আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড

REFERENCE

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

RETROCONVERTED
B. C. S. C. L.

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলি-৭৩

—দু'শো কুড়ি টাকা—

সম্পাদনা

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

সর্বাণী মুখোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট

অঙ্কন— অমিয় ভট্টাচার্য

মুদ্রণ—সান লিথোগ্রাফী

BCSC .... Public Library
Lib Fin. C... No. 3132
Lib Fin. Com. M.R. No. 12471

ASUTOSH MUKHOPADHYAY RACHANAVALI VOL-VIII
An anthology of collection of complete works Vol. VIII by Asutosh Mukherjee. Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd., 10 Shyama Charan Dey Street, Calcutta-700 073

Price Rs. 220/-

I S B N : 81-7293-388-6

শব্দগ্রন্থন : লেজার ইম্প্রেশন্‌স্‌

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ, ৫২ মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা

আশুতোষ কর্মজীবনে সাংবাদিক। হয়ত সাংবাদিকতা তাঁব পেশা এবং নেশা। 'সংবাদপত্রেব সেকালের কথা' গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ এমন কিছু সংবাদকণা প্রকাশ করেছেন যেগুলিকে আমরা গল্পই বলতে পারি। বাবুদের নষ্টামি আর বেলাল্লাপনা নিয়ে সমাচাব দর্পণে যে লেখা বেরিয়েছিল তার নাম ছিল বাবু উপাখ্যান। 'উপাখ্যান' শব্দটি ছোট গল্পেব কথাই মনে করিয়ে দেয়। অন্যদিকে কৌলীন্যপ্রথার কুৎসিত ঘটনার নাম দেওয়া হযেছিল 'কাহিনী'। সংবাদ যে উপাখ্যানেব মেজাজ নিয়ে আসতে পারে 'সংবাদপত্রে সেকালেব কথায়' তার দৃষ্টান্ত কম নেই।

আশুতোষ এই ঘরানার লেখক। সিনেমাতে যাই হোক 'দীপ জ্বেলে যাই' গল্পটি তো একটি সংবাদই। অথবা মধুরঙ্গেব কাহিনীতে দুর্গা এবং মধুবঙ্গেব জীবনকথা প্রায সংবাদপত্রেব ভাষাতেই বর্ণিত হয়েছে। এমন কি কোনো কোনো গল্পে কিছু সংবাদ পবিবেশন কবে লেখক সংবাদেব বাহুল্যটুকু যে বর্জন করেছেন তা পাঠককে জানিযে দেন। আশুতোষ যখন গল্প বচনায প্রবৃত্ত হযেছিলেন তখন সংবাদপত্র জগতেও দিক পবিবর্তনেব সূচনা হয়েছিল। নিউজ-ভিউজ তো মিলেমিশে গিয়েছিল। সাদামাটা সংবাদে আব গ্রাহক-পাঠক টানা যাচ্ছিল না। আব আন্তর্জাতিক ঘটনাপবিবেশন অথবা গুরুতব সংবাদনিবেদনের ফাঁকে ফাঁকে এমন কিছু পারিবারিক বা সামাজিক ঘটনাব ঝলক পাই যা স্পর্শকাতব লেখককে উদবেজিত করে। তখনই প্রবাদবাক্যটি সত্য মনে হয 'ট্রুথ ইজ স্ট্রেঞ্জাব দ্যান ফিকশন'। আশুতোষ হাতে যে সংবাদপত্রেব সংবাদে একটা গল্পেব বীজ পেয়ে যেতেন, লেখকজীবনে যে সব মুহূর্ত আসে তাব কোনোটিকেই তিনি নষ্ট হতে দিতে চান না। এরকম সাহসে কোনো গল্প যেমন জমে যায আবাব কোনো গল্প কিছুটা ফিকে আর তরলই থেকে যায়। সংবাদকণাকে অবশ্য লেখকেব কল্পনাব তাপে-উত্তাপে গলিয়ে নিতে হয। এখানেই লেখকের শিল্পকর্ম এবং এখানেই সংবাদসাহিত্য শিল্পগুণে হযে ওঠে সমৃদ্ধ। সেজন্য সংবাদের উপর আশুতোষকে নাটকীযতাব সঞ্চার কবতে হয়। তাঁব অনেক গল্পেই নায়ক-নায়িকার মিলন বা সাক্ষাৎ আকস্মিকভাবে ঘটে যায। গল্পটিও যেন তখন মাটি পেযে যায আর বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র গল্প সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। দুর্গেশনন্দিনীতে তা স্পষ্ট। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই উপন্যাসে গল্পের উপর ঠাঁই দিলেন প্লটকে আব তার সঙ্গে বুনে দিলেন প্যাটার্ন যার ছন্দে পাঠকচিত্ত আন্দোলিত হতে থাকে। আর সেই ছন্দে দুলতে থাকে এই বাণী—'এ জীবন লইয়া কি করিবব?'

শরৎ গল্পকে আশ্রয় করলেন আরও দৃঢভাবে। দত্তা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শ্রীকান্ত উপন্যাসে গল্পের মালা। লেখক প্রায়শই কথক হয়ে ওঠেন। গৃহদাহেব অচলার ট্রেন বদল নাটকীয়। চবিত্রহীনে নাটকীয়তা আরও বেশি। তারকেশ্বরে রমা-রমেশের সাক্ষাৎ আরও রোমাঞ্চকব। আমরা বলতে পারি আশুতোষের ছোটগল্পে নদীজঙ্গল পেরিয়ে বাংলোয় হাসিরাণীকে আবিষ্কার, অথবা রামেশ্বরে মাতাজীর আবির্ভাব এরকমই ঘটনা।

আশুতোষ কেবল সাংবাদিক নয়, একটি সাংবাদিক সত্তাও যেন ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল তাঁকে ঘিরে। যে সত্তা বিশ্বাস করে কৌশল, ইশারা, ইঙ্গিত-এর তেমন প্রয়োজন নেই। যা যা ঘটছে তা একটানা বলে যেতে হবে। বালিকা-কিশোরী-যুবতীর হাসির জীবনকে কয়েকপৃষ্ঠার মধ্যে তিনি বেঁধে ফেলেন। রেখা মিত্রের সেবিকা জীবনের কাহিনীটুকুর মধ্যে বৈচিত্র্য বিশেষ কিছু নেই কিন্তু তিনি মোচড় দিলেন গল্পের শেষে যেখানে দেখি রেখা ভালোবাসার অভিনয় করে যে সব মানসিকরোগীকে বাঁচিয়েছিল সে অকৃত্রিম ভালোবাসাই তাকে গ্রাস করল। এবারে সে-ই রোগিণী। আশুতোষ গল্প বলতে চান। শরৎচন্দ্রের পর আমরা গল্প বলার যাদুকর পাই শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে। গল্প মানে তো কৌতূহলকে উসকে দেওয়া। কিন্তু উসকে দিলেই হবে না। বর্ণনা, ঘটনা, বিকৃতি বিশ্বাস্য হওয়া চাই। তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসে এই কৌতূহলকে অতি সহজে জাগিয়ে রাখতে সমর্থ হয়েছেন। আবার ব্যোমকেশের কাহিনী তো কৌতূহলের তারা মুদারা উদারা। ছোট গল্পেও তিনি গল্পের মর্যাদাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তুলনা না করেও বলা চলে বিমল মিত্র এই পর্যায়েরই লেখক। গল্পের কৌতূহলকে টেনে নিয়ে যান শেষ পর্যন্ত। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই গোষ্ঠীরই লেখক। কীভাবে তাঁরা এই সার্থকতা পেয়েছেন? শরদিন্দুর পথ বিচিত্র। কখনও ঐতিহাসিক, কখনও রোমান্টিক, কখনও ডিটেকটিভ রচনা লিখে তিনি বৈচিত্র্য বাড়িয়ে দেন কথাসাহিত্যের। মধ্যবিত্ত জীবনের রোজনামচায় কিছুটা ঢেউ তোলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। অ্যাভারেজ বাঙালী পাঠকের চাহিদা আজও বোঝা যায় টেলিভিশনের সিরিয়ালের দিকে লক্ষ করলে। সিরিয়ালের কাহিনীতে মধ্যবিত্তের সোনার সংসারের ওলোটপালট দর্শককে টেনে নিচ্ছে। এ কথা তো ঠিক, মধ্যবিত্ত জীবনের পড়ার মতো বই রবিনসন ক্রুসো। আজও যার আবেদন অম্লান। কেন? মধ্যবিত্ত দেখতে পায় তার জীবনযাপনে যে সংগ্রাম আছে, উদরপূর্তির জন্য যে দৈনন্দিন যুদ্ধ সে তো আমাদেরই প্রতিচ্ছবি। আশুতোষ এই সংগ্রামে, যুদ্ধে হাত রাখেন। এই গোষ্ঠীর লেখকবৃন্দের মধ্যে যাঁদের নাম করেছি তাঁরা বেস্ট সেলারের পর্যায়ে পড়েন। 'বেস্ট সেলার' মানেই সেসব লেখক নন—একথা মানি। আবার সাময়িক হুজুগকে আশ্রয় করে যে রচনা বেস্ট সেলারের পর্যায়ে পড়ে তার জাত কিঞ্চিৎ আলাদা। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় চমক সৃষ্টি করবার জন্য গল্প লেখেন না। তিনি একালের এক শ্রেণীর পক্ষে জনপ্রিয় লেখক—এবং এই জনপ্রিয়তাতে তিনি অভিভূত।

এবারে কিছু গল্পের পরিচয় নিই।

মুখোমুখি আত্মজৈবনিক। নিজেকেই বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। সেটা সম্ভব কিনা জানি না, কিন্তু লেখকের প্রয়াসকে স্বাগত জানাতে হয়। একজন লেখক যখন স্মৃতিরোমন্থনে নিমজ্জিত হন তখন উঠে আসতে থাকে তাঁর লেখার নানা প্রকরণ কৌশলের ইঙ্গিত। চরিত্ররচনায় তার বিন্যাসগতভাবে কতটা খাঁটি ছিলেন, এ সংশয়ও তাঁকে উতলা করে। আর লেখা যদি জীবনেরই অভিজ্ঞতা হয় তবে জীবনে তাঁর চাওয়া-পাওয়ার টানাপোড়েনের সুখদুঃখের কথাও এসে পড়বে। একের পর এক প্লট উদ্ভাবন করে নিজেকেই যেন তিনি জানতে চেয়েছেন। আর জানার ধাপে ধাপে তৈরি হতে

থাকে একের পর এক গল্প অথবা উপন্যাস। লেখক-জীবনের সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছে লেখক শেষ পর্যন্ত বলছেন 'মানুষের চরিত্র নিয়ে সমস্ত লেখকজীবন ধরে যে এ-ভাবে ভাঁওতাবাজী করে গেলাম, নিজেই জানতাম না। যে লোক নিজের চরিত্রের ঠিকানা জানে না, হদিস জানে না, সেই লোক অনন্য চরিত্রস্রষ্টা—এর থেকে হাসির ব্যাপার আর কি হতে পারে।' সত্যিই কি তাই? কেবল ভাঁওতাবাজী? প্রশান্ত যে সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন ছোটগল্পের পরিসরে তাকে বিশ্বাস্য করে তোলা কিঞ্চিৎ দুরূহ। কেননা প্রশান্ত সফল লেখক। পাঠকধন্য লেখক। পাঠক কি করে এই ফাঁকিতে ভুলে যায়? নাকি লেখক প্রশান্ত এই কথাই বলতে চান শৌখিন মজদুরিতে ভুলিয়ে তিনি সাময়িকভাবে পাঠকচিত্ত জয় করেছেন? তাই শৌখিন মজদুরির প্রতিই তাঁর অবজ্ঞা? মুখোমুখি হলে এরকম নৈরাজ্য পীড়িত করে লেখককে? 'সহাবস্থান' গল্পটিতে একালের সমস্যাকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন লেখক। স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার বিবাহ। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ভালোবাসা ছাই হয়ে যায়। দেখা যাচ্ছে বিবাহপূর্বজীবনে একজনের স্খলন অন্যজনের বিবাহপরজীবনে আনুগত্যের অভাব। বলা বাহুল্য স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনের অভিনয় দীর্ঘস্থায়ী হয় না। অভিনয় দীর্ঘস্থায়ীও হয় না। দুজনেই পাপবোধে জর্জরিত হয়। ডিভোর্স ছাড়া অন্য সকল পথ তখন বন্ধ। কিন্তু একদিন সাহস করে স্ত্রী খুলে বলে তার পাপের কথা। স্বামীও তার পাপবোধকে লুকিয়ে রাখেনি নিশ্চয়ই। এই পাপবোধই দুজনের চৈতন্যে ঘা দেয়। হয়ত বা মিলনের সেতুবন্ধও রচিত হয় এইখান থেকেই। উত্তরণের একটা দিশাও পেয়ে যায় দুজনে। বোঝা গেল না স্বামী দিলীপ তার গোয়ার জীবনকে কোথায় নিক্ষেপ করবে? বোধ করি যেমন করে দিলীপ শীলার বড় ছেলেকে (যে অন্যের সন্তান) টেনে নেবে, তেমনি শীলাও গোয়ার দিলীপের সন্তান দুটিকে বুকে করবে। এর বেশি প্রশ্নের উত্তর লেখক দেননি, সম্ভবত পাঠককেও তা বিশ্বাস করতে বলেছেন।

'দাম্পত্য' আমাদেরই ঘরোয়া জীবনের কাহিনী। উঁচু ঘরের মেয়ের প্রেমে পড়ে যে সাধারণ ঘরের ছেলেটি নিজের সুখের চাইতে বিপর্যয়কে ডেকে আনল, তার কাহিনী বলেছেন লেখক এখানে। ছেলেটির মধ্যে এসে যায় এক প্রতিযোগিতার উত্তেজনা। প্রাণপণে যে হয়ে উঠতে চায় সুমিত্রার অর্থকৌলীন্যের প্রতিস্পর্ধী। বলা বাহুল্য এটা একটা হাস্যকর ব্যাপার। কেননা প্রতিস্পর্ধায় দাম্পত্যজীবনের ফাটলে জোড়া লাগে না। অর্থ সব সময় শান্তি নাও দিতে পারে। এই গল্পেও দেয়নি। শুরু হল নানা বিষয় নিয়ে ঝামেলা। এই ঝামেলায় যোগ দেয় সুমিত্রার বাবা। তিনি মেয়েকে নিয়ে আসেন নিজের বাড়িতে। সুমিত্রাও ঝগড়াঝাঁটি করে বাপের বাড়ি চলে যায়। এ কি বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইলের মতো ভ্রমর-চরিত্র? বাপের বাড়ি চলে গিয়েই তো ক্ষণস্থায়ী অভিমানকে ভ্রমর দীর্ঘস্থায়ী তিক্ততায় পৌঁছে দিল। এক্ষেত্রে অবশ্য রমেন চেষ্টা করেছে সুমিত্রাকে ফিরিয়ে আনবার। কিন্তু বাদ সেধেছে সুমিত্রার বাবা। যখন ডিভোর্স একরকম অনিবার্য হয়ে উঠল তখন দেখা গেল সুমিত্রার ছেলেকে নিয়ে নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন। কিভাবে এই অঘটন ঘটল? লেখক দেখালেন মাদ্রাজে এক শেঠজীর দোকানে কোল্ড ড্রিংস খেতে খেতে একটি ছেলের সঙ্গে পরিচয় হল। পরিচয়ের ফলে সহানুভূতি।

সকালে স্কুল করে ছেলেটি দোকানে চলে আসে। সারাদিন খাটে, খদ্দের সামলায়। খদ্দের আপ্যায়ন করে। রাত্রে তার ছুটি। কথায় কথায় জানাল ছেলেটি যে শেঠজীই তার বাবা। শেঠজী নিজে দোকান করেছেন, এখন বয়সে ছেলেকে শেখাচ্ছেন তার দোকানবিদ্যা। সুমিত্রার সঙ্গে রমেনের এবারের ঝগড়ার উদ্দেশ্য ছিল অনেকটা অনুরূপ। সুমিত্রা চেয়েছিল ছেলে চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট হবে, বাপ বলেছিল ছেলে তার কারখানায় কাজ শিখুক। সুমিত্রা ঠাণ্ডা পানীয় খেতে খেতে ছেলেটির জীবনের যে পরিচয় পেল তাতে তার সম্বিত ফিরে এল। সে বাপকে উপেক্ষা করেই নিজের গৃহে চলে এল। দাদু চেয়েছিল ছেলে ডাক্তার হবে, মামা চেয়েছিল এঞ্জিনিয়ার হবে। সবগুলিতেই ছেলে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ। তারপর চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট। এখন শেঠজীর দোকানে বসে বুঝে ফেলে রমেনের কথাই ঠিক। বাপের কারখানা জীবনেই ছেলের সাফল্য আসবে। বাইশ বছর পরে স্বামী-স্ত্রী 'দুজনে দুজনকে নতুন করে দেখছেন।' এইভাবেই সত্যপরিচয় উদঘাটিত হয়। গল্পটি মনস্তাত্ত্বিক গল্পের নমুনা হয়ে উঠতে পারত। কিন্তু আশুতোষ বহিরঙ্গ একটি ঘটনা নিক্ষেপ করলেন রমেন-সুমিত্রা-সুমু (ছেলে)র জীবনে। তার ফলে কঠিন সমস্যার সমাধান। আশুতোষ গল্পের জন্য প্লটের কথা খুব কি ভাবেন? আমার মনে হয় তিনি ঘরের মধ্যেই যে ঘর আছে তারই আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়ান। আর গল্পের টুকরো পেয়ে যান সেখানে। এটাই তাঁর যথার্থ এলাকা।

'তপ' আশুতোষের একটি বিশিষ্ট গল্প। বিশিষ্ট এই অর্থে যে এই গল্পে যেমন একদিকে পারিবারিক জীবনের এদিক-সেদিক ঘুরে দেখার কৌতূহল আছে তেমনি একলাফে গল্পটি রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে নারীর রহস্যময় গতিপ্রকৃতিতে। আশুতোষের গল্পে নারীচরিত্র প্রায়শই শক্তিময়ী হয়ে ওঠে। সাধারণ নারীর মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন তাপ-উত্তাপ সঞ্চিত থাকে আশুতোষের গল্পে তা দপ করে জ্বলে ওঠে। তপ গল্পে আসামের চা-বাগানের এলাকায় যে নারীর সন্ধান পাই আমরা তার দেখা সচরাচর শহরের কোলাহলে মেলে না। মনোরমা দ্বিজেন গাঙ্গুলির মেয়ে বলে সকলে জানে। কিন্তু দ্বিজেন গাঙ্গুলি মনোরমাকে লালনপালন করে বড়ো করেছেন। অসামান্য সুন্দরী মনোরমা। তাকে দেখে প্রেমানন্দ পাগল। বিবাহ হয়ে গেল। কিন্তু কলকাতায় মনোরমা বেমানান। সে শ্বশুরের ঘর করতে পারল না। স্বামী বাপমায়ের বাধ্য সন্তান। মনোরমাকে সন্দেহও সে করে। ক্ষিপ্ত প্রেমানন্দ মনোরমাকে শাসায়। অন্তঃসত্ত্বা মনোরমা ফিরে আসে। মনোরমার জীবন শেষ হয়ে যায় কিছুদিনের মধ্যেই। পঁচিশ বছর পরে মনোরমার ছেলে মহানন্দ ঘোষ এসে প্রেমানন্দের হাতে মায়ের গয়না ফেরত দেয়। সঙ্গে একটি কবচ। এখন প্রেমানন্দ স্ত্রী সুমিত্রাকে নিয়ে রীতিমত প্রৌঢ়। বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে মহানন্দের দিকে। সে জানত মনোরমা মৃত। গল্পটির পরিণতিতে এসে দেখি যার কাছ থেকে মনোরমার জীবনকাহিনী শুনতে পেলাম সে মনোরমা নয়—সুমিত্রা। নানা প্রশ্নে পাঠক অস্থির হয়ে ওঠে এই গল্প পড়ে। মনোরমা কেন প্রতিবাদী হয়ে উঠল, কেন গল্পে চলে এল সংক্ষিপ্ত শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারের কাহিনী? মনোরমা-সুমিত্রার মেলবন্ধনই বা কীভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? আসলে আশুতোষ লক্ষ রেখেছেন মনোরমা-সুমিত্রার দিকে। কতকগুলি পরিস্থিতির বাতাবরণে নারীর রহস্যময়তাকে উদঘাটন

কবেছেন লেখক। অতিকথনেব ক্রটিও আছে এই গল্পে। লেখক কিছুটা আবোপও কবেছেন নিজস্ব ভাবনা এই গল্পে এবকমই মনে হয়।

আশুতোষেব একটি আত্মজৈবনিক গল্প 'বিবেচনা সাপেক্ষ'। এ গল্পটিতেও বিভাবতী চবিত্র আশুতোষকে প্রেবণা দিযেছে। বিভাবতীব দীপ্তি গল্পটিতে বিস্তৃত হযেছে। এ বিস্তাব আশুতোষ সবল বেখায গডিযে দিযেছেন। কীভাবে বিভাবতী সংসাব চালনা কবেছে তাব কিছু দৃষ্টান্ত দিযে বিভাবতীব মধ্যবিত্ত জীবনেব সহনশীলতা, ধৈর্য, বুদ্ধিবৃত্তিব অসামন্যতাকে প্রকাশ কবেছেন লেখক। কিছু নাটকীযতাও এনেছেন গল্পে। এই গল্পটি কি আশুতোষ লিখেছেন নিজেবই লেখা বিশ্লেষণেব জন্য? গল্পেব শেষে কিছু কৈফিযৎ আছে। গল্পে কি কি উপাদান প্রত্যাশিত পাঠকেব কাছে? গল্পেব শৈলী কেমন হবে? এসব প্রশ্নেব উত্তব দিযেছেন লেখক। গল্পে কি সত্যেব ছাযা থাকে, গল্প কি আকাডা বাস্তব হবে, প্রথম পাঠে যাকে অবাস্তব বলে মনে হয, হযত সূক্ষ্ম বিচাবে তা ভ্রান্ত বলেই প্রতিপন্ন হবে, গল্পে কি উদ্দেশ্যমূলকতা প্রধান হবে অথবা পাঠকেব কৌতূহলকে জাগিযে বাখবাব জন্য উদ্দেশ্যমূলক ভাবকে গোপন কবতে হবে, পাঠকেব ইচ্ছাপূবণেব জন্যই গল্প তৈবি হবে? এসব প্রশ্ন লেখকেব যেমন পাঠকেবও তেমনি। লেখকেব জিজ্ঞাসা থেকে যা উঠে আসে তা হল গল্পে প্রত্যক্ষ বস্তুব ছাযা থাকে, উদ্দেশ্যমূলকতাকেও বিসর্জন দেওযা যায না, কৌতূহলকে জাগিযে বাখতে হবে শেষ পর্যন্ত, ইচ্ছাপূবণ গল্পে না থাকাই বাঞ্ছনীয। শেষ জিজ্ঞাসাটি কিন্তু আশুতোষ সর্বদা মেনে চলেন না। অনেক সমযেই আশুতোষেব গল্পেব বৃত্ত তৈবি হয ইচ্ছাপূবণে। আশুতোষ নাবীব মধ্যে শক্তিমযীকে দেখেছেন। আবাব মঙ্গলমযী নাবীব ভূমিকাকে আশুতোষ স্বাগত জানান তাঁব গল্পে . যে মেযেব মঙ্গল আব কল্যাণেব আকাঙ্ক্ষায মহিলাব উনিশ হাজাব টাকা সম্বলেব থেকে দশ হাজাব খবচ কবাব প্রেবণা আব অনাযাসে আইন ভঙ্গ কবাব তাডনা—কল্পনায সেই মেযেব মাথায হাত বেখে কেন বলতে ইচ্ছে কবছে, মঙ্গল হোক, সুখী হও। লেখক এখানে ধবা দেন পাঠকেব কাছে।

আশুতোষ প্রেমেব গল্প লেখেননি এমন নয। কিন্তু আমবা যে গল্পগুলি আলোচনা কবেছি তাতে পূর্ববাগেব বোমান্সেব বিস্তৃতি নেই। বোমান্টিক নাযক-নাযিকা গল্পে লুকোচুবি খেলে না। অথচ সুন্দবী, কুশলী, বুদ্ধিদীপ্ত, আবেগপ্রবণ নাযিকাব সাক্ষাৎ তাব গল্পে সব সমযেই উঠে আসে। আশুতোষ যেন বোমান্সেব ঘন পবিবেশে স্বচ্ছন্দ হতে পাবেন না। বুদ্ধিব প্রৌঢত্বে ছোটগল্পে সহজে তাবা পাঠকচিত্তকে আশ্বস্ত কবে ঠিকই, কিন্তু উর্বশীৰূপে পুরুষেব চিত্তকে উথালপাতাল কবে না। অপর্ণা আব মেজব ঘোষ চৌধুবীব বিবাহ প্রেমজসূত্রে কিন্তু সেটুকু সংক্ষেপে বলে লেখক মৃত্যুশয্যায শাযিত অপর্ণাব জন্য সৈনিক মেজবেব উৎকণ্ঠা, আবেগ উত্তেজনা এবং ভালোবাসাকে বিবৃত কবেছেন। গল্পটিকে তিনি সৈনিকেব জীবনযাপনেব দৃষ্টিকোণ থেকে দেখছেন। একটি দুষ্প্রাপ্য ওষুধ খাওযাতে পাবলে অপর্ণা বেঁচে যাবে এই আশায দ্রুত গাডি চালিযে দোকান থেকে সংগ্রহ কবলেন ওষুধটি। নির্দিষ্ট সমযে পৌঁছতে পাবলে স্ত্রী বেঁচে যাবে। মেজব গাডি চল্লিশ পঞ্চাশ মাইল গতিতে চালাতে লাগলেন। কিন্তু ক্রসিং-এ এসে গাডি থামাতে হয। অস্থিব হয়ে ওঠেন মেজব। এক একটা ক্রসিং-এব লাল আলো

মেজবেব বুকে আগুন হযে জ্বলে কিন্তু তিনি নিযম ভেঙ্গে বেবোতে পাবেন না। একদিকে স্ত্রীব প্রতি ভালোবাসা, অন্যদিকে শৃঙ্খলিত সৈনিকেব জীবনেব ক্রসিং-এব বিধিবিধান মানাব দাযিত্ব মেজবেব জীবনকে অস্থিব কবে তোলে। যখন তিনি পৌছলেন, তখন সব শেষ। বিষয হিসাবে তুচ্ছই বলতে হবে, কিন্তু আশুতোষকে বোধ কবি ভাবিযেছে মানুষেব দুর্ভাগ্যেব উৎস কোথায। এবকম গল্প খুব বেশি পডেছি বলে মনে কবতে পাবছি না।

আগেই বলেছি আশুতোষ নাবীচবিত্রেব বৈচিত্র্য লক্ষ কবেছেন নানা দিক থেকে। 'দুজনাব ঘব' গ্রন্থনামেব গল্পটিতে কাজললতা এইবকম একজন বৈচিত্র্যমযী নাবী। স্বাচ্ছন্দ্য আব অনটনে যে নাবী নূতন মাত্রায বদলে বদলে যায। কাজলতাব মধ্যে সৃষ্টিধর্মী এক সত্তাব পবিচয আমবা পেযে যাই। এ নাবী স্বপ্ন দেখে, পবিশ্রম কবে সে স্বপ্নকে বাস্তবে সৃষ্টি কবে তোলে। স্বামীব সঙ্গে দুজনে মিলে নিজেদেব ব্যবসাযকে উন্নতিব পথে নিযে যায। কিন্তু ব্যবসাযে ওঠা-পডা আছে। পডাব দিনে আগন্তুক তৃতীয ব্যক্তিটি দুজনাব ছিমছাম জীবনে গণ্ডগোল পাকিযে দেয। ধাবদেনা কবে কাজললতা ব্যবসাযকে বাঁচিযে বাখে, ধাব নেয বটুকেব কাছ থেকে। বটুক সুযোগ নেয। স্বামী বাধাকান্ত একদিন টেব পায। কাজললতাকে নিযে পালিযে যায বটুক। বটুকেব শযতানিব হাত থেকে বেহাই পাবাব জন্যে কাজল একদিন ফিবে আসে। বস্তিতে ঘব বাঁধলেও তাব সৃষ্টিসত্তা মবে যাযনি। সে আবাব খুঁজে পায দুজনাব ঘব। কপালে বডো কবে সিঁদুবটিপ। এটা যেন তাব বক্ষাকবচ। সে নন্দন দোকানে চাকবি জুটিযে নেয। দিনে দিনে নন্দব দোকানেব উন্নতি ঘটতে থাকে। কাজললতাব শ্রম আব পবিকল্পনা দোকানেব লক্ষ্মীশ্রী ফিবিযে আনে। নন্দ খুশি। যে মেযেটি কাজ কবত তাকে কাজললতাব সঙ্গে খাবাপ ব্যবহাবেব জন্য তাডিযে দেয। তাবপব নন্দ একদিন কাজললতাকে টেনে নিতে চায সঙ্গিনী হিসাবে। তাদেব নিভৃত খেলায এসে দাঁডায তৃতীয ব্যক্তি নন্দব স্ত্রী। কাজললতা সবে যায। জীবন দিযে সে বুঝতে পাবে দুজনাব ঘবে তৃতীয ব্যক্তিব স্থান নেই। বাঁচাব লডাইযেও তৃতীয ব্যক্তি প্রতিবন্ধক। পাবিবাবিক জীবন এবং বহির্জীবনেব দ্বন্দ্ব মেটানো সম্ভব নয। আশুতোষ এখানে আবাব নাবীব দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পটিকে তৈবি কবলেন। লেখকেব ইচ্ছাশক্তিব কাছে বাধাকান্ত, বটুক, নন্দ তিনজনই কুচবিত্রেব পর্যাযে নেমে আসে। বাধাকান্তব ঈর্শা, ক্ষোভ এবং খুনেব ইচ্ছা অবশ্য সঙ্গত। কিন্তু তাব বদমেজাজেব প্রসঙ্গ অনুল্লিখিত নয এই গল্পে। এখানেও পবিস্থিতিব মধ্যে নিক্ষেপ কবেছেন কাজললতাকে লেখক। আমবা কি কাজললতাকে অপাপবিদ্ধ ধবে নিতে পাবি? বোধ কবি এ ভাবা সম্ভব নয। বটুক কিংবা নন্দেব তাপউত্তাপে কাজল গলে যায কেন এব উত্তব বোধ কবি এই কাজললতা তাব সাচ্ছন্দ্যেব জন্য যে কোনো মূল্য দিতে বাজী। গল্পটি একালেব, হযত মূল্যবোধ হাবানোব দৃষ্টান্ত হিসাবে গল্পটিকে গণনা কবা যায।

আশুতোষ মুখোপাধ্যাযেব গল্পেব চবিত্রনির্মাণকলা কিছুটা সিনেমাব ফ্ল্যাশব্যাক কাহিনীগ্রন্থনেব মতো। নাযকেবা তাদেব গল্প যখন নিবেদন কবেছে পাঠকেব কাছে তখন তাদেব মধ্যে অনেকেই প্রৌঢত্বে পৌছে গেছেন। শ্রোতাদেব আসবে বসিযে

বাতির আলো ধীরে ধীবে কমিয়ে আনেন। আর নায়ক তখন বর্তমানকে শ্রোতার চিত্ত থেকে সরিয়ে দিতে থাকেন। অতীতের পর্দা খুলতে থাকে, আমরা আর এক আলোব জগতে পৌঁছতে থাকি। ভূতেব গল্পে এই পরিবেশটি গা-ছমছম-করা। আশুতোষ কিন্তু ভূতেব গল্প লেখেন না। অতীতকেই বর্তমানের ঘটনা, দৃশ্যে, সংলাপে রূপান্তরিত করেন। বোধ কবি গল্প শোনার কৌতূহল এতে বেড়ে যায়। আসলে আশুতোষ যেন নাটক কিংবা চরিত্রবিহীনবিহীন গল্প অথবা চরিত্রবিরোধী গল্পে বিশ্বাসী নন। গল্প বলাব বঙ্কিমী পদ্ধতিতে তাঁব পূর্ণ আস্থা।

স্ত্রী-ব মৃত্যুব পব প্রতিষ্ঠিত লেখক বামকৃষ্ণ চক্রবর্তী বামেশ্ববমে বেড়াতে গিয়েছেন নিছক ভ্রমণেব নেশায। আব কিছুক্ষণেব মধ্যেই দক্ষিণ ভারতেব বামেশ্বরমের বহস্যমযী মাতাজীকে দেখতে পান। বিকেলে সর্বজনশ্রদ্ধেযা, সঙ্গীতজ্ঞ, পবম ধর্মাচাবী মাতাজী বামকৃষ্ণকে ডেকে পাঠান। সকালেব দেখায (ঘোমটাব আড়ালে) যে কৌতূহল জেগেছিল বিকেলে তাকে চিনতে পাবলেন। আব গল্পের শুরুও এখানে। এক সমযের প্রেমিক-প্রেমিকা। বামকৃষ্ণেব যেন কেবল পালিযে-বেড়ানো প্রেমিকাকে ভালোবাসার সম্পুটে ধবে রাখবাব চেষ্টা। প্রচণ্ড আবেগে প্রেমিকা শুভ গাঙ্গুলিকে কিন্তু তিনি পেলেন না। বামকৃষ্ণেব প্রচণ্ড ভালোবাসাকে গ্রাহ্য না কবে শুভ উধাও হল। এখন সে মাতাজী। ভক্তজনেব ভক্তির পাত্র। বামকৃষ্ণবাবুর অনুমান কবতেন শুভা অন্য কোনো পুরুষেব সঙ্গে পালিযেছে। কৌতূহলবশেই জিজ্ঞেস কবলেন কেন শুভা পালিযেছিল এবং সেই প্রেমিকা পুরুষটিই বা কে? শুভাব উত্তর শুনলেন তিনি। বামকৃষ্ণের বড়ো হযে ওঠার জন্যই শুভা সেদিন নিজেব ভালোবাসাকে বিসর্জন দিযেছিল। বামকৃষ্ণের লেখকজীবনে এবকম বিচ্ছেদযন্ত্রণা থাকলেই তাঁব লেখায ফুটে উঠবে নাযিকাদের জীবনের সাধ আহ্লাদ, প্রেম রোমান্স আব শুভাব মতো সাধারণ কালো মেয়ে নয. দেখা দেবে সুন্দরীরা। নাবীব এই ত্যাগ আমাদেব কাছে কিছুটা অবাস্তব মনে হলেও আশুতোষ মানবিকতার দৃষ্টান্তরূপে গল্পটিকে প্রতিষ্ঠিত কবতে চান। আমাদেব ইচ্ছাপূরণের গল্প এটি। লোকনাথবাবুব গল্প বলাব কাহিনীও ওই অতীতেব দবজা খুলে দিয়ে তাব অন্দবমহলের চিত্র প্রদর্শন। রামকৃষ্ণবাবুর অভিজ্ঞতা অনেকটা ববীন্দ্রনাথেব বাখী সুমিত্রাব (রাজা ও রানী) মতো—তোমাকে যে ছেড়ে যাই সে তোমাবি প্রেমে। আব লোকনাথবাবুও বহুদিন বাদে তাঁব গ্রামের বাড়িতে এসে গ্রাম-পবিক্রমায় এসে সন্ধ্যাব আলোআঁধারে আবিষ্কার করেন বোবা হাসিবাণীকে। গল্পটিব মধ্যে মানুষেব স্বার্থচিন্তা, অর্থলোভ, ঠকানোব চিত্র আছে। গল্পেব স্বাদ ঘন কবেছেন প্রায ডিটেকটিভ উপন্যাসের শৈলীতে। কিন্তু নাবীর পালযিত্রী এবং বক্ষায়িত্রীর ভূমিকাকে তিনি মেলে দেন এই গল্পেব শেষে। নারীব অন্তবশক্তিব পবিচয পাই আমরা এ গল্পে। বোবা হাসিরানী নিজেব অধিকার বক্ষা করাব জন্য এক ধরনের নৃশংসতাব আশ্রয়ও নিযেছিল। এটা কি পাপ? গল্পের শেষে এর উত্তর পাই আমবা। লোকনাথবাবু বললেন, 'কোনো পাপ করোনি, কোনো অন্যায় করোনি—তুমি যা করেছ তোমার ছেলেবা তা সোনাব অক্ষবে লিখে রাখে যেন, বংশ বংশ ধরে সকলে জানতে পারে'। গল্পটার শেষ ছত্র 'বাঘিনীর নিঃশব্দ গর্জন কেউ শোনেনি'। অনেক গল্পেই আশুতোষ নিজেই চবিত্রের জবানিতে গল্পের মর্ম উদঘাটন

কবেন। এ প্যাটার্নও বঙ্কিমী। আব লেখক ধবা দেন পাঠকেব কাছে এইভাবে। প্রযোজনে নাবী যে বাঘিনী হযে উঠতে পাবে গল্পেব মর্ম তাই। আবাব সেই শক্তিমযীব ভূমিকাব বিস্তাব লক্ষ কবি আমবা।

আমবা আগে বলেছি আশুতোষ বোমান্সেব বহস্যঘটনা তাঁব গল্পে বিস্তাব কবেন না। তবে কি তাঁব গল্পে প্রণযকলাব ছলনা, আকাঙ্ক্ষা, আবেগবর্জিত? সেবকম নয অবশ্য। কিন্তু পূর্ববাগ থেকে মিলনে উত্তবণ খুব দ্রুত ঘটে যায আশুতোষেব গল্পে। পূর্ববাগ অনেক সমযেই নাযকেব পক্ষে একতবফা। এবং প্রেমিক তখন দুর্দান্ত হযে ওঠে। যতটা না মধুচন্দ্রিমাব ভাষায প্রেমিক অভ্যস্ত, তাব চাইতে অনেক বেশি সে মবিযা। কোনো বাধাই সে মানতে চায না। প্রেমিকা-কে সে জোব কবে ছিনিযে নেবে —এই তাব পণ। কিন্তু মিলনেব পব হঠাৎ যেন সংসাবেব চাপে এবং দাপে অথবা স্বভাবে সে হযে পড়ে দুর্বল। সেই জাযগায এসে দাঁড়ায প্রেমিকা। আশুতোষেব নাযিকাদেব গৃহিণীপনাব বৈচিত্র্য কর্তব্যপালনে, সন্তানপালনে, সংসাববিন্যাসে, কখনও বা সংসাবত্যাগে। তাব নাবীবা লক্ষ্মী ও প্রিযা একথা বলেছি, কিন্তু সমযবিশেষে তাবা উগ্র। বাঙালিব সংসাবে ঘানি টেনে (আধুনিকাদেব দেখতে পাই না বিশেষ। বঙ্কিমচন্দ্রেব নবীনা ও প্রবীণাব সাক্ষাৎ পাই নিশ্চযই। বঙ্কিমচন্দ্রেব নবীনাবাও কিন্তু একালেব উপন্যাসে নিতান্তই প্রবীণা। আশুতোষ বঙ্কিমগোষ্ঠীবই লেখক।) নাবীবা। সেই সূত্র ধবেই উঠে আসে বিভাবতী, হাসিবানী চবিত্র। মধুবঙ্গ গম্ভীব প্রকৃতিব মানুষ। অভিনযজীবনে সে মানুষকে হাসায। চবিত্রটিব মধ্যে আমবা এক অনাস্বাদিত জীবনবসেব পবিচয পাই। তাব শিক্ষাদীক্ষা খুব বেশি নয। কিন্তু অভিনযজীবনে সফল। সে ভালোবাসে দুর্গাকে। দুর্গা ধনীঘবেব মেযে। উচ্চ শিক্ষিত। সে মধুবঙ্গকে উপেক্ষা কবে। ঘৃণাই কবে বলতে হবে। মধুবঙ্গ দুর্গাকে পাবাব জন্য দুর্দান্ত হযে ওঠে। মাঝে মাঝে তাব মধ্যে জেগে ওঠে খুন কববাব প্রবৃত্তি। কিন্তু একদিন সে অভিনযেব ছলচাতুবিব দ্বাবাই দুর্গাব চিত্ত জয কবে। দুর্গা পবিবর্তিত হয। মধুবঙ্গকে সে ভালোবাসতে আবম্ভ কবে। কিন্তু প্রেমেব ফাঁদ সে জানে না। মধুবঙ্গেব জীবনকে গড়ে তোলাই তাব ধ্যানজ্ঞান হযে ওঠে। মধুবঙ্গ মানতে চায না। দুর্গা ক্ষেপে ওঠে। মধুবঙ্গেব জীবনকে সে সুন্দব কবে তুলতে চায বলেই কখনও কখনও নিষ্ঠুব হযে ওঠে দুর্গা। এই দুর্গা মবে গেল একদিন। দুর্গাব শোকে শ্মশানে যখন সকলে বিহুল তখন মধুবঙ্গেব মনে পড়ে যায দুর্গাকে যেদিন অভিনয-ছলাব দ্বাবা জয কবেছিল। সে অভিনযই সে কবতে লাগল এখানে এসে। সে অভিনেতা। জীবনেব সঙ্গে অভিনযেব জন্য মেলবন্ধন ঘটে যায। আব দুর্গা? সে যেন সবস্বতী নদী। যাব বুকে বালি আব খুঁড়লেই অন্তঃশীলা ফল্গু। যদিও দুর্গা অবাঙালী কিন্তু আশুতোষ তাব মধ্যে খুঁজে পান বাংলাব বধূব জীবনযাপনেব আদর্শ। যাকে আমবা প্রায ফেলে এসেছি, আসছি ইতিহাসেবই অমোঘ নিযমে। আশুতোষেব মূল্যবোধ সাবেকি, ঐতিহ্যনিযন্ত্রিত।

আশুতোষ মুখোপাধ্যাযেব গল্পে বাঙালী-অবাঙালী মধ্যবিত্তেব সুখদুঃখেব মেলা। তিনি দাম্পত্যজীবনেব বিশেষ একটি ঝোঁকেব প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ কবেছেন। তিনি যখন গল্প লিখতে শুরু কবেন তখন বাংলা গল্পে নূতন কালেব ইশাবা। নূতন গল্পে বচনাশৈলী

পালটে যাচ্ছিল। মননেব বিস্তাব গল্পে দীপ্ত হচ্ছিল। সূক্ষ্ম কারুকার্যেব দিকে লেখকবৃন্দেব ঝোঁক তখন। স্বাধীনতাপ্রাপ্তিব পব আশা ও আশাভঙ্গেব উৎসাহ ও বিষাদ বাংলা গল্পে দীর্ঘ ছায়া ফেলেছে। মধ্যবিত্তেব অস্তিত্ব তখন বিপন্ন। অবক্ষযেব এক গভীব খাদেব মুখোমুখি মধ্যবিত্ত। সিসিফাসেব মিথ টানছে লেখকবৃন্দকে। বাজনৈতিক পবিবর্তনেব কাঠামো পবিবর্তিত হলো। মানুষেব জীবনযাপনেব সঙ্গে সে পবিবর্তন জডিযে গেল। বাংলা গল্পে তাবও পদাঙ্ক পডল।

কিন্তু আশুতোষ এই পবিবর্তনেব আবর্তে উঠে আসতে চাননি। তিনি লক্ষ কবেছেন মধ্যবিত্তেব জীবনে এমন কতকগুলি প্রবণতা, টানটোন আছে যা প্রায গত শতাব্দেব মাঝামাঝি থেকে চলে আসছে। সেই ট্রাডিশন সমানে না চললেও, উচ্চাবচ কিছু তবঙ্গ সৃষ্টি হলেও—বাঙালী মধ্যবিত্তেব একটা সাবেকি প্যাটার্ন থেকেই গেছে। আমবা যে গল্পগুলি চুম্বকে দেখেছি সেখানে এই গডপডতা বাঙালিবই চেহাবা। মধ্যবিত্তেব এই চিত্রচবিত্র-কে আশুতোষ ভোলেননি। তিনি মননেব ধাব দিযে যাননি এমন কথা বলি না, তবে স্পষ্ট, প্রত্যক্ষেব ভাষায তিনি এ জীবন একে গেছেন। আমাদেব কেবলই বাংলা কবিতায অক্ষযকুমাব বডালেব এষা কাব্যেব কথা মনে পডে যায আশুতোষেব গল্পমালায। অক্ষয বডাল প্রীতিবিবহেব কাব্য বচনা কবেছিলেন। প্রিযাব বিবহেব স্পর্শ ঘবেব আনাচে-কানাচে মধুব রূপ নিযে আনাগোনা কবছে—এমন কি গৃহস্থালিব প্রতিটি খুঁটিনাটি জীবনে কবি প্রিযাব স্পর্শ পেযেছিলেন। দুর্দান্ত পুরুষকে স্নেহবন্ধনে বেধেছে নাবী। আশুতোষ এই জীবনকেই খুঁজে পান বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনে। তাব সঙ্গে যুক্ত হযেছে নাবীজাগবণেব বিস্তাব। এই জাগবণেব একটা আত্যন্তিক দিকও তাব গল্পে উঠে আসে। তাকে যেন তিনি ঠিক মেনে নিতে পাবেন না। সমব ঘোষাল আব অতসীব কাহিনীতে প্রেম ভালোবাসা মিলনে এবং চিববিচ্ছেদে তা স্পষ্ট হযে ওঠে। অতসী (কুল) যেন আতসী (এক জাতীয কাঁচ যা সূর্যকিবণকে ঘনীভূত কবে প্রচণ্ড তাপে আগুন জ্বালিযে দেওযা যায)। নাবীব দীপ্তি দাহ যেমন আমবা এ গল্পে পাই তেমনি দেখি ব্যর্থতাব কারুণ্য। একটি গল্পে হাসি নামে মেযেটিব অবহেলা আব উৎপীডনেব শিকাব হতে দেখি, অন্যদিকে আব একটি গল্পে শোনা যায হাসিবানীব গর্জন। আশুতোষ মধ্যবিত্ত জীবনেব এই কান্নাহাসিব রূপকাব।

ডঃ বিজিতকুমাব দত্ত

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী

অষ্টম খণ্ড



মুখোমুখি

প্রশান্ত মিত্র দোতলার বারান্দায় ইজিচেয়াবে গা ছেড়ে বসেছিলেন। ঘন্টাখানেক আগে ইন্দিরা নিজে ওই চেয়ার পেতে তাঁকে ধরে ধবে এনে বসিয়ে দিয়ে গেছেন। এখানে বসে ইচ্ছে করলে রাস্তাব লোক-চলাচল দেখা যায়। ইচ্ছে কবলে সামনেব আকাশেব খানিকটা দেখা যায়। ইচ্ছে কবলে রাস্তাব উল্টোদিকের বাড়ি ক'টার জানলা দরজা বা বারান্দার মুখগুলো দেখা যায়। আর কিছুই ইচ্ছে না করলে ইজিচেয়াবে মাথা রেখে চোখ বুজে চুপচাপ শুযে থাকা যায়।

বেরুবাব আগে ইন্দিবা এই শেষেব নির্দেশই দিযে গেছেন।—কিছু চিন্তা কববে না, কিচ্ছু ভাববে না, মনটাকে একেবাবে ফাঁকা কবে দিযে চুপচাপ চোখ বুজে শুয়ে থাকবে, আমি এক ঘন্টাব মধ্যে মার্কেটিং সেরে ফিরে আসছি—ঘরে কি আছে আব কি নেই ক'দিনের মধ্যে তো আব হুঁশ ছিল না—ছেলেমেযে দুটোরও যাদি বিবেচনা বলে কিছু থাকত—বাবাব জন্যে কেবল চিন্তা কবতেই ওস্তাদ তারা, ফাঁক পেলেই ছুটছাট বেরিয়ে পড়েছে—নিজে না বেবিযে করি কি। মহেশ কাছেই থাকবে, কিছু দবকার হলে ওকে বলো, আব খববদাব টেলিফোন এলে তুমি চেযাব ছেড়ে নড়বে না—মহেশ ধববে, কেউ খোঁজ নিলে কি বলতে হবে ওব এতদিনে মুখস্থ হযে গেছে। ঠিক আছে ?

প্রশান্ত মিত্র হেসে মাথা নাড়লেন, ঠিক আছে। বললেন, আমাব চিন্তা নিয়ে বেবিয়ে তুমি আবাব গাড়ি-চাপা পড়ো না।

ইন্দিবা ব্যস্ত পাযে চলে গেলেন। কিন্তু আধ মিনিটেব মধ্যেই আবার ফিবলেন। হাতে একটা ছোট টুল। পাযের সামনে ওটা পেতে দিযে বললেন, যখন ইচ্ছে হবে পা তুলে বোসো—আব ভালো কথা, আমি বেরুচ্ছি, এই ফাঁকে লুকিযে একটা সিগারেট খেলেও কিন্তু ধবা পড়ে যাবে—মহেশ ঠিক আমাকে বলে দেবে।

প্রশান্ত মিত্র মুখ টিপে হেসে বললেন, পি. এম'এব আদেশ শিরোধার্য।

—আ-হা, পি. এম'এব কথা কত শোনো তুমি। এ-কানে ঢুকলে ও-কান দিযে বেবোয—শুনলে আব এই বিপাকে পড়তে হত না।

চলে গেলেন। পি. এম অর্থাৎ প্রাইম মিনিস্টাব। নামে মিল, তাই ইন্দিরা গান্ধী যেদিন থেকে প্রধানমন্ত্রী সেই দিন থেকে ঘরের এই বসিকতা চালু। প্রশান্তবাবু সময়ে সময়ে এখনো ঠাট্টা করেন, ইন্দিবা সাম্রাজ্যেব তবু একবাব পতন হযেছিল, মিত্র সাম্রাজ্যের পতন বলে কোনো কথা নেই। লাই পেযে ছেলেমেযে দুটো পর্যন্ত ওই নাম নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করে।

...গত চার সপ্তাহ ধবে বাড়ির বাতাসে চাপা উত্তেজনা থিতিযে ছিল। সম্ভাব্য শোকেব উত্তেজনা। শোক ঠেকানোব উত্তেজনাও বলা যেতে পাবে। মোট কথা, সমস্ত ব্যাপারটাই প্রশান্তবাবুর বিবেচনায় একধরণের উত্তেজনা গোছেরই মনে হয়েছিল। হঠাৎ সত্যি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বিনা নোটিসে মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠেছিল। বাঁ-কাঁধে আব বুকের বাঁদিকে একটা যন্ত্রণা শুরু হয়েছিল। বেজায় গরম লাগছিল। ঘাম হচ্ছিল। সমস্ত শরীবে যেন পিন ফোটানো হচ্ছিল। এ রোগ তিনি চেনেন। বাবা

এই বোগে গেছেন। এক শালা গেল বছর এই রোগে গেছে। অন্তরঙ্গ এক খুড়তুতো ভাই ছ'মাস আগে গেছে। গত দেড় বছবের মধ্যে দু'জন সতীর্থ অর্থাৎ প্রবীণ সাহিত্যিক আর একজন কবিবন্ধু এই রোগে চোখ বুজেছে।

তাই সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে ডেকে তিনি কি হয়েছে বলেছেন। তারপব শুধু বলেছেন, মনে রেখো, যাই হোক কক্ষনো হাসপাতালে নয।

তারপর আর কথা বলার শক্তি ছিল না। কিন্তু জ্ঞান পুরোমাত্রায় ছিল। দশ মিনিটেব মধ্যে পাড়াব ডাক্তাব এসেছে। আধঘণ্টাব মধ্যে দু'জন বড় ডাক্তার। যে লোকের নাম-ডাক আছে তাব বেলায় অন্তত তড়িঘড়ি বড ডাক্তার কলকাতায মেলে। পটাপট কটা ইনজেকশান দেওযা হল প্রশান্তবাবু টেব পেযেছেন। তারপর দুটো দিন ঘুম আব ঘুমেব ঘোবে কেটেছে।

তৃতীয় দিনে একটু সুস্থ হবার পব থেকে চিকিৎসার আড়ম্বর আর সেই সঙ্গে এই চাপা উত্তেজনা দেখে যাচ্ছেন। দু'দিনেব সমাচাবও শুনেছেন। দু'জন বড ডাক্তাবই রোগীকে তক্ষুনি হাসপাতালে সরাতে চেয়েছিল। ইন্দিরা বেঁকে বসতে তা হযনি। দু'জন ডাক্তারই দস্তুবমতো অসন্তুষ্ট তাতে। তাবা ছেলেমেযেকে ডেকে বলেছে, এ অবস্থায় পেশেন্টকে বাড়িতে বাখা নির্বোধের কাজ হবে। ছেলেমেযে ঘাবড়ে গিয়ে মাকে বোঝাতে চেষ্টা কবেছিল। ইন্দিবাব এক কথা, চিকিৎসা বাড়িতেই হবে—তাব জন্যে দশগুণ খবচ হয হোক—হাসপাতালে নয।

হাসপাতালে কেন নয ছেলেমেযেও মোটামুটি আঁচ কবতে পাবে। দাদু থেকে শুরু কবে আত্মীয়-পবিজন আর বাবাব বন্ধুদেব এই বোগে যে ক'জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হযেছিল তাদেব একজনও জীবিত অবস্থায ফেবেনি। বাবা খোলাখুলি বলতেন, যাবাব সময হলে কোনো পাতাল থেকেই কেউ ফিববে না—আমাব কিছু হলে কেউ হাসপাতালে নেবার নামও কববি না।

প্রশান্তবাবু নিজেও জানতেন হাসপাতাল সম্পর্কে এরকম একটা ধাবণা থাকা কোনো শিক্ষিত মানুষেব উচিত নয। এমন অনেক রোগ আছে যাব যথাযথ চিকিৎসা আব আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা শুধু হাসপাতালেই হতে পারে। কিন্তু হাসপাতাল নামটাই তাঁব ব্যক্তিগত অ্যালার্জির মতো। ইন্দিরাবও ভয়, জ্ঞান হবার পর স্বামীটি যদি দেখেন হাসপাতালে বা নার্সিং হোমে আছেন, তক্ষুনি আবাব অঘটন ঘটে যেতে পাবে।

যাই হোক, প্রশান্ত মিত্র বাড়ির শয্যাতেই ফাঁড়া কাটিযে উঠলেন। ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছেন এ ধাবণা শুধু তাঁব নিজের—বাড়িতে আর একজনেবও না। তার ওপর বড ডাক্তাবরা নাকি বলে গেছেন, আবো কিছুদিন না গেলে একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। এই আরো কিছুদিনটা কত দিন তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা প্রশান্তবাবুর।

দুশ্চিন্তা নিজের শারীরিক দিক ভেবে নয়, চিকিৎসাব আডম্বর, স্ত্রী ছেলেমেযে আব খুব ঘনিষ্ঠ দু'চারজনের গার্জেনগিরির দাপটে। ডাক্তারবা সম্পূর্ণ সুস্থ ঘোষণা করলেও আর চলাফেরা কাজকর্মেব স্বাধীনতা দিলেও এরা তা মানবে কিনা সন্দেহ। একটু অনিয়ম কবা হয়েছে মনে হলে ইন্দিবা স্নেহমাখা ধমকেব সুরে কথা বলেন, ছেলে সুশান্ত আব মেয়ে অনীতা সোজাসুজি ধমকায়, বলে, আর তোমাব কথামতো

কোনো কিছু চলবে না জেনে বাখো। আর খুব ঘনিষ্ঠরা খবর নিতে এলে মা ছেলেমেয়ে তাদের কাছে নালিশ জানায়, এই এই অনিযম করা হচ্ছিল বা হতে যাচ্ছিল। শুনে তাবাও শুভার্থীর মতো হিতোপদেশ দিয়ে যায়।

ডাক্তারদের সিদ্ধান্ত মাইলড্ কবোনারি অ্যাটাক। কিন্তু স্ত্রী ছেলেমেযেদের দুশ্চিন্তাব কারণে আব প্রচারগুণে রোগীর অবস্থা সকলেব কাছেই সংকটজনক হয়ে উঠেছিল। রেডিও থেকে ফোনে বাডিব লোকের মুখেই খবর নেওয়া হযেছে। তাবা জেনেছে অবস্থা সংকটজনক—এবং সেই প্রচারই কবেছে। খববেব কাজগুলোতেও একইভাবে এই সংকটজনক অবস্থাব খবরই ছডিযেছে। ছেলেব সঙ্গে কথা বলে কোনো কোনো কাগজেব প্রতিনিধি এও লিখেছে, মনস্তাত্ত্বিক চবিত্রচিত্রনেব অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক প্রশান্ত মিত্রর নিষেধেই তাঁকে হাসপাতালে বা নার্সিংহোমে সবানো সম্ভব হযনি। শেষেব সময যদি উপস্থিত হযেই থাকে, তিনি স্বগৃহেই তার জন্য প্রস্তুত। পবে অপ্রস্তুত ছেলে অবশ্য সবোষে মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ করেছে. কাগজগুলো মিথ্যেবাদী, আমি কখনো এ-রকম কথা বলিনি।

প্রশান্তবাবু হাসি মুখেই জবাব দিযেছেন, বলে থাকলেও তো সত্যি কথাই বলেছিস. তোব বাগ হবাব কি হল।

এমন প্রচাবেব যা ফল, তাব উত্তেজনা ঠাণ্ডা হতে সময একটু লাগবেই। প্রথম দিনকতক তো বাডিব সামনেই কত চেনা অচেনা মেযেপুরুষেব ভিড। অবস্থা জানোনোব জন্য সুশান্তব দুই বন্ধুকে নিচেব দবজায মোতাযেন বাখতে হযেছে। এদিকে মুহুর্মুহু টেলিফোন। প্রশান্তবাবুব লেখাব ঘব থেকে টেলিফোন অবশ্য সরিযে ফেলা হযেছিল। কাবণ শোবাব ঘবেব পবেই লেখাব ঘব। তবু ফোন এলে এ ঘব থেকেও বিং শোনা যায। ফোনে খবব জানানোব দাযিত্ব অনীতার অথবা ইন্দিবাব। তৃতীয দিনে একটু সুস্থ হবাব পব সকাল থেকে বাত পর্যন্ত পঞ্চাশ-ষাটটা কবে ফোন আসার খবব প্রশান্তবাবু পেযেছেন। ফোনে কাবা কারা খবব নিচ্ছে নোট বাখা উচিত এবং এই উচিত কাজে গাফিলতি হযনি। সমবযসী আব অনুজ লেখক. পাবলিশাব. ছোট বড মাসিক সাপ্তাহিক পত্রেব সম্পাদক, সিনেমাব পবিচালক প্রযোজক. প্রশান্তবাবুব স্নেহভাজন অভিনেতা অভিনেত্রী গায়ক গাযিকাবা সকলেই বাড়িতে এসে খবব নেবাব কর্তব্য পালন করে চলেছে। বোগীর সঙ্গে দেখা কবা নিষেধ। ফলে তাদেব বোগীব খবর জানানোব দাযিত্ব ইন্দিবাব বা ছেলেমেযের। প্রত্যহ কাবা কাবা খবর নিতে এলো ইন্দিবা সন্ধ্যাব পব সময বুঝে স্বামীকে বলেন।

এমন একটা অবস্থার মধ্যে পড়ে প্রশান্ত মিত্র হাল ছেড়ে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কি করতে পাবেন ? প্রচুর সিগাবেট খেতেন। পনের দিনের মাথায় ডাক্তার তিনটে পর্যন্ত অনুমতি দিয়েছে। এ সপ্তাহ থেকে পাঁচটা। তাতেও ইন্দিরা আর ছেলেমেয়ের বেজায় আপত্তি। একটু আধটু ড্রিংক করা অভ্যাসে দাঁড়িযে গেছল। ডাক্তারের মতে এ রোগে সিগারেটেব থেকে ড্রিংক কম ক্ষতিকর—আরো কিছু দিন গেলে একটু আধটু খাওয়া চলতে পারে। ইন্দিরা আর ছেলেমেয়ে ওই ডাক্তাবের ওপর রেগে আগুন। তাদেব ধারণা, ডাক্তার নিজে খায় বলেই অমন উদার। ছেলে তার এক বন্ধুব ডাক্তার

বাবার সঙ্গে কথা বলে বাড়িতে এসে ঘোষণা করল, এই ডাক্তার আর চলবে না, বাবার মুখ চেয়ে ফতোয়া দেয়, আমি খুব ভালো করে জেনে এসেছি ড্রিংক সিগারেট কোনোটাই একদম চলা উচিত নয়।

মেয়ে আর মায়ের কাছে এই ফতোয়াই অভ্রান্ত। প্রশান্তবাবু মনে মনে বিরক্ত। বাপের পয়সায় ছেলে দিনের মধ্যে ক'প্যাকেট সিগারেট ওড়ায় ঠিক নেই—লুকিয়ে চুরিয়ে ড্রিংকও একটু আধটু চলে কিনা সে সম্পর্কেও একেবারে নিঃসংশয় নন। কিন্তু মুখে তিনি বাদ প্রতিবাদ কিছু করেন না। এখন বে-কায়দায় পড়েছেন—সময় হলে নিজের যা করার করেই যাবেন এ ওরাও ভালো করেই জানে। জানে বলেই এত কড়া নজরে এখন।

কাঠের টুলে দু'পা তুলে দিয়ে দূরের আকাশের দিকে চেয়ে গা ছেড়েই শুয়েছিলেন প্রশান্ত মিত্র। মাথার মধ্যে সেই হিজিবিজি ব্যাপারটা শুরু হয়ে গেল। হিজিবিজি ব্যাপার বলতে কতকগুলো এলোমেলো চিন্তা। কোনোটার সঙ্গে কোনোটার মিল নেই, এমন সব আধা ঘুমের মধ্যে যেমন অজস্র ছাড়া-ছাড়া চিত্র ভেসে ওঠে আবার মিলিয়ে যায়, তেমনি। কাউকে বলেন নি, একেবারে ছেলেবেলা থেকে এ-রকমটা হয়ে আসছে।

একরাশ বিক্ষিপ্ত চিন্তার মিছিল মগজের মধ্যে যেন মূর্তি ধরে সার বেঁধে চলতে থাকে। মানুষের চরিত্র বিস্তারে সিদ্ধহস্ত শিল্পী তিনি। যে চরিত্র কলমের ডগায় অবয়ব ধরে, তার ভেতর-বার পাঠককে আয়নায় দেখিয়ে দিতে পারেন। অতিবড় রূঢ় সমালোচকও চরিত্র বিশ্লেষণে প্রশান্ত মিত্রর মুক্তি নেই ভাবেন। অনেক সময়েই তাঁরা লেখেন, মানুষের চরিত্রের গভীরতম অন্তঃপুরে অনায়াসে ঢুকে পড়ার যাদুকাঠিটি এই এক লেখকের হাতের মুঠোয়। আর তাঁরই মগজের মধ্যে এমন এমন এলোমেলো হিজিবিজি চিন্তার মিছিল সার বেঁধে চলতে থাকে এ নিজের কাছেই বরাবর একটা কৌতুকের ব্যাপার।

নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন প্রশান্তবাবু। মাথায় একটা মতলব এসেছে। ওই এলোমেলো অথচ জীবন্ত চিন্তার মিছিলকে যদি কাগজে কলমে ধরে রাখা যায় তো কি দাড়ায়? যেমন ভাবা তেমনি কাজ। মহেশকে ডেকে হুকুম করলেন, আমার কালো নোটবই আর পেনটা দিয়ে যা—

মহেশ দ্বিধান্বিত। মনিব এটা উচিত কাজ করছেন না, আর মা শুনলে বকবেন এ সে-ও জানে।

—কি বললাম কানে গেল?

মেজাজের আভাস পেয়ে মহেশ ঘর থেকে মস্ত কালো নোটবই আর কলম রেখে গেল। এ নোটবইটা বাড়ির সকলেরই খুব চেনা, কিন্তু কেউ আর এখন এটা খোলে না। লেখার কোনো প্ল্যান বা প্লট মাথায় এলে এতে লিখে রাখেন। কিন্তু নোট করার পদ্ধতি এমন বিচিত্রি যে দেখে বা পড়ে কারোই তেমন বোধগম্য হবে না। জ্যামিতিক নক্সার মতো মনে হবে। তার মধ্যে দু'চারটে নাম, দু'চার অক্ষরে একটা-দুটো ঘটনা, তার মধ্যে আ্যারো টেনে কোথাও সার্কেল কোথাও ট্রায়েঙ্গেল কোথাও বা রেকট্যাঙ্গেল। তিনশ পাতার লম্বা বাঁধানো এই নোটবইয়ের প্রায় দু'শ পাতা এই গোছের

প্লটের নক্সায় বোঝাই। আর তার প্রায় সবগুলোতেই লাল দাগ মারা। অর্থাৎ যে প্লট বা প্ল্যানগুলো নিয়ে গল্প বা উপন্যাস লেখা হয়ে গেছে তাতে ওই লাল দাগ পড়ে। ইন্দিরা আর ছেলেমেয়েও তাঁর এই প্ল্যান অথবা প্লটের বই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করছে। কিন্তু কিছুই বোধগম্য হয় না বলে কৌতূহল গেছে।

নোটবইটা খুলে ছোট টুলের ওপর রেখে আজ আর কোনো প্লটের ছক কাটতে বসলেন না প্রশান্ত মিত্র। ওই চিন্তার এলেমেলো মিছিল যেমন আসে তেমনি সাজানোর সংকল্প। ...খুব ছেলেবেলা থেকেই ধরা যেতে পারে। চোখ বুজলে সেই ন'বছরের ছেলেটাকে তিনি স্পষ্ট দেখতে পান। তার উদ্ভট চিন্তার কারিকুরিও।

"...ইস্কুল যেতে ইচ্ছে করছে না। অঙ্কের মাস্টারটা বেত নিয়ে ক্লাসে ঢোকে। অঙ্ক ভুল হলে শপাশপ মারে। হি-হি-হি-হি—ওই মাস্টারের পিঠেই বৃষ্টির মতো বেতের ঘা পড়ছে। যন্ত্রণায় মাটিতে লুটোপুটি খাচ্ছে। হি-হি-হি—কিছু দেখতেও পাচ্ছে না বুঝতেও পারছে না। অদৃশ্য মানুষ হয়ে কে মারছে জানবে কি করে?...মা-টা যাচ্ছে তাই। অতবড় পাটালি থেকে এক ডেলা মাত্র ভেঙে দিল। কি দারুণ খেতে। বেশি খেলে পেট কামড়াবে না হাতি। বড় হয়ে অনেক টাকা রোজগার করতে হবে। আর প্রাণের সাধে পাটালি খেতে হবে। ওই ঘাড় গোঁজা ধ্যাবড়া মোটা জলের কলটা। বিচ্ছিরি। ভূতেরা নিশ্চয় ওই রকম দেখতে। ও-মা! তীরের মতে সাইকেলটা যে গায়ের ওপর এসে পড়ছে। দাঁড়াব? ছুটব? দাঁড়াব? দাঁড়াব? না ছুটি। গেল গেল গেল! সব অন্ধকার। দারুণ যন্ত্রণা। মাটি থেকে কে পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। অন্ধকার একটু কমছে। দাওয়ায় আঠের-উনিশ বছরের যে মেয়েটা সে-ই বুকের সঙ্গে জাপটে নিয়ে ছুটে বাড়িতে ঢুকছে। তার বুকটা কি নরম আর কেমন অদ্ভুত লাগছে। হি-হি-হি-হি। এ-মা ব্যাটাছেলে সাইকেল চাপা পড়ে। পাশের বাড়ির খুকুটা ছুটে ভিতরে পালিয়ে গেল। ধরা গেল না। হাত পা গা মুখের ছাল উঠে একাকার আর ওই মেয়ের হাসি। ধরতে পারলে মজা বুঝবে। ..আচ্ছা, ওই যে মেয়েটা বুকে জাপটে তুলে নিয়ে গেছল, খুকুটা বড় হলে তার মতো হবে? ওরও ওই রকম বুক হবে? মা মাসি খুড়ি জেঠি নয়, তাদের থেকে ঢের কমবয়সী মেয়েদের সক্কলের মধ্যে কিছু একটা মজা লুকিয়ে আছে। খুব জানতে ইচ্ছে করে। বুঝতে ইচ্ছে করে। খুকুটা বেজায় ছোট। তবু ওকেই একদিন ধরে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে আর টিপেটুপে দেখতে হবে।..."

প্রশান্তবাবু কলম রাখলেন। ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো হাসি। একটা আস্ত না হোক আধখানা সিগারেট খেলে ভালো লাগত। থাকগে। ইন্দিরা চেঁচামেচি করবে। এই কড়াকড়ি ক'দিন আর চলবে। পাঁচ সাত মিনিট ইজিচেয়ারে মাথা রেখে পড়ে রইলেন। এবারে ঠোঁটের ফাঁকে আগের থেকে একটু বেশি হাসি। সোজা হলেন। নোটবইয়ের পাতা উল্টে কলম নিয়ে আবার ঝুঁকে বসলেন।

"...মফঃস্বলের কলেজ নয় তো যেন স্কুল। এক ঘর ছেলে আর সাত-সাতটা মেয়ের চোখের ওপর নাম ধরে দাঁড় করিয়ে পড়া জিজ্ঞেস করা। আগের দিন কোলরিজের রাইম অফ দি এনসেন্ট মেরিনার শেষ করে আজই আবার ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর ইয়ারো আনভিজিটেড ইয়ারো ভিজিটেড ধরে এতটা এগিয়ে যাওয়া হয়েছে সেদিকে

কাল মন যখন ছিলই না, চুপ করে না থেকে বোকার মতো কেন জবাব দিতে গেল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ-এর কাব্য-প্রকৃতির প্রশ্নের জবাবে কোলরিজের কাব্য-প্রকৃতি দিয়ে উত্তর শুরু করলে ক্লাসসুদ্ধ সকলে হেসে উঠবে না তো কি? অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করেই যে ওই ত্যাঁদর প্রেফেসার এই একজনকেই ধরেছে তাতে কোন ভুল নেই। সকলের সঙ্গে মেয়েদের আলাদা বেঞ্চ থেকে গায়ত্রীও নাস্তানাবুদ মুখখানার দিকে চেয়ে কম হাসছিল না—এটাই বেশি যন্ত্রণার মতো। বয়সে দু'তিন মাসের বড় আর দিদির সঙ্গে ভাব বলে গায়ত্রীরও কথাবার্তায় দিদি-দিদি ভাব। বিকেলে বাড়ি এসে কিনা বলল, এই হাঁদারাম, ক্লাসে তোমার মনটা থাকে কোথায়?...ফস করে যদি মুখের ওপর বলে বসতে পারত কোথায় থাকে? ক্লাসে বসে আয়েস করে এই গায়ত্রীর মুখখানাই তো দেখছিল।...শুধু মুখখানা? কত কিছু দেখার মধ্যে ডুবে গেলে ক্লাসে অমন ভুলের মাশুল দিতে হয়?...রং একটু কালো হলেও ওই সুঠাম ঢলেশ্বরীর পাশে অন্য মেয়েগুলো সব প্যাঁকাটি।...হকির নক আউট ফাইনালে নিজের দোষেই কলেজ টিমের হার হয়ে গেল। দু'দুটো সোজা গোল মিস করে বসল। বিজয়ীর কাপ হাতে গায়ত্রীকে শৌর্যের মূর্তিখানা দেখানো গেল না। .কলেজ ম্যাগাজিনে গল্পটা ছাপা হয়েছে আর গায়ত্রীও সেটা পড়েছে নিশ্চয়। নইলে বারো গজ দূরে মেয়েদের আলাদা জায়গায় বসে টেরিয়ে টেরিয়ে তাকাচ্ছিল আর ঠোঁট টিপে হাসছিল কেন? সুলতা সিংহ আর রঞ্জিতা বোস ক্লাস শেষ হতে বলেই গেল, 'জিত' গল্পটা দারুণ হয়েছে। না, প্রেম বা বিয়ের গপপ নয়, একটি খুব সাধারণ ছেলে শুধু হৃদয়ের আশ্চর্য প্রসাদগুণে কেমন করে এক অহংকারী মেয়ের চোখে অসাধারণ হয়ে উঠল— সেই গল্প। বিকেলে গায়ত্রী বাড়ি এলো। ওর সামনেই হেসে হেসে দিদিকে বলল, তোমার ভাই এচড়ে পেকে গেছে রমাদি, মেয়ে কাকে বলে জানে না, মেয়ে নিয়ে গপপ লেখা শুরু করেছে। ..ক্লাসে গায়ত্রীর সেই চাউনি আর টিপটিপ হাসি দেখেই ভিতরটা কেমন গরম গরম লাগছিল। এই কথা আর এই হাসির পর একটা উষ্ণ বাষ্প ভেতরে সেঁদোচ্ছে। রাতে শুতে যাবার আগে পর্যন্ত ওই কথা আর ওই হাসি একটা স্পর্শ হয়ে এক অব্যক্ত যন্ত্রণার আগল ভেঙে চলেছে। কত জানে গায়ত্রী যদি জানত। বুক আর দুটো হাতের চাপে পাশবালিশটার দফা প্রায় রফা। কিন্তু ওটা কি পাশবালিশ নাকি? ..রাত দুটো। আর পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে ক্লাবের ওরা চুপিসাড়ে এসে জানলায় একবার টর্চ ফেলবে। ফেলল। বালিশের তলা থেকে নিজের টর্চ বার করে একবার জ্বেলে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে এসে পাঁচিল টপকে রাস্তায়। ভুতুড়ে অন্ধকারে সকলে মিলে সোজা আড্ডী-বাগানে। গা ছমছম করছে। গোটা বাগানটাই কোনো এক কালের কবরে ছাওয়া। নিজেদেরই পায়ের খসখস শব্দ, অথচ মনে হচ্ছে অশরীরীরা যেন আপত্তি জানাচ্ছে। ছেলেবেলার সেই ঘাড়-গোঁজা থ্যাবড়া মোটা কলের মতো ভূতগুলো অন্ধকারের শরীর ধরে আশপাশে ঘুরঘুর করছে। ধ্যেৎ। এতগুলো জোয়ান ছেলে একসঙ্গে, ভূতের নিকুচি করেছে। একজন টর্চের আলো ফেলতে সামনেই ওই মস্ত লম্বা লোহার বীমটা দেখা গেল। মণ পনের ওজন হবে ভেবেছিল। আঠেরো জনে মিলে হিমসিম খেয়ে ওটা কাঁধে তুলতে মনে হল বিশ মণের কম হবে না। আধমাইল পথ

ভেঙে রাতের অন্ধকারে লোহার বীমটা ক্লাবঘরের পিছনে এনে ফেলতে সকলের কালঘাম ছোটার দাখিল। কাজ সেরে আবার যে-যার বাড়ি। বিছানা। কালই ওই লোহার বীমটা ঠেলায় করে গণেশ সাহার দোকানে চলে যাবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এখন ঘরের দোরে। লোহালক্করের আগুন দাম। পনের ষোল মণ ওজন ধরেই গণেশ সাহা অনেক টাকা কবুল করেছে। সেই টাকায় ক্লাবের ব্যায়ামের সরঞ্জাম আসবে। নিজের সেই স্বাস্থ্যশ্রী বিছানায় শুয়ে চোখ চেয়েই কল্পনা করতে পারছে। দেখতে পাচ্ছে। গায়ত্রীও। তার মুগ্ধ চোখে পলক পড়ে না। আঃ, কেলো হারামজাদা আজ আবার পাশবালিশটা দিতে ভুলেছে। কাল ওর মাথাটা ভাঙবে। টর্চ জ্বেলে পাশবালিশটা নিয়ে আসতে হল। তারপর ওই মেয়ের আর কত তফাতে থাকবে সাধ্যি?...কত রোগের কত ওষুধ বেরুচ্ছে, টাইফয়েডের ওষুধ এখনো নেই কেন? এখন পর্যন্ত কেবল কাজ ভরসা আর সেবা ভরসা কেন? তাহলেও এই সেবাটুকুর ভার কেবল একজন পেলেই গায়ত্রী ম্যাজিকের মতো সেরে উঠতে পারে। কল্পনায় সেবার ভার নেবার সঙ্গে সঙ্গে দেখছে গায়ত্রী সেরে উঠছে।...এ কি হল। এনসেন্ট মেরিনারের নাবিকরা পাপ করেছে। তাদের সামনে মঙ্গলের দূত গুলিবিদ্ধ বিশাল অ্যালবেট্রস পাখিটা মরে পড়ে আছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দুর্যোগে নাবিকেরা সব পাগল। তারা হিংসা ভুলে আকুল হয়ে ঈশ্বরকে ডাকছে। শান্তির অনুভূতি ফিরে আসছে।.. করবের শান্তি ভঙ্গ করা হয়েছে। বিক্ষুব্ধ অশরীরীরা সব মশারির বাইরে অন্ধকারে ঘুরঘুর করছে। তারা প্রতিশোধ নেবে।...একজনের লোভের পাপ, বাসনার পাপ গায়ত্রীকে স্পর্শ করেছে। গায়ত্রী চরম প্রতিশোধ নিল। গায়ত্রী শ্মশানের আগুনে নিজেকে শুচিসুদ্ধ করে নিল। আরামের শয্যায় শুয়ে ভিতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে এই একজনের। ওই নাবিকদের মতো আকুল হয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে চেষ্টা করছে। মা—মাগো। ভোররাতে দু'চোখে ঘুম নামল। মনে হল বালিশে নয়, মায়ের কোলে শুয়ে আছি।... ... ..."

নোটবই আর কলম বন্ধ করে প্রশান্তবাবু আবার ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিলেন। ভিতরটা বেশ হালকা লাগছে। আরো মিনিট দশেক বাদে ইন্দিরা ফিরলেন। টুলে নোটবই আর কলম দেখে আঁতকে উঠলেন। —এইজন্যেই তো আমি বেরুতে চাই না, এরই মধ্যে নোটবই আর কলম নিয়ে তুমি লেখার ছক কাটতে বসে গেলে? ঘুরে দাঁড়িয়ে ইন্দিরা ঝাঁঝালো গলায় ডেকে উঠলেন, মহেশ।

সন্ত্রস্ত মহেশ তক্ষুনি হাজির। ইন্দিরা কিছু বলার আগেই প্রশান্তবাবু আদেশ দিলেন, দরকার নেই, যা—

মহেশ সরে যেতে হাসিমুখে স্ত্রীর দিকে ফিরলেন, মহেশও আমার ওপরে গার্জেনগিরি করতে পারেনি কেন সেই কৈফিয়ত তলব করতে যাচ্ছিলেন?

ইন্দিরা মনে মনে অপ্রস্তুত একটু। ফলে জবাবের ঝাঁঝ আরো বেশি।—তুমিই বা এমন অবুঝপনা করবে কেন—এখন তোমার লেখার প্লট ঠিক করার সময়?

কালো নোটবই মানেই লেখার প্লটের নক্সা বা খসড়া ভাবেন। জবাব না দিয়ে প্রশান্ত মিত্র গম্ভীর মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। ডাকলেন, এসো—

ফোনটা যে ঘরে সরানো হয়েছে সেই ঘরে চললেন। ইন্দিরা পিছনে। দ্রুত এগিয়ে হাত ধরতে পারলেন না। হঠাৎ কি হল ভেবে পেলেন না। স্বামীর এই গোছের গাম্ভীর্যকে একটু সমীহ করেন।

ঘরে ঢুকে প্রশান্তবাবু ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন। ডায়েল করলেন। ইন্দিরা এখনো কিছু না বুঝে চেয়ে আছেন। একটু বাদেই স্বামীর কথা থেকে বুঝলেন, কাকে ফোন করা হল এবং লাইনের ও-ধারে কে। হার্ট স্পেশালিস্ট, যিনি গত একমাসের মধ্যে অনেক দিন বাড়ি এসে রোগী দেখে গেছেন।

সাড়া পেয়েই প্রশান্তবাবু বললেন, আমার স্ত্রীর আমার বিরুদ্ধে ভীষণ নালিশ আছে।...তাঁর মুখেই শুনে আপনার যা বলার ওঁকে বলুন —আমার মনে হচ্ছে একমাসেরও পরে এমন কড়াকড়ি চললে আবার আমাকে বিছানা নিতে হবে। ধরুন—

রিসিভারটা ইন্দিরার দিকে বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর বিড়ম্বিত মুখখানা মিষ্টি লাগছে। অপেক্ষা না করে গম্ভীর মুখেই প্রশান্তবাবু ঘর থেকে নিজের শোবার ঘরে চলে এলেন।

মিনিট পাঁচেক বাদে ইন্দিরা এলেন। অনুযোগের সুরে বললেন, তুমি ডাক্তারকে ঘুষ-টুষ খাইয়ে রেখেছিলে নাকি?

প্রশান্তবাবু শব্দ করেই হেসে উঠলেন। নালিশের জবাবে স্পেশালিস্ট ডাক্তার কি বলে থাকতে পারেন এই থেকেই বোঝা গেল।

ইন্দিরা এবারে উৎসুক একটু।—তা এতবড় অসুখ থেকে উঠেই হঠাৎ কি প্লট মাথায় এল তোমার?

ভিতরে ভিতরে একটু বিড়ম্বনার মধ্যে পড়ে গেলেও প্রশান্তবাবু নির্লিপ্ত জবাব দিলেন, নোটবইটা খুলে নিজেই দেখো কি প্লট।

পাছে সত্যি ওটা খোলে সেই জন্যেই বলা। কাজ হল। ইন্দিরা বললেন, আ-হা, তোমার ওই নক্সা আর আঁকিবুকি দেখে কি বুঝব। শুনিই না কি প্লট, এই অসুখ নিয়ে কিছু না তো?

প্রশান্তবাবু হাসি মুখেই মাথা নাড়লেন। এ-সব কিছু না।

পরদিন। বিকেলে আগের দিনের মতোই প্রশান্তবাবু বারান্দার ইজিচেয়ারে বসেছেন। কাঠের টুলের ওপর নোটবই কলম। ইন্দিরা আজ এ নিয়ে কোনো আপত্তি তোলেননি। বড় ডাক্তার কাল বলেছেন, একটু একটু করে নিজের কাজের মধ্যে ফিরে আসতে চাওয়াটাই সব থেকে সুস্থতার লক্ষণ। পাশের মোড়ায় বসে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলেছেন। তারপর স্বামীর বিমনা ভাব লক্ষ্য করে উঠে গেছেন। নতুন কিছু সৃষ্টির আগের এই তন্ময়তা খুব ভালো চেনেন।

প্রশান্ত মিত্র সত্যিই বিমনা আর তন্ময় হয়ে পড়েছেন কোনো সৃষ্টির তাগিদে নয়। মগজের মধ্যে সেই হিজিবিজি ব্যাপারটা শুরু হয়ে গেছে। চিন্তার এলোমেলো মিছিল সচল অবাক ছবির মতো সার বেঁধে চলেছে। তারই ভিতর থেকে চোখের সামনে একখানা মুখ ধরে রাখার চেষ্টা। তারই ভিতরের আর একখানা মুখ।

খুব স্পষ্ট করে ধরা গেল। প্রশান্তবাবুর ঠোঁটের ফাঁকে হাসির টুকরো। নোটবই খুলে কলম নিয়ে ঝুঁকলেন।

"...তাড়াতাড়ি দাড়ি কাটতে গিয়ে গাল কেটে গেল। কাটুক। গলাটাই কাটতে ইচ্ছে করছে। নাকেমুখে গুঁজে এক্ষুনি দশটা-পাঁচটার অফিসে ছোটো। চাকরি না তো ফাঁসির দড়ি। ভাবতে গেলে কান্না পায়। পায়ের তলায় মাটি সরে সরে যায়। গলা বুক শুকিয়ে আসে। দু'চোখ সত্যি সত্যি জলে ভরে যায়। রাগে নিজের ওপরেই হিংস্র কিছু করে বসতে ইচ্ছে করে। সকলের অগোচরে বাথরুমে ছুটে যেতে হয়। চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে আসতে হয়। তারপর চোখ মুখ মুছে পাউডার বুলিয়ে নিলেই সকলের চোখে সপ্রতিভ স্মার্ট। ...যে কাণ্ড এ পর্যন্ত অনেকবার ঘটে গেছে আবারও সেই কাণ্ড। সেকশন অফিসারের সঙ্গে সামান্য কারণে কথা-কাটাকাটি, তারপরেই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সোজা রাস্তায়। মুক্তির স্বাদ। তারই সঙ্গে অনিশ্চয়তার আতঙ্ক। মুক্তির স্বাদ থেকে দিনে দিনে আতঙ্কটাই বড় হয়ে উঠছে। শুভার্থীজনেদের উপদেশ শ্লেষের মতো কানে বেঁধে। লিখে আবার এ-দেশের মানুষ খেতে পরতে পায়। নিজের চেষ্টায় আর রোজগারের সর্বস্ব খুইয়ে এ-পর্যন্ত চার-চারটে উপন্যাস ছাপা হয়েছে কিন্তু একটুকু আলোর হদিস কোথাও নেই। কেউ চেনে না। কেউ জানে না। পাবলিশারের কাছে খোঁজ নিতে গেলেও মুখঝামটা খেতে হয়—বই বিক্রি হয় নি। হলেও হিসেব চাইলে আবার মুখঝামটা। মাসিকে সাপ্তাহিকে লেখা পাঠালে অবধারিত ফেরত। পাণ্ডুলিপি নিয়ে প্রকাশকের দরজায় ধর্না দিলেও কেউ উল্টে দেখতে চায় না। সম্মানবোধ প্রখর, অথচ সর্বদা মাথা নিচু। আত্মীয়-পরিজনের করুণার পাত্র। ...নির্জন দুপুরে ছাতে উঠেছে। তারপর সভয়ে সরে গেছে। নিচের দিকে তাকাতে কে যেন মন্ত্রণা দিচ্ছিল, ইচ্ছে করলে এক্ষুণি সব যন্ত্রণার শেষ হতে পারে।...মায়ের ঠাকুরঘর। ভিতরে ঢুকে নিঃশব্দে দরজা দুটো ভেজিয়ে দিল। তারপর মায়ের পটের সামনে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। মা-গো শুধু এই দাও, যেন কোনদিন কারো গলগ্রহ হতে না হয়।...মা কি শুনল? নইলে দু'মাস না যেতে হঠাৎ অমন যোগাযোগ কেন? যেখানে ফিচার লিখে ভিক্ষের মতো পাঁচিশ তিরিশ টাকা করে হাত পেতে নিতে হত, সেখান থেকেই গল্প লেখার আমন্ত্রণ পেল কেন—গল্পের পরে উপন্যাস লেখার ফরমাস!...সেই থেকে বৃত্তবদল। বাজারে ফি বছর দু'তিনটে করে উপন্যাসের জমজমাট বিক্রি। ক'টা উপন্যাস সিনেমায় পরপর হীট। প্রকাশকরা যেচে আসছে। ছবির প্রযোজকরা খাতির করছে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাছেও খাতির কদর বেড়ে চলেছে।...সুরমা সরকারের ফোন। খিলখিল হাসি। আপনি প্রোডিউসারের কাছে আপনার গল্পের নায়িকা হিসাবে আমার নাম সাজেস্ট করেছেন শুনলাম, অনেক ধন্যবাদ। মঞ্জুশ্রী গুপ্তর সামনাসামনি অভিমান, কিছু বলছেন না মানেই আমার অভিনয় আপনার ভালো লাগেনি। এই শটটা আর একবার নিয়ে দেখব?...রাতের শয্যায় কল্পনার পথ ধরে ওই দুই অভিনেত্রীকেই চোখের সামনে দেখা যায়। কখনো সুরমা সরকার। কখনো মঞ্জুশ্রী গুপ্ত। ভেতরটা লালায়িত হয়ে ওঠে। হাত দুটো পাশবালিশের ওপর নিশপিশ করে। ইচ্ছে করলেই কল্পনায় ওদের খুব কাছে টেনে আনা যায়। তারপরেই

হাতের ধাক্কায় পাশবালিশটা ছিটকে মাটিতে পড়ল। আবার? আবার পাপ? গায়ত্রীকে মনে নেই? গায়ত্রী কি-ভাবে শুচিশুদ্ধ হল মনে নেই?...সমস্ত রাগ গিয়ে পড়েছে ইন্দিরার ওপর। ওধারে ঘুমে বিভোব হয়ে লতিয়ে পড়ে আছে। ও জেগে থাকলে তো এরকমটা হয় না। ভালো যাকে বাসে সে ইন্দিরা ছাড়া আর কে? ফের মিথ্যে? অন্তত নির্জলা সত্যি কি?...ইন্দিরা যখন তোমার বুকে মাথা গুঁজে ঘুমোয় তখনো কি এক-একসময ওই বমণী-দেহকে কেন্দ্র করে সিনেমার অভিনেত্রী ছেড়ে তোমার বইয়ের নাযিকারা পর্যন্ত কেউ কেউ ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে এসে হাজির হয় না?...

প্রশান্ত মিত্র নোটবই বন্ধ কবলেন। কলমও। সিগারেট না খেয়ে পাবা যাচ্ছে না। হাঁক দিলেন, মহেশ।

মহেশ এলো।

—তোর মা কোথায?

—এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা কইছেন।

—চলে গেলে ডেকে দিস।

সাত আট মিনিটেব মধ্যে ইন্দিবা এলেন। —ডাকছিলে?

—হ্যাঁ। বড় তেষ্টা।

—সে কি! ইন্দিবা সচকিত। —মহেশ কোথায়, এক গেলাস জলও দিতে পাবেনি?

—জলেব তেষ্টা নয। সিগারেটেব।

ইন্দিবা থমকে দাঁড়ালেন। চোখে চোখ।—আজ এরই মধ্যে একটা বেশি খেয়েছ না?

মুখ কাঁচুমাচু প্রশান্তবাবুব।—তাহলে অন্তত আধখানা...

ইন্দিরা হেসে ফেললেন।—কি যে করো না তুমি! সত্যি আধখানা কেটে আনছি।

দু' মিনিটের মধ্যে ফিবলেন। হাতে আধখানা সিগারেট আব দেশলাই।

প্রশান্তবাবু সিগাবেট ধবিয়ে আরাম কবে বড টান দিলেন। ইন্দিবা মোড়া টেনে বসলেন।

—কে এসেছিল?

—'এই বাংলা'র সম্পাদক সঞ্জয ঘোষ। তোমার শবীরের খবব নিচ্ছিলেন, কিন্তু আসল মতলব কবে থেকে তোমাকে লেখানো যাবে জানা। ওঠার আগে বলেই গেলেন, এবাবে প্রথম যে লেখাটি ধরবে সেটা তাঁর—তোমাকে যেন বলে বাখি।

আধখানা সিগারেট আর দু'তিন টানে ফুরিযে এলো। ইন্দিরা বললেন, তার খানিক আগে তোমাদেব প্রোডিউসার বিজন চাকলাদাব ফোন করেছিলেন, তোমার কি গল্প নিয়ে জরুরী আলোচনা দবকার। আমি বলে দিয়েছি সামনেব সপ্তাহের আগে হবে না—তাও কেমন থাকো না থাকো ফোন করে আগে জেনে নিতে।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে প্রশান্তবাবু বললেন, আসতে বললেই পারতে, টাকাও তো দরকার।

—থাক। যা আছে ওই দুটোর উচ্ছন্নে যাবার মতো যথেষ্ট। নিজের বিশ্রামেব কথা ভাবো।

প্রশান্তবাবু হাসলেন।—ওদের ওপব তোমার এত রাগ কেন? সুশান্ত চাকরি কববে কি করে, চাকরিব নামেই আমার তো হৃৎকম্প হত। আর অনীতা তো বলেই দিয়েছে এম. এ পাশ কবাব পর বিয়ের কথা।

ইন্দিরা অখুশি মুখ কবে জবাব দিলেন, জানি না বাপু, কারো মতিগতি বুঝি না।

ক'টা দিন ভেতরটা বেশ হালকা লাগছিল প্রশান্তবাবুর। মনের বিজ্ঞানীবা বলেন, নিজের ভেতর দেখা গেলে অনেক দুর্বোধ্য বা অগোচরেব জট খুলে যায়, স্নায়ু শিথিল হয়, বশেও থাকে। প্রশান্তবাবুর সদ্য অনুভূতিও অনেকটা সেই গোছেব। কিন্তু পরের ছ'সাত দিন আব ওই নোটবই খুলে বসাব অবকাশ পেলেন না। ছেলেমেযে আর সপরিবাবে শ্যালক এসেছে দিল্লি থেকে। ভগ্নিপতিব অসুস্থতার খবর পাওযার পব থেকেই আসতে চেষ্টা কবছিল।

ছ'দিন বাদে তাবা চলে যাবাব পব এতবড বাড়ি আবার খালি। বিকেলেব দিকে ইন্দিবা কি কাজ সাবতে বেরিযেছেন। ছেলেমেযেও বাড়ি নেই। প্রশান্তবাবু বাবান্দায ইজিচেযাবে। সামনেব কাঠেব টুলে সেই মোটা বাঁধানো নোটবই আব কলম। ওটা খুলে বসাব জন্য ভেতবটা অনেকক্ষণ ধবে লালাযিত হযে উঠেছিল। এই রকম নিবিবিলি ফুরসতেব অপেক্ষাতেই ছিলেন। ভিতবেব যে মানুষটা ওই হিজিবিজি চিন্তাব মিছিলেব নাযক, আযনায দেখাব মতো তাকে এখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কাবণ প্রশান্তবাবুর মতো সেও এক পরিণতিব মোহনাব দিকে পা বাড়িযেছে। তফাৎ শুধু, তার সত্তা সকলের দেখা সকলেব জানা প্রশান্ত মিত্রব থেকে ববাববকাব মতো আজও বিচ্ছিন্ন। নোটবই খুলে প্রশান্তবাবু কলম নিয়ে ঝুঁকলেন।

"...হবে কৃষ্ণ হবে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবে হবে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হবে হবে।" কতক্ষণ আব কতটা এমনি নামের আশ্রযে একাগ্র হতে পাবলে ভিতবটাকে নিরাসক্ত নির্লিপ্ত কবা যায? হবে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ...। টেলিফোন।...হ্যালো। হ্যাঁ বুঝেছি। শুনুন জীবনবাবু, বই পেযেছি। গুনে দেখেছি সমস্ত বইয়ে তিরিশটা ছাপার ভুল। আব আপনাকে বই দেব কিনা ভাবতে হবে। আপনাব পাবলিসিটিও আমার খুব পছন্দ হচ্ছে না। যাক, পুবো তিন এডিশনেব টাকা পাঠিযে দিন। আচ্ছা।...হবে বাম হবে বাম...বই লেখাটা নেশা না টাকা বোজগাব নেশা? একটাব সঙ্গে আর একটা। তফাৎ কবা যায না। যেমন গোলাপ আর তাব গন্ধ। তফাৎ কবা যায না। এই পৃথিবীতে আসা কেন? গাদা গাদা বই লিখতে? আব টাকা বোজগাব কবতে? ঠিক আছে, অনেক বই অঢেল টাকা—তাবপব কি? তারপবে কিছু না থাকলে ভিতরটা আশ্রয় খোঁজে কেন? সেটা কেমন আশ্রয? তাব ঠিকানা কি? "হবে কৃষ্ণ হবে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে...।" টেলিফোন। হ্যালো...না, অনীতা বাড়ি নেই। জানি না। জানি না। ...মেয়েটার চালচলন আবার অন্যরকম ঠেকছে। আবার কাব সঙ্গে গিয়ে ভিড়ল কে জানে? প্রায়ই এই গলাব ফোন আসে। একবাব ঘা খেয়েও মেয়েটার শিক্ষা হযনি। বিকেলে বেরোয় বাত করে ফেবে। খুব বুদ্ধিমতী ভাবে নিজেকে। সকালের কাগজ খুলেই অঘটনেব ছড়াছাড়ি। সেভাবে কাগজ পড়ে না, সাবধান হওয়ার দরকাবও ভাবে

না। অঘটনের বরাত যেন সব সময়েই অন্যদের, ওদেব নয়!...শুধু মেয়ে কেন, ছেলেটাও কোন্ রাস্তায় হাঁটছে ঠিক নেই। মেযেদেব ফোন তো লেগেই আছে। বাপ প্রেমের গপ্প লেখে আর বাপেব পয়সায় খেয়ে ছেলে প্রেম করে। মা সে-ভাবে বেঁকে না বসলে একবার তো কোন যাত্রাপার্টির মেয়ে এনে ঘরে ঢুকিয়েছিল প্রায়। যাকগে, ভেবে কি হবে? যার যেমন অদৃষ্ট। "হবে কৃষ্ণ হবে রাম, রাম রাম...।" টেলিফোন। হ্যা-লো।...হ্যাঁ শর্মাজী বলুন। ছবি সুপারহীট শুনেছি। থ্যাঙ্ক ইউ, কিন্তু গল্পেব পিছনে আপনি এভাবে লেগেছিলেন বলেই এতটা সাকসেস।...কোন্ গল্পটা ? ও হ্যাঁ...না এখনো কনট্রাক্ট হয়নি, ফ্রী আছে। বেশ তো, কিন্তু এতবড সাকসেসের পব নতুন গল্পে লেখকও একটু বাড়তি মর্যাদাব আশা বাখে—হাঃ হাঃ হাঃ।...বাংলাব সঙ্গে হিন্দীও কনট্রাক্ট হবে ? ওযাণ্ডাবফুল। ঠিক আছে, একটা দিন দেখে সকালের দিকে চলে আসুন, নমস্কাব নমস্কাব।...বাংলা হিন্দী একসঙ্গে কনট্রাক্ট মানে খুব কম হলেও পঞ্চাশ হাজাব টাকা। সাদা কালো আদাআধি। বাবান্দায দাঁডিযে দক্ষিণেব বাতাসটুকু বেশ মিষ্টি লাগছে। বাঃ, ভারী সুন্দর দেখতে তো মেযেটা। ফর্সা লম্বা সুঠাম স্বাস্থ্য। মেযেটা নয়, কাবো ঘবেব বউ হবে। বাস্তাব অনেক জোডা চোখ টেনে হেসে হেসে আব এক মেযেব সঙ্গে কথা বলতে বলতে চলেছে।...ধেৎ ! সুন্দর মেযে মিষ্টি মেযে দেখতে সকলেবই ভালো লাগে—ভালো কথা। কিন্তু তিবিশ বছর আগেব চোখ দিযে দেখা কেন ? ছিঃ ! "হবে কৃষ্ণ হবে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হবে বাম হবে বাম, বাম বাম হবে হবে।..."

পবদিন সকালে বেশ হাসি-হাসি মুখে ইন্দিবা ঘবে ঢুকলেন। তাঁর হাতে একখানা 'এই বাংলা' মাসিকপত্র। কাছে এসে ওটা খুলে প্রশান্তবাবুর সামনে ধবলেন। তাতে ছবিসহ অনন্য লেখক প্রশান্ত মিত্রর দ্রুত আরোগ্য-সংবাদ। ফাঁকে ফাঁকে তাঁর প্রতিভাব প্রশস্তি। বিশেষ করে তাঁর চরিত্রচিত্রণ আব বিশ্লেষণ ক্ষমতাব ঢালাও প্রশংসা।

হাসিমুখে 'এই বাংলা' ইন্দিবাকে ফেবত দেওয়াব সঙ্গে সঙ্গে প্রশান্তবাবুর কি মনে হল। চট করে উঠে কালো নোটবই আর কলমটা নিযে পাশেব লেখাব ঘবে চলে গেলেন। ওতে কিছু লিখে আবাব চাব পাঁচ মিনিটেব মধ্যে ফিবে এলেন।

ইন্দিবা অবাক একটু।—কি হল, এই থেকেই আবাব নতুন কিছু প্লট মাথায এসে গেল নাকি।

প্রশান্ত মিত্রব ঠোঁটেব হাসিটুকু বহস্যের মতো। নোটবই যথাস্থানে অর্থাৎ ডেস্কে রাখতে বাখতে জবাব দিলেন, ওই তেলেব প্লট নিযে গপপ তো কত বারই লেখা হয়ে গেছে!

দিন কুডি বাদে নীল আকাশ থেকে আচমকা বাজ পড়াব মতোই ঘটে গেল ব্যাপাবটা। লেখক প্রশান্ত মিত্র চিকিৎসার চার ঘণ্টাও সময় দিলেন না। ডাক্তাবরা বললেন, ম্যাসিভ স্ট্রোক। বাংলা সাহিত্য জগতে নিখাদ শোকেব ছায়া নেমে এলো। প্রশান্ত মিত্র নেই।

দিন যায়। একটা মাস গড়ালো। শোকের স্তব্ধতা থেকে ইন্দিরাকেও আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াতে হল। এই নিয়ম।

ক'দিন ধবে টেলিভিশনেব লোক এসে এসে ঘুরে যাচ্ছে। তাদের প্রস্তাব, প্রয়াত অনন্য লেখকেব সাহিত্যজীবন আর ঘরের জীবন নিয়ে স্বয়ং ইন্দিরা মিত্র একটা প্রোগ্রাম করুন। এই প্রোগ্রাম শত সহস্র দর্শক শ্রোতার কাছে পরম সমাদবের জিনিস হবে।

কিন্তু গোড়ায় গোড়ায় ইন্দিরা টিভিব লোকের সঙ্গে দেখাই কবেন নি। ছেলেমেযে অনুরোধ কবেও ফিরে গেছে। আজ আবাব এসেছে। সুশান্ত অনীতা দু'জনেই তাগিদ দিচ্ছে, নিচে এসে ভদ্রলোকেব সঙ্গে একটু আলাপ করো না মা, এই নিযে তিন দিন এলেন।

—বসতে বল।

ইন্দিবা উঠলেন। পরনেব শাড়িটা খুব পবিষ্কার নয়। বদলালেন। সেই মুহূর্তে স্বামীর সেই নোটবইটাব কথা মনে হল তাঁব। চবিত্রচিত্রণের প্রসঙ্গে কি-ভাবে নক্সা কেটে স্বামী কি কবতেন, দেখাবেন।

বাব কবলেন। শেষের দিকেব ক'টা দিন কি আঁকিবুকি করেছেন দেখার জন্য ওটা খুললেন। তারপবেই অবাক একটু। আঁকিবুকি নয, লেখা। বিছানায বসে পড়তে লাগলেন। যত পড়ছেন ততো গম্ভীব।

একেবাবে শেষেব কটা লাইন—ওপবে তাবিখ দেওয়া। "...মানুষের চরিত্র নিযে সমস্ত লেখক জীবন ধরে যে এ-ভাবে ভাঁওতাবাজী করে গেলাম, নিজেই জানতাম না। যে লোক নিজের চরিত্রেব ঠিকানা জানে না, হদিস জানে না, সেই লোক অনন্য চবিত্রস্রষ্টা—এব থেকে হাসিব ব্যাপার আব কি হতে পারে!"

ইন্দিরা নিষ্প্রাণ স্তব্ধ মূর্তিব মতো বসে আছেন। ছেলে আবার তাগিদ দিতে এলো, মা এলে না?

—না, চলে যেতে বল।

মায়ের এই মুখ দেখে আব তাঁব হাতে এবার কালো নোটবই দেখে ছেলে স্মৃতির শোক ভাবল। বলল, তাহলে আব এক দিন আসতে বলি?

—কোন দিন না। আমাব দ্বাবা এ-সব হবে না বলে দে।

নোটবইটা হাতে নিয়ে ইন্দিরাই আগে ঘব ছেড়ে চলে গেলেন।

সহাবস্থান

মস্ত বাড়ি, দু'তিনখানা ঝকঝকে গাড়ি আর টাকাপয়সার ছড়াছড়ি—কিন্তু এমন পরিবারেও কি ঝগড়া-ঝাঁটি, খিটির-মিটির লেগেই থাকে না? অথচ স্বভাবে দু'জনের একজনেও ঝগড়াটে নয়?

প্রশ্নটা আমাকে করেছিল বোম্বাইয়ের মাস্টার সাহেব।

বোম্বাইযেব মাস্টাব সাহেব বলতে সেখানকাব লোক নয। বাঙালী। পঁচিশ বছব বয়সে ভাগ্য ফেবানোব চেষ্টায বম্বে চলে গেছল। বেশ শক্তসমর্থ পুরুষেব চেহাবা ছিল তখন। বি-এ পাশ। বাপ দাদা কেবানী। ফলে কেবানীগিবিব ওপব ঘেন্না। কলকাতাব সিনেমা এলাকায কিছুকাল ঘোবাঘুবি কবেছে। আব এদিকে এক চৌকস হিন্দুস্থানী শিক্ষকেব কাছ থেকে বেশ মন দিযে হিন্দী শিখেছে। তাব জন্য পযসা খবচ কবতে হযনি। তাব আগ্রহ দেখে ভদ্রলোক নিজেই যত্ন কবে শিখিযেছে। হিন্দীব দু'দুটো ডিপ্লোমা পবীক্ষাযও ভালো পাশেব সার্টিফিকেট তাব ছাত্রেব পকেটে এসেছে। মোট কথা, কলকাতায সুবিধে হল না দেখে মাস্টাব সাহেব (তখন নাম অমব ঘোষ) যখন বোম্বাই পাডি দিযেছিল, তখন সে টগবগ কবে হিন্দী বলতে পাবে, ইংবেজী বলতে পাবে —বাংলা তো পাবেই।

কিন্তু অর্থভাগ্যটা কোনদিনই তাব সুবিধেব নয। বোম্বাইযেব ছবিব বাজাবে তখন বাজপুত্র মার্কা হিবোব কদব। অনেক কষ্টেও ভদ্রলোক পাত্তাই পেল না। ছোটখাটো বোলে কিছু চান্স পেযেছিল। কিন্তু সেখানে তৃতীয-চতুর্থ সাবিব আর্টিস্টদেব কোন অস্তিত্বই নেই। নাযক-নাযিকা ছেডে টেকনিসিযানদেবও তাবা করুণাব পাত্র। কিন্তু একজন মাঝাবি প্রোডিউসাবেব চোখে তাব যে গুণটি ধবা পডেছিল সেটা অভিনয নয। সেই প্রযোজকটিব নাম অজিত ববিসকব। তাব একটি বুদ্ধিমান কর্মঠ বিশ্বস্ত লোকেব দবকাব ছিল। সে সোজাসুজি তাকে বলেছিল, অভিনয-টভিনয কোনোদিন তোমাব দ্বাবা হবে না। আমাব এদিকেব হিসেবপত্র বাখা, আব বাডিতে তিনটি ছেলেকে পডানোব জন্য একজন ভালো লোক দবকাব। এ-জন্য মাস গেলে আমি তোমাকে তিনশো টাকা মাইনে দেব। থাকাব জন্য আমাব বাডিতেই আলাদা ঘব পাবে—বিনে পযসায খাওযা-দাওযাও পাবে। সকালে ছেলে পডাবে, দুপুবে স্টুডিওতে এসে আমাব কাজকর্ম দেখবে। ছোটখাটো এক-আধটা বোল যদি পাও কববে—সেটা তোমাব বার্ডতি বোজগাব।

মাস্টাব সাহেব অর্থাৎ অমব ঘোষ এককথায বাজি হযে গেছল। তাব তখন বীতিমতো দৈন্যদশা চলেছে। যত্রতত্র খাওযা আব যত্রতত্র শোওযা। আশা কবেছিল ববিসকব সাহেবেব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকতে পেলে একদিন তাব অভিনযেবও কদব হবে। তা আব হল না। সেই থেকে সে মাস্টাব সাহেব। ছোট ভূমিকায অভিনযে নামলেও পর্দায নাম লেখা থাকে মাস্টাব সাহেব। এতদিনে নিজেব নাম নিজেই সে ভুলতে বসেছে, কাবণ নাম বললে চেনা মহল বা স্টুডিও মহলেব কেউ তাকে চিনবে না।

বযেস এখন পঞ্চাশেব কাছাকাছি। একমাথা কাঁচা-পাকা চুল। ফর্সা কোনদিন ছিল না, গাযেব বঙে এখন আবো পোড খেযেছে। তবে এখনো সুশ্রী, আব বুদ্ধিদীপ্ত চোখ। নিজেব ভাগ্য নিযে আব কোন আক্ষেপ নেই। ববং বেশ হাসিমুখে কৌতুকবসে জাবিযে নিজেব দুর্ভাগ্যেব গল্প করতে পাবে। এখন এক স্টুডিও এলাকাতেই নামমাত্র ভাডায একখানা ঘব নিযে আছে। সেই স্টুডিওব খাতাপত্র দেখাব চাকবি করে, মাইনে সর্বসাকুল্যে চাবশো। বোম্বাই শহবে এ-টাকায মাস চালাতে হলে প্রতিটি পযসাব হিসেব বেখে চলতে হয। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ বেজাব মুখ দেখে না তাব।

এই বযসেও এত কম মাইনে। তাব কাবণ আছে। স্টুডিওব এই চাকবি খুব বেশি দিনেব নয তাব। মাত্র দেড-দু' বছবেব। তাও আগে চেনা-জানা ছিল বলে স্টুডিওব মালিকবা দযা কবে তাকে এই কাজটুকু দিযেছে। চাপাচাপি কবলে মাইনে আবো কিছু বাডতে পাবে, কিন্তু মাস্টাব সাহেব তা কবে না। দিব্যি চলে যাচ্ছে। নিজে বেঁধে খায, আব নেশাব মধ্যে শুধু বিডিব খবচ।

এখানকাব চাকবিব আগে মোটামুটি ভালভাবেই দিন কেটেছে তাব। টানা বাবো-তেবো বছব অজিত ববিসকবেব কাছে বাডিব লোকেব মতোই ছিল। সেই ভদ্রলোকেব ছোট ছেলেটাও সেকেণ্ডাবি পাশ কবে বেবিযে যাবাব পব মাস্টাব সাহেবেব ডাক পডেছে তাব বড মেযেব বাডিতে। বড মেযেব নাম শীলা। বিযেব পব তিডকে হযেছে। মাস্টাব সাহেব যখন ববিসকব বাডিব বাসিন্দা, শীলাব বযেস তখন উনিশ-কুডি। আবো বছব দেডেক বাদে দিলীপ তিডকেব সঙ্গে তাব বিযে হযে গেছে। তাদেব পৈতৃক ব্যবসা। শীলাদেব থেকেও বড অবস্থা। মেযে পছন্দ হতেই তুলে নিযে গেছে। পছন্দ হবাব মতো মেযে তো বটেই। কলেজে পডে, চেহাবাপত্রেব চটক খুব, কালো চোখেব শবে পুরুষ ঘাযেল কবাব কেবামতি বাখে। বিযে হবে না কেন। বিযেব একমাস বাদে দিলীপ তিডকে লণ্ডন চলে গেছল বিজনেস ম্যানেজমেন্ট পডতে। বছব দুই বাদে ধৈর্য খুইযে চলে এসেছে। শীলা ততদিনে এক ছেলেব মা। বিযেব ন'মাসেব মধ্যেই তাব ছেলে হযেছে। ছেলেব অন্নপ্রাশনেব উৎসবে দিলীপ তিডকে সাত দিনেব জন্য এবোপ্লেনে চেপে চলে এসেছিল। ধুমধামেব পব আবাব ফিবে গেছে।

যাই হোক. দিলীপ তিডকে ফিবে আসাব দশ-বাবো বছবেব মধ্যে শীলাব আবো দুটি মেযে আব একটি ছেলে হযেছে। তাব বছব কযেকেব মধ্যে শীলাব ছোটভাইযেব পডা সাঙ্গ হতে বাপেব কাছে আব্দাব জানিযে মাস্টাব সাহেবকে নিজেব বাডিতে এনে তুলেছে। আব ছেলেমেযেদেব পডানোব ভাব তাব হাতে ছেডে দিযেছে। শিক্ষক হিসেবে মাস্টাব সাহেবেব গুণ কেউ অস্বীকাব কবতে পাববে না। কাবণ শীলাব তিন-তিনটি সাদা-মাটা ভাই-ই দিব্যি ভালো বেজাল্ট কবে বেবিযে এসেছে।

তিডকেব বাডি এসে মাস্টাব সাহেবেব দিন আবো ভালো কেটেছে। বাডিব কর্ত্রী অর্থাৎ শীলা যাকে সম্ভ্রমেব চোখে দেখে, অন্যেবাও তাকে কিছুটা সমীহ কবে চলবে বইকি। তাব ওপব দিলীপ তিডকে কিছুটা নির্বিলিক মানুষ। তাবও গোঁ আছে বটে, কিন্তু না ঘাঁটালে সে কাবো সাতে-পাঁচে নেই। মাস্টাব সাহেবেব মাইনে সর্বসাকুল্যে তখন সাডে সাতশো টাকা। শীলা দেয সাডে চাবশো, আব স্টুডিওব কাজেব জন্য তাব বাপ দেয তিনশো। প্রায সবটাই ব্যাঙ্কে জমা পডাব কথা। খাওযা-পবাব খবচ এক পযসা নেই। কিন্তু দু'দুটো বডলোকেব বাডিতে থাকাব ফলে মাস্টাব সাহেবেব একটু খাবাপ অভ্যেস হযে গেছল। মদ খাওযা ধবেছিল। এ-জিনিসটা দু'বাডিতেই জল-ভাত ব্যাপাব। আব সিগাবেট খবচাও ছিল তখন। তখন তো আব বিডি ফুঁকত না। বছব দুই আগে বলা নেই, কওযা নেই, বাডিব মেজাজী কর্ত্রী শীলা তিডকে হুট কবে তাকে বিদায কবে দিতে বেশ ফাঁপবে পডেছিল মাস্টাব সাহেব। এ-বকম হবে বা হতে পাবে ভাবেনি, কাবণ তখনো তাব ছোট ছেলেব স্কুলেব পডা শেষ হতেই

বেশ বাকি। আবার ততদিনে মাস্টার সাহেবের সিনেমার চাকরিও গেছে। শীলার বাবা চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সে ব্যবসায় যবনিকা পড়েছে। বাবার দেওয়া মাইনেটাও শীলা পুষিয়ে দিচ্ছিল। মেয়েটার, এখন আর মেয়েটার নয়, মহিলাটির এমনিতে দরাজ মন, কিন্তু তার মেজাজ বোঝা ভার। মাস্টার সাহেবও কোনরকম আবেদন না জানিয়ে চলেই এসেছে। তারপর এই স্টুডিওর চাকরিটুকু জোটাতে পেরে নিশ্চিন্ত।

মাস্টার সাহেবের সঙ্গে এই স্টুডিওতেই গেল বছরে আলাপ আমার। নিজের গল্পের একটা ছবির কাজেই কিছুদিন ছিলাম। লোকটিকে আমার ভালো লেগেছিল। আমার অঢেল সময়। তার সঙ্গে আড্ডা দিয়েছে। ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে সে তার হাতের রান্নাও খাইয়েছে আমাকে। তখনই নিজের জীবনের গল্প করেছে।

এবারেও ছবির কাজে আসা। আমাকে দেখে মাস্টার সাহেব ভারী খুশি। তার সঙ্গে থাকার আমন্ত্রণ পর্যন্ত জানিয়েছিল। বলেছিল, আপনার মতো একজনের সঙ্গে আমার খাতির দেখলে এরাও আমাকে একটু অন্য চোখে দেখবে। সেটা সম্ভব হয়নি, কিন্তু আড্ডা দিতে তার ঘরে প্রায়ই গেছি।

স্টুডিওতে বসেই আমার আগামী ছবির বাঙালী ডাইরেক্টরের সঙ্গে স্ক্রিপট নিয়ে একটু কথা-কাটাকাটি হয়ে গেল। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায় অকারণ ঝগড়া আর বচসার ব্যাপারগুলো আমার পছন্দ হচ্ছিল না। মাস্টার সাহেব সেখানে চুপচাপ বসেছিল। শুনছিল। পরে তার ঘরে ধরে এনে চা খেতে খেতে প্রথমেই ওই প্রশ্ন। যথা, মস্ত বাড়ি, দু-তিনখানা ঝকঝকে গাড়ি আর টাকা-পয়সার ছড়াছড়ি—এমন পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অকারণ ঝগড়াঝাঁটি লেগে থাকতে পারে কিনা। অথচ স্বভাবে দু'জনের একজনও ঝগড়াটে নয়।

আমি কৌতূহল বোধ করেছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এ-রকম দেখেছ?

হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে মাস্টার সাহেব জবাব দিল, না দেখলে বলছি। অথচ আশ্চর্যভাবে এই ঝগড়াঝাঁটি, খিটির-মিটির একেবারে থেমে যেতেও দেখেছি।

তার চোখ-মুখের দিকে চেয়ে আমার কৌতূহল আরো বাড়ল। বললাম, ব্যাপারখানা বলো তো মাস্টার সাহেব—শুনি? সমস্ত জীবন তো মাস্টারি করে কাটালে, কোথায় দেখলে?

—এই মাস্টারি জীবনেই। গেলবারে দিলীপ তিড়কে আর শীলা তিড়কের ছেলেমেয়েদের পড়াতুম—সে গল্প করেছি তো?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

—সেখানেই। দিলীপ আর শীলার মধ্যে হঠাৎ-হঠাৎ কি যে তুমুল লেগে যেত, আপনি ভাবতেও পারবেন না। ছেলেমেয়েরা ছেড়ে দিলীপ তিড়কেও স্ত্রীর তিরিক্ষি মেজাজের হদিশ না পেয়ে প্রথমে হাঁ করে থাকত। পরে সে-ও ক্ষেপে যেত। আমার মাঝে মাঝে ভয় হত, এতগুলো ছেলেমেয়ে, কিন্তু এ-রকম অকারণে বা তুচ্ছ কারণে দু'জনের একটা ডিভোর্সের ব্যাপার না হয়ে যায়। এ-রকম বছরের পর বছর ধরে দেখেছি। তারপর মাত্র এই দু'বছর আগে সব ঠাণ্ডা—স্বামী-স্ত্রীতে বেশ সদ্ভাব।

মুখের দিকে চেয়ে মাস্টার সাহেব এমন টিপ টিপ হাসতে লাগল যে আমার মনে হল, গল্পের সবে শুরু। জিগ্যেস করলাম, বছরের পর বছর ধরে অত ঝগড়া কেন, আর পরে হঠাৎ সদ্ভাবই বা কেন—কেউ জানে না?

—শীলা তিড়কে নিশ্চয় জানে, আর দিলীপ তিড়কের হয়তো ধারণা কোন দৈব অনুগ্রহেই স্ত্রীর মন-মেজাজ ঘুরে গেছে।... কিন্তু ব্যাপারটা আমি আঁচ করতে পারি বলেই শীলা তিড়কে হুট করে আমাকে জবাব দিয়ে বসল।

এরপর আমি শোনার জন্য উদগ্রীব। মাস্টার সাহেবও বলতেই চায়। সংক্ষেপে চিত্রটা এই রকমঃ

..শীলা তিড়কের এখন বছর পঁয়তাল্লিশ বয়েস। কিন্তু এখনো দেখলে কেউ চল্লিশ ভাববে না। মাস্টার সাহেব লক্ষ্য করেছে তার মনমেজাজ বিগড়োতে শুরু করেছে বছর সাত-আট আগে থেকে। কারণে অকারণে ক্ষেপে যায়। রাগ সব থেকে বেশি স্বামীর ওপর। সে বেচারা যতক্ষণ পারে সহ্য করে। তারপর সে-ও পালটা ঝাপটা মারতে আসে। বাড়ির ছেলেমেয়েগুলো ভয়ে তটস্থ তখন। কারণ ঝগড়ার পরের জেরটা প্রায়ই ওদের ওপর এসে পড়ে। রাগারাগির পর ওদের বাপ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, আর মা ছেলেমেয়েগুলোকে নিয়ে পড়ে। তুচ্ছ কারণে মারধোরও করে। মাস্টার সাহেব বাধা দিতে চেষ্টা করলে তাকে সুদ্ধ চোখের আগুনে ভস্ম করতে চায়। এরই মধ্যে শীলা তিড়কের আবার ধর্মে মতি এসেছে কিছু । নিজের একটা ঠাকুরঘরও করেছে কিন্তু ধর্মে মন দিলে সাধারণত মেজাজপত্র ঠাণ্ডা আর সুস্থির হতে দেখা যায়। শীলা তিড়কের ঠিক উল্টো। দিনে দিনে আরো তিরিক্ষি হয়ে উঠছে।

এদিকে দিলীপ তিড়কে তার ব্যবসা নিয়ে সত্যি ব্যস্ত। ব্যবসার কাজে প্রায়ই তাকে বোম্বাইয়ের বাইরে বেরুতে হয়। বেশি যায় গোয়ায়। গোয়ার সঙ্গে কিছু আমদানি-রপ্তানির যোগ আছে। সেখানে তার এক খুড়তুতো ভাই ব্যবসার দেখাশুনা করত। বছর চারেক আগে সেই ভাই হঠাৎ মারা যাওয়ায় দিলীপ তিড়কের আরো ঘন ঘন গোয়ায় যেতে হয়। অন্য দায়ও আছে। সেই খুড়তুতো ভাইয়ের দুটো ছেলে। ভাই মারা যাবার সময় একজনের বয়েস চার, আর একজনের দেড়। ওদের বা ওদের মায়ের তখন একমাত্র দিলীপ তিড়কে ছাড়া তিন কুলে আর কেউ নেই। পরের এই ক'টা বছরে সেই ভাইয়ের বউটি ব্যবসার কাজ মোটামুটি বুঝে নিয়েছিল। বম্বে টু গোয়া দূর কিছু নয়। দিলীপ তিড়কের সেই ভাই জীবিত থাকতেও শীলা কোনদিন তাদের বম্বে বেড়িয়ে যাওয়ার জন্য আপ্যায়ন করেনি। আশ্রিতদের সে আশ্রিতের চোখেই দেখে। সেই ভাই মারা যাবার পরেও তাদের ডাকেনি। মাস গেলে মাসোহারা যাচ্ছে, এর বেশি আর কি করার আছে? স্বামীকে সে-ই পরামর্শ দিয়েছিল, হাত-পা গুটিয়ে বসে না থেকে তোমার ভাইয়ের বউকে ওখানকার ব্যবসার কাজ একটু আধটু বুঝে নিতে বলো—শুধু দয়ার ওপর কতকাল আর চলতে পারে। দিলীপ তিড়কে খুশিমুখে স্ত্রীর প্রস্তাবে সায় দিয়েছিল।

যাক, বাড়ির অশান্তি এদিকে বাড়ছেই—বাড়ছেই। শীলা তিড়কের উঠতে বসতে রাগ। স্বামী ঘরে থাকলে রাগ, ব্যবসার কাজে ব্যস্ততা বাড়লে রাগ, আগের

মতো উৎসব-আনন্দে যোগ দিতে পারে না বলে রাগ, আবার পূজোআর্চায়ও মন দিতে পাবে না বলে বাগ। এরই মধ্যে এই পবিবাবে আবাব একটা বড রকমেব পরিবর্তন দেখা দিল। নিজের চাব-চারটে ছেলেমেযে নিযেই অস্থিব আব অসহিষ্ণু শীলা তিড়কে. তার মধ্যে বলা নেই, কওয়া নেই, হুট কবে আবো দু-দুটো নাবালককে গোয়া থেকে বোম্বাইতে তুলে নিযে এলো দিলীপ তিড়কে।

ভদ্রলোক সত্যি নিরুপায। কাবণ গোয়াব সেই ভাইযের বউও তিন দিনের অসুখে দুম কবে মাবা গেল। তাব বড় ছেলেটার বযেস তখন ন'য়ের কাছাকাছি, আব ছোটটাব ছয়। ভাবী মিষ্টি ছেলে দুটো। দেখলে মায়া হয। আর বোঝা যায, ওদের বাবা বা মাযেব দু'জনেব একজন অন্তত ভারী রূপবান বা রূপসী ছিল। শীলা তিডকে যে মেজাজের মহিলাই হোক, স্বামীকে খুব একটা দোষ দেবে কি কবে? বাপ-মা-মবা ছেলে দুটো যাবে কোথায? অসন্তুষ্ট হলেও এ নিযে খুব একটা রাগারাগি কবতে পাবল না। দিলীপ তিডকে আশ্বাস দিল, আর একটু বড হলেই ছেলে দুটোকে হস্টেলে পাঠিযে দেওয়া হবে।

ভদ্রলোকেব বুকেব তলায বেশ একটা নরম জায়গা আছে বটে। স্ত্রীব ভযে বাইবে কোনরকম হাঁক-ডাক নেই, কিন্তু ভিতরে ভিতবে অসহায ছেলে দুটোব প্রতি সজাগ চোখ। চুপচাপ ওদেব ভালো স্কুলে ভর্তি কবা হযেছে। মাস্টাব সাহেবকে চুপি চুপি অনুবোধ করে ওদের দুজনেব জন্য আলাদা একজন টিউটর বাখা হযেছে। বডঘবেব ছেলেব মতোই ফিটফাট পোশাক-আসাক ওদেবও।

এবই মধ্যে মাস্টাব সাহেব লক্ষ্য কবছে, শীলা তিডকে হঠাৎ কি-রকম গুম মেরে যাচ্ছে। তাব চিৎকাব চেঁচামিচি বাগাবাগি কমে আসছে। সব দেখে লক্ষ্য করে, কিন্তু মুখে কিছু বলে না। মাস্টাব সাহেবের ভয়, খুব বড বকমেব কিছু বিস্ফোবণেব লক্ষণ এটা।

মাস চাবেক বাদে এক দুপুরে খোদ কর্ত্রীর শোবাব ঘবে ডাক পডল মাস্টাব সাহেবের। ছেলেমেয়েবা সব স্কুলে। দিলীপ তিডকে অফিসে। মাস্টাব সাহেব পডার ঘবে বসে বই পডছিল। নিজে এসে ডেকে নিয়ে গেল।

সেই থমথমে মুখ দেখেই প্রমাদ গুনছিল মাস্টার সাহেব।

শীলা খুব ঠাণ্ডা গলায় তাকে কিছু বলল, তাবপর কিছু হুকুম কবল। সেই হুকুম মতো সেই দুপুরেই মাস্টাব সাহেব গোয়ায় চলে গেল। তাব বুকেব তলায় সর্বক্ষণ তখন হাতুডির ঘা। দুদিন বাদে ফিবল। বুকেব তলায তখন এক ধরনের হিংস্র আনন্দ। এই পরিবার এখন তছনছ হয়ে যাবে—ওই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ডিভোর্স হয়তো আর কেউ রুখতে পারবে না।

ফিরেছেও দুপুরে। বাড়িতে যখন আব বিশেষ কেউ নেই। শীলা তিড়কে আবাব তাকে ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। নির্লিপ্ত ঠাণ্ডা মুখে মাস্টার সাহেব তাকে সমাচার জানালো। তার সন্দেহ সবটাই সত্য। গোয়াতে দিলীপ তিড়কেব কোনরকম ভাই বলে কেউ ছিল না। ওখানকার ব্যবসা দেখাব দায়িত্ব নিয়ে একজন খুব রূপসী মহিলা নিযুক্ত

ছিল। সেখানকার লোক জানে দিলীপ তিড়কে পরে তাকে বিয়ে করেছে। ছেলে দুটো তাদেরই।

এরপর শেষ দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল মাস্টার সাহেব। কিন্তু এমন শেষ দেখবে কল্পনাও করেনি। তাকে আবার একদিন চুপি চুপি ডেকে বলেছে, এ-খবর যেন প্রকাশ না হয়। আর পনের দিনের মধ্যে অন্য মূর্তি দেখেছে শীলা তিড়কের। সেই আগের মতো হাসি-খুশি, উচ্ছল স্বামীর সঙ্গে পার্টিতে যায়, সিনেমায় যায়। বাড়ির ছটা ছেলেমেয়েকেই আদর করে, জিনিস কিনে দেয়, সমান চোখে দেখে।

মাস শেষ হতেই তিন হাজার টাকা মাস্টার সাহেবের হাতে দিয়ে বলল, প্রাইভেট টিউটর আর দরকার নেই—সে আর মিস্টার তিড়কে ছেলেমেয়েদের অন্যভাবে মানুষ করার কথা ভাবছে। তারা দুজনেই মাস্টার সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞ।

এই পর্যন্ত বলে মাস্টার সাহেব থামল। আমি বিমূঢ় মুখে তার দিকে চেয়ে রইলাম।

ঘোরালো দু'চোখ মাস্টার সাহেব আমার মুখের ওপর তুলে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার বুঝলেন কিছু?

মাথা নাড়লাম। —না। একদিকে মহিলার এমন উদার পরিবর্তন, অন্যদিকে তোমার ওপর হঠাৎ বিরূপ কেন?

অনুচ্চ অথচ ক্ষোভ-ঝরা গলায় বিড় বিড় করে মাস্টার সাহেব জবাব দিল, উদার পরিবর্তন না ছাই—সে নিজের এতকালের বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পেল। বিয়ের এক মাস বাদেই দিলীপ তিড়কে দু'বছরের জন্য বিলেত চলে গেছল, আর ন'মাসের মধ্যে শীলার বড় ছেলে ঘরে এসেছে...সেই ছেলে দিলীপ তিড়কের নয়।

শুনে আমি হতভম্ব, বিমূঢ় খানিকক্ষণ। সেই বিস্ময়ের ঝোঁকেই জিগ্যেস করলাম, কিন্তু এ-রকম একটা ব্যাপার তুমি জানলে কি করে।

মাস্টার সাহেব অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। গলার স্বরে চাপা বিরক্তি। জবাব না দিয়ে মন্তব্য করল, কি-যে ছাইয়ের গল্প লেখেন বুঝি না।

দাম্পত্য

ঘুম থেকে উঠতে একটু বেলাই হয় রমেনবাবুর। খাটুনির জীবনে এইটুকুই বিলাসিতা। আজ চোখ মেলে তাকিয়েই তাঁর মনে হল কোথায় যেন এই সকালটার একটু ব্যতিক্রম অনুভব করছেন। বিছানায় শুয়েই চারদিকে তাকালেন। সামনের ছোট টেবিলে ট্রে-তে বেড-টি পট আর পেয়ালা। গত পাঁচ মাসের মধ্যে তিনি বেড-টি খেয়েছেন মনে পড়ে না। তার আগে অবশ্য ঘুম-চোখে এক পেয়ালা চা কোনরকমে গলাধঃকরণ করে আবার শুয়ে পড়তেন। চোখ মেলে ভালো করে তাকাতেনও না। সুমিত্রার তাগিদে উঠছি উঠছি করে মাথার ওপরের পাখার হাওয়ায় চা কিছুটা ঠাণ্ডা হলে দু'চুমুকে পেয়ালা শেষ করে আবার শুয়ে পড়তেন। চা সমস্তদিনে রমেন চৌধুরী অনেকবার খান। কিন্তু ওই সাতসকালে সুমিত্রার তাকে চা গেলানোটা বিরক্তিকর লাগত। না

খেলে, সেও যেন কালচারের হানি। রমেনবাবু অবশ্য কখনো এ নিয়ে আপত্তি করেননি। আজ থেকে বাইশ বছর আগে সুমিত্রা এ বাড়িতে পা-দিয়ে যা-কিছু করেছেন তার সব কিছুই তখন রমেনবাবু অম্লানবদনে মেনে নিয়েছেন। তাই পরে আর আপত্তির কোন প্রশ্নই ওঠেনি।

কিন্তু পাঁচ মাস বাদে রঘু ব্যাটা ভুল করে আবার চায়ের ট্রে রেখে গেছে বোধহয়। পরক্ষণে নিজের গায়ের পাতলা চাদরটার দিকে চোখ গেল। ভোরের দিকে এখন সামান্য ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা পড়ে। তার মধ্যে মাথার ওপর পুরোদমে পাখা ঘোরে। ভোররাতে বেশ শীত করছিল রমেনবাবুর মনে আছে। কিন্তু ঘুম-চোখে পায়ের তলার চাদরটা আর খুঁজে পাননি তিনি।

রঘুটা সেদিন চাদর দিতে ভুলেছে ভেবে কুঁকড়ে শুয়েছিলেন আবার। কিন্তু এখন নিজের পা থেকে মাথা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা দেখছেন। ঘুমের মধ্যে আবার কখন উঠে চাদর হাতড়ে পেয়েছেন এবং গায়ে দিয়েছেন মনে করতে পারছেন না।

আরো অবাক সামনের খোলা দরজার দিকে চোখ পড়তে। রঘু ভুল করে না হয় বেড-টি রেখে গেল, কিন্তু দরজা দুটোও খোলা রেখে গেল? তাছাড়া তাঁর ঘুমের মধ্যেই দরজায় পাট-ভাঙ্গা নতুন পর্দা লাগিয়ে দিয়ে গেল? ও-রকম মুগোরঙ্গের পর্দাগুলো সব সুমিত্রা নিয়েই গেছে ধরে নিয়েছিলেন। কারণ গত পাঁচ মাসের মধ্যে মাঝে একবার মাত্র এই ঘরের পর্দা বদলানো হয়েছে মনে পড়ছে। তাও রঘু নিজের পছন্দমতো ভাবী একটা নীল পর্দা এনে লাগিয়েছিল। গত তিন মাস ধরে সেই পর্দাই ঝুলছিল। কি ভেবে বালিশের ওপর দিয়ে মাথা উঁচিয়ে পিছনের জানলা দুটোর দিকে তাকালেন রমেনবাবু। তারু পরেই হাঁ একেবারে। দরজায় ওই মুগোপর্দা লাগালেই তার সঙ্গে ম্যাচ করে জানলায় ওই রংয়ের পর্দাই টাঙাতো সুমিত্রা। এখনো জানলায় সেই ম্যাচ করা ঝকঝকে পর্দাই দেখছেন রমেনবাবু। তিনি ঘুমুচ্ছেন আর সেই ঘরে ঢুকে রঘু নিঃশব্দে এত সব করে গেল দেখেও বিশ্বাস হচ্ছে না।

আস্তে আস্তে শয্যায় উঠে বসলেন তিনি। ঘরের চারদিকে ভালো করে তাকালেন আবার। ড্রেসিং টেবিলটা সাজানো, কোণের আলনাটা গোছানো। পাঁচ মাস আগে যেমন থাকত, সে রকমই অনেকটা।

ঘড়ি দেখলেন। ন'টা বাজে প্রায়। এত বেলা পর্যন্ত আগে ঘুমোতেন না তা বলে। ইদানীং বেলা হচ্ছে। অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়েন বা জার্নাল-টার্নাল পড়েন। রাতের ঘুম কমেছে, ফলে সকালের ঘুম বেড়েছে।

—বাবা এখনো ওঠেনি রে রঘু?

বাইরে থেকে এই গলার [illegible] কানে আসার সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতরটা যেন ধপধপ করে লাফিয়ে উঠল রমেনবাবুর। একি শুনলেন তিনি? কার গলা শুনলেন? এখন তিনি জেগে আছেন না ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন?

ওই গলার স্বর আর [illegible] পর্দা ঠেলে গলা বাড়ালো। তাঁকে বসে থাকতে দেখে মু[illegible] ভাঙা [illegible] চোখ আনন্দে চকচক করছে।

3132

সুমু— সৌমেন, রমেনবাবুর একমাত্র ছেলে। কুড়ি বছর বয়স। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে একমুখ হেসে বাবাকে প্রণাম করল। বলল, খুব অবাক করে দিয়েছি তো? মা একটা চিঠি লিখে তোমাকে জানাতে বলেছিল আমরা আসছি। আমি বলেছি, না, যাচ্ছি যখন না জানিয়েই যাবো। বাবাকে অবাক করে দেব।

ছেলেকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলেন রমেনবাবু। বুকে চেপে ধরলেন। তারপর কি যে হয়ে গেল, নিজেও অপ্রস্তুত। যা কখনো হয়নি তাই হয়ে গেল। কেঁদে ফেললেন তিনি।

বাবার চোখে জল দেখে ছেলেটাও অপ্রস্তুত। তাড়াতাড়ি বলল, তুমি আর কিছু ভেব না বাবা। সব ঠিক হয়ে গেছে। মা আর তোমাকে ছেড়ে যাবে না, আমিও না। কি যে এক মজার কাণ্ড হয়েছে না মাদ্রাজে—একদিনে মায়ের মেজাজ জল—মনই ঘুরে গেল একেবারে. বলব'খন তোমাকে—চুপ মেরে যেতে হল, পর্দা সরিয়ে সুমিত্রা ঘরে ঢুকলেন। বাপে-ছেলেতে তখনো জড়াজড়ি, রমেনবাবুর চোখে তখনো জল।

তাড়াতাড়ি ছেলেকে ছেড়ে দিলেন। নিজের ওপর হঠাৎ প্রচণ্ড রাগ হল রমেনবাবুর। এই একজনের কাছে চোখের জলসুদ্ধ ধরা পড়তে চাননি।

সুমিত্রা চুপচাপ তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন একটু। সুমুও এই ফাঁকে মাকে দেখে নিচ্ছে।

সুমিত্রা স্নান সেরে এসেছেন। ভেজা চুল। ফর্সা মুখে ফোঁটা ফোঁটা জলের দাগ। আয়নার দিকে চলে গেলেন। ড্রয়ার খুলে চিরুনি বার করলেন।

পাঁচ মাস বাদে দেখা হবার পরে ঘরের তিনজনেই একেবারে চুপ মেরে গেলো অস্বস্তিতে। ছেলে একবার মাকে দেখে নিয়ে অনেকটা বেপরোয়ার মতো বলে ফেলল, তোমাকে প্রথমেই একটা সুখবর দিয়ে রাখি বাবা। এবার থেকে আমি তোমার সঙ্গে কণ্ট্রাক্টরির কাজে লেগে যাবো। তোমার কাছে হাতেকলমে কাজ শিখবো।

এ-কথা শুনে রমেনবাবুই যেন ফাঁপরে পড়লেন। তাড়াতাড়ি বললেন, না না, ও-সব তোকে করতে হবে না।

সুমিত্রা মোটা চিরুনি দিয়ে মাথা আঁচড়াচ্ছিলেন। অনেক চুল। সেই চুলে চিরুনি সুদ্ধ হাত থেমে গেল। সামান্য মুখ ফিরিয়ে তাঁর দিকে তাকালেন।

রমেনবাবু ছেলেকে বললেন, মা যা বলবেন তাই করবি।

বা রে, মা-ই তো ওই কথা বলেছে— তোমার সঙ্গে কাজ করব, তোমার কাছে কাজ শিখব—

রমেনবাবু আবারও হতচকিত একটু। এতো বিশ্বাস করতে হবে।

সুমিত্রার হাতে আবার চিরুনি চলছে। আয়নার দিকে মুখ। ছেলেকে বললেন, রঘুকে ওই চায়ের ট্রে নিয়ে যেতে বল, চা-জলখাবার সব একেবারে নিয়ে আসুক. গল্প করতে হয় মুখ হাত ধোওয়া হলে তারপর কর, সকাল ন'টা বেজে গেল—

পরোক্ষ শেষের উক্তিটা রমেনবাবুর উদ্দেশ্যে সেটা ছেলেও বুঝল। খাট ছেড়ে মায়ের নির্দেশ পালন করতে চলল সে।

সুমিত্রা ধীরেসুস্থে মাথা আঁচড়াচ্ছেন। অত চুলের জন্য শরীরের ওপরের দিকটা একটু বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে। লোভীর মতোই দেখতে ইচ্ছে করছে রমেনবাবুর। আগে তাই দেখতেন। আয়নার ভিতর দিয়ে সুমিত্রার সঙ্গে আবার চোখাচোখি হতে তাড়াতাড়ি খাট থেকে নেমে এলেন। যেন তাড়া আছে এমনি ভাব করে মুখ হাত ধুতে চলে গেলেন।

হঠাৎ কি হল বা হতে পারে মাথায় ঢুকছে না। এই ছেলেকে অর্থাৎ সৌমেনকে নিয়েই মর্মান্তিক বিচ্ছেদ সুমিত্রার সঙ্গে। এবারে কোর্টে নিষ্পত্তি হবার কথা। শ্বশুরের শেষ কড়া চিঠিতে এ-রকম আভাসই পেয়েছিলেন তিনি। আর গোঁ ধরে সেই অবাঞ্ছিত পরিণামের অপেক্ষাতে ছিলেন। তার মধ্যে ছেলে নিয়ে সুমিত্রা হঠাৎ ফিরে আসবে এ তিনি ভাববেন কি করে? শুধু তাই নয়, সুমু বাপের কাছে কাজ শিখবে, বাপের সঙ্গে কাজ করবে—সুমিত্রাই নাকি এ-কথা বলেছে। এ কানে শুনলেও সত্যিই বিশ্বাস করেন কি করে?

তোয়ালেতে মুখ মুছে আবার ঘরে ফিরলেন রমেনবাবু। মাথা আঁচড়ানো শেষ করে সুমিত্রা মনযোগ দিয়ে কপালে সিঁদুরের লাল শিখা দিচ্ছে দেখলেন রমেনবাবু। রঘু চা আর সকালের খাবার রেখে গেছে। আয়নায় আবার চোখাচোখি হতে রমেনবাবু মুখ ফিরিয়ে পট থেকে পেয়ালায় চা ঢালতে লাগলেন।

—আগে টোস্ট আর পোচ খাও, তারপর চা ঢালবে।

আগে যে মেজাজে কথা বলত সুমিত্রা তার খুব একটা রকমফের হয় নি। হাব-ভাব-আচরণও বদলায়নি। তবু এরই মধ্যে কোথায় যেন একটু ভিন্ন স্বাদ পাচ্ছেন রমেন চৌধুরী। টোস্ট আর ডিমের পোচ টেনে নিলেন। সুমিত্রা সামনে এগিয়ে এলেন। তাঁর দিকে চেয়ে রমেনবাবু হাসতে চেষ্টা করলেন একটু। আজ অনেককাল বাদে টোস্ট আর পোচের থেকে হঠাৎ এই মুখখানা ঢের বেশী লোভনীয় লাগল তার। কিন্তু ধরা পড়ার ভয়ে বেশী তাকাতেও পারছেন না।

—এই পাঁচ— মাসে চেহারার তো বেশ উন্নতি হয়েছে দেখছি।

সুমিত্রার গলায় একটু শ্লেষের আভাস আছে কি নেই ঠিক ধরতে পারলেন না। সহজ হবার চেষ্টায় একটু হাসলেন রমেনবাবু।—কেন, খারাপ দেখছ?

—রঘু বলল, সকালে তিন চার পেয়ালা চা ছাড়া আর কিছু খেতে না। রাতেও দুটোর আগে ঘরের আলো নিভত না। শরীর খারাপ হবে না তো কি ভালো হবে?

রঘু ব্যাটা এইভাবে তাকে ডুবিয়েছে। কিন্তু চেষ্টা করেও তিনি রঘুর উপর রাগ করতে পারলেন না। পারলেন না, কারণ সুমিত্রার সেই চিরাচরিত কর্তৃত্ব আর ব্যক্তিত্বের ফাটল দিয়ে আজ তিনি ভিন্ন রকমের কিছু দেখতে পাচ্ছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কেমন ছিলে?

—কেমন ছিলাম পাঁচ মাসের মধ্যে একটা চিঠি লিখে তো খবর নিতে পারতে? না কি ভেবেছিলে, দূর হয়েছে ভালই হয়েছে।

জবাবে রমেন চৌধুরী বলতে পারতেন, তিনি চিঠি লেখার জন্যে প্রস্তুত হবার আগেই শ্বশুরের দু'দু'খানা কড়া চিঠি পেয়েছেন। একটাতে তাঁর উপদেশ ছিল, নিজে

এসে মেয়েব কাছে মাপ চেয়ে তাকে যেন ঘবে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কবা হয। মাস দেডেক প্রতীক্ষার পবে শ্বশুব দ্বিতীয় চিঠিতে লিখেছিলেন, তিনি এবং সুমিত্রা দু'জনেই ডিভোর্স সুট ফাইল কবাব কথা ভাবছেন। আশা কবা হচ্ছে, এ নিযে সে (অর্থাৎ বমেন চৌধুবী) বেশী তিক্ততা সৃষ্টিব চেষ্টা কববে না। এবং সৌমেনেব ভবিষ্যতেব যথাযথ ব্যবস্থাও তাব বাবা বিনা জোবজুলুমেই করবেন।

এই দ্বিতীয় চিঠিব জবাব বমেন চৌধুবী শ্বশুবকে দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন, সৌমেন সাবালক, সে ইচ্ছে কবলে তার বাবাব কাছে থাকতে পাবে, ইচ্ছে কবলে মাযেব কাছে থাকতে পাবে। আইনগতভাবে তাব প্রতি আর কোন দাযিত্ব বমেনবাবুর নেই। তবে ছেলে যদি তাব বাবাব কাছে থাকা সাব্যস্ত কবে, তাব ভবিষ্যৎ-চিন্তাও তিনিই কববেন।

এ সব কথা মনে এলেও আজকেব এই অপ্রত্যাশিত পবিস্থিতিতে তা বলা যায না। টোস্ট চিবুতে চিবুতে সুমিত্রাব মুখেব দিকে চেযে একটু ঠাট্টাই কবলেন বমেনবাবু। বললেন, এ-বযসে স্ত্রী দূব হযে গেলে আব ভালোটা কি হতে পাবে?

এইটুকুতেই সেই চিবাচবিত অসহিষ্ণুতা সুমিত্রাব, থাক। পযসার গরম হলে ষাট বছর বযেসটাকেও তোমাবা খুব একটা বযেস ভাব না—বুঝলে?

বমেন চৌধুবী হাসছেন।—আমাব ছে'চল্লিশ...এটা কি তাহলে পুবো যৌবন?

সুমিত্রা চোখেব কোণে মানুষটাকে আব একবাব দেখে নিলেন। সকালে যখন পাখাব হাওযায কুঁকড়ে অঘোবে ঘুমোচ্ছিল তখনো দাঁড়িযে দাঁড়িযে দেখেছেন। নিরীহ ঘুমন্ত মানুষটাব দিকে চেযে তখনো একটা জোবেব দিক আবিষ্কার কবছিলেন তিনি। এখনো সেই জোরেব দিকটাই দেখছেন। একটুও বাগ হচ্ছে না, ববং ভালো লাগছে। এই ভালো লাগাব স্বাদটা আশ্চর্য বকমেব নতুন। হঠাৎ হাসলেন সুমিত্রা একটু। বললেন, যাক শোন, সুমু ঠিকই বলেছে— এখন থেকে সে তোমাব সঙ্গে কাজে বেরুবে।

শুনে রমেনবাবুই হাঁসফাস কবে উঠলেন। সুমিত্রা ফিবেই যখন এসেছে এ প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি আব ঘোঁট পাকাতে চান না। তাড়াতাডি বাধা দিয়ে বললেন, না-না, ও তুমি যা চাও তাই হবে। সুমু চার্টার্ড আকাউনটেনসিই পড়ুক, দেখেশুনে ভালো একটা ফার্মে ভর্তি হয়ে যাক, তাবপব টাকা খবচ কবলে গাইড কবাব লোকও ঠিকই পাওযা যাবে।

সুমিত্রাব চোখদুটো এমনিতেই বড। মুখেব দিকে স্থিব তাকিযে থাকলে আবো বড দেখায়। তেমনি চেয়ে বইলেন কযেক পলক। বললেন, কিন্তু আমি এখন আব তা চাই না—যা চাই তাই তোমাকে বললাম। কাল থেকেই ও তোমাব সঙ্গে কাজে বেরুবে।

উঠে চলে গেলেন। বমেনবাবুব ভ্যাবাচাকা খাওয়া মুখ। না, সুমিত্রাব এ-রকম পবিবর্তনেব জন্য তিনি কোনো ঠাকুর-দেবতাব দোরে ধর্ণা দেননি। তবু এ কি করে সম্ভব হল ভেবে পাচ্ছেন না। সুমিত্রা যে বাগ কবে নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছে বাতিল করে এ-ভাবে ফিবে এসে আত্মসমর্পণ করল, রমেনবাবুর সেবকমও মনে হচ্ছে না। তার নিজেব ইচ্ছেটাই সব। সে কোনবকম আপোসের ধাব ধারে না।

অথচ এই সুমু আব সুমুর ভবিষ্যৎ নিয়েই পাঁচ মাস আগের সেই চবম ব্যাপার। অবশ্য এব আগেও স্বামী-স্ত্রীতে অনেক ঝগড়া হযেছে আব সুমিত্রা বাগ কবে বাপের বাড়ি চলে গেছে। ঝগড়া বলতে যে গোছের বাকবিতণ্ডা বা বচসা বোঝায় তা নয়। সেভাবে কথা-কাটাকাটি কবতে সুমিত্রাব রুচিতে বাধে। আব বমেনবাবুও সবসময় কটকট করাব মানুষ নন। যতক্ষণ সম্ভব সহ্য করেন, আব চুপচাপ দেখে যান বা শুনে যান। তাবপব নিতান্ত অসহ্য হলে দুমদাম দু-পাঁচ কথা বলে বসেন। সুমিত্রা তখন এমনভাবে চেয়ে থাকেন যে তাঁব সামনে কোনো ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে না ইতবজন— তাই যেন সন্দেহ। তাই দেখে বমেনবাবুব মেজাজ এক-এক সময় দ্বিগুণ বিগড়োতো। তখন মাত্রাজ্ঞান ছাড়িযেই যেত। ওবকম অশালীনতাব একটাই জবাব, সুমিত্রাব বাপেব বাড়ি প্রস্থান। এবপব বমেনবাবু প্রথমে ছেলেকে পাঠাতেন, তারপবে টেলিফোনে যোগাযোগেব চেষ্টা কবতেন। শেযে মুখ কাঁচুমাচু কবে নিজেই শ্বশুরবাড়িব দিকে পা বাড়াতেন।

শ্বশুববাড়িব লোকেবা সর্বদাই তাঁদেব মেযেব পক্ষে। শাশুড়ী ঠাবেঠোবে কিছু মন্তব্য কবেন, শ্বশুব গম্ভীব মুখে দুই-একটা জ্ঞানেব কথা শুনিযেছেন। বড়শালা বা শালাব বউও দুই-একটা বিদ্রূপাত্মক কথা শোনাতে ছাড়েন না। তখনও ভিতবে ভিতবে ফুঁসতে থাকেন বমেনবাবু। কিন্তু তখন তাব কানে তুলো, পিঠে কুলো। তবু নিজে গেলেই যে সুমিত্রাকে আনা যেত এমন নয়, তবে তাতে কাজ হত। বাগেব মাত্রা অনুযায়ী একদিন বা দুদিন বা পাঁচদিন বাদে সুমিত্রা ফিবে আসতেন।

রমেনবাবুব মতো ঠাণ্ডা মানুষেব হঠাৎ-হঠাৎ ধৈর্যেব বাঁধ কেন ভাঙে সুমিত্রা সেটা কখনো বোঝেননি বা বুঝতে চেষ্টা কবেননি। তাব কাবণ বমেন চৌধুবী মানে এক সাধাবণ কনট্রাকটাবেব জীবনে তিনি দযা কবে পদার্পণ কবেছেন এবং নিজেব মর্যাদা অনুযাযী সেখানে নিবঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তাব কবে চলেছেন।

সুমিত্রাব বাবা এক মস্ত এঞ্জিনিয়াবিং ফার্মেব ম্যানেজিং ডাইবেক্টব এবং চাব আনাব মালিক। বড় অবস্থা। তেমনি চালচলন। আব রমেনবাবুব বাবা ছিলেন ওভাবসিযাব। নিজের উদ্যমে কনট্রাকটবি ব্যবসা ফেঁদে বসেছিলেন তিনি। বিশ্বস্ত মানুষ। সুমিত্রাব বাবা তাঁকে পছন্দ করতেন। অনেক কাজও দিতেন। বি.এ পাশ কবে বমেনবাবু আব চাকবিব চেষ্টায় না গিযে বাপেব ব্যবসাযে লেগে গেছলেন, আব নিজেব সততা আব পবিশ্রমেব ফলে অল্পদিনেব মধ্যে তিনিও সুমিত্রাব বাবাব সুনজবে এসে গেছলেন। বছর দুই-আড়াইযেব মধ্যে বমেনবাবুব বাবা মাবা গেলেন। আব সত্যি কথা বলতে কি, সুমিত্রাব বাবা তখন ওই উদ্যোগী ছেলেটা অর্থাৎ বনেমবাবুব প্রতি একটু বেশী উদাব হয়েছিলেন। কর্মঠ, বুদ্ধিমান ছেলে। কাছে ডেকে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন। কাজও আগেব থেকে আবও বেশীই দিযেছেন ক্রমশ। আব তাব ফলাফল দেখে খুশীই হয়েছেন।

—বমেনবাবুব তখন পঁচিশ বছর বয়েস। একটা চাপা প্রলোভন দুর্বার হয়ে উঠল। কাণ্ডজ্ঞান খুইযে একেবাবে মুখথুবড়ে পড়লেন। অর্থাৎ ম্যানেজিং ডাইবেক্টরের একমাত্র মেযে সুমিত্রাকে একখানা চিঠি লিখে বসলেন। তার চাব বছর আগে থেকে এ বাড়িতে

আনাগোনা। ওই মেয়েকে অনেকবার দেখেছেন। খুব যে রূপসী তা নয়, সুখের ঘরে ওটুকু রূপ অনেক মেয়েরই থাকে। কিন্তু তাঁকে দেখে দেখে রমেন চৌধুরীর পাগল হওয়ার দাখিল। সুমিত্রার তখন সবে উনিশ। কলেজে পড়ছেন। তাঁর দাদা বিলেতে। সেখানে তিনি এঞ্জিনিয়ারিং পড়ছেন। ভাবতে গেলে এই লোভ আকাশের চাঁদের দিকে হাত বাড়ানোর সামিল। কোন যুক্তির দিকে না গিয়ে দীর্ঘদিনের একটা যন্ত্রণার অবসান করে দেবার সংকল্পে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন তিনি।

—চিঠিতে চার বছরের স্বপ্ন আর সেই দুঃসহ যন্ত্রণার কথাই লিখেছিলেন। আর লিখেছিলেন, যদি এতটুকু আশা পান তাহলে মৃত্যু পণ করেও তিনি সুমিত্রার যোগ্য হয়ে উঠতে চেষ্টা করবেন।

স্বাস্থ্যবান সুঠাম এবং সশ্রী লোকটাকে চোখের কোণ দিয়ে সুমিত্রাও বহুবারই দেখেছেন। ও-রকম করে দেখা আর নিজেকে যাচাই করারই বয়েস সেটা। কিন্তু ঐ দেখা পর্যন্তই। বাবার আশ্রিতজনের প্রতি এতটুকু দুর্বল চিন্তার প্রশ্রয় ছিল না। তাই চিঠি পেয়ে সুমিত্রা প্রথমে স্তম্ভিত। এ দুঃসাহস ছাড়া আর কি? চিঠিটা বাবাকে দেখিয়ে একটা হেস্তনেস্ত করে ফেলার ইচ্ছে। কিন্তু লোকটার মুখখানা মনে পড়তে তখনকার মতো ইচ্ছেটা বাতিল করলেন। কেন যেন একটা গুরুতর শাস্তি মাথায় চাপিয়ে দিতে ইচ্ছে করল না। দরকার হলে ধৃষ্টতার জবাব নিজেই দিতে পারবেন। তাছাড়া বাবাকে যখন খুশী বলা যেতে পারে।

সেই বিকেলেই লোকটার দেখা পেলেন। তার খানিক আগেই বাবা বেরিয়েছেন। দূর থেকে তাকে দেখে সুমিত্রা ভুরু কোঁচকালেন। তারপর হন-হন করে সামনে এসে দাঁড়ালেন-- কাকে দরকার? বাবাকে না আমাকে?

—উনি তো একটু আগে বেরিয়ে গেলেন দেখলাম। আমতা-আমতা জবাব।

ঘুরিয়ে বলা হল তাকেই দরকার।

সুমিত্রার গলার স্বর এবারে ঝাঁঝালো।—চিঠির জবাব চাই?

—পেলে নিশ্চিন্ত হতাম।

—তাহলে একটু অপেক্ষা করতে হবে। বাবা ফিরলে চিঠি তার হাতে যাবে। তিনিই জবাব দেবেন।

রমেন চৌধুরী চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইলেন কয়েক পলক। ভীত চাউনি নয়— বিমর্ষ বললেন, তাতে আর লাভ কি। চিঠি পড়ে তিনি গলাধাক্কা দেবেন, আর তুমি না চাইলে আমি বরাবরকার মতো চলে যাবো। তোমার কাছ থেকে এটুকু সম্মান অন্তত দুষ্প্রাপ্য ভাবি নি।

—তুমি! তোমার! সত্যিকারের ঝলসেই উঠেছিলেন সুমিত্রা।

বিব্রত মুখে রমেন চৌধুরী বলেছিলেন, খুব অন্যায় হয়েছে।... নিজের মনে 'তুমি' 'তুমি' করে চার বছর এত কথা বলেছি যে ওটা আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

এ কথা শুনে ওই মুখ দেখে কেন যেন সুমিত্রা সেরকম জোরের সঙ্গে রাগ করে উঠতে পারেন নি। তবু তাঁর গলায় ব্যঙ্গ ঝরেছে। নিজেও তুমি করেই বলেছেন। —তাহলে তুমি আশা করছ, জবাবটা আমিই দিয়ে তোমাকে একটু সম্মানিত করব!

—হ্যাঁ।

—আব জবাব পেলে তুমি নিজে থেকেই বাবাকে ছেড়ে চলে যাবে!

—তা না গেলে নিজেব আত্মসম্মানে লাগবে।

—আব সেই জবাবটা যদি অত হৃদযবিদাবক না হয়, তাহলে বাবাব অনুগ্রহে থেকে আমার যোগ্য হতে চেষ্টা কববে! সুমিত্রাব গলাব স্বব একটুও নরম নয।

—তাঁব অনুগ্রহ ছাড়াই চেষ্টা করব। রমেন চৌধুবীব শান্ত জবাব।

সুমিত্রাব এবারে একটু মজাই লাগল।—বেশ, বাবাব অনুগ্রহ ছাড়া যোগ্য হতে পাবলে আমাব আপত্তি নেই। কিন্তু তাতে কত বছব লাগবে?

—ভবসা পেলে দু'বছবেব বেশী লাগবে বলে মনে হয় না।...আমাব বাবাব একটা জমি কেনাই ছিল, দু'বছরেব মধ্যে সেখানে তোমার পছন্দমতো একটা বাড়ি তুলতে পাবলে যোগ্যতাব পবীক্ষায তোমার যদি পাস-নম্বব দিতে আপত্তি না হয, তাহলে গড়গড় কবে আবো বড় পবীক্ষায উতবে যাওযা কঠিন হবে না।

প্রস্তাবে বৈচিত্র্য ছিল। মানুষটাব জোবেব দিক যাচাই কবাব লোভও হযেছিল। সুমিত্রা কথা দিয়েছিলেন, দু'বছব অপেক্ষা কববেন।

...শ্বশুববাড়িব আদবকাযদাব সঙ্গে কোনদিনও নিজেকে মেলানো সম্ভব হযনি বমেন চৌধুবীব। এই বকম অসম বিযেতে সুমিত্রাব বাবা-মাযেব এবং বিলেত-ফেবৎ এঞ্জিনিযব দাদার একটুও সায ছিল না। কিন্তু আদবকাযদা ভুলে কালচাবড মেযেব সিদ্ধান্তও সবাসবি কেউ বাতিল কবে দেননি। সুমিত্রা বিজযীব গলায মালা যেমন দিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে বাপেব বাড়ির আভিজাত্যেব ছটাও তেমনি পুবেপুবি সঙ্গে কবে নিযে এসেছিলেন। এদিক থেকে স্বামীটিকে উপযুক্ত কবে তোলা যেন একটা বড় দাযিত্ব তাঁব। গোড়ায গোড়ায মজাই পেতেন রমেনবাবু। পবে সন্তর্পণে শ্বশুববাড়িব সংস্রব এড়িযে চলতে চেষ্টা কবতেন। নিবলস প্রবল কর্মী পুরুষ তিনি, কিন্তু শ্বশুববাড়িব অন্য সকলের কথা বাদ দিযে সুমিত্রাবও এজন্যে তাঁর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা আছে মনে হত না। সুমিত্রার যা কিছু পবামর্শ সব তাঁব বাবা মা দাদাব সঙ্গে।

বমেনবাবু সহজে কিছু বলতেন না। আব যদি কখনো কিছু বলেন, সুমিত্রা সঙ্গে সঙ্গে টেনে ধবতেন—তুমি যা বোঝ না তা নিযে মাথা ঘামিও না।

এই থেকেই বিরোধেব সূচনা ক্রমশ। বছব না ঘুবতেই কোলে ছেলে এলো, সুমিত্রাব চোখে এও যেন মেহনতী মানুষেব বিবেচনার অভাব। সাফ জানিযে দিযেছেন, আব ছেলেপুলে নয। এই লোকেব প্রতি নির্ভর করতে না পেরে নিজেই তিনি সাবধান হয়েছেন। আব এই এক ছেলে সুমুও বড় হতে থাকল তাঁব মাযেব আব মামা-বাড়িব হেপাজতে থেকে। এ ব্যাপাবেও বমেনবাবুব বক্তব্য বা বিবেচনা কেউ গাযে মাখেন না।

কিন্তু ওপবওযালা শোধ নিচ্ছেন। ছেলেটা বাপের নেওটা, বাপেব কাছে আসতে পেলে মা বা মামাববাড়ির দিকে ঘেঁষতে চায় না। দু'-দুটো মাস্টার বাখা সত্ত্বেও স্কুলের পরীক্ষায় কোনদিন প্রথম দশজনেব মধ্যেও তার নাম দেখা যায় না। মা শাসন করতে গেলে ছেলে বাপের কাছে পালায়। ওকে নিযে স্বামী-স্ত্রীব মধ্যে ঝগড়া বেড়েই চলে। বাপ ছুটির দিনে বাগানের কাজে হাত দিলে ছেলে সোৎসাহে কোদাল দিযে মাটি

কোপায, জলনিকাশের নালা তৈরি করে। আর তাই দেখে মাযেব হাড়পিত্তি জ্বলে। সুমিত্রার মনেব তলায় সব থেকে বড় আশঙ্কা, ছেলেটা বাপেব মতো হযে উঠছে। এই আশঙ্কা চাপাও থাকে না সব সময়। তখন স্বামী-স্ত্রীতে তুমুল ঝগড়া অনিবার্য।

এঞ্জিনিযব দাদুব ইচ্ছে ছিল নাতি মস্ত ডাক্তার হোক। আর এঞ্জিনিযর মামাব ইচ্ছে ভাগনে বড় এঞ্জিনিযবই হোক। কিন্তু দু'দুটো বাছাই করা মাস্টার রাখা সত্ত্বেও সুমু সকলেব আশায ছাই দিযে হাযাবসেকেণ্ডাবিতে সেকেণ্ড ডিভিসনে পাস কবে বসল। এব ফলে সুমিত্রাব যত বাগ গিযে পড়ল ছেলেব বাপেব ওপর। আব বাপ বলল যা হযেছে হযেছে, কত ছেলে তো থার্ড ডিভিসনে পাশ কবে।

এই নিয়ে শেষে তুমুল বির্তক আব তাবপব সুমিত্রাব বাগ কবে বাপেরবাড়ি প্রস্থান। ইদানীং এই বাগারাগি আব প্রস্থান একটু ঘন-ঘনই হচ্ছিল।

বাবা আব ভাইযেব পবামর্শে সুমিত্রা এবপব ছেলেকে বি. এসসি অনার্স পড়ালো। উদ্দেশ্য, এতেও ভাল ফল হলে ডাক্তাব অথবা এঞ্জিনিযাব কিছু একটা হওয়া সম্ভব। অনেক টাকা মাইনে গুনে গোড়া থেকে দু'জন প্রোফেসার বাখা হল। পড়াশোনাব ব্যাপারে সুমিত্রা এবাব ছেলেব ওপরেও নির্মম। কিন্তু বি. এসসিব ফল বেরুতে এবাবেও সুমিত্রাব মাথায বজ্রাঘাত। ছেলে অনার্সই পায় নি. পাস কোর্সে পাস কবেছে।

পাঁচ মাস আগেব সেই মর্মান্তিক ব্যাপারটা ঘটে গেল এই নিযে। দোষের মধ্যে হেসে হেসে বমেনবাবু বলেছিলেন, অনেক তো দেখলে, এবারে ছেলেটাকে বেহাই দিয়ে আমাব হাতে ছেড়ে দাও। আমাব সঙ্গে বেবোক, কাজকর্ম শিখুক—ভালোই কববে।

শুনেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন সুমিত্রা।—ওব ভবিষ্যৎ নিযে কেউ তোমাকে মাথা ঘামাতে বলেনি. তুমি কুলিমজুব ঠেঙাচ্ছো ঠেঙাও—

বমেনবাবুও সশ্লেষে বলে উঠেছেন, আমাকেও তুমি একটু বড়গোছেব কুলিমজুবই ভাবো জানি—আব ঠিকই জানো, আমাব ছেলে ওই কুলিমজুবেব কাজটাই ভালো পাববে। আব তাতে লজ্জাবও কিছু নেই, সেটা মগজে একটু বুদ্ধি থাকলে এত দিনে বুঝতে। তোমাব বাবা আব দাদা শুনলাম এবাবে সুমুকে চার্টার্ড আকাউনটেন্সি পড়াতে বলেছে আব তুমিও তাই শুনে নাচছ—কিন্তু আমাব কাছে শুনে বাখো তাতে ভস্মে ঘি ঢালা হবে—আব কিছু হবে না।

সুমিত্রাব খবখবে দু'চোখ তাঁব মুখেব ওপব স্থিব খানিকক্ষণ।—অভদ্রেব মতো চেঁচিও না, সুমুর ব্যাপাবে কেউ তোমাব পবামর্শ চাযনি।

রমেনবাবু আবো উগ্র।—কেন কেউ চায নি? কেন তুমি চাও নি?

—তোমার সে যোগ্যতা আছে ভাবি না।

—সেটা ভাবতে হলে নিজেবও কিছু যোগ্যতা থাকাব দবকার। ভাববে কি কবে, বক্ত-জল-কবা টাকা মুঠো মুঠো খরচা করতে পেলে তোমাব মতো কালচাবের ছটা সকলেই দেখাতে পারে—বুঝলে?

বাগে মুখ সাদা সুমিত্রার।—আবাব বলছি, ছোটলোকেব মতো চেঁচিও না। এই কালচাবের পিছনেই হাতজোড় করে ছুটেছিলে একদিন—

ছোটলোক শুনে মাথায় রক্ত উঠল বমেনবাবুর।—আমি সত্যিকারেব গাধা বলেই এমন ভুল করেছিলাম, এখন সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।

খাটেব বাজু ধরে নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করলেন সুমিত্রা।— এখন সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পাবছ?

—স্বামীকে ছোটলোক বলার পরেও বুঝতে পারা উচিত নয় ভাবছ?

—ঠিক আছে। বুঝতে যখন পেবেছ, আমাব ব্যবস্থা আমি এখনো করব— ছেলে সি. এ. পড়বে কি পডবে না!

—পডবে না, পডবে না। রমেনবাবু এতকালের সব আক্রোশ উজাড কবে দিতে চাইলেন।—আমার মতো ছোটলোকেব ছেলে আমাব মতোই ছোটলোক হবে। তোমাব বাবা-মাকে গিযে বলো, তাঁদের ঘরেব নাতি-নাতনীকে এক-একখানা কবে হীবে-জহবত বানাতে—আমাব ছেলেব দিকে তাকাতে হবে না।

সুমিত্রা শেষবারের মতোই যেন দেখে নিলেন তাঁকে। তাবপর বললেন, তোমাব ছেলেও আব তাহলে তোমাব ছেলে থাকবে না।

ছেলেকে নিযে সুমিত্রা বাপেববাড়ি চলে গেলেন। সুমুব যাবাব ইচ্ছে থাকুক আব না থাকুক, মাব অবাধ্য হবাব সাহস নেই। এবারে যাওযাটা অন্যান্য বাবের যাওয়াব মতো নয় বমেনবাবু সেটা অনুভব কবেও চুপ একেবাবে। তাঁব গোঁ চেপে গেছে। শ্বশুবের প্রথম চিঠি পেযে আবও তেঁতে উঠেছিলেন। মেযেব কাছে তাকে মাপ চাইতে বলা হযেছে। দ্বিতীয় চিঠিতে ডিভোর্সের হুমকি— সে চিঠির জবাব বমেনবাবু দিযেছেন। আব তাবপব থেকে শেষ ফযেসলাব জন্যেই প্রস্তুত হতে চেষ্টা কবছেন।

কিন্তু বুকেব ভিতবটা খালি-খালি লাগে। তাব ফলে নবম হবাব বদলে নিজেব ওপবেই ক্রুদ্ধ হযে ওঠেন তিনি।

পাঁচ মাস বাদে এই সকালে আচমকা পট পবিবর্তন। ছেলেকে নিযে সুমিত্রা নিজে থেকে ফিবে এসেছেন। শুধু তাই নয়, ছেলেব প্রতি মাযেব নির্দেশ, এবাব থেকে সে বাপের সঙ্গে বেবোবে, তাঁব কাছে কাজ শিখবে।

বঘুব সঙ্গে সুমিত্রাও রান্নায হাত লাগিযেছেন আজ। সেই ফাঁকে সুমুকে আবাব কাছে ডাকলেন বমেনবাবু। চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপাব বে, তোব মাযেব হঠাৎ এবকম মত বদলালো কেন?

শুনে ছেলে প্রথমে হাসতে লাগল। তাবপব বলল, মা আমাকে কিছু বলেন নি, কিন্তু আমি জানি কেন বদলালো।

—কেন? রমেনবাবু আরো উদগ্রীব।

চাপা আনন্দে সুমু এবাবে যে চিত্রটি তাঁর সামনে তুলে ধবল, বমেনবাবব মুখে আব কথা সবে না। দু'কান ভরে শোনার মতোই বটে।

...মাযেব মেজাজ খারাপ, সুমুর দাদু তাই সকলকে নিয়ে মাদ্রাজে বেড়াতে গেছলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে ধীরেসুস্থে ডিভোর্সেব মামলার ব্যবস্থা করার কথা। সুমুর মামাও দাদুর দিকে।

...মাদ্রাজে মস্ত সফট ড্রিংক-এব বেস্তোবাঁ আছে। সকলে সেটাকে শেঠজীব 'ঠাণ্ডা ঘব' বলে। বিবাট ব্যাপাব। বড বড লোকেরা গাডি হাঁকিযে আসে সেখানে। বিকেল পাঁচটা থেকে বাত দশটা পর্যন্ত জমজমাট ব্যাপাব। দিশী বিলিতি যাবতীয় কোল্ড ড্রিংক-এব বিশাল এযারকনডিশন বেস্তোরাঁ। কত বেয়ারা আব বয় খাটছে ঠিক নেই।

সুমুবা দল বেঁধে সেই কোল্ড ড্রিংক-এব বেস্তোবাঁয় তিন-চাব দিন গেছে। ঠাণ্ডা ঘরের মালিক আধবয়েসী শেঠজীকে মারসিদিস গাড়ি থেকে নামতে দেখেছে। কিন্তু সুমুবা তাঁব ওপব মনে মনে খুশী নয তেমন। গদিতে বসে শ্যেনদৃষ্টি মেলে সকলেব কাজেব তৎপবতা দেখেন, খদ্দেবকে খুশী করাব ব্যাপাবে বয বা বেযাবাদেব এতটুকু ত্রুটি দেখলে তাকে কাছে ডেকে চাপাগলায় বেশ কবে ধমকে দেন।

এদেব মধ্যে একটি 'বয' সকলেব দৃষ্টি কেড়েছিল। বছব তেব-চৌদ্দ বযেস। ফুটফুটে গাযেব বং-ভাবী মিষ্টি চেহাবা। একমাথা কোঁকড়া চুল। ডাগব চোখ। ছেলেটা যেন সাবাক্ষণ উৎসাহ আব উদ্দীপনায ফুটছে। খদ্দেব দেখলেই ছুটে যাচ্ছে, ছাপা মেনু কার্ড সামনে বেখে যাচ্ছে। খদ্দেব জিজ্ঞাসা কবলে কোন ড্রিংক-এব কি বৈশিষ্ট্য গড গড কবে বলে যাচ্ছে। প্রথম দিন কি নেবে সুমুবা ঠিক কবে উঠতে পাবছিল না বলে ছেলেটা মিষ্টি গলায সুমিত্রাকে বলল, চকোলেট দেওযা ক্রিম মিলক শেক সিন ম্যাডাম, আমি বলছি ভালো লাগবে।

চার্ট দেখে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা কবলেন, প্লেন পাইনঅ্যাপেল মিলক শেক-এব থেকে দাম বেশী কেন?

সোৎসাহে ছেলেটা বোঝালো কেন দাম বেশী। একটা ইলেকট্রিকে তৈবী হয, অন্যটা হাতেব কাজ। এতে বিস্ক বেশী, মেহনত বেশী। গড গড কবে আবো কত কি বলে গেল ঠিক নেই।

সমস্ত বেস্তোবাঁয ওই একটা ছেলে যেন ফুলেব মতো মিষ্টি সৌবভ ছড়িযে বেড়াচ্ছে। সকলে তাকে ডাকে, সকলে তাব সঙ্গে কথা বলতে চায। ফলে ছেলেটাব ছোটাছুটিব বিরাম নেই। অমন সুন্দব ছেলেটা যেন এই কাজে নিজেকে উৎসর্গ কবেছে।

সুমুব মামী আবাব একটু-আধটু গল্প-টল্প লেখেন। তাঁব ধাবণা, বড দুঃখেব জীবন নিশ্চয় ছেলেটাব। ভদ্রঘবেব ছেলে যে তাতেও সন্দেহ নেই। অভাবেব দাযে হযতো অসুস্থ বাপ-মা এই বযসেব এমন ছেলেকে এমন কাজে ঠেলে দিযেছে।

সেদিন বাত সাড়ে দশটায সুমুবা সকলে মিলে সেই ঠাণ্ডাঘবে গেছল।

খদ্দেবেব ভীড তখন বেশ হালকা। এবাবে দোকান বন্ধ হবাব কথা। তাদের দেখে সেই ছেলেটা ছুটে এল। এই ক'দিন তার সঙ্গে বেশ ভাব হযে গেছে। কিন্তু গল্প কবার সময ছেলেটা পায না, ছেলেটা তখন দস্তুরমতো ক্লান্ত, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম— তবু হাসি মুখ।

তাকে দেখে সুমিত্রার বাবা মা দাদা বৌদি সকলের মাযা হল। আর বাগ হল দোকানেব মালিক ওই শেঠজীব ওপব। দোকান বন্ধেব আগে গদিতে বসে তখন কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা গুনছে। এদেব রক্ত-জল-কবা পবিশ্রমের ষোল আনা ওই লোকটাই শুষে নিচ্ছে। এরা হযতো দু'বেলা ভালো কবে খেতেও পায না, আর ওই নিষ্ঠুর মালিক

মাবসিদিস হাঁকিযে বেডাচ্ছে।

ছেলেটাব নাম শঙ্কব। সেই বাতে সুমিত্রা তাকে এক গেলাস কোল্ড ড্রিংক খাওযাতে চেষ্টা কবলেন, কিন্তু ছেলেটা একবাব দূবেব মালিকেব দিকে চেযে হাসিমুখেই মাথা নাডল। অর্থাৎ এখন খাবে না। পাছে ছেলেটাব কাজেব ক্ষতি হয, সেজন্য কেউ আব তাকে পীডাপীডি কবল না। কাজেব ক্ষতি হলেই তো ওই অকৰুণ মালিকেব কাছে বকুনি খাবে। সুমিত্রা জিজ্ঞাসা কবলেন, আজও তুমি সেই বিকেল সাডে পাঁচটায এসেছ ?

—না, আমি পাঁচটায আসি। আধ ঘণ্টা আগে এসে সব দেখেশুনে নিতে হয।

সুমিত্রা জিজ্ঞাসা কবলেন, সকাল থেকে পাঁচটা পর্যন্ত কি কবো ?

—সকালে বাডিতে পডি, তাবপব স্কুলে যাই— তাবপব বিকেলে খেযেদেযে দোকানে আসি।

—বোজ ?

—বোজ।

সুমিত্রাব বউদি জিজ্ঞাসা কবলেন, বাডিতে তোমাব কে আছেন ?

—সবাই আছে।

—বাবা-মা ?

ছেলেটা মাথা নাডল। অর্থাৎ আছে। তাবপব মিষ্টি হেসে বলল, আমাব ভাইবোন দুটো ছোট তো, তাই মা আব দোকানে আসতে পাবে না। তাবপব সকলকে হতবাক কবে দিযে অদূবে গদিতে বসা দোকানেব মালিক শেঠজীকে দেখিযে বলল, ওই তো আমাব বাবা, দোকান বন্ধ হলে বাবাব সঙ্গেই আমি বাডি ফিবি। তাবপব লজ্জা-লজ্জা মুখ কবে বলল, বাবা বুডো হেযে গেলে আমাকেই তো এত বড দোকানখানা চালাতে হবে, তাই বোজ বিকেলে বাবা আমাকে সঙ্গে কবে নিযে আসে আব সেই বাতে একেবাবে দোকান বন্ধ কবে' একসঙ্গে বাডি যাই।. আমাব খুব ভালো লাগে। আব বাবা যখন নিজে কডা খদ্দেব সেজে টেবিলে বসে আমাকে সার্ভ কবতে বলে আব গম্ভীব মুখে মিথ্যে মিথ্যে দোষ বাব কবতে থাকে, তখন কি মজা লাগে না। আমাব কিন্তু তখনো হাসাব উপায নেই, সত্যিকাবেব খদ্দেবেব মতোই তাকে বুঝিযে ঠাণ্ডা কবতে হয।

সুমুব শেষ কথায সম্বিত ফিবল যেন বমেনবাবুব। সুমু বলছে, ছেলেটাব সেই মিষ্টি মিষ্টি হাসি দেখে আব মিষ্টি কথা শুনে মাযেব মুখখানা যা হযে গেল না—তুমি বিশ্বাস কবতে পাববে না বাবা।

তাবপব বাডি এসেই আমাব ওপব ওই হুকুম। শুনে দাদু আব দিদা বাগ কবলে, কিন্তু মা আব কোন কথায কানও দিল না। তাবপব আজ হাওডা স্টেশানে, পা দিযেই আমাকে নিযে সোজা এখানে চলে এলো।

সুমিত্রা ঘবে ঢুকতেই ছেলে আব বাবা সচকিত। মাযেব সঙ্গে চোখাচোখি হতে সুমু যেন ধবাই পডে গেল। লজ্জা পেযে তক্ষুনি প্রস্থান কবল।

বমেনবাবু সুমিত্রাব দিকে চেযে আছেন। সুমিত্রা তাঁব দিকে।

...বাইশ বছব বাদে দু'জনে দু'জনকে নতুন কবে দেখছেন।

তপ

মহিলাকে প্রথম দিন দেখেই মনে হয়েছিল, গল্প আছে।

কথাটা সুবল মিশ্রকে বলেছিলাম। সুবল মিশ্রর দেশ উড়িষ্যায়, বিদ্যালাভ পশ্চিম বাংলায় তথা কলকাতায়, কর্মস্থল এই সুদূর ব্রহ্মপুত্রের দেশে। আমার সঙ্গে আলাপ এবং হৃদ্যতা ছাত্রজীবন থেকে। একই হস্টেলে একই ঘরে থাকতুম। এখন সে পয়সাঅলা লোক, চা-চালানের কারবারী। বছরে বার পাঁচেক কলকাতায় আসে। তাই যোগাযোগ আছে। আগে সে নিজে থাকত উড়িষ্যায়, তার কর্মচারী থাকত আসামে। বছর তিনেক হল নানা কারণে সে নিজেই আসামে স্থায়ী প্রবাসী হয়েছে।

সম্প্রতি আমি তার অতিথি।

তার ডেরা থেকে দু' মাইল দূরে মাতৃকুটীরের মায়ের প্রসঙ্গে আমার ওই উক্তি যে তার কাছে এমন কৌতুকের ব্যাপার হবে জানতাম না। দু'দিন বাদে আবার যখন তাকে সঙ্গে করে এলাম মহিলার কাছে, তখন সে একঘর লোকের সামনেই আমাকে নাজেহাল করল। বলল, মা ভালো ডাক্তার, শুনেছি বাতাস টেনে রোগের গন্ধ পায়, আমাদের সাহিত্যিকও তেমনি আপনাকে দেখেই গল্পের গন্ধ পেয়েছে। সেদিন আপনাকে দেখে গিয়ে বলছিল, গল্প আছে।

ঘরে আমার অপরিচিত যে ক'জন ছিল সুবল মিশ্রর সঙ্গে গলা মিলিয়ে তারা হেসে উঠল। ঘরে মা অর্থাৎ মহিলার কৃতী ছেলে আর ছেলের বউ ছিলেন। ছেলে আমাদেরই বয়সী। আগের দিনের আলাপে তাঁকে স্বল্পভাষী মনে হয়েছিল। সুবল মিশ্রর কাছে শুনেছি মহানন্দ ঘোষ অর্থাৎ ওই ছেলে কলকাতার নাম-করা ব্যারিস্টারদের একজন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে বছরে দু'বার মায়ের কাছে আসেন—পুজোর ছুটিতে আর গরমের ছুটিতে। মায়ের ছেলে-অন্ত প্রাণ, কিন্তু এ-জায়গা ছেড়ে তিনি নড়তে চান না। তাই ছেলেকেই ছুটে আসতে হয়। সুবল মিশ্র শুনেছে, এখানে বছর পনের আগেও ছোট পড়ো বাড়ি ছিল একটা। জায়গাটা এখনই নির্জন, এর থেকে অনেক বেশি ফাকা ছিল তখন। দেখতে দেখতে ছেলের পসার হয়েছে, উপার্জনের টাকা দিয়ে প্রথমেই তিনি এই ছিমছাম বাংলো প্যাটার্নের মাতৃকুটীর স্থাপন করেছেন। শোনা যায় সেই পড়ো বাড়িতে সকন্যা এক বৃদ্ধ থাকতেন। সে প্রায় তিন যুগ আগের কথা।

শুধু মাতৃকুটীর স্থাপন নয়, সুবল মিশ্রর মুখে শুনেছি মাতৃভক্ত এই ব্যারিস্টার ছেলে মায়ের নির্দেশে এখানকার গরিবদের হাসপাতালে কত টাকা দিয়েছেন আর ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় গ্রাম থেকে মানুষ বাঁচানোর জন্য কত সময় কত টাকা ঢেলেছেন ঠিক নেই।

শুনে ভালো লেগেছিল। তবু প্রথম দিনের আলাপে ভদ্রলোকের বাকসংযম কিছুটা কৃত্রিম মনে হয়েছিল আমার। ওটুকু পয়সাঅলা নাম-করা ব্যারিস্টারের মর্যাদার সঙ্গে যুক্ত ধরে নিয়েছিলাম। আর মনে হয়েছিল, চেহারাখানা ভদ্রলোকের এখনো বহুজনের মধ্যে চোখে পড়ার মতই নিখুঁত সুন্দর, সেই কারণেও হয়ত একটু সচেতন এবং মিতভাষী।

হাটে হাঁড়ি ভাঙাব মত কবে সুবল মিশ্র মাযেব প্রসঙ্গে আমাব মন্তব্য ফাঁস কবাব সঙ্গে সঙ্গে আজ এই নামী ব্যাবিস্টাব ভদ্রলোকেব দৃষ্টিটা যেন আমাব মুখেব ওপব থমকাতে দেখলাম কযেক মুহূর্ত। শুধু তাই নয়, তাঁব স্ত্রীটিব চোখেমুখেও নীবব চাপা বিস্ময দেখা গেল। আব এই কাবণেই আমাব আবাবও মনে হল, গল্প আছে।

মা হাসছেন মিটি মিটি। ষাটেব কাছাকাছি বযেস এখন। বযেসকালে বেশ সুশ্রী ছিলেন বোঝা যায। হাসিটুকু আবো কমনীয। তাব ওপব বুদ্ধিব ছাপ।

ঘবে আব যাবা ছিল তাব বেশিব ভাগই ওষুধপ্রার্থী। কেউ ওষুধ নেবে, কাবো বা পুবনো ওষুধ ফুবিযেছে, এখন কি কববে জিজ্ঞাসা। মা একে একে তাদেব বিদায কবলেন, কাউকে ওষুধ দিলেন, কাউকে বা বললেন, অনেক ওষুধ খেযেছ আব কাজ নেই। সুবল মিশ্র বলে, মা পাকা হোমিওপ্যাথি ডাক্তাব। আগে যাদেব পযসা জুটত না তাবাই শুধু চিকিৎসাব জন্যে মাযেব কাছে এসে জুটত। অনেকেব অনেক কঠিন ব্যামোও মাযেব ওষুধে ভালো হযেছে নাকি। ওষুধে ভালো হযেছে কি মাযেব কোন বকম দৈবশক্তি আছে সেই বিশ্বাসে—বলা শক্ত। প্রচাবেব ভাব তাবাই নিযেছে। অনেক দূব থেকেও হামেশাই বোগী আসে এখন। আব শুধু অভাবী লোকই আসে না, পযসাঅলা লোকও অনেক আসে। এ সব ব্যাপাবে বিশ্বাস বস্তুটা বোগেব মতই সংক্রামক বলা যেতে পাবে।

মা ডাক্তাব কেমন জানি না, কিন্তু বীতিমত শিক্ষিত যে তাতে সন্দেহ নেই। এই বসাব ঘবেই একটা আলমাবি হোমিওপ্যাথি সংক্রান্ত নানা বকম বিদেশী বইযে ঠাসা। কোথাও কোনো নতুন বই আব ভালো বইযেব সন্ধান পেলেই তিনি ছেলেকে লেখেন আব ছেলে দেশ থেকে হোক বা বিদেশ থেকে হোক সে-বই সংগ্রহ কবে মাকে পাঠাবেন। সবসময লিখতেও হয না, ছেলে নিজে থেকেও কোনো নতুন বইযেব সন্ধান পেলে মাযেব জন্য কিনে ফেলেন। সুবল মিশ্র ঘণ্টাব পব ঘণ্টা বসে মাকে এ-সব বই পড়তে দেখেছে—পড়ে পড়ে দাগ দিতে দেখেছে।

মহিলাকে প্রথম দিনই আমাব ভালো লেগেছিল। সকলেবই লাগে শুনি। তাব হাসিমাখা চোখ দু'টিতে সকলেব জন্যেই যেন স্নেহ সঞ্চিত। কথাবার্তা স্বচ্ছ, স্পষ্ট। বড়লোকেব স্ত্রী ছিলেন নাকি, আব মস্ত বড়লোকেব মা তো বটেই। তাঁব এ-বকম অনাড়ম্বব জীবনযাত্রা মানুষকে কাছে টানবে তা আব বিচিত্র কি। ছুটি ফুবোলে ছেলে যখন সপবিবাবে কলকাতা যেবেন তখনো তাব মাযেব জন্য দুশ্চিন্তাব কাবণ নেই। তাব মা এই তিন চাব মাইল জোড়া গোটা এলাকাব অজস্র লোকেব মা। বাড়িতেও বাবোমাস ক'টি দবিদ্র ছেলে থাকে। তাছাড়া কাজকর্ম কবাব লোকজন তো আছেই।

মহিলা বিধবা। কোবা বা এমনি সাদা থান পবেন না কখনো। সর্বদাই তসবেব বা মুগোব থান পবেন। এও সুবল মিশ্রব মুখে শোনা। কতজনে কত দামী তাঁতেব থান এনে মাকে প্রণাম কবে যায। মা সে-সব গবিব দুঃখী বিধবাদের চুপিচুপি বিলিযে দেন। এমনি থান পবতে দেখলেই নাকি তাঁব ছেলেব মুখ ভাব হয। অতএব ছেলেব যেভাবে মাকে সাজিযে আনন্দ সেইভাবেই সাজেন তিনি।

ছেলের এই পছন্দের সঙ্গে আমি নিজেও দ্বিমত হতে পারিনি। সত্যিই এই বেশে ভারি সুন্দর দেখায় তাঁকে। সামনে এলে প্রথমেই মনে হয় না তিনি বিধবা। শুচিস্নিগ্ধ এই বেশ দেখলে দৃষ্টি প্রসন্ন হয়।

ওষুধপ্রার্থী আর উপদেশপ্রার্থীদের বিদায় দিয়ে তিনি আমার দিকে ফিরলেন। সকৌতুকে নিরীক্ষণ করলেন একটু। তারপর বললেন, হ্যাঁ, আছে তো গল্প, তুমি লিখবে?

আমি অপ্রস্তুত। সুবল মিশ্রর পুলকিত বদন। নামী ব্যারিস্টার ছেলের মুখে বিড়ম্বনা গোপনের প্রয়াস। তাঁর স্ত্রীর মুখে কৌতুকব্যঞ্জনা।

মা আবার বললেন, সেদিন তুমি চলে যাবার পর বউমা বলছিল, লেখক হিসেবে তোমার নাকি খুব নাম-ডাক, তোমার অনেক গল্প-উপন্যাস ওর পড়া। এখন তো দেখছি ও ঠিকই প্রশংসা করছিল, দিব্বি চোখ আছে—গল্প যে আছে সেদিন একঘন্টা এখানে বসেই তুমি বুঝলে কি করে?

তামাসা করছেন কিনা বোঝা গেল না, কারণ সুবল মিশ্রর মুখে মহিলাটির হাসি-কৌতুকের গল্পও শোনা আছে। বললাম, আর লজ্জা দেবেন না।

তিনিও হেসে উঠলেন, লজ্জা কি, অনুভব করার মত চোখ আর মন আছে বলেই ধরে ফেলেছ—উল্টে বাহাদুরীর কথা তো। হাসিমুখে তিনি ছেলের বউয়ের দিকে তাকালেন একবার, তারপর আবার বললেন, ওই বউমাকে যদি ভালোমত ধরতে পারো, একটা গল্প পেয়েও যেতে পারো—তবে তোমাকে খুব সাবধানে লিখতে হবে, ও গল্প লিখতে না পারুক বাড়িয়ে বলতে ওস্তাদ।

ছেলের বউয়ের নাম ঊর্মিলা। বছর সাঁইতিরিশ-আটতিরিশ হবে বয়েস। ইনিও মন্দ সুশ্রী নন, তবে তাঁর রূপবান স্বামীটির তুলনায় কিছুই নয়। কিন্তু ভদ্রলোকের তুলনায় অনেক বেশি হাসিখুশী। এই গুণেরও একটা রূপ আছে। শাশুড়ীর কথায় লজ্জা পেলেন হয়ত, কিন্তু ঠিক দেখলাম কিনা জানি না, তার দিকে চেয়ে একটা চাপা উদ্দীপনার আভাসও চোখে পড়ল যেন।

মায়ের হাসিমাখা দৃষ্টি এবারে ছেলের মুখখানা চড়াও করেছে।—ও কি। তোর মুখ অত গম্ভীর কেন? পাছে মায়ের ঠুনকো মর্যাদায় ঘা পড়ে সেই ভয়ে বুঝি?

এবারে ছেলে অপ্রস্তুত। হেসেই জবাব দিলেন, তোমার মর্যাদায় ঘা দিতে হলে একে কলম ছেড়ে অন্য কিছু ধরতে হবে।

মা-টি ছদ্মগাম্ভীর্যে তক্ষুনি আমার দিকে ফিরলেন, থাক বাবা, তোমার লিখে কাজ নেই, কোর্টে কাড়ি কাড়ি মিথ্যের ব্যবসা করে তো ও আগে থাকতেই ওর বউকে চাটুর রাস্তায় চালাতে চাইছে, আর কানাকড়িও সত্যি পাবে না তুমি—এর পর বউমা বলে যদি কিছু, আমার কাছে যাচাই করে নিও।

ফেরবার পথে সুবল মিশ্র বলল, আমার কেমন মনে হচ্ছে, তুমি ঠিকই ধরেছ —মায়ের জীবনে কিছু একটা ব্যাপার আছে।

—মনে হচ্ছে কেন?

—মাযেব কথা শুনে আব ওই ছেলে আব ছেলেব বউযেব হাবভাব দেখে।

একটু বাদে নিজে থেকেই জানালো, মাকে এখানে স্কুলে সক্কলে ভালবাসে, ভক্তি কবে, আপদে-বিপদে ছুটে আসে তাঁব কাছে। মাযেব সর্বদাই হাসিমুখ আব সর্বদাই কিছু না কিছু কাজে ব্যস্ত। বিশেষ কবে ছেলে, ছেলেব বউ, নাতি-নাতনী এলে তো কথাই নেই। যত হাসিখুশী ততো ব্যস্ত।...কিন্তু একদিন মাযেব সে-এক অদ্ভুত মূর্তি দেখেছিল সুবল মিশ্র। কাব মুখে শুনেছিল, মাযেব একটু জ্বব-ভাব হযেছে। কিন্তু সমস্ত দিন দেখতে যাওযাব ফুবসত মেলেনি। সময হল বাত আটটাব পবে। শীতকাল তখন। ঘবেব মধ্যেই হাড়ে-হাড়ে ঠোকাঠুকি, নেহাত দাযে না ঠেকলে বাইবে কেউ বেবোয না। কিন্তু সুবলেব ভিতবটা কেমন খুঁতখুঁত কবতে লাগল। তাব পবদিনই বড লেন-দেনেব ব্যাপাব আছে একটা। এব মধ্যে মাযেব শবীব খাবাপ শুনেও যাওযা হল না বলে খুঁতখুতুনি আবো বেড়েই গেল। শেষে আপাদমস্তক গবম পোশাকে নিজেকে মুড়ে সাইকেল আব টর্চ নিযে বেবিযেই পডল সে। মা যদি ঘুমিযে পড়ে থাকেন, খববটা তো নিযে আসতে পাববে।

কিন্তু গিযে দেখে, বাড়িতে যাবা থাকে তাবাই ঘুমুচ্ছে—বাইবেব ঘবে কম্বল মুড়ি দিযে একজন চাকব বসে। চাকবটা জানালো, মা তখনো পূজোব ঘব থেকে বেবোননি।

কি খেযাল হল, পাযে পাযে সুবল ভিতবে ঢুকল। মাযেব বাড়িতে অন্দবমহল বলে কিছু নেই। ভিতবে আগেও দুই একবাব এসেছে। পূজোব ঘবেব দবজাব এক পাট খোলা। গিযে যে দৃশ্য দেখল ভোলবাব নয। গোবিন্দজীব বিগ্রহেব সামনে মা দু'হাত জোড কবে দাঁড়িযে আছেন। চোখ বোজা। সেই হাডকাঁপানো শীতে মাযেব গাযে একটা গবম জামা বা চাদব পর্যন্ত নেই। তসবেব থানেব আচলটা শুধু গাযে জড়ানো। কিন্তু মা যেন পাথবেব মূর্তি। একটু কাঁপছেন না, একটু নডছেন না—নিঃশ্বাস প্রশ্বাসও নিচ্ছেন কিনা খুব ভালো কবে লক্ষ্য না কবলে বোঝা যায না। সেই পাথবেব মর্তিব দুই গাল বেযে অজস্রধাবে ধাবা নেমেছে।

হতবুদ্ধিব মত কতক্ষণ দাঁড়িযেছিল সুবল মিশ্র খেযাল ছিল না। কম কবে আধঘন্টা হবে। ঠায দাঁড়িযে সেই এক দৃশ্য দেখেছে সে। মাযেব সমস্ত দেহে কোনো অনুভূতিব লেশমাত্র নেই। কেবল ওই নীবব নিঃশব্দ কান্না ছাড়া। কেঁদে কেঁদে মা বুঝি নিজেকে নিঃশেষে ক্ষয না কবা পর্যন্ত ওমনি চোখ বুজে হাত জোড কবে গোবিন্দজীব সামনে দাঁড়িযেই থাকবেন।

যেমন এসেছিল সুবল মিশ্র তেমনি নিঃশব্দেই ফিবে গেছে।

মাতৃকুটীতে আমাব আনাগোনা নৈমিত্তিক হযে দাঁড়াল।

মাযেব সঙ্গে কথা হয। তিনি ব্যস্ত থাকলে ব্যাবিস্টাব মহানন্দ ঘোষেব সঙ্গে গল্প কবি। তাঁব স্ত্রী উর্মিলাব সঙ্গে কথাবার্তা গল্পগুজব আবো বেশি হয। মা তাও এক এক সময লক্ষ্য কবেন আব মুখ টিপে হাসেন। কখনো বা জিজ্ঞাসা করেন, তোমাব গল্প কতদূব এগোলো?

গল্প এগোচ্ছে কিনা সেটা আমি জানি আব উর্মিলা জানেন। একজনেব জানাব

আগ্রহেব সঙ্গে আর একজনেব জানানোর আগ্রহ মিলেছে। কিন্তু সোজাসুজি আমি তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা কবি না, তিনিও সরাসবি কিছু বলেন না। এই জানা আব জানানোর মধ্যে কখনো স্পষ্ট কখনো অস্পষ্ট অথচ অনায়াসে একটা লুকোচুরি খেলা চলেছে যেন। কথাপ্রসঙ্গে কথা ওঠে, যেটুকু বললে চলে, তিনি হয়ত তাব থেকে একটু বেশি বলেন। আব যেটুকু শুনলে কৌতূহল মেটে, আমি তাব থেকে একটু বেশি শুনতে চাই।

মাকে নিযে সত্যিই কিছু লেখা হবে কিনা ঊর্মিলা নিঃসংশয নন। কিন্তু আগ্রহ যে তাঁবই সব থেকে বেশি সেটা সহজেই বোঝা যায। কথাব মাঝে থমকে সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কবেন, সত্যিই আপনি লিখবেন নাকি কিছু?

মৃদু হেসে ব্যাবিস্টাব সাহেব আমাকে সতর্ক কবেছেন, লিখতে গিযে আপনি না মশায ফ্যাসাদে পড়ে যান, মাকে যিনি চেনাচ্ছেন আপনাকে, তিনি নিজেই কিন্তু অন্ধ—

ঊর্মিলা হাসিমুখেই বাগ কবেছেন, বেশ, তুমিই তাহলে ভদ্রলোককে সাহায্য কবো না একটু, মা তো পাবমিশন দিযেইছেন।

হাসিব মধ্যে মহানন্দ ঘোষকে অন্যমনস্ক হতে দেখেছি। একটু চুপ কবে থেকে বলেছেন, মানুষেব ভিতবটা বড বিচিত্র ব্যাপাব, কখন কোন ছোঁযা লেগে কি কাণ্ড যে ঘটে যায!...আমাব এই মাকে দেখা, আকাশ দেখাব মতই সহজ, কিন্তু চেনা বড কঠিন। কথা ক'টা বলেই আত্মস্থ হযে হেসেছেন আবাব, বলেছেন, জোডা অন্ধেব হাতে পডাব থেকে এক অন্ধেব হাতে পডাই নিবাপদ আপনাব পক্ষে।

তবু কথাপ্রসঙ্গে হোক বা জ্ঞাতসাবেই হোক, সাহায্য তিনিও কবেছেন আমাকে। যেটুকু আমি পেযেছি তাই দুর্লভ মনে হযেছে।

ছুটি ফুবোতে ব্যাবিস্টাব সাহেব সপবিবাবে কলকাতা বওনা হয়ে গেলেন। আমাব আবো আগেই ফেবাব কথা ছিল। শিগগীবই ফিবব শুনে তাঁবাও সাগ্রহে আমাকে তাঁদেব সঙ্গী হবাব আমন্ত্রণ জানিযেছিলেন। কিন্তু আমাব কবে যাবাব সময হবে যে শুধু আমিই জানতাম।

তাঁরা চলে যাবাব ঠিক চাব দিন বাদে সন্ধ্যাব পব আমি মাযেব কাছে এলাম। একা। মা তখন পুজোব ঘবে যাবেন বলে পা বাডিযেছেন। আমাকে দেখে দাঁডালেন।

—সুবল বলছিল, তুমি দুই-একদিনেব মধ্যেই চলে যাচ্ছ?

—হ্যাঁ, কাল যাব ভাবছি।

মা সাদা মনে বললেন, তাহলে তো নন্দদের সঙ্গে গেলেই পাবতে, এত পথ একা-একা যেতে কষ্ট হবে।

—আপনার জন্যেই থেকে গেছি, আপনি বলেছিলেন লেখা যাচাই করিয়ে নিতে।

মাযেব মুখে প্রথমে বিস্ময, পরে কৌতুক-মাধুর্যেব নীরব বিন্যাস দেখলাম আমি। তাঁর চোখে হাসি, মুখে হাসির আভাস।

—সত্যি লিখেছ নাকি?

আমি মাথা নাডলাম— সত্যি।

—আচ্ছা, এসো।

আমাকে সঙ্গে করে সোজা পুজোর ঘরেই ঢুকলেন তিনি। তাঁর আসন পাতাই ছিল, অদূরে আর একখানা আসন পেতে দিলেন।—বসো, এখানে বসেই শুনি কি লিখেছ।

আমি যা লিখেছি সেটা আর যাই হোক চমকপ্রদ গল্প কিছু নয়। হৃদয়ের চিত্র বলা যেতে পারে। তবে বিচিত্র বটে।

আমি পড়ছি। বাহুল্যবর্জিত খুব সংক্ষেপে আঁকা চিত্র। অদূরের আসনে বসে মা নিষ্পলক আমার মুখের দিকে চেয়ে শুনছেন।

ঘটনার প্রথম পটভূমি এখানেই। এই মাতৃকুটীরের জায়গায় যে ভাঙা বাড়ি ছিল, সেখানে। বাড়িতে থাকতেন বৃদ্ধ দ্বিজেন গাঙ্গুলি আর তাঁর মেয়ে মনোরমা। বয়েস হিসেব করলে দ্বিজেন গাঙ্গুলিকে প্রৌঢ় বলা যেত। অবশাঙ্গ রোগী তিনি, অকালে বার্ধক্য এসেছে।

কলেজের খাতায় মনোরমার নাম ছিল। কিন্তু যেতে কমই পারতেন। প্রথম বাধা বাপের ব্যাধি, দ্বিতীয় বাধা মেয়ের রূপ, তৃতীয় বাধা তাঁর মেজাজ। রূপের কারণে স্তাবকদের অত্যাচার আর মেজাজের কারণে প্রায়ই অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব। অসচ্ছল ঘরের রূপের প্রতি মানুষের লোভ বেশি অশালীন হয়ে উঠতে চায়। আর সেই রূপের ওপর মেজাজের ছটা দেখলে তাদের আচরণ আরো বেশি ক্রূর হয়। মনোরমা কলেজে যাওয়া ছেড়েই দিয়েছিলেন প্রায়।

(এইটুকু পড়েই আমি মায়ের দিকে তাকিয়েছিলাম। তাঁর মুখ নির্লিপ্ত, ভাবলেশশূন্য।)

ওই ভাঙা বাড়িতে নতুন একজনের পদার্পণ ঘটল একদিন। কলকাতার প্রেমানন্দ ঘোষ। সবে ল' ফাইন্যাল দিয়েছেন। অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং সহপাঠী রণদা চ্যাটার্জীর সঙ্গে আসামে বেড়াতে এসেছেন। রণদা চ্যাটার্জীর বাবার তখন আসামে কর্মস্থল।

বন্ধুকে সঙ্গে করে রণদা চ্যাটার্জী গাঙ্গুলি কাকাকে দেখতে এসেছেন। পাড়ার সম্পর্কে কাকা। কাকার অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গরা এখনো তাঁদের পাশের বাড়িতে থাকেন। এক গাঙ্গুলি কাকাই শুধু সকলের সংস্রব ছেড়ে ওই বাড়িতে বাস করছেন ওই মেয়ের জন্মের আগে থেকে। আত্মীয়-পরিজনের সঙ্গে তাঁর পোষায়নি। কিন্তু বাড়ি ছাড়লেও রণদা চ্যাটার্জীর বাবার সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক ছিল। সেই সুবাদে হৃদ্যতা এবং যাতায়াত।

রণদা চ্যাটার্জী গাঙ্গুলি কাকাকে দেখলেন এবং তাঁর শয্যার পাশে বসে সুখদুঃখের কথা কইতে লাগলেন। প্রেমানন্দ ঘোষ বাড়ির আর একজনকে দেখলেন বার কয়েক, এবং দেখে সারাক্ষণ বোবা হয়ে বসে থাকলেন। সকলের অগোচরে দু'চোখ তাঁর এই ভাঙা বাড়ির আনাচে-কানাচে উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগল। যাঁকে এই ঘরের মধ্যে দুই একবার দেখেছেন তাঁকে আবার দেখার জন্য তাঁর নির্বাক দৃষ্টি থেকে থেকে উসখুস করে উঠতে লাগল।

দ্বিজেন গাঙ্গুলি প্রেমানন্দ ঘোষের নামধাম লেখাপড়া ইত্যাদির খোঁজখবর নিলেন।

প্রেমানন্দকে লক্ষ্যও করলেন ভালো করে। লক্ষ্য অনেকেই করে থাকে, অমন সুন্দর চেহারা শতেকে চোখে পড়ে না। যেমন গায়ের রঙ, তেমনি উঁচু লম্বা, তেমনি স্বাস্থ্য। দেখে দু'চোখ হঠাৎ চকচক করে উঠল দ্বিজেন গাঙ্গুলির। এরপর বার কয়েক মেয়েকে তিনি ঘরে ডাকলেন—চা-জলখাবার দেবার জন্য, পেয়ালা নিয়ে যাবার জন্য, মশলা দিয়ে যাবার জন্য।

তারপর রণদার উদ্দেশে অনুযোগ করলেন, আমাকে একটি ভালো ছেলে দেবার জন্য কলকাতায় তোমাকে চিঠি পর্যন্ত লিখেছি, কিছুই তো করলে না, এদিকে আমার এই হাল, কবে আছি কবে নেই, আর সুযোগ পেয়ে বাজে লোকে হামলাও করে, দুর্ভাবনায় আমি ঘুমুতে পারি না জানো?

বাড়ি থেকে বেরিয়েই রণদা চাটুজ্যে প্রেমানন্দর জেরায় পড়লেন।—মেয়ের জন্য ভদ্রলোক আসলে তোমাকেই চান বোধ হয়?

—না।

—কেন? তুমি দুর্লভ?

—না, ওই মেয়ে আমার দুর্লভ। মেয়ে রাজী হলে সকলের অমতেই বিয়ে করতুম।

—আশ্চর্য। মেয়ে রাজী নয়?

—প্রস্তাব দিইনি কখনো, দিলেও রাজী হবে না। মেয়ের দোষের মধ্যে মেজাজ কড়া।

—কেন রাজী হবে না কেন, তুমি যোগ্য নও?

—একটু বেশি যোগ্য বলে। মনোরমা বামুনের মেয়ে নয়, কায়স্থ। তোমার পছন্দ হয়ে থাকে তো বলো, দ্বিজেন কাকা আকাশের চাঁদ হাতে পাবেন।

প্রেমানন্দ ঘোষের হৃৎপিণ্ডটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠেছিল বুঝি। স্তব্ধ বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছেন মেয়েটি তাহলে তোমার দ্বিজেন কাকার মেয়ে নয় বলছ?

—না। তবে মেয়ের থেকে ঢের বেশি।

রণদা চ্যাটার্জী এরপর খোলাখুলিই বলেছেন সব। কারণ তিনি অনুমান করেছেন মনোরমার রূপ দেখে বন্ধুর মাথা ঘুরেছে, আবার বন্ধুর রূপ দেখে ওদেরও মাথা ঘোরা বিচিত্র নয়। নইলে গাঙ্গুলি কাকা অত আগ্রহ নিয়ে খোঁজখবর করছিলেন কেন?

যা তিনি নিবেদন করলেন, তার ইতিবৃত্ত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু জটিল একটু। বয়েস-কালে দ্বিজেন গাঙ্গুলি ভয়ানক বেপরোয়া ছিলেন আর তাঁর চরিত্রেরও দুর্নাম ছিল। মদ-গাঁজা খেতেন, গান-বাজনা করতেন। পৈতৃক জমিদারির আয় ছিল, তাতেই চলে যেত। আজকের এই ব্যাধিও সে-সময়ের অপচয়ের ফল বলেই অনেকে সন্দেহ করেন।

এক বড়লোকের মেয়েকে মনে ধরেছিল তাঁর। তাঁকে সত্যিই ভালোবাসতেন। মেয়েটি ঘৃণা করতেন তাকে, কিন্তু তাঁর গান পছন্দ করতেন। সেই বাসনায় মোহগ্রস্ত। মেয়ের দাদার বন্ধু ছিলেন গাঙ্গুলি কাকা। তাঁরা কায়স্থ। তবু সেই মেয়েকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠেছিলেন তিনি। ফলে মর্মান্তিক বিচ্ছেদ, গাঙ্গুলি কাকার বাড়িতেও এ নিয়ে গঞ্জনা-লাঞ্ছনা। সব বাধা উপেক্ষা করে ওই মেয়েকে নিয়ে পালানোর ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ করেছিলেন। কিন্তু মেয়েটি টের পাওয়ার ফলে ষড়যন্ত্র বানচাল। আর তা প্রকাশ

হবাব ফলে গাঙ্গুলি কাকাব অদৃষ্টে দ্বিগুণ লাঞ্ছনা।

মেযেটিব অন্যত্র বিযে হযে গেল। বডলোকেব বাডিতেই বিযে হল। অনেক দূবে, আসামেব বাইবে।

আত্মীযস্বজনদেব ছেডে গাঙ্গুলি কাকা এই বাডিতে এসে আস্তানা নিলেন। আব আত্মঘাতী আনন্দে, অপচযেব পাঁকে ডুবতে লাগলেন।

বছব দেডেক বাদে সকালে ঘুম ভেঙে দেখেন, তাঁব শয্যাব একধাবে দেডমাসেব একটা মেযে ঘুমুচ্ছে। বাতেব নেশাব ঘোব কাটেনি কিনা বুঝলেন না। চোখ কচলে আবাব দেখলেন। সত্যিই মেযে একটা।

বাতে ঘবেব দবজাব কপাট খোলা বেখেই শোন তিনি। কোন বাডিব মেযে, কে কখন এসে বেখে গেল। মেযেব হাতে বাঁধা একটা ভাঁজকবা কাগজ চোখে পডল। তাডাতাডি সুতোটা ছিঁডে নিযে খুললেন সেটা। ছোট্ট চিবকুট।—দযা কবে বেখো ওকে। নিরুপায হযেই তোমাব আশ্রযে বেখে গেলাম। কেউ জানবে না।—মণিমালা।

সেই মেযেব নাম মণিমালা।

গাঙ্গুলি কাকা হতভম্ব। অনেক ভেবে একসময মণিমালাব বাপেব বাডি গেলেন। জিজ্ঞাসাবাদ না কবেও বুঝলেন, সেখানে কেউ তাঁব খবব বাখে না। ভাবতে ভাবতে গাঙ্গুলি কাকা ফিবে এলেন।

এব ঠিক তিন দিন বাদে কাগজে মণিমালাব আত্মহত্যাব খবব বেরুলো। তাব নাকি মাথাখাবাপ হযেছিল। আত্মহত্যা কবাব আগে নিজেব মেযেকেও হত্যা কবে গেলেন লিখেছেন। কিন্তু সেই শিশুব দেহেব কোনো সন্ধান মেলেনি।

কেন এবকম একটা ব্যাপাব ঘটল সেই বহস্য আজও অগোচব।

ঘবে একটা শিশু পুষছেন, ছ'মাসেব মধ্যেও গাঙ্গুলি কাকা সেটা বাইবে কাউকে জানতে দিলেন না। পবে সকলে জানল, গাঙ্গুলি কাকাবই মেযে, কোথায কি কাণ্ড কবে বসেছিলেন, এ তাবই ফল।

সেই শিশুকন্যাই এই মনোবমা।

গাঙ্গুলি কাকাব বাডিতে প্রেমানন্দ ঘোষেব যাতাযাত বেডেছে। পবে সেটা দু'বেলায দাঁডিযেছে। মনোবমাকে যত বেশি দেখেছেন তিনি তত বেশি নিজেকে হাবিযেছেন। হাবাবাব নেশাতেই আবাব ছুটে এসেছেন। কিন্তু ভিতবে দুশ্চিন্তাব অন্ত নেই তাঁব। বক্ষণশীল পবিবাব তাঁদেব, বাপ সাধাবণ উকীল, চেহাবাব জোবে ছেলে দেখেশুনে শাঁসালো মুরুব্বিব ধববে—ঘবে অর্ধেক বাজত্ব আব বাজকন্যা আসবে—সেই আশায আছেন। অতএব দুর্ভাবনাব কাবণ বইকি তাঁব। কিন্তু দ্বিজেন গাঙ্গুলিব বাডি এলে তাঁব সব ভাবনা-চিন্তা নিঃশেষে তলিযে যায। দুনিযাব বিঘ্ন ঠেলে সবিযে ওই মেযেকে ঘবে নিযে তুলতে চান তিনি।

ফেবাব দিন দশেক আগে ঘোষণা কবলেন, মনোবমাকে বিযে কববেন। শুধু তাই নয, একেবাবে বউ নিযে কলকাতায ফিববেন। এ প্রস্তাবে আপত্তি একমাত্র বণদা চ্যাটার্জী তুলেছিলেন, সেটা ঠিক হবে না, আগে বাবা-মাকে জানানো দরকাব।

প্রেমানন্দ বলেছেন, তাহলে বিযে হবে না, তাঁবা রাজী হবেন না।

অন্য কেউ হলে আপত্তি কবতেন, কিন্তু দ্বিজেন গাঙ্গুলি সেই চবিত্রেব মানুষ যিনি অন্য কাবো মতামত বা অনুমোদনেব গুরুত্ব দেন না। তিনি শুধু জিজ্ঞাসা কবেছেন, প্রেমানন্দ মেযেব সম্পর্কে বিস্তাবিত জানেন কিনা। আব বিযে কবলে আব কিছু যে প্রাপ্তিব আশা নেই তাও তিনি স্পষ্ট কবেই বুঝিযে দিযেছেন।

উকীলেব ছেলে প্রেমানন্দ টাকা চেনেন, টাকাব প্রতি তাঁব টানও আছে। কিন্তু তখন সমস্ত চিন্তা তাঁব একটাই। বলেছেন, আর কিছু তিনি আশা কবেন না।

বিয়ে হযে গেল। এমন অনাডম্বব বিযে প্রেমানন্দ কল্পনাও কবতে পাবেন না। তবু তখনকাব মত আত্মবিহ্বল তিনি।

মনোবমাকে নিযে যেদিন কলকাতায বওনা হবেন, তাব আগেব দিন বাত্রিতে দ্বিজেন গাঙ্গুলি মানুষটিকে সত্যিই চেনা গেল। মনোবমাকে তিনি আদেশ দিলেন—ভাবী কাঠেব সিন্দুকটা খুলতে আব তাব ভিতবে একটা উবুড কবা বড হাঁডিব মধ্যে যে শাড়ি জড়ানো বড পুঁটলিটা আছে, সেটা নিযে আসতে।

নির্দেশ পালন কবা হল। পুঁটলি খুলতেই চক্ষুস্থিব প্রেমানন্দ ঘোষেব। একবাশ পুবনো ধাচেব সোনাব গযনা।

দ্বিজেন গাঙ্গুলি বললেন, বিশ বছব আগেব পঁচিশ হাজাব টাকাব গযনা এখানে, এখন এব দাম কম কবে পঁযতিবিশ হাজাব হবে—খুব সাবধানে নিযে যাও।

প্রেমানন্দ হতভম্ব। সত্যি দেখছেন বা সত্যি শুনছেন কিনা সেই সংশয। দ্বিজেন গাঙ্গুলি আবাব বললেন, এসবই ওব, পাছে গযনাব লোভে কেউ ওকে বিযে কবতে চায সেজন্যে বলিনি। দেডমাস বযসে ওব মা শুধু ওকেই বেখে যাযনি ওব মাথাব কাছে এই পুঁটলিটাও বেখে গেছল।

কলকাতা।

প্রেমানন্দব বাবা মা বা আত্মীয পবিজন কেউ এ বিযে ক্ষমাব চোখে দেখেননি। বউ রূপসী সেটা সকলেই দেখেছেন, এমন রূপ সচবাচব চোখে পডে না, কিন্তু এই রূপেব পিছনে কাটাব ছাযাও দেখেছেন সকলে। এমন রূপসী মেযেকে এ-ভাবে কে গছিযে দেয? যে-লোক ছেলেব বাপ-মাযেব অনুমতি না নিযে এ-ভাবে মেযে পাব কবল, সেই লোককে ভালো বলা যাবে কেমন কবে? আব ভালো না হলে তাবই আশ্রযে ছিল যখন—এই মেযেই বা কেমন?

প্রেমানন্দ নিজেব বাডিতে চোবেব মত কাটালেন কিছুদিন। উত্তেজনা একটু থিতিযে আসতে সব খুলে বলে মা-কে বোঝাতে চেষ্টা কবলেন তিনি। ফল তাতে আবো বিপবীত হল। মা-টা কেন আত্মহত্যা কবল? মাযেব স্বভাব-চবিত্র কেমন ছিল? একজন পব-পুরুষেব বাডিতে মেযে ফেলে বেখে গেল কেন?

যাক, বাডিব কর্তা পঁযতিবিশ হাজাব টাকাব গযনা পাওযা গেছে শুনেই হযত শেষ পর্যন্ত ত্যাজ্যপুত্র কবলেন না ছেলেকে। মোট কথা, ওই গযনা ছাডা আব কিছুই পছন্দ হল না প্রেমানন্দব বাবা-মাযেব।

তবু মনোবমা যতদিন মুখ বুজে ছিলেন, একবকম কেটেছে। মুখ খুলতেই

গণ্ডগোল শুরু হল। দু'মাস না যেতেই বউয়ের এক-এক সময় উগ্র মূর্তি দেখে বাড়ির মানুষেরা তাজ্জব। অন্যায় কিছু কানে এলে মনোরমা ফুঁসে ওঠেন। আর কানে তো হরদমই আসছে। বউ সহ্য করে না বলে প্রেমানন্দও বিরক্ত। কখনো বা ক্রুদ্ধ। তারও ফল বিপরীত। কাপুরুষের মত স্বামী অত্যাচারের প্রশ্রয় দেয় বলে তাঁর ওপরেও এক-এক সময় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মনোরমা।

বউয়ের সাহস আর স্পর্ধা দিনে দিনে অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল শ্বশুর-শাশুড়ীর। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে তাঁরা সাহস দেখেন, স্পর্ধা দেখেন। কথার জবাবে কথা বললে রাগে সাদা হয়ে ওঠেন তাঁরা। আর সবকিছুর অবধারিত গঞ্জনার ঝাপটা এসে পড়ে প্রেমানন্দর ওপর। বেচারা নতুন উকীল, পসারের চেষ্টায় মাথা ঘামাবেন কি, বাড়ির অশান্তিতে নাজেহাল। ফলে বউয়ের ওপরেই ক্রোধে আরক্ত হয়ে ওঠেন তিনি।

এদিকে রণদা চ্যাটার্জী ঘন ঘন বাড়িতে আসেন আজকাল। তাঁর সঙ্গে অমন দেমাকী আর অতি রাগী বউয়ের সম্প্রীতি একটুও সুনজরে দেখেন না শ্বশুর-শাশুড়ী। ওদিকে এই একমাত্র মানুষকে বেশ সমীহ করতে দেখে প্রেমানন্দর নিভৃতের চিন্তাও বিকৃত রাস্তায় চলতে শুরু করল। মনোরমা রাজী হলে জাত-বর্ণের বাধা বা বাপ-মায়ের আপত্তি তুচ্ছ করেও বিয়ে করতে আপত্তি ছিল না রণদার, এ তো তার নিজেরই মুখেই শুনেছেন। সামনা-সামনি বন্ধুর সঙ্গে কোনো বিবাদের সূচনা হল না বটে, কিন্তু অশান্তির আগুন ধিকি ধিকি জ্বলতেই থাকল।

শেষে তুচ্ছ কারণেই দপ করে জ্বলে উঠল একদিন।

কোন এক নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে পৈতের নেমন্তন্ন ছিল সকলের। প্রেমানন্দ সকালে উঠেই সেখানে চলে গেছেন। বউকে নিয়ে শ্বশুর-শাশুড়ীরও সকাল-সকালই যাওয়ার কথা। কিন্তু মনোরমা জানালেন, তাঁর শরীর ভালো না, তিনি যাবেন না।

বউ সাত মাস অন্তঃসত্ত্বা; শরীর ভালো নাও থাকতে পারে, শ্বশুর-শাশুড়ী তার আপত্তিতে কান দিতে চাইলেন না। হুকুম করলেন, যেতে হবে। মনোরমা শাশুড়ীকে জানালেন তাঁর যাওয়া সম্ভব হবে না।

ছুটির দিন। এর একটু বাদে রণদা এলেন গল্প করতে। শ্বশুর-শাশুড়ী দেখলেন বউ তাঁর সঙ্গে দিব্বি কথাবার্তা কইছে।

নেমন্তন্ন বাড়িতে এসে ছেলেকে ডেকে তাঁর বাবা নিজেদের অপমানের ফিরিস্তি দিলেন, আর রণদার সঙ্গে বসে বউ গল্পসল্প করছে জানিয়ে তাকে বললেন বউকে নিয়ে আসতে।

মাথার মধ্যে অগ্নিকাণ্ড শুরু হল প্রেমানন্দর। ট্যাক্সি হাঁকিয়েই বাড়ি ফিরলেন তিনি। এসে অবশ্য দেখেন বউ একাই আছে। তবু যা মুখে আসে তাই বলে গালাগালি করলেন। রণদাকে আর বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হবে না, একথাও ঘোষণা করলেন। আর বিয়ের ন'মাসের মধ্যে জীবনটা যে তাঁর অশান্তিতে জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে গেল সরোষে তাও বার বার বলতে বাকি রাখলেন না।

মনোরমা জিজ্ঞাসা করলেন, অশান্তির শেষ হবে কেমন করে?

ক্রুদ্ধ গর্জনে প্রেমানন্দ জবাব দিলেন, শ্মশানে নিয়ে গিয়ে তোমাকে চিতায় শুইয়ে

দিতে পারলে? বুঝলে? সেই রাস্তা করে দিতে পারো?

মনোরমার দুই চোখেও তেমনি জ্বলন্ত আক্রোশ আর বিদ্বেষ। জবাব দিলেন না।

প্রেমানন্দ চিৎকার করে উঠলেন, তুমি এক্ষুনি আমার সঙ্গে যাবে কিনা আমি জানতে চাই।

মনোরমা বললেন, না।

প্রেমানন্দ চলে গেলেন, আর ফিরে এসে এর শেষ দেখবেন বলে গেলেন।

কিন্তু সন্ধ্যায় ফিরে এসে বউকে আর বাড়িতে দেখলেন না কেউ। মনোরমা নেই, তাঁর বড় ট্রাঙ্কটাও নেই।

বাড়ির মানুষেরা স্তম্ভিত।

দু'মাস বাদে আসাম থেকে দ্বিজেন গাঙ্গুলির টেলিগ্রাম এলো, মনোরমা মারা গেছে।

ব্যস। বিয়ের এগারো মাসের মধ্যে একটা অধ্যায় শেষ।

প্রেমানন্দ জানেন না ছেলে হতে গিয়ে মারা গেল কি আর কোনো কারণে? মনোরমার মা মণিমালা আত্মহত্যা করেছিলেন। মেয়েও তাই করল কিনা কে জানে?

বউয়ের জন্য এ-বাড়িতে শোক করার কেউ নেই। সংবাদের একঘণ্টার মধ্যে প্রেমানন্দর বাবা ছেলেকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেছেন, যাবার সময় বউমা সব ক'টি গয়না তো গুছিয়ে নিয়ে গেছলেন, সেগুলির কি হবে?

এরপর রণদাকেও ডেকে গয়নার কথা বলেছেন তিনি। জিজ্ঞাসা করেছেন, যাতায়াতের খরচ দিলে আসামে গিয়ে রণদা সেগুলি নিয়ে আসতে পারেন কিনা।

রণদা চ্যাটার্জী মাথা নেড়েছেন— পারবেন না।

অগত্যা দিন পনের বাদে তিনিই বউয়ের গয়না চেয়ে অদেখা দ্বিজেন গাঙ্গুলির নামে চিঠি দিয়েছেন একখানা।

জবাব মেলেনি।

প্রেমানন্দ ঘোষের ধাক্কা সামলাতে খুব বেশি সময় লাগেনি। গয়নার কথা শেষে তাঁরও মনের তলায় উঁকিঝুঁকি দিয়েছে। মাস চারেক বাদে দ্বিজেন গাঙ্গুলির নামে শেষে তিনিও চিঠি দিয়েছেন একখানা। লিখেছেন, তাঁর নির্দেশ পেলে বউয়ের গয়না আনতে লোক পাঠাবেন, না নিজেই যাবেন।

নির্দেশ পাননি। জবাব আসেনি।

পরের যবনিকা উঠেছে পঁচিশ বছর বাদে। অ্যাডভোকেট প্রেমানন্দ ঘোষ বাড়ি করেছেন, গাড়ি করেছেন, বাইরে জায়গাজমি কিনেছেন, ব্যাঙ্কে প্রচুর টাকাও জমিয়েছেন। কিন্তু মনে শান্তি নেই।

সুমিত্রাকে বিয়ে করেছিলেন বউয়ের মৃত্যুসংবাদ আসার ছ'মাসের মধ্যে। সে সময়ের নাম-করা সিনিয়রের মেয়ে। তা সে-ভদ্রলোক যতই বড়লোক হোন, তাঁর আটটি মেয়ে। সুমিত্রা মাঝের দিকের একজন। অতএব প্রেমানন্দর প্রতি চোখ পড়েছিল তার। সুমিত্রারও পড়েছিল। সে-দিক থেকে প্রেমানন্দর চেহারা প্রধান সহায়। ছেলেটা কালে-দিনে ভালো করবে এটা সিনিয়র ভদ্রলোক বুঝেছিলেন এবং বাড়িতে

বুঝিয়েছিলেন। অতএব ঝঞ্ঝাটশূন্য প্রথম স্ত্রী-বিয়োগের বাধাটা বড় হয়ে ওঠেনি।

দ্বিতীয় শ্বশুরের অনুমানে ভুল হয়নি। দেখতে দেখতে পসার বেড়েছে প্রেমানন্দর। কিন্তু দ্বিতীয় স্ত্রী অর্থাৎ সুমিত্রার সঙ্গেও খুব মনের মিল হল না প্রেমানন্দর। বিয়ের দশ বছর বাদেও ঠাট্টার ছলে বণদা চ্যাটার্জীকে শুনিয়েই সুমিত্রা বলেছেন, আপনার বন্ধুর মনমেজাজ ভালো থাকবে কি করে, প্রথম বউ মরার ছ'মাসের মধ্যে আবার বিয়ে করলেও তার স্মৃতিতে যে এখনো বুক ভরে আছে।

বণদা চাটুজ্জে টিপ্পনী কাটতেন, গয়নার স্মৃতিতে নয় তো?

যত হাসিমুখেই বলুন, জ্বালা ছিলই সুমিত্রার। দু'জনের মতের মিল কমই হত, খিটিমিটি লেগে থাকত। অশান্তি বাড়তে থাকল ছেলেরা বড় হয়ে উঠতে। তিন ছেলে। বড় ছেলের তেইশ বছর বয়স, মেজ ছেলের একুশ, ছোট ছেলের উনিশ। বাপের পয়সার দরুন হোক বা মায়ের প্রশ্রয়ের কারণে হোক—পড়াশুনা একজনেরও তেমন হয়নি। তারা বড়লোকের ছেলে, বড়লোকের ছেলের মতই চাল-চলন। এই চাল-চলন দেখে অনেক রকম সন্দেহও প্রেমানন্দর মাথায় ঘোরে। সন্দেহ কেন, বড় দুই ছেলের সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ হতাশ। ছোটটাও দাদাদের রাস্তায় চলা শুরু করেছে।

সুমিত্রা ছেলেদের দোষত্রুটি ঢেকে রাখতেন, ভদ্রলোকের কাছ থেকে তাদের আগলে রাখতে চেষ্টা করতেন। এই কারণেই সুমিত্রার সঙ্গে এক-একদিন তুমুল বচসা হয়ে যেত তাঁর।

প্রেমানন্দর শরীর ভালো যাচ্ছিল না। হঠাৎ কোর্টেই স্ট্রোক হয়ে গেল একদিন। চিকিৎসার দাপটে সেরে উঠলেন এ-যাত্রা, কিন্তু এখনো শয্যাশায়ী। ডাক্তার সতর্ক করেছেন, দ্বিতীয়বার হলে ভয়ের কথা। কিন্তু বিপদের সম্ভাবনাই বেশি দেখছেন প্রেমানন্দ ঘোষ। হার্ট দুর্বল, প্রেসার হঠাৎ ওঠে হঠাৎ নামে। ভিতরে ভিতরে বিদায়ের জন্যেই প্রস্তুত হচ্ছেন তিনি।

এই প্রস্তুতির আভাস ছেলেরা পেয়েছে, সুমিত্রা পেয়েছেন। প্রেমানন্দ ঘোষের ধারণা ছেলেরা দিন গুনছে, বাপ চোখ বুজলে সব তাদের হাতে আসতে পারে। স্ত্রীর সামনেই বণদা চ্যাটার্জীকে সেদিন ডেকে বললেন, ছেলেদের ইচ্ছে কোথায় কি আছে না আছে তাদের বুঝিয়ে দিই, ওদের মায়েরও সে-রকমই ইচ্ছে কিনা জানি না—কিন্তু ছেলেদের হাতে সব পড়লে ফল কি হবে ভগবান জানেন। তাই ভেবেছি একটা উইল করব, তুমি ব্যবস্থা করো—এঁর জন্যে অর্ধেক অন্তত আলাদা করে রাখব ঠিক করেছি।

বণদা চাটুজ্জে স্পষ্টই সুমিত্রাকে সচকিত হতে দেখলেন।

বন্ধুর কথার জবাব দিলেন না বণদা চ্যাটার্জী। গম্ভীর। অন্যমনস্ক। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, আসাম থেকে কেউ দেখা করতে এসেছিল তোমার সঙ্গে?

প্রেমানন্দ ঘোষ অবাক।—না তো, আসাম থেকে কে আসবে?

—একটি ছেলে, এলে শুনো। তাড়া আছে, চলি।

চলে গেলেন। শুধু প্রেমানন্দ নয়, সুমিত্রাও বিস্মিত।

পরদিন। প্রেমানন্দ শুয়ে, তাঁর সামনে বসে বেদানা ছাড়াচ্ছেন সুমিত্রা। বুড়ো

চাকব এসে খবব দিল, সাহেবপানা একটি ছেলে কর্তাবাবুব সঙ্গে দেখা কবতে চান, বললেন, আসাম থেকে আসছেন—অসুখেব জন্যেই দেখা কবা বিশেষ দবকাব।

প্রেমানন্দ ঘোষ ভেবে পাচ্ছেন না কে হতে পাবে? অসুখেব খবব বণদাব কাছে জেনে থাকবে। বললেন, নিযে এসো—

সুমিত্রা চলে গেলেন না অথবা যেতে পাবলেন না। তাছাড়া বাড়িব কর্তাব ঘবে একলা থাকা নিষেধ, আব বাইবেব কেউ এলে বেশি কথা বলাও নিষেধ। চাকবেব কথায মনে হযেছে— অল্পবযসীই কেউ হবে।

যিনি এলেন তাঁকে দেখে ঘবেব দু'জনেই একটু বিশেষ দৃষ্টিতে লক্ষ্য কবলেন। হাজাবেব মধ্যে এবকম চেহাবা বড দেখা যায না। আব সাহেবপানাই বটে। তাঁকে দেখামাত্র প্রেমানন্দ ঘোষ কেমন বিমূঢ যেন।

আগন্তুকেব হাতে বড চামডাব ব্যাগ একটা। পবনে ট্রাউজাব আব চকচকে হাফ-শার্ট। তাতেই ৰূপ ঠিকবে পডছে। ব্যাগসুদ্ধ হাত তুলে ঘবেব দুজনেব উদ্দেশেই নমস্কাব জানালেন।

প্রেমানন্দ ঘোষ ইঙ্গিতে সামনেব খালি চেযাবটা দেখালেন।

চেযাবে বসে হাতেব মোটা ব্যাগেব খুপবি থেকে ছোট্ট একটা মোডক বাব কবে আগন্তুক বললে, এতে একটা কবচ আছে, আপনাব অসুখ জেনে আমাব মা আপনাকে পবাব জন্য বিশেষ কবে অনুবোধ কবেছেন।

প্রেমানন্দ এবং সুমিত্রা দু'জনেই হতভম্ব। ফ্যালফ্যাল কবে খানিক চেযে থেকে প্রেমানন্দ জিজ্ঞাসা কবলেন, আপনাব...মানে তোমাব মা আমাব অসুখ জানলেন কি কবে?

—মাস দুই আগে বণদা কাকাব সঙ্গে দেখা কবতে এসে আমিই শুনে গিযে বলেছিলাম। মাযেব বিশ্বাস, এটা পবলে আপনাব উপকাব হবে।

—তা তোমাব নাম কি বাবা?

—আমাব নাম মহানন্দ ঘোষ।

কোন দুর্বোধ্য কাবণে প্রেমানন্দ আব সুমিত্রা দু'জনেই কি চমকে উঠলেন একটু?

সুমিত্রা চেযেই আছেন ছেলেটিব দিকে। তাঁব কাছে ছেলেব বযসীই, বছব পঁচিশ ছাব্বিশ হবে বযেস।

আত্মস্থ হযে প্রেমানন্দ জিজ্ঞাসা কবলেন, বণদাব সঙ্গে তোমাদেব কতদিনেব পবিচয?

আমি গেলবাবেই প্রথম দেখলাম।...বিলেতে গিযে ব্যাবিস্টাবি পডাব ব্যাপাবে তাঁব তদবিব-তদাবকে কোনবকম সুবিধে হয কিনা, আলাপ কবতে এসেছিলাম। আমাব বাবাব বিশেষ বন্ধু তিনি।

—তোমাব বাবাব নাম কি?

খুব ধীব স্পষ্ট জবাব এলো, আমাব বাবাব নাম প্রেমানন্দ ঘোষ।

আকাশ থেকে বাজ পডল একটা? নাকি সুমিত্রা আব প্রেমানন্দ দু'জনেই স্বপ্ন দেখছেন? নিঃশ্বাস বন্ধ হবাব উপক্রম প্রেমানন্দব। এত উত্তেজনা ভাল নয। কিন্তু

দু'জনের কারোই তা খেয়াল থাকল না, খেয়াল শুধু মহানন্দ করলেন। বললেন, আপনি উত্তেজিত হতে পারেন ভেবে মা আমাকে আসতে দেবেন কিনা ভাবছিলেন।

প্রেমানন্দব গলা দিয়ে স্বর বেবোয না প্রায়। বিমূঢ় মুখে বললেন, কিন্তু তিনি তো পঁচিশ বছব আগে মারা গেছেন!

—মারা যাননি। আপনি যা চেয়েছিলেন টেলিগ্রামে তাই শুধু জানিয়েছেন।

স্তব্ধ মুহূর্ত অনেকগুলো। প্রেমানন্দ ঘোষেব নিষ্ক্রিয মস্তিষ্ক সক্রিয হতে লাগল খুব আস্তে আস্তে। দু' চোখের সমস্ত দৃষ্টি ঢেলে লক্ষ্য কবছেন। ...ভাঁওতা নয, হতে পাবে। চেহাবাই বলছে, হতে পারে। মাযেব মুখের আদল কি নিজেব মুখেব, জানেন না—কিছু একটা বড় বেশি স্পষ্ট। কিন্তু পঁচিশ বছব বাদে আজ হঠাৎ এই কবচ পাঠানো কেন? অসুখ বলে?...নাকি বণদাব কাছে সঙ্কটেব সময উপস্থিত শুনে ছেলেব জন্য কোনো সংগতিব ব্যবস্থা চায়? ছেলেকে বিলেত পাঠিযে ব্যাবিস্টাব কবে আনাব উদ্দেশ্যও হতে পাবে। অনেককাল ধবে আইন আব কোর্ট কবে মানবচবিত্রেব দুর্বলতা কিছু বেশিই জেনেছেন তিনি।

অপেক্ষা কবছেন। চেয়ে আছেন।

মহানন্দ ঘোষ বললেন, বেশি বিবক্ত কবব না, আব একটু কাজ সেবেই আমি যাব—

বড চামড়ার ব্যাগ খুলে মস্ত একটা প্যাকেট বাব কবে তাঁব সামনে বাখলেন। —এতে আপনাব সব গযনা আছে, মা স্কুলে মাস্টাবি কবে আমাকে মানুষ কবেছেন, এব একটাও খরচ হযনি। দিযে গেলাম—

বুকেব ঠিক মধ্যিখানে প্রচণ্ড একটা আঘাত এসে লাগল যেন। সুমিত্রা মর্তিব মত বসে। প্রেমানন্দ ঘোষ ঘামছেন। পবক্ষণে উঠে বসতে চেষ্টা কবে আর্তনাদ কবে উঠলেন তিনি।

—এগুলো তোমাব মা তোমাকে দিযে পাঠিযে দিযেছেন?

—হ্যাঁ, এগুলোব জন্যে আপনি চিঠি লিখেছিলেন। মা তখন বাগ কবেই দেননি বোধ হয়।

—তা বলে আজ—আজ এই প্রতিশোধ নিল। প্রতিশোধ নেবাব জন্য তোমাকে দিযে এগুলো পাঠাতে পাবল।

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি ধবে শুইযে দিলেন তাঁকে। প্রেমানন্দ ঘোষ কাঁপছেন থবথব।

একটু চুপ কবে থেকে মহানন্দ বললেন, তিনি ঠিক পাঠাননি, তাঁব ইচ্ছে বুঝে আমিই নিযে এসেছি। মাযেব কাছে এত গযনা দেখে আমি ভেবেছিলাম আমার জন্যেই বেখেছেন। বিলেত যাবাব জন্য এগুলো চেযেছিলাম। মা তখন বলেছেন ওগুলো আপনাব, আপনাকে ফেরৎ দেবেন বলে বেখেছেন। সব শোনাব পবেও পাছে আবার আমাব লোভ হয, তাই এবাবে আসার সময নিযে এলাম।

আর কিছু বলার বা শোনার জন্য অপেক্ষা না কবে উঠে দাঁড়ালেন মহানন্দ ঘোষ।—এবপব আপনার আবো ক্ষতি হতে পারে, আচ্ছা চলি—

লম্বা লম্বা পা ফেলে ঘবেব বাইবে চলে এলেন তিনি। কিন্তু বাইবে এসেও

প্রেমানন্দব আর্তস্বব শুনলেন। স্ত্রীকে বলছেন। দেখলে সব? শুনলে সব? এসব গযনা এখন তুমি নাও, তুমি দেখো, ছেলেদেব দেখাও—খুব খুশী হবে, আমাব শুধু এই কবচ থাক—বুঝলে? বুঝলে?

এই পর্যন্তই চিত্র।

আমি মাযেব দিকে তাকালাম। নিস্পন্দেব মত বসে আছেন তিনি, কিন্তু পবক্ষণেই হতভম্ব আমি। হঠাৎ সবোষে মা বলে উঠলেন ওই সুমিত্রাব ওপবে তুমি পক্ষপাতিত্ব কবেছ—তাব ভিতবে অনেক বিষ ছিল—স্বামীব স্ট্রোক হবাব পবে ছেলেদেব ওপব বিশ্বাস হাবিযে সেও মনে মনে চাইছিল স্বামী উইল কবে দিযে যাক—জানো?

তীক্ষ্ণ শোনালো কণ্ঠস্বব। এমন মহীযসী যিনি, এত তেজ আব এত ক্ষমা যাব মধ্যে, তাঁব এই রূঢতা আমি আশা কবিনি। আঘাতই পেলাম যেন। বললাম, আপনি নিশ্চযই বণদাবাবুব মুখে শুনেছেন এ-কথা, কিন্তু পুবোপুবি সত্যি তো না-ও হতে পাবে.. ।

মা নীবব একটু। নিজেকে সংযত কবলেন। শান্ত কমনীয আবাব। একটু থেমে নিযে বললেন, গল্প মোটামুটি ঠিকই হযেছে। কেবল তোমাব ভাবনায সামান্য একটু ভুল থেকে গেছে।

আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে চেযে আছি।

তেমনি সহজ সুবেই তিনি আবাব বললেন, আমি মনোবমা নই। সে ভাগ্যবতী সিঁথিব সিঁদুব নিযেই চোখ বুজেছে। আমি সুমিত্রা।

আমি নির্বাক বিমূঢ নিস্পন্দ কাঠ।

সৈনিক

অপর্ণা এবাবে সত্যিই চলল তাহলে। অনেক দিন যাবে যাবে কবেছে, অনেক দিন বলেছে সময হযে এলো। মেজব ঘোষ চৌধুবী এ-কানে শুনে ও-কান দিযে বাব কবে দিযেছেন। অপর্ণা উপেক্ষা ভেবেছে কিনা কে জানে। সদা ব্যস্ত স্বামীব কান-মন সজাগ নেই ভাবত কিনা কে জানে। নইলে অত কবে বলত কেন?

ভিডেব বাস্তা ছেডে গাডি বেড বোডে পডতেই স্পিডেব কাটা তিবিশ থেকে এক লাফে পঁযতাল্লিশেব দাগে গিযে দাঁডাল। কিন্তু সে কাটা কেউ দেখছে না। মেজব ঘোষ চৌধুবী ঘডিব কাটা দেখলেন একবাব। বেলা চাবটে বাজতে দশ। বাস্তা ফাঁকা। কতক্ষণ আব লাগবে। যাবেন আসবেন। এই জন্যেই আব কাউকে না পাঠিযে নিজে গাডি হাঁকিযে চলেছেন। প্রতিটা মুহূর্তেব অনেক দাম এখন। মবণ-বাচনেব দাম। জীবনেব একটাই মিনতি বাখা না-বাখাব দাম। না, একটানা তেত্রিশ বছবেব যুক্ত জীবনে অপর্ণাব আব কোনো প্রার্থনা বা মিনতি এই মুহূর্তে অন্তত মনে পডছে না মেজব ঘোষ চৌধুবীব। অপর্ণা বলেছিল, তুমি এত ব্যস্ত, তাই ভয হয। শেষ সময়ে

কাছে থেকো, নইলে ভযানক খাবাপ লাগবে আমাব—থাকবে তো?

একবাব নয, অনেকবাব কবে বলেছিল। এই গত পবশুও বলেছিল। কালও একবাব বোধহয বলতে চেষ্টা কবেছিল। আব আজ সকাল থেকে মুখে বলতে না পাকক হঠাৎ-হঠাৎ তাকিযে দেখেছিল তিনি আছেন কিনা।

চোখদুটো ভযানক চকচক কবছে মেজব ঘোষ চৌধুবীব। অথচ ঝাপসা ঝাপসা দেখছেন। কাঁচাপাকা লোমশ দুই পবিপুষ্ট হাতে স্টিযাবিং ধবে আছেন। একটা হাত প্যান্টেব পকেটে ঢুকল। হুইস্কিব ছোট বোতল বেকলো। দাঁতে কবে মুখ খুললেন। বাস্তাটা ফাঁকা, তাছাডা কে দেখল না দেখল পবোযা কবেন না। দবকাব বলেই খাচ্ছেন। মাথা ঝিমঝিম কবলে চলবে না, চোখে ঝাপসা দেখলে চলবে না।— সমযেব অনেক দাম এখন। হাত শক্ত, স্নাযু সবল বাখা দবকাব। ছোট বোতল উপুড কবে গলায ঢাললেন খানিকটা। অর্ধেকেব বেশিই খালি হযে গেছে গত দু-ঘন্টাব মধ্যে। সাধাবণত বেশি খান না। দুদিন ধবে বেশিই খাচ্ছেন। দুদিনে এবকম চাবটে ছোট বোতল খালি হযে গেল...না, দিস ইজ দি ফোর্থ, খালি হতে চলেছে।

দাঁতে কবে বোতলেব মুখ আটকে আবাব পকেটে বাখলেন। স্পীডেব কাঁটা প্রায পঞ্চাশ ছুঁযে আছে। একটু আধটু কমছে, আবাব পঞ্চাশেব কাছে দাঁডাচ্ছে। হাত একটুও কাঁপছে না মেজব ঘোষ চৌধুবীব। এজন্যেই আব কাউকে না পাঠিযে তিনি নিজে ছুটেছেন। আর্মিতে তাঁব দুবন্ত গাডি ছোটানো দেখে কত লোকেব তাক লেগে যেত। তিনি গাডি চালাবেন শুনলে ভযে অনেকে সে-গাডি এডাতে চাইত।

...সেই অপর্ণা সত্যিই চলল তাহলে।

মেজব ঘোষ চৌধুবীব মনে হচ্ছে, এই তো সেদিনেব কথা। কি কাণ্ড কবেই না তিনি ঠিক-ঠিক ঘবে এনে ছেডেছিলেন তাকে। অথচ এবই মাঝে কিনা তেত্রিশটা বছব কেটে গেল।

আবাব দুচোখ চকচক কবছে, আবাব একটু একটু ঝাপসা দেখছেন। সেই সঙ্গে ঠোঁটেব ফাঁকে হাসিব আভাসও।...তেত্রিশ বছব আগেব নয, মাত্র সেদিনেব দৃশ্য যেন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে থেকে থেকে।

...ডাক্তাবী পডাব চতুর্থ বছব সেটা। পডাব চাপ বেশি। একটা পাঁচমিশিলি নামী হস্টেলে থাকতেন। জানালা খুললেই পডায ব্যাঘাত হত। অথচ না খুলেও পাবতেন না। বাস্তাব উল্টোদিকেব বাডীব মেযে অপর্ণা। নাম আবো দেড বছব আগেই জানেন। তাঁব যখন ডাক্তাবীতে ফোর্থ ইযাব, অপর্ণাব তখন কলেজেব থার্ড ইযাব। সেই সমযে গণ্ডগোলটা হল। এমন নতুন কিছুই কবেননি। সেদিন চতুর্থ বছবেব ডাক্তাবী নবিশ ত্রিদিবেশ ঘোষ চৌধুবী বোজকাব মতই মাঝে মাঝে জানালায এসে দাঁডিযেছিলেন, অন্য দিনেব মতই মৃদু মৃদু হেসেছিলেন চোখাচোখি হতে। বাডতিব মধ্যে আভাসে হযত বা কথা বলাব বাসনা ব্যক্ত কবেছিলেন।

ব্যস, অপর্ণা ঠাস কবে মুখেব ওপব দবজা বন্ধ কবেছিল। আধ ঘন্টাব মধ্যে অপর্ণাব মাবমুখী দাদা-কাকাবা হস্টেলে এসে হাজিব হযেছিল। অন্য ছেলেবা তাব

হযে তুমুল বচসা কবেছিল। আব তাঁব কান দিযে আগুন ছুটেছিল। সেইদিনই ডাকে তিনি অপর্ণাব নামে চিঠি ছেড়েছিলেন। সাব কথা, একদিন তাকে তাদেব বাড়ীতে তাঁব ঘবে আসতেই হবে। ইচ্ছে হলে একথা সে তাব বাবা মা দাদা কাকাদেব জানিযে দিতে পাবে।

মেজব ঘোষ চৌধুবী হাসছেন একটু একটু। ওই বকম গোঁযাবই ছিলেন বটে। জানালায এবপব আব খুব বেশি দাঁড়াতেন না। হঠাৎ একদিন কানে এলো—অপর্ণাব বিযে পাকা হযে এসেছে। পড়াশুনা সিকেয উঠল তাঁব। মাথায আগুন জ্বলল। একটা দিনেব অক্লান্ত চেষ্টায ও বাড়ীব দূব-সম্পর্কীয এক লোকেব মাবফৎ বাব কবলেন কোথায বিযে পাকা হযে এসেছে। ঠিকানাও সংগ্রহ কবলেন। তাবপব উড়ো চিঠি ছাড়লেন।—অপর্ণা এবং একটি ছেলে পবস্পবকে বিযে কববে বলে অঙ্গীকাববদ্ধ। অতএব ছেলেব অন্যত্র বিযে কবাই ভালো।

বিযে ভেঙে গেল। কাবণও একেবাবে গোপন থাকল না হযত। কাবণ দিনকতক বাদেই অপর্ণাকে হস্টেলেব এই ঘবেব দিকে চেযে তাদেব জানালায স্থিব দাঁড়িযে থাকতে দেখা গেল। আব ধীব পদক্ষেপে তিনিও নিজেব জানালায এসে দাঁড়ালেন। নিঃশঙ্কচিত্তে নির্দ্বিধায স্পষ্ট কবেই বুঝিযে দিলেন তিনিই এই ব্যবস্থা কবেছেন।

পবীক্ষা হযে গেল। তিনি হস্টেল ছাড়লেন। বেজাল্ট বেরুলো। ভালো পাস কবলেন। অপর্ণা জানেও না তিনি কি পড়তেন বা কোথায চলে গেলেন।

অভাবিত একটা ভালো সম্বন্ধ পেলেন অপর্ণাব বাবা-মা একজনেব মাবফৎ। সেই একজন ত্রিদিবেশ ঘোষ চৌধুবীবই লোক সে আব কে বলতে গেছে। তাবা জানালেন, বড়ঘবেব ছেলে, ববাবব ভালো বেজাল্ট কবে ডাক্তাব হযেছে।

মিথ্যে জানলেন না তাঁবা।

অপর্ণাব বাবা নিজে এলেন খোঁজখবব কবতে। এই ভদ্রলোক দেড় বছব আগেব বিবাহেব ঘটনা কিছুই জানেন না। তাঁব সবই ভাবী পছন্দ হল। এত সহজে মেযেব বিযে হযে যাবে আশা কবেননি। ছেলেব বাবা-মাযেব উদাবতা দেখে তিনি মুগ্ধ। ছেলে দেখেও খুশি। মুখখানা চেনা চেনা লাগল। ফলে বাবা বলেই দিলেন, ছেলেব পছন্দ বলেই তিনি এগোচ্ছেন, ছেলে মেযে দেখেছে—উল্টোদিকেব হস্টেলই ছেলে থাকত।

জানাজানি হওযা সত্ত্বেও বিযেতে বিঘ্ন হল না। আব তাবপব কটা দিন কি কাণ্ড। দুচোখ চকচক কবছে মেজব ঘোষ চৌধুবীব. কিন্তু অল্প অল্প হাসছেনও।...বিযেব পব অপর্ণা তাঁব দিকে আব চোখ তুলে যেন তাকাবেই না, এমন অবস্থা।...সব যেন সে-দিনেব কথা মাত্র।

পিচেব বাস্তা ঘষটে ঘ্যাঁচ কবে থামল গাড়িটা। লাল আলো জ্বলে উঠেছে—বেড লাইট। গলা দিযে অস্ফুট একটা বিবক্তিব শব্দ বাব কবলেন মেজব ঘোষ চৌধুবী। সবুজ না হওযা পর্যন্ত থাকো বসে। আবো অসহিষ্ণু বোধ কবলেন তিনি, কাবণ বিপবীত দিকে অর্থাৎ যে-দিকটাব লাইন ক্লিযাব—সেই বাস্তায একটিও গাড়ি-আসছে না বা যাচ্ছে না। যান্ত্রিক ব্যবস্থায সময ধবে বোড সিগন্যাল পড়ে. এ-দিক বন্ধ তো ও-দিক খোলা, ও-দিক বন্ধ তো এ-দিক।

পকেটে হাত। হুইস্কির বোতল। খুললেন। গলায় ঢাললেন। বন্ধ করে ওটা পকেটে রাখার অবকাশ পেলেন না— সবুজ আলো! বোতল পাশে পড়ে থাকল। গাড়ি ছুটল।

...সময় নেই।

আর্মিতে চাকরি নিতে অপর্ণা ঘাবড়েছিল। অনেক নিষেধ করেছিল, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করার জন্য ঝকাঝকি করেছিল, তার ভয় তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। সর্বদাই ও যে একটা চাপা আতঙ্কে ভুগত সেটা তিনি টের পেতেন। সিভিল পোস্টিং হলে তবু স্বস্তি, সঙ্গে থাকত বলে অত ছটফট করত না। ইমারজেন্সি এরিয়ায় বদলী হলেই অপর্ণার আহার-নিদ্রা ঘুচত যেন। এই জন্যেই অসময়ে পুজো-আর্চা ধরেছিল বলে বিশ্বাস। মেজর ঘোষ চৌধুরী হাসতেন, আবার বিরক্তও হতেন।...লেফটানেন্ট থেকে ক্যাপ্টেন হয়েছেন, ক্যাপ্টেন থেকে মেজর, তবু অপর্ণার ভয় ঘোচেনি। সে ছেলেমেয়েগুলোকে ঠিকমত মানুষ করে তুলেছে, তাঁর প্রতি সকল কর্তব্য করেছে আর সেই সঙ্গে একটা অহেতুক ভয় পুষেছে। আশ্চর্য, দৈব বিড়ম্বনায় অসময়ে আর্মি থেকে অবসর নিতে হল তাঁকে, তবু অপর্ণার ভয়ে ভয়ে থাকাটা যেন অভ্যাসে দাড়িয়ে গেছে। পাথর পড়ে পা ভাঙার ফলে আর্মির চাকরি থেকে বিদায় নিতে হয়েছে তাকে। মেজর ঘোষ চৌধুরী ঠাট্টা করেছিলেন, ঠাকুর তোমার ডাক শুনেছে, মিলিটারির চাকরি ছাড়িয়েছে।

অপর্ণার নির্বাক চাউনিটা স্পষ্ট মনে আছে। দু'চোখে জল টলমল করছিল।

গাড়ি থামল। এই দোকানই। নেমে হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন মেজর ঘোষ চৌধুরী। পরক্ষণে আরো বেগে ছুটে এসে গাড়িতে উঠলেন। মুখ শুকনো, চোখের নিমেষে গাড়ি ওধারের বড় রাস্তার দিকে ঘোরালেন।

...অপর্ণা চললই তাহলে! বড় দোকানে ওষুধ মিলল না। মিলবে কিনা সন্দেহ ছিলই। পাওয়া গেলেও অপর্ণা থাকবে কিনা সন্দেহ—ডাক্তার তো তিনিও, আর নামী ডাক্তারই—সবই বোঝেন। তবু আশা, শহরের সব থেকে নামজাদা ডাক্তার বলেছেন, এই ওষুধটা একটা কেসএ জাদুর কাজ করেছিল—পান কিনা এক্ষুনি দেখুন। ওমুক জায়গায় যান—

সেই জন্যেই টেলিফোনে জিজ্ঞাসাবাদের সময় বাঁচিয়ে নিজেই গাড়ি হাঁকিয়েছেন। আর কারো ওপর নির্ভর করতে পারেননি। ওষুধটা কোথাও থাকলে তাকে পেতে হবে। ওদিকের বড় রাস্তা ধরে গেলে আরো দুটো দোকান আছে।

কিন্তু ওদিকটায় আবার ট্রাম বাস মোটর চলাচলের ভিড়। তার ফাঁক দিয়েই বেগে ছুটেছে। এই ওষুধটার জন্য তিনি যেন সর্বস্ব দিতে পারেন। টাকার তো অভাব নেই, অভাব যার ঘটতে চলেছে টাকা দিয়ে তা পূরণ হবে না।..অপর্ণা রাগই করত, সময়ে নাওয়া নেই, খাওয়া নেই—তোমার এত টাকার কি দরকার?

মিলিটারি চাকরির যা পেনশন পান, সেদিকে তাকানোও দরকার হয় না তার। যে টাকা তিনি প্র্যাকটিস করে রোজগার করেন, তা কল্পনার বাইরে। সেই এক আট

টাকা ভিজিট কবে বেখেছেন তিনি—তাই রোগী আসে কাতারে কাতাবে। প্রায তিন বেলাই হিমসিম অবস্থা হয তাঁব। বাড়ি থেকে এক মাইল দূরে চেম্বার। কিন্তু খোঁড়া মেজবের কাছে বোগী আসে পাঁচ সাত মাইল দূব থেকেও। পা জখম হবার পব থেকে একটু খুঁড়িযে চলেন বলে বোগীদের মুখে মুখে এখন এই নাম।

ওযার্থলেস।

মুখ বিকৃত কবে চাব বাস্তার মুখ সবেগে পার হবাব মুখেই ঘ্যাঁচ কবে গাড়িটা থামাতে হল। লাল আলো। ভ্রূকুটি কবে ওধাবেব বাস্তাব গাড়িগুলোব দিকে তাকালেন তিনি. গ্রীন পেযে এখনো নডতেও শুরু কবেনি। এই ফাঁকে অনাযাসে পেবিযে যেতে পাবতেন। বাবুবা সব গদাই লস্কবি চালে গাড়ি চালায।

ঘন ঘন লাল আলোব দিকে তাকাচ্ছেন তিনি। অসহিষ্ণু হাতে পাশেব হুইস্কিব বোতল ট্রাউজাবেব পকেটে ঢোকালেন। গাযে তো শুধু পুরু গেঞ্জি একটা।

সর্বদা অত ভযে ভযে থাকত বলেই একে একে হার্টেব দু'দিকেবই ভালব খাবাপ হযে গেল কিনা অপর্ণাব, মেজব ঘোষ চৌধুবীব এখন সেই সন্দেহ হয। শয্যা নিযেও তাব দুশ্চিন্তা যায না তাঁব জন্য। ঘড়ি ধবা সমযে খেতে না এলে বা সমযে শুতে না এলে বিছানায শুযেই ছটফট কববে। ছেলেবা আব মেযেবা অনেকবাব সেই নালিশ কবেছে। আব এখন তো মুখে কেবল এক কথা, শেষ সমযে তুমি যেন কখনো আমাব কাছছাড়া হযো না, কাছে থেকো—থাকবে তো?

মেজব ঘোষ হেসেছেন, শেষ সময অত সস্তা নয, বুঝলে?

—তবু তুমি কথা দাও— কথা দাও না গো।

কথা দিতে হযেছে। শুধু তাই নয, তাব তবু ভয যায না দেখে বিছানাব গাযে টেলিফোন এনে দিতে হযেছে। একটু খাবাপ বুঝলেই অপর্ণা চেম্বাব থেকে ডাকবে তাঁকে।

মা-কে বাবাব এই কথা দেওযাব খববটা ছেলেমেযেবাও কি কবে যেন জেনেছে। মাযেব অসুখ বাডবাডিব দিকে গডাবাব আগে তাবা এই নিযে হাসাহাসিও কবেছে। টেলিফোন হাতে পেযে ওদেব মা যেন পবীক্ষা কবাব জন্যেই এ পর্যন্ত দিনতিনেক ডেকেছে তাঁকে।

গ্রীন লাইট। গাড়ি ছুটল।

দ্বিতীয বড দোকানেও নেই। চললই তাহলে অপর্ণা। মিথ্যেই দুর্বল হচ্ছেন তিনি, ওষুধ পেলেও যাবেই। তবু অন্য দোকানটাও দেখতে হবে। সময নেই।...বাডিব সঙ্গে কানে একটা টেলিফোন লাগানো থাকলে বুঝি ভালো হত। বাকি বড় দোকানটা দেখেই সোজা বাড়ি। তিনি কথা দিযেছেন পাশে থাকবেন, সে-কথা যে কি-কথা সেটা এখন অনুভব কবছেন। যে অবস্থায দেখে ঝোঁকেব মাথায বেবিযে পড়েছেন—আব দেবি কবা ঠিক হবে না।

আশ্চর্য। অপর্ণা কি তাহলে থাকবে এ-যাত্রা? ওষুধ পেয়েছেন। তিনি তো ডাক্তাব,

জীবন-মন্ত্র ভাবছেন নাকি এটা? ওষুধ হাতে পাবাব পব আশাও তেমন কবতে পাবছেন কই? এই অবস্থা থেকেও ফেবে কেউ? সত্যি মিবাকল হয?

এবাবে আবো বেগে ছুটেছেন।

খাইযে তো দেবেন, যেমন কবে হোক কিছুটা পেটে যাওযা চাই। চাই-ই।

ইমপসিবল। ইমপসিবল। বিবক্তিতে অসহিষ্ণুতায গলা দিযে জোবেই শব্দ বাব কবে ফেললেন মেজব ঘোষ চৌধুবী।

লাল আলো। অর্থাৎ থামো।

অথচ মাত্র দুটো সেকেণ্ডেব জন্য বোধহয। প্রথম সাদা দাগ ছাডিযেই এসেছিলেন। দ্বিতীয দাগটা ছাডাতে পাবলেই আব থামতে হত না। কিন্তু তাব আগেই সবুজ আলো হলদে হযেছে, তাবপব লাল। ও-ধাবেব বাস্তাব গাডি স্টার্ট নেবাব আগে এমন কি হলদে আলো সবুজ হবাব আগেই তিনি হাওযা হযে যেতে পাবতেন।

কিন্তু কি আব কবা যাবে। পিছনেব দিকে দেখে নিযে দ্বিতীয সাদা দাগেব কাছ থেকে গাডি ববং হাতকযেক পিছিযে নিতে হল।

এ-বকম হয না কেন, যে বাস্তায গাডি যাবে সে বাস্তায শুধু যাবেই, যে বাস্তায আসবে, শুধু আসবেই—চাব বাস্তা থাকবে না—ক্রস বোড থাকবে না।

মাথা গবম হযেছে বোধহয তাঁব, কিন্তু এখানে বোতল খোলা মুশকিল।

নাকেব ডগা দিযে যে গাডিগুলো যাচ্ছে, সেগুলিকে ভস্ম কবাব চোখ মেজব ঘোষ চৌধুবীব।

আশ্চর্য, অপর্ণা যে তাঁব এতখানি এ কি নিজেই জানতেন। পাশে থাকতে কথা দিযেছেন যখন, তখনও কি জানতেন? তখনো কি এবকম কবে অনুভব কবতে পেবেছিলেন?

ক্রস বোডে গাডি চলেছে তো চলেছেই। এক মিনিট এত বড হয কি কবে?

' তবু তুমি কথা দাও, কথা দাও না গো।'

কথা যখন দিযেছিলেন, তখনো কি সেই আকূতি এমন কবে শিবাতে শিবাতে ওঠা-নামা কবেছিল তাব? তিনি তো তাব পবেও লোকেব চিকিৎসা নিযে সদা ব্যস্ত ছিলেন, এমন দম-আটকানো শূন্যতা তো কখনো অনুভব কবেননি?

চিকিৎসাব বাইবে আব সকল দিক অপর্ণা এ ভাবে ভবাট কবে বেখেছিল বলেই অনুভব কবেননি। তাই বটে। কোনদিন আব কোনদিকে তাকানোব দবকাবই হযনি তাব। দুটো মেযেব বিযে হযেছে, বড ছেলেটাব বিযে হযেছে, আব একটা ছেলেও আগামী বাবে ডাক্তাবী পাস কবে বেরুবে। এবা সব ছোট থেকে হঠাৎ চোখেব ওপব দিযে কেমন কবে যে বড হল, যোগ্য হল, তাও যেন ভালো জানেন না মেজব ঘোষ চৌধুবী। সব-দিক এমনিই ভবে বেখেছিল বটে অপর্ণা। তেত্রিশ বছবেব এই ভবাট দিকটাই শূন্য হওযাব দাখিল। তাই সর্বদিকই শূন্য। নিঃশ্বাস নিতে ফেলতে কষ্ট। চোখে ভযানক ঝাপসা দেখছেন।

বিষম চমকে উঠলেন— সবুজ আলো। গ্রীন। ব্লেসেড গ্রীন।

হাওযাব বেগে গাডি ছুটল। আশ-পাশেব গাডিওযালাবা তাঁব গাডিব এই গতি

পছন্দ করছে না। অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে ভাবছে। হলেই হল। মিলিটারি চাকরিতে কোন পথ দিয়ে কি স্পীডে গাড়ি চালাতে হয়েছে তা কে জানবে কি করে। চকচকে চোখ, কিন্তু ঠোঁটে আবার যেন হাসির আভাস একটু—জানলে অপর্ণা বোধহয় সুস্থ শরীরেই হার্টফেল করত। নির্ভয়ে শক্ত হাতে স্টিয়ারিং ধরে আর দুটো চোখ আর সবগুলো স্নায়ু একত্র করেই অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিচ্ছেন তিনি। গাড়িতে বসলে তাঁর খোঁড়া পা আর খোঁড়া থাকে না—ওনলি ডোন্ট ডিসটার্ব মি এনিবডি অ্যাণ্ড লেট দেযার বি নো রেড লাইট এনি মোর।

বাড়ি।

সিঁড়ির গোড়ায় পা রেখেই নিশ্চল স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি। কানে গলানো শিসে ঢুকল এক ঝলক। ঝলকে ঝলকে ঢুকছে। তিনি নিস্পন্দ কাঠ।

দোতলার ওই অনেক গলার আর্তনাদের একটাই অর্থ। ..অপর্ণা থাকল না। গেলই।

কয়েক নিমেষের মধ্যে বুঝি বুড়িয়ে গেলেন মেজর ঘোষ চৌধুরী। এত বুড়িয়ে গেলেন যে সিঁড়ির শেষ নেই মনে হচ্ছে। ঝকঝকে দু'চোখে মুক্তোর মত দুটো কি। হাপ ধরছে। দাঁড়ালেন। কি যেন একটা ভুল হয়ে গেছে।...কি? মাথার ভিতরে এরকম লাগছে কেন? তিনি ডাক্তার, জানতেনই তো অপর্ণা থাকবে না।

পকেটের বোতলটা উবুড় ক'রে নিঃশেষে গলায় ঢাললেন।

দোতলা। অপর্ণা শুয়ে আছে। মেয়ে দুটো আর ছোট ছেলেটা আছড়া-আছড়ি করে কাঁদছে। বড় ছেলে, ছেলের বউ কাঁদছে। জামাইরা কাঁদছে।

তাকে দেখেই ছোট ছেলে আর্তনাদ করে উঠল, বাবা, তুমি আর একটা মিনিট দেড়টা মিনিট আগে এলে না? আর একটু আগে এসে কথা রাখতে পারলে না বাবা? যাবার দশ সেকেণ্ড আগেও মা যে চোখ তাকিয়ে চারদিকে খুঁজল তোমাকে?

মেজর ঘোষের এইবার মনে পড়েছে। তিনি কথা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন পাশে থাকবেন। কি আশ্চর্য, তিনি কি পাশে ছিলেন না এতক্ষণ?

অপর্ণার দিকে তাকালেন। ঘুমুচ্ছে যেন। হাসি-মাখা ঘুম। চিৎকার করে গলা ফাটিয়ে ডেকে ঘুম ভাঙাতে চেষ্টা করবেন তার? বলবেন, শোনো অপর্ণা, আমি চেষ্টা করেছিলাম, আমিও তাই চেয়েছিলাম—চেয়েছিলাম।

নির্বাক, বোবা তিনি।

ঘন্টাখানেক বাদে কান্নার প্রাথমিক আবেগ স্তিমিত হল। জামাইরা দেহ নেবার যোগাড়যন্ত্রে বেরিয়েছে। দুই ছেলে শিয়রে আর পায়ের কাছে বসে। পাশে তিনি।

ধরা-গলায় এক সময় বড় মেয়ে বলল, আর একটু যদি আগে আসতে বাবা...মায়ের কাছে তুমি শেষ কথাটা রাখতে পারলেই না ....।

ক্লান্ত-ক্লিষ্ট মুখে মেজর ঘোষ চৌধুরী আস্তে আস্তে বললেন, হবার নয় বলেই হল না রে,...তিন-তিনবার রাস্তার লাল আলোয় আটকে গেলাম—বড় ক্রসিং, এক মিনিট করে থামতে হল। যাবার সময় অন্য রাস্তায় একটাও গাড়ি নেই, অথচ লাল আলো, আর আসার সময় একেবারে বেরিয়ে মুখে-মুখে দু'বার।

বড ছেলে বেশ জোবেই বলে উঠল, বেবিযে আসাব মুখে তো বেবিযেই এলে না কেন? কে কি কবত? বড জোব একশ' দেডশ' টাকা জবিমানা হত—এব বেশি আব কি হত?

মেজব ঘোষ চৌধুবী হতভম্ব বিমূঢ হঠাৎ। বেবিযে আসা যেত ঠিকই। অনাযাসেই যেত। আব একশ' দেডশ' টাকা ছেডে কথা বাখাব জন্য এক হাজাব দু হাজাব দশ হাজাবও বাব কবে দিতে আপত্তি ছিল না তাঁব। কিন্তু লাল আলো দেখেও বিধি নাকচ কবে ওভাবে বেবিযে আসা যেতে পাবে সেটা মাথাযও আসেনি তাঁব। এখনো যেন ভালো কবে আসছে না।

ছেলেব মুখেব দিকে ফ্যালফ্যাল কবে চেযে বইলেন মেজব ঘোষ চৌধুবী।

তৃষ্ণা

প্যাট মেনডোনসা, এই ঘবে তুমি এসেছ আমি বুঝতে পাবছি। আমি আব যুঝব না, বাধা দেব না, আমাব ক্ষমতা ফুবিযেছে—তুমি যা চাও তাই হবে। কিন্তু তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না, তাই ভয হচ্ছে। তুমি সামনে এসে দাডাও, তোমাব কাকে ভয?

ঘবে যে ক'টি প্রাণী ছিল সকলে চমকে উঠেছিল। এমন কি অমন নামজাদা ডাক্তাবও। বোগেব ঘোবে অনেকে অনেক বকম প্রলাপ বকে, সেটা অসংলগ্ন হয। জডতা থাকে। কিন্তু এ যেন কেউ সর্ববকমভাবে হাব মেনে ক্লান্ত বিষণ্ণ থমথমে গলায স্পষ্ট কবে শেষ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কবল। অনেকেব কানে সেটা নিজেব মৃত্যুঘোষণাব মত লাগল।

অসুখেব ঘোবে বোগী আগেও অনেকবাব ভুল বকেছে, বিকাবগ্রস্ত দুই চোখ টান কবে অনেকবাব ঘবেব চাবদিকে চেযে চেযে দেখেছে। কিন্তু সেই কণ্ঠস্বব এমন স্পষ্ট হযে কানে লেগে থাকেনি কাবো, সেই চাউনি এত স্পষ্ট, স্বচ্ছ মনে হযনি। তাতে নিজেকে আগলে বাখাব ব্যাকুলতা ছিল, সেই দৃষ্টিতে অব্যক্ত দুর্বোধ্য যাতনা ছিল। অভিজ্ঞ চিকিৎসক ইনজেকশন আব ঘুমেব ওষুধ দিযে তখন বোগীকে ঘুম পাডিযেছেন। আজ ছ'দিন ধবেই তাই কবছেন। দেহগত লক্ষণ তিনি সুবিধেব দেখছেন না। অথচ আবো দুজন সতীর্থ চিকিৎসকেব সঙ্গে সলাপবামর্শ কবেও সঠিক বোগেব হদিস পেযেছেন বলে মনে হয না। এক-একবাব ভেবেছেন হাসপাতালে এনে ফেলা দবকাব। আবাব মনে হযেছে, এই অবনতিব লক্ষণ গোটাগুটি স্নাযবিক প্রতিক্রিযাব দরুন। ধবা-ছোঁযাব মধ্যে কোন বোগ যখন দেখা যাচ্ছে না, তখন তেমন ভযেব কিছু নেই বোধ হয। স্নাযু সে-বকম বিকল হলে দেহেব অন্যান্য লক্ষণও তাব সঙ্গে যুক্ত হতে পাবে।

তিনি শুনেছেন বোগীব প্রকৃতি ভাবপ্রবণ। এব ওপব বড বকমেব মানসিক বিপর্যযেব যে কাবণ ঘটেছে তাও শুনেছেন। তিনি বিশ্বাস কবেননি, সম্ভব-অসম্ভবেব চিন্তাও তাঁব মাথায আসেনি। সুপ্ত বাসনাব একটা বিকৃত প্রকাশ ছাডা আব কিছু

ভাবেননি তিনি। যে বাতেব কথা শুনেছেন সেই বাতে, ছোকবা যে প্রকৃতিস্থ ছিল না তাতেও ডাক্তাবেব কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। আজকালকাব বোমান্সসর্বস্ব দুর্বলচিত্ত অতি আধুনিক ছেলে-ছোকবাদেব জানতে বাকি নেই তাঁব। যে কাবণেই হোক বড বকমেব একটা ধাক্কা খেযেছে, সেটা সামলে ভালো কোনো মানসিক চিকিৎসকেব হাতে ছেড়ে দিতে পাবলেই দাযিত্ব শেষ হতে পাবে ভাবছিলেন তিনি।

কিন্তু লক্ষণ দেখে ভিতবে ভিতবে তিনিও শঙ্কা বোধ কবছেন এখন।

বোগীব এই শেষ কথা শুনে আব তাব এই চাউনি দেখে সব থেকে বেশি চমকে উঠেছিল খববেব কাগজেব চ্যাটার্জী। বন্ধুদেব মধ্যে আবো দুই-একজন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ কবেছে। চ্যাটার্জীব কাছ থেকেই তাবাও ঘটনাব কিছু কিছু আভাস জেনেছিল। আব সাতদিন আগে উৎসবেব সেই বাত্রিশেষে একটা মজাব প্রহসন তাবা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ কবেছিল। কেউ কেউ অসংযত ঠাট্টা-বিদ্রূপে জর্জবিত কবেছে নবিসকে, হাতে পেযেও ছেড়ে দিলি? সঙ্গে ঢুকলি না? তোব মত হাঁদা প্রেমিককে কলা দেখাবে না তো কি, কোটেব শোক কবতে কবতে এখন বাড়ি গিযে ঘুমুগে যা—।

ঠাট্টা যাবা কবেছিল, ফিলিপ নবিসেব অন্তবঙ্গ বন্ধু খববেব কাগজেব চ্যাটার্জীও তাদেব একজন।

ফিলিপ নবিসেব এই কণ্ঠস্বব শুনে আব এই চাউনি দেখে ঘবেব অনেকেই নিজেদেব অজ্ঞাতে দবজাব দিকে তাকালো। মনে হল এই কথাব পব, এই আত্মসমর্পণেব পব দ্বাবপ্রান্তে বুঝি সত্যই কোন বমণীব নাটকীয আবির্ভাব ঘটবে। তা ঘটল না। বোগীব দৃষ্টি ধবে চ্যাটার্জীব চোখ যেদিকে ফিবল ঘবেব সেখানটায আলনা। আলনাব হ্যাঙ্গাবে গবম কোট ঝুলছে একটা। ফিলিপ নবিস সেদিকেই চেযে আছে, বিকাবেব চাউনি জানে, কিন্তু বড অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। যেন সেদিকে চেযে সত্যিই কাউকে দেখছে সে। ঠোঁট দুটো নডছে। বিডবিড কবে বলছে কিছু। শোনা যায না, কিন্তু চ্যাটার্জীব মনে হল সে বলছে, প্যাট মেনডোনসা, প্যাট মেনডোনসা...।

ঘবেব মধ্যে সব থেকে বেশি অস্বস্তি বোধ কবছে চ্যাটার্জী। এই ছ'দিনে অনেকবাব যে কথা মনে হযেছে, কোটটাব দিকে চেযেও আবাব সেই কথাই মনে হল। দিযে যখন দিযেই ছিল, এই কোটটা নবিস আব ফিবিযে না আনলেই পাবত। এই আনাটাই যেন ভুল হযেছে। কি ভুল, কেন ভুল— চ্যাটার্জীও জানে না। অথচ তাব সামনেই তো ওটা ফিবিযে এনেছে নবিস, চ্যাটার্জী নির্বাক দাঁড়িযে ছিল—অস্বস্তি বোধ কবেছিল, কিন্তু বাধা দেবাব কথা মনে হযনি।

ডাক্তাব আবাব ওষুধ খাওযালেন, ইনজেকশন দিলেন।

বাইবে এসে এক বন্ধু ভেবেচিন্তে চ্যাটার্জীকে বলল, দেখো এক কাজ কবো, উৎসবেব পবদিন পর্যন্ত তোমাবও মাথা খুব সাফ ছিল না বুঝতে পাবছি, তোমাদেব কাগজে প্যাট মেনডোনসাব নামে একটা বিজ্ঞাপন দাও—ফিলিপ নবিসেব এই অবস্থা জানিযে অতি অবশ্য তাব সঙ্গে এসে দেখা কবতে লেখো—এই বোম্বাই শহবে প্যাট মেনডোনসা হযত ডজন দুই বেরুবে, কোথায কাব সঙ্গে লটঘট বাঁধিযে বেখেছে কে জানে—বিজ্ঞাপন চোখে পডলে যে আসবাব ঠিক এসে হাজিব হবে'খন দেখে

নিও। তোমরা যে ঠিকানায় গেছলে সেটা একটা যোগাযোগ হতে পারে আর তার আগের রাত থেকে ফিলিপেরও মাথার গোলযোগ ঘটে থাকতে পারে—সে তো বেসামাল কথাবার্তাই বলছিল তখন, কেউ কি এক বর্ণও বিশ্বাস করেছে।

করেনি সত্যি। চ্যাটার্জী নিজেই করেনি। কিন্তু তারপরে যা সে দেখেছে অবিশ্বাস করবে কি করে। তবু নিজেরই তার বার বার ধাঁধা লাগছে, ধোঁকা লাগছে। ফিলিপের না-হয় মাথার গণ্ডগোল হয়েছিল, কিন্তু তারও কি হয়েছিল? বন্ধুর কথামত কাগজে বিজ্ঞাপন একটা দিয়েই দেখবে? পরমুহূর্তে কি আবার মনে পড়েছে— না, ভুল কিছু হয়নি, যারা জানে না তাদের এ-রকম ভাবাই স্বাভাবিক। কিন্তু চ্যাটার্জী ভাববে কি করে? এ যদি ভুল হয় তা হলে তার এই মুহূর্তের অস্তিত্বও ঠিক কিনা সন্দেহ।

যাক, এ নিয়ে চিন্তা-ভাবনার অবকাশও আর কিছু থাকল না। ডাক্তারের ওষুধ আর ইনজেকশনে ফিলিপ নরিস চোখ বুজেছে। সেই চোখ মেলে সে আর তাকায়নি। তার সেই রাতের ঘুম আর ভাঙেনি। কখন শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে নার্সও টের পায়নি। বন্ধুরাও পরদিন এসে তাকে মৃত দেখেছে।

এবারে আগের ঘটনাটুকু যোগ করলেও কাহিনী সম্পূর্ণ হবে কিনা বলা শক্ত।

ঘটনাস্থল বোম্বাইয়ের এক মস্ত নামজাদা ইঙ্গ-ভারতীয় ধাঁচের ক্লাব। নামজাদা ক্লাব না বলে নামজাদা সংস্থা বললেই বোধ করি ঠিক হবে। অনিবার্য কারণে নাম অনুক্ত থাক। এই ক্লাব বা ক্লাবের নিজস্ব প্রাসাদ-সৌধ সেখানকার সকলেই চেনেন। মেম্বাররা সর্বভারতীয় এবং কিছুটা সর্বদেশীয়। তবে একক সংখ্যার বিচারে গোয়ান মেয়ে-পুরুষের সংখ্যাই বোধ করি বেশি। এই গোয়ানদের মধ্যে আবার জাতের রেষারেষি আছে। গোঁড়া ব্রাহ্মিন-ক্রিশ্চিয়ান গোয়ানদের মাথা উঁচু—সামাজিক ব্যাপারে অধস্তন গোয়ানদের সঙ্গে সচরাচর তারা আপস করে না। কিন্তু এই ক্লাব অনেকটা শ্রীক্ষেত্রের মত। এখানে জাত-বর্ণের খোঁজ বড় পড়ে না।

এখানে প্রবেশের প্রধান ছাড়পত্র আর্থিক সংগতি। যার টাকা আছে আর তারুণ্যের পিপাসা আছে তার কাছে ক্লাবের দ্বার অবারিত। বহু লক্ষপতি বা ক্রোড়পতি প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ এই সংস্থার পৃষ্ঠপোষক। নবীন সভ্য-সভ্যাদের টাকার জোরের থেকে দিল-এর জোর বেশি। টাকার থেকেও তাদের বড় মূলধন আনন্দ আহরণের উৎসাহ আর উদ্দীপনা। এই উৎসাহ আর উদ্দীপনার ফলেই সাধারণত সংস্থার মুরুব্বীদের সঙ্গে যোগযোগ ঘটে যায়। এখানে ইচ্ছার বেগই প্রধান। এখানে এসে হিসেবের খাতার পাতা খোলে না।

চ্যাটার্জী এখানে ভিড়তে পেরেছে টাকার জোরে নয়, তার কাগজের জোরে। আর কিছুটা তার সুপটু যোগাযোগের ফলে। সুমার্জিত কৌশলে সব-জান্তার আসরে যে নামতে পারে, দুনিয়া উলটে-পালটে গেলেও খুব একটা কিছু যায় আসে না এমনি নির্লিপ্ত মাধুর্যে যে অবকাশ যাপন করতে পারে—এখানে তারই কদর বেশি। সেই হিসেবে চ্যাটার্জী প্রিয়পাত্র এখানকার। ফিলিপ নরিসের বিশেষ গুণ হল সে টাকা যা রোজগার করে তার থেকে বেশি খরচ করতে জানে। নিজের গতিবিধি আচার-আচরণ

সবল, সংযত—অথচ বন্ধুবান্ধববা তাব বেশিব ভাগই বেপবোযা, সদা মুখব। কাবো টাকাব দবকাব হলে অসঙ্কোচে হাত পাতো ফিলিপ নবিসেব কাছে, হাতে থাকলে সে তক্ষুনি দিযে দেবে। না থাকলে, আব টাকাব প্রযোজন যাব সে প্রিযপাত্র হলে, ধাব কবে এনে দেবে। দিযে অনুগ্রহ কববে না, নিজেই অনুগৃহীত হবে। ব্যাঙ্কে মোটামুটি ভালো চাকবিই কবে, ব্যাচিলব, তাই ভালো হোটেলে আলাদা একখানা ঘব নিযে থাকাব সংগতি আছে।

তাহলেও ফিলিপ নবিস ক্লাবেব প্রথম সাবিব কেউ নয। অর্থাৎ চ্যাটার্জীব মত নিজেব গৌববে প্রতিষ্ঠিত নয। সকল সভ্য বা সভ্যাবা ভালো কবে চেনেও না তাকে। তাব উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিব দরুন সভাব আলো উজ্জ্বল বা স্তিমিত হয না। তাব মত সাদামাটা সভ্যসংখ্যা শতকেব ওপব। দু'দশজনেব কাছে যেটুকু খাতিব সে পায তাও চ্যাটার্জীব সঙ্গে তাব অন্তবঙ্গতাব দরুন। এইজন্যই চ্যাটার্জীব প্রতি সদা কৃতজ্ঞ সে। কৃতজ্ঞতাব আবো কাবণ আছে, চ্যাটার্জীব সক্রিয সহযোগিতায তাব কাগজে নবিসেব দুই-একটা আবেগমুখব প্রবন্ধও ছাপা হযেছে। তিবিশ টাকা দক্ষিণা পেলে আনন্দাতিশয্যে ষাট টাকা খবচ কবে বসেছে সে, তবু চ্যাটার্জীব ঋণ শোধ হযেছে ভাবেনি।

গুণমুগ্ধ দুই-একটি ভক্ত সকলেই পছন্দ কবে। চ্যাটার্জীবও ভালো লাগে ফিলিপ নবিসকে।

ক্লাবেব বার্ষিক উৎসবেব বাত সেটা। গোটা প্রাসাদ আলোয আলোয একাকাব। ছ'মাস আগে থেকেই এই একটা বাতেব প্রতীক্ষা কবে থাকে সকলে। এক বাতেব উৎসবে কত হাজাব টাকা খবচ হয সে প্রসঙ্গ অবান্তব। সভ্য এবং অতিথি-অভ্যাগতদেব গাড়িব ভিড়ে প্রাসাদসৌধেব সামনেব দুটো বড় বড় বাস্তাব অনেকটাই আটকে থাকে।

সমস্ত বাতেব উৎসব—খাওযাদাওযা নাচগানেব ঢালা ব্যবস্থা। যে সমযেব ঘটনা, বোম্বাই শহব তখন 'ড্রাই' নয, অতএব বহুবকম বঙিন পানীযেব ব্যবস্থাবও ত্রুটি ছিল না কিছু। বাত বাবটাব পবে ডান্স হলে যখন নাচেব ডাক পড়ল, নিজেব নিজেব দুটো পাযেব ওপব তখন অনেকেবই খুব আস্থা নেই।

..সেই মেযেটিব দিকে আবাব চোখ পড়ল ফিলিপ নবিসেব। এই নিযে বাবকযেক চোখ গেল তাব দিকে। খুব রূপসী না হলেও সুশ্রী। বছব পঁচিশ-ছাব্বিশ হবে বযস। এই উৎসবে এই বযসেব সঙ্গীহীন মেযে বড় দেখা যায না। ডান্স হলেব দবজাব ওধাবেব দেযাল ঘেঁষে কেমন যেন বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িযে আছে। একা। সকলেই যে নাচছে তা নয, কিন্তু ওই মেযেটিব মত একা কাউকে মনে হল না নবিসেব। মুখখানা মিষ্টি কিন্তু বড় শুকনো—এক ধবনেব বিষণ্ণ ঘুম-জড়ানো চোখ-মুখ-চাউনি। এই পবিবেশ মেযেটিব যেন পবিচিত নয খুব—মনে হল সেই থেকে সে যেন কাউকে খুঁজছে। অন্যমনস্কেব মত নাচ দেখছে এক-একবাব, আবাব শ্রান্ত দৃষ্টিটা এদিক-ওদিক ফিবিযে আগন্তুকদেব মুখ দেখে নিচ্ছে।

এখানে, বিশেষ কবে এই সমযে কাবো দিকে কাবো চোখ নেই। সকলেই যে যাব সঙ্গী-সঙ্গিনী বা বন্ধু-বান্ধব নিযে ব্যস্ত। এই বাতেব মত বাতে সঙ্গী বা সঙ্গিনী

থাকার কথা নয় ফিলিপ নবিসেরও। সে নাচতে একটু-আধটু জানে বটে, কিন্তু এগিয়ে এসে কাউকে ডেকে নিতে জানে না। সে মদও সচরাচর খায়ই না, তবে আজ সামান্য খেয়েছে, আর তাইতেই বেশ একটু আমেজের মত লাগছে। ভালো লাগছে। একটু আনন্দ করার ইচ্ছে তার মধ্যেও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। কিন্তু সহজাত সঙ্কোচে কারো দিকে এগোতেও পারছে না। আর এগোবেই বা কার দিকে, সকলেই ব্যস্ত, আনন্দমগ্ন।

মেয়েটির বিষণ্ণ ঠাণ্ডা দৃষ্টিটা ফিলিপ নবিসের মুখের ওপরেও আটকালো দুই একবার। লোকটিও তাকে দেখছে মনে হতেই দৃষ্টিটা চট করে সরে গেল না মুখ থেকে।

ফিলিপ নবিস উঠে মেয়েটির কাছে এলো একসময়। সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি কারো অতিথি এখানে?

সামনে এসে মেয়েটির চোখ-মুখ আরো নিষ্প্রভ বিষণ্ণ মনে হল নবিসের। কেমন এক ধরনের আত্মবিস্মৃত জড়তার ভাব। মুখ তুলে তার দিকে তাকাল মেয়েটি। কয়েক মুহূর্ত চেয়েই রইল। তারপর আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল। অস্ফুট শ্রান্ত স্বরে বলল, না...আমি কেমন করে যেন এসে পড়েছি।

সঙ্গে সঙ্গে ফিলিপ নবিস উদার হয়ে উঠল, বলল, বেশ করেছেন, ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম মাদাম, দয়া করে নিজেকে আপনি আমার অতিথি ভাবুন। আগে কি খাবেন বলুন? মেয়েটি নিঃশব্দে চেয়েই আছে তেমনি। অথচ নবিসের মনে হল সে যেন কিছু স্মরণ করতে চেষ্টা করছে। বলল না, কিছু খাব না। একটু থেমে আবার বলল, দেখো আমি সেই থেকে একজনকে খুঁজছি, পাচ্ছি না...ভাবলাম এখানে থাকতেও পারে। তুমি কি বলতে পারবে...

হঠাৎ 'তুমি' শুনে নবিস রীতিমত অবাক। অথচ মেয়েটি যে খেয়াল না করেই বলেছে তাতেও ভুল নেই। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, এখানকার মেম্বার? কি নাম?

নবিস বিস্মিত। কি নাম তাও চট করে মনে করতে পারছে না। স্মরণের চেষ্টা। বেশি মাত্রায় মদটদ খেয়েছে কিনা নবিসের সেই সন্দেহ হল একবার। না, তাহলে টের পেত। মনে পড়েছে। মনে পড়ার দরুনই যেন মেয়েটির শ্রান্ত মুখখানা উজ্জ্বল দেখালো একটু। অস্ফুটস্বরে বলল, ডিসুজা...মার্টিন ডিসুজা...চেনো?

নবিস মাথা নাড়ল, চেনে না।

মেয়েটির বিষণ্ণ মুখখানা বড় অদ্ভুত লাগছে নবিসের। রাজ্যের অন্যমনস্কতার দরুন সে যেন খুব কাছে নেই। একটা লোকের সন্ধানে এখানে এসে পড়েছে তাও কম আশ্চর্যের ব্যাপার নয়। কোথায় থাকে ডিস্‌জা, কি করে তাও স্মরণ করতে পারল না। নবিসের কেমন মনে হল, মেয়েটি যে কারণেই হোক বড় অসুখী, তাই খুব প্রকৃতিস্থ নয়। কিছু মানসিক রোগ থাকাও বিচিত্র নয়। যার নাম করছে, তার কাছে থেকেই হয়ত বা বড় রকমের কোনো আঘাত পেয়েছে।

নবিস বলল, দেখো এটা আনন্দের হাট, এই আনন্দের টানেই তুমি এসে পড়েছ—বি চিয়ারফুল অ্যাণ্ড হ্যাপি, আমাকে তোমার বন্ধু ভেবে নাও, নাচবে একটু?

ঠোঁটের ফাঁকে হাসির আভাস ফুটল একটু। ঘুম-জড়ানো ভাবটা কাটিয়ে উঠছে

যেন। দেখছেই তাকে। এত কি দেখছে নবিস ভেবে পেল না। তাব মুখেব দিকে চেয়ে যেন বিস্মবণেব ধাপগুলো উত্তীর্ণ হতে চেষ্টা কবছে।

মাথা নাড়ল— নাচবে।

ডান্স হল। তাবা আস্তে আস্তে নাচছে। বাহু স্পর্শ কবে নবিসেব মনে হযেছে মেযেটি বড দুর্বল, হযত অনেকটা পথ পাব হযে নিজেব অগোচবে এখানে চলে এসেছে। সহৃদয সুবে বলল, আগে কিছু খেযে নাও না, এই উৎসব সমস্ত বাত ধবে চলবে।

তাব চোখেব আত্মবিস্মৃত দৃষ্টি এখন আবো একটু বদলেছে। নাচেব ফাকে নবিসেব মুখখানাই দেখছে ঘুবে ফিবে, এই চোখ ঈষৎ প্রসন্ন। মেযেটিব তাকে পছন্দ হযেছে বোঝা যায। মাথা নেড়ে জানালো খাবাব ইচ্ছে নেই। হঠাৎ জিজ্ঞাসা কবল, তোমাব নাম কি?

নবিস...ফিলিপ নবিস। তোমাব?

প্যাট মেনডোনসা।. তুমি খুব ভালো.. ডিসুজাব মতই দবদী.. তুমি কি ব্রাহ্মিন ক্রিশ্চিযান?

নবিস হঠাৎ এ প্রশ্নেব তাৎপর্য বুঝল না।—না, কেন বলো তো?

নয শুনে প্যাট মেনডোনসাব চোখে-মুখে খুশিব আভাস। জবাব না দিযে চুপ কবে বইল। একটু বাদে বলল, আমাব কেমন শীত-শীত কবছে।

নবিস কি কবতে পাবে। আধঘণ্টাব আলাপে মেযেটিব প্রতি মাযা অনুভব কবছে কেন জানে না। আব কোনো মেযেব ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে কখনো আসেনি বলেও হতে পাবে। এ যেন এবই মধ্যে তাব প্রতি নির্ভবশীল হযে পড়েছে। আব একটু কাছে টেনে আনল, নাচেব গতি বাড়িযে দিল। সঙ্গী এত সদয বলেই যেন প্যাট মেনডোনসা কৃতজ্ঞ, সে কাছে ঘেযে এসেছে, মন্থব পাযে নাচছে, আব প্রসন্ন চোখে দেখছে তাকে।

বিশ্রামেব জন্য দুজনে একটা নিবিবিলি কোণে গিযে বসল একটু। আব তখনি প্যাট মেনডোনসা অস্ফুট ক্লান্ত সুবে বলল, আমাব ভযানক শীত কবছে। আমি আব থাকতে পাবছি না.

জামাব ওপব তাব কাধে হাত বেখে নবিস বিচলিত হল একটু। গা'টা সত্যি বড বেশি ঠাণ্ডা। আবাব আগেব মতই শ্রান্ত আব ক্লান্ত মনে হল তাকে। তাড়াতাড়ি উঠে নবিস নিজেব দামী গবম কোটটা নিযে এসে তাব গাযে পবিযে দিল। বলল, তোমাকে খুব সুস্থ লাগছে না, আব বাত না কবে তুমি একটা ট্যাক্সি ধবে বাড়ি চলে যাও— বাড়ি কোথায?

বান্দ্রা...।

বেশি দূবে নয তাহলে। প্যাট মেনডোনসাব গাযে তাব নিজেব কোটেব পকেট হাতড়ে এক টুকডো কাগজ আব কলম বাব কবল। পলকে কি ভেবে সে দুটো তাব দিকেই বাড়িযে দিল।—তোমাব বাড়িব ঠিকানা লিখে দাও, কাল সকালে গিযে আমি কোটটা নিযে আসব'খন।

এ-বকম বিদাযটা যেন খুব পছন্দ নয মেযেটিব, মুখেব দিকে খানিক চেযে থেকে

নাম, বাড়ির নম্বর আর ঠিকানা লিখে দিল। কাগজটা নিজের পকেটে রেখে নবিস বলল, চলো তোমাকে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে আসি।

দোতলার সিঁড়ির কাছে আসার আগেই সামনের লম্বা প্যাসেজের দিকে চোখ পড়তে মেনডোনসা দাঁড়াল।—ও-দিকটা কি?

বাথ.

অস্ফুট স্বরে বলল, আমি যাব, দেখিয়ে দাও—

প্যাসেজ ধরে পায়ে পায়ে খানিকটা এগিয়ে নবিস দাঁড়াল। প্যাট মেনডোনসা হালফ্যাশানের মস্ত বাথরুমের দরজা পর্যন্ত গিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। গম্ভীর ক্লান্ত দুটো চোখ আবার নবিসের মুখে এসে আটকালো। মাথা নেড়ে ডাকল তাকে।

ঈষৎ বিস্মিত মুখে সে কাছে আসতে বলল, তুমিও এসো।

হঠাৎ হতভম্ব বিমূঢ় নবিস। বলে কি। এ কার পাল্লায় পড়ল সে। তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে উঠল, না না, কিছু ভয় নেই, তুমি যাও, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি।

রমণীর নিষ্পলক দুই চোখ তার মুখের থেকে নড়ছে না। এই মুখে আর চোখে একটা কঠিন ছায়া পড়ছে। শান্ত ঠাণ্ডা গলায় আবার বলল, তুমিও এসো।

প্রায় আদেশের মত শোনালো। নবিস ঘাবড়েই গেল। কপালে ঘাম দেখা দিল। এ কি সাঙ্ঘাতিক মেয়ে। ভয় নেই, সঙ্কোচ নেই—নাকি এও মানসিক রোগ কিছু। বিস্ময় সংবরণ করে এবারে জোর করেই মাথা ঝাঁকালো নবিস, বলল, আঃ, কেউ এসে পড়লে কি ভাববে। বলছি তুমি যাও, আমি এখানে দাড়াচ্ছি—

প্যাট মেনডোনসা চেয়েই আছে— চেয়েই আছে। তারপর আস্তে আস্তে বাথরুমের দরজা খুলল সে। ভিতরে ঢুকল। দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল নবিসের। ভালয় ভালয় এখন ট্যাক্সিতে উঠলে হয়।

জানালায় ঠেস দিয়ে একটা সিগারেট ধরালো সে। অদ্ভুত মেয়েটার কথাই ভাবছে।

হঠাৎ সচকিত। একটা আস্ত সিগারেট শেষ হয়ে গেল, আর একটা কখন ধরিয়েছে এবং আধাআধি শেষ করেছে খেয়াল নেই—অথচ প্যাট মেনডোনসা এখনো বেরোয়নি। বাথরুমের দরজা বন্ধ।

দ্বিতীয় সিগারেট শেষ হল। নবিস পায়চারি করছে। কিন্তু দরজা খোলার নাম নেই।

তারপর আরো আধঘণ্টা কেটে গেল। নবিস বিলক্ষণ ঘাবড়েছে। দরজা ঠেলেছে, দরজায় মৃদু আঘাত করেছে, ডেকেছে—কিন্তু ভিতর থেকে কোন সাড়াশব্দ নেই। তারপর একটা করে মিনিট গেছে আর নবিসের ভয় বেড়েছে। গোড়া থেকেই কেমন লাগছিল মেয়েটাকে—ভিতরে অজ্ঞান-টজ্ঞান হয়ে গেল, নাকি কোনো অঘটন ঘটিয়ে বসল।

ঘড়ি দেখল। সাড়ে তিনটে বেজে গেছে রাত্রি। তার মানে একঘণ্টার ওপর সে দাঁড়িয়ে আছে প্যাসেজে। বিমূঢ় নবিস কি করবে দিশা পেল না। জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিল কয়েকবার। মজবুত দরজা একটু কাঁপল শুধু।

নবিস দৌড়লো হঠাৎ। আধভাঙা আসর থেকে চ্যাটার্জীকে খুঁজে বার করল।

চ্যাটার্জী প্রকৃতিস্থই আছে বটে, কিন্তু নিজের হাতপায়ের ওপর দখল খুব নেই। তাকে একবকম টানতে টানতেই নিয়ে এলো নবিস। চ্যাটার্জীর পিছু পিছু আর দুই-একজন উৎসুক বন্ধুও এলো। খুব সংক্ষেপে ব্যাপারটা শুনে তারাও অবাক। খানিকক্ষণ দরজা ধাক্কাধাক্কি করল তারাও।

শেষে কেয়ারটেকারের তলব পড়ল। বেগতিক দেখে কেয়ারটেকার পুলিসে ফোন করল। পুলিস এসে দরজা ভাঙল যখন, তখন প্রায় সকাল।

ভিতরে কেউ নেই।

একসঙ্গে বহু জোড়া বিস্মিত দৃষ্টির ঘায়ে নবিস বিভ্রান্ত, বিমূঢ়। বাহ্যচেতনা লোপ পাবার উপক্রম তার।

সুরার ঝোঁকে দুই-একজন ঠাট্টা করল, নবিসের প্রেয়সী বাথরুমের জানালা দিয়ে নিশ্চয় পাখী হয়ে উড়ে পালিয়ে গেছে। নইলে ভিতর থেকে উধাও হবার আর কোন পথ নেই!

কেয়ারটেকার বা পুলিসের লোকেরও ধারণা হল, নবিস বেসামাল হয়েছিল হয়ত, ভিতরে যে ঢুকেছিল সে কখন বেরিয়ে চলে গেছে খেয়াল করেনি—আর বাইরে থেকে দরজার হ্যাণ্ডেল টানাহেঁচড়ার ফলে হোক বা অন্য কোন অস্বাভাবিক কারণে হোক ভিতরের ল্যাচ আটকে গেছে। বাইরে থেকে টানাহেঁচড়া করে বা কোনরকম অস্বাভাবিক কারণে এই দরজার ল্যাচ আটকে যেতে পারে কিনা—এই দিনের এই সময়ে তা নিয়ে গবেষণা করার মত ধৈর্য কারো নেই।

চ্যাটার্জী হতভম্ব নবিসকে একদিকে টেনে এনে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল, রাত্তিরে কতটা খেয়েছিলে?

নবিস সত্যি কথাই বলল, কিন্তু চ্যাটার্জীর সংশয় গেল না। বলল, অভ্যেস নেই —ওটুকুতেই গণ্ডগোল হয়েছে।

তাকে বিশ্বাস করানোর ঝোঁকে পকেট থেকে চিরকুট বার করল নবিস. এই দ্যাখো. আমার কোট গায়ে দিয়ে গেছে. নিজের হাতে নাম বাড়ির ঠিকানা লিখে দিয়েছে—

চ্যাটার্জী দেখল। রাতের ধকলে তার মাথাও খুব পরিষ্কার নয়। তবু একমাত্র সংগত মন্তব্যই করল সে। বলল. তাহলে তুমি যখন জানালার দিকে ফিরে সিগারেট খাচ্ছিলে তখনই বেরিয়ে চলে গেছে সে— তুমি টের পাওনি। নিশ্চয় তোমার মতলব ভালো মনে হয়নি তার. তাই—

নবিস তখন আদ্যোপান্ত ব্যাপারটাই বলল তাকে। মতলব যে তার ভালো ছিল না তাও গোপন করল না। শুনে চ্যাটার্জী হাঁ করে চেয়ে রইল তার দিকে—বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পেল না।

এদিকে চ্যাটার্জীর ওই শেষের যুক্তিই সম্ভবপর মনে হয়েছে নবিসের। সে যখন জানালার দিকে ফিরে সিগারেট টানতে টানতে অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল. মেয়েটা তার অলক্ষ্যে তখনই চলে গিয়ে থাকবে। এ ছাড়া কি আর হতে পারে! তার অনভ্যস্ত জঠরে ওই সামান্য সুরাই হয়ত কিছুটা আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল তাকে। আর, মেয়েটা

যে কষ্ট হয়েছিল সে তো বোঝাই গেছে—তাই কোনরকম বিদায়সম্ভাষণ না জানিয়েই চলে গেছে।

ঘণ্টাতিনেক নবিসের ঘরেই ঘুমালো চ্যাটার্জী, তারপর নবিস ঠেলে তুলল তাকে। তাকে নিয়ে সে প্যাট মেনডোনসার বাড়ি যাবে কোট আনতে।

ঘুম তাড়িয়ে নবিসের সঙ্গ নিল চ্যাটার্জী। যে মেয়ে ওভাবে নিজেকে এগিয়ে দিতে চেয়েছিল, তাকে একবার দেখার কৌতূহলও ছিল। চিরকুটের নম্বর মিলিয়ে বান্দ্রার বাড়ির ঠিকানায় এসে দাঁড়াল তারা। কড়া নাড়তে এক বৃদ্ধ দরজা খুলে দিলেন।

নবিস প্যাট মেনডোনসার খোঁজ করতে বৃদ্ধটি খানিক চেয়ে রইলেন মুখের দিকে। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা কে?

নবিস জানালো তারা কে এবং কেন এসেছে। গত রাতের ফাংশানে শীত করছিল বলে প্যাট মেনডোনসা তার কোট গায়ে দিয়ে বাড়ি ফিরেছে, সেই কোটটা ফেরত নিতে এসেছে তারা। নাম ঠিকানা লেখা চিরকুটটা তার দিকে বাড়িয়ে দিল নবিস।

বৃদ্ধ দেখলেন। গম্ভীর। বললেন, আচ্ছা আপনারা বসুন একটু—

ভিতরে চলে গেলেন তিনি। একটু বাদে বাঁধানো একটা ফোটো হাতে ফিরলেন। সেটা এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, দেখুন তো, এর মধ্যে কেউ কাল আপনার কোট নিয়ে এসেছিল কিনা।

বৃদ্ধের ব্যবহারে এরা দুজনেই মনে মনে বিস্মিত। সামনে আট-দশটি নারীপুরুষের বড় গ্রুপ ফোটো একটা। সেটার দিকে এক নজর তাকিয়ে আঙুল দিয়ে প্যাট মেনডোনসাকে দেখিয়ে দিল নবিস। বলল, ইনি—

দু' চোখ টান করে বৃদ্ধ নবিসের দিকে চেয়ে রইলেন খানিক। নবিস জিজ্ঞাসা করল, ইনি কি এ বাড়িতে থাকেন না?

থাকত— এখন থাকে না। আমার এই মেয়ে দু'বছর আগে মোটর অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

নবিস আর তার সঙ্গে চ্যাটার্জীও কি সত্যি শুনছে, নাকি এখনো রাতের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে। সত্যিই কোথায় তারা?

চেতনারহিতের মত আরো একটু খবর শুনল। বৃদ্ধ জানালেন, বাড়ির সব থেকে সেরা মেয়ে ছিল এই প্যাট মেনডোনসা—মার্টিন ডিসুজা নামে এক ছেলেকে সে বিয়ে করতে চেয়েছিল। সকলে ধরেও নিয়েছিল বিয়ে হবে। কিন্তু ডিসুজার বাপ-মা'র বড় গর্ব তারা ব্রাহ্মিন ক্রিশ্চিয়ান—বিয়ে হতে দিলে না। বিয়ে হবে না শুনে মেয়েটার মাথাই হয়ত বিগড়ে গিয়েছিল, নিজে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিল ডিসুজার বাড়ি থেকে—দাদারে সাংঘাতিক অ্যাকসিডেন্ট হল—তক্ষুনি শেষ। অ্যাকসিডেন্টের খবরটা কাগজে বেরিয়েছিল।

অনেকক্ষণ রাস্তায় ঘুরে ঘুরে কাটাল নবিস। চ্যাটার্জী ঠেলে তাকে বাড়ি নিয়ে যেতে পারল না। মুখে কথা নেই। কেমন যেন হয়ে গেছে। খানিক বাদে ফুল কিনল এক গোছা, চ্যাটার্জীকে নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠল।

সমাধিক্ষেত্র। নিঃশব্দে খুঁজতে খুঁজতে এগোচ্ছে দুজনে। বেশি খুঁজতে হল না। হঠাৎ একদিকে চোখ পড়তে নিস্পন্দ কাঠ দুজনেই। ওই ছোট সমাধি একটা—। সমাধির

ওপব ক্রস। ক্রস-এ ঝুলছে নবিসেব সেই কোট। সমাধিব গাযে নামেব হবপ—প্যাট মেনডোনসা।

নির্বাক স্তব্ধ দুজনেই। অভিভূতেব মত কতক্ষণ দাডিযেছিল সমাধিব সামনে হুঁশ নেই।

নবিস ফুল দিল। ক্রস-এব ওপব থেকে কোটটা হাতে তুলে নিল। বলল, চলো—

ফিলিপ নবিসেব হাতে কোটটা দেখে কি এক অজ্ঞাত অস্বস্তি বোধ কবছিল চ্যাটার্জী। কিন্তু বলা হযনি, ওটা থাক।*

মেজর সেবকরাম

সন্ধ্যাব পব আজ বেশ একটু সময নিযে আব বেশ একটু যত্ন কবে প্রসাধন পর্বে মনোনিবেশ কবেছেন মিসেস সেবকবাম। মুখখানা হাসি-হাসি। হাসি-হাসি কেন, আযনায নিজেব দিকে চেযে মাঝে মাঝে হাসছেনও মিটি-মিটি। কিছুদিন আগেও পার্টি শুনলে গাযে জ্বব এসেছে। গোমডামুখ কবে প্রসাধন সেবেছেন। বিশেষ কবে মেস ক্লাবেব ডিনাব পার্টি শুনলে না যাবাব ফিকিব খুঁজেছেন এই বযসেও। যে হৈ-হুল্লোড কাণ্ড সব, বযসেব বাছবিচাব নেই, ছেলে-বুডোতে মিলে ফষ্টি-নষ্টিব হাট। মিসেস সেবকবাম একবাব এক বছবেব একটা লিস্ট কবেছিলেন—গোটা বছবে কতগুলো পার্টি হল। তাতেও অফিস পার্টি অর্থাৎ যাতে তাদেব নিমন্ত্রণ নেই, সেগুলো বাদ দিযেছিলেন। তাবপব কর্তাকে ঠাট্টা কবেছিলেন, মিলিটাবী চাকবি মানে তো শুধু পার্টি আব পার্টি।

এই ঠাট্টাব পবেই অবশ্য দুর্দৈব ঘটেছিল। চীনা আক্রমণে হিমালযেব শান্তি নডে উঠেছিল। তখন এক এক কর্মক্ষেত্রেবই আবাব আব এক রূপ দেখেছেন মিসেস সেবকবাম। সার্ভিসেব লোকগুলোকে নিযে যেন হবিব লুট লেগেছিল। কে কোথায ছিটকে পডেছিল ঠিক নেই। আজ যে এখানে কাল সে কোন সীমান্তে ঠিক নেই। সেদিনেব কথা মনে পডলেই একখানা হাসি-হাসি-মুখ বুকেব তলায খচখচ কবে মিসেস সেবকবামেব। তাঁব থেকে অনেক ছোট অথচ কি নজবে যে দেখেছিল তাকে, কে জানে।—ক্যাপ্টেন বিঠঠল, বড জোব চল্লিশ হবে বযস। মিসেস সেবকবাম কোন পার্টিতে গেলেই কাছে কাছে ঘুব-ঘুব কবত, তিনি এদিক ওদিক তাকালেই পাঁচবাব কবে ছুটে আসত কিছু চাই কিনা জিজ্ঞাসা কবতে। চাই বললে খুশি হত, চাই না বললে মুখখানা বেজাব কবত। মিসেস সেবকবাম তাব ওপবঅলাব স্ত্রী, সেই হিসেবে কিছুটা অনুকম্পাব পাত্র। তা এসব পার্টিতে লেডিদেব অনুকম্পাব পাত্র সকলেই - —সে লেফটেনেন্ট কর্ণেলই হোক আব নবাগত লেফটেনেন্টই হোক। সম্মিলিত পার্টিতে সামান্য অফিসাবেব স্ত্রীবও বাজবাণীব মর্যাদা।

---

* আখ্যানেব বক্তা খববেব কাগজেব চ্যাটার্জী আমাব বন্ধু। মূল ঘটনাটি সত্যি বলে তাঁব দাবি।

তবু বড় অফিসাবদেব স্ত্রীদেব ছোট অফিসাববা নিজেদেব অগোচবেও কিছুটা সমীহ্ কবে থাকে। কিন্তু সেদিন ক্যাপ্টেন বিঠঠলেব পানেব মাত্রা বোধ হয একটু বেশী হয়ে গিয়েছিল। সবিনয়ে চুপি চুপি প্রস্তাব কবেছিল, মাদাম, আজ যদি অনুগ্রহ কবে আমাব সঙ্গে নাচেন। মিসেস সেবকবাম পার্টিব এই অধ্যাযটা ববাবব সন্তর্পণে পবিহাব কবে এসেছেন। আঠাব-কুড়ি বছব বযস থেকেই এই এক ধকল তাঁকে সামলে আসতে হয়েছে। বুড়ো বুড়ো ওপবঅলা অফিসাবগুলো পর্যন্ত হ্যাংলাব মত এই অনুগ্রহ প্রার্থনা কবেছে। কিন্তু মিসেস সেবকবাম নাচ শেখেনইনি মোটে। গোড়ায গোড়ায মেজব চেষ্টা কবেছিলেন শেখাতে—অবশ্য চেষ্টা যখন কবেছিলেন তখন তিনি মেজব নন, নতুন বযসেব লেফটেনেন্ট। ছদ্ম কোপে তখন চোখ পাকিয়েছেন মিসেস সেবকবাম, তোমাদেব মিলিটাবী চাকবিতে এত বউ ধবে টানাটানি কেন, নিজেবা যা কবছ কবোগে।

কিন্তু এই বযসে বিঠঠলেব ওই প্রস্তাবে যেমন অবাক হয়েছেন তেমনি বিবক্ত হয়েছিলেন। মেজবকে বলেছিলেন, ছোকবাব একটা বিয়েব ব্যবস্থা কবো, ওব মাথায গণ্ডগোল হয়েছে, আজ আবাব আমাব সঙ্গে নাচতে চেয়েছিল।

মেজব সেবকবাম হা-হা কবে হেসে উঠেছিলেন, বলেছিলেন, এবাব থেকে তোমাব বযসেব একটা কার্ড তুমি গলায ঝুলিয়ে যেও।

সেই ক্যাপ্টেন বিঠঠলেব বিদায পার্টি ছিল সেদিন—সুদূব ফ্রন্ট-এ হাজিবা দেবাব নির্দেশ এসেছিল তাব উপব। বিদায সম্বর্ধনাব পবে মেজবেব সামনেই সে এসেছিল মিসেস সেবকবামেব কাছে। সৌজন্যেব বীতি অনুযাযী মিসেস সেবকবাম তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন, সুস্থ পবমাযু কামনা কবেছিলেন। ছেলেটা চুপচাপ খানিক তাকিয়েছিল তাঁব দিকে, তাবপব অনুমতি প্রার্থনা কবেছিল, আপনাব হাতখানা ধবতে পাবি?

মিসেস সেবকবাম বিব্রত বোধ কবেছিলেন, ওদিকে স্বামী নীববে একটু ইশাবা কবেছিলেন। মিসেস সেবকবাম একটা হাত তাব দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। দুই হাতে প্রগাঢ় আবেগে সেই হাতখানা নিয়ে নিজেব ঠোঁটে ঠেকিয়েছিল ক্যাপ্টেন বিঠঠল। তাবপবেও ধবে বেখেছিল কযেক মুহূর্ত। তাবপব সসম্ভ্রমে ছেড়ে দিয়ে বলেছিল, মাদাম, এই দুটো বছব আপনাকে বড় ভালো লেগেছে। হাসি-খুশি দবদ মর্যাদাবোধ—সব মিলিয়ে আপনাকে দেখলেই মনে হয়েছে, ইউ বিপ্রেজেন্ট মাদাব ইণ্ডিযা।

মিসেস সেবকবাম স্বামীব দিকে চেয়ে দেখেছেন, চোখ দুটো তাঁব অদ্ভুত চকচক কবছে। দেশেব প্রসঙ্গে এই চোখ তিনি জীবনে অনেক দেখেছেন।

মাসখানেকেব মধ্যে ফ্রন্ট থেকে ক্যাপ্টেন বিঠঠলেব মৃত্যুসংবাদ এসেছে। তাব বীবত্ব আব দুঃসাহসিক মৃত্যুববণেব বিববণও এসে পৌঁচেছে। সকলে গর্ব অনুভব কবেছে। গোপনে অনেকবাব চোখেব জল মুছেছিলেন মিসেস সেবকবাম।

এব কিছুদিন বাদেই নিজেব স্বামীকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। মেজবকে হাজিবা দিতে হয়েছে সুদূব লদাকে। সেই দীর্ঘ সমযটা কি ভাবে কেটেছিল মিসেস সেবকবামেব তিনিই জানেন। এই দুটো ঘটনাব পব থেকে বাকি এ-কটা বছব পার্টিব অনেক প্রগলভ

হৈ-চৈ এমন কি অনেক ক্ষেত্রে প্রায় অশালীন ফুর্তি দেখেও তিনি বিরক্ত হননি।...আহা, কে কবে আছে আর নেই কে জানে, জীবনের তো এই দাম সব!

কিন্তু আজ নিজের খুশির আমেজেই সুচারু প্রসাধন সম্পন্ন করছেন মিসেস সেবকবাম। তাঁব বয়স পঞ্চাশ ছুঁয়েছে। চুলের বোঝার ফাঁকে ফাঁকে অনেকগুলোতে পাক ধবেছে। কিন্তু সাজগোজ কবে পার্টিতে গেলে সেখানকাব পঞ্চাশোর্ধ্বেবা তাঁব দিকেই বেশি ঘেঁষে। মেজরের এখন আটান্ন, সব চুল সাদা। দুই ছেলে মিলিটারী কলেজে ভবিষ্যৎ সৈনিক হবাব জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। মেজব ঠাট্টা কবেন, আমাব সঙ্গে তোমাব পার্টিতে যাওযার অনিচ্ছাব কাবণটা বুঝতে পাবি, ছেলেদেব যখন বড় বোন ভাবে লোকে তোমাকে, আমাকে কি ভাবে কে জানে।

এই বেপবোযা বসিকতাবও হেতু আছে। ছেলেবা সেবাবে ছুটিতে বাড়ি আসতে একজন সদ্য পবিচিত ভদ্রলোক মিসেসকে জিজ্ঞাসা কবেছিলেন. এঁবা দুটি আপনাব ছোট ভাই নাকি?

কিন্তু মুখে যাই বলুন মেজব. তাঁব ওই চুলই শাদা হয়েছে। এখনো চওড়া বুকের ছাতি, পবিপুষ্ট হাতের কব্জা। আনন্দে অনেক নব্য তরুণেব হাত ধরে ঝাঁকুনি দেন যখন, তাদেব কাঁধেব হাডে লাগে। এই বসিকতা শুনলেই মিসেস সেবকবাম বাগ কবেন আবাব হেসেও ফেলেন।

কিন্তু প্রসাধনবত মিসেস সেবকবাম আজ হাসছেন অন্যকাবণে। আজকেব বিশেষ পার্টি বিশেষ কবেই তাঁদেব জন্যে—সেই কাবণেও নয়। জীবনেব এক বিবাট অধ্যায় শেষ হযে গেল. চাকবি থেকে অবসব গ্রহণ কবছেন মেজর সেবকরাম—সেই বিদায় উপলক্ষে এই সাডম্বর পার্টি। কিন্তু মিসেস সেবকবামের ঠোঁটেব ফাঁকে কৌতুকেব হাসিটুকু লেগে আছে একেবারে ভিন্ন কারণে। আজও এই খানিক আগে স্বামীব সঙ্গে সেই চিরাচবিত ব্যাপাব নিযে ছদ্ম বাকবিতণ্ডা হযে গেছে একপ্রস্থ। ঠোঁটেব হাসিটুকু তাবই বেশ। মেজব বলেছিলেন, যাব জন্যে জীবনেব ঠিক এইখানটায আজ এসে দাঁডানো গেছে, তাকে সত্যি সত্যি কেউ চিনল না।

মিসেস সেবকবাম হাসি চেপে দেযালেব মস্ত অয়েলপেন্টিং ছবিটা দেখিযে নিরীহ মুখে জবাব দিলেন. কর্নেল ব্রাউনেব কথা বলছ?...চিনবে না কেন, মস্ত নামী লোক— তার ওপব তোমাব মত এমন একজন মেজব তৈবি কবে গেল।

সেবকবাম মাথা নেডেছেন, কর্নেল ব্রাউন নয়, আমি আমাব ঝুমবিব কথা বলছি। আজকে এই জাযগায় এসে দাঁড়ানোব পিছনে ঝুমবিবাঈযেব কেরামতি কতখানি কেউ জানলই না, বোকাগুলো জীবনভোব শুধু আমাকেই বাহবা দিযে গেল।

মিসেস সেবকরামেব নাম ঝুমবিই বটে. ঝুমবিবাঈ। কিন্তু এখন ভদ্রলোকটিও তাঁকে ঝুমরি বলে ডাকলে লজ্জা-লজ্জা করে—কেমন ছেলেমানুষ লাগে নিজেকে। ছেলেদেব সামনে ডাকলে তো চোখ রাঙান তিনি। মহিলাদেব উদ্যোগের কোনো চাঁদাব খাতাটাতায় সই কবতে হলেও সংক্ষেপে লেখেন মিসেস জে, সেবকবাম। ঝুমবিবাঈ শুনলে তবু একবকম, শুধু ঝুমরি শুনলে বযস যেন অর্ধেক কমে যায়।

সেই বকমই ভ্রূকুটি কবেছিলেন ঝুমবিবাঈ, এই প্রসঙ্গ উঠলে যেমন করে থাকেন। বলেছিলেন, হুঁঃ, আমার কেরামতি কত জানা আছে। আসলে যাব কেরামতি সে তোমার ওই গলায় ঝুলছে—তোমাব এই চাটুবাক্যে যে ভুলবে সে একটি আস্ত বোকা।

মেজবের গলায় ঝুলছে বড় লকেটসুদ্ধু একটা হার। আজ ছত্রিশ বছব ধরেই এটা গলায় ঝুলছে তাঁব। ছত্রিশ বছব আগে প্রথম যখন ফৌজেব চাকবিতে ঢোকেন তিনি—তাঁব ঠাকুবদা এটি উপহাব দিযেছিলেন তাঁকে।

উপদেশ দিযেছিলেন, মন্ত্রপূত কবচেব মত এটি যেন সর্বদা গলায বাখা হয। ঠাকুবদা ছিলেন দূর অতীতেব স্বাধীন মাবাঠা বীর সৈনিকবংশেব সন্তান।

পবদেশী ফৌজে চাকবি নেবেন তাঁব নাতি এটা আদৌ মনঃপূত ছিল না। নিলেনই যখন, এটা তখন তাঁব গলায পরিযে দিয়ে বলেছিলেন, তোমাব দেশেব সম্মান তোমাব গলায থাকল। সেই থেকে অনেকবাব হাব ছিঁড়েছে আব বদলেছে, কিন্তু মূল জিনিস অর্থাৎ সেই লকেট তেমনি আছে। ঝুমবিবাঈ এটা ইঙ্গিত কবেই মুখঝামটা দিযেছিলেন। আব তারপর প্রসাধন কবতে কবতে আপনমনেই হাসছিলেন।

সভাব মধ্যে মেজব যে এই কাণ্ড কবে বসতে পাবেন, ঝুমবিবাঈ তা কল্পনাও কবেননি।

জীবনেব যে একটি বিশেষ ঘটনা মেজবেব কর্মজীবনে সোনাব অক্ষবে চিহ্নিত হয়ে আছে, সেই কাহিনীটিই আন্তবিক আনন্দে সভাব বৃদ্ধ সভাপতি জুনিয়ব অফিসাবদেব শোনালেন। মেজবেব সেই কাহিনী অনেকে অনেকবাব শুনেছে, তবু ববাববকাব মতই সবস লাগল আবাবো। আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। ঝুমবিবাঈ তখনো খুশিতে গর্বে মাঝে মাঝে স্বামীব মুখখানা দেখে নিচ্ছিলেন। এবাবে মেজবেব কিছু বলাব পালা। উঠে দাঁড়িযে তিনি গম্ভীব মুখে বললেন, আমি এই দীর্ঘদিন ধবে খানিকটা অপবেব প্রাপ্য অপহবণ কবে আসছি। আজকেব বিদাযেব দিনে সেটুকু স্বীকাব কবে যাওযাই ভালো—এইমাত্র জীবনেব যে ঘটনা শুনে আপনাবা আমাকে অভিনন্দন জানালেন তার সবটুকু আমাব প্রাপ্য নয—

এ পর্যন্ত বলে তিনি অদূবে ঝুমবিবাঈয়েব দিকে তাকালেন একবাব। মিসেস সেবকবামেব শঙ্কাটাপন্ন অবস্থা দুই চক্ষু বিস্ফাবিত কবে তিনি যেন নীববে নিষেধ কবতে চেষ্টা কবলেন। এখানকার হুল্লোড়েব ব্যাপার তিনি জানেন।

কিন্তু মেজর তা দেখেও দেখলেন না, উৎসুক শ্রোতাদেব দিকে চেযে বলে গেলেন, বযসকালে একটি মেযেকে মনে ধবেছিল আমার, তাকে বিযে কবাব জন্য ভিতরে ভিতবে ক্ষেপেই উঠেছিলেন, কিন্তু তখন ফৌজে সেই সামান্য চাকবি কবি আব জীবনটা কবে আছে কবে নেই ভেবে সেই মেয়েব বাপ আমাব সঙ্গে তাব বিযে দিতে বাজি নন। যেদিন আমি ওই কাণ্ড কবে আপনাদেব কাছে ফেমাস হয়েছিলাম, ঠিক তাব আগেই বিয়ের নাকচপত্র এসেছিল। ফলে আমার মাথায তখন আগুন জ্বলছিল—এবং যা আমি করে বসেছিলাম সেই মেযেটিকে না পাওযাব সম্ভাবনার প্রতিক্রিয়াতেই বোধ হয় কবতে পেবেছিলাম। অতএব আমাব সেই ছেলেমানুষি বীবত্বেব সঙ্গে একটি

মেযেবও পবোক্ষ কৃতিত্ব জডিত ছিল—সেদিনেব সেই মেযেটি উনি—ওই মিসেস সেবকবাম।

হিযাব হিযাব! হিযাব হিযাব। ওযাণ্ডাবফুল! আবো শুনব! আবো শুনতে চাই আমবা!

আনন্দে খুশিতে সভাস্থল সবগবম। মিসেস সেবকবামেব মুখ টকটকে লাল। আনন্দোচ্ছল অজস্র জোডা দৃষ্টিব আঘাতে তিনি ফাপবে পডলেন।

মেজব সেবকবাম গম্ভীব। বললেন, আপনাবা আজ আমায বিদায দিচ্ছেন, কিন্তু উনি তো দিচ্ছেন না— তাই নিজেব নিবাপত্তাব স্বার্থে আমি আব একটি কথাও বলব না।

সভা এইবাব মিসেস সেবকবামকে নিযে পডল। তাকেও কিছু বলতেই হবে। বিব্রত বিডম্বিত মুখে মিসেস সেবকবামকে উঠে দাডাতে হল। শ্রোতাবা উন্মুখ।

মিসেস সেবকবাম বললেন, পুরুষেবা মেযেদেব চিবদিনই নির্লজ্জ তোষামোদ কবে থাকেন, মেজবেব উক্তি সেই নির্লজ্জতাবই চবম নিদর্শন। আসলে কাব অপমান ববদাস্ত কবতে না পেবে তিনি সেদিন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হযে সেই বিচিত্র কাণ্ড কবে বসেছিলেন, তাব সঠিক প্রমাণ আছে আপনাদেব মেজবেব গলাব ওই হাবেব লকেটটিতে। আপনাবা ওটি দেখলে খুশি হব।

এবাবে মেজব বিডম্বিত। চাবদিক থেকে তবল বব উঠেছে, দেখব, দেখব—উই মাস্ট সি।

সভাপতি হাত বাডাতে নিরুপায মেজবকে গলা থেকে হাবটা খুলে দিতে হয। তাবপব সেই লকেটসুদ্ধ হাব সকলেব হাতে হাতে ঘুবতে লাগল। সকলেব মুখেই শ্রদ্ধা এবং সম্ভ্রম।

লকেটেব পিছনে সুন্দব কবে খোদাই কবা ভাবতেব মানচিত্র, তাব মধ্যে ভাবতমাতা দাঁডিযে।

পার্টি শেষ হতে গাডি বাডিব দিকে ছুটেছে। পিছনেব সীটে মেজব এবং মিসেস সেবকবাম দু'জনে দু'ধাবে বসে। মাঝখানে ফুলেব বোঝা। তাদেব ছদ্ম গাম্ভীর্যে ফাটল ধবছে মাঝে মাঝে। আডে আডে এক-একবাব দুজনেই দুজনকে দেখে নিচ্ছেন।

ফুলেব আডাল দিযে একখানা হাত মিসেস সেবকবামেব হাতে ঠেকল। ড্রাইভাবেব অলক্ষ্যে তিনিও ঈষৎ আগ্রহেই হাতখানা ধবলেন।

গাডি নির্দিষ্ট পথে ছুটে চলেছে।

এবাবে বহুকালগত মেজবেব জীবনেব সেই স্মবণীয ঘটনাটি ব্যক্ত কবলে এই কাহিনী সম্পূর্ণ হতে পাবে।

সেই নতুন বযসে মেজব সেবকবাম ছিলেন এক তোপখানাব হাবিলদাব মেজব। হাবিলদাব মেজব থেকে হওযা আব মন্ত্রী দপ্তবেব আবদালী থেকে মন্ত্রী হওযা প্রায একই পর্যাযেব বিচিত্র ব্যাপাব। মেজব সেবকবাম তাই হযেছিলেন।

ইংবেজ আমলে তোপখানাব তিনি সিপাই হযে ঢুকেছিলেন। খাওযা পবা ছাডা তখন মাইনে ছিল মাসে আট টাকা। অল্প লেখাপডা জানতেন, সাহেবী আমলেব

ভাঙা ইংরেজী বলায় তাঁর সুনাম ছিল। আর ছিল প্রচুর উৎসাহ আর উদ্দীপনা। ফলে ওপরেব অফিসার ক্যাপ্টেন ব্যানার্জীর প্রিয়পাত্র ছিলেন তিনি। সিপাই থেকে নায়েক হয়েছেন, নাযেক থেকে হাবিলদার এবং সেই অল্প বয়সেই হাবিলদাব থেকে মেজর। মাইনে তখন অলফাউণ্ড কুড়ি টাকা—তাঁদেব পর্যাযে সেদিনেব মস্ত চাকবি। হাবিলদার মেজর নিজের ইউনিটের জোয়ানদের মধ্যে সর্বেসর্বা—তাঁকে ডিউটি ভাগ কবে দিতে হয়, জোয়ানদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায বাখতে হয। জোযানেরা যেমন সমীহ কবত তেমনি ভালও বাসত তাঁকে। মোট কথা সেই অল্প বযসেই জোযানদেব আকাঙ্ক্ষাব স্বর্ণচূডায উঠে বসেছিলেন হাবিলদাব মেজর সেবকবাম।

কিন্তু এই উন্নতিব তেমন কদব ছিল না শুধু ঝুমবিব বাবাব কাছে।

সেবকবাম ফৌজে চাকবি কবে, বছবেব ছুটিতে একবার মাত্র দেশে আসে, কোনো গণ্ডগোল বাধলে কোথায কোথায চলে যেতে হবে জামাইকে— এইসব ভেবে ঝুমবিব বাবাব এই বিযে মনঃপূত ছিল না। তাব থেকে ফলেব ব্যবসাযী প্রভুজীব ছেলেকেই বেশি পছন্দ তাব।

ঝুমবি সেবকবামেব পডশিনী, ছেলেবেলা থেকে ভাবী ভাব দুজনেব। বড় হযে ফৌজে ঢোকার ফলে সেবকবাম ভেবেছিলেন তাঁব কদব বাডল। কিন্তু উল্টো ব্যাপাব দেখে তাঁব চক্ষুস্থিব। পাবলে তক্ষুনি চাকবি ছেড়ে দেন। কিন্তু ফৌজেব চাকবিতে একবাব ঢুকলে ছাডতে প্রাণান্ত। ঝুমরিব বাবাকে চিঠিপত্রে অনেক বোঝালেন তিনি। ওদিকে ঝুমরিবাঈও দোটানায পডলেন, গোলামী কবতে যাওযাটা তাঁব আদৌ পছন্দ ছিল না। তাছাড়া বাপও ন্যায্য কথাই বলছেন মনে হল, বিযেব পবেও তো জীবনেব অর্ধেক ছাড়াছাড়ি হয়ে থাকা।

কর্মস্থলেব প্যাবেড গ্রাউণ্ডে দাঁডিযে মাযেব লেখা ওদেব শেষ জবাব পডলেন সেবকবাম। মা লিখেছেন. ওবা শেষ পর্যন্ত এই বিযেতে বাজি হল না।

চিঠি পড়ে সেবকবামেব দুনিয়া বসাতলে পাঠানোব আক্রোশ। পাযে পাযে তিনি চললেন টেন্ট-এব দিকে।

এদিকে অস্ট্রেলিযা থেকে এক নতুন ক্যাপ্টেন এসেছেন তখন। গ্রাউণ্ডে দাঁডিযেই তিনি তাঁকে কম্যাণ্ডিং অফিসাব—অর্থাৎ এই ইউনিটেব সর্বাধিনাযক লেফটেনেন্ট কর্নেল ব্রাউনেব কাছ থেকে কিছু জ্ঞান আহবণ কবছিলেন। জোযানদেব ভালোভাবে জেনে বুঝে পরিচালিত কবাব সুবিধে হয এবকম কোনো বই আছে কিনা খোঁজ কবছিলেন নতুন উৎসাহী ক্যাপ্টেনটি।

লেফটেনেন্ট কর্নেল ব্রাউন জবাব দিলেন, আছে কিন্তু তাব কিছু দরকার নেই। জাস্ট গিভ দেম এ কিক অন দি ব্যাক অ্যাণ্ড দে উইল ডাই ফব ইউ। অর্থাৎ পিছনে একটি করে লাথি কসাবে, তা'হলেই তাবা তোমার জন্যে প্রাণ দেবে।

ঠিক সেই সমযেই সেবকবাম তাঁদেব পিছন দিয়ে যাচ্ছিলেন। ক্যাপ্টেনেব প্রশ্ন কানে আসতে দাঁড়িয়ে গেলেন আর কম্যাণ্ডিং অফিসাবের জবাব শুনে পাযে পাযে কাছে এগিযে এলেন। তাঁরা পিছন ফিবে দাঁড়িয়ে।

পিছন থেকে আচমকা এক বিপুল পদাঘাতে তিন হাত দূরে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন কম্যাণ্ডিং অফিসার ব্রাউন। নবাগত ক্যাপ্টেন বিমূঢ় হঠাৎ। কম্যাণ্ডিং অফিসার মাটি থেকে উঠে দেখলেন পিছনে কে দাঁড়িয়ে।

সেবকরাম শান্ত মুখে প্রশ্ন করলেন, ইউ মিন হি সুড কিক দিস ওয়ে সার? অর্থাৎ, কি এইভাবে লাথিটা মারতে বলছেন ওঁকে?

কম্যাণ্ডিং অফিসারের কোমরে রিভলভার থাকলে হয়ত তক্ষুনি সব শেষ হয়ে যেত। তাঁর হাতে ছিল একটা স্টিক। তাই নিয়েই বাঘের মত সেবকরামের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি। তারপর লপটা-লপটি দু'জনে। সেবকরামের কপাল ফেটেছে, কম্যাণ্ডিং অফিসারেরও নাকমুখ দিয়ে রক্ত ঝরছে।

মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই ব্যাপার ঘটে গেল। তারপরেই লোকজন ছুটে এলো। সেবকরামকে অ্যারেস্ট করা হল, নিরস্ত্র করা হল।

এরপর কোর্ট মার্শাল। যুদ্ধের সময় হলে এই অপরাধে সেবকরামের মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত হতে পারত— এখন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হবে জানা কথাই।

কোর্ট মার্শাল শুরু হল। আইন অনুযায়ী নিচু পর্যায়ের তিনজন ভারতীয় অফিসারও থাকবেন। তাঁরা চেষ্টা করতে লাগলেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যদি বারো-চৌদ্দ বছরে এনে দাঁড় করানো যায়। এদিকে এই বিচারে আসামী নিজেরও একজন সমর্থক বা আইনজ্ঞ দাঁড় করানোর রীতি। যত টাকা খরচ হোক, সরকার তাকে আসামীর ইচ্ছানুযায়ী এনে দিতে বাধ্য।

সমর্থক প্রসঙ্গে সেবকরাম তাঁর প্রিয় অফিসার ক্যাপ্টেন ব্যানার্জীর শরণাপন্ন হলেন। চতুর ক্যাপ্টেন ব্যানার্জী আবার এক ইংরেজ লেফটেনেন্ট কর্নেলকেই এনে দাঁড় করালেন সেবকরামের হয়ে সওয়াল করার জন্য—এমন লোক বাছাই করলেন যার সঙ্গে ওই অফিসার কম্যাণ্ডারের খুব সদ্ভাব ছিল না। এই ইংরেজ লেফটেনেন্ট কর্নেল এসেই হৈ-চৈ কাণ্ড বাধিয়ে দিলেন, প্ররোচনার কারণ থাকলে করে কোথায় কোন ইংরেজ সৈনিক অফিসারকে লাথি মেরেছিল তার নজির বার করলেন। অফিসার কম্যাণ্ডার অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেনকে যে পরামর্শ দিয়েছিলেন সেটা অস্বীকার করেননি। সেটাই তো প্ররোচনা। নিপুণ সুদক্ষ কর্মী সেবকরামের দেশপ্রীতির জন্য শাস্তি না হয়ে তাঁর পুরস্কার পাওয়া উচিত বলে গলা ফাটালেন তিনি।

হুলস্থূল বেধে গেল এই নিয়ে। শেষ পর্যন্ত অফিসার কম্যাণ্ডারের সম্মান রক্ষার্থেই কোর্ট মার্শালে মাত্র একমাস কারাদণ্ড হল সেবকরামের। হাবিলদার মেজরের পদমর্যাদা অবশ্য গেল, দণ্ডের মেয়াদ ফুরালে আবার সিপাই থেকেই কাজ আরম্ভ করতে হবে তাঁকে।

ওদিকে সেবকরামের দেশে পর্যন্ত নানাভাবে পল্লবিত হয়ে এই খবর চলে গেছে। সেখানে তিনি বীরের আসন লাভ করেছেন। ঝুমরিবাঈ ঘোষণা করেছেন, জেল থেকে বেরুলে সেবকরামকেই বিয়ে করবেন তিনি। তাঁর বাবা এবারে হৃষ্টচিত্তে সায় দিয়েছেন।

জেল থেকে বেরিয়েই সেবকরাম দেখেন, সামনে দাঁড়িয়ে সেই কম্যাণ্ডিং অফিসার ব্রাউন যাঁকে তিনি পদাঘাত করেছিলেন। দু'জনে দু'জনকে দাঁড়িয়ে দেখলেন কয়েক

মুহূর্ত। সাহেব এগিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন। হেসে বললেন, আমার মাজায় এখনো ব্যথা আছে।

নিজে কাঁধ ধরে নিয়ে গিয়ে কাজে বহাল করলেন, আর তক্ষুনি আবার হাবিলদার মেজরের পদে প্রমোশন দিলেন তাঁকে।

বিয়ে কর্মস্থলেই হল। কম্যাণ্ডিং অফিসার ব্রাউন বউ দেখতে এলেন। এসে এক ফাকে খুশী হয়ে বউকে বললেন, বি কেয়ারফুল, হি ক্যান কিক ওয়েল।

হাবিলদার মেজর সেবকরাম সলজ্জে হেসে এই প্রথম ক্ষমা চাইলেন তাঁর কাছে। বললেন, সাহেব, সেই দিন ঝুমরির বাবা আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল আর এই দেখো—বলে গলার লকেটটা তাঁকে উল্টে দেখিয়েছিলেন, বলেছিলেন, সেই ব্যথার ওপর তুমি আরো কোথায় ব্যথা দিয়েছিলে দেখো—এই দেশ যে আমার প্রাণ সাহেব। সাহেবের দুই চক্ষু চকচক করছিল। একবার ঝুমরিকে দেখছিলেন তিনি, একবার সেবকরামের গলার লকেটটা।

এরপর কম্যাণ্ডিং অফিসার ব্রাউন ক্রমশ অনেক ওপরে উঠেছেন, পুরোদস্তুর কর্নেল হয়েছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে অলক্ষ্য থেকে সেবকরামকেও টেনেছেন। সকলে অবাক হয়ে দেখেছে—হাবিলদার মেজর সেবকরাম হঠাৎ ভাইসরয়েস কমিশনড অফিসার হয়েছেন একদিন—লেফটেনেন্ট হয়েছেন। তারপর প্রশস্ত রাস্তা, লেফটেনেন্ট থেকে ক্যাপ্টেন, ক্যাপ্টেন থেকে মেজর। এর অনেক আগেই দেশ স্বাধীন হয়েছে। কর্নেল ব্রাউন বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু যাবার আগে তিনি এঁদের সঙ্গে দেখা করে যেতে ভোলেননি। সেই পুরনো ঠাট্টাও করেছেন মিসেস সেবকরামের দিকে চেয়ে, হি কিকস ওয়েল—দ্যাট ওয়ান ব্রিলিয়ান্ট কিক ব্রট বোথ ইউ অ্যাণ্ড মি নিয়ারার—ডোণ্ট ইউ এগ্রি উইথ মি ম্যাডাম?

তিলে তিলে তিলোত্তমা

আজব শহরের আজব বাহার।

ঘড়ি ধরে সন্ধ্যা ছ'টায় খোলে, ন'টায় বন্ধ হয়। আশেপাশে প্রায় সকাল ছ'টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত যাদের দোকান খোলা, তারাও তখন এদিকপানে চেয়ে থাকে আর বড় বড় নিঃশ্বাস ছাড়ে। প্রাসাদোপম এই অট্টালিকায় অনেক ব্যবসায়ী অনেক রকমের ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। কিন্তু বিউটি হাউসের তিন ঘণ্টা ওদের তিরিশ ঘণ্টা।

'সব রাস্তা রোমের দিকে।' এখানে সব আগন্তুক বিউটি হাউসের দিকে।—সসঙ্গিনী তিনঘণ্টা সিনেমায় কাটানো যায়, লাভার্স পার্কের আবছা আলোয় নিরিবিলিতে বসে তিন মিনিটে তিন ঘণ্টার অবসান হতে পারে, হাত-ধরাধরি করে শিথিল চরণে মার্কেট প্লেসের শো-কেইস দেখেও ঘণ্টাতিনেক উতরে দেওয়া যায়। কিন্তু এখানকার এই তিন ঘণ্টার স্রোত একেবারে অন্য খাতে বইছে। এই তিন ঘণ্টায় মনো-বৈচিত্র্যের নিখুঁত নক্সা আঁকতে পারে, এমন লিপি-বণিক জন্মায়নি বোধ হয়।

রূপচর্যার জীবন্ত মিছিল। —বিধাতার মার হার মেনেছে বিউটি হাউসের মার-প্যাঁচের কাছে। খোদার ওপর খোদকারীর নমুনা দেখাচ্ছে বিউটি হাউস। বিউটি হাউস মুশকিল-আসান।

নারীপুরুষের বিচ্ছিন্ন সমাগম। সঙ্গী বা সঙ্গিনী নিয়ে বড় কেউ আসে না এখানে। অন্যের চোখে নিজেকে অভিরাম করে তোলার তাগিদে কোঅপারেশন অচল।

প্রকাণ্ড হল। শাদা আলোয় মেঝেতে পুরু কার্পেটের বোঁয়া পর্যন্ত দেখা যায়। একদিকে সারি সারি শো-কেইসএ রঙ-বেরঙের প্রসাধনসামগ্রী সাজানো। সেসবের উপযোগিতা আর ব্যবহার বুঝিয়ে দেবার জন্য আছে এক্সপার্ট সেলসম্যান। অন্যদিকে ছোট ছোট চেম্বার। হাতে-কলমে কলাকৌশল শেখানোর মহড়া চলেছে সেখানে।

বয়সের ভারে কোঁচকানো চামড়ায় যৌবনের জলুস আনা যেতে পারে।...কালোর চেকনাই ছোটানো যেতে পারে শাদা চুলে।...তোবড়ানো গাল ভরাট দেখাবার উপকরণ পেতে হলে এখানে আসতে হবে। ...এখানে আসতে হবে প্লাস্টার-পালিশে বাঁকাচোরা বিকৃত দাঁতে কুন্দ-দন্তের শোভা আনার কৌশলটি জানতে হলে। পটলচেরা চোখ বা কোঁকড়ানো চুল চাই তো এসো বিউটি হাউসে।—শুধু এখানকার উপকরণ আর পনের দিনের ট্রেনিং—এর পরে মুখের ওপর সার্চ-লাইট ফেললে প্রসাধন যদিও বা ধরা পড়ে, আসল রঙটি ধরা যাবে না। শোনা যায়, এ বিদ্যে শেখানোর জন্য প্যারিস থেকে ট্রেইনার ধরে এনেছে দোকানের মালিক ভাটনগর। নিরুৎসুক-জনের খটকা লাগতে পারে, যে-দেশে কালো রঙের সমস্যা নেই, সে-দেশে অমন এক্সপার্ট গজায় কি করে? কিন্তু নিরুৎসুক-জনকে নিয়ে কারবার নয় বিউটি হাউসের।

চটপটে ছটফটে মানুষ ভাটনগর। হাসছে গল্প করছে তদবির-তদারক করছে। নতুন খদ্দের দেখলেই বিলিতি কায়দায় মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানায়, সাদরে নিয়ে গিয়ে বসায় নিজের নিরিবিলি বসবার জায়গাটিতে। গভীর সহানুভূতিতে সমস্যা শোনে, মাথা নাড়ে। সম্ভাব্য সমাধান বাতলে দিয়ে আশ্বস্ত করে তারপর। সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের গায়ে লাগানো বোতাম টেপে। প্যাঁক করে শব্দ হয় একটা। বেয়ারা দৌড়ে আসে।

—সাবকো (অথবা মেমসাবকো) ...নম্বর কামরা দেখাও।

পুরানো বা চেনা-জানা খদ্দেরের সঙ্গে তার হাসি-খুশি-ভরা অন্তরঙ্গতায় ব্যবসায়ীর দূরত্ব নেই এতটুকু। কোনো ভদ্রলোকের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে সোচ্ছ্বাসে বলছে, গ্রোইং ওয়ানডারফুলি ইয়ং স্যার। উত্তরতিরিশ কোনো মহিলাকে সবিনয় অভিবাদনে স্তুতি জানাচ্ছে, ইউ লুক হার্ডলি টুয়েন্টি মাদাম—।

যার রূপ আছে সেও আসে। যতটুকু আছে তার থেকে বেশি একটু থাকতে আপত্তি কি। আর যার নেই তার তো কথাই নেই। কিন্তু সবাই যে এখানে এসে একেবারে রূপচয়নে বসে যায় বা তেমনি কোন সমস্যা নিয়ে হাজির হয় এমন নয়। সাধারণ প্রসাধনসম্ভারও হরদম বিক্রি হচ্ছে এখানে, যা আজকাল ঘরে ঘরে লাগে। সেসব কেনার ছুতোয় কৌতূহল মেটাতে আসে অনেকে।

কিন্তু আরো একটা আকর্ষণ আছে বিউটি হাউসের।

স্বপ্না বোস।

দীপশিখা যেমন পতঙ্গ টানে, তেমনি ওবও অমোঘ একটা আকর্ষণ আছে। পিছনেব দবজা দিযে গটগট কবে ঢোকে যখন, মনে হয এত বড হলটা ঝলমলিযে হেসে উঠল।

বিউটি হাউসেব প্রধানা আপ্যাযিকা স্বপ্না বোস।

কিন্তু অন্তবঙ্গ সকলেবই বিশ্বাস, শুধু কর্মচাবিণী নয, ব্যবসাযেব কলকাঠিও এই মহিলাই আগলে বসে আছে। আব ধাবণা, স্বপ্না বোস ছাড়া ভাটনগবেব জীবন-জোযাবেও চডচড কবে ভাটা নেমে আসবে। অনেকেব ইঙ্গিত আবো স্পষ্ট। বোস পদবীটা এখনো বেখেছে ব্যবসাযেব আবহাওযায বোমান্স ছড়াবাব জন্য, নইলে, ইত্যাদি।

আশ্চর্য, মেযেদেব সঙ্গে পর্যন্ত ভাবি সহজ একটা হৃদ্যতা ওব— যা হবাব কথা নয। তাবা আসে রূপচযন কবতে। এ নাবী রূপেবই জীবন্ত উৎস। ঈর্ষা হবাব কথা, কিন্তু হয না। ববং সলা-পবামর্শ নির্দেশ-উপদেশেব জন্য ওবই কাছে মন খুলে দেয তাবা। ওকে দেখে আপন অভিলাষ ব্যক্ত কবতে নবাগতদেব হযত একটু সঙ্কোচ হয, হযত বা ওব দিকে চেযে চেযে চাপা নিঃশ্বাসও পড়ে দুই-একটা। কিন্তু যাদু জানে স্বপ্না বোস। হেসে, জড়িযে ধবে, কানে কানে কথা বলে, নিবিবিলি চেম্বাবে টেনে নিযে গিযে মনেব কথা শুনে আব মনেব মত কথা শুনিযে বৈষম্যেব অনুভূতিটুকু পর্যন্ত ধুযে-মুছে দেয।

পুরুষদেব সঙ্গে অবশ্য স্বপ্না বোসেব বীতিনীতি ভিন্ন। এদেব মধ্যে সমস্যা নিযে যাবা আসে, তাবা আব যাই হোক ওব কাছে আসে না। তাবা সোজা যায ভাটনগবেব কাছে, নযত তাব অন্য কোনো পুরুষ সহকাবীব কাছে। কিন্তু স্বপ্না বোসেব সঙ্গ-অভিলাষী আগন্তুকেব সংখ্যাও কম নয। বাবো মাস তিবিশ দিনেব প্রসাধনসামগ্রীই হযত কিনতে আসে তাবা। একেব জাযগায তিন গছিযে দেয স্বপ্না বোস। কৃত্রিম বিপন্ন ভাবটি ফুটিযে তুলে তাবা হযত বলে, বাঃ বে, এত কি হবে?

—নিযে যান, বউ খুশি হবে।

বউ খুশি হোক না হোক, আব কেউ যে খুশি হবে সেটা জেনেই ওবা খুশি।

কাউকে বা স্বপ্না বোস ছদ্মকোপে ঝাঁঝিযে ওঠে, আপনাবা না নিলে আমাদেব দোকান চলে কি কবে?

ওদেব দোকান সচল বাখতে গিযে নিজে অচল হচ্ছে কিনা, সেটা তখনকাব মত অন্তত অনেকেবই মনে থাকে না।

বাড়িগাড়িঅলা সুপবিচিতদেব ছদ্ম-ত্রাস-জড়িত অন্তবঙ্গতাব সুবও বৈচিত্র্যহীন নয। —বাঃ বে, এলেই এককাঁড়ি জিনিস নিতে হবে তাব কি মানে আছে? গবীব মানুষ, অত টাকা কোথায পাব?

স্বপ্না বোস কখনো একঝলক হেসে ফস কবে জবাব দেয, তবে দোকানে আসেন কেন? কখনো বা তেমনি ছদ্ম-গাম্ভীর্যে বলে, সত্যি কথাই তো, টাকাব এত টানাটানি আপনাব—আচ্ছা নিযে যান, জিনিসগুলো আমাব নামে লিখিযে বাখব'খন।

সানন্দে হাব মেনে জিনিস নেয তাবা।

হল্-এব এক প্রান্তে ভিজিটাদেব জন্য দামী সোফা সেটি কৌচ পাতা।

অন্তবঙ্গজনদেব নিযে সেখানে দিব্বি আড্ডা জমে যায। প্রাযই চা আসে, সিগাবেট আসে। ভাটনগবেব সেদিকে একটুও কার্পণ্য নেই। সপ্রগলভ আড্ডাব মাঝেই স্বপ্না বোস এক এক সমযে সকলকে সচেতন কবে দেয।— বেচাবী ভাটনগব ড্যাব-ড্যাব কবে দেখছে দেখুন, আপনাদেব ব্যাপাব দেখে হার্টফেল না কবে বসে।

জোড়া জোড়া চোখ ছোটে অদূবে মালিকেব দিকে। দু'হাত তুলে ভাটনগব একটা হতাশাব ভাব দেখায। কখনো বা স্বপ্না বোসেব দিকে চেযে হাসে মৃদু-মৃদু। আবেশ জড়ানো হাসি। আব এদিক থেকে সে হাসিব নীবব প্রত্যুত্তবও বোধ কবি সবাবই চোখে পড়ে। বুকেব ভেতবটা খচখচ কবে ওটে অনেকেবই। কিন্তু ভাটনগবেব কাছ থেকে তাকে ছাড়িযে আনা সম্ভব নয কোনমতে, এও এতদিনে সকলেব কাছেই স্পষ্ট হযে গেছে। অবাঙ্গালী ভাটনগবেব ভাগ্য দেখে তাবা ঈর্ষা কবাও ছেড়ে দিযেছে। এখন সেটা সবস হাস্য-কৌতুকেব ব্যাপাব।

স্বপ্না বোস শত্রুমুখে বসালাপেব ছোট্ট বড়েটা এগিযে দেয যেন।—চাকবিটা আমাব আপনাবাই খাবেন দেখছি।

হা-হাঁ কবে ওঠে তাবা।—নিশ্চয খাবো, আলবৎ খাবো, কবে খাবো বলুন— ভাটনগব চাকবি খেতে দেবি কবছে বলেই তো আমাদেব অমন খাওযাটা মাটি।

বলে বটে। কিন্তু ভাটনগব সত্যিই যদি তাব চাকবি খেযে এদেব খাওযাবাব ব্যবস্থা কবে, বিউটি হাউস দু'দিনেই তাহলে মরুভূমি হযে যাবে এও বোঝে। খাওযা তাদেব একদিন জুটবেই, তবে ভাটনগবেব গৃহস্বামিনী হলেও শুধুই ঘবেব বউ হযে থেকে স্বপ্না বোস ব্যবসা মাটি কববে না, এটুকুই ভবসা।

অবকাশকালে ভাটনগবও সহাস্য বদনে এদেব হালকা ফূর্তিতে যোগ দেয। বিভিন্ন পেশাব লোক আছে স্তাবকদলেব গুঞ্জন-সভায। ভাটনগব ডাক্তাবকে লক্ষ্য কবে বলে, একবাব স্টেথসকোপটা লাগান দেখি বুকে, ঠিক চলছে কিনা দেখি। কখনো বা নব্য ব্যাবিস্টাবেব উদ্দেশে বলে, আপনি বেডি থাকুন সাব, ওব এগেইনসট-এ হযত শীগগিবই কেইস ঠুকতে হবে। ওব মানে স্বপ্না বোসেব। কখনো বা অসহায মুখে প্রোফেসাব নামখ্যাত লোকটিব স্মবণ নেয। কিসেব প্রোফেসাব, কোথাকাব প্রোফেসাব জানে না (জানে না বোধ হয কেউ-ই), তবু বলে, আপনাব কাছে আমি দর্শন পড়ব প্রোফেসাব—এ জীবনে আব কি সুখ।

হাসাহাসি পড়ে যায। স্বপ্না বোসেব পাশেব জাযগাটা আপনিই খালি হযে যায। জাযগাটা কে ছেড়ে দিলে ভালো কবে খেযাল না কবেই ওব গা-ঘেঁষে বসে পড়ে ভাটনগব। স্বপ্না বোস তাকায আড়চোখে। সে কটাক্ষ-বাণে ভাটনগব কতটা বিদ্ধ হয বলা শক্ত। কিন্তু আব যাবা বসে, তাদেব দৃষ্টিপথে সে কটাক্ষ একেবাবে মর্মে গিযে কাটা-ছেড়া কবতে থাকে। হাসি-বিদ্যুৎ-প্রেম—এ তিনেব একখানি ঝকঝকে ছবি যেন। চোখেব দু'কোণে একটু লালিমা, চোখেব তাবাব তড়িত-ঝলক আব চোখেব গভীবে কাজল-দীঘিব নিবিড়তা। আঁখি-কোণেব ওই লালিমা অবশ্য তাবা যখন-তখন দেখে দেখে পাগল হয। কিন্তু এই তিনেব ট্রাযো সব সমযে বড় চোখে পড়ে না।

আব, এই দৃষ্টি-মাধুর্য দর্শন থেকেই হযত সকলে এবা মনে মনে উপলব্ধি কবেছিল, ভাটনগবেব কাছ থেকে স্বপ্না বোসকে ছাডিযে আনাব চেষ্টা স্বপ্নেব মতই ব্যর্থ হবে। কাবণ মানুষটা তাব এই বিচিত্র আত্মসমর্পণেব ভেতব দিযেই এই নাবীব প্রসন্নতাব শতকবা সবটুকুই দখল কবে বসে আছে।

তবু কিন্তু চেষ্টাব কসুব হযনি।

চাযেব নেমন্তন্ন, সিনেমাব আমন্ত্রণ, পিকনিক পার্টিব আহ্বান—এমনি অনেক কিছুব সাদব এবং সাগ্রহ আকৃতি সলজ্জ বিব্রত মুখে একেব পব এক প্রত্যাখ্যাত কবেছে স্বপ্না বোস। খুব যে একটা জোবালো কাবণ দেখাতে পেবেছে এমন নয। পাবেননি বলে বিব্রত হযেছে, লজ্জিত হযেছে আবো বেশি। নিরুপায হযে রূপ-বসিকেব দল যুগ্ম আহ্বান জানিযেছে ওদেব। ভাটনগব খুশিতে ডগমগ। পাবলে তক্ষুনি আমন্ত্রণ বক্ষা কবতে ছোটে। হাক-ডাক কবে স্বপ্না বোসকে ডেকে সুসংবাদ শোনায।

জবাবে আবাব সেই কটাক্ষ-বাণ। ভ্রূকুটি কবে স্বপ্না বোস শেষে এমন একটা কিছুব ওজব দেখায, যাতে কবে আমন্ত্রণকাবীদেব সামনেই ভাটনগবেব সকল উৎসাহে যেন ঠাণ্ডা জল পড়ে একপ্রস্থ। বলে, অমুক জাযগাব অ্যাপযেন্টমেন্ট ভুলে বসে আছ এবই মধ্যে?

বলে, মিস্টাব আব মিসেস অ্যাডভানিকে কি কথা দিলে যে সেদিন?

বলে, সেদিন আমাকে নিযে কোথায যাবে বলে নাকে খত দিযেছিলে?

অথবা কিছু না বলে একেবাবে হতাশাব দৃষ্টিতে শুধু চেযেই থাকে, যাব অর্থ —এমন লোককে নিযে তো আব পাবিনে।

ভাটনগবেব তাতেই পূর্ব কোন প্রতিশ্রুতি বা তেমনি কিছু একটা মনে পড়ে যায। মাথা চুলকে বিব্রত মুখে মাপ চায আমন্ত্রণকাবীদেব কাছে।

এই ক'বছবে সকলেই সখেদে উপলব্ধি কবেছে, বিউটি হাউসেব এই তিন ঘণ্টা ছাড়া স্বপ্না বোসেব মনেব অঙ্গিনায আব পলকেব ঠাঁই হবে না কাবো। কিন্তু স্বপ্না বোস যাদু জানে। এই তিন ঘণ্টাব সপ্রগলভ সান্নিধ্য-প্রাচুর্যেব মোহও ভক্তজনেবা কাটিযে উঠতে পাবে না শেষ পর্যন্ত। পাবতে চাযও না। কিন্তু এব পবে কোথায থাকে স্বপ্না বোস, কোন জগতে তাব গতিবিধি, তাব অবকাশকালেব কতটা দখল কবে আছে ভাটনগব—এসব প্রচ্ছন্ন জিজ্ঞাসাব জবাব মেলেনি কিছু। মিলেছে এক টুকবো হাসি, এক লাইন কাব্য বা একটু কিছু হেযালি। শেষ পর্যন্ত ভাটনগবেব ভাগ্যেব ওপব ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ছেড়ে কৌতূহলে ক্ষান্ত দিযেছে সকলেই।

বিউটি হাউসেব আব এক বিপবীত আকর্ষণ ভূতনাথবাবু।

ভূতেব যিনি নাথ তিনি আব যাই হোন, নিজে ভূত নন। কিন্তু এ ভূতনাথেব নামেব সার্থকতা ষোলকলায পূর্ণ। হলএব একটা কোণেব দিকে ছোট টেবিল পেতে বসে একমনে একেব পব এক ক্যাশমেমো কাটে। টাকা লেনদেনেব জন্য আলাদা ক্যাশ-কাউন্টাব আছে। যে যাই কিনুক, সেলসম্যান অথবা সেলসগার্লকে মাল নিযে আগে ওব টেবিলে ফেলতে হবে। এই তিন ঘণ্টায মুখ তোলাব অবকাশ থাকে না বেচাবীব। তবু এবই মধ্যে ওকে নিযে প্রাযই একটু-আধটু হাস্য-কৌতুকেব প্রহসন ঘটে যায।

মানুষটাব চেহাবার মধ্যে যেন বেপবোয়া কারুকার্য চালিয়ে গেছেন বিধাতা। গাযেব রঙ আবলুস কাঠকে হার মানায। ছোট ছোট চোখ দু'টোয এতটুকু জীবনের সাড়া নেই— একেবাবে নিবাসক্ত, নিষ্প্রাণ। নাকটা হঠাৎ যেন সামনের দিকে তুবড়ে গেছে। পুরু ঠোঁট, প্রকাণ্ড মাথা আর মাথাবোঝাই অবিন্যস্ত কোঁকড়ানো চুল। গাযের রঙে চুলের বঙে মিশে গেছে। চোখধাঁধানো বিউটি হাউসেব ঝকমকানি একাই যেন ব্যালান্স কবেছে ভূতনাথ। ভাটনগরের বসজ্ঞানেব তাবিফ কবে খদ্দেব বন্ধুবা। সেলসম্যান, সেলসগার্লরা একতবফাই হাসি-তামাসা করে ভূতনাথেব সঙ্গে। একতরফা কাবণ, ভূতনাথ কোন কথার জবাব দেয না, মুখ তুলে মড়া-চোখে তাকায একবাব, মাথা নিচু কবে মেমো কাটায মন দেয আবার।

ওব সঙ্গে স্বপ্না বোসেব অন্তবঙ্গতাটুকু সব থেকে বেশি উপভোগ্য। এ অন্তরঙ্গতাও একতবফাই। অর্থাৎ স্বপ্না বোসেব তবফ থেকে। ভূতনাথকে নিযে কেউ কিছু বললেই সে প্রতিবাদ জানায তৎক্ষণাৎ। বলে, বাহু ছাড়া চাঁদ মানায় না, ভূতনাথ ছাড়া বিউটি হাউস মানায না। মেমো লেখাতে গিযে হালকা চাপল্যে তার মাথাব ওই ঝাঁকড়া চুলেব মুঠি ধবে দুই-একবাব ঝাঁকুনি দেওযাটা প্রায় অভ্যাসে দাঁড়িযে গেছে ওব।

কোন বসিক ভক্ত ঠাট্টা কবে।—এও যেন বাহুব সঙ্গে চাঁদেব মিতালি।

মুচকি হেসে স্বপ্না বোস জবাব দেয, একমাত্র বাহু ছাড়া চাঁদেব কাছে আব ঠাঁই কাব?

মাঝে মাঝে আবো বেশ খানিকটা গড়ায। এখানকাব সর্বজনজ্ঞাত একটা বড তামাসাব কথা হল যে, ভূতনাথবাবু নাকি স্বপ্না বোসেব প্রেমে পড়েছে। কাব মাথায় যে প্রথম এই বসিকতাটুকু এসেছিল, সে আব কাবো মনে নেই। কিন্তু কথাটা থেকে গেছে। কালোব সঙ্গে আলো মেশে না বলেই হযত এ ধবণেব বসিকতা জমে ভালো। ভাটনগবও সানন্দে যোগ দেয় এসব হাসি-ঠাট্টায।

স্বপ্না বোস হযত বলে, মিথ্যে ওকে দোষ দেওযা কেন, আমিই ববং ওর প্রেমে পড়ে গেছি।

শোনামাত্র ভাটনগবকে সচেতন কবে দিতে চায কেউ, বলে, সাবধান ভাটনগবজী, ওই ভূত বাবাজীই কিন্তু শেষ পর্যন্ত একদিন আপনাব ঘাড থেকে—

মনোমত কথাটা আব হাতড়ে পায না।

স্বপ্না বোস আলতো কবে জুড়ে দেয, পেত্নী ছাড়াবে।

সমস্ববে হেসে ওঠে সকলে। ভাটনগব একবাব সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ কবে দূবে কর্মবত মূর্তিটিব দিকে। বলে, ভূতনাথ ইজ এ জ্যুযেল—এ ব্ল্যাক জ্যুযেল—বত্নেব প্রতি আব লোভ না থাকে কোন মেযের।

তবু মুখে যে যত হাসি-তামাশাই করুক, একমাত্র ভাটনগব ছাড়া স্বপ্না বোসকে যখন-তখন তবল হাস্যে ওই ভূতনাথেব গাযে-পিঠে হাত বুলোতে দেখে বা ঝাঁকড়া চুলের গোছায় বেপরোয়া চাঁপাকলি আঙুল চালাতে দেখে বুকের ভেতরটা চড়চড় করে ওঠে অনেকেবই।

রাত ন'টা বেজে গেছে।

বিউটি হাউসের গেট বন্ধ। কর্মচারী-কর্মচরিণীরা বিদায় নিয়েছে। কোমব-উঁচু ঝকঝকে কাঠঘেরা গণ্ডীব মধ্যে মালিকের নির্দিষ্ট গদি-আঁটা-আসনে বসে গভীর মনোযোগে হিসেব দেখছে ভাটনগর।

হলএব অন্য প্রান্তে নিজের জাযগায় বসে সেদিনের বিক্রির মেমো ওলটাচ্ছে ভূতনাথ। মাঝে এক-আধবার চোখ যাচ্ছে তার বিপবীত কোণের দিকে, যেখানে ক্রেতা-অভ্যাগতদেব জন্য সৌখীন সোফা-সেটি পাতা। কৌচের ওপব দেহ এলিয়ে দিযেছে স্বপ্না বোস। শুধু এখন নয়, কাজেব মধ্যেও আজ একাধিকবার নিবিষ্ট-চিত্ততায ছেদ পড়েছে ভূতনাথবাবুর। ওই নাবীমুখের হাস্যলাস্যেব মাত্রাটা আজ বেড়েছিল, একটু একটু করে বেড়েই যাচ্ছে যেন। ছোট ছোট ঘরে নিবিবিলি সান্নিধ্যে আজ দু'বাব দু'টো লোকেব সঙ্গে গল্প কবে কাটিযেছে বেশ খানিকক্ষণ ধবে, তাও লক্ষ্য কবেছে। মেমো লেখা ছেড়ে ভূতনাথ মুখ তোলে না বড। কিন্তু চোখ এড়ায না কিছু, ভূতনাথবাবু সব দেখে।

কৌচেব ওপব স্থাণুব মত পড়ে আছে স্বপ্না বোস। শ্রান্ত, ক্লান্ত। প্রায নির্জীব যেন। ভালো লাগছে না— কিছুই ভালো লাগছে না। কান্নার মত একটা বিষাদেব তবল স্রোত বইছে সর্বাঙ্গে। ভাবছে, কিছু ভাববে না, ভাবলেই তো ভাবনাব বিভীষিকা বাড়ে। ভাবছেও না কিছু, তবু দুর্বোধ্য বোঝার মত কি যেন বুকে চেপে আছে।

অদ্ভূত নীববতা বিউটি হাউসে। সবগুলো আলো জ্বলছে তেমনি। তেমনি ঝকঝক কবছে শো-কেইসেব দ্রব্যসম্ভাব। কোথাও টু-শব্দটি নেই। শুধু তিন কোণে তিনটি প্রাণী। সামনের দবজা বন্ধ। পিছনেব পথ দিযে বেবোয তাবা। প্রাসাদ-সৌধেব পিছনদিকেও একাধিক নির্গমনেব ব্যবস্থা আছে। সেদিক দিয়ে বেরুলে বাড়িব মধ্যেই দশ দিকে দশ পথ।

ঠং কবে ঘড়িতে শব্দ হল একটা। সাড়ে ন'টা বাজল। কৌচ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল স্বপ্না বোস। অলস মন্থব গতিতে পাযে পাযে এগিযে এলো ভূতনাথবাবুব কাছে।

মুখ না তুলেই ভূতনাথ বলল, বোসো।

—হয়নি তোমাব?

—হযেছে। মেমো-বইযেব ওপব পেপারওযেট চাপা দিয়ে চোখে চোখ বাখল তাব। তেমনি মড়া-চোখ, ভাবলেশহীন, নির্বিকাব। সে চোখে এতটুকু আগ্রহ নেই।

সামনেব চেযাবে বসে পড়ল স্বপ্না বোস। বিবক্ত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কবল, কি দেখছ?

—কিছু না,—খুব ক্লান্ত?

—নাঃ, ভালো লাগছে না কিছু।

—লাগবে না তো!

—কেন? কণ্ঠস্ববে তিক্ততা প্রকাশ পায় আবাব।

ভূতনাথ শান্ত কণ্ঠে বলল, এখন শুধু ভালো লাগছে না, আব কিছুদিন বাদে তিলে তিলে জ্বলতে হবে। জেনে-শুনে নিজে দুঃখ সৃষ্টি করলে দুঃখের শেষ কোথায়?

—থামো, থামো—! অস্ফুটকণ্ঠে প্রায গর্জে ওঠে স্বপ্না বোস। চাপা কর্কশ স্বরে

বলে ওঠে, খুব সাহস দেখি যে?

—হ্যা-ল-লো। ডোণ্ট ফাইট মাই ডিযাব।

শশব্যস্তে চেযাব ছেড়ে দাঁড়িযে উঠল দু'জনেই। মেঝেতে পুরু কার্পেট পাতা, পাযেব শব্দ শোনা যায না। ভাটনগব কখন এসেছে দু'জনেব কেউ খেযাল কবেনি।

—সিট ডাউন, সিট ডাউন প্লীজ—।

বসল দু'জনেই।

এক মুহূর্ত ভেবে নিযে ভাটনগব একটা শূন্য চেযাবে এক পা তুলে দিযে ঝুঁকে দাঁড়িযে ডাকল, স্বপ্না?

—ইযেস স্যাব।

—তোমাকে কিছু বলবাব আছে।

—ইযেস স্যাব .

ভাটনগব তীক্ষ্ণ চোখে তাকে নিবীক্ষণ কবল আবাব একটু।—ইউ সিম টু ফবগেট ইওবসেলফ অপবকে ভোলানো আব নিজে ভোলা এক কথা নয. ডোণ্ট বিসিভ ইনডিভিজ্যুযাল অ্যাটেনশান অ্যাণ্ড ইনভাইট ট্রাবলস আণ্ডাবস্ট্যাণ্ড?

শুষ্ককণ্ঠে স্বপ্না বোস জবাব দিল, ইযেস স্যাব ।

—গুড নাইট।

পিছনেব দবজা দিযে বেবিযে যাচ্ছে ভাটনগব। আব হিংস্র শ্বাপদেব মত জ্বলে উঠেছে স্বপ্না বোসেব দুই চোখ। সে অদৃশ্য হবাব পবেও সেই দিকে চেযে নিঃশব্দে আগুন ছড়ালো আবো খানিকক্ষণ।

পবে মাথা বাখল ভূতনাথেব টেবিলেব ওপবেই।

চেযাব ছেড়ে ভূতনাথ উঠে দাড়াল। এক দিকেব কাঁচেব আলমাবি খুলে একটা আবকেব শিশি বাব কবল। ড্রপাবে কবে সাদা জলেব মত আবক তুলে নিল কযেক ফোঁটা। কাছে এসে বলল, ওঠো বাত হযেছে, এব পবে তো আবো কতক্ষণ লাগবে ঠিক নেই।

স্বপ্না বোস মাথা তুলল। কিছুটা সংযত, কিছুটা শান্ত। নিজেই দু'হাতেব আঙুলে কবে একটা চোখেব ওপব নিচ টেনে ধবে আলোব দিকে মুখ ফেবালো। ভূতনাথ ড্রপ ফেলল চোখে। একে একে দুই চোখেই।

নীববে উঠে গেল স্বপ্না বোস। এক কোণেব আড়াল থেকে একটা পেটমোটা ভাবী চামড়াব হ্যাতব্যাগ তুলে নিযে পাশেব দবজা দিযে নিস্ক্রান্ত হযে গেল।

ভূতনাথ বসে আছে।— নীবব, নিস্পন্দ। যেন ঘুমিযে আছে। কোন তাড়া নেই। কোন চাঞ্চল্য নেই। সময কেটে যাচ্ছে।

অনেকক্ষণ বাদে ওই ব্যাগ হাতে নিযেই আবাব দেখা দিল যে নাবী, তাকে চিনবে না বিউটি হাউসেব অতি পবিচিত কোন খদ্দেবও।

ঘড়িব দিকে তাকালো ভূতনাথ। এক ঘণ্টা পাব হযে গেছে। হবাব কথা। বোজ ঘণ্টাতিনেক লাগে যে প্রসাধন সম্পূর্ণ হতে, সেটা তুলতে কম কবে এক ঘণ্টা তো লাগবেই। এমনিতে ওঠে না, ওই হাতব্যাগে আছে নানা বকম বাসাযনিক নির্যাস— সেটা যথাস্থানে বেখে ভূতনাথেব মুখোমুখি বসল আবাব।

সদ্যস্নাতা। আটপৌবে বেশবাস। সর্বাঙ্গেব চাঁপাহলুদ পেলবতা ধুযে-মুছে গেছে। শ্যামাঙ্গী। কুৎসিত। চোখেব ভ্রূপে নেত্র-কোণেব সেই মন-মাতানো লালিমাব আভা কেটে গেছে। দাঁতেব নিখুঁত প্লাস্টাব-পালিশ উঠেছে। নিশ্চিহ্ন হযেছে অধব-কোণেব কামনা জাগানো তিলটাও।

অবসন্ন, বিষাদক্লিষ্ট দুই চোখ মেলে স্বপ্না বোস তাকালো ভূতনাথেব দিকে।

ভূতনাথও তাকেই দেখছিল।

তাব সেই মডা-চোখেব দৃষ্টি যেন বদলে যাচ্ছে একটু একটু কবে। নিস্পৃহতাব আববণটুকুও সবে যাচ্ছে। কোমলতাব আভাস আসছে যেন। চেযেই আছে ভূতনাথ।

ভাবী সহজ লাগছে তাব বিধাতাব গডা ওই নাবীমূর্তি।

কুৎসিতেব মধ্যেও কোথায যেন সুন্দবেব সন্ধান পেযেছে সে।

বিবেচনা সাপেক্ষ

পডা শেষ হতে সকলেই ওবা চুপচাপ বসে বইল খানিক। শ্রোতাদেব মধ্যে দুজন বেশ নামী সাহিত্যিক। বাদবাকি সকলে মোটামুটি নামী। গল্পটা নিযে মনে মনে সকলেবই একটু বিচাব-বিশ্লেষণ শুরু হযেছে ভেবে আমি মনে মনে খুশি।

বেশ খানিকটা সময নিযে নামী দুজনেব একজন জিজ্ঞাসা কবলেন, তা তোমাব ইচ্ছেটা কি, নতুন লেখকেব এই গল্প ছাপতে চাও?

আমি মাথা নাডলাম, সেই বকমই ইচ্ছে বটে।

একটু ভেবে তিনি মন্তব্যসহ আবাব প্রশ্ন কবলেন, মাথা খাটিযে মোটামুটি মন্দ দাড কবাযনি, কিন্তু তোমাব অতবড কাগজে ছাপাব মত স্পার্ক কিছু দেখছ কি?

আমি সায দিলুম, খুব অবাক কবাব বা মুগ্ধ কবাব মত কিছু দেখছি না বটে। নতুন লেখকেব গল্প নিযে সঠিক আলোচনা এবপব গডগডিযে বিস্তৃত হতে থাকল।

মোটামুটি নামীদেব একজন বলল, লেখকেব ভাষা বেশ সহজ তব-তবে সেটা ঠিক, এ-জন্যেই আপনাব ভালো লেগেছে বোধহয। কিন্তু গল্পটাতে ভাবেব চাপা বাঁধুনি কম, তাছাডা ঠিক ছোট গল্পেব ছকে এটাকে ফেলা যায না—অনেকটা বিপোর্টিংযেব মত লাগছে।

প্রতিবাদেব সুবে আব একজন সমর্থনই কবল তাকে। বলল, নতুন লেখকেব কাছে তুমি তাব বেশি আশা কবো কি কবে?

হাসিমুখে তৃতীয তরুণ শ্রোতা গল্পটাব বুকে অনাযাসে একটা ধাবালো ছুবি চালিযে দেবাব মত কবে মন্তব্য কবল, কিন্তু আগাগোডাই উদ্দেশ্যমূলক প্রোপাগ্যাণ্ডা ধবনেব না? গল্পেব বসেব উপব দিযে উদ্দেশ্যটা এ বকম সাদাসাপটাভাবে উপচে উঠবে কেন?

আসবেব দু'নম্বব নামী সাহিত্যিক মুখ খুললেন এবাবে, মাথা নেডে বললেন, সেদিক থেকে গল্পটা তো মাব খেযেইছে, তা ছাডাও অনেক জাযগায একটু আনবিযেল

হয়েছে। কোর্টে দাঁড়িয়ে প্রৌঢ়া বিভাবতীর জবাব আর বিচারকের চাপা উচ্ছ্বাসের দিকটাই ভাবো না—অবাস্তব মনে হয় না?

আমি দ্বিধান্বিত মুখে জবাব দিলাম, কিন্তু লেখক তো বলছে গল্পটা সত্যি ঘটনার ছায়া নিয়ে লেখা।

মোটামুটি নামীদের একজন সপ্রতিভ মুখে বলে উঠল, সত্যের থেকে ছায়াটা যে একটু বেশিই বড় হয়ে গেছে।

সকলে হাসল একপ্রস্থ।

একনম্বর নামী লেখক এবারে দু'নম্বর নামী লেখকের সমালোচনার ওপর মন্তব্য চাপালেন।—আনরিয়েলই যদি বলো তো সব থেকে বেশি অস্বাভাবিক ব্যাপার মেয়ে-বিয়ের রাতে মহিলাটির তাঁর স্বামীকে ও-ভাবে মোটরে চাপিয়ে ব্যাণ্ডেলে চালান করা। ওরকম ভ্যাবলাকান্ত স্বামী গল্প-উপন্যাসেই যা দু'চারটে দেখা যায়।

মোটামুটিদের একজন সোৎসাহে ঘাড় নাড়ল বারকয়েক—আমি ঠিক এই পয়েন্টটাই বলতে যাচ্ছিলাম দাদা. বিভাবতীকে সধবা রাখার দরকার কি? বিধবা করে দিলেই তো ওদিকের প্রবলেম মিটে যায়।

গল্পের সধবাকে কলমের খোঁচায় অনায়াসে বিধবা করে দেওয়া যেতে পারে, আর তাতে মেয়ে-বিয়ের রাতে ভ্যাবলাকান্ত স্বামীকে হারানোর সমস্যাও মেটে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। গল্পের মুখ রক্ষার খাতিরে এটুকু সংস্কার গর্হিত কেউ বলবে না। গল্প লিখতে বসে নিজেই কত সময় কুমারী মেয়েকেই বিধবা করেছি আর বিধবাকে শেষ পর্যন্ত কুমারী করে দিয়েছি ঠিক নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে চুপ করেই রইলাম।

নতুন লেখকের গল্পের প্রৌঢ়া নায়িকা বিভাবতীর নাটকীয় আচরণ, জাঁদরেলপনা, কথাবার্তা, অন্ধ বিশ্বাস ইত্যাদির অবাস্তবতা নিয়ে অনেকভাবে খুঁত-খুঁত করার পরে সাহিত্যিকরা আসর ভঙ্গ করল এক সময়। নামী সাহিত্যিক দুজন পরামর্শ দিয়ে গেলেন, নতুন লেখকের ওপর সুনজর যখন পড়েছে, তোমার কলম চালিয়ে ঠিকঠাক করে নাও—এ-রকম তো কতই করেছ।

আমি বললাম, দেখা যাক, ছাপতেই হবে এমন কথা নেই—তবে তোমরাও আর একটু ভেবো তো।

তাঁরা চলে যাবার পর নিজেই আবার কেন যে নতুন করে ভাবতে বসলাম, জানি না।

সাদাসিধেভাবে বললে গল্পটা এই রকম দাঁড়ায়ঃ

বিভাবতী একজন জাঁদরেল মহিলা। বয়স পঞ্চাশের কিছু ওপরে। বয়সকালে চেহারা বেশ ভালো ছিল বোঝা যায়। এখনো দিব্বি শক্ত-সমর্থ, মজবুত স্বাস্থ্য। বে-সরকারী স্কুলের হেডমাস্টারের বউ। হেডমাস্টার বলতে নব্যযুগের হেডমাস্টার নন শৈলেশ চাটুজ্জে, নব্যযুগে পা দিয়ে টাকার মুখ দেখতে না দেখতে চাকরির মেয়াদ ফুরিয়েছে। মাস পাঁচেক হলো চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। অন্য মাস্টাররা পাঁচ জায়গায় ছেলে পড়িয়ে তাঁর থেকে বেশি রোজগার করত, কিন্তু হেডমাস্টারের পদমর্যাদা

লাভ করে তিনি তাও পারতেন না। এখন অবশ্য সে বাধা নেই, কিন্তু স্বাস্থ্যটাই বাধা। হার্টের ব্যারাম, একটু পরিশ্রম করলেই বুক ধড়ফড় করে। বিভাবতী তা করতে দেন না। ধরা-করা করলে চাকরির মেয়াদ আরো একটা বছর বাড়ানো যেত হয়ত, কিন্তু স্ত্রীর আপত্তির দরুন সে-চেষ্টা করেন নি।

এ-বাড়িতে এই স্ত্রীটির আপত্তি আর মতামত একটা বিশেষ ব্যাপার। ছেলে মেয়েরা আড়ালে মন্তব্য করে, হেডমাস্টারি আসলে চিরকাল তাদের মা-ই করে আসছে।

অতিশয়োক্তি নয়। বাড়ির কর্তা থেকে শুরু করে সকলেই কর্ত্রীর দাপটে তটস্থ। সংসারের কোনো ব্যাপারে অপোজিশন বলে কিছু নেই—সেখানে বিভাবতীই সব।

তিন মেয়ে এক ছেলে। মেয়েরা বড়, ছেলে এ বছরই হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করে বি. এ-তে ভর্তি হয়েছে। বড় মেয়ে দুটো স্কুল ফাইন্যাল পাস করে বসে ছিল। চেহারা তাদের মোটামুটি সুশ্রী। নাম রমা আর শ্যামা। গত দেড় বছরের মধ্যে তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। খুব সামান্য ভাবেই হয়েছে। তবু ঘরে সোনাদানা যা একটু ছিল, আর সামান্য সঞ্চয় যা ছিল, সব নিঃশেষে বেরিয়ে গেছে। তাতেও কুলোয় নি, প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফণ্ডের তহবিল কিছুটা হালকা করতে হয়েছে। তবু স্ত্রী-টি কড়া-ক্রান্তি হিসেব করে চলেন বলেই দেড় বছরের মধ্যে দুটো মেয়ের বিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, শৈলেশ চাটুজ্জে সেটা একবাক্যে স্বীকার করেন। দ্বিতীয় মেয়ের বিয়েতে খরচের কথা ভেবে গায়ে জ্বর এসেছিল তাঁর, কিন্তু স্ত্রীর ধমক খেয়ে সে জ্বর ছেড়েছে আর বিয়েও নির্বিঘ্নে হয়ে গেছে।

বড় মেয়ে রমার বিয়ে দিয়েছেন ব্যাণ্ডেলে এক স্কুল মাস্টারের কাছে। ওই মেয়ের সংসারে আরো কয়েকটি পোষ্য আছে। তাই সদা অনটন। সে তুলনায় বর্ধমানে মেজ মেয়ে শ্যামার একটু ভালো বিয়ে হয়েছে। নিজেদের পৈতৃক ঘর-বাড়ি ওই জামাইয়ের, তার ওপর ছেলেটা মোক্তারি করে মন্দ পয়সা পায় না। বড় মেয়ে অনটনের মধ্যে আছে বলে মনে মনে বিভাবতীর তার ওপরেই টান বেশি একটু। যে কোন ছল-ছুতোয় তাকে একটু সাহায্য করতে পারলে খুশি হন।

তৃতীয় মেয়ে শম্পা আগামী বছরে বি. এ. পরীক্ষা দেবে। এই মেয়েটার ভালোয় ভালোয় একটা বিয়ে দিয়ে দিতে পারলে দায় চোকে ভাবেন বিভাবতী। ছেলে করে নিজের পায়ে দাঁড়াবে, করে বিয়ে করবে, সে ভাবনা ভাবেন না তিনি। ভিতরে ভিতরে চিন্তা তাঁর এই মেয়েটাকে নিয়েই— শম্পাকে নিয়ে।

তার প্রথম কারণ, তিন মেয়ের মধ্যে শম্পাই রীতিমত সুন্দরী। যেমন ফর্সা, তেমনি লম্বা-টম্বা—স্বাস্থ্যও সব বোনের থেকে ওরই ভালো। এই মেয়ে কলেজে যায় সেটাই তাঁর মনঃপূত নয় খুব। কিন্তু ঘরে বসিয়ে রেখেই বা কি করবেন। হায়ার সেকেণ্ডারি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করার ফলে আর সেই সঙ্গে মেয়ের ক'দিন কান্নাকাটির ফলে কলেজে পড়ার অনুমতি দিতে হয়েছে। পার্ট ওয়ানও ভালোই পাস করেছে, সামনের বার পার্ট টু দেবে। বিভাবতীর ধারণা— তাঁদের যা সঙ্গতি, মেয়ে বি. এ. পাস করলে তার বিয়ে দেওয়া আরো শক্ত হবে।

দুশ্চিন্তার দ্বিতীয় কারণ, মেয়েটার স্বভাব। অন্য দু'বোনের মত একটুও নয়। হেসেখেলে ধিঙ্গিপনা করে বেড়াতে ভালো লাগে, পরিপাটি করে সাজতে-গুজতে ভালবাসে, মুখে কথার খই ফোটে, সিনেমা দেখার নামে জিভে জল আসে। বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে মায়ের কাছে শম্পা যত দাবড়ানি খায় তেমন আর কেউ নয়। একটু বে-চাল দেখলে ওর চুলের গোছা টেনে ধরবার জন্য এখনো মায়ের হাত নিশপিশ করে। আর ওর দিকে তাকালেই যেন বে-চাল দেখেন তিনি। মাকে যমের মত ভয় করে অবশ্য, কিন্তু চুপিচুপি মায়ের অমতের কাজও দুই-একটা শুধু ও-ই করে বসে। এত সাহস আর কারো নেই। এই সেদিনও ফিরতে দেরী হবে বলে কলেজ থেকে কোন দুই বান্ধবীর সঙ্গে চুপি চুপি সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরেছিল। ছ'টা বেজে যেতেই মায়ের মনে ঠিক খটকা লেগেছে, ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ধরেছেন,—কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

ঘাবড়ে গিয়ে মেয়ে অবশ্য সত্য কথাই বলেছিল। মুখের দিকে চেয়ে সরাসরি মিথ্যে বলবে এত সাহস নেই। অতবড় মেয়েকে বিভাবতী পাখার বাঁট দিয়ে শুধু ঠেঙাতে বাকি রেখেছিল। মেয়ে কেঁদে-কেটে হাতে-পায়ে ধরে তবে রেহাই পেয়েছে। তবু না বলে সিনেমা যাবার সাহস হল কি করে তাই ভেবেই তাজ্জব বিভাবতী।

এই মেয়েটার জন্য এমনি নানা কারণে সব থেকে বেশি দুশ্চিন্তা তাঁর। মায়ের মেজাজ ভালো থাকলে শম্পা নিজেই কত সময় শোনায়, মায়ের সদাই সৎমায়ের মত ব্যবহার তার সঙ্গে। সে যেন নিজের মেয়ে নয়। খুব মিথ্যে বলে না। বাড়ির খাটাখাটনি সব থেকে বেশি তাকেই করতে হবে—দিদিদের বিয়ের আগেও এই পক্ষপাতিত্ব ছিল। পুজোর সময় এখনো সব মেয়েদের শাড়ি দেওয়া হয়। সব থেকে ভালো শাড়ি আর জামা বড় দুই মেয়ের কাছে যাবে—ছোট মেয়ের একটা হলেই হল।

আর সেই সাদামাটা শাড়ি পরে শম্পা যখন বেরোয় আর কলেজে যায়, সে দিকে চেয়ে বিভাবতীর বুকের ভিতরটা গুড়গুড় করে কেমন—ওর শাড়ি জামা সব থেকে সুন্দর ঠেকে তার চোখে। ভাবেন আরো সাদাসিধে কিছু আনলেই যেন ভালো হত।

তিন মেয়ে এক ছেলে, কিন্তু ছেলের দলে আর একজনকেও ফেলা যায়। তিনি বাড়ির কর্তা শৈলেশ চাটুজ্জে। বিয়ে করে বিভাবতীকে ঘরে এনেছেন পঁচিশ বছর বয়সে। বড় জোর গোড়ায় পাঁচটা বছর বাদ দিলে তিরিশ থেকে আটান্ন—এই আটাশ বছর একটানা স্ত্রীর শাসনে প্রতিপালিত হয়েছেন তিনি। সেই শাসনও প্রয়োজনে কঠিন আর প্রয়োজনে কোমল। বয়স যত বেড়েছে ভদ্রলোক ততো বেশি স্ত্রীর হাতে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। ফলে স্ত্রীটিও তাঁকে বয়স্ক ছেলের মতই নেড়েচেড়ে লালনপালন করে এই বয়স পর্যন্ত টেনে তুলেছেন। স্বামীর হার্টের রোগ আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে তো স্ত্রীর নির্দেশে তাঁর জোরে কথা বলাও বন্ধ। তাঁর খাওয়া-দাওয়া ওঠা-বসা চলাফেরা সবই বিভাবতীর হিসেবমত সম্পন্ন হয়ে থাকে।

পণ্ডিতের ঘরের মেয়ে ছিলেন বিভাবতী। তাঁর বাপের সংসার সেদিনে অসচ্ছল ছিল না। আর পড়েছিলেনও সচ্ছল ঘরেই। স্বামী বিদ্বান, বাড়িতে বিদ্বান শ্বশুর বিদ্যমান।

সদাগবী অফিসে ভালো চাকবি কবতেন বউ তাঁব চোখেব মণি ছিল। কি যে আনন্দে কেটেছে সেই দিন, ভাবলেও দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ে বিভাবতীব। সব যেন কোথায মিলিযে গেল। পান্তা খেতেও নুনে কুলোয না এখন এমন অবস্থা। সামাজিকতা নেই, আদব আপ্যাযন নেই, বাড়িতে দুটো অতিথি এলে চক্ষু স্থিব হয সকলেব। শ্বশুব খেতে ভালবাসতেন, খাওযাতে ভালবাসতেন। আব কোন বিলাসিতা ছিল না তাঁব। কেবল আনো আব পবিতৃপ্তি কবে খাও সকলে। সেই সন্তাগণ্ডাব বাজাবে বাড়িতে যেন নিত্য নেমন্তন্ন লেগেছিল।

আব তাঁবই দু'দুটো নাতনীব কি ভাবে বিযে হল। মনে পড়লে বাগে দুঃখে চোখে জলই আসে বিভাবতীব। দু'বাবই সবকাবী বিধিনিষেধেব দোহাই দিযে অব্যাহতি পেযেছেন। ববযাত্রীদেব শুধু আদবযত্ন কবে খাওযানো হযেছে, অন্য সকলেব ববাতে জলযোগ। অথচ আশীর্বাদী হাতে কবে জ্ঞাতি কুটুম্ববা সব এসেছে, মনেব কথা চেপে মুখে বলেছে, বেশ ব্যবস্থা হযেছে—যে দিনকাল পড়েছে। সকলেব হাতে হাতে উপহাবেব বাক্স বা প্যাকেট দেখে লজ্জায বিযেবাড়ি ছেড়ে পালাতে ইচ্ছে কবেছে বিভাবতীব। মনে হযেছে নেমন্তন্ন কবে এনে খেতে না দিযে তিনি যেন ভিক্ষে নেবাব ব্যবস্থা কবেছেন। শ্যামাব বিযেব সময এক ঠোঁট-কাটা আত্মীয তো বলেই বসল, আইনও বযেছে আবাব যাব ইচ্ছে সে এবই মধ্যে দিব্বি খাইযেও যাচ্ছে।

লজ্জায মাথাই কাটা গিযেছিল বিভাবতীব। আব চোখ ঠেলে বাব বাব জল আসছিল। কাব নাতনীব বিযেতে কি কথা শুনতে হল। অথচ বাগই বা কবেন কি কবে, মিথ্যে তো বলেনি। গত এক বছবেব মধ্যে বিভাবতী কম কবে দু'তিনটে নেমন্তন্নে গেছেন, না খেযে তো ফিবতে হয নি। কিন্তু কি কববেন, যেমন ববাত। শ্বশুব বেঁচে নেই বক্ষে। থাকলে হযত এই অপমানে প্রাণান্ত হত।

দিনকযেকেব জন্য বিভাবতী গেছলেন বড় মেযেব বাড়ি—ব্যাণ্ডেলে। যাবাব জন্য মেযেটা কতবাব যে লিখেছে ঠিক নেই। প্রথম ছেলে হবাব পব থেকেই অসুখে ভুগছে —দিনে দিনে হাড়সাব হচ্ছে। মাস ছয হল নাতিব বযস, ওটাবও বিকেট না কি হযেছে। যেমন ববাত।— অবস্থা না হয খাবাপই হল, স্বাস্থ্যটাস্থ্যগুলোও তো একটু ভালো থাকতে পাবে।

বিভাবতীকে বড় মেযেব কাছে যেতে হযেছে দিনকযেকেব জন্য। যাবাব আগে শম্পাকে বাড়িব ব্যবস্থা শুধু বুঝিযে দেন নি—তাকে সকাল থেকে বাতেব যাবতীয কর্তব্য একেব পব এক লিখে নিতে হযেছে। আব যাওযাব আগে পর্যন্ত বাড়িব কর্তাটিকেও ওষুধ-পথ্যেব ব্যাপাবে পাখী-পড়া কবে বুঝিযেছেন। তাবপব ছেলেকে নিযে দুর্গা দুর্গা কবে বওনা হযেছেন। ছেলেব কলেজ, সে সেদিনেই বিকেলে আবাব ফিবে এসেছে।

কিন্তু বিভাবতী চাব দিনেব বেশি ব্যাণ্ডেলে থাকতে পাবলেন না। মেযেব শবীব একটুও ভালো না, তাব ওপব ছ'মাসেব বোগে নাতিটা সাবাক্ষণ কাঁদে—তাঁব থাকা দবকাব ঠিকই, কিন্তু চাব দিনেই হাঁফ ধবে গেল বিভাবতীব, মনে হল যেন চাব সপ্তাহ

কেটে গেছে। মেয়ে-নাতি অসুস্থ, কিন্তু ঘব-সংসাব ফেলে কতদিন তিনি মেয়েব বাড়িতে বসে থাকতে পাবেন? ওদিকে কি হচ্ছে ভেবে সাবাক্ষণই ভিতবটা উতলা তাঁব। ওখানেও তো হার্টেব বোগী ফেলে এসেছেন একজন, সময়মত ওষুধ খাচ্ছে কিনা, পথ্য ঠিকমত পাচ্ছে কিনা কে জানে। যে দাযিত্বজ্ঞান আব এক মেয়েব। তাছাড়া সকাল সাড়ে নটা না বাজতে ওব কলেজে ছোটা আছে, শ্যামলেবও কলেজ আছে, খেলা আছে। কে কাকে দেখে।

চাব দিনেব দিন মেয়েব চেনা-জানা কলকাতাব সঙ্গী পেয়ে তিনিও ঘোষণা কবলেন, আব না, এবাবে যাবেন। ছুটি হলেই শ্যামলকে পাঠিয়ে দেবেন, নিজেও ফুবসত পেলে আবাব আসবেন—এখান থেকে এখানে, অসুবিধে কিছু নেই। একটানা আব থাকা সম্ভব নয়, ওখানে হয়ত সব অচল হয়ে আছে।

চলনদাবকেও অসুবিধেয ফেললেন না তিনি। হাওড়া স্টেশনে নেমে নির্দিষ্ট বাসে উঠে বসে তাকে বিদায দিলেন। এ তো আব ব্যাণ্ডেল নয যে পথ-ঘাটেব হদিস পাবেন না তিনি। কোথায নামতে হবে জানাই আছে। আব কলকাতাব বাস্তায চলাফেবা কবেও অভ্যেস আছে, এক মাছ-তবকাবিব বাজাব ছাড়া সব কেনা-কাটাই তো নিজেব হাতে কবেন।

শম্পা বাড়ি ছিল না। কলেজ থেকে ফিবেই বেবিয়েছিল কোথায। ফিবল সন্ধ্যাব একটু আগে। বাড়িতে পা দেবাব সঙ্গে সঙ্গে ভাইয়েব সঙ্গে অর্থাৎ শ্যামলেব সঙ্গে দেখা। ছোড়দিব সাড়া পেয়েই ও হন্তদন্ত হয়ে কাছে এসে গলা খাটো কবে বলল, এতক্ষণ ছিলি কোথায? মা চলে এসেছে—আব এসে পর্যন্ত কি কাণ্ড, কাছে যেতে ভয কবছে। প্রথমেই বাবাকে খামোকা যাচ্ছেতাই বকাবকি কবে নিল খানিকক্ষণ, তাবপব আমাকে, আব একটু আগে ঝি-টাকে—

শোনামাত্র শম্পাব খুশি মুখ থেকে প্রাণটুকুও যেন উড়ে গেল। সত্রাসে ভাইয়েব দিকে চেয়ে বইল খানিক, বলল, এত তাড়াতাড়ি তো ফেবাব কথা ছিল না..

শ্যামল বলল, সেই জন্যেই তো আমিও হাঁ, তোকে বলে চুপি চুপি আজ একটা ছ'টাব শো মাবব ভেবেছিলাম—ভাগ্যিস যাই নি।

ভয়ে ভয়ে শম্পা জিজ্ঞেস কবল, আমাব কথা কিছু বলেছে?

না, তুই বাড়ি নেই—বাগেব মাথায এখনো খেয়ালই কবে নি হয়তো। ব্যাণ্ডেলেই কিছু একটা হয়েছে বোধ হয়. বড়দিব অসুখটাই বেড়ে গেল কিনা বুঝছি না।

শম্পা বলল, অসুখ বেড়ে থাকলে মা চলে আসবে কেন?

শ্যামল বলল, তাই তো—তবু সেখানেই নির্ঘাৎ কিছু হয়েছে, নইলে ফিবেই এই মূর্তি কেন? মা এখন বাবাব ঘবে. তুই চুপি চুপি ঘবে গিয়ে ওই স্টাইলেব শাড়ি পবা বদলে ঠিকঠাক হয়ে নে তো যা—

পাংশু মুখে পা টিপে শম্পা বাবান্দা ধবে এগলো। এক সাবিতে ছোট বড় তিনখানা ঘব। প্রথম খুপবি ঘবটা শ্যামলেব, বোনেদেব বিয়ে হবাব পব দ্বিতীয ঘবটাতে এখন শম্পা একাই থাকে। ঘবেব আলো নেবানো। তাব পবেব ঘবটা বাবা-মায়েব—সে ঘবে আলো জ্বলছে।

নিজের ঘরের দোরগোড়ায় এসে শম্পা দাঁড়াল একটু, তারপর সামনের দিকে ঝুঁকে শুনতে চেষ্টা করল, বাপ-মায়ের ঘরের কোন কথা কানে আসে কিনা।

পরের মুহূর্তে যা ঘটে গেল, অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল শম্পা। আচমকা চুলের মুঠি ধরে হ্যাঁচকা টানে কে তাকে তার অন্ধকার ঘরের মধ্যে এনে ফেলল। হুমড়ি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিল, কোন রকমে টাল সামলে আবার আর্তনাদ করে ওঠার উপক্রম।

চুপ।

মায়ের চাপা গর্জন। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করার শব্দ। তারপর ঘরের আলো জ্বলে উঠল।

সামনে মা দাঁড়িয়ে। দু'চোখ ধকধক করে জ্বলছে। বি, এ, পড়া মেয়েকে চুলের মুঠি ধরে এভাবে ধরে টেনে আনা কিছুই নয়, মায়ের এ-মূর্তি দেখে শম্পা থরথর করে কেঁপে উঠল।

বিভাবতী দেখছেন মেয়েকে, ওর পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখের আগুনে ঝলসে দিচ্ছেন। সমস্ত মুখ লাল, ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছেন অল্প অল্প।

ওই ছেলেটা কে?

হিসহিস শব্দটা যেন এক ঝলক গলানো শিসের মতো কানে ঢুকল শম্পার। মাথাটা ঘুরে গেছে, চোখে লাল নীল সবুজ হলদে দেখছে।

তোকে আজ খুন করে ফেলব! রেস্টুরেন্টে বসে কার সঙ্গে ঢলাঢলি করছিলি আর গিলছিলি?

মা! ত্রাসে মায়ের হাত কিংবা পা ধরার জন্য এগিয়ে আসছিল শম্পা।

আবার এক ধাক্কা খেয়ে তিন হাত দূরে ছিটকে মাটিতে বসে পড়ল। বিভাবতী সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এসে চুলের মুঠি ধরেই তাকে হিড়হিড় করে টেনে তুলে ধাক্কা দিয়ে চৌকিতে বসিয়ে দিলেন—তোকে আমি মেরেই ফেলব আজ, বঁটি দিয়ে কাটব, শিক পুড়িয়ে তোর পিঠে ছ্যাঁকা দেব—বল শিগগীর ছেলেটা কে?

মা! বলছি মা, তুমি একটু স্থির হয়ে বোসো, তোমার পায়ে পড়ি মা—

খবরদার! তুই আমাকে মা ডাকবি না। তিন দিনের জন্য গেছি, তার মধ্যে এই চরিত্র তোর? গলায় দড়ি জোটে না—কাল আমিই তোকে দড়ি এনে দেব—ভালো চাস তো কে ছেলেটা আগে বল শিগগীর।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে শম্পা বলল, ওই তিনতলা লাল বাড়ির—

জনালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলেন কোন তিনতলা লাল বাড়ির।—ওই সামনের রাস্তার মুখের লাল বাড়ির?

শম্পা কাঁপতে কাঁপতে মাথা নাড়ল—তাই।

ঠিক এই জায়গায় বাইরে শৈলেশ চাটুজ্জের কোমল ডাক ভেসে এলো।

এ ঘরের দরজা বন্ধ কেন? শম্পা, তোর মা কোথায় রে, আমাকে ওষুধ দেবে না?

যাচ্ছি! জানালার দিকে চেয়ে তপ্ত একটা ঝাপটা মারলেন বিভাবতী, তারপর মেয়ের দিকে ফিরে দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, বসে থাক, এখান থেকে নড়বি তো আস্ত রাখব না।

দবজা খুলে বেবিযে গেলেন।

আতঙ্কিত শম্পা ধবেই নিযেছে বাবাকে ওষুধ খাইযেই মা এক্ষুনি ফিববে। কিন্তু তিনি ফিবলেন না। বাতে খাবাব সময হলো, তখন পর্যন্ত না। মাঝে মাঝে দেখা যাচ্ছে তাঁকে, থমথমে মুখ। একবাব দবজায দাঁডিযে ডাকলেন, খেতে আয।

ভযে ত্রাসে মুখ-হাত পর্যন্ত ধোযা হয নি তখনো। বসেছিল আব প্রমাদ গুনছিল। ডাক শুনে তাডাতাডি কাপড বদলে এসে খেতে বসল। যে যাব নিঃশব্দে খেযে উঠল। ছোডদিব মুখ দেখে শ্যামল বুঝে নিযেছে সঙ্কটজনকই কিছু ঘটেছে। মা মাঝে মাঝে ছোডদিব দিকে যেভাবে চোখ বুলোচ্ছে তাতে তাবই ভয ধবে গেছে। আব ছোডদিটা যেন বেঁচে নেই, কলেব পুতুলেব মতো হাত নডছে আব এক-একবাব মুখে উঠছে।

খাওযাব পাট চুকল।

সব গোছগাছ কবে নিজেব ভাত বেডে ঢাকা দিযে বেখে বিভাবতী হাত ধুযে বান্নাঘব থেকে বেবিযে এলেন। কি জন্যে যে ঠাকুব তাঁকে এই দৃশ্য দেখালেন কে জানে। নইলে আজ তো তাব ব্যাণ্ডেল থেকে আসাবই কথা না।...মোডেব মাথায যেখানে বিভাবতীব বাস থেকে নামাব কথা, তাব খানিক আগেই নেমে পডতে হযেছিল। সামনে একগাদা গাডি আটকে গেছে, তাই নেমে পডেছিলেন। গবমে সেদ্ধ হওযাব থেকে এই দু'মিনিট হাঁটা ভালো।

নেমে ওধাবেব ফুটপাথ ঘেষে আসছিলেন তিনি। ওখানে একটাই হালফ্যাশনেব নামী বেস্তবাঁ আছে। ঘাড ফেবাতেই হতভম্ব কযেক মুহূর্ত। কোণেব দিকে দুটো চেযাবে মুখোমুখি বসে খাচ্ছে শম্পা আব কে একটা ছেলে। দু'জনে দু'জনেব দিকে ঝুঁকে কথা কইছে, এত নিবিষ্ট যে কোনদিকে চোখ নেই কাবো।

ছেলেটাব চেহাবাপত্র ভালো, আব জামাকাপডও ফিটফাট। বিভাবতীব মাথায তখন দাউ দাউ আগুন জ্বলে উঠেছে—কলকাতাব পথেঘাটে অমন ভালো চেহাবা ফিটফাট হাড-পাজী ছোকবা তিনি অনেক দেখেছেন।

কিন্তু স্বামীকে ওষুধ খাইযেই তক্ষুনি আবাব ফিবে এসে মেযেব ওপব চডাও হন নি তাব প্রথম কাবণ, মেযেটা আবো ভয পাবাব অবকাশ পাক, দ্বিতীয কাবণ, তিনি কিছু ভাবছেন আব কিছু মনে কবতে চেষ্টা কবছেন।

নিঃশব্দে মেযেব ঘবে ঢুকে আবাব দবজা বন্ধ কবলেন তিনি। মেযেব ফর্সা মুখ কাগজপানা হযে আছে দেখলেন। কাছে আসতেই শম্পা কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁডাতে চেষ্টা কবল।

বোস।

দাবডানি খেযে বসে পডল আবাব। তিনি দাঁডিযে বইলেন।—ওই লাল বাডিব ছেলে মানে গাঙ্গুলি জজেব বাডিব ছেলে?

গাঙ্গুলি জজ বিশ বছব আগে পেনশন নিযেছেন। পাডায তাঁদেব নামডাক প্রতিপত্তি মন্দ নয।

শম্পা ঘাড গোঁজ কবে সামান্য মাথা নাডল।

গাঙ্গুলি জজেব কে হয?

ছেলে। শম্পাব গলা দিযে শব্দ বেবোয না প্রায।

কোন ছেলে?

ছোট।

পড়াশুনা কতদূব কবেছে?

এক বছব আগে এম. এ. পাশ কবেছে।

বিভাবতী তীক্ষ্ণ গভীব দৃষ্টিতে মেযেকে দেখে নিলেন একটু। মেযে সত্যি বলছে কিনা সেটাই বোঝাব চেষ্টা হযতো।—এখন কি কবে?

কলেজেব প্রোফেসাবি। শম্পাব গলায কি একটু আশাব সুব বাজল? সাহস কবে সে কি মুখ তুলে মাযেব মুখেব দিকে একবাব তাকাবে? পাবল না।

বিভাবতী জিজ্ঞাসা কবলেন, তোব সঙ্গে ক'দিন ধবে আলাপ?

শম্পা নিরুত্তব।

কদিন? বিভাবতী ঝাঁঝিযে উঠলেন আবাব।

দু বছব।

বিভাবতী হতভম্ব খানিক। তাবপবেই দাঁত কডমড কবে বলে উঠলেন, দু বছব ধবে আমাব চোখে ধুলো দিযে তুই এই কবে বেডাচ্ছিস? তোব দিদিদেব বিযেব আগে থেকে?

শম্পাব মুখ বিমর্ষ আবাব। কেঁদে ফেলে বলে উঠল, তুমি বিশ্বাস কবো মা, ও খুব ভালো ছেলে।

বিভাবতী দাঁডিযে দাঁডিযে দেখলেন খানিক। তাবপব বললেন, কাল থেকে আমি না বলা পর্যন্ত তুই কলেজে যাবি না, আব বাডি থেকে এক পা বেরুবি না।

একে একে দুটো স্তব্ধ দিন কেটে গেল।

তৃতীয দিনে লাল বাড়িব ছেলে কলে পডল। বাডিব সামনে ঘুবঘুব কবছিল, বিভাবতী কাজেব অছিলায বেরুলেন, তাবপবেই খপ কবে ছেলেটাব হাত ধবে বললেন, তোমাব বাডিই যাচ্ছিলাম, ভিতবে এসো আমাব সঙ্গে।

বিমূঢ তটস্থ লাল বাডিব ছেলেকে সোজা বাডিতে টেনে নিযে এলেন তিনি। এনে তাকে নিযে সোজা শম্পাব ঘবেই ঢুকলেন।

শম্পা আঁতকে উঠে দাঁডাল।

তুই ও ঘবে যা।

হুকুম অমান্য কবাব মত বুকেব পাটা নেই। করুণ চোখে একবাব লাল বাডিব ছেলেব দিকে তাকিযে শম্পা দুরু-দুরু বক্ষে ঘব ছেডে চলে গেল।

বোসো।

চৌকিব এক কোণে কাঠ হযে গেল ছেলেটা।

কি নাম?

সুনীল গাঙ্গুলী।

কি কবো?

কলেজে পডাই।

কোন কলেজে?

নাম বলল।

বিভাবতী এব পব বাড়িতে কে আছে না আছে, দাদাবা কি কবে না কবে ইত্যাদি খবব নিলেন। বোনেদেব কোথায় বিয়ে হয়েছে তাও শুনলেন। সবই মোটামুটি বড ব্যাপাব।

আমাদেব অবস্থা কি জানো?

লাল বাড়িব ছেলে সুনীল মাথা নাড়ল—জানে।

আমাদেব কিছু নেই জেনেও তোমাব বাবা-মা এখানে তোমাব বিয়ে দিতে বাজি হবেন?

তাবা বাজি হয়েছেন।

তুমি তাঁদেব বলেছ?

হ্যাঁ। বাবা-মা শম্পাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে দেখেছেন, আলাপ কবেছেন। এখন আপনাদেব দিক থেকে প্রস্তাবেব আশা কবছেন তাঁবা। কিন্তু শম্পা ভয়ে আপনাকেও কিছু বলছিল না, আমাকেও দেখা কবে কিছু বলতে দিচ্ছিল না। কেবলই বলে বি এ. পাস কবাব আগে কিছু হবে না।

বিভাবতী খানিক হাঁ কবে চেয়ে বইলেন ছেলেটাব দিকে। প্রথমে ঘাবড়ে গেছল, নইলে মুখে বোল আছে।

শম্পা! হঠাৎ দবজাব দিকে চেয়ে হাঁক দিলেন তিনি।

শুকনো নতমুখে শম্পা দোবগোড়ায় দেখা দিল।

ঘবে কি আছে দেখ, সুনীলকে খেতে দে। আব শোন, আমি এক্ষুনি ওব সঙ্গে ওদেব বাড়ি যাচ্ছি।

সুনীল তক্ষুনি উঠে দাঁড়াল, খাওযা পবে হবে, আপনি চলুন না—

তুমি বোসো।

এই হুকুমেব ধবণই আলাদা। সুনীল তাড়াতাড়ি বসে বাঁচল। আব ব্যস্তসমস্ত শম্পা ছুটল বান্নাঘবেব দিকে। আশায আনন্দে থবথব কবে কাঁপছে সে।

বিভাবতী লাল বাড়ি থেকে ফিবলেন যখন, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সুনীলই পৌঁছে দিযে গেল। শম্পা উদগ্রীব হয়েই ছিল সাবাক্ষণ। কিন্তু মাযেব মুখ দেখে বোঝাব উপায নেই, ভালো খবব কি খাবাপ খবব। খাবাপ খবব হবাব তো কোন কাবণ নেই, তবু ত্রাস যায না। মেজাজ ঠাণ্ডা বেখে মা কিছু কবে আসতে পাবে বলেই ধাবণা নেই তাব।

তোব বাবাকে ঠিকমত ওষুধ খাইয়েছিস?

মাথা নাড়ল— খাইয়েছে।

তিনি সটান নিজেব ঘবে চলে গেলেন।

বেবিয়ে মেযেব ঘবে এলেন প্রায ঘণ্টাখানেক বাদে। শম্পা শয্যায বসেছিল। সচকিত।

চুপচাপ তিনি মেযেকে দেখলেন একটু। বললেন, সামনেব এই দশ দিনেব মধ্যে

বিয়ে দিতে চায় ওরা—তা না হলে ভাদ্র আশ্বিন কার্তিক এই তিন মাস আর হবে না।

বুকের ভিতর থেকে শম্পার একটা বোঝা নেমে গেল। আস্তে আস্তে মুখ তুলে তাকাল সে। কিন্তু মায়ের মুখখানা যেন অদ্ভুত শান্ত মনে হলো তার। আর তারপর যা ঘটল শম্পা কল্পনাও করতে পারে না। মা হঠাৎ পাশে বসে পড়ে দুহাতে বুকে টেনে নিল তাকে। তারপর আরো আশ্চর্য, মায়ের চোখে জল— বুক চেপে ধরে মা তার পিঠে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

আনন্দের আবেগে শম্পা দুহাতে মাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর কোলে মুখ গুঁজে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগল।

বিভাবতী নিঃশব্দে তার পিঠে হাত বুলোচ্ছেন।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলেন বিভাবতী। সমস্ত গা কাপছে। ঘামছেন দরদর করে। ঘন অন্ধকার।

এ কি দেখলেন তিনি? এ কি দেখে উঠলেন?

তিনি দেখলেন, ঘুমের মধ্যে একেবারে স্পষ্ট দেখলেন, বিগত শ্বশুর খাচ্ছেন আর হাসছেন— হাসছেন আর খাচ্ছেন। মাছ মাংস পোলাউ রসগোল্লা সন্দেশ সব পরিপাটি করে খাচ্ছেন। খাচ্ছেন আর বলছেন, বেটি সেয়ানা বটে, বেশ করেছে, নিজেরটা নিজেই যোগাড় করে নিয়েছে। খেয়ে বড় তৃপ্তি হল গো বউমা।

এ রকম স্বপ্নও দেখে কেউ? বিয়ের আর মাত্র দুদিন বাকি, দিবারাত্র নিঃশ্বাস ফেলার সময় নেই বিভাবতীর। এই কদিনে তিন ঘণ্টা করেও ঘুমিয়েছেন কিনা সন্দেহ। বেশি রাতে শুয়েছিলেন আজও। বিছানায় গা ঠেকানো মাত্র ঘুমিয়েছেন।—তার মধ্যে এই স্বপ্ন।

সকালে উঠেও অনেকক্ষণ বিমনা তিনি। কদিন ধরে ভিতরটা তার খুঁতখুঁত করছিল ঠিকই। আবার সেই জলযোগের ব্যবস্থার নামে গায়ে জ্বর আসছিল। কেবলই ভাবছিলেন কি করা যায়। স্বপ্ন দেখা আশ্চর্য নয়, কিন্তু শ্বশুর এভাবে খাচ্ছেন আনন্দ করছেন এই স্বপ্নই কল্পনাতীত।

ছেলের পক্ষ ধরেই নিয়েছে, শুধু মেয়েটি ঘরে আসবে, তার সঙ্গে আর বেশি কিছু নয়। তবু যতটা পারা যায় করবেন ঠিক করেছিলেন বিভাবতী। মেয়ের বরাতে বড় ঘর জুটেছে, অতিরিক্ত ভালো জামাই জুটেছে। মেয়ের বড় ভাগ্যটা তিনি একেবারে ছোট করে শুরু করাবেন না। যথাসাধ্য করবেন। এই যথাসাধ্য করার হিসেব দাড়িয়েছে আট হাজার টাকা। বিভাবতীর কল্পনার বাইরের অঙ্ক প্রায়। স্বামী প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড গ্রাচুইটি ইত্যাদির ইত্যাদির সব টাকা কুড়িয়েবাড়িয়ে সর্বসাকুল্যে উনিশ হাজার টাকা তাঁর হাতে দিয়েছিলেন। ওই যথাসর্বস্ব। ছেলে না দাঁড়ানো পর্যন্ত আর কপর্দক ঘরে আসারও সম্ভাবনা নেই। তবু তাই থেকে আট হাজার টাকা খরচ করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন বিভাবতী।

স্বপ্ন দেখার ফলে বিকেলের মধ্যে প্ল্যান আরো অনেকটা প্রশস্ত রাস্তায় এগিয়ে চলল। কাউকে কিছু না বলে বাসে চেপে ভাগ্নের বাড়ি চলে গেলেন তিনি। ভাগ্নেটা

কবিতকর্মা লোক। তাব সঙ্গে বসে নতুন কবে আব একটা হিসেব কবে ফেলা হল। দু'শ সোয়া দু'শ লোককে পেটপুবে খাওযাতে কম কবে আবো দু' হাজাব টাকা লাগবে। যা তিনি খাওযাতে চান, এব কমে হবেই না।

বিভাবতী বললেন, ঠিক আছে, তুমি সব ব্যবস্থা কবে দাও। সব যোগাডযন্ত্র কবতেও তো প্রাণান্ত ব্যাপাব।

সেদিক থেকে ভাগ্নে তাকে নিশ্চিন্ত কবল।

খুশিমনে বিভাবতী বাডি ফিবলেন। তাব মস্ত একটা দুর্ভাবনা গেল। কেবলই মনে হল, মেযেব কল্যাণেব জন্য শ্বশুবই এভাবে তাঁব দ্বিধা ঘুচিযে দিলেন। পবে যা হবাব হবেই। আব এতে মেযেব মঙ্গলও হবেই। ইতিমধ্যে সকালেই তিনি পাডাব বিযেবাডিব একতলা ভাডা কবে এসেছেন। নিজেদেব আডাই ঘবে কিছুই হবে না। বাডি থেকে মিনিট তিনেকেব পথ ওই বিযেবাডি। দোতলায বাডিব মালিক থাকে, একতলা বিযেব দরুন ভাডা দেওযা হয। তা সেও শ্বশুবেব আশীর্বাদে আব মেযেব ভাগ্যে একটু সুবিধেতেই পেযেছেন তিনি। বিযেব দিন সকাল থেকে চব্বিশ ঘন্টাব জন্য ভাডা একশ টাকায বফা হযেছে।

খবচ আট হাজাব থেকে এক লাফে দশ হাজাবে উঠে গেল। কিন্তু ভবিষ্যতেব ভাবনায একটুও উতলা নন তিনি। মেযেব কল্যাণ হবে মেযে সুখী হবে এটাই যেন বড কথা।

বাডিব কর্তা অর্থাৎ শৈলেশ চাটুজ্জে খোঁজ নিতে চেষ্টা কবেন, কি হচ্ছে বা কি হবে। বিভাবতী ধমকেই ঠাণ্ডা কবেছেন তাঁকে, যা হবে তা হবে, তোমাকে কে মাথা ঘামাতে বলেছে? ভাবনা-চিন্তা কবে আবাব হার্ট ধবে বসে পডো।

আমতা আমতা কবে ভদ্রলোক বলেন, ইযে, আমি তো বেশ ভালই আছি এখন।

বিভাবতী বেগে যান, ভালো আছ সেটা আব সহ্য হচ্ছে না, কেমন? তাহলে তুমিই সব ব্যবস্থা কবো, আমি গিযে শুই।

স্বামীটি সুডসুড কবে ঘবে পালিযে বাচেন।

কিন্তু ভদ্রলোক আকাশ থেকে পডলেন বিযেব বাতে। গোধূলি লগ্নে বিযে। বিযে হযে গেছে। বিযেবাডিব এলাহি ব্যাপাব দেখে কি বকম যেন অস্বস্তি বোধ কবেছেন তিনি। এক-একবাব এক-একদিকে ঘুবে দেখছেন, আবাব চুপচাপ এক জাযগায বসে থাকছেন।

অনেক ব্যস্ততাব মধ্যেও তাব দিকে চোখ পডল বিভাবতীব। তক্ষুনি ছেলেকে দিযে বাডি পাঠিযে ছাডলেন তাকে। বললেন, বিযে তো হযে গেছে, এখন ঘবে গিযে খানিক চুপচাপ শুযে থাকোগে যাও—একটু বাদে আমি দুধ পাঠিযে দিচ্ছি।

কেন, আমি তো ভালই আছি।

আঃ, যাবে তুমি?

তৎক্ষণাৎ প্রস্থান। স্ত্রীব মন ভালো না, জানেন। বড মেযেব শবীব খাবাপ, বাচ্চাটাব আবো খাবাপ—তাকে আনতে পাবেনি। স্ত্রীব চোখে কতবাব যে জল এসেছে আব শুভদিনেব অমঙ্গলেব আশঙ্কায সেই জল ঠেকিযে বেখেছে—সে শুধু তিনিই জানেন। বড মেযে আসতে না পাবাব দরুন স্ত্রীব এত মন খাবাপ দেখেই তাঁবও মনটা বিষণ্ণ।

ঘবে এসে শুযে পডলেন তিনি, জামা-কাপড ছাডলেন না— একটু বিশ্রাম কবে স্ত্রীব মন বুঝে আব একবাব ওদিকে যেতে চেষ্টা কববেন। যে দুধ নিযে আসবে তাবই মাবফৎ স্ত্রীব অনুমতি চেযে পাঠাবেন।

আধ ঘন্টাব মধ্যে দুধেব গেলাস হাতে স্ত্রীই হাজিব। তাডাতাডি উঠে বসলেন শৈলেশ চাটুজ্জে, আবাব তুমি কেন?

ঘামে জবজব কবছে বিভাবতীব মুখ, আব পবিশ্রমে বড বেশি লাল হযেছে। এক চুমুকে দুধেব গেলাস খালি কবে জল খেলেন শৈলেশ চাটুজ্জে, তাবপব জিজ্ঞাসা কবলেন, সব খেতে বসে গেছে?

এক ব্যাচ হযে এলো। তোমাব কেমন লাগছে এখন?

খুব ভালো, একবাব ঘুবে আসব?

না, তোমাকে এক্ষুনি ব্যাণ্ডেলে যেতে হবে, বিশু ঠাকুবপোব নতুন গাডিটা পেযেছি, তোমাব কিছু কষ্ট হবে না—পাকা ড্রাইভাব তোমাকে পৌঁছে দিযে আসবে।

শৈলেশ চাটুজ্জে হতভম্ব হঠাৎ। কি শুনছেন ঠিক যেন বুঝছেন না। বিশু ঠাকুবপো মানে তাঁব বডলোক বাল্যবন্ধু বিশ্বেশ্বব ঘোষ? বললেন, আমি—মানে এখন ব্যাণ্ডেলে যাব?

হ্যাঁ, সবে তো বাত আটটা এখন, দেড ঘন্টাব মধ্যেই পৌঁছে যাবে। কেবলই মনে হচ্ছে মেযেটা ছটফট কবছে আব কাঁদছে—জামা-কাপড তো পবাই আছে দেখছি, এই টাকা কটা বাখো, গাডি দাঁডিযে আছে, আব দেবি কোবো না, এক্ষুনি চলে যাও। গাডিতে টিফিন ক্যাবিযাবে বমা আব ওদেব সক্কলেব জন্য খাবাব দিযেছি—খায যেন। আব তুমি গিযেই যেন কাল-পবশুব মধ্যে ফেবাব জন্য ব্যস্ত হযো না, এই গণ্ডগোলেব মধ্যে থাকলে তোমাব হার্ট আবো খাবাপ হযে যাবে। তিন চাব দিনেব মধ্যে এদিকেব সব চুকলে আমিও যাচ্ছি—একসঙ্গে ফিবব। এই নাও, পকেটে তোমাব ওষুধ ক'টা নিযে নাও।

কথা বলাবও ফুবসত পাচ্ছিলেন না শৈলেশ চাটুজ্জে। এবাবে বললেন, কিন্তু আজই কেন...কাল না হয যাব...তাছাডা আমি তো এখন বেশ...

গাডি দাঁডিযে আছে, তুমি উঠবে? তুমি না গেলে এক্ষুনি আমি যাব।

যাচ্ছি, যাচ্ছি, কিন্তু—

আব কিন্তু না, শিগগীব ওঠো। লক্ষ্মীটি, তুমি মেযেটাব কাছে না গেলে আমাব একটুও ভালো লাগছে না। এদিকে আমি সব সামলে নিতে পাবব—

শৈলেশ চাটুজ্জে নীববে তাকালেন একবাব। তাঁব মনে হল, স্ত্রীব চোখে জল বুঝি ভেঙেই পডবে। আব একটি কথাও না বলে যাবাব জন্যে প্রস্তুত হলেন। তাবপব নিঃশব্দেই গাডিতে এসে উঠলেন। গাডিটা চলে গেল।

বিভাবতী স্থাণুব মত দাঁডিযে বইলেন কযেক মুহূর্ত। তাবপব বিযেবাডিব দিকে চললেন। শুকনো দু'চোখ খবখব কবছে এখন।

হ্যাঁ, দশ মিনিট সময নিযেছিলেন, তাব মধ্যেই ফিবেছেন তিনি।

বিয়েবাড়ির এদিকটায় চাপা উত্তেজনা একটা। বিভাবতী জানেন কিসের উত্তেজনা, কেন উত্তেজনা?

স্থির পায়ে এগিয়ে এসে পাশের একটা ছোট ঘরে ঢুকলেন তিনি। সেই ঘরে তিনজন পুলিশ এবং দুজন তাদের ওপরঅলা ভদ্রলোক।

তাদের সামনে এসে দাড়ালেন বিভাবতী, কি বলবেন বলুন?

প্রধান অফিসারটি বললেন, যাঁর মেয়ের বিয়ে তিনি কোথায়?

আমারই মেয়ের বিয়ে।

সিঁথির সিঁদুরের দিকে চোখ গেল অফিসারের।

আপনার স্বামী কোথায়?

তিনি অসুস্থ, কলকাতায় নেই। আমার বড় মেয়েও অসুস্থ, আসতে পারেনি, তাঁকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

অফিসারের চোখে অবিশ্বাসের দৃষ্টি, মেয়ের বিয়ে হচ্ছে, তিনি এখানে নেই?

না। বললাম তো তিনি অসুস্থ, হার্টের রোগী, বাড়িতে ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন আছে একগাদা, দেখতে পাবেন।

নেমন্তন্ন চিঠি কার নামে ছাপা হয়েছে?

নেমন্তন্ন চিঠি ছাপানো হয়নি, ওসব বাজে খরচ করার পয়সা নেই।

একজন কেউ তো দাড়িয়ে থেকে ব্যবস্থা করিয়েছেন, তাকে ডাকুন।

আমিই দাড়িয়ে থেকে সব ব্যবস্থা করেছি, আর কেউ করেনি।

ও..। অফিসারের তির্যক দৃষ্টি, লোক তো অনেক দেখছি, কত লোক খাওয়াচ্ছেন?

দু'শ।

লিখে নিলেন। কি খাওয়াচ্ছেন একবার দেখতে চাই।

দেখলে খেয়ে যেতে হবে। আসুন—

অফিসার কেন যেন এগোতে পারলেন না। বললেন, অপরাধ নেবেন না, আমরা কর্তব্যের দায়ে এসেছি খেতে পারব না।

আমি কর্তব্যে বাধা দেব না, খেয়ে গেলে আমার মেয়ের কল্যাণ হবে। এখানেই আনিয়ে দিচ্ছি—

না না না। অফিসার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মহিলার দিকে চেয়ে অস্বস্তিও বোধ করছেন কেমন। আচ্ছা আপনি বলুন, কি খাওয়াচ্ছেন?

লুচি মাছ মাংস পোলাও দই রসগোল্লা সন্দেশ—

অফিসার লিখে নিলেন।— সকলের জন্য এই ব্যবস্থা?

সকলের জন্য।

আবার লিখলেন। তারপর আমতা আমতা করে বললেন, কিন্তু এসব তো আইনে নিষেধ করা আছে...একটু মুশকিল হলো।

আমাকে এখুনি থানায় যেতে হবে?

অফিসার মুখ তুলে তাকালেন, কিন্তু চোখে চোখ রাখতে পারলেন না। একটু ভেবে বললেন, না, আপনি যা বললেন...এতে একটা সই করে দিলেই হবে।

খাতাটা বাড়িয়ে দিলেন, কলম এগিয়ে দিলেন।

আঁকা-বাঁকা অক্ষরে বিভাবতী নাম সই করলেন। নির্দেশমত বসতবাড়ির ঠিকানাও লিখে দিলেন।

সদলবলে অফিসার চলে গেলেন। ঘরের বাইরের চাপা উত্তেজনা আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল আবার। এদিকের একটা ঘরে কি ঘটে গেল, বিয়েবাড়ির অন্দরমহলের কেউ কিছু জানতেও পারল না।

আসামী বিভাবতী চট্টোপাধ্যায়ের কথাবার্তা শুনে তরুণ ম্যাজিস্ট্রেট কৌতূহল বোধ করছেন বেশ। ঘরের অনেকে হাসছেও মুখ টিপে। একধারে শুধু নতুন মেয়ে জামাই, বর্ধমানের মেয়ে জামাই আর ছেলের মুখ শুকনো।

বিভাবতী উকীল দেননি। বর্ধমানের মেজ জামাই সে চেষ্টা করতে গিয়ে ধমক খেয়ে বিরত হয়েছে। শাশুড়ী বলেছেন, নিজের ওকালতি নিজেই তিনি করতে পারবেন, এর জন্যে লোক ভাড়া করার দরকার নেই।

করেছেনও। তাঁর বক্তব্য, স্বামীর উনিশ হাজার টাকা সম্বলের মধ্যে দশ হাজারের ওপর খরচ করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন, ভবিষ্যত ভাবতে গেলে চোখে অন্ধকার দেখার কথা—এই খরচ তিনি সখ করে করেননি, ফূর্তি করার জন্যও না। করার দরকার হয়েছিল তাই করেছেন।

তিনি স্বীকার করেছেন, দু'শ লোক নেমন্তন্ন করা হয়েছিল, আর যা-যা খাওয়ানো হয়েছে বলে অভিযোগ, তাও সবই স্বীকার করেছেন, শুধু তিনি দোষী এটুকুই অস্বীকার করেছেন।

তরুণ বিচারক প্রশ্ন করলেন, পঞ্চাশজনের বেশি লোককে এসব খাওয়ানো নিষেধ, আপনি জানতেন না?

জানতাম। এরকম বাজ্যি-ছাড়া নিষেধ আমাদের ভিতরে পৌঁছয় না।

কেন?

কেবল নিষেধ, আর কেবল নেই। সত্যিই নেই বুঝতে পারলে কারো নিষেধ করার দরকার হত না।

সম্ভব হলে বিচারক এই আসামীটিকে মুক্তিই দিতেন বোধ করি। একেবারে ন্যূনতম লোক-দেখানো শাস্তিই ঘোষণা করলেন তিনি। বিভাবতীর পঁচিশ টাকা জরিমানা হল, অন্যথায় তিন দিন জেল।

তিন দিন জেলের উক্তি নিয়ম-রক্ষার্থে, পঁচিশ টাকা জরিমানাতেই এই বিচার-পর্ব শেষ হবে জানা কথা। কিন্তু আসামীর প্রশ্ন শুনে ভিতরে ভিতরে হয়ত অস্বস্তিই বোধ করলেন বিচারকটি। বিভাবতী তাঁর দিকে স্থির তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, পঁচিশ টাকা জরিমানা না দিলে তিন দিন জেলে থাকতে হবে?

তরুণ বিচারক মাথা নাড়লেন।

আপনাদের জেলে ভদ্রঘরের মেয়েদের রাখার ঠিক ঠিক ব্যবস্থা সব আছে তো?

বিব্রত মুখে আবাবও মাথা নাডতে হল বিচাবককে। তাবপব তেমনি বিডম্বিত মুখে তাঁব আত্মীয়-পবিজনদেব দিকে তাকালেন তিনি।

বিভাবতী বললেন, পঁচিশ টাকা দেবাব আমাব ক্ষমতা নেই, তিন দিন জেলেই থাকব। ছেলে আব মেযেদেব দিকে ফিবলেন তিনি, তোবা বাডি যা-তিনটে দিন দেখতে দেখতে কেটে যাবে। আব সাবধান ব্যাণ্ডেলে যেন কেউ কিছু না জানায।

নিরুপায জামাই দুটি শাশুডীব অলক্ষ্যে বিচাবকেব দিকে চেযে মাথা নেডে কি বোঝাতে চেষ্টা কবল তাবাই জানে। তিনি উঠে যাবাব সঙ্গে সঙ্গে তাবাও অদৃশ্য। একটু বাদেই হন্তদন্ত হযে ফিবল তাবা। বিভাবতী অবাক হযে দেখলেন তাঁকে কেউ জেলখানায নিযে যেতে এলো না। শুধু মেযেবাই খুশিমুখে এগিযে এলো। শম্পা বলল, চলো মা, এবাবে বাডি চলো— তুমি দেখালে বটে, হাকিম তোমাব জবিমানা মকুব কবে দিযেছেন।

জবিমানা সত্যিই যে এভাবে মকুব কবা যায না, বিভাবতীব তা জানাব কথা নয। তবু সন্দিগ্ধ। জামাইদেব দিকে তাকালেন, সত্যি না তোমবা জবিমানা গুনে দিযে এলে?

প্রাণেব দাযে মেজ জামাই আব নতুন জামাই ঘন ঘন মাথা নাডল। আব মেযেবা বলে উঠল, তোমাব কাছে মিথ্যে বলাব সাহস আছে নাকি আমাদেব, চলো শিগগীব।

আশ্বস্ত হযে সকলকে নিযে বিভাবতী বাইবেব বাবান্দায এসেই তপ্ত মুখে গজ গজ কবে উঠলেন, আমাদেব সময মা-বাবা শ্বশুব-শাশুডীবা বলত, কখনো নেই বলতে নেই— আব এদেশেব লোক হযে আইন কবে হাকডাক কবে নেই-নেই বব তুলে দিযেছে একেবাবে—লজ্জাও কবে না।

পবক্ষণে কি মনে পডতে থমকালেন একটু, পা-ও থেমে গেল। ছেলেব দিকে তাকালেন তিনি, বললেন, এখনো তো বেলা পডেনি, তুই এক কাজ কব তো, এক্ষুনি ব্যাণ্ডেলে চলে যা, তোব বাবাকে নিযে আয—কি ভাবে আছে কে জানে, সঙ্গে টাকা আছে?— আছে? যা তাহলে—যাবি আব আসবি, আব সাবধানে নিযে আসবি—

গল্পটা এই।

তখনো ভাবছিলাম আমি। ভাবছিলাম অর্থাৎ নামী আব মোটামুটি নামী লেখকদেব মত আব মন্তব্য বিশ্লেষণ কবছিলাম।

দীর্ঘদিন ধবে নিজে সাহিত্য কবছি, কঠিন বাস্তবেব পটভূমিতে অনেক গল্প লিখেছি, আব সেই সঙ্গে কডা সম্পাদক হিসেবে কিছু সুনাম আব দুর্নাম কুডিযেছি। তবু সতীর্থদেব মতামত আব মন্তব্যেব সঙ্গে নিভৃতেব অনুভূতিব তেমন যোগ হচ্ছে না কেন?

প্রথম, নতুন লেখক যে বলেছে, গল্পটা সত্যেব ছাযা নিযে লেখা—সেটা অবিশ্বাস কবতে ইচ্ছে কবছে না কেন?

দ্বিতীয, বিভাবতীব যে কথাবার্তা আচাব-আচবণ লেখক বন্ধুদেব অবাস্তব মনে হযেছে, তাব একবর্ণও বদলালে গল্পটা বর্ণশূন্য হযে যাবে মনে হচ্ছে কেন?

তৃতীয, গল্পটা নিছক উদ্দেশ্যমূলকই যদি হয তো, ও-বকম একটি মহিলাকে সচক্ষে দেখাব লোভ হচ্ছে কেন?

চতুর্থ, শ্রোতা-লেখকদেব মন্তব্য অনুযাযী গল্প থেকে হার্টেব বোগী ভদ্রলোকটিকে উডিযে দিযে, অর্থাৎ মহিলাব সিঁথিব সিঁদুব মুছে দিযে এই গল্পটা জটিলতা-মুক্ত কবে তোলাব কথা ভাবতেও বুকেব ভিতবে বাতাসেব অভাব বোধ কবছি কেন?

আব সব শেষে, যে মেযেব মঙ্গল আব কল্যাণেব আকাঙ্ক্ষায মহিলাব উনিশ হাজাব টাকা সম্বলেব থেকে দশ হাজাব খবচ কবাব প্রেবণা আব অনাযাসে আইন ভঙ্গ কবাব তাডনা— কল্পনায সেই মেযেব মাথায হাত বেখে কেন বলতে ইচ্ছে কবছে, মঙ্গল হোক, সুখী হও।

গল্পটা ছাপব কিনা এখনো ঠিক কবে উঠতে পাবিনি।

আকাঙ্ক্ষা

এক অন্তবঙ্গ বন্ধুব সঙ্গে দেখা গৌবকিশোব অধিকাবীব। বন্ধু ট্রামেব অপেক্ষায দাঁডিযেছিলেন আব গৌবকিশোব মস্ত ঝকঝকে গাডি হাঁকিযে যাচ্ছিলেন। ট্রাফিকেব লাল আলো জ্বলতে গাডিটা একটা বাসেব পিছনে দাঁডিযে গেছল। বন্ধুই তাকে প্রথম দেখেছেন, তাবপব না চেনাব মত কবে অন্যদিকে মুখ ফিবিযে নিযেছেন। কিন্তু গৌবকিশোব তাঁকে দেখামাত্র উৎফুল্ল। ড্রাইভাব তাঁব ইঙ্গিতে গাডি পিছিযে নিযে বাযেব ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড কবিযেছে। গাডি থেকে নেমে হন্তদন্ত হযে তিনি বন্ধুকে ধবেছেন। তাঁকে জাপটে ধবে টেনে এনে গাডিতে তুলেছেন। তাবপব সানন্দে বলে উঠেছেন, ভাগ্যিস দেখেছিলাম, তুই তো অন্যদিকে মুখ ফিবিযেছিলি।

বন্ধু জবাব দিযেছেন, তোমাকে আব তোমাব গাডি দেখে মুখ ফিবিযেছিলাম—

—কেন, কেন? গৌবকিশোববাবু ঈষৎ অপ্রস্তুত।

—সংকোচে আব হিংসেয।

গৌবকিশোববাবু হা-হা শব্দে হেসে উঠেছেন। তকমা আব টুপা পবা ড্রাইভাব সচকিত হযে সামনেব আযনা দিযে তাঁব মুখ দেখতে চেষ্টা কবেছে। গাডি সামনেব বাস্তা ধবে চলেছে।

বন্ধুব জবাব শুনে বেশ মজাব খোবাক পেযেছেন গৌবকিশোববাবু। জিজ্ঞাসা কবলেন, সংকোচ কিসেব আব হিংসেই বা কেন?

ড্রাইভাবকে বাঙালী মনে হযনি বন্ধুব। তাই গলাব স্বব স্বাভাবিক বেখেই জবাব দিলেন, সংকোচ তোমাব অবস্থান্তব দেখে আব হিংসে তোমাব স্ত্রী-ভাগ্য দেখে।

গৌবকিশোববাবুব মুখে হাসি ধবে না।—এই দুটো ব্যাপাবই যে অবশ্যম্ভাবী সে তো তুই হাত দেখে আব কুষ্টি দেখে অনেক আগেই বলে দিযেছিলি।

—তা বলেছিলাম হযত, কিন্তু গণনা কবা আব স্বচক্ষে তাব সফল রূপ দেখাব মধ্যে কিছু তফাৎ আছে। আব অভাজনদেব কিছু কিছু উক্তি কানে এসেছে, যাব

ফলে তোমাকে দেখামাত্র ওই তফাৎটা চোখ ধাঁধিয়েছে।

হাসিমুখে গৌরকিশোরবাবু বন্ধুর গন্তব্যস্থল জেনে নিলেন। বাড়ি যাচ্ছেন শুনে খুশিমনে তাকে পৌঁছে দিতে চললেন। আপাতত তিন-কোয়ার্টার ফ্রী তিনি, অতএব বন্ধুর বাড়িতে দশ বিশ মিনিট বসে একটু আড্ডা দেবারও সময় হবে। তারপর সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন, অভাজনদের আবার কি উক্তি কানে এলো তোমার?

—সুবিনয় দাশগুপ্ত বাড়িতে তোমার সঙ্গে দেখা করতে গেছল, তুমি ব্যস্ত ছিলে বলে তাকে বসতেও বলোনি, এগিয়ে এসে দুই এক কথা বলে সিঁড়ি থেকেই তাকে বিদায় করেছ।

—ও হ্যা, সেদিন স্ত্রীর কয়েকজন বন্ধু আর বান্ধবী এসেছিলেন, কি একটা প্রোগ্রাম নিয়ে আলোচনা চলছিল।

—আর মাস ছয় আগে এক বৃষ্টির দিনে তোমার গাড়ি ট্রামের পাশ কাটাতে গিয়ে ফুটপাতে অমল ঘোষের জামাকাপড় রাস্তার জলে ভিজিয়ে দিয়ে চলে গেছল। তুমি তাকে দেখেছিলে, তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিলে।

গৌরকিশোরবাবু একটুও চিন্তা না করেই মাথা নাড়লেন।—জলের ধারে ফুটপাথ ঘেষে দাড়ায় কেউ? বেচারার কোমর পর্যন্ত ভিজে সারা। গাড়িতে সেদিন স্ত্রী শ্বশুর শাশুড়ী শালা সবাই ছিলেন, সেদিনও এক বড় ইনডাসট্রিয়াল ম্যাগনেটের বাড়িতে পার্টি ছিল। তারপর, আর কিছু?

বন্ধু মাথা নাড়লেন, আর কিছু না।

গৌরকিশোর অধিকারী হৃষ্টমুখে মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, অবশ্যম্ভাবী অবস্থান্তর আর স্ত্রী-ভাগ্যের পরে আমার যে এরকম পরিবর্তন হবে হাত আর কুষ্ঠি দেখে সেটা বুঝি আঁচ করতে পারিসনি?

বন্ধু মাথা নাড়লেন, পারেননি।

গৌরকিশোরবাবু ড্রাইভারকে দ্বিতীয় দফা সচকিত করে হা-হা শব্দে হেসে উঠলেন।

বন্ধুর বাড়িতে এসে চা হল, গল্পগুজব হল খানিক। কথা বেশি গৌরকিশোরই বললেন। সামাজিকতা লৌকিকতার ঝামেলায় সময়ের অভাব কত কম, সরস হাসি মুখে সেই গল্প করলেন। শালার সঙ্গে নতুন স্টীল অ্যাণ্ড নেট অ্যায়ারিং-এর ব্যবসা কি রকম চলছে গম্ভীরমুখে সেই ফিরিস্তি দিলেন।

বন্ধুর শ্রোতার ভূমিকা।

শেষে হঠাৎ এক সময় হাত বাড়িয়ে দিলেন গৌরকিশোর অধিকারী, বললেন, আমার কুষ্ঠি তো তোর মুখস্থই ছিল—হাতের সঙ্গে মিলিয়ে আর একবার দ্যাখ দেখি—কলেজের মাস্টারি ছেড়ে এই ব্যবসায় নামলে তুই সত্যিই লাল হয়ে যেতিস।

হাতের ওপর হাত-দেখা কাচ ফেলে বন্ধু গম্ভীর মুখে খানিক রেখা পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি জানতে চাও, বলো—।

—আমি বলব কি, তুই বল।

—তোমাব সদ্য বর্তমানেব আকাঙ্ক্ষাব স্বরূপ আমাব জানা নেই, বলো কি জানতে চাও?

মুখেব দিকে চেযে মৃদু মৃদু হাসছিলেন গৌবকিশোব। হাসিটা কমে আসতে লাগল। চোখে চোখ বেখে চেযেই বইলেন খানিক। তাবপব সাদাসিধে স্পষ্ট গলাতেই জিজ্ঞাসা কবলেন, আমাব স্ত্রীব চোখে কোনদিন জল দেখতে পাব?

এবাব বন্ধু ফ্যালফ্যাল কবে চেযে বইলেন তাঁব দিকে।

গৌবকিশোবেব মুখে হাসিব ভাঁজ পডতে লাগল আবাব।—কি বলে তোমাব গণনা, পাব?

বন্ধু মাথা নেডে জবাব দিলেন, আমাব জ্যোতিষী বিদ্যায এটা বলা সম্ভব নয।

গৌবকিশোব জোবেই হেসে উঠলেন এবাবে। পবমুহূর্তে ঘডি দেখেই আঁতকে উঠলেন প্রায, দেখেছ কাণ্ড! চলি ভাই—

হন্তদন্ত হযে সিঁডিব দিকে চললেন তিনি।

গাডিতে উঠে ড্রাইভাবকে তাডা দিলেন, তুবন্ত চলো—

গাডি ছুটল। অসহিষ্ণু অস্বস্তি নিযে হাত-ঘডিটা দেখলেন আবাব। স্ত্রীকে যেসময দিযেছিলেন তাব থেকে সাত আট মিনিট দেবি হবেই পৌঁছুতে। গৌবকিশোববাবুব চাপা অস্বস্তি সাত আট বছব দেবিতে পৌঁছুনোব মত। সমযেব হিসেব না থাকাটা কালচাবেব একটা বড খুঁত।

সাত আট মিনিট নয, দু'মিনিট দেবি হযেছে ফিবতে। স্ত্রী ঘডি ধবে ঠিক পাঁচ মিনিট অপেক্ষা কবেছিলেন শুনলেন। তাবপব একাই ডান্স-ড্রামা দেখতে চলে গেছেন। ...ঠিক এক মিনিট আগে।

তাঁব একত্রিশ, লতাব ছাব্বিশ।

গৌবকিশোব বিযে কবেছেন পাঁচ বছব আগে। কবেছেন বলা ঠিক হল না, তাঁব বিযে হযেছিল। বিযেটা তাঁব জীবনে এক অভাবিত ঘটনা। তিনি বাস্তববাদী মানুষ, জীবনে কোনদিন আকাশকুসুম কল্পনায বিভোব হননি। কিন্তু বাস্তবেব আকাশ থেকে তাঁব জীবনে ভাগ্যেব এক দুর্লভ কুসুম খসে পডেছে। বিযেব পব নয, বিযেব প্রস্তাব শুনেই তিনি বিহ্বল হযেছিলেন।

তাঁব বাবা ছিলেন বনেদী লোহাব কাববাবী চ্যাটার্জী মেটালস-এব পাঁচজন অ্যাকাউনটেন্ট-এব একজন। দু'দুটো যুদ্ধেব কল্যাণে চ্যাটার্জী মেটালস—এব ভাগ্য আব খ্যাতিব তুঙ্গস্থানে বৃহস্পতিব অনড অবস্থান। কিন্তু গৌবকিশোবেব বাবা আনন্দকিশোব সচ্ছলতাব মুখ দেখেছিলেন মাত্র মাসকতকেব জন্যে। গৌবকিশোব বি. এ. পাশ কবাব পবে।

বিধাতাব খেযালেব কূল মেলা ভাব। নইলে বলা নেই কওযা নেই, গৌবকিশোবেব অ্যাকাউনটেন্ট বাবা ম্যানেজিং ডাইবেক্টাবেব খাস বেযাবাব মুখে 'বডা সাব সেলাম দিযা' শুনে তো ঘামতে ঘামতেই ছুটেছিলেন তাঁব এযাব কনডিশনড চেম্বাবেব দিকে। মাঝে এক ঝুডি ছোট বড হোমবাচোমবা অফিসাবেব ফাঁক দিযে হঠাৎ তাঁকে তলব

কেন ভেবে না পেয়ে গলদ-ঘর্ম অবস্থা। ন'মাসে ছ'মাসে ডাক যদি কখনো পড়ে তো আব পাঁচজন অফিসারেব নির্দেশে তাঁদেব সঙ্গ ধবে ঘবে ঢোকেন, কাঠ হযে দাঁড়িযে তাঁদেব কথাবার্তা শোনেন, তাবপব আয-ব্যয সংক্রান্ত কিছু প্রশ্নেব জবাব দিযে অফিসাবদেব ইঙ্গিত বুঝেই আবাব বেবিযে এসে স্বস্তিব নিঃশ্বাস ফেলেন। শুধু অফিসাববা কেন, ওই ঘব থেকে ডাক এলে ম্যানেজিং ডাইবেক্টবেব বড দুই ছেলে পর্যন্ত সভযে হন্তদন্ত হযে ছোটেন—বাপেব পবেই যাঁবা এত বড কোম্পানীব হর্তাকর্তা।

সেই ঘব থেকে একা অ্যাকাউনটেন্টেব ডাক আসাটা মেঘশূন্য আকাশ থেকে একটা বাজ পড়াব মতই।

ঘবে ঢুকে দেখেন ম্যানেজিং ডাইবেক্টবেব সামনে চার্টার্ড অ্যাকাউনটেন্ট দত্ত সাহেব বসে। কোম্পানীব বাৎসবিক আয-ব্যয লাভ-লোকসানেব হিসেব-নিকেশ তিনিই কবে থাকেন। ওই হিসেবপত্রেব সুতো ধবেই তাঁব সঙ্গে আনন্দকিশোবেব অনেক দিনেব যোগাযোগ। ভদ্রলোক স্নেহ কবতেন তাকে। দু'জনেব কাবো মুখই বিপজ্জনক বকমেব গম্ভীব নয দেখে মনে মনে স্বস্তিবোধ কবেছিলেন একটু।

—বোসো। ম্যানেজিং ডাইবেক্টবেব সহজ আপ্যাযনে হকচকিযে গেছলেন তিনি। আদেশ পালন কবাব মত কবে দত্ত সাহেবেব পাশেব চেযাবে বসেছিলেন। ম্যানেজিং ডাইবেক্টব কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জীব বযেস প্রায পঁযষট্টি, আব আনন্দকিশোবেব ছে-চল্লিশ —কিন্তু এই তুমি বলাব মধ্যে খুব প্রচ্ছন্ন একটু অন্তবঙ্গ স্পর্শও পেলেন যেন।

—তোমাব ছেলে স্কুল ফাইনালে সেকেণ্ড হযেছিল?

প্রশ্নটা এত অপ্রত্যাশিত যে প্রায দুর্বোধ্য মনে হযেছিল।

—আজ্ঞে হ্যাঁ...

—আই, এসসি-তে ফার্স্ট হযেছিল?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এবাবে বি, এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হযেছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—কোন সাবজেক্ট?

—আজ্ঞে অঙ্ক।

ম্যানেজিং ডাইবেক্টব কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী কৃতী ছেলেব বাপেব মুখখানা পর্যবেক্ষণ কবলেন একটু।—তুমি কত মাইনে পাও এখন?

—আজ্ঞে তিনশ সত্তব।

—ছেলেকে বাড়িতে পড়াতো কে, তুমি না মাস্টাব?

—আজ্ঞে ও নিজেই পড়ত।

—এখন এম, এ পড়বে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ছেলেটিকে একবাব নিযে এসো তো, দেখব। আই অ্যাম সো গ্ল্যাড টু হিযাব ইট।

বড় সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে আনন্দে ঘেমে ওঠার দাখিল। প্রতিবারের সুখবরের মত ছেলের সুখবরটা সেই সকালেই দত্ত সাহেবকে জানিয়েছিলেন তিনি।

যতটা সম্ভব ভব্যসভ্য করে ছেলেকে পরদিনই বড় সাহেবের ঘরে নিয়ে এসেছিলেন। বাবার সেই চাপা উত্তেজনা আর ব্যস্ততা দেখে গৌরকিশোর হকচকিয়ে গেছলেন। ঘাবড়ে গিয়ে প্রণাম করার তাড়ায় চেয়ারের আড়ালে ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের দ্বিতীয় পা খুঁজে না পেয়ে এক পায়ের জুতোর উপরে দু'বার হাত বুলিয়ে মাথায় ঠেকিয়েছেন। কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী ঈষৎ কৌতুকে পর্যবেক্ষণ করেছেন তাঁকে।

কিন্তু তাঁর মন্তব্য শুনে বাপের মুখে কাষ্ঠ হাসি আর ছেলের মুখে বিড়ম্বনার ধকল। বড় সাহেব হেসে বলেছেন, লেখাপড়ায় তুমি এত ভালো...বাট ইউ ডোন্ট লুক দ্যাট স্মার্ট।

বাবা বার বার করে বলে দিয়েছিলেন, হাবাগোবার মত চুপ করে থাকিস না, একটু আধটু কথা বলবি। অতএব চুপ করে না থেকে গৌরকিশোর কথাই বলেছেন। —চেষ্টা করিনি স্যার...

কৌতুকে নড়েচড়ে বসেছেন কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী।—কি চেষ্টা করোনি, স্মার্ট হতে?

এবারে আর জবাব জোগালো না, মাথাই নাড়লেন শুধু— অর্থাৎ তাই।

—কি চেষ্টা করেছ?

গৌরকিশোর ফাঁপরে পড়েছিলেন, জবাব দিয়েছেন, একবার সেকেণ্ড হবার পর থেকে ফার্স্ট হতে চেষ্টা করেছি।

আর একটু ভালো করে পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে বড় সাহেবের ঠোঁটের ডগার হাসি আরো স্পষ্ট হয়েছিল।—চেষ্টা করলে স্মার্ট হতেও পারো বলছ?

নিরুপায় গোছের মাথা নেড়েছিলেন গৌরকিশোর— পাবেন।

হাসি মুখে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর উপদেশ দিয়েছেন, আচ্ছা এম. এ-তে ফার্স্ট হবার পর সে চেষ্টা কোরো। ভেরি গ্ল্যাড টু মিট ইউ—

ছেলেটাকে একেবারে হাবাই ভাবলেন কিনা বড় সাহেব, বাবা দিনকতক সেই অস্বস্তি ভোগ করেছেন। তারপর একদিন দোকান থেকে মিষ্টি কিনে নিয়ে হাসিমুখে বাড়ি ঢুকেছেন। কোম্পানীর চিফ অ্যাকাউনটেন্ট বলে কোনো পোস্ট ছিল না এতদিন —এখন হল। জনাকতক জুনিয়র আর সিনিয়র অ্যাকাউনটেন্ট কোম্পানীর কাজ চালাতেন। চ্যাটার্জী মেটালস-এর তিনিই প্রথম চীফ অ্যাকাউনটেন্ট—মাইনে তিনশ সত্তর থেকে এক লাফে পাঁচশ সত্তর।

ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জীর সঙ্গে গৌরকিশোরের আবার দেখা হয়েছে মাস নয়েক বাদে। শোকের আর দুশ্চিন্তার তাপ নিয়ে গেছলেন বাবার শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে, আর কিছু না হোক, দুটো সহানুভূতির কথা শুনবেন আশা ছিল। কিন্তু শোকের তাপের সঙ্গে অবজ্ঞার তাপ নিয়ে ফিরেছেন।

বেয়ারার মুখে খবর পেয়ে কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী তাঁকে ঘরে ডেকেছিলেন অবশ্য। বসতে বলেননি। তার পরনে কাঁচা-কোঁচা, হাতে আসন, একগাল খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। মুখ তুলে একবার শুধু দেখেছিলেন তাঁকে, তারপর আবার ফাইলে মন দিয়েছিলেন।

বাবাব আকস্মিক মৃত্যু সম্পর্কে একটি কথাও জিজ্ঞাসা কবেননি। সন্তর্পণে শ্রাদ্ধ-পত্র তাঁব সামনে টেবিলে বাখতে মুখ না তুলেই মাথা নেড়ে শুধু বলেছেন, ঠিক আছে—

বাইবে এসে গৌবকিশোবেব কান্না পাচ্ছিল। পাঁচটি ভাই বোন তাঁবা, তিনিই বড। বাবা চোখ বোজাব সঙ্গে সঙ্গে শোকেব থেকেও তিনি চোখে অন্ধকাব দেখেছেন বেশি। ম্যানেজিং ডাইবেক্টবেব ঘব থেকে বেরুতে সেই অন্ধকাব আবো গাঢ হযে উঠেছিল।

অবাক একটু হযেছিলেন ঠিক দু'দিন বাদে। নতুন চিফ অ্যাকাউনটেণ্ট নিজে এসেছিলেন বাবাব সমস্ত পাওনাগণ্ডা বুঝিযে মিটিযে দিতে। তাছাড়া বাড়তি এক হাজাব টাকা দিযেছেন বড সাহেবেব নাম কবে—বাবাব শ্রাদ্ধেব কাজেব বাবদ। হাতে টাকা নিযেও গৌবকিশোব ঠিক যেন বিশ্বাস কবে উঠতে পাবছিলেন না।

আব হতচকিত হযেছেন বাবাব কাজেব দিনে। ভাঙা বাড়িব দবজায মস্ত ঝকঝকে গাড়িটা থামতেও ঠাওব কবে উঠতে পাবেননি কে এলেন। বিমূঢ মুখে ছুটে এসে তাবপব গাড়িব সামনে হাতজোড কবে দাঁড়িযেছেন গৌবকিশোব।

শ্রাদ্ধবাসবে কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী মিনিট পাঁচেক বসেছিলেন। যাবাব আগে বলে গেছেন, কাজকর্ম চুকে গেলে অফিসে একবাব দেখা কোবো।

দেখা কবেছেন। এই দিন বড সাহেব তাঁকে বসতে বলেছেন। আলাপ কবেছেন। বাড়িতে কে আছে না আছে খোঁজ নিযেছেন। চিন্তা কবেছেন একটু। তাবপব বলেছেন, মন দিযে পড়াশুনা কবে যাও—তোমাব বাবা খুব বিশ্বস্ত কাজেব লোক ছিলেন, তুমি এম, এ পাশ না কবা পর্যন্ত কোম্পানী তাই তোমাব মাযেব নামে মাসে দু'শ টাকা কবে দেবে ঠিক কবেছে।

গৌবকিশোবেব চোখে জল আসাব উপক্রম। অল্প হেসে বড সাহেব বলেছেন, আব একটা কথা, এখন থেকেই একটু স্মার্ট হতে চেষ্টা কবো—এত সহজে ভেঙে পড়লে চলবে না। আচ্ছা এসো, উইশ ইউ ভেবি ভেবি গুড লাক।

গোবকিশোব আবাব দেখা কবতে এসেছেন এক বছব পাঁচ মাস বাদে। এম. এ পবীক্ষাব ফল বেরুবাব পব।

তাঁকে দেখামাত্র উৎফুল্ল মুখে বড সাহেব হাত ধবে ঝাকিযে দিযেছেন। অর্থাৎ এবাবেব সুখববটা সেদিনেব সকালেব কাগজে দেখেছেন তিনি। বাবকযেক খুশি জ্ঞাপন কবে টেবিলেব বোতাম টিপে বেযাবাব তলব কবেছেন। দুই ছেলে, অর্থাৎ বড আব মেজ 'চ্যাটার্জী সাব'কে একসঙ্গে সেলাম দিতে বলেছেন।

ছেলেবা আসতে হাসিমুখে গৌবকিশোবেব সঙ্গে পবিচয কবিযে দিযেছেন তিনি। —আনন্দকিশোবেব ছেলে গৌবকিশোব, স্কুল-ফাইনালে শুধু পবীক্ষা খাবাপ কবে সেকেণ্ড হযে বসেছিল—তাবপব আই. এসসি-তে ফার্স্ট, বি, এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, আব এবাব এম, এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।

পবিচয-পর্বে শুধু বড সাহেব নয, গৌবকিশোবেব সৌজন্যসূচক স্মার্টনেসেব অভাব ছেলেবাও লক্ষ্য কবলেন। কোম্পানীতে বিলেত-ফেবত এনজিনিযাব আছেন

চারজন, সেখানে এম, এ-র এই কৃতিত্ব বাবার কাছে এমন বড় ব্যাপার হল কি করে ছেলেরা বুঝলেন না।

বড় সাহেব বললেন, তোমরা দুজনেই ওকে ভালো করে কাজ-কর্ম শেখাবে। ...ওর ডেসিগনেশন কি হবে? বড় ছেলের দিকে ফিরলেন, এখন অ্যাসিসট্যান্ট সেক্রেটারী বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দাও, পরে দেখা যাবে।

সেক্রেটারী বড় ছেলে।

হাসিমুখে বড় সাহেব গৌরকিশোরের দিকে ফিরলেন, এঁদের সঙ্গে যাও, খুব বুঝে-শুনে ভালো করে কাজ-কর্ম করবে।

একটানা তিন বছর চ্যাটার্জী মেটালস-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী হয়েই ছিলেন গৌরকিশোর। কাজে সুনাম কিছু হয়েছে, কিন্তু সেটা চটকদার সুনাম নয়। দায়িত্বের কাজ দিলে সেটা তাঁর দ্বারা সুসম্পন্ন হবে কিনা বোঝা ভার, অথচ শেষ পর্যন্ত হয় ঠিকই। ফলে কাজ যাঁরা দেন তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না সর্বদা। বড় সাহেব ছেলেদের জিজ্ঞাসা করেন, কেমন?

তাঁরা বলেন, ভালই, তবে আনস্মার্ট।

কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী মাথা নাড়েন, আনস্মার্ট ঠিক নয়, ডিফরেন্ট টাইপ।

তাঁর মতলব বোঝা গেছে তিন বছর বাদে—বছর দুয়েকের চেষ্টায় ছোট মেয়ে লোটি অন্যথায় লতা চ্যাটার্জী যখন টেনেটুনে বি, এ পাশ করে উঠলেন।

কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জীর তিন ছেলে, ছোট ছেলে গৌরকিশোরের থেকে বছর দুয়েকের ছোট, আর লতার থেকে বছর তিনেকের বড়। ছোট ছেলে সক্রিয়ভাবে চ্যাটার্জী মেটালস-এ ঢোকেননি তখনো। ওদিকে বড় দুই ছেলের পরে দুটি মেয়ে ছিল, আর ছোট ছেলের পর লোটি—সর্বকনিষ্ঠা। বাপের বেশি বয়সের মেয়ে, তাই তাঁর আদরও বেশি। বেশি আদরের আরো একটু কারণ আছে।

কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জীর এখন সর্বসাকুল্যে দুই মেয়ে। বড় মেয়ে বিয়ের দেড় বছরের মধ্যে আত্মহত্যা করেছেন।

বড় দুই মেয়ের বিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড ঘা খেয়েছেন কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী। বড় মেয়ের বিয়ে দিলেন মস্ত বনেদী ঘর দেখে। মানুষ দেখেননি তেমন করে। বড় মেয়ের আত্মহত্যার পর একটানা বছরখানেক কেস চালিয়েছিলেন তিনি মেয়ের শ্বশুর-শাশুড়ী আর জামাইয়ের বিরুদ্ধে। ফল হয়নি।

মেজ মেয়েরও ঘটা করে বিয়ে দিয়েছিলেন এক মস্ত ব্যবসায়ীর ঘরে। বিশেষ অবস্থাপন্ন তাঁরাও। তাদের আবার চালচলন জাঁকজমক এত বেশি যে তাই থেকেই বিরোধের সূত্রপাত। তার ওপর মেজ জামাইয়ের নাক তাঁদের পরিবারের মধ্যে সব থেকে বেশি উঁচু। তুচ্ছ রেষারেষি বড় বিরোধে দাঁড়িয়েছে—মেজ জামাইটি নিজেও দূরে সরেছেন, মেয়েকেও দূরে সরিয়েছেন।

বড় ঘরে মেয়ে দেবার সাধ মিটেছে ভদ্রলোকের। ছোট মেয়ের বয়স তখন ষোলও নয়, কিন্তু তখনই সঙ্কল্প করেছেন আর বড় ঘর নয়। মেয়েকে কারো হাতে দেবেন না, বরং মেয়ের হাতের মুঠোয় কাউকে এনে দেবেন।

তাই দিয়েছেন।

বিয়েটা যখন হয়েই গেল, অর্থাৎ কল্পনার আকাশকুসুম যখন সত্যিই বাস্তব জীবনে খসে পড়ল, গৌরকিশোরের বয়স তখন ছাব্বিশ—লতার একুশ। কিন্তু বিয়ের কিছু দিনের মধ্যেই তাঁদের বয়সটা বিপরীত খাতে বইতে লাগল। গৌরকিশোর বুঝি সবে না-বালকত্বের গণ্ডী ছাড়িয়েছেন, আর লতার পাকাপোক্ত সাবালিকার ভূমিকা।

ছোট মেয়ে, বাপের আদরের মেয়ে—বাবাকে পছন্দ করতেন, আর বাবার মুখে শুনেছিলেন চমৎকার ছেলে গৌরকিশোর—তাই চমৎকার যে তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বিয়ের আগে তাঁকে দেখে ততটা চমৎকার লাগল না। বাবার কৃষ্ণকমল নাম ভারী ভালো লাগে তাঁর, গৌরকিশোর নামও সেই গোছের ভালো লেগেছিল। বেশ ধারালো অথচ একখানা মিষ্টি মুখ তিনি কল্পনা করেছিলেন। প্রথম দর্শনেই হোঁচট খেল। তারপর দিনে দিনে হোচট খেতে লাগল। ধারের চিহ্নও নেই কোথাও, আর মিষ্টি অর্থে যদি আনুগত্য হয়, তাহলে মিষ্টিই বটে।

ভিতরে বাইরে এমন এক বর্ণশূন্য লোকের সঙ্গে বাপ তাঁর বিয়ে দিলেন কি করে তিনি ভেবে পাননি। চেনা-জানা যে ক'টি লোক বিয়ের আশায় ঝুঁকেছিল বা ঝুঁকতে চেয়েছিল, তাঁদের যে-কেউ এর থেকে অনেক ভালো ছিল। লতার কেবলই মনে হত, অনুগত জামাই আনার তাড়নায় বাবা সব থেকে বেশি অবিচার করেছেন তাঁরই ওপর।

বিয়ের মাসতিনেকের মধ্যে শ্বশুরবাড়িতে বারকয়েক আনুষ্ঠানিক যাতায়াত করেছেন তিনি। জামাইকে ডেকে বাবা নিজেই তারপরে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন, বিধবা মা বা ভাই-বোনদের প্রতি কর্তব্যের ব্যাপারে তাঁর সহানুভূতির অভাব নেই, কিন্তু মেয়ে সেখানে থাকতে পারবে না। তার বড় বাড়ির পাশে ছোট বাড়িটা মেয়ের কথা ভেবেই তিন বছর ধরে খালি রেখেছেন তিনি—মেয়েকে নিয়ে আপাতত সেখানেই থাকতে হবে। মেয়ের নামে অভিজাত এলাকায় বেশ খানিকটা জমি কেনা আছে—ধীরেসুস্থে সেখানে বাড়ি করা হলে তারপর অন্য ব্যবস্থা।

শ্বশুরের ব্যবস্থা জামাইয়ের মনঃপূত কিনা সে-প্রশ্ন অবান্তর। গৌরকিশোরের পৈতৃক বাড়ির সচ্ছলতায় সত্যিই টান ধরেনি, কিন্তু বিনিময়ে বড় কাছের একজনকে খোয়াতে হয়েছে তাদের। মাঝেসাঝে মাকে দেখতে আসেন গৌরকিশোর। এই আসাটাও কমে আসছে। এ নিয়ে বাড়ির কারো অভিযোগ নেই। থাকলেও মুখে অন্তত কেউ কিছু বলে না। কিন্তু দেখা হলে একজন বলেন।

সুমিতা।

গৌরকিশোরের এক মামীর বোনের মেয়ে। সুরসিকা আর ঠোঁট-কাটা। কাছাকাছি বাড়ি, তাই আত্মীয়তার থেকে ঘনিষ্ঠতা বেশি। এম, এ, পড়ার সময়ে মনের তলায় সুমিতাকে ঘিরে কিছু মিষ্টি সম্ভাবনাও উঁকিঝুঁকি দিত। খুব সংগোপনে। বছর আড়াই মোটা মাইনেয় চ্যাটার্জী মেটালস-এ চাকরি করার পর সেই সম্ভাবনা নিজের মধ্যেই দানা পাকিয়ে উঠেছিল। সুমিতার এম, এ, পরীক্ষার পরই একটা প্রস্তাব উত্থাপনের বাসনা ছিল গৌরকিশোরের। তার আগেই সব ওলট-পালট হয়ে গেল। অবশ্য সে-

জন্য চক্ষুলজ্জাব কাবণ নেই। সেই সামযিক দুর্বলতাব খবব সুমিতাব জানাব কথা নয। খেদও নেই। বিত্ত বা বৈভব ছেড়ে বড ঘবেব মেযেব ৰূপেব টানও অন্য বকম।

দেখা-টেখা হলে এই সুমিতাই ঠাট্টাব ছলে ঠাসঠোস কথা শুনিযে দেন। স্কুল মাস্টাবি কবে মুখ আবো ঢিলে হযেছে। এক মুখ হেসে সেদিন মাযেব সামনেই বলেছিলেন, বাবাবে বাবা, গৌবদা তুমি দেখালে বটে, বাধিকাব জন্যে স্বযং ব্রজকিশোবও এভাবে স্বজন ছেড়েছিল বলে শুনিনি।

মা বলেছিলেন, তুই থাম তো—

আবো বেশি হেসে সুমিতা প্রতিবাদ কবেছিলেন, আমি থামতে যাব কেন? আপনাদেব ঘবেব ছেলে, আপনাবা মুখ বুজে থাকুন।

বিযেব পব শ্বশুব স্টিল অ্যাণ্ড নেট অ্যাযাবিং-এব নতুন শাখা খুলেছেন। তাব সর্বময কর্তৃত্ব দিযেছেন ছোট ছেলে আব জামাইকে। আব পুবনো অফিস থেকে কিছু সুযোগ্য কর্মচাবীও দিযেছেন।

কিন্তু লতাব তবু দুশ্চিন্তা হযেছিল। ছোড়দা আছেন সঙ্গে তাতে যেটুকু স্বস্তি। নইলে ওই মানুষেব আলাদাভাবে ব্যবসা দাঁড কবানোব ক্ষমতা আছে এ বিশ্বাস তাঁব আদৌ নেই।...আগাগোড়া পবীক্ষায প্রথম হল কি কবে, তাব ওপব অঙ্কে, সেটাই তাঁব কাছে বিস্ময। সার্টিফিকেটগুলো না দেখলে বিশ্বাস হত না।

পাঁচ বছবে শাখা-প্রতিষ্ঠান ভালোই দাঁড়িযেছে। লতাব বদ্ধ ধাবণা, বাবা চোখ বেখেছিলেন, ছোড়দা আছেন, দবকাবমত বড়দা-মেজদাও পবামর্শ দেন, তাব ওপব বিশ্বস্ত কর্মচাবীবা আছে—তাই দাঁড়িযেছে। আব কাবো কোনো কৃতিত্বেব ছিটেফোঁটাও নেই।

বিযেব সাত বছবেব মধ্যে নতুন কোম্পানীব লাভেব টাকা দিযে লতাব জমিতে মস্ত বাড়ি উঠেছে। গৃহপ্রবেশে ঘটা কবে উৎসব কবা হযেছে।

তাবপব কৃষ্ণকমল চ্যাটার্জী চোখ বুজেছেন। স্টিল অ্যাণ্ড নেট অ্যাযাবিং-এব শিকড তখন পবিপুষ্ট। উইল-এ দেখা গেল, এই কোম্পানীব মালিকানাব সবটাই তিনি ছোট মেযে জামাইকে দিযে বেখেছেন। অন্যান্য বিষয-আশয এবং চ্যাটার্জী মেটালস তিন ভাইযেব।

অতএব ছোট ছেলে ভগ্নিপতিব ব্যবসাযেব সংস্রব ছেড়ে চ্যাটার্জী মেটালস-এ চলে এসেছেন। লতা বিমর্ষ এবং চিন্তিত হযেছিলেন। দাদাদেব বলেছিলেন, তোমবা চলে এলে ওব দ্বাবা ব্যবসা চলবে?

দাদাবা আশ্বাস দিযেছেন—তাবা চোখ ঠিকই বাখবেন, তাছাড়া বিশ্বস্ত কর্মচাবীবা তো থাকলেনই।

লতাব ছাব্বিশ, গৌবকিশোবেব একত্রিশ।

যাব বীজ ভালো তাব ফসলও ভালই। দুর্ভাবনা সত্ত্বেও কোম্পানী যে বীতিমত জাঁকিযে উঠেছে, তাব পিছনে এটাই কাবণ ভাবেন মিসেস অধিকাবী। গৌবকিশোবই এ ব্যবসাব হর্তা-কর্তা বিধাতা বটে, কিন্তু ভাগ্য চাবদিক থেকে নিবাপদ প্রহবায একজন অতি সাধাবণ মানুষকে ওইখানে এনে তুলেছে, এই ধাবণা তাঁব একটুও বদলাযনি।

ছেলেপুলে এখনো হয়নি। তাব কাবণ মিসেস অধিকাবী এখনো তা চাননি। একতিবিশেও একুশেব থেকে বেশি মন দিযে সাজ-সজ্জা কবেন। সেটা ববং দিন-কে-দিন সূক্ষ্মতব হচ্ছে। গাযেব জামা আব শাড়িব মাঝে আড়াই আঙুলেব জাযগায় এখন চাব আঙুল কোমব দেখা যায। কাঁধখোলা মিহি ব্লাউসেব টেপ ক্রমে গলাব দিকে ঘেঁষছে। পোশাক-আশাকেব ম্যাচিংএ অভিনবত্ব আসছে। বক্ষদেশেব সম্ভাবে বিভ্রম ছড়ানোব ললিত প্রযাস স্পষ্টতব হযে উঠছে। প্রসাধনেব পাবিপাট্য বেড়েছে। অভিজাত এলাকায হাই সোসাইটিব চটকদাব পুরুষ-বমণীব আনাগোনা বেড়েছে।

গৌবকিশোবেব অবকাশ কম। প্রচুব খাটেন। আবো খাটলেও আপত্তি নেই লতা অধিকাবীব। তাঁব এ-দিকটা নিজস্ব দিক, সংস্কৃতিব দিক, মনেব পুষ্টিব দিক। অতএব গৌবকিশোব মুখ বুজে কাজ কবেন আব লতা বা লোটি অধিকাবী ঘণ্টা দেড়েক কেশ-বিন্যাস কবে ক্লাবে যান, ফাংশানে যান, পার্টিতে যান। কিন্তু হাই সোসাইটিব বীতি অনুযাযী যুগল উপস্থিতিবও প্রযোজন হয অনেক সময। স্ত্রীব কাছে তখনই শুধু তাড়া খেতে হয গৌবকিশোবেব। বলেন, তোমাকে নিযে বেরুতে হলেই আমাব ভাবনা হয, ঠিক-ঠাক হযে নাও। নিজেব ঠিক-ঠাক হওযাব দিকে এই একজনেব অবাধ্য দৃষ্টি বাব কযেক ঘুবতে দেখলেও ধমকে ওঠেন, হ্যাংলাব মত চেযে থেকো না, আব পার্টিতে গিযে আমাব পিছনে ঘুবো না—নাও চলো।

অথচ অনুষ্ঠানেব কোনো সুপুরুষ যখন উচ্ছ্বসিত হযে ওঠেন,—ইউ লুক এক্সকুইজিট ম্যাডাম—তাব হাতে হাত বেখে স্ত্রীটিকে বিগলিত হতে দেখেন গৌবকিশোব। বলতে শোনেন, থ্যাঙ্ক ইউ—।

বোকা-বোকা মুখ কবে আবো কিছু লক্ষ্য কবেন গৌবকিশোব। কাবো সঙ্গে শুধু অন্তবঙ্গতা, কাবো সঙ্গে বা বেশি। এবই মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিবিবিলিতে স্ত্রীব সেই বেশি অন্তবঙ্গতাব রূপটাও গৌবকিশোবেব নির্বাক চোখে বসে গেছে। একা বেরুলে স্ত্রীব অনেকদিনই ফিবতে বাত হয—এতেও প্রায অভ্যস্তই হযে উঠেছেন তিনি।

মিসেস লোটি অধিকাবীব স্বাভাবিক দিনযাপনেব সামান্য একটু অস্বস্তিব ছাযা পড়ল সেদিন হঠাৎ।

নিজেব চেকবই দুটো যে কোথায বেখেছেন খুঁজে পাচ্ছেন না। গৌবকিশোব দাড়ি কামাচ্ছিলেন। স্ত্রী কিছু দবকাবী জিনিস পাচ্ছেন না মনে হতে জিজ্ঞাসা কবলেন, কি খুঁজছ?

—চেকবই দুটোব একটাও পাচ্ছি না, এক্ষুনি দবকাব।

গৌবকিশোব বললেন, সেদিন তোমাব টেবিলেব ওপব পড়েছিল দেখে কোথায বাখলাম ..ওই আলমাবিতে দেখো তো।

দেখলেন নেই।

—তা'হলে ও-ঘবে আমাব সুটকেসে বেখেছি বোধ হয...দেখছি।

অপেক্ষা কবাব সময নেই মিসেস অধিকাবীব। বিবক্ত।—তোমাব সবেতে গোলমেলে কাণ্ড, টেবিলেব ওপবে ছিল—ড্রয়াবে বেখে দিলেই তো হত।

ও-ঘবে গিযে নিজেই সুটকেস খুললেন। চেকবই পেলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আবো যে দুটো জিনিস চোখে পড়ল, তাতেই অবাক তিনি। একটা ফোটো আব নামকবা দোকান থেকে কেনা একটা শৌখিন শাড়িব প্যাকেট।

ফটো একটি মেযেব। হাসিমুখ, চেহাবাও মন্দ নয। বেশ স্মার্ট। আব প্যাকেটে কম কবে তিনশ সাড়ে তিনশ টাকা দামেব শাড়ি একটা।

লতা অধিকাবী প্রথমে হকচকিযে গেলেন একটু। এ দুটো বস্তু এখানে কেন বোধগম্য হল না। চেকবই পাওযাব তাড়া ভুলেছেন আপাতত। ফিবে এসে জিজ্ঞাসা কবলেন, তোমাব সুটকেসে এক মেযেব ফটো দেখলাম, কাব?

সাবান মাখানো মুখখানায একটু ব্যস্ততাও লক্ষ্য কবলেন যেন।

গৌবকিশোব জবাব দিলেন, আ...আমাব ভাইযেব জন্য, মানে সত্যব জন্য এক জাযগায মেযে দেখতে গেছলাম...ভদ্রলোক ধবেছিলেন, তাবাই দিযে দিলেন।

স্বাভাবিক ব্যাপাব। কিন্তু যে-ভাবে বললেন স্ত্রীব সেটাই বিবক্তিব কাবণ। দশ বছবেও যদি কথাবার্তা সপ্রতিভ হত একটু।—আব, শাড়িব প্যাকেট দেখলাম, সেটা কাব?

—ইযে, এক বন্ধুব বিযে, দেব বলে কিনেছি।

এই জবাবটা কেন যেন খুব সবল ঠেকল না কানে। দোকানে গিযে নিজে পছন্দ কবে এবকম শাড়ি কিনে নিযে আসতে পাবে ধাবণা ছিল না।—দামী শাড়ি মনে হচ্ছে কে বন্ধু? কবে বিযে?

নাম কবে দিলেন একজনেব। বললেন, খুব পুবনো বন্ধু। আজই বিযে—মানে বেজিস্ট্রি ম্যাবেজ।

—তোমাব একাব নেমন্তন্ন?

—হ্যাঁ, তুমি যেতে পাববে না বলে দিযেছিলাম।

—পাবি বা না পাবি তোমাব বলাব কি দবকাব ছিল? আব শাড়ি কিনেছ, আমাকে দেখাওনি কেন?

বিপদগ্রস্তেব মত শেভিংএ মন দিলেন গৌবকিশোব।

ব্যাপাব কিছুই নয, তবু ভিতবটা একটু খুঁত-খুঁত কবতে লাগল লতা অধিকাবীব। তাকে না জানিযে বন্ধুব ভাবী বউযেব জন্য আড়াইশ তিনশ টাকা দিযে শাড়ি কেনা হযেছে, হলে হতেও পাবে।

গৌবকিশোব তাঁব অলক্ষ্যে শাড়ি আব ফটো বাব কবে নিযে অফিসে চলে গেলেন।

বেলা চাবটে নাগাদ অফিস থেকে বেরুলেন। আজও মা আব বোন তাঁকে দেখে খুশি। ভাইযেবা বাড়ি নেই। কিছুদিন ধবে একটা পবিবর্তন চোখে পড়ছে সকলেবই। বিশেষ কবে মাযেব। ছেলে প্রাযই আসছে, তাদেব সকলকে নিযে সেদিন গাড়ি কবে দক্ষিণেশ্বব থেকে বেড়িযে এনেছে—সুমিতা এসেছিল, তাকেও জোব কবে ধবে নিযে গেছে। আনন্দে মাযেব চোখে জল এসেছিল। হৈ-চৈ আনন্দেব মধ্যে কেটেছে—ছেলে সকলেব একসঙ্গে আব আলাদা আলাদা সকলেব ফটো তুলেছে।

সেদিনও গৌবকিশোব হাসি-খুশি। শাড়িব প্যাকেট বোনেব হাতে দিলেন, নে, এটা তুই পবিস।

শাড়ি দেখে বোনের আর সেই সঙ্গে মায়েরও চোখ ঠিকরোবার উপক্রম। এ রকম দামী বেনারসী পরা দূরে থাক, বোন হাতে নিয়েও দেখেনি।—এ তুমি আমার জন্যে কিনে আনলে নাকি দাদা।

নির্লিপ্ত মুখে গৌরকিশোর বললেন, কিনে না তো কি আমি বেনারসী বানাচ্ছি।

মা বলেছেন, যত্ন করে তুলে রেখে দে, পরে কাজে লাগবে।

বোন মুখ লাল করে উঠে গেছে। পরে গৌরকিশোর তার মুখেই শুনেছেন, সুমিতাদি আগামী পরশু দিল্লী চলল, সেখানে কি একটা ভালো চাকরি পেয়েছে।

গৌরকিশোরকে অন্যমনস্ক দেখা গেল একটু। ঠিক এরকম খবর আশা করেননি। খানিক বাদে আবার গাড়িতে উঠলেন। তখনো চিন্তামগ্ন।

গাড়ি সুমিতাদের বাড়ির দরজায় থামল। সুমিতা তাঁকে দেখে অবাক প্রথম, পরে খুশি। আদরযত্ন করে বসালেন, পরে ঠাট্টাও করলেন, এই বাড়িতে ওই গাড়িসুদ্ধ তার মালিক হাজির—কি ব্যাপার?

গৌরকিশোর বললেন, দিল্লীবাসিনী হচ্ছ শুনলাম, তাই এলাম দেখা করতে।

সুমিতা হাসলেন, আমার দিল্লী যাত্রার ভাগ্য বটে।

—কবে যাচ্ছ?

—এই তো পরশু, প্রথমে পাটনায় দিদির কাছে যাব, সেখানে দুদিন থেকে দিল্লী।

—পাটনার গাড়ি কটায়?

—বিকেল পাঁচটা পয়ত্রিশে শুনলাম, কেন, সী অফ করতে যাবে?

গৌরকিশোর হাসলেন। কিন্তু তিনি দ্রুততালে চিন্তাও করেছেন কিছু। বললেন, যেতে পারি, বলো তো স্টেশনে পৌঁছেও দিতে পারি।

—কি ভাগ্যি। বিশ্বাস করতে বলছ? দিলে তো বেঁচে যাই, আমার সঙ্গে আবার একগাদা মালপত্র।

—ঠিক আছে আমার গাড়িও ছোট নয়। সাড়ে তিনটেয় গাড়ি তোমার দরজায় হাজির হবে, সোয়া চারটের মধ্যে তুমি আমার অফিসে পৌঁছচ্ছ—পনের মিনিটের মধ্যে তুমি আমার অফিস দেখবে আর এক পেয়ালা চা খাবে—ঠিক সাড়ে চারটেয় আমরা বেরিয়ে পড়ব।

—আবার তোমার অফিসে নামব।

—নিজের হাতে গড়লাম, একদিন দেখবেও না?

অতএব সুমিতা সানন্দে রাজি হয়েছেন।

এখানেও এক দফা চা খেয়ে গৌরকিশোর ওঠার আগে ব্যাগ খুলে ফটো বার করে তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন।—নাও, তোমার ফটো যখন, এক কপি তোমারও প্রাপ্য।

ফটো পেয়ে সুমিতা আরো খুশি। জিজ্ঞাসা করলেন, অনেক তো তোলা হয়েছিল সেদিন, আর সকলের কই?

—ডেভেলপ করা হয়নি এখনো, পরে পাঠাব'খন।

গাড়িতে বসে আবার চিন্তাচ্ছন্ন গৌরকিশোর। বাড়ি ফিরলেন। স্ত্রী বাড়িতে নেই। ভাবনার অনুকূল অবকাশ পেলেন। কিন্তু যা ভাবছেন, তার সুরাহা ঠিক হল না যেন।

পরদিন অফিসেও চিন্তামগ্ন। আগামী কাল ঠিক পাঁচটায় স্ত্রীর সঙ্গে একটা জরুরী সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন সৃষ্টি করা দরকার। ঠিক সেই সময়ে একসঙ্গে দু'জনের কোথাও এক পার্টির নেমন্তন্ন থাকলেও বেঁচে যেতেন।

নেই। ফাইল সব টেবিলে পড়ে থাকল, গভীর ভাবনায় গৌরকিশোর তন্ময়।

হঠাৎ সচকিত তিনি। মনে পড়েছে কিছু। ভিতরে চাপা উত্তেজনা। ঠাণ্ডা হয়ে বড় শালাকে টেলিফোন করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, সকলে মিলে কেনার জন্য সেদিন একটা জমি দেখার কথা বলছিলেন, সেটা কোথায়?

ওধার থেকে জবাব এলো, তোমার বাড়ি থেকে গাড়িতে মিনিট পনেরর পথ।

—ঠিক আছে, কাল চলুন তাহলে—এর মধ্যে কালই তবু বিকেলের দিকে একটু ফ্রী আছি।

পরদিন বিকেলেই জমি দেখতে যাওয়ার ব্যবস্থা পাকা হল। বিকেল পাঁচটা থেকে পাঁচটা দশ মিনিটের মধ্যে দুই শালা তাঁর বাড়িতে আসবেন। গৌরকিশোরও অফিস থেকে তার মধ্যেই বাড়ি পৌঁছুবেন। তারপর লতাকে নিয়ে সকলে মিলে জমি দেখতে যাবেন।

পরদিন দাদাদের সঙ্গে জমি দেখতে যাওয়ার প্রোগ্রাম লতা রাত্রিতে শুনলেন। দাদারা যাতে আছেন তাতে তাঁরও আগ্রহ স্বতঃস্ফূর্ত। অতএব তিনি সানন্দে রাজি।

পরদিন অফিস যাবার আগে তিনিই স্মরণ করিয়ে দিলেন, পাঁচটার একটু আগেই চলে এসো, দেরি কোরো না—তোমার তো আবার যা সময়ের জ্ঞান—

অফিসে এসে সেদিন আর ফাইল স্পর্শও করলেন না গৌরকিশোর।

সময়মত সুমিতার বাড়িতে গাড়ি গেল, আর সময় ধরেই সুমিতা এলেন।

সকলে ধরে নিলেন তেমন বিশিষ্ট মহিলাই কেউ এসেছেন, নইলে বড় সাহেব নিজে বেরিয়ে এসে আদর করে তাঁকে নিয়ে যেতেন না।

ঘড়ি ধরে ঠিক সাড়ে চারটেতেই সুমিতাকে নিয়ে হাসিমুখে ঘর থেকে বেরুলেন গৌরকিশোর। দু'পা এগিয়েই কি বুঝি মনে পড়ল তাঁর। বললেন, এক মিনিট—

আবার ঘরে ঢুকলেন। টেলিফোন তুলে মৃদু গলায় অফিসের অপারেটর গার্লকে নির্দেশ দিলেন কিছু। তারপর রিসিভার রেখে বেরিয়ে এলেন।

ঠিক পাঁচটা বাজতে লতা অধিকারীর মুখ গম্ভীর। দাদারা মিনিট তিনেক আগে এসে গেছেন, কিন্তু এই লোকের দেখা নেই। পাঁচটা বেজে পাঁচ হতেই বিরক্তির তাপ বাড়ল। পাঁচ মিনিট পর্যন্তই তিনি সময়ের হেরফের সহ্য করে থাকেন। গনগনে মুখে দাদাদের কাছ থেকে উঠে এসে শোবার ঘরে ঢুকে টেলিফোন তুলে নিলেন। অফিসের নম্বর ডায়েল করতে অপারেটর মেয়ের সাড়া পেলেন।

—মিঃ অধিকারী প্লীজ।

নির্দেশমতই অপাবেটব সবিনযে জানালো, তিনি তো নেই, মিসেস অধিকাবী এসেছিলেন—একটা জরুবী কাজে তাঁব সঙ্গে তাঁকে বেরুতে হযেছে।

স্পষ্ট শুনেও লতা অধিকাবী ঠিক বুঝলেন না। বিস্মিত এবং দ্বিগুণ বিবক্ত। —কে এসেছিলেন?

—মিসেস অধিকাবী।

লতা বিমূঢ।—মিসেস অধিকাবী কোথায এসেছিলেন?

—আজ্ঞে, অফিসে।

—মিঃ অধিকাবী তাঁব সঙ্গে বেবিযেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি কে কল কবছেন বলুন, মিঃ অধিকাবী কাল এলে জানাব—

—মিসেস অধিকাবী।

বিসিভাব আছডে বাখলেন তিনি। ওদিক থেকে টেলিফোনেব মেযেটা হতভম্ব।

সমস্ত মুখ বক্তবর্ণ লতা অধিকাবীব। মাথাব মধ্যে কি যেন ওলট-পালট হতে শুরু কবেছে। বুদ্ধিও ঘুলিযে যাচ্ছে কেমন। ঘব থেকে বেরুলেন প্রায দশ মিনিট বাদে। দাদাবা জিজ্ঞাসা কবলেন, কি বে, কি হল?

তিনি বললেন, হঠাৎ কি জরুবী কাজে বেবিযে যেতে হযেছে শুনলাম। আজ আব হবে না দাদা, কতক্ষণ অপেক্ষা কববে—

তাঁবাও বিবক্তি চেপেই উঠে গেলেন।

একলা বাডিতে লতা অধিকাবী জ্বলতে থাকলেন। ঠাণ্ডা মাথায যত বেশি ভাবতে চেষ্টা কবছেন, ততো বেশি জট পাকিযে যাচ্ছে। কানে মাথায বাবকযেক জল দিযেছেন। ভাবতে চেষ্টা কবেছেন, হতেও পাবে আব কোনো মিসেস অধিকাবী।...হযই যদি আব কেউ, সে এমন কে যাব জন্যে বাডিব অ্যাপযেন্টমেন্টেব কথাও মনে থাকল না...মনে থাকলে টেলিফোনে জানিযে দিল না কেন?

বিকেল গেল, সন্ধ্যা পাব হল—এখনো দেখা নেই। হিজিবিজি চিন্তায ভিতবটা তেতেই উঠছে ক্রমশ।..অত দামেব শাডি কিনে এনে চুপচাপ বাক্সে বাখা হযেছিল কাব জন্যে?...ওই ফটোই বা কাব? যে-বাডিব সঙ্গে সম্পর্ক নেই, সেখানকাব ভাইযেব জন্যে মেযে দেখতে গেছল...ঠিক বিশ্বাস কবা যাচ্ছে না কেন এখন? মিসেস অধিকাবী এসে মিঃ অধিকাবীকে ডেকে নিযে গেল...সকলে কোন মিসেস অধিকাবী ভেবেছে?

লতা অধিকাবী কেবল বসছেন উঠছেন ঘবে বাবান্দায ঘুবপাক খাচ্ছেন। ভাবতে চেষ্টা কবছেন, কিন্তু অসহ্য বাগে ভাবতে কিছুই পাবছেন না।

গৌবকিশোব ফিবলেন বাত্রি প্রায সাডে ন'টায। সুমিতাব গাডি ছাডাব পব স্টেশন থেকে বেবিযে কি ভেবে দমদম চলে গেছলেন তিনি। এবোড্রামে একটানা দু'ঘণ্টাব ওপব বসে থেকে তাবপব উঠে চলে এসেছেন।...ড্রাইভারকে জেবা কববে না হযত, সেখানে কালচাবেব প্রশ্ন। আব কবেই যদি, ধবা পডতে আপত্তি নেই। ধবা পডবাব আশাতেই তো এত কিছু।

অন্য দিন লতা চোখ তুলে তাকান না, আজ শুধু তাকিয়েই রইলেন। স্ত্রীর মেজাজ-পত্র সুবিধের নয়, জামাকাপড় বদলাবার ফাঁকে গৌরকিশোর শুধু এটুকুই লক্ষ্য করলেন যেন।

মিনিট পাঁচ সাত দু'চোখ দিয়ে ওই মুখ ফালা-ফালা করে ভিতরে দেখতে চেষ্টা করলেন লতা অধিকারী। লোকটার ওই বিড়ম্বনা অভিব্যক্তি কেন যে মেকী মনে হ'ল জানেন না।—এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

—একটু কাজে আটকে পড়েছিলাম।

—দাদাদের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে কাজে আটকে পড়লে কেন?

গৌরকিশোরবাবু যেন প্রচণ্ড একটা ধাক্কাই খেলেন হঠাৎ। কিছু মনে পড়েছে—সমস্ত মুখে সেই চকিতবিমূঢ় অভিব্যক্তি। ঢোক গিললেন, তারপর আমতা আমতা করে বললেন, হঠাৎ বেরিয়ে পড়তে হল...ইয়ে, ঠিক খেয়াল ছিল না। আবার ঢোক গিললেন।—তৃ-তুমি অফিসে আমার খোঁজ করেছিলে নাকি?

রমণীর দুই চোখ তাঁর মুখের ওপর আরো যেন কেটে কেটে বসছে। তিনি চোর ধরেননি, গোবেচারা-মুখ একটা ডাকাত ধরেছেন যেন। জবাব দিলেন না, শুধু প্রশ্নই করলেন।—তুমি কোন কাজে আটকে গেছলে?

মিথ্যে বললে ধরা পড়ার সম্ভাবনা, এই ভয়েই যেন সত্যি জবাব দিলেন।—এই...একজনকে তুলে দিতে গেছলাম—

—কাকে তুলে দিতে গেছলে?

—একটি মে-মানে—মহিলাকে।

—কোথায় তুলে দিতে গেছলে?

—দমদম এরোড্রামে।

—তাঁর নাম কি?

ঢোক গেলাটা এবারে বড় বেশি স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ল লতার চোখে।

—রমা।

—রমা কি?

—ব্যানার্জী...

দুই চোখে নিঃশব্দে ওই মুখ আর এক প্রস্থ দগ্ধে দিলেন লতা অধিকারী। মিসেস অধিকারী তাহলে কে, জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও করলেন না। যা বোঝবার ঠিকই বুঝেছেন, আরো কিছু বোঝা দরকার।

—তিনি কোথায় গেলেন?

—লণ্ডন।

—একা?

—হ্যাঁ, আগেও একবার গেছল, অক্সফোর্ডের এম, এ। সেখানকার ইকনমিক রিসার্চ অর্গ্যানিজেশনে বড় চাকরি নিয়ে গেল, এখানেও এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের বড় অফিসার ছিল।

—তুমি তাঁকে চিনলে কি করে?

—বি, এ-তে অঙ্ক ছিল, আমার কাছ থেকে অঙ্ক বুঝে নিত।

লতা অধিকারী দেখছেন। দেখছেন দেখছেন দেখছেন।—প্লেন কটায় ছেড়েছে?

—রাত সাড়ে আটটায়।

—তুমি সাড়ে চারটেয় বেরিয়েছিলে কেন?

—কিছু, মানে—কেনাকাটা ছিল—

আর কিছু জিজ্ঞাসা করার নেই। শেষবারের মত ওই মুখ ঝলসে দিয়ে লতা অধিকারী বেরিয়ে এলেন। তারপর রাতের মধ্যে আর ওই ঘর-মুখো হলেন না। পাশের ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রায় সমস্ত রাত ধরে জ্বললেন আর ছটফট করলেন। ওই শাড়ি কার জন্যে কেনা হয়েছিল, আর ওই ফটোই বা কার—খুব ভালো করেই স্পষ্ট হয়ে গেছে। জীবনে এরকম স্তম্ভিত আর তিনি হননি। গোবেচারার মুখোশপরা এত শয়তানী তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। পাছে অফিসের কেউ কিছু মনে করে এজন্যে মিসেস অধিকারী বলে চালানো হয়েছে ওই মেয়েটাকে—এতখানি ধূর্ত। অফিসে প্রায়ই যাতায়াত ছিল নিশ্চয়, একদিন দু'দিন হলে লোকের চোখে ধুলো দেওয়ার দরকার হত না। জীবনের মতই শিক্ষা দেবেন তিনি, কিন্তু কি যে করবেন ভেবে পাচ্ছেন না বলেই একটুও শান্ত হতে পারছেন না।

একদিন দু'দিন বা একবছর দু'বছর নয়—ওই লোক একটানা দশ বছর ধরেই চোখে ধুলো দিয়ে এসেছে তার। নিজের বোকামিটাই থেকে থেকে বড় হয়ে উঠছে। সত্যি সত্যি গোবেচারা হলে আই, এস-সি থেকে এম, এ, পর্যন্ত একটানা ফার্স্ট হয় কি করে, এটা তার ভাবা উচিত ছিল। .. সেও আবার অঙ্কে। নির্বোধ হলে তার অত বুদ্ধিমান বাবা তাকে জামাই করতেন না, এ সত্য আজ নতুন করে চিন্তা করতে হল। আর মগজের সে-রকম জোর না থাকলে দেখতে দেখতে ব্যবসা এত বড় হয়ে উঠত না, তাও এই রাতেই প্রথম উপলব্ধি করলেন। শুধু তাই নয়, অক্সফোর্ডের এম, এ, পাস মেয়ের অত খাতির পেতে হলে মাথায় যে বেশ কিছু থাকা দরকার, তা'ও হাড়ে হাড়ে অনুভব করছেন তিনি।

মাথার মধ্যে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। এই বাড়ি তাঁর, ওই ব্যবসায়ও তাঁরই বাবার টাকায়। অনেক কিছুই করতে পারেন তিনি। কিন্তু সেভাবে হেস্তনেস্ত করার মত আর আক্রোশ মেটার মত কিছুই ভেবে উঠতে পারছেন না।

দিন কাটতে লাগল। একটা দুটো করে মাসও।

লতা অধিকারীর ক্লাবে যাওয়া কমে এলো, ফাংশনে যাওয়া কমে এলো, পার্টিতে যাওয়া কমে এলো, কমতে কমতে বন্ধই হয়ে এলো একসময়। উষ্ণ আপ্যায়নের অভাবে চটকদার পুরুষ-রমণীদের আনাগোনায় ভাটা পড়ল। প্রসাধনের একাগ্রতায় ছেদ পড়ল, ম্যাচিংএ অভিনবত্ব রচনার ঝোঁক গেল, টেপ ব্লাউস গলা থেকে সরতে সরতে ক্রমে কাধ ঢেকে দিতে লাগল, গায়ের জামা আর শাড়ির মাঝের ফারাক সঙ্কীর্ণতর হতে থাকল।

সমস্ত অবকাশ শুধু একজনের প্রতি সজাগ লক্ষ্য আর প্রহরায় নিবিষ্ট হল।

লতা অধিকারী প্রথম সন্তানের জননী হলেন বত্রিশ বছর বয়সে—ছেলে। দ্বিতীয় সন্তান এলো সাড়ে তেত্রিশে—ছেলে। তৃতীয় সন্তান এলো ছত্রিশে—ছেলে।

লতা অধিকাবী অসহিষ্ণু বিবতি ঘোষণা কবলেন। কিন্তু কিছুদিন না যেতে আব একজনেব অভিলাষ টেব পেযে তপ্ত হযে উঠলেন—একটি মেযেব বাসনা। সবোষে একটানা বছব দুই বাসনা নাকচ কবে চললেন।

তাবপব চতুর্থবাব এবং শেষবাব নার্সিংহোমে এলেন উনচল্লিশ বছব বযসে। এবাবও ছেলে।

পবদিন গৌবকিশোব নার্সিংহোমেব ঘবে এসে দাঁড়ালেন মাত্র, তাঁব মুখেব ওপব এক পলক আগুন ছডিযে লতা অধিকাবী ঝাঁঝিযে উঠলেন, হযেছে? ফেব কাছে ঘেঁষবে তো তোমাকে আমি—

কি কববেন সেটা আব সম্পূর্ণ কবে উঠতে পাবলেন না। সেই চিবাচবিত গোবেচাবা-মূর্তি দেখে গা জ্বলল তাঁব। সবোষে পাশ ফিবলেন।

লতা অধিকাবীব আটান্ন আব গৌবকিশোবেব তেষট্টি।

এ পর্যন্ত সমান দাপটে স্বামী শাসন কবে এসেছেন লতা অধিকাবী, ওই মুখেব সদা গোবেচাবা ভাব আজও তাঁব চক্ষুশূল। শাসন দেখে মনে মনে ছেলেবাও মাযেব থেকে বাপেব প্রতি বেশি সদয।

বাইবে তাঁবা আদর্শ অভিজাত দম্পতি। কোনো সভা বা অনুষ্ঠানে একজনকে ছেড়ে আব একজনকে দেখেনি কেউ। অল্পবযসী ছেলেবা বলে কাযাযুক্ত ছাযা যথা—

সেদিনও কি এক অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব কবতে গেছলেন গৌবকিশোব। লতা অধিকাবী যথাবীতি তাঁব পাশে প্রধানা মহিলাব আসন গ্রহণ কবেছেন। সভাপতিব চিবাচবিত সংক্ষিপ্ততম ভাষণেব ভূমিকা শুনে লতা অধিকাবীব গা জ্বলেছে। গৌবকিশোব বলেছেন, বক্তৃতা কবাব মত অত চালাকচতুব বা চৌকস নন তিনি, অতএব কি আব বলবেন...।

বাড়ি ফিবেই বিব্রত মুখ কবে স্ত্রীকে জানালেন, শবীবটা কেমন যেন কবছে, ভালো লাগছে না।

বক্তৃতায টিকা-টিপ্পনী কেটে এসে এখন একটু সদয দৃষ্টি আকর্ষণেব ছল কিনা, মুখেব দিকে চেযে সেটাই আগে বুঝতে চেষ্টা কবলেন লতা অধিকাবী। কিন্তু খটকা লাগল কেমন।

গৌবকিশোব ঠাণ্ডা জল চেযে খেলেন এক গেলাস। শুযে পডলেন। শবীবেব সমস্ত বক্তকণাগুলো যেন জ্বলছে আব গাযে আলপিন ফোটাচ্ছে। বুকেব একদিকে যন্ত্রণাও বোধ কবছেন। মাথাব উপব পুবোদমে পাখা ঘুবছে কিন্তু তিনি ঘামছেন। চোখে ঝাপসা দেখছেন। স্ত্রীকে তাড়াতাড়ি ঘব ছেড়ে চলে যেতে দেখলেন। একটু বাদে ফিবে এসে মুখেব ওপব ঝুঁকে পডেছেন তাও টেব পেলেন। ছেলেবা ঘবে ঢুকেছে, দু'জন আবাব ছুটে বেবিযেও গেল মনে হল। চোখ টান কবে স্ত্রীব মুখখানাই দেখতে চেষ্টা কবলেন তিনি। মাথাব ভিতবে সবকিছু গণ্ডগোল হযে যাচ্ছে, বক্তেব জ্বালা বাডছে, আব ফাঁকে ফাকে কি যেন মনে কবতে চেষ্টা কবছেন তিনি। ভবিষ্যৎ গণনায পটু এক বন্ধুকে কবে যেন কি দেখতে পাবেন কিনা জিজ্ঞাসা কবেছিলেন...

গৌরকিশোর চোখ বুঝলেন। আর তাকালেন না।
লতার চোখে জল দেখতে চেয়েছিলেন গৌরকিশোর।
লতা অধিকারী অঝোরে কাঁদছেন।
গৌরকিশোর দেখছেন কি?

দুজনার ঘর

তৃতীয় মানুষ এলে দু'জনার ঘর টেঁকে না।
অনেক, অনেক মূল্য দিয়ে তবে এই সার জেনেছে কাজললতা।

বিস্ময়ের তাড়নায় তার ভয় উবে যাবার দাখিল। অনেকক্ষণ সঙ্গোপনে দূরে দাঁড়িয়ে দেখেছে। জমজমাট মনে হয়েছে দোকানটা। জলুস বেড়েছে, লোকজন বেড়েছে, খদ্দের বেড়েছে। দেখছিল আর বুকের তলায় কাটা-ছেঁড়ার ওপর যেন এক ধরনের খুশির প্রলেপ পড়ছিল।

কিন্তু নিভৃতের রোমাঞ্চ মিলিয়ে আসতে চোখের নজর বাড়ছিল। কাজললতার খটকা লাগছে কেমন। অত দূর থেকে ভালো ঠাওর করতে পারছে না। যদিও ওখানকার ভিতরের আলো দিনের আলোর মত সাদা। তবু কি যেন এক ব্যতিক্রম উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। একটাও চেনা মুখ চোখে পড়ছে না। পায়ে পায়ে এগোলো আরো একটু। জনা দুই অল্প বয়সের ছেলে কাজ করছে, আর তিনটি মেয়ে। আঠেরো থেকে বাইশ চব্বিশের মধ্যে হবে মেয়েগুলোর বয়েস। কাজললতা আরো একটু এগিয়ে তাদের দেখছে ভালো করে। চোখের দৃষ্টিটা খরখরে হয়ে উঠছে। এ আবার কি? এ কি দেখছে কাজললতা?

নিজের জীবন যাত্রা যেমনই হোক, সকল সংশয়ের ঊর্ধ্বের কোনো উগ্র শুচিসুদ্ধ মানুষকে জীবনের জটিল রাস্তায় চলতে দেখলে মন হঠাৎ যেমন ধাক্কা খায়, ওই মেয়েগুলোকে দেখে প্রায় তেমনিই একটা ধাক্কা খেয়ে উঠল কাজললতা।

নিজের অগোচরে পায়ে পায়ে আরো একটু এগলো সে।

সুন্দর দূরে থাক, তেমন সুশ্রীও নয় একটা মেয়েও। তবে সাজগোজে শ্রী বাড়াবার চটক আছে। যে চটকে শ্রী আসলে নিষ্প্রভ হয়, কিন্তু চোখ টানে। পরনে উগ্র রঙের শাড়ি, গায়ে গলা ঘেঁষা টেপ ব্লাউস, হাতে এক এক বোঝা রঙবেরঙের কাচের চুড়ি, গালে ঠোঁটে রঙ।

এই বৈচিত্র্যের বুদ্ধি একদিন কাজললতাই দিয়েছিল। জীবিকার্জনের সেই যুগ্ম আসরে সে-ই প্রথম এবং একমাত্র নায়িকা ছিল। কিন্তু এ আবার কি? লোকটা কি এতদিনে তাহলে এই জটিল যুগে তাল ঠুকে চলার সহজ রাস্তাটা চিনে ফেলেছে? কাজললতা যখন ওই আসরের নায়িকা ছিল, তখনো হয়ত লক্ষ্যের তফাৎ ছিল না খুব। কিন্তু এ যেন রাতের নিভৃতে প্রত্যাশার তাগিদে ঘরের স্ত্রীর কাছে আসা আর

গণিকালয়ে যাওয়ার মধ্যে যেটুকু তফাৎ, অনেকটা সেই রকম। রুচির তফাৎ, শালীনতার তফাৎ।

নিজের অজ্ঞাতে আরো কাছে এসে দাঁড়িয়েছে কাজললতা। প্রায় দোকানের সামনেই।

তারপর দ্বিতীয় ধাক্কা। ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে ওধারের ক্যাশবাক্সের সামনে মালিকের নির্দিষ্ট আসনটা দেখা যাচ্ছে। সেখানে জাঁকিয়ে বসে আছে সম্পূর্ণ একজন অচেনা লোক।...বছর পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ হবে বয়স, রোগা, ঢ্যাঙা, পরিপাটি সাজ। উঠছে, তদারক করছে, আবার গিয়ে বসছে, চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে নজর রাখছে, ক্যাশবাক্সে টাকা তুলছে।

দোকানের প্রায় দরজায় দাঁড়িয়েই নির্বাক বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকে দেখছে কাজললতা। মাথার মধ্যে সব যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে কেমন। সচকিত হয়ে খানিকটা পিছনে সরে এলো। মাথা উঁচিয়ে দুচোখ টান করে সাইনবোর্ডটা দেখল আবার।

.. দু'জনার ঘর। সেই সাইনবোর্ড। লাল রক্তের অক্ষরে সেই লেখা। দু'দিকে সেই দুটি নারী-পুরুষের মূর্তি। সেই ঘর।

কিন্তু এ কি দেখছে কাজললতা? আবার এগিয়ে একেবারে দরজার মুখে এসে দাঁড়াল। আবার ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে দেখতে লাগল। বিশেষ করে মালিকের আসনের সেই লোকটাকে।

দু'জনার ঘর জমজমাট বটে। যেমন তারা আশা করেছিল একদিন, প্রায় তেমনি। সে আর রাধাকান্ত। কাজললতা আর রাধাকান্ত দু'জনার ঘরের ওই বাইরের দিকটা বহুলোকের সমাবেশের প্রত্যাশাতেই খোলা ছিল। না, দু'জনার ঘর বলতে সত্যিই দু'জনের বাসের ঘর এটা নয়। কোনো কাব্যের ব্যাপারও নয়। এটা একটা সাইনবোর্ড। ওই সাইনবোর্ডে বড় বড় জ্বলজ্বলে রক্তের হরপে ওই কথাক'টি লেখা। লেখার দু'পাশে নিপুণ রঙের প্রলেপে একটি পুরুষমূর্তি আর একটি রমণীমূর্তি, আঁকা। দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে আছে। এই চাওনিটুকু বড় জীবন্ত।

দু'জনার ঘর বলতে দু'জনার ঘর গড়ার উপকরণ যোগানোর দোকান এটা। বিজ্ঞাপনের চটকে বস্তুজগতে ভাগ্য বদলের অনেক বিস্ময়কর নজির আছে। কখন কোনটা যে জনতার মনে দাগ কেটে বসবে বা চোখে ঘোর লাগাবে, তার স্থিরতা কিছু নেই। দাগ পড়ল কি ঘোর লাগল, অমনি কপাল ফিরল।

দু'জনার ঘরের এখন অন্তত সেই কপাল। দলে দলে মেয়ে পুরুষ আসছে, জিনিস কিনছে, বেরিয়ে যাচ্ছে। যে-কোনো বয়সের স্বামী-স্ত্রী অথবা যুগ্ম দয়িতা এই পথে চললে ওই সাইনবোর্ডটা তাদের চোখ টানবে। পরস্পরের দিকে চেয়ে তারা মুখ টিপে হাসবে। কিছু কেনার থাকলে তারা এই দোকানেই ঢুকে পড়বে।

দূরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, তারপর নিজের অগোচরে একটু একটু করে কাছে এসে এসেও এই দৃশ্যই দেখছিল কাজললতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

কিন্তু সত্যিই এ কি দেখছে সে? মালিকের আসনে ওই লোকটা কেন? চোখে পলক পড়ে না কাজললতার। দোকান-ঘেঁষা ফুটপাথে যাতায়াতের পথে দাঁড়িয়ে আছে,

কত লোক যে তাকেই লক্ষ্য কবে যাচ্ছে হুঁশ নেই। লক্ষ্য দোকানেব মালিকও কবল এক সময। ভিতবের ভিড কমেছে, তাই দেখছে। তারপব অনেকবাবই চোখ গেল সেদিকে। উঠে এলো এক সময। সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি কিছু নেবেন? ভিতবে আসুন না—

কাজললতা থতমত খেল একপ্রস্থ। তারপব লোকটাকে আবার দেখল একটু। ভিতরে এসে দাঁডাল সে। মহিলাটির হাবভাব দেখে দোকানেব মালিক নন্দ ঘোষ বিস্মিত। উৎসাহিত হবাব মত খদ্দেব নয কিছু, আটপৌরে বেশবাস, মোটসোটা গডন, কপালে নযা পযসাব থেকে বড় জ্বলজ্বলে সিঁদুবের টিপ। দেখলেই বোঝা যায তেমন অবস্থাপন্ন নয, তেমন আধুনিকা তো নয়ই। তবু তাব ঈষৎ-বিমূঢ চাউনিব মধ্যে কি যেন ছিল যা নন্দ ঘোষেব খুব স্বাভাবিক মনে হযনি।

জিজ্ঞাসা কবল, কি চাই বলুন?

কাজললতা আত্মস্থ হল এবাব। কিছু বলতে হবে। অস্ফুটস্বরে বলল, মালিককে...

নন্দ ঘোষ এ বকম চাওযাব জন্য প্রস্তুত ছিল না খুব।—আমিই মালিক, বলুন কি বলবেন?

তাব মুখেব ওপব কাজললতাব চাওনিটা বদলাতে লাগল আবাব। শূন্য দৃষ্টি লোকটাব মুখেব ওপর ঘুবল বাবকযেক। কি বলবে বা কিছু না বলে দোকান থেকে বেবিযে আসবে কিনা ভেবে পেল না।

আব নন্দ ঘোষেব মনে হল, যা বলতে চায এই অপবিচিতা, তা বোধহয এত লোকজনেব সামনে বলতে পাবছে না। এখন ভিড আবো পাতলা হওয়ায ওই ছোঁড়া-ছুঁড়িগুলো এদিকেই ফিবে ফিবে তাকাচ্ছে। এই অজ্ঞাত রমণীব প্রতি তার একটু কৌতূহল হল কেন কে জানে?...কিছু বলতে চায় নিশ্চয, নইলে দবজার সামনে দাঁডিযে ও-ভাবে অতক্ষণ ধবে দোকানেব দিকে চেযে ছিল কেন? আব ভিতবে এসেই বা মালিকেব খোঁজ কবল কেন?

আচ্ছা, এদিকে আসুন—

মালিকেব আসনেব পিছনে ছোট একটা খুপরি ঘর। এটা নিজস্ব বিশ্রামেব ঘব নন্দ ঘোষেব। সেখানেই নিযে এলো কাজললতাকে। তাকে বসতে বলল, তারপব আবাব জিজ্ঞাসা কবল, কি চাই?

কি বলবে কাজললতা? এ পর্যন্ত আসবে তা তো ভেবে আসেনি। একবারে ভিতরে ঢুকবে তা তো কল্পনাও করেনি। এই আসা, এই বসা, সব নিজেব অজ্ঞাতসাবেই ঘটেছে। কিন্তু জবাব কিছু দিতে হবে। লোকটা চেযে আছে। সে-ই নাকি মালিক এই দু'জনার ঘবের। তার ব্যবহারেই হযত লোকটাব চাউনি সন্দিগ্ধ হযে উঠবে কেমন।

জবাব মাথায এলো চকিতে। উদ্ভট কিছু নয, নিতান্ত প্রযোজনেব জবাব। বাস্তব জবাব। মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা উদগত অনুভূতি দমন করে নিতে হল আগে। এই পরিবেশ, এখানকার বাতাসই হঠাৎ যেন আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িযে ধরতে চাইল তাকে। ...এই চেষ্টাই আগে করবে বই কি কাজললতা। দরকারও তো। ...যদি হয়, তারপর সবই জানতে পারবে।

নন্দ ঘোষের মুখের ওপর তার ডাগর দুই চোখ আটকালো আবার। বলল, একটা চাকরিব জন্য এসেছিলাম।...খুব দরকার। দেবেন?

না, এবারে আর নন্দ ঘোষ খুব বিস্মিত হয়নি। এই বকমই কিছু যেন মনে হযেছিল তার। শোনামাত্র তাব ঘাড় নাড়ার কথা। এযাবৎ আগে দু'পাঁচটা মেয়ে তার কাছে চাকরিব জন্য এসেছে। তাদের হাবভাব অবশ্য এরকম ছিল না। তাবা এসেছে, সবিনযে চেষ্টা কবেছে, তাবপব চলে গেছে।

কিন্তু এর বেলায নন্দ ঘোষ কেন যে মাথা নাডতে পাবল না তক্ষুণি জানে না। বমণীটিব প্রতি গোড়াতেই তাব চোখ পড়েছিল কেন, মুখেব দিকে চেযে সেটাই আগে বুঝে নিতে চেষ্টা কবল। সামনেব চেযারটায বসল এতক্ষণে। পকেট থেকে সস্তাদামেব সিগাবেট বাব কবে ধবালো। ব্যবসায়ীব তির্যক দৃষ্টি।

কাজললতা প্রতীক্ষা কববে। ব্যগ্র প্রত্যাশা। লোকটার একটা হাঁ বা না'ব ওপব যেন জীবনমবণ নির্ভর। এই ব্যাকুলতাই যে তাব স্বপক্ষে কাজ কবছে জানে না। শোনাব অপেক্ষায় ফর্সা মুখ ঘেমে উঠেছে তার।

নন্দ ঘোষ ভাবছে যেন। ভাবছে ঠিকই, আব আড়ে আড়ে তাকিযে বুঝতে চেষ্টা কবছে কেন চোখে পড়েছিল তাব। ...ওই অতবড জ্বলজ্বলে সিঁদুবেব টিপটাব জন্যই বোধহয। মুখখানা বড়সড, চওড়া, আব বেশ ফর্সা—তাই বোধহয় মানিযেছে ভালো। তাকালেই দু' চোখ আগে ওই সিঁদুবেব ধাক্কা খায।

—থাকা হয কোথায? আপনি তুমি বর্জন কবে একটা নির্লিপ্ত প্রশ্ন নিক্ষেপ কবল নন্দ ঘোষ।

এই কাছেই। ...বস্তিবাড়ির একখানা ঘবে।

আব কে আছে?

কাজললতাকে চেষ্টা কবতে হযনি, মুখ দিযে আপনিই নির্গত হযেছে।

—মা।

খুব মিথ্যে বলেনি কাজললতা, সাত দিনেব চেনা ওই বুড়ী যদি মা না হয় তো মা আব কে?

স্বামী কোথায? কি কবে?

প্রশ্নেব ফাঁকে ফাঁকে ভেবে নিচ্ছে নন্দ ঘোষ। সম্মুখবর্তিনীব সচকিত বিবর্ণ মূর্তিটা তাই ভালো করে চোখে পড়েও পড়ল না। নিলে কেমন হয তাই ভাবছে সে। বৈচিত্র্যেব দিকটা ভাবছে।...যে মেয়েগুলো আছে দোকানে, তাবা অতি আধুনিকা। ওই কেমন হাওয়া আজকাল, নইলে তাকালে তো গা রি-রি করে নন্দ ঘোষের। কিন্তু খদ্দেব তো কত বকমেবই আছে, অনেকেব হয়ত তাবই মত গা রি-রি কবে। সে-স্থলে এই বৈচিত্র্য দেখলে হযত চোখ জুড়োবে। মুখশ্রী বেশ কমনীয়, মিষ্টি, তাব ওপর ওই জ্বলজ্বলে সিঁদুরেব টিপ চোখ টানেই। তাব যখন টেনেছে, কত খদ্দেরের টানবে ঠিক কি। গেরস্থঘরের মেয়ে-পুরুষদের ভালো যে লাগবে তাতে সন্দেহ নেই। আসল কথা, অতি আধুনিকা আর সিঁদুবপবা গেবস্থঘরের বউ—দু'-রকমই কাজ করছে দোকানে—এই বৈচিত্র্যটাই বড় বলে মনে হতে লাগল নন্দ ঘোষের।

তার প্রশ্নের জবাবে বিড়বিড় করে কি বলল, নন্দ ঘোষের ঠিক যেন কানে ঢুকল না। মুখভাব একটু অন্যবকম দেখছে কেন, তাও বুঝল না। আবার জিজ্ঞাসা কবল, স্বামী এখানে থাকে না?

কাজললতার মুখে ঘাম দেখা দিয়েছে আবাব। মাথা নাড়ল— থাকে না।

নন্দ ঘোষেব খটকা লাগল কেমন। স্বামীব কথায় মুখখানা অমন হয়ে গেল কেন? জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি ববাববই এখানে থাকেন?

এবারও মাথা নাড়ল কাজললতা—অর্থাৎ এখানে থাকত না। কিন্তু মুখ বুজে থাকলে হবে না জানে। ঢোঁক গিলে মৃদু জবাব দিল, পাকিস্তানে থাকতুম, অল্পদিন হল এসেছি

অস্বস্তি...মিথ্যে বলাব অস্বস্তি। কিন্তু খুব মিথ্যে নয় বোধহয়। পাকিস্তান বর্ডাবেই তো নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাকে। আব ক'দিন থাকলে কি হত কে জানে।...অল্পদিন হল এসেছে, তাও সত্যি।

নন্দ ঘোষ যেটুকু বুঝবাব নিজেব মত কবে বুঝে নিল। যে জায়গা থেকে আসছে বলল তাতেই যেন সব বোঝা হয়ে গেছে। সর্বস্ব খুইয়ে এ-রকম তো কতই আসছে। বুক বেঁধে যত বড় কবেই সিঁদুবেব টিপ পরুক, সত্যিকাবেব আশাভবসা যে কতটুকু তা এই মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

নাম কি?

কাজল...

মুখেব ওপব লোকটাব যাচাইয়েব দৃষ্টি এই যেন প্রথম অনুভব কবল কাজললতা। সম্পূর্ণ নাম আর বলা হল না।

সকাল দশটা থেকে বাত আটটা পর্যন্ত কাজ এখানে, ববিবাবে শুধু ছুটি—সুবিধে হবে?

কাজললতা তক্ষুনি মাথা নাড়ল, হবে। আরো বেশি সময় থাকতে হলেও আপত্তি ছিল না। থাকতে না পাবাটাই যেন যাতনা।

মাইনে কত চাই?

যা দেবেন।

আশায় আনন্দে দু'চোখ চকচক কবছে কাজললতাব। মাইনেব কথা সে একবাবও ভাবেনি। দু'জনাব ঘবে তাব জায়গা হবে কি হবে না, সেটাই একমাত্র ভাবনা।

হবে মনে হয়...।

হল। পবদিন থেকেই তাকে আসতে বলে দিল নন্দ ঘোষ। তারও মনে মনে হিসেব কষা শেষ হয়েছে। চাব-চাবটে মেয়ে সে দোকানে বাখতে পাববে না। আগামী সপ্তাহে মাস শেষ হলে ওই কেতকী মেয়েটাকে বিদায় করবে। যেমন্ চেহাবা তেমনি মুখেব ওপব কট-কট করে কথা বলে। কালই ছাড়িয়ে দেবে তাকে।

কাজললতা বাইরে এসে দাঁড়াল। কিন্তু পা নড়তে চায় না। বিকেলে যখন আসে, ভাগ্যেব এই যোগাযোগ কল্পনাও কবেনি। দূব থেকে খুব সঙ্গোপনে একবাব চোখেব দেখা দেখে যাবে বলে এসেছিল। কিন্তু সব ওলট-পালট হয়ে গেল কেমন। কাজললতা

যেন এখনো নিঃসংশয় নয়, একটু আগের ওই অধ্যায়টা সত্যি কিনা। যা দেখেছে আর দেখে এলো, তাই ঠিক কিনা।

এ কার বদলে কাকে দেখল সে? দু'জনার ঘরের আসল মালিক গেল কোথায়?

দু'টি জিনিসের সুনাম আর দুর্নাম ছিল রাধাকান্তর। তার মগজে বুদ্ধি ছিল আর স্নায়ুতে রাগ ছিল।

কিন্তু এ দুটি জিনিসের সহঅবস্থান রীতি নয়। একের প্রকোপে অন্যটিকে নিষ্প্রভ মনে হত। মাথা যখন খেলত, উৎসাহ আর উদ্দীপনায় তখন কারো বড় দোষও চোখে পড়ত না। আবার স্নায়ু যখন চড়ত তখন মনগড়া ত্রুটি আবিষ্কার করে ত্রাসের কারণ হয়ে উঠতেও দেরি হত না।

কিন্তু অবস্থার ফেরে স্নায়ুর উপর যত হাত পড়েছে মগজের উপর ততো নয়। স্টুডিওতে চাকরি করত। সিনসিনারি আঁকার কাজ। সে আর বটুক একসঙ্গেই কাজে ঢুকেছিল। ঠিক একসঙ্গে নয়— বটুক ক'দিন আগে ঢুকে তাকে ঢুকিয়েছিল। বটুকের মুখ ভালো চলে। গুছিয়ে কর্তাদের মনের মত ব্যবস্থা-পত্র করা, সাজ-সরঞ্জাম জোগানো —এসব ব্যাপারে তার মাথা ভালো খেলত। কিছুকাল চাকরি করার পর কাচা টাকা রোজগারের পথটাও ভালই চিনেছিল। গণ্ডায় গণ্ডায় দশ টাকা রেটের এক্সট্রা আর্টিস্ট জুগিয়ে মাথা পিছু দু'তিন টাকা বখরা আদায় করাটা আদৌ গর্হিত কাজ ভাবত না বটুক। তাছাড়া পার্টির বিশ্বাসভাজন হয়ে খুচরো কেনা-কাটার ফাক দিয়েও মন্দ রোজগার হত না তার। রোজগার যেমন করত, ওড়াতও তেমনি।

মনে মনে ওই লোকটাকেই রাধাকান্তর থেকে অনেক বেশি চৌকস ভাবত কাজললতা। বহু ব্যাপারে যোগ্য ভাবত। কিন্তু মনে মনে সে ভয়ই করত রাধাকান্তকে। এমন চণ্ডাল রাগ আর বুঝি দেখেনি। কত জায়গায় চাকরি করেছে ঠিক নেই। ওই মেজাজ নিয়ে কোথাও টিকে থাকে নি। স্টুডিওর চাকরিও কতবার যায়-যায় হয়েছিল, ঠিক নেই, প্রতিবারই ওই বটুকই বাচিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দোষটা পুরাপুরি রাধাকান্তরই ধরে নিয়েছিল কাজললতা। পয়সাওলা মালিকের যদি স্বভাবচরিত্রের বালাই না থাকে তো তার কি? আর ঈষৎ মত্ত অবস্থায় রাধাকান্তর আকা সিন অপছন্দ হওয়ার ফলে ঘরের বউকে টেনে একটা নিম্নস্তরের রসিকতা করে ফেলেই থাকে যদি তো সেইজন্য গায়ে ওরকম ফোস্কা পড়তে গেল কেন? আর রাগ হয়েছে বলে কি একেবারে মালিকের গলা টিপে ধরতে হবে?

কি হয়েছিল না হয়েছিল, বটুকের মুখে সবই শুনেছিল কাজললতা।

রাগ তো বলতে গেলে বিয়ের পর থেকে তারও।

কোন সাধ-আহ্লাদ মিটেছে তার? ভাত দেবার মুরোদ নেই, কিল মারার গোসাই। অথচ কতরকম স্বপ্নই না ছিল বিয়ের আগে। যে ঘরের মেয়ে কাজললতা, বিয়ের আগে তার রীতিমত প্রতিপত্তি ছিল বলা চলে পাঁচজনের কাছে। ওর মত সুন্দরী গোটা ব্যারাকের মধ্যে আর একজনও ছিল কিনা সন্দেহ। তার বাবা ছিল পুলিশ ব্যারাকের বাজার-সরকার। তাই স্বামীর থেকেও বটুকের কাজটা অনেক বেশি পছন্দ

হত তার। তাছাড়া বটুক তার শিক্ষাদীক্ষার কদরও করতে জানত। ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছিল কাজললতা। সেটা ওদের পরিবারে কম কথা নয়। এই লেখাপড়া আর এই চেহারা দেখেই পড়ন্ত মানীবংশের ছেলে হয়েও তাকে মনের আনন্দে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল রাধাকান্ত। কিন্তু দু'দিন না যেতে রূপের কদর, শিক্ষার কদর সব যেন ঘষা পয়সা।

তার উপর উঠতে বসতে শাসন। কাজললতার একটু সাজতেগুজতে ভাল লাগে, বিকেলে একটু রাস্তায় এসে দাঁড়াতে ভালো লাগে, আর সিনেমা দেখতে আর সিনেমার গল্প শুনতে কত যে ভালো লাগে তার ঠিক নেই। এই জন্যেই কি লোকটা কম গঞ্জনা দিয়েছে তাকে?

এঁটে-উঠতে পারে না শুধু বটুকের সঙ্গে। দু'জনার ঝগড়া হয়, রাগারাগি হয়। কিন্তু বটুকের স্বভাব উল্টো বলে আবার ভারও হয়। তাছাড়া উপকার তো কম করে না, ভার না করে যাবে কোথায়? বটুক যখন সিনেমার গল্প করে বা কখনো জোর করে সিনেমায় নিয়ে যেতে চায়, অনেক সময় ইচ্ছে না থাকলেও লোকটা বাধা দিতে পারে না।

চাকরি যাবার পর দিনে দিনে মেজাজের উন্নতি হতে লাগল রাধাকান্তর। মুখের দিকে তাকাতে ভয় করত কাজললতার। এদিকে দিন চলে না এমন অবস্থা। সেই দুঃসময়ে বটুক একটা মস্ত লোভনীয় প্রস্তাব দিয়েছিল কাজললতাকে। দিন পিছু দশটাকা হবে ছবিতে মুখ দেখাতে আপত্তি কি কাজললতার? কোথাও একটু কাঁদতে হবে, কোথাও একটু হাসতে হবে—কোথাও বা কিছুই করতে হবে না। সপ্রতিভভাবে একটু কাজ করতে পারলে উন্নতিও অবধারিত। দশটাকাটা বিশ পঁচিশ পঞ্চাশেও গিয়ে ঠেকতে পারে একদিন বটুকেরই হাত, সে অনায়াসেই ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

রাধাকান্ত বাড়ি ছিল না। কাজললতা তার জন্য অপেক্ষা করছিল আর বাতাসে সাতার কাটছিল। তারপর রাধাকান্ত বাড়ি আসতেই বটুকের প্রস্তাবটা আরো পল্লবিত করে তার চোখের সামনে তুলে ধরেছিল।

রাধাকান্তর বুঝতে সময় লেগেছিল একটু। শেষ পর্যন্ত বুঝেছিল ঠিকই। সেই মুখের দিকে আর সেই চোখের দিকে চেয়ে কাজললতা সভয়ে পায়ে পায়ে সরে দাঁড়িয়েছিল। ভয়ে কাঠ সে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বটুকের একদিনের গল্প মনে পড়ে গেল তার। কবে নাকি এক পরিচিত জ্যোতিষ দুই বন্ধুর হাত দেখে রাধাকান্তকে বলেছিল, রাগ-টাগগুলো সামলাও একটু, করে না খুন করে ফাসীকাঠে ঝুলতে হয়।

..হঠাৎ মনে হল, সেই বীভৎস খুন উঁকিঝুকি দিচ্ছে লোকটার চোখে-মুখে। সেই কটা ত্রাসের মুহূর্ত কাজললতা ভুলবে না বোধহয়।

এর পরেই দিন ফেরাবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছিল রাধাকান্ত। দেশে কিছু জমিজমা ছিল, চেষ্টাচরিত্র করে তাই বিক্রি করে এলো। হাসিমুখ—তার হাতে সাড়ে তিন হাজার টাকা। কাজললতার কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য অঙ্কের টাকা।

রাধাকান্তর মন স্থির। চাকরি আর নয়, গোলামী আর নয়। ররাতজোরে ভালো ঘর পেল একটা। অবশ্য তার জন্য সেলামী গুনতে হল হাজার টাকার ওপর। তারপর

দিনকতক নাওযা-খাওযা ভুলে নিজেব হাতে সাইনবোর্ড নক্সা কবতে বসল। দোকানেব নাম শুনে তখন হেসে বাঁচেনি কাজললতা, দু'জনাব ঘব—মাথায আসেও।

সেই সাইনবোর্ড শেষ হতে চোখে পলক পড়ে না কাজললতাব। মাঝখানে বড বড লাল আগুনেব হবপে দোকানেব নাম—আব দু'মাথায দাঁড়িযে পবস্পবেব দিকে চেযে আছে একজন মেযে আব একজন পুরুষ। মুচকি হেসে বাধাকান্ত মেযেটাকে দেখিযে বলেছিল, তোমাব মুখেব আদল এনে দিলাম।

শোনাব পব কাজললতাব মনে হচ্ছিল সেই বকমই যেন। খুশিতে আনন্দে তাগিদ দিযেছিল, ওই লোকটাব মুখও বদলাও। বাধাকান্ত বলেছে, দোকানে কেউ ঢুকবে না তাহলে।

দোকান হযেছে। স্টেশনাবি আব ছোটখাট হোসিযাবী মিলিযে একসঙ্গে দোকান। এই সঙ্গে নৈমিত্তিক ঘব-কন্নাব সামগ্রীও কিছু বেখেছে। দোকান কবতে বসে বাধাকান্তব নেশা চেপে গেল যেন। কম কবে আবো হাজাব দেড়েক টাকা চাই— চাই-ই। এবাব স্ত্রীকেই পবামর্শ দিল, টাকাটা বটুকেব কাছ থেকে ধাব পাবাব চেষ্টা কবতে। নিজে চাইলে দেবে কিনা সন্দেহ, কিন্তু কাজললতা চাইলে নিবাশ কববে না হযত। যেমন কবে হোক যোগাড কবে দেবে।

দিল। ধাব কবেই এনে দিন নাকি। বলা মাত্র এত টাকা ধাব পায যে, তাব ওপব কাজললতাব একটু শ্রদ্ধা বাড়াও স্বাভাবিক। দোকান চলতে লাগল। কাজললতাও যখন দোকানে কাজ কবাব প্রস্তাব দিল, বাধাকান্তব খুশি ধবে না। লোক তাহলে আব একজনেব বেশি বাখতেই হবে না—আব স্বামী-স্ত্রী দু'জনে দোকান চালাচ্ছে, এই বৈচিত্র্য যে লোক টানবে তাতে তাব একটুও সন্দেহ ছিল না।

ছ'টা মাস এই এক নেশাব মধ্যেই কেটে গেল। কিন্তু টাকায টান পড়ছেই। দোকানেব টাকা ভেঙেই খেতে হচ্ছে। দোকান বড কবতে হলে আবো টাকা চাই। ওদিকে বটুকেব কাছ থেকে আব টাকাপযসা দূবেব কথা, আভাসে ইঙ্গিতে আগেব টাকাই ফেবত চাইছে সে। যাব কাছ থেকে টাকা এনে দিযেছিল সে তাগিদ দিচ্ছে।

ইদানীং বটুককে একটু খাতিব কবেই চলছে বাধাকান্ত। কাজললতাও। লোকটা উপকাব তো কম কবে না। ফাঁক পেলে দোকানে এসে দাঁড়ায, সাহায্য কবে। সেই লোক টাকাব কথা বলতে বাধাকান্ত বিপদ গনল। আবাবও স্ত্রীকেই পবামর্শ দিল, ওকে একটু বুঝিযে সুজিযে ঠাণ্ডা বাখতে।

বোঝাতে গিযে তাকে চোখই বাঙাল কাজললতা, এখন টাকা চাইছেন মানে। টাকা দেব কোত্থেকে? উল্টে আবো টাকাব যোগাড দেখুন। বটুক হেসেছে একগাল। বলেছে, তুমি বললে তাও পাবি না এমন নয।

এদিকে দোকান কবাব নেশা কাজললতাব অন্তত কমে আসছিল একটু একটু কবে। আব সেটা যে ঠাট্টা-ঠিসাবায কমিযে আনছিল বটুকই, সেটা তখন অন্তত মনে হযনি। এই দোকান কবাব ফাঁকে লোকটা আপন মনেব মত আবো অনেক কাছে এসে গেছে। বাধাকান্ত মাল সংগ্রহেব কাজে বেবোয, দোকান চালায তখন বটুক আব কাজললতা। বটুক নিজেব কাজ কামাই কবে প্রাযই। তাব সঙ্গে দাঁড়িযে হাসি-আনন্দেব মধ্যে দোকান

চালাতে ভালই লাগে কাজললতাব। ফাঁক পেলে বটুক সিনেমাব মজাব মজাব গল্প শোনায তাকে। বিশেষ কবে আর্টিস্টদেব গল্প। কাঁচা নোট কিভাবে ছডিযে পডে আছে সেখানে, সেই গল্প। একস্ট্রা আর্টিস্টকে ইচ্ছে কবলেই সে নাকি এখন দিন পিছু দশ টাকাব জাযগায কুডি টাকাও পাইযে দিতে পাবে।

শুনে কাজললতাব বুকেব ভিতবে দোলা লাগে। তাবপব দীর্ঘনিঃশ্বাস পডে।

এদিকে বাধাকান্তব ওপব টাকাব চাপটা শিথিল কবল না সে। অপব দিকে সময বুঝে কাজললতাকে জানিযে বাখল, অবুঝ লোকটাকে বশে আনাব জন্যেই তাব এই কাবসাজি। চাপে পডে কাজললতাকে একটু স্বাধীন হতে দিলে সে-ই কাঁডি কাঁডি টাকা এনে দিতে পাবে। স্বাধীন হতে দিলে। কথাটা কোথায গিযে যে স্পর্শ কবেছিল, কাজললতা জানে না। তাব মনে হতে লাগল, বিযেব পব থেকেই আষ্টেপৃষ্ঠে সে এক অবুঝ শাসনেব শিকলে বাধা।

সেই থেকে মন্ত্রণা শুরু। বটুক আবো বেশি কবে ধাব শোধেব চাপ দিলেও তাব আপত্তি নেই। তাকে স্বাধীন হতে দিলে টাকা বোজগাব কবে সে তো এই দোকানেই ঢালবে—দোকান ফাপিযে তুলবে। তাছাডা যে স্বাধীনতাব স্বপ্ন সে দেখছে, তাব কাছে এই দোকানও একটা পিঞ্জবেব মত।

তাব এই স্বপ্নেব ঘোবে কতখানি এগিযে এসেছিল বটুক, কাজললতা দেখেও দেখতে চাযনি। তাব হাতে কাধে হাত বাখলে কাজললতাব মুখ লাল হযেছে। বটুক অমনি টিপ্পনী কেটেছে, থাক, আব ছবিতে নেমে কাজ নেই।

তাবপব সেই একদিন ।

শনিবাব। দোকান তাডাতাডি বন্ধ হবে। বাধাকান্ত দেশে গিযেছিল যদি আব কিছু টাকা সংগ্রহ কবতে পাবে। দেশে তখনো তাব দখলে মজা পুকুব ছিল একটা। সেদিন ফিবতেও পাবে, না-ও পাবে। ফেবে যদি অনেক বাতে ফিববে।

কিন্তু আসলে বাধাকান্ত যে কোথাও যাযনি, সেটা এবা কেউ জানত না। যথাসমযে দোকানেব লোহাব দবজা টেনে দেওযা হযেছে। কালো ভাবী ক্যানভাসেব পবদাটাও। দু'জনে ঘেষাঘেঁষি দুটো টুলে মুখোমুখি বসে তন্ময হযে জল্পনা-কল্পনা কবছে। কেমন কবে ঘবেব অবুঝ লোকটাকে বোঝানো যায? কি কৌশলে কাজললতা এটুকু স্বাধীনতা আদায কবতে পাবে? তাব একটা হাত বটুকেব হাতেব মুঠোয। সন্ধ্যা কখন পেবিযে গেছে খেযাল নেই।

কখন লোহাব গেট সবেছে, কখন পুরু ভাবী পবদাটা নডেছে তাবা টেবও পাযনি। পাবে কি কবে, উঁচু কাউন্টাবেব ওধাবে ওদিক ফিবে দুটো নিচু টুলে বসে দু'জনে।

.তবু ষষ্ঠ চেতনা বলে আছে কিছু বোধহয।

কাজললতা মুখ ফিবিযে তাকিযেছে একসময।

পবক্ষণে ভযে বিবর্ণ পাণ্ডুব একেবাবে। দুজনেই। কাউন্টাবেব ওধাবে বাধাকান্ত দাঁডিযে।

কিন্তু কাজললতা কি দেখেছিল সেই চোখে? আব সঙ্গে সঙ্গে কি মনে পডেছিল তাব?

মৃত্যুব আঘাতে স্তব্ধ পশুব শেষ অব্যক্ত যাতনা আব অব্যক্ত হিংসা যেন গলে গলে পডতে দেখেছে ওই দুটো চোখে। আব সঙ্গে সঙ্গে মনে পডেছে সেই জ্যোতিষীব কথা—খুন কবে ফাঁসীকাঠে ঝোলাব কথা।

কেমন কবে দোকান থেকে তাব সামনে দিযে বেবিযে এসেছিল কাজললতা জানে না। আব কি কববে এখন, তাও জানে না।

চমকে ফিবল।...বটুক। প্রায সঙ্গে সঙ্গেই বেবিযে এসেছে।

তাবপব...

হ্যাঁ, তাবপব দূবে অনেক দূবে পালিযে আসাব পব, পবপুরুষেব লোলুপ হিংস্র বীভৎসতা, আব নির্দয নগ্ন অত্যাচাবই দেখেছে সে। গা-ঢাকা দিযে থাকা দবকাব বুঝিযে বটুক পাকিস্তান বর্ডাবে এনে ফেলেছিল তাকে। সময আব সুযোগ বুঝে তাদেব ফেবাব কথা।

কিন্তু ফিবেছিল কাজললতা একাই। খুব সঙ্গোপনে। বটুকেব চোখে ধূলো দিযে। ..বটুকেব নেশা কেটেছে। কুৎসিতদর্শন লুঙ্গিপবা লোকেব সঙ্গে গোপনে সলাপবামর্শ কবতে দেখেছিল তাকে কাজললতা। তাব মতলব বুঝেছিল। সেই দিনই পালিযেছিল।

সাত দিন হয কলকাতায ফিবেছে। তাকে আশ্রয দিযেছে প্রায অন্ধ এক বুডী। ট্রেনে যোগাযোগ তাব সঙ্গে। সে তাকে আশ্বাস দিযেছিল, কলকাতায কোনো বাডিতে কাজ জুটিযে দেবে একটা। বুডীব কোথাও কেউ নেই তেমন—বোনপোব কাছে এসেছিল। কলকাতায দু'তিনটে বস্তি-ঘব ভাডা খাটায সে।

কলকাতায এসে কাজললতা জ্বলজ্বলে সিঁদুবেব টিপ কপালে পবতে শুরু কবেছে। শুধু পুরুষেব কবল থেকে আত্মবক্ষাব তাগিদে, তাদেব কৌতহলেব তাডনা থেকে নিজেকে বাচানোব দাযে। কপালেব এই জ্বলজ্বলে সিঁদুব একটা জোবালো নিষেধেব কাজ কবছে শুধু। সত্যমিথ্যেয বুডীমাকে কি বুঝিযেছে সে ভালো মনে নেই। কপালে অমন টকটকে সিঁদুব দেখে সে বলেছিল, আহা, দেখে চোখ জুডিযে গেল, বেঁচে থাক মা। এই সিঁদুবেব টানেই মবদটা একদিন ফিবে আসবে দেখিস।

দিনে দিনে খুশি উপচে উঠছে নন্দ ঘোষেব। সে যে এমন একজনকে দোকানে লাগিযেছে, ভাবতেও পাবেনি। দোকানটাকে নিজেব বলে ভাবতে পাবে বটে মেযেটা। সকালে সকলেব আগে এসে নিজেব হাতে ঝাটপাট দেয, তাবপব খুঁটিনাটি যাবতীয কিছু ঝেডে মুছে তকতকে কবে তোলে।

অন্য মেযেদেব কাবো গাফিলতি দেখলে সত্যি সত্যি বেগে যায, বকাবকিও কবে। কাউকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখলেও যেন তাব চোখ টাটায।

চাবটে মাস না যেতে দোকানেব আসল মালিক যে কে, এই ভুল হবাব দাখিল অন্য কর্মচাবী আব কর্মচাবীণীদেব। তা'ছাডা নন্দ ঘোষকে সে পবামর্শও দেয, এই করুন, এইসব জিনিস দোকানে এনে বাখুন। নন্দ ঘোষ তাব প্ল্যানমত কাজ কবে দেখেছে, লাভ বই লোকসান হচ্ছে না। দোকানেব এতটুকু ভালোব জন্যে এত উদবেগ আব এমন উদ্দীপনা দেখে নন্দ ঘোষ যথার্থ অবাক হযেছে এক এক সময। পবীক্ষা কবাব

জন্য ক্যাশেব ভাবও ছেড়ে দিযে দেখেছে এক-একদিন। দিযেছে বটে, কিন্তু চোখ ঠিকই বয়েছে। একটা নযাপযসাও গবমিল হয়নি। নিজেব জিনিস নিজের চুবি কবাব যেমন কথা ওঠে না, এ যেন তেমনি। ওদিকে খদ্দেবও বাডছেই।

তিন মাসের মধ্যেই নন্দ ঘোষেব ভালো লাগতে শুরু কবেছে। এই ভালো লাগাটা দিনে দিনে স্পষ্ট হযে উঠতে লাগল। কাজললতা তা ভালো কবেই টেব পেল। কিন্তু কিছু যায আসে না যেন। কাজললতা শুধু এই দোকানটাকেই বড কবে তুলতে চায —আব সব কিছু ভুলতে চায। দিনকে-দিন এই শুধু এক নেশাব মত পেযে বসছে তাকে। লোকটা দুর্বল হলে যদি তাব কর্তৃত্ব বাড়ে, আব আবো বেশি নিজেব বলে ভাবতে পাবে দোকানাটাকে—তাব একটুও আপত্তি নেই। দোকান বড কবে তুলে কাজললতা যেন অদৃশ্য কাবো ওপব প্রতিশোধ নিচ্ছে আব প্রাযশ্চিত্ত কবছে।...আব পবপুরুষকে প্রশ্রয দেওযা? এখনো কপালেব সিঁদুব তেমন কবে লোকটাকে কাছে ঘেঁষতে দেযনি বটে, কিন্তু পব বলে সত্যিই কিছু আছে নাকি এখনো?

কাজললতা শুধু দোকানটাকে আকাশছোঁযা বড কবে তুলতে চায, আব কিছুই চায না। একটু প্রশ্রয না পেলে লোকটা সে সুযোগ দেবেই বা কেন তাকে? এক একসময চমকে ওঠে কাজললতা, তাব কি মাথাখাবাপ হল? নইলে মালিকেব আসনেব ওই লোকটাকেসুদ্ধু সময সময বাধাকান্ত বলে ভাবতে চেষ্টা কবে কেন? কেন ভাবতে ইচ্ছে কবে, যা ঘটে গেছে তাব সবটাই একটা দুঃস্বপ্ন ছাডা আব কিছু নয?

ক্রমশ কাছে এগিযে আসছে নন্দ ঘোষ। দোকানেব উন্নতি প্রসঙ্গে আলোচনাব ছলে, দোকানেব নানা সমস্যা নিযে আলাপেব ছলে। এই আলাপ চলে দোকানে যখন আব তৃতীয কেউ থাকে না, তখন। দোকান বন্ধ হবাব পবেও দোকান নিযে মাথা ঘামায দু'জনে বসে।

নন্দ ঘোষেব মাথা গবম হতে থাকে, হৃৎপিণ্ড লাফালাফি কবতে থাকে, চোখেব দৃষ্টি বদলাতে থাকে।

সেদিন শুক্রবাব। একটা মেযেব চাকবি চলে গেল। ঠাবেঠোবে মেযেগুলো প্রাযই হাসাহাসি কবত। সেই মেযেটা সেদিন মুখে মুখে তর্কই কবল কাজললতাব সঙ্গে। বলল, তুমি দোকানেব কে যে কথায কথায চোখ বাঙাও?

কে সেটা তক্ষুনি তাকে বুঝিযে দিল নন্দ ঘোষ। পাওনাগণ্ডা মিটিযে পত্রপাঠ বিদায কবল তাকে।

পবদিন শনিবাব।

তিনটেয দোকান বন্ধ। বন্ধ হল। কাজললতা আব নন্দ ঘোষ ছাড়া আব সকলে চলে গেল। লোহাব গেট প্রায সবটাই টেনে দেওযা হল, ভাবী কালো পর্দা পড়ল।

একটু বাদে নন্দ ঘোষ বেবিযে খাবাব নিযে এলো দু'জনেব জন্য। প্রতি শনিবাবে দোকান বন্ধ হলে কম কবে ঘন্টা দুই ধবে দোকানেব জিনিসপত্র নতুন কবে সাজায

কাজললতা, গোছগাছ করে। নন্দ ঘোষ ততক্ষণ অপেক্ষা করে আর দেখে চেয়ে চেয়ে। তারপর একসঙ্গে খায় দু'জনে বসে।

খাওয়া শেষ হল। কাউন্টারের ওধারে ছোট টুলে মুখোমুখি বসে একসঙ্গে গোটাপাঁচেক সমস্যার ফিরিস্তি দিল কাজললতা। নিজেই আবার সমাধানের রাস্তা খুঁজতে লাগল। কারণ নন্দ ঘোষ বেশির ভাগই চুপ। চেয়ে আছে। দৃষ্টিটা ঘোলাটে হয়ে উঠেছে।

কাজললতার হঠাৎ খেয়াল হল, তার একখানা হাত লোকটার হাতের মুঠোয় চলে গেছে কখন। ওদিকে সন্ধ্যাও কখন পার হয়ে গেছে।

কাজললতার দু'চোখ তার মুখের ওপর থমকালো।

তুমি অত বড় সিঁদুরের টিপ পরো কেন? অস্বস্তি বোধ করে বলেই বোধহয় কথা কটা বেরুল নন্দ ঘোষের মুখ দিয়ে।

কাজললতা জিজ্ঞাসা করল, ছোট করতে হবে?

নন্দ ঘোষের মুখের দিকে চেয়ে আছে শুধু। জবাব দিয়ে উঠতে পারল না। করলে খদ্দেরদের কাছে দোকানের বৈচিত্র্য নষ্ট হবে কিনা ভেবে পেল না।

চেয়ে আছে কাজললতাও।

সচকিত হয়ে হঠাৎ বিষম চমকে উঠল দু'জনেই। কাউন্টারের ওধারে দাঁড়িয়ে আছে কে।

কে— কাজললতা চিনল না। একটি বউ...কপালে সিঁথিতে সিঁদুর, কোলে একটি ফুটফুটে ছেলে। কিন্তু এ কি দেখছে কাজললতা? এরকম আর করে দেখেছিল?

...মৃত্যুর আঘাতে স্তব্ধ পশুর সেই শেষ অব্যক্ত যাতনা আর সেই অব্যক্ত ক্রুর হিংসা যেন গলে গলে পড়ছে এই দুই চোখেও। ঠিক যেমন দেখেছিল রাধাকান্তর চোখে।

বিমূঢ় মুখে নন্দ ঘোষের দিকে ফিরতেই কাজললতা বুঝতে পেরেছে ছেলে কোলে বউটি কে। সঙ্গে সঙ্গে নির্বাক পাথর যেন কাজললতা।

সামলে নিয়ে নন্দ ঘোষ রূঢ় কর্কশ গলায় চিৎকার করে উঠল প্রায়, তুমি এখানে কেন? যাও—যাও বলছি, এখুনি যাও এখান থেকে।

কোলের ছেলেটা ভয় পেয়ে কেঁদে উঠল। বউটির দুই চোখের গলিত ঘৃণা একটা ঝাপটা মারল নন্দ ঘোষের মুখের ওপর। তারপর সেই অব্যক্ত যাতনায় কাজললতার সর্বাঙ্গ আর একবার ঝলসে দিয়ে যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি চলে গেল সে।

নন্দ ঘোষ শুকনো গলায় জোর এনে আস্ফালন করল, বাড়ি গিয়ে আমি দেখাচ্ছি ওকে মজা! নিশ্চয় চাকরি গেছে বলে দোকানের ওই নচ্ছার মেয়েটা পিয়ে লাগিয়েছে।

কাজললতা কাঠ।

পরদিন থেকে কেউ আর তাকে দেখেনি। আবারও সার জেনেছে কাজললতা, তৃতীয় মানুষ এলে দু'জনার ঘর টেঁকে না।

ফেরারী অতীত

তখনো ভালো কবে ফর্সা হযনি, বিশ হাত দূবে চোখ চলে না। কামবাব মধ্যে বেশ একটা গুঞ্জন উঠতে বামকৃষ্ণবাবুব ঘুম ভেঙে গেল। সামনে পাশে পিছনে ফটাফট জানলা খোলাব শব্দ।

পামবান ব্রিজ আসছে। গাড়িব গতি কমেছে। ওই ব্রিজ পাব হলে খানিকক্ষণেব মধ্যে বামেশ্ববম—সাদা বাংলায বামেশ্বব। যাত্রীদেব এই ব্রিজ সম্পর্কে একটু বাড়তি আগ্রহেব কাবণ আছে। এই সেতু পেরুলে মহামোক্ষ ক্ষেত্র। সেতুব এধাবে বন্ধন ওধাবে মুক্তি। ওই সেতু উত্তবণেব আগে পার্থিব জগতেব যা-কিছু সব ওধাবেই ফেলে এসো।

ক'জন সত্যিই তাই আসে বামকৃষ্ণবাবু জানেন না। তবু নির্লিপ্ত মুখে তিনিও সামনেব জানলাটা খুললেন। ট্রেন ব্রিজে উঠলেই অনাবকম শব্দ। এদিকেব সবই ছোট লাইনেব ছোট ট্রেন। তা সত্ত্বেও ব্রিজে ওঠাব আগে থেকেই গাড়িটাব শম্বুকগতি একেবাবে। এটা কোনো নিবাপত্তাব কাবণে কি যাত্রীদেব সুবিধার্থে বামকৃষ্ণবাবু জানেন না।

আবছা অন্ধকাব ভেদ কবা একটা একাগ্রতা নিযে দেখতে লাগলেন তিনিও। শতসহস্র সেতুব মতোই একটা। তবে নীচে নদীব বদলে সমুদ্র—সমুদ্রেব ফালিও বলা যেতে পাবে সেতুটা বিশাল বটে, অনেকক্ষণ লাগল পাব হতে। কামবাব মধ্যে মেযে-পুরুষদেব সমদ্রে পযসা ফেলাব হিড়িক পড়ে আছে। লোভ কাম মোহ মাৎসর্যেব প্রতীক দু'নযা তিননযা পাঁচনযা দশনযা সিকি আধুলি বিসর্জন দিযে মুক্ত মন নিযে মহাধামে পদার্পণেব প্রেবণা কিনা এটা বামকৃষ্ণ চক্রবর্তী জানেন না। একটি মহিলাব তাব দেড বছবেব শিশুকে দিযেও সমুদ্রে পযসা ফেলাব উদ্দীপনা লক্ষ্য কবে নিজেব মনেই হেসেছেন।

বামেশ্ববে গাড়ি থামল যখন, চাবদিক বেশ পবিষ্কাব। যাত্রীদেব নামাব তাড়ায ব্যাঘাত না ঘটিযে বামকৃষ্ণবাবু অপেক্ষা কবলেন খানিক। তাব কোন তাড়া নেই। তিনি তীর্থ কবতে আসেননি। কোনো মানত নিযেও আসেননি। এখানে এক দিন থাকবেন কি তিন দিন নিজেও জানেন না। ভালো লাগলে দু'তিন দিন কাটাবেন, না লাগলে আবাব বেবিযে পড়বেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত ভালই লাগছে তাঁব। জীবনেব এই প্রৌঢ় প্রহবে থার্ড ক্লাস কামবাব সর্বসাধাবণেব মধ্যে নিজেকে ছড়িযে দিতে পেবে বেশ একটা বৈচিত্র্যেব স্বাদ উপভোগ কবছেন। এদেব কেউ তাকে চেনে না, কেউ জানে না, কেউ ঈর্ষা কবে না, কেউ তোষামোদ কবতেও আসে না। নামেব মোহ, নামেব যশখ্যাতি, প্রতিপত্তিব শেকল থেকে একটা মুক্তিব স্বাদ যে এভাবে অনুভব কবা যায় —বামকৃষ্ণবাবু দীর্ঘদিনেব আবাম-ঘবে বন্দী থেকে সেটা যেন ভুলতেই বসেছিলেন। ...বাড়িব গাড়িতে মেযে আব ছোট ছেলে সঙ্গে হাওড়া স্টেশনে এসে মাদ্রাজ মেলেব ফার্স্ট ক্লাস বিজার্ভ কামবায তুলে দিযে গেছল। বড আব সেজ ছেলে খুঁতখুঁত কবছিল —এযাব কনডিশনে গেলেই ভালো হত। তিন বউমা বেশাবেশি কবে যাত্রাব সুব্যবস্থায উঠে-পড়ে লেগেছিল। কিন্তু বামকৃষ্ণবাবু শেষ পর্যন্ত একটা হোলড অল আব ছোট সুটকেস ভিন্ন আব কিছুই নিতে বাজি হলেন না দেখে তাবা মুখ চাওযাচাওযি কবেছে।

শ্বশুবেব একটু বিবাগী মনোভাব লক্ষ্য কবে ভিতবে ভিতবে যেন উতলা হয়েছে তাবা। ফার্স্ট ক্লাস থেকে বেবিযে থার্ড ক্লাস কামবায এ-ভাবে ঘুবে বেডাচ্ছেন তিনি, জানলে তাদেব চোখগুলো কপালে উঠত। মেযে বাব-বাব কবে বলে দিযেছে, দুদিন পবে পবে একখানা কবে চিঠি দেবে বাবা, নইলে ভযানক দুশ্চিন্তায থাকব। বড বউমা বলেছিল, ঠিকঠিক খবব না পেলে কিন্তু আপনাব ছেলে কাজকর্ম ফেলে মাদ্রাজ ছুটবে। তখন অন্য বউমাদেব দিকে চেযে বামকৃষ্ণবাবুব মনে হযেছে— এ-বকম কথা ওদেবও বলাব ইচ্ছে ছিল।

...মাদ্রাজে পৌঁছে তিনি টেলিগ্রামে পৌঁছানো-সংবাদ এবং কুশল সংবাদ দিযেছেন। তাবপব সাতদিনেব মধ্যে অনির্দিষ্ট পর্যটনে বেবিযে পডাব আগে তাদেব চিঠি লিখে জানিযেছেন, এত ভালো আছি যে এক জাযগায আব বসে থাকতে ভালো লাগছে না। বেবিযে পডছি, কখন কোথায থাকব এবপব ঠিক নেই, নিযমিত চিঠিপত্র না পেলে একটুও চিন্তা কোবো না।

...দেখলে কেউ বলবে না বামকৃষ্ণবাবুব বযেস এখন সাতান্ন। শবীব শক্ত মজবুত এখনো। চুলেব তলায তলায কিছুটা পাক ধবেছে, একটা দাঁত নডেনি বা পডেনি। এখন তাব পোশাক ঢোলা পাজামা আব ঢোলা বঙিন পাঞ্জাবি। এই পোশাকে বযেস আবো কম দেখায। এ-ভাবে বেবিযে পডাব পব বামকৃষ্ণবাবু যেন একটা ভাবী মহার্ঘ্য জিনিস ফিবে পেযেছেন। সেটা তাঁব যৌবন আব যৌবনস্মৃতি। শক্তসমর্থ লোকেব মতোই ঘোবাফেবা কবছেন—কাবো মুখাপেক্ষী নন, সম্পূর্ণ নিজেব ওপব নির্ভবশীল। ..দীর্ঘদিন ধবে এই আত্মপ্রত্যযটুকুই তিনি খুইযে চলেছিলেন। ছেলেমেযে বউমা নাতি নাতনী পবিবৃত হযে তিনি যেন অকালে বুডিযে যাচ্ছিলেন। বেশ একটা খোশ-মেজাজেব জবা নেমে আসছিল তাঁব ভিতবে বাইবে।

...প্রত্যযেব এই নতুন স্বাদে ভবপুব হযে স্ত্রীব কথাও চিন্তা কবেছেন বইকি। আজ পাশে সে— শুধু সে থাকলে বেশ হত। স্ত্রীব বেডাবাব ঝোকও ছিল। কিন্তু বামকৃষ্ণবাবু তখন সাফল্যেব ভবা জোযাবে ভাসছেন, এই জোযাব থেকে কেউ তটে এসে বিবাম চায না।

গাডি ফাঁকা। যাত্রীবা সব নেমে গেছে।

বামকৃষ্ণবাবু উঠলেন। কুলীব মাথায হোলড-অল আব ছোট সুটকেস তুলে দিযে প্রথমে বেলওযেব বিটাযাবিং রুমেব সন্ধানে এলেন।

সিঙ্গল রুম ভাডা হযে গেছে, ডাবল রুমেব ভাডা বেশি—সেটা খালি আছে। বামকৃষ্ণবাবু সেটা বুক কবে মালপত্র বেখে নিশ্চিন্ত।

বামেশ্ববে এসে সমুদ্রস্নান না কবলে আসাটাই অসমাপ্ত। পুণ্যেব লোভ না থাকলেও সমুদ্রস্নানেব ইচ্ছে আছে বামকৃষ্ণবাবুব। মুখ-হাত ধোওযা চা-খাওযা ইত্যাদিব পব গামছা আব নতুন একপ্রস্থ পাজামা পাঞ্জাবি কাঁধে ফেলে বেবিযে এলেন। বামেশ্ববেব মন্দিব এবং স্নানেব জাযগা কাছাকাছি। স্নান সেবে মন্দিবে পূজো দেওযাব বিধি।

টমটমে কবে স্নানেব বাঁধানো চাতালেব সামনে নামলেন। স্টেশন থেকে তিন কোযার্টাব মাইল পথ হবে—বোদ চডা তখন।

এ-সময় সমস্ত মানুষেবই গন্তব্যস্থান ওই একটি। টমটম থেকে নামতেই দু'জন পাণ্ডাব চেলা দু'দিক থেকে এগিয়ে এলো। এদিকেব পাণ্ডাব সঙ্গে তাদেব তফাৎ হল তাবা বিনীত বেশ। বামকৃষ্ণবাবু মাথা নাড়লেন, পাণ্ডাব দবকাব নেই। একটু চেষ্টা কবে একজন সবে গেল, আব একজন ছোকবা কিন্তু লেগেই থাকল। সে আবাব জামা জুতো বাখাব ভাব নেবে, পূজোব সব ব্যবস্থা এবং দর্শনাদি কবিয়ে দেবে, এমন কি আজকেব বিশেষ পুণ্যদিনে ওই যে মাতাজী এসেছেন বামঝবক্কা থেকে, তাঁবও দর্শনলাভেব এবং আশীর্বাদলাভেব ব্যবস্থা কবে দেবে।

সমুদ্রেব ডানদিক ঘেঁষা উঁচু বিশাল বাঁধানো চাতালেব একদিকে হাততুলে দেখালো সে। সেখানে দস্তুবমতো মেয়ে-পুরুষেব ভিড। অর্থাৎ মাতাজীব দর্শন এবং আশীর্বাদ লাভ কবছে তাবা।

বামকৃষ্ণবাবু মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ কিছুবই দবকাব নেই। কিন্তু লোকটা নাছোড। সবিনয়ে বলতে লাগল, দেবস্থানম-এ এসেও ছেলেমেয়েব কল্যাণেব জন্য পূজো দেবে না এ কেমন কথা বাবুজী— ভগবানেব কাছে ডালি দাও, ছেলেপুলেব ভালো হবে।

এইবাব বামকৃষ্ণবাবু থমকালেন। ছেলেমেয়েব কল্যাণ তিনি চান, মঙ্গল চান। পূজো দিলে কতটুকু কল্যাণ বা মঙ্গল হবে জানেন না, কিন্তু না দিলে ক্ষতি হবে কিনা কে জানে। আধ্যাত্মিকতা নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাননি, কোথায় কি আছে, কোন জায়গাব কি স্থানমাহাত্ম্য কে জানে? কাতাবে কাতাবে লোক সমুদ্রে স্নান কবছে, সকলেই তাবপব পূজো দেবে। কিছুই যখন জানেন না কি হয়, আত্মাভিমান নিয়ে বিচ্ছিন্ন থাকাব দবকাব কি? তাছাড়া এখানে কে চিনছে, কে জানছে তাঁকে? পবে ছেলেমেয়েদেবও জানাব দবকাব নেই এই আত্মপ্রসাদ থেকে নিজেকে বঞ্চিত কবাব দবকাব কি?

চেলাব হাতে জামাকাপড জিম্মা কবে কোমবে গামছা জড়িয়ে তিনি সমুদ্রে নামলেন। তাব আগে ঘাড ফিবিয়ে দেখে নিলেন, পাণ্ডাব চেলা তবতব কবে ওই বাধানো উঁচু চাতালে উঠে গেল। মন্ত্র-মোক্ষদাতাবা সব ওখানেই বসে।

অনেকক্ষণ ধবে চান সেবে উঠে এলেন। নুন-জলে গা চটচট কবছে। ঘবে ফিবে আবাব একদফা চান কবতে হবে। কিন্তু খুব তাজা লাগছে এখন, আব বয়েসটা যেন আবো কম ঠেকছে নিজেবই।

ডালি হাতে পাণ্ডা চাতালেব ওপব দাড়িয়ে। ভিজে জামাকাপড বদলানোব নামে সে ঘনঘন মাথা নাড়লে। সিক্তবস্ত্রে পূজো দেওয়াব বিধি। বলল, চাতালেব ওই পুবোহিতেব কাছে মন্ত্রপাঠ শেষ কবে মন্দিবে যেতে হবে। তাবপব দ্বাদশ কুণ্ডব মিঠে জলে স্নান কবে দর্শন ও পূজো শেষ কবতে হবে।

মিঠে জলেব স্নান ছাড়াও নিজেব সহিষ্ণুতা যাচাইয়েব ইচ্ছেও হল। নেমে গেছেন যখন বামকৃষ্ণবাবু—সব ঠিক আছে।

এগাবোটি টাকা আগে গুনে দিয়ে পুবোহিতেব সামনে আসনে বসলেন। পুবোহিত জিজ্ঞাসা কবলেন, কাব কল্যাণে পূজো?

একটু ভেবে বামকৃষ্ণবাবু তিন ছেলে আব মেয়েব নাম কবলেন। মনে মনে তাদেব সুমতি প্রার্থনা কবলেন। পুবোহিতেব সঙ্গে মন্ত্র আওড়ে যেতে চেষ্টা কবলেন।

কিন্তু এটুকু সময়েব মধ্যেই বিমনা হয়ে পড়লেন। ছেলেদেব, মেয়েব, বউমাদেব একে একে সকলেব মুখগুলো চোখে ভাসল বামকৃষ্ণবাবুব—আব কিছু না চেয়ে শুধু সুমতি চাইলেন কেন?

না, বাইবেব আচবণে কোনদিন কাবো ওপব বিরূপ হননি বামকৃষ্ণবাবু। কিন্তু চাপা খেদ বা ক্ষোভ একটু ছিল বইকি। নিজেব স্ত্রীব মেজাজপত্র খুব ভালো ছিল না। হয়তো একটু অল্পেতেই বেগে যেতেন। কিন্তু বামকৃষ্ণবাবু ঠিকই অনুভব কবতেন ছেলেবা বা বউমাবা তাদেব মা বা শাশুড়ীব ওপব তুষ্ট ছিল না খুব। ওদেব আচবণে আঘাত পেয়ে স্ত্রীকে অনেক সময় স্তব্ধ দেখেছেন। ছেলেদেব অথবা ছেলেব বউদেব কিছু বলতেন না, স্ত্রীকেই বোঝাতে চেষ্টা কবতেন। কিন্তু মনেব ব্যথা মনেই চাপা থাকত।

শাশুড়ীব পবে কর্তৃত্বেব হাত-বদল হয়েছে। ছেলেবা চোখ বাখে তাঁব ওপব, বউমাবা যথাসাধ্য সেবা-যত্ন কবে, মেয়ে একদিন অন্তব একদিন এসে বাপেব খবব নেয়। তবু সে-সবেব কোনো তাপ যেন বুকেব তলায় স্পর্শ কবে না। উল্টে টুকবো টুকবো এক-একটা ব্যাপাব মনে পড়লে হাসি পায়। কিন্তু সে-হাসি খুব সুখেব নয়। .. বাড়িটা তিন ছেলেব নামে লেখাপড়া কবে দেবাব পব মেয়ে-জামাইয়েব মুখ শুকনো-শুকনো মনে হয়েছে। বাড়িটাব দাম ধবে তাব তিন ভাগেব এক ভাগ নগদ টাকা মেয়ে-জামাইয়েব নামে চালান কবাব সময় আবাব ছেলেদেব বা বউমাদেব মুখে তেমন উৎসাহ চোখে পড়েনি।

...গল্প উপন্যাস মিলে কম কবে দেড়শ বই আছে বামকৃষ্ণ চক্রবর্তীব , এই সাতান্ন বছব বয়সেও সম্পাদক আব প্রকাশকদেব তাগিদেব জ্বালায় অস্থিব হতে হয়। সিনেমাব প্রযোজক ও পবিচালকবা এখনো বাড়িতে হানা দেয়। তাঁব লেখা বহু উপন্যাস গল্প এযাবত ছবি হয়ে গেছে—আবো অনেক হতে পাবে। এ ছাড়াও ওই দেড়শ গল্প উপন্যাসেব বইগুলো বেশিব ভাগই সচল এখনো। মাস গেলে মোটা বয়েলটি আসে। এই সব বই কিভাবে ভাগ-বাঁটোয়াবা হবে ছেলেদেব আব মেয়েব মনে সেজন্যে একটু প্রচ্ছন্ন উদ্বেগ আছে মনে হয়। ছেলেবা একবাব হালকা কথাবার্তাব ফাঁকে এই প্রসঙ্গ উত্থাপনও কবেছিল।

হঠাৎ সচকিত বামকৃষ্ণবাবু, পুবোহিতেব মন্ত্র পড়ানো কখন শেষ হয়েছে কে জানে—বাবুকে ভাব-তন্ময় মনে কবে পুবোহিত আব তাব চেলা নির্বাক।

ধড়মড় কবে উঠে দাঁড়ালেন। চাতাল অনেকটা ফাকা এখন। কোণেব দিকেব মাতাজীব সামনে মাত্র পাঁচ-সাতটি মেয়ে পুরুষ দাঁড়িয়ে এখন। বাতাসে তাঁব লালপাড় শাড়িব আঁচল উড়ছে। একটু উঁকি দিলেই বামকৃষ্ণবাবু মাতাজীব মুখ দেখতে পেতেন, কিন্তু সে-বকম কোন আগ্রহ হলো না।

চেলা মন্দিবেব পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। দক্ষিণভাবতে বহু মন্দিব কল্পনাতীত স্থপতিমাহাত্ম্য নিয়ে দাঁড়িয়ে। বামেশ্ববেব মন্দিবও তাব ব্যতিক্রম নয়। এব কবিডবটিই শুনেছি চাব হাজাব ফুট।

পুবী বাবাণসী গয়াধাম ইত্যাদি দ্বাদশ কূপেব চব্বিশ বালতি মিঠে জল তাব মাথায় ঢাললো পাণ্ডাব চেলা। স্বচ্ছ জল, ভালো লাগল। তাবপব সেই ভিজে জামা-কাপড়ে চল্লিশ মিনিট লাইনে দাঁড়ানোব পব দর্শন এবং পূজো শেষ।

গায়ে ভিজে জামা-পাজামা, খালি পা, বাইরে মাটি তেতে আছে, মাথার ওপর সূর্য জ্বলছে। এবারে একটু ক্লান্ত বোধ করছেন রামকৃষ্ণবাবু। চেলার সঙ্গে চাতালে এসে উঠলেন আবার—সেখানেই শুকনো জামা-কাপড়। কোণের মাতাজীর সামনে জনাতিনেক লোক তখন। রমণী এদিকেই চেয়ে আছেন—সিঁড়ি ধরে উঠতে উঠতে রামকৃষ্ণবাবু আড়চোখে তাকালেন একবার—কালোকুলো মুখের একপাশ দেখতে পেলেন। রমণী তাঁর দিকেই চেয়ে আছেন মনে হল, কিন্তু রামকৃষ্ণবাবুর তখন ঘরে ফেরার তাড়া। সোজা চাতালের আড়ালে চলে গেলেন। জামা-পাজামা বদলে ভিজেগুলো হাতে তুলে নেবার আগে একজন স্থানীয় লোক এসে চেলাটির কানে কানে কি বলতেই সে ব্যস্তসমস্ত মুখে চলে গেল।

রামকৃষ্ণবাবু সোজা চাতাল থেকে নেমে এলেন। চেলার প্রাপ্য সে আগেই পেয়েছে। মাতাজীর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে সে কথা বলছে। মাথায় কাপড় তোলা মাতাজীর কালো মুখের একটু আভাস মাত্র পেয়েছেন। তা দক্ষিণভারতে রূপসী রমণীর দর্শনলাভ একটা বিরল ব্যাপার।

বিকেলে আবার বেড়াবার জন্য রাস্তায় নামলেন। পায়ে পায়ে টাঙ্গা আর টমটম ছেঁকে ধরছে—এখানকার যাত্রীদের পাঁচ পা হাটতে দেখলেও ওরা বরদাস্ত করতে চায় না। সমুদ্র বা মন্দিরের দিকে এগোতে মালা-অলা আর শাঁক-অলারাও সঙ্গ নিতে ছাড়ে না।

—রামঝরুক্কা—বাবুজী রামঝরুক্কা চলিয়ে।

কম করে দশটা টাঙ্গাঅলার মুখে এই একই হাকডাক শুনলেন রামকৃষ্ণবাবু। রামঝরুক্কা কি ব্যাপার বোধগম্য হল না।

এক ছোকরা টাঙ্গাঅলাকে জিজ্ঞাসা করলেন, রামঝরুক্কা কেয়া হ্যায়?

সাগ্রহে টাঙ্গা থেকে নেমে এসে ও বলল, রামজীকো চরণ দর্শন হোগা, নসিব হো তো মাতাজী কো গানা ভি শুনিযেগা—আই-এ সাব, বৈঠিয়ে।

উঠে বসেই পড়লেন।

দু'দিকের তেঁতুল সারির মাঝখান দিয়ে সুন্দর পাকা রাস্তা। মাইল তিনেক বাদে রাস্তাটা একেবারে সমুদ্রের সামনে এসে থেমেছে। সামনে একতলা সমান প্রশস্ত বাধানো চাতাল, তার ও-পাশে একতলার মতো সিঁড়ি ভাঙলে মন্দির।

চাতালের সামনে সাইনবোর্ড টাঙানো। সেটা পড়ে হাসিই পেয়ে গেল। জায়গা বা মন্দিরের নাম হল রামজী রুককা। অর্থাৎ সীতা অন্বেষণের পথে রামজী এখানে থেমেছিলেন। এখানে দাড়িয়ে সমুদ্রের অপর প্রান্তে স্বর্ণলঙ্কার দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করেছিলেন।

মন্দিরে উঠলেন। চারদিকে রেলিং-ঘেরা বাঁধানো চাতালের মাঝখানে ছোট মন্দির। সেখানে রামজীর পাষাণ-চরণচিহ্ন। সেই দর্শন সারতে এক মিনিটও লাগে না। চাতালের চারদিকে ঘুরে সমুদ্র দেখাটা সত্যিই লোভনীয়। সেই উদ্দেশ্যে সবে দরজা দিয়ে বেরিয়েছেন—সেখানকার একজন লোক তাঁর কাছে এসে সবিনয়ে জানালো, মাতাজী বোলাতেঁ।

এ আবার কি বিড়ম্বনা রে বাবা। মাতাজী তাঁকে ডাকেন কেন? গানের সমজদার

ভেবেছেন নাকি? চাবদিকে চেযে জিজ্ঞাসা কবলেন, কাঁহা মাতাজী?

মন্দিবেব পিছনটা দেখিযে লোকটা তাঁকে বেলিংঘেবা চাতাল ধবে পিছনদিকে নিযে চলল।

লালপেড়ে শাড়িপবা সকালেব সেই বমণী বসে। সোজা সামনেব দিকে অর্থাৎ সমুদ্রেব দিকে মুখ। পিছন থেকে কালো দেহেব আঁট-বাধুনী দেখে খুব বেশি বযেস মনে হল না মাতাজীটিব। ইনি ওখানে বসে বামকৃষ্ণবাবুব এইস্থানে আগমন টেব পেযে লোকমাবফৎ ডেকে পাঠালেন কি কবে? হযতো আসাব সময দেখে থাকবেন।

—নমস্তে।

—নমস্কাব। বোসো। বলতে বলতে তাঁব দিকে ঘুবে তাকালেন মাতাজী।

সেই মুহূর্তে মাথাব মধ্যে এই পৃথিবীটাই বুঝি উল্টেপাল্টে যেতে লাগল বামকৃষ্ণবাবুব। কিন্তু বাইবে স্থাণুব মতো দাঁড়িযে গেলেন। বিস্ফাবিত চোখে দেখছেন। দেখাব পবেও বিশ্বাস কববেন কি কববেন না জানেন না।. .তেইশ বছবেব একটা মেযেব মুখে চোখে সর্ব অঙ্গে তিবিশটা বছব জুড়ে দিলে কি দাড়ায? কেমন দাঁড়ায? অথচ আশ্চর্য, এঁব সামনে এসে দাঁড়ালে. ভালো কবে একটু তাকালে. তিবিশ বছব আগেব সেই তেইশ বছবেব মেযেকে চিনতে একটুও সময লাগে না। বামকৃষ্ণবাবুবও সময লাগল না। তিনি ফ্যালফ্যাল কবে চেযে বইলেন।

মাতাজী এবাবে খানিকটা ঘুবেই বসলেন তাঁব দিকে। হাসিমাখা স্নিগ্ধ মুখ। .তিবিশ বছব আগে ওই মুখে সৌন্দর্যেব ছিটেফোঁটা ছিল না, আজও নেই। কিন্তু সেদিনও মুখেব হাসিটুকু ভালো লাগত, আজ সেটা স্নিগ্ধ কমনীয লাগছে।

—চিনতে পাবছ না?

দাঁড়িযে থাকাব দরুন মাথাব চুল আবো বেশি উড়ছে বামকৃষ্ণবাবুব। মাথা নাড়লেন।— পাবছেন।

সামনেব ঝকঝকে মেঝে দেখিযে মাতাজী বললেন, তাহলে বোসো —সকালে বামেশ্ববেব ঘাটে দেখাব পব থেকে তোমাব জন্য অপেক্ষা কবছি।

বাহ্যজ্ঞানবহিতেব মতো বামকৃষ্ণবাবু বসলেন। চেযেই আছেন মুখেব দিকে। এভাবে সামনে বসতে. মুখেব দিকে চেযে থাকতে এ-বযসে কোনো দ্বিধা বা সংকোচ থাকাব কথা নয। তাব ওপব ইনি মাতাজী এখানকাব। শ্রীবামচন্দ্রেব চবণদর্শনে যাবা আসছে, অলিন্দ ঘুবে তাবা একবাব মাতাজীকেও দর্শন কবছে—তফাতে দাঁড়িযে দুহাত জুড়ে প্রণাম কবে চলে যাচ্ছে। হযতো তাঁব নির্দেশেই মন্দিবেব ভক্ত দুটি আপাতত কাউকে কাছে আসতে দিচ্ছে না।

মুখেব ওই হাসি এখন আবো অদ্ভুত লাগছে বামকৃষ্ণবাবুব।.. তাঁব থেকে চাব বছবেব ছোট, অর্থাৎ তিপ্পান্ন হবে বযেস এখন। তেতাল্লিশও দেখায না। কালো মুখেব চামড়ায যেটুকু ভাঁজ পড়েছে তাও জরাব দাগ মনে হয না। দুই ঠোঁটেব নিঃশব্দ হাসি দুই গালেব দিকে ছড়িযে ওই ভাঁজেব মধ্যে পড়ে যেন অদ্ভুত চিকচিক কবছে —তাবপব উপচে উঠে চোখেব কালো তাবাব দিকে ধাওযা কবছে। বাতাসে বিশৃঙ্খল হয বলেই হযতো চুলেব বোঝা টান কবে পিছনে এসে গোড়ায শক্ত কবে বেঁধে

বাখা হযেছে। বন্ধনীব নীচে একপিঠ চুল কোমবেব নীচ পর্যন্ত তাণ্ডব জুড়ে দিযেছে। কান দুটো চুলে ঢাকা পডেনি, ওই হাসি যেন শেষে কানেব ডগা পর্যন্ত ছডিযেছে।

খুব হালকা সুবে বললেন, এ জাযগাটাব মাহাত্ম্য আছে, একদিন বামচন্দ্র রুকেছিলেন এখানে, আজ বামকৃষ্ণ রুকলেন।

বামকৃষ্ণবাবু বলতে পাবতেন, বামচন্দ্র সীতা-সন্ধানে এসেছিলেন, বামকৃষ্ণেব কোনো হাবানো-প্রাপ্তিব প্রত্যাশা নেই।

কিছুই বললেন না। চেযে আছেন। দেখছেন।

—বামেশ্ববেব ঘাটে দেখলাম বেশ ধর্মেকর্মে মতি হযেছে।..একবাব ফিবেও তাকালে না।

বামকৃষ্ণবাবু আত্মস্থ কবলেন নিজেকে। এ-বকম বিডম্বনা ভোগ কবাব তাঁব অন্তত কোনো কাবণ নেই। জবাব দিলেন, কলকাতাব শুভা গাঙ্গুলী এখানে মাতাজী হযে বসে থাকতে পাবেন, এটা কোনো কল্পনাব মধ্যে ছিল না—

বমণীব মুখে সেই অদ্ভুত সুন্দব নিঃশব্দ হাসিটা আবো যেন বেশি উপচে পডছে। —তাছাডা চেহাবাটাও ফিবে তাকানোব মতো নয়।

কেন যে হঠাৎ আবাব বিব্রত বোধ কবছেন বামকৃষ্ণবাবু, জানেন না। কোনো একদিন দেখা হলে কৈফিযত তো তাঁবই নেবাব কথা। ঘবে আব একজনকে আনাব পবেও এই এক বমণীকে দীর্ঘদিন ভুলতে পাবেন নি। ভুলবেন কি কবে, নিরুদ্দেশ হবাব পবেও কম কবে তিন চাব বছব বেডিওতে আব বেকর্ডে তাব গান বাজাব কামাই নেই। তাবপব অবশ্য স্বাভাবিক ভাবেই বিস্মৃত হযেছেন।

যে লোকটি তাঁকে মাতাজীব কথা বলে এদিকে নিযে এসেছিল, সে অদূবে এসে দাঁডাল। তাদেব মাতাজী সপ্রশ্ন চোখে তাকাতে সে জানান দিল, টাঙ্গাঅলা বাবুজীকে ডাকছে।

স্পষ্ট হিন্দীতে মাতাজী নির্দেশ দিল, আমাব নাম কবে তাকে বলে দাও অনেকক্ষণ বসতে হবে—বাবু ডবল ভাডা দেবেন। ঠোঁটেব ফাঁকে হাসি ঝুলিযে তাব চোখে চোখ বেখে দেখলেন একটু।—তোমাব তাহলে তিন ছেলে আব এক মেযে এখন?

ঈষৎ বিস্মযে মাথা নাডলেন বামকৃষ্ণবাবু— তাই।

—না, মন্ত্রতন্ত্র কিছু জানি না, যে পাণ্ডাব মাবফত ওদেব কল্যাণে পুজো দিলে তাব কাছে শুনলাম।...তা একা তীর্থে এলে, স্ত্রীকে নিযে এলে না কেন?

—তিনি অনেক বড তীর্থে চলে গেছেন।

মহিলা থমকালেন একটু।—কতদিন আগে?

—বছব দেডেক।

শুভা গাঙ্গুলী ছোট নিঃশ্বাস ফেললেন একটা।—ভাগ্যবতী বলতে হবে। ...ছেলেমেযেদেব সব বিযে-থা হযে গেছে?

মাথা নাডলেন— হযেছে।

—তাবা কেমন?

—ভালো।

—এ বয়সে একলা তোমাকে তীর্থ করতে ছেড়ে দিলে?

—তীর্থে বেরোইনি আমি—মাদ্রাজ থেকে হঠাৎ ঘোরাঘুরির নেশায় পেয়ে বসেছে।

ভিতরটা ভয়ানক উসখুস করে উঠছে রামকৃষ্ণবাবুর। কৈফিয়ত চাইবার সময় আর প্রয়োজন বহুকাল আগে ফুরিয়েছে। এখন শুধু কৌতূহল একটু।. প্রতিশ্রুতি ভুলে, ভবিষ্যৎ ভুলে, গান ফেলে তিরিশটা বছর আগে শুভা গাঙ্গুলী হঠাৎ কার সঙ্গে ওভাবে নিখোঁজ হয়ে গেছল, আর এখন সেই মানুষের খবর কি— ঠোঁটের ডগায় বার বার এই প্রশ্নটাই আসছে শুধু।

তিরিশটা বছর অনায়াসে চোখের সামনে থেকে সরে গেছে রামকৃষ্ণবাবুর। তিরিশটা কেন, তারও ঢের বেশি।

ন'দশ বছর বয়েস থেকেই নিজের কালো কুৎসিত বয়েস সম্পর্কে সজাগ ছিল একটা মেয়ে। তার নাম শুভা—শুভা গাঙ্গুলী। রামকৃষ্ণবাবুর দিদির ভাসুরের মেয়ে। মধ্যবিত্ত অবস্থার মানুষ। সেই কুৎসিত মেয়েটা এমন কিছু গুণের অধিকারিণী হতে চেয়েছিল, যার আলোয় রূপের খেদ ঢাকা পড়ে যেতে পারে।

সেরকম গুণের অধিকারিণী হতে পেরেছিল। গান— চৌদ্দ বছর বয়সে তার গানের প্রথম রেকর্ড হয়। তেইশ বছরের মধ্যে তার রেকর্ডের ছড়াছড়ি। বড় বড় সব জলসা থেকে ডাক আসে, সিনেমায় প্লে-ব্যাকের ডাক আসে। শেষের দুটো বছর রেকর্ড আর প্লে-ব্যাকের দরুন অবিশ্বাস্য টাকা এসেছিল সেই মেয়ের হাতে।

আর যে ছেলেটার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকে তার হৃদ্যতা, তার নাম রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী। শুভার মা নেই, ভাসুর-ভাসুরঝির বাস দিদির কাছেই। ওই মেয়ে তার লেখক জীবনের প্রথম প্রেরণা। তার সঙ্গে প্রতিটা লেখা নিয়ে কত আলোচনা, কত মতভেদ।

নিজের সঙ্গে অনেক বোঝাপড়া করে ওই মেয়েকেই বিয়ে করবেন স্থির করে ফেলেছিলেন রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী।

বাইরেটা কুৎসিত কিন্তু ভেতর তো সুন্দর। চোখ বুজে গান শোনে যখন, স্থান কাল ভুল হয়ে যায়। তা ছাড়া বয়সেরও একটা রূপ আছে, সেই রূপই চোখে ধরে রাখতে চেষ্টা করে। শুভার গানের কদর চারদিকে যতো বাড়ছে—রূপের প্রশ্নটা ততো গৌণ ভাবতে চেষ্টা করেছেন রামকৃষ্ণ।

কিন্তু বিয়ের প্রসঙ্গে মেয়েটা হাসে শুধু। হাঁ-না কিছুই বলে না। কালো মুখে রঙের ছোপ লাগে সেটা অবশ্য রামকৃষ্ণ চক্রবর্তীর চোখ এড়ায় না। ওদিকে গানের টাকা আসছে—ভক্তের সংখ্যা বাড়ছে— রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী অন্তত চারজনকে জানেন, যাদের যে-কোনো একজন শুভার একটু চোখের ইশারা পেলে বিয়ে করে তাকে সাদরে ঘরে তুলে নিয়ে যাবে। রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী ঠাট্টা করেন ওদের নিয়ে। শুভা গাঙ্গুলী হাসে খুব। বলে, স্টুডিওতেও জনতিনেক আছে যারা পাগল করে ছাড়লে।

মনস্থির করে ফেলার পরেও ওই মেয়ের সাড়া না পেয়ে ভিতরে ভিতরে রামকৃষ্ণ অসহিষ্ণু হয়ে উঠছিলেন। অথচ মেয়েটা যে তাঁর আশায় উন্মুখ হয়ে থাকে সেই আভাসও পেয়েছেন। গানের জন্যে যে মেয়েকে সাধ্যসাধনা করতে হয়, সেই মেয়ে নিরিবিলিতে তাঁকে দশখানা গান শোনাতেও আপত্তি করে না।

...ছেলেটাব সাতাশ আব মেয়েটাব তেইশে এক বিপর্যয় ঘটে গেল। ওই মেয়ে প্রশ্রয় না দিলেও প্রেমিকেব সংখ্যা বাড়ছে দেখে ছেলেটাব ইদানীং মেজাজ চড়া প্রায়ই।

বৃষ্টিতে কলকাতা ভেসে যাচ্ছিল সেই বাতে। দিদি-জামাইবাবু কোথাও বেবিয়ে আটকে গেছেন বোধহয়। তিনতলাব ঘবে চোখ বুজে একেব পব এক গান শুনে যাচ্ছিলেন বামকৃষ্ণ চক্রবর্তী। এক-একটা গান শেষ হলে শুভাব চোখে চোখ মেলছিলেন। হঠাৎ উঠে ঘবেব দবজাটা বন্ধ কবে দিল ছেলেটা। শুভাব মুখে শংকা, চোখে বিস্ময়।—কি ?

বামকৃষ্ণ চক্রবর্তী এগিয়ে এলেন। খুব কাছে। তানপুবা সবিয়ে দিলেন। তাবপব শক্ত দুই হাতে একেবাবে বুকেব ওপব টেনে আনলেন ওকে। —আমাদেব বিয়ে হবে কি হবে না ?

—ছাড়ো, আঃ।

বাধা পড়ল। দুটো পুরু ঠোঁটেব মধ্যে শব্দটা হাবিয়ে গেল। অসহিষ্ণু তাড়নায় মেয়েটাকে বুঝি গ্রাসই কবে ফেলবেন।—বিয়ে হবে কি হবে না ?

সমস্ত মুখে বেগুনে বং শুভাব। কাঁপছে। নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা কবছে। —কি কবছ। ছাড়ো, কেউ এসে গেলে—

আবাব আসুবিক বাধা পড়ল। তাবপব আবাব সেই প্রশ্ন।— আমাদেব বিয়ে হবে কি হবে না ?

হাল ছেড়ে ওই মেয়ে কালো টানা-টানা দুই অসহায় চোখ তাঁব মুখেব ওপব বাখল। —হবে। ছাড়ো।

এই ঘটনাব ঠিক পাঁচদিনেব মাথায় ওই মেয়ে নিখোঁজ। যে চাবটে ছেলে তাব প্রত্যাশায় বাড়িতে আসত, তাদেব দেখা মিলেছে। বামকৃষ্ণ চক্রবর্তী আব তাদেবও ধাবণা, স্টুডিওবই কোনো একান্ত গুণগ্রাহীকে নিয়ে শুভা গাঙ্গুলী উধাও হয়েছে। দিদিব মুখে শুনেছে, যাবাব আগে ওই পাঁচদিনেব মধ্যে ব্যাঙ্ক থেকে নিজেব নামেব সব টাকাও তুলে নিয়ে গেছে।

..তিবিশ বছব বাদে এই দেখা।

বামকৃষ্ণবাবু জিজ্ঞাসা কবলেন, কি দেখছ ?

তেমনি হাসিমুখে মহিলা জবাব দিলেন, তোমাকেই দেখছি।. তিবিশটা বছব কেটে গেল, এ যেন বিশ্বাস হয় না—. মনে হয় সব সেদিনেব কথা। চোখ বুজে তোমাব সেই গান শোনা আজও যেন চোখেব সামনে দেখছি।

বামকৃষ্ণবাবু অস্বস্তি বোধ কবতে লাগলেন। পুবনো দিনেব স্মৃতিব শুধু এটুকুই চোখে ভাসাব কথা নয়।

বমণীব কালো মুখে খুশিভবা কৌতুক।—আচ্ছা, তোমাব বউ রূপসী ছিলেন নিশ্চয় ?

—রূপসী না হোক, মোটামুটি ভালোই ছিলেন দেখতে। জবাবটা দিতে পেবে মনে মনে খুশী হলেন বামকৃষ্ণবাবু।

মুখ টিপে হাসছেন মহিলা। আবাব কি মনে পড়ল হঠাৎ। মুখে সেই বকমই

কৌতুকেব মিষ্টি ছটা।—আব তোমাব পবেব সব বইযেব নাযিকাবাও কি প্রায সুন্দবী নাকি?

এবাবে আব বামকৃষ্ণবাবু জবাব দিলেন না। ভিতবে ভিতবে কেন যে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ কবছেন জানেন না। পুবনো স্মৃতি সবই মুছে গেছল, তিবিশ বছব বাদে আবাব সেটা তাজা কবে তোলাব ব্যাপাবে কিছুমাত্র আগ্রহ নেই। ভিতবে তাঁব একটাই কৌতূহল। শুভা গাঙ্গুলীকে আজ তিনি এখানে এই বিজনে এ অবস্থায দেখছেন কেন? অথচ কালো মুখেব ওই হাসিব সঙ্গে যেন সদ্ভাব যোগ—পিছনে যা ফেলে এসেছেন তাব জন্যে যেন এতটুকু খেদ নেই, ক্ষোভ নেই।

প্রশ্নেব সুযোগ মহিলাই দিলেন। বললেন, এতকাল পবে দেখা, আমাব কোনো খবব জিজ্ঞাসা কবলে না তো?

—জিজ্ঞাসা কবলে বলবে?

—ওমা, না বলাব কি আছে।

—এই জীবনে অভ্যস্ত হতে তোমাব কতদিন লেগেছে?

—বেশি দিন না। গানেব কল্যাণে ভাবী সহজেই সব সযে গেল।

—অর্থাৎ যাব জন্যে তোমাব এতখানি আত্মত্যাগ, তিনি অল্পদিনেব মধ্যেই তোমাকে ছেড়ে গেছেন?

জবাব দিলেন না। বামকৃষ্ণবাবুব আবাব মনে হল, কালো মুখেব তলায তলায আবাব সেই বিচিত্র হাসিব উৎসমুখ যেন খুলে গেছে। কালো ত্বকেব ভিতব দিযে সেই হাসিব তবঙ্গও বুঝি দুচোখ মেলে দেখাব মতো।

—জবাব দিলে না। বামকৃষ্ণবাবু বললেন, তবু আবো একটু কৌতূহল আমাব—আমাদেব সকলেব চোখকে ফাঁকি দিযে যে মানুষটিকে সেদিন অনুগ্রহ কবেছিলে তাকে কি আমি চিনি?

সমস্ত মুখেই হাসি চিকচিক কবছে। অদ্ভুত সুন্দব লাগছে বামকৃষ্ণবাবুব। এবাবে মুখে কিছু না বলে মাথা নাড়লেন মহিলা— অর্থাৎ চেনেন।

—নাম বলবে না বোধ হয?

—বললে কি কববে, তিবিশ বছব বাদে তাব সঙ্গে বোঝাপড়া কবতে ছুটবে?

—না, শুধু জানাব ইচ্ছে। আব সত্যিই তুমি সুখী কিনা।

কালো মুখে সেই হাসিব নিঃশব্দ তবঙ্গেব ছেদ নেই। হাসিমাখা দুই চোখ তাব চোখেব ওপব অপলক কৌতুকে স্থিব হযে আছে। তেমনি মিষ্টি স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বব মহিলাব। বললেন, তাব নাম বামকৃষ্ণ চক্রবর্তী—যে ভদ্রলোক চোখ বুজে আমাব গান শুনত আব কল্পনাব জোযাবে ভাসত, যাব গল্পেব নাযিকাবা সকলেই সুন্দবী, আব যে ভদ্রলোক আমাকে ছেড়ে আমাব গানকে বিযে কবাব জন্য একেবাবে ক্ষেপে উঠেছিল। আমি সবে এসে তাকে বক্ষা কবতে পেবেছি, নিজেকে বক্ষা কবতে পেবেছি—আমাব মতো সুখী কে আছে!

মুহূর্তেব মধ্যেই পা থেকে মাথা পর্যন্ত একটা তোলপাড় কাণ্ড ঘটে গেল বুঝি বামকৃষ্ণবাবুব ভিতবে ভিতবে। তাবপব নির্বাক, নিস্পন্দ, বিমূঢ়, একেবাবে।

কালো মুখেব হাসিব আলো মিলাযনি একটুও। ঈষদুচ্চ স্নিগ্ধ গলায ডাকলেন, লছমন।

স্থানীয সেই লোকটি এগিযে এলো।

মহিলা সুন্দব হিন্দীতে বললেন, বাবুজী যাবেন এখন, অন্ধকাব হযে আসছে, সঙ্গে গিযে টাঙ্গায তুলে দিযে এসো।

কথাব সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, হাসিব তবঙ্গ কমেছে, কিন্তু সমস্ত মুখে তাব কমনীয বেশ ছড়িযে আছে। বললেন, ভজনেব সময হল, আমাব আব বসাব জো নেই—

যন্ত্রচালিতেব মতো উঠলেন বামকৃষ্ণবাবুও। বিমূঢ় নেত্রে চেযে আছেন তেমনি। চোখে পলক পড়ে না।

শুভা গাঙ্গুলী তিবিশ বছব আগে মুছেই গেছে।

সামনে যাকে দেখছেন তিনি মাতাজী।

বাঘিনীর নিঃশব্দ গর্জন

আজও গ্রামই দেখবেন লোকনাথবাবু ভাবেননি।

তেত্রিশ বছব আগে ববং এই বর্ধিষ্ণু গ্রামে শহবেব কিছু ছাঁদছিবি এসেছিল। এখানকাব কাঠেব ব্যবসা ফলাও হযে উঠেছিল। দূবেব মানুষদেব আনাগোনা বেড়েই চলেছিল। ফলে তখনই এব থেকে ঢেব বেশি চেকনাই দেখা গেছল। তেত্রিশ বছব বাদে এখানে পা দিযে লোকনাথবাবুব কেবলই মনে হতে লাগল—সমস্ত গ্রামটা যেন ভযানক বুড়িযে গেছে আব আফিমখোবেব মতো ঝিমুচ্ছে। শুধু তাই নয, এখানে দিনকতক কাটালে এখানকাব জবা বুঝি তাঁকেও ছেঁকে ধববে।

অথচ দিনকযেক এখানে থাকাব বাসনা নিযেই এসেছেন লোকনাথবাবু। জীবনেব প্রথম বিশটা বছব এই জাযগাব সঙ্গে নিবিড় যোগ তাব। যদিও বছবেব বেশিব ভাগ সমযেই দূবেব শহবে কাটাতে হত তাঁকে। এই দশা হলেও এখানে নাকি হাই স্কুল আছে একটা। তখন প্রাইমাবী স্কুল ছিল। সেখান থেকে বৃত্তি পাওযাব ফলে কাকা উদাব হযে কাকীমাব অমতে শহবেব হাই স্কুলে পড়তে পাঠিযেছিলেন তাঁকে। কাকীমাব ইচ্ছে ছিল, নিজেব ছেলেকেই শুধু শহবেব স্কুলে পড়তে পাঠান, একসঙ্গে দুজনকে বোর্ডিং-এ বেখে পড়ানোব সংগতি কোথায? ভাসুবপো ববং বাবুদেব কাঠেব গুদামে বা জঙ্গলেব কাজে লেগে যাক।

কাকা অনেক কাবণে চক্ষুলজ্জায পড়েছিলেন। প্রথম কাবণ, মবাব আগে লোকনাথবাবুব বাবা কাকাব হাতে কিছু টাকাকড়ি তুলে দিযে গেছলেন। আব মাতৃহীন ছেলেটাকে মানুষ কবাব আকূতি জানিযে গেছলেন। দ্বিতীয কাবণ, কাকাব আগে লোকনাথবাবুব বাবাই কর্তাদেব বিশেষ প্রিযপাত্র ছিলেন। বাবা অকালে মাবা যেতে তাঁব জাযগায কাকা জাঁকিযে বসেছেন। এই কাকাকে বুড়ো কর্তামশাই খুব একটা

সুনজরে দেখতেন না। কিন্তু অতিবৃদ্ধ তিনি তখন, আর তাঁর তিন ছেলের মধ্যে মেজ আর ছোটই সর্বব্যাপারে মাতব্বর তখন। বড় ছেলেই বাপের এত বড় কাঠের ব্যবসা আর জঙ্গল তত্ত্বাবধানের প্রধান সহায় ছিলেন। সেই ছেলে শিকারে বেরিয়ে বাঘের থাবার ঘা নিয়ে ফিরলেন। তারপর একটু একটু করে দেহ বিষিয়ে চোখ বুজলেন। সেই শোক তাঁর বৃদ্ধ বাপ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত ভুলতে পারেন নি। লোকনাথবাবুর কাকা ওই ছোট দুই ছেলের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন একসময়। তাদের অনেক রকমের হুকুম তামিলের মানুষ ছিলেন। তাই লোকনাথবাবুর বাবা চোখ বুজতে কাকাকেই তার বাবার জায়গায় বসিয়ে দিলেন। সেই জায়গার গালভরা নাম হল ম্যানেজার। কিন্তু আসলে গোমস্তা। লোকনাথবাবুর বাবা বুড়ো কর্তার স্নেহের ভাগীদার ছিলেন, কিন্তু কাকা শুধুই গোমস্তা। মাইনে পঞ্চাশ টাকা। তেত্রিশ বছর আগে সেটা একেবারে কম কিছু নয়। কিন্তু বুঝে-শুনে চলতে পারলে আরো অনেক দিকে আয়ের পথ খোলা ছিল। সে-রকম বুঝেশুনে চলার বুদ্ধিও কাকার ছিল। তবু ভাইপোর বাবার জায়গায় তিনি বসেছেন, এটা বোধহয় ভুলতে পারেন নি।

তৃতীয় কারণ, চক্ষুলজ্জা। নিজের ছেলেটা কোনরকমে প্রাইমারী পাশ করেছে তাকে শহরের স্কুলে পড়তে পাঠাবেন আর জলপানি পাওয়া ভাইপো এখানে বসে থাকবে, শুনলে কর্তাবাবুরাই বা বলবেন কি? বাইরের পাঁচজনের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল।

আর ভাইপোকে শহরের স্কুলে পড়তে পাঠানোর শেষ কারণ সম্ভবত ভবিষ্যতের আশা। নিজের ছেলেকে দিয়ে সেরকম আশা করেননি। ভাইপো যদি লেখাপড়া শিখে একটা পাশ দিয়ে বিদ্বান হয়ে আসতে পারে, তাহলে কর্তাবাবুদের এতবড় বিষয়-আশয়ের ওপর তাঁর কর্তৃত্ব ঢের বাড়বে। ওর ভাইপো কোনদিন তার অবাধ্য হতে পারে সেটা কল্পনার বাইরে। অতএব ভাইপোকে বিদ্বান করে সুখে কাল কাটানোর একটা স্বপ্নও তিনি দেখেছিলেন হয়তো।

বয়সে বছর পাঁচেকের বড় এক দিদি আছেন লোকনাথবাবুর। বাবা সেই দিদির ভালো বিয়ে দিয়ে যেতে পেরেছিলেন। লোকনাথবাবু আর কাকার ছেলে মন্মথ সমবয়েসী। দুই এক মাসের তফাত। দু'জনেই তারা শহরের স্কুলে পড়তে চলে গেছলেন। পুজো আর গ্রীষ্মের বড় ছুটিতে তো বটেই—একসঙ্গে পাঁচটা দিনের ছুটি পেলেও মন্মথকে পট্টি পরিয়ে দেশের বাড়িতে চলে আসার জন্য ছটফট করতেন লোকনাথবাবু। গাঁটের পয়সা ভেঙে একা আসাটা কাকা-কাকীমা বরদাস্ত করবেন না, তাই মন্মথকে চাই। মন্মথর কিন্তু শহর ছেড়ে আসার ঝোঁক পরের দিকে তেমন ছিল না। লোকনাথ বরাবরই ছুটে চলে আসার জন্য পাগল। এখানকার আকাশ বাতাস নদী জঙ্গল পাহাড় সব ভালো লাগত তার। এরা যেন হাতছানি দিয়ে সর্বদা ডাকত তাঁকে।

...আজ তেত্রিশ বছর বাদে সেইখানেই এসেছেন। এসে যেন পায়ে পায়ে ঠোক্কর খাচ্ছেন।

কাকা তো অনেককাল বিগত। মন্মথও নেই। তার ছেলেরা এখানে ছোটখাট

কাঠের কল দিয়ে বসেছে একটা। শহরের সঙ্গে যোগাযোগও এত বছরে আগের থেকে ঢের সহজ হয়েছে। লরি আর বাস চলার পাকা সড়ক হয়েছে। উঠতি মানুষেরা শহরের দিকেই ছুটেছে। সেখান থেকে আরো দূরে দূরে গেছে। ফলে যা স্বাভাবিক তাই হয়েছে। শহরের সঙ্গে যোগাযোগ বেড়েছে অথচ শহর গ্রামের দিকে এগিয়ে আসেনি, গ্রামের প্রাণ শহরের দিকে ধাওয়া করেছে।

লোকনাথবাবুর বাস এখন কলকাতায়। কম করে সাড়ে তিনশ' মাইল দূর এখান থেকে। কর্মজীবনে ভারত সরকারের চাকরি নিয়ে বহু জায়গায় ঘুরেছেন। এখন কলকাতায় বহাল আছেন। বয়েস এখন তিপ্পান্ন তাঁর। চাকরির মেয়াদ আরো পাঁচ বছর। পদস্থ ব্যক্তি তিনি। কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি। মন্মথর বড় দুই ছেলে কলকাতায় বেড়াতে এসেছিল। বিশ বছর বয়সে দেশছাড়া লোকনাথবাবু আর ও-মুখো হননি, মন্মথ বিয়ে করেছে কি করেনি এ খবরও তার জানা ছিল না। ছেলেদের চেনার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

কোথা থেকে কেমন করে তার আপিসের ঠিকানা সংগ্রহ করে তারা এক দুপুরে সেখানে এসে হাজির। ওদের পরিচয় পেয়ে লোকনাথবাবু আদর করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। একটা সস্তার হোটেলে উঠেছিল, সেখান থেকে ওদের তুলে এনে নিজের কাছে রেখেছিলেন ক'টা দিন। এত বড় মানী জ্যাঠার (মন্মথর থেকে লোকনাথবাবুই মাস দেড় দুইয়ের বড় ছিলেন) আন্তরিক আদরযত্নে ছেলে দুটো মুগ্ধ। ওদের মুখেই লোকনাথবাবু খবর পেলেন মন্মথ আর নেই। মা আছেন। বাবার কাঠের কল এখন ছেলেরা চালাচ্ছে। মন্মথর তিন ছেলে। ছেলেরা নাকি তাদের বাবার মুখে এই জ্যাঠার গল্প অনেক শুনেছে। লোকনাথবাবুর বড় চাকুরে হবার কথা মন্মথর জানা অস্বাভাবিক নয়। দেড় বছর আগেও লোকনাথবাবুর দিদির সঙ্গে তার যোগাযোগ ছিল।

যাবার আগে ওই দুই ছেলে বার বার তাঁকে অনুরোধ করেছিলো একবারটি তিনি যেন দেশে আসেন। লোকনাথবাবু কথা দিয়েছিলেন যাবেন।..এখানকার এই আকাশ বাতাস নদী পাহাড় জঙ্গল প্রায় তিন যুগ বাদে আবার তাঁকে ডেকেছে, হাতছানি দিয়েছে। এর কারণ ওই ছেলেদের জানার কথা নয়। প্রথম সুযোগে তিনি চলে এসেছেন।

মন্মথর বউ আর ছেলেরা তাকে পেয়ে মহা ব্যস্তসমস্ত। তার সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি সকলের বিশেষ নজর। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে তিন ছেলের একজন না একজন ছায়ার মতো তার সঙ্গে লেগে আছে। শেষে নিরুপায় হয়ে লোকনাথবাবু বলেছেন, এ জায়গার সবকিছু আমার বড় চেনা, আমি নিজের মনে দু'-চারদিন বেশ বেড়াব--আমার জন্যে তোমরা নিজেদের কাজের ক্ষতি কোরো না।

মানী জ্যাঠার মন বুঝে ছেলেরা কিছুটা অব্যাহতি দিয়েছে তাঁকে।

...তেত্রিশ বছর আগে তাঁরা যেখানে থাকতেন মন্মথর ছেলেরা এখন আর সেখানে থাকে না। ওদের বাবাই নাকি এখানে এই কাঠের বাড়ি করে রেখে গেছে।

এখানে এসে এক ঘণ্টার মধ্যে লোকনাথবাবু তাঁদের আদি বাসস্থান দেখতে গেছলেন মন্মথর বড় ছেলেকে নিয়ে। দেখে হতভম্ব তিনি।... তাঁদের সেই কাঠের

দালান প্রায় নিশ্চিহ্ন। চারদিক জঙ্গলে ছেয়ে আছে। অদূরে কর্তাদের সেই চকমিলানো দালানেরও প্রায় সেই অবস্থা। সমস্ত গাঁয়ের মধ্যে ওটাই ছিল একমাত্র তিন-মহলা দালান। ভাঙা জীর্ণ একটা কংকাল শুধু দাড়িয়ে আছে। সেটার নানা দিক খসে ধসে পড়ছে। সর্বাঙ্গে পুরু শ্যাওলা জমে আছে। বাড়িটার পিছনের দিকে ছিল মস্ত একটা দীঘি। দীঘিটাও কর্তাদেরই ছিল, কিন্তু ওই বাড়ির আঙিনার বাইরে ছিল ওই দীঘি। বাড়ির মুখোমুখি ঘাটটা বাবুদের নিজস্ব—অন্য দিকের ঘাট দুটো কর্তাদের পোষ্য এবং অনুগ্রহভাজনেরা ব্যবহার করতে পারত। ঘাটের তিনদিকেই বেশ সাজানো গাছের সারি ছিল। বাবুদের ঘাট—তাই বাবুঘাট ছিল ওটার নাম।

পায়ে পায়ে ঘাটের দিকে এলেন লোকনাথবাবু। চোখে কাটা বিধল যেন। চারদিক জঙ্গলে ছেয়ে গেছে। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ জল ছিল, এখন সেই জল একেবারে তলায় এসে ঠেকেছে—তার ওপর যেন সবুজ সর পড়ে আছে একটা। দেখলেই বোঝা যায় কেউ আর এখন এই জল ছোঁয় না। বাধানো সিঁড়িগুলোও ভেঙে ফেটে চৌচির হয়ে আছে।

লোকনাথবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, কি ব্যাপার, দেবরায়দের কোনো বংশধরও আর এখানে থাকে না?

মন্মথর বড় ছেলের নাম সুবল। সে বলল, না, মাত্র বছর পাঁচেক আগে বাড়ি-ঘর, বিষয়আশয় সব বেচে দিয়ে তারা এখান থেকে চলে গেছেন। এই বাড়ি আর জায়গা-জমি কি সব কাজে লাগানো হবে বলে সরকার কিনে নিয়েছিল, কিন্তু কিছুই হয় নি, তেমনি পড়ে আছে।

—মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে এই দশা?

সুবল বলল, খারাপ দশা অনেক আগেই শুরু হয়েছিল—ভাগের মা গঙ্গা পায় না, বাড়ি-ঘরদোর কে দেখে! কর্তাদের দু'ভাইয়ের মিল ছিল খুব, দু'জনে একসঙ্গেই নেশা-টেশা করত, কিন্তু তাদের ছেলেদের মধ্যে বনিবনা ছিল না একটুও—বউদের মধ্যেও না। তবু কর্তারা বেচে ছিলেন বলে তখনো খাওয়া-খাওয়ি শুরু হয়নি, আর ব্যবসাপত্রও চালু ছিল। ছেলেপুলেসুদ্ধ সেই ডাকাতের হাতে পড়ার পর রাতারাতি অতবড় ব্যবসা অর্ধেক হয়ে গেল, তারপর কিছুদিনের মধ্যে—

লোকনাথবাবু অবাক।—ছেলেদেরসুদ্ধ কর্তারা ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন নাকি? কোথায়?

সুবল সোৎসাহে বলল, ও, আপনি তো কিছুই জানেন না—সে এক তাজ্জব কাণ্ড! সেও বছর ছয় আগের কথা, মাসে তখন বুড়ো কর্তারা একবার করে জঙ্গলে যেতেন আদায়পত্র দেখাশুনা করতে। নেশার কল্যাণে তখন ইজারার একটা জঙ্গলই হাতে ছিল, কর্তাদের সঙ্গে তাঁদের ছেলেরা থাকতেন।

একবার ওমনি জঙ্গলে গিয়ে তিন দিন বাদে ছেলেদের কোথায় রেখে শুধু কর্তারা দুই ভাই ফিরে এলেন। তাঁদের সে মুখের দিকে তাকানো যায় না, যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে মাথার ওপর দিয়ে। দু'জনের দুই-দুই চার ছেলেকে কোথায় রেখে এলেন কেউ জানে না। ফিরে এসেই অত বড় ব্যবসার অর্ধেকই বেচে দিলেন তাঁরা—আর

কাউকে সঙ্গে না নিয়েই আবার জঙ্গলে ছুটলেন। তার পরদিনই অবশ্য কর্তাদের সঙ্গে তাদের চার ছেলেও ফিরলেন—কিন্তু ছ' মাসের মধ্যে কি ব্যাপার কেউ একটি কথাও জানল না।

ছ' মাস বাদে সবকারের কাছে এই সব বেচে এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে ব্যাপারটা জানাজানি হল। যাবার আগে পুলিসের কাছে একটা রিপোর্টও করে গেলেন না তাঁরা এটাই আশ্চর্য। জঙ্গল থেকে ফেরার সময় ওই চার ছেলেসহ দুই কর্তা ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন। জঙ্গলের ধারেকাছে ডাকাত আছে এমন খবর কেউ কখনো শোনেনি। সেই ডাকাতের দল নাকি তাদের ধরে বহু দূরে তাদের গোপন আস্তানায় নিয়ে গিয়ে তুলেছিল—যাবার সময় মোষের গাড়িতে সকলের চোখ বেঁধে নিয়ে গেছে। তারপর বহু হাজার টাকা ছেলেদের মাথার বিনিময়ে মুক্তিপণ হেঁকে চোখ বেঁধে শুধু বুড়ো কর্তা দুজনকে জঙ্গলের বাইরে এনে ছেড়ে দিয়ে গেছে। টাকা দেবার জন্য পাঁচটি দিন সময় দেওয়া হয়েছিল তাদের—তার মধ্যে জঙ্গলে টাকা না নিয়ে এলে বা কোনরকম চালাকি খেলতে গেলে চার ছেলেরই মৃতদেহ সোনালীর জলে ভাসবে বলে শাসিয়ে দিয়েছে। টাকা নিয়ে ঠিক দিনে তারা জঙ্গলে গেলেই বাদবাকি ব্যবস্থা তারা করবে।

টানা প্রায় ছ'মাস কর্তাদের ছেলেরা ভয়ে সিঁটিয়ে ছিল। তাছাড়া বাপেরাই হয়তো ছেলেদের কাউকে কিছু বলতে নিষেধ করে থাকবেন। কিন্তু সব ছেড়েছুড়ে চলে যাবার আগে তাদের ভয় ভেঙে গেছল। ছেলেরাও মদের নেশায় পোক্ত হয়ে উঠেছিল, সেই মদের ঝোঁকেই তারা সব ফাঁস করে দেয়। তারা নাকি খুব ভালো করেই জানে, ওই ডাকাত দলের সর্দারণী একজন মেয়েছেলে। তারা তাকে দেখেনি, কিন্তু টের পেয়েছে।

ঘটনাটা শুনে বেশ অদ্ভুতই লাগল লোকনাথবাবুর। পাহাড়ে জঙ্গলে ডাকাতের উৎপাত হতে পারে, যদিও আগে এ-রকম ঘটনার কথা কখনো শোনা যায়নি। আর আগে থাকতে খবর নিয়ে আটঘাট বেঁধে যদি ডাকাতেরা কাজে নেমে থাকে—তাহলে মুক্তিপণ হাঁকাটাও অসম্ভব কথা কিছু নয়। কিন্তু ভয়ের চোটে ঘটনার ছ'মাস বাদেও এরা কাউকে কিছুই বলেননি সেটাই আশ্চর্য। হয়তো বা ডাকাতরা শাসিয়ে রেখেছিল, পরেও কাউকে কিছু বললে আর এ নিয়ে পুলিশের তত্ত্ব-তল্লাসী চললেও তাঁদের গর্দান যাবে।

লোকালয় ছাড়িয়ে মাইল দুই হাঁটলে সোনালী নদী। বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ পায়ে পায়ে সেই দিকে চললেন লোকনাথবাবু। এই এলাকাটাই একসময় সব থেকে প্রিয় ছিল তাঁর। স্কুল-কলেজের বিশ বছর বয়েস পর্যন্ত এখানে এলে এদিকটাই সব থেকে বেশি চষে বেড়িয়েছেন তিনি।

শীতের অপরাহ্নের মিঠে রোদ, হাঁটতে ভালো লাগছে। এদিকে পা বাড়ানোর পর আরো ভালো লাগছে। তৃষ্ণার্ত দুই চোখ মেলে সোনালীর দিকে এগিয়ে চলেছেন। নদীর দুদিকে সোনার মতো ঝকঝকে বালুর চর—এই জন্যেই নদীর নাম সোনালী বোধ হয়।

দূব থেকে লোকনাথবাবু হতাশ হলেন একটু। সব-কিছুব মতো সোনালীও বুডিযে গেছে মনে হল। নদীব দু'দিকে চবেব পবিধি দ্বিগুণ বেড়ে গেছে মনে হল। কাছে এসে দেখলেন.সোনালী অর্ধেক সরু হযে তিবতিব কবে বইছে এখনো, সেই জলে পাযেব পাতা ডোবে কিনা সন্দেহ।

শীতেব সময আগেও অবশ্য হাঁটুজলেব বেশি গভীব ছিল না সোনালী। তবে চওড়া এব তিনগুণ ছিল। আব বর্ষায তো এই সোনালীবই দুকূল ছাপানো সংহাব মূর্তি। সুবল ওদেব মুখে শুনেছেন, দূবেব কোথায বাঁধ হবাব ফলে এখন নাকি বর্ষাযও সোনালী আব তেমন ভবে ওঠ না।

এখানে এসে বযেস ভুলে গেলেন লোকনাথবাবু। সামনেব দিকে দৃষ্টি মেলে দিতে দুই চোখে সেই আগেব দিনেব তৃষ্ণা উপচে উঠল। তিবতিবে জলেব ওধাবে প্রায দেড় মাইল পর্যন্ত ধু-ধু বালুব চব। তাব ওধাবে ঘন জঙ্গলেব বেখা। তাবও ওধাবে সাবি সাবি বিচ্ছিন্ন পাহাড়।

...আগে হামেশাই লোকনাথবাবু শুকনো চব পাব হযে ওই জঙ্গলে গিযে ঢুকতেন। দু'পাশেব জঙ্গলেব মাঝখান দিযে আগে পাযে-হাঁটা-বাস্তা ছিল। এখন কি হযেছে জানেন না। জঙ্গলেব ধাবে ধাবে আদিবাসী গবীবদেব বসতি ছিল। সেগুলো গাছেব আড়ালেই ছিল বলে আগেও এত দূব থেকে দেখা যেত না। কর্তাদেব ইজাবাব জঙ্গল এদিকে নয—সেটা পশ্চিমে। দেববাযদেব সেই চকমিলানো বাড়িব এক-আধ মাইলেব মধ্যেই জঙ্গল শুরু হযেছে। তাঁদেব জঙ্গলও সেইদিকেই ছিল, তবে বহু দূবে। দেববাযদেব ওই বাড়িব ছাদে উঠে লোকনাথবাবু একমনে দাড়িযে সেদিকেব জঙ্গলও দেখতেন। কিন্তু তাব সব থেকে ভালো লাগত এ-দিকটা—এই সোনালীব দিকটা।

জুতোজোড়া হাতে নিযে লোকনাথবাবু সাগ্রহে সোনালী পেবিযে ওদিকেব চবে গিযে উঠলেন। তাবপব ওই জঙ্গল আব পাহাড়েব দিকে চোখ বেখে চলতে লাগলেন। তেত্রিশ বছব বাদে আবাব সেই ছেলেবেলায ফিবে এসেছেন যেন তিনি। মনেব আনন্দে এগিযে চললেন।

চব শেষ হল। এদিকটায জলেব বেখাও নেই আব। লোকনাথবাবু ওপাবেব ডাঙায গিযে উঠলেন। দূব থেকে বনেব লাইন যেমন নিশ্ছিদ্র মনে হয তা নয। তেত্রিশ বছব আগে যেমন দেখেছিলেন, এ-দিকটায তাব থেকে অন্তত ঢেব উন্নতি হযেছে। বনেব মাঝখান দিযে পাকা বাস্তা চলে গেছে। গাছ-গাছড়াব আড়ালে বেশ সুন্দব কাঠেব বাড়িও দেখা গেল গোটাকতক।

ঘন বন একপাশে বেখে আপনমনেই হাটতে লাগলেন। জঙ্গলে হিংস্র জন্তু জানোযাব আছে, লোকালযেব দিকটায তাদেব পদার্পণ ঘটাব কথা নয।

একটা জীপ পাশ কাটিযে গেল। ড্রাইভাবেব পাশে একজন বযস্কা বমণী বসে। পবনে ছাপাশাড়ি, মাথায ঘোমটা। এক নজব তাকিযে বাঙালী মনে হল না লোকনাথবাবুব। কাবণ নাকে বড়সড় একটা সোনাব নথ। কিন্তু অবাক কাণ্ড, জীপেব গতি শিথিল হল, আব সেই বমণী তাব আসন থেকে ঝুঁকে পিছনেব দিকে তাকিযে তাঁকে দেখতে লাগল।

তিনি খানিকটা এগিয়ে আসতে প্রায়-থামা জীপটা হঠাৎ স্পীড বাড়িয়ে চলে গেল। নথ-পরা রমণীর ফর্সা গোলগাল মুখ, কিন্তু মুখের আদল লক্ষ্য করার সুযোগ হয়নি লোকনাথবাবুর। ভাবলেন, হয়তো কোনো চেনা লোক ভেবেছিল রমণী, চেনা নয় দেখে চলে গেল।

নিজের মনে আরো অনেকখানি এগিয়ে গেলেন লোকনাথবাবু। পাশের বন ক্রমে গভীর হয়ে উঠছে, অন্যদিকে লোক-বসতির আভাস আর চোখে পড়ছে না। আদিবাসীদের কুঁড়েঘরের বসতি দেখেছেন। এখন আর তাও চোখে পড়ছে না।

এত পথ এভাবে হেঁটে এসে ভালো করেন নি, লোকনাথবাবু ফিরলেন। একটু তাড়াতাড়িই পা চালালেন। যতটা এসেছেন, সোনালীর চরে পৌঁছুতে কম করে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট লাগবে।

কাছাকাছি এসে গেছেন, আর শতখানেক গজ পথ শেষ হলেই সোনালীর চরের সামনে পৌঁছবেন। চকিত হয়ে পিছন ফিরে তাকালেন। একটা জীপ তীরের মতো এদিকেই ছুটে আসছে— তারই শব্দ। সেই জীপটাই কিনা বুঝলেন না। বাঁধানো হলেও সরু রাস্তা। অত স্পীডে আসতে দেখে লোকনাথবাবু বিরক্ত হয়েই পাশ দেবার জন্য একধারে সরে দাঁড়ালেন।

কিন্তু আশ্চর্য, একটু বাদে জীপটা তাঁর পাশেই ঘ্যাঁচ করে দাঁড়িয়ে গেল। হ্যাঁ, আগের সেই জীপই। কিন্তু এতে ড্রাইভারের পাশে রমণীর বদলে অন্য একটি অল্প-বয়সী লোক। আর জীপের পিছনে আরো দুটি ছেলে।

চারজনই জীপ থেকে নেমে এলো। তাদের পরনে পরিষ্কার ট্রাউজার আর গায়ে টেরিকটের হাফ-শার্ট। চারজনেরই মুখের আদল একরকম। দেখলেই মনে হবে চার ভাই। কালোর ওপর বেশ মিষ্টি চেহারা। টানা চোখ। সব থেকে আগে চোখে পড়ে স্বাস্থ্যসম্পদ। ওই দুটো করে বাহু যেন দুনিয়ার অনেক শক্তি কেড়ে নিতে পারে।

চারজনই এগিয়ে এসে হাত কপালে ঠেকিয়ে সবিনয়ে নমস্কার করল তাকে। লোকনাথবাবুও বিমূঢ় মুখে প্রতি-নমস্কার জানালেন। এদের মধ্যে সকলের বড়টির বছর বত্রিশ বয়েস হবে, আর সকলের ছোটর বছর পঁচিশ। ওই বড়জনই জীপ চালাচ্ছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, আপনার নাম লোকনাথ মিত্র ?

বিমূঢ় মুখে লোকনাথবাবু মাথা নাড়লেন— নামটা তারই বটে।

—আপনাকে একবারটি আমাদের সঙ্গে আসতে হবে।

লোকনাথবাবু আকাশ থেকে পড়লেন।—কোথায় ?

—জীপে গেলে খুব বেশি দূর নয়, আপনি কিছু ভাববেন না, আপনাকে আবার আমরা পৌঁছে দেব।

লোকনাথবাবু ভেবাচাকা খেয়ে গেলেন।—আমি তো আপনাদের চিনি না, কোথায় যেতে হবে ? কেন যেতে হবে ?

—আমাদের মা একবারটি আপনাকে নিয়ে যেতে বলেছেন।

—আপনাদের মা। আপনাদের মা কে ?

ছেলেটা হাসল। হাসিটা মিষ্টি। জবাব দিল, মা মা-ই, আসুন।

লোকনাথবাবু ফাঁপরে পড়লেন। বললেন, আমি তো এখানে কাউকেই চিনি না —বহুকাল বাদে এদিকে এসেছি, কোথাও কিছু একটা ভুল হয়েছে, আমাকে কেউ এখানে ডাকতে পারেন না।

ছেলেটা গম্ভীর হঠাৎ। অন্য সকলেও।

বলল, মায়ের ভুল হয় না।—ঘণ্টাখানেক আগে এই জীপে করে যাবার সময় মা আপনাকে দেখেছেন, তাছাড়া আপনার নাম করেই তো আপনাকে নিয়ে যেতে হুকুম করেছেন?

তাও তো বটে।—নথ-পরা সেই রমণীই এদের মা তাহলে। আপনি ছেড়ে এবারে তুমি করে বললেন লোকনাথবাবু।—তোমাদের মায়ের নাম কি?

এই জেরার মধ্যে পড়ে ছেলেগুলো বিরক্ত যেন। ওই বড় ছেলেই জবাব দিল, মা-কে আমরা মা বলেই জানি, নাম-টাম জানি না।

অবাক ব্যাপার। এত বড় বড় ছেলেরা মায়ের নাম জানে না, এও কি বিশ্বাস্য।

'তুমি' ছেড়ে আবার আপনি করে বললেন লোকনাথবাবু। ব্যাপার-গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না তাঁর।—আপনাদের বাবার নাম কি?

এবারে বড় ছেলেটা স্পষ্টই বিরক্ত।—দেখুন, কোনো কথা না বলে মা আপনাকে শুধু নিয়ে যেতে বলেছেন— আপনি নির্ভয়ে গাড়িতে এসে উঠুন, আবার আপনাকে আমরা পৌঁছে দিয়ে যাব।

মনের ভাব চেপে জিজ্ঞাসা করলেন, গিয়ে আবার ফিরতে কতক্ষণ লাগবে?

—যেতে-আসতে বড়জোর সোয়া-ঘণ্টা, তারপর মা যতক্ষণ আটকে রাখেন আপনাকে।

তার মানে কম করে দু' ঘণ্টা। এখনই পাঁচটা বাজে, শীতের আলোয় টান ধরেছে। মাথা নেড়ে বললেন, আমি এখন যেতে পারছি না, এখানে নতুন মানুষ আমি, আপনার মা-কে বলবেন—

—দেখুন, আপনিই মিছিমিছি দেরি করছেন। মায়ের হুকুমে আমরা আপনাকে নিতে এসেছি। তিনি নিয়ে যেতে বলেছেন, আমরা নিয়ে যাব। আপনি দয়া করে গাড়িতে উঠুন।

বিনীত কথাগুলোর মধ্যে এমনই একটা দৃঢ়তার সুর যে ভিতরে ভিতরে বিষম অস্বস্তিবোধ করলেন লোকনাথবাবু। এই নির্জনে জোর করে জীপে টেনে তুললেই বা কি করতে পারেন তিনি। সকলের মুখের দিকেই তাকালেন একবার। এই অযথা বিলম্ব ওরা কেউ পছন্দ করছে না।

দুর্গা নাম নিয়ে জীপের দিকে এগোলেন। তা ছাড়া তার ক্ষতিই বা কি হতে পারে? তেত্রিশ বছর বাদে এখানে এসেছেন, ক্ষতি করতে খামোখা কেউ চেষ্টাই বা করবে কেন? নথ-পরা একজন রমণী যে ঝুঁকে দেখছিল তাঁকে, আর এরা এসে নামটাও তো ঠিকই বলেছে।

ওই বড় ছেলে এবারে নির্বাক অথচ সাদর আপ্যায়নে তাঁকে এনে ড্রাইভারের পাশে বসালো। নিজে চালকের আসনে বসল। পরের তিন ছেলে পিছনে।

জীপ ছুটল।

যে গতিতে ছুটল তাতেই ভয় ধরে গেল লোকনাথবাবুর। মাইলের কাঁটা পঞ্চাশের দাগ ছুঁয়েছে। এই স্পীডে যেতে-আসতে সোয়া-ঘণ্টা লাগলে কম করে পঁচিশ-তিরিশ মাইল যেতে হবে এখন।

আবার ভয়ানক অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন তিনি।

আধ ঘণ্টা বাদে একটা পাহাড়ের কাছাকাছি ফাঁকা জায়গায় সুন্দর একটা কাঠের বাংলোর সামনে জীপ এসে দাঁড়াল। পাশেই কাঠের স্তূপ আর একটা কাঠ-কাটা-কলের শেড চোখে পড়ল। বাংলোর বারান্দার রেলিং-এ দটি অল্পবয়সের বউ দাড়িয়ে, আর দুটো ফুটফুটে বাচ্চা ছেলেমেয়ে ছোটাছুটি করছে।

এইখানেই জীপ দাড়াল যখন, অনেকখানি নিশ্চিন্ত বোধ করলেন লোকনাথবাবু। যাক, কোনো একটা সংসারের মধ্যেই এসে পড়েছেন তাহলে তিনি।

ছেলেরা তাকে আপ্যায়ন করে বাংলোয় এনে তুলল। সেখানেই বসার সুন্দর চেয়ার-টেবিল পাতা। দু'দিকে চমৎকার বাগান। অনেক রকমের ফুল ফুটে আছে। এই গৃহস্বামী-গৃহস্বামিনীদের রুচি আছে।

বড় ছেলে হাক দিল, মা কোথায়? উনি এসেছেন—

অল্পবয়সী বউ দুটি ভিতরে ঢুকে গেছে। ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে আর মেয়েটা অবাকবিস্ময়ে আগন্তুককে দেখছে।

ভিতরের দরজার কাছ থেকেই বড় ছেলের হাসি আর কথা শোনা গেল।—আরে না না—আমরা কোনরকম জোর-জবরদস্তি করিনি—বাইরের দিকে মুখ বাড়ালো সে-—আচ্ছা মশাই, আমরা আপনার সঙ্গে কোনরকম অভদ্র আচরণ করেছি?

ঘুরে তাকিয়ে লোকনাথবাবু মাথা নাড়লেন। ছাপাশাড়ির আভাস পেলেন, কিন্তু মুখ দেখতে পেলেন না। ছেলেটি তাকেই বলছে কথাগুলো।

রমণীটি এগিয়ে এলো। মাথায় ঘোমটা, নাকে বড় নথ, বয়সের দরুন সামান্য মোটার দিক ঘেষা, মুখের দিকে ভালো করে তাকান নি —কিন্তু অবয়ব দেখেই বোঝা গেল খুব ফর্সা রং।

একেবারে চেয়ারের কাছেই এগিয়ে এলো সে, মাথার ঘোমটা অনেকখানি সরে গেছে তখন। তার একপাশে ওই অল্পবয়সী বউদের একটি। ছেলেরা চারজনই সামনে দাড়িয়েছিল।

কিন্তু রমণীর মুখে একটিও কথা না শুনে সংকোচ কাটিয়ে মুখ তুলে তাকালেন লোকনাথবাবু। আর তারপরেই মাথাটা ঘুরে গেল কেমন। এই বাংলোটাই যেন প্রচণ্ডভাবে দুলে উঠল। বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ে আছেন—স্বপ্ন দেখছেন কি সত্যি, ভেবে পাচ্ছেন না।

তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে হাসছে একটি রমণী। সেই হাসি তার সমস্ত মুখে, এমন কি কানের ডগা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। হাসলে গালের এক দিকে বড় একটা টোল পড়ে, তাই পড়েছে। সেই টোলের ভিতর দিয়েও যেন হাসি ঠিকরোচ্ছে। নিঃশব্দে এরকম হাসি একজনই হাসতে পারত, একজনেরই ওরকম হাসি সমস্ত মুখের রেখায় রেখায় ছড়াতো, কানের ডগা পর্যন্ত লাল হয়ে যেত, মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠত।

নিজেব অগোচবে চেযাব ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন লোকনাথবাবু। অস্ফুট বিস্ময়ে বলে উঠলেন, হাসিবানী।

নিঃশব্দ হাসিটা যত বাড়ছে ততো যেন বক্তবর্ণ হয়ে উঠছে মুখ। গালেব টোলে ততো বেশি খাঁজ পড়ছে। সেই হাসিব একটু ছোঁয়া যেন ছেলেদেব মুখেও লেগেছে। তাবা অল্প অল্প হাসছে আব দুজনকেই নিবীক্ষণ কবছে। বউটিও তাই।

—হাসিবানী তুমি! তুমি এখানে!

চোখেব দিকেই চেযে আছে, তেমনি হাসছে। আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল—সে-ই বটে। পদ্মহাতেব মতো একখানা হাত তুলে তাঁকে বসতে বলল।

নিজেও সামনাসামনি চেযাবেব একটাতে বসল। তখনো মুখ লাল। হাসি মিলাযনি। হাসি চুঁযে পড়ছে।

বউটি তাব চেযাবেব হাতলেব কাছে দাঁড়াল। একটা চেযাব টেনে বড় ছেলে একেবাবে মাযেব গা ঘেঁষে বসল। বমণী তাব দিকে ফিবে একটুও শব্দ না কবে ঠোঁট নাড়ল। হাসছে তখনো।

বক্তব্য বুঝে নিযে ছেলে লোকনাথবাবুকে বলল, মা বলছেন-- আপনাকে হঠাৎ এভাবে ধবে নিযে খুব কষ্ট দেওযা হল।

লোকনাথবাবু সম্বিত ফিবে পেলেন যেন এতক্ষণে। বললেন, না, কষ্ট কিছু না। তোমাব মা-কে আজ তেত্রিশ বছব বাদে দেখলাম কোনদিন দেখব ভাবিনি, তাই অবাক হযেছি।

ছেলে হাসিমুখে বলল, আপনি তো আসতেই চাননি, ভাবলেন ডাকাতেব পাল্লায পড়েছেন। মাযেব দিকে চোখ পড়তেই সে আবাব তাড়াতাড়ি বলে উঠল, না মা, সত্যিই একটুও খাবাপ ব্যবহাব কবিনি—তুমি জিজ্ঞাসা কবে দেখো না—

সমর্থনেব আশাতেই যেন হাসিবানী লোকনাথবাবুব দিকে তাকালো। অদ্ভুত লাগছে লোকনাথবাবুব। এখনো যেন সবকিছু বাস্তব ভাবতে পাবছেন না তিনি। হাসিবানীব বযেস বড়জোব বিযাল্লিশ-তেতাল্লিশ মনে হচ্ছে। কিন্তু লোকনাথবাবু জানেন, হাসিবানীব বযেস এখন একান্ন—ঠিক দু' বছবেব ছোট তাব থেকে।

বললেন, না, ওবা খাবাপ ব্যবহাব কবেনি, তোমাকে দেখব কল্পনা কবিনি তো, তাই আসতে ইতস্তত কবছিলাম।

হাসিবানীব মুখে আবাব সেই হাসি। ছেলেব দিকে ফিবে একবাব ঠোঁট নাড়লেন শুধু। সে তক্ষুনি উঠে লোকনাথবাবুব পাযে হাত বেখে প্রণাম কবল। সঙ্গে সঙ্গে বাকি তিন ছেলেও।

হাসিবানী তাদেব দিকে চেযে আবাব ঠোঁট নাড়তে পবেব ছেলে জানান দিল, মা বলছেন আমবা মাযেব এই চাব ছেলে।

লোকনাথবাবু বলে উঠলেন, বেঁচে থাকো বাবাবা, সুখে থাকো।

হাসিবানী ববাববই রূপসী, কিন্তু এই হাসিমুখ অদ্ভুত কমনীয দেখালো। আবাব তাব ইশাবা পেযে বড় ছেলে হাঁক দিল, আব বউবা সব কোথায, এদিকে এসো, মা ডাকছেন—

ইত্যবসবে যে বউটি সামনে দাঁড়িযে ছিল সেও প্রণাম সেবে উঠল। সেই বোধহয বড বউ। সুশ্রী। আবো তিনটি সুশ্রী বউ ভিতব থেকে বেবিযে এসে প্রণাম কবল।

বড ছেলে হাসছে। —মা বলছেন, এই তাব চাব বউ।

আশ্চর্য, মাযেব ঠোঁট নডাব সঙ্গে সঙ্গে ছেলে তাব কথা এমন পবিষ্কাব বুঝে নেয কি কবে লোকনাথবাবু ভেবে পেলেন না। হাসিমুখে হাসিবানী আদুবেব বাচ্চা ছেলেমেযে দুটোকে হাতেব ইশাবায কাছে ডাকল। সঙ্গে সঙ্গে তাবা ছুটে এলো। বড ছেলে বলল, প্রণাম কবো, দাদু—

লোকনাথবাবু তাদেব ধবে ফেললেন।

বড ছেলে বলল, এই মাযেব দুই নাতি-নাতনী— এটি আমাব ছেলে, এটি ভাইযেব মেযে—

সুন্দব ঝলমলে সংসাব। কি মনে হতে লোকনাথবাবু হাসিবানীব দিকে চেযে জিজ্ঞাসা কবলেন, আব কেউ নেই?

ফর্সা মুখেব হাসি মিলিযে যেতে লাগল। ম্লান স্নিগ্ধ দুটো চোখ তাঁব মুখেব ওপব স্থিব হল একটু। তাবপব সামান্য মাথা নাডল— নেই।

বড ছেলে বলল, দশ বছব আগে বাবা ব্ল্যাক ফিভাবে মাবা গেছেন।...এদিকটায তখন ওই বোগ খুব হত। তাবপব হেসেই বলল, মাকে কিন্তু আমবাই কক্ষনো সাদা শাড়ি পবতে দিই না।

লোকনাথবাবু মাথা নেডে সায দিলেন শুধু। প্রতিমাব আব যাই হোক থান মানায না। উন্মুখ হযে এবাব ওই ছেলেকে একটা কথা জিজ্ঞাসা কবতে চাইলেন তিনি। কথাটা ঠোঁটেব ডগায এসে গেছল, এবাবে তোমাব বাবাব নাম বলো, কিন্তু জিজ্ঞাসা কবতে পাবলেন না। .দবকাবও নেই, সবই বুঝতে পাবছেন।

হাসিবানী বউদেব দিকে চেযে মৃদু হেসে কি ইশাবা কবতে তাবা চলে গেল। এই ইশাবাটা লোকনাথবাবুও বুঝলেন। চা-জলখাবাবেব ব্যবস্থা কবতে বলা হল।

বাধা দিতে চেষ্টা কবলেন, আমি এখন কিছু খাব না—

হাসিমুখে একটু দুলিযে দুলিযে মাথা নাডল হাসিবানী। আঠেবো বছব বযসেও মাথা নাডতে হলে ঠিক যেমনটি কবত। অর্থাৎ বলতে চাইল, তা হয না।

...কর্তাদেব চকমিলানো দালান থেকে আঠাবো বছবেব বোবা মেযে হাসিবানী হাবিযে গেছল একদিন। হাবিযে যাযনি, সকলেই ধবে নিযেছিল প্রকাবান্তবে সে আত্মঘাতিনীই হযেছিল। নিখোঁজ হবাব আগেব দিনও বিপদেব স্পষ্ট হুশিযাবী এসেছিল। আব সেটা উপেক্ষা কবেই সে মবণ ববণ কবেছিল।

...আব বিশ বছবেব বি-এ পবীক্ষা দেওযা এক ছেলে ভেবেছিল, দুঃখে অপমানে তাব জন্যই মেযেটা প্রাণ খোযালে। তাব আত্মহত্যাব সামিল কাজ কবাব জন্য সে-ই দাযী। তেত্রিশ বছব আগে সেই ছেলেটা অনুশোচনায দগ্ধ হযে দেশ ছেড়ে চলে গেছল।

সেই ছেলে লোকনাথ মিত্র।

সে-সমযে বুড়োকর্তাব তিন ছেলেব মধ্যে বড় ছেলেব একমাত্র মেযে হাসিবানী। বাঘেব থাবায পচন ধবে যে ছেলে প্রাণ খুইযেছিলেন তাঁব।

মেয়েটার হাসি দেখেই বুড়োকর্তা তার নাম হাসিরানী রেখেছিলেন বোধহয়। লোকনাথ, খুড়তুতো ভাই মন্মথ, আর বুড়োকর্তার নাতিরা আর এই নাতনী একসঙ্গে পাশাপাশি বড় হয়েছে। দু' বছর বয়সে হাসিরানীর টাইফয়েড না কি মরণাপন্ন ব্যাধি হয়েছিল। তখন ও রোগের চিকিৎসা নেই। বাচার কোনো আশাই ছিল না। কিন্তু বাঁচল শেষ পর্যন্ত। কথা বলার মধ্যে সেই দু' বছর বয়সেই কেমন একটু জড়তা ছিল মেয়েটার। সেই কথা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কথা বলতে চেষ্টা করলে মুখ দিয়ে কেমন একটা অদ্ভুত শব্দ বেরুতো শুধু।

ওর পাঁচ বছর বয়সে তার বাবা সেই বাঘের ক্ষত নিয়ে ফিরে এলেন। সঙ্গে ছিল বিশ্বাসী আর দুরন্ত সাহসী চাকর কিষণচাঁদ। চাকর বলা ঠিক হবে না, আসলে সে ছিল বড়বাবু অর্থাৎ বড় ছেলের শিকারের অন্তরঙ্গ সঙ্গী। কিষণচাঁদ হুবহু বাঘের ডাক ডেকে বাঘকে ভুলিয়ে কাছে নিয়ে আসতে পারত। আরো অনেক রকম ডাক ডেকে জন্তু-জানোয়ারকে ঘাবড়েও দিতে পারত। বড়বাবুর প্রাণ বাচাতে গিয়ে সেই কিষণচাঁদ ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারিয়েছিল। তার একটা মাত্র ছেলে, বছর চৌদ্দ বয়েস, বাপের মতোই ষণ্ডামার্কা হবে বড় হলে বোঝা যেত। তার নাম মগন, সে বাবুদের বাড়ীর ফাই-ফরমাস খাটত। কিষণ মরে যেতে মগনকেও বুড়োকর্তা সস্নেহে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। একই অঘটনে বড়বাবুও চোখ বুঝতে বুড়োকর্তার হুকুমে মগনের কাজ হল তার বোবা মেয়েটার দেখাশুনা করা, তাকে খেলা দেওয়া।

হাসিরানীর বয়স তখন পাঁচ, লোকনাথ আর মন্মথের সাত, আর ওই মগনের চৌদ্দ। লোকনাথ বা মন্মথ মগনকে তেমন পছন্দ করত না, কুচকুচে কালো ছোঁড়াটা হাড়পাজী—আর গায়ে জোরও তেমনই, যখন-তখন ধরে রামঝাঁকানি-টাকানি দিত। মেয়েটাকেও এক-একসময় দু' হাতে একেবারে মাথার উপর তুলে ফেলত। কিন্তু হাসিরানী একটুও ভয় পেত না, নীরব হাসিতে ওর সমস্ত মুখ রক্তবর্ণ হয়ে যেত।

পাঁচ বছরে হাসিরানীর বাবা মারা গেছলেন, সাত বছর না হতে তার মা-ও চোখ বুজলেন। স্বামী অঘটনে মারা যাবার পর থেকেই মহিলা জীবন্মৃত হয়ে ছিলেন। সকলেই বলাবলি করতে লাগল মেয়েটা অভাগা, বিশেষ করে হাসিরানীর কাকা কাকীমারা, আর লোকনাথের কাকীমাও।

মগনের তখন ওকে আগলাবার দায়িত্ব আরও বেড়ে গেল। সে-ই যেন গার্জেন ওর। কর্তাবাবুদের চোখের আড়ালে মেয়েটার ওপর মগন দস্তুরমতো হম্বিতম্বি করত, একটু-আধটু শাসনও করত। কিন্তু লোকনাথ বা মন্মথ এমন কি হাসিরানীর খুড়তুতো ভাইরাও ওর সঙ্গে লাগতে এলে মগন মারমুখী একেবারে। সে-বেলায় কারোও ক্ষমা নেই।

বুড়োকর্তা সময়ে চোখ বুজলেন। হাসিরানীর বয়স তখন নয়। মগনের আঠেরো। পেল্লায় জোয়ান হয়ে উঠেছে। পাথুরে কালো গায়ের রং-এ যেন জেল্লা ছোটে। ওই ফুটফুটে মেয়েটার হাত ধরে পুকুরের পশ্চিম দিকের ঝোপঝাড় বনে-জঙ্গলে যখন ঘুরে বেড়াতো—তখন অদ্ভুত দেখতে লাগত। তপ্তকাঞ্চন আর নিকষ কালোর দুই সচল মূর্তি। পশ্চিমের ওই জঙ্গলই বড় জঙ্গলে গিয়ে মিশেছে। মেয়েটাকে ওদিকে

নিযে যেত বলে গিন্নিদেব কাছে বকাঝকা খেত মগন। কিন্তু ও তাঁদেব কথা কানেই তুলত না। ফলে তাঁবাও মগনেব ওপব ক্রুদ্ধ।

এই সমযে মগনেব চাকবিটা গেল। বাবুদেব চোখ দিযে দেখতে গেলে অপবাধ গুরুতবই বটে। প্রথম অপবাধ, নিষেধ সত্ত্বেও পুকুবেব পশ্চিম দিকে নিযে গেছে মেযেটাকে। তাব সঙ্গে মেজকর্তাব এক ছেলেও ছিল। কি কাবণে বেগে গিযে মগন হাসিবানীব এত জোবে হাতটা ধবেছে যে বোবা মেযেটা বীভৎস আর্তনাদ কবে উঠেছে একটা। গালে বক্তেব চাপ ধবে গেছে। মেজকর্তাব ছেলে কি বলে উঠতে তাব গালেও একটা প্রচণ্ড থাপ্পড় বসিযে দিযেছে।

গিন্নিবা কর্তাদেব কাছে নালিশ কবেছেন। মেযেটাব গালেব দাগ দেখিযেছেন। ছেলেব গাযে হাত তোলাব কথাও বলেছেন শুনে মেজকর্তা পাযেব চটি খুলে মগনকে বেশ কবে প্রহাব কবে গলাধাক্কা দিযে বাড়ি থেকে বাব কবে দিযেছেন। এ বাড়ীব ত্রিসীমানায আব তাকে দেখা গেলে গাযেব ছাল থাকবে না, তাও বলে দিযেছেন।

মগনেব চাকবি যেতে সকলেই খুশি. এমন কি লোকনাথও।

কেবল ওই মেযেটা ছাড়া। মগন ওব সর্বক্ষণেব সঙ্গী।

মগনকে কিন্তু প্রাযই পশ্চিমেব পুকুবঘাটেব জঙ্গলেব দিকে ঘুব-ঘুব কবতে দেখা যেত। বিশেষ কবে দুপুবে, কর্তাবা যখন বাড়ি থাকেন না— আব গিন্নিবা যখন দিবানিদ্রায মগ্ন। হাসিবানীকে চুপি চুপি ওব কাছে যেতে দেখা গেছে। আবাব অন্য ভাইদেব নালিশেব ফলে ধবাও পড়ত হাসিবানী। বেগে গিযে কাকীমাবা তখন ওব চুলেব মুঠি ধবে ঝাকাতেন। মেযেটা কিন্তু কাঁদত না বড়-একটা।

মেযেটা অপযা. মেযেটা বোবা। কাকীমাদেব অত্যাচাব বাড়তেই থাকল ওব ওপব। আব মেযেটাও একগুযে তেমনি। মারুক ধরুক. জঙ্গলেব দিকে যাবেই—ফাঁক পেলে বনে-বাদাড়ে ঘুবে বেড়াবেই। কাকীবা ছেড়ে কাকাবাও কতদিন মাবধব কবেছেন ঠিক নেই।

হাসিবানীব চোখে জল গড়ায, কিন্তু গলা দিযে কান্নাব শব্দ বেবোয না। কিন্তু এই মেযেব হাসি যেন এক অদ্ভুত জিনিস। হাসিটা যেন ছোঁযাচে বোগেব মত ওব। কাবণে-অকাবণে হাসতে হাসতে বক্তবর্ণ হযে যায একেবাবে। তখনো গলা দিযে শব্দ বাব কবে না বিশেষ। হাসলে গালে টোল খায— আব হাসিটা যেন তাব মধ্যেও লুটোপুটি খায।

ওকে হাসাতে বড় ভাল লাগত লোকনাথেব। একটু চেষ্টা কবলেই হাসাতে পাবত। ও মেযে সর্বদাই যেন হাসাব জন্য তৈবি হযে আছে। চুপচাপ দাঁড়িযে থাকে যখন, তখনো মনে হয হাসি-হাসি মুখ।

চৌদ্দ ছেড়ে পনেবয পা দিযে এই মেযেই বাড়িব অশান্তিব কাবণ হযে উঠল। এত রূপ সচবাচব চোখে পড়ে না। তেমনি স্বাস্থ্য। কিন্তু বুদ্ধি যেন হযইনি। এখনো সেই হাসি মুখে লেগে আছে—আব পশ্চিমেব জঙ্গলে ঘুবে বেড়ানো আছে। কাকীমাদেব চোখেব বিষ ও এখন। এখনো গুম-গুম কিল বসিযে দেন তাঁবা, চুলেব ঝুঁটি ধবে মাটিতে শুইযে ফেলেন। বাড়িব আঙিনাব বাইবে সেদিন ওকে মগনেব সঙ্গে ঠোঁট

নাড়তে দেখে আর হাসতে দেখে তো কাকীমারা রেগে এমন আগুন যে, কাকারা পর্যন্ত সেই নালিশ শুনে রীতিমতো মেরেছেন ওকে। আর দু'দিন দরজায় শিকল তুলে দিয়ে ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছিলেন।

সেই সময় মন্মথ প্রায়ই বলত, হাসিরানীকে দেখলেই আমার বুকের ভিতরটা কেমন করে। লোকনাথ ঠিক বুঝতে পারেননি তখনো, কেমন করে ওর বুকের ভেতরটা। মেয়েটাকে দেখলে লোকনাথের আগের থেকে ঢের বেশি ভালো লাগে এই পর্যন্ত কিন্তু বুকের ভিতর কেমন করে-টরে না।

বছর দুই বাদে বুঝতে পারল, মন্মথর বুকের ভিতরটা কেমন করে। হাসিরানীর তখন সতের, ওদের উনিশ। নীল ডুরে শাড়ি পরে যখন ঘুরে বেড়ায়, চোখ ফেরানো যায় না। মন্মথ ততদিনে আরো সেয়ানা হয়েছে। একদিন চুপি চুপি বলল, হাসিকে দেখলাম পশ্চিমের ঝোপ-ঝাড়ের আড়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছে, প্রায়ই যায় ওদিকে, মেয়েটা তো কথা বলতে পারে না—একদিন ধরব চেপেচুপে।

মন্মথর সঙ্গে লোকনাথের সেদিন দস্তুরমতো রাগারাগিই হয়ে গেছল।

পরের বছর। হাসিরানীর আঠেরো আর ওদের কুড়ি।

মন্মথ ম্যাট্রিকের বেড়া ডিঙোতে না পেরে এখানেই থাকে, তার বাপের সঙ্গে বাবুদের কাজকর্ম দেখে। কিন্তু আসলে কিছুই করে না। লোকনাথ ততদিনে খুব ভালোভাবে আই-এ পাস করে সেবারে বি-এ পরীক্ষা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ক'মাসের জন্য ঘরে ফিরেছে।

বাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কাকা-কাকীমার খুব হাসিমুখ দেখল। এতটা সচরাচর দেখে না।

মন্মথ ফাঁক পেয়েই তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল। তারপর তাজ্জব কথা শোনালো। তিন মাস আগে হাসিরানীর কাকারা এক বউ-মরা আধবয়সী লোকের সঙ্গে হাসিরানীর বিয়ের ঠিক করেছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন দেখা গেল সেই লোকটার মাথা কে দু'ফাঁক করে দিয়েছে—প্রাণে বেঁচে সে আর বিয়ের নামও করছে না।

হাসিরানীর কাকারা তখন মন্মথর বাবাকে ধরেছে। লোকনাথের সঙ্গে হাসিরানীর বিয়ে দিতে হবে। তার জন্যে কাকারা অনেক টাকাও খরচ করবেন। ওর বাবা নাকি তাতে রাজি হয়েছেন। লোকনাথ এসেছে, এবারই বিয়েটা হয়ে যাবে।

লোকনাথের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। তার তখন ভবিষ্যৎ-চিন্তা অন্যরকম। কমপিটিটিভ পরীক্ষা দেবে। নিজের পায়ে দাঁড়াবে। তার মধ্যে কিনা বিয়ে। আর যতো রূপসীই হোক, একটা বোবা মেয়েকে বিয়ে করবে ও। কক্ষনো না, কক্ষনো না।

এরপর কাকা-কাকীমা ওঁকে খবরটা জানালেন। লোকনাথ মাকে বলল, সে এখন বিয়ে করবে না।

কাকা ততোধিক গম্ভীর। ধমকে বললেন, এটা ফাজলামোর ব্যাপার নয়, কর্তারা নিজের মুখে এ প্রস্তাব দিয়েছেন তার ভাগ্য ভালো। তাঁদের কথা দেওয়া হয়ে গেছে, এর আর নড়চড় হবে না।

লোকনাথ ঠিক কবে ফেলল, বিযেব আগেই সে পালাবে। জীবনে সে আব এ-মুখো হবে না। কিন্তু মেযেটাকে দেখে বড কষ্ট হল তাব। রূপ যেন ফেটে পডছে। ওব সঙ্গে দেখা হতেই ফিক কবে হাসল, গালে টোল পডল— সেই হাসি সমস্ত মুখে ছডালো। চটপট সবে পডল সে।

লোকনাথ বুঝল মেযেটাও শুনেছে সব। দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু বিযে সে এখানে কবতে পাববে না— পালাবেই।

পবদিন দুপুবে মেঘলা দিন দেখে পশ্চিমেব জঙ্গলেব দিকে পাযে পাযে এগিযে চলেছিল লোকনাথ। জঙ্গলেব পবিবেশ তাব ভালো লাগে।

হঠাৎ বিষম চমকে উঠল। সামনে হাসিবানী। ওকে দেখে সেও ভযানক চমকে উঠেছে। ঘাটেব থেকে বেশি দূবে নয অবশ্য জাযগাটা। লোকনাথ জিজ্ঞাসা কবল, হাসিবানী, তুমি এখানে একলা কি কবছ?

হাসিবানীব মুখে লালেব ছোপ লাগল। কিন্তু মুখ শুকনো। লোকনাথ ভাবল, পাছে বাডিতে বলে দেয, সেই ভয।

লোকনাথ বলল, আমি কাউকে কিছু বলব না। শোনো...বাডিব সব কি কাণ্ড কবতে যাচ্ছে শুনেছ?

হাসিবানী মাথা নাডল— শুনেছে।

—ইযে...তুমি কি বলো?

মুখেব দিকে সোজা তাকালো। ঠোঁটেব ফাঁকে হাসি। বিপবীত মাথা নেডে আপত্তি জানালো কিছু।

—বিযে কবতে চাও না?

আবাব মাথা নাডল— চায না।

—আমি কি কবব? আপত্তি কবব?

মাথা নেডে সায দিল।

ঘাম দিযে যেন জ্বব ছাডল লোকনাথেব। বলল, আমি ভাবছি এখান থেকে পালিযে যাব।

এবাবে একগাল হেসেই সায দিল। অর্থাৎ সেই ভালো।

লোকনাথ চলে এলো। কিন্তু মেযেটাব কথা ভেবে অবাকই লাগছে তাব। শেষে ভাবল, বিযে কাকে বলে ও বোধহয তাই-ই জানে না।

এমন দিনে সমস্ত এলাকায যেন হঠাৎ নাডাচাডা পডে গেল একটা। ভযে সক্কলেব মুখ শুকালো। পশ্চিমেব জঙ্গলে সেদিন সন্ধ্যায বাঘেব ডাক শোনা গেল। দূবে অবশ্য, কিন্তু বাঘেব কাছে কত আব দূবে? বাবোশিঙা হবিণেবও বিদঘুটে ডাক শোনা যেতে লাগল। বাঘেব পদার্পণ ঘটলে তাবা অমনি ডেকে নিজেবা হুঁশিযাব হয, আব অন্য জীব-জন্তুকেও হুঁশিযাব কবে।

পব পব দু-তিন দিন দূবে দূবে বাঘেব ডাক শোনা যেতে লাগল। তাব পবেব দিন দিনেব বেলাযও শোনা গেল। কর্তাদেব বন্দুক আছে দু'দুটো। কিন্তু সে বন্দুক হাতে নেবাব মতো আব মানুষ নেই। পাহাবাদাব আছে একটা। তাব কাঁধে একটা

বন্দুক উঠল। কিন্তু ভয়ে তারও মুখ আমসি। কর্তারা শহরে খবর পাঠালেন। কিন্তু সেখান থেকেও কোনো সাড়া আসছে না।

...দূবে পশ্চিমেব জঙ্গলে আগে বাঘের উপদ্রব খুবই ছিল। কিন্তু দশ বছবেব মধ্যে সে ভয় নির্মূল হযে গেছে। কত বাঘ যে মারা পড়েছে ঠিক নেই। অন্য কোনো জঙ্গল থেকে ছিটকে-ছটকে এসে গেছে একটা। অত দূব থেকেও এমন গুরুগম্ভীব ডাক শোনা যায যখন, বড় বাঘ সন্দেহ নেই। যতো দূবেই হোক, বাবুঘাটেব ত্রিসীমানায লোক মাড়ায না। ঝোপঝাড গাছপালাব পরেই তো ঘন জঙ্গল শুরু। বড-জোব এক-দেড় মাইল। ঘাটের দিকেব কর্তাদের বাড়িব জানলা-দবজা পর্যন্ত অষ্টপ্রহব বন্ধ। ত্রাসে দিশেহারা সকলেই। লাঠিসোঁটা টিন কানেস্তাবা নিয়ে লোকজন সন্ধ্যাব পব থেকে সমস্ত বাত কর্তাদের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে।

সেদিন সকালের দিকেই বাড়িব সকলের বক্ত জল। পুকুবেব ওপারে ঝোপ-ঝাড়েব কাছাকাছি বাঘেব গবগব গলাব শব্দ পাওযা গেছে—আব দিনমানেই বাবো-শিঙাবা ডাকাডাকি ছোটাছুটি কবেছে। লোকনাথবাও কর্তাদেব বাড়িব সামনে ঠায় দাঁড়িযে পুকুবেব ওপাবেব দিকে চেযে ছিল— আবাব দবকাবমতো ছোটাব জন্যও প্রস্তুত ছিল সকালে।

কিন্তু বাঘেব আওযাজ আব শোনা গেল না। কেউ কেউ মন্তব্য কবল, বাঘ ওদিকেব ধারেকাছেই খেযেদেযে ঘুম লাগিযেছে।

...সেই দুপুবেই অঘটন ঘটে গেল। সকলে তখন ঘুমে। বাড়িব একটা ঝিযেব হঠাৎ চোখ গেল পুকুবেব ওপাবে ঝোপেব দিকে পাযে পাযে এগিযে চলেছে বড কর্তাব মেযে হাসিবানী। বাড়ি কাঁপিযে আর্তনাদ কবে উঠল ঝিটা। তাবপব পড়ি-মবি কবে ছুটল তাকে ধবে আনতে। এতদূব থেকে চিৎকাব চেঁচামিচি শুনতে পাওযাব কথা নয, শোনা গেলও না। হাসিবানী তখন আপনমনে ঝোপ-ঝাড়েব আড়ালে অনেকটা চলে গেছে, আব তাকেও দেখা যাচ্ছে না। ঝিটা একাই তাবস্ববে চিৎকার কবতে কবতে পুকুবেব ধাব ধবে ছুটল। আব কেউ এগোতে সাহস কবছে না— হাসিবানীব কাকীমাবা দোতলায দাঁড়িযেই কাঁপছেন ঠকঠক কবে।

ঝিটা চিৎকাব করতে কবতে সবে পুকুবেব ওপাবে পৌঁছেছে—হঠাৎ একেবাবে কাছেই বাঘেব প্রলযংকব গর্জন—চতুর্দিক কাঁপিযে দিযে শিকাবের ওপব ঝাঁপিয়ে পড়ে সে-বকম গর্জন কবে ওঠে তেমনি। গর্জন আব থামে না। ঝোপঝাড়ের ওধাবেই ওটা যেন লণ্ডভণ্ড কাণ্ড কবছে একটা। ঝি-টা আবাব আর্তনাদ করতে কবতে তীবেব মতো এপারে ছুটে এসে মাটিব ওপর হুমড়ি খেযে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে। কর্তাদেব বাড়িব সামনে তখন অনেক লোক কাঠ হযে দাঁড়িযে। লোকনাথ আব মন্মথও ছিল।

খানিক বাদে বাঘেব গর্জন থেমেছে।

সকলে যা বোঝবাব বুঝে নিয়েছে। বড়কর্তার রূপসী বোবা মেয়েটাকে বাঘে টেনে নিযে গেল। সকলেই বলাবলি করল, মেয়েটা যেন আত্মঘাতিনী হল। ইচ্ছে কবেই বাঘেব মুখে গিয়ে পড়ল।

লোকনাথেরও সেটাই স্থিরবিশ্বাস। আত্মাহুতি দিয়ে সে তাকে এবং অন্য সকলকে অব্যাহতি দিয়ে গেল। তারপর আর কোনদিন বাঘের ডাক শোনা যায় নি। দু'দিন বাদে জঙ্গল তল্লাস করা হয়েছিল অনেক লোকজন নিয়ে, কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে এর মধ্যে— বাঘের বা রক্তের কোনো চিহ্নও মেলেনি।

সমস্ত মুখ দিয়ে হাসি চুয়ে চুয়ে পড়ছে হাসিরানীর। পাশ থেকে বড় ছেলের সহাস্য উক্তি, কাকা, আমরাও বাবা আর দাদুর মতো ভয়ংকর বাঘের ডাক ডাকতে পারি—আপনাকে শোনাতে বলছেন।

লোকনাথবাবু হাসিরানীর দিকেই চেয়ে আছেন আর হাসছেনও। চা-জলখাবার খাওয়া হয়ে গেছে—অন্য ছেলেরা আর বউরাও হাসিমুখে দাঁড়িয়ে।

লোকনাথবাবু বড় ছেলেকে বললেন, তার থেকে তোমার বাবার একখানা ফটো থাকে তো আমার বড় দেখার ইচ্ছে।

মায়ের ইশারায় বড় ছেলে তাঁকে নিয়ে সামনের ঘরে ঢুকল। সামনের টেবিলেই টাটকা মালা পরানো মস্ত একখানা ফটো। ফটোর মধ্যে দাঁড়িয়ে মগন যেন হাসছে তার দিকে চেয়ে। হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা। পাথরে খোদাই করা দেহ।

ফিরে এসে লোকনাথবাবু বসলেন আবার। সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত হয়েছে। কিন্তু লোকনাথবাবুর উঠতে ইচ্ছে করছে না। মায়ের ঠোঁট-নাড়ার দিকে খানিক মনোযোগ দিয়ে চেয়ে থেকে বড় ছেলে এর দিকে ফিরল।—মা আপনাকে যে জন্য ডেকে এনেছেন, এতক্ষণ সেটাই আপনাকে বলা হয়নি— শুনে আপনিও মতামত দেবেন।

এরপরে যে কথাগুলো বলে গেল সে, শুনে লোকনাথবাব স্তব্ধ খানিকক্ষণ।

—চার ছেলেকে মা তার মনের মতো করে মানুষ করেছে, মায়ের হুকুমে তাদের লাঠি চালানো, ছোরা খেলা আর বন্দুক ছোঁড়া শিখতে হয়েছে। শিকারে পটু হতে হয়েছে। মা সর্বদাই বলতেন তার একটা কাজ ছেলেদের করে দিতে হবে—আর সেই কাজের জন্য বড় হয়ে তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এই প্রস্তুত হবার ব্যাপারে বাবাই ওদের সাহায্য করেছেন। মারা যাবার আগেও তিনি বলে গেছেন, মা যা বলে তাই করবি, তাতে জান যায় যাক।

সেই কাজের সময় এসেছিল ছ' বছর আগে। মায়ের হুকুমে আচমকা ছেঁকে ধরে ঠিক ডাকাতের মতোই মায়ের বাপের বাড়ির কর্তাদের দু' ভাইকে আর তাদের চার ছেলেকে আটক করে আনা হয়েছিল। তাদের গায়ে কেউ হাত তোলেনি, কিন্তু ভয়ে তারা তখন আধমরা। তার তিন ভাই বন্দুক হাতে ওই চার ছেলেকে পাহারা দিয়েছে—আর বড় ভাই আলাদা ঘরে মায়ের দুই কাকাকে। মা শুধু তার কাকাদের ঘরে এসেছেন, প্রণাম করেছেন, তারপর তার মারফৎ কাকাদের জানিয়েছেন—পৈতৃক সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ মায়ের পাওনা—তার বিনিময়ে নগদ মূল্য না পেলে ছেলেদের হাত থেকে ওদের ছেলেদের রক্ষা করা যাবে না। মায়ের কাকারা অনেক মিনতি করেছেন ছেড়ে দেওয়ার জন্য, ছেড়ে দিলে যথাসাধ্য ব্যবস্থা করবেন।

মা অবিচল কঠিন। তাঁর হুকুম, কাকার ছেলেরা তাঁর জিম্মায় থাকবে, কাকারা টাকা আনার জন্য যেতে পারেন—পাঁচ দিন সময়, তার মধ্যে তাঁদের ছেলেদের কেউ কেশ স্পর্শ করবে না—কিন্তু পাঁচদিনেব মধ্যে টাকা না নিযে এলে আর তাদেব বক্ষা কবাব কোনো দাযিত্ব তাঁর থাকবে না।

...কাকাবা নিজেদেব মধ্যে কথা বলে পঞ্চাশ হাজাব টাকা দিতে চেযেছিলেন মাকে, মা রাজি হননি। শেষে সত্তর হাজাব টাকায বফা হযেছে।

পাঁচদিনেব মধ্যে সেই টাকা তাঁরা মাযেব হাতে তুলে দিযে ছেলেদের মুক্ত কবে নিযে গেছেন।

হাসিবানী চেযে আছে লোকনাথবাবুব দিকে। একাগ্রভাবে যেন সে জানতে চায কিছু। লালচে মুখ গম্ভীব এখন।

বড ছেলে বলল, এখন মাযেব জিজ্ঞাস্য, এ-ভাবে দাবি আদায কবে মা পাপ কবেছেন কিনা, অন্যায কবেছেন কিনা।

লোকনাথবাবু মুগ্ধ বিস্মযে চেযে ছিলেন তাব দিকে। এবকম রমণী তিনি এ জীবনে আব দেখেন নি। বললেন, কোনো পাপ কবোনি, কোনো অন্যায কবোনি— তুমি যা কবেছ তোমাব ছেলেবা তা সোনাব অক্ষবে লিখে বাখে যেন, বংশ বংশ ধবে সকলে যেন জানতে পাবে।

আবাব ওই মুখে হাসি ভবাট হতে লাগল, গালে টোল পডল, ঠোঁট দিযে গাল দিযে নাক-চোখ-কান দিযে হাসি চুঁযে চুঁযে পডতে লাগল যেন।

আত্মবিস্মৃতেব মতো চেযেই আছেন লোকনাথবাবু।

তাঁব মনে হতে লাগল, তেত্রিশ বছব আগে বাবুদীঘিব নিবাপদ ব্যবধানে দাঁড়িযে বাঘেব ডাক শুনেছে সকলে ক'দিন ধবে। বাঘিনীব নিঃশব্দ গর্জন কেউ শোনেনি।

মধুরঙ্গ

মধু বঙ্গনাথনেব সঙ্গে আমাব প্রথম আলাপ ছাব্বিশ-সাতাস বছব আগে। তাব বযস তখন পঁচিশ-ছাব্বিশ, আমাবও তাই। ট্রেনে কলকাতা থেকে বম্বে যাচ্ছিলাম। আমার একটা গল্প ছবি কবাব ব্যাপাবে সেখানে গবম তোডজোড় চলছিল। বাংলা গল্পেব হিন্দি ছবি হবে। হামেশাই হয। কিন্তু সেই উঠতি বয়সে অমন ভাগ্য দুর্লভ মনে হযেছিল। তাই মনে আনন্দ ছিল। ভিতবে বেশ একটু উত্তেজনাও ছিল। গল্পেব কাঠামো একটু-আধটু অদল-বদল কবাব ব্যাপাবে খোদ পবিচালকেব টেলিগ্রাম পেঁযে ছুটেছি। পবেব পযসায় ফার্স্ট ক্লাসে তোফা আবামে যাচ্ছিলাম।

সেই সময সামনেব বার্থের একটি সমবযসী অবাঙালী ছেলে আমার চোখ টেনেছিল। ছিপছিপে বেঁটে-খাট গড়ন, গায়ের বঙ কালোই বলা যায়। সে-ও আমাব মতোই নিঃসঙ্গ যাত্রী, কিন্তু যতবাব চোখাচোখি হযেছে, দেখি অস্বাভাবিক গম্ভীব। অথচ ওই মুখেব আদল কেমন যেন চেনা-চেনা ঠেকছিল আমাব।

আলাপের চেষ্টায় এগিয়েছিলাম, কিন্তু লোকটা ভয়ানক নির্লিপ্ত আর নিরুত্তাপ। সে-ও বম্বে যাচ্ছে শুনে আমি একটু উৎসাহ বোধ করেছিলাম, কিন্তু তার ঠাণ্ডা হাবভাব দেখে সেটা বেশিক্ষণ থাকল না। ভাবলাম আমি পরের পয়সায় কায়দা করে ফার্স্ট ক্লাসে চলেছি, এ হয়তো পয়সাঅলা কোন বড়লোকের ছেলে হবে, সেই দেমাকে এত গম্ভীর। অতএব আমিও বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত নিস্পৃহ থাকতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু যতবার তার দিকে চোখ গেছে ততবার মনে হয়েছে এই মুখ আমি কোথাও দেখেছি।

একবার ও নিজের ছোট সুটকেসটা টেনে এনে খোলার মুখে ডালার ওপর লেবেল আঁটা নাম চোখে পড়ল—মধুবঙ্গ। এই নাম দেখে কোন দেশের বা কোন জাতের মানুষ ঠাওর করা গেল না। কিন্তু সুটকেস থেকে যে বস্তুটা বার করল, দেখে আমার চক্ষুস্থির। লম্বাটে ধরনের এক বাণ্ডিল বিড়ি। কোন ফার্স্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জারের মুখে বিড়ি দেখব এটা তখন কল্পনার বাইরে। একটা বিড়ি নিজের ঠোঁটে ঝোলাল। আমাকে চেয়ে থাকতে দেখে ড্যাবড্যাব করে সেও খানিক চেয়ে রইল। তারপর ইংরেজিতে মন্তব্য করল—ফাইন স্টাফ, চলবে?

আমি হকচকিয়ে গিয়ে হাত বাড়ালাম। অতি সাধারণ একটা লাইটার জ্বালিয়ে সে আমার বিড়ি ধরিয়ে দিয়ে নিজেরটা ধরাল। তারপর মস্ত একটা তৃপ্তির টান।

আমাদের কাণ্ড দেখে কামরার অপর দুই প্রায়-বৃদ্ধ দম্পতি অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

সাধারণ বিড়ি, আকারে একটু বড়, এমন কিছু ফাইন স্টাফ বলে আমার মনে হল না। কিন্তু ঐ লোকটা খুব মৌজ করে টানছে। আধাআধি শেষ করে আমার দিকে ফিরল আবার। তেমনি নির্লিপ্ত মন্তব্য করল, খুব সস্তা বলে এ জিনিসটা আরো ভালো লাগে, একগাদা কিনে নিয়েছি।

ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীর মুখে এ-কথা শুনে একটু যেন ধাক্কাই খেলাম। বলে ফেললাম, শুধু সস্তা বলে বিড়ি খান, না কড়া জিনিসের লোভে?

জবাব দিল, চুরুট আরো কড়া, আরো বেশি ভালও লাগে, কিন্তু বেশি দাম—

হেসেই জিজ্ঞাসা করলাম, এত দূরের পথ ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছেন অথচ বেশি দামের জন্য চুরুট কিনে খান না?

বিড়িতে শেষ টান দিয়ে সাদাসাপটা জবাব দিল, আমিও আপনার মতই ফোকটে ফার্স্ট ক্লাসে যাচ্ছি—নিজের পয়সায় থার্ড ক্লাসে যেতে হলে চোখে সর্ষেফুল দেখতে হয়।

আমি হতভম্ব। ও ফোকটে মানে পরের পয়সায় যাচ্ছে সেটা নিজে বলল, কিন্তু আমি কার ঘাড়ের ওপর দিয়ে যাচ্ছি সে তো আমার গায়ে লেখা নেই —জানল কি করে।

আমার বিস্ময় ওর নিস্পৃহ বিশ্লেষণের বস্তু যেন। নিজে থেকেই বলল, আপনি তো অমুক প্রযোজকের অমকু ছবির স্ক্রীপট্-এর কাজে সাহায্য করতে যাচ্ছেন?

বিমূঢ় মুখে মাথা নাড়লাম।

কড়ে আঙুলের ডগটা নিজের কানের গহ্বরে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘন-ঘন নাড়ল একপ্রস্থ। আয়েসে চোখ দুটো ছোট হয়ে এলো। তারপর বয়েসয়ে বলল, আমি বাংলা কথা-বার্তা মোটামুটি বুঝি, আপনাকে যারা তুলে দিতে এসেছিল তাদের আর আপনার কথা থেকেই জেনেছি কেন বম্বে যাচ্ছেন—আপনার ওই ছবিতে আমিও একটা রোল পাবার চেষ্টা করেছিলাম—হল না।

আমি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি ফিল্ম আর্টিস্ট?

মাথা নাড়ল।—আর্টিস্ট ঠিক না, ফিল্ম-ভাঁড় বলতে পারেন।

সুটকেসের লেবেলে নাম দেখেছি মধুরঙ্গ। এই নামের কোন কমিক অ্যাকটর স্মরণে আসছে না। অথচ মুখখানা চেনা-চেনা লাগছে। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি শেষ কোন ছবিতে কাজ করেছেন?

বলল— আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল আমার। হ্যাঁ, হাঁড়ি-মুখো এক কিশোর জবর হাসিয়েছিল বটে ওই ছবিটাতে। আর্টিস্ট-এর নামটাও মনে পড়ে গেল তখুনি।

শুধোলাম, আপনার নাম কি?

—মধু রঙ্গনাথন। ছেঁটে সেটাকে মধুরঙ্গ করেছি। ফিল্মের নাম ভিন্ন।

সেই ভিন্ন নাম আজ সুপরিচিত। আর সেই কারণেই নামটা অনুক্ত থাক।

ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগে সেই দুদিনের যাত্রাপথে মধু রঙ্গনাথন আমার অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল। সেই বন্ধুত্ব দিনে দিনে বেড়েছে। বম্বেতে সেই প্রথমবারে পৌঁছেও বড়লোকের আতিথ্য ছেড়ে ওর একখানা ঘরেরই ভাগীদার হয়েছিলাম। আর আমার সক্রিয় চেষ্টার ফলে পরিচিত ডিরেক্টার ভদ্রলোক প্রযোজককে বলে ওর একটা রোলের ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন।

ট্রেনের দু'দিনের সান্নিধ্যেই আমার মনে হয়েছিল, মধু রঙ্গনাথন একদিন বড় আর্টিস্ট হবে। কারণ দু'দিনের মধ্যে দু'বারও ওকে আমি হাসতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। অথচ ওর কথা শুনে আমি এক-একবার অট্টহাস্য করে উঠেছি। কিন্তু অবাক কাণ্ড, ওর গাম্ভীর্যটা এতটুকু কৃত্রিম মনে হয়নি কখনো। যেন সত্যি ভাবলেশশূন্য পটের মূর্তি একখানা।

ওকে জিজ্ঞাসা করেছি, ছবিতে না হয় না-ই হাসলে, বাইরেও অত গাম্ভীর্য কেন?

মধু জবাব দিয়েছেঃ কোনটা হাসির ব্যাপার আর কোনটা নয় সেটা যাচাই করার ফাঁকেই হাসির সময়টা উৎরে যায়। তাছাড়া এক-এক সময় হাসি, যখন কেউ হাসে না তখন জোরে হেসে উঠি।

—কেন?

—তাতে অন্য লোকের আমাকে বোকা ভাবতে সুবিধে হয়। তারা হাসে।

ট্রেনের সেই দীর্ঘ দু'দিনের অবকাশে অনেক মনের কথা আর মজার কথা বলেছে মধু রঙ্গনাথন। যত শুনেছি তত আমি ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি।

...বিয়ে করেছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে ও বলেছিল, এবারে কলকাতায় আসার আগেও বাবা তার একজন গেলাসের বন্ধুর মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চেষ্টা করেছিল।

বাবা তাব সঙ্গে থাকে না, অন্যত্র থাকে, আব সূর্যি ডুবলেই মদ নিয়ে বসে। নেশাব ঘোবে সেদিন ওব ঘবে এসে গর্জন কবে বলল, তোব বউ দবকাব, একটা বউ এনে দিচ্ছি।

ছেলে সায দিযে জিজ্ঞাসা কবেছে, তা তো দবকাব...কিন্তু কাব বউ আনবে? শুনে ওব বাবাও নাকি চিন্তায পডে গেছে, বলেছে, তাই তো, কাব বউয়েব দিকে আবাব হাত বাডাতে যাব।

..কলেজে পডতে সমবযসী একটা মেযেকে বিযে কবাব জন্য নাকি পাগল হয়ে উঠেছিল মধু। শেষ পর্যন্ত সেই মেযেব ওপব চডাও হযে একদিন আবেদন জানাল, কি বললে তুমি বিশ্বাস কববে আমি তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে বিয়ে কবতে চাই?

মুখেব দিকে খানিক চেযে থেকে সেই মেযে নাকি জবাব দিয়েছে, মোটে তিনটে কথা বললে।

—কি কথা? কি তিনটে কথা? মধু আশান্বিত।

—এক লক্ষ টাকা।

মধু লম্বা লাফ মেবে পালিয়েছে।

..হযতো বানানো গল্প সব। শুনে আমি হেসে অস্থিব। কিন্তু ওব মুখে হাসি দেখিনি।

বর্তমানেব মনেব কথাও বলেছে। একটা মেযেকে ভযানক ভালবাসে। এখানকাবই মেযে। তাব বাপ যুনিভার্সিটিব প্রোফেসাব —মেযেব নাম দুর্গা। সে ও যুনিভার্সিটিতে পডছে। ভালো ছাত্রী। কিন্তু মধুব থেকেও গম্ভীব নাকি। বিযেব কথা একবাব বলতে এমন তাকিযেছিল যে মধুব জমে যাওযাব দাখিল। অনেক দূব-সম্পর্কেব আত্মীয়া ওদেব, সেই সুবাদে ছেলেবেলা থেকে জানাশুনা। মধুব সাফ সিদ্ধান্ত, দুর্গাকে হয বিযে কববে নযতো খুন কববে। ওব মতে দুর্গা ভযানক অবুঝ মেযে, ওব জন্যই বেশি টাকা বোজগাবেব আশায মধু ফিল্মে নেমেছে, মেযে কোথায খুশি হবে তা না, উল্টে বাগে ফুটছে।

এ গল্পও খুব যে বিশ্বাস কবেছিলাম এমন নয। কিন্তু বেডাতে বেডাতে একদিন ও আমাকে দুর্গাব বাডিতে নিযে গিযে হাজিব। তখনো ওব মতলব বুঝিনি। দুর্গাকে ডেকে বাংলা দেশেব মস্ত লেখক বলে পবিচয দিল আমাব। আমাব পবিচয বড কবে তুলে নিজেব কদব বাডাতে চায বোধহয। কিন্তু বাংলা দেশেব মস্ত লেখকেব প্রতি দুর্গাব তেমন আগ্রহ আছে মনে হল না। তবে মার্জিত রুচিব মেযে, অভদ্রতাও কবল না। সুন্দবী কিছু নয, বেশ স্বাস্থ্যবতী সুশ্রী মেযে।

পবেব চাব-পাঁচ বছবেব মধ্যে আবো বাবতিনেক বম্বেতে এসেছি। মধুও আব একবাব কলকাতায আমাব অতিথি হযে এসেছিল। কমিক অ্যাক্টব হিসেবে তখন মোটামুটি নাম হযেছে ওব। আব আমাব সঙ্গে বন্ধুত্বও গাঢ হযেছে। কিন্তু মধু বঙ্গনাথনেব হাবভাব কথাবার্তা সেই একবকমই আছে। দুর্গাব জন্য ওব হা-হুতাশ বেডেছে। দুর্গা এখন কলেজেব মাস্টাব, ওব দিকে ভালো কবে ফিবেও তাকাতে চায না— ফেবাবাব চেষ্টা কবলেও বেগে আগুন হয। মধু বঙ্গনাথনেব সুখশান্তি সব গেল। দুর্গাকে খুন কবাব সময এগিযে আসছে কিনা এখন সেই চিন্তা কবছে।

এর দু'মাসের মধ্যে বম্বে থেকে মধুর উচ্ছ্বাসভরা চিঠি পেলাম, দুর্গাকে খুন করতে পেরেছে, অর্থাৎ বিয়ে করে ঘরে আনতে পেরেছে। সেই প্রহসন শুনলে বন্ধু (অর্থাৎ আমি) নিশ্চয় চমৎকৃত হবে। কিন্তু বিয়ে করাব পর দুর্গাবই উল্টে খুনী মেজাজ এখন। সকাল বিকেল দুপুব বাত্তিবে মুখ দিয়ে নযতো চোখ দিয়ে ঝাঁটাপেটা কবে ছাড়ছে। কেবল মধুব একটু-আধটু শবীর-টরীর খারাপ হলে ঘাবড়ে গিযে তাড়াতাডি বড ডাক্তাব ডাকে, অতএব মধু প্রাণপণে শরীব খারাপ কবতেই চেষ্টা কবছে।

এবপব বম্বেতে এসে ওদের অতিথি হযেছি। সত্যিই ভালো লেগেছে। মধু বঙ্গনাথন সেইবকমই গম্ভীর প্রায়, কিন্তু ভিতবে ভিতরে ও যে আনন্দে ভাসছে তাও বোঝা যায়।

কি করে শেষ পর্যন্ত দুর্গাকে ঘবে আনা গেল, মধু একদিন চুপি চুপি তাও বলল আমাকে। শুনে আমি হাঁ। বিশ্বাস করব কি কবব না ভেবে পেলাম না।

বললাম, সত্যি বলছ কি বানিযে বলছ, দুর্গাকে ডেকে জিজ্ঞাসা কবব।

মধু আঁতকে উঠল।—আমাব পেশাব দিব্বি কেটে বলছি, এক বর্ণও মিথ্যে বলিনি —কিন্তু দুর্গাকে জিজ্ঞেস কবতে গেলে ও ঠিক ডিভোর্স করবে আমাকে।

বিশ্বাস কবেছি। কিন্তু যতবার মনে পড়েছে প্রহসনটা, নিজেব মনেই হেসে বাঁচি না। মধুর মাথা বটে একখানা—এমন কাণ্ড কবেও কাউকে বিয়ে কবে ঘবে টেনে আনা যায়!

...দুর্গাকে বিযে করতে পাবাব এই অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা আব একটু বাদে ব্যক্ত কবব। কাবণ ওই একই ব্যাপার থেকে মধু বঙ্গনাথন-এব জীবনেব দুটো দিক দেখা গেছে। ...একটা জীবনের দিক, অন্যটা জীবন-মৃত্যুব দিক।

বম্বে গেলে ওদের অতিথি হতাম। দুর্গা আমাকে আদবযত্ন কবত। এই দীর্ঘকালেব মধ্যে ওরাও যুগলে এসে কলকাতায অনেকবাব আমাব বাড়িতে থেকে গেছে। সেই শুরু থেকে দেখে এসেছি, মধু বঙ্গনাথনকে দুর্গা কড়া শাসনে বাখে।

বেশি বাচালতা করলে অন্য লোকেব সামনেই ধমকে ওঠে। দুর্গা কলেজের মাস্টারি ছাড়েনি, স্বামীটিব ওপব সর্বদাই ওব মাস্টাবি মেজাজ। আমার কেমন ধারণা, দুর্গার ওই কড়া শাসন মধুব ভালো লাগে, আর সেই কারণে ওব গম্ভীব বাচালতা বাড়ছে বই কমেনি।

কমিক অ্যাক্টব হিসেবে তাব দস্তুবমতো নামডাক তখন। কিন্তু তাব ছবিব ভাঁড়ামোও দুর্গাব চক্ষুশূল যেন। ও ব্যাপাবেবও মাত্রা ছাড়ালে সে দস্তুবমতো রাগারাগি করে। একবাবেব ঘটনায় বম্বেতেই উপস্থিত ছিলাম আমি। মধুব একটা ছবি তখন হৈ-চৈ করে চলছে। আমিও দেখে এলাম। ওর বোল আব অভিনয় দেখে পেটে খিল ধরাব দাখিল। এক বড়লোকের বাড়ির ড্রাইভারেব ভূমিকা ওর। নির্লিপ্ত বোকা-মুখ কবে বড়লোকেব বাড়িব কেচ্ছা দেখে অভ্যস্ত। ঘরে তার বিষম রাগী আব ঝগড়াটে স্ত্রী এবং একটি বযস্থা মেযে। মেযে রূপসী নয আদৌ। অতএব মেযেব মা পছন্দ-মতো পাত্র পায় না। মাথা খাটিয়ে মেয়ের মা একটা রাস্তা বার করল। মেয়েকে বলল,

বক্স নম্বর দিয়ে কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দে—তাতে লেখা থাকবে বড়লোকের ছাব্বিশ বছরের একটিমাত্র মেয়ের জন্য শিক্ষিত সুশ্রী এবং দিলদরিয়া মেজাজের পুরুষ সঙ্গী চাই। মেয়ের বিবাহ কাম্য নয়, অন্তরঙ্গ মেলামেশাটুকুই কাম্য।

মেয়ের মায়ের আশা, এই টোপে বড়লোকের যোগ্য ছেলেরা ছুটে আসবে, আর অন্তরঙ্গ মেলামেশার পরেও মেয়ে মায়ের সাহায্যে একজনকে গেঁথে তুলতে পারবেই।

বিজ্ঞাপন দেওয়া হল। কিছুদিন বাদে মা মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার, বক্স নম্বরের বিজ্ঞাপনের জবাব আসছে না?

মেয়ে আমতা-আমতা করে জবাব দিল, একটা মাত্র এসেছে।

—কার কাছ থেকে? মা উদগ্রীব।

—সেটা একটু গোপনীয়, বলব না।

—হতচ্ছাড়ী মেয়ে, শীগগীর বল—কার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছিস?

কাতর মুখ করে মেয়ে জবাব দিল, বাবার কাছ থেকে।

এরপর ওই দজ্জাল মায়ের হাতে বাবার হেনস্থা দেখে হাসতে হাসতে দম বন্ধ হবার উপক্রম।'

এই ছবি দেখে দুর্গা নাকি মধুর সঙ্গে কুরুক্ষেত্র করে ছেড়েছে। দুর্গা নিজেই আমাকে বলেছে, ছবিতে নিজের ওই প্রহসন মধু নাকি নিজেই বানিয়ে নিয়েছে —আসল গলায় ওর কোনো ভূমিকা ছিল না।

কিন্তু যতই কড়া মেজাজ হোক, স্বামীর প্রতি দুর্গার প্রচ্ছন্ন যত্নটুকুও আমি স্বচক্ষে দেখেছি। ও কম খেলে বা শরীর একটু খারাপ হলে বকা-ঝকার ভিতর দিয়েও ওর আসল দরদের মূর্তিটা আমার চোখ এড়ায় নি।

গত বছর অর্থাৎ ওদের বিয়ের প্রায় বিশ বছর বাদে হঠাৎ একদিন খবর পেলাম মধু দুর্গাকে খুইয়েছে। মাত্র তিনদিনের জ্বরে দুর্গা মারা গেছে।

শুনে মনটা কি যে খারাপ হয়েছিল নিজেই জানি। মধুকে দু'তিনখানা চিঠি লিখেও জবাব পাইনি। মাস ছয় বাদে বম্বেতে যাবার আমার সুযোগ মিলল। এসেই ওর বাড়ি ছুটলাম। কিন্তু বাড়ি তালাবন্ধ, মধু নেই। কোথায় গেছে তাও কেউ বলতে পারল না। আজ চারমাস ধরে সে নাকি নি-পাত্তা। একসঙ্গে চার-পাঁচটি প্রযোজক ছবির মাঝখানে ওর জন্যে আটকে গিয়ে নাকি মাথায় হাত দিয়ে বসেছে।

আমার পরিচিত পরিচালক এবং আরো জনাকয়েকের মুখে ওর কথা শুনলাম। সকলেই বীতশ্রদ্ধ মধুর ওপর। কথায় কথায় পরিচালক বলল, ভাঁড়ের ভাঁড়ামীরও একটা সীমা আছে। বউ মরে যেতে সক্কলের সামনে শ্মশানে দাঁড়িয়ে পর্যন্ত মধু কি করল জানেন? দুর্গাকে চিতায় শোয়ানো হয়েছে, আর মধু দুই চোখের জল ছেড়ে দিয়ে নিজের একটা হাতের উল্টোদিক মুখে ঠেকিয়ে চট-চট শব্দ করে চুমু খেতে লাগল—যেন দুর্গাকেই ক্রমাগত চুমু খেয়ে চলেছে—তার চোখমুখের সে কি হাব-ভাব তখন। যারা ছিল তারা শোক করবে কি, হেসে সারা।

...হাতের উল্টোপিঠ মুখে ঠেকিয়ে শব্দ করে চুমু খাওয়ার একটা রহস্য আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। তাই সকলে একটা ভাঁড়ামী ভেবেছে।

...দুর্গাকে বিয়ে করতে পারার সেই অবিশ্বাস্য কাণ্ডটা এবারে ব্যক্ত করা যেতে পারে।

...মধুকে দুর্গা আমল দেবেই না। আর মধুও না-ছোড়। সেদিনের ঘটনা, সেই সকালেও নাকি দুর্গা দাবড়ানী দিয়ে মধুকে বাতিল করতে চেয়েছে, বলেছে, পুরুষকার থাকলে কোনো ছেলে ছবিতে ভাঁড়ামী করে না—সে একটি দুর্বল-চিত্ত অমানুষতাকে আবার বিয়ে।

সেই দুপুরেই একজন বান্ধবীর সঙ্গে দুর্গার দেড়শ-দু'শ মাইল দূরে কোথায় যাবার কথা। মধুর হাতে কোনো কাজ নেই শুনে দুর্গার বাবা মধুকেই ওদের চলনদার ঠিক করে দিয়েছে। দুর্গার আপত্তি ছিল, কিন্তু এ-ব্যাপারে সোরগোল করে আপত্তি করতেও ওর রুচিতে বাধে। কিন্তু মধু সঙ্গে যাচ্ছে শুনে দুর্গার বান্ধবী মহাখুশি। সে আবার মধুর খুব ভক্ত।

ট্রেনের একটা খুপরিতে ওরা দু'জন পাশাপাশি বসেছে, ওদের উল্টোদিকে মধু রঙ্গনাথন। দুর্গার বান্ধবী সেই থেকে ভাবী খুশিমেজাজে মধুর সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করছে—আর অনর্গল তার প্রশংসা করে চলেছে। দুর্গা বেশির ভাগ সময়ই গম্ভীর।

একসময় একটা মস্ত টানেলের মধ্যে গাড়িটা ঢুকে পড়ল। মধু জানে লম্বা টানেল। গাড়ীর ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকে নিজের হাতের উল্টো-পিঠ মুখে ঠেকিয়ে বেশ রসিয়ে এবং অল্প অল্প শব্দ করে দীর্ঘ একটা চুমু খেয়ে বসল।

গাড়ি অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে বেরুবার আগেই তার আবার হাবাগোবা মুখ।

গাড়ি আবার আলোয় আসার সঙ্গে সঙ্গে দুই মহিলা দু'জনের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালো। দুজনারই খরখরে মুখ, করকরে চাউনি। সারাক্ষণ আর কেউ কারো সঙ্গে কথা বলল না।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছে মধুকে আড়ালে টেনে এনে দুর্গা মুখে যা আসে তাই বলে গালাগালি করল— শয়তান বলল, চরিত্রহীন বলল, তাড়িয়ে দিতে চাইল।

মধু জবাবদিহি করল, আমাকে দুর্বল পুরুষকারশূন্য বলো, তাই ভাবলাম—

দুর্গা আরো তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। আরো বেশি গর্জন করে ওকে তাড়িয়ে দিতে চাইল।

ফলে মধুরও একটু রাগ হয়ে গেল। বলে ফেলল, এতই যদি খারাপ লাগল তো ধরলাম যখন, আমাকে ঠেলে ফেলে দিলে না কেন—অতক্ষণ ধরে চুমু খাওয়া সত্ত্বেও একটু বাধা দিলে না কেন, তোমার ভালো লাগছে ভেবেই আমার আনন্দ হল, আর তাইতেই একটু শব্দ বেরিয়ে গেল। আসলে বান্ধবী পাশে ছিল বলেই তোমার অত রাগ এখন, তখন তো দিব্বি গলা জড়িয়ে ধরলে—

—কি? কি বলছ তুমি? রাগে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল দুর্গা।— তুমি আমাকে ধরেছিলে, আর আমি বাধা দিলাম না। আমি তোমাকে ঠেলে ফেলে দিলাম না, আমি তোমার গলা জড়িয়ে ধরলাম। পাজী শয়তান মিথ্যেবাদী কোথাকার।

—যাঃ কলা। মধুব বিমূঢ় মূর্তি।—অন্ধকাবে আমি তাহলে নার্ভাস হযে গিযে কাকে ধবতে কাকে ধবেছিলাম? ছি ছি ছি ছি—আমাকে সত্যি তুমি গুলী কবে মাবো, তুমি না মাবলে আমি ফিবে গিযে নিজেই আত্মহত্যা কবব।

সঙ্গে সঙ্গে গালেব ওপব ঠাস কবে একটা চড। চড মেবে দুর্গা জ্বলতে জ্বলতে ঘব ছেড়ে·চলে গেল।

...বাড়ি ফিবে বিযেতে বাজী হযেছে। কিন্তু দুর্গা কোনদিন বিশ্বাস কবেনি, মধু সত্যিই ভুল কবে ওই কাণ্ড কবেছে। তাব বদ্ধ বিশ্বাস, তাকে জব্দ কবা আব আক্কেল দেবাব জন্যেই বেপবোযাব মতো বান্ধবীব ওপব ওই হামলা কবেছে। বিযেব পবেও নাকি এই নিযে ওকে অনেক গঞ্জনা দিযেছে দুর্গা।

ওদেব মুখে শোনা শেষেব দৃশ্যটা আমি চোখেব সামনে দেখতে পাচ্ছি। দুর্গা চিতাশয্যায শযান। আব চোখেব জলে ভেসে মধু পাগলেব মতো নিজেব হাতেব উল্টোপিঠ মুখে ঠেকিযে সশব্দে চুমু খেযে চলেছে।

. এই বেপবোযা কাণ্ড কবে মধু বঙ্গনাথন দুর্গাকে একদিন নিজেব জীবনে টেনে আনতে পেবেছিল। আব ঠিক এমনি কবেই নিজেকে জাহান্নামে পাঠাবাব ভয দেখিযে দুর্গাকে সে চিতা-শয্যা থেকে তুলে আনতে চেষ্টা কবেছে।

ক্ষুধা

ট্রেনে সাধাবণত থার্ড ক্লাসেব খদ্দেব আমি। শ্রীপাব কোচে সাড়ে চাব টাকাব বাড়তি মাশুল গুনে বাতে ঘুমোবাব জন্যে একখানা বেঞ্চ পেলেই খুশি। ফলে অভ্যেসখানা এমন হযেছে যে, ববাতজোবে সদ্য বর্তমানে ফার্স্ট ক্লাস বিজার্ভ কোচেব চাবজনেব বিচ্ছিন্ন কম্পার্টমেন্টে এত আবামেব জাযগা পেযেও ট্রেন ছাড়াব কিছুক্ষণ বাদেই ভেতবটা ওই থার্ড ক্লাসেব জন্যেই আনচান কবে উঠেছিল। অথচ একটু আগে এই অভিজাত খুপবিতে পদার্পণ কবে এবং আসন নিযে ভেতবটা প্রসন্ন হযে উঠেছিল। পবিষ্কাব চকচকে কামবা, দু'দিকে দুটো পুরু গদিআঁটা বার্থ, আব ওপবে তেমনি গদিআঁটা আবো দুটো বার্থ। বেশ চওড়া। শুলে পিঠেব সিকিভাগ বেবিযে থাকাব সম্ভাবনা নেই। মাথাব ওপব চাবজনেব জন্যে চাবটে পাখা, দুটো বড় সাদা লাইট, একটা সবুজ লাইট, শিযবেব দিকেব ওপবে নীচে চাব কোণে চাবটে শেড-দেওযা ছোট পড়াব লাইট—স্বাচ্ছন্দ্যেব আবো কিছু আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা। সামনেব দবজাটা টেনে দিলেই চাবটি যাত্রী ট্রেনেব মধ্যে থেকেও বিচ্ছিন্ন।

মোট কথা, এই শ্রেণীব যাত্রীদেব মান এবং মর্যাদা সম্পর্কে বেল কর্তৃপক্ষ কিছুটা সচেতন। তা যত গুড় তত মিষ্টি। এযাব-কনডিশন আবো আবামেব, এবোপ্লেনে ততোধিক, আব এই গুড় যদি নিজেব পকেট থেকে ঢালতে না হয তাহলে যাকে বলে মিষ্টি মধুব। এই যাত্রায আমি চলেছি সম্মানিত অতিথি হিসেবে একজন সহযাত্রীব

কাঁধে ভব কবে যিনি পকেটেব পবোযা কবেন না। ফলে আমাব দিক থেকে এটি নির্ভেজাল আনন্দ-যাত্রা। আনন্দেব আবো কিছু ফিবিস্তি দেওযা যেতে পাবে। কোন ভবঘুবেব উক্তি, আপনাব বেড়াবাব আনন্দ অনেকখানি নির্ভব কবছে আপনাব সহযাত্রীব ওপবে। সহযাত্রী বা যাত্রীবা যদি স্বল্পভাষী অথচ বসিক হন তাহলে আপনি ভাগ্যবান, তিনি বা তাঁবা যদি আপনাব থেকে বাকপটু হন তাহলে আপনাব ভাগ্যটা মাঝাবি, আব যদি পলকা বাক্যবাগীশ হন তো আপনাব দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাঁদেব মধ্যে একটি মাত্র যদি সুদর্শনা বমণী থাকেন আব তিনি যদি সহযাত্রীব ওপব হাবভাবেও সামান্য একটু সহৃদযা হন আব অল্পসল্প মিষ্টি হাসেন আব একটু-আধটু কথা বলেন তো আপনাব ভাগ্যেব তুলনা নেই—পথ যত দীর্ঘ বা ক্লান্তিকব হোক, আপনাব ভিতবটা বংদাব তাজা ফড়িংযেব মত আনন্দেব ডালে ডালে ঘুবেফিবে বেড়াবে।

তা আমি এ-যাত্রায প্রায সব দিক থেকেই তুলনাবহিত ভাগ্যবান। চাব বার্থেব এই অভিজাত কম্পার্টমেন্টে আমাকে বাদ দিলে আব দু'জন সহযাত্রী এব, একজন সহযাত্রিনী। ভদ্রলোক দু'জনেব একজনেব বযেস পঁযতাল্লিশ একজনেব বড়জোব পঁযত্রিশ। তাঁবা মামাতো-পিসতুতো ভাই। এ-যাত্রায ওই পঁযতাল্লিশ, ভদ্রলোকটিব গৌবী সেনেব ভূমিকা। নাম তাঁব যাই হোক, সকলে মজুমদাব মশাই বা বড়বাবু বলে ডেকে থাকে। বাংলা ছাযাছবিব মোটামুটি নামী প্রযোজক অর্থাৎ প্রোডিউসাব তিনি। এতদিন নিতান্ত মাঝাবি প্রোডিউসাব ছিলেন, কিন্তু সম্প্রতি পব পব তাব দু'খানা ছবি উর্ধ্ব মার্গেব বক্স অফিস হীট। সেই বিত্তেব হিড়িকে বাতাবাতি বৃত্ত বদল হযে গেছে তাব। প্রযোজনাব সামনেব সাবিতে এসে হাজিব হযেছেন। সেই দু'খানা ছবিই বিলিজেব পব পব আমি দেখে নিযেছিলাম এবং আশাহত হযেছিলাম। খবচেব টাকা উশুল হবে কিনা সংশয ছিল। কিন্তু সব সংশয বববাদ কবে ভদ্রলোক প্রমাণ কবেছেন বাংলা ছবিব দর্শক-মনেব কত নির্ভুল বিচাবক তিনি। দু'বছবে পব পব দু'খানা ছবি তাক-লাগানো ভাবে লাগিযে দিযে এখন সাদা আব কালো টাকাব হিসেব-নিকেশে মশগুল হযে আছেন। এবাবে তাব, যাকে বলে একখানা প্রেস্টিজ ছবি কবাব বাসনা। কিন্তু প্রযোজকেব শুধু প্রেস্টিজ ধুযে জল খেলে চলে না। কাগজওযালাবা গত দুটো হীট ছবিব একটিবও সদয মন্তব্য কবেনি। অতএব এবাব নাম চাই আব সেই সঙ্গে টাকাও চাই।

অনেক খেটে অনেক জল্পনা-কল্পনা কবে এই প্রেস্টিজ ছবিব যে গল্প বাছাই কবা হযেছে, ভাগ্যক্রমে সেটা আমাবই লেখা। সত্য কথা বলতে কি, আমি নিজেই একটু অবাক হযে গেছলাম। আগেব ওই সুপাবহীট পিকচাব যাবা কবেছেন তাদেব কেউ এ গল্পেব ছাযা মাড়াতে পাবেন, ভাবিনি। কিন্তু আমাব ভাবনা নিযে তো আব জগৎ চলছে না, আব বলা বাহুল্য, এই ব্যতিক্রমেব ফলে অন্তত ভদ্রলোকেব সম্পর্কে ধাবণা অনেকখানি বদলেছে। এখন আমাব ধাবণা, টাকা কি কবে কবতে হয ভদ্রলোক জানেন, সেই সঙ্গে ভালো-মন্দেব বিচাব-বোধও আছে। ব্যবসাযী হিসাবে গল্পেব দাম নিযে প্রথম দফায কিছু ঝকাঝকি কবেছেন আমাব সঙ্গে, ফযসলা হযে যাবাব পব তিনি ভিন্ন মানুষ।

দিলদরিয়া অতিথি-বৎসল। গল্পের আলোচনার জন্য বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে অনেক খাইয়েছেন। এই ছবিতে নিযুক্ত নামী পরিচালকটির কাছে নিজের বক্তব্য শেষ করার জন্য আমাকে ঠেলে দিয়েছেন। লক্ষ্ণৌতে আউটডোর শুটিং-এ চলেছেন এঁরা। ইউনিট নিয়ে পরিচালক দু'দিন আগেই যাত্রা করেছেন। মজুমদার মশাই, অন্যথায় বড়বাবু, ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাপারে আটকে পড়েছিলেন বলে দু'দিন পরে যাচ্ছেন। বড়বাবুর সর্বকাজের প্রধান দোসর তাঁর এই পিসতুতো ভাই হিরন্ময় বা হিরু গুপ্ত। বড়বাবু না নড়লে তারও নড়ার উপায় নেই। অতএব ম্যানেজারির ভার অন্যের ওপর চাপিয়ে সে-ও দুদিনের জন্য পিছিয়ে গেছে। আমার সঙ্গী হবার বাসনাটা সে-ই বড়বাবুকে জানিয়েছিল, শোনামাত্র ভদ্রলোক আমাকে দরাজ আমন্ত্রণ জানিয়ে-ছিলেন।

এ হেন সহযাত্রী আর যাই হোক অবাঞ্ছিত নন। তাছাড়া ভদ্রলোক কথা বেশি বলেন না, তার থেকে ঢের বেশি মিটিমিটি হাসেন। তখন তাঁর খুশি-খুশি ফোলা গাল দুটোকে টসটসে রসালো মনে হয়। লক্ষ্য করেছি তাঁর কথায় সোজা সায় দিলে তিনি সেটা চাটুকারিতা ভাবেন, কিন্তু প্রতিবাদ করে শেষে যুক্তি খুঁজে না পেয়ে হার মানলে তুষ্ট হন। হিরু গুপ্তের আচরণে এই বৈশিষ্ট্যটুকুই লক্ষ্য করেছি। প্রতি কথায় প্রথমে বাধা দিয়ে পরে স্বীকার করবে, তুমি ঠিকই বলেছিলে, আমি আগে বুঝিনি, বা এদিকটা খেয়াল করিনি, ইত্যাদি।

পাঠানকোট সকালে ছাড়ে, পরদিন সকাল সাড়ে আটটায় লক্ষ্ণৌ পৌঁছায়। অতএব আমাদের গোছগাছ নিয়ে তাড়ার কিচ্ছু ছিল না। কিন্তু গাড়িটা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মজুমদার মশাই উঠে দাঁড়িয়ে বার্থগুলো একনজর দেখে নিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, ওপরে না নীচে?

আমি জবাব দেবার আগেই হিরু গুপ্ত মন্তব্য করেছে, ওনার নীচের বার্থ হলেই সুবিধে হয় বোধহয়, কিন্তু

কিন্তুর দিকে না গিয়ে তাড়াতাড়ি বলেছি, না না, ওপরের বার্থে আমার একটুও অসুবিধে হবে না। সঙ্গে সঙ্গে সামনের মহিলার দিকে চোখ গেছে। তার নির্লিপ্ত মুখভাব। নীচের আর একখানা বার্থ তার দখলে থাকবে জানা কথাই।

মৃদু হেসে মজুমদার মশাই নিজের হাতে আমার বেডিং খুলতে গেলেন। তাঁর উদ্দেশ্য বোঝার আগেই হিরু গুপ্ত হাঁ-হাঁ করে উঠল, আহা, ওঁর বিছানা পরে করে দেওয়া যাবে— সর্বব্যাপারে তোমার ব্যস্ততা—

পরে নয় এখনই করে দে তাহলে। আর ওই বার্থে তোরটাও পেতে ফেল —সবকিছু পরিপাটি ছিমছাম না হলে আমার অস্বস্তি।

আমি কিছু বলার ফুরসুত পেলাম না। হিরু গুপ্ত অপ্রসন্ন মুখে আমার হোলড অলটা টান মেরে খুলে ফেলল। অতএব ব্যস্ত হয়ে আমিও তার সঙ্গে হাত লাগালাম। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমার ফিটফাট শয্যা রচনা হয়ে গেল। এরপর দ্বিতীয় বাংকে সে নিজের তকতকে শয্যা বিছালো, তারপর নেমে এসে বলল, এবার তোমাদেরটাও শেষ করে যে যার শুয়ে পড়া যাক।

অল্প হেসে মজুমদাব মশাই বললেন, আমাদেবটা এখন কি, বসতে হবে, খাওযা-দাওযা সাবতে হবে—

বলতে বলতে ঝুঁকে বড ট্রাংকটা খুলে দুটো ঝকমকে গালচে বাব কবলেন। —নীচে আপাতত এই দুটো বিছিযে দে।

নীচেব গদি-আঁটা বেঞ্চদুটোয শৌখিন গালচে বিছানো হল। এ ব্যাপাবে দেওবেব সঙ্গে মহিলা নিজেও হাত লাগালো। তাবপব জিনিসপত্রগুলোও জাযগামত গোছগাছ কবে বাখল। এই সামান্য কাজটুকু দেখেই আমাব কেমন মনে হল, মহিলাব রুচিবোধ আছে। তাছাডা ওপবে বিছানাপত্র সুবিন্যস্ত কবা আব নীচে গালচে দুটো পেতে অন্য জিনিসগুলো গুছিযে বাখাব পবে ছোট কামবাটাব শ্রীই বদলে গেল। ধপ কবে হাত-পা ছডিযে বসে পডে ঈষৎ অপ্রতিভ মুখে হিরু গুপ্ত মন্তব্য কবল, সত্যিই এখন ভালই তো লাগছে দেখি।

তোষামোদটুকু যাঁব উদ্দেশ্যে তিনি অর্থাৎ মজুমদাব মশাই সেটা স্মিতহাস্যে গ্রহণ কবে আমাব দিকে ফিবলেন।—বসুন, এখন কি খাবেন বলুন?

এবাবও হিরু গুপ্ত আগেই তডবড কবে উঠল, এই তো খেযে বেরুনো হল সবে, এখনই আবাব খাওযা কি!

আমিও সায দিলাম, যাক খানিকক্ষণ।

মজুমদাব মশাই স্ত্রীব উল্টোদিকেব আসনে গা ছেডে দিযে বসলেন। ঠোঁটেব ফাঁকেব হাসিব অর্থ—দেখা যাক কতক্ষণ কাটে।

এবাবে দ্বিতীয সহযাত্রী হিরু গুপ্তব প্রসঙ্গ। আধমযলা লম্বাটে চেহাবা। নাকেব ডগা একটু থ্যাবডা, চোখ দুটো মন্দ নয, কিন্তু চাউনিটা বেশ প্রখব। এ চোখেব দিকে তাকালে মনে হয ওব মাথাব মধ্যে সর্বদাই কিছু একটা জল্পনা-কল্পনা চলছে, সেই কাবণে ওব মনটা যথার্থ স্থানে যেন প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নয। ফলে চাউনিব মধ্যে এক ধবনেব ধাবালো সংশযেব ছাযা।

সহযাত্রী হিসেবেও একে কোন শ্রেণীতে ফেলব বলা শক্ত। কাবণ কথা যখন বলে অনর্গল বলে যেতে পাবে। আবাব যখন চুপ কবে থাকল একেবাবে চুপ। হাবভাব ছটফটে গোছেব। আজ নয, আগেও মনে হযেছে ওব ভিতবে কিছু একটা অসহিষ্ণুতা দানা বেঁধে আছে। সেই ঝোঁকে চলে, সেই ঝোঁকে কথা বলে। বডবাবুব সে ডান হাত, ইউনিটে স্বভাবতই তাব অখণ্ড প্রতাপ।

আমাব সঙ্গে এব প্রথম আলাপ ছবিব এই গল্প নিযেই। এ গল্প নির্বাচনেব ব্যাপাবে সে-ই যে প্রথম উদ্যোক্তা এটা সে গোডাতেই আমাব কাছে জোব গলায জাহিব কবেছে, দাদা কি সহজে বুঝতে চায মশাই, নাকি এসব হাই জিনিস সহজে তাব মগজে ঢোকে! ঠেসে ঢোকাতে হযেছে মশাই, বুঝলেন? এ-জন্য ডিবেক্টবকে পর্যন্ত আগেভাগে হাত কবতে হযেছে। গল্প পডে তিনি টলতে দাদা ঢলল। গল্পটা ভাল কবে মাথায ঢোকাব পবে অবশ্য দাদাব উৎসাহ সকলকে ছাডিযেছে। আমাব অবিশ্বাসেব কাবণ নেই, কাবণ কি ছবি উনি আগে কবেছেন দেখেছি। ভিতবে ভিতবে হিরু গুপ্তব প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। দিনকযেক বাডিতে আসাব ফলে বেশ খাতিব হযে গেছল। সেই খাতিব জমাট বেঁধে

গেল কিছুদিন আগেব এক সন্ধ্যায। সেই সন্ধ্যায বাড়িতে এব জন্যে আমি প্রস্তুত হযেই অপেক্ষা কবছিলাম। কাবণ সেই দিন আমাব এই ছবিব গল্পেব পুবো দাম অর্থাৎ বেশ কযেক হাজাব টাকা প্রাপ্তিযোগ আছে।

নির্দিষ্ট সমযেব প্রায ঘণ্টাখানেক বাদে হিরু গুপ্ত এলো। আশা কবেছিলাম ফাইনাল লেনদেনেব ব্যাপাবে তাব দাদাও আসবেন। কিন্তু গাড়ি থেকে হিরু গুপ্ত একাই নামল।

তাব দিকে চেযে আমি অবাক একটু। শুকনো ক্লান্ত মুখ, উসকো-খুসকো চুল। এসেই টাকাব বাণ্ডিল সামনে ফেলে দিযে বিসিট বাব কবে বলল, দেখে নিযে সই কবে দিন—

দেখে নেওযা অর্থাৎ টাকা গুনে নেওযা দবকাব বোধ কবলাম না। যাবা দিচ্ছে দেখেশুনে গুনেই দিচ্ছে। বিসিটটা নাড়াচাড়া কবতে কবতে জিজ্ঞাসা কবলাম, আপনাকে ভালো দেখাচ্ছে না, অসুস্থ নাকি?

—না মশাই, এই লোহা-মার্কা শবীবে অসুখ-বিসুখ নেই—সেই সকাল থেকে আপনাব এই ছবিব ব্যাপাবে ছোটাছুটি, তাবপব তিনটে থেকে ছ'টা পর্যন্ত ইনকাম ট্যাক্স, সেখান থেকে ডিবেক্টবেব সঙ্গে অ্যাপযেন্টমেন্ট সেবে আপনাব এখানে আসছি —সকাল থেকে চান দূবে থাক পেটে একটা দানা পড়েনি।

আমি ব্যস্ত হযে উঠলাম।—সে কি। নিজে না এসে দাদাকে পাঠালেই তো পাবতেন।

হাসল। হাসিটা কেমন তিক্ত মনে হল আমাব। জবাব দিল, তিনি আজ ব্যস্ত বড়, তাব ব্যস্ততাব সবটুকুই আনন্দেব। নিন সই করুন চটপট—

বিসিট বেখে টাকাব বাণ্ডিল হাতে কবে আমি উঠে দাড়ালাম।— সই পবে হবে, আপনি ঠাণ্ডা হযে বসুন বিশ মিনিটেব মধ্যেই আমি আপনাব খাওযাব ব্যবস্থা কবছি।

এই আন্তবিকতাব ফলে উল্টে কেউ যে বিবক্ত হতে পাবে ধাবণা ছিল না। হিরু গুপ্ত যথার্থই বিবক্ত। উঠে দাড়াল একেবাবে।— দেখুন মশাই, আমাব মেজাজপত্র এখন ভাল নয, সই কববেন তো করুন, নইলে আমি চললাম, পবে সই কবে পাঠিযে দেবেন।

মেজাজ দেখে সত্যিই বিব্রত বোধ কবলাম একটু। বসে বিসিট সই কবে দিলাম। সেটা দেবাব ছলে তাব হাত ধবে সকাতবে বললাম, দেখুন সমস্ত দিন উপোস কবে আপনি টাকা দিতে এসে শুধু-মুখে ফিবে গেলে খুব খাবাপ লাগবে, আপনি দশটা মিনিট বসুন, আমি যা হোক কিছু ব্যবস্থা কবছি।

বিবক্তি চাপতে চেষ্টা কবে সোজা মুখেব দিকে তাকালো। তাবপব কি ভেবে থমকালো একটু।—খাওযাতে চান?

—যা হোক একটু কিছু—

—একটু কিছু কি খাওযাবেন?

—একটু সময দিলে যা খেতে চাইবেন তাঁই খাওযাব।

হাতঘড়িটা দেখে নিল। সাড়ে সাতটা। আবার চোখে চোখ রেখে দুই এক পলক ভেবে নিল। তারপর কষ্ট করে হেসে বলল, সমস্ত দিন বাদে একটু কিছু খেয়ে আর কি হবে, আজ আপনার সুদিন, খাওয়াতে চান তো ভালো করেই খাওয়াবেন চলুন, আমি গাড়িতে বসছি, চটপট রেডি হয়ে আসুন।

আমি হতভম্ব একটু। হিরু গুপ্ত ততক্ষণে দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে। অগত্যা তাড়াতাড়ি ভিতরে এসে জামাকাপড় বদলে নিলাম। কি খেতে চায় ভগবানই জানেন। নোটের বাণ্ডিল থেকে দুটো একশো টাকার নোট পকেটে ফেলে বেরিয়ে এলাম। স্ত্রী ততক্ষণে খুশিচিত্তে নোটের তাড়া নিয়ে গুনতে বসেছেন।

যা মনে হয়েছিল তাই। গাড়িতে পাঁচটা কথাও হল না, অভিজাত এলাকায় এসে যে ভোজনশালাটি বেছে নিল সেটি পানশালাও বটে। আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। হিরু গুপ্ত ড্রিংক-এর অর্ডার পেশ করল। আমার চলে না শুনে একটু যেন বিরক্ত। বেয়ারা চলে যেতে মন্তব্য করল, আপনি একেবারে জলো লেখক দেখি—

নিঃশব্দে দু'দ'ফা গেলাস খালি করল। ইশারায় বয়কে আবার ঢেলে দিতে বলল। ইতিমধ্যে খাবার অর্ডারও সে-ই দিয়েছে। এতক্ষণে একটু একটু করে মেজাজ আসছে মনে হল। মুখে সস্তা কড়া সিগারেট লেগেই আছে। ঘন ঘন সিগারেট খাওয়াটাও রোগ হিরু গুপ্তর। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, মদ কেন খাই বলুন তো?

—অভ্যেস করে ফেলেছেন।

—কেন অভ্যাস করতে গেলাম? ভালো জিনিস তো কিছু নয়। এই যে আমি একাই গিলে চলেছি, সামনে বসে আপনি খাচ্ছেন না—আপনার ওপর আমার রাগই হচ্ছে।

জবাব এড়াতে চেষ্টা করে বোকার মত একটু হাসলাম শুধু। চোঁ করে হিরু গুপ্ত গ্লাসের অর্ধেক সাবাড় করল। সিগারেটের ডগায় নতুন সিগারেট ধরিয়ে বলল, আসলে যন্ত্রণা ডোবাবার এ একটা মোক্ষম দাওয়াই। আমিও খেতাম না, এখন এন্তার খাই। শালারা খাবার দিতে এত দেরি করেছ কেন? কি বলছিলাম, যন্ত্রণা। আপনি আমার সঙ্গে পনেরো দিন এসব জায়গায় ঘুরুন, তারপর বাড়ি ফিরে একদিন দেখুন অন্য কোন লোকের সঙ্গে আপনার বউ পালিয়েছে বা সেই গোছের কিছু একটা হয়েছে —তখন দেখবেন মদ আপনার একমাত্র বন্ধু। হেসে উঠল, এটা একটা কথার কথা, মানে উপমা—

হিরু গুপ্ত এখন কথার মুড-এ আছে। আর এক চুমুকে গেলাস খালি করে হাঁক দিল, বোয়!

হন্তদন্ত হয়ে এসে বয় গেলাস বদলে সোডার বোতল খুলে সামনে রাখল। তার দিকে চেয়ে হিরু গুপ্ত নৃশংস অথচ ঠাণ্ডা গলায় বলল, পাঁচ মিনিটমে টেবিল পর খানা নহী আয়ে তো—

বাকিটুকু শেষ না করে পাঁচ আঙুলে খোলা সোডার বোতলটা চেপে ধরল সে। এখানকার বয় সম্ভবত খদ্দেরের এই গোছের মেজাজ দেখে অভ্যস্ত। গলা দিয়ে 'জি সাব' নির্গত করে চকিতে উধাও সে। হিরু গুপ্ত গেলাসে সোডা মেশালো। এইবার আমি আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়লাম। বললাম, আপনার যন্ত্রণাও মেয়েঘটিত নিশ্চয়ই।

গেলাস মুখে তুলতে গিয়েও তোলা হল না। হিরু গুপ্ত আকাশ থেকে পড়ল যেন একেবারে।—আমার যন্ত্রণার কথা আপনি জানলেন কি করে? আমি কিছু বলেছি?

নেশার ঘোরে আলোচনার প্রসঙ্গ এরই মধ্যে ভুলেছে মনে হল। আমার সুবিধেই হল, বললাম, আপনাকে দেখে কেন যেন আমার সেই রকমই মনে হয়।

—কি মনে হয়? উদগ্রীব।

—কোন মেয়ের কাছ থেকে আপনি বড় রকমের আঘাত পেয়েছেন।

থমথমে চোখে মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। তারপর বড় করে এক ঢোক গিলে নিয়ে বলল, এই জন্যেই আপনারা লেখক, আপনারা জীবনশিল্পী—আপনার সম্পর্কে আমার ধারণাই বদলে গেল।

অমায়িক একটু হেসে খাবারের প্রত্যাশায় আমি ঘাড় ফেরালাম। খাবার না আসা পর্যন্ত গেলাসের চাহিদা থামবে বলে মনে হয় না। খাওয়ার ফাঁকে হিরু গুপ্তর যন্ত্রণা প্রসঙ্গে পাড়ি দেবার ইচ্ছে।

গেলাস আধা-আধি খালি। সামনের দিকে ঝুঁকে সাগ্রহে সে এক ধরনের দার্শনিকতার মধ্যে ঢুকে পড়ল।—আপনি আজ টাকা পেলেন আপনার সুদিন, আর সমস্ত দিন উপোস আর ধকলের পর আপনাকে সেই টাকা দেবার জন্য ছুটতে হল বলে আমার মাথায় রক্ত উঠে গেছল। ওদিকে দেখুন, দাদার আজ সব থেকে আনন্দের দিন আর ওই এক কারণে আজই আমার সব থেকে খারাপ দিন। একই কারণে একজনের ভালো তো একজনের খারাপ—একজনের খারাপ তো একজনের ভালো। আশ্চর্য না?

সদয় মুখ করে মাথা নেড়ে সায় দিলাম।—আজকের দিনেই বোধহয় আপনি কাউকে খুইয়েছিলেন?

বেদনায় আর বিস্ময়ে হিরু গুপ্তের ভারী চোখ দুটো বিস্ফারিত।— আপনি তো অদ্ভুত মানুষ দেখি, অ্যাঁ। এমনিতে তো মনে হয়, ভাজা মাছখানা উল্টে খেতে জানেন না। সাগ্রহে আরও সামনে ঝুঁকল, গলার স্বর ভাঙা-ভাঙা।—কিন্তু এ যন্ত্রণার শেষ কোথায়? শেষ আছে?

—কি জানি।

—জানেন, জানেন—আপনি অনেক জানেন—বলুন।

ভেবে নিলাম একটু।—শুধু এইটুকু বলতে পারি, আপনার যন্ত্রণা যদি সত্যি হয়, তার একটা ভাগ তিনিও পাচ্ছেন।

নেশা ছোটার উপক্রম। লাফিয়ে উঠল যেন।—পাচ্ছেন? পাচ্ছেন? আপনি ঠিক জানেন?

ভারী গলায় জবাব দিলাম, তা নাহলে যন্ত্রণা আর যন্ত্রণা থাকে না—বিস্বাদ হয়ে যায়।

কি বুঝল হিরু গুপ্ত সে-ই জানে। দুচোখ টান করে চেয়ে রইল।

খাবার এলো।

সেই খাবাবেব পবিমাণ দেখে আমাব চক্ষুস্থিব। এত অর্ডাব দেওযা হযেছে কল্পনাও কবিনি। প্রমাণ সাইজেব টেবিলটায হিরু গুপ্তব সোডাব বোতল আব গেলাস বাখাবও জাযগা নেই। এক চুমুকে সে গেলাসটা খালি কবে দিল। টেবিল পবিষ্কাব কবে দুটো বয আটটা বড ডিসে একবাশ খাবাব সাজিযে দিযে গেল।

হিরু গুপ্ত নডেচডে সোজা হযে বসল। ঘোব-লাগা দুই চোখ টান কবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভোজ্যসামগ্রী একদফা নিবীক্ষণ কবে নিল। তাবপব কাঁটা-চামচে সব একধাবে সবিযে বেখে হাত লাগালো। আমাব উদ্দেশে অস্ফুট স্ববে বলল, শুরু করুন।

আমি শুরু কবলাম কি কবলাম না দেখাব ফুবসত নেই। হিরু গুপ্ত ক্ষিপ্র মেজাজে খেতে লাগল। খাওযাব ব্যাপাবে এই গোছেব তৎপব একাগ্রতা কমই দেখেছি। যেন অনেক দিন খেতে পাযনি— তাব মধ্যে একবাশ খাবাব হাতেব কাছে পেযে হামহুম কবে খেযে চলেছে। এই খাওযাব ঝোঁক দেখে এতক্ষণ সে কোন বাজ্যে ছিল কল্পনাও কবা যাবে না। মুখে কথা নেই, অবিবাম মুখ নডছে আব হাত নডছে। দু'চোখ খাবাবেব ডিশগুলোব ওপবেই চক্কব খাচ্ছে। বলা বাহুল্য, মোট খাবাবেব চাব ভাগেব তিন ভাগই সে অক্লেশে উদবস্থ কবল। এই খাওযাব ফাঁকে দুই-একবাব আমি পূর্ব প্রসঙ্গ উত্থাপনেব চেষ্টায ছিলাম, কিন্তু তাব খাওযাব তন্মযতায চিড ধবানো গেল না।

একেবাবে খাওযা শেষ কবে তবে মুখ তুলল। বড একটা তৃপ্তিব নিশ্বাস ফেলে বলল, বেশ খেলাম, আপনাব হযেছে?

—অনেকক্ষণ।

—চলুন তাহলে ওঠা যাক।

বিল মিটিযে আবাব তাব গাডিতে গিযে উঠলাম। এখনো আশা কবছিলাম হিরু গুপ্ত তাব যন্ত্রণাব প্রসঙ্গ তুলবে। কিন্তু সেটা ওই একবাশ খাবাবেব তলায চাপা পডল কি আব কিছুব, ভেবে পেলাম না। কিন্তু যা-ই হোক, এই এক সন্ধ্যাব পব থেকে হিরু গুপ্ত আমাকে একেবাবে তাব বুকেব কাছেব মানুষ ভাবে।

তৃতীয, সহযাত্রিনী প্রসঙ্গ।

ভবঘুবেব উক্তিব সঙ্গে অনেকটা মেলে। বমণী শুধু সুদর্শনা নয, সুলক্ষণাও। সুন্দব মুখে একধবনেব চাপা মিষ্টি অভিব্যক্তি ছডিযে আছে। মুখ তুলে সোজা মুখেব দিকে তাকাতে পাবে, কিন্তু চাউনিটা নবম আব ঠাণ্ডা গোছেব। বযেস বডজোব তিবিশ, লম্বা গডন, স্বাস্থ্যও পবিমিত। নডাচডাব ফাঁকে নিজেকে একটু ঢেকেঢুকে বাখাব সহজাত প্রবৃত্তিটুকুও মিষ্টি লাগল। পঁযতাল্লিশ বছবেব স্থূলবপু মজুমদাব মশাইযেব পাশে একটুও মানায না। কিন্তু সংসাবেব বেশিব ভাগ ক্ষেত্রে এ-বকম বেমানান জুটিই দেখা যায। নাম শুনলাম মিলু। মজুমদাব মশাই এব মধ্যে বাবকযেক তাকে ওই নামেই ডেকেছেন। সম্ভবত সংক্ষিপ্ত আদবেব ডাক এটা।

এক্ষুণি খাওযাব প্রসঙ্গ বাতিল কবে হিরু গুপ্ত তাব সস্তা কডা ব্র্যাণ্ডেব সিগাবেট বাব কবে ঠোঁটে ঝোলালো। তাব পবেই একটু থমকে বমণীব দিকে তাকালো। বমণীব ঈষৎ অপ্রসন্ন ঠাণ্ডা চাউনি লক্ষ্য কবলাম আমিও। এটুকুও সুচারু মনে হল।

ঠোঁট থেকে সিগারেট নামিয়ে হিরু গুপ্ত বলে উঠল, যাচ্ছি বাবা, বাইরে যাচ্ছি— এই জন্যেই নিজের জন্য আলাদা কম্পার্টমেন্ট করতে চেয়েছিলাম, এখন পনেরো মিনিট অন্তর উঠে বাইরে গিয়ে সিগারেট খেয়ে আসতে হবে—

গজগজ করতে করতে উঠে দাঁড়াল সে। মজুমদার মশাইয়ের হাসিতে স্নেহ ঝরল—তোরই তো দোষ, এতদিনে সিগারেটের গন্ধটাও সহ্য করাতে পারলি না—

প্রোডিউসার দাদার মুখের ওপর বেশ জুতসই সরস জবাব দিতে পারে দেখলাম হিরু গুপ্ত। বলল, দখলদার তুমি, আর সহ্য করানোর দায় আমার?—চেষ্টা করলে তোমার খুব ভালো লাগবে?

আমি বাইরের মানুষ সামনে বসে বলেই হয়তো রমণীর আরক্ত মুখ। মজুমদার মশাই জোরেই হেসে উঠলেন। মিলুর মুখের ওপর একটা বিরক্তিসূচক কটাক্ষ নিক্ষেপ করে সিগারেট ঠোঁটে ঝুলিয়ে হিরু গুপ্ত দরজা টেনে করিডোরে চলে গেল।

স্টেশনে আসা এবং ট্রেনে ওঠার পর থেকে এইটুকু সময়ের মধ্যেই আমার ভিতরে ভিতরে একটা নিঃশব্দ প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। স্ত্রীটির সঙ্গে মজুমদার মশাই স্টেশনেই আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর থেকে এই অবকাশটুকুর মধ্যে আমার কেবলই মনে হয়েছে, সেই সন্ধ্যায় পানাসক্ত হিরু গুপ্ত যে যন্ত্রণার কথা বলেছিল সেটা এই রমণীর কারণে। হিরু গুপ্ত সেটা আভাসেও আমার কাছে ব্যক্ত করেনি, শুধু সেই সন্ধ্যার কিছু কথা মনে পড়েছে। এই যোগাযোগে তার বিরক্তি, গাম্ভীর্য আর পরোক্ষ মনোযোগ এই রমণীর প্রতি যেন বিশেষভাবে নিবিষ্ট দেখেছি। ট্রেন আসতে ব্যস্তসমস্তভাবে হাত ধরে মিলুকে গাড়িতে তুলতে দেখেছি। অথচ এই ব্যস্ততার কোন হেতু নেই। ওদের পিছনে আমি। কুলির মাল তোলা হলে মজুমদার মশাই ধীরেসুস্থে আসবেন বোধ হয়। সরু করিডোর ধরেও রমণীটিকে পিছন থেকে প্রায় আগলে নিয়ে এসেছে হিরু গুপ্ত। চোখের ভ্রম কিনা জানি না, এমনও মনে হয়েছে—কনুইয়ের মৃদু ধাক্কায় রমণী তাকে একটু ঠেলে সরাতে চেষ্টা করেছে আর তখন অস্ফুট স্বরে হিরু গুপ্ত গলা দিয়ে একটু ক্রুদ্ধ আওয়াজ বার করেছে। চলতি ট্রেনে জিনিসগুলো টুকটাক গুছিয়ে রাখার সময় ঝাঁকুনিতে রমণী দুই-একবার বেসামাল হয়েছিল, কিন্তু তাকে রক্ষা করার জন্য পিছনে হিরু গুপ্ত মজুত। সে তক্ষুণি তার দুই বাহুর ওপর দখল নিয়েছে। আর তারপর হিরু গুপ্তর বিরক্তিমাখা গম্ভীর চোখ কতবার যে ওই রমণীর মুখে এবং দেহে বিদ্ধ হতে দেখেছি ঠিক নেই। আমার ধারণা, পুরুষের এই চাউনি আমি চিনি। কিন্তু মজুমদার মশাই এ-সব সংশয়ের ধার-কাছ দিয়েও হাঁটেন মনে হয় না।

সিগারেট শেষ করে তেমনি অপ্রসন্ন মুখে তার জায়গায় এসে বসল। আপাতত তার জায়গা বলতে মিলুর পাশে। এদিকের বার্থে আমি আর মজুমদার মশাই। কথায় কথায় ছবির প্রসঙ্গ উঠল—অর্থাৎ যে ছবিতে মজুমদার মশাই হাত দিয়েছেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন হবে বলুন?

—আমি কি বলব।

—বাঃ আপনার গল্প, আপনি বলবেন না তো কে বলবে?

মহিলার দিকে ফিরে ঈষৎ আগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, বইটা আপনি পড়েছেন?

মৃদু হেসে মিলু সামান্য মাথা নাড়ল। মজুমদার মশাই বলে উঠলেন, বা রে, এই গল্প সিলেকশনের পিছনে আসল ব্যাপারটাই তো আপনি জানেন না দেখছি! বই পড়ে ও-ই তো প্রথমে আমার পিছনে লাগে—এবারে এই গল্পটা করো। আপনার বই তো আমি আজও পড়িনি মশাই, তিনবার করে ওর মুখে গল্প শুনেছি।

লেখক মাত্রেরই ভালো লাগার কথা। ভালো লাগল। মিলুরও হাসি-হাসি মুখ। চকিতে হিরু গুপ্তর দিকে তাকালাম। তার অসহিষ্ণু বিরস বদন। কারণ আমার কাছে গল্প সিলেকশনের যে ফিরিস্তি সে দিয়েছে তার সঙ্গে এটা মিলছে না। চোখাচোখি হতে মর্যাদা রক্ষার তাগিদে ঠোঁটের ফাঁকে হঠাৎ একটু হাসি ঝুলিয়ে উঠে একেবারে আমার কানের সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলল, ঠাকরোণকে দিয়ে কলকাঠিটি কে নেড়েছে দাদা সেটা জানলেও বলবে না। নিজের জায়গায় ফিরে গেল আবার। মিলুর চকিত চাউনি। মজুমদার মশাই ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি বললি শুনি?

হিরু গুপ্ত সাদাসাপটা জবাব দিল, বললাম, দাদা কার ক্রেডিট কাকে দিচ্ছে দেখুন। বউদির তোয়াজ করার সুযোগ পেলে তুমি ছাড়ো না।

মজুমদার মশাই সহাস্যে বললেন, তুই তো তোর বউদির কিছুই ভালো দেখিস না—এ গল্প কে আমার মাথায় ঢুকিয়েছে জেনেও লাগতে ছাড়বি না।

হিরু গুপ্তর হাসিটা তখনো ঠোঁটে ধরা আছে কিন্তু গলার স্বর একটু যেন অসহিষ্ণু। —তাহলে নাও গো, গল্পের ছবি কেমন হবে তুমিই লেখককে বলো।

নির্বাক মহিলার দুই চোখ অব্যাহতি চাইছে। হৃষ্টবদন মজুমদার মশাই বললেন, ও কি বলবে ছবি কেমন হবে না হবে! সে তো তোর ওপর নির্ভর করছে। আমার দিকে ফিরলেন—হিরু না থাকলে আমার ব্যবসা অচল আমিও অচল—সেটা জানে বলেই ওর এত দেমাক, বুঝলেন?

বার বার শাড়ির আঁচল টেনেটুনে বসাটা মহিলার একটা মিষ্টি অভ্যাস ভেবেছিলাম। এখন কেমন মনে হল, সেটা হিরু গুপ্তর ঘন-কটাক্ষ প্রতিহত করার দরুনও হতে পারে। মালিকের প্রশস্তি শুনে তার প্রসন্ন গম্ভীর তির্যক চাউনিটা রমণীর মুখের ওপর বিঁধে থাকল খানিক। আমার মনে হল, মিলু মজুমদারের ধড়ফড়ানি দেখলাম একটু।

হিরু গুপ্ত উঠে দাঁড়াল। মালিকের মন রক্ষার সুরে বলল, মুখ না চললে সত্যিই আর ভালো লাগছে না।

মজুমদার মশাই হাসলেন। ভাবখানা—আমি তো আগেই বলেছিলাম।

দুটো ছোট ডিশ আর একটা বড় ডিশে দুভাগ করে হিরু গুপ্ত শুকনো খাবার সাজালো। লোভনীয় সন্দেহ নেই। পেল্লাই সাইজের একটা করে চপ আর চিকেন কাটলেট, সঙ্গে মুখরোচক স্যালাড। ছোট ডিসের একটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিল, একটা মজুমদার মশাইয়ের দিকে। তারপর বড় থালার মত ডিশটা নিজেদের রেঞ্জের মাঝখানে রেখে রমণীর উদ্দেশে গম্ভীর রসিকতা করল, এসো—আমারটা নিয়ে টানাটানি কোরো না আবার।

সকলেব চোখেব ওপব বড ডিশে দু'জনেব খাবাবটা একসঙ্গে নেওয়া এমন কিছু দৃষ্টিকটু নয়, অথচ আমাব ভালো লাগল না। ওদিকে বসিকতাব জবাবে মিলু মজুমদাব বলে ফেলল, আমি এখন খাবই না কিছু।

গলাব স্ববটুকুও নিটোল মিষ্টি। কিন্তু এতেই হিরু গুপ্তেব মেজাজ চড়ল, খাবে না মানে?

বিব্রত মুখে মিলু হাসতে চেষ্টা কবল একটু।—খাব না মানে আবাব কি—

—খাবে না তো আগে বললে না কেন?

তেমন মৃদু হাসি।—আগে তুমি জিজ্ঞাসা কবেছ?

—আমাকে খাবাব বাব কবতে দেখেও বললে না কেন?

-আচ্ছা আমাবটা আমি বেখে আসছি।

—বেখে আসতে হবে না, তুমি খাবে কি খাবে না আমি জানতে চাই।

মিলু তাব চোখে চোখ বেখেই আবাব ডাইনে বাঁযে মাথা নাড়ল— অর্থাৎ না। মজুমদাব মশাই এতক্ষণ দেওব-ভাজেব কথা-কাটাকাটি উপভোগ কবছিলেন যেন। এবাবে বললেন, আহা মিলু, ওকে বাগাচ্ছ কেন, যা হোক একটা তুলে নাও না।

বিবক্তি চাপতে চেষ্টা কবে মিলু বলল, আমাব এখন খাওযাব ইচ্ছে নেই তবু জোব কবছ কেন?

স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি হিরু গুপ্ত অপমান বোধ কবছে। শেষবাবেব মতই জিজ্ঞাসা কবল, তুমি খাবে না তাহলে?

তাকে জবাব দেবাব বেলায আবাব হাসি-হাসি মুখ মিলুব। জবাব দিল না, মাথা নাড়ল— খাবে না।

সবোষে বড ডিশটা নিজেব দিকে টেনে নিল হিরু গুপ্ত। আমি ভাবলাম ওটা বুঝি এবাব জানলা দিযে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। না, তাব বদলে নিজে খাওয়া শুরু কবল। ওব খাওযাব এই একাগ্র ধবনটা আমি আগেও দেখেছি। আমাদেব আগেই নিজেব ভাগটা শেষ কবল। পবে দ্বিতীয় ভাগটাও। আমি আব মজুমদাব মশাই হাসছি। অল্প অল্প হাসছে মিলু। হাসি নেই শুধু হিরু গুপ্তেব মুখে।

খাওয়া শেষ কবে তিনটে ডিশই একসঙ্গে কবে কোণেব দিকে সবিযে বাখল। অ্যাটেনডিং কাবে চাকব আছে, স্টেশনে গাড়ি থামলে সে এসে ওগুলো পবিষ্কাব কবে বেখে যাবে। আমবা আগেই জল খেযে নিযেছিলাম। হিরু গুপ্ত ঢক ঢক কবে এক গেলাস জল খেযে পকেট থেকে সিগাবেট বাব কবতে কবতে দবজা খুলে কবিডোবে চলে গেল। অর্থাৎ বাগ তাব একটুও পড়েনি।

আমাব দিকে ফিবে মজুমদাব মশাই প্রসন্ন মন্তব্য কবলেন, বেজায চটেছে, ভযানক ভালবাসে তো—আব ও-ও ফাঁক পেলেই বাগাবে।

আড়চোখে বমণীব মুখখানা দেখে নিলাম। দু'চোখ জানলা দিযে দূবেব দিকে প্রসাবিত।

সিগাবেট একটু আধটু আমিও খাই। সেই অছিলায বাইবে চলে এলাম। কবিডোবে এসে দবজাটা আবাব টেনে দিযেছি।

বাইবেব দিকে চেযে হিরু গুপ্ত সিগাবেট টানছে। আমাব সিগাবেট ধবাবাব শব্দে একবাব ফিবে তাকালো। গম্ভীব বাগ-বাগ মুখ।

বলে ফেললাম, আপনাব হঠাৎ এত বাগেব কি হল, ভদ্রমহিলাব খিদে পাযনি তাই খেতে আপত্তি কবেছেন।

ঠোঁটেব সিগাবেট হলদে দুই আঙুলেব ফাঁকে উঠে এলো হিরু গুপ্তব। গোল দুটো চোখ আমাব মুখেব ওপব স্থিব একটু। ক্রুদ্ধ চাপা স্ববে বলল, খিদেব আসল চেহাবাটা আপনি জানেন? দেখেছেন কখনো?

মনে হল ইন্ধন যোগাতে পাবলে হিরু গুপ্ত কিছু কথা বলতে পাবে। কলকাতাব সেই হোটেলেব পানভোজনেব বাত থেকেই আমাব মনে হযেছে শোনানোব মত কিছু কথা হিরু গুপ্তব ঝুলিতে আছে। বোকা মুখ কবে বললাম, সে আবাব কি?

—আমি দেখেছি, বুঝলেন? তিন দিনে একদিন খাওযা জোটে না, এই দুটো হাত ধবে বিধবা মা আব মেযেব সে কি আকুতি—আমি গিযে না পডলে খিদেব জ্বালায ওই মেযেকেই ক'টা হাযনাব মুখে গিযে পডতে হত খুব ভালো কবে জানি—বুঝলেন?

সিগাবেটে লম্বা অসহিষ্ণু দুটো টান দিযে ছুঁডে ফেলে মন্তব্য কবলে, আব এখন তাব এত অঢেল যে খিদে পায না, যতসব ঢং—ওতে দাদা ভোলে, আমি ভুলি না।

একটু চেষ্টা কবে মনে কবতে হল।—হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

—সেদিন আপনাব মেজাজ-পত্র ভালো ছিল না। খেতে খেতে কি একটা যন্ত্রণাব কথা বলছিলেন—আব বলছিলেন আপনাব দাদাব সেটা সব থেকে আনন্দেব দিন আব সেই কাবণেই ওটা আপনাব সব থেকে খাবাপ দিন।

গোল দুটো চোখ আমাব মুখেব উপব চক্কব খেল একপ্রস্থ। গাম্ভীর্য সত্ত্বেও অন্তবঙ্গ সুবেই বলল, আপনি খুব চতুব লোক, সেদিন বেমক্কা পেযে কথা বাব কবে নিযেছেন। —সত্যি এক এক সময এত যন্ত্রণা হয।

বললাম, আত্মত্যাগেব একটু-আধটু যন্ত্রণা আছেই।

শেষেবটুকু কানে গেলই না বোধ হয, সাগ্রহে কাছে সবে এসে জিজ্ঞাসা কবল, আমাব আত্মত্যাগেব কথাও আপনাকে বলেছিলাম নাকি?

—না, অনুমান কবেছিলাম।

—ঠিকই কবেছিলেন। বড একটা নিশ্বাস ফেলে সিগাবেটেব খোঁজে পকেটে হাত ঢোকালো।

যন্ত্রণাব জাযগায মোচড পডতে এবপব হিরু গুপ্ত যা জানালো তাব সাবমর্ম, বিধবা মা আব তাব মেযে মিলুকে সে আগেই জানত। হুগলীব দিকে থাকত তাবা। মেযেটা দেখতে শুনতে ভালো আব খুব চালাক-চতুব। ববাববই হিরু গুপ্তব ভালো লাগত। অনেক দিনেব ছাডাছাডিব পব আবাব যখন দেখা, ওই মা-মেযেব অচল অবস্থা তখন, খাওয়া জোটে না, পবনেব কাপড জোটে না। সমযে সে গিযে না পডলে আব পাঁচজনে ছিঁডে খেত ওই মেযেকে, ওদেব ঘব আঁস্তাকুড হযে উঠত। হিরু গুপ্ত মিলুকে ছবিতে নামাবে ঠিক কবে কলকাতায নিযে এসেছিল। মিলু সানন্দে বাজী হযেছিল। কালে দিনে এই মেযে নামী নাযিকা হতে পাবত। আব তাবপব বিযেটাও

সে-ই কবত। কিন্তু সব ভণ্ডুল কবল দাদা অর্থাৎ মজুমদাব মশাই। মিলুকে একটা ভালো জাযগায বাখা হযেছিল আব তাব সবে তখন ট্রেনিং চলছিল। দবাজ হাতে দাদাই খবচ যোগাচ্ছিল। কিন্তু অল্পদিনেব মধ্যে তাব এমন মনে ধবে গেল যে মেযেটাকে আব ছবিতে নামতেই দিল না। বিযেব প্রস্তাব কবল। হিরু গুপ্ত কত বড আঘাত পেল সে-ই জানে—দাদাব জন্যেই সব, দাদাব জন্যেই যা-কিছু। নিজে ওদেব বিযে দিল। মিলু প্রথমে বাজী হযনি, শেষে অনেক বোঝাতে তবে বাজী।...

এখন সেই মেযেবই নাকি খিদে হয না, সিগাবেটেব গন্ধ সহ্য হয না।

দু'জনেই চুপচাপ খানিক। চাপা আগ্রহে হঠাৎ হিরু গুপ্ত আবাব বলল, কলকাতাব সেই হোটেলে আপনিও যেন কি বলেছিলেন—আমাব যন্ত্রণাব একটা ভাগ আব একজনও পাচ্ছে নাকি—সত্যি যন্ত্রণা পাচ্ছে? বলুন না?

মহিলাব সপ্রতিভ মিষ্টি মুখখানা চোখে লেগে আছে। আজ আব হিরু গুপ্তব কথায সায দিতে পাবা গেল না। বললাম, সেদিন কি বলেছিলাম মনে পডছে না —তবে সে বকম যন্ত্রণা কিছু পুষছেন বলেও তো মনে হয না।

মিলু মজুমদাব পবস্ত্রী হিরু গুপ্ত এই ভবিতব্যটা মেনে নিক এটুকু আমাব কাম্য। তাই বলা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে লোকটাব মুখ থমথমে আবাব। সিগাবেটে দুটো অসহিষ্ণু টান দিযে বিডবিড কবে বলল, আপনাব মতে তাহলে উনি সুখেব সাগবে ভাসছেন এখন, কেমন? কিন্তু ও নির্বোধ না হলে এতদিনে এও ওব বোঝা উচিত, সব সুখ আমি ঝাঝবা কবে দিতে পাবি—এই দুনিযায দাদা আমাকেই সব থেকে বেশি বিশ্বাস কবে, আমাব ওপবই সব থেকে বেশি নির্ভব কবে। ওকে ছাডা দাদাব চলতে পাবে কিন্তু আমাকে ছাডা চলে না সেটা ও জানে।

বিবক্তি গোপন কবে জবাব দিলাম, ভালই যদি বাসেন তো এতবড ক্ষতি আপনি কববেন কেন?

যন্ত্রণাপ্রসঙ্গে আমাব সেই মন্তব্যেব ফলেই মিলু মজুমদাবেব সঙ্গে তাব পবেব আচবণ আবো রুক্ষ হযে উঠল কিনা জানি না। কেবিনে ঢুকেও তাব সঙ্গে আব কথাবার্তা কইতে দেখলাম না। তাব বাগ মহিলা ঠিকই আচ কবেছে মনে হল। তাব তোযাজেব মুখ একটু। কিন্তু হিরু গুপ্ত নির্লিপ্ত, কঠিন।

ভোজেব ব্যাপাবে বসিক দেখলাম বটে আমাব সহযাত্রী দুজন। চব্বিশ ঘণ্টাব বাস্তাব জন্য এত খাবাবও কেউ আনে কল্পনা কবা যায না। বড বড অনেকগুলো ডিশে হিরু গুপ্তই একবাশ কবে দুপুবেব খাবাব সাজালো। তাবপব কতকগুলো ডিশ আমাব আব তাব দাদাব দিকে ঠেলে দিল আব বাকি ক'টা নিজেব দিকে টেনে নিল। মহিলা খাবে কি খাবে না তা নিযে যেন তাব কোন মাথাব্যথা নেই।

মজুমদাব মশাই ভাইযেব বাগ দেখে মুখ টিপে হাসছেন। আমাব চোখে চোখ পডতে মিলু বিডম্বনাব ভাবটা কাটিযে সহজ হাসিমুখেই দেওবেব দিকে তাকাল—আমাকে দিলে না?

মুখ ঈষৎ বিকৃত কবে হিরু গুপ্ত তিক্ত প্রশ্ন ছুঁডল, আমাব ছোঁযা তোমাব চলবে?

হাসি-হাসি মুখেই মিলু মাথা নাডল—অর্থাৎ চলবে।

এই তোষামোদেও হিরু গুপ্তর মেজাজ নরম হল না। সে নির্বিষ্ট রুক্ষ মুখে খাবার চালান করতে লাগল। হাসিমুখে মজুমদার মশাই চাপা গলায় আমাকে বললেন, বেজায় ক্ষেপেছে দেখছি আজ... আবার ভাব হতেও খুব বেশি সময় লাগবে না, আপনি খান।

তবু মহিলার দিকে চেয়ে বললাম, আমি দেব আপনাকে?

হিরু গুপ্তর ক্রুদ্ধ দু'চোখ আমার মুখের ওপর চড়াও হল—আপনার দরদ দেখাতে হবে না, সকলেরই দুটো হাত আছে সেটা ও সকালেই বুঝিয়ে দিয়েছে।

কথা-কাটাকাটির ভয়েই যেন মিলু মজুমদার তাড়াতাড়ি উঠল। একটি মাত্র বড় ডিশ নিয়ে খাবার তুলে নিল। আমাদের তুলনায় অতি সামান্যই নিল বলতে হবে। এত সামান্য যে চোখে পড়ে। আমি বললাম, ও কি, নিজে নেবার ফলে যে কিছুই নিলেন না।

অল্প হেসে জবাব দিল, আমি এর বেশি পারি না।

খেতে খেতে হিরু গুপ্ত তপ্ত ব্যঙ্গ ছুঁড়ল, অঢেল থাকলে তখন বেশি পারা যায় না, না থাকলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড খেতে পেলেও বেশি হয় না।

মিলু হাসছে বটে। কিন্তু হাসিটা কেমন নিষ্প্রভ মনে হল আমার। —হিরু গুপ্ত বলেছিল সমস্ত সুখ ঝাঁঝরা করে দিতে পারে, সেটা সত্যি মহিলা জানে মনে হল। তোয়াজের অভিব্যক্তিটুকু হয়তো সেই কারণে।

বিকেলের ভারী জলযোগ-পর্বেও হিরু গুপ্তর মেজাজ একটুও নরম দেখলাম না। কি হল ভেবে না পেয়ে মিলুও যেন বিস্মিত একটু। তবে রাতের আহার-পর্বের সময় হিরু গুপ্তর রুক্ষ মুখ কিছু ঠাণ্ডা মনে হল। তেরছা সুরে সে জিজ্ঞাসা করল, আমার পরিবেশন চলবে, না অশুদ্ধ হবে?

হাসিমুখেই মিলুকে তাড়াতাড়ি মাথা নাড়তে দেখলাম। অর্থাৎ চলবে। হিরু গুপ্তর মেজাজের পরিবর্তন অন্য কারণেও হতে পারে। সে খাবার সাজাবার তোড়জোড় করার সঙ্গে সঙ্গে মজুমদার মশাই আস্ত মদের বোতল বার করেছেন একটা। ঈষৎ সঙ্কুচিত চোখে মিলু আমার দিকে তাকিয়েছে। আমার সহজ হবার চেষ্টা—এ যেন অস্বাভাবিক কিছুই না।

আমার চলে না শুনে মজুমদার মশাই দুই-একটা হালকা রসিকতা করলেন। তার পর নিজের গেলাসে বেশ খানিকটা মদ ঢেলে নিলেন। দ্বিতীয় গেলাসে ঢালার আগেই হিরু গুপ্ত বাধা দিল, আমি এখন না, শরীরটা ভালো লাগছে না।

—সে কি রে। ভালো লাগছে না বলেই তো এটা বার করলাম। সেই সকাল থেকে তোর যে রকম মেজাজ চলছে, খেলেই হালকা হয়ে যাবে, নে—

হিরু গুপ্ত বলল, তুমি খাও তো, আমার এখন ইচ্ছে করছে না, পরে দেখা যাবে। মজুমদার মশাই গোড়াতে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন বোধহয়, কিন্তু গেলাসের তরল পদার্থ প্রথম দফায় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হৃষ্টচিত্ত। আর বিপুল আহার সহযোগে আধখানা বোতল খালি হয়ে যাবার পর স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে দুলছেন তিনি, অর্থাৎ সোজা হয়ে বসতেও পারছেন না।

রাতেও মিলুর সেই পরিচ্ছন্ন স্বল্পাহার লক্ষ্য করলাম। ঠিক দেখছি কিনা জানি না, তার মুখে একটু শংকার ছায়া। আড়চোখে এক এক বার দেওরকে দেখে নিচ্ছে। হিরু গুপ্ত গভীর মনোযোগে খেয়ে চলেছে।

শরীরটা আসলে আমারই খুব খারাপ লাগছিল। মাথাটা সেই থেকে ধরে আছে, আর এখন বেজায় টন টন করছে। এই এক রোগ আমার। তখন কড়া ঘুমের বড়ি খেয়ে পড়ে থাকতে নয়, নইলে সমস্ত রাত ধরে যন্ত্রণা চলবে। সেই ট্যাবলেট সঙ্গেই থাকে। খাওয়া শেষ করে স্যুটকেস থেকে ট্যাবলেটের শিশিটা বার করতে দেখে মজুমদার মশাই টেনে টেনে জিজ্ঞেস করলেন, কি ওটা?

—ঘুমের ওষুধ, মাথায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছে সেই থেকে।

মজুমদার মশাই হেসে উঠলেন, বললেন, একেই বলে কপাল, যন্ত্রণার আর ঘুমের এমন মহৌষধ হাতের কাছে থাকতে আপনি ট্যাবলেট গিলছেন।

মিলুর খাওয়া আগেই হয়ে গেছল। এদেরও শেষ। ডিশ আর পাত্রগুলো সব একত্র করে হিরু গুপ্ত বাইরের করিডোরে রেখে এলো। নীচে খবরের কাগজ পাতা হয়েছিল, সেগুলো জড়ো করে জানালা দিয়ে ফেলে দিল। তারপর মুখ হাত ধুয়ে মুছে সে বাইরে সিগারেট খেতে যাওয়ার উদ্যোগ করতে মজুমদার মশাই আবেদনের সুরে বললেন, আমার বিছানাটা আগে ঠিক করে দিয়ে যা—

অর্থাৎ তিনি আর বসতেও পারছেন না। কোনরকম উঠে ধপ করে মিলুর পাশে বসলেন। হিরু গুপ্ত তৎপর হাতে তাঁর শয্যারচনা করে দিতে তিনি সেটি গ্রহণ করে বাঁচলেন যেন।

মিলুর শয্যাও একই সঙ্গে বিছানো হয়ে গেল। আমার কেমন মনে হল, ও যেন একটু বেশি চুপচাপ এখন। আমি ততক্ষণে আমার বার্থে উঠে গা এলিয়ে দিয়েছি। মিলু তার জানালার পাশে বসল। চড়া বাতিগুলো নিভিয়ে দিয়ে হিরু গুপ্ত সবুজ আলোটা জ্বালতে মজুমদার মশাই বিড় বিড় করে উঠলেন, নিভিয়ে দে, নিভিয়ে দে—কি দরকার।

অতএব সেটাও নিভিয়ে ঘর অন্ধকার করে হিরু গুপ্ত বাইরে সিগারেট খেতে গেল। আর তার দু'মিনিটের মধ্যে মজুমদার মশায়ের পরিতৃপ্ত নাসিকা-গর্জন শোনা যেতে লাগল।

আমি হঠাৎ অস্বস্তি বোধ করছি কেন একটু, জানি না। মিনিট পনেরো বাদে হিরু গুপ্ত নিঃশব্দে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল টের পেলাম। ঘুমে তখন দু'চোখ বুজে আসছে আমার। ভিতর থেকে দরজা লক করে ঘুরে দাড়াল। অন্ধকারে চুপচাপ দাঁড়িয়েই রইল একটু। জানলা খোলা থাকায় নীচের দিকটা সামান্য আবছা দেখা যাচ্ছে। ওপরটা একেবারে অন্ধকার।

হিরু গুপ্ত পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে মিলুর বেঞ্চির অন্য ধার ঘেষে বসল। এক্ষুণি আপার বার্থে উঠে শোবার ইচ্ছে নেই বোধহয়। মজুমদার মশাইয়ের নাকের গর্জন বেড়েছে। মিলু জানলার দিকে মুখ করে বসে আছে।

ঘুমে চোখ তাকাতে পারছি না, কিন্তু ভিতরের অস্বস্তি বাড়ছেই। মিলুর মুখে শঙ্কার ছায়া দেখেছিলাম কেন—হিরু গুপ্ত মদ খাচ্ছে না বলে?

অস্বস্তি নিযেই তন্দ্রাচ্ছন্ন হযেছিলাম হযতো। কতক্ষণ কেটেছে জানি না। চোখ টান কবে দেখি মিলু তেমনি জানলাব কাছে বসে আছে, আব হিরু গুপ্ত ওখানে বসেই সিগাবেট টানছে—সস্তা কডা সিগাবেটেব উগ্র গন্ধ নাকে আসছে।

হঠাৎ বাগই হচ্ছে আমাব। কিন্তু বেশিক্ষণ চোখ তাকিযে থাকা গেল না। এবাবে ঘুমিযেই পডলাম।

কিন্তু ভিতবেব অস্বস্তিটাই আবাব আমাকে জাগিযে দিযেছে কিনা জানি না। যে দৃশ্য দেখলাম, ভিতবটা ধডফড কবে উঠল। মিলু জানলাব কাছ থেকে সবে এসেছে আব হিরু গুপ্ত খানিকটা ওধাবে সবেছে। দু'জনেব মাঝে বডজোড হাত খানেক ফাবাক। সেটুকুও কমিযে আনাব জন্য হিরু গুপ্ত মিলুব একখানা বাহু ধবে টানাটানি কবছে, আব মিলু একবাব তাব হাত ঠেলে সবাচ্ছে আব দু'হাতে এক-একবাব ধাক্কা দিযে তাকে বেঞ্চিব ওধাবে ঠেলে সবাতে চেষ্টা কবছে। কিন্তু পাবছে না। ফলে হিরু গুপ্তব উপদ্রবেব চেষ্টাটা এক-একবাব আবো অশালীন হযে উঠছে।

দু'জনেব কাবো মুখে ফিস ফিস শব্দটিও নেই। শুধু মজুমদাব মশাইযেব নাকেব গর্জন শোনা যাচ্ছে।

মাথায বক্ত উঠছে আমাব। চিৎকাব কবে ধমকে উঠতে ইচ্ছে কবছিল। এদেব এই নিঃশব্দ লীলা কতদূব গডাবে আবো?

গাডিব গতি হঠাৎ শ্লথ হযে আসতে নীচেব ওই দু'জন সচেতন একটু। হযতো স্টেশন আসছে। গতি কমছেই। শেষে বিচ্ছিবি বকমেব একটা ঘটাং-ঘটাং শব্দ কবে গাডিটা থেমেই গেল। সেই শব্দে যেন ঘুম ভাঙল আমাব। গলা-খাঁকাবি দিযে আডমোডা ভাঙলাম। তাবপব উঠে বসলাম।

হিরু গুপ্ত ততক্ষণে বেঞ্চিব এধাবে সবে এসেছে। জিজ্ঞাসা কবলাম, স্টেশন নাকি?

—না, এমনি থেমেছে।

—আপনি শোননি এখনো? কটা বাজল?

অন্ধকাবেই ঘডি দেখে জবাব দিল, একটা। আমাব অত চট কবে ঘুম আসে না। একটু বাদেই গাডি চলতে শুরু কবল আবাব। আব আমিই বা শুযে না পডে কি কবব। বেশ খানিকক্ষণ জেগেই ছিলাম, ওবা তফাতেই বসে আছে। শেষে ঘুমেব জ্বালায অস্থিব হযে ওদেব দু'জনকেই মনে মনে জাহান্নমে পাঠিযে ও-পাশ ফিবলাম।

আবাব যখন ঘুম ভাঙল, সকাল।

হিরু গুপ্ত আপাব বার্থে অঘোবে ঘুমুচ্ছে। নীচে মজুমদাব মশাইযেব ঘুম ভাঙেনি তখনো। মিলু জানলাব পাশে বসে আছে। একটু আগে মুখে-চোখে জল দিযে এসেছে বোধহয। ভেজা-ভেজা মুখখানা মিষ্টি। কিন্তু আমাব কুৎসিত লাগছে। বাতেব লীলা কোন পর্যন্ত গডিযেছে আমি জানি না।

আটটায পৌঁছবাব কথা। সকাল সাড়ে ছ'টা নাগাদ সকলে উঠে পডেছে।

মনে হল মিলু আব হিরু গুপ্ত এক-একবাব আমাকে লক্ষ্য কবছে। আমি ওদেব দিকে ফিবেও তাকাচ্ছি না বলেই হযতো।

গাড়িটা একটা গণ্ডগ্রামের মত জায়গায় থেমে আছে কেন বুঝছি না। ধারে-কাছে লোকালয় নেই। দু'দিকে খাঁ-খাঁ মাঠে আধা-শুকনো একটা বিল—দূরে জঙ্গলের রেখা।

খানিক বাদে কনডাক্টর-গার্ডের মুখে শুনলাম, সামনে কি গণ্ডগোল হয়েছে তাই গাড়ি লেট। পরের বড় স্টেশন ফয়েজাবাদ, কিন্তু সেও সাতাশ মাইল দূরে এখান থেকে। ওখানে পৌঁছাবার আগে চা বা কোনরকম খাবার মেলার আশা নেই।

মজুমদার মশাই আর হিরু গুপ্তর মুখ দেখার মত। সকালে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ এ যেন এক বজ্রাঘাত। বেলা দশটা না বাজতে অন্য কেবিনের যাত্রীদেরও ছটফটানি দেখা গেল। গাড়ির বহু যাত্রী নীচের প্রাঙ্গণে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেলা দেড়টা নাগাদ হিরু গুপ্ত খবর নিয়ে এলো ফয়েজাবাদের আগে কোথায় এঞ্জিন উল্টে আছে। লাইনও গেছে। আমাদের গাড়ির এঞ্জিন সাহায্যার্থে সেখানে চলে গেছে। অতএব এ গাড়ি কখন নড়বে তার কিছুই ঠিক নেই।

শুনে মজুমদার মশাই হাল ছেড়ে শুয়েই পড়লেন। এদের দু'জনকে দেখে মনে হল বেলা দেড়টার মধ্যেই যেন দেড় দিন ধরে উপোসী।

ক্লান্তিকর ভাবে ঘড়ির কাঁটা বিকেল সাড়ে চারটের কাছাকাছি পৌঁছল। একগাড়ি লোকের একটা ক্ষুধার অসহিষ্ণু চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠছে। গাড়ির পাঁচ ভাগের চার ভাগ লোক তখন নীচে। শুনলাম অনেকে খাওয়ার সন্ধানে চার মাইল দূরের গাঁয়ের দিকে চলে গেছে। যারা জানে এ এলাকা তারা বলছে, ওই গণ্ডগ্রামে চিড়ে-মুড়ি জুটবে কিনা সন্দেহ। অদূরের প্রায়-শুকনো বিলে কয়েকজন গাঁয়ের লোক ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। সেখানেও ভিড় করে ট্রেনের যাত্রী দাঁড়িয়ে গেছে। দুই-একটা পাঁকাল মাছ উঠতে দেখলে উল্লাসে চেচিয়ে উঠছে আর চোখ দিয়ে গিলছে।

বেলা বাড়ছে। সূর্যের তেজ কমছে। যাত্রীদের ফার্স্ট সেকেণ্ড থার্ড ক্লাসের বিভেদ ঘুচে গেছে। তাদের মিলিত জটলায় শুধু ক্ষুধার চিত্রটাই উদগ্র হয়ে উঠছে। মজুমদার মশাই হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছেন। আমার মনে হল খিদের জ্বালায় ধুঁকছেন তিনি। ধুকছে হিরু গুপ্তও। কিন্তু তার ক্ষিপ্ত অসহিষ্ণু আচরণ। একবার নেমে যাচ্ছে, খানিক বাদে উঠে আসছে, আবার নামছে। আর কার উদ্দেশে অনবরত গালি-গালাজ ছুঁড়ছে সে-ই জানে। মিলু জানলার ধারে বসে আছে সেই থেকে। তারও মুখখানা শুকনো। তবু গতরাতের কথা ভুলতে পারি না, ভিতরটা তার ওপরে বিতৃষ্ণ হয়েই আছে।

সূর্য পাটে নামল। দিনের আলোও দ্রুত কমে আসতে লাগল। একটু বাদেই ওই খোলা আকাশের নীচের অন্ধকারে আমরা ডুবে যাব। প্রায় ছ'টা, এখন বিকেল। ক্ষুধার অসহিষ্ণু চিত্র জমজমাট। শোনা গেল বেশি রাতের আগে এখান থেকে গাড়ি নড়ার আশা নেই।

—রাম নাম সত্ হ্যায়। রাম নাম সত্ হ্যায়।

আমরা সচকিত হয়ে সামনের দিকে তাকালাম। এবড়ো-খেবড়ো মাঠের ওপর দিয়ে চাদরে ঢাকা শব নিয়ে আসছে মাত্র চারজন গ্রামের লোক। মজুমদার মশাই চমকে উঠে বসেছেন। আমরা ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখছি। নীচের বহু যাত্রীরও দৃষ্টি

ওই শবের দিকে। লোকালয় ছাড়িয়ে এই নির্জন প্রান্তরে কোথায় শ্মশান ধারণা নেই। লোকগুলো শব নিয়ে ট্রেনটার একেবারে পিছন দিক দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে দেখলাম।

একটু বাদেই নীচের যাত্রীদের কারো কারো মধ্যে একটু যেন চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম। দ্রুত পায়ে তারা ট্রেনটার পিছন দিকে চলেছে। পরক্ষণে হতচকিত আমরা। হিরু গুপ্ত বাইরে ছিল, ছুটে এসে কেবিনে ঢুকল, তার পরেই ঝোলানো জামার পকেট থেকে মানিব্যাগটা তুলে নিয়ে সাঁ করে ছুটে বেরিয়ে গেল। কি ব্যাপার আমরা ভেবে পেলাম না। ঝুঁকে দেখলাম দ্রুতপায়ে আরো অনেকে যেন ট্রেনটার পিছনের দিকে চলেছে। কিন্তু তখন অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে, কিছুই ঠাওর হল না।

প্রায় মিনিট কুড়ি বাদে মস্ত একটা শালপাতার ঠোঙা হাতে ঘর্মাক্ত হিরু গুপ্ত কেবিনে ঢুকল। মুখে দিগ্বিজয়ের হাসি।

আমাকে বলল, কেবিনের দরজাটা বন্ধ করুন শিগগীর।

করলাম।

মস্ত শালপাতার ঠোঙায় খাদ্যসামগ্রী দেখে আমরা বিস্মিত এবং পুলকিত। ওতে আছে অনেকগুলো বড় বড় আলু-সেদ্ধ, তার ওপরে একগাদা কাবলিছোলাসেদ্ধ আর শশা, এবং তার ওপর একরাশ ফুচকা। অন্য ছোট ঠোঙায় নুন, লঙ্কাগুড়ো আর পেঁয়াজ।

মজুমদার মশাই উল্লাসে লাফিয়ে উঠলেন।—এত কোত্থেকে পেলি?

হিরু গুপ্ত হাসিমুখে যে সমাচার শোনাল, আমরা হতভম্ব। গাঁয়ের ওই চারটে লোক লুঠপাটের ভয়ে এই খাবারগুলো দিয়েই একটা শব সাজিয়ে নিয়ে এসেছিল। এ-রকম ওরা নাকি আগেও করেছে। ভিড়ের মধ্যে মাল আনলেই লুঠ হয়ে যায়। ট্রেনের শেষ মাথায় বেশ একটু দূরে দাঁড়িয়ে শবের ঢাকা খুলে বিক্রি শুরু করেছে। বরাতজোরে হিরু গুপ্ত ওদিকেই ছিল তখন। একটু দেরি হলেই কিছুই আর জুটত না। ব্যাটারা এরই দাম নিয়েছে ন'টাকা।

সোল্লাসে চারটে ডিশে ওই আলু-সেদ্ধ কাবলিছোলা শশা আর ফুচকা সাজাল হিরু গুপ্ত। এখনো দেখলাম মিলু তার ডিশে বেশি দিতে দিল না।

এই খিদের মুখে এই খাদ্যও অমৃত মনে হতে লাগল আমাদের। খুশি মেজাজে গোগ্রাসে গিলছে হিরু গুপ্ত আর মজুমদার মশাই। কিন্তু লক্ষ্য করলাম, মিলু তার ডিশ সরিয়ে রেখেছে, খাচ্ছে না।

লক্ষ্য মজুমদার মশাইও করলেন।—কি হল, খাচ্ছ না যে?

মিলু মৃদু জবাব দিল, সন্ধ্যাটা পার হোক, তোমরা খাও।

এই মেয়েলিপনা দেখে ওরা বিরক্ত। হিরু গুপ্ত শাসালো, দেরি করলে আমিই মেরে দেব কিন্তু, এখন বেজায় খিদে।

মিলু হেসেই জবাব দিল, নাও না—দেব?

—থাক, অত আত্মত্যাগে কাজ নেই।

আমাদের আহার সমাধা হল। মজুমদার মশাই আর হিরু গুপ্ত ঢকঢক করে জল খেয়ে পরিতৃপ্তির নিশ্বাস ফেলল। এখন একটু জোর পাওয়ার ফলে হিরু গুপ্তর সঙ্গে এবারে মজুমদার মশাইও কেবিনের বাইরে গেলেন।

আমি মজুমদার মশাইয়ের সচিত্র ফিল্ম ম্যাগাজিনটা ওলটাতে লাগলাম।

একটু বাদেই মিলু মজুমদারকে একটু যেন সচকিত দেখলাম। মুখ না তুলেও মনে হল বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছে। কিছু বলবে কিনা ভেবে পেলাম না। কৃত্রিম মনোযোগে চোখ দুটো জার্নালের দিকে আটকে রেখেছি।

নিঃশব্দে একবার উঠে কেবিনের দরজা দিয়ে দু'দিকের করিডোর দেখে নিল মিলু। তারপর আবার এসে বসল। আমার পড়ার মনোযোগ লক্ষ্য করল। তারপর নিজের খাবারের ডিশটা আঁচলের আড়ালে নিয়ে তেমনি নিঃশব্দে কেবিন ছেড়ে বেরুল।

জার্নাল ফেলে আমি কেবিনের দরজার সামনে দাঁড়ালাম।

দেখলাম ডিশ হাতে মিলু দ্রুত ডানদিকের খোলা দরজার সামনে গেল। আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে এসেছি। মিনিট দুই-তিনের মধ্যেই নীচের দু'তিনটে অল্পবয়সী গ্রাম্য ছেলে এসে দাঁড়াতে ওদের ডেকে ডিশের সব খাবার ঢেলে দিয়েই মিলু তাড়াতাড়ি ফিরতে গেল।—

—আমি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

চকিতে বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে আমার পাশ ঘেষে দ্রুতপায়ে কেবিনে ঢুকে গেল সে। আমিও এলাম।

অপ্রতিভ মুখখানা আবার লালচে দেখাচ্ছে একটু।

জিজ্ঞাসা করলাম, খাবার সব এভাবে দিয়ে দিলেন যে?

বিব্রত সুরে জবাব দিল, রাম নাম করে যেভাবে শব সাজিয়ে ওগুলো নিয়ে এসেছে.. মনে হচ্ছিল ওতে শবের ছোয়া লেগে গেছে.. ইয়ে আমার বড় খারাপ অভ্যেস—তারপরেই অনুনয়ের সুরে বলল, ওই শয়তানটাকে আপনি যেন কিছু বলবেন না, আমাকে তাহলে খেয়ে ফেলবে—

শয়তান অর্থাৎ হিরু গুপ্ত। চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে আছি। সংযমের এক অনির্বচনীয় কমনীয় মূর্তি দেখছি যেন। গতরাতের বিতৃষ্ণ অনুভূতিটা দ্রুত নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে।

মাথা নাড়লাম— বলব না।

নিঃসংশয়ে অনুভব করছি, এই মেয়েকে শুচিতার গণ্ডি থেকে বার করবে এমন সাধ্য হিরু গুপ্তর নেই।

রূপ

বড় দুটোকে নিয়ে গোড়া থেকেই বাপ-মা যেমন নিশ্চিন্ত, ছোটটাকে নিয়ে তেমনি তাঁদের ভাবনা। তাদের স্বস্তি আর ভাবনার খবর তিন মেয়েও রাখে। তিন মেয়ের মধ্যে বয়সের ফারাক দেড়-দু'বছর করে। বড় মেয়ে রমলা সুন্দরী, মেজ মেয়ে শ্যামলী রূপসী, ছোট মেয়ে কাজল ওদের থেকে বেখাপ্পা রকমের বিপরীত। ছোট মেয়ে কালো, ঢ্যাঙা—নাক মুখ চোখের শ্রীও তেমন নয়, চাল-চলনেও তেমনি কমনীয়তার অভাব।

রমলা আর শ্যামলীর বিশ্বাস, ভগবান ওকে ছেলে করে পাঠাতে গিয়ে ভুল করে মেয়ে করে পাঠিয়ে বসেছে।

মাকে ছোটর উদ্দেশ্যে কত সময় দুঃখ করতে শুনেছে, এই মেয়েটা যে কোত্থেকে এলো! আর তার ভাবনাতেই বাপের অনেক তপ্ত নিশ্বাস পড়তে দেখেছে। নতুন পরিচিতেরা এই তিন মেয়েকে একসঙ্গে দেখে আর সম্পর্কের কথা শুনে সংশয় কাটানোর জন্য মুখ ফুটে জিজ্ঞাসাই করে বসেছে—ও নিজের বোন তোমাদের?

এ-রকম প্রশ্ন শুনলে বড় দুই বোন লজ্জা পায় আর যার সম্পর্কে কথা সে আড়ালে গিয়ে কুৎসিত ভেঙচি কাটে।

ফলে ছেলেবেলা থেকেই ছোট মেয়ে কাজল বড় দুই বোনের ওপর হাড়ে চটা। পিঠোপিঠি তিন বোন, ঝগড়া-ঝাঁটি ছেড়ে মারামারিও একটু-আধটু লেগে যেত। কিন্তু বড় দুই বোন একত্র হয়েও ছোটর সঙ্গে পেরে উঠত না। ফলে কালী পেত্নী বলে গাল দিয়ে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলত দু'জনেই। মা এসে ওই ছোটকেই সব থেকে বেশি শাসন করতেন, চুলের ঝুঁটি টেনে ছিঁড়ে ফেলতে চাইতেন। আর একটু বড় হবার পর মা গায়ে অত হাত তুলতেন না, মুখে গালাগাল দিতেন, তোর বাইরেটা যেমন ভেতরটাও তেমনি—কোনদিকে যদি তাকানো যেত।

ছোটকে নিয়ে বাবা-মায়ের দুশ্চিন্তা দিনে দিনে বাড়তেই থাকল। পাড়ার বখাটে ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে, লজ্জাসরমের মাথা খেয়ে হাসাহাসি করে কোমর বেঁধে ঝগড়াও করে। চৌদ্দ ছাড়িয়ে পনেরোয় পা দিল, মারধরের শাসন আর কতদিন চলে? তাছাড়া চেহারা যেমন হোক, ওই বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গায়ে একটু মাংস লেগেছে, এক ধরনের ছাঁদছিরি এসেছে। ফ্রক ছেড়ে মা আগেই শাড়ি ধরিয়েছেন ওকে। দেখলে আঠেরোর কম মনে হয় না বয়েস। মেয়ের নিজেরই একটু সমঝে চলা উচিত—তা না ধিঙ্গিপনা!

বাবার টাকার জোর কম। বে-সরকারী আপিসের সুপারিনটেনডেন্ট হয়েছেন —তাও বেশি বয়সে। ভবিষ্যৎ ভেবেই মেয়েদের ভালো করে লেখাপড়া শেখানোর ইচ্ছে ছিল। রমলা আর শ্যামলীর বিয়ে হয়ে গেল বি, এ, পাশ করার আগেই। কিন্তু বাবা মায়ের সে জন্য একটুও খেদ নেই। কুড়ি না পেরুতে রমলার অবিশ্বাস্য ভালো বিয়ে হয়েছে। শিক্ষিত সুপুরুষ ছেলে, বাপ আর কাকার হার্ড-অ্যায়ারের ব্যবসা—নিজেদের বাড়ি, গাড়ি। ছেলের বাপ আর কাকা সেধে সম্বন্ধ নিয়ে এলেন একদিন। দাবি-দাওয়ার প্রশ্ন নেই। আগে থাকতে খবর দিয়ে মেয়ে দেখতে এলেন, দেখে দিন তারিখ ঠিক করার তাগিদ দিয়ে গেলেন।

ব্যাপার দেখে মেয়েদের বাবা-মা ভেবাচাকা। তাই দেখে আড়াল থেকে শ্যামলী আর কাজল মিটিমিটি হাসে। রমলা ওদের চোখ পাকিয়ে ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করে। অর্থাৎ খবরদার, বাবা-মাকে কিছু বলবি না।

কিছু না বললেও তাঁরা আঁচ করে নিলেন। শ্যামলী আর কাজল ছ'মাস আগে থেকেই বাবা-মায়ের মুখে এই হাসি দেখার প্রত্যাশায় ছিল। একই প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে আর একই বিল্ডিংয়ের দুই শাখার একদিকে কলেজ, একদিকে স্কুল। বাড়ি এসে এই

দুই মেয়েকে দিদি কেন ফিবল না সে-সাফাই অনেক দিন গাইতে হয়েছে বাবা-মায়ের কাছে। বি, এ, পবীক্ষা আসছে, পডার চাপ বাডছে, দিদি বিনেপযসায় ছুটিব পব প্রোফেসাবদের বাড়ি পডতে যায়, কখনো বা স্পেশাল টিউটোরিযালেব জন্য কলেজেই আটকে যায়, ইত্যাদি। মেয়ে কলেজ, মেয়ে প্রফেসাব, অতএব বাবা-মায়েব দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। বড মেয়েব হঠাৎ পড়াশুনাব একাগ্রতা দেখে মনে মনে বরং খুশিই তাঁবা। সেই মেয়ে বিয়েব পরেই কলেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছেঁটে দিল সেটাই বিস্ময়। মা বলেছিলেন এত পড়াশুনা কবলি, এত কষ্ট কবলি, পবীক্ষাটা দিয়েই ফেল না।

রমলা বলেছে, ভালো লাগে না।

বড মেয়ের ভালো লাগা-না-লাগাটা বাবা-মা এখন আব ছোট কবে দেখেন না। মা বলেন থাক তা হলে।

কাজল একটু ঝামটা মেবে বলে বসেছিল, কষ্টেব ফল তো পেযেই গেছে, আবার কেন।

শ্যামলী সশঙ্ক দৃষ্টিতে ডেঁপো বোনেব দিকে তাকিযেছে। সে ইদানীং দিদিকে বেশ একটু তোযাজ তোষামোদ করে। বমলা ছোটব কাছেও তা-ই আশা কবে। আডালে টেনে এনে কাজলকে শাসিয়েছে, তোর বড বাড বেড়েছে, না?

কাজলেবও তেমনি জবাব. যা যা. ওই ছোড়দি তোকে পটে বসিযে হাতজোড কবে থাকবে'খন. আমাকে চোখ দেখাতে আসিস না।

চাব মাস না যেতে কাজল মাযেব কাছে আব একটা বেফাঁস উক্তি কবে ফেলেছিল। বলেছিল, ছোডদিবও শিগগিরই খুব ভালো বিয়ে হয়ে যাবে দেখো।

মাযেব মনে সংশয, চোখে ভয়।—তুই কি ক'ব জানলি?

—দেখে নিও। কাজল আব বিস্তাবেব ধার ধারে না।

সেই বিকেলেই শ্যামলী একেবাবে আগুন ওব ওপব।—মাকে বলতে গেলি, তোব লজ্জা কবে না. হিংসুটে কোথাকাব। ভিতবটাও হিংসেয একেবারে কালি হযে আছে, কেমন?

কাজল পাল্টা ঝ'খে উঠেছে, আছেই তো। বেশ কবেছি বলেছি—আমি বাইবে কালো, ভিতবে কালো. আমাব সব কালো। তুই তোব ভদ্রলোককে রূপ ধুয়ে জল খাওযাগে যা।

আবো মাসকযেক যেতেই ছোট মেযেব উক্তিব সাব বুঝতে কষ্ট হযনি মাযেব। বমলা প্রায়ই শ্যামলীকে নিজেব বাড়িতে ধবে নিযে যায়। ছুটি থাকলে দুই-এক দিন আটকেও বাখে। ছোট বোনের চেহারা যেমনই হোক, তাকে অবজ্ঞা করতে দেখে মায়ের মনে লাগত। কিন্তু বড মেয়েব আসল উদ্দেশ্যটা বোঝা গেল যখন মাঝে মাঝে ওর খুড়শ্বশুবেব ছেলেব এ-বাড়িতে পদার্পণ ঘটতে লাগল। শ্বশুব আর খুড-শ্বশুবেব যুক্ত ব্যবসা, তবে একান্নবর্তী পবিবার নয। জামাই বিমানের মতো, রঞ্জনও ওই ব্যবসাব পদস্থ লোক একজন। সেও সুশ্রী, শিক্ষিত—বিমানেব থেকে আট-ন'মাসেব ছোট।

রমলাব কাছে সৌভাগ্যেব আভাস পেয়ে আশায় আনন্দে মুখে কথা সবে না মায়ের। মনে মনে বড মেয়েব বুদ্ধিব কত যে প্রশংসা করেছেন তারপব ঠিক নেই।

না, আশা এবং আনন্দ ব্যর্থ হয়নি মায়েব। বঞ্জনেব সঙ্গে শ্যামলীবও নির্বিঘ্নে বিয়ে হয়ে গেছে। আনন্দেব হার্ট একেবাবে।

তিন মাস না যেতে মা এবাব দুই কৃতী জামাইকেই মুরুব্বি ধবেছেন। ছোটব জন্য এবাবে একটা ভালো ছেলে দেখে দাও বাবাবা—চেহাবা যেমনই হোক, তোমবা থাকতে ওব বিয়ে হবে না?

কাজল মায়েব ওপব বাগে জ্বলছে। বিমান আব বঞ্জন দু'জনেই শাশুড়ীকে আশ্বাস দিয়েছে—বিয়ে হবে না কেন, সবে তো হায়াব সেকেণ্ডাবি দিল—এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন?

শাশুড়ী আড়াল হতেই প্রায় সমবয়সী খুড়তুতো-জাঠতুতো দুই ভাই কাজলেব পিছনে লেগেছে। বিমান বলে, হ্যাঁবে বমা, আব তো হাতেব মুঠোয় ভাই-টাই নেই আমাদেব—এটাকে আমবাই ভাগাভাগি কবে নিয়ে নিই, কি বলিস?

বঞ্জন সায় দেয়, আপত্তি কি. মা যে কেন ওব চেহাবাব খোঁটা দেন বুঝি না—আমাব তো বেশ লাগে।

কাজল ভেঙচি কেটে চেঁচিয়ে জবাব দেয়, নিজেব নিজেব বউকে শো-কেস-এ সাজিয়ে বেখে দেখে দেখে চোখ জুড়োও গে যাও না—আমাব পিছনে কেন।

এমন গলা ছেড়ে এই গোছেব কথা বলে যে দু' ভাই-ই চুপ কবে যায়। দু'বোন ভ্রূকুটি কবে তাকায় ছোট বোনেব দিকে। ওকে আড়ালে ডেকে ধমকায়, তোকে পছন্দ কবে বলেই ও-বকম ঠাট্টা কবে, তা বলে তুই যা মুখে আসে তাই বলবি! বাড়িতে সক্কলে কত সমীহ কবে ওদেব, জানিস?

—তোবা যে যাব পাদোদক ধুয়ে জল খা গে যা, আমাব পিছনে লাগতে আসে কেন?

একটা ব্যাপাব লক্ষ্য কবে কাজল অনেক সময় অবাক হয়েছে। বিয়েব আগে পর্যন্ত যে দু'ভাই হ্যাংলাব মতো দিদিদেব পিছনে ঘুবেছে, কলেজে এসে হাজিব হয়েছে বেহায়াব মতো, চোবেব মত লুকিয়ে সিনেমায় নিয়ে গেছে—বিয়েব কিছুদিন না যেতে সেই মানুষদেব ভিন্ন মূর্তি—বাশভাবী হোমবা-চোমবা মানুষেব মতো হাব-ভাব। দিদিব না হয় দেড বছব হতে চলল বিয়ে হয়েছে, বিমানদাব মনমেজাজ বুঝে চলে, কিন্তু ছোড়দিব তো বিয়ে পাঁচ মাসও হয়নি, এবই মধ্যে বঞ্জনদাব কথায় ওঠে বসে, তোয়াজ কবে চলে তাকে—আব সর্বদাই ভয়, এই বুঝি বকুনি খেতে হল।

যাক, কাজলকে নিয়েই এ বাড়িব যা-কিছু অশান্তিব সূত্রপাত। দু'দুটো মেয়েব অত ভালো বিয়ে হওয়ায় বাবা-মায়েব ওব জন্য আবো বেশি দুশ্চিন্তা। কিন্তু আচাব-আচবণে মেয়ে যেন আক্রোশবশতই তাঁদেব দুশ্চিন্তা আবো বাড়িয়ে চলেছে।

...একদিন দুপুবে বাপেববাড়ি আসাব সময় বমলা দেখে মোড়েব ও-ধাবে একটা বাববি-চুল লোকেব সঙ্গে কাজল হেসে হেসে কথা কইছে। লোকটাকে এবা সকলেই চেনে। নাম সনৎ ঘোষ, সকলে সোনা ঘোষ বলে ডাকে। কোন এক অ্যামেচাব ক্লাবেব হয়ে থিয়েটাব কবে বেড়ায়। সেই থিয়েটাবও বমলাবা দুই-একটা দেখেছে।

টাইপ বোল-এ মন্দ কবে না অবশ্য, কিন্তু বমলাবা দু'চক্ষে দেখতে পাবে না ওকে। বাস্তা দিযে হেঁটে গেলে ড্যাবড্যাব কবে চেযে থাকত—আব হবদম বিড়ি টানত।

সিনেমা থিযেটাব দেখাব ব্যাপাবে তিন বোনেব মধ্যে কাজলেবই নেশা বেশি। তা বলে এবকম একটা লোকেব সঙ্গে তাব বোন ঘাস্তায দাঁড়িযে কথা বলবে, হাসাহাসি কববে!

পিত্তি জ্বলে গেল বমলাব। এসেই মাকে নিযে পড়ল। ড্রাইভাবও নাকি দেখেছে আব তাইতে লজ্জায আবো বেশি মাথা কাটা গেছে বমলাব।

মাযেব বুকে ত্রাস। বললেন, ও আমাদেব মুখ পুড়িযে ছাড়বে, তোবা কিছু বল—

কাজল বাড়িতে পা দেবাব সঙ্গে সঙ্গে মাযেব চিৎকাব চেঁচামেচি, বকাবকি। কাজল ব্যাপাবখানা বুঝে নিল। সবোষে একবাব দিদিব দিকে তাকিযে নিজেব ঘবে চলে গেল। কিন্তু বমলা ছাড়বাব পাত্র নয। ঘবে ধাওযা কবল। বি, এ. পড়ছিস আব এই রুচি তোব, অ্যাঁ? এ-বকম একটা থার্ডক্লাস লোকেব সঙ্গে বাস্তায দাঁড়িযে কথা বলিস. হাসাহাসি কবিস?

কাজল গম্ভীব শ্লেষে জবাব দিল, তোদেব মতো ফার্স্টক্লাস লোক আব কোথায পাব বল—আমাব জুটলে থার্ডক্লাসই জুটবে।

বমলা ঝলসে উঠল, লজ্জাও কবে না মুখ নেড়ে কথা বলতে। তোব জামাইবাবু যদি কোন দিন এই কাণ্ড দেখে, কক্ষণো কোথাও তোব জন্যে চেষ্টা কবতে বাজি হবে ?

সঙ্গে সঙ্গে কাজলেব ধৈর্য গেল। পাল্টা ঝাঁজে বলে উঠল, তুই আব তোব ববও এই কাণ্ড কবে উতবে গেছিস—তোদেব বেলায দোষ নেই কেন? গাযেব চামড়া সাদা বলে আব বিমানদাব টাকা আছে বলে?

বমলা চিৎকাব কবে উঠেছে, মা—কাজল আমাকে অপমান কবছে, আমি আব এ বাড়িতে আসব না বলে দিলাম কিন্তু!

মা হাঁ-হাঁ কবে ছুটে এলেন, আব তাবপব যা মুখে আসে তাই বলে কাজলকে আব একপ্রস্থ গালাগালি।

মাসখানেকেব মধ্যে এব থেকে দ্বিগুণ হুলুস্থুল বাড়িতে। ছুটিব দিনে ফার্স্ট ক্লাসেব টিকিট কেটে বিমান আব বঞ্জন সস্ত্রীক সিনেমা দেখতে গেছল। হাফটাইমেব আলো জ্বলতে বঞ্জনেব চোখে পড়ল, সামনেব সস্তাব টিকিটেব সাবিতে একটা লোকেব পাশে বসে আছে কাজল। দুজনে হাসছে, গল্প কবছে। গাযে খোঁচা মেবে শ্যামলীকে দেখালো বঞ্জন, শ্যামলী দিদিব গা-টিপে সামনেব দিকে তাব দৃষ্টি আকর্ষণ কবল। ফলে বিমানেবও দেখতে বাকি থাকল না।

চাবজনেই সাবাক্ষণ গম্ভীব তাবপব। বমলা আব শ্যামলীব ছবি দেখা মাথায উঠল। সোনা ঘোষকে ওবা দুজনেই চেনে। কিন্তু বিমান আব বঞ্জন জিজ্ঞাসা কবতে দুজনেই মাথা নেড়েছে—চেনে না।

শো ভাঙার পব বিমান আব বঞ্জনেব ছোট শালীব জন্য অপেক্ষা কবাব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বমলা আর শ্যামলীব এত মাথা ধবেছে যে তাবা আব এক মুহূর্তও দাঁড়াতে

পাবছে না। ব্যাপাব বুঝেই দু'ভাই আব গাড়ি নিযে অপেক্ষা কবল না। বাড়ি ফিবে ছোট শালীকে নিযে গম্ভীব টিকাটিপ্পনী শুরু কবল।

বাত্রিতে একসঙ্গে দু'বোনই বাপেববাড়ি এসে হাজিব। বাবাও বাড়িতে তখন। সমাচাব শুনে বাবা-মাযেব মাথায বজ্রাঘাত। তাব ওপব বমলা শ্যামলী স্পষ্ট জানিযে দিল, এ বকম বিচ্ছিবি ব্যাপাব হতে থাকলে তাদেব আব বাপেববাড়ি আসতেই দেবে না।

ক্রোধে ক্ষিপ্ত হযে পাযেব থেকে চটি খুলে ছোট মেয়েকে মাবতে গেছলেন বাবা। মেযেবাই অবশ্য আটকেছে। আব মা আঁশবটি দিযে কুটতে চেযেছেন তাকে। ঘেন্নায ওই আঁস্তাকুড-মার্কা মুখে থুথু ছিটোতে চেযেছেন।

বিমান আব বঞ্জন বাড়ি এলে কাজল এবপব নিজেব ঘবেব দবজা বন্ধ কবেছে। তাবা ডাকা সত্ত্বেও আসেনি। দিদিবা তাব ফলেও ভযানক অপমান বোধ কবেছে।

বাপেববাড়িব এই অশান্তিব সংসাবে দুর্দিন ঘনালো হঠাৎ। বলা নেই, কওযা নেই, হার্ট-অ্যাটাকে মা হঠাৎ চোখ বুজলেন। বোনেবা তাবস্ববে আক্ষেপ কবল, কাজলই মা-কে মেবে ফেলল।

পাঁচ মাস না যেতে বাবাও গাড়িচাপা পড়ে মাযেব পথ ধবলেন। বড দুই বোন এবাবেও আছাড়ি-বিছাড়ি কবে কাঁদল। সেই একই আক্ষেপ। ছোট বোনেব চিন্তাতেই বাবা অহবহ অন্যমনস্ক থাকতেন। অতএব এই মৃত্যুব জন্যেও সে-ই দাযী।

শোকেব ব্যাপাব চুকেবুকে যেতে ওই দিদিদেব আশ্রযেই আসতে হল কাজলকে। কর্তব্যবোধে দিদিবাই টেনে নিযে এল অবশ্য। কিছুদিন বডদি বাখল তাকে, কিছুদিন ছোটদি। ওব অবস্থানেব ফলে দুই দিদিই স্বামীদেব কাছে সংকুচিত। সর্বদাই চাল-চলন সম্পর্কে উপদেশ দেয বোনকে। আব মেজাজ বুঝে বোনেব বিযেব চেষ্টাব অনুবোধ জানায।

তাবা কখনো চুপ কবে থাকে, কখনো বিবক্ত হয। বলে, সবুব কবো, চেষ্টা হচ্ছে, বললেই তো আব বিযে হয না—বোনেব রূপ তো জানো।

পাশেব ঘব থেকে বিমানদাব এই কথা নিজেব কানে শুনেছে কাজল। তাব ধাবণা, বঞ্জনদাও ছোড়দিকে এই কথাই বলে।

দিদিব ততদিনে একটি ছেলে হযেছে, আব ছোটদিবও হব-হব কবছে। স্বামীদেব তাবা আবো অনুগত হযে পড়েছে। নির্বাক কাজল বাড়িতে দু'জনেবই গুরুগম্ভীব ব্যক্তিত্ব অনুভব কবে। কাজলেব সঙ্গে তাবা যে একেবাবে কথা বলে না তা নয। দু'ভাই একসঙ্গে হলে ঠাট্টাও কবে, আমাদেব দুজনেব মধ্যে সেই ভাগাভাগিই হল দেখছি—

বিমানদা জিজ্ঞাসা কবে, পড়াশুনাব ইচ্ছে থাকে তো বলো, আবাব ব্যবস্থা কবে দিই।

দিদি উষ্ণ ঝাঁজ দেখায, আব পড়াশুনায কাজ নেই, বিযেব চেষ্টা দেখো।

বঞ্জন সকলেব সামনেই ভ্রূ-ভঙ্গি কবে খুঁটিযে দেখে কাজলকে।—তোমবা যা-ই বলো, কাজল দেবীব মধ্যে একটা বলিষ্ঠ ভাব আছে যা তোমাদেব নেই—ছেলেগুলোব চোখে পড়ে না কেন বুঝি না।

শ্যামলী হেসে বলে, তোমাকে আব চাটুকাবিতা কবতে হবে না।

দুই ভাইযেব খুব ভাব। তাবা একত্র হলেই শুধু এই গোছেব একটু-আধটু হাসি-ঠাট্টা হয।

এবই মধ্যে একটা কাণ্ড ঘটে গেল একদিন। কাজল তখন বমলাব কাছে। বাডিব ঝি এসে জানালো, একটা লোক মাসিমণিব খোঁজ কবছে।

মাসিমণি অর্থাৎ কাজল। বিমান কাজে বেবোযনি তখনো। সেও শুনল খববটা। বমলা আব বিমান দুজনেই দবজাব বাইবে এসে দেখল কে লোক। দেখামাত্র বমলা চাপা ঝাঁজে বলে উঠল, তাডিযে দাও। ঘাডধাক্কা দিযে বাব কবে দাও।

অদূবে দাঁডিযে আছে সেই বাববি-চুল সোনা ঘোষ।

কিন্তু তাডানো বা ঘাডধাক্কা দেওযাব ফুবসত মিলল না। ওদিকেব ঘব থেকে তাকে দেখেই কাজল পাযে পাযে এগিযে গেছে। সামনে এসে দাঁডাল। পাঁচ সাত মিনিট দাঁড়িযে দাঁডিযেই দু'জনেব কি কথা হল এদিকেব কেউ জানল না। বমলা আব বিমান লোকটাকে বিমর্ষ মুখে চলে যেতে দেখল।

বিমান জিজ্ঞাসা কবল, কে?

বমলা শুকনো গলায জবাব দিল, সোনা ঘোষ বাজে লোক একটা।

—কি কবে?

—থিযেটাব।

লোকটা চোখেব আডাল হতেই বাগে গজবাতে গজবাতে বোনেব কাছে এলো বমলা।—ও এখানে এসেছে কোন সাহসে? কোন আক্কেলে?

কাজল মুখ তুলে তাব দিকে তাকালো শুধু। দিদিব পিছনে বিমানদা দাঁডিযে।

দিদি আবো অসহিষ্ণু।—আমি জানতে চাই, ও কেন এসেছে এখানে?

কাজল ঠাণ্ডা জবাব দিল. আমাকে দেখতে।

এবকম জবাব পাবে বমলা আশা কবেনি। বাগে সমস্ত মুখ বক্তবর্ণ। কিন্তু সে ফেটে পডাব আগেই বিমান জিজ্ঞাসা কবল. তোমাকে দেখতে ও কি আবো এখানে এসেছে, না এই প্রথম?

কাজল নিরুত্তবে তাকাল শুধু। জবাব দিল না।

—দেখো কাজল দেবী, বিমানেব গলাব স্বব আদৌ উঁচু পর্দায উঠল না, অথচ কঠিন শোনালো, এ বাডিব ডিসিপ্লিন আব বীতিনীতি একটু অন্যবকম, সেটা এতদিনে তোমাব বোঝাব কথা—এটা মনে বেখো।

বিকেলেই ফোন কবে শ্যামলীকে আনিযেছে বমলা। ওদিকে বিমানেব মুখে বঞ্জনও খবব শুনছে। আপিসেব পব সেও সোজা এখানেই এসেছে। আব তাবপব সকলে মিলে কঠিন উপদেশই দিযেছে কাজলকে।

কাজল নির্বাক। সে-ও তাব একটা বাডতি অপবাধ যেন। আসলে সে যে সোনা ঘোষকে এখানে আসতে সাফ নিষেধ কবে দিযেছে, সেটা জানাব কেউ দবকাব বোধ কবল না।

পবদিন দিবানিদ্রা সম্পন্ন কবে বমলা কাজলকে দেখতে পেল না। কোথাও না। শ্যামলীকে ফোন কবল। সেও আকাশ থেকে পডল, অর্থাৎ তাব ওখানেও যায নি।

দুই-এক দিন নয়, দুই-এক মাস নয়—টানা তিন বছর কেউ আর তার হদিস পেল না।

কোনো এক অ্যামেচার ক্লাবের অভিনেত্রী কাজল মিত্রর নাম ছড়াতে লাগল একটু একটু করে। তারপর সে-নাম আর দিদিদের ভগ্নীপতিদের কানেও এলো। তারা সাগ্রহে দুই একটা থিয়েটার দেখে এলো। অভিনয় সকলেরই ভালো লেগেছে, কিন্তু সকলেই গম্ভীর।

বোনেরা খবর সংগ্রহে সচেষ্ট হল। অ্যামেচার ক্লাবের অভিনেত্রী হলেও ভালো রোজগার করে কাজল মিত্র। কলকাতা এবং কলকাতার বাইরে থেকেও ডাক পড়ে তার।

আরো এক বছরের মধ্যে ওই নামের চটক চারগুণ বেড়ে গেল। সিনেমা থিয়েটারের পত্র-পত্রিকায় তার ছবি আর খবর বেরুতে লাগল। বড় কাগজের কলা বিভাগগুলোতেও। শহরে সব থেকে বড় পেশাদার নাট-মঞ্চ মোটা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে দু-বছরের জন্য চুক্তিবদ্ধ করেছে তাকে।

সেই দু' বছরে তার তিনটে নাটকের সফল অভিনয় দেখল দিদি ভগ্নীপতিরা। মুগ্ধ হবার মতোই অভিনয় বটে। পেন্টিংয়ের ফলে স্টেজে দস্তুরমতো রূপসী দেখায় তাকে। মাঝের ঐতিহাসিক এক নাটকে তো রাজেন্দ্রাণীর ভূমিকায় তারই জয়জয়কার। সেই অভিনয় দেখেও দিদিরা হতবাক। হাবভাব চাউনি চলন বলন সবই মিষ্টি অথচ দৃপ্ত রাজেন্দ্রাণীর মতোই।

তৃতীয় বছরের শেষেই পত্র-পত্রিকার বিমর্ষ খবর, প্রতিভাসম্পন্না অভিনেত্রী কাজল মিত্রকে পেশাদার নাটমঞ্চ আর চুক্তিবদ্ধ রাখতে সক্ষম হলেন না। অচিরে নিজেই তিনি একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান চালু করবেন। ইতিমধ্যে চিত্রজগতের দু'জন খ্যাতিমান পরিচালক তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। দুটি বড় ছবিতে তাঁকে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে। তবে আশার কথা, কাগজের প্রতিনিধিদের তিনি বলেছেন, রঙ্গমঞ্চই তার প্রাণ, এটি তিনি ছাড়বেন না, ছায়াচিত্রের কাজটাই বরং সাময়িক।

ছোট বড় সব কাগজেই চিত্র এবং নাটমঞ্চের পাতায় কাজল মিত্রর ছবির ছড়াছড়ি। কাজল মিত্র গাড়ি ড্রাইভ করছেন। নীল চশমা পরে—কাগজে এমন ছবিও বেরিয়েছে। আর কাজল মিত্রর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান চালু হবার সংবাদও।

আর নিস্পৃহ থাকা সম্ভব হল না দুই বোনের। পরামর্শ করে এক দুপুরে বাড়ির গাড়ি না নিয়ে ট্যাকসিতে চেপে দু'জনে বেরিয়ে পড়ল। সিনেমার কাগজে বাড়ির ঠিকানার হদিস মিলেছে—কিন্তু গাইড হাতড়ে ফোননম্বর পায়নি। অতএব কপাল ঠুকে রওনা হয়েছে।

শহর থেকে অনেক দূরে ছোট একটা ছিমছাম একতলা বাড়ি। সামনে ছোট একটু বাগান।

কড়া নাড়তে কাজলই দরজা খুলে দিল। তারপর দুই চক্ষু বিস্ফারিত। মুখে কথা সরে না খানিক।—কি ভাগ্যি কি ভাগ্যি—তোরা! আঁা, আমি জেগে আছি না ঘুমুচ্ছি? আয় আয় আয়—

খুশিতে আটখানা একেবারে। আদর করে তাদের টেনে এনে বসালো। তারপর লাফালাফি ঝাঁপাঝাঁপি শুরু করে দিল একেবারে।

গোড়ায় খানিক দুই বোনেরই বিব্রত মুখ। তারপর রমলা বলল, আর বেশি খাতির দেখাস না, বাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনটে বছর সোজা ভাবিয়েছিস?

কাজল হাসল একচোট। তারপর বলল, তিন বছর পরে তো আরো তিনটে বছর কেটে গেল, তার মধ্যে তো একটা-বার খবর নিতে এলি না।

শ্যামলী বলল, আমাদের আসা কি সহজ কথা নাকি, কোন রাজ্যের পারে এসে আছিস—তাছাড়া সেদিন মাত্র তো তোর ঠিকানা জানলাম।

কাজল হাসছে তাদের দিকে চেয়ে। ঝকঝকে দাতের একটু একটু দেখা যাচ্ছে। এমনিই নিঃশব্দ অথচ জীবন্ত হাসি রাজেন্দ্রাণীর ভূমিকায় নাটকেও দেখেছিল দুই বোনের মনে পড়ল। আর মনে হল মেয়েটার সেই চেহারা সেই রং সেই নাক মুখ চোখই আছে—কিন্তু তার মধ্যেই কেমন একটু শ্রী এসেছে বেশ যা চোখে পড়েই।

ফুর্তিতে কাজল নিজের হাতে চা বানালো, খাবার এনে সামনে রাখল, আর গল্প করতে লাগল। কিন্তু দিদিরা অন্য গল্প ছেড়ে শুধু সিনেমা আর থিয়েটার রাজ্যের গল্প শুনতে চায়। কাজলের ওই গল্পে আবার উৎসাহ কম, জিজ্ঞাসা করলে জবাব দেয়।

অনেকক্ষণ বাদে ওর সিঁথির দিকে চোখ গেল রমলার। বলল, বিয়ে-থা করলি না এখনো, আর কবে করবি। বয়েস তো সাতাশ গড়ালো।

কাজল হাসিমুখে সোজা উত্তর দিল, বিয়ে করেছি বলতে পারিস, আবার করিওনি বলতে পারিস। তবে পাকা অনুষ্ঠান এবারে একটা শিগগিরই সেরে ফেলব ভাবছি নেমন্তন্ন করলে আসবি?

আগেরটুকু শুনে রমলা আর শ্যামলীর মুখ লাল। কিন্তু জবাব দেবার আগেই বাইরে থেকে আর একজনের পদার্পণ ঘটল। সেই বাবরি-চুল সোনা ঘোষ, পরনে সেই রকমই পাজামা আর টুইলের শার্ট তবে একটু মোটার দিকে ঘেঁষেছে। ওকে দেখে বোনেরা সচকিত।

সোনা ঘোষ থমকালো একটু। তারপর একগাল হেসে বলল, দিদিরা যে। খবর ভালো?

রমলা আর শ্যামলী চুপ।

সোনা ঘোষ কাজলের দিকে ফিরল।—জলপাইগুড়ির সেই পার্টি ঠায় আপিসে বসে আছে, কন্ট্রাক্ট সই না করে নড়বেই না।

কাজল ভুরু কুঁচকে ভাবল একটু।—কবে নিতে চায়?

—এই মাসে হলেই সুবিধে হতো বলছে।

—উঁহু, এ মাসে হবে না, শুটিং আছে—সামনের মাসে গোড়ার দিকে হতে পারে। সব খরচখরচা বাদ দিয়ে চার হাজার টাকা দিতে রাজি থাকে তো কন্ট্রাক্ট সই করে দাও।

দিদিদের দিকে আর একবার কৌতুক-মাখা চোখ বুলিয়ে সোনা ঘোষ চলে গেল।

কাজল আলতো করে জিজ্ঞাসা করল, ভগ্নীপতি পছন্দ হল তোদের?

ওবা দুজনেই আঁতকে উঠল একেবাবে। বমলা বলেই ফেলল, ওই লোফাবটাকেই শেষ পর্যন্ত বিয়ে কববি তুই।

কাজল হাসছে। বলল, লোফাবই বটে... গোডায় গোডায় অভিনয় বপ্ত কবতে না পাবলে চডচাপড পর্যন্ত বসিয়ে দিত, বুঝলি?

বাগত মুখে শ্যামলী বলল, তোব রুচি আব বদলালো না।

কাজল হাসছে।—যা বলেছিস, আব এত টাকাপযসা নাড়াচাডা কবছে তবু রুচি ওই লোফাবেবও বদলালো না।...অথচ কতই তো দেখছি, কত বকমেব প্রস্তাব নিয়ে কত লোক আসছে—আব কত উদাব সব। ভালো কথা, নিজস্ব প্রতিষ্ঠান কবব খববটা কাগজে বেরুবাব পব চেকবই পকেটে কবে বিমানদা আব বঞ্জনদাও ছোটাছুটি কবে এসেছিল। কাজল হাসছে।—আলাদা আলাদা অবশ্য—টাকাব দবকাব নেই বোঝাব পবেও আসাব কামাই নেই—হাজাব হোক, শালী তো—টান যাবে কোথায়। শেষে এত বেশি আসতে লাগল যে তোদেব কথা ভেবে আমিই একদিন নিষেধ কবে দিলাম—তোবা ফিবে গিয়ে বেচাবাদেব ওপব আবাব বাগাবাগি কবিস না।

কাজল হাসছে। সেই সামান্য দাঁত-চিকানো নিঃশব্দ হাসি। এখন মেক-আপ নেই, পেণ্ট নেই, তবু ওই মুখ ওই চাউনি আব ওই হাসি বাজেন্দ্রাণীব মতোই লাগছে।

বক্তশূন্য পাংশু বিবর্ণ মুখে বমলা ও শ্যামলী যাবাব জন্যে উঠে দাঁড়িয়েও সেইটুকু দেখে নিচ্ছে।

চলো জঙ্গলে যাই

সকালে খানিকক্ষণ বেডিও শোনা অভ্যাস। তাই শুনছিলাম। চোখ অন্য-কাজে ব্যস্ত থাকলেও কান সজাগ ছিল। এই দিনে চোখ-কান-হাত-পা সব একই সঙ্গে যে বিভিন্ন কাজে নিযোগ কবতে পাবে না তাব অগ্রগতি ব্যাহত হ'তে বাধ্য। আমাব হাতে সিগাবেট ছিল, চোখ দুটো সামনেব বইযেব দিকে ছিল, মনেব একভাগ বইযেব লেখকেব দিকে আবেক ভাগ বেডিওব দিকে ছিল, আব মগজেব কোষে-কোষে সিগাবেট, বই, লেখক, বেডিও থেকে শুরু ক'বে সমস্ত দিনেব প্ল্যান-প্রোগ্রাম সবই আসা-যাওয়া কবছিল। এই সব গুণ কবাযত্ত ব'লেই সিদ্ধিব পথে আমাব সহজ স্বচ্ছন্দ গতি। গেলবাবে আমাব সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক বন্ধুবা, সবকাবী বে-সবকাবী বহু পদস্থ শুভার্থীবা আমাকে যখন মানপত্র দেন, তখন আমাব বহু গুণেব কথা উল্লেখ ক'বে অনেকেই তাঁবা সশ্রদ্ধ বিস্ময প্রকাশ কবেছেন। তাঁদেব সেই বিস্মযেব উত্তবে আমি বিনীত জবাব দিযেছিলাম, সবেতে সহিষ্ণু, সংযম, উদাব দৃষ্টিভঙ্গি আব অতি মন্দেব মধ্যেও ভালো দেখাব চেষ্টা ছাডা আমাব আব কোনো গুণ নেই; শুধু এই ক'টি মিলিযে আমি যা—তাই।

মিথ্যে বলিনি বা অতিশযোক্তি কবিনি। মনেপ্রাণে এই তিন মন্ত্রেব ওপবে নির্ভব কবেই আমি দিনযাপন ক'বে চলেছি।

সকালে বেডিও খুলি, কাবণ প্রথম দিকে ভালো ভালো ঠাকুব-দেবতাব গান থাকে কযেকটা, যা শুনলে চিত্ত প্রসন্ন হয, একটা শুচিশুদ্ধ ভাব জাগে মনে। তাবপব বেডিওব খববও খববেব কাগজেব খববেব থেকে আমাব ভালো লাগে। খববেব কাগজগুলো সর্বদা দু-নৌকায পা দিযেই আছে, মানুষেব চিন্তা বিভ্রান্ত কবাই যেন তাদেব কাজ। একই সঙ্গে প্রশংসা আব নিন্দা, স্তুতি আব কটূক্তি, আস্থা আব অনাস্থা—সব পাশাপাশি বিবাজ কবছে। কিন্তু বেতাবেব খববে উন্নতিব প্রযাস, অগ্রগতিব চেষ্টা, সততা, নিষ্ঠা আব আশা-আশ্বাসেব, একটা স্পষ্ট চিত্র মেলে। উজ্জ্বল সম্ভবনায মন প্রসন্ন হয।

বাড়িতে অবশ্য উঠতি বযসেব ছেলেছোকবা আছে আবো, নিজেদেব তাবা বেশ দিগগজই ভাবে। ভালো ভালো খবব শুনলেও তাদেব মন ভবে না, তাদেব চোখে অবিশ্বাস উকিঝুঁকি দেয, ঠোঁটে অনেক সময বাঁকা হাসি ফোটে, আব মনে মনে হযত বক্র শ্লেষও কবে। কিন্তু ওদেব এই বিরূপতা একটু রূঢ শাসনেই আমি কাটিযে তুলতে চেষ্টা কবছি। কিছুটা সফলও হযেছি। এখন আব আমাব সামনে অন্তত মুখ ফুটে কেউ কিছু বলে না।

আমি ওদেব বলি, এত ধৈর্যশূন্য হবাব কী আছে, এই তো সেদিন মাত্র স্বাধীন হলাম, শিশু দেশ আমাদেব, এবই মধ্যে যা হযেছে অনেক হযেছে—ভোজবাজীব ব্যাপাব তো নয যে বাতাবাতি একেবাবে প্রাচুর্যেব বন্যা এসে যাবে।

জবাবে সব থেকে মূর্খেব মত আমাব স্ত্রীই একদিন মুখ-মচকে প্রতিবাদ ক'বে বসেছিলেন, বলেছিলেন, তাও তো আঠেব বছব হ'যে গেল দেশ স্বাধীন হযেছে, শিশু আব কতকাল থাকবে?

সত্যিই আমাব মনটা সেদিন খাবাপ হযে গিযেছিল—ঘবেব স্ত্রী পর্যন্ত যদি মনে মনে অবিবেচক হন তাহলে কেমন লাগে? বাগ না ক'বে জিজ্ঞাসা কবলাম, তোমাব ছেলেব বযেস কত?

আমতা আমতা ক'বে জবাব দিলেন, উনিশ

বললাম, তাকে তুমি কোন চোখে দেখো? মস্ত যোগ্য হযেছে ব'লে তাকে তুমি ঠেলে বাস্তায বাব ক'বে দিতে পাবো? সেদিন পযসা চুবি ক'বেছিল বলছিলে, মস্ত নীতিবতী হযে, তাকে তুমি জেলে পাঠাওনি কেন? ও-বাড়িব ওই দুর্বল ছেলেটাকে, অমন ঠেঙিযে আধমবা ক'বে আসাব পবেও ওব তুমি একখানা হাতও ভেঙে দাওনি কেন? আপদে-বিপদে এত সন্তর্পণে তাকে তুমি আগলে বাখো কেন? এই সবেবই একমাত্র কাবণ, আসলে ওকে তুমি শিশু ভাবো, এবং ঠিকই ভাবো। দেশটাকেও ঠিক এই চোখেই দেখা উচিত।

সেই মোক্ষম জবাবেব পব স্ত্রীব মুখ বন্ধ হযেছে।

যাক এসব কথা, আজ থেকেই আমাব মেজাজ কিছুটা বিগডে দিযেছে যে বস্তুটা, সেটা আমাব হাতেব এই বই। না পাবছি ভালো কবে বেডিওব খববে মন দিতে, না পাবছি বই হাতে নিযে আব কিছু ভাবতে। জুতোব ভিতব থেকে পাযেব তলায ক্রমাগত যদি কিছু খচখচ ক'বে বিঁধতে থাকে, আঘাত সামান্য হলেও কতক্ষণ আব সেটা ববদাস্ত ক'বে নির্লিপ্ত থাকা যায?

বইটাব নাম 'চলো, জঙ্গলে যাই'—জীবন-যন্ত্রণাব প্রতীক এক আধুনিক কবিব কাব্যসংকলন। চোখা-চোখা বাক্যবাণ সাহিত্যেব আওতায আনাব ফলে কবিব একটু সস্তা নাম হযেছিল। আমি নামই শুধু শুনেছিলাম, আগে তাঁব লেখা কিছু পডিনি। পণ্ডশ্রম কবাব মত অত সমযও নেই। কবিব এই নবতম সংকলনটিব প্রসঙ্গে পাঠকেব একটু বেশি উচ্ছ্বাস প্রকট হবাব ফলেই বইটা আমাব হাতে এসেছে। আবাব সুস্থ-বুদ্ধি দু-চাবজনেব অনুরোধও এসেছে আমাব কাছে, কবিতাব বইটা প'ডে কাগজে আচ্ছা কবে একটু সমালোচনা করুন তো—এ সব আলপিন-সাহিত্য আব তো সহ্য হয না।

সমালোচনাব উদ্দেশ্য নিযেই বইটা হাতে নিযেছি, আব এ সপ্তাহে সমালোচনা প্রকাশ কবতে হ'লে আজই এটা উল্টে-পাল্টে দেখে যা লেখাব লিখে দিতে হবে। কিন্তু বইটা পডতে পডতে গাযে যেন জল-বিছুটি লাগছে এক-একবাব, ইচ্ছে হযেছে ছুঁডে ফেলে দিই। কিন্তু ছুঁডে ফেলে দিলে সমালোচনা লেখা হয না—আব সমালোচনা না কবা মানেই এই সব অসংযমী বেপবোযা লেখককে প্রশ্রয দেওযা।

অতএব পডছি আব জ্বলছি।

সবকটা কবিতাব মধ্যেই কবি তাঁব পাঠকবর্গসহ জঙ্গেলে যেতে চাইছেন। তাব মতে দেশটা এখন আব বাসযোগ্য নয, এই সভ্যতাব মশাল জ্বালিযে পুডিযে খাক কবে দিলে সব, এই সভ্যতাব মোলাযেম হিংসা বনেব হিংস্র শ্বাপদকেও হাব মানিযেছে, মানুষেব মধ্যে এখন আব লোভ-লালসা দুর্নীতি-বিদ্বেষ ছাডা আব কিছু দেখছেনই না কবি, দযা-মাযা-ভালবাসা-মানবতাব শুধু মুখোশই দেখা যাচ্ছে সর্বত্র, শাসকেব বেশে শোষক ঘুবছে, ধার্মিকেব বেশে অত্যাচাবী ছুবি হানছে, ন্যাযেব নামাবলী পবে অন্যাযেব বিজযযাত্রা চলেছে—অতএব এই পাপ যাদেব সত্যিই অসহ্য, কবিব সঙ্গে তাবা যদি জঙ্গলে যাত্রা কবে, তাহলে এখান থেকে অন্তত অনেক সুখে থাকবে। নমুনা দিই

তুমি শান্তি চাও?
বুকেব তলায ডুব দিযে দেখো বন্ধু,
দেখো সত্যি কি চাও তুমি।
শান্তি যদি চাও,
তবে অন্য পথ নাও।
এখানে শান্তি বড চড়া দবে বিকোয,
এখানে প্রাচুর্যেব পাপে নাবাযণ শুকোয,
তোমাব মূলধন তো কানাকডি।
নীতিব খাপে পোবা তীক্ষ্ণ অস্ত্র নেই তোমাব ঝুলিতে,
লোভেব আগুন ছাই-চাপা নেই তোমাব
অহিংস উদাব বুলিতে,
কথাব প্রলেপে তুমি, দিন কে পাবো কি বাত কবতে?
আব প্রসন্ন ঢেকুব চেপে, চোখ দিযে পাবো
সমব্যথাব অশ্রু ঝবাতে?

হায বে হায, তোমাব মূলধন যে কানাকড়ি।
তবু যদি বলো শান্তি চাই—
তাহলে আমি যা বলি শোনো তাই,
চলো বন্ধু,
চলো জঙ্গলে চাই।

এব পব স্নায়ু ঠাণ্ডা কবাব জন্যেও খানিকক্ষণ অন্যদিকে মন ফেবানো দবকাব। বই বেখে খববেব কাগজ টেন নিলাম। কিন্তু এইসব অপবিণামদর্শী লেখকদেব কথা ভেবে গা জ্বলছে। সবকাবেব ওপব এই প্রথম হযত একটা ব্যাপাবে বাগ হল আমাব —তাদেব মুদ্রণ পর্যবেক্ষণ দপ্তব তো আছে একটা, এই সব বই বাজেযাপ্ত কবে না কেন তাবা? কেনই বা শান্তিপ্রিয লোকগুলোকে এভাবে তাতিযে তুলতে দেয?

খববেব কাগজে কতকগুলো ভালো ভালো খববেব ওপব চোখ বুলিযে মনটা একটু প্রসন্ন হল। নতুন কযেকটা পবিকল্পনা প্রায সমাপ্তিব পথে, খাদ্য-দপ্তব খাদ্যেব অনটন দূব কবাব দৃঢ উদ্দীপনায কতকগুলো ভালো ভালো ব্যবস্থায অগ্রসব হতে চলেছেন, অন্যদিকে শাসকবা স্পষ্ট ঘোষণা কবেছেন—মুনাফাখোব, মজুতদাব বা ভেজাল-ব্যবসাযীদেব দুর্নীতি আব তাঁবা কিছুতেই ববদাস্ত কববেন না—তাদেব শুভবুদ্ধিব উদ্রেক কবাব এবং তেমন প্রযোজনে শাস্তি পর্যন্ত দেওযাব বাস্তাও বাব কবতে বদ্ধপবিকব তাঁবা।

চাকব এসে খবব দিলে, নিচে একটি মেযে এসেছে, দেখা কবতে চায।

কে আবাব মেযে এলো এসমযে দেখা কবতে, বুঝলাম না।

সিঁড়িব মুখে বাধা পড়ল, স্ত্রী উঠে আসছেন। আমাকে দেখে বললেন, যে লোকটা চুপি চুপি বেশি দবে, বাড়িতে মাছ দিযে যায তাবও আজ দেখা নেই—কী হবে?

এসব কথা কোনো দিনই ভালো লাগে না, অথচ আমাবই কানে বেশি আসবে। বললাম, মাছ ছাড়াও লোকে দু' দশ দিন প্রাণধাবণ কবতে পাবে—বেশি মাংস আনিযে নাও, মাংস তো পাওযা যাচ্ছে।

কিন্তু এই ফযসালাব পবেও পাশ কাটানো গেল না। তিনি আবাব বললেন, কিন্তু বাঁধবে কী দিযে মাথামুণ্ডু—দিচ্ছি দিচ্ছি ক'বে তিন দিন ধবে তেলঅলাবও তো পাত্তা নেই।

এবাবে সত্যিই বাগ হল, বললাম, নেই তাব জন্যে মাথা খাবাপ কবাব কী আছে? এক কালেব মানুষ সব কিছু পুড়িযে খেত, তাদেব স্বাস্থ্য, তোমাব-আমাব থেকে খাবাপ ছিল না।

বলে ফেলেই এক ধবনেব অস্বস্তি বোধ কবলাম। জঙ্গলেব কবিব, জঙ্গলেব মানুষদেব সমর্থনই যেন ক'বে ফেলা হল। নামতে নামতে আবাব ঘুবে দাঁড়িযে শুধবে নিলাম।—"সেদ্ধ কবেও বেশ খাওযা চলে সব কিছু, তাতে স্বাস্থ্য ববং আবো ভালো থাকে।"

নিচে অপেক্ষা কবছে বছব বাইশ-চব্বিশেব একটি মেযে। মোটামুটি সুশ্রী, ভালো স্বাস্থ্য, একটু গম্ভীব গোছেব। যে ধবনেব মেযে দেখলে চোখে স্বভাবতই প্রীতি হয একটু। চেনা-চেনা লাগল মুখখানা, অনেকদিন আগে কোথাও যেন দেখেছি।

মেয়েটি উঠে এসে আমাকে প্রণাম করল, কাকাবাবু ডাকল, বলল, আমাকে চিনতে পারলেন না তো কাকাবাবু?

ওর বাবার নাম বলতেই চিনলাম, আমাদের বিনয়ের মেয়ে। স্কুল-কলেজে বিনয় আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। কোথায় একটা কেরানীগিরি করে এখন, সংসার নিয়ে হিমসিম খাচ্ছে, বিশেষ দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। কিছুদিন আগে তার এই মেয়ের সম্পর্কেই কী যেন শুনেছিলাম...ঠিক মনে পড়ছে না, কী একটা কারণে মেয়েটা চাকরি ছাড়তে চায়—ওই গোছের কিছু।

মেয়েটির কথাবার্তা বেশ স্পষ্ট, সপ্রতিভ, আলগা লজ্জা-সঙ্কোচ নেই। আগমনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল, কোনো ভালো ভদ্র প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে চায়, আমাদের কাগজে কোনো চাকরির ব্যবস্থা হতে পারে কিনা...।

আমি অবাক একটু, কেন, তুমি তো একটা ভালো চাকরি করছিলে কোথায় শুনেছি!

জবাবে প্রায় অসঙ্কোচেই সে জানালো, ভাল চাকরিই করছিল এবং এখনো করছে। শর্টহ্যাণ্ড-জানা-গ্র্যাজুয়েট বলে চাকরি পাওয়াও সহজ হয়েছিল। তারপর স্টেনোটাইপিস্ট থেকে দেড় বছরের মধ্যেই স্টেনোগ্রাফার হয়েছে, থাকতে পারলে শিগগীরই হয়ত পি. এ-ও হয়ে যাবে। কিন্তু থাকাটাই আর সম্ভব হচ্ছে না, আত্মসম্মান বজায় রেখে সেখানে চাকরি করা কঠিন হয়ে উঠেছে। তার ঘন ঘন প্রমোশন পাওয়াটাও সকলে সুচক্ষে দেখছে না...দেখার কথাও নয়।

এইবার মনে পড়ল, ওর বাপের মুখে কী শুনেছিলাম। বাপ দুঃখ ক'রে বলছিল, মেয়েটা যা-ও একটা ভালো চাকরি পেয়েছিল, টিকতে পারছে না। ছাড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কী যে মতিগতি হয়েছে আজকাল, ছেলে-ছোকরা ছেড়ে বাপের বয়সী অফিসাররা পর্যন্ত সোজা রাস্তায় চলে না।

যেমন বাপ তেমনি মেয়ে। বিরক্তিকর না তো কী! এই বয়সের মেয়ে পর্যন্ত একটু উদার হতে পারে না। ফ্রয়েড বা হ্যাভলক এলিস পড়া থাকলে এই সব সামান্য সহজাত বিকৃতিগুলোকে বরং একটু দরদের চোখে দেখতে পারত। দুর্নীতির মধ্যে পা না বাড়িয়েও সহজ একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে তোলার বলিষ্ঠ চিন্তা এদের মাথায়ই আসে না। নীতি-নীতি করেই গেল সব, এই সামান্য কারণে একেবারে চাকরিই ছাড়তে হবে!

বিরক্তি চেপে ওকে বললাম, আমাদের কাগজের অফিসে মেয়েদের কোনো স্কোপ নেই। এও বললাম, এতেই যদি চাকরি ছাড়তে হয়, তাহলে তার উচিত কোনো মেয়ে-স্কুলে চাকরি নেওয়া।

ওপরে এসে আবার ওই জঙ্গল-ভক্ত কবির বইটাই খুলে বসলাম। প্রথমেই যে জায়গাটায় চোখ পড়ল, মনে হল চোখে যেন পট-পট করে ইনজেকশন ফোটাচ্ছে কেউ :

...তাই বলি বন্ধু, যদি সঙ্গী পাই
তবে খাঁটি সবুজ জঙ্গলে যাই।

যেখানে হিংসা খাঁটি,
আর সরলতাও।
যেখানে বাঘ ভালুক হায়না—
আপন মুখ মুখোশে ঢাকে না।
যেখানে হিংস্র চকিত হুঙ্কারে
ভক্ষ্য হবিণের ঘাড়ে লাফায,
রক্ষা কববে বলে তাকে—
বৃথা আশ্বাসে ভোলায না।
যেখানে শ্বাপদ-হিংসা খাঁটি
আব শশকেব সরলতাও।
অবণ্যে আবো ক্ষুধা নেই একথা বলি না বন্ধু,
বিপু যেখানে আদিম আব অবিকৃত
সেখানেও বনিতাব খোঁজ পড়ে অবিবত।
তবু আপন-নির্ভয়ে সেথায় বনিতাবে রক্ষা কবা বীতি,
আব অকপট শৌর্যে তাবে জয় কবা নীতি।
সেখানে ক্ষুধা খাঁটি
আব বনিতাব সবলতাও।
দুইই সকলে চেনে।
যেখানে অচেনা কেউ নয, যেমন এই সভ্যতার অরণ্যে।
তাই, আমরা যাবা চেনা মুখ খুঁজে বেড়াই
তাবা এসো বন্ধু,
চলো, নির্ভেজাল জঙ্গলে যাই।

জঙ্গলেব বই ফেলে, সহজ দম নিতে ফেলতে সময লাগল একটু। ভেবে আর মাথা গরম কবব না, লেখাব যা লিখব। পাবলে জঙ্গলেই পাঠাব কবিকে। খাওযা-দাওযাব পব অল্প একটু ঘুমনোব অভ্যাস, তাবপবে অফিস।

বাসে বসেও বইটা শেষবাবেব মত উল্টেপাল্টে দেখছি। আব ওতে ভালো করে মন না দিযে মনটাকেও ঠাণ্ডা বাখতে চেষ্টা কবছি। বাসে কয়েকটি ছেলেছোকবাব তবল কলবব কানে আসতে মুখ তুলতে হল। বই-খাতা নিয়ে গুটিসাতেক ছেলে কলেজে চলেছে। একজনেব সামনের লেডিস সীটের একটা পাশ খালি, অন্য পাশে বছর পঁযতিবিশেকেব এক মহিলা বসে। মহিলার শৌখিন বেশবাস, চোখে পুরু কালো গগলস। বসিকতা কবে ছেলেরা সকলকে শুনিযেই নিজেদেব মধ্যে আলোচনা কবছে, মহিলাব পাশেব ওই খালি সীটটাতে কেউ বসবে কিনা।

শেষে একটি ছেলে জিজ্ঞাসাই করে বসল, ও দিদি, বসব একটু?

না। মহিলা ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিলেন, তোমরা আব একটু ভদ্র হলে বলতে হত না, আমিই বসতে বলতাম।

আব যায কোথায, ভীমরুলেব চাকে ঢিল পডল যেন। ছেলেবা তর্জন-গর্জন কবে উঠল, এতবড কথা! আমবা অভদ্র! মেযেছেলে বলে যা মুখে আসে বলে পাব পেযে যাবেন ভেবেছেন? ফর্সা জামাকাপড পবে আব স্টাইল কবে চোখে গগলস চড়ালেই মেযেবা ভদ্র হযে যায, কেমন?

বাসেব দুই-একজন থামাতে চেষ্টা কবল তাদেব, কিন্তু তাব ফল বিপবীত হল। অল্পবযসী ছেলে সব, সত্যিই চটেছে। মাবমূর্তি হযে তাবা বলতে লাগল, কেন, কেন এই কথা বলবে আমাদেব, এই সব মেযেছেলেব এত সাহস কেন? মহিলাকেই চডাও কবল আবাব, আপনাব মত ফ্যাশানেবল মেযেদেব খুব চিনি আমবা, বুঝলেন? আপনাব মত কালো চশমা পবা মেযেদেব জানতে বাকি আছে আমাদেব ভাবেন?

ক্রোধে ক্ষোভে মহিলাবও আব এক মূর্তি। বলে উঠলেন, না বাবাবা, এবই মধ্যে তোমবা সবই জেনে ফেলেছ, কিছুই আব জানতে বাকি নেই তোমাদেব। তবে নীল চশমা কেন পবি? এই দেখো, দেখো—

বলেই একটানে চশমাটা খুলে ফেললেন তিনি। তাঁব মুখেব দিকে চেযে বাসেব সকলেই ধাক্কা খেল একটু—ছেলেবাও চুপ কযেক মুহূর্ত। তাঁব এক চোখ পাথবেব, এবং পাতা পডে না—দেখলেই অস্বস্তি হয।

তিনি চশমাটা ফিবে পবতেই ছেলেবা আবাব ক্ষেপল, আমবা এবই মধ্যে সবই জেনে ফেলেছি, কিছুই জানতে বাকি নেই—এ-কথাব মানে কি? একবাব অভদ্র বলেছেন, আবাব আমাদেব ক্যাবেক্টাব ধবে টানাটানি! আমবা কৈফিযৎ চাই, ওই চোখ দেখিযেই আপনি আমাদেব ভোলাবেন ভেবেছেন?

দাঁতে কবে ঠোঁট কামডে বসে আছেন মহিলা। চেঁচামেচি আবো বাডাব আগেই ছেলেদেব গন্তব্যস্থান এসে গেল। আমাবও। ছেলেবা শাসিযে গেল, তাবা ছাডবে না, এই পথে আবাব দেখা হলে ভালো হাতেই মহিলাকে জবাবদিহি কবতে হবে, কলেজেব ছাত্রকে অপমান কবে অত সহজে পাব পাওযা যায না, ইত্যাদি।

মনে মনে আমিও ওই মহিলাব ওপবেই বিরূপ হযেছিলাম। অল্পবযসেব হাসি-খুশি ছেলে-ছোকবাব দল, দেশেব ভবিষ্যৎ বলতে গেলে ওবাই—কী দবকাব ছিল মহিলাব এভাবে ওদেব বিগডে দেওযা না হয। কবছিলই একটু বসিকতা, এলিস তো বলেছেন, এ-সব হ'ল এক ধবনেব 'সেফটি ভালভ' —না সবেতেই অধৈর্য, গাযে যেন ফোস্কা পডেছিল।

অফিসে বসে লেখাব আগে আব একবাব সেই জঙ্গলেব কাব্য খুলেছি। পডবি তো-পড এমন জাযগাই চোখে পডল যে হাতেব কলম আছডে মাবতে ইচ্ছে কবে

তবু আশা বন্ধু? এখনো আশা?
এখনো কিছু দেখতে বাকি।
এখনো ভাবো, আবো একটু থাকি।
এখনো আশা, নতুন কণ্ঠে শুনবে ভাষা?
শোনো বন্ধু, অবণ্যে দাউদাউ দাবাগ্নি জ্বলে
সেই আগুনে বস্তু পোড়ে, অবণ্যেব প্রাণ পোড়ে না।

তোমাদের এই সভ্যতার আলোর তলায় মশাল জ্বলে,
এই আগুনে মানবতা পোড়ে, বস্তু পোড়ে না।
নতুন অরণ্য জাগে
ঋতুস্নাতা ধরণীর অনুরাগে।
কিন্তু তোমার নগরে নতুন মানুষ কারা?
মানবতা-পোড়া বস্তুর, সন্তান যারা?
অনেক তো দেখেছ বন্ধু,
অনেক জেনেছ,
শক্তির দম্ভ আর লোভীর হীনতা
পণ্ডিতের দর্প আর জ্ঞানীর মূঢ়তা
প্রাচীনের গর্ব আর নবীনের ক্লীবতা—
এরা কি শোনাবে বলো নতুন দিনের বারতা?
অনেক দেখেছ বন্ধু, অনেক জেনেছ।
তবু আমিও তোমারই মত কিছু আশা চাই,
তাই ডাকি বন্ধু, চলো,
এবারে অকৃপণ উদাত্ত গম্ভীর জঙ্গলে যাই।

বই ফেলে দিয়ে কলম হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভাবলাম, কি লেখা যায়, কেমন করে উপযুক্ত ঘা দেওয়া যায়। ভাবতে ভাবতে শুভবুদ্ধিই মনে জাগল। সব থেকে ভালো অবজ্ঞা করে যাওয়া, এর অস্তিত্বই অস্বীকার করা। এ ধরনের অবাঞ্ছিত বইয়ের বিরুদ্ধে জোরালো রকমের হাঁকডাক করলেও অপরিণত বয়সের ছেলেমেয়েদের কৌতূহল বাড়বে। একবার পড়ে দেখার জন্যও বইখানা হয়ত বা তাদের কেনার আগ্রহ হবে। তাদের প্রতি গুরুদায়িত্বের কথা ভেবেই কলম বন্ধ করলাম।

না, সমালোচনা লিখব না।

রমা মিত্র এবং মালবী মিত্র

..প্রশান্তকে তিনদিন বাদে আসতে বলেছিল মালবী মিত্র। বলেছিল তিনটে দিন সে ভয়ানক ব্যস্ত থাকবে, দু-দুটো ছবি শেষের মাথায়—সকালে রাত্রিতে দু'দফা করে শুটিং, এর মধ্যে দু'দণ্ড মাথা ঠাণ্ডা করে কিছু ভাবার সময় নেই। বলেছিল, দিনতিনেক পরে যেন সে আসে। তখন শুনবে। তখন ভাববে। তখন যা বলার বলবে। নিরুপায় ভ্রূভঙ্গি করে হেসেই বলেছিল, এই দেখো না, এতকাল বাদে তোমাকে দেখে কী যে করব ভেবে পাচ্ছি না, অথচ দুটো ঘণ্টা তোমাকে বসিয়ে আদর-যত্ন করতে পারলুম না...কী যে জীবন আমাদের যদি জানতে।

প্রশান্ত জবাব না দিয়ে চুপচাপ মুখের দিকে চেয়েছিল। সেই পুরু দুটো কাঁচ, তার ওধারে সেই ডাগর দুটো চোখ, সেই রকমই এক-মাথা ঝাঁকড়া চুল। কে বলবে

এই মানুষ একটানা সাত বছব বিদেশেব মাটি চষে, মস্ত মস্ত চাকবি কবে কিছুদিন আগে দেশে ফিবেছে। মালবী এই মুখ আব এই চাউনি দেখে ভাবতে পাবো বড জোব সাত মাস দেখেনি মানুষটাকে।

চুপচাপ ওই বকম খানিক চেয়ে থেকে প্রশান্ত বলেছিল, আচ্ছা, তিন দিন পবেই আসব তাহলে। তক্ষুণি উঠে দাঁডিযেছিল।

হ্যাঁ, এসো, বাগ কবলে না তো? ঠিক এসো কিন্তু—

ট্রেনেব বিজার্ভ কামবাব পুরু গদীতে ঠেস দিযে বাইবেব দিকে চেযে বসে আছে মালবী। বাইবেব গাঢ অন্ধকাবেব পাতাল ফুঁডে ট্রেন ছুটেছে। ওটা আলোয পৌঁছুবে। কিন্তু মালবী কোথায ছুটেছে? সে অন্ধকাব খুঁজছে। কোনো অস্তিত্বগ্রাসী অন্ধকাবে বিলীন হযে যাবাব তাডনা তাব। কিন্তু এমন জাযগা আছে কি...।

সামনেব বার্থে অঘোবে ঘুমচ্ছে সাবদা। ঝি ঠিক নয, তাব থেকে বযসে বছব বাবো বড সহচবী বলা যেতে পাবে, যে তাব ঘব সামলায। মনিবানীকে হঠাৎ এ-ভাবে পডি-মবি কবে বেবিযে পডতে দেখে সে ততো অবাক হযনি যত অবাক হযেছে টানা দুটো দিনেব থমথমে মুখ দেখে। এত হাসি-খুশি যেন কোথায উবে গেল। তাবপব আজই হঠাৎ হুকুম, বেরুতে হবে। কোথায যেতে হবে, কতদিনেব মধ্যে যেতে হবে না জেনেই তডিঘডি সব গোছগাছ কবে নিতে হয়েছে। তা সহৃদযা মনিবেব এই গোছেব খেযালেব ধকল তাকে অনেক সামলাতে হয। তাই আব থমথমে মুখেব কাবণ নিযে সে বিশেষ মাথা না গামিযে তোফা আবামে নিদ্রা দিযেছে।

একবাব তাকে দেখে নিযে অবসন্নেব মত আবাব বাইবেব দিকে ফিবল মালবী মিত্র।

...সাত বছব বাদে প্রশান্ত এসেছিল কোনো একদিনেব এক সাধাবণ মেযে বমা মিত্রেব কাছে। কিন্তু তাব সঙ্গে কথা বলেছে এক অসাধাবণ মেযে মাধবী মিত্র। যাব তুলনা নেই। যাব দর্শন পেলে বহু বসিকজন ভাগ্য মানে। খ্যাতিব বিডম্বনায যে মালবী মিত্র সর্বসাধাবণেব নাগাল থেকে বিচ্ছিন্ন—মিনিট চল্লিশ সে মাধবী মিত্র কথা বলেছিল প্রশান্তব সঙ্গে। বমা মিত্র নয...প্রশান্ত কি তা বুঝেছে? বুঝে গেছে? বোঝাব কথা, কিন্তু মালবী সেই মুখেব দিকে চেযে নিঃসংশয হতে পাবেনি। শুধু তাই নয, কথা-বার্তায, বিস্ময আব হাসি-খুশিব ফাঁকে মালবী তাকে প্রকাবান্তবে এও বোঝাতে চেষ্টা কবেছে, সাত বছব বাদে লোকটা এসে যে-কথা বলছে তাব মধ্যে অবিশ্বাস অনেকখানি জাযগা জুডে আছে। কিন্তু লোকটা এও বুঝেছে কিনা সন্দেহ...বমা মিত্র নয, আপন মহিমায বিকশিত এক মালবী মিত্র তাকে বলেছে আপাতত দিন-তিনেক তাব মববাব ফুবসত নেই, তিন দিন পবে যেন আসে। প্রশান্ত বলেছে তাই আসবে।

...এই বাতটা পোহালে তিনটে দিনেব অবসান। কালই বিকেলেব দিকে প্রশান্ত আবাব আসবে। ঢোকবাব সময বাডিব দবজা-জানলা বন্ধ দেখে একটু অবাক হবে। তাবপব দবজায তালা ঝুলছে দেখে হতভম্বেব মত দাঁডিযে থাকবে।...

মালবীব ঠোঁটেব ডগায় কৌতুকেব মত বেখা পডল একটু। কিন্তু চোখ দুটো অস্বাভাবিক চকচক কবছে। বিগত এই কটা বছব শিল্পেব তাগিদে ঠোঁটে তাব অজস্র

কৌতুক ঝরেছে, আর চোখ তার অজস্রধার চকচকিয়ে উঠে দু'গাল বেয়ে ধারা নামিয়েছে। কিন্তু এর সঙ্গে সে-সবের মিল নেই।

রমা মিত্র এখনো ভস্মস্তূপে পরিণত হয়নি। আর সেই ভস্মস্তূপ থেকে তখন কোনো মালবী মিত্রর আবির্ভাব ঘটেনি।

এম. এ. পড়া একটি অতি সাধারণ মেয়ে রমা মিত্র। মামুলি প্রেমে পড়েছিল একটি বনেদী ঘরের সাধারণ ছেলের সঙ্গেই যার নাম প্রশান্ত ঘোষ। কিন্তু রমা মিত্র প্রায় অসাধারণই ভাবত তাকে। ভাবতে ভালো লাগত।

রমা রূপসী কিছু নয় যে নিজের সম্পর্কে বাড়তি গর্ব পুষবে। গায়ের রং বলতে গেলে কালোই। স্বাস্থ্যটা ভালো এই যা। আর যাদের দরদ আছে তারা নাক মুখ চোখও ভালো দেখে। তবে ফটো ওর খুব সুন্দর ওঠে, সত্যিকারের চেহারা থেকে ঢের বেশি সুন্দর মনে হয়। ফটোতে তো আর গায়ের রঙ ধরা পড়ে না। বি.এ. পাস করার পরেই তার বাবা এক বড় ঘরে মেয়ে দেবার আশায় ওর একখানা ছবি পাঠিয়েছিল পাত্রপক্ষের কাছে। ছবি দেখেই পাত্রপক্ষ সাগ্রহে এগিয়ে এসেছিল মেয়ে দেখতে। কিন্তু রঙ দেখে ফিরে গেছে। মোটামুটি ফর্সা হলেও হয়ত আটকাতো না, কিন্তু রমাকে ঠিক মোটামুটি ফর্সাও কেউ বলবে না।

কিন্তু গর্ব করার কত রমার গুণও একটু ছিল। খুব সুন্দর থিয়েটার করত স্কুল আর কলেজে পড়তে। মেয়ে-কলেজের সেই থিয়েটার দেখে অনেক ছেলে অনেক রূপসী মেয়ের থেকেও তার দিকে বেশি ঝুঁকত। ওর বাবা কোন ফার্মের বাঁধা মাইনের কমার্সিয়াল আর্টিস্ট হলেও আর্টিস্ট তো বটেন। উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। মেয়ের এই সখে বাধা দেননি কখনো। এম.এ পড়ার সময়ও কি এক ব্যাপারে পাড়ার মেয়েরা মিলে থিয়েটার করেছিল। রমা মিত্র তার নায়িকা এবং সর্বাধিনায়িকা। সেই যশের দু'দুটো অ্যামেচার থিয়েটার দলের ভদ্রলোকেরা ওর বাবাকে পর্যন্ত ধরে পড়েছিল, মেয়েকে থিয়েটার করতে দিতে হবে। নিরুপায় ভালমানুষ বাবা মেয়ের কাছেই পাঠিয়ে-ছিলেন তাদের। রমা তাদের তাড়িয়েছে।

যাক, ওটা জীবনের ক্ষেত্র নয়—অন্য সব ক্ষেত্রেই রমা মিত্র নিজেকে অতি সাধারণের ঊর্ধ্বে ভাবত না কখনো। আর তার এই মাধুর্যটুকুই কারো কারো চোখে পড়ত, মনেও বোধহয় ধরত। বিশেষ করে চোখে পড়েছিল আর মনে ধরেছিল প্রশান্তর।

এই প্রেমে পড়া এমন কি তার পরিণতিও অনেকটা ছকে বাঁধা মামুলি ব্যাপার। হাজারগণ্ডা ছেলে-মেয়ে হামেশাই এ-রকম প্রেমে পড়ে থাকে। মিলন অথবা বিচ্ছেদের পরিণামে সচরাচর সে-রকম কিছু বৈচিত্র্যও চোখে পড়ে না। কিন্তু যে ছেলেটা আর যে মেয়েটা সেই মামুলি প্রেমে পড়ে, তাদের চোখে এখন দুনিয়ার রঙ আলাদা।

রমা যখন বিয়ে পড়ে তখন পরিচয়। পরিচয়ের রাস্তাটাও চিরাচরিত এবং সাজানো। রমার সহপাঠিনী সুমিতার মাসতুতো দাদা প্রশান্ত। সেখানেই দেখা-সাক্ষাৎ এবং আলাপ। প্রশান্ত তখন এঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়ে। অবকাশ কম। কিন্তু ছুটিছাঁটায় বাড়ি এলে প্রায়ই তাকে সুমিতার ওখানে দেখা যায়। একদিন সুমিতাই প্রশান্তর মাসির বাড়ি আসার

টানেব কাবণটা বমাব কাছে ফাঁস কবে দিল। বলল, প্রশান্তদা কলকাতায এলেই ঘন ঘন আমাদেব বাড়ি আসে কেন জানিস? তোব জন্য। তোকে ভালো লাগে।

সেই প্রথম বমা দু'চোখ বড় বড় কবে শুনল একটা ছেলেব তাকে ভালো লাগে, আব সেই জন্যে সে তাব মাসিব বাড়ি আসে। ভালো লাগাব কাবণটাই খুব বিচিত্র লাগল তাব। মেযে কলেজেব চিত্রাঙ্গদা নাটক দেখাব পব থেকেই নাকি এই ভালো লাগাব সূত্রপাত। বমা যখন চিত্রাঙ্গদা কবেছিল তখন ফার্স্ট ইযাব ছাড়িযে সবে সেকেণ্ড ইযাবে উঠেছে। তখন নাচতেও পাবত ভালো। চিত্রাঙ্গদা কবে দুই একটা মেডেল-টেডেল পেযেছিল বটে, কিন্তু কোন ছেলেব মনে এই গোছেব ছাপ ফেলতে পেবেছে সেটা কল্পনাও কবেনি।

এব পব থেকে বলা বাহুল্য সুমিতাব প্রশান্তদাকে সে একটু বিশেষ দৃষ্টিতেই দেখতে লাগল। পড়াশুনায বমা সাদামাটা ছাত্রী, কিন্তু সুমিতাব প্রশান্তদা শুনল স্কলাবশিপ পাওযা ছেলে। এনজিনিযাবিং-এও প্রতি বছব ফার্স্ট হচ্ছে। বমাব মনে তাইতে সঙ্কোচ একটু। কিন্তু পুরু কাঁচেব ওধাবে প্রশান্তব চোখ দুটো যখন ঘুবে ফিবে তাব দিকেই আটকে থাকত আব ঠোঁটেব ফাঁকে একটু দুষ্টু-দুষ্টু হাসি লেগে থাকত— বমাব তখন ছেলেমানুষই লাগত তাকে।

বমা যেবাব বি.এ. পাস কবল, প্রশান্ত সেবাব এনজিনিযাবিং পাস কবে বেরুল। পাস কবাব সঙ্গে সঙ্গে ভালো মাইনেব চাকবি। একে কৃতী ছেলে, তায মুরুব্বিব জোব আছে। তাব বড়দাও আধা-প্রবীণ এনজিনিযাব—বম্বেব এক নামজাদা ডিজাইন অ্যাণ্ড কনস্ট্রাকশন ফার্মে মস্ত চাকবি কবে। তাব সুপাবিশে তাদেব কলকাতাব শাখায বহাল হযে গেল সে। প্রশান্ত খুঁতখুঁত কবেও বাপেব হুকুম অমান্য কবতে পাবল না। তাব ভযানক ইচ্ছে ছিল বিলেতে গিযে আবো কিছু ডিগ্রি-টিগ্রি পকেটস্থ হবাব পব কর্ম-জীবন শুরু কবে। কিন্তু বাপেব ইচ্ছেটাই তাদেব পবিবাবে সব। তাব বাবা জববদস্ত পুলিস-অফিসাব ছিলেন। অনেককাল বিটাযাব কবেছেন। কিন্তু পাবিবাবিক ক্ষেত্রে ভদ্রলোকেব পুলিসী মেজাজ এখনো অক্ষুণ্ণ আছে। সেই বাপ হুকুম কবল—দাদা যা ব্যবস্থা কবেছে তাই কবো, চাকবিতে ঢোকো।

ছেলে মুখ সেলাই কবে চাকবিতে ঢুকেছে।

প্রেমে হাবুডুবু অবস্থা নয তাদেব তখনো। আলাপ বেশ ঘনীভূত হযেছে এই পর্যন্ত। আব তাব ফলে প্রশান্তকে ভালো লাগতে শুরু কবেছে এই পর্যন্ত। কিন্তু সুমিতাব মুখে তাদেব বনেদী বাড়িব কর্তাটিব দাপটেব কথা যা শোনে তাতে বমাব ভযই কবে। তবু সেই ভদ্রলোক ছেলেব বিলেত যাওযা বন্ধ কবল বলে মনে মনে খুশিই হল। নিজেব মনেই বলেছে, বেশ হযেছে, বিলেত গিযে ছেলে একেবাবে লাটসাহেব বনে আসবে।

প্রেমে হাবুডুবু অবস্থাটা দাড়াল বমাব এম-এ পড়াব দুটি বছবে। প্রাযই আপিস পালিযে প্রশান্ত ছেলেমানুষেব মতই যুনিভার্সিটিব দোবগোড়ায ওব ছুটিব অপেক্ষায দাঁড়িযে থাকে। গোড়ায গোড়ায বমা লজ্জা পেত। ক্লাসসুদ্ধ ছেলে-মেযে জেনে ফেলেছে। কিন্তু শেষে এটা সহজ হযে গেল। গল্প কবতে কবতে দু'জনে এসপ্লানেড

পর্যন্ত হাঁটে। বেস্টুবেণ্টে খায। তাবপব ট্রামে পাশাপাশি বসে সন্ধ্যেব সময বাড়ি ফেবে। প্রশান্তব বাড়িতে জানে ছেলেব কাজেব চাপ, বমাব বাড়িতে জানে মেযেব লাইব্রেবিতে পড়াব চাপ। যুনিভার্সিটি আব আপিস পালিযে দু'জনে সিনেমাও দেখে মাঝে মাঝে।

বমা বলে, তোমাব জন্যে আমি ঠিক ফেল কবব, তখন লজ্জায আব মুখ দেখাতে পাবব না।

প্রশান্ত জবাব দেয, হুঁ, ভাবী তো বাংলা পড়া তাব আবাব ফেল।

বাগ দেখাতে গিযেও কী মনে পড়তে বমা হেসে ফেলে, কী বললে. ভাবী তো বাংলা—বলতে লজ্জা কবে না, বাংলায একটা চিঠি লিখতে সাতটা বানান ভুল হয, বই পড়াব সঙ্গে শাড়ি পবাব বানানেব তফাৎ জানে না।

সেদিন সিনেমা দেখাব প্রোগ্রাম কবে প্রশান্ত বমাকে চিঠি লিখেছিল, ওমুক-বঙা শাড়িখানা পবে যেন আসে। তাইতেই বানানেব বিভ্রাট।

কিন্তু প্রেম-প্রীতিব ব্যাপাবটা জানাজানি হতে আব বেশি দেবি হল না। প্রশান্তব বাবা সঠিক হদিস পেলেন সুমিতাকে জেবা কবে। কাব মেযে কেমন মেযে জানাব পব ছেলেব প্রতি বীতশ্রদ্ধ তিনি। ওদিকে প্রশান্তব এক দাদার বিযে তখনো বাকি, সে সাধাবণ চাকবি কবে। তাব বিযেটা দিযে ফেলে কৃতী এনজিনিযাব ছেলেব জন্য অর্ধেক বাজত্ব আব বাজকন্যা আনাব সঙ্কল্প। বড় বড় ঘব থেকে প্রস্তাব আসছেও। তাব মধ্যে এ-বকম ছেলেমানুষি ববদাস্ত কবাব মত নবম মন নয তাব। তাই ছেলেকে ডেকে বেশ কড়া সুবেই হুমকি দিলেন, বাপু হে, তোমাব ছোড়দাব বিযেটা হযে গেলে তোমাব বিযে আমিই দেব। ততদিন ঠাণ্ডা মাথায কাজেব উন্নতি যাতে হয সেই চেষ্টা কবো।

বাবাব হুমকিব খববটা সেদিনই বমাকে দিল সে। এই গুণটা আছে। নিজেব সমস্যাটা দুজনেব সমস্যা ভাবে। তাই সব কথাই বমাকে বলে। শোনামাত্র দু'চোখ কপালে—সর্বনাশ। তাহলে?

ঠোঁট উল্টে প্রশান্ত জবাব দিল, সর্বনাশ আবাব কি, ও-সব পুলিশী দাপটে দেশেব স্বাধীনতা ঠেকানো গেছে?

বমা বলল, দুটো এক হল। তাতেও তো কত লোকে জীবন দিযেছে।

আমিও তো একজনকে আমাব জীবন দিযেছি।

কী ভালো যে লেগেছিল শুনতে বমাই জানে। সেদিন সন্ধ্যাব আড়ালে ভিক্টোবিযা মেমোবিযালেব কোণেব চত্ববে বসে দু'জনে যত কাছাকাছি হযেছিল এব আগে ততটা আব কখনো হযনি। সেদিন বাতে ভালো ঘুমুতে পাবেনি বমা। দুটো ঠোঁটেব সেই ঘন আবেগেব স্পর্শ সমস্ত বাত ধবে তাব সর্বাঙ্গে আবেশ ছড়িযেছে আব বিহ্বল কবেছে।

এমন অদ্ভুত ছেলেমানুষি প্রস্তাবও কবে মানুষটা যে বমা হেসে বাঁচে না। সেদিন ওব বাবাব হুমকিব প্রসঙ্গেই বমা বলেছিল, কিন্তু আমাব বাপু সত্যি কেমন ভয কবছে।

প্রশান্ত তক্ষুনি বলেছিল, আমাবও কবছে।

তাহলে?

তাহলে চলো পালাই দু'জনে। কিন্তু বাবা যা লোক, ঠিক আবাব ধবে আনবে।

তাহলে?

তাহলে আব এক কাজ কবা যাক। চলো কোন সাধু-সন্ন্যাসীব কাছে যাই, মন্ত্রেব জোবে তাবা বাবাব মন বদলে দিক।

বমা হেসে উঠেছিল। তাবপব বলেছিল, বিযেটা হযে গেলে মন আমিই বদলে দিতে পাবি বোধহয।

প্রশান্ত সাগ্রহে বলে উঠেছিল, তাহলে তাই কবে ফেলি এসো। বেজিস্ট্রি বিযে কবে সোজা বাবাব সামনে গিযে দাঁড়াই।

ও বাবা! বমা আঁতকেই উঠেছিল, তোমাব বাবাব সামনে?

এবকম উদ্ভট উদ্ভট অনেক প্রস্তাব কবে সে। কখনো বলে বাডি গিযে মাকে শাসাবে, এ বিযে না দিলে ছাদ থেকে লাফিযে পডবে। কখনো ভাবে মাকে শেখাবে, এ বিযেব জন্য ইষ্টদেবাতব স্বপ্ন-টপ্ন দেখেছে সেই গোছেব কিছু ভাঁওতা দিযে বাবাকে বশ কবতে।...সেদিন তো এমন মোক্ষম প্ল্যান মাথায গজালো তাব যে আপিস ফেলে বমাদেব বাডিতে এসে হাজিব। বমাব যুনিভার্সিটি ছুটি সেদিন। চুপি চুপি তাকে বাইবে টেনে আনল। সাগ্রহে বলল, তোমাব সাহসে কুলোলে এবাব আব কেউ আটকাতে পাববে না—পাববে?

সত্যি তেমন কিছু আশা কবেছিল বমা। কী কবতে হবে?

দু' তিনদিনেব মধ্যেই দুজনে পালাব আমবা।

এ তো পুবনো প্ল্যান।

আঃ! আগে শুনোই না, তাব কযেকদিনেব মধ্যে কাগজে চিঠি পাঠাব আমবা—মানে ওমুক মেযে আব ছেলে একসঙ্গে আত্মহত্যা কবেছে, ব্যস।

বমাব দু'চোখ বিস্ফাবিত। কী বাস, কাগজে খবব পাঠিযে আমবা আত্মহত্যা কবব?

দূব পাগল, আমবা বিযে কবব—সকলে জানবে আমবা আত্মহত্যা কবেছি।

আস্ত পাগল তুমি! আচ্ছা স্কলাবশিপ পেলে কী কবে? অত ভালো এনজিনিযাবিং পাসই বা কবলে কী কবে?

কেন?

উড়ো খবব কাগজে ছাপবে কেন?

দুজনে একসঙ্গে ছবি তুলে কাগজে পাঠিযে দেব বাইবে থেকে—এই দুজন আত্মহত্যা কবেছে—অন্য লোক খবব পাঠিযেছে।

আত্মহত্যা কবলে আমাদেব বডি যাবে কোথায? পুলিস চুপ কবে বসে থাকবে? আমাদেব টেনে বাব কববে না? তখন আত্মহত্যাই কবতে হবে।

এমন প্ল্যানটাও বাতিল হযে যেতে প্রশান্ত বিমর্ষ। বমা না থাকলে সে যে এতদিন একটা কিছু চমকপ্রদ বিভ্রাট বাঁধিযে বসত তাতে সন্দেহ নেই।

বমা এম.এ. পাশ কবাব পব দুজনেই অনেকখানি বেপবোযা হযে উঠল। ওদিকে প্রশান্তব ছোডদাব বিযে হযে গেছে। তাব বাবা তখন কৃতী ছেলেব বিযেব তোডজোড কবছেন। প্রশান্ত স্পষ্টই তাব মাকে জানিযে দিযেছে বিযে কোথায কববে। তাব ফলে

বাপ আগুন, মাও অসন্তুষ্ট। বাড়িতে অশান্তি। বাবাও ঘোষণা করেছেন, অবাধ্য হলে ছেলের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না।

রমা এম.এ. পাস করার পর প্রশান্ত জিজ্ঞাসা করল, এবার?

রমা জবাব দিল, এবারে চাকরি।

কী চাকরি? কোথায় চাকরি?

স্কুলে স্কুলে—মাস্টারি ছাড়া আমি কী আর পেতে পারি?

খবরদার।

বা রে, তাহলে কি করব? বাবা আর কতকাল টানবেন?

খপ করে তাকে বাহুে টেনে প্রশান্ত বলেছে, বাবা কেন, আমি টানব।

রমা হেসে ফেলেও ভ্রূকুটি করেছে—বিয়ের আগেই?

প্রশান্ত ভেবে-চিন্তে বলেছে, না, চোখ-কান বুজে এবারে বিয়েটাই আগে করে ফেলা যাক। কী আর হবে, বাপ মেরে ফেলতে তো আর পারবে না, বড়জোর আলাদা করে দেবে।

কিন্তু রমার মনে সায় দেয় না। কারণ অভিশাপ দিয়ে ঘর বাঁধবো কেমন করে?

ছুটির দিনে বেশ সকাল সকাল এক এক দিকে বেরিয়ে পড়ে দুজনে। কখনো ব্যাণ্ডেল, কখনো কাঁচড়াপাড়া, কখনো বা গঙ্গার বুকে ডিঙি নৌকায়। আর সমস্যার সমাধান কেমন করে হবে তাই ভাবে দুজনে। বিশেষ করে নির্জন বন-বাদাড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতে ভালো লাগে দু'জনেরই। সেই নির্জনতার একটা ভাষা আছে। হাত ধরাধরি করে শুকনো পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে এগোয় দুজনে। গাছের ছায়ায় ঘন হয়ে বসে। দুপুরে পাখির অলস ডাক কান পেতে শোনে। সমস্যা-টমস্যা সব দুজনেরই ভুল হয়ে যায় তখন।

রমা একদিন ঝগড়া টেনে আনে।—তুমি আমাকে ভালোবাস না ছাই, আসলে চিত্রাঙ্গদা পছন্দ তোমার।

তুমি তো চিত্রাঙ্গদা।

আমি রমা। তবে চিত্রাঙ্গদার মত কুৎসিত বটে—

চিত্রাঙ্গদা কুৎসিত?

না তো কি?

তাহলে তুমি একটি অন্ধ, ভেতর দেখতে জানো না।

কথাগুলো যেন কান পেতে আস্বাদন করবার মত। রমার অনেকদিন মনে হয়েছে লোকটা এনজিনিয়ার বটে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে কবি। শুধু কবি নয়, একেবারে অবুঝ কবি।

সামনের গাছটার দিকে তাকিয়ে কাবাই করল প্রশান্ত। বলল, আমি যদি গাছ হতাম, আর তুমি ওই লতার মত আমার সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে, বেশ হত।

রমা তক্ষুনি তার কাঁধে গা ঠেকিয়ে আর একটা হাতে তার গলা বেষ্টন করে বলল, লতা হবার দরকার কী, এই তো জড়িয়ে থাকলাম।

সেদিন ওই ঠাণ্ডা মানুষটার বক্ষে কেন যে অত দোল লাগল রমা জানে না। এরকম তো আগেও হয়েছে। আগেও কাছে টেনে নিয়েছে। দুই উষ্ণ ঠোঁটের আবেগ ওর অধরের বাধা বিচূর্ণ করেছে। কিন্তু এই দিনের তৃষ্ণার মূর্তিটাই অন্যরকম। ওর দেহটা যেন ক্রমে একটা আবিষ্কারের বস্তু হয়ে উঠতে লাগল। নিবিড় নিষ্পেষণে সর্বাঙ্গে কী রকম একটা যন্ত্রণার শিহরণ, রমা যেন কোথা থেকে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ ওকে দু'হাতে ঠেলে দিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসল সে। বিস্রস্ত বসন ঠিক করতে করতে ধমকের সুরে বলে উঠল, এই!

একটা ভূত নামল যেন প্রশান্তর কাঁধ থেকে। আত্মস্থ, বিব্রত।—কি?

বাক্ষুসেপনা কোরো না, সময় ফুরিয়ে গেল নাকি!

কিন্তু শিগগীরিই একটা ধাক্কা খেয়ে দু'জনেরই মনে হল সময় ফুরিয়ে গেল বুঝি। প্রশান্তর সঙ্গে তার বাবার মুখোমুখি একটা সংঘাত হয়ে গেল এক বড়লোকের বাড়ির মেয়ে দেখতে যাওয়া নিয়ে। খুব বিনীত আর খুব স্পষ্ট ভাবে প্রশান্ত এবার বাবাকেই জবাব দিয়েছে, তার দেখতে যাওয়া সম্ভব নয়, এবং কারোরই না যাওয়া ভাল।

প্রাথমিক ঝড়টা প্রশান্তর উপর দিয়ে গেল। তারপর ভেবেচিন্তে ভদ্রলোক রমার বাবাকে ডেকে পাঠালেন একদিন। রমার বাবা এলেন।

প্রশান্তর বাবা রূঢ়মুখে জানতে চাইলেন, মেয়ের বিয়েতে তিনি কী করতে পারবেন?

রমার বাপ জবাব দিলেন, আপনি চাইলে শুধু বিয়েই দিতে পারব, আর কিছু করার সঙ্গতি নেই।

তপ্ত বক্রস্বরে প্রশান্তর বাবা বললেন, সেটা কি বেশী আশা করা হচ্ছে না?

রমার বাবা জবাব দিলেন, এর মধ্যে আমার কোন হাত নেই।

আপনার মেয়েকে বোঝাবার হাত বা দায় আমার?

আপনার ছেলেকে বোঝাবার হাত বা দায় আপনার।

নিঃস্ব লোকের এই উক্তিতে প্রশান্তর বাবা অপমানিত বোধ করলেন। আর আসল অপমানিত মানুষটি নিঃশব্দে উঠে গেলেন।

সব শুনে রমা রাগে জ্বলতে লাগল। বাবা ওর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নিয়ে ও-বাড়ি থেকে ফেরেননি। তবু বাবার অপমান ওকে মর্মান্তিকভাবে বিঁধল। ঘরে মা নেই—ভাইবোনদের কাছে বাবা অনেকখানি।

ওদিকে এ ঘটনার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই প্রশান্তর বাবা তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। ছেলেকে কলকাতা থেকে আপাতত সরাতে না পারলে এ মোহ কাটবে না, তাই বোম্বেতে বড় ছেলের সঙ্গে এ নিয়ে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান চলছিল। রমার বাবার সঙ্গে কথা হবার পরের দিনের মধ্যে হেড-অফিস অর্থাৎ বম্বেতে পত্রপাঠ বদলির অর্ডার পেল প্রশান্ত। সেটা যে দাদারই চেষ্টার ফল, বুঝতে কারো বাকি থাকল না।

এ খবরও রমা শুনল প্রশান্তব মুখ থেকেই। শোনার পর গুম সে। একটু বাদে বিবস মুখে জিজ্ঞাসা করল, বম্বে যাচ্ছ?

তুমি কী বলো, চাকরি ছেড়ে দেব?

আবাব একটু চুপ কবে থেকে বমা বলল. না, যাও।

প্রশান্ত অসহিষ্ণু, উতলাও।

তুমি এভাবে কথা বলছ কেন? সব তো জানো, আমার কী দোষ? তাছাড়া এই করে বাবা বা দাদা বা দুনিয়াব কেউ আমাদেব আটকাতে পারবে?

পারবে না?

পাগল! এক বছরে হোক, দু বছবে হোক, পাঁচ বছবে হোক—বিযে আমাদেব হবেই। যতদিন না হয, আমাব প্রতীক্ষায তুমি থাকবে, তোমার প্রতীক্ষায আমি থাকব।

সত্যি?

সত্যি।

সত্যি?

সত্যি সত্যি সত্যি। মুখেব দিকে চেয়ে থেকে প্রশান্ত বিষণ্ন মুখে হাসল একটু, কিন্তু আমাকে এখনো তুমি বিশ্বাস কবলে না।

বিশ্বাস করলাম না?

প্রশান্ত মাথা নাড়ল, না।

দরদে রমাব ভিতবটা ভবে গেল। দু'হাত বাড়িয়ে তার মাথাটা বুকে টেনে আনল। বলল, বিশ্বাস কবেছি। তুমি আমাব অপেক্ষায থাকবে, আমিও তোমাব প্রতীক্ষায থাকব।

তিন দিনেব মধ্যে প্রশান্ত বম্বে চলে গেল। আব তিন মাসের মধ্যে তাব চিঠি পেল লণ্ডনগামী জাহাজ থেকে। সুযোগ পেয়ে চাকরি ছেড়ে সে সাগব পাড়ি দিচ্ছে! বমা যেন প্রতীক্ষায থাকে।

এই সবই ঘটে গেল বমা এম. এ. পাশ কবার ছ'মাসেব মধ্যে।

আব আবো দু'মাস বাদে বমাব মাথায বুঝি বাজ পড়ল একটা। খববটা দিল সুমিতা। তাব অনেকদিন বিযে হযে গেছে। হঠাৎ দেখা। কথায় কথায বলল, বিলেত গিয়ে প্রশান্তদা মেম বিযে কবেছে, শুনেছিস?

রমা চমকে উঠল। তাবপর অবিশ্বাস কবল। বিশ্বাস করবে কী করে—মাত্র তিন সপ্তাহ আগেও সে প্রশান্তর আবেগভবা চিঠি পেযেছে। তাব এত অবিশ্বাস দেখেই পবে সুমিতা মাসিব বাড়ি গিয়ে একখানা ছবি আর মাকে লেখা প্রশান্তর নিজেব হাতে লেখা চিঠি নিয়ে এলো। তাদেব বাড়িতে নাকি হুলুস্থূল ব্যাপার চলেছে সেই থেকে।

অবিশ্বাসেব আর কিছু নেই। এক তরুণী শ্বেতাঙ্গিনীব বাহু বেষ্টন করে প্রশান্ত দাঁড়িযে। দু'খানি হাস্যোজ্জ্বল মুখ। চিঠিতে লিখেছে, তোমরা আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না জানি, পারো তো আমাদেব আশীর্বাদ করো।

এরপর দিনকয়েক পর্যন্ত রমার মাথায় শুধু আগুন জ্বলেছে।

এদিকে রমার বাবাও কিছু ঝামেলার মধ্যে ছিলেন, বাড়ি ছাড়ার কেস চলছিল বাড়িঅলার সঙ্গে। প্রতিপক্ষ ডিক্রি পেয়েছে, তিনমাসের মধ্যে বাড়ি ছাড়ার হুকুম

হযেছে। তাব মধ্যে মেযেব এই আঘাত। একমাসেব ছুটিব দবখাস্ত কবে ভদ্রলোক ছেলেমেযেদেব নিযে বাইবে বেবিযে পডলেন। আব তাবপব ফিবে এসে অন্যত্র উঠলেন।

ভিতবে ভিতবে যাতনাব মত একটা তাগিদ অনুভব কবত বমা। সাধাবণ মেযেব অসামান্য হযে ওঠাব তাগিদ। ভিতবটা যেন একটা জ্বলন্ত অঙ্গাব হযে উঠছে তাব, আব এই তাগিদ বাডছে।

আগে স্কুল-মাস্টাবিব চেষ্টা কবছিল, এখন সে চেষ্টা ছেডে দিল।

এই অবস্থাব মধ্যে হঠাৎ এক নামজাদা চিত্র-পবিচালকেব নামে বিজ্ঞাপন চোখে পডল একটা। নাযিকাব ভূমিকাব জন্যে একজন শিক্ষিতা অভিনেত্রী চাই। ফোটোসহ আবেদন কবতে হবে।

মাথায একটা ঝোঁকই চাপল বমাব। নতুন কবে নিজেব ছবি তুলিযে আবেদন পাঠিযে দিল।

অসামান্য হবাব যোগ্যতা ছিল বমা মিত্রেব। ডাক এসেছে। কথা বলে আব ছাত্রীজীবনেব অভিনযেব মেডেল দেখে পবিচালক খুশি একটু। ট্রাযেল দিযে আবো খুশি। চমৎকাব ফোটোজনিক মুখ, সুন্দব বযেস, নাক মুখ চোখ ভালো—তাব ওপব অভিনযে বুদ্ধিদৃপ্ত সহজ দক্ষতা আছে। আশাতীত পছন্দ হল তাব।

বমা মিত্র মবে গেল। ছবিতে এক মালবী মিত্রেব আবির্ভাব দেখল সকলে। প্রথম ছবিতে এমন বিপুল বন্দনা কম নাযিকাব ভাগ্যেই জুটেছে।

তাবপব এই দ'বছবে দিনে দিনে তাব আবির্ভাব স্থাযী হযেছে, উজ্জ্বলতব হযেছে। আজ মালবী মিত্র একটা নাম। সে অসামান্যা। তাব নিঃশ্বাস ফেলাব ফুবসৎ নেই।

ক'টা ছবিব কাজ একসঙ্গে শেষ হতে মালবী একটু হাপ ফেলেছিল। নতুন কোন কোন ছবি হাতে নেওযা যেতে পাবে ভাবছিল। ধবছে তো এসে কতজনই। বম্বে থেকে ডাক এসেছে, তাতেও সাডা দেবে কিনা চিন্তা কবতে হবে।

এমন দিনে প্রশান্ত ঘোষ এসে হাজিব। সাবদাব হাতে চিবকুট দেখেও নির্বাক খানিক। সেই পুবনো জ্বালা আব অনুভূতিটা নতুন কবে আবাব মাথাব দিকে উঠছে। প্রথমে ভাবল সাবদাকে বলে দেয, দেখা হবে না বলগে যা। কিন্তু তা বলল না। বলল, এখানে নিযে আয।

নিযে এলো। সেই মুখ, সেই পুরু কাচেব চশমা, ঠোঁটেব ডগায সেই কাঁচা হাসি। দেখামাত্র বাগে সর্বাঙ্গ চিনচিন কবে উঠল ভেতবটা।

প্রশান্ত দ'চোখ ভবে দেখল তাকে খানিক।—কেমন আছ বমা?'

বমা আবাব কে, আমি তো মালবী। মালবী মিত্র।

প্রশান্ত হেসে উঠল, কি ফ্যাসাদেই যে ফেলেছিল এই নাম নিযে—যাকে সকলে চেনে তাকে কেউ চেনে না। বাইবে থেকে ফিবে এই একটা মাস হন্যে হযে খুঁজেছি তোমাকে। শেষে সুমিতাব কাছে শুনলাম তুমি এখন উজ্জ্বলতম তাবকা মালবী মিত্র। ..বিলেত থেকেও তোমাকে কত যে চিঠি লিখেছি, জবাব না পেযে শেষে হাল ছেডেছি।

...বাড়ি ছেড়েছিল তাই চিঠি পায়নি।। পেলেও জবাব দিত না। চোখে চোখ রেখে মালবী চেয়ে আছে।—একা ফিরেছ না মেম-বউকেও এনেছ?

প্রশান্ত অবাক।—মেম-বউ!

ভিতরটা দাউ দাউ করে জ্বলছে এখন। এমন নির্লজ্জও মানুষ হয়! ঠাণ্ডা গলায় বলল, তোমাদের কাঁধে হাত রাখা যুগল ছবি আমি দেখেছি, আর তোমার মাকে লেখা তোমার সেই চিঠিও আমি পড়েছি।

প্রশান্তর দু'চোখ বিস্ফারিত প্রথম। তারপরেই হা-হা হাসি।—সে-সব তুমিও কি বিশ্বাস করেছ নাকি? কি আশ্চর্য! আমার প্রত্যেকবারের প্ল্যান তুমি বাতিল করেছিলে--তাই বিলেতে গিয়েই বাবাকে জব্দ করার মোক্ষম প্ল্যান ফেঁদেছিলাম। বাবার ওপর আমার তখন দুনিয়ার সব থেকে বেশি রাগ—আর কাঁধে হাত রেখে ছবি তোলার মত অন্তরঙ্গতা ও-দেশে একটু চেষ্টা করলেই হয়।

মুহূর্তের মধ্যে এ কি হল মালবীর? মাথাটা এমন প্রচণ্ডভাবে ঝিমঝিম করে উঠল কেন? তার অস্তিত্ব সুদ্ধ এভাবে নড়েচড়ে উঠল কেন? প্রাণপণে এই কথাগুলো ভণ্ডামী ভাবতে চেষ্টা করল কেন? আর ঘরে এত আলো, অথচ সামনে রাজ্যের অন্ধকার ভিড় করে আসছে কেন?

প্রশান্তও বিস্মিত চোখে চেয়ে আছে তার দিকে।

প্রাণপণ চেষ্টায় মালবী সামলে নিল নিজেকে।—বিশ্বাস করতে বলছ?

কী আশ্চর্য, আমি বলছি তাও বিশ্বাস করবে না?

মালবী দেখছে তাকে। অন্তস্তল পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে।—তারপর?

তারপর আবার কি, এবারে বিয়ে। বাবা তো আর নেই, আর মায়ের যা অবস্থা, তোমাকে ঘরে আনতে পারলে বাঁচেন।

বসার চেয়ারটা, মাটি, বাড়িঘর যেন দুলছে মালবীর চোখের সামনে। তবু হাসি মুখেই বলতে চেষ্টা করল, কিন্তু আমি যে অভিনেত্রী হয়েছি!

মাথা ঝাঁকিয়ে প্রশান্ত বলল, কথা যদি রেখে থাকো, মানে আমার জন্যে প্রতীক্ষা যদি করে থাকো, তাহলে আর কোন কিছুতে যায় আসে না।

চেয়ার মাটি ঘর দুয়ার আর একবার বিষম দুলে উঠেছে। তারপর মালবী হেসেছে। নিজের জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট মনে পড়েছে। কাজের চাপে আপাতত মরবার ফুরসৎ নেই বলেছে। বলেছে, মাথায় কোনো কথা ঢুকছেই না এখন। তিন দিন বাদে তাকে আসতে বলেছে। তখন কথা হবে।

কিছু একটা ব্যতিক্রম অনুভব করেই প্রশান্ত লক্ষ্য করেছে তাকে। তারপর তিনদিন বাদে আসবে জানিয়ে উঠে চলে গেছে।

তিনদিনের মধ্যে দু'রাত এক মিনিটের জন্যেও মালবী ঘুমোয়নি। আজ তার পালাবার তাগিদ।

কারণ সে তার মন দিয়ে বুঝেছে, প্রশান্ত এক বর্ণও মিথ্যে বলেনি।

তার কারণ, মালবী তার জন্য প্রতীক্ষা করেনি।. .অসামান্য হয়ে ওঠার দুর্বার তাগিদে তার যৌবন-বাস্তবে একাধিক পুরুষের অভ্যর্থনা ঘটে গেছে। মালবী এতটুকু পরোয়া করেনি।

অন্ধকাব বিদীর্ণ কবে ট্রেন ছুটেছে। আলোয পৌছুবে। কিন্তু মালবী ছুটেছে তেমনি অন্ধকাবে নিজেকে মিলিযে দেবাব তাডনায।

বমা মিত্রব ভস্ম থেকে একদিন মালবী মিত্র উঠে এসেছিল। আজ মালবী মিত্র ভস্ম হযে গেলেও এ জীবনে আব বমা মিত্রেব হদিশ মিলবে না।

যৌবন

দুনিযাখানা যৌবনেব বশ।

এক বুড়ো প্রাযই আক্ষেপ কবত, আব বলো কেন ভাযা, দুনিযা তাব যৌবন যাব।

ছেলেবেলায এই যৌবনটিব জন্য ভিতবে ভিতবে একটা লোভনীয প্রতীক্ষা ছিল। বোধহয সকলেবই থাকে। কিন্তু সমযেব বেড়া বাঁধা এই বম্য বাগিচায পা ফেলাব পব তাব অনেক চটক চোখে পড়ে না। যাই হোক, ওই দুর্লভ গণ্ডীব মধ্যে বিচবণকালে তাব মহিমা সম্পর্কে আমি নিজে অন্তত খুব সচেতন ছিলাম না।

ক্রমে প্রৌঢ় ব্যবধানে সবে আসাব পব আজ আবাব সকৌতুকে চেযে চেযে দেখছি, যৌবন চটকদাব বস্তু বটে। শুধু তাই নয, দি ওযার্লড ইজ ফব দি ইযং—সেই বুড়োব ভাষায, দুনিযা তাব যৌবন যাব।

এক নামজাদা দার্শনিক বলে গেছেন, যৌবন অনেক সময কাণ্ডজ্ঞানশূন্য, কিন্তু কদাপি ধী-শূন্য নয। সর্বকৃত্রিমতাব ওপব তাব তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি—সে ধোঁকা বা ফাঁকি ধবতে জানে। কিন্তু আজকেব বাস্তব দুনিযাব দার্শনিক এই বাসি প্রসঙ্গ নিযে আদৌ মাথা ঘামাবেন কিনা সন্দেহ। তিনি ববং উত্তব-যৌবন সম্পর্কে কিছু দর্শন বচন শোনাতে পাবেন। কাবণ এ-যুগেব এটাই বড় সমস্যা।

কেন ?

কাবণ দি ওযার্লড ইজ ফব দি ইযং। যৌবন যাব দুনিযা তাব। এতে দ্বিমত কেউ নয়।

অতএব আজকেব দার্শনিক বলেন যদি কিছু, যৌবনেব বদলে সম্প্রসাবিত যৌবনেব কথা বলবেন। অর্থাৎ কাল ফুবালেও যে যৌবনেব বহিবঙ্গ অনেক কাল পর্যন্ত অটুট বাখা যায—তাব কথা। আব বলবেন বোধ হয একেবাবে উল্টো কথাই। বলবেন, টেনে বাড়ানো এ যৌবন ধী-শূন্য যদিবা, কাণ্ডজ্ঞানশূন্য কদাপি নয। সর্বকৃত্রিমতা আড়াল কবাব প্রতি তাব তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি—ধোঁকা আব ফাঁকি তাব একমাত্র পুঁজি।

খববেব কাগজে সেদিন একটা কার্টুন দেখে আপনাবা অনেকে হাসাহাসি কবেছেন জানি।...এক ভিড়েব ট্রাম থেকে একজন মহিলা নেবে যাচ্ছেন, তাঁব চুলেব (পবচুলেব) বোঝা এক ভদ্রলোকেব ছাতায আটকে আছে, আব ভদ্রলোক তাঁকে চেঁচিযে ডাকছেন, ও ম্যাডাম, আপনাব সব চুল যে আমাব ছাতায আটকে থাকল, নিযে যান, নিযে যান।

যাঁবা হেসেছেন তাঁবা হেসেছেন, কিন্তু আমাব ধাবণা, যদি কোনো ম্যাডামের ববাতে অমন দুর্দৈব ঘটেই, তাঁব পুঁজি খোযানোব দুঃখে আজকেব দিনে কাঁদবাব লোকেবও অভাব হবে না।

যাক, আমি কোনো গুরু-গম্ভীব তত্ত্ব বিস্তাবে বসিনি। যৌবন আগলে বাখাব প্রেবণা বা তাডনাব বহু বিচিত্র নজিব সকলেই হামেশা দেখছেন। অবকাশ সময়ে আমিও দেখি। আমাব দেখাব বঙ্গপট একটি হাল-ফ্যাশনেব চুলছাঁটাব সেলুন। নাম প্রসাধনী। প্রসাধনীব হেড কাবিগব যে, মালিকও সেই। নাম অমল, বযেস এখন তিবিশ-বত্রিশ হবে। চৌকস চটপটে ছেলে। আমি তাকে গত বাবো বছব ধবে দেখছি। তখন বাডিতে এসে চুল ছেঁটে দিযে যেত। নিজেব উদ্যমে দোকান কবেছে, তাবপব ক'বছবেব মধ্যে সেটাকে এমন ঝকঝকে কবে তুলেছে। আশপাশেব দুটো সেলুন কমপিটিশনে টিকতে না পেবে উঠে গেছে। তাদেব বাছাই-কবা তিনটি কাবিগব প্রসাধনীতে কাজ পেযেছে। অমলেব আশা অদূব ভবিষ্যতে সেলুনটাকে সে এযাব কণ্ডিশন কবে ফেলতে পাববে। আব তাব একটা বড খেদ, এ লাইনে একটিও দিশি মেয়ে-কাবিগব মেলে না। তাহলে আলাদা একটু পার্টিশন কবে মেযেদেব ব্যবস্থাও বাখত। দোকান জমজমাট হত তাহলে। এ তো আব সাহেব-পাডাব দোকান নয যে মেযেবা এসে পুরুষ কাবিগবেব হাতে চুলেব বোঝা ছেডে দেবে।— মেযেবা না থাকলে কোনো ব্যাপাবই ঠিক কমপ্লিট হয না, কী বলেন সাব?

ওব হাত যেমন চলে, বসালো জিভখানাও তেমনি অবিবাম নডে। আমাকে দেখলে আবো বেশি নডে। গল্প উপন্যাস লিখি ও জানে। একটু-আধটু পডে। তাই দেখামাত্র অন্য খদ্দেবদেব শুনিযে সাদব অভ্যর্থনা জানায। তাবপব সোৎসাহে বলে, আপনাব অমুক লেখাটা পডছি স্যাব। ওমুক বইটা খুঁজছি, বা আপনাব ওমুক ছবিটা দেখলাম, হাই ক্লাস।

গোডায গোডায বিডম্বনা বোধ কবতাম, বিবক্তও হতাম। কিন্তু ও সেটাও খুব সহজেই বুঝত। তাই ফাঁক পেলেই গলা খাটো কবে বলত, কিছু মনে কববেন না স্যাব, এবকম বললে আপনাব তো কোনো ক্ষতি হয না, কিন্তু আমাব বড উপকাব হয—কতজন এসে আপনাব কথা জিজ্ঞেস কবে আপনি জানেন না স্যাব।

প্রসাধন-কলা ছেডে তোষামোদ-কলাতেও লোকটা যে কম পটু নয, এ বোধহয ওব শত্রুও স্বীকাব কববে।

ওব বচনেব জ্বালায হোক বা ভিড এডানোব জন্যে হোক, ইদানীং প্রতি মাসে আমি বাত্রেব নিবিবিলিতে আসি। তখনো যে খদ্দেব একেবাবে থাকে না এমন নয, তবু অপেক্ষাকৃত কমই থাকে। যাই হোক, এখান থেকে মানুষেব যৌবনপ্রীতিব অনেক সকৌতুক নজিব আমি দেখছি। আব এই দেখাটুকু লক্ষ্য কবেই অমল খদ্দেবদেব অনেক মজাদাব কাণ্ডকাবখানা আমাকে শোনায। এই নিযে আমি একবাব একটা হাসিব গল্প লিখেছিলাম। এবপব থেকে ওকে আব পায কে। বসদ যোগাবাব তবল আনন্দে ও আপনা থেকেই মুখব হযে ওঠে।

সেদিন বাত ন'টা নাগাদ গিয়ে দেখি, অমলেব দোবে ঝকঝকে একটা গাডি দাঁডিযে। ভিতবে অমল অপবিমিত মনোযোগ সহকাবে এক সৌখিন ভদ্রলোকেব চুলে

কলপ লাগাচ্ছে। বলতে ভুলে গেছি, সাদা চুল পবিপাটিভাবে তকতকে কালো কবাটাও প্রসাধনীব এক বড আকর্ষণ। অমল বলে, এ কাজে ও স্পেশ্যাল ট্রেনিং নিযেছে। চুল কালো কবাব মাশুল দু-টাকাব থেকে পাঁচ টাকা—অর্থাৎ খদ্দেব বুঝে যেমন আদায কবা যায। ব্যাপাব লক্ষ্য কবেছি প্রায একই, শুধু একটু যত্ন-আত্তি আব তোষামোদেব যা তফাত।

ভদ্রলোককে দেখে আব অমলেব সৃতৎপব তন্ময মনোযোগ দেখে বুঝলাম, পাঁচ টাকাব খদ্দেব তো বটেই, বেশিও হ'তে পাবে। ভদ্রলোকেব বযেস ষাটেব কাছাকাছি। মোটামুটি সুপুবষ। হাতে সোনাব ঘডি, আঙুলে মুক্তো আব নীলাব আংটি, জামায হীবেব বোতাম।

ভদ্রলোকেব চুল কতটা সাদা ছিল সঠিক বোঝা গেল না। কাবণ কলপ-বিন্যাসপর্ব প্রায শেষ হযে এসেছিল। এখন অমল যা কবছে সেটা বাডতি। স্ফীত অঙ্কেব কিছু প্রাপ্তিব আশা তাব। আমাকে দেখেই চোখেব ইশাবায একটু অপেক্ষা কবতে বলল, এবং অন্য কাবিগব আমাব দিকে এগিযে আসতে ইশাবায তাকেও নিষেধ কবল। অর্থাৎ হাত খালি হলে সে নিজেই কাজ ধববে বুঝলাম, আমাকে শোনানোব মতই কিছু বসদ তাব কাছে জমা আছে।

আবো মিনিট দশেকেব মধ্যে ওদিকেব কেশবিন্যাস শেষ। অমল তাডাতাডি এগিযে গিযে পুশ-ডোব ঠেলে দাডিযে আবো একটু বাডতি সম্ভ্রম দেখালো। ভদ্রলোক পকেট থেকে বডসড মানি-ব্যাগ বাব কবতে কবতে পুশ-ডোবেব ওধাবে চলে গেলেন।

দবজা ঠেলে অমল আবাব ফিবে আসতে দেখি চাপা খুশিতে তাব মুখখানা ডগমগ কবছে। হাতেব দশটাকাব নোটখানা ভাজ কবে কাঠেব বাক্সে বাখতে বাখতে সামনেব দেযাল-ঘডিটাব দিকে তাকালো একবাব। তাবপব দ্বিতীয কর্মচাবীটিকে বলল, সাডে ন'টা বেজে গেছে, এই বাতে আব কেউ আসবে না, তুমি যাও।

আমাব গলায বুকে কাপডেব এপ্রন জডিযে চিরুনি কাচি হাতে পিছনে এসে দাঁডাল।—স্যাব, এই যে ভদ্রলাকটি চলে গেলেন. চিনলেন ?

কাচি চলছে, মাথা নাডাব উপায নেই, বললাম, না।

—মস্ত লোক, আপনাব তো চেনাব কথা। জগু দত্ত...থিযেটাব কোম্পানীব মালিক।

নামটা চেনা। ওই বাজ্যেব মস্ত লোকই বটে।—তোমাব খদ্দেব হযেছেন?

—হ্যা. দু'মাস ধবে। পাকা হাতেব কলপ মাসে একবাব লাগালেই চলে, কিন্তু উনি পনেব দিন অন্তব অন্তব আসছেন—এই দু'মাসে চাববাব এলেন।

আমি নিবীহ প্রশ্ন ছুঁডলাম, কেন, চুল খুব বেশি সাদা ?

—সাদাই বটে. তবে ভযে আব অশান্তিতে ভেতবটা আবো বেশি সাদা, বুঝলেন ?

পবেব বিশ মিনিটেব মধ্যে বুঝতে আব কিছু বাকি থাকল না। অমল বেশ বসিযে সাদা চুলেব ভয আব অশান্তিব ব্যাপাবটাব বিস্তাব শুরু কবল। তাব সাবমর্ম: জগু দত্তব বযেস এখন ষাট ছুঁযেছে। তাঁব চাবটে বাডি তিনটে গাডি আব অঢেল টাকা। অবস্থাজনিত আনুষঙ্গিক গুণাবলীও আছে। তাব মধ্যে একটি সত্যিকাবেব গুণও অস্বীকাব কবা যায না। নিজেব একটি ছোট ভাই আছে, নাম সুবল দত্ত—কম কবে

কুড়ি বছরের ছোট তাঁর থেকে। এই ভাইটিকে বাপের মত মানুষ করেছেন তিনি, সত্যিই ভালবাসেন তাঁকে। বিষম গোল বাধল প্রিয়বালা আসার পর থেকে।

—প্রিয়বালাকে দেখেছেন নিশ্চয় স্যার। ওঃ। স্টেজে ঢোকে যখন সে তামাম হলখানার হাওয়া বদলে যায়।

দু'মাস হল প্রিয়বালা জগুবাবুর থিয়েটারে যোগ দিয়েছে। পশ্চিমের ডাঁটালো মেয়ে, আগে কেউ তাকে কলকাতার কোনো থিয়েটারে দেখেনি। সেই থেকে জগুবাবু অমলের খদ্দের।

ওই প্রিয়বালা জগুবাবুর চোখের মণি। বাড়ি-ঘর ছেড়ে দিনরাত তার কাছেই পড়ে থাকতেন। কিন্তু ফ্যাসাদ বাধল আদরের ছোট ভাই সুবল দত্তকে নিয়ে। সেও প্রিয়বালার প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেতে লাগল। ফলে রাগে দুঃখে নিজের মাথার চুল ছেড়েন জগু দণ্ড। ষাট বছরের সঙ্গে চল্লিশ বছরের রেষারেষি। ওদিকে উদার হয়ে ভাইটিকে বেশ একটা মোটা অঙ্কের টাকা অনেক আগেই দিয়ে বসেছিলেন। তার বিষ-গাছ গজাচ্ছে এখন। শোনা যাচ্ছে, সেই টাকা দিয়ে সুবল দত্ত প্রিয়বালাকে নিয়ে আলাদা থিয়েটার খুলবে।

—জগু দত্তর বন্দুক আছে স্যার, বুঝলেন। আর তাঁর মাথায়ও রক্ত চড়েই আছে। একবার ভাবেন, ভাইকে গুলী করে মারবেন, আর একবার ভাবেন প্রিয়বালাকে। ...আমার মনে হয়, ওই বন্দুক দিয়ে শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক নিজের মাথারই খুলি ওড়াবেন...কি বলেন স্যার?

আমি কিছু বলিনি। কিছুদিন বাদে ভেবে-চিন্তে আর রাখা-ঢাকা করে একটা মামুলী গল্প লিখেছিলাম। সেই প্রেমের গল্পে ষাট বছরের সঙ্গে চল্লিশ বছরের রেষারেষিতে স্থূল দৃষ্টিতে চল্লিশ বছরকেই জিতিয়ে দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে হৃদয়ের দিক থেকে ষাট বছরই অনেক বড় হয়ে উঠেছিল।

গল্পটা অমলের আদৌ পছন্দ হয়নি। সে বলেছে, এটা কি করলেন স্যার, ষাট বছর ওই অভিনেত্রীর জন্য তার চারটে বাড়ি আর তিনটে গাড়ির একটা করে খসালেই তো অনায়াসে তাকে হাতের মুঠোয় পুরতে পারত। আর জগু দত্ত যদি কোনদিন জানতে পারে এই গল্পের খোরাক আমি জুগিয়েছি, আমাকে একেবারে জ্যান্ত পুঁততে চাইবে।

ভাবলাম, ষাট বছর জিতলে ও বোধহয় মোটা বকশিশই পেত তাঁর কাছ থেকে।

মাস দুই পরের কথা। প্রসাধনীতে ঢুকে সেই রাতে বিপরীত গোছের দৃশ্য দেখলাম। অর্থাৎ যেমনটি সচরাচর দেখা যায় না। রাতের নিরিবিলিতে মাথার একরাশ শনের মত সাদা চুল কালো করতে বসেছে নিতান্ত ক্লিষ্ট চেহারার একটি লোক। গায়ের রং রোদে-পোড়া কালচে—কপালের দু'দিকে ফুটে ওঠা নীল শিরা দুটো দূর থেকে দেখা যায়। সর্বাঙ্গে দারিদ্র্য আর মেহেনতের ছাপ। পরনে তেলচিটে খাকি হাফপ্যান্ট, গায়ে বিবর্ণ একটা ফতুয়া। তবু বয়েস যাই হোক, দেহের কাঠামো তেমন শীর্ণ নয়।

এ-হেন মূর্তির মাথার সাদা চুল কালো করার তাগিদটা ভারী অদ্ভুত লাগল। অমল তার ঝাঁকড়া চুলের মাথাটা নিজের দু-হাতের দখলে টেনে এনে গজগজ করে

উঠেছে—স্থির হয়ে বসুন, অত ছটফট করলে কালোর ভেতর দিয়ে অনেক সাদা চুল দাঁত বার করে হাসবে। এই সরব-দৃশ্যে আমার পদার্পণ।

অমল বিব্রত মুখ করে বলল, একটু বসুন সার, ভোলা চা খেতে গেছে, এলো বলে—

ওর হাত জোড়া থাকলে ভোলাই আমার চুল কেটে থাকে। আমি মাথা নেড়ে অদূরে বসে সকৌতুকে অমলের ওই খদ্দেরটিকে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। অমল সেটা লক্ষ্য করল এবং বার দুই-তিন আমার দিকে ফিরে তাকালো। বিরক্তি গিয়ে তার চোখেও বেশ সরস কৌতুক নেচে উঠেছে। সাদা চুলের গোছায় হাত চলাতে চালাতে সামনের আয়না দিয়ে লোকটার মুখখানা ভালো করে দেখছে আর চাপা খুশিতে দাঁতে করে নিজের ঠোঁটের কোণ কামড়াচ্ছে। এবারেও গল্প আছে কিছু, হাবভাবে অমল যেন সেটাই আমাকে বোঝাতে চাইছে।

ভোলা আসতেই গম্ভীর মুখে অমল তাকে ডাকলো, এই এদিকে আয়, এঁর কাজটা ধর—খুব ভালো করে বানিয়ে দিবি, চুল দিয়ে কালো জেল্লা বেরোয় যেন—

সঙ্গে সঙ্গে লোকটাকে বলল, কিছু ভাবনা নেই মশায়, ও আমার থেকে অনেক ভালো কাজ করবে—জাপান থেকে চুল কালো করার ট্রেনিং নিয়ে এসেছে।

সংশয়-ভরা চোখে লোকটা একবার ভোলার দিকে তাকালো শুধু। কোনরকম প্রতিবাদ করল না।

অমল সোজা এগিয়ে গিয়ে লম্বা ঘরের ওধারের কোণের একেবারে শেষ চেয়ার আর আয়নার সামনে গিয়ে আমাকে ডাকল, ইদিকে আসুন স্যার—

উঠে গেলাম। এই ব্যবধান রচনার উদ্দেশ্য বুঝেও বললাম, ওকে ছেড়ে এলে কেন, ভোলাই তো কাটতে পারত—

আমার গলায় চাদর জড়াতে জড়াতে অস্ফুট একটা শব্দ বার করল গলা দিয়ে। তারপর চাপা ব্যঙ্গস্বরে বলল, দু'টাকা রেট, দু'দিন রাতদুপুরে এসে দরকষাকষি করে আজ দেড় টাকায় কাজ সেরে যাচ্ছে।

আমি ফিসফিস করে বলে উঠলাম, এমন অবস্থায় চুল কালো করার সখ।

—প্রাণের দায় যে। চুলে ক্লিপ চালিয়ে খাটো গলায় অমল লঘু উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করল, যেখানে মেয়েমানুষ সেখানেই গোল, বুঝলেন স্যার। খুব মজার ব্যাপার...আপনাকে বলব বলেই এদিকে নিয়ে এলাম...কিন্তু লিখতে গেলে এবারে আপনার পক্ষেও খুব মুশকিল হবে—

আড়চোখে যতটুকু সম্ভব ঘাড় ফিরিয়ে একবার লোকটার ওধারের দিকে তাকালাম। কোনো দিকে হুঁশ নেই, তন্ময় আগ্রহে আয়নায় নিজের সাদা চুলের ওপর ভোলার হাতের কসরৎ দেখছে।

চুলে কাঁচি চালাতে চালাতে অমল তেমনি চাপা গলায় আর চাপা আনন্দে মজার ব্যাপারটা বলে গেল।—লোকটা কলে কাজ করে, আর বয়েস তো দেখতেই পাচ্ছেন। ঘরে একগাদা ছেলেপুলে, নিজের প্রথম পরিবার অনেক আগেই খতম হয়েছিল। ওর বড় জোয়ান ছেলেটাকেও মিলে ঢুকিয়ে তার বিয়ে দেবার চেষ্টায় এগিয়েছিল।

কিন্তু ছেলেব জন্য মেযে দেখতে গিযে নিজেবই মুণ্ডু ঘুবে গেল—চালাকি কবে ও-ব্যাটা নিজেই তাকে বিযে কবে বসল। তাবপব থেকেই বিষম ফ্যাসাদ। বাপে-ছেলেয সাপ-বেজিব সম্পর্ক, আব ওই ছেলেব দিকেই বউটাব গোপন টান।

. হবে না তো কি, বউটাকে তো আমি স্বচক্ষে দেখেছি—প্রথম দিন ওকে দূবে দাঁড কবিযে বেখে আমাব সঙ্গে চুল কালো কবাব দবদস্তুব কবতে এসেছিল। বড ছেলেকে বাডি থেকে তাডিযেও বউকে বিশ্বাস কবে না বলেই সঙ্গে এনেছিল নিশ্চয। তখন দেখেছি। কালো পাথবে কোঁদা চেহাবা—সর্বঅঙ্গে স্বাস্থ্য আব ইযে যেন চুইযে পডেছে। এই বুডো অমন মেযেমানুষ বশে বাখবে কী কবে।

আমি নীবব শ্রোতা। একটু চুপ কবে থেকে তেমনি খাটো গলায অমল যেন প্রায শ্লেষে কেটা চ্যালেঞ্জ ছুঁডে মাবল।— কিন্তু এবাবে লিখলে বুডোব বদলে আপনি ওই ছোঁডাটাকে জেতাবেন কী কবে—মা-ছেলে সম্পর্ক যে।

জবাব দিইনি। লেখাবও বাসনা ছিল না।

কিন্তু তা হবাব নয বলেই বোধহয দেড মাস বাদে এই বঙ্গমঞ্চে আবাব এক বাতে এই বুডোব সঙ্গে দ্বিতীয দফা দেখা। আবো ক্লিষ্ট আবো ঝডো মূর্তি। অমলেব হাতে তাব চুল কালো কবাব কাজ চাব ভাগেব তিন ভাগ শেষ।

অতএব ভোলা এসে আমাব মাথা দখল কবল। আব সেই দখল ছাডাব মিনিটখানেক আগে ট্যাঁক থেকে সন্তর্পণে খুচবা পযসা গুনে অমলেব হাতে দিযে বুডো প্রস্থান কবল।

আমি বাইবে এসে দেখি অদূবেব লাইট-পোস্টেব নীচে দাঁডিযে ফতুযাব পকেট থেকে একটা ক্ষুদে আযনা বাব কবে বুডোটা নিবিষ্টমনে তাব কালো পালিশ-কবা চকচকে চুল পর্যবেক্ষণ কবছে। ঘবেব অত আলোতে দেখেও সে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পাবেনি।

পাশ কাটাতে গিযেও আমি দাঁডিযে গেলাম। গম্ভীব অথচ লঘু বিদ্রূপেব সুবে বলে ফেললাম, চমৎকাব হযেছে, কেউ বুঝতে পাববে না।

অবাক চোখে লোকটা ঘুবে দাঁডালো, তাবপবেই মুখে বোকা-বোকা হাসি।—হ্যা হুজুব তবে বড খবচ।

হুজুব শুনে হোক বা খবচেব কথায বিমর্ষ শুকনো মুখ দেখে হোক, আমি জিজ্ঞাসা কবলাম, তোমাব নাম কী?

—আজ্ঞে কার্তিক দোলুই। এত কাছ থেকে মুখখানা যেন আবো ক্লিষ্ট বিমর্ষ লাগছে। আমাব মনেব অগোচবে কোনো খটকা লেগেছিল কিনা জানি না।—এখানে থাকো কোথায?

—ফুটপাথে।

—আমি অবাক। আব কে থাকে?

—এখানে কেউ থাকে না হুজুব, বউ আব বাল-বাচ্চাবা দেশে থাকে।

সত্যিই খটকা লাগছে।—দেশ কোথায?

আমাকে সদয ভেবেই লোকটাব বিষণ্ণ মুখে কৃতজ্ঞতাব আভাস।—মেদিনীপুব।

—তা অত খবচ কবে পাকা চুল কালো কববাব দবকাব কী?

দুটো গর্তেব করুণ দৃষ্টিটা আমাব মুখেব ওপব থমকালো।—কী কবব, পেটেব দায—ভিক্ষে কবতে মন সবে না।

—কেন? কী কবো তুমি?

—আজ্ঞে হুজুব বিকশা টানি।...আমাব সাদা চুল দেখে কেউ আমাব বিকশায উঠেতে চায না, সব জোযানদেব বিকশায ওঠে।

কপালে হাত ঠেকিযে সেলাম কবে লম্বা শ্রান্ত দেহটা টেনে টেনে লোকটা চলে যাচ্ছে। লাইটপোস্টেব নীচে আমি হতভম্বেব মত দাঁড়িযে।

পরনে ঢাকাই শাড়ি

স্বপ্নেব গাছে বাস্তবেব ফল সত্যিই ধবে?

বিজন ঘোষ চৌবঙ্গী এলাকায এসেছিল একটা ওষুধেব খোঁজে। ক'দিন আসবে আসবে কবে সময কবে উঠতে পাবেনি। তাব কর্মক্ষেত্র সুদূব দক্ষিণে' থাকেও সেদিকেই। কিন্তু ওষুধটা আব না কিনেলই নয। সমস্ত দক্ষিণ কলকাতা চষে পায নি। আপিস থেকে একটু আগে বেবিযে এসেছে মধ্যস্থলে।

ওষুধটা পাওযা গেল। ফেবাব বাসেব অপেক্ষায দাঁড়িযে ছিল।

তখনি যোগাযোগ।

একটা কাগজেব প্যাকেট বুকে কবে ফুটপাথ ছেড়ে বাস্তা পাব হবাব তোড়জোড কবছিল প্রমীতা গুপ্ত। পবিচিত ফ্যালফেলে চাউনিব চেনা-মুখ দেখে দাঁড়িযে গেল। বিস্মযেব সঙ্গে সঙ্গে বিড়ম্বনাব চকিত কারুকার্য একটু। পলকেব দ্বিধা। তাবপব মিষ্টি আব ভাবী অবাক মুখ কবেই প্রমীতা কাছে এগিযে এলো। —তুমি। কী আশ্চর্য।

বিজন ঘোষেব মুখে লাজুক হাসি। কাছে এসে দাঁড়ানোব পব অবাধ্য চোখ দুটো প্রমীতাব মুখেব ওপব থেকে নড়তে চাইছে না। পলকেব দেখাব মধ্যে চৌদ্দ বছবেব অদেখাব একটা দুস্তব সমুদ্র পাড়ি দেবাব বাসনা।

—দেখছ কী এমন কবে, চিনতে পাবছ তো?

বিজন ঘোষেব হাসি-হাসি মুখ, কিন্তু চোখেব তাবা দুটো বড বেশি স্থিব তাব মুখেব পব। মাথা নাড়ল, অর্থাৎ চিনতে অনাযাসেই পেবেছে। বলল, তুমি বাস্তা পাব হতে চেষ্টা কবছিলে দেখছিলাম।

—বলো কি, দেখেও ডাকোনি?. .নাকি ডাকতে চাওনি?

—মনে মনে ডাকছিলাম, ভবসা কবে গলাব আশ্রয নিতে পাবিনি।

প্রমীতা হঠাৎ হেসে উঠল। ফর্সা মুখখানা খুশি-খুশি দেখালো। পা থেকে মাথা পর্যন্ত এক-নজব দেখল তাকে। পবনেব ধুতিটা পবিষ্কাব, গাযেব মুগা-বঙা পাঞ্জাবিটা আধমযলা—কিন্তু একটু মোটা হযেছে, আব মুখখানাও আগেব থেকে ঢলঢলে হযেছে। বলল, তুমি একেবাবে আগেব মতই আছ দেখছি, কত বছব পবে দেখা বলো তো।

—চৌদ্দ বছর। রামচন্দ্রের বনবাসের কাল।

—এত হিসেবও রেখেছ। উৎফুল্ল মুখে প্রমীতা জিজ্ঞাসা করল, কিন্তু তুমি কলকাতায় কবে থেকে? আমি তো শুনেছিলাম পাকাপাকি পশ্চিমবাসী হয়ে গেছ?

—বছরখানেক হল কলকাতাবাসী হয়েছি, বিহারী আপিসের কলকাতায় শাখা-বিস্তার হয়েছে।

প্রমীতা সকৌতুকে তাকালো তার দিকে।—এক বছরের মধ্যে মনে পড়ল না, আমাদের বাড়ির রাস্তাটা ভুলে গেছ বুঝি?

বিজন হাসতে লাগল। হাসিটা মিষ্টি লাগছে প্রমীতার, কিন্তু মুখের ওপর ওই চাউনিটা অস্বস্তিকর। জবাব দিল, ভুলিনি...বরাবরই সাহসের অভাব তো। তাছাড়া ভেবেছিলাম তুমিও ঘর বদলেছ।...কিন্তু কী ব্যাপার, সীমন্তে দাগ দেখছি না যে?

নিমেষে মুখের রঙবদল হল যেন একটু, তারপর হাসি-মাখা দু'চোখ তার চোখের ওপর তুলল প্রমীতা। লোকটার কথাবার্তার ধরনও যেন আগের থেকে তাজা হয়েছে মনে হল। বলল, দাগ ফেলার মত লোক আর এলোই না, তার কী করা যাবে? মুখ আবারও রাঙালো একটু, তাড়াতাড়ি বলল, চলো কোনো ভালো জায়গায় বসে একটু চা বা কফি খাওয়া যাক, তোমার তাড়া নেই তো কিছু?

খুশিমুখে বিজন পকেটে হাত ঢোকালো, দাঁড়াও, পকেটে রসদ কী আছে দেখি—

—দেখতে হবে না, এসো।

স্মিতমুখ দু'জনেরই। পাশাপাশি কোনো রেস্তরাঁর উদ্দেশে এগোলো তারা।

আপিসের হিসেব রাখার কাজ করে বিজন ঘোষ। জীবনের হিসেবও ভোলেনি। আর দেখা না হলেও প্রমীতা গুপ্তর খবর রাখে না এমন নয়। কোন এক বে-সরকারী কলেজে প্রোফেসারি করে এই খবর রাখে, সীমন্তে এখনো দাগ পড়েনি এবং পড়ার সম্ভাবনাও বিশেষ নেই—এ-খবরও রাখে। আর চৌরঙ্গিপাড়া থেকে বিলিতি বই কিনে আর পড়ে অবসর সময় কাটায়, হাতের প্যাকেট দেখে অনুমানে সে-খবরটা আজ পেল।

...বিজনের ঊনচল্লিশ চলছে, প্রমীতার বয়েস তাহলে এখন ছত্তিরিশ হবে। দেখায়ও তার থেকে কম নয়, ফর্সা মুখ আগের থেকে আরো ফ্যাকাশে হয়েছে।

আঠারো বছর বয়সে পনের বছরের মেয়ে প্রমীতার প্রেমে পড়েছিল বিজন ঘোষ। ভীরু প্রেম। বাইরের প্রকাশ আরো ভীরু। কিন্তু ভিতরে প্রেমানলের স্রোত।

তার মামাতো বোন শেফালীর সহপাঠিনী ছিল। মামারবাড়িতে থেকেই পড়াশুনা করত বিজন ঘোষ। সেই সূত্রেই বাড়িতে যাতায়াত আর পরিচয়। শেফালী খানিকটা করুণার চোখে দেখত ভালোমানুষ পিসতুতো দাদাটিকে। প্রমীতার চোখও তার থেকে ওপরে ওঠেনি। গরীব ঘরের মেয়ে শেফালীর সতেরোয় বিয়ে হয়ে গেছে। গল্পের বই যোগান দিয়ে, সিনেমার টিকেট কেটে দিয়ে, আরো অনেক-রকম সরল কৌশলে

প্রমীতার সঙ্গে যোগাযোগটা অন্তরঙ্গ করে তুলেছিল বিজন ঘোষ। অন্তরঙ্গতা শুধু তার দিক থেকেই, প্রমীতার দিক থেকে সেটা প্রীতি-দাক্ষিণ্যের বেশি নয়।

ফেল করার মত ছাত্র ছিল না বিজন ঘোষ। কিন্তু বয়েসয়ে এক বছর পর এক বছর ফেল করে করে এম-এ ক্লাসে উঠে প্রমীতার সহপাঠী হবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিল সে। আর খুশিমুখে কৌশলে এই ফেল করার উদ্দেশ্যটা প্রমীতাকে জানিয়েছিল।

বিস্ময় ছাপিয়ে প্রমীতার ভ্রূকুটি বেশি ঘন হয়ে উঠেছিল।— তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে ! কেন ?

এই কেনর জবাব প্রমীতা যদি নিজের থেকে বুঝে না নেয়, বিজন ঘোষ কী বলতে পারে।

সিক্সথ ইয়ারে উঠে প্রমীতার বিরক্তিটা প্রায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সর্বদা যদি একটা লোক ছায়ার মত লেগে থাকে, কাঁহাতক ভালো লাগে। বন্ধুরা মুখ টিপে হাসে, সীতা দেবীর ভক্ত হনুমান বলে ওকে নিয়ে আড়ালে ঠাট্টা-তামাশাও করে— প্রমীতা তাকে বলেছেও সে-কথা। কিন্তু বলার উদ্দেশ্য সফল হত বোঝারও চেষ্টা যদি থাকত।

ওই সময়েই কোথা থেকে ভালো একটা বিয়ের প্রস্তাব এসেছিল তার, বিজন খবরটা জানতে পারার পর এই দীর্ঘ ব্যাপারটার ছেদ।

আমতা-আমতা করে শুকনো মুখে বিয়েরই প্রস্তাব করেছিল সে। তখনি নয় অবশ্য, এম-এ পাশ করার পর, আর ভালো চাকরি জুটিয়ে যোগ্যতা অর্জনের পর। সে শুধু ভবিষ্যতের আশ্বাসটুকু চায়।

মুখের দিকে চেয়ে কটু কথা বলা দূরে থাক, আশ্বাসটুকু ধূলিসাৎ করতেও কষ্ট হয়েছিল প্রমীতার। আবার এরকম সম্ভাবনার কথা ভাবতেও রাগ হচ্ছিল। খানিক চুপ করে থেকে জবাব দিয়েছিল, মাকে গিয়ে বলো, এ-সব আমি কিছু জানি না।

প্রমীতা সেদিনই মাকে একটু আভাস দিয়ে রেখেছিল, ভদ্রভাবে বেশ স্পষ্ট করেই যেন প্রস্তাবটা নাকচ করা হয়।

প্রমীতার মা ওই সাদামাটা নিষ্প্রভ ছেলের দুঃসাহসিক অভিলাষের কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। প্রস্তাবটা আর তাঁর কাছে ভালো করে উত্থাপনও করতে পারেনি বিজন ঘোষ। তার আগেই বেশ স্পষ্ট অনুশাসনের সুরে আর এ-বড়ি আসতে বা প্রমীতার ছায়া মাড়াতেও নিষেধ করে দিয়েছিলেন তিনি।

কৃতী স্বামী আর চার-চারটে কৃতী ছেলের পর ওই একটিমাত্র মেয়ে তাঁর। রাগ হবারই কথা।

এর পরদিন থেকে প্রমীতা আর তাকে দেখেনি। য়ুনিভার্সিটিতেও আসে নি বিজন ঘোষ, অর্থাৎ এম-এ পড়া সেখানেই খতম হয়েছে। পরে কার কাছে শুনেছে, এ দেশ ছেড়েই চলে গেছে সে, বিহারে না কোথায় চাকরি নিয়েছে।

লোকটা দুঃখ পেয়ে গেল বলে প্রমীতার অবশ্য কষ্টই হয়েছিল, কিন্তু কী আর করতে পারে সে।

প্রমীতাব জীবনেও অনেক জল ঘোলা হয়েছে এব পব। জামাই বাছতে বাছতে হঠাৎ একদিন চোখ বুজেছেন তাব মা। তাবপব প্রমীতা নিজেও অনেক সম্ভাব্য পাত্র বাতিল কবেছে, আবাব কেউ কেউ তাকেও বাতিল কবেছে। এমনি এক বাতিলেব ব্যাপাব নিয়ে বীতিমত অপমানকব ব্যাপাব ঘটে যায় একটা। বাবাকে আব তাব বিয়ে নিয়ে মাথা ঘামাতে নিষেধ কবে প্রমীতা কলেজে চাকবি নিয়েছে। বয়েস এখন ছত্রিবিশ...চাকবিই কবে যাচ্ছে। ক্লান্তিকব অবকাশ কাটানোব জন্যে মাঝে মাঝে এ-পাড়ায় এসে বিলিতি বই কেনে।

জীবনেব এই সীমান্তে এসে বিজন ঘোষেব সঙ্গে দেখা।

একটা ক্যাবিনে মুখোমুখি বসেছে দু'জনে। বয় এসে দাঁড়িয়েছে। প্রমীতা জিজ্ঞাসা কবল, চা না কফি?

—কফি হোক। অনেকদিন ও বস্তু জিভে ঠেকাইনি।

এই সবলতা কানে বেশ ভালো লাগল প্রমীতাব। হেসে বলল, আব কি?

—আব কিছু না।

বয় কফিব অর্ডাব নিয়ে গেল আব দিয়ে গেল। কফি তৈবি কবে পেয়ালা এগিয়ে দিল প্রমীতা, নিজেবটাও টেনে নিল। সহজ অন্তবঙ্গতাব সুবেই জিজ্ঞাসা কবল, তাবপব, এখানে আছ কোথায়?

—সেই দক্ষিণে।

—দক্ষিণে কোথায়?

—কেন, যাবে?

আবাবও মুখেব উপব চোখ দুটো বড় বেশি স্থিব মনে হল প্রমীতাব। হেসেই জিজ্ঞাসা কবল, কেন, গেলে কাবো আপত্তিব কাবণ হবে?

বিজন হাসছে মৃদু মৃদু—তা হবে না অবশ্য। বাড়ি পনেবোব দুই, ভবেন হালদাব লেন, চারু মার্কেটেব কাছে।

—ঠিক যাব একদিন দেখো, ছুটিব দিনে থাকো তো?

বিজন মাথা নাড়ল, থাকে। ওষুধেব বোতলটাব দিকে চোখ পড়তে প্রমীতা জিজ্ঞাসা কবল, ওষুধ মনে হচ্ছে, কাব?

—মেজ মেয়েব। ও-পাড়ায় পেলাম না।

ঠিক সেই মুহূর্তে প্রমীতাব মুখখানা নিষ্প্রভ দেখালো-একটু, গলাব স্ববও বদলালো যেন। কিন্তু মুহূর্তেব ব্যতিক্রম মাত্র, তাবপবে হেসেই বলল, সংসাবচিত্রেব প্রথমেই মেয়েব অসুখেব খবব দিলে। কী হয়েছে?

—পেটে চিনচিনে ব্যথা, প্রায়ই ভুগছে, আজও ওষুধটা না নিলে খণ্ড-প্রলয়েব সম্ভাবনা ছিল।

পবিতুষ্ট মন্তব্যেব মত শোনালো প্রমীতাব কানে। হেসেই জিজ্ঞাসা কবল, ছেলেপুলে কী তোমাব?

—দুই মেয়ে, এক ছেলে।

—কাব কত বযেস? সত্যিই এই লোকটাব সম্পর্কে জানাব কৌতূহল প্রমীতাব।

—বড মেযে এগাবো, মেজোটা সাডে আট, ছেলে সাবে ছয।

—বেশ। এবাব বউ কেমন শুনি?

—বিযেব পব একবছব পর্যন্ত বউ ছিল, এখন তিনি কর্ত্রী—আমাব পোজিশন ছেলে-মেযেদেব থেকে খুব বেশি ওপবে নয। নিজেও কিছু উপার্জন কবে বলে আমাকেও প্রায অকর্মণ্য পোষ্য ভাবে।

—চাকবিও কবে তাহলে! লেখা-পডা জানা বলো...কী চাকবি?

—মাস্টাবী। তবে তোমাব মত বডদবেব নয, ছোটদবেব। দিনেব বেলায স্কুলেব মেযেদেব ওপব, বাত্রিতে আমাদেব ওপব।

প্রমীতা লক্ষ্য কবছে, মুখখানা আগেব থেকে সত্যিই অনেক ঢলঢলে হযেছে, আব প্রকাবান্তবে যতই বউযেব নিন্দাব আভাস ফোটাতে চেষ্টা করুক, কথাবার্তায আসলে বেশ একটা সহজ পবিতৃপ্তিব আমেজ ব্রযেছে।

হেসে ছদ্ম ভ্রূকুটি কবল প্রমীতা, বিচ্ছিবি কথাবার্তা হযেছে তো তোমাব! দাঁডাও, বাডি গিযে যা-যা বলেছ, বউকে বলে দেব সব।

—বোলো। বিশ্বাস কবলে আমাকে ধোলাই কবতে নিশ্চয ছাডবে না, কিন্তু তোমাব মত এমন পবিচিত একজনও আছে আমাব, চাক্ষুষ সে-প্রমাণ পেলে মনে মনে একটু সম্মানও অন্তত নিশ্চয কববে—আমাব কপালে এ বস্তুটি দিনকে দিন দুর্লভ হযে উঠছে।

চাকুমার্কেট ছডিযে, ট্রামডিপো ছাডিযে, আবো আধমাইল পথ পাযে হেঁটে অন্ধকাব গলিব ভিতব দিযে ঠাওব কবে এগিযে এসে জীর্ণ বদ্ধ দবজাব তালা খুলল বিজন ঘোষ। নিঃশব্দ হাসিটা সমস্ত মুখে ছডিযে আছে।

...বগলেব ওষুধটা নিজেবই, পেটেব চিনচিনে ব্যথাটাও নিজেবই। কিন্তু ওষুধটা না কিনলেও হত, ব্যথাটা বোধ হয সেবেই গেল। প্রমীতা কোন দিনও আব তাব ঘবে আসবে না। এলেও চাকুমার্কেটেব সামনে পনেবোব দুই ভবেন হালদাব লেনেব অস্তিত্ব কোথাও আছে কিনা বিজন ঘোষ জানে না।

অন্ধকাবশূন্য ঘবে তাব নিঃশব্দ হাসিটা গাল বেযে প্রায কানেব দিকে ছডাচ্ছে এখন। কলকাতায এসে এই দেড বছব ধবে এই গোছেবই একটা স্বপ্ন দেখেছিল যেন। স্বপ্নেব গাছে বাস্তবেব ফল সত্যিই ধবে?

বিজন ঘোষও হবিপদ কেবানীদেবই একজন। এই শূন্যঘবে যে মানসীব আনাগোনা, তাবও পবনে ঢাকাই শাডি, কপালে সিঁদুব...।

বিজন ঘোষ কোনদিন তাব অস্তিত্ব টেব না পেলেও প্রমীতা শুধু পাচ্ছে।

আহুতি

সোমনাথ চাটুজ্যেব কাছে আজও একে একে পাঁচ-ছ' দফা লোক এলো। প্রত্যেকেব কাঁধেব ঝোলায বিশ-পঁচিশখানা কবে বই। বইগুলো তাবা সোমনাথবাবুকে বুঝিযে

দিযে বখশিশ নিযে চলে গেল। সোমনাথবাবুব থমথমে মুখ। বাডিব চাকব সে বইগুলো তাঁব নির্দেশে ভিতবে নিযে গেল। ভিতবে মানে বান্নাঘবেব সামনে ঢিবি কবে বাখাল সেগুলো।

তিনদিন ধবে বাডিতে লোকে বড তাজ্জবকাণ্ড দেখছে কর্তাব। বাডিব লোক বলতে এখন ঠাকুব-চাকব, সোমনাথবাবুব গৃহিণী আব ছোট মেযে সুলেখা। আবো একটি জীব আছে, প্রভুব কাণ্ড দেখে সেও কম অবাক হবে না। সে কোন লোক নয, সোমনাথবাবুব অ্যালসেসিযান 'উলফ'। সব দেখেশুনে বগ-চটা এই জীবটিও হকচকিযে গেছে।

সব থেকে বেশি হতভম্ব সোমনাথবাবুব স্ত্রী শশীবানী। ডাক্তাব ডাকাব কথা কদিনই ভাবছেন। একটা ফোন কবলেই ডাক্তাব এসে পডবে, কিন্তু শশীবানী ভবসা কবে তাও ডাকতে পাবছেন না। ডাক্তাব এলে এই মানুষ আবাব কোন মূর্তি ধববে কে জানে।

সোমনাথবাবু হাসিখুশি মানুষ। কিন্তু কদিনেব এই মুখ দেখলে কেউ বলবে না মানুষটা হাসতে জানে।

সোমনাথ চাটুজ্যে তেমনি গম্ভীবমুখে উঠলেন। চাকব যেখানে বইযেব ঢিবি কবেছে, পাযে পাযে সেখানে এলেন। বইগুলো দেখলেন একটু চেযে। ঝকঝকে বই, নতুনেব গন্ধ লেগে আছে।

—কটা এলো?

চাকব তাডাতাডি এগিযে এসে বলল, আজও একশ ত্রিশ—

পুবনো চৌকস চাকব। তাব হিসেবে বিশ্বাস কবা যায।

বললেন, বোস, আবো খান-বিশ-পঁচিশ আসবে।

...প্রথম দিন আনা হযেছিল পঁচাত্তবখানা। দ্বিতীয দিনে একশ দশ। তৃতীয দিনে একশ পঁচিশ। আজ আসবে কম কবে একশ পঞ্চাশ। মনে মনে একটু হিসেব কবে নিলেন সোমনাথবাবু। মোট দাঁডাল চাবশ পঞ্চাশ।...আবো দেডশ কিনলে এ-যাত্রাব কাজ শেষ।

ভিন্ন ভিন্ন বই নয। একই বইযেব কপি সব। উপন্যাস। নাম—'অনুবাগ চক্র'। এই বইযেব ঢিবিব সবগুলোই 'অনুবাগ চক্র'। আজ চাবদিন ধবে থাকে-থাকে খেপে খেপে কেবল 'অনুবাগ চক্র'ই আসছে সোমনাথবাবুব বাডিতে। আবো দেডশ এই বই-ই আসবে।

উপন্যাসখানাব দাম আট টাকা। মোট ছ'শ বই যদি কিনতে পাবেন সোমনাথবাবু, তাহলে দাম দাঁডাল চাব হাজাব আটশ টাকা। বই যাদেব দিযে কেনানো হচ্ছে তাদেব মাবফত কমিশন পাওযা যাচ্ছে পঁচিশ পাবসেন্ট। তাব মানে বাবোশ' টাকা বাদ; তাহলে খবচা দাঁডাল তিন হাজাব ছশো। এ ছাডা ওই লোকগুলোকে—যাবা বই কিনে আনছে —তাদেব বখশিশ দিতে হচ্ছে প্রত্যেককে দশটাকা কবে।

যে দেডশ বই আবো আসবে তাব দাম বাদ বাকি সব টাকা সোমনাথবাবু দিযেই দিযেছেন।

এ বই অর্থাৎ 'অনুবাগ চক্র'ব লেখক সোমনাথ চাটুজ্যে নিজেই।

হ্যাঁ, এই চাবদিন ধবে বিভিন্ন লোক মাবফৎ নিজেব বই-ই কিনে চলেছেন তিনি। কালকেব মধ্যে নতুন-চাব-পাঁচজনকে দোকানে পাঠিযে আবো দেড়শ অন্তত কিনবেন।

বাইবে পবিচিত গলাব হাঁক শোনা গেল। কাব গলা চিনতে পাবাব সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা বিব্রত এবং বিবক্ত। যাঁব পদার্পণ তিনি যে আসবেনই জানা কথা। ওই ভদ্রলোকেব হন্তদন্ত হযে আসাব মত একটা অস্ত্র সোমনাথ চাটুজোই নিক্ষেপ কবেছেন। তবু বিব্রত, তবু বিবক্ত।

বাইবেব ঘবে চেনা-গলাব হাঁক শুনে আড়াল থেকে মনে মনে আশান্বিত কেউ যদি হযে থাকেন, তিনি শশীবানী। অন্যদিন হলে খুশিমুখে তিনিই বেবিযে আসতেন। আজ পাবলেন না। আজ সঙ্কোচ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আশা, ঘবেব মানুযেব এই মতিব কিছু হদিশ মিলতে পাবে এবাব।

গাড়ি হাঁকড়ে যিনি এসে হাজিব হযেছেন তাঁব নাম বিজয ঘোষ। বাংলা দেশেব এক নামজাদা প্রকাশক। তাঁব অনুগ্রহ সবস্বতীব দপ্তবে প্রবেশেব ছাড়পত্রেব সামিল। অনেক মাঝাবি লেখককেও প্রচাবেব মাধ্যমে প্রথম সাবিতে এনে হাজিব কবেছেন তিনি, এ-দেশেব লেখককুল তাঁব প্রতি কৃতজ্ঞ। কিন্তু সোমানাথ চাটুজোব সম্পর্কে আজ অন্তত ঠিক একথা খাটে না। তিনি মাঝাবি নন। একেবাবে সামনেব সাবিব একজন। বিজয ঘোষেব সঙ্গে তাঁব বহুদিনেব অন্তবঙ্গ বন্ধুত্ব। এই বন্ধুত্ব এখন অপব লেখক এবং প্রকাশকেব চোখ টাটানোব মতো ফলপ্রসূ—এই শুধু বলা যেতে পাবে।

সোমনাথ চাটুজ্যে বাইবেব ঘবে পা দেবাব সঙ্গে সঙ্গে বিজয ঘোষ গলায কাপড়েব খুঁটটা জড়িযে নিযে দু'হাত জোড় কবল।—কী অপবাধ বলো।

মিনমিন কবে সোমনাথবাবু জবাব দিলেন, অপবাধ আবাব কি, বোসো..।

গম্ভীব মুখে আসন নিযে বিজয় ঘোষ পকেট থেকে একটা বেজেস্ট্রি খাম বাব কবলেন।—আমি কি বিশ্বাস কবব, এটা তুমিই আমাকে পাঠিযেছ?

সোমনাথবাবু তেমনি মিনমিন কবেই জবাব দিযেছিলেন, হ্যাঁ ভাই .পাঠাতে হ'ল। বিজয ঘোষেব গোল মুখেব ওপব দৃষ্টি স্থিব হল একটু।

—তোমাকে কে কী বলেছে?

—কেউ কিছু বলেনি।

—আমাব থেকে কেউ বেশি টাকাব টোপ ফেলেছে?

—না।

—আমি বাইশশ' ছেপে দু'চাব হাজাব ছেপেছি, এ-বকম বিপোর্ট কেউ দিযেছে তোমাকে?

—না।

—সেদিন যখন তুমি আমাকে টেলিফোন কবেছিলে, আমি জানিযেছিলাম দেড়মাসে দেড়হাজাবেব বেশি কপি বিক্রি হযে গেছে। হঠাৎ এই চাবদিন ধবে বাকি কপিগুলো মুড়িমুড়কিব মত বিক্রি হযে যাচ্ছে—আব দেড়শ বইও নেই। তবু আমি ঠিকমত তোমাব বই বিক্রি কবতে পাবছি না—এ-কথা কেউ বলেছে?

—না, সে-সব কিছুই না।

ঈষৎ অসহিষ্ণু অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে বিজয় ঘোষ বলে উঠলেন, তাহলে আমার ওপর এই চিঠির বজ্রাঘাত কেন খুলে বলবে তো?...এই কদিনের বিক্রি দেখে রাতারাতি পরের এডিশন ছাপার জন্য আমি একসঙ্গে চারটে প্রেসের সঙ্গে ব্যবস্থা করে ফেলেছি—তার মধ্যে তোমার এই হুকুমজারি, এই বই আমি ছাপতে পারব না।

—ইয়ে, পরে সব তোমাকে বলব'খন।

—এখানো পরে বলবে। তোমার এই চিঠির হুকুমই পাকা তাহলে?

—হুকুম আবার কী, বিশেষ দরকার হয়েছে.তাই।

—কিসের দরকার? টাকার?

—না।

—তাহলে আমাকে ছাড়ার?

সোমনাথ চাটুজ্জে নীরব।

—তা আমাকে ছেড়ে এ বই কাকে দিচ্ছ এখন, কে নিচ্ছে?

সোমনাথবাবু নিরুত্তর।

একটু চুপ করে থেকে বিজয় ঘোষ সখেদে বললেন, তুমি বই তুলে নিচ্ছ সে জন্যে দুঃখ নেই, কী হয়েছে বলছ না বলেই দুঃখ। তার মানে, এমন অপরাধ করেছি যার কোন ক্ষমা পর্যন্ত নেই, কি বলো?

ক্ষমার কথা শুনে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন সোমনাথ চাটুজ্যে।

কেন বার বার এসব কথা বলো, অপরাধ কারো যদি হয়ে থাকে এ দুনিয়ায়, আমারই হয়েছে, বুঝলে? বলতে বলতে আরো উত্তেজিত মুখে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। জানতে চাও এ বই কাকে দিচ্ছি? কে নিচ্ছে জানতে চাও? হঠাৎ এগিয়ে এসে হাত ধরে টানলেন, এসো, দেখবে এসো—

বিমূঢ় বিজয় ঘোষকে টেনে নিয়ে বারান্দা ছাড়িয়ে রান্নাঘরে ঢুকলেন তিনি। শশীরানীর আড়াল ঘুচে যেতে তিনিও তটস্থ।

রান্নাঘরে চাকর সেই বড় উনুনটা ধরিয়েছে। সে-ই বইয়ের পাঁজা এক-একটা করে নিয়ে সজোরে টেনে ছিঁড়ে উনুনে দিচ্ছে। এক-একটা করে বই গনগনে উনুনে পুড়ছে আর সঙ্গে সঙ্গে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

বিষম হকচকিয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি চাকরকে বাধা দিতে যাচ্ছিলেন বিজয় ঘোষ, নিজেই বাধা পেলেন। সোমনাথবাবু হাত ধরে থামালেন তাকে। বিবস কণ্ঠে বিড়বিড় করে বললেন, আমার হুকুমেই একাজ করছে। বই কাকে দিচ্ছি, কে নিচ্ছে দেখলে? চারদিন ধরে তোমার এত বই বিক্রি হচ্ছে কেন বুঝতে পারলে?

বিজয় ঘোষের দু'চোখ ঠিকরে পড়ার দাখিল। এমন কাণ্ড তিনি এতকালের ব্যবসায়ী জীবনে আর দেখেননি। এই ধ্বংস-যজ্ঞ আর তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তার ওপর বিষম ঘাবড়ে গেছেন তিনি। লেখকের মাথা হঠাৎ সাঙ্ঘাতিক খারাপ হয়ে গেছে, তাতে আর একটুও সন্দেহ নেই। এখন বই পোড়াতে পোড়াতে যদি বইয়ের প্রকাশকের মাথাও এমনি করে উনুনে গোঁজার বোখ চাপে—তাহলে? মনে

হওয়া মাত্র তখনকার মত ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রস্থান করলেন তিনি। এরপর একেবারে ডাক্তার-টাক্তার নিয়ে তবে বাড়িতে ঢোকা যেতে পারে।

মাথা যে সাঙ্ঘাতিক রকমের খারাপ হয়েছে, শশীরানীরও তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। সুখের সংসারে কেন এরকম বিপর্যয় ঘটে গেল, তা তিনি কিছুটা আঁচ করতে পারেন। কিন্তু অনেকটাই দুর্বোধ্য এখনো।

শশীরানী প্রথমে ভেবেছিলেন, ওই হতভাগা ছেলে আর বড় মেয়েটা মুখে এ ভাবে চুনকালি দিল বলেই মাথাটা খারাপ হয়ে গেল। মানী লোক, চারদিকে কত নামডাক—মাথা খারাপই হবার কথা। দুঃখে ঘেন্নায় আজ কদিন ধরে তাঁর নিজেরই তো বুকের ভেতরটা হু-হু করে জ্বলছে!

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, এর জন্যে ছোটও কম দায়ী নয়। বাপে আর ওই ছোট মেয়েতে সেদিন কি কাণ্ডই ঘটে গেল! দেখেশুনে ভয়ে-ত্রাসে অস্থির তিনি। অথচ বলতে গেলে ওই ছোট মেয়েই বাপের একেবারে চোখের মণি। তাঁর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বাপের এত আদর কেউ পায়নি। দুঃখের সংসারই তো ছিল এক-সময়। একটা মানুষ কলম চালিয়ে এতবড় বাড়ি করবে গাড়ি করবে, এত সম্মান প্রতিপত্তি হবে, একি স্বপ্নেও কখানো ভেবেছিলেন তিনি... ওই ছোট মেয়ে যেদিন কোলে এলো সেদিনই এক মস্ত সুখবর—কোন সিনেমা কোম্পানী স্বামীর একখানা গল্প কিনেছে, বেশ কয়েক হাজার টাকা ঘরে এসেছে।

সেই থেকে বাপের কাছে ছোট মেয়ের কদর। তারপর থেকে সত্যিই দিনে দিনে ভাগ্য ফিরেছে আর দেমাকী মেয়ের আদর বেড়েছে। অন্য ভাইবোন দুটো এ-জন্যে ওকে হিংসেই করে মনে মনে, শশীরানী বেশ বুঝতে পারেন।

আর ওই ছোট মেয়েও ছিল বাপ-অন্ত-প্রাণ। ওর বাপের সম্পর্কে কেউ কখনো একটু বিরূপ কিছু বলেছে কি, রক্ষে নেই। লিখতে থাকলে সামনে ঘুরঘুর করেছে, কতক্ষণে বাবা লেখা ছেড়ে উঠবে আর ও তখন লেখা গোছগাছ করে রাখার নামে ছাপার আগেই একদফা পড়ে নেবে। সেই মেয়ে কিনা এত লেখা-পড়া শিখে এম.এ পাস করে বাপের সঙ্গে এই ব্যবহার করল! সেই ব্যাপারের পর থেকেই বাড়িতে এই পাগলের কাণ্ড চলেছে। মেয়ে দিনরাত দোতলার ঘরে বসে থাকলেও, নীচে কী ঘটছে কদিন ধরে সে কি জানে না? সব শোনার পরেও মেয়ে সেই আগের মত গুম হয়ে রইল তো রইলই। তার ওপর এই কদিনের মধ্যে একটা ডাক্তার পর্যন্ত ডাকল না। এখনো ওর রাগই বেশি! সবক'টা স্বার্থপর, সবক'টা অমানুষ।

সোমনাথ চাটুজ্যের এক ছেলে দুই মেয়ে। ছেলে সুদীপ, আর মেয়েরা শ্রীলেখা আর সুলেখা। সুদীপ টেনেটুনে বি.এ পাস করেছিল, তারপর সেই থেকে ভালো কিছু ব্যবসা করা যায় কিনা তাই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে চলেছে। চাকরিতে ঘেন্না তার।

শ্রীলেখা দু'বার বি.এ. ফেল করে স্পষ্টই ঘোষণা করেছে, পড়াটড়া আর তার দ্বারা হবে না। কিন্তু সে চৌকস মেয়ে নয়, এমন কথা কেউ বলবে না। সপ্তাহে গোটা তিনেক ইংরেজি বাংলা সিনেমা একটা-দুটো থিয়েটার দেখে, আর কালচারাল নাটক-টাটক করে তার ফুরসত নেই বললেই চলে। ছোট মেয়ে সুলেখা হায়ার সেকেণ্ডারিতে

বেশ ভালো বেজাণ্ট কবেছিল, বি.এ-তেও খুবই ভালো, আব এম. এ-তে তো কথাই নেই—বাংলায ফার্স্ট ক্লাস একেবাবে। কাগজে যখন ওব ছবি বেবিযেছিল, তখনকাব মেযে সে সে-কথাও লেখা ছিল। এখন বিসার্চ কবছে, তাব জন্যে টাকাও পাচ্ছে।

শ্রীলেখা পড়ে না, একটা বই নিযে শুলেই তাব ঘুম পায— যেটুকু পড়া হযেছে সেটুকুই আবাব নতুন কবে পড়তে হয, নইলে কিছুই মনে থাকে না—আব সেই কবতে গিযে আবাব ঘুম। এই কাবণে দীর্ঘদিন পর্যন্ত সোমনাথবাবুব মনে একটা খেদ ছিল। সেটা গেছে ছেলেমেযেবা বড হযে উঠতে। তাবা সকলেই বাপেব লেখাব ভক্ত। বিশেষ কবে ছোট মেযেব তো কথাই নেই। লাইন মুখস্থ বলে দিতে পাবে অনেক বইযেব। ওব মাকে বলে, বাবাব দর্শনতত্ত্বব কত কথা যে আমি পবীক্ষাব খাতায মেবে দিই, ঠিক নেই।

অনেক আধুনিক চটকদাব মাসিক আব সাপ্তাহিকপত্র ব্যক্তিগত ইণ্টাবভিউ নিযে লেখক-সমাচাব ছাপায। সেবকম লোক এলে সোমনাথবাবু সুলেখাকে পাঠিযে দেন। বলেন, আমাব সম্পর্কে আমাব থেকেও ও-ই ভালো জানে। বাপেব সম্পর্কে ছোট মেযেব বিবৃতিই ফলাও কবে ছাপা হয।

এমনি একটা ব্যাপাবে প্রায বছবখানেক আগে এই মেযেব কাছ থেকেই প্রথম আঘাত পান সোমনাথবাবু। সুলেখা সবে এম. এ পবীক্ষা দিযেছে, তখন নীচেব ঘবে এমনি এক কাগজেব সম্পাদকেব কাছে সুলেখাকে পাঠিযে ঘণ্টাখানেক বাদে দেখেন, সম্পাদকেব কাছে বাপেব সম্পর্কে ফলাও কবে বলছে শ্রীলেখা। সুলেখা সেখানে নেই। পবে বড মেযেব কাছে যা শুনলেন তিনি, প্রায অবিশ্বাস্য। সম্পাদককে নাকি সুলেখা বলে দিযেছে, বাবাব ইদানীং কালেব লেখা সে পড়ে না, অতএব কিছু বলতেও পাববে না। অবাক হযে সম্পাদক জিজ্ঞাসা কবেছে, কেন? ও জবাব দিযেছে, ভালো লাগে না। দিদিব ভালো লাগে, তাকে ডেকে দিচ্ছি।

শুনে বাগেব থেকে সোমনাথবাবু অবাকই হযেছেন বেশি। এই মেযেটা যে এত বোকা তিনি কল্পনা কবেননি। সাহিত্যে নতুন বাস্তবেব বাতাস নিযে আসছেন তিনি। সে-বাস্তব অনেক সময নির্মম, কুৎসিত, নগ্ন। কিন্তু উপায কি, যে কালেব যা। কালেব এই বসদ যোগানোব ফল তো সকলেই দেখছে। তাঁব শেষেব চাব-চাবটে বই বাজাবে হৈ-হৈ কবে বিক্রি হচ্ছে। বিশেষ গোঁড়ামি যাঁদেব, তাঁবা সমালোচনাব ফুল ফোটাচ্ছে বটে, কিন্তু সাহিত্যে বিপ্লব আনতে হলে সকলকে খুশি কবা যায না। মেজবিটি যে খুশি, বইযেব বিক্রিই তাব প্রমাণ।

তাবপব শেষেব এই বই—'অনুবাগ চক্র'। বেরুবাব সঙ্গে সঙ্গে একখানা বই নিযে এত হৈ-চৈ বাংলা দেশে বোধহয আব কোনো বই নিযে হযনি। গোঁড়াবাও অবশ্য সক্রিয হযে উঠেছে। তাদেব কাগজে তাবা গালাগাল কবেছে। তাব উত্তবে সোমনাথবাবু নিজেব খাতিবেব কাগজে লিখেছেন, জীবনে সুন্দব আছে, কুৎসিত আছে, জীবনকে বাদ দিযে সাহিত্য হয না। কুৎসিতকে অস্বীকাব কবা মানে জীবনকেই অস্বীকাব কবা।

এব জবাবে সেই গোঁড়াদেব কাগজ ফলাও কবে একজনেব প্রশ্ন ছেপেছে। প্রশ্ন, সাহিত্যে-যাত্রা বলতে জীবনেব কুৎসিত থেকে সুন্দবেব দিকে যাত্রা বুঝব, না সুন্দব

থেকে কুৎসিতের দিকে? জীবনের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, না আলো থেকে অন্ধকারের দিকে?

এই প্রশ্ন ফলাও করে ছাপা হয়েছে, তার কারণ ওই প্রশ্ন করেছে সুলেখা চট্টোপাধ্যায়—তাঁর ছোট মেয়ে।

ছাপার অক্ষরে ওই নাম দেখে স্তব্ধ হয়ে ছিলেন সোমনাথ চাটুজ্যে। তারপর জুৎসই একটা জবাব লিখবেন ঠিক করেছিলেন।

কিন্তু সে-অবকাশ পেলেন না। তার আগেই বাড়িতে দ্বিতীয় বিভ্রাট আর এই দ্বিতীয় বিভ্রাটে মাথাই খারাপ হবার দাখিল সোমনাথবাবুর।

প্রথম বিভ্রাট গেছে মাসতিনেক আগে। তখনো 'অনুরাগ চক্র' বেরোয়নি। বড় ছেলে সুদীপ পাড়াতে একটি বড়ঘরের কায়স্থ মেয়েকে নিয়ে ভেগে পড়ল। সেই সঙ্গে বাপের মাত্র হাজার পাঁচেক টাকা সঙ্গে নিয়েছে। লিখে রেখে গেছে তার বাবাকে, তিনি উদার; অসবর্ণ বিয়ে এখানেই হতে পারত, কিন্তু মেয়ের বাড়ির লোক ভয়ানক গোঁড়া বলেই আপাতত পালাতে হচ্ছে। স্ত্রীর কাছে ছেলেকে যথেচ্ছ গালাগাল করেই ক্ষান্ত হয়েছেন সোমনাথবাবু।

কিন্তু দ্বিতীয় বিভ্রাট তার চতুর্গুণ। বলা নেই, স্ত্রী হঠাৎ এক রাত্রে তার লেখার ঘরে এসে হাউ-মাউ করে কেঁদে পড়লেন। তারপর ব্যাপার শুনে স্তম্ভিত তিনি।

বড় মেয়ে শ্রীলেখা অন্তঃস্বত্ত্বা। কিছুদিন ধরেই স্ত্রীর সন্দেহ হচ্ছিল। আজ যে করে হোক স্পষ্টই টের পেয়েছেন। আর বেগতিক দেখে শ্রীলেখাও স্বীকার করেছে। বলেছে, সেই ছেলে তাকে বিয়ে করবে, তাই আর দেরী না করে ব্যবস্থা করা দরকার।

মাথার আগুন একরকম জল ঢেলেই নেবাতে হয়েছে সোমনাথবাবুকে। সেও এক কায়স্থের ছেলে। ছোটাছুটি করে আর হয়রানির একশেষ হয়ে দরকারী কাজ আগে সম্পন্ন করেছেন তিনি। সেই ছেলের সঙ্গে মেয়ের চুপিচুপি বিয়ে দিয়ে বিদায় করেছেন তাকে। বাপ তাঁর গলায় গামছা দিয়ে একর্কাড়ি টাকা আদায় করেছে।

ধকল শেষ হতে মাত্র পাঁচ দিন আগে অগ্নিমূর্তি ধারণ করেছিলেন তিনি। বিষণ্ণ স্ত্রীকে বলেছিলেন, ছেলে আর বড় মেয়েকে ত্যাগ করলেন তিনি, আর তাদের মুখ দেখবেন না, কোন সম্পর্ক রাখবেন না—তাঁর বাড়ি ঘর টাকাকড়ি সব তাঁর ছোট মেয়ে পাবে—আর কেউ এক কপর্দকও পাবে না।

পাশের ঘর থেকে ছোট মেয়ে সুলেখা সটান তাঁর সামনে এসে হাজির।—কেন পাবে না তারা? কেন তাদের ত্যাগ করবে? তারা কী দোষ করেছে?

প্রশ্ন ছেড়ে মেয়ের এই মূর্তি দেখে সোমনাথবাবু হতভম্ব। শশীরানীও। তীক্ষ্ণ চাপা স্বরে সুলেখা আবার বলে উঠল, জীবনের এই রাস্তায় গড়িয়ে তোমার চোখে এমন কী অন্যায় কাজ করেছে তারা? তারা যা করেছে সে-রকম ঘটনা তোমার এক-একটা বইয়ে অনেকবার করে ঘটেছে—আর শেষের বইটাতে তো কথাই নেই। তোমার অবাধ্য তো কেবল আমি হয়েছি, তাড়াতে যদি হয় আমাকেই তোমার তাড়ানো উচিত।

সোমনাথবাবু নির্বাক। হঠাৎ শশীরানী বলে উঠলেন, তোর কী মাথাখারাপ হয়ে গেল, মুখের ওপর এ-সব কী বলছিস তুই?

—ঠিকই বলছি মা। বাবা না তাড়ালেও এ বাড়িতে আর থাকার ইচ্ছে নেই আমার—আমি অন্য জায়গা খুঁজছি। কার মেয়ে বলতে পর্যন্ত এক-এক জায়গায় লজ্জায় পড়তে হয় আমাকে। সে-কথা থাক, কিন্তু বাবা কী বলে রাগ করে—এসব কথাই বা বলে কেন?

যেমন এসেছিল, তেমনি এক ঝটকায় সুলেখা আবার নিজের ঘরে চলে গেল।

এ-ঘরে শশীরানী নির্বাক, বিমূঢ়। আর সোমনাথ চাটুজ্যে বিবর্ণ, চিত্রার্পিত।

তমোঘ্ন

এই পাহাড়ী মরুরাজ্যে হৃদয়ের চাষ নেই। পাহাড়গুলো সব অতিকায় হাড়গোড় বার-করা পাথরের স্তূপ। বড় বড় গাছগুলোর প্রায় বারো মাসই কঙ্কাল-মূর্তি। সন্ধ্যের আগে পর্যন্ত মাথার ওপর সূর্য জ্বলে। শুকনো হাঁ-করা মাটির রং বাদামী। দূরে মরুভূমি।

এখানে সব থেকে দুর্লভ মানুষের হৃদয় নামে বস্তু।

মানুষগুলো খেতে না পাক, নেশা করে। এই বস্তুর জন্য ওরা প্রাণ দিতে পারে, প্রাণ নিতে পারে।

কিন্তু পুরুষদের সব থেকে বড় নেশা ভাটিখানা বা ঘরের তৈরি রক্তে-আগুন-ধরানো পচাই নয়। তার থেকেও অনেক বড় নেশা আছে।

প্রতিশোধের নেশা।

চকচকে ছুরির ফলা বুকে আমূল বিদ্ধ হলে ফিনকি দিয়ে তাজা রক্তের ফোয়ারা ছোটে যখন, ওদের সে উল্লাস দেখলে এই সভ্য দুনিয়াটাকে বহু শতাব্দী পিছনের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া চলে।

চিমনলালের ছেলে রোশনলাল দীর্ঘ তিন বছরে এই একটি নেশার সাধনায় স্তব্ধ হয়ে আছে।

প্রতিশোধ।

দুটি মৃত্যু চাই তার। এমন মৃত্যু যা কখনো কেউ কল্পনা করতে পারে না। একটা মৃত্যু অন্তত সেই রকম হবে। একটা একটা করে চোখ উপড়ে নেবে, একটু একটু করে গায়ের ছাল ছাড়িয়ে নেবে—আরও অনেক পরে আসবে মৃত্যু।

আর একটা মৃত্যু কেমন হবে, রোশনলাল এখনো স্থির করে উঠতে পারে নি। সেও চমকপ্রদ যে হবে সন্দেহ নেই।

প্রতিশোধের এই লগ্নকাল উপস্থিত। রোশনলাল হদিস পেয়েছে ওদের। দলের একজন দূরে চলে গেছল, সে ফিরে এসে হদিস দিয়েছে। এখান থেকে দু'শ মাইল দূরে এক ছন্নছাড়া গাঁয়ে বাসা বেঁধেছে ওরা।

খববটা শোনামাত্র শিবায শিবায কী কাণ্ড ঘটে গেছে তা শুধু বোশনলালই জানে। আব অনুমান কবতে পাবে তাব অতি বিশ্বস্ত প্রধান চাবজন সঙ্গী।

দু'শ মাইল আর কতদূব?

বোশনলাল বাপেব মন্ত্রে দীক্ষিত। প্রতিশোধ কী কবে নিতে হয সেটা সে বাবো বছব বযসে স্বচক্ষে দেখেছে।

অবশ্য সেও সেদিন বাপকে ঘৃণা কবত আব ভয কবত। পছন্দ ববং তখন মাকেই কবত। বেশ সুশ্রী ছিল তাব মা।

সেই বাতটা মনে আছে বোশনলালেব।

তাবা থাকত তখন পশ্চিমঘাটেব এক পাদ্রীব আশ্রযে। সেখানকাব কর্মচাবী ছিল তাব দুর্দান্ত বাবা। পাদ্রী জোসেফেব ঘবে থাকত তাব আট বছবেব একটা ফুটফুটে মেযে। হীবা—হীবা জোশেফ। সকলে বলে কুডনো মেযে, অনেকে আডালে বলে জোশেফেবই মেযে। ওই মেযেটাকে মা ভাবী ভালবাসত।

ক'দিন ধবে মাযেব মুখখানা খুব শুকনো দেখছিল বোশনলাল। নিশ্চয বাবাব ভযে। বাবাকে যমেব মত ভয কবত মা।

..সেই একটা বাত। ঘবে মা দাঁডিযেছিল। সেখানে বোশনলাল ছিল আব হীবা ছিল। দেযালে টাঙানো মস্ত একটা ছবি ছিল। ছবিতে খোলাচুল লালচে বঙেব একটা মেমসাহেব, তাব বুকে মাখমেব ডেলাব মত একটা ছেলে। মা সেই দিকে চেযে ছিল। বোশনলাল জিজ্ঞাসা কবেছিল, ওবা কাবা?

বিডবিড কবে মা কী যে জবাব দিযেছিল কিছুই বোঝেনি। বলেছিল, বিশ্বমাযেব কোলে মানবপুত্র বিশ্বশিশু।

না বুঝলেও বোশনলালেব একটা দৃশ্য ভাবতে বেশ ভালো লেগেছিল। সেও একদিন ওই ছবিব বাচ্চাটাব মতো ছোট ছিল, আব তাব মা হযত তখন অমনি তাকে বুকে কবে দাঁডিযে থাকত।

বাবা হঠাৎ ঘবে ঢুকে মা কে ডাকতে এসেছিল। মা চমকে উঠেছিল। বলেছিল, যাবে না।

সেই বাতে বাবাব হ্যাঁচকা টানে ঘুম ভেঙে গেছল। পাশে চোখ যেতেই বোশনলাল ভযে নীল হযে গেছল। মাযেব দেহ বক্তে ভাসছে।

বাবাব সেই মুখেব দিকে চেযে অস্ফুট আর্তনাদও কবতে পাবে নি বোশনলাল। বাবা তাকে তুলে নিযে যে-ঘবে ঢুকেছে সেটা পাদ্রী জোসেফেব ঘব। সেও মৃত। বক্তে ভাসছে। অদূবেব শয্যায হীবা ঘুমিযে। বাবা তাকে তুলে নিযে নিঃশব্দে বেবিযে এসেছে।

তিন-চাবটে বাতেব অন্ধকাবে অন্ধকাবে কোথায কতদূবে চলে এসেছিল জানে না। যেখানে এসেছিল, সেখানে চেনা-মুখ দেখেছে জনা-কতক। বাবাব বন্ধু। মাঝে মাঝে পাদ্রী জোসেফেব ওখানে এসে বাবাব সঙ্গে দেখা কবত তারা।

একেবাবে অবুঝ নয বোশনলাল তখন। মা আব পাদ্রী জোসেফেব মৃত্যুব কাবণ অনুমান কবতে পাবে। আব একটু বড হবাব পবে স্পষ্টই বুঝেছে।

বোশনলাল ভেবেছিল হীবাকেও বাবা মেবেই ফেলবে। নিজেব মেযে হোক না হোক, হীবাকে খুব ভালবাসত পাদ্রী জোসেফ, আব তাব মা তো ভালবাসতই—অতএব বাবাব বাগ ওব ওপবেও পডবেই ধবে নিযেছিল।

কিন্তু কিছুকাল যেতে দেখা গেল, বাবাব টান তাব থেকেও হীবাব ওপব বেশি। হীবা ওব নামে বাবাব কাছে নালিশ কবলে বাবা ওকে তুলোধুনো কবে, কিন্তু হীরাব নামে নালিশ কবলে কিছুই বলে না।

আট বছব কেটে গেছে। বোশনলালেব বযেস কুডি, হীবাব ষোল।

বাবাব পক্ষপাতিত্বেব দরুন হীবাকে অনেকবাব খুন কবতে সাধ গেছে। কিন্তু এখন আব তা হয না। হীবাকে দেখলে বক্তে এখন অন্য বকমেব নাচন-মাতন শুরু হয। মাথায গ্রাসেব আগুন জ্বলে। হীবা সেটা বুঝতে পাবে। একলা থাকলে বেশি কাছে ঘেঁষে না।

মাথা খাটিযে কৌশলে এক বাতে ওকে পাহাডেব আডালে অন্ধকাবে টেনে নিযে গেছল। বক্তে সবে নেশা লেগেছিল। সবল দুটো বাহুব নিষ্পেষণে হীবা অস্ফুট আর্তনাদ কবে উঠেছিল। আব হিংস্র অধবদংশনে বোশনলাল তাকে শাসাচ্ছিল, টু-শব্দ কবলে একেবাবে খুন কবে পাথবেব তলায পুঁতে বেখে চলে যাব।

কিন্তু পবেব মুহূর্তে নিজেবই বক্ত জল। আচমকা আঘাতে চোখেব সামনে মৃত্যুব অন্ধকাব। সেই অন্ধকাব ফুডে তাব বাবা দাঁডিযে।

বোশনলালেব ধাবণা, এই বিশ্বাসঘাতকতা কবেছে সুবযপ্রসাদ। সে-ই হীবাব পিছনে ছাযাব মতো ঘোবে সর্বদা। দুটিতে খুব ভাব, সে-ই কোথাও থেকে দেখে থাকবে। বাবাকে বলে দিযে থাকবে।

তাব খাতায সুবযপ্রসাদেব পবমাযুতে সেদিনই ঢ্যাবা পডে গেছল।

দলে অনেক ছেলেছোকবা এসেছে এখন। সকলেব থেকে অকর্মণ্য ওই চাষীব ছেলে সুবযপ্রসাদ। চিমনলাল দলেব সর্দাব, বোশনলাল তাব ডান হাত। সকলেব ধাবণা, কালে-দিনে বাপেব থেকে দ্বিগুণ দুর্ধর্ষ হবে বোশনলাল, কিন্তু এই ছেলেকেও বাপ সেদিন ক্ষমা কবেনি। তিনদিন তিনবাত ঘবে তালা দিযে ফেলে বেখেছিল। খেতেও দেযনি। খুপবি জানলা দিযে ওই হীবা চুপি চুপি কিছু খাবাব ফেলে না দিলে প্রাণে বাঁচত না।

তাবপব বাবা তাকে বলেছিল, সময হলে হীবাব সঙ্গে আমিই তোব বিযে দেব, কিন্তু তাব আগে ওব গাযে হাত দিলে কেটে দু'খানা কবে ফেলব।

গাযে আব হাত দেযনি। কিন্তু কবে যে বাবাব সময হবে তা ভেবে পাযনি।

আবো দীর্ঘ চাবটে বছব কেটেছে। বোশনলালেব চব্বিশ আব হীবাব কুডি।

চিমনলাল বলেছিল, এ বছবটা কাটলে ছেলেব বিযে দেবে। বোশনলালেব মনে হযেছিল, মাযেব মৃত্যুব বাবো বছব পাব হওযাব অপেক্ষায আছে তাব বাবা। অনেক ব্যাপাবে বাবো বছবেব সংস্কাব মানে তাদেব সমাজেব মানুষ।

কিন্তু বিযে দেওযাব সময বাবাব আব হল না। ছোটখাট বাহাজানি কবতে গেছল কোথায। পাঁজবে গুলি খেযে ফিবল। পরদিন শেষ।

রাতারাতি চরিত্র বদলে গেল রোশনলালের। সে দলপতি। তিনদিনের মধ্যে বাপের মৃত্যুর মর্মান্তিক প্রতিশোধ নিল। তারপর দলটাকে নতুন উদ্দীপনায় তাজা করে তুলতে লাগল সে।

হীরাকে বিয়ে এরছরের পরেই করবে। বাপের ইচ্ছের অসম্মান করবে না।

খবর পেল, সুরযপ্রসাদের আর দলে থাকার ইচ্ছে নেই, দেশে ভদ্র জীবনযাপনের মতলবে আছে সে।

রোশনলালের আপত্তি ছিল না। বাপের আমলেও কোনো কাজে লাগেনি, এখনো ওর মত অকর্মণ্য আর কেউ নয়। কিন্তু অনুমতি পেয়েও কেন যে গেল না, তখন বোঝেনি।

ক'দিন ধরে একটা কানাঘুষা শুনছিল। হীরার সঙ্গে সুরযপ্রসাদের ইদানীং ভাব-সাব একটু বেশিই দেখছে সকলে। আত্মপ্রত্যয়ে ভরপুর রোশনলাল এসব তুচ্ছ ব্যাপারে মাথা ঘামায় না। আর আসলে মেয়েটাই বজ্জাত, তাও জানে। যখন-তখন হীরাই ওকে ডাকে। মেয়েদের মন জুগিয়ে চলার মতো মরদ ওর দলে এক সুরযপ্রসাদ ছাড়া আর কে আছে।

তবু মেজাজ বিগড়েছিল একদিন। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে একটা নিরিবিলি জায়গায় বসে ওদের দু'জনকে হাসিমসকরা করতে দেখে মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। তার হাতের একটা চড় খেয়ে তিন হাত দূরে ছিটকে পড়েছিল সুরযপ্রসাদ। তারপর উঠে খরগোশের মত পালিয়েছিল।

হীরা ফুঁসে উঠেছিল, ওকে মারলে কেন? জবাবে চুলের মুঠি ধরে তার মাথাটাও পাথরে বারকয়েক ঠুকে দিয়েছিল রোশনলাল।

শিকারে বেরিয়েছিল, দু'দিন বাদে ফিরে দেখে ঘরে হীরা নেই। তারপর দেখা গেল সুরযপ্রসাদও নিখোঁজ।

এত সাহস দুনিয়ায় কারো হতে পারে রোশনলাল কল্পনা করতে পারে না।

তারপর থেকে রোশনলাল ক্ষিপ্ত, উন্মাদ। অনেকবার রক্তরাঙা হয়েছে তার এই দুটো হাত।

সমস্ত অঞ্চল আঁতি-পাতি করে খুঁজেছে। সন্দেহবশে কোথা থেকে কোথায় ছুটে গেছে ঠিক নেই। সভ্য দুনিয়া তাকে পেলেই ধরে ফাঁসিকাঠে ঝোলবে জানে, তবু গেছে।

কিন্তু ওরা যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। ক'বছরের মধ্যে সন্ধান মেলেনি। এই চার বছরের মাথায় মিলেছে।

রাতের অন্ধকারে চারজন যোগ্য সঙ্গী নিয়ে একদিন রোশনলাল পা ফেলেছে এই দু'শ মাইল দূরের এলাকায়। তার চোখে সাদা আগুন, চোয়াল দু'টো লোহার মত শক্ত—

রাতেই খবরাখবর নেওয়া শেষ।

পরদিন সকালে পুরুষেরা সব চলে যাবে চার মাইল দূরের হাটে। সুরযপ্রসাদও যাবেই। রোশনলালের সঙ্গীরা যেমন করে হোক সেখান থেকে তাকে গায়েব করবে। নিতান্ত না পারে যদি, সেখানে নৃশংসভাবে হত্যা করবে তাকে।

...আব বোশনলাল একা যাবে হীবাব কাছে। একশ দেড়শ গজ দূবে দূবে ছাড়া ছাড়া বসতি। হীবাব ঘবেব শ'গজ ছাড়িযে কয়েকটা বুড়োবুড়িব ঘব—তাও সে-ঘবে বুড়োবা থাকবে না তখন। তাঁবা হাটে যাবে।

পটভূমি প্রস্তুত।

সমস্ত বাত ঘুম হল না বোশনলালেব। পচাযেব স্রোত জঠবে ঢেলে মাথাব আগুন ঠাণ্ডা কবা গেল না।

কী কববে সে? প্রথমেই হত্যা কববে?

না। তাব বিশ বছব বযস থেকে ভিতবেব যে পশুটা বুভুক্ষু, প্রথমে তাকে ছেড়ে দেবে। হীবাব তখন আশা হবে। তাব নাবীদেহেব লোভে ডুবিযে মানুষটাকে বশীভূত কবা গেল ভাববে। আতঙ্কে ত্রাসে বোবা হযে যাবে পবক্ষণে। চোখ বোজাবও অবকাশ পাবে না, ধাবালো ছোবাটা তাব নবম বুকেব উষ্ণ তাজা বক্তে স্নান কবে উঠবে।

পবদিন।

প্রতীক্ষিত সময এলো।

সঙ্গী চাবজন নির্দেশমত হাটেব দিকে চলে গেল।

বোশনলালও তাব পথে পা বাড়ালো।

দূবে দাঁড়িযে হীবা আব সুবযপ্রসাদেব ঘবটা ভালো কবে দেখল একবাব। তাবপব আস্তে আস্তে কাছে এগিযে এলো।

দবজা ভেতব থেকে বন্ধ। পলকা দবজা, অনাযাসে ধাক্কা দিযে ভেঙে ঢুকতে পাবে। কিন্তু তাব দবকাব হবে না বোধহয।

দবজায বাব-কযেক মৃদু আঘাত কবতে ওদিক থেকে সাড়া মিলল।

কযেক পা পিছিযে এসে বোশনলাল প্রস্তুত হযে দাঁড়াল

দবজা খুলে হীবা বেবিযে এলো।

কিন্তু নিমেষেব মধ্যে চোখেমুখে সমগ্র সত্তায এ কিসেব আচমকা ঝাপটা খেল বোশনলাল? সবকিছু ধাঁধিযে দেবাব মতো, অন্ধ কবে দেবাব মত আলোব ঝাপটা।

পাদ্রী জোসেফেব ঘবেব দেযালেব ছবিব মতো এক অনির্বচনীয বমণী-মূর্তি, কোলে তাব ফুটফুটে ছেলে একটা। মা বলছে, বিশ্বমাযেব কোলে মানবপুত্র বিশ্বশিশু। ..যা দেখে বোশনলালেব ভাবতে ভালো লাগত, সেও একদিন ওই ছবিব বাচ্চাটাব মতো ছোট ছিল, আব তাব মা হযত তখন অমনি তাকে বুকে কবে দাঁড়িযে থাকত।

না, ছবি নয। সামনে হীবা দাঁড়িযে। বুকে তাব দু'-বছবেব ফুটফুটে ছেলে একটা।

তাকে দেখে হীবা চমকে উঠেছিল কিনা, ত্রাসে বিবর্ণ হযেছিল কিনা—ওই আলোব ঝাপটা খেযে বোশনলাল কিছুই লক্ষ্য কবেনি। স্থিব দাঁড়িযে হীবা এখন তাকেই দেখছে। তাব বিভ্রম অনুভব কবছে।

জোসেফেব ঘবেব ছবিব বমণী কখনো কথা বলেনি। এই বমণী বলল।—বাইবে দাঁড়িযে কেন, ভেতবে এসো। সুবযপ্রসাদ হাটে গেছে।

স্থান-কাল ভুলে ফ্যালফ্যাল করে চেয়েছিল রোশনলাল, দেখছিল। মিষ্টি মৃদু কথা কটা কানে যাওয়া মাত্র বিষম চমকে উঠল। নিজের মাথার উপর উদ্যত খড়গ দেখলেও কেউ এমন চমকায় না বোধহয়।

চকিতে আর একবার শুধু সামনের জীবন্ত চিত্রটা দেখে নিল। পরক্ষণে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল হাটের পথ ধরে।

একটু দেরি হয়ে গেলে চরম সর্বনাশ আর ঠেকানো যাবে না বুঝি।

স্মৃতি যদি ফেরে

কমল গুহ আমার সহপাঠী ছিল আর প্রতিবেশী ছিল। সেই নবম বয়সে দিনের মধ্যে বেশ কয়েক ঘন্টা ওকে আটকাতে না পারলে দিনটাই জলো ঠেকত। উঁচু-মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। পড়াশুনায় আমাদের পাঁচজনের থেকে অন্তত ঢের ভালো। তবু ওর জ্ঞানগম্যি সম্পর্কে আমাদের বরাবরই একটা কৌতুককর সংশয় ছিল।

মিষ্টি পাগলাটে ধরণের ছেলে। ভয়ানক খামখেয়ালী। কিন্তু গোঁ আছে—যা ধরবে, তা করবে। মফঃস্বল কলেজ ছেড়ে কলকাতায় পড়ার সময়ও ওর সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। ও ডাক্তারী পাশ করার পর একে একে গুটিপাঁচেক বড় ডাক্তারের সাকরেদি করল বছর-দুই পর্যন্ত। কিন্তু কাউকেই পছন্দ হল না। শেষে চোখ-কান বুজে বেশ কেতাদুরস্ত বড়ঘরেই একটা বিয়ে করে বসল। আমরা নেমন্তন্ন খেলাম আর ঈর্ষান্বিত চোখে ওর চকচকে বউটাকে দেখলাম। তারও মাস-তিনেক বাদে গলায় মালা-টালা দিয়ে একদিন ওকে বোম্বাইয়ের ট্রেনে তুলে দিলাম। সেখান থেকে বিলেত যাবে। ও নিজেই এক ফাঁকে বলেছিল, সেখান থেকে আরো গোটাকয়েক চটকদার ছাপ-ছোপ নিয়ে আসতে পারলে একসঙ্গে তিন কাজ হবে। নিজের হিল্লে হবে, বউয়ের মান-মর্যাদা বাড়বে আর শ্বশুরের টাকার সদগতি হবে।

তারপর দীর্ঘ দুটো যুগ কেটে গেছে। গঙ্গায় অনেক রকমের ঘোলা জল বয়ে গেছে। জীবনের ঘাটে ঘাটে ছড়িয়ে আমরা এক-একটা বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের মহড়া দিয়ে চলেছি। আমাদের ভেতর-বার দুই-ই বদলেছে। দেহের কাঠামোয় বিদায়ী মধ্যাহ্নের ছায়া বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

কমল রওনা হয়ে যাবার বছর-আষ্টেক বাদে এক বন্ধুর মুখে শুনেছিলাম, বিদেশ থেকে ও মস্ত পাগলের ডাক্তার হয়ে, ফিরেছে। লণ্ডনে ছিল, জার্মানীতে ছিল, আমেরিকায়ও নাকি কিছুকাল ছিল।

আমি মন্তব্য করেছিলাম, ও ওর যোগ্য লাইনই বেছে নিয়েছে, কিন্তু এরপর বউটাকে ধরে রাখতে পারলে হয়।

বন্ধু প্রতিবাদ করেছিল, এতবড় মনোবিজ্ঞানী—মন বুঝে এখন তো আরো বেশি কষে বাঁধতে পারবে হে।

যুক্তির কথাই বটে। ফস করে কেন ওই উক্তি মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল নিজেই জানি না। শুনলাম, আট বছরের মধ্যে সেই প্রথম দেশে ফিরেছে সে। এই দীর্ঘকাল অবশ্যই স্ত্রী-বিরহিত জীবনযাপন করেনি। বছর-তিনেকের মধ্যেই বউ আকাশপথে উড়ে গিয়ে তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অসুবিধে আর কী, শ্বশুরের টাকা ছিলই, তার ওপর বিদেশের কৃতী ডাক্তার হয়েছে জামাই, আর তার রোজগারের ভাগ্যও খুলে গেছে। সেই ভাগ্য দিনে দিনে নাকি আরো বিস্তারলাভ করেছে। বিদেশে অর্থাৎ লণ্ডনে আর জার্মানীতে বছর-তিনেক ঘরকন্না করেছে বউ। তারপর হাঁপ ধরে যেতে পালিয়ে এসেছে। কমল ফিরেছে তারও দু'বছর বাদে।

বন্ধুর কাছ থেকে একটা বড় হোটেল-সুইটের ঠিকানা পেয়ে আমি কমলের সঙ্গে দেখা করতে গেছলাম। দেখা হয়নি। সে তখন বম্বে না কোথায় চলে গেছে।

দেখা করতে গেছলাম বটে, কিন্তু ভেতর থেকে খুব একটা তাগিদ ছিল না। কারণ নিজের তখন লেখক-জীবনের বহু হতাশা আর অনিশ্চয়তায় ক্ষতবিক্ষত সংগ্রামী জীবন। এর মধ্যে পরিচিতজনের দুর্লভ কোনো সাফল্যের খবর কানে এলে নিজের ব্যর্থতার ছায়াটা যেন আরো বেশি ঘন হয়ে উঠতে চায়।

এর বছর-দশেক বাদে হঠাৎ আর এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা। সে মোটামুটি সফল অ্যাডভোকেট। আমারো তখন দুর্দিনের মেঘ অনেকটাই কেটেছে। অতএব পরিচিত সফল মুখ দেখলে আনন্দই হয়। দু-পাঁচ কথার পরেই সে জিজ্ঞাসা করল, আমাদের কমল গুহর খবর জানো?

বললাম, মস্ত মেণ্টাল সার্জন হয়েছে, এই পর্যন্তই জানি। কেন?

—এখানেই তো ছিল কিছুদিন। আমাদের কোর্টেই ওর বউয়ের সঙ্গে মামলার নিষ্পত্তি হয়ে গেল। এ ভেরি পিসফুল ডাইভোর্স।

আমি হতভম্ব।—সে কি?

—হ্যাঁ। বউ স্যুট ফাইল করেছিল, ওর দিক থেকে কোনো বাধা আসেনি।

মস্ত পাগলের ডাক্তার হয়েছে শুনে আর এক বন্ধুর কাছে দশ বছর আগেই সেই ঠাট্টাটা 'বউটাকে ধরে রাখতে পারলে হয়',—এমন কাকতালীয় ভাবে ফলে যাবে আর আমাকেই অপ্রস্তুত করবে, স্বপ্নেও ভাবিনি।

এই ঘটনা শোনার পর আরো ছ'বছর বাদে অর্থাৎ পাকা দু'যুগ পরে কমল গুহর সঙ্গে আমার দেখা। আমাদের তখন ঠিক পঞ্চাশ চল্‌ছে।

দিন-কতকের অবকাশ পেয়ে বাংলাদেশের বাইরে এই ছিমছাম পাহাড়ী জায়গায় বেড়াতে এসেছিলাম। কমল গুহ এখানকার বিরাট পাগলের হাসপাতালের সর্বাধিনায়ক জানি—যার যখন তার সঙ্গেও দেখা করার ইচ্ছে ছিলই।

হোটেলে উঠেছিলাম। ঠিক দু'দিন বাদে বিকেলের দিকে তার রেসিডেনসিয়াল কোয়ার্টার্সের চত্বরে ঢুকে পড়লাম। বাড়ির গায়ে ওর নামের শৌখিন নেমপ্লেট, তার পিছনে একগাদা বিলিতি ডিগ্রী-ডিপ্লোমার মিছিল। দাঁড়িয়ে সেগুলো পড়ে নিলাম।

কিন্তু ওর কাছে যাবার পথ তেমন সুগম নয়। অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট করা নেই শুনে দরোয়ান প্রথমে আমাকে দরজার কাছেই এগোতে দেবে না। আপনারজন বলতে

সে স্লিপ নিয়ে যেতে বাজি হল। ছাপানো স্লিপে নামেব সঙ্গে ওমুক জায়গাব পুবনো বন্ধু তাও লিখে দিলাম। শুধু নামে যদি চিনতে না পেবে দেখা না কবে দবোয়ানেব কাছে ইজ্জত যাবে।

এতটু পবেই ডাক এলো। দবোয়ান এবাবে সেলাম ঠুকে ধুতি-চাদব-পবা এই খাঁটি বাঙালীকেই বলল, যাইয়ে সাব্।

ঘবে ঢুকলাম। এটা ডাক্তাবেব আবাসিক আপিস-ঘব। মস্ত টেবিলেব একদিকেব বিভলভিং চেয়াবে বসে আছে কমল গুহ। তাব মুখোমুখি চাব-পাঁচটা চেয়াব অন্য ভদ্রলোকদেব দখলে। কোণেব দিকে আলাদা ছোট টেবিলে বসে মৃদু টুকটুক শব্দে টাইপ কবে চলেছে সুশ্রী একটি ফিবিঙ্গি মেয়ে।

আমাব দিকে এক-পলক চেয়ে থেকে একটু মাথা নাডল কমল গুহ। তাবপব ইঙ্গিতে ভদ্রলোকদেব পাশেব একটা চেয়াব দেখিয়ে দিল। পাইপ দাঁতে চেপে অস্ফুট স্ববে বলল, বিজ-ই ফ' ফাইভ মিনিটস ওনলি, উড ইউ মাইণ্ড ?

আমি বোকাব মত মাথা নাডালাম। কিন্তু সে সেটা দেখলও না বোধহয়। কেতাদুবস্ত কথা কটা বলেই ভদ্রলোকদেব সঙ্গে বাক্যালাপে মগ্ন হল। হাসপাতাল-সংক্রান্ত কথা। এঁবা সকলেই এখানকাব ডাক্তাব বা অফিসাব হবেন।

আমি ঠিক এ-বকম অভ্যর্থনাব জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। একটু হাসি, একটু উচ্ছ্বাস না। তাঁদেব আলোচনায় পাঁচ মিনিটেব জায়গায় দশ মিনিট গেল, তাব মধ্যে চব্বিশ বছব বাদে এককালেব অন্তবঙ্গ কেউ এসেছে বলেও আব একবাব আমাব দিকে ফিবে তাকালো না। হয়ত ভুলেই গেছে। আলোচনা যাদেব সঙ্গে হচ্ছে তাদেব সকলেই হয়ত বাঙালী, কিন্তু বাংলা কথা একটাও শুনলাম না। হাব-ভাব ছেডে কমল গুহব কথাবার্তাব আধো-আধো টানগুলোব মধ্যেও পুবোদস্তুব সাহেবিয়ানা।

হয়ত সীবিয়াস আলোচনাই কিছু, কাবণ বাজেট ফাইন্যান্স ইত্যাদিব বাধা অনেকবাব কানে এলো। তবু আমাব মনে হতে লাগল, চব্বিশ বছব যখন গেছে বাদবাকি জীবনটাও দেখা না হয়ে কেটে যেতে পাবত। আবাব সকৌতুকে ওকে দেখছিও আমি। জেনে-শুনে এখানে ওব সামনে এসে না পডলে কে বলবে সেই কমল গুহ। আধা-গম্ভীব ভাবী মুখ, চোখে মোটা ফ্রেমেব চশমা, দাঁতে মোটা পাইপ, মাথাব ঝাঁকডা চুলেব দু-পাশে খানিকটা কবে পাকা চুলেব বর্ডাব।

—ও কে।

সর্বাধিনায়কেব ছাডপত্র পেয়ে ভদ্রলোকদেব সবিনয়ে প্রস্থান। আমাব নিজেব অবস্থানেব মেয়াদও দশ-বিশ মিনিটেব বেশি হবে আশা কবছি না। পাশে যে ভদ্রলোকটি তখনো দাঁডিয়ে সে বোধহয় সেক্রেটাবি। প্রভুব ইঙ্গিতে সেও প্রস্থান কবল।

—মিস জোনস।

কোণেব টাইপেব টেবিল থেকে সুশ্রী মেয়েটি শশব্যস্তে এদিকে ফিবল।—ইয়েস সাব ?

—উড ইউ প্লীজ...

অসমাপ্ত বক্তব্য বুঝে সেও টাইপ ফেলে টক-টক দ্রুত শব্দে ঘব ছেড়ে চলে গেল। কমল গুহ ততক্ষণে উঠে টেবিল ঘুবে আমাব সামনে চলে এসেছে।

—ওঠ।

সম্বোধন শুনে কান জুড়লো, তবু ঈষৎ বিস্ময়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। সঙ্গে সঙ্গে আচমকা দু' হাতে ও আমাকে বেশ জোবেই জাপটে ধবল, আব তাবপবেই আমাব দু'গালে সশব্দে দুটো চুমু।

—তুই একটা বাসকেল, তুই একটা হতভাগা, তুই একটা ওযাণ্ডাবফুল।

একটু আগে কী চিন্তা কবছিলাম ভেবে নিজেই আমি অপ্রস্তুত। হেসে বললাম, তুই পাগলেব ডাক্তাব হযেছিস বটে।

হা-হা শব্দে হেসে উঠে সজোবে আমাব পিঠ চাপড়ে দিল। আব তাব ফলে ওব ওই পুষ্ট দুটো হাতেব খুব কাছে থাকাও নিবাপদ মনে হল না আমাব।

এবপব মিনিট পনেব ধবে খুশিব আলাপ চলল। কবে এসেছি, কোথায উঠেছি জেনে নিল। হোটেলেব নামটা শুনে কী ভাবল একটু।—চল, ওদিকে আমাব কাজও আছে একটু।

গাড়ি ও নিজেই ড্রাইভ কবে দেখলাম। পাশে বসে পুবনো গল্প কবতে কবতে চলেছি। একটা বাড়িব সামনে গাড়ি থামিযে মিনিট আট দশেব জন্য ও ভিতবে ঢুকে গেল। ফিবে এসে এবাবে ড্রাইভ কবে সোজা চলে এলো আমাব হোটেলে।

এতবড় হোটেলেব মালিক তাকে দেখামাত্র হন্তদন্ত হযে অভ্যর্থনায এগিযে এলো। তাব দিকে একবাব সৌজন্যসূচক মাথা ঝাঁকিযে কমল গুহ আমাব স্যুটকেস বেডিং মালপত্র যা আছে সব লোক দিযে তাব গাড়িতে নামিযে দিতে বলল। আমাকে বাধা দেবাব অবকাশ না দিযে হোটেলেব মালিক তক্ষুনি ছুটল।

আমি বললাম, এটা কী-বকম হল?

জবাবে ও চোখ পাকালো, তুই একটা হতভাগা বলেছি না?

এবাবে আমি নিঃসঙ্কোচ। ওব বাইবেব খোলস একেবাবে বদলেছে বটে. ভিতবটা সেই চব্বিশ বছব আগেব মত তাজা আব কাঁচা আছে।

সন্ধ্যেব অনেক আগেই ওব বাড়িতে স্থিতি হযে দু'জনে মুখোমুখি চাযেব টেবিলে বসেছি। বসনা পবিতৃপ্তিব অঢেল আযোজন। প্রসন্ন মুখে কমল বলল, তোব একটু অসুবিধেই হবে হযত—

আমি মন্তব্য কবলাম, অসুবিধেব লক্ষণ তো দেখতে পাচ্ছি।

—সে অসুবিধেব কথা বলছি না। বমণীবর্জিত আতিথেযতা তো তোব ভালো না-ও লাগতে পাবে।..ভালো কথা, বউযেব সঙ্গে আমাব ডাইভোর্স হযে গেছে, জানিস তো?

বিব্রত মুখে মাথা নাড়লাম।

বললাম, হঠাৎ এ-বকম একটা কাণ্ড...

—নাথিং নিউ, যেতে দে। বলছিলাম এখানে একটিও সুন্দব মুখ না দেখে তোব নীবস লাগাই স্বাভাবিক। ফেমিনাইন কার্ভস লুব্রিকেট মনোটনি।

মুখেব আগল আগেব থেকেও ঢিলে হযেছে দেখছি। হেসেই জবাব দিলাম, বযসও তো পঞ্চাশ গডিযে গেল।

মুখ থেকে পাইপটা নামিযে ও বলে উঠল, তুই কি-বকম ছাবপোকা-মার্কা সাহিত্যিক বে।...তাই বা কেন, তোব দুই-একটা বইযেতেও তো প্রেমেব বেপবোযা কাণ্ডকাবখানা দেখি।

এই ব্যস্ততাব মধ্যেও পৃথিবী-চষা হোমবাচোমবা ডাক্তাব আমাদেব বই পডে বা পডাব সময পায ভেবে অবাকই লাগল।

দুটো দিন বেশ কেটে গেল। ও যখন ব্যস্ত, আমি তখন হাসপাতাল দেখে বেডাই। জীবনেব বসদ খুঁজি। খোদ-কর্তাব অন্তবঙ্গ বন্ধু, বাধা দেবাব কেউ নেই।

তৃতীয দিন সন্ধ্যাব পবে আবাব লেখাব কথা উঠল। কমল বলে বসল, এদেশে একালেব লেখকদেব মধ্যে চবিত্র খোঁজাব অ্যাডভেঞ্চাব নেই—দুনিযায কত কাণ্ড যে ঘটে তাবও খবব বাখ না তোমবা।

আমি প্রতিবাদ কবলাম, যেটুকু অ্যাডভেঞ্চাব কবা হয, তাইতেই তো সমালোচনা হয—গল্পেব গোরু গাছে তুলি আমবা।

ও জবাব দিল, গোরু তুললে আপত্তি কিন্তু মানুষ সত্যি সত্যি বাতাসেও ভাসে, পাতালেও ডোবে। হি অব সী হ্যাজ আ পেযাব অভ ম্যাজিক উইংস—জাদু পাখা আছে দুটো কবে, বুঝলে? দে ওযার্ক মিবাকল অ্যাণ্ড ডিভাসটেট ট্যু বিশেষ কবে মেযেদেব পাখা—দোজ ইটাবন্যাল ইভস।

হেঁযালীব মত লাগলেও মনে মনে ধাবণা, উক্তিটা এক মেযেব প্রসঙ্গে,—যে ওব ঘব ভেঙেছে। এ-কদিনে আভাসেও স্ত্রী-বিচ্ছেদেব কোনো প্রসঙ্গ তোলেনি। নিবীহ মুখে বললাম, আবো একটু বিশদ না কবলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

অন্যমনস্ক একটু। তাবপবেই ঘডি দেখে উঠে দাঁডাল। মুচকি হেসে জবাব দিল, এক্ষুনি হাসপাতালে যেতে হবে, তাডা আছে—কাল বলব—দেন ওযার্ক ইফ ইউ ক্যান।

আমি উদগ্রীব হযে সেই কালেব প্রতীক্ষায ছিলাম।

পবদিন সকাল দশটা নাগাদ হাসপাতালেব একজন কর্মচাবী এসে আমাকে ডেকে নিযে গেল, সাহেব সেলাম দিযেছে।

গেলাম। কমল বলল, চলো একটি মহিলাব সঙ্গে আলাপ কবিযে দিই। সে বেশ মেজাজে আছে মনে হল, হাসছে অল্প অল্প। লিফটে উঠে আবাব বলল, মহিলা যদি তোমাকে কিছু বলে, সায দিযে যেও, নযতো একটু মুশকিলে পডতে পাবো।

ওব গতকালেব প্রসঙ্গেব সঙ্গে হাসপাতালেব কোনো মহিলাব যোগ আছে ভাবিনি। ওব স্ত্রী-বিচ্ছেদেব ঘটনাই শুনব ধবে নিযেছি। আমি লেখক, তাই কোনো বিকাব-বৈচিত্র্য দেখাতে নিযে যাচ্ছে ভাবলাম। হাসপাতালেব খোদকর্তা সঙ্গে আছে যখন, আমাব ঘাবডাবাব কাবণ নেই।

তিনতলাব ওপব পাশাপাশি গোটাকতক সুইট। একটাব সঙ্গে আব একটাব যোগ নেই। মাঝে মাঝে কোলাপসিবল গেটে দবোযান মোতাযেন। মাস গেলে যাবা মোটা

টাকা ফেলে দিতে পাবে তাদেব বোগী বা বোগিণী ভিন্ন এখানে আব কাবো আশ্রয় মেলা সম্ভব নয়।

আমাকে সঙ্গে কবে কমল এমনি একটা সুইটে ঢুকে গেল।

ওদিক ফিবে জানালাব গবাদ ধবে আকাশ দেখছিল মহিলা। একপিঠ খোলা চুল। দু'খানা বাহু, কানেব দু'পাশ আব পাযেব পাতা দেখেই বোঝা গেল মহিলা ৰূপসী। কমলেব গলাখাঁকাবি শুনে এদিকে ফিবল, তাবপবে হেসে অভ্যর্থনা জানাতে গিযেও আমাকে দেখে সুচাৰুভাবে থমকালো একটু।

আমাব অনুমান মিথ্যে নয়, ৰূপসীই বটে। কিন্তু ফর্সা মুখেব দু'দিকে কালচে ছোপ, আব সুন্দব টানা চোখেব কোলে কালি। সুন্দব স্বাস্থ্য,—বযেস মন হল আটত্রিশ ঊনচল্লিশ হবে। পবে শুনেছি ছেচল্লিশ।

তডবড কবে কমল আমাব যে পবিচয দিল শুনে আমাবই দু'চোখ কপালে ওঠাব দাখিল। বলল, আমাব ছেলেবেলাব বন্ধু ওমুক—, মস্ত ইনডাসট্রিযালিস্ট, বাঙালীব গর্ব বলতে পাবেন। তিন চাব দিন হল এখানে বেড়াতে এসেছে। এসেই পালাই-পালাই কবছে কেন, বুঝলেন?

মহিলাব হাসি-হাসি মুখেব সুচাৰু অভিব্যক্তি, আমাব দিকে একবাব তাকিযে মাথা নাডল। কমল তেমনি তডবড কবেই আবাব বলে গেল, ওব স্ত্রী। সাচ এ লাভলি লেডি, ওব টাকাব জন্য নয, এই জন্যেই ওকে আমাব হিংসে হয—কলকাতায ওব বাডি গেলে ওই ভদ্রমহিলাকে দেখাব লোভেই আব চলে আসতে ইচ্ছা কবে না। ওদেব দুটো ছেলে একটা মেযে; এখনো দু'জনেব টানে দু'জন অন্ধ একেবাবে—এই যে এখানে আছে ক'দিন, বোজ একটা কবে মিসেসেব ট্রাঙ্ক-কল, কেমন আছ, কবে আসবে।

আমাবই ঘেমে ওঠাব দাখিল। কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য কবলাম মহিলাব দুটি আযত নেত্র আমাব মুখেব ওপব ঘন হযে বসতে লাগল। এই প্রথম তাব চাউনিও অস্বাভাবিক ঠেকছে।

এবাবে কমল মহিলাব পবিচয দিল। স্মৃতি গুপ্ত। ইনিও এখানে বেড়াতে এসেছিলেন, জাযগাটা ভালো লেগে গেছে তাই আবও কিছুদিন থাকবেন আশা কবা যায।...এই ফাইন অ্যাকমপ্লিসড লেডি, ওঁব সঙ্গে দেখা হযে গেল তোমাব ভাগ্য ভালো।

আব এক দফা নমস্কাব বিনিময হল; লক্ষ্য কবলাম মহিলাব চোখ দুটো যেন অস্বাভাবিক চকচক কবছে। কমল চট কবে উঠে দাঁডাল। —আচ্ছা আপনাবা আলাপ কৰুন, আমি পাশেব সুইট থেকে ঘুবে আসছি।

কথা শেষ কবেই সে অদৃশ্য। সেই মুহূর্তেই একটা ভয যেন আমাকে ছেঁকে ধবতে লাগল। স্মৃতি গুপ্তব চকচকে দু'চোখ আবও ঘন হযে আমাব মুখেব ওপব বসছে। হঠাৎ একটু হাসল মহিলা, তাব পবেই উঠে এসে অন্তবঙ্গ পবিচিতাব মতই আমাব গা ঘেঁষে বসল। চোখেব মত সুন্দব দাঁতেব সাবিও ঝকঝক করে উঠল এবাবে। —চাবদিন হল এসেছেন, আব আজ এখানে আসাব কথা মনে পডল?

অজ্ঞাত ত্রাসে বুকেব ভেতবটা ঢিপঢিপ কবছে আমাব। এ কি বিড়ম্বনা বে বাবা। সন্তর্পণে ব্যবধান বচনা কবতে চেষ্টা কবে আব সেই সঙ্গে শুকনো ঠোঁটে হাসি ফোটাতে চেষ্টা কবে জবাব দিলাম, সময় পেয়ে উঠিনি...।

—বলবেনই তো, আপনাবা সব এই বকমই। আছেন তো কিছুদিন এখন, না স্ত্রীব টানে পালাবেন?

—না...দিনকতক থাকব।

খুশি। সামনেব চুলেব গোছা সবাতে গিয়ে মহিলাব বাহু আমাব কাঁধে ঠেকল। তাবপব আব একটু ঘুবে বসাব ফলে ব্যবধান সঙ্কীর্ণতব হল। উৎফুল্ল মুখে মহিলা বলে গেল, ইনডাস্ট্রিয়ালিস্টদেব সঙ্গে বন্ধুত্ব কবাব আমাব কত লোভ আপনি জানেন না, সত্যিকাবেব পুরুষকাব বলতে তো তাবাই। আপনাকে দেখেই আমাব মনে হয়েছিল একজন মানুষেব মত মানুষ আমাব ঘবে এলো। আমাব কত ভাগ্য আজ।

নিজেব ভাগ্যেব কথা ভেবে আমি কাঁপছি। হন্তদন্ত হয়ে তক্ষুনি কমল ঘবে ঢুকতে ঘাম দিয়ে জ্বব ছাড়ল আমাব। এগিয়ে এসে ও মহিলাকে জিজ্ঞাসা কবল, কেমন লাগল আমাব বন্ধুকে?

—ওযাণ্ডাবফুল!

—এই জন্যেই তো নিয়ে এলাম, চলো হে আজ আব সময় নেই। বলেই সে আবাব দবজাব দিকে পা বাড়ালো। আমি উঠে অনুসবণ কবাব জন্য ব্যস্ত।

দবজাব কাছে আসাব আগেই পিছন থেকে খপ একটা হাত ধবে ফেলল মহিলা। কমল ততক্ষণে ঘব থেকে বেবিয়ে গেছে। খুব কাছে এসে ফিসফিস কবে বলল, কাল আবাব আসবেন, আসবেন তো? একলা আসবেন, আমি আশায় বসে থাকব —ঠিক আসবেন?

মাথা নেড়ে বাজি হয়ে ঘবেব বাইবে পা দিয়ে বাঁচলাম আমি। কমল শুহ আগে আগে চলেছে। এই মুহূর্তে আমাব সব থেকে বাগ হচ্ছে ওব ওপব।

ওব আপিস-ঘবে আসাব পব গম্ভীব মুখে হাসি দেখলাম। জিজ্ঞাসা কবল, অক্ষত আছিস?

বললাম, তোব আসতে আব দু'মিনিট দেবি হলে হার্টফেল কবতাম। কী ব্যাপাব?

—নট এ ওযার্ড টু-ডে, আবাব কাল।

সত্রাসে বলে উঠলাম, কাল আবাব ওই ঘবে?

ও হাসতে লাগল, তুই একটা কাপুরুষ—ইজ'ন্ট সী বিয়েলি চার্মিং?

পবদিন বিকেলে কমল আবাব আমাকে ধবে নিয়ে গেল। কথা দিল, আজ আব আমাকে ফেলে ঘব ছেড়ে যাবে না। তাছাড়া আমাবও কৌতূহল ছিলই।

আজ দ্বিতীয় প্রস্থ বিস্ময। গতকালেব পবিচয মহিলাব মনেও নেই। কমল বলল, আমাব লেখক বন্ধু, আলাপ কবাতে নিয়ে এলাম। স্মৃতি গুপ্ত স্বাভাবিক মুখেই দুটি হাত জুড়ে নমস্কাব কবল, কি ভাগ্য, বসুন।

গলা খাটো কবে কমল যেন আমি শুনছি না এইভাবে মহিলাকে বলল, লিখে আবো কত নাম কবতে পাবত ঠিক নেই, বাড়িতে বড় অশান্তি, বউয়েব সঙ্গে এক

মুহূর্তের বনিবনা নেই...হয়ত ছাড়াছাড়িই হয়ে যাবে। বড় দুঃখের জীবন...

গতকালের বিপরীত দৃশ্য দেখলাম আমি। আমার দিকে মহিলা তাকলো একবার। আয়ত চোখে বিমনা ব্যথার ছায়া। প্রায় ফিসফিস করে কমলকে বলল, আ-হা! আমার কাছে এ-সব লোককে কেন আনেন বলুন তো, বড় মন খারাপ হয়ে যায়।

আজকের আলাপের মেয়াদ পাঁচ মিনিটও নয়। লেখার প্রসঙ্গেই দু-এক কথা জিজ্ঞাসা করল স্মৃতি গুপ্ত। আসার সময় শান্ত দু'চোখে আমার দিকে চেয়ে বলল, জীবনে শক্ত হয়ে যুদ্ধ করতে পারাটাও কম কথা নয়, বুঝলেন...তখন দেখবেন সব বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ হয়ে গেছে। তারপর কমলের দিকে একটু চেয়ে থেকে বলল, মুখ শুকনো দেখছি কেন, খাওয়া-দাওয়া হয়েছে, না সে-সময়ও হয় নি?

হেসে মাথা ঝাকিয়ে কমল আমাকে নিয়ে বেরিয়ে এলো।

সন্ধ্যার পর এক পেয়ালা কফি নিয়ে বসে কমলকে বললাম, এবারে কী আমাকেই তুই পাগল করে ছাড়বি? কৌতূহল আর কত সহ্য হয়?

পাইপ ধরাবার ফাকে কমল হাসল একটু। আমি প্রসঙ্গ বিস্তারের আশায় আবার বললাম, মহিলাকে বেশ শিক্ষিতা মনে হলো?

—হ্যা, এম-এ পাশ।..তা বয়েসকালে দেখতে কেমন ছিল মনে হয়?

জবাব দিলাম, বয়েসকাল তো এখনো মায়া কাটাতে পারে নি মনে হ'ল।

খুশি মুখে কমল মাথা নাড়ল। তারপর খুব চাছাছোলাভাবে একেবারে সংক্ষেপে যে ঘটনাটা ব্যক্ত করল, তাই শুনে আমি স্তম্ভিত।

স্মৃতি গুপ্ত ইউ-পি'তে থাকত। সেখান থেকেই এম-এ পাস করেছিল। তার বাবা সেখানকার ডাক্তার। ছেলেবেলায় দুই-একবার বাংলা দেশ, অর্থাৎ কলকাতা দেখেছে।

ভাবী এক সুপুরুষ স্মার্ট ছেলের প্রেমে পড়ল সে। নাম পরাশর দত্ত। সেই ছেলেরও কলকাতায় ব্যবসা—ডাক্তারি সরঞ্জাম আর পঙ্গু মানুষদের সরঞ্জাম সরবরাহ করে। নিজের হেলথ ক্লিনিক আছে।

পরাশর দত্ত যখন সেখানকার কলেজের ছোকরা, স্মৃতি গুপ্তর দিকে তখন থেকেই চোখ ছিল তার। কিন্তু স্মৃতি তখন ফ্রক ছেড়ে শাড়িও ধরে নি। আলাপ ছিল, প্রেম বোঝার বয়েস তখনো সেটা নয়। কিন্তু খুব চৌকস মনে হত ছেলেটাকে তখন।

ভাগ্যের সন্ধানে পরাশর ইউ-পি ছাড়ল। আট বছর বাদে এই ইউ-পি'তেই ব্যবসার কাজে এসে আবার যোগাযোগ। স্মৃতি তখন এম এ পড়ছে—সামনের বারে পরীক্ষা দেবে। আর পরাশর দত্তও তখন উঠতি অবস্থার মানুষ। দুজনে দুজনকে দেখে মুগ্ধ। স্মৃতিকে দেখে মুগ্ধ তখন অনেকেই। কিন্তু পরাশর আসাতে সকলে বরবাদ হয়ে গেল। ব্যবসার কাজে ঘন ঘন বার-দুই-তিন ইউ-পি আসার ফাঁকেই তাদের প্রেম জমাট বেঁধে গেল। তারপর বিয়ে।

স্মৃতির জীবনের সব থেকে সেরা কটা দিন কেটে গেল। পরাশর কলকাতায় ফিরল। স্মৃতি ছ'মাস বাদে এম-এ পাস করার পর্ব তাকে নিয়ে যাবে। তখন পরাশর

থাকে কলকাতার এক নামকরা হোটেলে। সেখানকার ঠিকানা হিসেবে একটা পোস্ট-অপিসের নাম লিখে দিল সে। তার চিঠিপত্র সব ওই পোস্ট-অফিসের কেয়ারে যায়। ব্যবসার তাগিদে প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষেই ঘুরতে হয় তাকে—কখন থাকে না থাকে ঠিক নেই। হোটেলের চিঠি মারা যায় বলে এই ব্যবস্থা।

এর পরের খানিকটা অংশ জানা গেছে পুলিশের রিপোর্ট থেকে।...অলক বিশ্বাস নামে একটা লোক সেই পোস্ট-অফিসে এসেছিল তাদের ব্যবসার অথবা সুধীর ঘোষের নামে চিঠিপত্র কী আছে সংগ্রহ করতে। পোস্ট-অফিসের লোক তাকে চেনে, সুধীর ঘোষের অনুপস্থিতিতে সেই এসে চিঠিপত্র নিয়ে যায়।

ব্যবসা এবং সুধীর ঘোষের নামে একগোছা চিঠিই ছিল। অলক বিশ্বাস দেখল তার সঙ্গে পরাশর দত্ত নামে একজনের একটা খাম ভুল করে এসে গেছে। খামের ওপরে মেয়েলি হাতের লেখাটা বড় সুন্দর মনে হল তার। বাইরে এসে খামটা খুলল। লিখেছে স্মৃতি নামে এক মেয়ে। বেশ চাপা উচ্ছ্বাসের ঝকঝকে চিঠি। বেশিদিন বিয়ে হয় নি বোঝা যায়।—নিজের এম-এ পাশের খবর দিয়েছে। তারপর লিখেছে, ওমুক দিন ওমুক গাড়িতে কলকাতা আসা স্থির করেছে। ছোট ভাইয়ের পরীক্ষা সামনে, তাই একলাই রওনা হতে হবে। চিঠির শেষ, 'পত্রপাঠ প্রাপ্তিসংবাদ পেলে আমি নিশ্চিন্ত মনে রওনা হব। তুমি অবশ্যই ঠিক সময়ে স্টেশনে থেকো। জ্ঞান-বয়সে তো কলকাতা দেখি নি, ট্রেন থেকে নেমেই তোমার মুখখানা না দেখতে পেলে তালকানা হয়ে যাব।'

অলক বিশ্বাস তিন দিন বাদে স্মৃতি দত্তর ঠিকানায় একটা টেলিগ্রাম পাঠালো। পরাশর যখন দত্ত, স্মৃতিও তখন দত্তই হবে। টেলিগ্রামের বয়ান: স্টার্ট—পরাশর।

ব্যবসার বারো আনার অংশীদার সুধীর ঘোষকে এ ব্যাপারে সে ঘুণাক্ষরেও কিছু জানালো না। তাদের ব্যবসায় কৃতিত্ব ভাগাভাগি করাটা রেওয়াজ নয়। তাছাড়া সুধীর ঘোষের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তার একটা চাপা বিরোধ চলেছে। জানলে ফোপরদালালী করবে। তারপর মেয়েটা যদি মনে ধরার মত না হয়, তাহলে ঠাট্টা-ঠিসারা করবে। কিন্তু কে জানে কেন, চিঠি পড়েই অলক বিশ্বাসের আশা, মনে ধরার মতই হবে মেয়েটা। তা যদি হয়, তাহলে সে-রকম শিকার ধরার বাড়তি প্রাপ্যও কম হবে না। অতএব পার্টনারের কাছে গোপন।

তারপরের ব্যাপারটা জল-ভাতের মত সহজে ঘটে গেল। উনিশশ' সাতচল্লিশের শুরু সেটা। উদ্বাস্তুর চাপে শিয়ালদহ স্টেশন তখন নরক। কলকাতার বহু জায়গাই নরক।

ট্রেন থেকে নেমে স্মৃতি চেনা মুখ দেখল না। উদগ্রীব মুখে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। আর দূর থেকে অলক বিশ্বাসের মনে হল—এই হবে। কিন্তু রূপ দেখে সে নিজেই হকচকিয়ে গেল প্রথম, ভরসা করে তক্ষুনি সামনে এগোতে পারল না। আরো খানিক বাদে নিঃসংশয় হয়ে ব্যস্তসমস্তভাবে তার কাছে এলো।—এক্সকিউজ মি, আপনি কি মিসেস স্মৃতি দত্ত?

স্টেশনের সেই নরকের মধ্যে চেনামুখ না দেখে স্মৃতি ভয়ানক উতলা হয়ে পড়েছিল। সাগ্রহে মাথা নাড়ল।

—সবি, আমাব একটু দেবি হযে গেল আসতে। মিস্টাব দত্ত মানে পবাশব দত্ত আমাকে পাঠিযেছেন। তিনি হঠাৎ বেশ অসুস্থ হযে পডেছেন, তাই আসতে পাবলেন না...চলুন।

বেশ অসুস্থ শুনে স্মৃতি ঘাবডে গেল—কী অসুখ?

—পেটেব নিচেব দিকে খুব যন্ত্রণা, চলাফেবা কবতে পাবছেন না। আপনি ঘাবডাবেন না, আসুন।

চিন্তিত মুখে স্মৃতি তাব সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠল।

অলক বিশ্বাসেব জীবনে আজ ভাগ্যেব সূর্যোদয যেন। বাবোআনাব মালিক সুধীব ঘোষ বাত সাডে আটটাব আগে আসবে না। সাডে আটটাব পব বাবু এসে মালিকেব আসনে জাঁকিযে বসে টাকা গোনেন। তাব ওপব আজ কোনো টোপেব আশায চন্দননগব গেছে। আগে এসে হাজিব হবাব কোনো সম্ভাবনাই নেই। ভালোই হযেছে। এ জিনিস দেখলে কিছুদিন অন্তত আব কাউকেই সে ধাবে-কাছে ঘেঁষতে দিত না। ও নিজেই একটা বাঘব বোযাল। আব একবাব বেশ সুশ্রী এক শিকাব ধবে আনাব পব এক মাস পর্যন্ত নিজেই তাকে গিলে বসে থাকল। এভাবে ব্যবসা চলে।...জাযগায গিযেই অলক বিশ্বাস অচিন্ত্য সবখেলকে টেলিফোনে আমন্ত্রণ জানাবে। অঢেল টাকাব মালিক অচিন্ত্য সবখেল। সবকাবী-বেসবকাবী মহলে তাব প্রবল প্রতাপ। কখনো বিপদেব গন্ধ নাকে এলে সে-ই তাদেব ত্রাণকর্তা। মেযেটাকে একবাব তাব কবলে ফেলে দিতে পাবলে নিশ্চিন্তি। সুধীব ঘোষ তখন 'নো-বডি'। অচিন্ত্য সবখেলেব কাছ থেকে সে আজ মোটা কিছুই খসাতে পাববে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

শৌখিন এলাকাব অনেক ফ্ল্যাটেব একটা বিশাল বাডিব দোতলায উঠে হেলথ ক্লিনিকেব সাইন বোর্ড দেখল স্মৃতি। তাকে তিনতলায নিযে এলো অলক বিশ্বাস। সুন্দব একটা সাজানো ঘবে এনে ঢোকালো। বাডিব মধ্যে এটাই সাউণ্ড-প্রুফ ঘব। বাইবে থেকে বা ভিতব থেকে গলা ফাটালেও দু'দিকেব কেউ শুনতে পাবে না।

তাকে বসতে বলে অলক বিশ্বাস বেবিযে গেল। পাঁচ মিনিট বাদেই এসে আবাব খবব দিল, মিস্টাব দত্ত গেছেন বেবিযামমিল এক্স-বে কবাতে, তাই ফিবতে দেবি হবে। মিসেস দত্ত চা-টা খেযে বেস্ট নিন, চান-টান করুন, মিস্টাব দত্ত ততক্ষণে এসে যাবেন।

বিভ্রাটেব কথা শুনে স্মৃতিব আবাব মুখ শুকালো। বলল, আমাকে সেখানে নিযে চলুন।

অলক বিশ্বাস সবিনযে বলল, কোন ডাক্তাবেব চেম্বাবে গেছেন তিনি তাদেব জানা নেই।

একটু বাদে বেযাবা চা ইত্যাদি দিযে গেল।—তাব চাউনিটা কি-বকম বিশ্রী লাগল স্মৃতিব। চা খেতে খেতে ঘবটা দেখেও অবাক লাগল একটু। সুন্দব শয্যা পাতা, বসাব শৌখিন আসবাব, ড্রেসিং টেবিল, টযলেট সেট—সবই আছে, কিন্তু ঘবে কোন বাক্স বা স্যুটকেস বা জামা-কাপডেব চিহ্নও নেই।...ভাবল, কোথায কোথায ঘোবে লোকটা, তাই এ-সব বাখাব জাযগাবও হযত ঠিক নেই।

ঘরের সঙ্গে সুন্দর বাথরুম। ক্লান্তি দূর করার জন্য বেশ কবে চান কবে নিল। দুপুরের দিকে সত্যিই বিচলিত সে। একলাই খেয়ে নিতে হল, বেলা তিনটে বেজে যায়—লোকটাব পাত্তা নেই।

বাত হওয়া পর্যন্ত তাব দুশ্চিন্তার বিবরণ বাদ দেওয়া যাক। বিকেলে বহুবার ঘর থেকে বেরুতে চেষ্টা করে দেখেছে—বাইবে থেকে বন্ধ। চিৎকার করেও সাড়া মেলে নি।

তাবপর নবক। শক্তিশালী একটা জঘন্য পুরুষেব সঙ্গে দিশেহাবার মত ধস্তাধস্তি কবতে হয়েছে ·তাকে। লোকটা আধঘণ্টার চেষ্টায কাবুই কবে ফেলেছিল তাকে, হঠাৎ দাঁতে কবে তাঁব বাহুব মাংস প্রায় ছিঁড়ে নেবার উপক্রম কবে কযেক মুহূর্তের জন্য মুক্তি পেয়েছিল সে। আর্তত্রাসে এবাব ছুটে এসে হ্যাণ্ডেল ঘোবাতেই দবজা খুলে গেছল। ত্রস্ত-বসনে আলুথালু অবস্থায পাগলেব মত নিচে ছুটল।

নিচেব সাজানো আপিস-ঘরে তখন সুধীব ঘোষ বসে। চাব আনাব পার্টনাব অলক বিশ্বাস সন্ধ্যে থেকে মনেব আনন্দে অঢেল মদ গিলে কোথায নিপাত্তা হয়ে আছে জানে না। এসে অন্য লোকেব মুখে শুনেছে বড় জবব শিকাব ধবে এনেছে পার্টনার আজ। এবং খানিক আগে অচিন্ত্য সরখেল সে-ঘবে গেছে।

সিঁড়িতে অস্ফুট কাতর শব্দ শুনে কান খাড়া হল তাব।

সামনে একটা আপিস-ঘর এবং আলো দেখে উদ্ধাবেব আসায আর্তত্রাসে প্রচণ্ড বেগে দবজা টেনে স্মৃতি ভিতরে ঢুকল, বাঁচান।

পরমুহূর্তে তড়িৎস্পৃষ্টের মত স্তব্ধ, পঙ্গু একেবাবে। মালিকেব চেযাবে বসে আছে পরাশর দত্ত, সহকর্মীরা সকলে য়াকে জানে সুধীব ঘোষ বলে। তাব সামনে মদেব বোতল, মদেব গেলাস—আর দু'পাশে বসে দুটো মেয়ে হাসাহাসি কবছে।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে পবাশব দত্তও বিমূঢ়, হতচকিত। মদেব নেশায ভুল দেখছে কিনা সেই বিভ্রম। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।—স্মৃতি তুমি। তুমি এখানে।

ভাবার অবকাশ পেলে স্মৃতি কী করত জানে না, কিন্তু সেই কযেকটা মুহূর্তেব মধ্যেই বুঝি তার মাথায সর্বনাশা কিছু ঘটে গেল। অস্ফুট আর্তনাদ করে ছুটে বেবিযে সোজা আবাব ওপবে উঠে গেল স্মৃতি। ঠাস কবে সাউণ্ড-প্রুফ ঘরেব দরজা বন্ধ কবে দিল আব্যব। ঘরেব মধ্যে সেই আহত বাঘ বসে তখনো।

তিনতলায় উঠে পাগলেব মতই পরাশব দত্ত দবজা ধাক্কাতে লাগল। দবজা খোলাব জন্য চিৎকাব করে ডাকাডাকি কবতে লাগল। ও-ঘরে কোন শব্দ ঢুকবে না নিজেই ভুলে গেছে।

...বেশি রাতে সেই ঘর থেকে, সেই নরককুণ্ড ছেড়ে স্মৃতি অচিন্ত্য সরখেলেব সঙ্গেই বেরুতে পেরেছিল। দাঁতেব কামড় খেযে হোক বা এমন এক দুর্লভ বস্তু লাভের আনন্দে হোক, এই বারোয়ারি জায়গায তাকে ছেড়ে যেতে অচিন্ত্য সরখেলেব মন সবে নি। যাবার আগে জিজ্ঞেস করেছে, তুমি যাবে আমাব সঙ্গে? ...এখানে থাকিলে তোমার ওপর বেশি অত্যাচার হবে, এর থেকে তোমাকে অনেক ভালো জায়গায় রাখতে পারি।

নির্জীব কলের পুতুলের মত স্মৃতি মাথা নেড়েছে, যাবে।

পরাশর দত্ত অন্যথায় সুধীর ঘোষের চোখের ওপর দিয়েই স্মৃতিকে নিজের গাড়িতে এনে তুলেছে অচিন্ত্য সরখেল। বলেছে, একটু টু-টা করলে তাকে হাজতে গিয়ে পচতে হবে।

নিস্পন্দ পরাশর দত্ত টু-টা করে নি।

হতচেতনের মত চার রাত্রি এক নামকরা হোটেলে কাটিয়েছে স্মৃতি। প্রতি সন্ধ্যায়ই অচিন্ত্য সরখেল এসেছে। যাবার আগে মোটা টাকাও গুঁজে দিয়ে গেছে। সে এত খুশি যে সর্বস্ব দিতে পারে।

তারপর মাথায় খুন চেপেছে স্মৃতির। হোটেল থেকে বেরিয়ে থানায় এসেছে। কিন্তু সুধীর ঘোষ বা পরাশর দত্ত পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছে। ধরা পড়েছে অলক বিশ্বাস।

সেই থেকে দিনের পর দিন বছরের পর বছর আক্রোশের জ্বলন্ত আগুন মাথায় নিয়ে কলকাতার রাতের অভিসারে পা বাড়িয়েছে স্মৃতি দত্ত—না দত্ত নয়, তখন আগের পদবী ব্যবহার করে সে—স্মৃতি গুপ্ত। একটিমাত্র নেশা তার, সখের ঘর ভাঙাবে। অনেক ভেঙেছে—অনেক।

কিন্তু সেই সঙ্গে মাথার গোলযোগও বেড়েই চলল। শেষের দিকে এক শাঁসালো মাড়োয়ারীর কাছে ছিল। মস্তিষ্কের বিকৃতি অসহ্য হয়ে ওঠা সত্ত্বেও লোকটার নেশা ঘোচে নি। স্মৃতি ভালো হবে এই আশায় বহু পয়সা খরচ করে সে-ই তাকে এই হাসপাতালে রেখে যায়। কিন্তু চোখের বার হলে মনের বার, কতদিন সে আর পাগলের আশায় এই হাতির খরচ টানবে। দু'বছর হয়ে গেল—সে আর খরচাপত্রও দেয় না, খবরও নেয় না।

কতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম জানি না। এক সময় জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে এখন খরচ চালাচ্ছে কে?

নতুন করে পাইপ ধরাতে ধরাতে কমল গুহ জবাব দিল, আমি।

আমি অবাক।—তুমি কেন?

—কে জানে। একটু বিমনা দেখলাম ওকে, বলল, পিকিউলিয়ার কেস, কিন্তু সারার আশা আছে। আগের থেকে এখন অনেক ভালো।. .তাছাড়া, স্ত্রীর সঙ্গে আমার ডাইভোর্সের মামলা চলছে শোনার পর থেকে এক অদ্ভুত মায়া পড়ে গেছে মহিলার—একমাত্র আমি ছাড়া হাসপাতালের আর কোন লোককে সে সহ্য করতে পারে না। ডাইভোর্স হয়ে গেছে জানার পর মায়াটা আরও বেড়েছে—আমাকে একটা অসহায় শিশু ভাবে।

আমি নীরব। বার-কয়েক পাইপে টান দিয়ে কমল হঠাৎ আমার দিকে ফিরল। —কিন্তু তারপর?

আমি তারই প্রশ্নের পুনরুক্তি করলাম, তারপর কী?

উঠে ঘরের এ-মাথা ও-মাথা পায়চারি করল বার-দুই। তারপর দেশের নামজাদা এক মনোবিজ্ঞানী ডাক্তার কমল গুহ আমার চেয়ারের সামনে ঝুঁকে দাঁড়াল।—আমিও তো তাই জিজ্ঞেস করছি, তারপর কী? হোয়াট্‌ নেক্সট?

ঘৃণা

রোজই রাত ন'টা নাগাদ টার্মিনাস থেকে বাসে উঠি। ফেরার সময় তাই সপ্তাহের বেশির ভাগ দিন ওই লোকটার বাস জোটে। দোতলা স্টেট বাসের একতলার কণ্ডাক্টর সে।

প্রায়ই তার বাসে উঠি বলে মুখ-চেনা। তার কর্কশ স্বভাবের দরুনও মুখ-চেনা। উঁচু লম্বা চেহারা, চওড়া বুকের ছাতি। মাথায় ঝাঁকড়া চুল। রুক্ষ চোয়াড়ে মুখ। গায়ের রং তামাটে, কালচে। পরনে ময়লা খাকি প্যান্ট, গায়ে বুকখোলা খাকি কোর্তা—ভিতরের বিবর্ণ তেল-চিটে গেঞ্জিটা চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক।

আমার মনে হত কণ্ডাক্টরি করতে হয় লোকটার সেই রাগ রাজ্যসুদ্ধ যাত্রীর ওপর। একদিন আমার সঙ্গেই লেগে গেছল একটু। টিকিট চাইতে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার কাছে দশটা টাকার চেঞ্জ হবে?

—না। খুচরো না নিয়ে ওঠেন কেন?

আমিও রুক্ষ জবাব দিলাম, খুচরো নিয়েই উঠেছি। দরকার ছিল বলে আছে কিনা জিজ্ঞেস করেছিলাম। একটা সিকি তার হাতে দিলাম।

প্রায় শেষ প্রান্তের যাত্রী আমি, পঁচিশ পয়সাই ভাড়া। লোকটা টিকিট দিয়ে চলে গেল। একটু বাদেই ফিরে এসে হাত বাড়ালো, দিন—।

আমি মাথা নাড়লাম।—দরকার নেই, আপনার ব্যবহারেই খুশি হয়েছি।

লোকটার অপ্রসন্ন দু'চোখ আমার মুখের ওপর থমকালো। বলল, এ চাকরি করলে আর ব্যবহার মোলায়েম রাখা যায় না, বুঝলেন? ওই দেখুন, দেখুন বাস গড়ের মাঠ আর উনি গেটে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছেন। ও মশাই, বলি ভিতরেও হাওয়া খাওয়ার জায়গা আছে, উঠে আসুন।

টেরিলিন পরা গেটে-দাঁড়ানো শৌখিন তরুণটি মুখ লাল করে উঠে এসে বলল, ভদ্র ভাষায় কথা বলতে পারেন না?

লোকটা দু'পা এগিয়ে তার ওপর দিয়ে গলা চড়ালো—অপর লোকের সুবিধে-অসুবিধের কথা না ভেবে আপনি উঠেই গেটে গ্যাঁট হয়ে দাড়ালেন—তার পরেও ভদ্র ভাষা যোগাতে পারলে তো ভাষার পণ্ডিত হয়ে বসতাম, বাসের কণ্ডাক্টরি করতে আসব কেন?

অনেকে হেসে উঠেছিল।

আর একদিন তো গোটাকতক ছোকরা যাত্রীর সঙ্গে হাতহাতি শুরু হয় আর কি। সামনের লেডিস সীট-এর দিকে গিসগিস ভিড়, পিছনের দিকটা অপেক্ষাকৃত ফাকা। লোকটা ঘেমে নেয়ে বারপাঁচেক ডেকে উঠেছে, পিছনে চলে আসুন না মশাইরা, সব ওদিকে ভিড় করছেন কেন?

কে কার কথা শোনে। শেষে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে লোকটা অল্পবয়সী কটা ছেলের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, ওদিকে এত কী আনন্দ মশাই আপনাদের—ভিড়ের চোটে আধমরা হবার দাখিল, তবু ওখানেই দাঁড়িয়ে আনন্দ করা চাই—এদিকে সরে আসতে পারেন না?

ব্যস, এই থেকেই হাতাহাতি লাগে আব কী। গবম বচসাব ফলে কণ্ডাক্টবেব মুখ দিযে আবো যে কথা বেরুলো, তাই শুনে ওদিকেব মহিলাদেব মুখ লাল হবাব কথা। ভিড়েব দরুন তাদেব মুখ দেখতে পাইনি।

কণ্ডাক্টবেব স্ব-পক্ষেও জনাকতক যাত্রী বচসায যোগ দেবাব ফলে সে-যাত্রা সত্যিকাবেব হাতহাতিটা হল না। টিকিট দেখতে চাওযা, ঘণ্টা দেওযা ইত্যাদি ব্যাপাবে লোকটাব রুক্ষ ব্যবহাব আমি আবো দিন-কযেক লক্ষ্য কবেছি। আমাব ধাবণা, এব দরুন লোকটাকে যাত্রীদেব হাতে একদিন না একদিন নিগ্রহ ভোগ কবতে হবে।

সকলেব সেটা ছুটিব দিন। আমাদেব কাগজেব অফিস খোলা। ঝমঝম বৃষ্টিব ফলে বেরুতে সেদিন বাত দশটা হযে গেল। টার্মিনাসেব বাসে উঠে দেখি সেই লোকটাবই বাস।

বাস ফাঁকা। মাত্র পাঁচ সাতজন লোক। কণ্ডাক্টব একেবাবে পিছনেব আগেব সীটটাতে বসে নিবিষ্ট মনে সমবযসী এক ভদ্রলোকেব সঙ্গে কথা কইছে। তাদেব ঠিক পিছনেব কোণেব সীটটাতে আমি বসলাম। ফাকা বাস পেলে ওই সীটটাই আমাব পছন্দ।

বসাব পবেই যে কথা কানে এলো তাতে বোঝা গেল অনেক দিনেব পুবনো বন্ধু তাবা এবং অনেক দিন বাদে দেখা হযেছে। আমি বসতে বসতে শুনলাম, ভদ্রলোক বলছে, তোব ভাইদেব কাবো কাবো সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা হয, তোব কথা জিজ্ঞেস কবলে ভালো কবে জবাবই দেয না—প্রায চাব বচ্ছব বাদে দেখা হল তোব সঙ্গে, মনে কবে একবাব এলেও তো পাবিস।

জবাবও কানে এলো।—এ ঘণ্টাব চাকবিতে জান কযলা হযে গেল, সময পাই কোথায বল। তাব ওপব ফাক পেলেই মুদি-দোকানে বসতে হয, নইলে ভগ্নিপতিটিব তো কুমীবেব পেট—কড়া চোখ না বাখলে দেবে সব সাবাড়ে।

কণ্ডাক্টব আমাব দিকে পিছন ফিবে বসে আছে। তাব বন্ধুব মুখ সামনেব দিকে। আমাব মুখ বাইবেব দিকে। বন্ধু জিজ্ঞেস কবল, ভগ্নিপতিব সঙ্গে শেযাবে বিজনেস বুঝি?

—বিজনেস। কণ্ডাক্টবেব গলায একটু যেন কৌতুক ঝবল।— পাঁচ হাত বাই পাঁচ হাত চালাব নীচে কিছু মশলাপাতি, তেল, নুন, আলু, কযেক হাড়ি গুড, কিছু দড়ি-দড়া আব কিছু আতপ চাল—প্রকাণ্ড বিজনেস। তবু সমযে ওটুকু কবেছিলাম বলে গুষ্টিসুদ্ধু উতবে গেলাম। হ্যাঁ ভগ্নিপতিই দেখছে এখন, চাব আনা শেযাব পায আব কম কবে চাব আনা চুবি কবে।

হুইসল বাজতে সে বসে বসেই হাত তুলে দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজালো। গাড়ি ছেড়ে দিল। একবাব ঘুবে বসে আমাব টিকিটটা কেটে নিল। টিকিট কাটা হযনি এমন যাত্রী আব কেউ আছে কিনা দেখল। তাবপব বন্ধুব দিকে ফিবে বসল আবাব।

এবপব বাসস্টপ এলে যন্ত্রচালিতেব মতই ঘণ্টা দিচ্ছে, গেট দেখছে। দুই-একজন যাত্রী নামছে, দুই-একজন উঠছে। আলাপেব ফাঁকেও লোকটাব সেদিকে চোখ আছে। উঠে টিকিট কেটে আবাব বন্ধুব কাছে এসে বসছে।

এবাবে তাদেব অনুচ্চ মোট সংলাপটুকুব একটা চিত্র আঁকাব বসনা।

বন্ধু: "জমিটা তোব নিজেব শুনলাম?"

কণ্ডাক্টব: "হুঃ, একেবাবে জমিদাব বলতে পাবিস। কলকাতা থেকে সতেব মাইল দূব, এই তো এগাবোটাব ডিউটি শেষ হলে বাত্রি দেড়টায পৌছুব।...তবু সেই হুজুগেব সময ধাব-ধোব কবে আড়াইশ' টাকায দু'কাঠা জমি কিনে ফেলেছিলাম বলে ফুটপাথে থাকতে হচ্ছে না।"

"পাকা দালান তুলেছিস?"

"আটচালাব ইমাবৎ—ওই বক্ষা কবতে প্রাণান্ত। কবে ফিবে দেখব সব সমান হযে গেছে।"

"কেন?"

"স্বাধীন হযেছি না আমাবা এখন? কথায কথায দিনেদুপুবে বুকে পিঠে ছুবি আব মাথায ডাণ্ডা। আমাদেব শালা মবণ-দশা, বামে মাবলেও মাববে, বাবণে মাবলেও মাববে। কতজন তো হুমকি দিযে বেখেছে—দেখে নেবে।"

"কেন?"

"কাবণ দবকাব হয না, কাবণ সব্বাই নিজেবাই তৈবী কবে নেয। মদ খাবাব চাঁদা দিতে আপত্তি কবলে তোমাব পেট ফেঁসে যেতে পাবে।"

স্বল্পক্ষণেব বিবতি। উঠে দুটো টিকিট কাটা, ঘণ্টা বাজানো এবং ফিবে এসে বসা।

বন্ধু: "যাক, ছেলে-পুলে কী তোব বল দেখি?"

কণ্ডাক্টব: "একটা মেযে।"

"সেকি বে! প্রেম কবে মেযেটাকে মামাব খপ্পব থেকে বাব কবে পালিযে নিযে গিযে কত কাণ্ড কবে, বিযে—তাবপব এতদিনে মাত্র একটা মেযে।"

"ওই সামলাতে প্রাণান্ত।"

"কেন, তোব পবেব ভাই দুটো তো দাঁড়িযে গেছে।"

"দাঁড়িযে বুদ্ধিমানেব মত সবে গেছে। মেজটাকে আই-এ পবীক্ষাব পব স্টেনোগ্রাফি পাশ কবিযেছিলাম, আব সেজটাকে স্কুল ফাইন্যালেব পবে টেকনিকাল স্কুলে ঢুকিযেছিলাম। দুজনেই ভালো কবছে এখন। ওদেব মুখ চেযে আশায আশায কতদিন একবেলা খেযে কাটিযেছি আমি আব বউ। যাক গে, ভাল থাক—।"

"তাব পবেব জন?"

"চেষ্টাচবিত্র কবে বি. কম. পড়াচ্ছি, সামনেব বাব পবীক্ষা দেবে।...ওটা বোকা, থাকলে থেকেও যেতে পাবে। ওব বউদিকে খুব পছন্দ।"

"ছ'ভাই তো তোবা, তাব পবেও তো দুটো আছে।...তোব কাছেই থাকে, না?"

"হ্যাঁ, যাবে আব কোন চুলোয।...ওবা ছোট, স্কুলে পড়ছে আব কু-সঙ্গে মিশছে। এক-একদিন ধবলে আধ-মবা কবে ছাড়ি, কিন্তু দিনেব হাওযা যাবে কোথায।"

"আচ্ছা, তুই ভাইদেব জন্য এত কবলি, মাযেব জন্যে যা কবেছিলি সে তো নিজেব চোখেই দেখেছি...মাঝখান থেকে শেষ বযসেও তোব বাবাকে এত কষ্ট দিলি কেন?"

"তোকে কে বলল ?"

"তোর পরের ভাই দু'জনের মুখে শুনেছিলাম। খুব দুঃখ করছিল, শেষ সময়েও তুই নাকি অমানুষের মত ব্যবহার করেছিস।...কেন বল তো ? শেষ পর্যন্ত তো মরেই গেল ভদ্রলোক—"

রুক্ষ জবাবটা ঠাস করে কানে লাগল আমার।—"মরে তো সকলেই যাবে, কে আর চিরদিন বেঁচে থাকবে।"

কলেজ স্ট্রীটের কাছে কিছু লোক উঠল। তাদের মধ্যে সাতজনের একটা গোটা পরিবারও আছে। স্বামী-স্ত্রী আর তেরো থেকে ছয়ের মধ্যে পাঁচটি ছেলেমেয়ে। তাদের পিছনে আরো পাঁচ-সাতজন লোক উঠেছে। ফাঁকা বাস, সকলেরই বসার জায়গা মিলেছে।

গাড়ি ছাড়ার ঘন্টি বাজিয়ে কণ্ডাক্টর টিকিট কাটতে এগলো। তারপর বচসা শুরু হল সেই পরিবারটির টিকিট সংগ্রহ করতে গিয়ে। মাঝ-বয়সী সেই ভদ্রলোকটি পাঁচখানা কালীঘাটের টিকিট কেটেছে।

—এদের টিকিট ? কণ্ডাক্টর ছোট ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখালো।

ভদ্রলোক বিস্ময়ের ভান করল, ওদের আবার টিকিট কী।

—ওদের তাহলে নামিয়ে দিই ?

ফলে বাসসুদ্ধ লোকের কান খাড়া হল। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, ছেলেমেয়েগুলো রোগা-রোগা, ভদ্রলোক আর বউটাও রোগা। সকলেরই বেশ-বাসে দৈন্যের ছাপ।

ভদ্রলোক বলল, ওইটুকু ছেলেমেয়ে, নামিয়ে দেবেন কি-রকম।...ওদের তো কোনসময়ে টিকিট কাটি না।

—অন্যায় করেন। কণ্ডাক্টর হাত বাড়ালো, আর দুটো টিকিটের দাম দিন।

নিরুপায় মুখ করে ভদ্রলোক পকেট থেকে আর একটা টিকিটের ভাড়া তার হাতে দিয়ে সুর পালটে বলল, আচ্ছা ওদের দু'জনের জন্য আর একটা টিকিটি নিন...বুঝতেই তো পারছেন অসুবিধে হচ্ছে।

জবাবে অপ্রত্যাশিত রূঢ় ব্যবহার কণ্ডাক্টরের। বলল, অসুবিধে হলেও বাসে যখন উঠেছেন, আর একটা টিকিটের দাম দিতে হবে। দিন—

এ রূঢ়তা অনেকের কানে বিঁধল। ছেলেমেয়েগুলো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে, বউটারও বিব্রত মুখ। একজন সহানুভূতিসম্পন্ন প্যাসেঞ্জার বলে উঠল, ভদ্রলোক মুখ ফুটে বলছেন, দিন না ছেড়ে—

কণ্ডাক্টর তার দিকে ফিরল, তাহলে আপনি মুখ ফুটে বললে তো আপনার টিকিটও ছেড়ে দিতে হয়।

প্যাসেঞ্জারটির সঙ্গে সঙ্গে আরো দু'জন বলে উঠল, খুব চ্যাটাং চ্যাটাং বুলি ঝাড়ছেন যে মশাই,—খুব ডিউটি দেখাচ্ছেন, কেমন ?

—আমি দেখাচ্ছি না, আপনারাই আমার ডিউটিতে বাধা দিচ্ছেন।

এ-ধার থেকে একজন চেঁচিয়ে উঠল, কেমন ডিউটিফুল আপনারা খুব জানা আছে মশাই !

কণ্ডাক্টবেব তামাটে মুখ কঠিন। কোনদিকে ভ্রক্ষেপ না কবে তেমনি হাত বাডিযে বলল, কী, আপনি আব একখানা টিকিটেব দাম দেবেন, না আমি গাডি থামিযে দেব?

বেগতিক দেখে এবাবে লোকটি বিমর্ষমুখে আব একখানা টিকিটেব দামও দিযে দিল। সঙ্গে সঙ্গে এধাব-ওধাব থেকে নানা ধবনেব টীকা-টিপ্পনী শুরু হল। কণ্ডাক্টবেব কানে তুলো, থমথমে মুখে টিকিট দিযে সে আবাব তাব বন্ধুব সামনে এসে দাঁড়াল।

লোকটাব এই হৃদযহীনতা কাবোবই ভালো লাগেনি। তাব বন্ধুটিবও খুব খুশি মুখ নয।

চাপা বাগে চাপা গলায কণ্ডাক্টব গবগব কবে উঠল, বাসে উঠে টিকিটেব পযসা দেবাব মুবোদ নেই, তাব চাব-পাঁচটা ছেলেমেযে—লজ্জাও কবে না।

জ্বলন্ত চোখে ওই পবিবাবটিব দিকে একদফা অগ্নিবর্ষণ কবল সে।

ঠিক সেই মুহূর্তে আমাব চোখেব সামনে থেকে একটা পর্দা সবে গেল। কণ্ডাক্টবেব বেশবাসেব আডালে এই প্রথম সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা মানুষকে আমি দেখতে পাচ্ছি। ...নিজেব এতবড সংসাবেব সমস্ত দাযিত্ব বহন কবেও কেন সেই লোকটা শুধু তাব বাপকে কষ্ট দিযেছে, মৃত্যুব পবেও ক্ষমা কবেনি—এই রুক্ষ মুখেব দিকে চেযে যেন সেই জবাবও স্পষ্ট হযে উঠতে লাগল।

পরিতাপ

আমাব ধাবণা, বিচাবে লোকটাব ফাঁসী হবে, নযত দ্বীপান্তব হবে।

দুটোব একটা যাতে হয, পুলিস সে চেষ্টায সৃতৎপব। এই তৎপবতাব দরুনই মঙ্গলেব সঙ্গে দেড বছব বাদে আমাব আবাব যোগাযোগ।

পুলিসেব তদন্তসাপেক্ষে ওকে যেখানে আটকে বাখা হযেছে সেখানকাব ভাবপ্রাপ্ত অফিসাবটিব সঙ্গে আমাব দীর্ঘদিনেব আলাপ। কাগজেব অফিসেব চাকবিব দরুন হোক বা ভদ্রলোক নাট্যবসিক এবং আমি লেখক বলে হোক, আলাপটা মোটামুটি অন্তবঙ্গমুখী। এঁব কাছে গেলে অনেক সময লেখাব মত অনেক বিচিত্র বসদ মেলে। তাঁব দখলেব আবাসটিও আমাব বাডি থেকে দূবে নয।

সেদিন সকালে ভদ্রলোক আমাব বাডিতে হাজিব। অবকাশ পেলে সাধাবণত আমিই তাঁব ওখানে গিযে থাকি। এসেই সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কবলেন, হ্যা মশাই, মঙ্গল দাস নামে একটা লোককে আপনি চিনতেন?

চট কবে ওই নাম বা নামেব কোন মুখ স্মবণে এলো না। ভেবে বললাম, মনে পডছে না তো।

সে তো আপনাব নাম খুব ফলাও কবে বলল, আপনি নাকি তাঁব অনেক উপকাব কবেছেন...তাব বদলে সে আপনাব কিছু উপকাব কবেছে—আপনাব দামী ঘডি, দামী পেন, জামাব সোনাব বোতাম আব পকেটেব কিছু টাকা নিযে সবে পডেছিল।

মঙলা। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল প্রতি মাসেব গোড়ায পদ্মমণিকে টাকা পাঠাত যখন, প্রেবকেব নাম মঙ্গল দাসই লেখা হত বটে। মণি-অর্ডাব আমিই লিখে দিতাম। কিন্তু ওই নামে বোর্ডিংযেব কেউ তাকে চিনত না। সকলেই হাঁক দিত মঙলা বলে। নতুন বোর্ডাব এসে নাম জিজ্ঞাসা কবলে ও নিজেও এই নামই বলত। আব দুদিন না যেতেই নতুন বোর্ডাব টেব পেত, মঙলা সেখানকাব একটি বিশেষ চবিত্র—আব পাঁচটা চাকব-বাকবেব মত হেলাফেলা বা অবজ্ঞাব পাত্র নয।

আমাদেব বোর্ডিংযে বেকাব বা আধা-বেকাবেব বাস ছিল না। সবাই মোটামুটি ভালো উপার্জনশীল। একবাব এক আত্মাভিমানী প্রায-নতুন বোর্ডাবেব মুখেব ওপব ও কী একটা জবাব দিযে বসেছিল, ফলে ঠাস কবে গালেব ওপব এক চড়। জবাবে স্তব্ধ চোখে মঙলা তাব দিকে চেযে ছিল শুধু। এই ঔদ্ধত্যেব জন্যেও নবীন ভদ্রলোক দ্বিতীয দফা তেড়ে এসেছিল। তাব আগেই অন্য বোর্ডাববা হা-হাঁ কবে ছুটে এসে তাকে ধবে ফেলেছিল। তেমনি নিষ্পলক তাব দিকে চেযে থেকে মঙলা শুধু বলেছিল, এখন থেকে নিজেব জন্য আপনি ভগবানেব কাছে প্রার্থনা কববেন।

এই কথা শুনে আব অন্য বোর্ডাবদেব বিচলিত হাবভাব দেখে চাকবি-গর্বী আধা-নতুন বোর্ডাবটি মনে মনে ঘাবড়েছে। পবে সতীর্থদেব মুখে মঙলা-সমাচাব শুনে মুখ আমসি। সকলেব এক কথা, কবলেন কী মশায, এখন সামলাবেন কী কবে। ওব দলেব কানে তো পৌছুল বলে!

ওব দল বলতে এই এলাকায ওদেব শ্রেণীব ছন্নছাড়াদেব গোষ্ঠী। ওদেব মধ্যে অনেকে বাড়ি আব হোটেলে বোর্ডিংযে চাকবি কবে, অনেকে আবাব কিছুই কবে না, উপার্জনেব আশায নানা বকমেব বাঁকা বাস্তায ঘোবা-ফেবা কবে। এ-বকম একটা দলেব ও মাতব্বব হযে বসল কী কবে সঠিক খবব বাখি না। বোজ দুপুবে সামনেব পার্কেব একটা চাতালে ওদেব জুযাব আড্ডা বসে। আমাব ধাবণা, এই থেকেই মঙলা ওদেব পাণ্ডা। গোড়ায ওকে দুই-একবাব সাবধান কবেছি, তোমাকে পুলিশে ধবল বলে। ও তাচ্ছিল্যভবে জবাব দিযেছে, পুলিশ নিজেব ক্ষেতি কববে কেন, তাব ট্যাকেও দু'পযসা আসছে।

তবে ওই মঙলাই আমাকে আশ্বস্ত কবেছিল, এখন আব সে জুযা-টুযা খেলে না, আড্ডায গিযে বসে এইমাত্র, নইলে ছোঁড়াগুলো নিজেদেব মধ্যে কাটাকাটি খাওযা-খাওযি কবে। একদিন সে ওদেব থেকেও অনেক বড় বদমাস ছিল, এখন ভালো হতে চায বলেই চাকবি কবছে আব জুযাখেলাও বলতে গেলে ছেড়েই দিযেছে।

ওব এই সুমতিব কিছু কিছু কাবণ আমাব জানা আছে। সেটা পবেব প্রসঙ্গ। যাক, ওব সমাচাব শোনাব পবেও সেই আত্মাভিমানী নব্য বোর্ডাবটি ভয গোপন কবে ঝাঁঝিযে উঠতে চেষ্টা কবেছিল, এ-বকম একটা বাফিযানকে বোর্ডিংযে বাখা হযেছে কেন—পত্রপাঠ তাড়িযে দেওযা উচিত আব পুলিসেও একটা খবব দিযে বাখা উচিত।

একজন বলে উঠেছিল, উচিত কাজ নিযে মাথা ঘামানোব আগে নিজেব মাথাখানা বাঁচাবাব কথা ভাবুন মশাই। বলা নেই কওযা নেই, আপনি গাযে হাত তুলতেই বা গেলেন কেন? এখনো সেই বামবাজত্বে আছেন ভাবেন?

সন্ধ্যেনাগাদ সতীর্থরাই তাকে আমার কাছে আসার পরামর্শ দিয়ে পাঠিয়েছে বোঝা গেল। তাদের ধারণা, এরপর আমিই বলে-কয়ে মঙলার মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারি, অন্যথায় বিপদ অনিবার্য। ভয়ে ত্রাসে ভদ্রলোক মুষড়ে পড়েছে। অগত্যা মঙ্গলাকে ঘরে ডেকে বললাম, বাবু একটা অন্যায় কাজই করে ফেলেছেন, তুমি কিছু মনে রেখো না।

ড্যাবড্যাব করে খানিক মুখের দিকে চেয়ে থেকে ও জিজ্ঞেস করল, আপনি ওনার মঙ্গল চান?

না চাইলে তোমাকে ডাকলাম কেন?

চাহিবেন বৈকি বাবু, আপনিও ভদ্দর লোক, আর একজন ভদ্রলোক একটা ছোটলোকের গায়ে হাত তুলেছে এ আর এমন কী কথা।

ফাঁকে পেলে ও আমাকে অনেক রকমের নীতিকথা শোনায়। কিন্তু এ কথার ধার অন্যরকম। মুখে বিরক্তির ভাব এনে বললাম, তাহলে কী করতে হবে এখন?

আড়চোখে একবার ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে ও জবাব দিল, ওর ভালো চাইলে কাল সকালের মধ্যে ওঁকে এখেন থেকে চলে যেতে বলুন।

রাগ হচ্ছিল বটে, কিন্তু মঙলাকে যে চেনে সে নির্বোধের মতো রাগ করবে না। পাংশুমূর্তি ভদ্রলোকের দিকে ফিরে আমি বললাম, ঠিক আছে, কাল সকালে আমি আপনি দুজনেই চলে যাব এখান থেকে।

এবারে মঙলা থমকালো একটু। থমথমে মুখে একবার আমার দিকে আর একবার ভদ্রলোকের দিকে তাকালো। তারপর হনহন করে দরজার ওধারে চলে গিয়েও অসহিষ্ণু ক্ষোভে ফিরে এলো আবার। শরণাপন্ন বোর্ডারটির দিকে চেয়ে গরগর করে উঠল, দিনকাল খারাপ, হাত নিশপিশ করলেও হাত দুটোকে বশে রাখতে শেখেন। আমার দিকে ফিরে অভিমানাহত ঝাঁঝে বলে গেল, গরিবের আপনজন কেউ নেই, সবাইকেই জানা আছে আমার—কাউকেই যেতে হবে না এখান থেকে।

এই মঙলা।

বিস্ময় চেপে পুলিশ অফিসারকে জিজ্ঞেস করলাম, চুরির চার্জ নাকি?

মাথা নেড়ে পুলিশ অফিসার জবাব দিলেন, একেবারে প্রাণ চুরি—মার্ডার চার্জ।

চমকে উঠলাম। নিজের অগোচরে আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কী সর্বনাশ, গৌরী দাসীকে?

ভদ্রলোক নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসলেন।—আপনি জানলেন কী করে?

আমি বিমূঢ়। কী ফ্যাসাদ ঘটালাম কে জানে।

পুলিশ অফিসারটির দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্য। তারপর মুখে হাসি ঝরল। বললেন, যা জানেন, বন্ধু হিসেবে খোলাখুলি বলুন—তাতে বরং লোকটার কিছু উপকার হতে পারে... এভিডেন্স যা, তাতে ওর অব্যাহতির আশা কম। অথচ লোকটার হাবভাব কেমন পিকিউলিয়ার...নট লাইক এ সীজনড ক্রিমিন্যাল। কিন্তু মার্ডার শুনেই আপনার গৌরী দাসীর নাম মনে এলো কেন?

সত্যি জবাবই দিলাম—বোর্ডিং-এ থাকতে ও শাসাতো ওই একটা মেয়েছেলেকে ঠিক একদিন খুন কবে বসবে। বলত, ভগবান যেন তাব হাত থেকে ওকে বক্ষা কবেন।

পুলিশ অফিসাব বললেন, বক্ষা কবেনি, ওই গৌবী দাসীই তাব নিজেব বস্তিঘবে খুন হয়েছে। ঘড়ি দেখে উঠে দাঁড়ালেন।— জরুবী কাজ পড়েছে, যেতে হবে...বিকেলেব দিকে আমাব অফিসে আসুন একবাব, এ নিয়ে একটু আলাপ-আলোচনা কবা যাবে। বোর্ডিংযেব চাকবিব আমলে কে ভালো চিনত জিজ্ঞেস কবতে মঙ্গল দাস প্রথমেই আপনাব নাম কবল, আব আপনাব কী কী চুবি কবেছিল তাও কবুল কবল। আপনি নাকি ইচ্ছে কবলেই তাকে ধবাতে পাবতেন, কিন্তু ধবান নি। ভয়ানক শ্রদ্ধা আপনাব ওপব। আপনাব সঙ্গে আমাব খাতিব আছে শুনেই একবাব দেখা কবিয়ে দেবাব জন্য দু'হাত জুড়ে আকূতি। নিযম নেই, বাট আই মে ট্রাই, আসুন তো একবাব বিকেলে—

চোখেব সামনে একদিনেব ছবি ভেসে উঠল। বোর্ডিংযেব বাজাব সেদিন আমাব হাতে। বাজাব কবে ফিবছিলাম—মঙলাব দু'হাতে দুটো বড বোঝা, পিছনে মুটে। মঙলা হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল।

অদূবে একটা ভিখিবি গোছেব লোক তাব সাত-আট বছবেব একটা ছেলেকে বেদম মাবছে। মাব খেযে ছেলেটা ফুটপাতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, কিন্তু তবু বাপেব বাগ কমছে না।

মঙলা হঠাৎ হনহন কবে এগিযে গেল। তাবপব হাতেব বোঝা মাটিতে বেখে হাড-জিবজিবে লোকটাব ঝাকড়া চুলেব মুঠি ধবে ঠাস ঠাস কবে দুই গালে দুটো পেল্লায় চড়। কাছাকাছি যাবা ছিল সকলে হতভম্ব, এমন কি যে লোকটা মাব খেল সেও। দাতে দাত ঘষে মঙলা বলে উঠল, এ-সব ছেলে জন্মায কেন —জন্মায কেন পাজী শুওব কোথাকাব!

লোকটাব হাতে চাবআনা পযসা গুজে দিযে আমি মঙলাকে একবকম ঠেলে নিযে বোর্ডিংযে ফিবি।

বোর্ডিংযেব মাসিক ফিস্ট-এব দিন সেটা অতএব আনন্দেব দিন কিন্তু বাত পর্যন্ত মঙলাব থমথমে মুখ। একসময ওকে ঘবে ডেকে জিজ্ঞেস কবলাম সকালে ওভাবে লোকটাকে কেন মাবল?

ও গুম হয়ে বসে বইল খানিক। তাবপব হঠাৎ কপালে হাত দিযে বলল, এটা দেখেছেন?

কপালে মস্ত একটা পুবানো ক্ষতচিহ্ন। মুখেব দিকে তাকালে ওটাই আগে চোখে পড়ে। বলে গেল, এই দশা ওব মা কবেছে, তখন ওব বযেস আট কি নয। ফুটপাতে থাকত। ওব পাঁচ বছব বযসে বাবা মাবা যায। তাব পবেব ক'বছবেব মধ্যে আবো দুটো ভাই-বোন এসেছিল। তাদেব বাবা কে মঙলা জানে না। মা ওকে যখন-তখন ধবে বেদম ঠেঙাত। একদিন ও বাগ কবে খাবাব ফেলে দিযেছিল বলে চুলেব মুঠি ধবে মা ওকে মাটিতে ফেলে থেতলাতে লাগল। কপাল ফেটে চৌচিব—বক্তে ভেসে গেল। মা ওকে সেদিন মেবেই ফেলত বোধহয, অন্য লোকেব জন্য পাবেনি। মাযেব হাত

থেকে ছাড়া পেয়ে ও ছুটে পালিয়েছিল। কপালের ক্ষতের মধ্যে অনেক ময়লা ঢুকে যেতে শরীর বিষিয়ে গেছল। কদিন অজ্ঞান হয়ে ছিল জানে না, জ্ঞান হতে দেখে একটা হাসপাতালে পড়ে আছে। সেখান থেকে ছাড়া পেয়ে আর ও মায়ের খোঁজ করেনি।

...আজ ভিখারিটা তার ছেলেকে ও-ভাবে মারছিল যখন, ওর মনে হচ্ছিল সেই মার যেন ওর গায়ে পড়ছে।

এর পর দিনে দিনে মঙলার জীবনের আরো অনেক খবর আমি জেনেছিলাম। .দশ বছর বয়সে ও একজনের কাছে আশ্রয় পেয়েছিল। পেয়েছিল কারণ ও একটু একটু গান গাইতে পারত। ভিক্ষে পেতে সুবিধে হয় বলে মায়ের কাছে মার খেতে খেতে গান শিখতে হত। আশ্রয় যে দিয়েছিল তার নাম চিন্তামণি। তার কাছে ছ বছরের একটা মেয়ে ছিল—নাম গৌরী। মোটাসোটা মেয়েটা দেখতে একেবারে মন্দ নয়। কার মেয়ে কোথাকার মেয়ে কেউ জানে না। মঙলা এসে জোটার পর চিন্তামণি ওদের হর-গৌরী সাজিয়ে পয়সা রোজগারের রাস্তা ধরল। রোজ রং মেখে সং সেজে ওদের পথে বেরুতে হত—হর-গৌরীর নাচ নাচতে হত, গাইতে হত সেই সঙ্গে, চিন্তামণি ভাঙা হারমোনিয়াম বাজাতো। রাস্তায় ছেলেমেয়েদের ভিড় জমে যেত, বাড়ির একতলায় দোতলায় দাঁড়িয়ে মেয়েরা মজা দেখত, নাচগান শেষ হলে পয়সা ছুড়ে ছুঁড়ে দিত।

এক-একদিন চিন্তামণির বেশ ভালো রোজগার হত। পরিশ্রম খুব হত, পায়ের সুতো ছেঁড়ার দাখিল হত। কাহিল হয়ে পড়লে চিন্তামণি কষে ঠ্যাঙানি লাগত। তবু এই নেচে-গেয়ে বেড়ানোটা ভারী পছন্দের জিনিস ছিল মঙলার। দশ থেকে আঠেরো এই আট বছর এমনি কেটেছে। তার পরেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত। গৌরীর তখন চোদ্দ বছর বয়েস, কিন্তু দেখাতো সতের-আঠেরোর মতো। তার আশেপাশে বাজে লোক জুটতে লাগল। মঙলাও তখন কুসঙ্গে মেশা শুরু করেছে, তাই সবই সে বুঝতে পারে। আরো একটা বছর টেনেটুনে কাটানো গেল। তারপর আর গেল না—গেল না মঙলার জন্যেই। পনের বছরের গৌরীর নাচ সকলে হা করে গেলে, চোখে-মুখে কুৎসিত ইঙ্গিত করে। অথচ তার মত ধাড়ী ছেলের নাচ যেন সকলের চক্ষুশূল, হেসে হেসে টিটকিরি দেয়। হর-গৌরী পালার মধ্যে দুজনে কাছাকাছি হলে সকলে হৈ-হৈ করে ওঠে।

ঘরে ফিরে মঙলা রাগ করে, আর গৌরী হি-হি করে হাসে। কখনো ফিরে ঝাঝ দেখিয়ে বলে, লোক অমন করবে না তো কি—গায়ে হাত দেবার সময় তুই আজকাল সাপটে ধরতে চাস আমাকে! কার চোখে ধুলো দিবি?

বেগতিক দেখলেই মঙলা ওকে ধরে মার লাগাতো। আর মার খেলেই গৌরী ফুঁসে উঠত। ফলে আরো বেশি মার খেত। মেয়ে সেয়ানা হয়ে উঠেছে বেশ। ফাঁক পেলে বাজে ছেলের সঙ্গে ফিসফিস গুজগুজ করে। ওদিকে নাচ প্রায় বন্ধ, খাওয়া জোটে না। মঙলা এখানে-সেখানে বা কারখানায় কাজের ধান্ধায় বেড়ায়।

একদিন ঘবে ফিবে দেখে ঘব খালি। গৌবীও নেই, চিন্তামণিও নেই। এবপব ছ'বছব কেটেছে। এই ছ'বছব ধবেই মঙলা ওদেব খুঁজেছে। ও তখন পঁচিশ বছবেব জোযান। ওদেব পেলে দু'জনকেই খুন কবত। না পাওযাব আক্রোশে আবো বেশি উচ্ছৃঙ্খল হযে উঠেছে। বযেসকালেব মেযে দেখলেই ওব শিবায শিবায আগুন জ্বলত। কাবখানায চাকবি কবত—মদ খেত. জুযা খেলত আব দুবন্ত আক্রোশে ব্যাভিচাবেব পাতাল চষে বেড়াতো।

কাবখানায কাজ কবাব সময হাবানেব বউ পদ্মব সঙ্গে যোগাযোগ। হাবান কলে কাটা পড়ে মবেছে। তাব বউটা বোজগাবেব আশায আসে। বেশ সুশ্রী মেযে। অনেকেবই চোখ গেছে তাব দিকে। কিন্তু মঙলাব চোখও আটকেছে যখন, কাবো ঘাড়ে দুটো মাথা নেই যে পদ্মব দিকে এগোবে।

কিছুদিনেব ঘনিষ্ঠতাব পব পদ্ম ওব জুলুমে পড়ে সেই বাতে ওকে ওব ঘবে আসতে বলল। অল্পস্বল্প নেশা কবে মঙলা ওব ঘবে গেল। বেশি নেশা কবলে আনন্দ মাটি। মাথায আব এক ক্ষুধাব আগুন জ্বলছে বলে সমযেব একটু আগেই গিযে পৌঁছুল।

ঘবে পা দিযেই হতভম্ব সে। পদ্ম ভুঁযে লুটিযে পড়ে কাঁদছে। সে কি কান্না। তাব বুকেব কাছে হাবানেব একটা পুবনো ফোটো। অদূবে একটা কচি ছেলে আব একটা কচি মেযে বসে বোবা-বিস্মযে মাযেব বুকফাটা কান্না দেখছে।

মুহূর্তেব মধ্যে মঙলা কেমন যেন হযে গেল। পদ্মকে জেবা কবে শুনল, হাবান একদিন তাকে পথেব থেকে ঘবে এনে তুলেছিল। মঙলা পাথব। মনে পড়ল, মাযেব সঙ্গে বাস্তায বাত কাটতো যখন, তাবও বোন ছিল একটা। এ সে-ই কিনা কে জানে। ঠিক সে না হোক, সেই বকমই একজন।

সেই থেকে মঙলা অন্য মানুষ। একে একে অনেক ছেড়েছে তাবপব থেকে। কাবখানাব চাকবিও ছেড়েছে। না ছাড়লে পাতাল তাকে টানত। সেই বোর্ডিংযে চাকবি নিযেছিল। পদ্মকে আব ছেলেমেযে দুটোকে হাবানেব দেশেব ঘবে পাঠিযে দিযেছিল। মাসেব শেষে আমাকে দিযে যে মণি-অর্ডাব ফর্ম লিখিযে টাকা পাঠাতো, সে ওই পদ্মব কাছে।

ওব দুর্ভাগ্য, তাই ওই সময গৌবীব সঙ্গে আবাব দেখা। পথে দেখা প্রথমে হঠাৎ একদিন চিন্তামণিব সঙ্গে। ওই বযসেই চিন্তামণি বুড়িযে গেছে। হাঁপ-বোগে ভুগছে। মাথাব চুল সাদা। মঙলাকে সে-ই তাব বস্তিঘবে টেনে নিযে গেছে।

হ্যাঁ, মঙলা যা ভাবতে পাবেনি তাই হযেছে। মঙলা ভেবেছিল পুঁজি হাতছাড়া হবাব ভযে চিন্তামণি গৌবীকে সবিযেছিল। গৌবী ওব পুঁজি। কিন্তু তা নয, গৌবীকে ও-ই জোব কবে বিযে কবেছে। গৌবীব থেকে চিন্তামণিব বযেস কম কাবে এক-কুড়ি বেশি। কিন্তু ষোল বছবেব মেযেটাকে ও নিজেই খেযেছে। তাবপব সাত বছব কাটতে এই হাল।

গৌবীব দিকে প্রথম প্রথম মঙলা চোখ তুলে তাকাতে পাবেনি। যৌবনেবই আগুন যেন ওব সর্বঅঙ্গে বাসা বেঁধেছে। নড়লে-চড়লে ঝলসে ওঠে। হাসলে পবে উছলে পড়ে।

ঘরে একটা তিন বছরের রোগাটে ছেলে। গৌরীর ছেলে। বোবা-মূর্তি মঙলা তাকেই একটু আদর করছিল, চিন্তামণি তখন বাইরে চা বানাচ্ছিল—সেই ফাঁকে গৌরী বেশ কাছে এসে কোমরে দু'হাত দিয়ে ছদ্ম ভ্রূকুটি করে সকৌতুকে তাকে দেখছিল। ছেলেকে আদর করতে দেখে হেসে গুনগুন করে গেয়ে উঠেছিল, হায় গো হায়, রাই না পাই, দুধের সাধ ঘোলে মেটাই।

সেই থেকে মঙলার মাথায় আবার আগুন জ্বলতে শুরু করেছিল। প্রায়ই ইচ্ছে হত চিন্তামণিকে খতম করে দিয়ে সবদিক পরিষ্কার করে ফেলে।

কিন্তু দেখা হলেই হেপো রোগী চিন্তামণি ওর কাছে দুঃখ করত। বলত, গৌরী তাকে দেখতে পারে না, এমন কি ওর ওপর রাগে রোগা ছেলেটাকে পর্যন্ত দেখতে পারে না। চিন্তামণির ধারণা, একটা পালাগানের দল ওকে না করে দিতে পারলে আর বেশিদিন ওকে ধরে রাখা যাবে না। ছেলেবেলার সেই ঝোঁক গৌরীর এখনও কাটেনি। এক বাড়িতে গৌরী এখন দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনটে ছেলেমেয়ে রাখার কাজ করে। সেই বাবুটির বউ নেই। বাবুর মতলব ভাল নয় বুঝেও গৌরী তাকে আসকারা দেয়। কিছু বললে উল্টে শাসায়, শিগগীরই পালাগানের দল না করে দিলে ও যার সঙ্গে খুশি তার সঙ্গে চলে যাবে।

কিন্তু পালাগানের দল খোলার মত টাকা চিন্তামণি পাবে কোথায়?

রঙ্গ করে গৌরী একদিন চিন্তামণির সামনেই মঙলাকে বলেছিল, তুমি যোগাড় করে দাও না টাকা, তুমি তো আমার প্রথম পক্ষের শিবঠাকুর গো, ভাগে-সাগে না হয় দুজনেরই ঘর করা যাবে। এমন কী দোষের, দ্রৌপদী তো পাঁচজনের ঘর করত। বলেই খিলখিল হাসি। এত হেসেছিল বলেই কথাটায় তেমন দোষ ধরেনি চিন্তামণি। কিন্তু মঙলার মাথার আর বুকের জ্বলুনি বেড়েই গেছল।

একদিন সকাল থেকে মঙলার দেখা নেই। বোর্ডিংয়ে ফিরল সন্ধ্যার পর। উসকো-খুসকো মূর্তি। দেখলেই বোঝা যায় বিশেষ কিছু ঘটেছে। রাত্রিতে ওকে ঘরে ডেকে এনে ব্যাপার শুনলাম। গৌরী তার বাবুর বাক্স থেকে তিনশ টাকা চুরি করে চিন্তামণির হাতে দিয়েছে। প্ল্যান ছিল ভোররাতে ওরা পালাবে, তারপর দূরে কোথাও গিয়ে ওই টাকা দিয়ে পালাগানের দল গড়বে। কিন্তু মঙলার মতে চিন্তামণি বুদ্ধিমান লোক, সে জানে পালাগানের দল হোক বা না হোক, গৌরী একদিন তাকে ছেড়ে চলে যাবেই। তাই কড়কড়ে তিনশ' টাকা হাতে পেয়ে মাঝরাতে উঠে সে একাই পালিয়েছে। ওদিকে বাবু পুলিশে খবর দিতে তারা এসে গৌরীকে টানাহেঁচড়া করছে। গৌরী অবশ্য স্বীকার করেনি, কিন্তু স্বীকার না করে যাবে কোথায়? বাবুর বাড়ি গিয়ে তার হাতেপায়ে ধরেছিল, বাবু শেষ পর্যন্ত বলেছে টাকা পেলে ফয়সলা করে নেবে।

তারপর?

তারপর মঙলা গৌরীর ঘরে গেছে। এলোপাথারি কিল-চড় মেরেছে তাকে। মেরে এখানে চলে এসেছে। বলল, ও আমার হাতে একদিন ঠিক খুন হবে। একথা আগেও বলেছে।

পরদিন আমার ঘড়ি, পেন আর সোনার বোতাম চুরি এবং মঙলা নিখোঁজ।

পুলিশ অফিসারকে মঙলা ঠিকই বলেছে, একটু তৎপর হয়ে গৌরী দাসীর বস্তি-ঘরের আশেপাশে পুলিশ মোতায়েন করলেই আমি ওকে ধরতে পারতুম। .

বিকেলে পুলিশ অফিসারের ঘরে গেলাম। তিনি বললেন, আপনার মঙ্গল দাস লোকটার মশাই মেজাজ এখনও তিরিক্ষি। কবুল করবার ফিকিরে ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা হচ্ছে কিনা। ও তার জবাবে খানিক চুপ করে থেকে আমাকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, মানুষ মরলে ফিরে আবার জন্মায় কিনা। বুঝুন ঠেলা—অর্থাৎ আবার জন্মালে আবার ও গৌরী দাসীকে খুন করবে।

একটু বাদে মঙলাকে আমার সামনে এনে হাজির করা হল। তার হাতে শেকল, পায়ে বেড়ি, কোমরে দড়ি। আমি আতকে উঠলাম—প্রেত-মর্তি যেন।

অফিসার আমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী, চিনতে পারো?

জবাবে যতটা সম্ভব ঝুকে শেকল-বাঁধা-হাত কপালে ঠেকিয়ে আমাকে প্রণাম করল। আমাকে অবাক করে দিয়ে পুলিশ অফিসার উঠে দাঁড়িয়ে ওকে বললেন, বাবুর সঙ্গে কথা বল, আমি একটু কাজ সেরে আসি—কিছু ভয় নেই।

ঘর ফাকা। বাইরে অবশ্য প্রহরী মোতায়েন বলে ধারণা আমার। তাছাড়া এ-রকম অবস্থায় ওই একটা সামনের দরজা দিয়ে কারো পালাবার প্রশ্ন ওঠে না। তবু কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

বাবু ভালো আছেন?

আমি সচকিত।—হ্যাঁ। কিন্তু এ কী হলো!

জবাবে ও ওপরের দিকে ঘাড় উঁচিয়ে তাকাল একবার। তারপর বিড়বিড় করে বলল, সবই অদেষ্ট। একটু বাদেই ওর গর্তের চোখ দুটোতে আগ্রহের ছোয়া লাগল। —আচ্ছা বাবু, মানুষ মরলে আবার জন্মায়?

পুলিশ অফিসার এ প্রশ্নের যাই তাৎপর্য বুঝুন, আমি বুঝতে পারলাম না।—জানি না।...কেন বল তো?

জবাব দিল না। চুপ করে খানিক ভাবল কি। তারপর অনুনয়ের সুরে বলল, বাবু, আপনার কাছেও আমি অপরাধ করেছি, তবু দয়া করে আপনি আমাকে ক্ষমা করেছেন। আর একটুখানি দয়া চাইব বাবু..?

আমি জিজ্ঞাসু।

মঙলা বলল, গৌরীর রোগা ছেলেটাকে ওরা অনাথ আশ্রমে রেখেছে শুনলাম...আমার কিছু টাকা আছে, হক্কের টাকা, সেটা যাতে ওই ছেলেটার ভালোর জন্যে খরচ হয় আপনি সে ব্যবস্থা করে দেবেন—দেবেন?

বললাম, আচ্ছা সে হবে'খন, আগে তো কেসটেস হোক।

এরপর দু'চার কথায় ব্যাপারটা শোনা গেল।...চুরির দায় থেকে খালাস পেয়ে গৌরী যেন কেনা দাসী হয়ে গেল মঙলার। নিজেকে ওর কাছে বিলিয়ে দিয়ে ওর নেশা ধরিয়ে দিল। মঙলা দূরের এক কলে কাজ নিয়েছিল, প্রতিজ্ঞা করেছিল, আমি

ওকে পুলিশে ধবিযে দিলাম না বলেই ও বোজগাব কবে চুবিব দেনা শোধ কববে। হপ্তাব ছুটিব দিনে গৌবীব বস্তিতে আসত, একদিন থেকে আবাব চলে যেত।

কিন্তু গৌবী আসলে ওকে ভালবাসত না, ভয কবত। ভিতবে ভিতবে যে অন্য লোক জুটিযেছে সেটা বোঝা গেল বছব না ঘুবতে। দুই-একবাব ধবা পডে ওব হাতে বেদম মাব খেল গৌবী। মাব খেযে কিছুদিন ঠাণ্ডা হযে থাকে, তাবপব আবাব বেচাল শুরু হয। একবাব খাওযাব দোষে ওব বোগা ছেলেটা মব-মব, ভাবনা-চিন্তায মঙলা বাতে ফ্যাক্টবী থেকে পালিযে বস্তিতে এসে দেখে সেই বিপদেব দিনেও বাতেব আঁধাবে বেডাব গাযে দাঁডিযে বাবুগোছেব একটা লোকেব সঙ্গে গৌবী ফিসফিস কবছে। ওব সাডা পেযেই লোকটা পালিযে গেল।

সেই বাতে হাডভাঙা মাব খেযেও মঙলা দেখেছে, গৌবীব দু'চোখ বাঘিনীব মতো জ্বলছে। এব ক'মাসেব মধ্যে মঙলা যে কবেই হোক স্থিব বুঝেছিল, গৌবী ওকে ছেডে পালাবে। বুঝেছিল, কাবো সঙ্গে পালাবাব ষডযন্ত্র পাকা কবে এনেছে। এই পর্যন্ত বলে মঙলা থামল।

আমি বলে উঠলাম, ও-বকম একটা মেযেব জন্য নিজেব এতবড বিপদ ডেকে আনলে ?

আবাব একটু চুপ কবে থেকে মঙলা বিডবিড কবে জবাব দিল, কোন মেযেব জন্য নয বাবু, গৌবীকে খুন না কবলে ওব হাতে একটা শিশু খুন হত। নিজেব ছেলেটাই সব থেকে বড কাঁটা, ওকে একেবাবে সবিযে দিযে পালাবাব মতলব ভেজেছিল ওবা।. .আগেববাবে খাবাবেব সঙ্গে বিষও গৌবীব ওই লোকই দিযেছিল।...বুকে ছোবা বসাবাব পব চোখেব জলে ভেসে গৌবী সব স্বীকাব কবে গেছে।

ঘবে পুলিশ অফিসাবেব সামনে বোকাব মতো আমি বসে। উনি বললেন, এ ঘবেব আপনাদেব সব কথা ওদিক থেকে শোনাব ব্যবস্থা আমি আগেই কবে বেখেছিলাম। ...ভেবি স্যাড ইনিডিড।

অন্যমনস্কেব মতো বাডি ফিবছি। পব পব কতগুলো দৃশ্য আমাব চোখেব সামনে ভাসছে।...একটা ভিখিবি তাব ছেলেকে মাবছে দেখে হাতেব মোট নামিযে ক্ষিপ্ত আক্রোশে মঙলা তাকে মেবে বসল।...আদিম বিপুব তাডনায পদ্মব ঘবে গিযে সেই কান্না দেখে, আব তাব থেকেও বেশি—সেখানে দুটো অসহায নির্বাক শিশুমূর্তি দেখে ওই উচ্ছৃঙ্খল মঙলাব আমূল পবিবর্তন ঘটে গেল।...আব তাবপব, ওই মঙলা আব একটা অসহায শিশুব আসন্ন মৃত্যুভযে গৌবী দাসীকে খুনই কবে বসল।... কেন, পথেব ছেলে মঙ্গলা কি ওদেব মধ্যে নিজেকেই দেখত ?

চমকে উঠলাম। কানে যেন বিডবিড স্ববেব একটা উৎসুক প্রশ্ন আঘাত কবল।-
–আচ্ছা বাবু, মানুষ মবলে আবাব জন্মায ?

...মঙলা আজীবন তাব জন্মটাকে ঘৃণা কবেছে। আবাব একটা জন্মেব অভিশাপ ও বহন কবতে চায না।

আশা আর বাসা

ছিল পোস্টমাস্টাবেব মেযে। নিজে কিছুকাল কবল স্কুল-মাস্টাবি। তাবপব হযে পডল কলেজেব মাস্টাবেব বউ।

জীবনেব এই কোনো ক্ষেত্রই পছন্দ নয। পোস্টমাস্টাব বা স্কুল-মাস্টাব অথবা কলেজেব মাস্টাব যে তাব চক্ষুশূল এমন নয, ববং পোস্টামাস্টাব বাবাটিকে সে ভালই বাসত, তাঁব সদা খুঁতখুঁতে মনোভাব দেখে বেশ মজা পেত। ড্রযাবে একটা কাগজ বাখলেও তিনবাব কবে খুলে দেখতেন ঠিক বেখেছেন কিনা। কাবো হাতে একটা দশ টাকাব নোট দিলে দু'তিনবাব অন্তত সেটা টেনে নিযে আঙ্গুলে ঘষে দেখতেন একটাব জাযগায দুটো বেবিযে গেল কিনা।

নিজে যতদিন স্কুল-মাস্টাবি কবেছে ততদিন খুব যে নিবানন্দে ছিল তাও নয। ববং সমবযসী সতীর্থদেব সঙ্গে হেসে-খেলে দিন কাটিযেছে। তাদেব সুখ-দুঃখেব সঙ্গে নিজেকে যুক্ত কবেছে।

আব কলেজেব মাস্টাবেব বউ হবাব জন্যেও কেউ তাকে বাধ্য কবে নি। নিজেব ইচ্ছেতেই হযেছে। ঘবে প্রায সর্বদাই পাঠ আব পঠনবত অল্পবযসী একটি সিবিযস মুখ দেখে এক-এক সময সে বেশ কৌতুকই অনুভব কবত। কোন সময বা টেনে টেনে ছড়া কাটত, বাম গরুডেব ছানা হাসতে তাদেব মানা—। ফলে ইতিহাসেব তরুণ মাস্টাবেব অনেক সমযই পাঠ-পঠনেব মনোযোগ বসাতলে যেত। তাব হাসিতে প্রমাণ মিলত হাসিব বসদ পেলে তাব হাসতে তেমন মানা নেই, আব বাতেব নিভৃতে এই টিপ্পনীব দরুণ দস্তুবমত হামলা কবে চড়ামাশুলও আদায কবতে চেষ্টা কবত। তখন সমর্পণেব হাল ছাড়তে খুব মন্দও লাগত না।

তবু এই তিনেব একটা ক্ষেত্রও যে পছন্দ নয তাব কাবণ ওব নিজেব চবিত্রগত উচ্ছলতা। ওই তিনেব কোন ক্ষেত্র থেকেই সেটা পবিপূর্ণ বসেব জোগান পেত না। উচ্ছল সত্তা বিকশিত বা বিস্তৃত হবাব মতো সেগুলিব একটাও তেমন প্রশস্ত নয, উর্বব নয—মানিযে নিতে পাবলে দিন এক বকম কবে কাটে, এই পর্যন্ত। কিন্তু বর্ণশূন্য দিনযাপনেব সহিষ্ণুতা তাব কম। ববং বর্ণেব অনুশীলনে সেটা কত ভাবে কত বকমে উজ্জ্বল হতে পাবে সেই কল্পনাব সঙ্গে তাব মানসিক যোগ।

এবও কাবণ আছে।

নাম বাখি। আগে গাঙ্গুলি ছিল। কলেজেব মাস্টাবেব ঘবে এসে চক্রবর্তী হযেছে। বাখি চক্রবর্তী। বর্ণবিলাসী কল্পনাব সঙ্গে তাব মানসিক যোগেব কাবণ বিশ্লেষণ এই নাম থেকেই শুরু কবা যেতে পাবে।

ওব বাবাবা পাঁচ ভাই। জলপাইগুড়িতে একান্নবর্তী পবিবাব। তাঁদেব কেউ স্কুল মাস্টাব, কেউ উকিল, কেউ কেবানী। বাবা পোস্টমাস্টাব আব ছোট কাকাব স্টেশনাবি দোকান। বাখিব বাবা সেজ। বাখিব চাবটি নিজস্ব দাদা। বড জ্যাঠা আব মেজ জ্যাঠাব চাবটি কবে ছেলে। বড কাকাব ছয ছেলে। ছোট কাকাব পাঁচ ছেলে। সব মিলিযে বাড়িতে ছেলেব সংখ্যা তেইশ। আব একটি মাত্র মেযে—সে বাখি। মেজ জ্যাঠাব নাকি

একটা মেয়ে হয়েছিল। সে দেড় বছরের বেশি টেকেনি। বাড়িতে মেয়ের দুর্ভিক্ষ। সাধারণত লোকে ছেলে হলে খুশি হয়, কিন্তু এ বাড়িতে ছেলের মুখ দেখতে দেখতে এমন অবস্থা যে ছেলে হলে মন-মেজাজ খারাপ হয়। ছোট কাকিমার কাছে রাখি শুনেছে, ওর ছোড়দা যখন হল, মায়ের সে কি কান্না! কে নাকি হাত দেখে মাকে বলেছিল এবারে ছেলে হবে।

এহেন পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ আগন্তুক কন্যা। স্বভাবতই তার আদর, তার কদর, তার প্রশ্রয় অন্যরকম। ও এসেছে তাই আনন্দ ধরে না, শেষ পর্যন্ত টেকে কি টেকে না ভিতরে ভিতরে সেই শঙ্কা। সেই কারণেই নাম—রাখি। তা ছেলেবেলা থেকে সকলে মাথায় করেই রেখেছে তাকে। বৃহৎ পারিবারে অনটনের ছায়া পড়েই ছিল। কিন্তু সেটা একমাত্র ওকেই স্পর্শ করে নি কোনদিন। যখন যা চেয়েছে তাই পেয়েছে। বাবা না দিলে কাকা-জ্যাঠারা দিয়েছে। বছর পনের বয়েস পর্যন্ত অন্তত চাইলে পাবে না এমন কিছু আছে বলেই সে ভাবতে পারত না। তার চোখে তখন পর্যন্ত সমস্ত দুনিয়াটাই বর্ণে গন্ধে আনন্দে ভরা।

স্কুল ফাইন্যাল থেকে বি.এ. পাস করার চারটে বছরের মধ্যে পর পর কটা বিপর্যয়ে সেই রংদার দুনিয়ার সব বর্ণ সব গন্ধ আর সব আনন্দ যেন কর্পূরের মতো মিলিয়ে গেল চোখের সমুখ থেকে। আর যে বাস্তব মুখব্যাদান করে তার সামনে এগিয়ে এলো সেটা যেমন নীরস, তেমনি অকরুণ। পনের বছর পর্যন্ত যে মেয়েটা সব পেয়েছে, এ বাস্তবের সঙ্গে তার আপোস করে চলাটা সহজ নয়।

ওই চার বছরের গোড়ায় বড় কাকা চোখ বুজলেন। তারপর বড় জ্যাঠা। শেষে বি. এ. পাস করার ছ'মাস আগে তার বাবা মারা যাবার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের তাপ্লি-মারা নৌকোটা হঠাৎ যেন খান-খান হয়ে গেল।

বি. এ. পাশ করার আগেই রাখি গাঙ্গুলি যেন অকূল পাথারে পড়ে হাবুডুবু খেতে লাগল। নিজের এবং খুড়তুতো-জ্যাঠতুতো তেইশটি দাদার মধ্যে মতের মিল থেকে অমিলই বেশি। অনেকেই বিয়ে-থা করেছে, অনেকেই বাইরে চাকরি-বাকরি করছে—কিন্তু পৈতৃক বাড়ির বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে যে যার ভিন্ন-মতে মাথা ঘামাতেও কসুর করছে না। একান্নবর্তী পরিবারের জমিজমা কিছু ছিল।! চার বছরের মধ্যে সেসব শূন্যে মিলিয়ে গেল। পৈতৃক বাড়িতে যারা থাকে তাদের প্রতি যারা থাকে না তাদের যেন একধরণের অনুকম্পামিশ্রিত উদারতা। ইচ্ছে করলে ওই বাড়িও বেচে দেওয়ার দাবি তোলা যেতে পারে, ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে গেলে তো কারো ভাগেই কয়েকখানা করে ইঁট-কাঠের বেশি কিছু পড়বে না। অতএব বেচে দেবার দাবি না তোলাটা প্রকাশ্য উদারতা ছাড়া আর কি।

বাবা মারা যাবার কিছুদিনের মধ্যে জানা গেল ভদ্রলোক মেয়ের বিয়েবাবদ আলাদা করে কিছু টাকা রেখে গেছেন। প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা মা আর ছেলেরা পাবে। এ টাকাটা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত। আলাদা। বড়জোর হাজার পাঁচেক হবে—তাই নিয়েই আড়ালে-আবডালে কথা। যে জ্যাঠা আর কাকা মারা গেছেন, তাদের ছেলেদের সংশয়, এত খরচের মধ্যে বাবা মেয়ের জন্যে ওই টাকা জমালেন কী করে? শেষের কয়েকটা বছর এই একান্নবর্তী সংসার পরিচালনার ভার রাখির বাবার ওপরেই ছিল।

অপরের কথা দূবে থাক, একমাত্র ছোট বোনের প্রতি বাবার পক্ষপাতিত্ব দেখে দাদারাও কেউ কেউ গম্ভীব। তাব কাবণ, তাবা দেখেছে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডেব টাকাব একটা বড অংশই বাবা ধাবে কমিযে বেখে গেছেন। সেই কাবণেই ছোট বোনেব নামে পাঁচ হাজাবেব অঙ্কটা তাদেব চোখে খুব কম ঠেকেনি।

বি. এ. পবীক্ষাব মাত্র মাসতিনেক আগে বডদার কথা শুনে তো বাখিব চোখে জলই এসে গেছল। গম্ভীব মুখে বডদা মাকে বলছিল, পবীক্ষাব জন্যে আবাব কতগুলো টাকা খবচ কবে কী হবে, পডাশুনায যা মন আব যা মাথা, নির্ঘাৎ ফেল কববে আব টাকাগুলোও যাবে। তাব থেকে চেষ্টা-চবিত্র কবে বিযেই দিযে দাও, ঝামেলা মিটে যাবে।

মা অবশ্য দাদাব কথায কান দেযনি। আব পবীক্ষাব ফীসও ছোট কাকা নিজে থেকে ডেকে দিযেছে ওকে। কিন্তু বডদাব কথা শুনে ও যত না দুঃখ পেযেছিল তাব থেকে তাজ্জব হযেছিল ঢেব বেশি। বাডিব একটামাত্র এত আদবেব মেযে সে কিনা এবই মধ্যে ঝামেলাব সামিল। যেমন-তেমন কবে তাকে বিদায কবতে পারলে ঝামেলা মেটে।

সেই প্রথম নিজেব ওপব ভযানক বাগ হযেছিল বাখি গাঙ্গুলিব। পডাশুনায তাব কোনদিন খুব একটা মন ছিল না সত্যি কথা। প্রতিবার যখন পবীক্ষা-সংকট একেবাবে নাকের ডগায এগিযে আসে তখনি প্রতিজ্ঞা কবে, ঠাকুবেব দযায সেবাবেব মতো কোনবকমে উতবে গেলে জীবনে আব পডাশুনায় গাফিলতি কববে না। কিন্তু উতবে যাবাব পব প্রতিজ্ঞাব কথা আব মনে থাকে না। কিন্তু তা বলে পডশুনা কবলে পাস না কবাব মতো মাথাও নেই তাব? ববং স্কুলে পডতে টিচারবা উল্টো কথাই বলত। বলত, মেয়েটাব মাথা ছিল, পডাশুনা মন দিযে কবলে ওই সোমা মিত্রব থেকেও ভালো কবত। সোমা প্রতি বছব একগাদা প্রাইজ নিযে বাডি ফিবত। বি. এ.-তেও সে অনার্স পডছে আব আশা কবছে ভালো বেজাল্ট কববে। নিজেব ওপব বাখিব বাগ এই জন্য, কেন এতগুলো বছব সে হেলায হাবালো, কেন সকলেব জিব নাডা বন্ধ কবাব মতো বেজাণ্ট কবল না আগাগোডা।

যাই হোক, সাংসাবিক বিপর্যযেব পব বিশেষ কবে বাবা মাবা যাবাব পব বাখি গাঙ্গুলি বেশ টেব পাচ্ছিল সে কোন মাটিতে দাঁডিযে আছে। খানিকটা নিজের ওপব আব সক্কলেব ওপব বাগ কবে, খানিকটা ঝোঁকেব মাথায, আব খানিকটা বা বেগতিক দেখে পবীক্ষাব কটা মাস এমন পডাই পডল যে শুধু পাশ নয, ডিস্টিংশনে পাস।

পাস কবাব পব বাবাব মৃত্যুটা যেন আবো বেশি অনুভব করল সে। বাবা বেঁচে থাকলে যেমন কবে হোক কলকাতায থেকে এম. এ. পডাব বাবস্থা কবা যেত। উৎসাহেব আতিশয্যে মনে মনে একটা হিসেব কবে ফেলল সে। যে পাঁচ হাজাব টাকা বাবা ওব নামে বেখে গেছেন তাব থেকে দু'বছবে হাজাব আড়াই খরচা কবে কলকাতাব কোনো হস্টেলে থেকে এম.এ-টা পডে ফেললে কেমন হয? কিন্তু মাকে এ প্রস্তাবে বাজি কবানো গেল না। তাব পডাশুনাব ব্যাপাবে বাডিব মধ্যে আগ্রহ ছিল একমাত্র যে মানুষটির তিনি ছোট কাকা। তিনিও এ প্রস্তাবে সায় দিলেন না।

ফলে প্রায় একটা বছব বেকাব দশা। মাঝে দু'মাস একমাসেব জন্য যে স্কুলে পড়ত সেই স্কুলে কাজ কবেছে। কোনো টিচাব ছুটিছাটায় গেলে তবে সেরকম কাজ মেলে।

ইতিমধ্যে ওব সহপাঠিনী এবং স্কুল-কলেজেব ভালো মেয়ে সোমাব মস্ত ঘবে বিয়ে হয়ে গেল। সোমা এমন কিছু রূপসী নয় তাব থেকে। ববং স্কুল-কলেজে পড়তে কবলা নদীব ধাবে অথবা তিস্তাব চবে ওবা দল বেঁধে হুটোপুটি কবত যখন, সেদিককার ছোঁড়াগুলোও দল বেঁধে আসতই। ওব সঙ্গেই গায়ে পড়ে বেশি আলাপ কবতে চেষ্টা কবতে, আব পাত্তা না দেবাব ফলে ওকেই বেশি জ্বালাতন কবত।

কিন্তু বিয়েটা ওদেব মধ্যে সোমাবই সব থেকে ভালো হল। বান্ধবীদেব বিয়ে আবো কাবো কাবো হয়েছে, কিন্তু সোমাব মতো কারো নয়। সোমাব বাবাব টাকাব জোব ছিল, অঢেল খবচ কবেছেন তিনি। ছেলে আই এ এস্ অফিসাব। আব সেই বিয়েব বাতে সোমাকে যেন বাজকন্যাব মতো লাগছিল রাখিব। সোমাব পবে আবো দুই-একটি অন্তবঙ্গ বান্ধবীব বিয়ে হয়েছে। তাতেও ঘটা মন্দ হয়নি। এ-সবেব মধ্যে পাঁচ হাজাব টাকায় নিজেব বিয়েব চিত্রটা এত অনুজ্জ্বল ঠেকেছে চোখে যে মনে হয়েছে তাব থেকে বিয়ে না হওয়াই ভালো। বান্ধবীদেব কাছে যে মাথাটা তাব একেবাবেই নীচু হয়ে যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মোট কথা পনেব বছব বয়েস পর্যন্ত বহু আদব আব প্রশ্রয়েব মধ্যে চরিত্রের যে ভিত গড়ে উঠেছে বাখি গাঙ্গুলিব, বিশ বছব বয়সেব প্রতিকূল ধাবাব মধ্যে পড়ে সেটা বিপর্যস্ত হয়েছে শুধু—একটুও বদলায়নি।

এক বছব বাদে স্কুলেই চাকবি পেল। সবকাবী স্কুলেব চাকবি। অনেক ডিস্ট্রিক্ট স্কুলেই টিচাব নেওয়া হচ্ছিল, এবাবে তাব ডিস্টিংশনেব ছাপটাই কাজে লেগে গেল। এম. এ. বা অনার্স হলে আবো ভালো হত, মাইনে আবো কিছু বেশি পেত। যাই হোক, চেষ্টা-চবিত্র কবলে কাছাকাছি থেকেই চাকবিটা কবতে পাবত। কিন্তু মনেব আনন্দে সে দার্জিলিংয়ে চাকবি নিয়ে বসল। দার্জিলিং-এ থেকে চাকবি কববে এতে যেন নিজেব কাছেই তাব মর্যদা খানিকটা বেড়ে গেল। মনেব আনন্দেই চাকবি কবতে এলো।

কিন্তু এ আনন্দ খুব বেশিদিন থাকল না। গোড়ায় গোড়ায় হাতে যা পেত, ভাবত অনেক টাকা। কিন্তু কয়েকটা মাস না যেতে মাইনেব অঙ্কটা কেমন জ্যোতিশূন্য ঠেকতে লাগল চোখে। তাব প্রধান কাবণ, সে হিসেব করে খবচ করতে জানে না। চোখে বা মনে কিছু ধবলে সেটাব অধিকাব না মেলা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। দার্জিলিংয়ের মতো জায়গায় শীতেব ভব্যসব্য বেশবাসেব ব্যবস্থাতেই অনেক খরচ। এ ব্যাপারে স্কুল মিসট্রেস বলে সে মান খাটো কবতে বাজি নয়। তাব ওপব খাওয়া-দাওয়া আব প্রসাধনসামগ্রীব খবচ। মাস কাবাব হবাব আগে প্রতিবাবই দস্তবমতো ফাঁপরে পড়ে যায় বাখি গাঙ্গুলি।

এই কাবণেই স্কুলেব চাকবিব ওপব বিরূপ সে। মাইনেটা আবো শ'দেড়েক টাকা বেশি হলেও মনেব আনন্দে কাটাতে পাবত। টিচাববা আব মেয়েবাও সৌখিনভাবে থাকে। আড়ালে তাকে নিয়ে কথাও হয়, এটুকু বাড়তি মর্যদাব মতো। এর থেকে

নেমে আসতে মন সবে না। সেই ছেলেবেলা থেকেই দৃষ্টি উঁচুব দিকে, তাব কী দোষ। দোষ ভাবে না, কিন্তু মাসেব শেষে মেজাজ ঠাণ্ডা বাখা কঠিন হযে পড়ে।

এই শৈল-শিখবেই সুবীবকান্তব সঙ্গে আলাপ এবং পবিণয বিধিলিপি।

সুবীবকান্ত চক্রবর্তী এখানকাব কলেজেব নতুন মাস্টাব। নতুন বলতে দার্জিলিং-এ নতুন। হুগলি না কোথাকাব কোন কলেজ থেকে বদলি হযে এসেছে।

এ-সব পবেব বৃত্তান্ত।

বিকেলে ম্যাল বা বাজাবেব দিকে সেজেগুজে বেড়াতে বেবিযে বাখি গাঙ্গুলিব দিনকযেক মনে হল দুব থেকে এক অল্পবযসী ভদ্রলোক তাকে নীববে লক্ষ্য কবে। তা লক্ষ্য অমন অনেক সময অনেকেই কবে। এখানে মৌসুমেব সময বেড়াতে যাবা আসে, পাহাড় দেখাব সঙ্গে সঙ্গে তাদেব যেন মেযে দেখে বেড়ানোব বাই চাপে। এ তো তবু তাব দিকে চেযে থাকে, বাখি এও দেখেছে, নীচেব থেকে বেড়াতে এসে এখানে খেটে আব মেহনতী কবে খায যে মেযেগুলো, হ্যাংলাব মতো লোকগুলো ওদেব দিকেও তাকিযে থাকে।...কিন্তু এ লোকটাব তাকানোটা সে-বকম মনে হযনি বাখিব। বেশ পবিষ্কাব চাউনি, আব বেশ একটু উৎসুক ভাব।

একদিন লেবংযেব পথে দেখা হল। বাখি নামছিল আব লোকটা উঠছিল। ওকে দেখে দাঁড়িযে গেছল। বাখিও থামলে এগিযে এসে কথাই বলত হযত, কিন্তু বাখি দাঁড়াযনি বা থামেনি। স্কুল-টিচাবেব এ-ধবণেব গাযে-পড়া আলাপ ববদাস্ত কবা ঠিক নয, এটুকু জ্ঞান তাব আছে।

আব একদিন জলাপাহাড়ে দেখা। এই দিন আব আলাপ ঠেকানো গেল না। মাঝে মাঝে এসে বসে এখানে। সহকর্মিণীবাও সঙ্গে থাকে প্রাযই। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ আসেনি, বাখি একাই বসে গুনগুন কবে গান গাইছিল। এক সমযে ঘাড় ফিবিযে দেখে অদবে লোকটা দাঁড়িযে। উৎসুক দৃষ্টি, ঠোঁটেব ডগায সামান্য হাসিব আভাস। চোখাচোখি হতে দু'হাত জুড়ে নমস্কাব জানিযে লোকটা এগিযে এলো।

—কিছু মনে কববেন না, আপনাব নাম বাখি গাঙ্গুলি?

সবাসবি একেবাবে নামেব ওপব চড়াও না হলে এই আলাপেব ইচ্ছেটা বাখি বাতিলই কবে দিত। কাবণ এক্ষুনি সুলতাদি বা মুখবা বমলাদি ওদেব কেউ এসে গেলে জেবাব চোটে বাখিকে অস্থিব কবে মাববে। কিন্তু অচেনা লোকেব মুখে নিজেব নাম শুনে বিবক্তিব বদলে অবাক হল। মাথা নাড়তে আবাব প্রশ্ন হল, আপনি জলপাইগুড়িব মেযে আব ওমুকেব ভাইঝি তো?

ছোট কাকাব নামই কবল। কিন্তু এবাবেব প্রশ্নটা কেন যেন খুব মার্জিত ঠেকল না বাখিব কানে।

এবাবেও মাথা নেড়ে মৃদু প্রশ্ন কবল, আপনি?

লোকটা জবাব দেবাব আগে আবো একটু কাছে এগিযে এলো। পাশে বসেই পড়ে কিনা সেই ভয বাখিব। হাসিমুখে জবাব দিল, আমি জলপাইগুড়িতে আমাব

কাকার বাড়িতে অনেকবার কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছি। আমার কাকা আপনার কাকার খুব বন্ধু। তখন আপনাকে তিস্তার ধারে অনেকবার দেখেছি।

কাকার যে নাম করল, সেটা বিলক্ষণ চেনাই বটে। রাখির ছোট কাকার অন্তরঙ্গ বন্ধু শুধু নয়, সে বাড়িতে রাখি বা রাখির মায়ের যাতায়াতও আছে। ওদের বাড়ির মেয়েরাও তাদের বাড়িতে আসে। কিন্তু কাকার বন্ধুর ভাইপোর সঙ্গে আর আলাপ বাড়ানোর ইচ্ছে খুব নেই রাখির। সুলতাদি-কমলাদিরা আসার আগে সরে গেলেই ভালো হয়। তাই নিস্পৃহ একটা উক্তি বেরুলো গলা দিয়ে—ও..।

কিন্তু লোকটার কেটে পড়ার ইচ্ছে নেই বোঝা গেল। হাসিমুখে বলল, আমার নাম সুবীরকান্ত চক্রবর্তী—এবার এখানে আসার আগেও জলপাইগুড়িতে কাকার বাড়ি হয়ে এসেছি। কাকা আপনার কথা বলছিলেন, আপনি এখানকার স্কুলে কাজ করছেন। .দেখা করে আলাপ করতে বলেছিলেন, আপনার কাকাও বলেছিলেন। হাসল। কিন্তু ক'দিন আপনাকে দেখেও ঠিক ভরসা পেয়ে উঠিনি। আর আপনার সঙ্গে প্রায়ই অন্য মেয়েরাও থাকেন..তাই একদিন আপনাদের বোর্ডিংয়েই যাব ভাবছিলাম।

আলাপে এগোতে ভরসা পেয়ে ওঠেনি পর্যন্তই শুনতে খারাপ লাগেনি। নিতান্ত সৌজন্যের খাতিরেই রাখি গাঙ্গুলি জিজ্ঞাসা করল, এখানে বেড়াতে এসেছেন?

এই সমান্য প্রশ্নটাই যেন একটা পাথর ছেড়ে পরের পাথরটায় বসে পড়ার পাসপোর্ট। কিন্তু জবাব যা পেল তা শোনার জন্যে খুব প্রস্তুত ছিল না রাখি গাঙ্গুলি। বলল, বেড়াতে এলে তো করেই পালিয়ে বাঁচতাম। এসেছি এখানকার কলেজে মাস্টারি করতে। কী কুক্ষণেই যে বদলি হতে রাজি হলাম।

কলেজের মাস্টার শুনে রাখি এবার এবং এই প্রথম কাছে থেকে ভালো করে দেখল মানুষটাকে। ছোট করে ছাঁটা চুল, চাকচিক্যশূন্য সাদামাটা মুখ—কেবল চাউনি ভারি পরিষ্কার আর উজ্জ্বল। চোখ দুটো লক্ষ্য না করলে মানুষটাকে নিরীহ বোকা গোছের মনে হবে।

—এখানকার গভর্নমেন্ট কলেজে?

—হ্যাঁ, তাছাড়া আর বদলি হয়ে আসব কী করে? .এসে এই দু'মাসের মধ্যেই হাঁপ ধরে গেছে, এখন থেকেই করে পালাতে পারব ভাবছি।

কলেজের মাস্টার শোনার পর আগের মতো আর অবজ্ঞার চোখে দেখা গেল না লোকটাকে। রাখি জিজ্ঞাসা করল, কেন?

—প্রথম কারণ, এখানকার অভদ্র রকমের শীত। একেবারে জ্বালিয়ে মারলে। দ্বিতীয় কারণ, রাস্তাঘাট। হয় নাক উঁচিয়ে উঠতে হবে, নয়তো চোখ পায়ে ঠেকিয়ে নামতে হবে—আর তৃতীয় কারণটাই আসল, এখানে এ মাইনেয় পোষায় না, এখানে চাকরি করতে হলে মাইনে ডবল হওয়া উচিত।

জবাবটা বেশ স্বচ্ছ ঠেকল কানে। অথচ এই বয়সের লোকের শীতে কাবু হওয়া বা উঁচু-নীচু পথের দরুণ বিতৃষ্ণ হওয়া তেমন বীরোচিত সমস্যা বলে ঘোষণা করা উচিত নয়। আর শেষের উক্তির সঙ্গে রাখিও একমত। কিন্তু এই সামান্য আলাপের মধ্যে খরচায় না পোষানোর কথাটা রাখি গাঙ্গুলি অন্তত বলে ফেলতে পারত না।

কিন্তু একজন কলেজের মাস্টার আর একজন স্কুল মাস্টারকে এ-কথা বলছে বলেই হয়ত ঝরঝরে স্পষ্টোক্তির মতো লাগল কথাগুলো।

পিছনে রমলাদির গলা শুনে রাখি সচকিত হয়ে ঘাড় ফেরাল। সুলতাদি আর রমলাদি দুজনেই এদিকে আসছে। রমলাদি বোধহয় পাথরে হোঁচট-টোচট খেয়েছে, তার গলা দিয়ে অস্ফুট একটা কাতর শব্দই বেরিয়ে এসেছে। সুবীরকান্তও ফিরে তাকিয়েছে। সুলতাদি হাসি চাপতে চেষ্টা করছে।

কাছে এসে দুজনেই গম্ভীর। রমলাদি আরো বেশি। সুবীরকান্ত তাদের উদ্দেশ্যে দু'হাত কপালে তুলল। জবাবে তারা একবার মাথা নেড়ে সপ্রশ্ন গম্ভীর দৃষ্টিতে রাখির দিকে তাকালো।

রাখি তাড়াতাড়ি পরিচয় করিয়ে দিল, ইনি এখানকার গভর্নমেন্ট কলেজের প্রোফেসার, সুবীরকান্ত চক্রবর্তী, দার্জিলিংএ নতুন এসেছেন—

সুবীরকান্ত সবিনয়ে বলল, প্রোফেসার হবার আশা শিগগীরই আছে বটে, তবে এখনো লেকচারার।

রমলাদি গম্ভীরমুখে সুলতাদিকে বলল, বোসো সুলতা। নিজেও একটা ছোট পাথরে বসে সদ্যপরিচিতের দিকে তাকালো।—আমরা স্কুলমাস্টার, তাই কলেজের ফিজিক্যাল ইনস্ট্রাকটরকেও প্রোফেসার বলে সম্মান দেখাই, আপনি হবু প্রোফেসার যখন আমাদের চোখে প্রায় ভাইস প্রিন্সিপাল।

মাত্রা-ছাড়ানো রসিকতার কথা শুনে সুবীরকান্ত হাসতে চেষ্টা করল একটু। সুলতাদি ফস করে জিজ্ঞাসা করে বসল, রাখির সঙ্গে আগে আলাপ ছিল না, এখানে নতুন এসে আলাপ হল?

এদের এই বেশি-বেশি কথা বিচ্ছিরি লাগছিল রাখির। সুবীরকান্ত জবাব দিল আলাপ আজই তবে জলপাইগুড়িতে আগেও দেখেছি ওকে, আমার কাকা আর ওর কাকা বিশেষ বন্ধু।

—ও। রমলাদি গম্ভীরমুখেই মাথা নাড়ল।—সেই জন্যেই, নইলে কলেজের মাস্টাররা স্কুলের মাস্টারদের দিকে ফিরেও তাকায় না।

সুবীরকান্ত জবাব দিল, তা কেন, অবস্থা তো দু'জনেরই সমান।

সুলতাদি যেন প্রস্তুত হয়েই ছিল ফোড়ন কাটল, দার্জিলিংয়ের উঁচু জায়গায় এসে আপনার দৃষ্টির অধোগতি হয়েছে দেখছি—কলেজে কী পড়ান, ফিলসফি নিশ্চয়ই?

—আজ্ঞে না, ইতিহাস।

ছদ্ম-বিস্ময়ে সুলতাদি তার সহচরীর দিকে ফিরল।—তুমিও তো ইতিহাস পড়াও রমলাদি, এ-রকম সাম্যবাদের কথা আছে নাকি কোথাও?

ঠোঁট উল্টে রমলাদি জবাব দিল, ঢের। সুলতান মামুদ নাদিরশা, তৈমুর লং মন্দির দেখলেই ধ্বংস করেছে, ছোট বড় তফাত করেনি, আর খুন করবার সময়ও মেয়ে-পুরুষে তফাত রাখেনি। তারপর ইংরেজ...হিন্দু মুসলমান ফরাসী শিখ—কাউকে ছোট করে দেখেনি, সকলের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।

দুই মহিলাব দ্বারা এ-ভাবে আক্রান্ত হয়ে আর শেষে সাম্যবাদের এই বেপেরোয়া বিশ্লেষণ শুনে সুবীবকান্ত গোবেচারার মতো হাসতে লাগল। রাখি ভাবছে, লোকটা বুদ্ধিমান হলে এবাব তার উঠে পালানো উচিত।

সুলতাদি বলল, রমলাদি একটু বেশি কথা বলেন, আপনি কিছু মনে কববেন না যেন।

হাসিমুখে মাথা নেড়ে সুবীরকান্ত এবাবে উঠেই দাঁড়াল।—না, এখানে এসে পর্যন্ত একঘেয়ে লাগছিল, আলাপ হয়ে আজ সময়টা ববং ভালই কাটল। আচ্ছা, আবাব দেখা হবে নিশ্চয—

সুলতাদি সায দিল, নিশ্চয, আমবা তো প্রাযই আসি এখানে।

সকলেব উদ্দেশে নমস্কাব জানিযে সুবীবকান্ত প্রস্থান করল। সেদিকে খানিক চেযে থেকে বমলাদি ডাকল, বাখি—

এবাবে তাকে নিযে পড়বে ওরা, বাখি ভালই জানে। সদ্যপরিচিত একটা লোকেব সামনে এই গোছেব বাচালতা তাব ভালো লাগছিল না। ডাক শুনে তাকালো শুধু।

—একটা গান কব তো।

বাখি কোনদিন গান করেও নি, গান জানেও না। কিন্তু এই ফর্মাসেব তাৎপর্য বুঝেছে। এই দুজনেব মধ্যে বমলাদির মুখখানাকেই সকলে বেশি সমঝে চলে। বযেস ছত্তিবিশ, দেখতে ভালো নয, বিয়ে-থা হবাব আশা নিজেও আব বাখে না। কিন্তু এতটুকু বসেব হদিস পেলে আব বক্ষা নেই।

—তোমাব প্রাণে বাতাস লেগে থাকে তো তুমি কবো!

টেনে টেনে বমলাদি বলল, লেগেছে, ছত্তিবিশেব প্রাণে বাহাত্তুবে বাতাস, গান কব না একটা, আজ বোধহয চেষ্টা কবলে পাববি।

বাখি হেসে ফেলল।

অমনি সোজা হয়ে বসে চোখ পাকালো রমলাদি।—আবাব হাসি! বলি, এক কাকাব ভাইপো'ব সঙ্গে আব-এক কাকাব ভাইঝি'ব কিছু একটা হযে-টযে যাবার সম্ভবনা আছে?

বাখি প্রায রাগ কবেই বলল, তুমি একটি অসভ্য।

—ও। আব নিজেরা যে নিরিবিলিতে ঘেঁষাঘেঁষি হযে বসেছিলি? স্কুলের কোনো মেযে দেখে ফেললে?

বাখি প্রতিবাদ কবল, ঘেঁষাঘেঁষি মানে। ভদ্রলোক তো ওই পাথবে বসেছিল।

সুলতাদি ইন্ধন যোগালো, পাহাড কিনা, নীচে থেকে ঘেঁষাঘেঁষি মনে হয।

—হোক। পাহাডটা কী আমাব, ভদ্রলোক এসে বসলে কী করব?

বমলাদি তক্ষুনি জবাব দিল, দুটো কাজ কবতে পারতিস। আসামাত্র বলে উঠতে পারতিস, এসো নাথ, আমি উমা, শিবের তপস্যায এই শৈলশিখবে বসে মাথা খুঁড়ছি! নয়তো এসে বসামাত্র পাথর তুলে তাড়া কবতে পারতিস! কিছুই যখন কবলি না, বুঝতে হবে তোর মনে অনিশ্চযতাব পাপ ঢুকেছে।

নিরুপায রাখি আবাবও হেসেই ফেলল।

এখানেই যে প্রজাপতির নির্বন্ধ সেটা বাখি দিনকতকেব মধ্যেই জেনেছে। আব সেটা এমন আচমকা জানা যে সে হকচকিযে গেছল।

তাব আগে কটা দিন সুবীবকান্তব সঙ্গে প্রায বোজই দেখা হযেছে। কোনদিন বমলাদি-সুলতাদিব সামনে, কোনোদিন বা একা। এই দেখা হযে যাওযাটা যে লোকটাব সক্রিয চেষ্টাব ফল সেটা বুঝতে বেগ পেতে হযনি। বমলাদি-সুলতাদিব ঠাট্টা-তামাসায নাজেহাল হযে লোকটাব প্রতি বাখি বলতে গেলে একটু বিবক্তই তখন।...কলেজেব মাস্টাব, এমনিতে হাবভাব গম্ভীব, কিন্তু তাব মধ্যেই তাব প্রতি উৎসুক-উৎসুক ভাবটা বাখি টেব পায। বমলাদি সুলতাদি আবো বেশি টেব পায। তাকে একলা দেখলে যেন আবো বেশি খুশি হয। গাযে পডে নিজেব কাকাব কথা বলে, ওব কাকাব কথা, বাডিব কথা জিজ্ঞাসা কবে, স্কুলে কী পডায, উঁচু ক্লাসে পডায কিনা খোঁজ নেয—আব কিছু কথা না পেলে বমলাদি-সুলতাদিব প্রশংসা কবে।

বাখিও মনে মনে বলে—সুবীবকান্ত না হ্যাংলাকান্ত।

কিন্তু আচমকা সেদিন এক অভাবিত মানসিক বিডম্বনাব মধ্যে পডে গেল বাখি গাঙ্গুলি।...বমলাদি আব সুলতাদিব সঙ্গেই জলাপাহাডেব দিকে যাচ্ছিল, কিছুদূবে ওই মূর্তি। গম্ভীব মুখে যেন তাবই প্রতীক্ষায দাঁডিযে আছে। বমলাদি গলা দিযে একটা চাপা শব্দ বাব কবে বাখিকে বলল, একটু ভাঁওতাবাজী কবব?

—যা খুশি কবগে। ভ্রূকুটি কবে বাখি জবাব দিল।

—আচ্ছা তুই বোসগে যা। বলেই সুলতাদিব হাত ধবে টেনে বমলাদি ভাঁওতাবাজী কবতে চলল। বাখি একাই তাদেব বসাব জাযগায উঠে গেল।

কিন্তু মিনিট সাতেক না যেতেই অবাক সে। তক্ষুনি বুঝে নিল বমলাদি ভাঁওতাবাজীটা আসলে কাব সঙ্গে কবেছে। তাব দিকেই একলা উঠে আসছে সুবীবকান্ত, ওবা দু'জন নিপাত্তা।

কাছে এসে সামনেব পাথবটায বসে পডল। তাডাতাডি ওঠাব দরুণ অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে। বলল, এ-বকম শবীব খাবাপ নিযেও পাহাডে ওঠা-নামা কবেন কী কবে, আশ্চর্য। তাব ওপব আজ সমস্ত দিন কিছু খাননি শুনলাম।

বাখিব বাগই হচ্ছে, সেই সঙ্গে বিব্রতও কম নয। জবাব না দিযে জিজ্ঞাসা কবল, ওঁবা কোথায?

—ওঁবা বাজাবেব দিকে গেলেন। বললেন, শবীব খাবাপ তাই আপনাব জন্যে ফল কিনতে যাচ্ছেন, আব আমাকে বললেন, গল্প কবাব ইচ্ছে থাকলে ওপবে চলে যান। হাসল। বমলা দেবী আবাব ঠাট্টা কবলেন, আমাব ববাতেও কিছু ফল-টল জুটতে পাবে।...আমি বেশ পেটুক আছি জানেন, এবাবে আসাব আগে আপনাব মা আমাকে একদিন খুব যত্ন কবে খাইযেছিলেন...কী চমৎকাব বান্না তাঁব।

কী থেকে কী কথা। বাখি অবাক, আমাব মা?

—হ্যাঁ, কাকা নিযে গেছলেন। খুব ভালো লেগেছিল তাঁকে।

বাখি ভেবেই পেল না তাব মা হঠাৎ এই লোককে আদব-যত্ন কবে খাওযাতে গেল কেন? সুবীবকান্ত অন্তবঙ্গ সুবে জিজ্ঞাসা কবল, যাক, আপনাব কী হযেছে বলুন তো?

—কিছু না।

—সমস্ত দিন কিছু খান নি শুনলাম যে?

—খেয়েছি। ঈষৎ বক্রসুবে জবাব দিল, তাছাড়া দার্জিলিংযেব বাতাস খেলেও কিছু কাজ দেয।

—বলেন কি। আমার তো উল্টে ঘন্টায় ঘন্টায খিদে পায়। হাসছে।...ওঁরা তাহলে ঠাট্টা কবেছেন, আমি কিন্তু আজ সত্যি আপনাকে খুঁজছিলাম—দেখা না হলে হযত আপনার বোর্ডিংযেই চলে যেতাম।

বমলাদি আর সুলতাদিব জন্যেই মেজাজ প্রসন্ন নয বাখিব। অন্তবঙ্গ উক্তিটা তাই স্পর্ধাব মতো ঠেকল কানে। জিজ্ঞাসু দু'চোখ তাব মুখের ওপব থমকালো।

সুবীবকান্ত বলল, সামনে চার দিন ছুটি আছে, আপনাদেবও ছুটি নিশ্চয়, ভাবছি একবাব জলপাইগুডি ঘুবে এলে হয।...যাবেন?

—না।

এ-রকম সাদাসাপ্টা জবাব আশা কবেনি সুবীবকান্ত। মুখেব দিকে একটু চেযে থেকে আবাব বলল, ছুটির মধ্যে এখানে বসে থেকে কী করবেন, চলুন না একসঙ্গে ঘুরে আসি।

বাখিব বাগ চডছে। মাসেব শেষে হাত খালি, ইচ্ছে থাকলেও যাওয়া হত না। কিন্তু অসহিষ্ণুতাব আসল কারণ, লোকটাব হ্যাংলামি দেখে। মাত্র ক'টা দিনেব আলাপে এ-বকম অনুবোধ কবাব মতো অন্তবঙ্গতা কিছু হযনি। কিন্তু কলেজেব মাস্টাবেব সঙ্গে কত আব অভদ্র ব্যবহাব করতে পাবে। আবাবও সংযত জবাবই দিল, না, আমাব যাওয়া সম্ভব নয়।

একটু চুপ কবে থেকে লোকটা দ্বিধান্বিত মুখে হাসল একটু। তাবপব বলল, আপনি বোধহয বিবক্ত হচ্ছেন, কিন্তু এদিকে আমি একটু মুশকিলে পড়ে গেছি...যাবেন না যখন, বোঝাপডাটা এখানেই সেরে নিই...আপনাব সত্যই শবীব খাবাপ নয তো?

এবাবে বাখি অবাক। গোডা থেকেই আজ কথাবার্তাব সুব অন্যবকম ঠেকছিল কানে। জবাব না দিয়ে মুখের দিকে তাকালো শুধু।

সুবীবকান্ত পকেট থেকে খাম বার কবল একটা। তাবপব সেটা তার দিকে এগিযে দিযে বলল, দার্জিলিংয়ে আসাব পব আমাব কাকাব এই তিন নম্বব চিঠি। পড়ুন—

বিস্ময়েব ওপব বিডম্বনা।—আমি কেন।

—আপনাব আব আপনাব মায়েব ব্যাপাব নিযে লেখা। পড়ুন।

—রাখি খামটা নিল। খুলল। কিন্তু পডতে শুরু কবাব সঙ্গে সঙ্গে দেহের রক্তকণাগুলো বুঝি মুখের দিকে ছোটাছুটি আরম্ভ কবে দিল। একটু অনুযোগেব সুরেই ভাইপোকে কাকা লিখেছেন, এব আগে দু'দুটো চিঠি লিখেও আসল প্রসঙ্গের জবাব পাননি। দার্জিলিংযে আসাব সময সে কথা দিযে গেছল রাখি গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা কবে এবং আলাপ কবে তাব মতামত জানাবে। এদিকে ভদ্রমহিলা (বাখিব মা) আশায দিন গুনছেন আব প্রায় রোজই খোঁজ নিচ্ছেন ভাইপোর মতামত কিছু জানা গেল কিনা। ভবসা পেলেই মেয়েকে তিনি চিঠি লিখতেন। কোনো খবর না পেয়ে মহিলা

ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছেন। কাকা লিখেছেন, পছন্দ যদি না-ই হয়ে থাকে তো এভাবে ঝুলিয়ে না রেখে সেটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে অসুবিধে কি? শেষের মন্তব্য, তাঁব মতে মেয়েটি ভালো এবং অপছন্দের নয়, ভাইপো এখানে বিয়ে কবলে ব্যক্তিগতভাবে তিনি খুশিই হতেন।

চিঠি শেষ করতে গিয়ে দার্জিলিংয়ের পাহাড়ে বসেও রাখি ঘেমে ওঠাব দাখিল। চিঠি খামেব মধ্যে পুরে রাখতে গিয়েও হাত কাঁপছে যেন। ও যতক্ষণ চিঠি পড়ছিল, সুবীরকান্ত ওর মুখের ওপর থেকে চোখ ফেরাতে পারেনি। বিড়ম্বিত রমণী-মুখের এমন মিষ্টি কারুকার্য আর বুঝি দেখেনি। হাত বাড়িযে খামটা নিল।

রাখি আব এদিকে ফিরে তাকাতেও পারছে না।

একটু অপেক্ষা করে সুবীবকান্ত বলল, এখন আমাব মত আমি জানাতে পারি, কিন্তু একতবফা মতেব উপব তো কিছু নির্ভব কবছে না, কী জবাব দেব বলুন?

নিজেকে রাখি বচনপটু বলে জানত। কিন্তু এখন আর গলা দিযে শব্দ বেরুতে চায না। এমন আচমকা বিড়ম্বনাব মধ্যে জীবনে পড়েনি। সামনেব দিকে চোখ বেখেই বলল, এ সম্পর্কে আমি কিছু ভাবিনি।

—ঠিক কথা।...আপনাব মা আপনাকেও লিখলে পাবতেন, তাহলে এ-বকম বিব্রত বোধ কবতেন না। তাঁব বোধহয় ধাবণা, আমাব মত পেলেই আটকাবে না। সে যাক, আপনার ভাবার সুবিধের জন্যে নিজেব সম্পর্কে দুই-একটা কথা বলে বাখি। জলপাইগুড়িব ওই এক কাকা ছাড়া আমাব তিনকূলে আব কেউ নেই। ম্যাট্রিক থেকে এম.এ. পর্যন্ত স্কলাবশিপেব টাকায পড়েছি। বি.এ. আর এম. এ. দুটোতেই ফার্স্টক্লাস পেয়েছি। একেবারে প্রোফেসারি পাওযাব কথা ছিল, কিন্তু পিছনে সুপাবিশের জোব না থাকায় লেকচারাবেব পোস্ট অ্যাকসেপ্ট কবতে হযেছে, আব এক-আধ বছবেব মধ্যে প্রোফেসার হব আশা কবাটা খুব বেশি হবে না বোধহয়।

এতগুলো কথা শোনাব ফাঁকে রাখি কখন এদিকে মুখ ফিবিয়েছিল জানে না। কথা শেষ হতে খেযাল হল দু'জনে দুজনাব দিকে চেযে আছে। তাড়াতাড়ি মুখ ফেবাল আবাব।

সুবীবকান্ত উঠে দাঁড়াল।—আচ্ছা আব বিবক্ত কবব না, ভেবে আমাকে জানাবেন।

চলে যাচ্ছে। বাখি সেদিকে চেযে আছে। যতক্ষণ দেখা গেল চেযেই বইল। তাবপব খেযাল হল, বমলাদি সুলতাদি এক্ষুনি ফিবে এসে তাকে নিয়ে পড়বে।

উঠে হনহন কবে সেও বোর্ডিংযেব উদ্দেশে নেমে চলল। গিযে কোন বকমে ঘবেব দবজা বন্ধ কবতে পাবলে হয। ভিতবটা কেমন যেন দিশেহারা হযে পড়েছে তাব। আবার সেই সঙ্গে মনে হচ্ছে, পাহাড়ী শহবটার বঙ যেন এক মুহূর্তে বদলে গেছে।...প্রথম দিন এসে আলাপ কবা থেকে এ-পর্যন্ত লোকটার কোনো আচবণই এখন আর বিসদৃশ লাগছে না।

কটা দিনের মধ্যে রাখি আর বোর্ডিং ছেড়ে বেরুতেই পারল না। কী একটা সঙ্কোচ যেন পায়ে জড়িয়ে আছে তাব।

নিজেব বিযেব সম্পর্কে ওব নিজেবই কোনো স্পষ্ট ধাবণা ছিল না। বিয়েব কল্পনা কবেনি এমন নয—কবেছে যখন বেশ ঘটা কবেই কবেছে। কল্পনায ঘটা কবতে দোষ কী? সেই সম্ভাব্য জীবনেব মানুষকে এক-সময সর্ব-যোগ্যতাব চূড়ায তুলেও বসিযেছে। তাব সঙ্গে আব যাই হোক, কলেজেব মাস্টাব সুবীবকান্ত চক্রবর্তীব মিল নেই। কিন্তু নিজেব এই সংগোপন কল্পনাটাকে বাখি গাঙ্গুলি বাস্তবেব মর্যাদা কখনো দেযনি। ববং আচমকা যে মানুষটা এগিযে এসেছে তাকেই এখন অন্যবকম লাগছে।.চেহাবা সাদামাটা হলেও চোখদুটো ভাবী উজ্জ্বল। কথাবার্তাগুলোও স্পষ্ট আব স্বচ্ছ। ম্যাট্রিক থেকে এম.এ. পর্যন্ত স্কলাব, এও খুব কম কথা নয। তাব ওপব স্কুল-মাস্টাব তো নয, প্রোফেসাব। প্রোফেসাব আব লেকচাবাবে এখনো খুব তফাত দেখে না সে।

. সেদিনেব নিজেব ব্যবহাবে বাখি নিজেই লজ্জা পাচ্ছে। কী কবে জানাবে ভিতবে ভিতবে এই ব্যাপাব চলেছে। বমলাদি আব সুলতাদিব ঠাট্টাতামাসা—কলেজ-মাস্টাবেব হ্যাংলামি ছাড়া আব কিছু ভাবতে পাবেনি। চাবদিনেব ছুটি শুযে বসে কেটে যাচ্ছে, একসঙ্গে জলপাইগুড়ি গেলেও মন্দ হত না। অন্তত ওবকম ঠাস-ঠাস জবাব না দিলেও হত।

আবাব বিযেটা এখানে যে হযেই যাবে, চিন্তাব এই নিশ্চিত প্রশ্রযেও গা ভাসাতে পাবছে না।. বিযেব বাজাবে এই সব ছেলেব দামও কম নয। কতটা আশা কবে বসে আছে ঠিক কি? যদিও খুব বেশি আশা কবছে বলে তাব মনে হয না। তবু তাকে এখানে এই বড়লোকী চালে থাকতে দেখে কী ভেবে বসে আছে ঠিক কী? তাদেব বাড়ি-ঘবেব ভেতবেব অবস্থা ঠিকঠিক জানে কী না তাই বা কে জানে। মাযেব তো ওই পাঁচ হাজাব টাকা সম্বল।

চিন্তা যে ভাবেই করুক, বাইবে বেরুবাব জন্যে ভেতবটা কদিন ধবে ছটফট কবছিলই। সেদিন সকালে মাযেব একটা চিঠি পেল। অন্যান্য পাঁচকথাব পব মা লিখেছে, ওমুকেব ভাইপো সুবীবকান্ত নামে একটি ছেলেব সঙ্গে তাব ইতিমধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হযেছে কিনা জানাতে। ছেলেটি এখানকাব কলেজেব প্রোফেসাব। তাকে দেখে আব তাব সঙ্গে কথাবার্তা বলে খুবই ভালো লেগেছিল। আশা ছিল, নির্বন্ধ থাকলে এখানেই বাখিব বিযেটা দিযে নিশ্চিন্ত হতে পাববে। তাব কাকাও আশা দিয়েছিল। এতদিনেও কোনো খবব না পেযে মনে হচ্ছে—হবে না। ছেলেটিব হযত আবও বড ঘবে বিযে কবাব ইচ্ছে। তবু এ-বকম কোনো ছেলেব সঙ্গে কখনো দেখা হযেছে কিনা মেযেকে জানাতে লিখেছেন।

সেই বিকেলেই বাখি চুপচাপ একা না বেবিযে পাবল না। বাস্তায নেমেই বুকেব ভেতবটা কেমন টিপটিপ কবতে লাগল।

জলাপাহাড়েই উঠল।

কেউ কোথাও নেই।...নিজে থেকে এসে আন্দাজে কোথায খুঁজবে? একবাব ভাবল ম্যালেব দিকটা ঘুবে এদিকে এলে পাবত। আবাব ভাবছে সেটা যেন বেশি বেশি হবে। পবিচিত জাযগাটা ছেড়ে আবো খানিকটা পিছনদিকে পাহাড়েব আড়ালে গিযে বসল।

এরও মনস্তত্ত্বগত কারণ আছে। বমলাদি সুলতাদি এসে পড়লে দূর থেকে দেখে ভাববে কেউ নেই। কিন্তু যে কারণে এই সাবধানতা, তাবই দেখা মিলবে কিনা কে জানে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। দেখা মিলল। কাছে এসে দাঁড়াল। আগেব দিনের মতো সামনে বসে পড়ল না। বলল, সেদিন ও-কথা বলে আপনাকে এতটা বিব্রত বা বিবক্ত করা হবে বুঝতে পারিনি। ক'টা দিন আপনার বেরুনোই বন্ধ হয়ে গেল। যাক, আপনার দিক থেকে কোনো সঙ্কোচের কারণ নেই, ও ব্যাপাবে স্বাধীন মতামত তো সকলেবই থাকা স্বাভাবিক। কিছু মনে কববেন না, দ্বিতীয়বার আর বিরক্ত কবব না।

বাখি ফাঁপবে পড়ল। ও যে বুদ্ধিব পবিচয় দিয়েছে—এই রকমই ভাবা স্বাভাবিক। ...এবাবে চলেই যাবে বোধহয। অতএব তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস কবল, আপনি জলপাইগুড়ি যান নি?

সুবীবকান্ত হাসল একটু। প্রশ্নটা যেন আশাপ্রদ ঠেকল কানে। বলল, যে জন্যে যাবাব চিন্তাটা মাথায় এসেছিল তাব আলোচনা তো এখানেই হয়ে গেল। এবপর কিছু না জেনে সেখানে একলা ছুটে লাভ কী?

বাখি নীবব আবাব। কী ভাবে যে প্রাসঙ্গিক আলাপটা শুরু কববে ভেবে পাচ্ছে না।

—আপনি কী ভেবেছিলেন আমি জলপাইগুড়ি চলে গেছি?

এবাবে বাখি একটু বুদ্ধিমতীব মতো কাজ কবল। হাঁ-না কিছুই জবাব না দিয়ে অল্প একটু হেসে বলল, বসুন।

ক'দিনেব মধ্যে দেখা না মেলাব একটাই অর্থ ধবে নিয়েছিল সুবীবকান্ত। তাকে এড়াবাব চেষ্টা। কিন্তু এই সামান্য অভ্যর্থনাব ফলেই সংশয় দেখা দিল। সামনেব পাথরে বসে ঈষৎ আগ্রহ নিয়েই তাকালো তার দিকে।

অন্য দিকে চোখ বেখে মৃদু গলায় রাখি বলল, আজ সকালে আমিও মাযেব চিঠি পেযেছি।

আবো কিছু শোনার আশায সুবীরকান্ত অপেক্ষা কবল একটু। তাবপব জিজ্ঞাসা কবল, আমি কী ধবে নেব, আমার সেদিনেব প্রস্তাবটা বাতিল হযে যায নি?

চোখ তুলে বাখি একবাব তাব দিকে না তাকিযে পাবল না। আব তাব পবেই সঙ্কোচ কেমন কমে আসতে লাগল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল, আমাদেব বাড়িব সব খবব আপনাব জানা আছে?

সুবীবকান্ত অবাক একটু।—কী খবব?

আবো মৃদু সুরে বাখি জবাব দিল, আমাদেব বাড়ির অবস্থা-টবস্থা...

বলাব পব নিজেরই বিচ্ছিবি লাগল বাখিব। অনুরাগ-পর্বের যেটুকু জানা আছে তাতে কোনো মেযে নিজে মুখ ফুটে এ-কথা বলেছে বলে শোনেনি। ওদিকে বক্তব্যটা বোধগম্য হতে সুবীবকান্ত তার দিকে চেয়ে হাসছে মিটি মিটি। বলল, কাকা কিছু কিছু বলেছেন, কিন্তু ও নিয়ে আমি মাথা ঘামানো দরকার মনে করিনি।...আমি গরিবের ছেলে, রাজত্ব বা রাজকন্যাব আশা রাখি না, শুধু মনের মতো একটি কন্যা পেলেই খুশি।

কথাগুলো কান পেতে শোনার মতো। রাখির সমস্ত মুখে লালের আভা ছড়াচ্ছে। হাসছে অল্প অল্প। হাওয়া অনুকূল সেটা সুবীবকান্ত বুঝে নিয়েছে। তাই আবো কিছু বলার লোভ সংববণ করতে পারল না। সামনের দিকে আব-একটু ঝুঁকল। হাসছে।—বললে বিশ্বাস হবে কিনা জানি না, বছব আটেক আগে একবাব কাকাব কাছে এসে তিস্তার চবে কতগুলো মেয়েকে হুটোপুটি কবতে দেখতাম। তার মধ্যে একটি মেয়েকেই ভারী জীবন্ত মনে হত আমাব। তাবপর আরো অনেকবাব এসেছি, অনেকবাব দেখেছি, কিন্তু দার্জিলিংযে এসে কাকা যে সেই মেযেকেই দেখতে বলে দিয়েছিলেন এতবাব কবে, কী কবে জানব।

লজ্জা সত্ত্বেও বাখি আবাব তাব চোখ না তুলে পাবল না। এই মুহূর্তে যেন একটা অদ্ভুত ভালো লাগাব স্বাদ তাব অস্তিত্ব ভবাট কবে তুলছে।

সুবীবকান্ত সবাসবি কাজেব কথায় চলে এলো এবাব।—এখন তাহলে আমি আমার কাকাকে চিঠি লিখতে পাবি?...হ্যাঁ কী না বলো?

মুখে বলা গেল না। বাখি হাসিমুখে মাথা নেড়ে সায় দিল। পুরুষগুলো এত চট কবে 'আপনি' থেকে 'তুমি'তে চলে আসে কী কবে ভেবে পায না।

ভাবতে না পাবাব আবও একটু বাকি ছিল। মাথাব ওপব একটা চলতি মেঘ যে আবো একটু আচমকা কৌতুক বর্ষণেব জন্যে এগিযে এসেছিল দুজনেব কেউ লক্ষ্য কবেনি। হঠাৎ একপশলা বৃষ্টিতে সচকিত দুজনেই। বাস্তায বেরুলে এখানে শবীবেব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেব মতোই ছাতা একটা থাকে সঙ্গে। সুবীবকান্তব সঙ্গে ছাতা আছে, কিন্তু বেরুবাব তাড়ায বাখি ছাতা আনতে ভুলে গেছে। চট কবে নিজেব ছাতাটা খুলে এগিযে এলো, তাবপব বাখিব গা ঘেঁষে ওই পাথবটাতেই বসে পড়ল।

দু'জনে অনাযাসে বসাব মত বড় নয পাথবটা। বাখি আড়ষ্ট একটু। গাযে গা ঠেকছে, কাঁধে কাঁধ লাগছে। তাছাড়া অন্তবঙ্গ না হলে পাঁচমিনিটেব বৃষ্টিব ঝাপটায সর্বাঙ্গ ভিজবে। কিন্তু পাশেব লোকেব তাকে ভিজতে দেবাব ইচ্ছে নেই। বৃষ্টিব ধারা আবো জোবে নামতে একেবাবে গাযেব সঙ্গে লেগেই বসল। ওদিকে আচমকা বৃষ্টিব প্রথম ঝাপটাতেই বাখিব মুখ আব মাথাব খানিকটা ভিজে গেছে।

সুবীবকান্ত হাসিমুখে জিজ্ঞাসা কবল, আজ ছাতা আনোনি যে?

—ভুলে গেছি।

সুবীবকান্ত বলল, ভুলেব জন্যে কৃতজ্ঞ।

বাখিও হেসেই ফেলল।

পাঁচমিনিটের বৃষ্টি। মেঘটা চলে যেতেই ঝলমলে আলো। যেন বসিকতা করবা জন্যই আসা। ছাতা বন্ধ করে সুবীরকান্ত পকেট থেকে রুমাল বাব কবে হাতমুখ মুছতে গিয়ে দেখে বাখি তার ব্যাগ খুলে রুমাল খুঁজছে। ব্যাগে রুমাল নেই, অর্থাৎ তাও ভুলেছে।

হাসিমুখে সুবীরকান্ত নিজেব রুমাল এগিযে দিল। দ্বিধা দেখে রুমালটা তাব হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, বিপাকে পড়লে লজ্জা কবতে নেই।

অগত্যা তাব রুমালেই মুখ মুছল বাখি। শবীরে কী এক অজানা অনুভূতি শিবশির করছে। রুমালটা তাব হাতে ফেবত দিযে হাসিমুখে বলেই ফেলল, এটা বিপাক!

রুমালটা দিয়ে বেশ চেপে চেপে নিজের মুখ মুছল সুবীরকান্ত। একটা লোভনীয় স্পর্শ যেন ওতে লেগে আছে। জবাব দিল, দু'জনের দু'রকমের বিপাক। তোমার বিপাক জলটা এল বলে, আর আমার বিপাক ওটা এত চট করে থেমে গেল বলে।... এবারে বোধহয় ভদ্রলোকের মতো আমার ওই পাথরটাতে উঠে যাওয়া উচিত।

হাসছে রাখিও। চোখের কোণে দুষ্টুমি। অল্প মাথা নাড়ল। অর্থাৎ তাই উচিত।

সুবীরকান্ত তক্ষুনি আবার বলল, কলেজের মাস্টার তো, উচিত কাজ করে করে ওটার ওপর একেবারে অরুচি ধরে গেছে। যেতেই পারে—তুমি কী বলো?

মুখের দিকে চেয়ে রাখি এবারে বেশিই হেসে ফেলল। জবাব দিল, আমিও স্কুলের মাস্টার।

সুবীরকান্ত মহা উৎফুল্ল। ওইটুকু পাথরের মধ্যেই মুখোমুখি ঘুরে বসার চেষ্টা। —তার মানে তোমারও অরুচি ধরেছে? ওয়াণ্ডারফুল।

রাখির ভালো লাগছে বটে, আবার ভাবগতিক দেখে ভয়ও করছে। রুচি বদলাবার আশায় আরো কী করে বসে ঠিক কী। কলেজের ছেলে বা স্কুলের মেয়ে এসে হাজির হতে পারে, আর সুলতাদি রমলাদি কেউ এ অবস্থায় দেখলে ওকে আস্ত রাখবে কিনা সন্দেহ।

সুবীরকান্ত হাসতে হাসতে বলল, আজ এই ররাত আমার কল্পনাও করিনি, ভেবেছিলাম তোমাকে সেদিন বিব্রত করার জন্যে দুটো পোশাকী কথা বলেই চলে যেতে হবে। পরের মুহূর্তে কী মনে পড়তে আতকে উঠল যেন।—কী সর্বনাশ!

কেউ এসেই গেছে ভেবে সচকিত হয়ে রাখি এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। কাউকে না দেখে বিমূঢ় দৃষ্টি গা-ঘেষা-লোকটার দিকে ফেরালো।

সুবীরকান্ত বলে উঠল, এটা তো শ্রাবণ মাস এসে গেল।

দুশ্চিন্তার কারণটা সঠিক বোধগম্য হল না। রাখি চেয়েই রইল।

—ভাদ্রয় বিয়ে নেই, আশ্বিনে বিয়ে নেই, কার্তিকে বিয়ে নেই। তোমাকে কাল পরশুর মধ্যেই ছুটি নিতে হচ্ছে, তারপর চলো দুজনে জলপাইগুড়ি পালিয়ে গিয়ে কাজটা সেরে আসি— আমার অত দেরি সহ্য হবে না।

তার চোখে চোখ রেখে রাখি হাসতেই লাগল।

বিয়ে হয়ে গেল। সেটা এত সহজে হল যে রাখির ভাবতেই অবাক লাগে। এই বিস্ময়ের সঙ্গে একটা রোমাঞ্চকর বিহ্বলতার মধ্যে দুটো মাস কেটে গেল।

তারপর শ্রীমতী রাখি চক্রবর্তী ধীরেসুস্থে তার শ্রীচক্রবর্তীটিকে নতুন করে আবিষ্কার করতে লাগল। তার প্রথম চোখ গেল লোকটার পড়ার নেশার দিকে। বই পড়ে লোক এত আনন্দ কী করে পায়, রাখি ভেবে পায় না। ফি-মাসে পার্শেলে কলকাতা থেকে বই আসে। তার বই যে কলেজের পাঠ্যবই-এর অন্তর্গত তা নয়, আবার ওই সব পড়ার ব্যাপার নিয়ে আলোচনার উৎসাহও কম নয়। ফলে রাখির ধৈর্য ফুরোতে সময় লাগে না। কিন্তু মনোযোগ দিয়ে শোনার ভান করেই কাছে এগোয়। লেকচার শুনতে শুনতে এক সময় চুপি চুপি বইটা সরিয়ে ফেলে। তারপর আলস্যভরে বুকের ওপর গা এলিয়ে দিয়ে হাই তুলে বলে, তারপর?

ফলে তাবপব যা সেটা কোনো আলোচনাব বিষয নয।

আবাব কোনো সময বা লেকচাব শুনতে শুনতে টান মেবেই হাতেব বই ফেলে দিযে নিজেব দুই ঠোঁট দিযে খানিকক্ষণ পর্যন্ত ওই মুখ বন্ধ কবে বাখে। শেষে নিবীহ মুখে জিজ্ঞেস কবে, তাবপব?

বাখি লক্ষ্য কবেছে, এই একটি মাত্র উপায ভিন্ন লোকটাকে পডাশুনাব জগৎ থেকে অন্য দিকে টেনে আনা খুব সহজ নয।

তাব দ্বিতীয আবিষ্কাব, লোকটা স্নেহ আব দবদেব কাঙাল। খুব অল্পবযসে বাপ-মা হাবিযেছে, আব আপনাব বলতে তেমন কেউ নেই বলেই বোধহয। ওব কাকা বা বাখিব মা চিঠিতে আদব কবে দু'কথা লিখলেই ভাবী খুশি। দু'জনেব সংসাবে কমবাইণ্ড-হ্যাণ্ড গোছেব একটা লোক বাখা হযেছে। প্রেসাব-কুকাবে বান্না সে-ই কবে ন'টা না বাজতে বাখি স্কুলে ছোটে, আসতে তো বিকেল। এবই মধ্যে ছুটিব দিনে ও যদি মানুষটাব জন্যে বাডতি একটু খাবাব-দাবাব কবে, তাতেই আনন্দে আটখানা। মাঝে একদিন সর্দিজ্বব হযেছিল। স্কুল থেকে ফিবে বাখি সেদিন আব বেবোযনি, শিযবেব কাছে বসে মাথায হাত বুলিযে দিচ্ছিল। সেটা যে বিশেষ কিছু কবা, বাখিব মনেও হযনি। কিন্তু একটু বাদেই অবাক সে। দু'চোখ যেন ছলছল কবছে।

বাখি ব্যস্ত হযে উঠেছিল।—কষ্ট হচ্ছে খুব?

মুখেব দিকে চেযে থেকেই আস্তে আস্তে মাথা নেডেছে, কষ্ট হচ্ছে না। বলেছে, কত সময অসুখে পডে থাকতাম, ওঠাব শক্তি নেই, হামা দিযে গিযে এক গেলাস জল গডিযে খেতে হযেছে।...আব আজ?

বাখিবও বুকেব ভেতবটা কেমন কবে উঠেছিল, মনে আছে নিজেব গালটা তাব কপালেব ওপব ছিল।

তৃতীয ব্যাপাব লক্ষ্য কবেছে, মানুষটাব গোঁ-ভবা অভিমান। প্রত্যাশা বেশি বলেই অভিমান বেশি। বাখি আগে স্কুলে চলে যায। কিন্তু একটা দিন তাব জামা-কাপড ঠিক-ঠাক কবে না বেখে গেলে মযলা জামা-কাপড পবেই কলেজে চলে যাবে। ভুল কবে নয, ইচ্ছে কবে। তাবপব ফিবে এসে অভিমান—অর্থাৎ বাক্যালাপ কম, চুপ।

বাখি হযত বলল, তোমাব কি নিজেব চোখ নেই? আমাব মনে ছিল না বলে এই জামা-কাপডে কলেজ কবে এলে?

জবাব, এলাম—এবপব যাতে তোমাব মনে থাকে সেই জন্যে।

আব একদিনও এই ভুল হযেছিল। সেদিনও একই ব্যাপাব। মিষ্টিকথায় দুই-এক কথায নিজেব ভুলেব কথা বলাব পবেও গম্ভীব দেখে বাখিবও বাগ হযে গিযেছিল। কিন্তু বাগ কবতে গিযে হেসে ফেলেই বলেছিল, আচ্ছা আমাব কী আগে আবো দু'পাঁচবাব বিযে হযেছে যে এত অভিজ্ঞতা—কোনো কিছুব ভুল হতে পাববে না?

তখন ঠাণ্ডা।

মনঃপুত নয এমন কিছু কবলেই অভিমান। নিজেব খেযালখুশিতেই বাখি এমন অনেক কিছুই কবে বসে। ঝোঁকেব মাথায স্কুল থেকে হযত দলেব সঙ্গে সিনেমায চলে গেল, নযত একেবাবে সন্ধ্যাব পব বেবিযে ফিবল কোথাও থেকে। ব্যস, মুখ

ভাব। ফলে আগেব থেকে মানুষটাকে ঠাণ্ডা বাখাব কৌশলও বপ্ত কবেছে বাখি।...সেদিন সুলতাদি বমলাদি ধবল—কাল ববিবাব, তাদেব টাইগাব হিলএ নিযে যেতে হবে। খবচ সব বাখিব। এড়ানো গেল না। ঠিক হল খুব সকালে বেরুবে, বেলা দেডটা দুটো নাগাদ ফিবে আসবে।

কথা দিযে আসাব পব বাখিব ভাবনা। মানুষটা সঙ্গে যাবে না জানা কথাই। ববিবাবে প্রথমে ছাত্র পডতে আসবে গুটিকযেক, তাবপব মাস্টাববা আসবে কেউ কেউ। তাদেব চা-টা একদিন অবশ্য ছোকবা চাকবটাই দিতে পাববে, কিন্তু তাহলেও ছুটিব দিনে সকাল থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত বাইবে কাটানো বাবুব সহজে ববদাস্ত হবে না। তাব ওপব একটু অন্যবকম বান্নাবান্না কবা হবে না বলে বেলা দুটো আডাইটে পর্যন্ত হযত না খেযেই বসে থাকবে।

অতএব উল্টো প্যাঁচ কষল বাখি। বাড়ি ফিবে মুখহাত ধুযে বিকেলেই মুখবোচক কিছু খাবাব তৈবী কবল। তাবপব গুনগুন কবে গান কবতে কবতে খাবাবেব ডিস সামনে এনে ধবল। সুবীবকান্ত বই-মুখে চিৎপাত হযে বিছানায শযান। বাখি তাব মুখে কিছুটা খাবাব গুঁজে দিতে সে হাসিমুখেই উঠে বসল।

জলযোগ শেষ হতে টুকিটাকি কিছু কাজ কবাব জন্য বেবিযে এলো। ও লোকটা আবাব বই নিযে শুযে পডবে জানা কথাই। খানিক বাদে বাখি লঘুপাযে ঘবে ফিবল আবাব। পর্দটা টেনে দিযে সোজা শয্যায তাব পাশে বসে পডে বইটা হাত থেকে টেনে ফেলে দিল। তাবপব আধ-বসা হযেই তাব বুকেব ওপব বুক বেখে দু'হাতে মাথাটা ধবে ঝাকালো একবাব। তাবপব একেবাবে মুখেব ওপব ঝুকে বলল, মাস্টাবমশায, আমাব একটা আর্জি আছে।

এই গোছেব বিস্মৃতি পেলে তখনকাব মতো পডাশুনাব আশায জলাঞ্জলি দিতে সুবীবকান্তব একটুও আপত্তি নেই। দু'হাতে তাকে বুকেব সঙ্গে চেপে ধবে আর্জি যেন মঞ্জুবই কবে ফেলল।—এই দিনেব বেলাতেই?

—ধ্যেৎ, অসভ্য কোথাকাব। হাত ছাড়াবাব চেষ্টা।

—আচ্ছা বলো বলো।

—না, আগে তুমি কথা দাও।

—কথা দিলে শেষে যদি তুমি ফ্যাসাদে ফেলো আমাকে?

—ও, এই টান আব এই বিশ্বাস তোমাব আমাব ওপব?

—ছাড়ো—

ছদ্ম বাগে আবাবও হাত ছাড়ানোব চেষ্টা।

—আচ্ছা, কথাই দিলাম। বলো।

—কাল সকালে তুমি ছেলে পডাবে না, আমাব সঙ্গে এক জাযগায যাবে?

—কোথায? আঁতকে উঠল যেন।

—টাইগাব হিলএ। খুব সক্কালে উঠে যাব, বেলা একটা দুটোব মধ্যে ফিবে আসব। সুলতাদি বমলাদি এমন ধবেছে, আমি কিছুতে এড়াতে পাবলুম না। ওবা ঠাট্টা কবে, মুখে মুখ লাগিযে আব কতকাল কাটাবি, চাব সাল তো হযে গেল।

এব পব বমলাদি-সুলতাদিব সঙ্গে ওকে ছাড়াই টাইগাব হিলএ ঘুবে আসাব জন্যে পাল্টা অনুবোধ শোনাব পালা। ছেলেগুলো সমস্ত সপ্তাহ এই একটা দিনেব আশায বসে থাকে, কী কবে যায সুবীবকান্ত—আগে জানলেও না হয কথা ছিল।

বেগতিক দেখলে বাখি এই গোছেব কৌশলে ঘবেব লোকেব অভিমান ঠেকিযে বাখে।

কিন্তু ও যেমন স্বামীব মান-অভিমান সবলতা-দুর্বলতাব সন্ধান পেযেছে, স্বামীটিও যে ঠিক তেমনি কবেই তাঁব স্ত্রীব চবিত্রটি নানা খুঁটিনাটিব ভিতব দিযে সকৌতুকে পর্যবেক্ষণ কবে চলেছে—সে খবব বাখিব জানা নেই।

না, এযাবৎ নিজেব স্ত্রীব প্রতি সুবীবকান্ত বিরূপ কখনো হযনি। ববং অনেক ব্যাপাবে তাব ছেলেমানুষি দুর্বলতা দেখে বেশ মজাই লেগেছে।...সর্বব্যাপাবে আধুনিক চটকেব ওপব স্ত্রীটিব অনুবাগ। প্রথমেই তাব নাক ধবে টান দিযেছিল, বলেছিল, আচ্ছা নামেব সঙ্গে তুমি আবাব একটা কান্ত জুড়েছ কেন? সুবীব চক্রবর্তী তো বেশ নাম।

ও হেসে জবাব দিযেছে, কান্ত নাই বলে বোধহয বাপ-মা নামেব ওপব দিযে অভাবটুকু উশুল কবতে চেযেছে।

—এখন ছেঁটে দাও।

—ছাঁটতে বাজি নই, ববং নাম বদলে বাখিকান্ত হতে পাবি।

বিযেব পবেই বাপেববাড়িতে দিনকযেক বাখি ওকে সুবীব বলেই ডেকেছে। কিন্তু একদিন ওব মাযেব কানে যেতে সুবীবেব সামনেই কযে ধমক।—ও কী বিচ্ছিবি! খববদাব নাম নিযে ডাকবি না।

—বা-বে! ও যে নাম ধবে ডাকে?

—ও ডাকুক, তুই ডাকবি না।

আপত্তি সত্ত্বেও মাযেব কথা ফেলতে পাবেনি। এখন আব ডাকে না।

দার্জিলিংযে আসাব দিনকযেক বাদে হঠাৎ একদিন বলেছিল, আচ্ছা এত বড় স্কলাব হযেও তুমি আই. এ. এস. পবীক্ষা দিলে না কেন?

—দিলে কী হত?

—দিলে আই. এ. এস. হতে পাবতে না? আমাব বন্ধু সোমাব আই. এ এস. বব, কী বিবাট চাকবি কবে এখন জানো?

ঠিক এই গোছেব ছেলেমানুষি ধবনেব কথা না হলে সুবীবকান্তব হযত খাবাপই লাগত। হেসেই ফিবে জিজ্ঞাসা কবেছে, কেন, কলেজেব মাস্টাব পছন্দ নয?

—মাস্টাব পছন্দ নয, তোমাকে পছন্দ।...চেষ্টা কবলে তুমি আই. এ. এস. হতে পাবতে।

—তা হযত হতে পাবতুম, কিন্তু এই বাখিকে পেতাম না।

—কেন?

—তখন আব দার্জিলিংযে আসতুম না, তোমাব সঙ্গে দেখাও হত না। তাছাড়া আই. এ. এস. হলে হযত লোভ আবো বেড় যেত, বাজকন্যা আব অর্ধেক বাজত্ব খুঁজতাম।

যুক্তিটা অস্বীকাব কবেনি বাখি, মাথা নেড়ে বলেছে, তা সত্যি, কী খবচটাই কবেছিল তোমাব কাকা, আমাদেব ঘব-বাড়ি বেচলেও অত হত না।

স্ত্রীব উঁচু দৃষ্টিব আঘাত পবেব এই ছেলেমানুষি উক্তিব দরুণই একটুও লেগে থাকে না। ববং মজাই লাগে শুনতে। গম্ভীব মুখে ও-কথাব পব বলেছিল, ধবো আই. এ. এস. অফিসাব হয়ে, আব তোমাব বদলে তোমাব বন্ধু সোমাব ববটি হয়ে আমি দার্জিলিংয়ে বেড়াচ্ছি—তোমাব দেখতে কেমন লাগত ?

ভালো যে একটুও লাগত না সেটা তাব মুখ দেখেই বোঝা গেছে। আব জবাবটা আবও ভালো লেগেছে।—ইস ! এখানেই যখন বিয়ে লেখা, যেভাবে হোক ঠিক তোমাব সঙ্গেই জুটে যেতাম আমি।

স্ত্রীব আব একটা স্বভাব লক্ষ্য কবে মুখ ফুটে কিছু না বললেও মনে মনে এক-আধ সময় উতলা হয়েছে সুবীবকান্ত। সর্বদাই বাখিব দৃষ্টি যেমন উঁচু দিকে, খবচেব হাতও সেই বকমই খোলা। বিলেতি ধাঁচেব নামী স্কুল, মাইনে ভালই। সুবীবকান্ত সে টাকা হাতেও নেযনি কখনো, বলেছে তোমাব কাছেই থাক। কিন্তু থাকছে যা এই ক'মাস সে ভালো কবেই দেখছে। সব মাসেব শেষেই তাব চিন্তা দেখেছে—হাতেব টাকা-টুকি ফুবিয়ে গেল, কী-যে কবি।

জিনিস দেখলেই তাব কিনতে ইচ্ছে কবে। মনেব মত ঘব সাজায়, সুবীবকান্তব জন্যেও এটা-সেটা কেনে। আব নিজেব জামা-কাপড় কেনা তো সব মাসেই লেগে আছে। মাইনেব অর্ধেক টাকা দিয়ে হয়ত একখানা শাড়ি কিনে বসল। পবে-পবে তক্ষুনি আবাব তাকে দেখানো চাই।—কেমন হয়েছে ?

চোখ তুষ্ট হলেও টাকাব অংকটা ভিতবে ভিতবে খচখচ কবতেই থাকে সুবীবকান্তব। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পাবে না। ফলে বসিকতা কবতে হয়, গবিব মাস্টাব —এই বাখিকে আমি বাখি কোথায় ?

বাখি তাইতেই খুশি, কোনো প্যাঁচ-পোঁচেব ধাব ধাবে না সে।

যাই হোক, আনন্দেব মধ্যেই দিন কাটছিল সুবীবকান্তবও। মাসপাঁচেক বাদে তাব মনেব দবজায় আব এক বৈচিত্র্য এসে হানা দিল। শুকনো-মুখ-বাখি সেদিন ঘবে ঢুকেই বলল, হয়েছে কাজ, এবাবে ঠিক গণ্ডগোল বেঁধেছে।

মুখ থেকে বই সবিয়ে সুবীবকান্ত জিজ্ঞাস কবল, কিসেব গণ্ডগোল ?

—আবাব কিসেব, যা হয় তাই, আবো খুব আনন্দ কবো—কতদিন বলেছি একটু সামলে-সুমলে চলো।

তবু বুঝতে সময় লেগেছে একটু। তাবপব বোঝা গেছে যখন বই ফেলে আনন্দে একেবাবে উঠে বসেছে।—সত্যি ? তাবপব মুখেব দিকে চেয়ে হাসতে সুরু কবেছে।

বাখি বাগ দেখাতে গিয়েও হেসে ফেলল।—তুমি তো মজা দেখবেই এখন, আমি ওদিকে চিন্তায় মবি।

—কিসেব চিন্তা ?

—স্কুলে তো আব একবছব ধবে ছুটি দেবে না, কিছুদিন গেলেই মেয়েবা ঠিক টেব পাবে। কী লজ্জাব কথা হল বলো তো ?

ছদ্ম গাম্ভীর্যে মাথা নেড়ে সায় দিল।—তাহলে এক কাজ করো, স্কুলের চাকরি ছেড়ে দাও।

—বলো কী, চাকরি ছেড়ে এখন থেকে আমি ঘরে বসে থাকব?

—তাহালে চোখ-কান বুজে স্কুল করতে থাকো।...তোমাদের স্কুলের টিচারদের বুঝি কারো ছেলেপুলে নেই।

—থাকবে না কেন, মেম-টিচারগুলোর তো এক-একজনের তিনটে-চারটে করে ছেলেপুলে, ওদের অত লজ্জাসরমের বালাই নেই।

সুবীরকান্ত আরো গম্ভীর।—প্রথমবার বলেই তোমার লজ্জা, পরের বার থেকে আর তোমারও থাকবে না।

এবারে গাম্ভীর্যের আড়ালে কৌতুক লক্ষ্য করল রাখি। রাগতে গিয়ে আবার ও হেসে ফেলল।—ভালো হবে না বলছি, সখ দেখে আর বাঁচি না।

এই সমাচারের দিন-কয়েকের মধ্যে সুধীরকান্তর এই বহু প্রত্যাশিত পদোন্নতির সংবাদ এলো। এই কলেজেই লেকচারার থেকে প্রফেসার হয়ে গেল সে। সেদিন কলেজ থেকে ফিরেই আনন্দে আটখানা হয়ে রাখিকে খবরটা দিল সে। আর রাতে চুপি চুপি বলল, যে আসছে সে বিশেষ ভাগ্য নিয়েই আসছে, বুঝলে...নইলে উন্নতির আশা তো কবে থেকেই করছিলাম, এতদিনেই বা হল কেন?

শুনে রাখিও খুশি বটে, কিন্তু তার মনে তখন নানা চিন্তা।

এর পরের কতগুলো মাসে যথার্থই আনন্দের মধ্য কাটল সুবীরকান্তর। নিজের মনেই জীবনের একটা নতুন স্বাদ অনুভব করে সে। আলো-বাতাসও অন্যরকম মনে হয়। রাখিকেও কেমন নতুন মনে হয় তার। ওর সর্বশরীরে যেন নতুন ছাঁদ, নতুন সুষমার ছোঁয়া লেগেছে। চেয়ে থাকে, চুরি করে দেখে। আবার ধরাও পড়ে। রাখি লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলে।—কী দেখছ?

সুবীরকান্ত হাসে শুধু।

সময় এগিয়ে আসতে স্কুল থেকে রাখি তিন মাসের ছুটি পেল। ভিতরে ভিতরে তার নানারকম ভয়-ভাবনা। তাই ও প্রস্তাব করল, এ সময়টা মায়ের কাছে গিয়ে থাকলে কেমন হয়। আপত্তি করা উচিত নয়। কিন্তু এবারে সুবীরকান্তই দুর্ভাবনার মধ্যে পড়ে গেল।—তিন মাসের জন্য? ও বাবা, আমি থাকব কী করে?

অসহায় মুখখানা দেখে তার হাসিই পেল।...মায়ের কাছে যেতে ইচ্ছে করছে বটে, কিন্তু সেই সময় এই লোক কাছে থাকবে না ভেবে আবার ভয়-ভয়ও করছিল। অতএব এখানেই থাকা মনস্থ করল সে। তাছাড়া এখানে ভালো ডাক্তার আর সুব্যবস্থার আশ্বাসও বেশি। তার ওপর সুবীরকান্ত যখন বলল, মাকেই ররং মাসখানেকের জন্য এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করবে—তখন অনেকখানি নিশ্চিন্ত।

মেয়ে হল।

আর তাতেই যেন সুবীরকান্ত বেশি খুশি। মাস-দেড়েক না যেতে কাঁপা হাতে শাশুড়ীর হাত থেকে মেয়ে কোলে নিয়ে বসতে চেষ্টা করেছে। নড়তে-চড়তে

ভয়, পাছে মেয়েব লাগে। বাপকে রাগাবাব জন্যেই মেয়েটাকে কুচ্ছিত বলে বাখি। তাব কারণ মেযের রং একটু চাপা হবে বলেই মনে হয়, কিন্তু মুখশ্রী সুন্দর। শাশুড়ীর সামনেই এই নিয়ে ঝগড়া। মেয়ের নাম নিয়েও। সুবীর প্রস্তাব কবে রাখির মেযেব নাম পাখি হোক। রাখি তক্ষুনি স-ঝঙ্কারে আপত্তি কবে, হ্যাঁ বয়েসকালে শেষে উড়ে পালাক আর কী!

সুবীর হাসে।—বয়েসকালে তো উড়ে পালাবেই। শাশুডীর অনুপস্থিতিতে সেদিন বলেছিল, উড়ে পালাবাব সময হলে ওকে পরামর্শ দেব দার্জিলিংযে জলাপাহাড়ে উঠে বসে থাকতে।

কিন্তু আবো মাসখানেক না যেতেই বাখি সত্যিকাবেব দুর্ভাবনাব মধ্যে পডল। মা তখন জলপাইগুডি ফিবে গেছে। বাখি আবাব স্কুলে যেতে শুরু কববে ভাবছে। তিন মাসেব পবে আবো দেড মাসেব আধা-মাইনেব ছুটিও ফুবিযে এসেছে। মেয়েব জন্য সবে ভালো একটা আযা বাখা হযেছে। সব সুব্যবস্থাব মধ্যে আচমকা এই খবর।

সুবীরকান্ত কলকাতায বদলিব হুকুম-পত্র পেয়েছে। শুনে বাখি বিমূঢ একেবাবে।

—কি হবে তাহলে?

—কি আবাব হবে, যাব।

—আর আমি?

—তুমিও যাবে।

এই নির্লিপ্ততা দেখে বাখি আরো অবাক যেন।—চাকবি ছেড়ে দেব?

সুবীরকান্ত হাসতে লাগল. তুমি কী ভেবেছ চিবকাল আমি এই দার্জিলিংযেই থেকে যাব?

না, রাখি কিছুই ভাবেনি। সমূহ সমস্যাটাই তাব কাছে বড। সে জোব দিযে বলল, এখন চাকবি ছাডা কোনো কাজেব কথা নয়, তুমি বদলি ক্যানসেল কবার ব্যবস্থা কবো।

—পাগল নাকি!

এই এক কথাতেই রাখি বুঝে নিয়েছে সেটা সম্ভব নয়, অথবা সম্ভব হলেও এই লোক সে-রকম তদবিরের ধাব-কাছ দিযেও যাবে না। গোড়াতে বাগই হয়ে গেছে তার। আসলে সে চাকবি কবে এটাই বোধহয তাব পছন্দ নয—ঘবেব মধ্যে মেয়ে আগলে বসে থাকুক তাই চায। এই অনুযোগেব পরেও মানুষটাব তাপ-উত্তাপ নেই, কেবল হাসে।

রাখি বলতে ছাড়ে না, এই তো মাইনে, চলবে কী কবে?

সুবীরকান্ত যেন আরো মজা পায।—এক-বেলা খাব, কী আব করা যাবে...এত বড চাকরিটা তোমার! শেষে হেসেই বলে, তোমাব এত ভাবনা কেন, কত লোকে বুড়ো বয়েসে প্রফেসাব হয়েও চাব-পাঁচটা ছেলেপুলে নিয়ে চালায়, আর একটা মেয়ে নিয়ে আমাদের চলবে না? তাছাড়া কলকাতায় মেয়ে-স্কুল নেই? চাকরি করতে চাইলে তোমার এত বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে একটা চাকরি পাবে না সেখানে?

এই প্রথম একটু আশার কথা শুনল যেন। আব তারপর সুবীরকান্ত যে প্রস্তাব দিল, ভাবতে গেলে সেটা রোমাঞ্চকরই বটে। সুবীরকান্ত পরামর্শ দিল, একটা কাজ যদি করো তো দেখবে এই বদলিটা আমাদের কাছে আশীর্বাদই হযেছে। কলকাতায গিযে ঘবে বসে দুটো বছব পডাশুনা কবে এম. এ.-টা পাশ করে নাও। স্কুল ছেড়ে তখন কোন কলেজেই চাকবি পেযে যাবে...আব মেযেটাও ততদিনে একটু বড হবে।

ববাবব উঁচু দিকে দৃষ্টি বাখিব, তাই শোনামাত্র উৎফুল্ল। কিন্তু পরক্ষণে নিজেব ওপব অনাস্থা।—হ্যাঁ, এতকাল বাদে আবাব আমি করব এম. এ. পাশ, তাহলেই হযেছে।

মুখে বললেও এ সম্ভাবনাটা একটা বডগোছেব আশাব মতই মনেব কোণে লেগে থাকল। তবু যাবাব আগে তার মন-খাবাপ। খুঁতখুঁত কবে বলল, এই মেযেটাই অপযা, আসতে না আসতে আমাব চাকবিটা গেল।

কলকাতায় এসে জীবনেব নতুন অধ্যায শুরু। আডাইখানা ছোট ঘরেব ফ্ল্যাট নিযেছে একটা। তাবই ভাডা এককাঁড়ি। গোড়ায গোড়ায বাখি আবাব চিন্তা কবেছে —চলবে কী কবে?

—ঠিক চলবে, কিছু ভেবো না। সুবীবকান্তব সেই এক কথা।

চলে যাচ্ছে ঠিকই। কিন্তু বাখিব মনে মনে বাসনা, আর একটু ভালো চললে ভালো হত। ভিতরে ভিতবে সেই ভালো দিনে পদার্পণেব সঙ্কল্প নিযেই এম. এ. পড়াব জন্য প্রস্তুত হল সে।

আলাপ-আলোচনা কবে ইকনমিক্স-এ এম. এ. পডা সাব্যস্ত হল। বি. এ.-তে এই বিষযটা ভালই লাগত তাব। এ ব্যাপারে সুবীবকান্তবও উৎসাহ কম নয। বই-পত্র সংগ্রহ কবে দিল। তাব কলেজেব ইকনমিক্স-এব এক তরুণ লেকচাবাবকে বাডিতে এনে হাজিব করল। সুদর্শনা ছাত্রী-বউদিকে সে যথাসাধ্য সাহায্য কববে সানন্দে প্রতিশ্রুতি দিযে গেল।

সুবীবকান্ত বলল, খুব বিদ্বান ছেলে, যতখানি পাবো আদায কবে নাও।

বাখি ধবেই নিযেছে তাব এম. এ. পাশেব বাস্তা সুগম। মনেব আনন্দে তাই ঠাট্টা কবেছে, বেশি আদায কবতে গেলে সেও যাদি কিছু আদায কবতে চায?

অবসিক স্ত্রীব কাছে সুবীবকান্তও নয। পাল্টা ঠাট্টা কবেছে, গুরু যখন, চাইলে কী আর করা যাবে...কিন্তু খুব গোপনে, আমি যেন জানতে না পাবি।

বাখিব ভালো পাশ কবাব ইচ্ছে যত, ধৈর্য তত নয। বেশি পডাশুনার নামে তার হাঁপ ধবে যায। বিশাল সমুদ্র সে পার হবে কী কবে, বই-পত্র খুলে এক-একসময গালে হাত দিয়ে তাই ভাবে। ভাবতে ভাবতে অসময়ে ঘুম পেযে যায। তাবই ঘরেব লোক বিনা উদ্দেশ্যেও অত পড়ে কী কবে সেটা তাব কাছে এখন এক বিস্ময। বইগুলো বোঝাব মত ঠেকে। মন হালকা কবাব জন্যে বিকেলেব শো'যে দু'জনেব সিনেমাব টিকিট কেটে বসে। সুবীরকান্ত কখনো বিবক্ত হয, কখনো হাসে।—এভাবে চললেই পাশ করা হয়েছে আব কী!

বাখি রেগে যায়, না হয় না হবে, আব পাবিনে বাপু, কেবল মাস্টারি! কখনো বলে, আমার দ্বারা কিছু হবে-টবে না, আমাব জন্যে তুমি একটা স্কুল-মাস্টারিই দেখো।

সুবীরকান্ত সে-কথা কানে তোলে না। পড়ার তাগিদ দেয়। ফাঁক পেলেই রাখি মেয়েব ঘাড়ে দোষ চাপায়, ওব জন্যে পড়াশুনা হচ্ছে না। মেযেব জন্যে ওদিকে সর্বক্ষণেব ঝি আছে একটা। আব বাপেব আদুবে মেয়ে, বাপকে দেখলেই তার কোলে চেপে বসে থাকে। তাই ওব জন্যে পড়া কেন হয না সুবীবকান্ত ভেবে পায় না। তা ছাড়া ঠিকে-চাকব আছে একটা, দু'বেলার বান্না আব বাড়ির কাজ সে-ই করে দিয়ে যায়। এ-সব ব্যবস্থাব ফলে প্রতি মাসেই খরচেব টানাটানি। কিন্তু পারতপক্ষে সুবীবকান্ত তা জানতে দেয না।

দ্বিতীয় বছবেব কযেকটা মাস কেটে যেতে বাখি একদিন হাত-পা ছড়িযে কাঁদতে বসল। পড়া কিছুই এগোযনি, কী কবে পবীক্ষা দেবে।

আব তখুনি ঘবেব লোকেব আবেক রূপ দেখল সে। প্রথমে বিবক্ত হযে হুকুম কবল, সব কটা পেপাবে শূন্য পেলেও গিযে পবীক্ষা দিযে আসতে হবে। তাবপব বলল, আচ্ছা তোমাব পাশ-ফেলেব দায আমাব। যা বলি তুমি শুধু তাই কবে যাও, আব কিছু ভাবতে হবে না।

এবপব থেকে দেখা গেল, ইতিহাস বই ছেড়ে তাব ইকনমিক্স বই নিযে পড়াশুনায মগ্ন হযেছে লোকটা। আব দু'বেলা নিজেই তাকে পড়াতে বসে যায। প্রথমে বাংলায জলেব মত কবে বোঝায, তাবপব ইংবেজিতে। এক-একটা দুরূহ পবিচ্ছেদ যে এত সহজে শেষ হতে পাবে তাব যেন বিশ্বাস হয না। পড়ানো হলে ঘুবিযে ফিবিযে নানাভাবে প্রশ্ন জিজ্ঞেস কবে, ঠিক হলে উত্তব লিখে বাখতে বলে। আগেব কয়েক বছবেব প্রশ্ন-পত্র এনে সেগুলিব খুঁটিনাটি জবাব শেখায—লেখায। খববেব কাগজ থেকে অর্থনৈতিক প্রসঙ্গেব কাটিং বেখে তাকে পাঁচবাব কবে পড়তে বলে, লিখতে বলে। সব লেখাই আবাব ধৈর্য ধবে সংশোধন কবে দেয়। এই তন্ময গম্ভীব মানুষটাকে তখন যেন খুব কাছেব কেউ বলে মনে হয না তাব।

নিজেব অগোচবেই একটু একটু করে আস্থা ফিবছে রাখিব। তাই শঙ্কাব ভাবটা কমছে। সব থেকে বড় কথা, একটু দুশ্চিন্তা দেখলেই মানুষটা ধমকায তাকে।—তোমাকে তো বলেছি, শূন্য পেলেও তোমার কোন দোষ হবে না—সব দায় আমার।

এ-কথা শুনলে মনেব জোব কাব না বাড়ে। তাই বাত্রে দুজনে মুখোমুখি আধশোযা হযে পড়াশুনা চলে যখন, বাখিব মাথায় এক-এক সময দুষ্টুমি চেপে বসে। একেবাবে বুকেব কাছে এগিযে গেলেও এত তন্ময যে খেযাল কবে না। বাখি তখন আচমকা দু'হাতে জাপটে ধরে তাকে, গালে গাল চেপে বলে, তারপব?

ধ্যানভঙ্গ হয তখন। সেদিন এমনি ব্যাপাবের পব সুবীবকান্ত তাকে টেনে ধবে বেখে জবাব দিল, তাবপব পবীক্ষা হযে গেলেই আব একবাব নির্ঘাত তোমার নার্সিং হোমে যাবাব ব্যবস্থা!

ছিটকে সরে আসতে চেষ্টা কবেছে বাখি।—খবরদার, কখখনো না।

আব ছেলেপুলে হবাব ব্যাপারে বাখির বেজায় আপত্তি। বলে, একটাই বেঁচে থাক, পাখিকে ভালো কবে মানুষ করো, আর বেশিতে কাজ নেই।

মেযেব ডাক-নাম পাখিই আছে। সুবীরকান্ত হাসে। বলে দেখা যাবে।

পবদিন সকালেই আবাব সেই পঠন আব পাঠনেব তন্ময়তা।

বেশ নির্বিঘ্নে এম. এ পাশ কবাব পবেও বাখি ভোলেনি আসল কৃতিত্বটা কাব। ভালই পাশ কবেছে। মাঝামাঝিব থেকেও একটু উঁচুব দিকেব সেকেণ্ড ক্লাস। সেটুকুও আশাব অতিবিক্ত। ফল যেদিন বেরুল বাখি সেদিন গম্ভীব মুখে সুবীবকান্তকে জিজ্ঞেস কবেছিল, জীবনে বোধহয এই পবীক্ষাটাই সব থেকে খাবাপ হল, কেমন?

যেন সুবীবকান্তই পবীক্ষা দিযেছে এবং পাশ কবেছে। সে হেসে জবাব দিযেছে, হ্যাঁ।

জীবনযাত্রাব পট পবিবর্তন আসন্ন বলেই বোধহয এমন দিনে একজনেব সঙ্গে দেখা বাখিব। সেদিন কী একটা ইংবেজী সিনেমা দেখতে গেছল তাবা, তাদেব সামনেই ঝকঝকে গাড়ি থেকে নামল একজোড়া মেযে-পুরুষ। মেযেটি গোলগাল মোটাসোটা, পবনে দামী শাড়ি, গলায আব হাতে দামী গযনা। পুরুষটি ফিটফাট বাঙালী সাহেব। গাড়ি থেকে দম্পতিটিকে নামতে দেখেই সিনেমা দেখাব আকর্ষণ ভুলে বাখি হাঁ কবে তাদেব দিকে চেযে বইল। পাশ কাটিযে যাবাব মুখে মহিলাটিও তাকে দেখে থমকে দাঁড়াল।

অস্ফুট বিস্মযে বাখি বলে উঠল, সোমা না?

—বাখি, তুই!

হলেব সামনে দুটি বমণীব পুলকিত জড়াজড়িব দৃশ্য দেখল অনেকে। তাদেব স্বামী দুটি পবস্পবকে দেখে নিল একবাব।

বাখিব সহপাঠিনী সেই সোমা আব তাব আই. এ. এস. স্বামী বমেন্দ্র সবকাব। বান্ধবীব হাত ঝাঁকিযে বাখি বলে উঠল, কী গোল হযে গেছিস বে তুই, আমি তো প্রথমে হকচকিযে গেছি! পবক্ষণে আই. এ এস-এব দিকে তাকিযে দু'হাত জুড়ে নমস্কাব জানালো, চিনতে পাবেন?

বিব্রত জিজ্ঞাসু নেত্রে স্ত্রীব দিকে তাকালো ভদ্রলোক।—সোমা সবকাব বলল, চিনবে কী কবে. বিযেব সময সেই তো একবাব দেখেছে! পবিচয কবিযে দিল. আমাব বন্ধু বাখি গাঙ্গুলি—ওমা, গাঙ্গুলি বলছি কেন! সুবীবকান্তব দিকে চোখ আটকালো তাব, পবক্ষণে বাখিব দিকে ফিবল।—বল না, ইনি নিশ্চয?

হাসিমুখেই মাথা নাড়ল বাখি।—প্রফেসব সুবীব চক্রবর্তী।

আব এক-দফা সৌজন্য বিনিময। ওদিকে সিনেমায দ্বিতীয বেল বেজে গেছে। খুশিব ব্যস্ততায সোমা জিজ্ঞাসা কবল, সিনেমা দেখবি তো? কোথায সীট তোদেব?

কোথায সীট বাখি জানে না, তবু বিব্রত অভিব্যক্তি একটু। সুবীবকান্ত জবাব দিল, নীচে।

সোমাদেব ওপবেব সব থেকে সেবা সীট সন্দেহ নেই বাখিব। কিন্তু সোমা কিছু খেযাল না কবেই বলল, শো শেষ হলে পালাবি না বলছি, এইখানে দাঁড়াবি—কতকাল বাদে দেখা!

এত দিন বাদে দেখা হওযাব ফলে বাখিও খুশি কম নয। কিন্তু সোমাব সঙ্গে তাব অবস্থাব তাবতম্যটা এভাবে স্পষ্ট না হযে উঠলে যেন আবো খুশি হত। এতদিন

বাদে আজ আবাব মনে হল, তাব ভদ্রলোকও যদি আই. এ. এস-টাই হতে পারত— ইতিহাসের মাস্টার হয়েও যে আনায়াসে এম. এ. ক্লাসেব ইকনমিকস পড়াতে পারে—ইচ্ছে করলে সে অনেক কিছু হতে পারত।

সীটে বসে বিস্ময় প্রকাশ করল, সোমাটা কী বিষম মোটা হযেছে, দিব্বি ছিপছিপে চেহারা ছিল !

একটা কথা ভেবে সুবীরকান্ত মনে মনে কৌতুক বোধ করছিল, পবিচয় দেবাব সময় বাখি সুবীরকান্ত বলেনি. শুধু সুবীর চক্রবর্তী বলেছে। ওব কথা শুনে মৃদু জবাব দিল, তোমার মত তো আব মাস্টাবেব বউ নয়, আই. এ. এস-এর বউ—সুখে আছেন। ...কিন্তু শো ভাঙলে মহিলা আবাব তো চড়াও করবেন মনে হচ্ছে।

চাপা হেসে বাখি জবাব দিল, তোমাব তাতে ভযটা কী, সঙ্গে আমি আছি, ওর ববও আছে।

শো ভাঙতে শুধু চডাও করা নয, কোনো ওজর-আপত্তিতে কান না দিযে সোমা সবকাব একেবারে গাডিতে টেনে তুলল তাদের। আই. এ. এস. সামনে ড্রাইভারেব পাশে বসল, তাবা তিনজন পিছনে।

হাসিমুখে সোমা সবকাব সুবীবকান্তব উদ্দেশে বলল, আপনাব স্ত্রী-টি মশাই কি যে দুষ্টু ছিল আপনাব কোনো ধাবণা নেই, আমাদের একেবাবে নাজেহাল করে ছাডত।

সুবীবকান্ত মন্তব্য কবল, স্বভাব এখনো খুব বদলায়নি।

সোমা সবকাব হালকা সুবে চ্যালেঞ্জ কবল, আপনাকে তো বেশ ভালো মানুষ মনে হচ্ছে, না বদলালে সামলান কী করে ?

—সামলাবাব চেষ্টাও কবি না, হাল ছেড়ে দিয়েছি।

সকলেই হেসে উঠল। এমন কী সামনে থেকে বমেন্দ্র সরকাবও হাসিমুখে এদিকে তাকালো।

সোমা সবকাব বলল, না সামলালেও আপনাব স্ত্রী আগের থেকে ঢেব বেশি সুন্দব হযেছে এখন. বুঝলেন ?

সুবীবকান্ত জবাব দিল, আমি সামান্য মাস্টার. এতেও আমাব কিছুমাত্র হাতযশ নেই।

আবার একপ্রস্থ হাসি। বাখিব কানের কাছে মুখ এনে সোমা সোচ্ছ্বাসে বলল, বেশ লোকটি তো বে তোব। তাবপব তেমনি চাপা গলায় জিজ্ঞাসা কবল, চেহারাখানা তো দিব্বি কচি রেখেছিস—ছেলেপুলে কী ?

—একটা মেয়ে।

সোমা জোরেই বলে উঠল, মাত্র !

বাখি তাব হাঁটুতে একটা চিমটি কেটে মুখ বন্ধ করতে চাইল। তারপর গলা আরো খাটো করে জিজ্ঞাসা করল, তোব ?

সোমা সরকার ছদ্ম-কোপে তাব আই. এ. এস. স্বামীর দিকে তাকালো একবার। তাবপর জবাব দিল, আমার এক গণ্ডা।

বলা বাহুল্য, যত নীচু স্বরেই তারা বাক্যালাপ করুক, সুধীরকান্তর কানে এসেছে সবই।

সোমার বাড়ি-ঘর দেখে দু'চোখ জুড়িয়ে গেল রাখির। ছবির মত বাড়ি, চমৎকার আসবাব-পত্র, আর তেমনি পরিপাটি ব্যবস্থা সব-কিছুর। ওর ছেলেমেয়েগুলোও তেমনি ফুটফুটে সুন্দর। সুখের ঘরে রূপের বাসা। রাখির যেমন স্বভাব, নিজের অবস্থার তুলনামূলক চিত্রটা মনে আসছেই।

বাড়ি ফিরে রাত্রিতে বিছানায় গা এলিয়েও ওদের কথাই ভাবছিল। বলল, কী চমৎকার আছে সোমারা, তাই না?

কাছে এগিয়ে এসে সুধীরকান্ত সায় দিয়ে বলল, চমৎকার, কিন্তু ওদের তুলনায় আমি আর এত পিছিয়ে থাকতে রাজি নই।

রাখি উৎসুক নেত্রে তাকালো তার দিকে। ভাবল অবস্থা ফেরানোর কোনো মতলবের কথাই শুনবে।

—ওদের চারটে ছেলেপুলে, আমার মাত্র একটা থাকবে কেন?

—যাও! রাখি ঠেলে সরাতে চেষ্টা করেছে তাকে।—তোমার কেবল ওই চোখে পড়েছে! কার সঙ্গে কার তুলনা!

সত্যি কথাই বলেছে। কিন্তু সব সত্যি কথা সর্বদা ভালো লাগে না। শেষের এই তুলনার উক্তিটুকু সুধীরকান্তর কানে খুব মিষ্টি লাগল না।

এরপর সোমা সরকার একদিন তাদের ফ্ল্যাটে এলো। রাখি তাকে কোথায় বসাবে, কতভাবে আপ্যায়ন করবে ভেবে পায় না। তার গাড়ি পাঠিয়ে ওকেও দু'তিনদিন তার বাড়িতে নিয়ে গেল।

সেদিন তাদের বাড়ি থেকে রাখি রীতিমত একটা উত্তেজনা নিয়ে ফিরল। একটা অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য যেন সেধে তার দোরগোড়ায় এসে হাজির হবার উপক্রম করেছে। এখন শেষ পর্যন্ত এলে হয়।

সুধীরকান্ত ব্যাপারটা শুনল। আই. এ এস. রমেন্দ্র সরকার এখন ডিরেক্টর অফ সোস্যাল ওয়েলফেয়ার, অর্থাৎ এই বিভাগটির সর্বময়কর্তা। এম এ পাশ করে রাখি কলেজে চাকরির চেষ্টা করছে শুনে সে একটা আশাতীত প্রস্তাব দিয়েছে। তার বিভাগে অ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়েলফেয়ার অফিসার নেওয়া হবে একজন—স্যোসিওলজির এম. এ চাই, ইকনমিক্সও চলতে পারে, কারণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম এ.-তে এই সাবজেক্ট নেই। অবশ্য এ চাকরি হওয়া খুব সহজ নয়, পরীক্ষা হবে, ইন্টারভিউ হবে, তারপর চাকরির প্রশ্ন। তবে রমেন্দ্র সরকার সহায় বলেই আশা। সে নিজেই বলেছে, যতটা সম্ভব চেষ্টা করবে। আর সোমা তাকে বলেছে, ওরা ওরকম হাতে রেখে বলে, শেষ পর্যন্ত চাকরি তোরই হবে জেনে রাখ।

আশ্চর্য, এমন একটা খবর শোনার পরেও লোকটা প্রায় নির্বিকার। খানিক চুপ করে থেকে মন্তব্য যা করল শুনে রাখির রাগ হবারই কথা। বলল, মেয়েদের পক্ষে এ বড় ঝামেলার চাকরি, তার থেকে কলেজই ভালো।

—বলো কী? গোড়াতেই গেজেটেড র‍্যাঙ্ক, কলেজে যেখানে শেষ এখানে প্রায় সেই মাইনের শুরু। এর ওপর কত প্রমোশন আছে—ওয়েলফেয়ার অফিসার তো

হওয়া যাবেই, অ্যাসিস্টান্ট ডাইরেক্টার, ডেপুটি ডাইরেক্টার পর্যন্ত হওয়ার আশা আছে। তাছাড়া কলেজেব চাকরি যে পাবই তারই বা ঠিক কী?

—না পেলে স্কুলে তো পাবেই।

ঠাট্টা করছে কিনা রাখিব প্রথমে সেই সন্দেহ হল। পবে রেগেই গেল।—তোমার কী মাথা খারাপ হয়েছে?

সুবীরকান্ত জবাব দিল না, চুপচাপ মুখেব দিকে চেয়ে রইল শুধু।

এরপর দিনকতকের জন্যে আহার-নিদ্রা ঘুচে গেল বাখির।

দবখাস্ত কবা হল। বোজই একবার কবে সোমাব ওখানে ছুটতে লাগল। লিখিত পরীক্ষার জন্য কী-ভাবে তৈরি হবে, ইন্টাবভিউতেই বা কী ধরনের প্রশ্ন কবা হয়ে থাকে, এ-সব ব্যাপাবে তাব কিছুই ধাবণা নেই। সোমাকে বলে, পবীক্ষায় চিত্তির করে এলে আব এ বাড়িতে মুখ দেখাতে আসতে পাবব না বলে দিলাম।

আর ওখানে যজ্ঞেশ্বর কাপুর নামে একজনের সঙ্গে সবকার আলাপ করিয়ে দিল। জয়েন্ট ডাইবেকটার, বমেন্দ্র সরকাবেব ঠিক নীচেব লোক। সোমা বলেছে, আপিসের সর্বকর্মে সেই নাকি বৃহস্পতি। বযেস রমেন্দ্র সরকাবের থেকে কিছু বেশি হবে। হাসি-খুশি দিলদবিয়া মানুষ। এখানে অনেককাল আছে, মোটামুটি ভালই বাংলা বলতে পাবে। তুমি বলে। তুমিটা অন্তরঙ্গসূচক জানাব পর থেকে একটু খাতিব হলেই সে আব কাউকে আপনি কবে বলে না।

রমেন্দ্র সবকাবেব সামনেই সোমাব আব্দার, মিস্টাব কাপুব, আমার বন্ধুকে কিন্তু নিতে হবে, নইলে আপনাব সঙ্গে কথা বন্ধ।

কাপুর হেসেই ভয়েব কারুকার্য ফুটিয়েছে মুখে।—কী সর্বনাশ, তাহলে তো নিতেই হবে!

পরীক্ষায় কী ধরনের প্রশ্ন আশা সম্ভব সেটা কাপুবই লিখে দিয়েছে তাকে। সে-সব নিয়ে বাখি আবার ঘবেব লোকের শবণাপন্ন হযছে। এত বড় একটা ব্যাপাবে তাব নির্লিপ্ততা দেখে সে মনে মনে বিরক্ত। কিন্তু এখন প্রযোজনে তোয়াজ না করে উপায কী?

বড চাকরি করার ঝোঁক এত প্রবল যে সুবীবকান্তও আব মুখ ফুটে বাধা দেয়নি। নিজে খেটে-খুটে আব বইপত্র ঘেঁটে সম্ভাব্য প্রশ্নগুলোর উত্তব লিখে দিয়েছে। আর গলদঘর্ম হয়ে রাখি সে-সব কণ্ঠস্থ কবেছে।

পরীক্ষা হয়ে গেল। বাখি অবাক, আসতে পারে বলে কাপুর যা লিখে দিয়েছিল, হুবহু সেই সবই এসেছে। তার বাইবে একটিও নয়। এব দিনকযেক বাদে কাপুর লাফাতে লাফাতে এক বিকেলে আপিস-ফেবত বডকর্তা অর্থাৎ সোমাব বাড়ি এসে হাজিব। রমেন্দ্র সরকার তখন টুরে। পরীক্ষার ফলাফল জানাব আশায রাখি প্রায়ই সোমাব ওখানে যায়। সেদিনও গেছল। তাকে দেখামাত্র কাপুর হৈ-হৈ করে উঠল। —কনগ্র্যাচুলেশনস ম্যাডাম, কনগ্র্যাচুলেশনস্! তুমি তো একটি সাংঘাতিক মেয়ে দেখি, পরীক্ষার খাতায় কী কাণ্ড করেছ! সোমার দিকে ফিরল।—বুঝলে ম্যাডাম, তোমার

বন্ধু একটি জিনিস, পরীক্ষার খাতায় যা-সব লিখেছে আমার বাবার সাধ্যি নেই সেরকম লেখে। অফিসাররা সব কাড়াকাড়ি করে ওর খাতা পড়েছে!

চাকরি? কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে যে এর পরেও চাকরি হবে না।

হাওযায ভেসে বাড়ি ফিরেছে রাখি। এতবড় কৃতিত্বটা কার প্রাপ্য সেটা সে ভালই জানে। সুখববটা তক্ষুনি ভাঙল না। খাওয়া-দাওয়াব পব লোকটা আবাব বই নিযে শুযে পড়েছে। ইদানীং পড়াশুনা একটু বেড়েছে লক্ষ্য করেছে। বইখানা হাত থেকে টেনে নিযে টেবিলেব ওপব ছুঁড়ে বাখল, তারপর দু'হাতে গলা জড়িযে ধবে যেন একটা সবল অধিকাব ঘোষণা কবল।

—কী ব্যাপার?

বাখি বলল, ব্যাপাব গুরুতর। তোমাব এবাবেব চাকবিব পবীক্ষাটা খুব ভালো হয়েছে—একেবাবে ফার্স্ট!

সুবীবকান্ত কিছুটা নির্লিপ্ত সুরে জবাব দিল, তোমাকে ফার্স্ট কবার দাযে যাবা প্রায প্রশ্নপত্র চালান কবেছে, তাদেব মুখ বক্ষা হয়েছে বলো।

মনে মনে একটু লজ্জা পেলেও উৎফুল্ল মুখে বাখি বেশ জোর দিযেই বলল, বেশ যাও, সকলেই তো আব তোমাব মত আদর্শ নিয়ে বসে নেই—কি যে হচ্ছে সর্বত্র তুমি খববও বাখো না।

—বুঝলাম। তোমাব চাকরি হচ্ছে তাহলে।

—হচ্ছেই তো। ছদ্ম-কোপে রাখি চোখ পাকালো।—কেন, না হলে তুমি খুশি হও?

সুবীবকান্ত হেসেই জবাব দিল, ঠিক বুঝছি না!

বাখি বলল, তুমি একটা স্বার্থপব, একটা ভালো চাকবি কববো তাও তোমাব সহ্য হয না। মেযেদের পোস্ট, আমি না পেলে আব কোনো মেযেই পেতো এটা —তাহলে আমি কী দোষ কবলাম।

সুবীবকান্ত অন্তবঙ্গ আকর্ষণে তাকে আগলে রেখে হেসেই জবাব দিল, দোষ কিছু নয়, বিয়েব পব থেকে তোমার বড় হবাব ঝোঁক দেখে আমাব ভয।

—বাবে, চাকবিই যখন কবব, ছোট চাকবি করব কেন?

সুবীবকান্ত তক্ষুনি ফিবে প্রশ্ন কবল, আমাব চাকবিটা ছোট চাকবি, না?

এবাবে বাখি লজ্জা পেল একটু।—তুমি তো তবু প্রোফেসাব, তোমাব মতো তো স্কলাব নই আমি, প্রোফেসাব হতে হতে বুড়িযে যাব।

—তাহলে তোমার স্কুলের চাকরিটা ছোট চাকরি ছিল বলো?

—অত সব জানি না, বিচ্ছিবি চাকরি।

এই প্রসঙ্গ বাতিল করে দিয়ে মনেব আনন্দে আবো নিবিড়ভাবে বক্ষলগ্ন হল সে। কিন্তু মানুষটাকে কেমন যেন অন্যমনস্ক মনে হল তার।

জীবনেব একটা ছোট বৃত্ত থেকে অনেক দিনেব আকাঙ্ক্ষিত একটা বড় বৃত্তে পদার্পণ করল যেন রাখি। এই বৃত্তেব রূপ আলাদা, রঙ আলাদা।

গোড়ায় গোড়ায তার কাণ্ড দেখে সুবীবকান্ত হাসত। দু'ঘবের ফ্ল্যাটে আর চলছে না, তিনঘরের ফ্ল্যাট একটা সংগ্রহ কবতেই হল। ঘর হলেই হল না, তার যোগ্য

সাজসজ্জা চাই। সোফা সেট এলো, তাব সঙ্গে বং মিলিযে জানলা দবজাব পর্দা এলো। টেলিফোন তো অফিস থেকেই মিলেছে। ছ'মাস না যেতে মাসিক কিস্তিব ব্যবস্থায ছোটখাটো একটা ফ্রীজও কিনে ফেলল সে।

মুখেব হাসি আস্তে আস্তে কমে ব্যঙ্গোক্তি কবেছিল, এবাবে একটা গাড়ি চাই না?

—বোসো, আস্তে আস্তে সব চাই। তোমাব কি, ভোলানাথ, কিছুই চাই না।

এ-সবেব সঙ্গে তাল বেখে চাকবিব মর্যাদা অনুযাযী নিজেব বেশবাসেব ব্যবস্থা।

ছ'মাসেব মধ্যে কম কবে চাবমাসেব শেষেব দিকেই বিব্রত মুখে বাখি এসে বললে, কিছু টাকা দিতে পাবো, আমাব হাতে যা ছিল ফুবিযে গেছে।

সুবীবকান্ত টাকা দেয, কিন্তু টিপ্পনীও কাটে।—তুমি বড চাকবি পাওযাতে আমাব কত সুবিধেই না হচ্ছে!

—বেশ যাও। সব যেন আমি নিজেব জন্যে খবচ কবছি। আব টাকাগুলোও ছাই কি-ভাবে যে খবচ হযে যায—তা গোডায গোডায তো এবকম হবেই, একবাব সব গোছানো হযে গেল তখন দেখো।

কিন্তু গোছানোব শেষ কোনো কালে হবে এমন ভবসা সুবীবকান্ত বাখে না।

বছব ঘুবতে পাখিকে নিযে তাদেব মধ্যে ছোটখাট ঝগডাই হযে গেল একটা। পাখি চাব-এ পডেছে, অতএব এখন ওকে কিণ্ডাবগার্টেনে না দিলেই নয। নামজাদা এক মিশনাবী স্কুলে ব্যবস্থা কবল বাখি।

কিন্তু এ ব্যাপাবে ওব বাপেব বেযাডা গোঁ দেখে মনে মনে বীতিমত বিবক্ত। তাব সাফ কথা, ওব জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না—যখন সময হবে, আব পাঁচটা সাধাবণ মেযেব মত ও সাধাবণ স্কুলেই পডবে।

বাখি দেখে আসছে তাব অনেক ব্যাপাবে মানুষটা ইচ্ছে কবেই আপত্তি কবে। বেগে গিযে বলল, তাহলে বড স্কুলগুলো আছে কী কবতে?

—বড স্কুলেব ক'টা বাপ নিজে তাব মেযেব ভাব নেয আমি খবব বাখি না, আমাব মেযেব ভাব আমি নিজে যখন নিযেছি, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। কিন্তু তাব পবেই হেসে যে কথা বলেছে, বাগ হবাবই কথা। বলেছে, তোমাব অসুবিধেটা কোথায আমি বুঝি, মেযে তোমাব কোনো নাম-কবা বিলিতি স্কুলে পডছে না, লোকেব কাছে সেটা বলতে তোমাব মানহানি হবাবই কথা।

ঠিক এমনি কবেই একটা ঠাণ্ডা বিচ্ছিন্নতা দু'জনেব মধ্যে এগিযে আসছে ক্রমশ। বাখিব মনে হয বাডিতে পা দিলেই সে যেন একটা সঙ্কীর্ণ পবিবেশেব মধ্যে এসে পডে। বাইবেটা এব থেকে অনেক উদাব, অনেক প্রশস্ত।

এদিকে তাব অফিসেব খাটুনিবও অন্ত নেই। কিন্তু তাতে বেশ একটা আনন্দ আছে, বৈচিত্র্য আছে। এক বছবেব মধ্যেই চাকবিতে বীতিমত সুনাম বাখি চক্রবর্তীব। তাব জন্যে পডশুনা এবং পবিশ্রমও কম কবেনি। চাইলড ওযেলফেযাব, মেটাবনিটি ওযেলফেযাব, নিম্নশ্রেণীব মেযেদেব উন্নতি এবং শিক্ষাব ব্যবস্থা, তাদেব কাবিগবী শিক্ষাব মহডা, স্বাস্থ্য, সমস্যা, সাংস্কৃতিক উন্নতি, স্পোর্টস, কমিউনিটি সেণ্টাব স্থাপন—ইত্যাদিব

ব্যাপাবে যে কত কত বই আব কত বিপোর্ট পডতে হযেছে তাকে ঠিক নেই। এবাবে আব সে কাবো সাহায্যভিক্ষা কবেনি, খেটে খেটে আব চোখ-কান খোলা বেখে নিজেব ভিত নিজেই তৈবি কবেছে।

ঘবেব লোকেব মেজাজ-পত্র তখনো অবশ্য অতটা অপ্রসন্ন দেখা যাযনি। ববং বলেছে, কাজ যখন নিযেছ, সর্ববকমে সে কাজেব উপযুক্ত হওযা ভালো।

কিন্তু অদৃশ্য বিচ্ছিন্নতাটা স্পষ্ট হযে উঠতে লাগল তাবপবে। কাজেব আঁটঘাট যখন বোঝা হযে গেছে, আব যখন সে নিশ্চিত পদক্ষেপে এগিযে চলেছে—আপিস থেকে সন্ধ্যে গডিযে যায প্রাযই। সব-দিন যে কাজ থাকে এমন নয। আপিসেব শেষে মাঝে-মাঝেই উঁচুমহলেব বৈঠক বসে, পবামর্শ হয, আলাপ-আলোচনা হয, কোনদিন বা নিছক আড্ডাই হয। এগুলোও চাকবিব অঙ্গ। তাছাডা উঁচু মহলেব এখানে সেখানে আনন্দ-সমাবেশ বা সাংস্কৃতিক ডাকও আছেই।

কিন্তু বাডি ফেবামাত্র একখানা গুরুগম্ভীব মুখ দেখতেই হবে। যেন কত অপবাধ কবে বাডি ফিবল সে। তিনটে কথা জিজ্ঞাসা কবলে একটাব জবাব দেবে। গোডায গোডায দেবিতে ফেবাব কাবণ বলত। এখন আব কিছু বলে না। হয বই, নয মেযে নিযে আছে। আব ওব সঙ্গে আডাআডি কবেই যেন মেযেটাব স্বভাব অন্যবকম কবে তুলছে। শুধু ওব জন্যেই এখন আযা আছে একটা, কিন্তু বাপ বাডি থাকলে এক ঘণ্টাও এখন আব তাব কাছে থাকতে চায না মেযেটা। নিজে হাতে তাকে খাওযাবে, জামা পবাবে, অতবড মেযেকে সর্বক্ষণ কোলে বসিযে আদব দেবে, ঘুম পাডাবে। মেযেও তেমনি হযে উঠছে, পানেব থেকে চুন খসলে বাবা বলে চিৎকাব। মনেব মতো কথা না বললে বা কখনো ধমক-ধামক কবলে তাকে পর্যন্ত শাসায, বাবাকে বলে দেব।

বাখিব বাগ হযে যায এক-একদিন, বলে, বল গে যা, তোব বাবা এসে মাথা কাটবে আমাব। আদব দিযে দিযে মাথাখানা খাচ্ছে একেবাবে।

ঝাঁঝটা সুবীবকান্তব কানে যায। কিন্তু সে বলে না কিছু। মেযেটা একটু-আধটু অসুখে ভোগে প্রাযই, তাতেও ওব বাপেব বাডাবাডি বকমেব ব্যস্ততা। সেদিন কাজেব চাপই বেশি ছিল একটু, সন্ধ্যাব পব বাডি ফিবে দেখে মেযেকে কোলে বসিযে তাব বাবা দুধেব গেলাস নিযে সাধ্য-সাধনা কবছে—কিন্তু মেযে কিছুতে খাবে না। বাখি শাডি বদলে মুখহাত ধুযে এলো, চা খেল—দুধেব গেলাস হাতে তখনো সেই সাধাসাধি চলেছে।

এই দেখে মেযেব বাবাকেই ঝাঁঝিযে উঠল বাখি।—আদব দিযে দিযে কী কবে তুলছ এখন দেখো। তাব পবেই মেযেকে শাসালো, এই মেযে, ভেবেছিল কী তুই? খাবি তো খা, নইলে বেবো এখান থেকে।

মাযেব দিকে চেযে মেযে পাল্টা চোখ পাকালো।—তুমি একটা পাজী।

সঙ্গে সঙ্গে বাপেব কোল থেকে মেযেকে টেনে তুলে একটু জোবেই হযত ঝাঁকুনি দিল বাখি।—কী বললি?

মেযে ভ্যা কবে কেঁদে উঠল। তাই শুনে আযা ঘবে ঢুকতে বাখি তাকেও ধমকে উঠল, মেযেকে দুধ-টুধ খাইযে দেখেশুনে বাখো না কেন? সব সময বাবুকে কষ্ট কবতে হয কেন?

জবাবদিহি না কবে আযা কাঁদুনে মেযেকে নিযে তাড়াতাড়ি ঘব ছেড়ে প্রস্থান কবল। দুধেব গেলাস হাতে সুবীবকান্ত যে-ভাবে চেযে আছে তাতে বাগ হচ্ছে বাখিব।

—কী, মাকে পাজী বলতে শিখেছে, শাসন কবে খুব অন্যায কবেছি?

—না। তবে ওই কথাটা সে তোমাব কাছ থেকেই শিখেছে। দিনেব মধ্যে দুই-একবাব তুমিই ওকে পাজী বলো, আব কেউ বলে না।

উঠে জানালা দিযে গেলাসেব সবটুকু দুধ বাইবে ফেলে দিযে শূন্য গেলাসটা টেবিলেব ওপব বাখল।—মেযেটা কাল থেকে সর্দিতে ভুগছে, আজ একটু জ্বব-জ্ববও হযেছে—বোজ যা খায সকাল থেকে এ পর্যন্ত তাব অর্ধেকও খাযনি, এ-খবব তুমি বাখো?

গেলাসেব দুধ ফেলে দিতে দেখে অপমানে বাখিব মুখ বক্তবর্ণ হযে উঠেছিল। শেষেব কথা শুনে বিপবীত প্রতিক্রিযা।—আমাকে তো বলোনি।

—আমি বলব, কেমন? তুমি মস্ত চাকবি কবো, তাই মেযেব অসুখেব খবব তোমাকে আমাব কাছ থেকে পেতে হবে? কোনা খবব যখন বাখাব সময নেই, তখন শাসন কবাবই বা দবকাব কী? সবে খেতে শুরু কবেছিল মেযেটা—মধ্যে এসে তোমাকে এই মূর্তি দেখাতে কে বলেছিল?

ঘব ছেড়ে চলে গেল। বাখি অপ্রস্তুত হযেছে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে চাকবিব খোঁটাটা বিঁধছে। পাযে পাযে মেযেব কাছে এলো। পিঠে হাত দিযে দেখল, একটু ছ্যাক-ছ্যাক কবছে বটে। আব ঢপঢপে সর্দিটাও মিথ্যে নয। মুখেব দিকে একটু চেযে থেকে বলল, খাবি?

মাযেব গম্ভীব অথচ নমনীয মুখ দেখে মেযে কৌতুক বোধ কবল। আযাব কোল থেকে মাথা নাড়ল, খাবে। বাখি দুধ ঢেলে নিতে এলো আবাব। বই ফেলে তক্ষনি সুবীবকান্ত উঠে এলো—দুধ কী হবে?

—ও খাবে বলছে।

—খেতে হবে না, বেখে দাও—যখন খাওযাবাব দবকাব হবে আমি খাওযাব।

বাখিব সমস্ত মুখ লাল হযে উঠেছে আবাব। দুধেব স্যসপ্যান হাতে বাখি তাব দিকে ফিবে চেযে আছে।

—দেখছ কী, তোমাব কোনো ব্যবহাবে ওইটুকু মেযেকে আমি অবাক কবতে চাই না। বেখে দাও, নযতো ওই প্যানসুদ্ধ দুধ আমি বাস্তায ঢেলে দেব।

ফিবে গিযে আবাব বই নিযে বসল। বাখি স্তব্ধ খানিকক্ষণ। লোকটাব গোঁ জানে, কিন্তু মেজাজ তাব নিজেবও কম নয। জীবনেব যে ক্ষেত্রে এখন বিচবণ তাব, তুচ্ছ কাবণে এ-বকম ঝগড়াবিবাদ রুচিতে ঘা লাগাব মতো। দুধেব স্যসপ্যান বেখে সোজা ওই ঘবেই এসে দাঁড়াল সে-ও।

—আমাব সঙ্গে আজকাল তুমি এ-বকম ব্যবহাব কবছ কেন?

সুবীবকান্ত বই পড়ছে—পড়ছে। জবাব দিল না।

অনুচ্চ কিন্তু আবো কঠিন সুবে বাখি বলে উঠল, তোমাব এ-বকম ব্যবহাবেব অর্থ কী আমি জানতে চাই।

—তাতে অশান্তি বাড়বে।

—অশান্তি আমি করছি কেমন, তুমি নিজে কিছু করছ না।

সুধীরকান্ত বই পড়ছে।

বিচ্ছিন্নতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল আরো বছরখানেক বাদে।

সহকারী ওয়েলফেয়ার অফিসার থেকে রাখি চক্রবর্তী ওয়েলফেয়ার অফিসার হয়ে বসল। কিন্তু প্রত্যাশিত উন্নতিটা একটু অপ্রত্যাশিত ভাবেই এগিয়ে এলো তার সামনে। কথা ছিল, এক বুড়ো অ্যাসিসট্যান্ট ডাইরেক্টর বছর দেড়েক বাদে রিটায়ার করলে ওয়েলফেয়ার অফিসার মণিমালা ঘোষ অ্যাসিট্যান্ট ডাইরেক্টার হবে আর মণিমালা ঘোষের জায়গাটি তখন রাখি চক্রবর্তী দখল করবে। কিন্তু রাতারাতি অবাক ব্যাপার হল একটা, বলা নেই কওয়া নেই মণিমালা ঘোষ হঠাৎ নিজের ইচ্ছেয় একেবারে অন্য বিভাগে অন্য চাকরি নিয়ে চলে গেল।

এই নিয়ে অবশ্য কানাঘুষো হল একটু। উড়ো গুজব কানে এলো রাখি চক্রবর্তীর, মণিমালা নাকি জয়েন্ট ডাইরেক্টার যজ্ঞেশ্বর কাপুরের ওপরেই রাগ করে চলে গেল। রাখি অবশ্য এ গুজবে কান দেয়নি। কারণ দিলখোলা যজ্ঞেশ্বর কাপুরের ওপর রাগ কারো হতে পারে না। তার ওপর এ আপিসে এসে অবধি মণিমালার সঙ্গে একটু খাতিরই বরং বেশি দেখেছে। একেবারে নিম্নপর্যায়ের মানুষদের কিছু চটুল রটনাও কানে এসেছে তার, কিন্তু এ-সব উক্তিতে রাখি কখনো কান পাতে নি। কারণ কাপুরের সঙ্গে খাতির সকলেরই—সে যখন ম্যাডাম বলে সরাসরি কাধে হাত রাখত অথবা হাত ধরে ঝাঁকাতো—রাখির নিজের মুখও গোড়ায় গোড়ায় লাল হত, এখন অভ্যস্ত হয়ে গেছে। আর বলতে গেলে কাপুরের খাতির এখন সব থেকে বেশি তার সঙ্গেই। রাখি জানে, এই নিয়েও আড়ালে চোখ-টেপাটেপি করে কেউ কেউ আজকাল। কিন্তু এ-সব নিম্নস্তরের ব্যাপার কখনো গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি সে।

মণিমালা ঘোষ আই এ এস ডাইরেক্টার রমেন্দ্র সরকারের নিজের খুড়তুতো বোন। নিঃসন্তান, বিধবা। বছর সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ হবে বয়েস, রমেন্দ্র সরকারের থেকে বছর দেড়-দুইয়ের ছোট। কিন্তু রাখি বা সোমার থেকে অনেকটাই বড়। ওরা মণিদি বলে ডাকত তাকে। আর রাখির বেশ ভালো লাগত তাকে। বুদ্ধিমতী, মোটামুটি সুশ্রী মিষ্টি চেহারা।

সে এভাবে হুট করে চলে যেতে রাখি অবাক হয়েছিল সন্দেহ নেই। সোমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কী ব্যাপার, মণিদি চলে গেল কেন?

সোমা ঠোঁট উল্টে জবাব দিল, কে জানে, মেজাজী মেয়ে, ভালো লাগল না চলে গেল। আমাকে শুনিয়ে গেল, দাদার আণ্ডারে আর চাকরি করার ইচ্ছে নেই। তারপরেই মুচকি হেসে সোমা বলল, ও বদলি হয়ে তোর তো কপাল খুলে গেল রে।

মিথ্যে নয়, কপাল খুলেছে বটে। এখন তো ওয়েলফেয়ার অফিসার, দেড় বছর বাদে ওই আধ-বুড়ো অ্যাসিট্যান্ট ডাইরেক্টর রিটায়ার করলে সেই পোস্টও অবধারিত সে-ই পাবে। কাপুর এ আশ্বাসও তাকে দিয়েই রেখেছে। সে জয়েন্ট ডাইরেক্টর বটে,

কিন্তু এ-সব ব্যাপারে সমস্ত বিভাগটিব সর্বময়কর্তা বলতে গেলে সে-ই। মিনিস্টাব থেকে শুরু কবে সকলেব সঙ্গেই তাব দহবম-মহবম। সেদিক থেকে প্রতাপ তাব ডাইবেক্টাবেব থেকেও বেশি। কিন্তু মানুষ হিসেবে এমনি মজাব যে প্রতাপেব দিকটা কখনো কোনা কাবণে উগ্র হয়ে ওঠে না।

ভাগ্যেব এ-হেন পবিবর্তনেও নির্বিকাব শুধু ঘবেব একজন। এই কাবণে বাখিব ভেতবটা এখন বিবক্তিতে ভবপুব। তাব মনে মনে ধাবণা, তাব বড চাকবিব দরুণ লোকটা তাকে ঈর্ষাই কবে। আসলে তাব নিজেবই পুরুষকাবেব অভাব। নইলে এত বিদ্যাবুদ্ধি নিয়ে কলেজেব মাস্টাবিতেই খুশি থাকে কী কবে? একটু খাটলে ডক্টবেট অনায়াসে পেতে পাবে। বাখি একবাব সেকথা বলেও ছিল। জবাবে যে কথা তাকে শুনতে হয়েছিল তাও চাপা গাত্রদাহ ছাড়া আব কিছু নয়। সে বলেছিল, বড চাকবি কবাব পব আজকাল আমাকে নিয়েও বোধহয় একটু লজ্জাব কাবণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তোমাব।

বাখিব বাগই হয়েছে। জবাব না দিয়ে চলে গেছে। ঘবেব লোক মস্ত লোক, সেটা যে সব স্ত্রীবই গর্বেব কাবণ, এটুকু বোঝাব মত উদাবতা পর্যন্ত যদি না থাকে, তাব সঙ্গে তর্ক কবে কী হবে?

এমনি কবেই হালকা ব্যাপাবগুলোও ঘোবালো হয়ে উঠছে। যেমন সেদিন—সন্ধ্যাব পব এক বড হোটেলে কাপুব সেদিন ওদেব ডিনাবে ডেকেছিল। ওদেব বলতে বমেন্দ্র সবকাব, সোমা সবকাব আব বাখি। মনে মনে খুশি হল, কাবণ ডিনাবটা তাবই প্রমোশনেব খাতিবে। কিন্তু কাপুবেব সেটা মাথায় না এলে বাখিই বা বলে কী কবে?

ডিনাবে হাসিখুশিব ব্যাপাবটা একটু বেশিই গডালো। এ-ধবনেব নিবিবিলি সমাবেশে বমেন্দ্র সবকাব আব কাপুবকে ড্রিঙ্ক কবতে বাখি আগেও দেখেছে। সেদিন কাপুব প্রস্তাব কবল, তাদেব সম্মানে মহিলাদেবও একটু ড্রিঙ্ক কবতে হবে। সোমা সানন্দে বাজি। ও একেবাবে অনভ্যস্ত নয়, সেটা খানিক বাদেই বোঝা গেল। কিন্তু তবল খুশিব ব্যাপাবটা জমে উঠল বাখিকে নিয়ে। সে কিছুতে খাবে না কাপুব খাওয়াবেই তাকে। গেলাসেব বঙিন পদার্থ সে খুব হালকা কবে মিশিয়ে তাবপব সেই থেকে অনুবোধ কবে চলেছে। শেষে সোমা বলেছে, অত কবে বলছে, খা না বাপু, এমন কিছু মহাভাবত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না—এই তো আমি দু'বাব মেবে দিলাম।

শেষ পর্যন্ত নাচাব হয়েই গেলাসেব জলীয় বস্তু চোখ-কান বুজে এক নিঃশ্বাসে জঠবে চালান কবে দিল বাখি। বিচ্ছিবি লাগল। তেতো-তেতো স্বাদ। গায়ে একটা ঝঙ্কাব দিয়ে উঠতে সকলে হেসে উঠল।

ডিনাবেব পব বমেন্দ্র সবকাব কাপুবেব গাডিতে তাব সঙ্গে কোথায় তাদেব একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাখতে চলে গেল। সোমা তাব গাডিতে বাখিকে পৌঁছে দিতে এলো। বাখিব ভেতবটা তখন আনন্দে ভবাট, ভাবী হালকা লাগছে। কোনো দুর্যোগেব ছায়া তাব কল্পনাতেও নেই। অন্যথায় বাডিব দবজায় নেমে সোমাকে হয়ত গাডি থেকেই বিদায় দিতে চেষ্টা কবত।

দোতলাব বসাব ঘবে ঢুকতেই সুবীবকান্তব সঙ্গে দেখা। সোমা হেসে বলে উঠল, আজ কিন্তু আপনাব স্ত্রীব চবিত্র খাবাপ কবে দিয়েছি আমবা...কাপুব ওকে ড্রিঙ্ক কবিয়ে ছেড়েছে।

শোনা-মাত্র মুখখানা যা হয়ে গেল, ভিতরে ভিতরে বাখি যেন কেঁপে উঠল। সোমাও বলে উঠল, ভয় পেয়ে গেলেন নাকি। কিছু ঘাবড়াবেন না মশাই, ইট ওয়জ জস্ট স্পোর্ট, আমি ওব ডবল খেয়েছি।

নিষ্প্রাণ ঠাণ্ডা গলায় সুবীবকান্ত জবাব দিল, আপনাব যা সহ্য হবে ওব তা সহ্য হবে কি ?

সোমা চোখ পাকালো, কেন, আপনাব স্ত্রীটিকে আপনি কাবো থেকে কম ভাবেন নাকি ?

—না, তবে নিজেব থেকেও খুব বেশি ভাবাব মতো মুশকিলে না পড়ে যাই।

তবল বস্তুব প্রতিক্রিয়ায় সোমাব ভেতবটাও খুব হালকা। অন্যথায় এই গম্ভীব আচবণ মর্যাদায় লাগাব কথা। হেসেই বাখিব দিকে ফিবল, তোব ভদ্রলোক দেখি বেজায় পিউবিটান, মেজাজপত্র খুব ভালো দেখছি না। আজ পালাই, আব একদিন এসে তর্ক কবব।

লজ্জায় বাখিব মাথা কাটা যাচ্ছিল। তাকে বিদায় দিয়ে ঘবে এসেই ফেটে পড়ল। বলে উঠলো, আমাব বন্ধু হলেও ও আমাব ডাইবেক্টবেব স্ত্রী, এটা তোমাব মনে বাখা উচিত ছিল—তুমি ওব সঙ্গে এ ব্যবহাব কবলে কী বলে।

হাতেব বই বেখে সুবীবকান্ত আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।—কী বকম ব্যবহাব কবতে হবে, তোমবা স্পোর্ট কবে মদ খেয়ে এসেছ সেই আনন্দে আটখানা হয়ে উঠব ?

—কী বললে ? স্পোর্ট কাকে বলে তুমি জানবে কী কবে ? নিজেব কাছে এক মস্ত লোক হয়ে বসে আছ তুমি, বাইবেব দুনিয়ায় কেউ তোমাব আদর্শেব কানা-কড়িও দাম দেয় না, সেখানকাব সভ্যতা ভব্যতা সম্পর্কে তোমাব কোনো ধাবণা নেই—বুঝলে ?

—ধাবণা কাব আছে, ওই কাপুবেব ? তাহলে তাব কাছেই যাও।

—কী ? কী বললে ? দু'পা এগিয়ে এলো সে।

—সামনে এসো না, ওইখানে দাঁড়াও। অনুচ্চ কিন্তু কঠিন এই স্বব শুনে বাখি থমকে দাঁড়াল। তেমনি স্পষ্ট পুনরুক্তি সুবীবকান্তব। বললাম আমাব দুনিয়াব আদর্শ আলাদা, সেটা যদি তোমাব না পোষায়, তুমি অন্য ব্যবস্থা দেখতে পাবো।

ভিতবেব ঘবে ঢুকে গেল। সেখান থেকে মেয়েব ঘবে। মেয়ে বাতে আয়াব কাছে ঘুমোয়—বাবা-মায়েব সঙ্গে একঘবে থাকা উচিত নয় বলে মাসছয়েক ধবে বাখিই এই ব্যবস্থা কবেছিল। একটু বাদে মেয়েব ঘব থেকে আয়াকে বেবিয়ে আসতে দেখল। তাবপবেই ওই লোককে শোবাব ঘব থেকে নিজেব বালিস নিয়ে যেতেও দেখল।

বাখিব মাথায় আগুনই জ্বলছে। প্রতিদিনেব এই সঙ্কীর্ণতাব অত্যাচাব যেন মুহূর্তেব মধ্যে সহ্যেব সীমা ছাড়াল। দু'ঘবেব মাঝেব দবজাব সামনে এসে দাঁড়াল সে। দেখল একটু।...বাহুতে চোখ ঢেকে মেয়েব পাশে শুয়ে আছে। অপমানে বক্তবর্ণ হয়ে গেল বাখিব মুখ। ঠাস কবে মাঝেব দবজা টেনে বন্ধ কবে দিল সে। এত জোৱে যে ঘুমন্ত মেয়েটা চমকে উঠল।

থাকুক। দেখা যাক ক'দিন পাবে থাকতে। আদর্শবান পুরুষেব আব এক দিকও খুব ভালই জানা আছে তাব। এ অপমানেব জবাব সেও দিতে জানে।

দিন কাটতে লাগল। যে চিড়টা খেল সেটা আর জোড়া লাগল না। কিন্তু কিছুটা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে লাগল। বাক্যালাপটা প্রয়োজনের বাক্যালাপে এসে ঠেকল। রাখির কাজের সুনাম যেমন বাড়ছে, ব্যস্ততাও বাড়ছে। দু'দিন একদিনের জন্যে মাসে কয়েক দফা ট্যুরে বেরুতে হয়। বেশ আনন্দের মধ্যেই কাটে তখন। কখনো খোদ ডাইরেক্টর রমেন্দ্র সরকার সঙ্গে থাকে, কখনো বা জয়েন্ট ডাইরেক্টার যজ্ঞেশ্বর কাপুর।

কিন্তু ফিরে এলেই সেই নীরস গুরুগম্ভীর পরিবেশ। রাখির হাঁপ ধরে যায় এক এক সময়। কোনো সময় যদি মেয়ে বা মেয়ের বাপের শরীর খারাপ হয়, সে খবরও ঝি-চাকরের মুখে শুনতে হয়। কেউ বলে না তাকে। তাকে অপ্রস্তুত করার জন্যই যে বলে না, রাখি সেটা ভালই বুঝতে পারে। তবু যতটুকু সম্ভব নিজের কর্তব্য করে যেতে চেষ্টা করে। মেয়ের আব্দারে তার বাপের এখনো তার কাছেই শোয়া বহাল আছে।

একে একে প্রায় দু'বছর ঘুরে গেল আবো। রাখির অক্লেশে প্রত্যাশিত উন্নতি হয়েছে আবার। সে এ্যাসিসট্যান্ট ডাইরেক্টার হয়েছে। কাপুর ট্যুরে। এই উপলক্ষে সোমা আর তার বর সেদিন ওদের ফ্ল্যাটে এসেছিল। রাখি আদর অভ্যর্থনা করেছে তাদের। ইদানীংকালের মধ্যে রমেন্দ্র সরকার সস্ত্রীক আরো দিন-দুই তাদের ফ্ল্যাটে এসেছে। বলা বাহুল্য ডাইরেক্টর হিসাবে নয়, স্ত্রীর বন্ধুর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ধরেই। সুধীরকান্ত সে দু'দিনের একদিনও বাড়ি ছিল না। এই দিনে ছিল, কারণ রাখি আগে থেকেই তাকে বলে রেখেছিল। খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থাও করেছিল।

সুধীরকান্ত হাসিমুখেই কথাবার্তা বলেছে তাদের সঙ্গে। তবু শুরুতেই রাখির মেজাজ বিগড়লো। তার মেয়েকে দেখে সোমা জিজ্ঞেস করেছিল, কোন স্কুলে পড়ো ?

মেয়ে যে স্কুলের নাম করল সেটা যেন নতুন করে কানের পরদায় বিঁধল রাখির। তার ওপর সোমা বলল, একটা মাত্র মেয়ে তোর, একটা ভালো স্কুলে দিলি না কেন ?

রাগ চেপে রাখি জবাব দিল, ওর বাবার আপত্তি।

সোমা হাসিমুখে সুধীরকান্তর দিকে তাকালো।—বাবা, আপনি এমন পিউরিটান যে মেয়েকে একটা ভালো স্কুলে দিতেও আপত্তি ?

মেয়ের সামনে তার স্কুল সম্পর্কে এই উক্তি যে পছন্দ হবে না সেটা একমাত্র রাখিই জানে। সুধীরকান্ত ক্ষুদ্র জবাব দিল, এটাও খারাপ স্কুল নয়। মেয়েকে বলল, তুমি খেলা করো গে যাও।

সোমা হাসিমুখেই আবার বলল, কিন্তু আশা আর বাসা ছোট করতে নেই, আপনার স্ত্রীকে দিয়েই দেখলেন তো ? বরাবর উঁচু আশা ছিল ওর—আপনার পাল্লায় পড়ে হতে যাচ্ছিল স্কুল-মাস্টার—হয়ে বসল এ্যাসিট্যান্ট ডাইরেক্টর...কটা বছর গেলে ডেপুটি ডাইরেক্টরও হবেই।

রমেন্দ্র সরকার মাথা নেড়ে সায় দিল, ইয়েস, সী ইজ ভেরি ডিজারভিং।

ভিতরে ভিতরে রাখি উৎফুল্ল। ঘরের লোকের মুখখানাই দেখছে সে। রমেন্দ্র সরকারের কথা শুনে কান জুড়িয়েছে, আর সোমার কথাগুলো চমৎকার লেগেছে।

—আশা আর বাসা ছোট করতে নেই।

সুধীরকান্ত মৃদু হেসে সোমার দিকে তাকালো।—ডেপুটি ডাইরেক্টর হলেই আশা আর বাসার শেষ?

সোমা জবাব দিয়েছে, আর কত চান মশাই?

—আমি চাইনে।...আশা আর বাসার মধ্যে খানিকটা সামঞ্জস্য না ঘটালে বিপদও হয়, সেই কথা বলছিলাম।

—কী রকম? সোমা উৎসুক।

—আশার থেকে বাসাটা বেশি বড় হয়ে গেলে খরচ বাড়ে, ঋণগ্রস্ত হতে হয়। আর, আর বাসার থেকে আশাটা খুব বেশি ছাড়িয়ে উঠলে অবজ্ঞায় যে বাসা আছে তাও ভাঙে।

—লজিক! রমেন্দ্র সরকার তারিফ করে উঠল।

—ছাই লজিক! সোমা সরকার ছদ্ম কোপ দেখালো।—আমি লজিক পড়া মেয়ে, সব উপমাই অমন ভাঙাচোরা করা যায়।

রাখি চক্রবর্তী আর এক ধাপ ওপরে উঠেছে বলেই হয়ত সহিষ্ণুতা কমেছে আরো একটু। বাইরে তার মর্যাদা প্রতিপত্তি যত বাড়ছে, অন্দরের সহজ আলো-বাতাস যেন ততো বেশি সঙ্কীর্ণ ঠেকছে। চাকরির ব্যাপারে মিনিস্টারের সঙ্গে পর্যন্ত সহজ যোগাযোগ এখন (অবশ্য কাপুর আর রমেন্দ্র সরকারের কল্যাণেই সেটা আরো সহজ হয়েছে), ঘরের লোকের সেজন্য গর্ব বোধ করা দূরে থাক, তার রূঢ় অসহযোগ দিনকে দিন যেন আরো বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

কিন্তু রাখি আর অত কেয়ার করে না। কেউ যদি ইচ্ছে করে তফাতে সরে থাকে, সে কী করতে পারে? মাসের মধ্যে বার-দুই অন্তত এক এক দফায় চার-পাঁচ দিন করে ট্যুর-প্রোগ্রাম আজকাল। কিন্তু ফিরে এসেও সেই গোমড়ামুখ দেখে মেজাজ চড়ে যায় তারও। আরো দু-তিন দফা ট্যুর-প্রোগ্রাম ফেলতে ইচ্ছে করে।

অনেক দিনের পুঞ্জীভূত মেঘ ফেটে ভেঙে চৌচির হয়ে পড়ল বুঝি সেদিন। কটা দিন রাখি বিশেষ ব্যস্ত ছিল। দূরের এক মফঃস্বল সহরে কম করে দশ-বারো দিনের ট্যুর-প্রোগ্রাম। বড় ব্যাপার। ছোট ছেলেমেয়েদের ফ্রী প্রাইমারি স্কুলের উদ্বোধন, তাদের শিক্ষার মহড়া, প্রসূতিসদনের উদ্বোধনী, জন্ম-নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা সপ্তাহ পালন, ওয়েলফেয়ার একজিবিশন ইত্যাদি অনেক ব্যাপার। কটা দিন হিমসিম অবস্থা রাখির। বাড়িতে ফাইল-পত্র এনে রাত জেগে কাজ করতে হয়েছে, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়ার ফুরসতও মেলেনি। তাছাড়া মেয়ের খপ্পরে না পড়লে সারাক্ষণ তো বই মুখে করেই আছে। রাখি চাকরকে বলে দিয়েছে, বাবুকে যেন সময়মতো খেতে দেওয়া হয়, তার সময়মত সে খেয়ে নেবে।

সেদিন ফাঁক পেয়ে একটু সকাল সকাল বাড়ি ফিরল। এসে দেখল কলেজের সেই অল্পবয়সী ইকনমিক্স-এর প্রোফেসারটি মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে। এম. এ. পরীক্ষার সময় যে ভদ্রলোকটি তাকে খানিকটা সাহায্য করেছিল। তাকে দেখে বলল,

দাদার জন্য বসে আছি, বাড়ি নেই শুনলাম। দু'দিন কলেজ যাননি দেখে খবর নিতে এলাম, কী হল?

রাখি অবাক। দু'দিন কলেজে যায়নি—ও জানেও না। তাছাড়া কলেজ পারতপক্ষে কখনো কামাই করে না। রাখি চাকরকে ডেকে তাড়াতাড়ি চা দিতে বলে বিস্ময় গোপন করতে চেষ্টা করল। ভদ্রলোকের নাম প্রতুল সোম। এ-কথা সে-কথার পর সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা বউদি, দাদা বদলির জন্য এরকম উঠে-পড়ে লেগেছেন কেন? আমরা জিজ্ঞেস করলে বলেন, এখানে শরীর টিকছে না।...কিন্তু যে-সব জায়গায় তিনি যেতে রাজি সে-সব কলকাতার থেকে কি এমন ভাল জায়গা?...আবার সরকারী চাকরি ছেড়ে বাইরের কোন কোন য়ুনিভার্সিটিতেও যেতে চেষ্টা করছেন শুনলাম, অবশ্য ওঁর মতো প্রোফেসার পেলে অনেকেই লুফে নেবে. কিন্তু ওর হঠাৎ এ-রকম ইচ্ছে হল কেন?

রাখি নির্বাক বিমূঢ় খানিকক্ষণ। এমন একটা সংবাদ সে কল্পনাও করতে পারে না। তার মুখ দেখে প্রতুল সোমও প্রথমে অবাক, পরে অপ্রস্তুত। সে বলেই ফেলল. আপনি এ-সব জানেন না নাকি?

সহজ হবার চেষ্টায় প্রাণান্তকর ধকল। সমস্ত শক্তি দিয়ে হাসতে চেষ্টা করল রাখি। বলল, ঠিক এতটা জানি না...।

বেফাস কিছু বলে ফেলেছে বুঝে প্রতুল সোম আর অপেক্ষা না করে উঠে পালাল।

মথায় আগুন জ্বলছে রাখির, সে অপেক্ষা করছে।

সন্ধ্যার একটু পরেই মানুষটা এলো টের পেল। সোজা তার শোয়ার ঘরে চলে গেল। ওর ঘরে আসা প্রায় ছেড়েই দিয়েছে।

খানিকটা সময় নিয়ে মাঝের দরজা দিয়ে রাখিই ও-ঘরে এসে দাঁড়াল। মেয়ে তখন বাপের বুকের ওপর উপুড় হয়ে কে এসেছিল সেই সমাচার জানাচ্ছে। তার বাবার গায়ে চাদর জড়ানো, শুকনো মুখ। কিন্তু আর লক্ষ্য করার ধৈর্য নেই রাখির। মেয়েকে বলল, ওদিকে আয়ার কাছে যাও।

মেয়ে আজকাল একটু ভয়ই করে তার মাকে। এই মুখের হুকুম শুনে তক্ষুনি চলে গেল। রাখি আরো একটু এগিয়ে এলো।—তুমি অন্য জায়গায় বদলির চেষ্টা করছ শুনলাম?

বদলির চেষ্টা নয়, আসলে সরকারী চাকরি ছেড়ে চলে যাবে কিনা, সম্প্রতি সেই চিন্তাই করছিল সে। জয়পুরের এক কলেজ থেকে তার আমন্ত্রণ যে এসেই গেছে, সেটা এ পর্যন্ত কারো কাছে বলেনি। এখনো বলল না। গায়ে চাদরটা আর একটু ভালো করে জড়িয়ে উঁচু বালিসে মাথা রাখল।

—হ্যাঁ।

—তা এ সামান্য খবরটা আমাকে বলোনি কেন, বাইরের লোকের কাছে বেশ ভালো-মতো অপমান করার জন্যে?

সুধীরকান্ত জবাব দিল না।

তীক্ষ্ণ কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রাখি।—আমাকে চাকরি ছাড়তে হবে?

—না।

—মেয়ে নিয়ে তুমি একা যাবে?

—হ্যাঁ।

চেয়ে আছে রাখি। মর্মান্তিক দেখাই দেখে নিচ্ছে যেন।—আশা বড করেছি সেই মস্ত অপরাধে বাসা তাহলে ভাঙাই ঠিক করেছ তুমি?

সুবীরকান্ত নিরুত্তর।

দু'চোখ ধক-ধক কবে জ্বলছে বাখির। গলার স্ববেও এবাব বুঝি আগুন ঝরল। —এত হিংসে তোমার ভেতরে ভেতবে! এত জ্বালা।

ধীব কিন্তু পাণ্ডুব মুখে সুবীবকান্ত আস্তে আস্তে বসল। কঠিন স্বরে বলল, বাখি। আমাব শরীব সুস্থ নয়, তুমি ও-ঘরে যাবে?

শরীর-মন কিছুই তোমাব সুস্থ নয সে তো অনেক দিন ধবেই দেখছি, ভিতবে এত বিকৃতি যার সে সুস্থ থাকবে কেমন কবে? ও-ভাবে দেখছ কী, আজও তুমি মুখ বন্ধ করবে ভেবেছ? তুমি নীচ! তুমি অতি নীচ, অতি ছোট, অতি হীন, বুঝলে—বুঝলে?

তাব মুখখানা ঝলসে দিয়েই এক ঝটকায সে ঘর থেকে বেবিয়ে এলো।

হাঁপাচ্ছে। বুকের ভেতবটা জ্বলে যাচ্ছে তখনো।

কববের স্তব্ধতার মধ্যে কেটে গেল কযেক ঘণ্টা। ও-ঘবেব আলো অনেকক্ষণ নিভে গেছে। মাঝেব পর্দাটা ঝুলছে। বাখি নিজের ঘব থেকে বেরুলো একসময। খাবাব ঘবে আলো জ্বলছে। চাকরটা বসে আছে। তাকে দেখে উঠে এলো।—বাবু বাতে কী খাবেন বললেন না তো?

তাব দিকে চেয়ে বাখি থমকালো একটু।—কী খাবেন মানে?

চাকর জানালো, আজ দু'দিন বাবুব শবীব খারাপ, দু'বেলাই দুধ-সাগু খাচ্ছেন —আজ কী খাবেন কিছুই বলেন নি।

কযেক মুহূর্ত বাখি নির্বাক। তারপব চাকবকে বলল, আব অপেক্ষা না কবে খেয়ে নিতে। তারও খিদে নেই বলে এলো।

পবদিন।

মেয়ে স্কুলে চলে গেছে। অফিসে বেরুবার আগে এক-বকম জোব করেই বাখি ঘরে ঢুকল।...চোখ বুজে শুযে আছে। টেবিলে ওষুধেব শিশি একটা। তেমনি পড়ে আছে—এক দাগও খাওয়া হয়নি। কাল বিকেলে ডাক্তাবের কাছে গেছল বোঝা গেল। সকালে টোস্ট পাঠিয়েছিল, তা তেমনি পড়ে আছে, শুধু চা খেযেছে।

ফিরে তাকাতে দেখল তার দিকেই চেয়ে আছে। বাখির মানসিক যাতনা একটুও কমেনি। সমস্ত রাত বরং আরো বেশি জ্বলেছে। তবু এই মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ দার্জিলিংয়ের একবাবের সামান্য অসুখের কথা মনে পড়ল। বাখি মাথায় হাত বুলিযে দিতে কয়েকটা কথা বলেছিল।...এ মুখের সঙ্গে সেই মুখের মিল নেই একটুও।

জিজ্ঞাসা করল, তোমার কী অসুখ?

জবাব পেল না।

—আজ কলেজ যাবে?

নিরুত্তর।

—দু'পুরে কী খাবে সে-কথা বলবে?

নির্বাক।

বাখি বেবিযে এলো। কাল বাদে পরশু অত বড় ট্যুর-প্রোগ্রাম, অফিসে অনেক কাজ। কিন্তু কাজ না থাকলেই বা কী কবত? ও বাড়ি থাকলেই ববং না খেযে না দেয়ে ওই ভাবে বসে থেকে তাকে আক্কেল দেবে। ক্ষোভ আব একটা অসহ্য যাতনা নিযে বেবিয়ে পড়ল।

এমনি স্তব্ধতাব মধ্যেই সেই দিনটা গেল। পরেব দিনও। সন্ধ্যা। প্রাণান্তকর বিমুখতা সত্ত্বেও পর্দা সবিয়ে ঘরে ঢুকল।...বসে আছে। পাশে মেযে।

—কেমন আছ?

জবাব পেল। মেযে সামনে আছে বলেই।—ভালো।

ট্যুবে বেবোনোব খবব আগেই জানত। পাঁচ-ছ'দিন আগে রাখি বলে রেখেছিল। ভিতবে ভিতবে মানুষটা কোন ছুবি শানাচ্ছে তখনো জানা ছিল না। জিজ্ঞসা কবল, কাল আমাব ট্যুব-প্রোগ্রাম, কী কবব?

—যাবে।

—ফিরতে আট-দশদিন দেবি হবে।

—হবে।

বাইরে এসে কাজেব চাপে সাময়িকভাবে যাতনাটা ভুলতে চেষ্টা করল বাখি। শুধু যাতনা নয, সেই সঙ্গে বিদ্বেষ, ক্ষোভ—আবাব কী একটা অজ্ঞাত ভয়ও।...মানুষটাব অভিসন্ধি জানাব পব এতবড় একটা ব্যাপাব ঘটে গেছে যখন, ভযের কিছু আছে ভাবছে না। তবুও ভয।

সমস্ত দিনে ফুবসত নেই বললেই চলে। বড ব্যাপাব। সোমাকে নিযে ডাইরেক্টর বমেন্দ্র সরকার এসেছে, জয়েন্ট ডাইরেক্টর কাপুব এসেছে, বাখি এসেছে, ওযেলফেযার অফিসাব এসেছে, আব আবো নীচেব কর্মচারীরা যে কত এসেছে ঠিক নেই।

ওপবেব দিকেব ওবা মস্ত সবকারী বাংলোয় আছে—সস্ত্রীক রমেন্দ্র সবকার, কাপুর, বাখি আর ওয়েলফেযার অফিসাব। বাতে কাপুরের ফূর্তিব আড্ডা বসে। বোতলেব রসদ সে কলকাতা থেকেই নিয়ে এসেছে। তাদেব চারজনেব আনন্দেব আসর বসে। আনন্দ যে নেই সেটা বুঝতে না দেবাব তাগিদেই রাখি যোগ দেয। না এলে সোমা বা কাপুর গিয়ে ঘব থেকে ধরে নিয়ে আসে।

তাদেব অনুরোধে গেলাসও হাতে তুলে নেয়। সমস্ত দিনেব এত পরিশ্রমের পরেও রাতে ঘুম হতে চায না। এই তরল জিনিস জঠরে গেলে চিন্তা-ভাবনাও কিছুটা ফিকে হয়ে যায়, ঘুমও একটু হয়। বাখি ভিতরের সমস্ত ক্ষোভ চিন্তা-ভাবনা যাতনা মুছে ফেলতেই চায।

দশটা দিন কেটে গেল। বমেন্দ্র সবকাব সোমা আব কাপুব কাল চলে যাবে। বাখিব আবও দিন-দুই থাকা দবকাব। মন না চাইলেও থেকেই যাবে।

বাতেব আসব আজ একটু বেশিই জমেছে। বাখি গেলাস তেমন মুখে তুলছে না দেখে বমেন্দ্র সবকাব নিজে পর্যন্ত দুই-একবাব সাহায্য কবতে এগিযেছে। সোমাব হাব-ভাবও অন্য দিন থেকে একটু বেশি খুশি-খুশি। বেশি খেযেছে বলেই বোধহয।

বাত মন্দ হল না। ববেব শবীব খাবাপ হবাব ভযে সোমা একবকম জোব কবেই বমেন্দ্র সবকাবকে টেনে তুলে নিযে চলে গেল।

বাখিও উঠল।

কাপুব বাধা দিল, ম্যাডাম দাঁড়াও, তোমাব সঙ্গে আমাব কথা আছে।

উঠে সোজা এগিযে গিযে ঘবেব পুরু নীল পর্দাব ওধাবেব দবজা দুটো টেনে দিযে সোজা তাব কাছে ফিবে এলো। খুব কাছে। সঙ্গে সঙ্গে হাত দুটো তাব দুই কাধে উঠে এলো।

—এ-ভাবে আব কত দিন চলবে? হোযাই ওযেস্ট টাইম?

—তাব মানে? বাখি হতভম্ব। তাব বোধশক্তি কযেক নিমেষেব জন্যে যেন বিলুপ্ত একেবাবে।

—ও, ইউ নো ওযেল! একটা জোবালো আকর্ষণ, পবমুহূর্তে পুরু দুই অধবেব নিষ্পেষণে ঠোঁটদুটো যেন জ্বলেপুড়ে গেল বাখিব। সর্বাঙ্গ অবশ, পাযেব নীচে মাটি দুলছে।

কযেকটা মুহূর্ত। প্রাণপণে লোকটাকে ঠেলে সবালো সে। চকিতে বসন সংববণ কবে নিযে একটা চাপা আর্তনাদ কবে উঠল প্রায।—এ আপনি কী কবছেন?

কাপুব থমকাল একটু। তাবপব হেসেই আবাব বলল, বাখি, লেটস কাম আউট—আমাব ফ্লার্টিং ওযাইফেব সঙ্গে আমাব বনছে না, তোমাবও ওই বাফ হাজব্যাণ্ডেব সঙ্গে বনছে না—সো লেট আস মেক অ্যাবেজমেন্ট অ্যাণ্ড লেট দেম গো টু হেল!

—এসব, এসব আপনাকে কে বলেছে? আমাব কথা আপনাকে কে বলেছে? ক্রোধে আব সেই সঙ্গে এক অব্যক্ত যাতনায বাখি ঝবঝব কবে কেঁদে ফেলল।

আব তাই দেখেই কাপুব হকচকিযে গেল কেমন।—বোসো ম্যাডাম, আই অ্যাম স্কাউন্ড্রেল বাট নট মীন। আমাকে বুঝতে দাও। তুমি তোমাব হাজব্যাণ্ডকে ভালবাসো?

বাখি অসহিষ্ণু জোবেব সঙ্গে বলে উঠল, হ্যাঁ।

—সে তোমাকে ভালবাসে?

—বাসে।

কাপুব ধুপ কবে সোফায বসে পড়ল।—দেন আই অ্যাম এ ফুল অ্যাণ্ড হ্যাভ প্লেড ইন হাব হ্যাণ্ডস এগেইন। শোনো ম্যাডাম, আমি একেবাবে ভুল ধাবণা থেকে এগিযেছি—দ্যাট লেডী, সোমা সবকাব, সী ইজ অ্যান ইনট্রিগিং গার্ল।। নাও আই আণ্ডাবস্ট্যাণ্ড এভবিথিং। —ওযেলফেযাব অফিসাব মণিমালা ঘোষকে মনে আছে? ওদেব আত্মীয। সি লাইকড মি...পবিবাবেব দুর্নাম হবে সেই ভযে আমাদেব মাঝখানে ওবা তোমাকে নিযে এলো। সোমা সবকাব কত যে প্রশংসা কবেছিল তোমাব ঠিক

নেই।..আব আমাবও সত্যি তোমাকে ভালো লাগতে শুরু কবেছিল, সেটা বুঝেই মণিমালা সবে গেছে।

বাখি স্তব্ধ। কাপুব উঠে লম্বা ঘবটায় একবাব পায়চাবি কবে তাব হাত-কয়েক দূবে এসে দাঁড়াল।—ইদানীং সোমা সবকাব তোমাব স্বামীব সম্পর্কে আমাব কাছে অজস্র নিন্দা কবত, তাকে বোগ বলত, বলত বিয়েব পব থেকে কোনোদিন তুমি শান্তি পাওনি বলে তাব ধাবণা।—কেন বলত জানো? বিকজ হাব হ্যাজব্যাণ্ড হ্যাজ স্টার্টেড লাইকিং ইউ, ইয়েস সী ক্যান স্মেল দ্যাট।—তাই সে এখন আমাকে দিয়ে তোমাকে ভালোমত আড়াল কবাব জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। আজ বিকেলেও আমাকে বাব বাব বলেছে, না এগোলে হবে কি কবে, এতবড় সুযোগ পেয়েও এগোচ্ছ না কেন?

অদ্ভুত একটা হাসি দেখা গেল কাপুবেব মুখে। সব ঝেড়ে ফেলেই যেন বলল, যাক, লেট এভবিওয়ান অফ আস একসেপটিং ইউ গো টু হেল। ক্যান ইউ ফবগিভ মি?

বাখি চিত্রার্পিতেব মতো দাড়িয়ে। জবাব দিতে পাবেনি।

পবদিন সন্ধ্যাতেই বাড়ি ফিবল বাখি। একটা দিনও আব দেবি কবতে পাবেনি। তাব কেবলই মনে হচ্ছিল, কী একটা ব্যাপাবে যেন বড় দেবি হয়ে যাচ্ছে। থেকে থেকে একটা দুর্যোগেব ছায়া পড়ছে।

তাই ছুটে আসাব তাড়া।

মেয়ে দৌড়ে এলো কাছে।—মা তুমি এসে গেছ! আমাব কী খাবাপ যে লাগছিল, ভাবছিলাম তোমাব সঙ্গে যাবাব আগে বুঝি দেখাই হল না!

বিষম চমকে উঠল বাখি। সত্রাসে তাকালো মেয়েব দিকে।—কোথায় যাবি?

—বাবে, কাল যে আমবা জয়পুব চলে যাচ্ছি! বাবু বলেছে, কাল এই সময় ট্রেন।

বাখি বাকশক্তিবহিত। কোনবকমে দু'পা এগিয়ে পাশেব ঘবেব পবদা সবালো। ঘবে কেউ নেই।

মেয়ে বলল, বাবা আবো কী সব কিনতে গেছে।

..নিজেব ঘবেব শয্যায় এসে বসল পাখি। নিস্পন্দ, কাঠ। বাখি পাশে দাড়িয়ে সাগ্রহে কী যেন বলছে...বলছে বাবাকে আব সেই সঙ্গে ওকেও কলেজে নিয়ে গিয়ে কত খাতিব কবেছে, বাবাকে মোটা মোটা মালা পবিয়েছে, কত ভাল ভাল কথা বলেছে, তাবপব কত কী খাইয়েছে তাদেব।

নিষ্প্রাণ মূর্তিব মত বাখি বসেই আছে।

সিঁড়িতে পায়েব শব্দ।...ওদিকেব দবজা দিয়ে নিজেব ঘবে ঢুকে গেল। কিন্তু বাখিব নড়াব শক্তি নেই। মেয়েব গলা কানে আসছে। মায়েব ফেবাব খবব দিচ্ছে বাবাকে।

খানিক বাদে সুবীবকান্ত এ-ঘবে এলো। শবীব এখনো ভালো কবে সাবেনি বোধহয়। শুকনো মুখ। নির্লিপ্ত মুখে সামনেব বিবর্ণ মূর্তিব দিকে চেয়ে বইল একটু। তাবপব ঠাণ্ডা গলায় বলল, ভাবনাব কিছু নেই, তোমাব অনেক ক্ষমতা, দু'দিনেই ঠিক হয়ে যাবে। কাল যাচ্ছি আমবা, তুমি আজই আসবে ধবে নিয়েছিলাম, না এলে প্রতুলেব

কাছে চাবিটাবিগুলো বেখে যেতে হত...যাক, এই তোমাব চাবি-পত্র—আব সব যেমন ছিল তেমনি আছে।

প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংববণ কবতে চেষ্টা কবছে বাখি। অস্ফুট স্বব নির্গত হল গলা দিযে—যাচ্ছ কেন?

স্থিব নেত্রে সুবীবকান্ত চেযে বইল একটু। জবাব দিল, যাচ্ছি, তোমাব জীবনে এই নীচ ছোট হীন লোকেব আব দবকাব নেই বলে।

—দবকাব আছে।

দু'চোখ ধাবালো-হযে উঠছে সুবীবকান্তব।—আছে? বড দুর্ভাগ্য আমাব। তাহলেও যাচ্ছি, আমাব জীবনেও তোমাব প্রযোজন ফুবিযেছে বলে।

অসহিষ্ণু হাতে পর্দা ঠেলে নিজেব ঘবে ঢুকে গেল।

পর্দাটা দুলে দুলে স্থিব হল আবাব।

বাতটা কী-ভাবে কাটল বাখি জানে না। ঘুমোযনি, আবাব জেগেও ছিল না। মাথাব মধ্যে কী সব অজস্র হিজি-বিজি ব্যাপাব চলেছিল। সকাল হতে আব কিছু মনে নেই।

এক বাতেব মধ্যে শবীবটা যেন পঙ্গু হযে গেছে। সমস্ত অস্তিত্বটাই যেন অনড হযে গেছে। নডতে-চডতে কষ্ট। সকাল থেকে বসে আছে নিষ্প্রাণ মূর্তিব মতো।

সাডে ন'টা বাজতে ধডমড কবে উঠল।

অফিসে যাবে।

না খেযেই বেবিযে গেল। অফিসে এলো। নিজেব ঘবে বসে বইল চুপচাপ। একটা ফাইলও ওলটালো না। মাথাব মধ্যে কী যেন সব তালগোল পাকাচ্ছে সেই থেকে। বেলা দুটো না বাজতে ভিতবে ভিতবে ওঠাব তাডা। ঘন ঘন ঘডি দেখল। কিন্তু জোব কবে পাঁচটা পর্যন্ত বসেই থাকল। বাডি ফিবে কী কববে? কী কবতে পাবে বাখি? ...চোখেব সামনে মেযেব হাত ধবে চলে যাচ্ছে, তাই দেখবে চেযে চেযে?

অন্যদিন অফিসেব গাডিতে বাডি ফেবে। আজ ট্রামে উঠল। তাতেও বেশ কিছুটা সময চলে গেল। জাযগায নামল। ট্রাম-স্টপেব উল্টোদিকেব বাস্তা ধবে আধ মিনিট হাঁটলে বাঁ-দিকে বাডি। ট্রাম-স্টপ থেকে বাডিটা দেখা যায।

বাখি বাস্তা পাব আব হল না। ট্রাম-স্টপেই দাঁডিযে বইল। বাডিটাব দিকে নিষ্পলক চেযে বইল।

বিকেলেব ছাযা ঘন হযে আসছে।

...বাডিব দোবে একটা ট্যাক্সি দাঁডাল। ও-মুখ কবে। ওই ফাঁকা বাস্তা ধবে স্টেশনে যেতে সুবিধা। বাখিব বুকেব ওপব হাতুডিব ঘা পডল। চাকবটা নেমে ভেতবে চলে গেল।

একটু বাদে মাল-পত্র তুলতে লাগল। বেশি কিছু নয। মেযেব হাত ধবে তাব বাবা ট্যাক্সিব সামনে এসে দাঁডাল।

সমস্ত শক্তি একত্র কবে বাখি দেখছে। নিঃশ্বাস রুদ্ধ।

তাবা উঠল। ট্যাক্সি চলে গেল। ওই চাকাগুলো বুঝি বাখিব বুকেব ওপব দিযেই চলে গেল।

সামনে রাজ্যের অন্ধকার ধেয়ে আসছে। রাখি এবার তার আগেই বাড়ি পৌঁছুতে চায়। নইলে আর পারবে না। পায়ের নিচে মাটি দুলছে। পৃথিবী ঘুরছে।

...বাড়ি। সিঁড়ি ধরে দোতলা। দোতলায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সামনের দুটো শূন্য ঘর যেন হাঁ করে গিলতে এলো তাকে। মিনিটখানেক শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে রাখি আত্মরক্ষা করল।

তারপর পায়ে পায়ে ঘরে ঢুকল।

মাথার মধ্যে আবার কী সব হিজিবিজি তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। রাখি তারও জট ছাড়াতে চেষ্টা করছে।...কী এমন হয়েছে? কিছু হয়নি। পৃথিবী রসাতলে যায়নি। সবই ঠিক আছে। জয়পুর আর কতদূর?...দার্জিলিংয়ে করে যেন একটা লোক অসুখে পড়ে আনন্দ-ছলছল চোখে বলেছিল—এত দিন তার কেউ ছিল না, এখন সব আছে। ... আর ও নিজের হাতে খাবার তৈরি করলে সেই লোকটা ছোট ছেলের মত খুশি হত। অনেকদিন কিছু করা হয়নি। কিন্তু তাতে কী, দিন কী ফুরিয়ে গেল নাকি...জয়পুর কত আর দূর?

...কাপুর জিজ্ঞেস করেছিল, হাজব্যাণ্ড ওকে ভালবাসে কিনা, আর জিজ্ঞেস করেছিল, ও হাজব্যাণ্ডকে ভালবাসে কিনা। যেন এরকম সম্ভাবনার মতো ছেলেমানুষি সম্পর্ক এটা। ঠোঁট দুটো বিষম জ্বালা করে উঠল হঠাৎ, সুরাযুক্ত দুটো অধরের স্পর্শ। তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে বেশ করে মুখটা ধুয়ে এলো।...সোমাটা হতচ্ছাড়ি একটা, দিল একটা ভালমানুষকে ক্ষেপিয়ে। কী না, ওর বর রাখিকে পছন্দ করতে শুরু করেছে। করলেই হল, অত সস্তা আর কী। জয়পুর যেন ভয়ানক দূর।

আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বিছানায় বসল।—কী যেন ভাবছিল। কী যেন ভাবা দরকার। কিন্তু আজ আর কিছু পারছে না। ভয়ানক ক্লান্ত। ঘুম পাচ্ছে। কাল ভাববে। পরশু ভাববে। ইচ্ছেমতো যে-কোন দিন ভাববে। আজ ঘুম পাচ্ছে—মোটা কথা, জয়পুর এমন কিছু দূর নয়।

ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা রাখি শয্যায় এলিয়ে দিয়ে নির্জীবের মত চোখ বুজল।—আজ আর কিছু ভাবতে পারছেই না। কাল ভাববে। পরশু ভাববে। ইচ্ছেমতো যে কোনদিন ভাববে। আজ রাখি ঘুমুবে।

আচরণ

সুমিত্রা সিংহর বয়েস এখন আটচল্লিশ। কিন্তু মেয়েদের কাছে আটষট্টির মুখোস এঁটে থাকেন সর্বদা। শুধু মেয়েদের কাছে কেন, নানা বয়সের বিয়াল্লিশজন শিক্ষয়িত্রীও তাঁর প্রায় মৌন অনুশাসনের ভয়ে সন্ত্রস্ত। বিচ্ছিন্ন ভাবে ঘরে ডাক পড়লে তাঁরাও খুব স্বস্তি বোধ করেন না।

চারশো মেয়ে, বিয়াল্লিশজন শিক্ষয়িত্রী, স্কুল বাস-এর জনাকয়েক ড্রাইভার আর ক্লিনার, চারজন ঝাড়ুদার, তিনটে মালী আর হস্টেলের মেট্রন আর কিছু ঝি-চাকর

নিযে সুমিত্রা সিংহব সাম্রাজ্য। ছোট ব্যাপাব কিছু নয। সকলেব সকল স্বার্থ বজায বেখে নিযম শৃঙ্খলাব সঙ্গে একটা স্কুল চালানো বেশ ধকলেব কাজ। আজ ছ'বছব ধবে শক্ত হাতে এই প্রতিষ্ঠানটিব হাল ধবে আছেন তিনি। স্কুল কর্তৃপক্ষ নির্বিবাদে এখন তাঁব সব সুপাবিশ মেনে চলেন। সব থেকে উঁচু আসনটি তাব দখলে আসাব পব থেকে বছবেব পব বছব বোর্ডেব পবীক্ষাব বেজাল্ট দেখছেন তাবা। শুধু এবই ফলে স্কুলে প্রতি বছব নতুন ভর্তিব হিড়িক সামলানো দায। কোন ক্লাসে সাতটা সীট খালি থাকলে তিনশো মেযে পবীক্ষা দিতে বসে যায। এ ব্যাপাবে হোমবা-চোমবাদেব সুপাবিশ অচল। তাছাড়া সুমিত্রা সিংহ আসাব পব গার্জেনদেব অবুঝ দাপট কমেছে, শিক্ষযিত্রীদেব দলাদলি গেছে। হবিতম্বি কবতে এসে অনেক গার্জেনকে মুখ বুজে মেযেব ট্রান্সফাব সার্টিফিকেট নিযে যেতে হযেছে। কযেকজন অকেজো বা অবাধ্য টিচাবকে অবসবও নিযে যেতে হযেছে। সর্বাধিনাযিকাটিব সুনজবে পড়তে হলে ক্লাসেব মেযেদেব ভালব জন্যে প্রাণপাত কবতে হবে—এ এখন সব শিক্ষযিত্রীবাই বুঝে নিযেছেন।

বেশি পবিশ্রম কবতে হয বলে সকলেই তুষ্ট নয। এত দাপট দেখে ভিতবে ভিতবে কাবো বা ঈর্ষা। তাবা দেমাক দেখেন, দম্ভ দেখেন। ৰূপেব দেমাক। ৰূপসী আদৌ নন, কিন্তু সুশ্রী বটেই। তাছাড়া স্বাস্থ্যেব বাধুনি এমন যে আটচল্লিশ বছব বযসটাকে অনাযাসে চল্লিশে টেনে নামানো যায। আব এদেব চোখে দম্ভ বলতে শিক্ষাব দম্ভ। ইংবেজিতে কলকাতাব এম. এ। আব এম. এড। সুযোগ সুবিধে পেলে ওবকম বিলেতি ছাপ যে কেউ নিযে আসতে পাবে। বেড়ালেব ভাগ্যে ক্বচিৎ কখনও শিকে ছেঁড়েও। স্কুলমাস্টাবি কবতে কবতে হঠাৎ সবকাবী দাক্ষিণ্যেব সুযোগে সুমিত্রা সিংহও তেমনি কিছুদিন বিলেতে ঘুবে এসেছেন। আড়ালে আবডালে এই সবকাবী দাক্ষিণ্য লাভেব ব্যাপাবেও কেউ কেউ জটিল সংশযেব ছাযা ফেলতে ছাড়েন না। বযেসকালেব সুশ্রী মেযেব সুপটু তোষামোদে কত কি হয, কত কি হতে পাবে। কিন্তু দেযালেবও কান আছে। একান্ত বিশ্বস্তজন ভিন্ন কাবো মনেব কথা মুখে ফোটে না।

সুমিত্রা সিংহ যেখান দিযে হাটেন চলেন, শিক্ষযিত্রীবা ঠাণ্ডা, মেযেবাও সন্ত্রস্ত। আব ঘবে ডাক পড়লে তো কথাই নেই, ভিতবে ভিতবে ঘাম হতে থাকে।

সুমিত্রা সিংহব বাড়িব চালচলনেও বকমফেব নেই খুব। এখানেও একটা হালকা গাম্ভীর্য ছুযে আছে তাকে। এক ছেলে এক মেযে। ছেলে নতুন ডাক্তাব, মেযে কলেজে পড়ে। ছেলে আব মেযে তাদেব ডক্টবেট বাপেব থেকে মাকে বেশি সমীহ কবে। ডক্টবেট ভদ্রলোক ইজিচেযাবে আধশোযা হযে বই পড়েন আব থেকে থেকে স্ত্রীব গম্ভীব মুখেব ওপব দু'চোখেব কৌতুক ছড়ান। সেটা কখনও-সখনও ধবা পড়ে না এমন নয।

স্ত্রীটি তখন থমকে তাকান।—কি ?

কি ?

হাসছ মনে হচ্ছে?

এটা সেটা বলে ভদ্রলোক সামলে নেন। য়ুনিভার্সিটিব মনোবিজ্ঞানেব প্রফেসাব তিনি। আপন মনে হাসাব অনেক কাবণ তাঁব ঠোঁটেব ডগায মজুত। মহিলাব তখনো

প্রধান শিক্ষযিত্রীব সন্দিগ্ধ চোখ। এ নিযে এই সেদিন আবো একটু মজাব ব্যাপাব ঘটে গেছল। শনিবাব বিকেল চাবটেব মধ্যে বাড়ি ফিবেছিলেন। ডক্টব সিংহ অন্য দিনেব মতোই বই হাতে ইজিচেযাবে শযান। ভদ্রলোকেব দু'তিন ঘণ্টাব বেশি ক্লাস থাকে না বলে স্ত্রী তাঁব চাকবিটাকে ফাকিবাজী ছাড়া আব কিছু ভাবেন না। এক এক সময খোঁটাও দেন—মাস্টাববা যে বকম পবিশ্রমকাতব ছেলেবা কত আব মানুষ হবে।

সুমিত্রা সিংহব মেজাজ খুব প্রসন্ন ছিল না সেদিন। স্কুলেব কোন একটা ভাবনা মাথায নিযে বাড়ি ফিবেছিলেন। তাবপব প্রায ঘণ্টাখানেক ধবে সেই চিন্তা কবেছেন, মাঝে মাঝে ভুরু কুচকে ঘবে আব সামনেব বাবান্দায পাযচাবি কবেছেন।

হঠাৎই এক সময খেযাল হল বই কোলেব ওপব ফেলে স্বামীটি সকৌতুকে চেযে আছেন তাঁব দিকে। ভুরুব ভাজ আবো একটু ঘন হল—হাসছ যে?

ভদ্রলোক সেদিন সত্যি কথাই বললেন। জবাব দিলেন, তোমাকে দেখে।

আমাকে দেখে হাসছ মানে?

বাজাবে সাদা কলপ কিনতে পাওযা যায কিনা দেখো, তোমাব এই চালচলন মানাচ্ছে না।

তাব মানে?

কাছে এস, বলছি।

সত্যিই এখন শুধু সমস্যাব জগৎ আব চিন্তাব জগতে বাস মিসেস সুমিত্রা সিংহব। সঠিক না বুঝে কাছে এসে দাড়ালেন। হাত ধবে আচমকা আবো কাছে টেনে যে কাণ্ডটা কবে বসলেন ভদ্রলোক দিশেহাবাব মত ছিটকে সবে দাড়ালেন মহিলা। আবক্ত মুখে আব অবিশ্বাস্য চোখে চেযে বইলেন খানিক। ভদ্রলোক কৈফিযৎ দিলেন, সেজন্যেই তো সাদা কলপেব কথা বলছিলাম, তোমাকে দেখলে আমাব এখনো এই সাধ জাগে তো কি কবব।

সুমিত্রা সিংহ এবপব পনেবো মিনিট ধবে শাসালেন তাকে। শোওযাব ঘব আলাদা কবে দেবাব হুমকি দিলেন, বযেস কালেব ধর্ম আব শৃঙ্খলা মেনে চলাব কথা বললেন, দবজা কপাট হা কবা খোলা, ছেলেমেযেবা একজন কেউ দেখে ফেললে কি কাণ্ড হত সে কথা পাঁচবাব কবে শোনালেন।

ভদ্রলোক বেচাবা দোষ স্বীকাব কবে বললেন, দবজা কপাট বন্ধ না কবে এ বকম গর্হিত কাজ আব কখনো কববেন না।

ভদ্রমহিলা দ্বিগুণ আগুন হযে ঘব ছেড়ে প্রস্থান কবলেন। এবপব ক'টা দিন মাযেব মেজাজ দেখে ছেলে মেযে অবাক। বাবাব সামনেই কথায কথায আত্মসংযম সম্পর্কে ধাবালো উপদেশ শুনতে হযেছে তাদেব।

সুমিত্রা সিংহ স্কুলে নিজেব ঘবে বসে আছেন। কঠিন থমথমে মুখ। অসংযম আব শৃঙ্খলাভঙ্গেব এক দাৰুণ নালিশ এসেছে তাঁব কাছে। অপবাধী একেবাবে উঁচু ক্লাসেব পাঁচটি মেযে। স্কুল হস্টেলে থাকে তাবা। নিজেব স্কুলে এত বড অপবাধেব কথা তিনি ভাবতে পাবেন না। কিন্তু অবিশ্বাস কবাব কিছু নেই। অপবাধেব নজিব

তাঁব সামনে। স্কুল লাইব্রেবিব কতগুলো ছেঁড়া-খোঁড়া বই। অসংযত স্ফূর্তিব উল্লাসে ওই মেয়েগুলো ছিঁড়েছে। বইযেব নানা জাযগায অশ্লীল মন্তব্য লেখা। সেও ওই মেযেগুলোব কাজ। এ ছাড়া তাদেব কতগুলো নোঙবা চিঠিচাপাটি হাতে নাতে ধবা পড়েছে। বেসিডেন্সিযাল টিচাব আব মেট্রন সেগুলোও হেডমিসট্রেসেব কাছে দাখিল কবেছেন।

সব দেখে শুনে সুমিত্রা সিংহব নিজেবই আত্মস্থ হতে সময লেগেছে। তাবপব ঠাণ্ডা মুখে ওই পাঁচ মেযেব সম্পর্কে বিপোর্ট নিযেছেন তিনি। পাঁচটি মেযেব মধ্যে চাবজন স্কুলেব পুবনো ছাত্রী এবং মোটামুটি ভাল ছাত্রী। কেবল একটি মেযে নতুন। নাম নন্দিতা বসু। গেল বছব অন্য স্কুল থেকে ট্রান্সফাব নিযে এই স্কুলে ভর্তি হযেছিল। কোনবকম ধব-পাকডেব জোবে নয়, পঞ্চাশ ষাটজন বাইবেব মেযেব মধ্যে এখানকাব অ্যাডমিশন টেস্টে সমস্ত পবীক্ষায ফার্স্ট হযে ভর্তি হযেছিল। তাবপব গেলবাবেব অ্যানুযাল পবীক্ষাযও ওই মেযে সমস্ত বিষযে ফার্স্ট হযে ক্লাস প্রমোশন পেযেছে। কিন্তু পড়াশুনায যত ভালই হোক ওই মেযেই সমস্ত নষ্টেব গোড়া। এসব অপকর্ম বেশীবভাগই তাব। কাউকে পবোযা কবে না। ওই একটা মেযেই বাকি চাবটে মেযেকে এভাবে নষ্ট কবছে। ধবা পড়াব পব এই মেযেবা ঘাবড়ে গিযে বেসিডেন্সিযাল টিচাবেব কাছে সব কবুল কবেছে। মেট্রন আবো জানালেন ধবা পড়াব পবেও ওই নন্দিতা বসুবই কেবল বেপবোযা হাবভাব।

অভাবনীয একটা শাস্তিব নজিব বাখাব সংকল্প নিযেছেন সুমিত্রা সিংহ। তাঁব নামেই সমস্ত মেযেব বক্ত জল, কোনদিন কোন মেযেব গাযে হাত তোলাব দবকাব হযনি। কিন্তু এ ঘটনা সব কিছুব ব্যতিক্রম। তিনটে বেত আনিযে টেবিলেব ওপব বাখলেন। তাঁব নির্দেশমত বেসিডেন্সিযাল টিচাব আব মেট্রন ওই পাঁচ মেযেকে ডেকে নিযে আসতে গেলেন।

শাস্তি কি দেবেন সুমিত্রা সিংহ সেটা স্থিব কবে ফেলেছেন। নতুন মেযে নন্দিতা বসু যত ভাল ছাত্রীই হোক এতখানি অধঃপতনেব পব তাকে আব স্কুলে বাখবেন না। তাই তাব গাযে হাত তোলা নিষ্প্রযোজন। কিন্তু তাকে সেটা বুঝতে দেবেন না। তাব সামনে চাব মেযেকে শাস্তি দেবাব পব ব্যাড কনডাক্ট-এব ছাপ মেবে তাকে স্কুল থেকে তাড়াবেন।

পাঁচ মেযেই এল। পিছনে বেসিডেন্সিযাল টিচাব আব মেট্রন। পুবনো চাব মেযেব বিবর্ণ পাংশু মুখ। এমনিতেই থব থব কাঁপছিল, প্রধান শিক্ষযিত্রীব মূর্তি দেখে আব টেবিলেব ওপব বেত দেখে তাদেব আবো হযে গেছে। চাবজনই হাত জোড় কবে নিঃশব্দে ক্ষমা চাইছে।

ক্ষমাশূন্য চোখে একে একে সবকটি মেযেকে দেখলেন সুমিত্রা সিংহ। সব শেষে নন্দিতা বসুকে। মেযেটাব তখনো উগ্র হিংস্র চাউনি। নতুন বযসেব খাঁচায পোবা এক উদ্ধত জীব যেন। সংকল্প ভুলে সকলকে ছেড়ে ওকেই মাটিতে শুইযে ফেলাব জন্যে হাত নিশপিশ করে উঠল সুমিত্রা সিংহব। কিন্তু নিজে তিনি সংযম খুইযে বসতে পাবেন না।

ওই নন্দিতা বসু মেয়েটার দিকে কয়েক পলক চেয়ে থাকার পরই নিজের ভিতরে কেমন যেন একটা নাড়া-চাড়া পড়ল সুমিত্রা সিংহর। এই মেয়ের মুখে কার যেন চেনা আদল একটা। ঠিক মনে করে উঠতে পারছেন না, কিন্তু এই মুখে কার একখানা মুখ যেন হুবহু বসানো।

কয়েক নিমেষের অন্যমনস্কতা ঝেড়ে ফেলে সুমিত্রা সিংহ কর্তব্যে মন দিলেন। বেতের আঘাতে আঘাতে এক একটা মেয়ে আর্তনাদ করে মাটিতে লুটোপুটি খেতে লাগল আর তাঁর পা জড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে লাগল। তখনো নির্মম কঠিন তিনি। শাস্তির পর একটি করে মেয়েকে বিদায় দিয়ে পরেরটিকে ধরেন। ঘরের মধ্যে শুধুই একটা ত্রাসের হাওয়া বইছে।

কিন্তু একটা করে মেয়ের ওই আর্তনাদের মুখেই এক একবার নন্দিতা বসুর দিকে চোখ গেছে তার। উদ্ধত আক্রোশে মেয়েটা যেন ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছে। কিন্তু বন্ধ দরজার সামনে মেট্রন দাড়িয়ে, বাইরে দরোয়ান। এক একটা মেয়ের শাস্তি শেষ হলে তবে দরজা খুলে তাকে বার করে দেওয়া হচ্ছে। তখনো সুমিত্রা সিংহর মনে হয়েছে রাগ হলে কার একখানা মুখের চিবুক আর ঠোঁট ওই মেয়েটার মতই বেঁকে যেতে দেখেছেন করে। আবারও মনে হয়েছে মেয়েটার অমন সুশ্রী মুখের সঙ্গে কার যেন আশ্চর্যরকম মিল।

চার নম্বর পুরনো মেয়েও বেত্রাঘাতে জর্জরিত হয়ে হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে ঘর ছেড়ে চলে গেল। সুমিত্রা সিংহ হাঁপাচ্ছেন বেশ। দু'চোখ জ্বলছে। নিজের চেয়ারে বসে সোজা একবার তাকালেন নন্দিতা বসুর দিকে। সব থেকে বেশি দাগী মেয়েটা এখন বেপরোয়া উদ্ধত চোখেই চেয়ে আছে তাঁর দিকে।

সুমিত্রা সিংহ ইশারায় রেসিডেন্সিয়াল টিচার আর মেট্রনকে ঘর ছেড়ে চলে যেতে বললেন।

তারা অনিচ্ছাসত্ত্বেই প্রস্থান করল। এই মেয়ের শাস্তিটাই বিশেষ করে চোখে দেখার ইচ্ছে ছিল বোধহয়।

ঘরের মধ্যে দুজনে মুখোমুখি এবার। চোখাচোখি।

অনুচ্চ কঠিন গলায় সুমিত্রা সিংহ জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নাম নন্দিতা বসু?

হ্যা। আপনি আমার গায়ে হাত তুলবেন না, ইচ্ছে হলে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিতে পারেন।

মুহূর্তের জন্যে সংযম হারালেন সুমিত্রা সিংহ। উঠে দাঁড়িয়ে টেবিল থেকে বেতটা তুলে নিয়ে মেয়েটার কাঁধ বেড়িয়ে একটা প্রচণ্ড আঘাত করে বসলেন। কিন্তু ওই একটাই। সুশ্রী মেয়েটার রক্তবর্ণ মুখ এখন। চেয়ে আছে। প্রহারের জবাবটা যেন চোখ দিয়ে দিচ্ছে। সুমিত্রা সিংহ বুঝে নিলেন আঘাতে আঘাতে মাটিতে শুইয়ে ফেললেও এ মেয়ের মুখ দিয়ে কান্নার শব্দ বেরুবে না।

তার দরকারও নেই। সংকল্প মতই কাজ করবেন। কিন্তু মেয়েটার এই মুখের আদল কেন যেন বড় বেশি বিমনা করে তুলছে তাঁকে।

বসলেন আবাব। তেমনি কঠিন গলায ফেব জিজ্ঞাসা কবলেন, তোমাব মাযেব নাম কি?

সুজাতা বোস।

না, সুমিত্রা সিংহ এই নামেব কাউকে চিনলেন না।

বাবাব নাম কি?

নীতিশ বোস।

নামটা শোনাব সঙ্গে সঙ্গে বুকেব তলায কি বকম একটা তোলপাড কাণ্ড হযে গেল সুমিত্রা সিংহব। একটা অস্পষ্টতাব পর্দা সবে গেল চোখেব সামনে থেকে। হ্যাঁ, অবিকল সেই নাক মুখ চোখই বটে। ঠোঁট বাঁকানোটা পর্যন্ত সেই বকম। জিজ্ঞাসা কবাব দবকাব ছিল না, তবু প্রশ্নটা যেন আপনা থেকেই গলা দিযে বেবিযে এল।—কি কবেন?

বাব অ্যাট ল। হাইকোর্টে প্র্যাকটিস কবেন।

না, কোথাও ভুল নেই, বিযেব পব নীতিশ বোসেব ব্যাবিস্টাবি পডাব জন্যেই বিদেশ যাওযা স্থিব ছিল।

দীর্ঘকালেব শিক্ষযিত্রী জীবনে এ বকম আব কখনো হযনি। মেযেটাব মুখেব দিকে চেযে চেষ্টা কবেও নিজেকে আব অত কঠিন কবে তুলতে পাবছেন না সুমিত্রা সিংহ। জিজ্ঞাসা কবলেন, কলকাতাতেই বাড়ি, তবু তুমি বাবা মাযেব সঙ্গে থাক না কেন?

মেযেটা সাদাসাপটা জবাব দিল, মা বাবাব সঙ্গে থাকেন না, ডিভোর্স হযে গেছে। বাবা তাই আমাকে হস্টেলে বেখেছেন।

সব ভুলে সুমিত্রা সিংহ বিমূঢ় মুখে মেযেটাব দিকে চেযে বইলেন খানিক। মেযেটা পডাশুনায এত ভাল, তা সত্ত্বেও এ বকম উচ্ছৃঙ্খল হযে ওঠাব কাবণ যেন বুঝতে পাবছেন তিনি। মেযেটাব কথা-বার্তায আচবণে একটা চাপা ক্ষোভ স্পষ্ট।

তোমাব বাবাব সঙ্গে টেলিফোনে কথা হতে পাবে?

মেযেটা টেলিফোন নম্বব বলে দিল।

কখন ফ্রী থাকেন তিনি?

সন্ধ্যাব পব। সমস্ত দিন ব্যস্ত থাকেন।

আচ্ছা, তুমি যেতে পাবো।

উদ্ধত মুখেই মেযেটা চলে গেল। সে কেমন কবে যেন ধবে নিযেছে অন্য ক'টা মেযেব থেকে তাব শাস্তি কঠিন হবে। অর্থাৎ বাবাকে বলে স্কুল থেকে সবিযে দেওযাব ব্যবস্থা হবে তাকে।

প্রায আধঘণ্টা স্থাণুব মত চুপচাপ বসে বইলেন সুমিত্রা সিংহ। সাড়ে ন'টায স্কুল, এখন সকাল সাড়ে দশটা। কি ভেবে ফোনেব বিসিভাব তুলে নিযে নম্বব ডাযাল কবলেন।

পেলেন।

বোস হিযাব।

আমি আপনার মেয়ের স্কুলের হেড-মিস্ট্রেস মিসেস সিংহ।... আপনার মেয়ে নন্দিতার গ্রোস মিস কনডাক্টের সম্পর্কে আপনার সঙ্গে কথা হওয়া দরকার। তাকে আর এ স্কুলে রাখতে পারা শক্ত।

ওদিকের ভারী গলার স্বর থমকালো একটু।—কি মিস কনডাক্ট ?

সেটা টেলিফোনে বলা সম্ভব নয়।

আই সি...বাট আই অ্যাম অফুলি বিজই...একমাত্র সন্ধ্যার পর বাড়িতে দেখা হতে পারে, বাট দ্যাট উইল বি পারহ্যাপস টু মাচ টু আস্ক—

এদিক থেকে আরক্ত মুখে সুমিত্রা সিংহ বললেন, ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর এবং জরুরী—আপনার আসা দরকার।

বাট ইউ সি, আই কান্ট পসিবলি মেক এনই টাইম। ঈষৎ অসহিষ্ণু কণ্ঠস্বর। ইউ ডু ওয়ান থিং ম্যাডাম, কাইন্ডলি সেণ্ড এভরিথিং ইন রাইটিং, আই উইল সি টু ইট। থ্যাঙ্ক ইউ।

রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ।

অসহিষ্ণু মুখে সুমিত্রা সিংহ ঘরের মধ্যে পায়চারি করে নিলেন খানিক। এরপর সোজাসুজি ওই মেয়ের বিরুদ্ধে চরম ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেবার কথা তার। তিনি সদয় হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লোকটার এত সাহস আর এত দম্ভ যে ঘুরিয়ে বাড়িতে দেখা করার কথা বলল। কিন্তু আশ্চর্য, এর পরেও তিনি যা করণীয় করে উঠতে পারলেন না। মেয়েটার প্রতি তার মায়া বাড়তেই থাকল। তাঁর ধারণা, পুঞ্জীভূত ক্ষোভ নিয়ে বিকৃত পথে চলেছে এমন ভাল মেয়েটা। হ্যাঁ, এখনো তাঁর উদার হবার ইচ্ছে। উদার হতে পারলে কোথায় যেন একটু শান্তিও। ...প্রায় পঁচিশ বছর আগের একখানা মুখ চোখে ভাসছে তার। ওই সুশ্রী মেয়েটার সঙ্গে মুখের আদল হুবহু মেলে যাঁর সঙ্গে তাঁর। নীতিশ বোসের।

সুমিত্রার বয়েস তখন তেইশ। তখন সিংহ হননি' ঘোষ, সবে এম-এ পাশ করেছেন। এবারে নীতিশ বোসের সঙ্গে বিয়েটা হয়ে যাবার কথা। বাপে-বাপে বন্ধুত্ব। অনেক দিন আগে থেকেই কথা পাকা। বোসেরা বনেদী বড়লোক। সুমিত্রার বাবা-মা নিশ্চিন্ত। বিয়ের পরেই ছেলে বিলেত চলে যাবেন ব্যারিস্টারি পড়তে অতএব তাঁর পক্ষে ঘন ঘন এ বাড়িতে আসার লোভটা স্বাভাবিক। নীতিশ বোস সপ্তাহে কম করে চার পাঁচদিন আসতেন আর সে রকম ফাঁক পেলে ভাবী স্ত্রীর ওপর একটু আধটু মিষ্টি হামলাও করে বসতেন। সুমিত্রাকে নিয়ে বেরুনোর তাগিদ দিতেন। কিন্তু সুমিত্রার দিক থেকে তেমন সাড়া পেতেন না বলে কখনো রাগ হত কখনো বা অভিমান।

সুমিত্রার জীবনে যথার্থই সংকটের কাল সেটা। রাশভারী বাবাকে কিছু বলা যাচ্ছে না। বলা যাচ্ছে না, কারণ ওখানে বিয়ে অনেক দিন ধরেই ঠিক। অথচ তিন বছর হল পিছনের বাড়ির এক ছেলের কাছে মন সঁপে বসে আছেন তিনি। গরীব ঘরের ছেলে। স্কলারশিপ পেয়ে নিজের পড়াশুনা চালাচ্ছেন। কোন এক দুর্বল মুহূর্তে সেই ছেলেও সুমিত্রার আশ্বাস পেয়ে ভবিষ্যতের রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন।

বডলোকেব হবু ব্যাবিস্টাব ছেলেব মনেব মত অনেক মেযে জুটবে, কিন্তু কথাব খেলাপ কবলে এই ছেলেব বুক ভেঙেই যাবে একেবাবে।

সেই সংকটেব ফলে জীবনে একটাই মিথ্যেব আশ্রয নিতে হযেছিল তাঁকে। মাকে স্পষ্ট কবে বলেছেন, বাবাকে জানিযে দাও এ বিযেতে আমাব আপত্তি আছে।

মা আকাশ থেকে পডেছিলেন একেবাবে।—সে কি বে। কেন?

কেন আবাব কি। সুমিত্রা মবিযা একেবাবে।—বডলোকেব ছেলে, এখনই মদেব নেশা, পবে আবো কত গুণ দেখা যাবে কে জানে। আমি স্পষ্ট জানিযে দিচ্ছি, আমাব আপত্তি আছে।

ওই একটা জিনিস বাবা আন্তবিক ঘৃণা কবেন সুমিত্রাব সেটা খুব ভাল জানা ছিল। এই এক কাবণে বাবাব সঙ্গে কাকাব মুখ দেখাদেখি বন্ধ। অতএব আব কোন উপায না দেখে সুমিত্রা এই পথ ধবেই সংকট কাটিযে উঠতে চেয়েছেন। হবু ব্যাবিস্টাবেব বাডিতে এ কথা তো কোনদিন প্রকাশ হবে না, তাঁদেব আব এমন কি ক্ষতি। বিযেটা নাকচ হবে শুধু।

নাকচ হযেছে। সুমিত্রাব ধাবণা বাবা শুধু তাঁদেব জানিযে দিযেছেন মেযেব আপত্তিব কাবণে এ বিযে হল না। এ ছাডা আব বলাব কি আছে?

তাবপব কথা যাঁকে দেওযা হযেছে সমযে তাকেই বিযে কবেছেন তিনি। সুমিত্রা সিংহ হযেছেন।

নিজেব ভিতবে কোন সুপ্ত অপবাধবোধ ছিল কিনা সুমিত্রা সিংহ জানেন না। নইলে পঁচিশ বছব বাদে এক মেযেব মুখেব আদল দেখে অবচেতন মনে হঠাৎ ওই বকম নাডা পডেছিল কেন।

না, স্কুল থেকে তাডিযে ওই সুশ্রী মেযেটাকে জাহান্নমেব পথে ঠেলে দেবেন না সুমিত্রা সিংহ। ববং এই মানসিক আবর্ত থেকে ওকে টেনে তুলতে পাবাটাই যেন ভাল কাজ হবে, উদাবতাব কাজ হবে।

স্কুলেব একজন ড্রাইভাবকে বলে বেখেছিলেন। সন্ধ্যাব পব সে তাঁকে নির্দিষ্ট ঠিকানায নিযে এল।

সুমিত্রা সিংহ কার্ড পাঠালেন।

কিন্তু তাবপবেও কম কবে পনেবো মিনিট অপেক্ষা কবতে হল। ভাবলেন, কোন কেস নিযে ব্যস্ত বোধহয।

কিন্তু নীতিশ বোস ঘবে এসে দাঁডানোব সঙ্গে সঙ্গে ভুল ভাঙল। ঝাঁ কবে একটা গন্ধ নাকে এসে লাগল। লোকটাব থলথলে লালচে মুখ। টানা দু' চোখ ঈষৎ আবক্ত। নেশাব মধ্যপথে উঠে আসতে হযেছে বলেই হযতো ভুরুব মাঝে ভাঁজ। —সীট ডাউন প্লীজ।

সুমিত্রা উঠে দাঁডিযেছিলেন, বসলেন আবাব। ভিতবটা মুহূর্তেব মধ্যে বিতৃষ্ণায ছেযে গেছে। আশ্চর্য, সেই সঙ্গে স্বস্তিবোধও। কোন এক দিনেব মিথ্যাচাবেব সুপ্ত অপবাধটুকু আজ অন্তত ধুযে মুছে গেছে।

নীতিশ বোসের এবাবে হঠাৎ খেযাল হল সামনে কা্কে দেখছেন। পঁচিশ বছরের ফাবাকেও সুমিত্রাব চেহাবা খুব বদলায নি। বিশ্বাস কববেন কি কববেন না ভেবে পাচ্ছেন না। চোখ টান কবে দেখছেন। হাতেব কার্ডটা একবাব চোখেব সামনে ধবলেন। তাবপব ভাবী গলায় টেনে টেনে বললেন, তুমি সুমিত্রা সিংহ...ওই স্কুলেব হেডমিসট্রেস।

ঈষৎ রূঢ গলায সুমিত্রা বাধা দিলেন, আপনি কবে বলুন। আপনাব মেযেব কনডাক্ট সম্পর্কে একটু সীবিযাস আলোচনাব দবকাব ছিল. কিন্তু আপনাব পক্ষে এখন সেটা সম্ভব নয মনে হচ্ছে।

মেযেকে ওই স্কুলে বাখতে হলে স্কুল টাইমে গিযে দেখা কবাব কথা বলতে যাচ্ছিলেন। বলা হল না। নীতিশ বোসেব নেশা-ছোঁযা দু'চোখ তাঁব মুখেব ওপব আটকে আছে। সঙ্গে সঙ্গে টানা ভাবী গলাও শোনা গেল।—ওযেট। আই ডোন্ট থিংক দ্যাট উইল বি নেসেসাবি। আলোচনাব দবকাব নেই। দু' আঙুলে সুমিত্রা সিংহব নাম লেখা কার্ডটা তুলে সামনে ধবলেন।—এই মহিলা যে স্কুলেব প্রধান সেখানে আমাব মেযেকে বাখা আমি উচিত মনে কবি না। আই উইল সেণ্ড হাব ডিউস টুমবো মর্নিং অ্যাণ্ড গেট হাব টি. সি. গুড নাইট।

চেযাব ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন তাবপব সৌখিন পার্টিশনেব ওধাবে চলে গেলেন।

স্কুল বাসে বাড়ি ফিবছেন সুমিত্রা সিংহ। দুর্বাব বাগে নিশ্চল স্তব্ধ তিনি। এত বড স্পর্ধাব কথা জীবনে কেউ শোনাযনি তাঁকে। ...কিন্তু বুকেব ভিতবে কোথায চিনচিন কবে জ্বলছে।

মা

বাবা মা ভাই বোন ভাইযেব স্ত্রী ভগ্নিপতি—সব মিলিযে একঘব লোকেব সামনে স্ত্রীব এই বে-খাপ্পা আচবণ দেখে গৌবীনাথবাবু আধা বিস্মিত আধা ক্রুদ্ধ। তাব দুশ্চিন্তা আব দ্বিধাব জবাবে স্ত্রী সুপ্রীতি উঠে দাঁড়িযে বিছানাব তলা থেকে চাবিব গোছা বাব কবে দেযাল-ঘেঁষা গডবেজেব আলমাবিটা খুলে ফেললেন। তাবপব অন্য চাবি দিযে ভিতবেব লকাবটা। লকাব থেকে বড বড দুটো গযনাব বাক্স বাব কবে গৌবীনাথবাবুব সামনে বাখলেন। ঈষৎ অসহিষ্ণু স্ববে বললেন, হাতে টাকা না থাকে তো এগুলো দিযে ব্যবস্থা কবো—ছেলে ফিবে না পেলে কিসেব টাকা কিসেব গযনা—

ঘবে আব যাবা ছিল তাবা চুপ। গৌবীনাথবাবুব চোখেমুখে ভর্ৎসনা মেশানো বিস্ময। সুপ্রীতি দেবীব আত্মস্থ হবাব পক্ষে সেটুকুই যথেষ্ট। আবেগেব মুখে কাজটা যে ভালো কবা হল না সেটা তক্ষুনি মনে ডাক দিল। কাবণ সর্ব ব্যাপাবে স্বামীব মুখাপেক্ষী তিনি। নিজেব বুদ্ধি বিবেচনাব ওপব নির্ভব কবে কোনো গুরু দাযিত্বেব কাজই ঠিক মতো কবে উঠতে পাবেন না। গলাব সুব নবম কবে তক্ষুনি ভুলটা শুধবে নিতে চেষ্টা কবে বললেন, সর্বদা অত টাকা কাবই বা হাতে থাকে, কাজ চালিযে নাও পবে না-হয এব ডবল বানিযে দেবে।

কথাটা উঠেছিল ছেলের বিশেষ একটা দৈব আনুকূল্য লাভের প্রবল সম্ভাবনার প্রসঙ্গে। বারো বছরের একমাত্র ছেলে দুরারোগ্য ব্যাধি-কবলিত। এখন একেবারে উত্থানশক্তিরহিত পঙ্গু। ভবিষ্যতের অবধারিত চিত্র আরো ভয়াবহ অন্ধকার। পৃথিবীর সমস্ত চিকিৎসাই ব্যর্থ। তারপর ভারতেব বহু তীর্থে বহু দৈব-প্রচেষ্টা, যাগযজ্ঞ ক্রিয়া-কলাপ আর দামী-দামী স্টোন ধাবণেব ফাঁক দিয়েও কত হাজাব টাকা জলের মতো বেবিযে গেছে, হিসেব নেই। এখন শুধু হতাশা আব হতাশা।

এই সময় এক মহাসাধকের নাম প্রাযই কানে আসতে লাগল তাঁদের। কলকাতাব দোকানে দোকানে তাঁর ছবি দেখা যেতে লাগল। আর বহু নাম-কবা কাগজেও ভগবান-সদৃশ ওই মহাযোগীর এমন সব করুণা-লীলাব কাহিনী প্রচাব লাভ কবল যে পড়লে শুচিশুভ্র আবেগে চোখে জল আসে।

গৌবীনাথবাবু খুব একটা বিশ্বাস কবেননি। কিন্তু মন দুর্বল। স্ত্রীব মন ততোধিক দুর্বল। ফলে ওই করুণাময় সম্পর্কে দিশি আর বিদেশী লেখকেব বই সংগ্রহ কবে দুজনেই পড়তে লাগলেন। সেইসব বাস্তব অভিজ্ঞতাব কাহিনী এবং তত্ত্ববিশ্লেষণ অভিভূত হবাব মতোই বটে। এ ছাড়া বহু শুভার্থীজনও তাঁদেব পবামর্শ দিলেন, একবাব কপাল ঠুকে চলে যান ছেলেকে নিয়ে, যদি দর্শন মেলে আব দয়া মেলে তাহলে অলৌকিক কিছু হতেও পাবে, এমনিতে তো আব কোন আশা নেই।

কিন্তু চলে যান বললেই এই ছেলে নিযে বেবিযে পড়া যায না। অলৌকিক বিভূতিসম্পন্ন ওই মহাতপা যেখানে থাকেন ছেলেব বর্তমান অবস্থায সেদিকে পা বাড়ানোটা দুর্গমযাত্রাব সামিল। বইযে সে-পথেব বিববণ শুনে সুপ্রীতি দেবী পর্যন্ত দমে যান। ফলে, মনে মনে প্রায অলৌকিক গোছেব একটা আশা নিয়ে বসে ছিলেন তিনি। খোঁজ-খবব কবে এই কুলকাতাযও ওই দেব-মানবেব অনেক গণ্যমান্য ভক্তেব সন্ধান পেযেছেন। তাঁদেব সঙ্গে যোগাযোগ কবেছেন। শুনেছেন 'বাবা'কে একবাব তাঁরা এই কলকাতায নিযে আসতে চেষ্টা কবছেন। তবে এও শুনেছেন, 'বাবা'ব ইচ্ছে না হলে শত চেষ্টাতেও তা হবে না।

গৌবীনাথবাবু স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছেন, ইচ্ছে হবেই একদিন। ভক্ত টানলে ভগবানেবও টনক নড়ে। স্বামীব ওপব আর তাঁব কথাব ওপব স্ত্রীটিব অগাধ আস্থা। কিন্তু আবো প্রায দেড়টা বছব কেটে যেতে তিনি অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। ছেলেব অবস্থা ধীব কিন্তু অবধাবিত গতিতেই সঙ্কটেব দিকে গড়াচ্ছে।

এমন দিনে একটা সংবাদ শুনে সুপ্রীতি দেবী আশায় আনন্দে কণ্টকিত। ঐশ্বরিক ক্ষমতাব ওই মহাযোগী দিল্লীতে আসছেন। সেখানকার ভক্তরা তাঁব সম্মতি পেঁযে বিপুল আযোজন কবেছেন। পাকা খবব। দিন তারিখ পর্যন্ত নির্দিষ্ট। কলকাতার বহু ভক্ত দিল্লীর দিকে ছুটেছেন।

দিল্লী! সুপ্রীতি দেবীব মনে হল দিল্লী একেবারে হাতেব মুঠোয়। এরোপ্লেনে দু'ঘণ্টার পথ। পা ফেলাব পব আব কোনো ঝামেলা নেই, সেখানে দেওরের বাড়ি দেওরেব গাড়ি। ঠাকুব মুখ তুলে না চাইলে এমন সুযোগ আসে।

শোনাব পব মন দুর্বল গৌবীনাথবাবুবও। কিন্তু তাঁকে সাত-পাঁচ ভেবে দেখতে হবে। অন্ধ অবাস্তব আশাব পিছনে ছুটে এযাবত বহু হাজাব টাকা খবচ হযে গেছে। কম কবে পঞ্চাশ ষাট হাজাব তাব ওপব এক-একটা চেষ্টা বিফল হবাব পব সে-কি হতাশা—বিশেষ কবে স্ত্রীব। ভেঙে পডাব দাখিল একেবাবে।

অতএব সব-দিক ভেবে দেখাবই আলোচনায বসা হযেছিল সকলে মিলে। কিন্তু দ্বিধাব প্রথম পর্যাযেই সোজা মুখেব দিকে তাকিযে স্ত্রী জিজ্ঞাসা কবে বসলেন, আসল কথা, 'বাবা'ব সঙ্গে দেখা হলে আব তাব করুণা পেলে ছেলে ভালো হযে যাবে, এ তুমি বিশ্বাস কবো কি কবো না?

গৌবীনাথবাবুব বিব্রত মুখ। বইপত্র যা পডেছেন, মনে প্রাণে বিশ্বাস কবতেই মন চায। দ্বিধান্বিত জবাব দিলেন, করুণা পাবই এমন ভবসা কোথায?

স্ত্রী স্থিব প্রত্যযে জবাব দিলেন, দেখা পেলে করুণাও পাব।

—সে-ভাবে দেখা মিলবে তাবও কোনো নিশ্চযতা নেই।

সুপ্রীতি আধা বিস্মিত আধা বিবক্ত।—কি যে বলো ঠিক নেই, দিল্লীব মতো জাযগায তুমি নিজে চেষ্টা কবলে দেখা হবে না এ আবাব একটা কথা নাকি। তাছাডা এখান থেকে চেনা-জানা ভক্ত যাবা যাচ্ছেন তাবাও সাহায্য কববেন। তাবও দবকাব হবে না, তুমি চেষ্টা কবলেই হবে—

মনে মনে বিবক্ত একটু গৌবীনাথবাবুও। স্ত্রীব ধাবণা, তাব স্বামী নামী লেখক আব কাগজেব বড চাকুবে অতএব দুনিযাব সমস্ত দবজাই তাঁব কাছে খোলা। বললেন, হ্যা, আমি দিল্লীব লাটসাহেব একেবাবে। যাক, এবপব খবচেব দিকটাও চিন্তা কবাব আছে, ওই ছেলেকে নিযে যেতে হলে তুমি আমি ছাডাও আব একজন লোক অন্তত দবকাব—এবোপ্লেনে চাবজনেব যাতাযাত ছাডাও অন্য খবচা আছে, কম কবে চাব হাজাব টাকা লাগবে।

জবাবে চিবসহিষ্ণু আব চিবমুখাপেক্ষী স্ত্রীব ওই কাণ্ড। সকলেব সামনে আলমাবি থেকে গযনাব বাক্স বাব কবে ওই উক্তি।

বিস্মষ কাটতে দু'চোখেব নীবব ভর্ৎসনাটুকুই আবো স্পষ্ট হযে উঠল। পবে স্ত্রীব নবম সুবেব জবাবদিহিতেও কাজ হল না তেমন। কিন্তু বাইবেব আচবণে ববাবব সংযত মানুষ গৌবীনাথবাবু। মৃদু গম্ভীব স্ববে আদেশ দিলেন, ও-দুটো জাযগা-মত বাখো—

উঠলেন। খোলা আলমাবি থেকে চেক-বই বাব কবলেন। পকেট থেকে কলম টেনে নিযে সামনেব ছোট টেবিলটায বসলেন। খসখস কবে চাব হাজাব টাকাব চেক লিখে নাম সই কবে চেকটা ছিঁডে ছোট ভাইযেব হাতে দিলেন।—কাল ফার্স্ট আওযাবে চাব হাজাব টাকা তুলে এযাবে চাব জনেব সীট বুক কববি, টিকিট থাক বা না থাক আমাব সেই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসাব বন্ধুব কাছে গেলেই সে ব্যবস্থা কবে দেবে। টিকিট হাতে পেলেই দিল্লীতে দীপুকে একটা আবজেন্ট টেলিগ্রাম কবে দিবি। তাবপব ছেলে আব তোব বউদিকে নিযে সন্ধ্যাব ফ্লাইটে তুই আব দিবা দিল্লী যাবি—সাধ যখন হযেছে টাকাব জন্যে আটকাবে না।

সুপ্রীতি দেবীব শুকনো মুখ, বা বে, তুমি না গেলে কি কবে হবে।

—আমাব কথা-বার্তা যখন পছন্দ হচ্ছে না, নিজেই চেষ্টা কবে দেখো।

গম্ভীব মুখে ঘব ছেড়ে ছেলেব কাছে চলে গেলেন গৌবীনাথবাবু। ছেলে বাবান্দায় হুইল-চেযাবে বসে।

বাতে মানভঞ্জনেব পালা। বাগত মুখেই সুপ্রীতি দেবী বললেন, নিজেব ওপব ভবসা কবে কবে আমি কোন কাজ কবি বা কোন কথা বলি তুমি জানো না?

বলতে না বলতে চোখে জল। একমাত্র এই বস্তুটিকেই গৌবীনাথবাবু মনে মনে ভয কবেন। ফলে পাঁচ মিনিটেব মধ্যেই আপোস।

না, স্ত্রী আদৌ আতশযোক্তি কবেননি। সর্ব ব্যাপাবে সর্ব কাজে উনি স্বভাবগত কাবণেই স্বামীব ওপব একান্ত নির্ভবশীলা। ঠিক এই জন্যে গৌবীনাথবাবুব কখনো খেদ কখনো অন্তর্তুষ্টি। স্বামীব মতামত না পেলে কোনো একটা জরুবী ব্যাপাবও স্ত্রীটি ফযসালা কবে উঠতে পাবেন না। ভদ্রলোকেব একবাব শক্ত অসুখ হযে পড়তে একটা দুশ্চিন্তায তাঁব দু'চোখে জল দেখা দিত। ...তাঁব অবর্তমানে হাজাব টাকা পযসা থাকলেও ওই স্ত্রীব অসহায অবস্থাটা তিনি যেন দেখতে পেতেন। পবে কত সময ধমকেছেন. একে একে নিজে সব দেখে শুনে বুঝে নাও,কখন কি দবকাব হয ঠিক আছে। কিন্তু তাঁব তাগিদে দেখে-শুনে বুঝে নিতে গিযে স্ত্রীব হিমসিম অবস্থা। শেষে গৌবীনাথবাবু নিজেই হাল ছেড়ে তাঁকে অব্যাহতি দিযেছেন।

ছেলে স্ত্রী আব একটি ভাই নিযে গৌবীনাথবাবু দিল্লী উড়ে এসেছেন। কিন্তু তাবপবেই যেন হাবুডুবু অবস্থা সকলেব।

মহাযোগী বাবাকে নিযে দিল্লীতে এক এলাহি ব্যাপাব। বিবাট পার্ক-এ তাঁবু ফেলে সাজিযে গুছিযে পঞ্চাশ হাজাবেব মতো জন-সমাবেশেব ব্যবস্থা। কিন্তু আবো বিশ তিবিশ হাজাবেব বেশি ব্যবস্থা হলেও যথেষ্ট নয। লোকে লোকাবণ্য। সমস্ত দিল্লীবাসী বোধহয ওই একপথে ভেঙে পড়েছে। দেশ-বিদেশ থেকে কত বোগী এসেছে ঠিক নেই। বাবাব অবস্থানেব দু'মাইলেব মধ্যে মোটব গাড়ি পার্ক কবাব পর্যন্ত জাযগা মেলে না। প্যাণ্ডেলে সকাল-সন্ধ্যাব কীর্তনেব আসবে 'বাবা' একঘণ্টা দেড় ঘণ্টাব জন্যে আসেন, ঘুবে ঘুবে সকলেব উদ্দেশে আশীর্বাদ কবেন হাত তুলে, ওই বিভোব তন্ময মূর্তি দেখলেই মনে হয এ-জগতেব কেউ নন। বোগীদেব মধ্যেও ঘোবাঘুবি কবেন, হঠাৎ হঠাৎ কাউকে বিভূতিও দেন, কাবো মাথায হাত বেখে আশীর্বাদ কবেন। কিন্তু গড় হিসেবে সে-বকম ভাগ্য দু'শ'ব মধ্যে একজনেবও হয কিনা সন্দেহ। বহু ক্লেশে গৌবীনাথবাবু দু'বেলাই সপবিবাবে বাবাব দর্শন পাচ্ছেন—কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে তাঁব সঙ্গে যোগাযোগ কবা বা কৃপা লাভ কবা দুবাশাই বোধহয। অথচ এই মুহূর্তে গৌবীনাথবাবুবও বদ্ধ বিশ্বাস, কৃপা পেলে উদ্দেশ্য সফল হবেই, অলৌকিক উপাযে ছেলে ভালো হবেই।

কিন্তু সেই একান্ত সন্নিধানে কি কবে যাবেন? পার্কসংলগ্ন যে বিশাল প্রাসাদে তিনি অবস্থান কবছেন, তাব চতুর্দিকেও জনসমুদ্র। দুর্ভেদ্য পুলিস প্রহবায আব ভলাণ্টিযাবদেব তৎপবতায বাড়িব গেটেব বিশ গজেব মধ্যেও কাবো যাবাব উপায

নেই। অবশ্য বিশেষ ব্যবস্থা কবে অনেকেই ভিতবে যাচ্ছেন, বাবাব অনুগ্রহ পাচ্ছেন, কিন্তু সেই বিশেষ ব্যবস্থা গৌবীনাথবাবুব অন্তত কবাযত্ত নয। কলকাতাব ভক্তদেব সঙ্গেও দেখা হযেছে, কিন্তু অবস্থা এমন যে তাঁবা নিজেবাই বাবাব ধাবে কাছে যেতে পাবছেন না। এখানে কে কাকে চেনে?

নিরুপায সুপ্রীতি দেবী বাতে চোখেব জলে বালিশ ভেজান আব প্রার্থনা কবেন, বাবা, তুমিই ব্যবস্থা কবো, পথ দেখাও।

'বাবা' দিল্লীতে অবস্থান কববেন সাতদিন। তাব মধ্যে চাব-চাবটে দিন চলে গেছে। গৌবীনাথবাবু মবীযা হযে উঠেছেন। তাদেব কাগজেব এখানকাব শাখা-অফিসেব মাবফৎ সকল চেষ্টাও ব্যর্থ হতে চলেছে।

এবই মধ্যে হঠাৎ আশাব আলো এক টুকবো। অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ একজনেব সঙ্গে। অবাঙালী। প্রভাব প্রতিপত্তিশালী মন্ত্রী ছিলেন একসময বাজধানীব। অধ্যাত্মবিদ হিসেবে সুপবিচিত তিনি। বহু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এবং সাধু-সন্তদেব সঙ্গে হৃদযেব যোগ তাঁব। তিনি বাজধানীতেই আছেন এবং গৌবীনাথবাবুব কাছে তিনি একেবাবে দুর্লভ নন।

ছেলে আব স্ত্রীকে নিযে ও'ব কাছেই ধবনা দিযে পডলেন গৌবীনাথবাবু। খবব পেযেছেন, বাবাব সঙ্গে ভদ্রলোকেব এই দিনই বিকেলে সাক্ষাৎকাবেব ব্যবস্থা হযে আছে।

ছেলেকে দেখে সহৃদয ভদ্রলোকটিব মন বিচলিত হল। বললেন, আচ্ছা বিকেল ঠিক চাবটেব সময ছেলেকে সঙ্গে কবে আমাব সঙ্গেই চলো, আমি বাবাকে ধবে পডব, আশাকবি ব্যবস্থা হবে।

কৃতজ্ঞতায গৌবীনাথবাবু নির্বাক খানিক। এমন আশ্বাসেব কথা দিল্লীতে এসে এই প্রথম শুনলেন। ফেবাব পথে স্ত্রীব দুই চোখও ছলছল। মাঝে মাঝে স্বামীব দিকে তাকাচ্ছেন। নীবব উচ্ছ্বাসেব একটাই অর্থ যেন, তুমি চেষ্টা কবলে হবে না এমন কিছু আছে নাকি।

ঘডি-ধবা সমযে প্রাক্তন মন্ত্রীব সঙ্গে সেই ঈপ্সিত প্রাসাদেব কাছাকাছি উপস্থিত হলেন সকলে। ভিড তখন অপেক্ষাকৃত কম হলেও গাডি এগোবাব উপায নেই। খানিকটা তফাতেই নামতে হল। পিছনেব ক্যাবিযাব থেকে তাডাতাডি ফোলডিং হুইল-চেযাব বাব কবে ছেলেকে বসালেন। স্ত্রীও তৎপব হাতে সাহায্য কবলেন তাকে। তাবপব এগিযে চললেন।

সামনে দু'জন ভদ্রলোকেব সঙ্গে প্রাক্তন মন্ত্রী। পিছনে হুইল-চেযাব ঠেলে নিযে চলেছেন গৌবীনাথবাবু, পাশে স্ত্রী। ওঁদেব দু'জনেবই দুরু দুরু বক্ষ।

সামনেব ভিডেব অববোধ সহজেই দু'ভাগ হযে গেল। এ সমযে বাবাব সঙ্গে দেখা কবতে কে আসছেন ব্যবস্থাপকবা সকলেই জানে।

এবাবে সামনে গেট। গেটেব ওধাবে সাবি সাবি ভলান্টিযাব মোতাযেন। ছাডপত্র না পেলে তাবা একজনকেও ঢুকতে দেবে না। গেটেব ও-ধাবে লম্বা বাস্তাব শেষে বাডি। সেখানেও বেশ জনাকতক ভাগ্যবান আব ভাগ্যবতীব সমাবেশ। ছাডপত্র পেযে তাবা কেউ বাডিব মধ্যে ঢুকছে, কেউ বা ঢোকাব অপেক্ষায দাঁডিযে আছে।

একজন ব্যবস্থাপক ভলান্টিযাবদেব কানে কানে কি বলতে বন্ধ গেট একটুখানি খুলে প্রাক্তন মন্ত্রীকে ভিতবে ঢুকিযে নেওযা হল। গৌবীনাথবাবু বা স্ত্রী বা হুইল-চেযাবে আসীন ছেলেব ছাড়পত্র নেই। গেট আবাব বন্ধ হযে গেল।

গেটেব ওদিক থেকে সদাশয প্রাক্তন মন্ত্রীটি গলা খাটো কবে গৌবীনাথবাবুকে বললেন, এখানেই অপেক্ষা কবো, আমি দেখি কি কবতে পাবি।

আবাব অধীব প্রতীক্ষা। ভলান্টিযাববা নিছক দযা কবেই বোধহয তাঁদেব তফাতে হটিযে দিল না। কিংবা হযতো বুঝে নিল এবাও ফেলনা লোক নয।

মিনিট দশেকেব মধ্যে একজন ভলান্টিযাব ভিতব থেকে ছুটে এলো।

গেটেব সামনে এসে হুইল-চেযাবে বসা ছেলেকে দেখিযে বলল, একে ভিতবে নিযে আসুন, জলদি।

হুইল-চেযাব নিযে বন্ধ গেট ঠেলেই তাঁবা ভিতবে ঢোকাব জন্য ব্যস্ত হযে উঠলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাধা আবাব।—ও নো নো! ওনলি ওযান। ছুটে-আসা ভলান্টিযাবেব ব্যস্ত-সমস্ত নির্দেশ।—বোগীব সঙ্গে আপনাদেব যে-কোনো একজন আসুন, দু'জন আসাব নিযম নেই।

গৌবীনাথবাবু বিমূঢ কযেক মুহূর্তেব জন্য। গেট আধখানা খোলা হযেছে। জোব কবে, দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে হুইল-চেযাব ঠেলে ভিতবে ঢুকতে গেলেন। কিন্তু পবক্ষণে কাঁধেব কাছে বেশ জোবেই একটা ঠেলা খেযে প্রায নিজেব অগোচবে একটু সবে গেলেন। তাজ্জব বিস্ময়ে দেখলেন স্ত্রী তাঁকে ঠেলে হুইল-চেযাবেব দখল নিযে বলছেন, সবো সবো, তুমি পাববে না, আমি যাচ্ছি—

বাধা দেবাবও অবকাশ পেলেন না গৌবীনাথবাবু। ছেলেসহ হুইল-চেযাব ঠেলে স্ত্রী গেটেব ভিতবে ঢুকে পড়েছেন। চিৎকাব কবে বলতে গেলেন, তুমি তো বোগেব নামটাও ঠিকমতো বলতে পাববে না—

বলা হল না। হতভম্ব বিস্ময়ে দু'চোখ বড বড কবে চেযে বইলেন তিনি। হুইল-চেযাব ঠেলে স্ত্রী তবতব কবে যেন এক লক্ষ্যকেন্দ্রেব দিকে এগিযে চলেছেন। স্ত্রীব এমন আত্মস্থ সমাহিত অথচ তৎপব মূর্তি আব বুঝি দেখেননি। নিষ্পলক চেযেই আছেন গৌবীনাথবাবু। আব সমস্ত সত্তা দিযে অনুভব কবছেন, ঠিক এই মুহূর্তে বাপেব তুলনায ছেলেব মাযেব সঙ্গে যাওযাটাব কত তফাৎ।

বাত আব দিনেব মতই তফাত।

দিনবদল

বৃন্দাবন পালেব পর্যন্ত একজন অনুগত সহকাবী আছে। যাবা জানে বৃন্দাবন পালকে তাবা হাসে। কাবণ বৃন্দাবনকেই তাবা চিনিব বলদ বলে ডাকে। তাব সহকাবী অমল দাস তাহলে কি?

বৃন্দাবন সীবিযাস মানুষ। তাব কানে তুলো পিঠে কুলো। কাবো ঠাট্টা তামাশাব

ধার ধারে না। একাগ্র নিষ্ঠায় তার মনিবের সেবা করে চলেছে। যে কাজ তাকে করতে হয় তার ঝক্কি অনেক, বিপদও কম নয়। এ যাবত ঝামেলা অনেক পোহাতে হয়েছে, কিন্তু সত্যিকারের বিপদে কখনো পড়েনি। দুই একবার পড় পড় হয়েছে, কিন্তু মনিবই সামলেছে। মনিবের টাকার ওপর ছাতা পড়ছে, তিনি সদয় হলে টাকার ঝাঁটা মেরেই মুশকিল আসান করে দিতে পারেন।

বৃন্দাবনের খুব আশা, মনিব তার ওপর একদিন সত্যিকারের সদয় হবেন, ওর কদর বুঝে আর প্রভুভক্তি দেখে তাঁর বুকের তলার কোন সূক্ষ্ম যন্ত্রে মোচড় পড়বে। তখন আর বৃন্দাবনকে পায় কে। মনিব তখন একটু হাত ঝাড়লেও যা পড়বে তাতেই বাকিটা কাল পায়ের ওপর পা তুলে সুখে কেটে যেতে পারবে। মনিব লোকটা যেমনই হোক, তাঁর বুকের তলায় স্নেহ মায়া মমতা যে কিছু আছে সে-তো তার কুকুর দুটোকে দেখলেই টের পাওয়া যায়। স্থূল বপুখানা নরম গদির সোফায় ছেড়ে দিয়ে আর ভারী ভারী পা দুখানা মস্ত মস্ত দুটো অ্যালসেসিয়ানের পিঠে চাপিয়ে দিয়ে যখন আদর করেন, তখন তাঁর থলথলে মুখে স্নেহ উপছে পড়তে দেখেছে বৃন্দাবন, আর সহকারী অমলকেও দেখিয়েছে।

একটাও ছেলেপুলে নেই, বউটাও মরে ভূত না কি পেত্নী হয়ে গেছে কোন কালে—এ-হেন ভাগ্যবান মনিব টাকার আণ্ডিল আগলে বসে থাকবেন আর কতকাল? মা-লক্ষ্মীর কৃপায় কুকুরের প্রতি ওই দরদের বাতাসটুকুও যদি বৃন্দাবনের দিকে ফেরে তাহলেও দিন ফিরে গেল।

সহকারী অমল অতশত বোঝে না। ভবিষ্যত ভেবে মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে পড়ে। বৃন্দাবন তখন তাকে ওই সব কথা বলে, বোঝায়, আশ্বাস দেয়। বলে, দিন ফিরবেই একদিন দেখে নিস, ওই খাম-খেয়ালী মনিব হঠাৎ দেখবি দয়ার অবতার বনে গেছে। নির্ঘাত তাই হবে, উইল করে আধাআধি না হোক, চার ভাগের একভাগ সম্পত্তি দেখবি আমাকেই দিয়ে গেছে।...বয়েস তো বাহাত্তর পেরুতে চলল, এত সব কাণ্ড মাণ্ডর পর কত দিন আর বাঁচবে—নেহাত পয়সার জোরে শরীরের ক্ষয়-ক্ষতি সামলে আসছে, নইলে কবে অক্কা পেয়ে যেত। কেউ তো বোকা বলবে না তাকে, নিজেই বোঝে সব, এই জন্যেই উকীল অ্যাটর্নির আসা-যাওয়া লেগেই আছে দেখছিস না? আর আজকাল কেমন মিষ্টি মিষ্টি হেসে আমার দিকে তাকায় লক্ষ্য করেছিস?

অমল দাস জবাব দেয় না, গুরুটি তার জবাবের প্রত্যাশাও করে না। নিজের অনাগত সুখ-স্বপ্নে বিভোর সে। তার বয়েস এখন ঊনচল্লিশ। আর এক আধ বছরের মধ্যে দিন বদলাবে। নিশ্চয় বদলাবে। তখন ভোগের বন্যায় গা ভাসাতে বাধা কোথায়। সমস্ত রকমের কাল্পনিক বাধা একের পর এক নাকচ করে দিয়েছে। টাকা থাকলে সব বাধা জল। আর বয়েসটা তো কোন বাধাই নয়। তার মনিব এই বাহাত্তর বছরেও ভোগী। অবশ্য ভোগের সাধ যত আছে এখন আর সাধ্য তত নেই। তার ফলে যে-সব কাণ্ড করে আনন্দ পেতে চেষ্টা করেন ভাবতে গেলে বৃন্দাবনের একটুও ভাল লাগে না। অত বয়সে ভদ্রলোকের একটু ধম্ম কম্মে মতি ফিরলে বরং বৃন্দাবনের

সুবিধে হত। না, অত বযসে বৃন্দাবন মনিবেব মত হ্যাংলাপনা কববে না। বড জোব ষাট বছব পর্যন্ত আনন্দেব সময। চল্লিশে তাব দিন ফিবলেও আনন্দেব ঢেব সময পড়ে থাকবে। কম কবে বিশটি বছব। অতএব তাব হতাশ হবাব কিছু নেই।

এ-সব কথা সে হামেশাই অমলকে শোনায। অমল তাব ভোগেব ছটকাও কিছু কিছু জেনেছে। যেমন; একটা ভাল বাসায থাকবে, ভাল জামা-কাপড পববে, একটু ভাল খাবে-দাবে, আব মনেব মত একটা মেযে এনে ঘব বাঁধবে।..ওই পোড়াবমুখি যদি কোথাও থেকে তাকে দেখে তখন, হিংসেয কালি হযে যাবে।

পোড়াবমুখিটা কে তাও অমল ভাল জানে। তাবই মাসতুতো দিদি শ্যামা। সম্পর্কে অমল বৃন্দাবনেব মাসতুতো শ্যালক। দুজনকেই একসঙ্গে আশ্রয দিযেছিল বৃন্দাবন। অমলেব তখন পনেব বছব বযেস আব মাসতুতো দিদিব একুশ। আব বৃন্দাবন পালেব তখন একত্রিশ। অমলেব বযেস এখন তেইশ আব শ্যামাদি আজ যেখানেই থাক— তাব ঊনত্রিশ।...শ্যামাদি বৃন্দাদাব ঘব কবেছে মাত্র দুটি বছব। তাব মধ্যেই অনেকবাব ঘব ভাঙাব দাখিল হযেছে, তবু কোন বকমে টিকে ছিল। বৃন্দাবন পাল তাব মনিব সুমন্ত চৌধুবীব খাস সবকাব আব মোসাহেব ছিল তখন। ফাই ফবমাশ খাটা বা হঠাৎ দবকাবে ছোটাছুটিব জন্য কর্তাব ড্রাইভাবেব পাশে বসে স্টুডিওতেও আসতে হত। স্টুডিওব অনুগ্রহ-প্রত্যাশীদেব কাছে সেই কাবণে তাব কদবও ছিল একটু। কর্তাটি ছবিব বাজ্যেব নামজাদা প্রডিউসাব।

নিজেব গুণেই বিশেষ নজবে পড়েছিল সে। দু'দুটো ছবিব ভবিষ্যত ভেবে কর্তা যখন মুষড়ে পড়েছিলেন, তখন টেকনিশিযনদেব সঙ্গে স্টুডিওতে সেই ছবি তন্ময হযে দেখে বৃন্দাবন ছাড়া ওবকম ভবিষ্যদ্বাণী আব কেউ কবেনি, কাবণ কর্মকর্তাবা মালিকেব দুশ্চিন্তাব ভাগ নেবাব ফলে ভবিষ্যত সম্পর্কে বায তেমন আশান্বিত হযে উঠতে পাবেনি। বোকাব মত সেই ছবিই হিট কববে বায দেবাব ফলে, তখনকাব মত বৃন্দাবন ববং মালিকেব বিবক্তিভাজন হযেছিল। কিন্তু, সত্যি সত্যি সেই দুটো ছবিতেই অপ্রত্যাশিত ভাল লাভ হযেছিল মালিকেব। চৌধুবীমশায সেইজন্য তাকে পুবস্কাবও দিযেছিলেন। এবপব দু'দুটো প্রেস্টিজ ছবি কবেছিলেন কর্তা। মালিকেব সঙ্গে সকলে একবাক্যে বায দিযেছে—ছবি হযেছে বটে, একেবাবে হীট। চৌধুবীমশাই সাগ্রহে বৃন্দাবনেব মতামত জানতে চেযেছেন। কিন্তু মাথা চুলকে সে বলেছে, আমি সবটা ঠিক বুঝতে পাবিনি হুজুব—একটু হাই জিনিস তো...

অন্য মোসাহেববা হেসে উঠেছে। কর্তা নিজেও। কিন্তু ছবিব ফলাফল দেখে সকলেব চক্ষুস্থিব। ওই দুই ছবিতে বহু টাকা লোকসান হযেছিল মালিকেব।

ফলে কর্তাব কাছে বৃন্দাবনেব খাতিব আবো বেড়ে গেছে। বৃন্দাবনেব ভাল লাগলে তবে তিনি কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ কবেন। এই কবেই ছবিব ব্যাপাবে জড়িযে পড়তে লাগল বৃন্দাবন পাল। একটা দুটো কবে কাজেব ভাব পড়তে লাগল তাব ওপবে। বাবকযেক আধাবস্তি গোছেব গবিব মহলে হানা দিযে ছবিব জন্য কিছু একস্ট্রা মেযে সংগ্রহ কবে দেবাব ফলে এই কাজটাই ক্রমশঃ তাব ওপব বর্তাল। নাযিকা বা সহ-নাযিকা ছাড়াও এক সীন দু'সীনেব জন্য অনেক ভদ্র চেহাবাব মেযেব দবকাব হয।

দিন পিছু তাদেব তিন টাকা পাঁচ টাকা বেট আব দুপুবেব খাওযাব ব্যবস্থা। এই কাজেই দস্তুবমত নাম কিনে ফেলল বৃন্দাবন পাল। সে যে-সব মেযেদেব আনে তাদেব বেশিব ভাগই মোটামুটি ভদ্র চেহাবাব, কেউ কেউ কথাবার্তাও কইতে পাবে বেশ, আবাব দুই একজন সুশ্রী মেযেও বেবিযে যায তাদেব মধ্যে। ছবিতে মেযেদেব কোন ভিডেব বোল থাকলেই বৃন্দাবন পালেব কাজ বাডল।

কর্তা এ-কাজেব জন্য একটা অল সেকশন ট্রামেব মান্থলি টিকিট ববাদ্দ কবে দিযেছেন তাকে। আব মাইনেও কিছু বাডিযেছেন, কাবণ, এ-কাজে একটু ভদ্র জামা-কাপড দবকাব।

বৃন্দাবন পাল সোৎসাহে এই কাজ কবে চলেছিল। কিন্তু মুশকিলে ফেললেন তাকে কর্তা নিজেই। এক্সট্রা মেযেদেব মধ্যে কাউকে মনে ধবলেই ওকে ডেকে কানে কানে কিছু প্রস্তাব কবেন। উদাব মুখে দশ পাঁচ টাকা আগাম বখশিসও কবে ফেলেন তাকে। ওই প্রস্তাব শুনে গোডায গোডায ভযানক অস্বস্তি বোধ কবত বৃন্দাবন পাল। কিন্তু ভগবানেব নাম কবে সেই দুরূহ কাজে ঝাপিযে পডেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে হযনি। কর্তাব নাম কবে ভবিষ্যতেব অনেক বকম লোভ-টোভ দেখিযে যেভাবেই হোক কর্তাব পছন্দেব বমণীটিকে বশে আনত। দেবি হলেও লেগে থাকত, কিছু খবচপত্র কবত এবং শেষ পর্যন্ত বিফল হত না।

.. কিন্তু মালিকেব এই বোগ বাডতেই থাকল। ছবিব জন্য একস্ট্রা মেযেব কোন সীন না থাকলেও কর্তাব ঝোক চাপলে তাঁব মনেব মত মেযে সংগ্রহেব জন্য হন্যে হযে ঘুবতে হয তাকে। সে বকম কাউকে পেলে কর্তা দবাজ হাতে টাকা দেন, আবাব সেবকম না হলে তাব পছন্দেব খোঁটাও দেন। এই ফবমাশ খাটতে গিযে এক একসময গলদঘর্ম হযে ওঠে বৃন্দাবন পাল।

একবাব একদঙ্গল মেযেব মধ্যে থেকে একটি উদ্বাস্তু মেযেকে আব স্টুডিওতে না নিযে গিযে সোজা নিজেব ঘবে তুলল বৃন্দাবন। সেই মেযে অমলেব মাসতুতো দিদি শ্যামা। কালোব উপবে দিব্যি সুশ্রী মেযে। আব চৌকসও। ঠাবে-ঠোবে তাকাতে জানে, হাসতে জানে। এই মেযে কর্তাব চোখে পডলে আব বক্ষা নেই জানে। চোখে পডতে দিল না। নিজেই বিযে কবে বসল। দিন কযেক বাদে শ্যামা তাব মাসতুতো ভাই অর্থাৎ অমলকেও তাব নিজেব সংসাবে টেনে নিযে এল। অমলেবও আব তিনকুলে কেউ নেই।

কিন্তু বৃন্দাবনেব সংসাব বেশিদিন টিকল না। তাব ঘবে ছবিব জগতেব নীচু পর্যাযেব কর্মীদেব আনাগোনা ছিলই। কিছু দিনেব মধ্যেই শ্যামাব চোখ খুলে গেল। বৃন্দাবন ওকে বিযে কবে বঞ্চিত কবেছে কানে এমন মন্ত্র দেবাবও লোক জুটল। তাব ওপব স্বামীটি কি কাজ কবে বেডায জানাব পব থেকে শ্যামা বীতশ্রদ্ধ তাব ওপব। কতদিন ঝাঁঝেব মুখে বলে বসেছে, তুমি আবাব একটা মানুষ নাকি, কোনদিন তোমাব মনিবেব হুকুম হলে আমাকেই পাঠিযে দেবে তাব কাছে—তুমি না পাবো কি ?

বৃন্দাবন পাল মনে মনে ভাবে মনিবের হুকুম হলে শ্যামা আর তার নির্দেশের অপেক্ষায় থাকবে না, ছবিতে নামার আশায় নিজেই ছুটবে তাঁর কাছে। মেজাজ ভাল থাকলে শ্যামা অনেকদিন মালিকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবার কথা বলেওছে।

যাই হোক, দু'বছর না যেতে শ্যামা নিজেই তার ব্যর্থ জীবন সফল করতে ঘর ভেঙে দিয়ে চলে গেল। এক রাত্রিতে বৃন্দাবন ফিরে দেখে বউ ঘরে নেই। আর দিন দুই যেতে বুঝে নিল ওই বউ ঘরে আর ফিরবেও না।

কিন্তু চির অনুগতের মতই অমল দাস থেকে গেল তার কাছে। বউ চলে যাবার পর কিছুদিন পর্যন্ত সমস্ত মেয়ে জাতটার ওপরেই ঘেন্না ধরে গেছল বৃন্দাবনের। সেই ঘেন্নার ভাগ অমল দাসও নিয়েছিল। দুই এক বছর যেতে বৃন্দাবনের মন বদলেছে। আবার সে সুখের সংসার করার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু অমল দাসের মন বদলায়নি। বৃন্দাদার কাজে সে যথেষ্ট সাহায্য করে বলেই ঘেন্না তার আরো বেড়েছে। মেয়েগুলোই দুনিয়ায় যত অনিষ্টের মূল ভাবে সে। বৃন্দাদাকে সে সাহায্য করে সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবেই। কসাইয়ের যেমন মাংস কাটা কাজ, অনেকটা সেই রকমই মনোভাব। বৃন্দাদার দিন ফিরলে তারও দিন ফিরবে এটুকুই আশ্বাস। কিন্তু দিন ফিরলেও কোন মেয়েকে নিয়ে সুখের স্বপ্ন দেখে না সে।

এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন একটা কাণ্ড হয়ে গেল। কলকাতার দিনকাল তখন খুব খারাপ। হামলা মারামারি কাটাকাটি লেগেই আছে। কিন্তু অমল নিঃশত্রু ভাবে নিজেকে, তাই রাত্রিতেও নিঃশঙ্কে চলাফেরা করে।

সবে রাত তখন আটটা সাড়ে আটটা হবে। স্টুডিওর পিছনের নির্জন রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছিল। বৃন্দাদার জন্য অর্থাৎ তার মালিকের জন্য একে একে তিনটে মেয়ের কাছে টোপ ফেলেও বিফল হয়েছে। ফলে ভিতরটা তেতে আছে তার। দুনিয়া থেকে মেয়েগুলোকে নির্মূল করে দিতে পারলে দিত। ওই বুড়ো হাঙর অর্থাৎ বৃন্দাদার মালিকের বিকৃত আনন্দের নিবৃত্তি যে কবে হবে তাও জানে না।

উঁচু রাস্তা, দুদিকে পোড়ো জমির ঢল। হঠাৎ অন্ধকারে মেয়ের গলার গোঙানি শুনে থমকে দাঁড়াল। হ্যাঁ, স্পষ্টই একটা চাপা আর্তস্বর কানে আসছে বাঁদিকের ঢল থেকে। অন্ধকারে ঠেকে-ঠোকে নীচু জমির দিকে পা বাড়ালো। আধা-আধি নেমেই সর্বাঙ্গ অবশ। সামনেই পুঁটলির মত পড়ে আছে একটা মেয়ে, অতি যন্ত্রণায় সে-ই কাতরাচ্ছে।

অমল দাস ঝুঁকে দেখল। তারপর পকেট থেকে দিয়াশলাই বার করে হাঁটু মুড়ে বসে দিয়াশলাই জ্বালল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই কাঠিটা নিভে গেল আবার।

অমল দাস তার মধ্যে যা দেখার দেখে নিল। বছর উনিশ কুড়ির একটা অপুষ্ট মেয়ে। কিন্তু বেশ সুশ্রী মুখখানা। এক পিঠ চুল। হাত পা গা ছিঁড়ে রক্ত ঝরছে।

কি যে করবে অমল দাস ভেবে পেল না। কিন্তু মেয়েটাই ককিয়ে উঠল, আমাকে তোলো—

অমল মেয়েটাকে টেনে বসাল। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। একটু বাদে ওকে দেখে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, আমাকে বাঁচাও, ছুঁচোগুলো ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে আমার হাড়গোড় ভেঙে দিয়েছে। একটু জল খাব—

কিন্তু জল কোথায় মিলবে সেখানে? অমল টেনে তুলল তাকে। তারপর একরকম আলতো করেই রাস্তায় এনে দাঁড় করাল। পরনের জামা-কাপড় যেভাবে ছিঁড়েছে আলোর দিকে যাবে কি করে ভেবে পেল না।

অন্ধকারে ভেঁপু বাজিয়ে একটা রিকশা আসছে। অমল দাস অন্য কোন দিশা না পেয়ে তাতেই উঠে বসল মেয়েটাকে নিয়ে। সেও প্রায় কোলে করেই তুলতে হল। রিকশাওলাকে কৈফিয়ত দিল, হঠাৎ পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছে, তাই—

রিকশাওলাটা বিহারী। চাপা গলায় অমল মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার বাড়ি কোথায়? কোথায় যাবে?

কিছু জবাব পেল না। পিছনে মাথা এলিয়ে বেহুঁশের মত পড়ে আছে মেয়েটি। ধাক্কা দিল। কোন সাড়া নেই।

অমল ঘামতে শুরু করেছে। কি করবে ভেবে না পেয়ে রিকশা নিয়ে সোজা নিজেদের ডেরায় চলে এল। দরজা খোলা দেখে আর আলো দেখে বুঝল বৃন্দাদা ঘরে আছে। একলাফে নেমে দু-এক কথায় ব্যাপারটা বলে তাকে টেনে নিয়ে এল। ... অজ্ঞান হয়ে আছে, তাকে নিয়ে এখন কি করা হবে?

কিন্তু বৃন্দাদাকে নিয়ে রিকশার কাছে এসে অমল হাঁ। মেয়েটা রিকশা থেকে নেমে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে মুখে যন্ত্রণার ছাপ। নিঃশব্দে কাঁদছেও।

অমল দাস বলল, তুমি না অজ্ঞান হয়ে ছিলে?

জবাব না দিয়ে মেয়েটা করুণ দুটো চোখ মেলে তাকাল শুধু।

বৃন্দাবন তাড়াতাড়ি বাধা দিল, অজ্ঞান হলেও জ্ঞান ফিরেছে দেখছিস না. এস এস, ঘরে এস। হাত ধরে ঘরের দিকে টানল তাকে। কিন্তু মেয়েটা সত্যিই জখম হয়েছে, হেঁটে আর আসতে পারছে না। বৃন্দাদা টেনেটুনে তাকে ঘরে এনে বসাল। তারপর সর্বাঙ্গের আঘাত লক্ষ্য করে তক্ষুনি ডিসপেনসারির উদ্দেশ্যে ছুটল।

দু'হাত কোমরে তুলে অমল দাস গম্ভীর মুখে তাকে দেখল একটু।

তোমার নাম কি?

অতসী।

ওভাবে ওখানে পড়ে ছিলে কেন?

ওরা চলন্ত গাড়ি থেকে আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল।

অমল দাস আঁতকে উঠল, কারা ফেলে দিয়েছিল?

সংক্ষেপে যা শুনল তাতেই চক্ষুস্থির তার। কতগুলো বদমাস ছেলে অতসীকে জোর করে রাস্তা থেকে গাড়িতে তুলে নিয়ে পালাচ্ছিল—পাড়ার চেনা গুণ্ডা ছেলে সব। সৎ মায়ের সঙ্গে তাদের খুব ভাব ছিল, মনে হয় সৎ মাকে টাকাও দিয়েছে ওরা। অনেক দূরে আসার পরে একটা পুলিশের গাড়ি হঠাৎ পিছু ধাওয়া করতে সেই ছুটন্ত গাড়ি থেকে ওকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ওরা পালিয়ে যায়। তারপর আর কিছু জানে না।

কয়েক মুহূর্তের স্তব্ধতা কাটিয়ে অমল দাস বলল, রিকশাতে জ্ঞান ছিল তোমার তবু অজ্ঞানের ভান করে ছিলে কেন?

তুমি তাহলে বাড়ি দিয়ে আসতে চাইতে আমাকে।

বাড়ি যাবে না তো কোথায় থাকবে?

জানি না। বাড়ি গেলে বাবা আর সৎমা এবারে মেরেই ফেলবে আমাকে।

বাবা কি করে?

কলে কাজ করে...ভয়ানক মদ খায়। আর মায়ের কথা শুনে আমাকে মারে। আমাকে বাড়িতে দিয়ে আসতে চাইলে আমি আত্মহত্যা করব।

মেয়েটাকে খুঁটিয়ে দেখল অমল দাস। রোগা একটু, নইলে মন্দ না। খাইয়ে-দাইয়ে পুষ্ট করে তুলতে পারলে বৃন্দাদার লাভ মন্দ হবে না। মরুকগে, বৃন্দাদাই দায় সামলাক এখন, তার ভেবে কাজ কি?

বৃন্দাবন পাল একজন চেনা কম্পাউণ্ডার নিয়ে এল। সে ওষুধপত্র দিয়ে চলে গেল। তারপর অমলের মুখে সব শুনে বৃন্দাবনও খুব খুঁটিয়ে দেখে নিল মেয়েটাকে। তার চাপা আনন্দ গোপন থাকল না। অতসীর আদর যত্নের ব্যবস্থায় কোন রকম কার্পণ্য করল না। আশ্বাসও দিল, তার সুব্যবস্থা সে-ই করে দেবে।

আর ভাগ্য এমনই, পরদিনই একগাদা ভাল ভাল একস্ট্রা যোগাড় করতে হল নতুন ছবির কাজের জন্য। তাদের মধ্য থেকে কর্তার চোখে লাগা দু' দুটো মেয়ে একেবারে জলের মত টোপ গিলল। কর্তা তাদের এক মাসের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন নিজের বাগানবাড়িতে। আর সেই সঙ্গে বৃন্দাবনকে ঝোঁকের মাথায় দু'শ' টাকা বখশিস করে ফেললেন।

অতসীকে খুব পয়মন্ত মেয়ে ধরে নিল বৃন্দাবন।

এক মাসের মধ্যেই খেয়ে দেয়ে আর শান্তিতে থেকে শ্রী ফিরে গেল অতসীর। বৃন্দাবন দু'চোখ ভরে দেখে তাকে আর আরো ভাল দেখার আশায় দিন গোনে। তাছাড়া মেয়েটার মস্ত গুণ, সুন্দর বাঁধতে পারে—খেতে বসে মনে হয় অমৃত খাচ্ছে। অমল আর বৃন্দাবন মাঝারি ঘরটায় থাকে, আর খুপরিটাতে অতসী থাকে।

এক মাসের মধ্যেই অমলের কাছে মনের কথা ব্যক্ত করে ফেলল বৃন্দাবন। অতসীকে বিয়ে করবে। এদিকের খুপরি থেকে অতসী নিজের কানেই শুনল প্রস্তাবটা। অমলের জবাবও। এরা কেউ রেখে ঢেকে কথা বলে না। অমল জবাব দিল, কেন ঝামেলায় পড়বে আবার, তার থেকে আর একটু তরতাজা করে নিয়ে তোমার কর্তার কাছে পাঠিয়ে দাও, এদিকে ফোটো ভাল উঠলে ছবিতে একস্ট্রা করেও রোজগার করতে পারবে—মোট কথা তোমারও পয়সা হবে ওরও হিল্লে হবে।

বৃন্দাবন পাল বিরক্ত। বলল, তুই বড় নৃশংস হয়ে গেছিস। অতসী আমার লক্ষ্মী, ওকে আমি কোথাও পাঠাতে পারব না— দিন-টিন দেখে সামনের মাসেই বিয়েটা করে ফেলব ভাবছি।

এদিকের খুপরি থেকে অতসী তার উদ্দেশে বড়-সড় ভেঙচি কাটল একটা। কিন্তু সেই সঙ্গে কৌতূহলও খুব। অমলদা ওকে কার কাছে পাঠিয়ে পয়সা রোজগারের কথা বলছে? ফোটো ভাল হলেই বা কি করবে?

বৃন্দাবন বেবিযে যেতে তাব ওপব চডাও হল। বাডিতে মাঝে মাঝে দুই একটা মেযে এক একটা আবেদন নিযে আসে দেখে, কি চায ঠিক বুঝে ওঠে না। কিন্তু গোডা থেকেই অমল দাস অতসীব সঙ্গে ভালো ব্যবহাব কবেনি বড একটা। কেবল খেতে বসলে খুশি। বলে, তুই বাঁধিস বেশ, না হলে বৃন্দাদাব কথায তোকে কখনো বাডিতে বাখতুম না—মেযেছেলেব ঝামেলা ভাল লাগে না।

অতসীও ফোঁস কবে ওঠে, ঝামেলাটা কি?

ঝামেলা না তো কি, যে দেখে সে-ই জিজ্ঞেস কবে কে?

তা জবাব দিলেই পাবো?

কি জবাব দেব, বদ ছেলেদেব ফূর্তি ফসকে এখানে এসে গেছে?

তা কেন, বলবে ভবিষ্যতে আপনাব জন কেউ হবে।

অমল ওকে মাবাব জন্য তেডে আসে। অতসী ছুটে পালায। যখন তখন এইবকম খটাখটি লেগেই আছে। যা কবতে বলে একবাবে শোনে না। তর্ক কবে, অবাধ্য হয। শাসন কবতে গেলে বৃন্দাদাব কাছে পালায।

সেদিন অতসী সবাসবি এসে কৈফিযত তলব কবল, কি ব্যাপাব তোমাদেব বল তো? আমাকে কাব কাছে পাঠাবাব কথা বলছিলে? আব ফোটোব কথাই বা কি বলছিলে?

অমল খেঁকিযে উঠল, তা দিযে তোব দবকাব কি?

দেখ, বড ভাইযেব বউ হতে যাচ্ছি, দস্তুবমত মান্যিগন্যি কববে আমাকে—আব খবদ্দাব তুই-তুকাবি কববে না। তা আমাকে নিযে যখন কথা হচ্ছিল তখন আমি না শুনলে কে শুনবে?

যা যা এখান থেকে—বৃন্দাদাব ভীমবতি ধবেছে—

কেন, আমাকে বিযে কবতে চায বলে? তা তোমাব আপত্তি থাকে তো জোব দিযে বল না?

আমাব কি দায পডেছে?

তাহলে কুপবামর্শ দিচ্ছিলে কেন?

দিচ্ছিলাম মেযে জাতটা অতি অখাদ্য জিনিস বলে।

অতসী হেসে ফেলল।—দুই একটা মেযে খেযে দেখেছ? বলে হাসতে হাসতেই পালাল সেখান থেকে।

কিন্তু ভিতবে ভিতবে অতসীব বেশ ভাবনাই ধবে গেল। এখান থেকে নডাব ইচ্ছে একটুও নেই। কিন্তু বৃন্দাবন পাল বিযে কবতে চাইলেই বা ঠেকাবে কি কবে? তাকে বিযে কবাব ইচ্ছে একটুও নেই। ওদিকে আব একজন তো কাছে গেলেই মাবতে আসে।

ইনিযে বিনিযে বৃন্দাবন প্রস্তাবটা কবেই ফেলল একদিন। তাব শবীবটা ভাল যাচ্ছে না। প্রাযই একটু একটু জ্বব আব বুকেব ব্যথায় ভুগছে। তাই মাঝে মাঝে আব কাজে বেবোয না। সেই অবকাশে একদিন কথাটা বলে ফেলল।

শুনে অতসী ভযানক বিমর্ষ।—তা তো এখন হয না।

কেন ? কেন হয না ?

আমাব যে ভযানক ফাঁড়া আছে। জ্যোতিষী আমাকে দেখে মাকে আব বাবাকে বলেছিল। ফাঁড়া না কাটতে বিযে হলে আমাবও ক্ষতি হবে, যে বিযে কববে তাবও খুব অনিষ্ট হবে। এই জন্যেই তো বাবা ঘবে বেখেছিল—

বৃন্দাবন চিন্তিত। কতদিন ফাঁড়া আছে ?

একুশেব মাঝামাঝি পর্যন্ত।

এখন কত ?

এই কুড়িব মাঝামাঝি।

স্বস্তিব নিশ্বাস ফেলল বৃন্দাবন, একটা বছব এমন কিছু দীর্ঘ নয। তাব পবেই কি মনে পড়তে পুলকিত। সেও তো গণক ঠাকুব দিযে হাত আব ঠিকুজী দেখিযে বেখেছে, আবো এক বছবেব মধ্যে তাব দিন ফেবাব কথা। যোগাযোগ একেই বলে, দিন তাহলে সর্ববকম ভাবেই বদলাবে।

অতসীব ফাঁড়া কাটাব কথা আব প্রায একই সময নিজেব দিন বদলেব কথা অমলকে না বলে পাবেনি বৃন্দাবন। তুই তো কিছুই বিশ্বাস কবিস না, কেমন মেলে দেখ এখন—

শুনে অমল ভুরু কুঁচকেছে শুধু। এসব প্রসঙ্গই বিবক্তিকব তাব কাছে।

বিবক্তি দিন দিন বাড়তেই থাকল, কাবণ ভয-ডব গিযে অতসীব হামলা দিনে দিনে বাড়ছে তাব ওপব। কাবণে অকাবণে ঝগড়া কবে, আবাব বৃন্দাদাব কাছে নালিশ কবে ওকে বকুনি খাওযাতে চেষ্টা কবে। ওব কাজেব জিনিস লুকিযে বাখে, ইচ্ছে কবে জামাব বোতাম ভেঙে বাখে। নিজেই অবশ্য আবাব বাব কবে দেয, বা পবিপাটি কবে নতুন বোতাম লাগিযে দেয। সেলাই কবতে কবতে দাতে কবে সুতো কাটে যখন, অমলেব দেখতে এক এক সময ভালই লাগে। কিন্তু ভাল লাগাব মেজাজ সব সময থাকে না। উল্টে বেশিব ভাগ সময হাত নিশপিশ কবে। কিন্তু গাযে আঙুল তুললে বৃন্দাদাব কাছে দশখানা কবে লাগায।

বেগে গিযে অমল বলে, তুই এখন থেকেই চাস না যে আমি এখানে থাকি— নিজেব একটা পেট আমি চালাতে পাবব না ভাবিস, কেমন ?

গম্ভীব মুখে অতসী জবাব দেয, একটা পাববে, দুটো পাববে কিনা আমাব সেই ভাবনা।

কি, বৃন্দাদাব মত হাঁদা পেযেছিস আমাকে ? আমি যাব ঝামেলা বাড়াতে ! বৃন্দাদা ছাড়ছে না বলে, নইলে আমি পালাতেই চাই, বুঝলি ? তোব ফাঁড়া কাটতে আব বাকি কত ?

ভাল মুখ কবে অতসী জবাব দেয, সে-তো তোমাব ওপব নির্ভব কবছে—কাটিযে দাও না চট কবে।

অমল দাস ভাবে, পূজো আর্চা দেওযা বা জ্যোতিষীব কাছে ধর্না দেওযাব অনুবোধ। জবাব দেয, আমাব দ্বাবা কিছু হবে না, আমাব সমযও নেই, আব ওসব কিছু বিশ্বাসও কবি না। নিজেদেবটা নিজেবা বোঝগে যাও—বড় নিশ্বাস ফেলে অতসী জবাব দেয, মেযেছেলে...কত আব পাবি।

এক বছবেব দবকাব হল না, মাস আষ্টেকেব মধ্যে বেশ অপ্রত্যাশিতভাবেই দিন বদলেব চাকাটা ঘুবে গেল। অতসীব ফাঁড়া কাটল, কিন্তু এতটা অকরুণভাবে কাটাতে চাযনি সে।

বৃন্দাবন আগেব থেকে আবো বেশি ভুগছিল। কিন্তু মনিবেব ভ্রূকুটিব ভযে আব বোজগাবেব আশায অসুস্থ শবীব নিযেই কাজে বেরুতে হত। এবই মধ্যে অঘটন ঘটে গেল। মনিবেব কাছে মোটা বখশিসেব ইংগিত পেযে একটি মোটামুটি শিক্ষিতা মেযেকে লোভেব টোপে প্রায আটকে ফেলেছে ভেবেছিল। অদূব ভবিষ্যতে ছবিব নাযিকা হযে ওঠাব উজ্জ্বল সম্ভাবনাব কথাও বলেছিল তাকে। আব মনিবেব সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎও কবিযে দিযেছিল।...মেযেটাব বোধহয ভালবাসাব লোক ছিল একজন, কিন্তু তা নিযে বৃন্দাবন মাথা ঘামাযনি। অমন অনেক দেখেছে। কিন্তু সেই ভালবাসাব লোক আব দুটো ষণ্ডামার্কা লোকেব সঙ্গে দিনমানে খোলা বাস্তায তাব ওপব আচমকা ঝাঁপিযে পড়ল—তাবপব বেদম মাব। মুখে বুকে পিঠে কিল চড় লাথি। নাক মুখ দিযে গল গল কবে বক্ত বেরুতে লাগল। বৃন্দাবন পাল অজ্ঞান হযে মাটিতে গড়াতে লাগল।

তাবপব হাসপাতাল। প্রায সন্ধ্যাব মুখে খবব পেযে অমল আব অতসী হাসপাতালে ছুটেছে। ওদেব দেখে বৃন্দাবন কেঁদে ভাসিযেছে।

দিন তিনেকেব মধ্যে সুস্থ হযে উঠেছিল। আব একটা দিন গেলেই বাড়ি ফেবাব কথা। পবদিন বিকেলে তাকে আনতে গিযে অমল আব অতসী শোনে বৃন্দাবন পাল মবে গেছে। ডাক্তাব জানালো, বাতে কবোনাবি অ্যাটাক হযেছিল, দুপুবেব মধ্যে শেষ।

দিন তিনেকেব চেষ্টায অমল দাস কর্তা চৌধুবীমশাযেব নাগাল পেল। নতুন ছবি নিযে খুবই ব্যস্ত তিনি। বৃন্দাবনেব মৃত্যুব খবব কানে এসেছে আগেই। অমলকে পবে দেখা কবতে বলেছিলেন।

বৃন্দাবনেব জন্য দুঃখ কবলেন একটু চৌধুবীমশাই। বড় কাজেব লোক ছিল বললেন। তাবপব জিজ্ঞাসা কবলেন, ওব বউটাব কি দশা?

বৃন্দাবনেব বউ পালানোব খবব চৌধুবীমশাই বাখেন না বোঝামাত্র অমল দাস শুকনো মুখে জানিযে দিল, পাগলেব মত হযে আছে—এদিকে ঘবে একটা কপর্দকও নেই।

বাড়িব সেক্রেটাবিকে ডেকে চৌধুবীমশাই হুকুম কবলেন, বৃন্দাবনেব দু'শ' টাকা মাইনে আব তিনশ'টা বাড়তি টাকা নিজে গিযে বৃন্দাবনেব বউযেব হাতে দিযে আসতে। আব অমলকে বললেন, সে ইচ্ছে কবলে বৃন্দাবনেব কাজ কবতে পাবে, কিন্তু তাব মত খাঁটি হওয়া চাই।

মনে মনে বুড়ো হাঙবেব মুণ্ডপাত কবতে কবতে সেক্রেটাবিকে সঙ্গে কবে ডেবায ফিবল। মেযেজাতটাব ওপবে সে এখন মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ। তাকে বাইবে দাঁড় কবিযে তাড়াতাড়ি ভিতবে গিযে অতসীকে টেনে এনে ঘবেব মেঝেতে বসিযে দিল। পবনেব কালো পেড়ে শাড়িব আঁচলে নিজেই ওব মাথা আব মুখ ঢেকে দিযে ফিসফিস কবে বলল, খববদাব একটা কথাও বলবি না. মালিকেব সেক্রেটাবি টাকা দিতে আসছে।

ছুটে গিযে সেক্রেটাবিকে ডেকে নিযে এল। সে ভদ্রলোক মালিকেব বক্তব্য শুনিযে সামনে পাঁচশ' টাকা বেখে চলে গেল।

অমল দাস ফিরে এসে দেখে অতসী তেমনি ঘোমটায় মুখ ঢেকে বসে আছে, কিন্তু সামনে টাকা নেই।

টাকাগুলো দে।

এক ঝটকায় ঘোমটা সবিয়ে ফেলে ছদ্মকোপে অতসী বলল, আমাকে বিধবা সাজিয়ে টাকাব কথা বলতে লজ্জা কবে না তোমাব? পাবে না যাও—

এই রাগটুকু দেখতে কেন যেন অমল দাসেব ভাল লাগল। বৃন্দাদা চলে যাবাব পর থেকেই কেন যে অমলেব দু'চোখ থেকে থেকে ওব দিকে ফেরে ঠিক বুঝে ওঠে না। কিন্তু মেয়েছেলেকে আব এই জীবনে আমল দেবে না ও—বৃন্দাদা অসময়ে চলে গেল, ওরাই যত সর্বনাশেব মূল। অতসীকে ওই বুড়ো হাঙবের কাছেই দিয়ে আসবে, তাতে মোটা কিছু টাকাও হাতে আসবে। তাবপব এই কাজে ইস্তাফা দেবে।

অতএব অতসীকে না রাগিয়ে একটু ভেবে চিন্তে আপোসেব সুবে বলল, ঠিক আছে ওই পাঁচশ' থেকে আড়াইশ' টাকা আমাকে দে, অর্ধেক তোব অর্ধেক আমার—

অতসী জবাব দিল, সবটাই তোমার সবটাই আমার।

বিবক্ত হয়ে অমল চোখ পাকাল, তোর মতলবখানা কি শুনি?

পাল্টা ঝাঁঝে অতসী বলে উঠল, ছোটলোকেব মত আব তুই-তোকাবি কববে না বলে দিলাম। কোপেব মুখেই হাসল আবাব—মতলব ভাল, টাকাব কথাই ভাবছিলাম দু'দিন ধবে, ভগবান জুটিযে দিলেন—তোমাব বৃন্দাদাব মত ওই সব জঘন্য কাজ আব তোমাব কবা হবে না—ওই মোড়ের মাথায একটা পান-বিড়ি-সিগাবেটেব দোকান দাও —আমি তোমাকে পান সাজা শিখিয়ে দেব, আর ফাঁক মত নিজেও দোকানে বসব। ফিক কবে হাসল আবাব, দোকানে সব পান খাওযাব হিড়িক দেখবে তখন—

অমল দাস তাব অবাধ্য চোখ দুটোকে জোব করেই শাসনেব গাম্ভীর্যে টেনে আনল। —তাবপব?

তারপব নয তার আগে—তার আগে বিযে।

অমল দাস জোব দিযেই ঝাঁঝিয়ে উঠল, কাব সঙ্গে কাব বিয়ে?

আমার সঙ্গে শ্রী অমলচন্দ্র দাসেব।

অসহিষ্ণু ঝাঁঝে একটা প্রলোভন থেকে নিজেকে ছিনিযে আনতে চাইল অমল দাস। ক্রুদ্ধ মুখে বলল আমাকে ওই ফাঁদে পা দেবাব মত আহাম্মক পেযেছিস? বৃন্দাদা অকালে চলে গেল তোদের জন্যে—মেযেগুলোব জন্যেই সক্কলে মবে বুঝলি? আমি ওর মধ্যে নেই।

অতসী তাব মুখের দিকে চেযে বইল খানিক। নির্লিপ্ত মুখ। জিজ্ঞাসা কবল, তোমাদেব মালিক চৌধুরীমশাইয়ের বযেস কত?

সঠিক না বুঝেই অমল জবাব দিল বাহাত্তব ছাড়িয়েছে।

আর তোমাব বৃন্দাদা কত বছব বয়সে গেল?

চল্লিশের আগে।

তাহলে?

কি তাহলে?

অতসী আবো গম্ভীব জবাব দিল, তাহলে প্রমাণ হল তুমি একটি পয়লা নম্ববেব গবেট। মেয়েদেব জন্যে মবলে চৌধুবীমশাই আবো তিবিশ বছব আগে মবে ভূত হযে যেত—মেয়েদেব জন্যে কেউ মবে না, অন্যেব জন্য মেয়েদেব যাদেব তাড়া কবে বেড়াতে হয তাবাই শুধু মবে।

অমল দাস হাঁ কবে শুনল। তাবপব হঠাৎই যেন কিছু তত্ত্বজ্ঞান লাভ হল তাব। প্রশংসা-ভবা চোখে জ্ঞানদাত্রীটিব দিকে চেয়ে বইল সে।

অতসী মেঝেতে বসেই ছিল তেমনি। এক লাফে এগিযে এসে তাকে আচমকা জাপটে ধবে মেঝেব ওপবেই গড়াগড়ি খেতে লাগল অমল দাস।

পথচিত্র

আমাব ভাল লাগে। পথে নেমে নিঃশব্দে আমি জীবন-চিত্র দেখি। জীবনেব মিছিল দেখি। কেউ আমাকে কিছু দেখায না। চলমান মানুষগুলো নিজেবা আপনা থেকে এক একটা চিত্র হযে আমাব সামনে আসে আবাব দূবে চলে যায।

কোন কাজ না থাকলে আমি পথে নেমে আসি। নিরুদ্দিষ্টেব মত হাঁটতে থাকি এক-একটা দিক ধবে। খেযালখুশি মত কখনো কোন ট্রামে উঠে পড়ি কখনো বা বাসে। কেউ বুঝতে পাবে না আমি একজন বেকাব দর্শক মাত্র। দেখাটা আমাব নেশা।

দেখে দেখে মনে হয প্রতিটি মানুষেব ভিতবে যেন একটা কবে সংকল্পেব মোটব বসানো। সেই মোটবেব দম-মাফিক তাদেব ওঠা বসা চলা ফেবা কাঁদা হাসা। মুখেব দিকে চেয়ে চেয়ে আমি তাদেব ভিতবেব সঙ্কল্পটি আঁচ কবতে চেষ্টা কবি। ঠিক হয কিনা আমি জানি না। কিন্তু ভাল লাগে। বিশ্বাস, ঠিকও হয।

বাসেব গাদাগাদি ভিড়েব মধ্যে একসঙ্গে পাচ সাতটা মুখ আমাব মুখেব ওপব চড়াও হতে দেখেছি। আমাব সামনেব আসনে-বসা লোকটা উসখুস কবছে। নেবে যাবাব জন্য সে এক্ষুনি উঠে দাঁড়াবে মনে হয। আমাব চাবদিকেব লোকগুলোব জোড়া জোড়া চোখ আমাবই মুখেব ওপব আটকে আছে কেন তক্ষুনি বোঝা গেল। যে লোকটাব সীট ছেড়ে ওঠাব সম্ভাবনা তাব একেবাবে সামনেই আমি। অর্থাৎ সে উঠলে আমাবই ওই সীটটা দখলেব সম্ভাবনা।

বসা লোকটা উঠল ঠিকই। সেই মুহূর্তে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যমনস্কেব মত আব এক দিকে মুখ ফিবিযে আছি। তক্ষুনি হুটোপুটি কাণ্ড বেধে গেল আমাব দু'পাশে। ওই অন্যমনস্কতাব ফাঁকে দুদিকেব লোকই সেই খালি সীটেব ওপব হুমড়ি খেযে পড়েছে।

...ট্রামে বসে আছি। ববাতক্রমে জানালাব ধাবেব সীটটাই আমাব দখলে। আমাব পাশে যে আধবযসী লোকটি বসে আছে সে কেন যেন ফিবে ফিবে আমাব দিকেই তাকাচ্ছে। প্রথমে খেযাল কবিনি। একটু বাদেই কবলাম। আমাব পথচিত্র দেখাব ঝোঁকটা সে ধবতে পাবেনি। এদিক ওদিক তাকাচ্ছি দেখে ভাবছে এক্ষুনি হযতো নেমে যাব

আমি। উঠে দাঁড়ালেই সে জানালার ধারটার দখল নেবার জন্য প্রস্তুত।

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সত্যি মিথ্যে যাচাইয়ের জন্য উসখুস করে উঠল ভিতরটা। আধা-আধি উঠে কোমর বেঁকিয়ে একবার নিচের দিকে ঝুঁকলাম। সাগ্রহে পাশের লোক সেই বসা-অবস্থাতেই সাঁ করে জানালার ধারে সরে গিয়ে পা তুলে আমাকে বেরুবার জায়গা করে দিল। কিন্তু ওইরকম আধাআধি উঠে আসলে আমি কি করছিলাম? হাতের টিকিট মাটিতে ফেলে ঝুঁকে সেটাই আবার কুড়িয়ে নিচ্ছিলাম। সেটা হাতে নিয়ে অবাক মুখ করে লোকটির দিকে তাকাতে সে তার ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত।

সরি!

ঠিক আছে, বসুন বসুন।

জানালার ধার ছেড়ে দিয়ে আমি তার পাশে বসেছি।

...ময়দানের নিরিবিলি ধারটা দিয়ে একটা ছেলে আর একটা মেয়ে চলেছে। ছেলেটার বয়েস সাতাশ-আটাশ আর মেয়েটার বড় জোর উনিশ। তেমন সুশ্রী নয় আবার তেমন কুরূপাও নয় মেয়েটা। হাত মুখ নেড়ে কথা বলতে বলতে চলেছে। কিন্তু আমার মনে হল তার সঙ্গীটি কথা যত না শুনছে তার থেকে দেখছে ঢের বেশী। তার একখানা হাত মেয়েটার কাঁধের ওপর। সেই হাত পিঠ বেয়ে মাঝে মাঝে মেয়েটার কোমরের দিকে নেমে আসছে। হাত বিশেক পিছনে চলেছি আমি। মেয়েটা পলকের সন্দিগ্ধ চোখে ঘাড় বাঁকিয়ে সঙ্গীর মুখখানা দেখে নিল একবার। সঙ্গীর হাত তক্ষুনি ওর কাধের দিকে উঠে গেল। আর পিছনে ফিরে একবার দেখেও নিল।

আমার মন বলছে তেমন অভিজ্ঞ নয় মেয়েটা। অনেকটা সরল বিশ্বাসেই সঙ্গীর পাশে চলেছে। আর মনে হল, ওই পাশের লোকটা নিরাপদ গোছের নির্জনতা খুঁজছে একটু। সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হয়ে এসেছে। ওরা এগিয়ে চলেছে। একটু বাদেই আর দেখা গেল না ওদের।

আমি মাঠেই এক জায়গায় বসে পড়লাম।

আধঘণ্টার মধ্যেই প্রত্যাশিত নাটক দেখলাম। অন্ধকার ফুঁড়ে হনহন করে কেউ একজন এদিকে আসছে। প্রায় ছুটেই আসছে যেন। আমিও অন্ধকার বিদীর্ণ করে দেখছি। একটা মেয়েই। সেই মেয়ে। কেউ যেন ওকে তাড়া করেছে। ও পালাচ্ছে।

আমি ভুঁইফোড়ের মত সামনে উঠে দাড়ালাম। মেয়েটা আঁতকে উঠল।

বললাম, ভয় পেও না, দাড়াও—তোমার পিছনের ওই লোক এসে গেছে, এভাবে পালিয়ে পার পাবে না।

বলতে বলতে লোকটা এসে গেল। সেই লোক। দাঁড়াবে কি দাঁড়াবে না ভাবছিল। অস্ফুট গর্জনে একটা কটূক্তি করে উঠে আমি তেড়ে যেতেই সে ত্রস্ত কুকুরের মত ছুটে পালাল। আমি মেয়েটাকে বললাম, এবার যাও, আর সন্ধ্যায় হাওয়া খেতে এসো না।

অন্ধকারে আমিও পা চালিয়ে দিলাম।

...বাসের ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যে সেই লোকটার মুখের দিকে আমার চোখ আটকাল কেন জানি না। বেশ ফিটফাট চেহারা। পরনে চকচকে প্যান্ট ঝকঝকে শার্ট।

মুখে দু-চাবটে বসন্তেব দাগ। বছব চব্বিশ-পঁচিশ বযেস। সে আমাকে দেখছে না। তাব চোখ আশ-পাশেব মানুষদেব উপব চক্কব খাচ্ছে। এই চিত্র যেন আমাব ষষ্ঠ চেতনাব ওপব আঘাত দিল একটা। মন বলল, লোকটা নিঃশব্দে অপবেব পকেটেব সন্ধানে আছে।

মিনিট কতকেব জন্য একটু অন্যমনস্ক হযে পডেছিলাম। হঠাৎ এক ভদ্রলোক চেঁচামেচি কবে উঠল। তাব পকেট থেকে মানিব্যাগ খোযা গেছে। একটা হৈ-চৈ পডে গেল। আশপাশেব সকলকেই সন্দেহ কবছে ভদ্রলোক। আমি দেখলাম সেই লোকটি তখন বেশ দূবে দাঁডিযে—অনেকটা সামনে এগিযে গেছে। আব নিস্পৃহ মুখে ঘাড ফিবিযে একটা দৃশ্য দেখছে যেন।

কপাল ঠুকে একটা কাণ্ড কবে বসলাম। টাকা যাব খোযা গেছে তাব গা টিপে ওই লোকটাকে দেখিযে দিলাম। সে ছুটে গিযে তাকে চেপে ধবল। লোকটা পাল্টা হুমকি দিযে উঠল, কিন্তু মুখখানা আমসি। আবো দু'চাবজন উৎসাহী লোক তাকে ছেকে ধবে কোমবে হাত দিতেই ব্যাগ বেরুল। তাবপব বহুজনেব সে কি নৃশংস উল্লাস।

এই থেকেই নিজেব ওপব একটা দৃঢ বিশ্বাস এসে গেছল। আমি পথচিত্র দেখি। আব তাই থেকে মানুযেব ভিতবেব চিত্রটাও স্পষ্ট দেখি।

সেদিন...

বেলা তখন তিনটে হবে। একটা পবিচিত ছোট বাস্তা ধবে আসছিলাম। উদ্দেশ্য মোডেব ওই দোকান থেকে পান খাব। আমি ওই বিশেষ দোকানেব খদ্দেব। বলতে গেলে এ পাডাতেই খানিক দূবে বাসা আমাব। ওই অল্পবযসী পানঅলাটাকে খুব পছন্দ আমাব। দেশ উডিষ্যায। এখন বাঙালীই হযে গেছে। সব সময মিষ্টি মিষ্টি হাসে, পান-সাজাব ফাঁকে শবীব কেমন আছে না আছে খবব নেয। মজাদাব টাটকা খবব কিছু থাকলে তাও বলে ফেলে।

গজ বিশেক এ-ধাবেই দাঁডিযে পডতে হল। সামনে কিসেব জটলা একটা। একজন মহিলা—বছব পযত্রিশ-ছত্রিশ হবে বযসে, ফুঁপিযে কাঁদছে। আব চাবদিক থেকে তাকে ঘিবে অনেকে অনেক বকমেব কথা বলছে। কেউ কেউ এটা সেটা জেবা কবছে মহিলাকে, কিন্তু উদগত কান্না চেপে মহিলা জবাব দিযে উঠতে পাবছে না। হাত তুলে সামনেব গলিটা দেখিযে দিচ্ছে কেবল।

আমিও দাডিযে গেছি। সমাচাব যা শুনলাম তাব সাবমর্ম, মহিলা আজ সকালেই তাব এক আত্মীযেব কাছ থেকে পঁচাত্তবটি টাকা স্বামীব চিকিৎসাব জন্য ধাব কবে এনেছে। স্বামী একেবাবে শয্যাশাযী। ঘবে আব এক কর্পদকও নেই। ওই টাকায স্বামীব জন্য ওষুধ আসবে আব তাব বুকেব এক্স-বে হবে। মহিলা আগে ওষুধটা কিনে নিযে বাডি যাবে ঠিক কবে এ-পথ দিযে যাচ্ছিল। এবই মধ্যে একটা লোক ছোঁ মেবে তাব হাতেব ব্যাগটা ছিনিযে নিযে ওই গলিতে সেঁধিযে গেছে। মহিলা বুক চাপডে কেঁদে উঠেছে। কিন্তু গলিব ভিতব দিযে লোকটা কোথা থেকে কোথায চলে গেছে ঠিক কি।

আমি দেখছি। মহিলাকে ঘিবে লোকেব সংখ্যা এখন কম কবে তিবিশজন। নানা বযসেব লোক। চেনা মুখও আছে এব মধ্যে অনেক। মহিলাব দিকে তাকালাম আমি।

কান্না থামেনি তখনো। তাব হাতে প্রেসকৃপশনটা আছে শুধু।...এক কালে সুন্দবীই ছিল মনে হয। অনটনেব হাড়কাঠে পড়ে সে-সৌন্দর্য গেছে বোঝা যায। কাঁদছে আব অসহায চোখে চাবদিকে তাকাচ্ছে। শোকে আব উত্তেজনায হাঁপাচ্ছে অল্প অল্প। ঈষৎ স্রস্ত বসনেব ওধাবে ওই বুকেব ওঠা-নামা দেখছে কেউ কেউ। কেউ পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিযে নিচ্ছে। কেউ বা জেবা কবে কবে ছিনতাইযেব আবো সঠিক হদিশ পেতে চেষ্টা কবছে।

আমি দেখছি একটা শোক আব হতাশা যেন মহিলাব দু'চোখ দিযে ঠেলে বেরুচ্ছে। ঘবে রুগ্ন স্বামী নিশ্চয তাব প্রতীক্ষায বসে আছে। কিন্তু সে ঘবে যাবে কোন মুখ নিযে ?

এ পাড়ায এ বকম হামলা সন্ধ্যায বা বাতে আবো হযে গেছে। এখন দিন-মানেও এই উপদ্রব শুরু হযেছে। লোকচবিত্র বা পথচিত্র দেখে যদি কোন অভিজ্ঞতা হযে থাকে তাহলে আমাব ধাবণা মহিলাব এত বড ক্ষতিটা পূবণ কবে দেওযা সম্ভব। কিন্তু কোন একজনেব প্রথম এগিযে আসা দবকাব।

পকেটে হাত দিযে দেখলাম দুটো দশ টাকাব নোট আছে। কযেক মুহূর্তেব দ্বিধা কাটিযে আমিই এগিযে গেলাম। গোল হযে যাবা ঘিবে আছে মহিলাকে এবং নানা দিক থেকে নানাভাবে দেখছে, তাদেব সক্কলকে উদ্দেশ্য কবে বললাম, ছিনতাই ঠেকাতে পাবছি না, দিনে দুপুবে এই কাণ্ড—এ আমাদেব দোষ, আমাদেব পাড়াব দুর্নাম। এই আমি কুড়িটাকা দিলাম, আপনাবা যে যা পাবেন দিযে মহিলাকে এই বিপদ থেকে বক্ষা করুন।

নিন ধরুন।

মহিলা থমকে তাকাল আমাব দিকে। দু'গালে তখনো জলেব দাগ। কি কববে ভেবে পেল না।

ধরুন, ধরুন। এটা লজ্জা কবাব সময নয—দোষ আপনাব নয, দোষ আমাদেব। নোট দুটো হাতে গুঁজেই দিলাম একবকম।

আব একজন দেখলাম পকেট থেকে মানিব্যাগ বাব কবছে।

নাযকেব ভূমিকা নেবাব পব আব দাঁড়িযে থাকাব মানে হয না। এক-আধজন আবাব অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য কবছে আমাকে।

কিন্তু বেশিবভাগ লোকেবই পকেটে হাত ঢুকছে দেখলাম। পথচিত্র দেখে অভ্যস্ত এই দুটো চোখ আগেই আঁচ কবেছিল এ বকম হবে।

সবে এসে পানেব দোকানেব সামনে সবে দাঁড়িযেছি। বছব চল্লিশ বিযাল্লিশেব একটি লোক সেখানে দাঁড়িযে মিটিমিটি হাসছে আব হুস হুস কবে সিগাবেট টানছে। আমাকে দেখেই একটা চোখ ছোট কবে আব সেই বকমই হেসে পবিচিতেব মতই জিজ্ঞাসা কবল, কি মশাই, টাকা দিযে এলেন নাকি ?

সঠিক না বুঝে আমি বললাম, হ্যাঁ।

লোকটা ফিক ফিক কবে আবো বেশি হাসতে লাগল আব সেই সঙ্গে জোবে দু'তিনটে টান মাবল সিগাবেটে। ধোঁযা ছাড়তে ছাড়তে জিজ্ঞাসা কবল, কেন দিলেন, সুন্দব মুখেব বিলাপটুকু পছন্দ হল ?

আমি রুষ্ট-নেত্রে তাকালাম তার দিকে।—ভদ্রমহিলা এ-রকম বিপদে পড়েছেন, এসব কি বলছেন আপনি।

আরো বিচ্ছিরি করে হাসল লোকটা। বলল, ভদ্রমহিলা বিপদে পড়লে আপনাদের দরদ উথলে ওঠে, না? আর সুন্দর মুখ হলে তো কথাই নেই—কোন ভদ্রলোক ও-রকম বিপদে পড়লে ফিরে তাকাতেন?

আমি বললাম, শাট আপ, ভদ্রলোকের মত কথা বলুন, ওই মহিলা কি রকম বিপদে পড়েছেন আপনি জানেন?

হাসছে তখনো।—জানি বইকি, অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসার টাকা ছিল ব্যাগে—সেই ব্যাগ ছিনতাই হয়েছে, এই তো?

আমি থমকে গেলাম।—ওই মহিলাকে আপনি চেনেন?

চিনি বইকি। আরো বেশি হাসতে লাগল।—ওই দেখুন আরো কত জনে টাকা পয়সা দিচ্ছে, ওয়াণ্ডারফুল।

ফিরে তাকালাম একবার। পানঅলাটা কি যেন ইশারা করছে আমাকে।

আমার ওর দিকে তাকাবার সময় নেই। রূঢ় স্বরে সামনের লোকটাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কতটা চেনেন আর কি জানেন?

মুচকি হেসে সে জবাব দিল, এমনও হতে পারে ওই মহিলার সেই অসুস্থ স্বামীর সঙ্গেই আপনি দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। থ্যাংকস ফর দি চ্যারিটি—

দ্রুত চলে গেল লোকটা।

আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। পানঅলা আমাকে বাবু বলে হাঁক দিল। কিন্তু আমি সে ডাকে কর্ণপাত না করে ওই মহিলার দিকেই ছুটে গেলাম। রাগের মাথায় এক থাবা মেরে মহিলার হাত থেকে টাকা পয়সা সব মাটিতে ফেলে দিলাম। চিৎকার করে বলে উঠলাম, মশাইরা, কেউ এক পয়সাও দেবেন না, সব জোচ্চুরি,সব মিথ্যে। মহিলা হতভম্ব মুখে চেয়ে রইল আমার দিকে। যারা চারপাশে ছিল তখনো তারাও চিত্রার্পিত।

হাতে একটা টান পড়তে চেয়ে দেখি ওই পানঅলা টানছে আমাকে। ছুটে এসে হাঁপাচ্ছে সে। বলছে, শুনুন বাবু শুনুন, খুব ভুল হোয়ে গেল—

তিন হাত এদিকে টেনে এনে সে আমাকে বলল, ওই পাগলের কথা শুনে আপনি কি করছেন বাবু।

পাগল।

হ্যাঁ পাগল। দু'বছর আগে ওর বউ অন্য লোকের সঙ্গে ভেগে গেছে। তারপর থেকে একটু ভাল চেহারার কোন মেয়েছেলে দেখলেই বলে তার বউ।

আমি বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। ওদিকে লোকগুলোর মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া শুরু হব-হব করছে। আমি তাড়াতাড়ি এসে ছড়ানো ছিটনো টাকা পয়সাগুলো রাস্তা থেকে কুড়োতে লাগলাম। অনেকে একসঙ্গে প্রশ্ন ছুঁড়ল, কি হয়েছে মশাই, কি হয়েছে?

আমি জবাব দিলাম, কিছু না মশাইরা, আমার মস্ত বড় একটা ভুল হয়েছে। সবিনয়ে আবার সেই টাকা পয়সা মহিলার সামনে ধরলাম, বললাম, অপরাধ নেবেন

না, নিন। মহিলা হাত বাড়িয়ে নিল। কিন্তু সেই সঙ্গে জ্বলন্ত চোখে আমার মুখটা একপ্রস্থ দগ্ধ করল।

এখনো আত্মবিস্মৃত তন্ময়তায় আমি পথচিত্র দেখে যাই। কিন্তু নিজের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে আর কখনো নিঃসংশয় হতে পারি না।

বোরখা

নায়ক ছেড়ে এই কাহিনীর লেখকও আমি নই। আমি অনেকটা মুনশীর কাজ করছি। অর্থাৎ, কারো কাছ থেকে শুনে লিখছি। কিন্তু শোনাটা সেকেন্ড-হ্যান্ড নয়, ডাইরেক্ট। এর নায়ক বা নিয়ামক আমাদের কুঞ্জলাল।

আমাদের কুঞ্জলাল বলতে যাঁরা আমাদের সতীর্থ বা সমসাময়িক তাঁরাই চিনবেন। কারণ, কুঞ্জলালকে সেদিন য়ুনিভার্সিটির তো বটেই, আশপাশের কলেজের বহু ছেলেমেয়েও চিনত। প্রণয়ের ব্যাপারে কন্দর্পদেবটি তার বক্ষ-বরাবর একখানি শর উঁচিয়েই ছিলেন। কুঞ্জলালের অবিমিশ্র বাঙালী-প্রীতি আমাদের চক্ষু এবং জঠরগত লাভের কারণ ছিল। তার পয়সায় রেস্টুরেন্টে কত চপ-কাটলেট খেয়েছি, কত ছবি আর খেলা দেখেছি ঠিক নেই।

ইউ. পি-র শেঠেরা টাকা চেনে শুনেছিলাম। ব্যবসা ছাড়া এমনিতেই টাকা খাটিয়ে টাকা বাড়ায়। তা যদি সত্যি হয়, তাহলে কুঞ্জলাল শেঠ-কুলের কলঙ্ক। সে টাকা গোছাতে জানে না, টাকা ছড়াতে জানে।

তার বাবা মানিকলাল শেঠ লক্ষ্ণৌয়ের নাম-করা চিকন কাপড়ের কারবারী। ভদ্রলোকের অনেকগুলো ছেলেপুলে হয়েছিল, কিন্তু একটাও টেঁকেনি। কুঞ্জলালের দু-বছর বয়সের সময় তার মাসি তাকে কলকাতায় নিয়ে এসেছিল। ছেলে নেই ভাবলে যদি ছেলে থাকে, সেই চেষ্টা করতে তাঁর আপত্তি নেই। এই উপায়টা ছেলের মাসি আর আত্মীয়-পরিজনেরা তাঁর মাথায় ঢুকিয়েছিল। বলা বাহুল্য, যে যোগাযোগেই হোক এই ছেলেটা বেঁচেছে, অন্যথায় এ কাহিনীর সূত্রপাত হত না।

কুঞ্জলাল কলকাতায় ম্যাট্রিক পাস করার পর তার বাবা তাকে কারবারে নিয়ে লাগাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভয়ে ভয়ে, কারণ তখনো ফাঁড়ার ভয় একেবারে কাটেনি। আই-এ পাস করার পর ছেলেকে নিয়ে যাবার আগ্রহ আর একটু বেড়েছিল, কিন্তু মাসি দেননি। বি-এ পাস করার পর তো রীতিমত বকাবকি করেছিলেন, ছেলের এত বিদ্যে তাঁর অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। কিন্তু ছেলে নিজেই তখন বেঁকে বসেছে—এম-এ সে পড়বেই। তারপর এই দুই বছরের মধ্যে তাকে নিয়ে যাওয়া দূরে থাক, সত্রাসে লক্ষ্ণৌ থেকে তাঁকেই বার কয়েক কলকাতায় ছুটে আসতে হয়েছে।

একবার যখন রত্না বোসকে সপ্তাহে সাতদিন,মাসে তিরিশ দিন কুঞ্জলাল মাসির গাড়িতে চড়াতে শুরু করেছিল। মাসির ছোট গাড়িটা সর্বক্ষণ তারই হেপাজতে থাকত।

সে গাড়িতে আমরাও হামেশা চড়তাম, কিন্তু সেটা তেমন কারো চোখে পড়ত না। বত্না বোস চড়লে পড়ত। বেগতিক দেখে মাসি বাপকে খবর দিয়েছিলেন। বাপ রাশভারি লোক, বিচক্ষণ, গম্ভীর প্রকৃতির। অন্যান্য সকলের দেখাদেখি ছেলেও তাকে কম সমীহ করে না। কিন্তু সেই নতুন বয়সের রোমান্সের জট ছাড়াতে ভদ্রলোকটিকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। শেষে মেয়ের বাপের শরণাপন্ন হতে হয়েছিল তাঁকে। মেয়ের বাপেরও অবস্থা ভালো, কিন্তু কুঞ্জলাল যে এমন নিরেট অবাঙালী, সেটা তার বাবাকে না দেখা পর্যন্ত ভদ্রলোক অনুমান করতে পারেন নি। একমাসের মধ্যেই তিনি মেয়ের বিয়ে দিয়ে মেয়ে-জামাই দুজনকেই বিলেতের জাহাজে তুলে দিয়েছেন। মেয়ের বাবার অবস্থা যদিও ভালো, তবু এই খরচের ভারটা কুঞ্জলালের বাবা বহন করেছেন কিনা, সেই সংশয়ে অনেককে কানাকানি করতে দেখা গেছে। কুঞ্জলাল আমাদের মতই ফূর্তি করে বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়েছে, আর বিষণ্ন মুখে বিলেতগামী জাহাজ সী-অফ করেছে।

এম. এ পড়তে পড়তেই কুঞ্জলাল দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থবার প্রেমে পড়েছে। এরাও বাঙালী মেয়েই। প্রৌঢ় মানিকলালকে আরও বার কয়েক কলকাতায় ছুটোছুটি করতে হয়েছে। তবে এগুলো প্রথমবারের মত অত জোরাল প্রেম নয়। মানিকলালকে এগুলোর ধকল সামলে উঠতে খুব বেগ পেতে হয়নি। ত্যাজ্যপুত্র করার ভ্রূকুটিতেই ছেলে ঠাণ্ডা হয়েছে।

এই কুঞ্জলাল একযুগ ধরে আমার সহপাঠী। স্কুল-কলেজ বা য়ুনিভার্সিটিতে তার মার্কা-মারা সাজ-সজ্জার বদল হয়নি, জামাকাপড়ের মাপ বদলেছে শুধু। চিকনের কারুকার্য-করা পাঞ্জাবির ওপর কুর্তা চাপিয়ে আসত। আমাদের অনেকবার চিকনের জামা-টামা উপহার দিতে চেয়েছে। কিন্তু মনে মনে লোভ থাকলেও আমরা ভরসা করে সেগুলো নিতে পারিনি। বরাবর চিকন পরত বলে ওকে সকলে বলত 'চিকন-বাবু'। আমাদের কি বলবে ঠিক কি।

তাছাড়া আমাদের বেশভূষা চাল-চলনের প্রতি তির্যক দৃষ্টি হানবার মত অভিভাবক ছিলেন বাড়িতে। লুকিয়ে-চুরিয়ে রেস্টুরেন্টে খাওয়া, সিনেমা দেখা, খেলা দেখা চলতে পারে। লুকিয়ে সাজ-সজ্জা চলবে কেমন করে?

এম-এ পাস করার পর তার বাবার কবলে পড়ল কুঞ্জলাল। ওদের সতের পুরুষের মধ্যে কেউ এম-এ পাস করেনি। তাই কুঞ্জলাল তার বাপের কারবারে টিকে থাকবে এ আমরা একবারও ভাবিনি কুঞ্জলালও ভাবেনি বোধহয়। লক্ষ্ণৌতে সে একটা বড় চাকরিই বাগিয়ে বসেছিল, শুনেছিলাম। সাতদিন না যেতে চাকরি ছেড়েছিল, তাও কানে এসেছে। কুঞ্জলাল লিখেছিল, বাংলা দেশে এতকাল থাকলাম, সেখানেই মানুষ হলাম, কিন্তু চাকরি কি করে বরদাস্ত করতে হয় তাই শিখলাম না।

চিঠি-পত্রের যোগাযোগ ক্রমশ স্বাভাবিকভাবেই কমে এসেছে। তারপর স্মৃতিও মুছে গেছে। এমন কি বিশ বছরের দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর লক্ষ্ণৌ এসেও কুঞ্জলালের কথা একটি বার মনে পড়েনি।

নবাবের দেশ, ইতিহাসের দেশ, বিপর্যয়ের দেশে এসে আমি শুধু লেখার রসদ খুঁজে বেড়িয়েছি। আমি যাঁর আশ্রিত তিনি এখানকারই স্থায়ী বাসিন্দা। ভদ্রলোক ডাক্তার।

সুরসিক। সাইকেল বিক্স আর টাঙ্গায় আপদমস্তক কালো বোরখা-ঢাকা মহিলাদের প্রতি আমার একটু বিশেষ লক্ষ্য দেখে তিনি অনেকরকম ঠাট্টা-ইশারা করেছেন। এমন কি কলকাতায় আমার গৃহিণীকে সাবধান করবেন বলেও শাসিয়েছেন।

কিন্তু সত্যিই আমার রহস্যের মত লাগত। বোরখা-ঢাকা প্রায় মুখগুলোই দেখতে ইচ্ছে করত। বোরখা জিনিসটার উৎপত্তি-ব্যুৎপত্তির খবর জানি না। এককালে ওটা হয়ত নিষেধেরই নিদর্শন ছিল। কখনো-সখনো পুরুষ-সন্নিধানে আসতে হলে চোখের আঁচ ঠেকাবার উপকরণ ছিল হয়ত ওটা। কিন্তু এখন অন্তঃপুরিকাদের পুরুষের সমান তালে পথে বেরনো নৈমিত্তিক ব্যাপার। তাই ওটা আর এখন নিষেধের বস্তু মনে হয় না, অঙ্গসজ্জা বলেই মনে হয়। সহজ সান্নিধ্যেও নিজেকে আড়ালে রেখে পুরুষ-চেতনা সচেতন রাখার মত লোভনীয় অঙ্গ-সজ্জা। যা দেখলে কৌতূহল জাগে, কল্পনার জাল বুনতে ইচ্ছে করে।

সামনে দিয়ে সেদিন ঝকঝকে একটা প্রাইভেট টাঙ্গায় দুজন বোরখা-ঢাকা মহিলা যাচ্ছিলেন। এক নজর তাকালেই অভিজাত মনে হয়। আমি কত নজর তাকিয়েছিলাম বলতে পারব না। টাঙ্গা দৃষ্টির বাইরে চলে যেতে সঙ্গীকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের এই বোরখা-পরা মেয়েরা প্রায় সবাই কি অপরূপ সুন্দরী?

সঙ্গী জবাব দিলেন, সুন্দরী অনেক আছে, কিন্তু প্রায় সবাই কেন হবে? কেন বলুন তো?

—আমার তো প্রায় সকলকেই ভাবি সুন্দরী বলে মনে হয়। হাতের আর পায়ের যতটুকু দেখা যায় ফুটফুট করছে—

সঙ্গী ঠাট্টা করলেন, সকলকেই যেন চাঁদে ধোয়া, কেমন?

—তাই তো। দেখতে ইচ্ছে করে.

—আচ্ছা, আপনাকে চেষ্টা করব দু-চারটে দেখাতে। তারপর আর দেখতে ইচ্ছে করবে না—এতদিন ধরে এখানে ডাক্তারী করছি, দু-চারটে ছেড়ে দু-চারশ দেখেছি বোধহয়। প্রথম প্রথম ওই হাত দেখে আর পা দেখে আপনার মতই খুব দেখতে ইচ্ছে করত। মাথা ধরার ওষুধ নিতে এলেও, চোখ দেখা আর জিভ দেখার নাম করে কম দেখতাম না। এখন আর একটুও দেখতে ইচ্ছে করে না।

আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে হল না, বিস্ময় লক্ষ্য করেই ভদ্রলোক হা-হা করে হেসে উঠলেন।—আরে মশাই, এটা রঙের যুগ, ভুলে যান কেন? মনে রঙ এলে বাজারের রঙ ঘরে আসতে কতক্ষণ। কত সুবিধে বলুন তো, শুধু হাত দুখানা আর পা দুখানা রঙ-পালিশ করে নিলেই হল। আর নিখুঁতভাবে করতেও পারে এরা, হাত দেখলে মনে হবে চাঁপার কলি, পা দেখে ভাববেন চরণকৌমুদী।

ছন্দপতন। ডাক্তার হলেই কি এমন বেরসিক হতে হয়। আমার সৌন্দর্য কল্পনার জালটা একেবারে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। এই জাল নিয়ে এরপর কোনো সত্যিকারের সুন্দরীকেও ছেঁকে তোলা শক্ত।

এবারে কুঞ্জর কথা বলি। অর্থাৎ কুঞ্জলালের কথা। গৃহিণীর জন্য একখানা চিকন শাড়ি নিয়ে যাব বলে এক মস্ত দোকানে ঢুকে পড়েছি। মাঝে বিশটা বছরের

ব্যবধান—লক্ষ্ণৌযে এসেছি, চিকন শাড়ি কিনব বলে এসেছি—তখনো কুঞ্জলালেব কথা একটি বাব মনেও পডেনি। সামনেব গদিব বৃদ্ধটি পবম সৌজন্যে আহ্বান জানালেন, আইযে—'

ভিতবেব মস্ত ফবাসে বড কাঠেব ক্যাশ-বাক্সব সামনে বসে যে লোকটি, সেও সবিনয আপ্যাযন জানাতে গিযে মুখেব দিকে চেযে হঠাৎ থমকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও। দুজনেব এই থমকানি থেকেই সংশয দূব হযে গেল। কুঞ্জলাল ক্যাশ-বাক্স টপকে দুহাতে আমাকে জাপটে ধবে দু-চাব ঝাঁকানিব পবেই এমন একটা কাণ্ড কবে বসল, যা দেখে দোকানেব কর্মচাবীবা আব অন্যান্য ক্রেতাবা হা। আমাব শবীবেব ভাবও নেহাত কম নয, ফলে আমাকে নিযে ফবাসেব উপবেই একপ্রস্থ গডাগডি। পবে দম নিতে নিতে বলল, তুই একটা ইডিযট, তুই একটা বাবিশ, কতকাল পবে দেখলাম বে তোকে। তুই একটা জেম। পাকাপোক্ত লেখক বনে গেছিস একেবাবে—অ্যাঁ? ...চোখ পাকাল, তোব বইযেব বিজ্ঞাপন দেখলেই আমি কিনে ফেলি সে-খবব বাখিস? থাকিস কোন চুলোয? প্রথম বই পডে দশ বছব আগে একটা চিঠি লিখেছিলাম —নো বিপ্লাই। উঃ, তোকে এখন খুন কবতে ইচ্ছে কবছে আমাব—

সকলেব অগোচবে তাব হাতেব কাছ থেকে একটু সবে বসে হাসতে লাগলাম। কর্মচাবীবা বা ক্রেতাবা বাংলা না বুঝলেও উচ্ছ্বাস বুঝল। সামনেব বৃদ্ধটি ঘাড ফিবিযে দেখছেন আব হাসছেন মিটিমিটি। কুঞ্জলালেব বাবা মানিকলাল নন, তাঁকে আমি কলকাতায দেখেছি।

আজকেব মত কুঞ্জলালেব দোকানে বসা হযে গেল—আমাব চিকন শাড়ি কেনাও। আমাকে নিযে উঠে পডল। বৃদ্ধটিকে বলল, কাকাজী, আমাব পুবনো বন্ধু এসেছে —একসঙ্গে দশ বছব পডেছি আমবা—আমি এখন দোকানে থাকছি না।

তাবপব কযেকটা দিন কুঞ্জলালেব সঙ্গেই বেশিব ভাগ সময কেটেছে। কুঞ্জলাল বিযে-থা কবেছে, ছেলেপুলে আছে। না, বাঙালী মেযে নয, স্বজাতিকেই বিযে কবেছে। তাব বাবা বছব তিন-চাব হল মাবা গেছেন। এতবড কাববাবেব সে-ই মালিক এখন।

এই সাক্ষাতেব ফলে আমাব কলকাতায ফেবাই দিন কতক পিছিযে গেল। সকালেব দিকে তাব আডতে বসে কথাবার্তা গল্প-গুজব হয। মস্ত আডত। চিকনেব কাবিগববা সব এখানেই আসে। পাবিশ্রমিক নেয, অর্ডাব-পত্র নেয। মেযে-পুরুষ দুই বকমেব কাবিগবই আছে। এব মধ্যে বর্ষীযসী কযেকটি বমণীব বোবখাব সামনেব দিকটা ঘোমটাব মত কবে তোলা। অল্পবযস্কা আপাদ-মস্তক বোবখা-ঢাকা কযেকটি মেযেকেও দেখলাম। কাবো হাত-পা তেমনি ফুটফুটে ফর্সা। কিন্তু ডাক্তাব বন্ধু আমাব রূপাভিসাব কল্পনাব ঝোঁকটা বিধ্বস্ত কবে দিযেছেন। এদেব হাত-পাযেব দিকে চেযে আমি এখন উল্টে আসল বঙ আবিষ্কাব কবতে চেষ্টা কবি।

কাবিগবদেব কাছে কুঞ্জলাল মনিব কডা দেখলাম। কাজ মনেব মত না হলে রূঢ কথা মুখে আটকায না—তা সে মেযে হোক, বা পুরুষ হোক। তবে কাজেব হাত যাদেব ভালো, তাদেব সে অবজ্ঞা কবে বলে মনে হল না। কিন্তু অন্যেবা তটস্থ তাব সামনে।

সেদিনও তাব আডতে এসে দেখি, বোবখা-পবা একটি মেযে বসে। আগেও দেখেছি, কিন্তু দেখাব মত নয। অর্থাৎ, হাত আব পা শ্যামবর্ণ। তবে বেশ স্বাস্থ্যবতী মনে হয। মেযেটি স্থিব বসে আছে, আব কুঞ্জলাল তাব সামনে ঝুঁকে বসে সাগ্রহে কতকগুলো অর্ডাব বুঝিযে দিচ্ছে। বাজা-মহাবাজাব ঘবেব অর্ডাব, এব দাযদাযিত্ব এবং মুনাফা, সবই বেশি।

মেযেটি মাঝে মাঝে সায দিযে অস্ফুট স্ববে বলছে, জী—।

অর্থাৎ, যা তাকে বোঝানো হচ্ছে, সে বুঝতে পাবছে। কিন্তু ওইটুকু থেকেই মেযেটিব কণ্ঠস্বব ভাবি মিষ্টি মনে হল আমাব। অর্ডাবগুলো গুছিযে নিযে আমাদেব দুজনেব উদ্দেশ্যেই বিনীত অভিবাদন জানিযে মেযেটি শান্ত পাযে নিষ্ক্রান্ত হযে গেল।

কোনো কাবিগবেব প্রতি কুঞ্জলালেব এতটা সম্ভ্রমপূর্ণ মিষ্টি ব্যবহাব আব দেখিনি। মেযেটি চলে যাবাব পবেও কুঞ্জলালকে বেশ অন্যমনস্ক দেখাল যেন। একটু বাদে আমাকে বলল, এই মেযেটি আমাব কাববাবেব সব থেকে সেবা কাবিগব, মাস গেলে কম কবে পাচ-ছ'শ' টাকা বোজগাব কবে। সী ইজ এ স্কীল আর্টিস্ট।

এত ভালোব কদব হতেই পাবে। কিন্তু কুঞ্জলালেব হাব-ভাব আমাব কেমন যেন লাগল—এব সবটুকুই ব্যবসাযসুলভ মনে হচ্ছে না। প্রশংসাটুকু একটু যেন আবেগ-মেশান। অথচ মেযেটি তো চোখে পডা বা মনে ধবাব মত কিছু নয। তাব ওই হাত আব পাযেব আভাসেব ওপব সাদাটে গোলাপী বঙ চডালে ববং চোখে অন্য বকম লাগতে পাবত।

কি মনে হতে কুঞ্জলাল নডেচডে সোজা হযে বসল। সাগ্রহে বলল, তুই তো লেখক বনে গেছিস—একটা গল্প শুনবি? এ লাইফ?

আমি শঙ্কা বোধ কবলাম। কুঞ্জলাল বিযে কবেছে, ছেলেপুলেব বাপ, বযেস চল্লিশ পেবিযে গেছে—কিন্তু যুনিভার্সিটিব সেই বোগ এখনও আছে নাকি।

কুঞ্জলাল আমাব মুখেব দিকে চেযেই মনেব কথাটা বুঝল বোধহয। বলল, তুমি যা ভাবছ বন্ধু, তা নয—মেযেটিকে আমি আজ পর্যন্ত চোখেও দেখিনি।

কুঞ্জলাল গল্প শুনিযেছে। গল্পটা ভোলা সম্ভব নয। শোনাব পব মনে হযেছে, না শুনলে লক্ষ্ণৌ আসা আমাব ব্যর্থ হত।

বাপ বেঁচে থাকতেই কুঞ্জলাল কাববাবেব সমস্ত ভাব নিজে নিযেছিল। বাপ মানিকলাল প্রাযই অসুস্থ হযে পডছিলেন। কুঞ্জলাল আব ওই কাকাজীকে কাববাব দেখতে হত। কুঞ্জলালেব আমলে কাববাবেব অনেক উন্নতিও হযেছে। সেই সময ওই মেযেটি কিছুদিন হয কাজে লেগেছে। নাম রুমাবাঈ। পবিষ্কাব পবিচ্ছন্ন হাতেব কাজ, কথামত কাজ দিযে যায—একটা দিনেব জন্যেও কথাব খেলাপ কবে না। কুঞ্জলালেব তখন কাববাব ফাঁপানোব নেশা, যে ভালো কাজ কববে, যাব কাজ দেখে ক্রেতা মুগ্ধ হবে, তাকে দ্বিগুণ পাবিশ্রমিক দিতে, বা দ্বিগুণ কাজ দিতে তাব আপত্তি নেই। দেখতে দেখতে রুমাবাঈযেব বোজগাব সকলকে ছাডিযে গেল। সব থেকে সেবা অর্ডাব নেবাব জন্য তাবই ডাক পডে।

অন্যান্য কাবিগববা ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল ক্রমশ। তাদেব মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিতে লাগল একটু একটু কবে। একটু আধটু বটনা শোনা যেতে লাগল। ব্যাপাবটা

কাকাজীব চোখেও ঘোবালো ঠেকল কেমন। মেয়েটি রূপসী মনে হলে আগেই সন্দেহ হত তাঁব, আগেই উতলা হতেন। কিন্তু বটনা কানে আসতে আব স্থিব থাকতে পাবলেন না তিনি। ভাইপোব কলকাতাব কাণ্ডকাবখানা ভালোই জানেন। রূপ থাক আব না থাক, কে কোথায মজে ঠিক কি। মেয়েটিব হাতেব কাজ ভালো তিনিও স্বীকাব কবেন, কিন্তু বিপদেব সম্ভাবনাটাই আবো বড কবে দেখলেন তিনি। শুধু কাজ ভালো হলেই এত কদব হয না—ভালো কাজ কবে এমন বযস্ক অভিজ্ঞ কাবিগবও তো আছে।

ব্যাপাবটা অগ্রজ, অর্থাৎ মানিকলালকে জানানো কর্তব্য বোধ কবলেন তিনি। জানালেন। শুনেই মানিকলাল ত্রাসে অস্থিব। ছেলেব বিযে-থা দিযে তাব নতুন বযসেব বোগটাব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন তিনি। সেইদিনই রুমাবাঈকে আডতে ডেকে পাঠালেন। শুধু কাকাজী আছেন তাঁব সঙ্গে, আব কেউ না।

রুমাবাঈ এল। হিসেব-পত্র কবাই ছিল। মানিকলাল তাব পাওনা-গণ্ডা মিটিযে দিলেন। বললেন, তোমাকে আব প্রযোজন নেই, আব এস না।

রুমাবাঈ স্থিব পাথবেব মত বসে বইল কিছুক্ষণ। মুখ না দেখা গেলেও মুখেব অবস্থা অনুমান কবা কঠিন নয। তাবপব আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা কবল, মালিক কি আমাব কাজে কোনো গাফিলতি পেযেছেন?

মানিকলাল বললেন, না, আমাব আব দবকাব নেই।

নবম অথচ স্পষ্ট কবে রুমাবাঈ বলল, কিন্তু আমাব যে বড দবকাব মালিক। হঠাৎ এভাবে কাজ বন্ধ কবে দিলে বড অসুবিধেয পডব—মালিক দযা কবে আব ক'টা দিন সময দিলে—

মানিকলালেব মেজাজ চডেছে। সাফ জবাব দিলেন, আব একদিনও না, অন্য জাযগায কাজ দেখে নাও গে যাও।

কিন্তু রুমাবাঈ উঠল না। তেমনি সবিনযে বলল, মালিক যে কাবণে আমাকে তাডাতে চাইছেন সেটা একেবাবে মিথ্যে। ছোট মালিক কাজ বোঝেন, কাজেব সমঝদাব তিনি, কাজ দেখে খুশী হযেছিলেন বলে আমাব নসীব ফিবেছিল। তিনি শুধু কাজই দেখেছেন, আমাকে কখনও দেখেন নি।

শোনামাত্র মাথায বক্ত চডেছিল মানিকলালেব। তিনি চেঁচিযে উঠেছেন, কি সত্য আব কি মিথ্যে, কে তোমাব কাছে শুনতে চেযেছে? ছোট মালিক কি দেখেছে না দেখেছে কে তোমাব কাছে জানতে চেযেছে? ছোট মালিকেব নাম কে তোমাকে তুলতে বলেছে এখানে? তোমাকে আমাব দবকাব নেই, তুমি চলে যাও, বাস।

কিন্তু রুমাবাঈ তবু গেল না। নিশ্চল মূর্তিব মত আবো খানিকক্ষণ বসেই বইল। তাবপব তেমনি নম্র অথচ দ্বিধাশূন্য স্পষ্ট গলায বলল, মালিক কেন আমাকে তাডাচ্ছেন, আমি তা জানি। ওদেব হিংসা আমিও দেখছি। বটনা যে একটুও সত্যি নয, আমি যদি তাব প্রমাণ দিতে পাবি, তাহলেও কি মালিক আমাকে বাখতে আপত্তি কববেন?

ওই কথা ক'টি, কণ্ঠস্বব, আব আচবণেব মধ্যেও কিছু বোধহয ছিল। কাকাজী বোবাব মত দাঁডিযে। আব মানিকলালও কৌতূহলে থমকালেন ঈষৎ।

—কি প্রমাণ দেবে?

প্রমাণ রুমাবাঈ মুখে কিছু দিল না। আস্তে আস্তে ঘন কালো বোবখাটা খুলে ফেলল শুধু। খুলে সেটা সবিযে বাখল। তাবপব মানিকলালেব দিকে দুচোখ মেলে তাকাল শুধু।

এতবড বিস্ময কাকাজী আব মানিকলালেব জীবনে এই প্রথম।

কাকে দেখছেন তাঁবা কিছুই বুঝছেন না। রূপসাধক কোনো শিল্পীব আঁকা যেন —নাক-মুখ-চোখ—সমস্ত নাবী-অঙ্গ। জ্যোৎস্নাধোযা ধপধপে গাযেব বঙ। শুধু হাতেব খানিকটা আব পাযেব খানিকটা কালো বঙ কবা—বোবখা পবা থাকলে যতটুকুব আভাস পাওযা সম্ভব ততটুকু।

মানিকলাল আব কাকাজীব চোখে পলক পডে না, মুখে কথা সবে না।

রুমাবাঈ তেমনি শান্ত মুখে বলে গেল, যে সন্দেহ কবে মালিক আমাকে তাডাতে চাইছেন, তা সত্যি হলে টাকাব জন্যে এ-পথে আসাব দবকাব হত না বোধহয—মেহনতী কাজ কবতে হত না। তা চাই না বলে হাতে-পাযে কালো বঙ মেখে সকলেব চোখ থেকে নিজেকে আডালে বেখে সম্মানেব উপার্জনে লেগেছি।

দু-চাব কথায এবপব পিতৃসদৃশ মানিকলাল আব কাকাজীব কাছে নিজেব দুর্ভাগ্যেব কথা বলেছে সে। এই রূপই তাব জীবনেব সবথেকে বড অভিশাপ, দুষ্ট লোকে তাব নামে কলঙ্ক দিযে তাব স্বামী কেডে নিযেছে—একটি ছেলে নিযে তাকে পথে দাঁডাতে হযেছে। সেই ছেলেটিই এখন প্রাণ তাব। তাকে সে মানুষ কবছে, ভালো জাযগায বেখে পডাচ্ছে। তাকে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ কবলে সেই ছেলে বড হবে কি কবে, মানুষ হবে কি কবে? মালিক যেন দযা কবে কাজ থেকে না ছাডান তাকে, ছোট মালিক কোনোদিন তাব মুখ দেখেন নি, কোনোদিন দেখবেনও না।

কাকাজীব কাছে কুঞ্জলাল এ-সব শুনেছে বাবাব মৃত্যুবও অনেক পবে। শুনেছিল, কাবণ কুঞ্জলালই একবাব তাকে কাজ থেকে জবাব দেবে স্থিব কবেছিল। যে মেযেব কাজে কখনো কোনো ত্রুটি দেখেনি, তাবই কাজে পব পব অনেকদিন গাফিলতি দেখেছে। সময়ে কাজ নেযনি, সমযে কাজ দেযনি, যাও দিযেছে তাও মনোমত হয নি। কুঞ্জলাল ভেবেছিল, বোজগাবেব দেমাকে এই অধঃপতন। তাব ওপব একটা বড কাজেব জন্য দু তিনবাব তাব কাছে কর্মচাবী পাঠাতে সে বলে পাঠিযেছিল, এখন অসুবিধেব মধ্যে আছে ভাবি কাজ নেওযা এ সমযে তাব পক্ষে সম্ভব নয।

কুঞ্জলাল তেতে ছিল, এইবাব আগুন হযে উঠল। তাছাডা মেযেটাব চবিত্রেব ওপব কটাক্ষ কবাব লোকও সর্বদাই আছে। কর্মচাবীদেব অনেকেই ঠাট্টা কবেছে, নাগব জুটেছে বোধহয, এখন ভাবি কাজ নিযে সময নষ্ট কববে কেমন কবে।

কুঞ্জলাল মেযেটিকে জবাব দেবে স্থিব কবেছে শুনে কাকাজী তাকে নিবস্ত কবতে চেষ্টা কবেছেন। বলেছেন, তাব ছেলেব খুব অসুখ—আমাকে সে জানিযেছে।

কুঞ্জলাল সে-কথা কানে তোলেনি। আবাব ছেলেও আছে শুনে মনে মনে উল্টে সে অশ্লীল কটূক্তি কবেছে। ছেলে থাকলেও সুস্থ সামাজিক সন্তান ভাবেনি। আব ছেলেব অসুখ, তাও বিশ্বাস কবেনি। সে ব্যবসাযী, ব্যবসা সব কিছুইব আগে— অসুখেব বিন্যাস শোনাব আগ্রহ তাব নেই।

এরপর রুমাবাঈ আবার একদিন কাজের জন্য আসতে সে জবাব পাঠাতে যাচ্ছিল, কাজ নেই। কিন্তু কাকাজী আবার বাধা দিয়েছেন। তাকে আড়ালে টেনে নিয়ে গিয়ে সেই একদিনের ঘটনা বলেছেন। শুনে কুঞ্জলাল কতক্ষণ স্থাণুর মত বসেছিল, ঠিক নেই। ইতিমধ্যে কাকাজী রুমাবাঈকে পরদিন আড়তে এসে মালিকের সঙ্গে দেখা করে কাজ নিয়ে যেতে বলে দিয়েছেন।

রুমাবাঈ এসেছিল। কুঞ্জলাল প্রথমেই ছেলে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করেছে। জবাব দেবার আগে রুমাবাঈ চুপ করে বসেছিল খানিক। ছেলের অসুখের খবরটা সে একমাত্র কাকাজীকেই গোপনে দিয়েছিল। অস্ফুট শান্ত জবাব দিয়েছে, মালিকের আশীর্বাদে ভালো আছে।

কুঞ্জলাল আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেনি। চুপচাপ চেয়ে চেয়ে সেই কালো বোরখা আর কালো হাত-পা দেখেছিল। তারপর নিঃশব্দে কাজ এগিয়ে দিয়েছে।

রুমাবাঈয়ের এই কালো বোরখা যেন স্পষ্ট নিষেধ। কিন্তু নিষেধ মানতে চায়নি কুঞ্জলাল। একদিন ওই বোরখা সরাবার জন্য অনুনয় করেছিল। কাকাজীর কাছে সব শুনেছে জানিয়ে একটিবার মাত্র তাকে দেখতে চেয়েছিল।

কিন্তু ঘন-কালো বোরখার আড়ালে নিষ্প্রাণ মূর্তির মতই বুঝি বসেছিল রুমাবাঈ। তারপর খুব নরম করে আস্তে আস্তে বলেছে, কথা দিয়ে সে কখনো কথার খেলাপ করেনি—বড় মালিককে সে কথা দিয়েছিল। ছোট মালিককে সে শ্রদ্ধা করে, তিনি যদি চান সে বোরখা সরাবে। কিন্তু তাহলে আর তার কোনোদিন এখানে কাজ নিতে আসা হবে না।

কুঞ্জলাল তা চায় নি।

আরোগ্য

ব্যবস্থা দেখে রাধারাণী খুশী।

জীবন এখানে যত্নের জিনিস, লালনের সামগ্রী। পায়ে পায়ে ক্ষয়ের খোড়ল হাঁ করে নেই। এখানে শুধু জীবনের মূল্যবোধটুকুই স্পষ্ট। চারদিক শুচিশুভ্র আরাম দিয়ে ঘেরা। বেশ ঠাণ্ডা নিরাপদ আরাম।

ঘরের দুই কোণে দুটো তকতকে বেড। এর অর্ধেকেরও অনেক ছোট ঘরে চারজনে থেকে অভ্যস্ত তাঁরা, ওইটুকুর মধ্যেই একটা গোটা সংসার। বিবাহিত জীবনের বাইশ বছরের মধ্যে এই প্রথম যেন নতুন বাতাসের স্বাদ পেলেন রাধারাণী। বাঁচার আগ্রহ বোধ করতে লাগলেন, মনের তলায় এক ধরনের উৎসাহ উকিঝুঁকি দিতে লাগল।

দিনে ছ' টাকা চার্জ। তাও ভূতনাথবাবু ওপর-ওলাদের ধরে পড়ে অর্ধেক দক্ষিণায় রাজী করাতে পেরেছেন বলে। নইলে চার্জ বারো টাকা। কিন্তু দিনে ছ' টাকাই রাধারাণীর কাছে আঁতকে ওঠার মত—মাসে একশ' আশী টাকা। তার ওপর ওষুধ-পত্র ফল-

টলে মাসে কম কবে আবো পঞ্চাশ টাকাব ধাক্কা—হল দু'শ' তিবিশ। শুনেই বাধাবাণী বিগড়ে গিয়েছিলেন। ক'মাস থাকতে হবে কে জানে...। কিন্তু তিনি নিশ্চিত নাগালেব বাইবে চলে যাচ্ছেন দেখেই মুখ কালো কবে ভূতনাথবাবু সবাসবি তাঁকে এখানে এনে ফেলেছেন। বাধাবাণী সাহস কবে আব আপত্তি কবতে পাবেন নি। মুখ খুললেই কুরুক্ষেত্র বাধবে জানেন, তখন আব ভদ্রলোক বোগিণী বলে বেহাই দেবেন না ওঁকে। ছেলেমেযেব সামনেও এমন কথা বলে বসেন যে চামডাব নিচে হাড-পাঁজবসুদ্ধ খটখটিযে ওঠে। কিন্তু এখানে জীবন-বক্ষাব উপকবণ দেখে বাধাবাণীব মনে হল তাঁদেব নেই—নইলে, এব তুলনায দিনে ছ' টাকা ছেড়ে বাবো টাকাও কিছু নয।

ও পাশেব বেডে যে মেযেটি থাকে তাব বছব তিবিশ বযেস। কিন্তু এবই মধ্যে কঠিন বোগ বাধিযে বসেছে। পেটে জল হযেছে নাকি। দেখতে বেশ সুশ্রী। কিন্তু বড বেশি বকম অবুঝপনা আব বাযনাক্কা। বোজ চাবটে বাজতে না বাজতে মেযেটিব স্বামী দেখতে আসে ওকে—কালো মোটাসোটা. বছব চল্লিশ হবে বযেস। সচ্ছল অবস্থা বোঝা যায। বাধাবাণী শুনেছেন কাগজেব কাববাব তাদেব। লোকটি বোজই কিছু না কিছু হাতে কবে নিযে আসে। দুর্মূল্যেব ফল, দামী দামী টনিক ফুড, গল্পেব বই, শখেব ব্লাউস, রুমাল, এমনকি গযনাও। বাধাবাণী দূব থেকে লক্ষ্য কবেন. কিছুতে যেন মন ওঠে না মেযেটাব—কোনো কিছুতেই তুষ্ট নয। লোকটি ঘডি ধবে পুবো দু'ঘণ্টাই বসে থাকে তাব শয্যাব পাশে, স্ত্রীব সব কথাতেই সায দেয, সব আক্ষেপে সান্ত্বনা দেয। দু-তিনদিন অন্তব বছব আটেকেব একটি ছেলেও আসে বাপেব সঙ্গে মাকে দেখতে। বাধাবাণী শুনেছেন, ওই একটিই ছেলে ওদেব, পুবনো ঝিযেব জিম্মায থাকে, বাড়িতে আব দ্বিতীয কেউ নেই।

বাধাবাণী অবাক হযে ভাবেন. ছেলেটা বোজ আসে না কেন, আব ওই মা-ই বা ছেলেকে বোজ না দেখে থাকে কি কবে। ওদিকে স্বামীটিব আসতে আধ মিনিট দেবি হলে আধঘণ্টা তাব জেব চলতে দেখেছেন বাধাবাণী। অনেক অনুনয অজুহাত সাধ্য-সাধনাযও সহজে মন গলে না। বাধাবাণীব এক একসময বাগই হয মেযেটাব ওপব, অত পায বলেই পাওযাব ওপব এতটুকু শ্রদ্ধা নেই। হত তাঁব ঘবেব লোকটিব মত, এক দাবডানিতে সব ঠাণ্ডা।

যাই হোক, এখানকাব এত সব সুব্যবস্থাব মধ্যে এসে পডেও বাধাবাণীব মনেব তলায কোথায যেন যাতনাব মত একটু। দু-বেলা খাবাব সময মন বেশ খাবাপ হয। দীর্ঘকালেব বক্তাল্পতাব বোগী তিনি, হাসপাতালেব নির্দেশ অনুযাযী আহাবেব বাজসিক ব্যবস্থা। মাছ-মাংসব ছড়াছড়ি। বাধাবাণী অর্ধেকও খেযে উঠতে পাবেন না। এমনি একটুকবো মাছ বাড়িসুদ্ধ লোকেব একবেলাব ববাদ্দ। এখন খবচেব ধাক্কায়ঃতাও জুটছে না নিশ্চয। মেযেটা কলেজেব আগে ছেলেটাকে সমযমত দুটো ভাত ফুটিযে দিতে পাবে কিনা তাই সন্দেহ। তাব ওপব উঠতে বসতে বাপেব বকুনি তো আছেই—বকুনিব চোটেই এখন সাবা হল বোধ হয দুটোতে।

সঙ্গে সঙ্গে সামনেব বেডেব মেযেটিব কথা মনে হয, আব তাব স্বামীব কথা। অবশ্য সাত তাডাব মধ্যেও ভূতনাথবাবু প্রায বোজই একবাব কবে দেখে যান তাঁকে।

দবকাবী ওষুধ-পত্র সবই কিনে দেন, তাঁবও মিটসেফে ফলমূল থাকে কিছু। কিন্তু সে-সবই কিসেব বিনিময়ে আসছে সেটা রুক্ষ মূর্তিটিব দিকে একবাব তাকালেই বোঝা যায়। ভিতবে ভিতবে গুমবে ওঠেন বাধাবাণী, এতবড অসুস্থতাব চিন্তাটাও মানুষটাব সব থেকে বড চিন্তা নয় যেন, এখানে এসেও দু-দণ্ড হাসিমুখে কথা বলাব নাম নেই। ফলে মেজাজ সব দিন বাধাবাণীবও ঠিক থাকে না, এক কথায় তিন কথা শুনিয়ে দেন। বিশেষ কবে ওই বেডেব মেয়েটিব স্বামীটিকে দেখে দেখে তাঁব সহিষ্ণুতা কমেছে। অন্যেব ঘবে কি, আব তাঁব ঘবেই বা কি...।

সেদিন ভূতনাথবাবু আসতে ইঙ্গিতে বাধাবাণী ওই মেয়েটিকে দেখিয়ে কথায় কথায় বললেন, কাল সবস্বতীপূজো উপলক্ষে ওব স্বামী ওকে চমৎকাব একজোডা ফবাসডাঙাব শাডি এনে দিয়েছে—আমাকে আবাব ডেকে দেখাল।...ভদ্রলোক কত তোযাজে বেখেছে মেয়েটাকে, বাধাবাণী সেই গল্পও কবলেন।

ভূতনাথবাবু হঠাৎ রুক্ষ বিবক্তিতে বলে উঠলেন, আমাব তো সাধ্য নেই তোমাকে এখন ফবাসডাঙাব শাডি এনে দিই—এইতেই তো শেষ হয়ে গেলাম।

শুনে বাধাবাণী গুম হয়ে বসে বইলেন। তিনি শাডি চাননি। ওই বকম মনটি চেয়েছিলেন। ওই বকম অনুবাগটুকুই লোভনীয় ছিল।

এক মাসেব মাথায়, এই ঘবে একটি মর্মান্তিক ব্যাপাব ঘটল।

ওই মেয়েটাব স্বামী দু'ঘণ্টাব জায়গায় চাব-ঘণ্টা ছ'-ঘণ্টা কাটিয়ে যেতে লাগল। শেষ অবস্থা বলেই অনুমতি মিলেছে বোধ হয়।

সেদিন দুপুব থেকেই অক্সিজেন চলছে।

বাধাবাণীব বুকেব ভিতবটা সাবাক্ষণ কাঁপছে থবথব কবে। ওই মেয়েটাব ভাগ্যব ওপব চোখ দিয়েছিলেন বলে ভিতবে-ভিতবে অপবিসীম যাতনা একটা। দুপুবে খুব কেঁদেছেনও, আব প্রার্থনা কবেছেন, ঠাকুব ওকে বাঁচিয়ে দিও।

সন্ধ্যে থেকে তাব স্বামী নিজেই অক্সিজেন ধবে বসে আছে। শান্ত বিষণ্ণ মূর্তি। বাধাবাণীব সেদিকে তাকাতেও কষ্ট।...একসময় দেখলেন, লোকটি অক্সিজেনেব নল বেখে আস্তে আস্তে উঠে দাঁডাল। চুপচাপ স্ত্রীব মুখেব দিকে চেয়ে বইল খানিক। তাবপব বুকেব কাছে মুখেব কাছে ঝুঁকে পডল।

বাধাবাণী চমকে উঠলেন। বুকেব ওপব ভেঙে পডবে নাকি—এখনো যে শেষ হয় নি। অবশ্য শেষ হতে বাকিও নেই...কিন্তু লোকটা কবছে কি।

বাধাবাণী হঠাৎ নিস্পন্দ কাঠ একেবাবে।

লোকটি মেয়েটিব গলাব হাব, কানেব দুল, হাতেব চুডি, বালা, আঙটি, সব একে একে খুলে পকেটে ফেলল। তাবপব চুপচাপ দাঁডিয়ে বইল।

আধঘণ্টাব মধ্যে সব শেষ। ডাক্তাব মাথা নেডে চলে গেলেন।

বাধাবাণীব বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত তখনো। চেয়ে আছেন বিস্ফাবিত নেত্রে। দেখছেন।

...লোকটি শান্ত মুখে একটা ঝোলাব মধ্যে স্ত্রীব শাডি ক'টা নিল, মিটসেফ খুলে নিজেব আনা বোতলেব খাবাব আব টনিকগুলো দেখে দেখে পুবল, তাবপব ভালো কবে স্ত্রীকে আব একবাব দেখে নিয়ে শ্রান্ত পায়ে ঘব থেকে বেবিয়ে গেল।

রাধারাণী চিত্রার্পিত।

ছেলে এবং লোকজন নিয়ে লোকটি ফিরল প্রায় ঘণ্টা দুই বাদে। বারান্দায় খাটিয়া পাতা—ওখান থেকেই শ্মশান-যাত্রা।

এই একমাসে শরীরের আশাতিরিক্ত উন্নতি হয়েছিল রাধারাণীর। কিন্তু এর পরের তিনদিনের মধ্যেই অনেকটা খারাপ হয়ে গেল। রাতে ঘুম নেই, চোখ বসা, আহারে রুচি নেই, হজমে গোলমাল। দিনরাত গুম হয়ে ভাবেন কি যেন। ছেলে আসে, মেয়ে আসে, ভূতনাথবাবু আসেন—রাধারাণী ভালো করে কথাও বলেন না কারো সঙ্গেই। সকলেই চিন্তিত।

সেদিন সকালে ছেলে একটা ওষুধ দিয়ে যেতে এসেছিল। রাধারাণী তার হাতে খুব যত্ন করে বাঁধা একটা পুঁটলি দিয়ে বললেন সাবধানে নিয়ে দিদির হাতে দিবি, ওনার বড় ট্রাঙ্কের একেবারে তলায় রেখে দেয় যেন।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হতভম্ব মুখে মেয়ে এসে হাজির। এক নজরে দেখে নিল মায়ের হাতে শুধু দুগাছা শাঁখা আর একটা লোহা।

—ওগুলো সব খুলে পাঠালে কেন মা?

রাধারাণী নিস্পৃহ মুখে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন—তুলে রেখেছিস?

—না, চাবি তো বাবার কাছে, বাবা বাড়ি নেই, তুমি—

—বাড়ি নেই তো তুই ওগুলো কার কাছে রেখে এলি? ভয়ানক রেগে গেলেন রাধারাণী, কে তোকে এখানে আসতে বলেছে এখন?

—কিন্তু তুমি হঠাৎ ওগুলো সব খুলে পাঠালে কেন?

—পাঠিয়েছি, আমি মরলে ওগুলো তোদের কাজে লাগবে বলে, সবেতে তোর বাড়াবাড়ি—যা শীগগির।...খানিক বাদে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বললেন, শরীরের যা অবস্থা, এখানে এ-সব পরে থাকা ঠিক নয়—শেষে হয়ত এটুকুও যাবে তোদের।

মেয়ে কাঁদ কাদ মুখে উঠে চলে গেল।

রাধারাণীর গত তিনদিনের জ্বালা একটু জুড়োল যেন। টাকাওয়ালা লোকেরই স্ত্রীর প্রতি যে দরদ দেখেছেন..নিজেদের তো প্রতি পয়সার হিসেব। তার অন্তিম শয্যায় কেউ তাঁর গায়ের গয়নার কথা ভাবছে সে-দৃশ্য কল্পনা করেও রাধারাণী বারবার শিউরে উঠেছেন।

সেই পুঁটলি হাতে মেয়ে কাঁদ কাঁদ মুখ করেই বিকেলে ফিরল আবার। রাধারাণী সমাচার শুনলেন।...ছেলে বাপের হাতে পুঁটলিটা দিয়েছিল, আর মেয়েকে বলতে হয়েছিল মায়ের অবুঝপনার কথা। শুনে উনি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়েছিলেন খানিকক্ষণ, তারপর আচমকা এক চড়ে ছেলের গালে পাঁচটা আঙুলই বসিয়ে দিয়েছেন, গয়নাগুলো ছুঁড়ে উঠোনে ফেলে দিয়েছেন, তারপর না খেয়ে অফিসে চলে গেছেন।

প্রত্যেকটা খবরই রেগে ওঠার মত। রাধারাণী রাগতে চেষ্টাও করলেন। কিন্তু রাগটা তেমন হল না।

সেদিন আর ভূতনাথবাবু তাঁকে দেখতে এলেন না। তার পরদিনও না।

তার পরদিন এলেন।

গয়না ক'টা রাধারাণী আবার পরেছেন। একখানা মোটামুটি ভালো শাড়িও পরেছেন। একটু বোধ হয় প্রসাধনও করেছেন। শয্যায় বসেছিলেন, বললেন, বোসো—

ভূতনাথবাবু টুলটা টেনে বসলেন। তারপর চুপচাপ চেয়ে রইলেন।

কোটরগত চকচকে দুটো অনুযোগ-ভরা চোখ, হাড় বার-করা চোয়াল, আর শুকনো কালচে মুখের দিকে চেয়ে রাধারাণীর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল কেমন। সব সময় এই ক্ষয়ের জ্যোতি পোড়া চোখে পড়েও পড়ে না। বিনা ভনিতায় বললেন, আর কতকাল পড়ে থাকব এখানে, সেরেই তো উঠেছি, ডাক্তারকে বল, বাকি চিকিৎসা বাড়িতেই হতে পারবে—আর ভালো লাগছে না।

ভূতনাথবাবু চেয়েই আছেন।

কি কারণে মিট-সেফটাই একবার খুলে দেখা দরকার হয়ে পড়ল রাধারাণীর। তাড়াতাড়ি ঘুরে বসে ঝুঁকে সেদিকে হাত বাড়ালেন।

রূপসী বাংলার মুখ

মেয়েটাকে চোখের ওপর বড় হতে দেখেছি। ঢলঢলে মিষ্টি মুখ। না কালো না ফর্সা। চোখ দুটো ভারী সুন্দর। না হাসলেও মনে হয় চাউনিতে একটু হাসির মায়া ছুঁয়ে আছে। নামও হাসি। ছ' মাস বয়েস হতে ওর মা মনোরমা একদিন মেয়ে কোলে আমার কাছে হাজির। মুখে চিন্তার ছায়া। বলল, আপনার ভাগ্নীর তো ছ' মাস হয়ে এলো দাদা, এ-মাসের শেষেই মুখে একটু মায়ের প্রসাদ দেব ভাবছি, কিন্তু এখনো পর্যন্ত একটা নামই ঠিক হল না—আজ আপনার কাছ থেকে ওর একটা নাম না নিয়ে নড়ছি না।

মেয়ের একটা নাম ঠিক করে দেবার তাগিদ এ পর্যন্ত ওর মা আমাকে অনেকবার দিয়েছে। তখন পর্যন্ত বাচ্চাটার বাবা ওকে আদর করে ডাকত বুচু। ওই ডাক শুনে পিত্তি জ্বলে যায় এ-ও মনোরমা নিজেই অনেকবার বলেছে। মেয়ে খাঁদা নয় বোঁচা নয় তবু বুচু বলে ডাকলে কোন মায়ের ভালো লাগে। .ভাবতে গেলে মনে হয় সেদিনের কথা, মেয়ে কোলে মায়ের আক্ষেপ, পাড়ার সকলেও এখন বুচু বুচু শুরু করেছে, শেষে ও-ই না ডাক-নাম হয়ে দাঁড়ায়। আপনি এমন একটা নাম দিন দাদা যাতে ভালো নাম ডাক-নাম দুই-ই হয়ে যায়। আমি ওকে বলে দিয়েছি, দাদা নাম ঠিক করে দিলে মেয়েকে আর কোনো নামে ডাকা চলবে না।

ওকে অর্থাৎ ওর স্বামী নয়নকে বলে দিয়েছে। ওরা বসু চৌধুরী। আমি এদের দাদা হলেও আত্মীয়তার কোনো যোগ নেই। লাগোয়া পুরনো দোতলা বাড়িটা ওদের। পৈতৃক ভিটে। দোতলার দু'খানা ঘরে ওরা থাকে। জোরে কথা কইলে বা শব্দ করে হাসলে-কাঁদলে আমাদের বাড়ির ও-মুখো ঘর থেকে শোনা যায়। একতলার ঘর দুটো পুরনো ভাড়াটের দখলে। নামমাত্র ভাড়া পায় বলে অভিযোগ আছে। কিন্তু এতকালে

তাবাও আত্মীযেব মতো হযে গেছে, তাই মুখ ফুটে কিছু বলে না বা বলতে পাবে না। ওপব-নিচেব দুই পবিবাবই নিজেদেব সুখে-দুঃখে আমাদেব আপনাব জন ভাবে।

পঁযত্রিশ বছব হযে গেল, নামেব তাগিদে ছ' মাসেব মেযে কোলে মনোবমাব সেই ঘবে এসে চডাও হওযাটা স্পষ্ট মনে আছে। যাব কোলেই হোক, ঘবে এলেই মেযেটা আমাব টেবিলেব ওপব ঝাঁপিযে পডতে চায। লেখাব কাগজ কলম বই-পত্র বহস্যজনক খেলাব কিছু ভাবে হযতো। কিন্তু মাযেব কোলে চেপে সেদিন সামনে না ঝুঁকে মুখেব দিকে চেযে ফিক-ফিক কবে হাসছিল। ও-যেন আমাব ফ্যাসাদ বুঝেই মজা পাচ্ছে।

মেযেটাব হাসি দেখেই মনে হযেছিল এই নামটা আমাব অনেক আগেই মনে আসা উচিত ছিল। একটুও না ভেবে বলেছিলাম, মেযেব নাম বাখো হাসি।

অনেকদিনেব প্রত্যাশাব পবে লেখকেব কাছ থেকে এমন সাদামাটা নাম আশা কবেনি মুখ দেখেই বোঝা গেল। বলল, শুধু হাসি

—হাসি আবাব শুধু হাসি কি, চোখ বুজে নামটা বেখে ফেলো, ও-নামেব কদব পবে বুঝবে।

মেযেটাও ও-কথাব পবেই জোবে হেসে উঠেছিল মনে আছে।

পছন্দ হোক না হোক মনোবমা মেযেব নাম হাসিই বেখেছে। আব ওব আত্মীয-পবিজন বা চেনা-জানা কাউকেই বোধহয জানাতে বাকি বাখেনি মেযেব এই নাম ওমুক দাদা· বেখেছে।

তাবপব দিনে দিনে মাসে মাসে বছবে বছবে হাসি আমাদেব চোখেব সামনে বড হযেছে। বিকেলে আব ছুটিব দিনেব দু'বেলাই ওদেব বাডিব সামনেব কাঁচা উঠোনে অন্য মেযেদেব সঙ্গে ছোটাছুটি কবে, এক্কা-দোক্কা খেলে, লাফাঝাঁপি কবে আব সমবযসী সব মেযেব ওপবেই সর্দাবি কবে। হঠাৎ হঠাৎ মুখ তুলে ওপব দিকে তাকায। ও ঠিক বুঝতে পাবে দোতলাব বেলিং-এ ভব দিযে দাঁডিযে অনেক সমযেই ওকে আমি লক্ষ্য কবি। ঝগডাঝাঁটি কবা বা সর্দাবি কবাও লক্ষ্য কবি। তখন লজ্জা পায আব খুব হাসে। সকালে স্কুল-বাসেব হর্ন শুনলেই বই-খাতাব ব্যাগ বুকে চেপে পডি-মবি কবে ছুটে আসে, আব তখনো একবাব তাকিযে দেখে দোতলাব বেলিং-এ আমি দাঁডিযে কিনা। ওব দৌলতে বাসেব মেযেবাও ওব মামাবাবুকে অর্থাৎ আমাকে চিনে গেছে, সকৌতুকে তাবাও চেযে চেযে দেখে। কোনো কাবণে পব পব দু-তিনদিন আমাকে না দেখলে হঠাৎ এক সময আমাব ঘবে এসে চডাও হয। গিন্নি গিন্নি মুখ।—বা-ব্বাঃ। এত লেখায ব্যস্ত যে ক'দিনেব মধ্যে দেখাই নেই, আমি ভাবলাম জ্বব-জ্বালা হল নাকি আবাব দেখে আসি—

সময সময় আমাবও গম্ভীব থাকাব চেষ্টা।—জ্বব জ্ববই লাগছে, দ্যাখ্ তো—

তক্ষুণি কাছে এসে কপালে হাত, বুকে হাত। তাব পবেই ঠোঁট উল্টে হাসি। —ধেৎ, পাথবেব মতো ঠাণ্ডা গা—তাছাডা জ্বব জ্বব মনে হলে কেউ পাখাব নিচে খালি গাযে বসে লেখে? আমাকে ঠকাবাব মতলব?

—আব তোব পাকামো কবতে আসাব মতলব?

তক্ষুণি হি-হি হাসি আব ছুট। ভিতবে ভিতবে আমার এই হাসি দেখাবই লোভ।

আবো একটু বড হতে বইযেব তাগিদ।—আজ ওমুক দিদিমণি তোমাব একখানা বই চেযেছে মামাবাবু, সকালে তো মাযেব জ্বালায আসাব সময পাই না, আজই দিযে বাখো।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও গম্ভীব।—বই নেই।

—বা বে, কাল একটা বই না নিযে গেলে আমাব যে মান-ইজ্জৎ থাকে না।

—কি থাকে না? আবাব বলতো?

থতমত খেযে হেসে ফেলে। একদিন প্রস্তাব কবেছিলাম, আমি ঘডি দেখছি, তুই যদি আমাব সামনে দাঁডিযে টানা দু' মিনিট হাসতে পাবিস, তাহলে একটাব বদলে দুটো বই পাবি।

শোনামাত্র সে-কি হাসি। হাসিব চোটে চোখ মুখ লাল।—তুমি কি যে বলো মামাবাবু, ঘডি ধবে কেউ হাসতে পাবে, আমি কি পাগল...। আবাব হাসি আব ছুট।

এই মেযেব নাম হাসি ছাডা আব কিছু হতে পাবে। যত দিন যায নিজেই নিজেব বিবেচনাব তাবিফ কবি।

স্কুলেব পাট শেষ হবাব আগে থেকেই হাসিব শাডি পবাব ঝোঁক। চোখেব সামনে মেযেটা এব ফলে যেন হুট কবে এক লাফে বেশ খানিকটা বড হযে গেল। স্বাস্থ্য ভালো, লম্বা গডন, শাডি পবলে হাসি-খুশি মেযেটাকে আবো সুন্দব দেখায অবশ্য। তবু বলেছিলাম দশ ক্লাশ শেষ না হতেই শাডি কেন, আবো একটা দুটো বছব ফ্রক-ট্রক চালিযে গেলেই পাবতিস। কলেজেব মেযেবাও আজকাল শাডি পবতে চায না—

হাসিব সব কথাতেই হাসি।—কত ঢ্যাঙা হযে গেছি তোমাব চোখ নেই! স্কুলেব ঢ্যাঙা মেযেবা শাডি পবে দেখে আমিও ধবে ফেললাম। তুমি আবাব মা-কে কিছু বোলো না বাপু, এমনিতেই বলে আমাব দিকে তাকালে তাব চোখে এখন কাঁটা ফোঁটে।

মাযেব চোখেব খবব ঠিক বাখি না, কিন্তু পাডাব নতুন বযসেব ছেলেগুলোব চোখেব ভাষাব কিছু তাবতম্য বুঝতে পাবি। সমযে অসমযে তাদেব অনেককেই ও-বাডিব কাছাকাছি ছোঁক-ছোঁক কবে ঘুবে বেডাতে দেখি। হাসিকে বাডি থেকে বেরুতে দেখলে বা বাডিতে ঢুকতে দেখলে কেউ চকিত হয, কেউ মুখখানা গম্ভীব কবতে চেষ্টা কবে, দুঃসাহসী দুই একজন ওকে থামিযে কিছু কথাবার্তা কইতেও চেষ্টা কবে। হাসিব কাছে ছেলেগুলোব এই আচবণ ভাবী কৌতুকেব ব্যাপাব মনে হয। কিন্তু দোতলাব বাবান্দাব দিকে তাকিযে তখন আমাকে দাঁডানো দেখলে খুব লজ্জা পায। ওব মুখেব এই লজ্জাব হাসিটুকু ঠিক ঠিক বর্ণনা কবাব মতো কলমেব জোব নেই। শুধু ভাবি মেযেটাব হাসি নাম সার্থক।

ওদেব স্কুল ফাইনাল পবীক্ষাব বেজাল্ট বেরুবাব পবে হাসি দিন কতক বাডিতেই সেঁধিযে থাকল। চাব নম্ববেব জন্য ফার্স্ট ডিভিশন হযনি। ওব মা এসে জানান দিল, বাডিতে বলছে লজ্জায মামাবাবুকে আব মুখই দেখাতে পাববে না। দিন তিনেক না

যেতে আবার ওর মায়ের মুখেই এক তাজ্জব খবর। হাসির বিয়ে। গত পরশু বিকেল সাড়ে তিনটেয় ছেলের পক্ষ এসে মেয়ে দেখে গেছে। ছেলের বাবা-মা নেই। বড় দুই দাদা, তাদের দুই বউ আর এক ছোট বোনকে নিয়ে ছেলে নিজেই হাসিকে দেখে গেছে। পছন্দ হয়েছে সেদিনই বোঝা গেছে। আজ সকালে এসে পাকা কথা দিয়ে গেছে। এটা জ্যৈষ্ঠ মাস, এই আষাঢ়েই তাদের ছেলের বিয়ে দেবার ইচ্ছে। মেয়ের মায়ের অর্থাৎ মনোরমার মাথায় এখন ভাবনার আকাশ ভেঙে পড়েছে।

ভাবনার কথা বলল বটে, কিন্তু মুখখানা খুশিতে ডগমগ মনে হল। হঠাৎ এ-খবর শুনে আমার মাথায় বরং দুশ্চিন্তা একটু।—সবে স্কুল ফাইনাল পাস করল, এরই মধ্যে বিয়ে...ছেলে কেমন ভালো করে খোঁজ-টোজ নিয়েছ?

—তা আর নিইনি, আমাদের কাছে সোনার টুকরো ছেলে, বি. এসসি পাস, সরকারী চাকরি, রিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্টে কি একটা পোস্ট-এ আছে বলল, এরই মধ্যে ছ'শ' টাকার ওপর মাইনে পায়, আর প্রায়ই ট্যুর-ফুরে যেতে হয়, তাতেও মাসে শ-দেড়শ' থাকেই। দাবি-দাওয়া বলতে গেলে কিছুই না—ছেলে এখানে বিয়ে করবে বলতেই তার দাদারা উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে এসেছে—ওর এক জ্যাঠতুতো ভাইয়ের চেনা পরিবার—তারাই সম্বন্ধটা দিয়েছিল, খুব ভালো বলেছে।

জিগ্যেস করলাম ছেলের বয়স কত?

—পঁচিশ। তা হাসিও তো ষোল পেরিয়ে সতেরোয় পা দিতে চলল, এমন কিছু খারাপ হবে না। আপনি যেন ওকে ডেকে একটু উৎসাহ দেবেন দাদা, এমনিতেই সকাল থেকে আমাকে ঝাড়ছে, আপনি খুব খুশি হয়েছেন না বুঝলে ঠিক বিগড়ে যাবে।.. এ-দিকের শরীরের অবস্থা তো জানেন, ভালোয় ভালোয় বিয়েটা দিয়ে ফেলতে পারলে একটা বড় দায় শেষ।

শেষেরটুকু যুক্তির কথাই বটে। এই বয়েসেই ওর স্বামী নয়নের ছোটখাট একটা হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে।

সেই বিকেলেই হাসি এলো। হয়তো বা লজ্জাতেই বেঁকে-চুরে সামনে এসে দাঁড়ালো। আমি সঙ্গে সঙ্গে দারুণ গম্ভীর।—আয়, সেকেন্ড ডিভিশনে সেকেন্ডারি পাস করে আমাকে মুখ দেখাতে পারছিস না, আর তার মধ্যে দিব্যি আর একজনকে মুখ দেখিয়ে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দিলি!

হাসি বলে উঠল, আমার বয়ে গেছে মুণ্ডু ঘোরাতে, একটা ভোঁদকা—

শুনে ধাক্কা খেলাম একটু।—সে কি রে! আমি তো শুনলাম খুব ভালো ছেলে—তোর পছন্দ হয়নি?

—আমার এখন বিয়েই পছন্দ নয়, হায়ার সেকেণ্ডারি পাস করলাম না, এরই মধ্যে বিয়ে! তারপরেই দস্তুরমতো মিনতি, তুমি মা-কে ডেকে একটু বলো মামাবাবু, তোমার কথা শুনতে পারে—

বিড়ম্বনায় পড়ে জবাব দিলাম, ভালো ছেলে পেলে সব বাবা-মা-ই মেয়ের বিয়ে দিয়ে ফেলতে চায়, চোখ-কান বুজে আপাতত বিয়েটা করে ফ্যাল, আমি বরং তোর বরকে শাসিয়ে দেব, এরপর না পড়ালে বিয়ে নাকচ হয়ে যাবে।

ঠোঁট উল্টে হাসি বলল, আব ছাই পড়া হবে, দেখো—

আষাঢেই বিয়ে হয়ে গেল। বব দেখে আমাবও যে খুব একটা পছন্দ হয়েছে তা নয়। ফর্সা, বেঁটে, মোটাসোটা, নাকেব নিচে এক ইঞ্চিব মতো এক খাবলা গোঁফ। কিন্তু সাধাবণ ঘবেব বিয়েব বাজাবে ছেলেব বিদ্যে আব ভালো চাকবিবই কদব। মেয়ে সুখে থাকলে একেই সকলে সোনাব ছেলে বলবে।

শ্বশুব বাড়ি যাবাব আগে হাসি প্রণাম কবতে এলো। সেই প্রথম বোধ কবি ওব কাঁদ কাঁদ মুখ দেখলাম ছদ্ম বকুনিব সুবে বললাম. হাসিব মুখে কান্না দেখলে আমাব দেওয়া নামেব অপবাদ হবে বলে দিলাম। ফিক কবে একবাব হাস দেখি?

এ-কথাব পব হাসিমুখেই প্রণাম কবে গেছে।

হিসেব না বাখলে সময় পাখা মেলে ওড়ে। দশটা বছব কেটে গেছে। এব মধ্যে হাসি কত শত বাব বাপেব বাড়ি শ্বশুব বাড়ি কবেছে তা খেয়াল কবাব মতো কখনো কিছু ঘটেনি। এই সাতাশ বছব বয়সে হাসি বীতিমতো গিন্নি-বান্নি গোছেব হয়ে উঠেছে। এখন এক মেয়ে আব দুই ছেলেব মা। মেয়ে বড়ো। ছেলে দুটো ছোট। পড়াশুনা আব হয়নি। বিয়েব এক বছব না ঘুবতে মেয়েব মা হয়ে বসেছে, পড়াশুনা হবে কি কবে। এই দশ বছবে খানিকটা মুটিয়েছে, কিন্তু লম্বা বলে খাবাপ দেখায় না, উল্টে আবো ফর্সা আব ঢলঢলে মনে হয়। পান খায় খুব, মুখে সেই হাসি লেগেই আছে। দেখা হলেই লাল দুই ঠোঁটেব হাসি সমস্ত মুখে ছড়ায়। আমি বলি, পান খাস কেন, অত সুন্দব দাঁতগুলো বিচ্ছিবি হয়ে যাবে।

ও হেসেই বলে, গেলেই হল, কত বাব কবে দাঁত মাজি জানো।

দাঁতেব যত্ন নেয় বোঝা যায়, হাসলে পানেব লাল বসে ভেজা দাঁতে সাদাব চেকনাই ঝিকঝিক কবে। হাসিব মুখেব হাসি আগেব মতোই সুন্দব।

এই দশ বছবেব মাথায় একটা অঘটন ঘটে গেল। তৃতীয় বাবেব হার্ট অ্যাটাকে হাসিব বাবা নযন মাবা গেল। তাব পব থেকেই হাসি মেয়ে আব ছেলে দুটোকে নিয়ে বাপেব বাড়িতে মায়েব কাছেই থাকে। বড় মেয়ে আব বড় ছেলেটা এ-দিকেব স্কুলেই ভর্তি হয়েছে। হাসিব মুখেই শুনেছি ছেলে-মেয়ে নিয়ে মায়েব কাছেই থাকবে ভাসুবদেব সঙ্গে এই ব্যবস্থা কবে এসেছে। ওব ববেব নাম সুবিনয় দত্ত। দশ বছবে ওব চেহাবা আবো পবিপুষ্ট আব ভাবিক্কি গোছেব হয়েছে। তাকে এখন সপ্তাহে দু'তিন দিন অন্তত এই শ্বশুব বাড়িব বাস্তায় দেখা যায়। শুনেছি বিহ্যাবিলিটেশনেব কাজে প্রায়ই এখন তাকে কলকাতাব বাইবে থাকতে হয়। ছেলে-মেয়ে নিয়ে হাসিব মায়েব কাছে এসে থাকাব এ-ও একটা কাবণ। তাছাড়া ও না থাকলে এখন আব মাকে কে দেখবে।

আবো তিন বছব বাদে দ্বিতীয় অঘটন। হাসিব মা মনোবমা লিভাব ক্যানসাবে মাবা গেল। বাবাব চিকিৎসা বা সেবা হাসি কবতে পাবেনি। কিন্তু মায়েব জন্য যথাসাধ্য কবেছে। বাপেব বাড়িব ষোল আনাব মালিক হবাব জন্য মাকে এতটুকু তুচ্ছ কবেছে, এ ওব শত্রুও বলতে পাববে না। যদিও বব সুবিনয় এ বাড়িব পাকা বাসিন্দা হবাব

পব অনেকেব চোখ টাটিযেছে। আড়ালে কেউ কেউ বলেছে, লোকটাব ভাগ্য বটে, বিযেব দৌলতে কলকাতাব মতো জাযগায আস্ত একখানা বাড়িব মালিক হয়ে বসল।

কলকাতায থাকলে সুবিনয এখন এ-বাড়িতেই থাকে, এখান থেকে অফিস যাতাযাত কবে। তবে দফায দফায মাসেব প্রায অর্ধেক দিন বাইবে কাটাতে হয। হাসিব মতো গিন্নি মেযেব খুব বেশি দিন শোক আঁকড়ে বসে থাকাব কথা নয। সময়ে আবাবও তাব পান-খাওয়া ঢলঢলে মুখে সেই পুবনো হাসিব ছোঁযা লাগল। ঘবেব বা ছেলেমেযেব ব্যাপাবে কোনো পবামর্শেব দবকাব হলে সোজা আমাব ঘবে চলে আসে। তেমনি হেসে বলে, এলাম আবাব জ্বালাতে, পবামর্শেব দবকাব হলে এখন আব তুমি ছাড়া কাব কাছেই বা আসব—

আমি বলি, কেন সুবিনয টুবে নাকি?

হাসি ঠোঁট উল্টে দেয, থাকলেই বা কি না থাকলেই বা কি, ভালো-মন্দ কোনো কিছুব মধ্যে আছে—বিযেব সময যা ছিল তাব থেকে আবো ভোঁদকা হযে গেছে দেখো না।

সেই বকমই চোখ-জুড়ানো হাসি।

ওব এখন বছব বত্রিশ বযেস। আব ছেলেপুলে হযনি। সে-জন্য মনে মনে ওবই বুদ্ধি আব বিবেচনাব প্রশংসা কবি। অনেক দিন আগে এই ছেলেপুলেব প্রসঙ্গে ওব মামী অর্থাৎ আমাব স্ত্রীকে নাকি বলেছিল, তোমাদেব জামাইযেব স্বভাব চবিত্র যা —ছ'বছবেব মধ্যে তিন-তিনটে চলে আসতে ওই ভালো-মুখো লোককে আব বিশ্বাস কবি। ছোটটা আসাব পবেই অপাবেশন কবিযে একেবাবে নিশ্চিন্ত।

হাসি হেসে-হেসেই এ-বকম কথা বলতে পাবে বটে।

এই হাসিব মুখ হঠাৎ থমথমে হযে ওঠা থেকেই এই কাহিনী। কিছুদিন ব্যস্ত ছিলাম, তাই লক্ষ্য কবিনি। হাসি অনেক দিন আসেনি তা-ও খেযাল কবিনি। সেদিন স্ত্রীব কথায টনক নড়ল। সে বলল, মেযেটাব কিছু একটা হযেছে বোধহয, আসে না, হাসে না, কথা-বার্তাও বলে না—

আমি অবাক।—কাব কথা বলছ?

—হাসিব। সুবিনযেব সঙ্গে কিছু একটা হযেছে, তিন সপ্তাহ হল ওকেও বাড়িতে বসা দেখছি, অফিস-টফিসেও যেতে দেখি না, মুখ চুন কবে বাড়িব সামনেব দাওযায বসে থাকে—আব এক-একদিন দেখি মেযেটা আগুনপানা মুখে ফটাফট কবে আমাদেব দিকেব ঘবেব জানলা-দবজা বন্ধ কবে দিচ্ছে, তা-সত্ত্বেও ও-ঘব থেকে ওব গর্জন আব বকাবকি কানে আসে—ডেকে কিছু জিগ্যেসও কবতে পাবি না—এমনকম হাসি-খুশি মেযেটাব হঠাৎ কি হলো বলো তো?

হাসিব মুখে হাসি নেই এ আমাব কাছে শুধু বিস্মায নয, আঘাতেব মতোও। এবপব ক'দিন লক্ষ্য কবেও ওকে দেখতে পাইনি। ওদেব এ-বাড়িমুখো দোতলাব ঘবেব জানালা দুটো এখন প্রায সমযই বন্ধ থাকে। সুবিনযকেও সত্যি ক'দিন একতলাব দাওযায বসে থাকতে দেখেছি। বিষণ্ণ, বিমর্ষ মুখ। ফর্সা মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। দেখলেই মনে হয সুখেব শবীব-মনেব ওপব দিযে কিছু একটা ঝড় গেছে।

রাস্তায় হঠাৎ সেদিন মুখোমুখি দেখা। মাথা নিচু করে সুবিনয়ের পাশ কাটানোর চেষ্টা। কিন্তু হাসির জন্যে আমার মনেও কম অশান্তি নয়। ওকে পাশ কাটাতে দিলাম না। জিগ্যেস করলাম, অনেকদিন হাসির দেখা নেই, ভালো আছো তো সব?

সুবিনয় মিনমিন করে জবাব দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ...ভালোই।

—তুমি অফিসে যাচ্ছ না দেখছি .ছুটিতে আছ নাকি?

—হ্যাঁ...অনেক ছুটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে..

আর কথার ফুরসত না দিয়ে যেন পালিয়ে বাঁচল। বড় রকমের কিছু গণ্ডগোল বেধেছে তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু সেটা পারিবারিক ব্যাপার না আর কিছু।

মাস দেড়েক বাদে আবার আমার স্ত্রীর মুখেই সমাচার শুনলাম। এর মধ্যে সে আরও অনেকবার জানলা-দরজা বন্ধ ওই মুখোমুখি ঘর থেকে হাসির তর্জন-গর্জন শুনেছে। সদ্য বর্তমানে হাসিদের একতলার পুরনো ভাড়াটে-গিন্নি ওদের ওপর দারুণ বিরূপ। হাসি নাকি এতকালের হৃদ্যতা ভুলে ভাড়া ডবল বাড়ানোর তাগিদ দিয়ে গেছে। ভাড়াটে-গিন্নি আমার স্ত্রীর কাছে এসে নালিশ করেছে, মগের মুলুক ভেবেছে এটা--ভাড়া ডবল বাড়াতে চাইলেই হল—আর যা ব্যাপার এখন, ভাড়া ডবল বাড়ালেই অভাব মিটবে—চরিত্র-দোষে জামাই অমন চাকরিখানা খুইয়ে বসেছে, এখন ভাড়াটের ওপর চড়াও হলে কত আর সুরাহা হবে।

এরপর ওদের ভাড়াটে-গিন্নির কথা থেকে বোঝা গেল, পাড়ার মধ্যে আমরাই কেবল প্রতিবেশীর খবর রাখি না, নইলে কেলেঙ্কারির খবর কে আর না জানে। যে-টুকু বোঝা গেল তার সারমর্ম, পুনর্বাসন দপ্তরের চাকরি সুবিনয় দত্তর, গরিব ঘরের কত উদ্বাস্তু পরিবারের হর্তাকর্তা বিধাতা ভাবত নিজেকে, কিন্তু ঘুঘু আর কতবার ধান খেয়ে যাবে—একবার ফাঁদে পড়বে না? এক বিধবা মেয়ের সর্বনাশ বলতে গেলে হাতে-নাতে প্রমাণ হয়ে গেছে, শুধু চাকরির ওপর দিয়ে সব নিষ্পত্তি, জেল হয়ে যায়নি এই রক্ষে। সোয়ামির সঙ্গে মেয়ের দিন-রাত কুরুক্ষেত্র চলেছে এখন, মেয়ের গলার চোটে এক-তলায় কান-পাতা দায়, দু'বেলা হিসহিস করে স্বামীকে শাসাচ্ছে, অমন লম্পটের জেলে পচে মরাই উচিত ছিল, তাহলে তার হাড়ে বাতাস লাগত। মেয়েও বলিহারি। দু'বেলা মাথা খোঁড়ে আর বিধবা হতে চায়। বাইরে এ-দিকে ঢাক-ঢাক গুড়গুড়—কিন্তু সত্যি কথা ক'দিন আর জানতে বাকি থাকে।

বুঝলাম, পাড়ায় এই সত্যি-কথা রাষ্ট্র করার গুরু দায়িত্ব ওদের ভাড়াটে-গিন্নিই নিয়েছে।

আমার হাড়-পাজরে একটা বোবা যন্ত্রণা ছড়িয়ে পড়ছিল। মেয়েটাকে আমি কত ভালবাসি তা যেন এতদিন জানতাম না। কেবল আশা করছি, বিনা দোষেও তো অনেকে অনেক সময় বিপাকে পড়ে—এ কি সে-রকম কিছু হতে পারে না? রাগে দুঃখে মাথার ঠিক নেই বলেই হাসি হয়তো সহ্য করতে পারে না। কিন্তু সুবিনয়ের সর্বদা অপরাধী মুখ দেখে এ আশাও ফিকে হয়ে আসছিল।

পবেব একটা বছবে অনেক পবিবর্তন লক্ষ্য কবেছি। হাসিব মুখে হাসি তো নেই-ই। ওদেব সংসাবে অনটনেব ছাযা স্পষ্ট হযে উঠেছে। শুনেছি, সুবিনযেব চাকবিই শুধু যাযনি, হাতে শুধু নিজেব-দেওযা প্রভিডেন্ট ফান্ডেব টাকা কটাই পেযেছে। এ-ছাড়া সতেব বছবেব চাকবিব পেনশন গ্র্যাচুইটি সবই মাব গেছে। মেযে আর ছেলে দুটো নাম-কবা স্কুলে পডত, স্কুল বাসে যাতাযাত কবত। ক্লাস-প্রমোশন হযে যেতে তাবা কাছাকাছিব এমন স্কুলে ভর্তি হযেছে যেখানে স্বল্পবিত্তেব মানুষও পাবতে ছেলে-মেযে দিতে চায না। ওই ছেলে-মেযেব মুখেব হাসিতেও টান ধবেছে। হাসিকে থলে হাতে ইদানীং ক্বচিৎ কখনো কাছেব বাজাবে যেতে বা আসতে দেখি। কিন্তু এ-বাডিব দোতলাব দিকে ছেড়ে মুখ তুলে কোনদিকেই ওকে তাকাতে দেখি না। শুকনো টান ধবা মুখ। পূজো এলো গেল, কিন্তু এবাবে ও বিজযাব প্রণাম কবতেও এলো না। ডাকতে ইচ্ছে কবে। কিন্তু সংকোচ হয, ডাকতে পাবি না। আমাব স্ত্রীও দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে, অত হাসি-খুশি মেযেটা কি হযে গেল।

এক বছব বাদে। সকালে অন্যদিনেব মতোই কাজে বসেছিলাম। মুখ তুলে আমিই সচকিত হঠাৎ। হাসি দবজাব কাছে দাঁড়িযে।

—ভিতবে আসব মামাবাবু?

আমিও গম্ভীব একটু।—আয। কবে আবাব জিগ্যেস কবে এ-ঘবে ঢুকেছিস? বোস—

হাসতে চেষ্টা কবল। এ হাসি কান্নাব মতোই। একটা মোড়া টেনে বসল। বলল, মুখ কেন দেখাতে পাবি না জানোই তো...

আমি কিছুই জানি না, জানতে চেষ্টাও কবি না। বিনা দোষেও অনেকেব ওপবে অনেক অবিচাব হয। কিন্তু যত দুঃখেব ব্যাপাবই হোক, তুই আমাকে সুদ্ধু ছেঁটে দিলি?

চুপচাপ চেযে বইল একটু।—আমাব সব গুমব ভেঙে গেছে মামাবাবু, দিন আব চলছেই না, তাই না এসে পাবলাম না....যা হোক কিছু ব্যবস্থা কবতে পাবো?

হাসিব মতো মেযেব হাব-না-মানা মুখেব থেকে হাব-মানা মুখ দেখলে বেশি কষ্ট হয। আমি কি কবতে পাবি না বুঝে জিগ্যেস কবলাম, কি ব্যবস্থাব কথা বলছিস?

দেখলাম, সহানুভূতি সত্ত্বেও আমাব মাথায যা আসেনি, বিপাকে পড়ে হাসি তা ভাবতে পেবেছে। মাথা নীচু কবে সাদা কথায বলল, আমাব বেযাই বা জামাইকে বলে যদি সুবিনযেব কোনো কাজেব ব্যবস্থা কবতে পাবি। একবাব মুখ তুলে আমাব প্রতিক্রিযা দেখে আবাব মাথা নীচু কবল—লোকটা যেমনই হোক, কাজে-কর্মে খুব সুনাম ছিল মামাবাবু...।

আমাব বেযাই আব জামাইযেব মস্ত কণ্ট্রাকটাবি ফার্ম। কনস্ট্রাকশন আব ডেভেলপমেন্ট দু'বকম কাজেই তাদেব বহু লোক খাটছে। কিন্তু সেখানে কাবো কাজেব সুপাবিশ এ-পর্যন্ত কবিনি। তবু আমিও যেন একটা পথ দেখতে পেলাম। কাবণ বেযাইযেব সঙ্গে আত্মীযতাব থেকেও হৃদ্যতাব দিকটা ঢেব বড। ভদ্রলোক বাইবে মেজাজী বাশভাবী মানুষ, কিন্তু ভিতবে যেমন উদাব তেমনি দিলদবিযা।

পরে জানাবো বলে হাসিকে তখনকার মতো যেতে বললাম। বেয়াই বেশি শুনতে চাইলেন না। আমি অনুরোধ করছি সেটাই যথেষ্ট ধরে নিয়ে সুবিনয় দত্তকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিতে বললেন।

চাকরি হল। বিহ্যাবিলিটেশনে কাজ করেছে জেনে ছেলের অর্থাৎ আমার জামাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে তাকে ডেভেলপমেন্টের কাজে দিলেন। মাইনে সর্বসাকুল্যে ছ'শ'। দিন-কাল যা ছ'শ' টাকা কিছুই না। কিন্তু হাসি তাতেই হাতে স্বর্গ পেল। আমি বললাম, মন দিয়ে কাজ করতে বল, এরা গুণের কদর করতে জানে।

হাসি হেসে জবাব দিল, সেটা আমি তাকে খুব ভালো করে সমঝে দিয়েছি —অনেক বার বলেছি, বেয়াইয়ের কাছে কক্ষনো তোমার জন্যে মামাবাবুর মুখ ছোট হলে রক্ষে থাকবে না।

এত দিন বাদে ওকে ওইটুকু হাসতে দেখেও মনে হল, সময়ে ও আবারও আগের মতোই হাসতে পারবে। মুখেও বললাম, আমার মুখ নিয়ে তোকে চিন্তা করতে হবে না, আমি কেবল তোর মুখে হাসি দেখতে চাই।

ছলছল চোখে হাসি পায়ের ধুলো নিল। বলল, আশীর্বাদ করো মামাবাবু, তোমার দেওয়া নাম আর যেন কালো না হয়।

হয়নি। ছ'মাস না যেতে বেয়াইয়ের মুখে সুবিনয়ের প্রশংসা। খাসা লোক দিয়েছেন মশাই, চেহারা দেখলে বোঝা যায় না এত খাটতে পারে, তাছাড়া সারভের কাজে বেশ পাকা, ডেভেলপমেন্টের কাজেও ভালো মাথা—কেউ শত্রুতা না করলে এ-রকম লোকের চাকরি যায় কি করে।

চাকরি কি করে যায় সে-আলোচনায় আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নেই। বেয়াই যে-খবরটা নিজে আমাকে বলেননি, হাসিমুখে এসে সে-খবর আমাকে হাসি দিল। এই ছ'মাস যেতেই সুবিনয়ের মাইনে আরো একশ' টাকা বেড়েছে—আর পাকা খাতায় তার নাম উঠেছে, অর্থাৎ এরপর চাকরির শেষে প্রভিডেন্ট ফান্ড গ্র্যাচুইটিও পাবে।

পরের তিন বছরের সমাচারে নিরানন্দের ছিটে ফোঁটাও নেই। হাসির বয়েস এখন ছত্তিরিশ, তার মেয়ে সুমিতার আঠারো। মেয়ের চেহারা মোটামুটি। এ-বয়সে তার মা যা ছিল তার ধারে কাছেও নয়। এরারে হায়ার সেকেনডারি দেবে। মেয়ের বিয়ের ভাবনা-টাবনা হাসির মাথায় নেই। অনেক দিনই বলেছে, লেখাপড়ায় ভালোই, যতটা পড়তে চায় পড়ুক, তারপর বিয়ে। আঠারো বছরের মেয়ের মুখের হাসির থেকে এখনো ছত্তিরিশ বছরের মায়ের হাসি আমার চোখে ঢের বেশি সুন্দর।

বছরখানেক হল সুবিনয়কে বাঁকুড়ায় থাকতে হচ্ছে। বাঁকুড়ার অনেকটা ভিতরে মেজিয়া। সেখানে থারমল পাওয়ার স্টেশন হবে। সেইজন্যে আশপাশের বিরাট এলাকা জুড়ে মাটি কাটা আর জমি ভরাটের কাজ চলছে। এ-সব জায়গায় নতুন টাউনশিপ গড়ে উঠবে। এই মাটি কাটা আর জমি ভরাটের বিশাল কণ্ট্রাক্ট আমার বেয়াই পেয়েছেন। এই তিন বছরের মধ্যেই নিজের যোগ্যতায় সুবিনয় আরো অনেক ওপরে উঠেছে। বেয়াই গত বছর তাকেই ম্যানেজার অর্থাৎ এ-কাজের সর্বেসর্বা করে পাঠিয়েছেন। এখন

তাব মাইনে বাবো শ' টাকাব ওপবে। দু'শ'ব মতো কুলি-মজুব কামিন খাটায, তাব অধীনে দু'জন সহকাবী ম্যানেজাব, জনা দুই সাবভেযাব, জনাকতক সুপাবভাইজাব আব ট্রাক, ড্রাইভিং ইউনিট কাজ কবছে। এবা সকলেই সাইট-এব টেন্ট-এ থাকে। সুবিনয গ্রামেব ধাবে ছোট একটা বাড়ি ভাড়া নিযেছে। তাব এখন আলাদা মর্যাদা। তবে সকলেবই খাওযা-দাওযাব ব্যবস্থা টেন্ট ক্যানটিনে। আমাব বেযাই ভদ্রলোক নিজে ভোজন-বসিক, কর্মচাবীদেব খাওযা দাওযাব ব্যাপাবেও তাঁব ফার্মেব উদাব নীতি। বেশ বড আকাবেব এক ক্যানটিন ইউনিটও সেখানে বহাল।

কলকাতা থেকে মেজিযা মোটবে বা জীপে সাত ঘণ্টাব মতো পথ। বেযাই তাঁব নিজস্ব জোঙ্গায (জীপেব মতোই, আকাবে বড) মাসে দুই একবাব সেখানে ইনসপেকশনে যান। আব ছেলে অর্থাৎ আমাব জামাই এখানে ফার্মেব অন্য কাজে ব্যস্ত, তাই ফি সপ্তাহে দেখে শুনে আসাব জন্য অন্য ইনসপেক্টব আব এঞ্জিনিযাব পাঠাতে হয। সুবিনয দু'তিন মাসে দুই একদিনেব জন্য কলকাতায আসে, কাজেব চাপে তাব বেশি আসা সম্ভবও নয।

তকতকে নীল আকাশ থেকে বজ্রপাত কি সত্যি কখনো হয? সেদিন বিকেলে বেযাইযেব টেলিফোন পেযে অন্তত আমাব মনে কোনবকম আশংকাব ছাযাও পড়েনি। চিবাচবিত হাসি-ছোঁযা ভাবী গলা। বললেন, অনেক দিন বসা হযনি, সন্ধ্যাব দিকে একবাব আসুন না, একটা ভালো জিনিস খুলব...তাছাড়া একটু আলোচনাও আছে।

এ-বকম আমন্ত্রণ নতুন কিছু নয। ভালো জিনিসেব লোভ দেখানোব অর্থ বিলিতি বোতল। আনুষঙ্গিক খাওযা-দাওযাব ব্যবস্থাও ভালোই থাকে। ভদ্রলোকেব বড কোনো কাজেব ধকল শেষ হলে এই গোছেব আমন্ত্রণ আসে। এ-বযসেও ওই এক জিনিসে আমাবও একটু-আধটু লোভ আছেই।

খুশি মনেই গেলাম। তখনও ভদ্রলোকেব হাসিমুখে এতটুকু দুর্যোগেব আভাস পাইনি। সকলে মিলে খানিক গল্পগুজব চলল। বৈবাহিকা আব মেযে খাবাব আব অন্যান্য সবঞ্জাম সাজিযে দেবাব পব ভদ্রলোক বললেন, এখন আমাদেব একটু দবকাবি আলোচনা আছে—

আমাব মেযেকে নিযে ভদ্রমহিলা বেবিযে গিযে বাইবে থেকে দবজা দুটো টেনে দিলেন। আমি উৎসুক একটু, কি ব্যাপাব?

—এমন কিছু নয, ভদ্রলোকেব হাসি মুখ, আগে শুরু তো করুন—

প্রথম দফায ওই ড্রিংক আব ফুড নিযেই হালকা কথা-বার্তা। দ্বিতীয দফাব শুরুতে হাসিমুখেই ভদ্রলোক জিগ্যেস কবলেন, আচ্ছা বিহ্যাবিলিটেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে সুবিনয দত্তব চাকবিটা যে গেছল সে-কি কোনো মেযে-টেযেব সঙ্গে কিছু অ্যাফেযাবেব ব্যাপাবে?

আমি এত চমকে উঠলাম যে হাতেব গেলাস থেকে খানিকটা ড্রিংক চলকে জামায পড়ল। ভদ্রলোক অপ্রস্তুত একটু, পাশ থেকে ছোট তোযালেটা এগিযে দিযে বললেন, কি কাণ্ড, এ-বকম ধাক্কা খাবাব মতো কিছু ব্যাপাব নয—

ভদ্রলোকেব স্নায়ু আমাব থেকে দশগুণ শক্ত এ অনেক দিন জানি। তাই আশ্বস্ত হওযা গেল না। জামাটা মুছে সোজা তাকালাম, বললাম, চাকবি ওই বকম কিছু ব্যাপাবেই গেছল শুনেছি...কি হযেছে আমাকে খোলাখুলি বলুন।

—বলছি। খান...

খাওযা মাথায উঠেছে। কিন্তু ভদ্রলোকেব কাছে ব্যস্ততা দেখিযে লাভ নেই। এবপব খেতে খেতে ধীবে সুস্থে যে সমাচাব শোনালেন, ভিতবে ভিতবে আমি নিস্পন্দ কাঠ।

...মেজিযাব একটা নিচু শ্রেণীব মেযেকে নিযেই ব্যাপাব এবাবও। বছব উনিশ হবে বযেস। যাবা দেখেছে তাবা বলে খুব কালো হলেও ওদেব মধ্যে অন্তত চোখে পডাব মতো মেযে। ওদেব শ্রেণীব একটা ছেলেব সঙ্গে বিযেও নাকি ঠিক হযে আছে, কিন্তু মেযেব মা মোটা বকম পণ হাঁকতে ছেলেটা দেড বছব ধবে টাকা জমানোব চেষ্টায আছে। এব মধ্যে ওই মেযেটাকে সুবিনয টাকা গযনাব টোপ ফেলে বশ কবেছে। ব্যাপাবটা এখন ক্রমেই ঘোবালো হযে উঠছে। তিন-চাব মাস যাবৎ বেযাই এ নিযে কিছু কানা-ঘুষা শুনছেন। কিন্তু যে লোক অত ভাল কাজ কবে তাব ব্যক্তিগত ব্যাপাব নিযে তিনি মাথা ঘামানো দবকাব মনে কবেন নি। এখন না ঘামিযে পাবছেন না। ম্যানেজাব সুবিনয দত্তব নামে কযেকটা বে-নামী চিঠি পেযেছেন—তাঁব ধাবণা, ওব আন্ডাবেব যে-সব লোক সাহস কবে মুখে কিছু বলতে পাবছে না, হিংসেয হোক বা বাগে হোক তাদেবই কেউ কেউ এ-সব চিঠি পাঠাচ্ছে। বেযাই তাতেও গা কবতেন না, কিন্তু এখন লেবাবেব মধ্যেও এ নিযে অশান্তি দেখা দিচ্ছে, যে-ছেলেটাব সঙ্গে মেযেটাব বিযে হবাব কথা সেই এখন লেবাবদেব ক্ষেপিযে তোলাব চেষ্টায আছে। ভালো কবে খোঁজ-খবব নেবাব জন্য বেযাই এ-সপ্তাহে একজন বযস্ক ইনসপেক্টবকে পাঠিযেছিলেন। সে-ও এসে দুশ্চিন্তাব কথাই বলেছে। মেযেটাব নাম দুলালী। সুবিনয এখন নিজেব বাডিতেই এনে বেখেছে। খাবাব সময সাইটেব ক্যানটিনে সে এখন খেতে পর্যন্ত আসে না। ক্যানটিন থেকে ওদেব দু'জনেব খাবাব তাব বাডিতে পৌঁছে দিযে আসতে হয। এ-সব এখন অনেকেই ববদাস্ত কবতে পাবছে না। বক্তব্য শেষ কবে ঈষৎ আশ্বাসেব সুবে বেযাই বললেন, সামনেব শনিবাবে কাউকে কিছু না জানিযে ওই ইনসপেক্টবকে নিযে আমি নিজে যাব, লেবাব ক্লাসেব মধ্যে গণ্ডগোলেব সম্ভাবনা দেখলে আমাকে স্টেপ নিতেই হবে তা না হলে আমাব কোনো মাথা ব্যথা নেই—আমাব ইচ্ছে শনিবাব আপনিও আমাব সঙ্গে চলুন।

মাথায আগুন জ্বলছে। ব্লাড প্রেসাবও চডে গেছে বোধহয। বললাম, আমাব যাবাব দবকাব নেই, আপনি সিভিযাব স্টেপ নিন।

ওঠাব আগে ভদ্রলোক বাব বাব বললেন, আপনাব আজকেব আনন্দটাই মাটি কবে দিলাম দেখছি।

বাডি ফিবে স্ত্রীকে একটি কথাও বললাম না। ভেতবে অশান্তিব ঝড। আবাব মেযে আব ছেলে দুটোব শুকনো মুখ চোখে ভাসছে। হাসিব কালো মুখ চোখে ভাসছে। এমন অশান্তিতে জীবনে কখনো পডিনি। বাত্তে ঘুম হলই না। হাসি আব ওব মেযে

আব ছেলে দুটোব কথা ভেবে আমার মনেব জোব কমে গেছে। সকালে উঠে ফোনে বেযাইকে জানালাম, শনিবাবে আমি তাঁব সঙ্গে মেজিযায যাচ্ছি।

মনেব তলায ক্ষীণ আশা, ওই সুবিনযকে শাযেস্তা কবাব জন্য পাযেব থেকে জুতো খুলে মেবেও যদি ওব চাকবিটা বজায বাখাব সুযোগ মেলে তো তাই কবব —তবু চাই না এতবড অশান্তিব খবব হাসি বা তাব সংসাবেব কেউ জানুক।

গবম কাল। সকাল ছ'টায বওনা হযে সাডে বাবোটায বেযাইযেব সঙ্গে তাঁব জোঙ্গায চেপে মেজিযায পৌঁছেছি। সঙ্গে সেই বযস্ক ইনসপেক্টব আব আবো একজন লোক। খুব সকালে বেরুনোব ফলে এবই মধ্যে দুর্গাপুবে সকলে দুপুবেব খাওযাও সেবে নিতে পেবেছি।

মেজিযায পৌঁছে আব সাইটে এসে বেযাইকেও হতভম্ব দেখলাম একটু। সেখানে সুবিনয নেই। ভযে ভযে একজন কর্মচাবী জানালো, সে তাব বাডিতেও নেই, সকাল থেকেই বাডি তালা-বন্ধ। আবো খোঁজ নিতে জানা গেল গত বাতে পর্যন্ত সেই মেযেটা অর্থাৎ দুলালীও তাব বাডিতে ছিল। সকালেব মধ্যে দু'জনেই কোথায উধাও হযে গেছে।

মেজিযা থেকে হামেশাই কেউ না কেউ কলকাতাব অফিসে যাতাযত কবে। গত ক'দিনেও তাব ব্যতিক্রম হযনি। সাহেব আজ আসছে আব কি জন্যে আসছে সে-খবব সুবিনয কোনোভাবে জেনেছে সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল। তাই মেযেটাকে সুদ্ধ নিযে কোথাও গা-ঢাকা দিযেছে।

ঘন্টা তিনেক থেকেও সেখানকাব লেবাব ক্লাসকে ম্যানেজাবেব ওপব ক্ষুব্ধ মনে হল না আমাদেব। যাব সঙ্গে দুলালীব বিযে হবাব কথা সে এখানকাব শ্রমিকদেব কেউ নয, কাজেই তাব দেখা পাইনি। কিন্তু এখানকাব শ্রমিকদেব সে ক্ষেপিযে তুলছে এমন আভাসও পেলাম না। ম্যানেজাবেব ওপব ভদ্রলোক কর্মচাবীবাই কেবল বিরূপ। ব্যাপাবটা সম্ভবত তাবাই ববদাস্ত কবতে বাজি নয। সাহস পেযে তাবা অনেকেই বলেছে ম্যানেজাব সুবিনয দত্তকে এখান থেকে না সবালে তাদেব মান থাকে না।

ফেবাব সময দুটি ছেলে কলকাতায ফিববে বলে আমাদেব জোঙ্গায উঠেছে। সামনে ড্রাইভাবেব পাশে আমি আব বেযাই। বেযাইযেব মুখ এখন থমথমে। চাপা বাগে বললেন, আমি আসছি জেনে এভাবে পালানোব জন্যেই তাকে স্যাক কবব।

আমি নির্বাক। সামান্য মাথা নেডে সায দিলাম। তাই কবা উচিত। নিজেব মেযেব বযসী একটা মেযেকে নিযে এই কুৎসিত ব্যাপাব সহ্য কবব কি কবে? ভযে পালিযেছে সে-অপবাধ আমি অত বড কবে দেখছি না।

হঠাৎ সচকিত আমবা। পিছনেব ছেলে দুটোব একজন বলে উঠল, ওই দুলালীব মা দাঁডিযে।

মালিকেব ইশাবায ড্রাইভাব গাডিব ব্রেক কষল। জংল' বাস্তাব ধাবে পঁচিশ ত্রিশ গজেব মধ্যে বিবর্ণ খাটো শাডি-পবা এক বমণী দাঁডিযে। হাডেব ওপব কালো চামডা মোডা। চোখ দুটো গর্তে। চোযালেব দু'দিকেব হাড উঁচিযে আছে। রুক্ষ চুলগুলো তেলজলেব মুখ দেখে না।

আমাদেব দিকে, না ঠিক আমাদেব দিকে নয়, সে মালিক চেনে মনে হল— বেযাইযেব দিকে এমন চেয়ে আছে যেন চোখেব আগুনেই তাঁকে ভস্ম কবে ফেলবে। চোখ দুটো সত্যি জ্বলছে। এমন ক্রুদ্ধ হিংস্র ভযংকব মূর্তি জীবনে দেখেছি কিনা জানিনা। পাবলে সে গাডিটাব ওপবেই ঝাঁপিযে পডে।

তবু, যে লোকেব জন্য তাব মেযেব এতবড সর্বনাশ হযে গেছে, সেই লোকেব মনিবেব ওপব এই বাগ অস্বাভাবিক মনে হল না।

সামনে এসে বেযাই নামলেন। ভযে ভযে পিছনে আমিও। নিকষ কালো এই অগ্নিমূর্তিব মেযেলোকটা দিশেহাবা বাগে ভদ্রলোকেব ওপব ঝাঁপিযে পডতে পাবে।

তাব সামনে এসে ভাবী অথচ সদয গলায বেযাই জিগ্যেস কবলেন, তুমি দুলালীব মা?

তক্ষুণি জবাব না দিযে মেযেলোকটা জ্বলন্ত চোখে আমাদেব দু'জনকেই আব এক দফা ভস্ম কবে নিল। তাবপব হিসহিস গলায তবল আগুনেব ঝাপটা মাবল। —ক্যানে, মোব পবিচযে তোমাদেব কি দবকাব বটটে?

ঠাণ্ডা গলায বেযাই বললেন, দবকাব কিছু নেই।...আমবাও ওই ম্যানেজাবেব বিচাব কবতেই এসেছিলাম, কিন্তু দেখা পেলাম না, আপাতত পালিযেছে। সঙ্গে তোমাব মেযেও। ...ম্যানেজাবেব ব্যবস্থা হবে, কিন্তু তোমাবও মেযেকে একটু সামলে বাখা উচিত ছিল।

সঙ্গে সঙ্গে শুকনো বারুদে আগুন ধবানো সম্পূর্ণ হল। হাত, মুখ নেডে চাবখানা হযে ফেটে পডল।—তোমবা ওই মানিজাবেব বিচাব কববেক, তাকে শাস্তি দিবেক? ক্যানে তোমাদেব এত হিংসা বটটে? ক্যানে শিকাবীব মতো তোমবা ওই ভালো মানুষ মানিজাবকে খুঁজতে লেগেছ? আমাব মেযেটা এট্টু ভালো খেতে পেলেক, পবাব ভালো ক'খানি শাডি পেলেক, কানে হাতে পাযে রূপাব গযনা পেলেক—মুইও এট্টু সুখেব মুখ দেখতে পালাম—তোমাদেব তা সহ্যি হল না ক্যানে? তোমবা এততো নিষ্ঠুব ক্যানে? ক্যানে ক্যানে ক্যানে?

আমবা দুজনেই স্তব্ধ, নির্বাক, বিমূঢ।

জোঙ্গা ছুটেছে। আমবা আবাব পাশাপাশি বসে। অনেকক্ষণ বাদে বেযাই মুখ খুললেন। তাঁব ঠোঁটে হাসিব আঁচড। ভাবী গলা যতটা সম্ভব মৃদু কবে বললেন, কে কাকে ফাঁদে ফেলেছে মশাই?...এবপব বিচাবটা কি-বকম হবে?

বিডবিড কবে জবাব দিলাম, জানি না।

জোঙ্গা ছুটেছে। আমাব চোখেব সামনে হাসিব মুখ, তাব মেযে সুমিতাব মুখ, তাব ভাই দুটোব মুখ ভাসছে। বাস্তাব দু'দিকে আব কাছে-দূবে শাল পিযাশাল জিযাল পলাশ মহুযা বহেবাব গাছ। সামনে তকতকে নীল আকাশ। সব কিছু ছাপিযে চোখেব সামনে বড হযে উঠছে নিকষ কালো এক বমণীব ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত জ্বলন্ত ক্ষুধার্ত মুখ।

আতসী

অতসী একটি ফুলেব নাম। স্বর্ণাভ। দেখতেও মিষ্টি।

অতসী গাঙ্গুলির বন্ধুরা ওই ফুলের সঙ্গে নামের মালিকের তেমন মিষ্টি গোছের মিল দেখতে পায়। বন্ধু বলতে য়ুনিভার্সিটির ছেলে-মেয়েরা। এই মিলটা তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বা ধরিয়ে দিয়েছে অতসী গাঙ্গুলির ছেলে-বেলার বন্ধু শোভনা বিশ্বাস। সে-ও তারই সঙ্গে কলেজ ডিঙিয়ে ইকনমিক্স পড়তে ঢুকেছে। এই মিল দেখানোর পিছনে একটু বাস্তব রসের যোগ আছে।.. যে কলেজ থেকে তারা পাশ করে বেরিয়ে এসেছে, সেখানকার দুজন তরুণ শিক্ষক ওই ফুলের সঙ্গে এই মিল আর মিতালিটুকু প্রথম আবিষ্কার করেছিল। তাদের একজন সেটুকু সামনা-সামনি ঘোষণা করার মতো সাহস দেখিয়েছিল। অতসী গাঙ্গুলি খুব খুশি হয়ে তাকে চপ কাটলেট খাইয়ে বিদায় করেছিল। তারপর ওই মন-পসন্দ নামের মালিকের কাছ থেকে আশানুকূল সাড়া না পেয়ে ভদ্রলোক আর একদিন বাড়িতেও এসেছিল। দূর থেকে অতসীকে সে দোতলার ঘরের জানলার কাছে কয়েক পলকের জন্য দেখেও ছিল। আর অতসীও তাকে দেখেই সরে এসেছিল।

বাড়ির কাজের লোকটি এসে খবর দিতেই অতসীর সাফ জবাব, বলে দাও বাড়ি নেই, কখন ফিরব তারও ঠিক নেই।

এই অতসী-স্তুতি সেখানেই শেষ। শুনে শোভনা বিশ্বাস বলেছিল, এত অকরুণ হতে পারলি কি করে—গোলাপে কাঁটা থাকে জানি, অতসীতেও থাকে।

দ্বিতীয় মিল-আবিষ্কারক ওই কলেজের বাংলার তরুণ কবি-শিক্ষক। উঠতি কবি হিসেবে ভদ্রলোকের বেশ সুনাম তখন। অতসী নামের মূল তার হৃদয়ে গেঁথে আছে দু'বছর ধরে ক্লাস করেও সেটা বোঝা যায়নি। এম. এ ক্লাসে ভর্তি হবার পর ডাকে একদিন অতসী গাঙ্গুলির নামে আধুনিক কবিতার মাসিক-পত্র এলো। কে পাঠালো ভেবে না পেয়ে পাতা উল্টেই দেখে ছাপা অক্ষরে প্রথম কবিতার নামই 'অতসী'। নিচে কবির নাম। বলাবাহুল্য কলেজের সেই অতি চেনা নাম।

বার কয়েক মনোযোগ দিয়ে পড়ে কবিতার মর্মোদ্ধার করা গেছে। চৌদ্দ লাইনের মধ্যে পুষ্পবাহার অতসীর বিশেষ একটি মানবী রূপের কল্পনা এবং স্তুতি।

যা করণীয় অতসীর তা ঝটপট করে ফেলা অভ্যাস। তারপর চার লাইনের একটা চিঠির নকলসহ কবিতাটা শোভনাকে দেখিয়েছে। প্রথমে কবিতা এবং পরে চিঠিটা পড়ে শোভনার দু'চোখ কপালে।—এই চিঠি সত্যি তুই ভদ্রলোককে পাঠাবি নাকি?

—পাঠাবো না, পাঠিয়ে দিয়েছি।

রুদ্ধশ্বাসে শোভনা চিঠিটা আবার পড়েছে।

'কবিতা-পত্র পেলাম। ধন্যবাদ। আপনার অতসী পড়ে মুগ্ধ হয়েছি। পরের সংখ্যায় কৌটিল্য-ব্যঞ্জনাসহ অর্থশাস্ত্রের ওপর একটি নিটোল সনেট দেখতে পেলে আরো মুগ্ধ হব।'

—চিঠিতে তোর নাম দিসনি? শোভনার ব্যগ্র প্রশ্ন।

—দেব কেন, কবিতার ওই মাসিক-পত্র যে পাঠিয়েছে সে তার নাম দিয়েছে?

দু'জনেই ইকনমিক্স-এর ছাত্রী, অবশ্য বি-এ'র রেজাল্ট দেখলে শোভনার থেকে অতসী ঢের বেশি এগিয়ে। সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড হয়েছিল। আত্মীয় পরিজনেরা

তাইতেই বেশ খুশি। কেবল অতসীর বুকের ভিতরটা চিনচিন জ্বলছে। মার্কশীটে দেখা গেছে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট-এর থেকে আট নম্বর মাত্র পিছিয়ে। তার মধ্যে দু'দুজন ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে, তারা ছেলে। একজন সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে, সে মেয়ে। অতসী ওদের থেকে নিজেকে কোনো অংশে খাটো ভাবে না। কিন্তু দু'দুটো টিউশনি চালিয়ে এর বেশি আর কত হবে। এম. এ-তে ওই তিনজনকেই মনে মনে দেখে নেবার ইচ্ছে। কিন্তু ভিতরের এই জ্বলুনি বা অভিলাষ কাউকেই বুঝতে দেবার মেয়ে নয় সে।

যাক। এবারে বন্ধুর উৎসুক প্রশ্ন, কৌটিল্য-ব্যঞ্জনা সহ অর্থশাস্ত্রের ওপর একটি নিটোল সনেট দেখা আর মুগ্ধ হওয়ার অর্থ কি—কলেজের বাংলা মাস্টারের আর্থিক সংগতির খোঁচা দিলি?

অতসীর হাসি এবং জবাব, যা খুশি বুঝে নে বাপু, মনে এলো লিখে দিলাম।

সাদা-মাটা দেখতে শোভনা বিশ্বাস অরসিক বা অনুদার নয়। য়ুনিভার্সিটিতে ঢুকে প্রশংসার ছলে দুই একটি উৎসুক ছেলের কানে অতসী-নামের মহিমা আর মাধুর্য তুলে দিতেই সেটা দ্রুত বিস্তার লাভ করেছে। দু'দুটি তরুণ মাস্টারের মুখে ঝামা ঘষে দেবার ঘটনা শোভনা বিশ্বাস অবশ্যই অনুক্ত রেখেছে। সেটা বলা মানেই প্রকারান্তরে তাদের সতর্ক করা আর সমঝে দেওয়া। এই বোকামো করলে ভবিষ্যতের মজার আশায় জলাঞ্জলি। কলেজের কবি-শিক্ষকের লেখা পুষ্পবাহার অতসীর বর্ণনা আর উপমা ক'টা কেবল সানুরাগে বন্ধুর ওপর চালিয়ে দিয়ে মন্তব্য করেছে, নামের সঙ্গে এমন মিষ্টি মিল কমই দেখা যায়।

অতসী-ফুল বা গাছ কত ছেলে দেখেছে আর দেখলেও কত জনে মনে রেখেছে তাতে দুই বন্ধুরই সন্দেহ আছে। দু'জনেরই ধারণা এই মিলটুকু ধরিয়ে দেবার পর ছেলেগুলোর কেউ-কেউ আলিপুরের হর্টিকালচারাল গার্ডেনে হানা দিয়েছে। তা না হলে ওই ফুলের গুণগান ছেলে-মেয়েদের (বিশেষ করে ছেলেদের) মুখে মুখে এতটা প্রগলভ হয়ে ওঠে কি করে? ফুলের গুণ-গান বলতে নামের মিলের প্রশস্তি।

এই প্রশস্তির ধারে কাছে না ঘেঁষেও ওই নামের ওপর ছোট্ট একটু কটাক্ষপাত করে ছাত্রবন্ধুদের মজার খোরাক যুগিয়েছিল যে ছেলে তাকে য়ুনিভার্সিটির মধ্যমণি বললেও অত্যুক্তি হবে না। সমর ঘোষাল। কিন্তু এ প্রসঙ্গ একটু পরে। ছেলেরা সমর ঘোষালকে কেবল ভালবাসে না, অনেক উঁচু পর্যায়ের আত্মজন ভাবে। অতসীর থেকে বছর খানেকের বড় হবে, পড়েও এক ক্লাস ওপরে। সিক্সথ ইয়ারের ছাত্র, সাবজেক্ট ইংরেজি। গত তিন বছরের মধ্যে তার আগে বি. এ-তে ওই বিষয়ে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স কেউ পায়নি। সমর ঘোষাল বেশ দাপটের সঙ্গে এই কলঙ্ক মোচন করেছে। এম. এ-তেও ফার্স্ট ক্লাস পাবে, এ-ও যেন ধরা-বাঁধা ব্যাপার। ভালো ক্রিকেটার, নামী ক্লাবের এ-ডিভিশনে খেলে, গত বছর থেকে বাংলা দলের বাছাই বারো জনের মধ্যেও জায়গা করে নিতে পেরেছে। মুরুব্বি জনেরা উৎসাহ দেয়, লেগে থেকে সেভাবে চেষ্টা করলে ভারতীয় বাছাই দলেরও সে নিশ্চয় একজন হতে পারবে। এমনিতে চোখের আড়ালেই

সরে থাকতে চায়, কিন্তু টেনে এনে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে অন্য মানুষ। ইংরেজি বাংলা দুই-ই কান পেতে শোনার মতোই বলে। ছাত্র মহলের ইউনিয়নবাজী তথা রেষারেষি অনেকটা এই একজনের জন্যেই অনেক শান্ত এখন। মধ্যস্থতায় নামলে মিটমাট হয়ই। এ হেন গুণের ছেলেব সব থেকে বড় গুণ কথা-বার্তায চাল-চলনে এতটুকু দম্ভ নেই। মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, ঠিক সেই রকমই থাকে। যে-যা বলুক মন দিযে শোনে, যেন সকলের কাছ থেকেই তাব কিছু শেখার আছে। এমনি সব কিছুর ভিতব দিয়ে তার শান্ত সহজ ব্যক্তিত্বটুকুই সকলকে আকর্ষণ করে।

শোভনা বিশ্বাসের একটা বড দোষ বা বড গুণ, সে সকলেব সঙ্গে যেচে আলাপ কবতে ওস্তাদ। কোনো নামী ছেলে বা মেযেব কথা শুনলে কতক্ষণে তাকে একটু নাড়াচাড়া করে দেখবে সেই ফাঁক খোঁজে। কলেজে পড়তে সাযেন্স গ্রুপ পড়াতেন এক প্রৌঢ় নাম-করা প্রফেসার। তাঁর ছাত্রবা তাঁকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা কবত। কথায কথায শোভনা কাব মুখে শুনল ভদ্রলোক ম্যাট্রিক থেকে এম. এস-সি পর্যন্ত ফার্স্ট ছাড়া কখনও সেকেন্ড হননি। কলেজ আঙিনায় ভদ্রলোককে সামনা-সামনি দেখেই এগিযে গিযে তাঁব পাযে হাত দিয়ে প্রণাম সেরে মুখোমুখি দাঁড়ালো।—আপনার হাতখানা একবাব আমাব মাথায় রাখুন তো সার।

ভদ্রলোক অপ্রস্তুত।—কেন বলো তো, তুমি কী পড়ো—কোন ইয়াবেব ছাত্রী?

—বলছি। বিনীত নিবেদন, আগে আপনাব হাতখানা একবাব আমাব মাথায রাখুন না...।

কি আব করেন? বাখলেন।

—আমি বি. এ ফাইন্যাল ইয়াবের ইকনমিক্স-এব খুব সাধাবণ ছাত্রী...ম্যাট্রিক থেকে এম. এস-সি পর্যন্ত একজন ফার্স্ট হওযা মানুষ জীবনে এই প্রথম দেখলাম সাব, দোষ নেবেন না।

অতসী একটু পিছনে দাঁড়িযে দেখছিল আর শুনছিল। কলেজ গেট পেরিযে হাসতে হাসতে বলল, হায়াব সেকেন্ডাবি থেকে এম. এ. এম-এসসি পর্যন্ত ফার্স্ট আজকাল অনেকেই হয, এই ভদ্রলোকেব অর্ধেক বযসের সে-বকম কাউকে যদি সামনে দেখতিস?

—তাহলে মাথায় হাত রাখতে বলতে পারতাম না, আড়ালে টেনে নিয়ে গিযে একবার জড়িয়ে টড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে কবত, ফার্স্ট বা ফার্স্ট ক্লাস ছেড়ে মোটামুটি সেকেন্ড ক্লাস যদি একটা হয।

সেদিন লাইব্রেরি হলে দূরের টেবিলে একজনকে দেখা গেল। বিকেলে ওই টেবিলে তাকে প্রাযই দেখা যায়। অতসীকে ক্লাসেব পব নিযমিত লাইব্রেরিতে এসে পড়াশুনা সেরে নিতে হয। ফিরে গিযে দু'দুটো টিউশনি আছে, সপ্তাহে তিন দিন করে পড়ায়, বাড়ি গেলে নিজেব পড়াব সময় মেলে না। তাছাড়া বেশ অবস্থাপন্নর পক্ষেও এম. এ ক্লাসের সব বই কিনে পড়া সম্ভব হয় না, অতসীর তো নিজস্ব খুব কম বই-ই আছে। ছুটিব দিনে ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পড়তে যায। সেখানেও ওই ছেলেকে এক-আধ দিন দেখেছে। সামনা-সামনি পড়ে গেলে বা চোখাচোখি হয়ে গেলে পরিচিতের

মতোই সামান্য হেসে পাশ কাটিয়েছে। অতসীও তাই করেছে। য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে আজ ওই দূরের টেবিলে মুখোমুখি একজন মাত্র সহপাঠী বসে। পড়াশুনার ফাঁকে ফাঁকে টুকটাক কথা-বার্তা চলছে।

আঙুল তুলে অতসী ওই টেবিলটা দেখিয়ে বলল, ওই দ্যাখ, ম্যাট্রিক থেকে এম-এতে ফার্স্ট না হলেও এখানকার একটি অলবাউন্ড বত্ন বিশেষ—তোর জড়িয়ে ধবতে ইচ্ছে কবাব মতোই একজন সমব ঘোষাল।

শোভনা বেশ নিবিষ্ট চোখে দেখে নিল। দূবে হলেও এই দিকে মুখ কবেই বসেছে। অস্ফুট মন্তব্য কবল, আমাব নয়, মনে হচ্ছে তোব ইচ্ছে কবাব মতোই একজন। চেযাব ঠেলে উঠে দাঁড়ালো—চলি...।

—ওকি। এই শোন—

কর্ণপাত না করে এগিযে চলল। সোজা ওই টেবিলে। দু'দিকেব দু'জনেই এক সঙ্গে মুখ তুলল। শোভনা সহপাঠীব দিকে তাকালোও না, সমব ঘোষালকে বলল, আমাদেব ওই টেবিলে একবাবটি অনুগ্রহ করে আসাব সময় হবে?

আঙুল তুলে টেবিল দেখালো। সমব ঘোষাল পঞ্চাশ গজ দূবের টেবিলে তাকালো। এবং অতখানি দূর থেকেই অতসী গাঙ্গুলীব সঙ্গে চোখাচোখি।

উঠল। ঠোঁটে মৃদু হাসিব আভাস। আসছে। আগে আগে শোভনা। একটা বড কাজ সমাধা কবাব মতো মুখ। এই টেবিলে এসে দুই ভুরু সামান্য কুঁচকে একটু ঘটা কবেই আব এক দফা বত্নটিকে দেখে নিল। অতসীর মনে হল, যে এলো সে এই দৃষ্টিবাণে আহত বা বিড়ম্বিত হবাব মতো একজন নয়।

গম্ভীব মুখে শোভনা বলল, সদ্য কলেজ উৎবানো দুটো কচিকাঁচা আমবা। সেখানে ছেলে-মেয়ে সকলেব সঙ্গে সকলেব তুই তোকাবিব সম্পর্ক ছিল, এখানকাব হাল কেমন, তুমি চলে না আপনি-আজ্ঞে?

তুমি'টাই ভালো চলে।

—বেশ। অতসীব মুখোমুখি চেযাবটা দেখিযে বলল, ওই চেযাবে পাঁচটা মিনিট বোসো তাহলে, একটু আলাপ পবিচয সেরে নিই—

সমব ঘোষাল হুকুম তামিল কবল, অর্থাৎ বসল।

—আমি শোভনা বিশ্বাস, খুব সম্ভব সেকেন্ডক্লাস লাস্ট হযে ইকনমিক্স পডতে ঢুকেছি, এ হল...(থেমে গিয়ে একটু ভ্রূকুটিব ঘটা) কেন, এব নামেব সৌবভ এখনো তোমাব নাকে-কানে পৌঁছযনি?

—কানে পৌঁছেছে, অতসী গাঙ্গুলি, তোমাব পাবলিসিটির গুণে ছেলেবা এই নাম নিযে গবেষণা শুরু কবেছে, পবিচিত হযে ধন্য হলাম, আমার নাম—

—থাক, থাক, য়ুনিভার্সিটির আকাশে তুমি দীপ্ত সূর্য, তোমাব আলোব গবিমায় চাব দিকেব নক্ষত্রবা টিপ টিপ জ্বলছে, এটুকু আমাদের জানা আছে। আমরাও গুণেব কদর জানি আর সেই কাবণেই এ হেন গুণীকে জবরদস্তি ধরে আমরা একটু টানাটানি করে থাকি—

খোঁটা দেবাব সুরে অতসী বলল, আমরা বলে আবার আমাকে জড়াচ্ছিস কেন, নিজের কথা বল—

সঙ্গে সঙ্গে শোভনাব ভ্রূকুটি এবং ঝাঁঝ। বেশি দেমাক দেখাস না, তোব মতো চেহাবা আব বিদ্যেব জোব থাকলে তোকে জড়াতে যাব, এতই বোকা ভাবিস আমাকে?

এবাবে সমব ঘোষালেব দু'চোখ শোভনাব দিকেই মনোযোগী একটু। তাবপব হাল্কা-গম্ভীব মন্তব্য—নিশ্চিন্ত থাকতে পাবো, তোমাব মতো চেহাবা আব বিদ্যেব জোবেব বসিকতাব টানাটানিও ভালো না লাগাব মতো উঁচু স্তবেব কেউ নই আমি।

খুশিতে বিগলিত ভাব শোভনা বন্ধুব দিকে ফিবে ঠেস দিল, কি বে, শুনলি? খুব যে নাক সিটকোস—

চেযাব ঠেলে সমব ঘোষাল উঠে দাঁড়ালো। ঠোঁটেব ফাঁকে একই বকমেব মৃদু হাসি, শোভনাব দিকে চোখ।—অনুমতি হলে আমি স্বস্থানে ফিবি—এব (অতসীব) ক্ষতি হচ্ছে, পড়াশুনাব ব্যাপাবে খুব সীবিযাস এখানেও দেখেছি, ন্যাশনাল লাইব্রেবিতেও লক্ষ্য কবেছি।

তেমনি মৃদু হেসে অতসী জবাব দিল, কপাল গুণে আমাব গোপাল ঠাকুবেব পূজো আর্চা সবই লাইব্রেবিতে...বাড়িতে সময হয না।

দাঁড়িযে শুনল, দেখলও একটু, কিছু জিগেস না কবে ফিবে গেল।

—যা! শোভনাব গলায হতাশা, ভেবেছিলাম যত জমাটি মগজই হোক, আগুনেব আঁচে এনে ফেলতে পাবলে একটু গলগলা ভাব দেখব, কিছুই তো দেখা গেল না।

—আব জ্বালাসনে বাপু, পড়তে হয পড়। নযতো পালা, এ চ্যাপ্টাবটা আজ শেষ কবতেই হবে।

শোভনাব অত ধৈর্য নেই, তাছাড়া বাড়িব গাড়ি অনেকক্ষণ ধবে অপেক্ষা কবছে। উঠে পড়ে বলল, এখন চ্যাপ্টাবেব চাপে বসে বসে চাপ্টা হ', তাবপব ট্রাম-বাসেব ভিড়ে চ্যাপ্টা হওযা আছেই—আমি বাপু সত্যি আব বসে থাকতে পাবছি না।

এব পবেও অতসী আব সমব ঘোষালেব দেখাসাক্ষাৎ যেটুকু তা এই লাইব্রেবিতে বা ন্যাশনাল লাইব্রেবিতে। যুনিভার্সিটিতে কথাবার্তা বলতে গেলে হযই না। মুখোমুখি বা সামনাসামনি পড়ে গেলে সমব ঘোষাল হেসে মাথা নাড়ে। অতসীও একই জবাব দেয। কথা টুকটাক ন্যাশনাল লাইব্রেবিতে দেখা হলে হয। ফেবাব সময কিছু পথ হেঁটে দুজনেবই ট্রাম বা বাস ধবতে হয। তাবপব দু'জনেব পথ দু'দিকে। সমব ঘোষাল থাকে, মধ্য কলকাতায, অতসী দক্ষিণে। অতসী প্রায প্রত্যেক ছুটিব দিনেই ন্যাশনাল লাইব্রেবি আসে, সমব ঘোষাল মাঝেমধ্যে। এইটুকু দেখাসাক্ষাৎ বা কথা-বার্তাব ফাকে বাড়তি আগ্রহেব ছিটেফোঁটাও কেউ দেখেনি। দশ মিনিটেব হাঁটা পথ ট্রাম-বাস পর্যন্ত পাশাপাশি আসাব মধ্যেও সহজ ব্যক্তিত্বেব ফাবাক একটু থেকেই যায। অতসীব এটুকুই খুব পছন্দ। গবীব ঘবেব সুরূপা মেযে এযাবত পুরুষেব হ্যাংলামো অনেক দেখেছে।

তবে ন্যাশনাল লাইব্রেবি থেকে ফেবাব সময এটুকু পথ এক সঙ্গে আসে দু'জনে। সমব ঘোষালেব আগে হযে গেলে ওব সামনে এসে দাঁড়ায, হাসিমুখে জিগেস কবে, কত দেবি? অতসীব প্রাযশঃ একই জবাব, আব দু'মিনিট অপেক্ষা কবো। বা, আব পাঁচ মিনিট। আবাব ওব আগে হযে গেলে ঝোলা ব্যাগ কাঁধে ঝুলিযে হাসি-হাসি মুখে

তাব টেবিলেব সামনে এসে দাঁড়ায কেবল, কিছুই জিগেস কবে না। সমব ঘোষাল চটপট উঠে পড়ে। স্বাভাবিক সৌজন্যে আগে ওকে ট্রামে তুলে দিযে (চাপা-চাপিব ভযে অতসী পাবতপক্ষে বাসে ওঠে না) নিজেব ট্রাম বা বাস ধবে।

এটুকুব মধ্যে দুই একটা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গেব টুকটাক কথাও হয। এব মধ্যে সমব ঘোষাল একদিন জিগেস কবেছিল, আচ্ছা, তোমাব সব পড়াশুনা লাইব্রেবিতে, বাড়িতে একদম সময পাও না বলেছিলে...কেন, অন্য কিছু শেখটেখ নাকি?

অতসী হেসেই জবাব দিযেছিল, শিখি না, শেখাই। সপ্তাহে তিন দিন কবে সন্ধ্যাব পব দুটো মাড়োযাবি বাড়িতে টিউশনি কবি। তাবা লোক ভালো, কেবল কামাই পছন্দ কবে না। বাত্রিতে তাবপবেও নোট-টোট বা লেখা-টেখা নিযে বসি—ফলে ঘুমোতে দেবি, সকালে উঠতেও দেবি—আব তাব ফলে স্নান-টান সেবে নাকে-মুখে কিছু গুঁজে যুনিভার্সিটিতে ছোটাব তাড়া—কম কবে এক ঘণ্টাব পথ তো।

শোনাব পব একটু শ্রদ্ধাব ভাবই লক্ষ্য কবেছে অতসী। চেহাবা বা ছিমছাম বেশ-বাস দেখে গবীব ঘবেব মেযে কেউ ভাবে না। চলতে চলতেই সমব ঘোষাল মুখ ঘুবিযে তাকিযেছে।—দু'দুটো টিউশনি কত দিন ধবে কবছ?

—বি, এ পড়তে ঢোকাব সময থেকেই।

পবেব বিস্ময়টুকুও নির্ভেজাল মনে হযেছে অতসীব।—এই কবে বি. এ-তে ইকনমিক্স-এব মতো সাবজেক্ট নিযে সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড—দারুণ তো।

শুনে মনে মনে সত্যিই খুশি অতসী, কাবণ সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ডেব খববটা ও নিজে কখনো দেযনি। মুখ টিপে হেসে বলল, তোমাব ইংবেজিতে ফার্স্ট ক্লাস পাওযাব থেকেও কঠিন মনে হচ্ছে?

হেসে উঠল, ও একটা হযে গেছে...এবাবে যে কি হবে ভাবতে গেলে ভয কবে বলে ভাবি না—

এমন শুনলে উৎসুক হবাবই কথা।—কেন?

—আব বলো কেন, আমাব বাইবেটাও খেলাব মাঠ, বাড়িতেও খেলাব মাঠ. .গেল বাব বেঙ্গল টিমে চান্স পেযে কি যে ক্ষতি হযে গেল সে-কেবল আমিই বুঝছি।

খেলাব সমঝদাব অতসী আদৌ নয। তবু মুখে বলল. নামী খেলোযাড় হওযাও কম কথা নয।

আবাব হাসি—। আমাব দৌড় আমি তো জানি। হাজাব খেলি, কোনদিন গাভাসকাব বা কপিলদেব হতে পাবব না। এব থেকে ফার্স্ট-ক্লাস পাওযাটা অনেক সহজ ছিল, কিন্তু বাড়িতে খেলাব মাঠেব শুভার্থীদেব হামলায দু'দিকই ফসকাবাব দাখিল। সব নয, এব মধ্যে একটা কথাই কুট কবে কানে লাগল অতসীব।...খুব অনাযাসে বলতে পাবল, এব থেকে ফার্স্ট ক্লাস পাওযা অনেক সহজ ছিল। তা-ও এম. এ-তে আব ইংবেজি সাবজেক্ট নিযে। অতসীবও আত্মবিশ্বাস সব থেকে বড় পুঁজি। সে-ও অনেক সময ভেবেছে, ওই দু'দুটো টিউশনি কবতে না হলে সে-ও ইকনমিক্স-এ ফার্স্ট ক্লাস পেতে পাবত।...সবে ফিফথ ইযাব, ফাইনালেব এখনো ঢেব দেবি, এখনো অতসীকে যদি কেউ টিউশনি থেকে অব্যাহতি দেয, সে কখনও এমন অনাযাস জোবেব সঙ্গে বলতে

পাববে না, এবাবে ফার্স্ট ক্লাস পাওযাটা সহজ ব্যাপাব।...ইকনমিক্স-এ ফার্স্ট ক্লাস ফি-বছব একজন ছেড়ে দু'তিন জনও পায, কিন্তু ইংবেজিতে ফার্স্ট ক্লাস পাওযাটা তাব বিবেচনায ভাগ্যেব শিকে ছেঁড়াব ব্যাপাব, অনন্য প্রতিভাধবও ওই বিষযে ফার্স্ট ক্লাস পাওযা সহজ বলতে পাববে কিনা সন্দেহ। কিন্তু যে বলল, সে একবাব ফার্স্ট ক্লাস পেযে দেখিযে দিযেই বলল, এটা বৃথা আস্ফালনেব পর্যাযে ফেলাব অজুহাত ভাবা যায না।

এবাবে অতসী নাম বাহাবেব প্রসঙ্গে বন্ধুদেব কাছে সমব ঘোষালেব সেই কটাক্ষপাতেব প্রসঙ্গ—যা যুগপৎ আনন্দেব সঙ্গে একটু তবল বিস্মযেবও খোবাক যুগিযেছিল। সমব ঘোষাল টিপ্পনিব সুবে বলেছিল, নামেব মধ্যে তোমবা কেবল নৈসর্গিক বসেব বাস্তব রূপ দেখছো, কিন্তু ওই নামেব সঙ্গে অদৃশ্য ছোট্ট একটু আ-কাব যোগ কবলে কি দাঁড়ায তা কখনো ভেবেছ?

বলা-মাত্র কেউই বুঝে উঠল না। সমস্ববে প্রশ্ন, তাব মানে?

—তাব মানে অতসীব 'অ'-এব সঙ্গে ছোট্ট একটু আ-কাব জুড়ে দিলে কি দাঁড়ায?

দুই একজনে তক্ষুণি বলেছে, কেন আতসী।

—ঠিক। তাহলে মানেটা কি দাঁড়ায?

—ভেবে একজন বলেছে, আতসবাজি শুনেছি, আতসী সেই গোছেব কিছু হবে।

—খুব ঠিক। আতসী মানে আগ্নেয, যাব জ্বলে ওঠাব জন্য সামান্য একটু তাপই যথেষ্ট। তা তোমাদেব অতসীব সঙ্গে অদৃশ্য একটু আ-কাব যুক্ত আছে কিনা ভেবে দেখেছ?

কথাটা স-পল্লবে অতসীব কানে উঠতে সময লাগেনি। শোভনাই বলেছে। তাবপব উৎসুক প্রশ্ন, কি বে, সমব ঘোষালেব তোব মেজাজেব আঁচ পাওযাব মতো কোনো ঘটনা ঘটেছে নাকি?

না, অতসীব বাগ একটুও হযনি, ভিতবে ভিতবে কেবল অবাক হযেছে। অতসী'ব অ-এব সঙ্গে একটা আ-কাব যুক্ত কবলে কি হয, তা কখনো ভাবেনি। কিন্তু যা হয সেটা কত বড সত্য তা ওই ছেলে কি বুঝে এমন টিপ্পনী কেটেছে, না নিছক ঠাট্টাব ছলে? বাগ হলে বা আঘাত পেলে অতসীব ভিতবটা কি যে জ্বলে জ্বলে ওঠে, সব ভস্ম কবে ফেলাব মতো আক্রোশে ফুঁসতে থাকে সেটা ও নিজে ভিন্ন আব কে জানে? এমন হলে যন্ত্রণা আবো বেশি, কাবণ ভিতবে যতই জ্বলুক ফুঁসুক, বাইবে তাব প্রকাশ কম। বাইবেটা সর্বদাই দাহ নিবাবক শান্ত ব্যক্তিত্বে ঢাকা। ভিতবে বাইবে অতসী গাঙ্গুলী একজন নয, প্রায় বিপবীত দু'জন।

বাগেব বদলে ওই একজনেব প্রতি কৌতূহল দ্বিগুণ বেড়েছে। যুনিভার্সিটি লাইব্রেবিতে দেখা হলে বা চোখাচোখি হলে মিটিমিটি হেসেছে। তাবপব সেদিন এক ফাঁকে জিগ্যেসও কবেছে, সামনেব বোববাবে ন্যাশনাল লাইব্রেবিতে আসছ?

সমব ঘোষালও ক'দিন ধবে একটু যেন ব্যতিক্রম লক্ষ্য কবছিল।—কেন বলো তো?

—তোমাকে একটু কমপ্লিমেন্ট দেবার ছিল।

সত্যি অবাক। —কেন, কী করলাম?

কী করেছে মাথায়ও নেই বোঝা গেল। হেসেই জবাব দিল, তেমন কিছু না, দেখা হলে বলব।

লাইব্রেরিতে এসেছে। দু'জনে দু' জায়গায় বসে পড়াশুনা যেমন হয়—হয়েছে। তবে এইদিনে সমর ঘোষাল বেশ আগেই উঠে এসেছে। —দেরি আছে?

অতসী নিজের হাতঘড়ি দেখল।—এরই মধ্যে হয়ে গেল?

—হয়ে গেল না, কমপ্লিমেন্ট পাওয়ার আশায় আর মন বসছিল না।

অতসীও হাসি মুখেই খাতাপত্র গুছিয়ে ব্যাগটা কাঁধে ঝুলিয়ে উঠে পড়ল। রাস্তায় নেমেই সমর ঘোষাল তাড়া দিল, কিসের কমপ্লিমেন্ট বলে ফেলো, সবুর সইছে না।

—তুমি খুব লোভী তো?

সমর ঘোষাল একবার থমকে তাকালো। তারপর হেসেই বলল, এমনিতে আমি খুব লোভী ছিলাম না, তবে মানুষের চরিত্র বদলাতে কতক্ষণ।.. তা বলো, কমপ্লিমেন্ট কী কারণে?

অতসী কটাক্ষে একবার দেখে নিল। আগের মন্তব্য একেবারে তাৎপর্যশূন্য মনে হল না। বলল, কমপ্লিমেন্ট অতসীর অ-এর সঙ্গে ছোট্ট একটা আ-কার জুড়লে কী দাঁড়ায় ছেলেদের সেটা বুঝিয়ে দেবার জন্যে।

শুনে সমর ঘোষাল প্রথমে জোরেই হেসে উঠল। ব্যাপারটা ভুলেই গেছল। হাসি থামাতে দু'চোখ আবার পাশের দিকে ঘুরল। কমপ্লিমেন্ট তো দিলে...কিন্তু আসলে রেগে যাওনি তো?

—রেগে যাব কেন, তুমি তো অনেকটাই সত্যের কাছাকাছি গেছ...তবে আমার কেবল কৌতূহল, গেলে কি করে, নাকি এটা কেবল বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে নিছক রঙ্গরসের ব্যাপার?

সমর ঘোষাল মুচকি মুচকি হাসতে লাগল। —সত্যি জবাব দিলে রেগে যাবে না তো?

—কেউ রেগে যাবে মনে হলেও তুমি সত্যের অপলাপ করো নাকি?

—তাহলে বলি।...তুমি আয়নায় নিজেকে দেখো?

—এ আবার কি কথা, রোজই তো দেখি।

—বন্ধুদের যা বলেছি তার ষোল আনাই রঙ্গরসের কথা নয়, তার সঙ্গে তোমাকে নিয়ে আমার কিছু ধারণাও মেশানো ছিল।...তোমার চেহারাপত্র বা রুচির ছিমছাম বেশবাস চাল-চলন দেখলে কারো মনে হবে না দু'দুটো টিউশানি আর নিজের হিম্মতের ওপর নির্ভর করে বি এ ইকনমিক্সে সেকেন্ড ক্লাস সেকেন্ড হয়ে এম. এ পড়তে এসেছ। বাসের আ-দেখলে চাপাচাপির ভয়ে তুমি সর্বদা ট্রামে যাতায়াত করো, সংগতি থাকলে ট্রামও এড়াতে। চরিত্রগতভাবে তুমি কেবল অতসী ফুলখানা হয়ে বসে থাকলে এত কষ্ট করে এভাবে এগোতে চেষ্টাই করতে না, অনেক আগেই যাচাই বাছাই করে কারো ঘরের শোভা বর্ধন করতে চলে যেতে। তাই আমার মনে হয়েছে যতই ওরা

তোমাব মধ্যে ফুলবাহাব অতসীব মিষ্টি মিল টেনে বাব করুক, দবকাব হলে অতসী থেকে তুমি আতসীও হযে উঠতে পাবো।

অতসী কান পেতে শুনছিল। বলে উঠল, থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ।

এবপব অনেক পাঠকেব হযতো প্রত্যাশা আব অনেক পাঠকেব হতাশা, কাহিনী এবাব চিবাচবিত প্রেমেব বাস্তায গডাবে। ...হ্যাঁ প্রেমেব বাস্তায এগনো একটু আছেই, তবে সকালেব ঘাসেব ডগায মুক্তা-বিন্দুব মতোই স্বল্প পবমাযু তাব।

পডাশুনাব চাপ যথাসম্ভব বাডিযেও সমব ঘোষাল এম এ'তে ফার্স্ট ক্লাস পাযনি। কেউই পাযনি। সমব ঘোষাল সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হযেছে।

বেজাল্ট খুব প্রত্যাশিত হল না বলে অনেকে সহানুভূতি আব সান্ত্বনাব কথা বলেছে। কেবল অতসী গাঙ্গুলী এ নিযে একটি কথাও বলল না বলে সমব ঘোষাল প্রথমে একটু অবাক হযেছিল। পবে কিচ্ছু না বলাটাই তাব ভালো লেগেছে—কথায চিঁডে ভেজে না এই প্র্যাকটিকাল মেযে তা খুব ভালো কবেই জানে।

অতসী ভেবেছিল দেখা-সাক্ষাতে এবাবে একটু ছেদ পডবে, আবাব মনে মনে বিপবীত আশাও ছিল। বিপবীতটাই হযেছে। যুনিভার্সিটিব দেখা-সাক্ষাৎ বন্ধ হযেছে। তাব বদলে প্রত্যেক ছুটিব দিনে সমব ঘোষাল ন্যাশনাল লাইব্রেবিতে আসা শুরু কবেছে। তাব সাবজেক্ট ইংবেজি, বি. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট, এম. এ-তে সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট—বে-সবকাবী কলেজে চটপট একটা মাস্টাবি জুটিযে নিতে কিছুমাত্র অসুবিধে হযনি। অতসীকে বলেছে, এটা খুব সামযিক, এবাবে খেলাব মাঠ ভুলে সে আই এ এস পবীক্ষা দেবাব জন্য তৈবি হচ্ছে। সেই প্রস্তুতিব তাগিদেই ছুটিব দিনে এখন ন্যাশনাল লাইব্রেবিতে আসা। এই উচ্চাশাব কথা শুনে অতসী একটা উৎসাহেব কথাও বলেনি। এ-টুকুও সমব ঘোষাল লক্ষ্য কবেছে, কিন্তু আদৌ অখুশি হযনি। এই ব্যক্তিত্বেব মেযেব মুখের কথায নেচে না ওঠাবই কথা। অন্য দিকে অতসী জানেও না আই এ এস হওযাব জন্য ন্যাশনাল লাইব্রেবিতে এসে কাজ কবাব কতটা দবকাব।...সীবিযাস ছেলে, এম এ-তে ঘা খেযেছে, দবকাব থাকতেও পাবে। কিন্তু এ-ছাডা এখানে আসাব আব কোনো আকর্ষণই নেই এটা সে ভাবেও না, বিশ্বাসও কবে না।

দিন গডিযেছে। সমব ঘোষালেব আই এ এস পবীক্ষা দেওযা হযনি। কাবণ পবীক্ষাব মাত্র ক'দিন আগে তাব বাবা মাবা গেছে। সামনেব বাবে দেবে বলেছে। অতসী বাবাব মৃত্যুব জন্য সহানুভূতি এবং সান্ত্বনাব কথা বলেছে। আই এ এস-এ বসা হল না বলে কোনো পবিতাপেব কথা বলেনি। এই না বলাব মধ্যে তাব শান্ত ব্যক্তিত্ব অর্থাৎ পাবসোনালিটিব দিকটাই বড হযে উঠেছে সমব ঘোষালেব কাছে। বনেব পাখিব আশায কথা তাবাই বেশি খবচ কবে যাদেব নিজেব ওপব বা অন্যেব ওপব আস্থা কম।

ততদিনে অতসীবও এম. এ পবীক্ষা শেষ। যথাসমযে বেজাল্ট বেবিযেছে। এবাবে সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট। ফার্স্ট ক্লাস তিনজন। শোভনা তাকে কংগ্র্যাচুলেট কবতে বাডিতে ছুটে এসেছিল। তাব এম. এ পবীক্ষা দেওযাই হযনি। সিক্সথ ইযাবে পৌছুবাব আগেই

তাব বিযে হযে গেছল। বডলোকেব মেযেব ৰূপেব ঘাটতি পূবণ কবা কঠিন কিছু নয। আপাদ-মস্তকে একবাব চোখ বুলিযে নিযে মনে মনে অতসী তাকে খবচেব খাতায ফেলে দিযেছে। শীগগিবই ছেলেপুলে হবে বোঝা যায।

সমব ঘোষালও সেই প্রথম বাডিতে এসেছে। তাব কথায উচ্ছ্বাস বা আতিশয্য নেই এটুকু ভালো লেগেছে। কিন্তু কথাগুলো খুব পছন্দ হযনি। বলেছিল, ফার্স্ট ক্লাস পেলে আবো কত যে ভালো লাগত...মনে মনে আশাও কবেছিলাম।

শুনে অতসী হেসেছে, কিন্তু ভেতবটা চিনচিন জ্বলেছে।...কাবণ, এই লোক এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পাযনি বলেই তাব নিজেব ফার্স্ট ক্লাস পাবাব উদ্দীপনাটা দ্বিগুণ বেডে গেছল। খেটেওছিল খুব।

এবপব দু'মাসেব মধ্যে সমব ঘোষালেব আব দেখা নেই। কেউ লক্ষ্য কবছে না, অতসীব দুই ভুরুব মাঝে একটু কোঁচকানো ভাঁজ স্পষ্ট হযে উঠছে। সমব ঘোষালেব বাডিতে টেলিফোন আছে। নম্ববও জানা। বাইবে বেবিযে একটা ফোন কবলেই হয। তাতেও ভিতব থেকে বাধা।

না কবে ভালই কবেছে। আবো দিন দুই যেতে নিজেই এসে হাজিব। বেলা তখন এগাবোটা বেজে গেছে। অতসীব কেন যেন মনে হল, তাব এখানে বসাব ঘব বলতে একটাই, এবং সেটা বাবা মা ভাই বোন সক্কলেব অধিকাবে, আব কাবো হানাদাবি অভিপ্রেত নয বলেই অসমযে আসা। এটা কোনো ছুটিব দিন নয, এক বাবা-মা ভিন্ন আব কাবো বাডিতে থাকাব সম্ভাবনাও কম।

বসতে দিযে এবং নিজে মুখোমুখি বসে নিবীহ প্রশ্ন কবল, এ সমযে যে...আজ কলেজ ছিল না?

—ছিল, কাল বাতে হঠাৎ ছোট্ট একটা গল্প মনে পডে যেতে একটু বাডতি উৎসাহ নিযে কলেজ বাতিল কবে তোমাব এখানে চলে এলাম।

—তাই নাকি, কি এমন গল্প?

দ্বিধা-ভবে অন্দবেব খোলা দবজাব দিকে একবাব তাকালো।—ইযে...কেউ নেই তো?

—তোমাব গল্প শোনাব জন্য কান পেতে বসে থাকাব মতো কেউ নেই।

শুনে বেশ একটু জোবেব সঙ্গেই সমব ঘোষাল বলল, তাহলে আজ আব আমাকে ঠেকায কে? গল্পটা ছোট্ট, সাদা-সাপটা ব্যাপাব।...কোনো ছেলেব এক মেযেকে বিযে কবাব ইচ্ছে, কিন্তু অনেক পাঁযতাবা কষেও মেযেকে কথাটা বলে উঠতে পাবছে না। শেষে কি বলবে, অনেক গুছিযে বিহার্সাল দিযে বলবেই পণ কবে সেই মেযেব কাছে হাজিব। কিন্তু এত বাবেব বিহার্সাল দেওযা ভালো-ভালো সব কথাগুলোই ভুল হযে গেল। ফলে নিজেব ওপবেই বিষম বেগে গিযে ঠাস-ঠাস কবে কেবল তিনটে কথা বলে উঠল, আমি তোমাকে চাই! শুনে মেযেটি একবাব শুধু তাকালো বলল, নিযে নাও।...ছেলেটা হাঁ। ভাবছে ডাবনড ইজি! সো ইজি!

দুই ঠোঁট চেপে অতসী হাসছে, চোখেও হাসি উছলে উঠেছে।

এবাবে সমব ঘোষাল চেষ্টা কবে গম্ভীব।—ভাবলাম ঝপ কবে বলে ফেলতে পাবলে

কপাল জোবে আমাব কেসটাও তো ডাবনড ইজি অ্যান্ড সো ইজি হযে যেতে পাবে —হাসি নয়, পাবে কি পাবে না বলো?

দুই ঠোঁটে আব চোখে হাসিটুকু তেমনি আগলে বেখে অতসী মাথা নাড়ল। পাবে।

সঙ্গে সঙ্গে সমব ঘোষাল চোখ পাকালো, তাহলে দু'দুটো মাস আমাকে যন্ত্রণাব মধ্যে না বেখে বাড়ি থেকে বেবিযে একটা ফোন কবলেই তো হত—কবোনি কেন?

বসাব ঢংটা একটু শিথিল কবে নিযে অতসী বলল, এবাব তাহলে আমাব একটা ছোট্ট গল্প শোনো।...এক ছেলেব আব এক মেযেব ভাব-সাব, দু'জনে দু'জনকে পছন্দও কবে, তাই থেকে মেযেটাব ধাবণা ছেলেটাকে তাব ষোল আনা জানা হযে গেছে। মেযেটি একদিন প্রস্তাব কবল, এবাবে আমবা বিযে কবে ফেললে কেমন হয। মুখে চিন্তাব ছাযা ফেলে ছেলেটা জবাব দিল, হয তো ভালই কিন্তু কে আব আমাদেব বিযে কবতে এগিযে আসছে বলো...। তাই আমি ষোল আনা বোঝাব জন্য তোমাব গল্পটা আগে শোনাব অপেক্ষায ছিলাম।

এবাবে সমব ঘোষাল এত জোবে হেসে উঠল যে নিজেব ঘবে বসেও অতসী সচকিত একটু।

—তাহলে চলো উঠে পডা যাক, এই দিনে ঘবে বসে আব ডাল ভাত-মাছ ভালো লাগবে না।

স্নান সাবাই ছিল, খুশি হযে অতসী দশ মিনিটেব মধ্যে তৈবী হযে এলো। তাব এই অনাডম্বব ছিমছাম ভাবটা শুরু থেকেই সমব ঘোষালেব পছন্দ। আব কেউ হলে কম কবে আধ-ঘন্টা সময নিত।

পার্কস্ট্রীটে এসে একটা ভালো বেস্তোবাঁ বেছে নিল। খাওযাব ফাঁকে টুকটাক ভবিষ্যতেব কথা শুরু হল। সমব ঘোষাল প্রস্তাব কবল, তা'হলে মা-কে বলি পুরুত ডেকে যত তাডাতাডি হয দিনক্ষণ ঠিক কবে ফেলুক?

অতসী বলল, পুরুত ডেকে পিঁডিতে বসে বিযে আমাব পছন্দ নয়, তাব থেকে বেজিস্ট্রি বিযে হোক।

—সে কি। কেন?

অতসী খুব অনাযাসে বলে গেল, কেন বুঝতে পাবছ না? বড বোনেব বিযে দিতে গিযেই বাবা প্রায নিঃসম্বল, ছোট বোন দুটো এখনো কলেজে আব ভাইটা স্কুলে পডছে। ঘটাব বিযে হলে লোকজনেব ভিড হযই, আব কনেব সঙ্গে তাবা আব কি ঘবে আসছে তা-ও লক্ষ্য কবে। তুমি যখন বডলোকেব সালঙ্কাবা কন্যা ঘবে এনে তুলছ না, আমাব দিকেব দৈন্য সকলেব চোখে আঙুল দিযে দেখানোব দবকাব কি? এব থেকে নির্ঝঞ্ঝাটে বেজিস্ট্রি বিযে অনেক স্বস্তিব হবে।

সমব ঘোষাল খাওযা থামিযে শুনল। আবো মুগ্ধ হল। মাথা ঝেঁডে আন্তবিক সায দিল।—খুব যুক্তিব কথা, মা একটু খুঁত খুঁত কববে, কিন্তু কি আব্ব কবা যাবে। ঠিক আছে, বেজিস্ট্রি বিযেই হবে।

এবাবে অতসীব সোজা-সবল প্রশ্ন, এ-তো হল, তাবপব?

—তাবপব কি?

—বিয়েব পবেব প্রোগ্রামটা কি?

—আই এ এস পবীক্ষায ওপবেব দিকে ঠাঁই পাওযাব জন্য এবাবে আবো আদা-জল খেযে লাগব...মনে হ্য ভালোই কবব।

নিরুত্তাপ গলায অতসী বলল, মনে হ্য কেন, পবীক্ষা দিলে ভালো কববেই। ...কিন্তু আমাব দিকটা তাহলে ভাবছ না—

সমব ঘোষাল শশব্যস্ত, কেন কেন—তোমাব কথা ভেবেই তো আমাব আবো বেশি পছন্দ—কিন্তু তুমি কি ভাবাব কথা বলছ?

অতসী মুখেব দিকে চেযে টিপ-টিপ হাসছে।—তুমি আই এ এস অফিসাব হযে জাযগায-জাযগায ঘুবে বেড়াবে আব আমি তাহলে সেই অতসী ফুলটি হযেই কেবল তোমাব ঘবেব শোভা বাড়াবো?

এ দিকটা ভাবা হযনি বটে, সমব ঘোষাল মনে মনে একটু হোঁচট খেযে উঠল। তাবপব ব্যস্ত মুখেই বলল, তোমাবও তো কোযালিফিকেশন কম নয, তুমিও ভালো চাকবি পেযে যেতে পাবো, আব গভর্নমেন্টেব চাকবি হলে দু'জনেব এক-জাযগায থাকতেও অসুবিধে হবে না।

মুখে হাসিব আভাস লেগেই আছে। দু'চামচ ফ্রাযেড-বাইস চালান দিযে চিবুতে চিবুতে বলল, পাঁচ বছব ধবে ছেলে-মেযে পড়াচ্ছি, এই এক চাকবি ছাড়া আমাব আব কিছু ভালো লাগবে না। বি. এ এম এ-ব একটাতেও ফার্স্ট ক্লাস পেলাম না, গভর্নমেন্ট কলেজে চাকবি পাওযাব কোনো আশা নেই, এ তুমি খুব ভালোই জানো। গভমেন্ট স্কুলে চাকবি পেতে পাবি হযতো, কিন্তু আই এ এস অফিসাবেব বউ স্কুল মাস্টাব এটা তোমাব খুব ভালো লাগাব কথা নয, আব এখানকাব প্রাইভেট কলেজেব চাকবি যদি জোটেও তোমাব বদলীব চাকবিব সঙ্গে খাপ খাওযাব কোনো আশাই নেই, তখন তুমি এক জাযগায আমি এক জাযগায। গা-ঝাড়া দিযে হেসে নিল একটু. মোট-কথা তোমাব ওই আই এ এস চাকবি আমাব একটুও পছন্দ নয।

বলাব সুবটুকু এমনি সহজ অথচ স্পষ্ট যে সমস্যাটা সমব ঘোষালেব কাছে আন্তবিক হযে উঠল। একই সঙ্গে চিন্তাব কাবণও। বলল, তা'হলে এ-বকম একটা বাজে কলেজেই পড়ে থাকব?

—তা কেন, আগাগোড়া ভালো কেবিযাব তোমাব, ইংবেজিব মতো সাবজেক্ট একটাতে ফার্স্ট ক্লাস আব একটাতেও অদ্বিতীয সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট, এই প্রভিন্সেব এতগুলো য়ুনিভার্সিটিব কোথাও না কোথাও অনাযাসে ঢুকে পড়তে পাবো—পাবো না?

সমব ঘোষাল সায় দিল, তা পাবি।

উৎসাহে অতসীব মুখখানা আবো সুন্দব লাগছে।—টিচিং লাইনে এতে কত ছুটি ভেবে দেখেছ, আব কত সুবিধে? নিজেদেব মধ্যে আমবা কত সময় পাব—ইচ্ছে কবলে তুমি ডক্টবেটেব থিসিস সাবমিট কবতে পাবো, পযসা কবাব ইচ্ছে থাকলে ছাত্রদেব জন্য দবকাবি বই লেখাবও অঢেল সময পেতে পাবো—আই এ এস'এব পিছনে ছুটে কেবল প্রতিপত্তি ছাড়া খুব বেশি আব কি পাবে?

কান জুড়নোব মতোই কথা আব যুক্তি। সোৎসাহে বলল, বেশ বেশ। আমি কোনো যুনিভার্সিটিব চাকবিতেই ঢুকে গেছি ধবে নাও কিন্তু তখন তুমি কি কববে?

অতসীব হালছাড়া হাসি আব জবাব, তখন আমাব আব কি সমস্যা। যেখানে তুমি, আমিও সেখানেই। কলেজেব মোহ আমাব নেই, স্কুলেব চাকবি তো একটা জোটাতে পাববই! প্রোফেসব হলে তখন আমাব স্কুলেব চাকবি নিযে কাবোই কোনো কমপ্লেকস থাকবে না—দু'জনেব বোজগাবে দিব্যি চলে যাবে—তাব বেশি আমাদেব দবকাব কি?

সমব ঘোষাল মুগ্ধ চোখে খানিক চেযে বইলো। তাবপব আধাভবাট খাবাবেব ডিশ ফেলে কেবিনেব পর্দা ঠেলে বেবিযে গিযে মুখ-হাত ধুযে এলো। ফিবে এসে অতসীব গলা জড়িযে ধবে ফ্রাযেড বাইস আব চিলি-চিকেন খাওযা মুখে গভীব একটা চুমু খেল।

অতসীব হাঁসফাঁস দশা। নিজেকে ছাড়িযে নিযে বলল, তুমি একটি অসভ্য।

সমব ঘোষাল বলল, তোমাব থেকে আমি যত ভালো বেজাল্টই কবি, প্র্যাকটিকাল বিচাববুদ্ধিতে আমি তোমাব নখেব যোগ্যও নই।

অতসীব হাসিমুখ, সেই সঙ্গে ধমকেব গলা, তা'বলে ভক্তিশ্রদ্ধাব ঠেলায এ-বকম হামলা! আবো সুযোগ সুবিধে থাকলে কি কবতে?

শোনাব পব সমব ঘোষালেব দু'চোখে সত্যিই তিমিব-তৃষ্ণা।

বিযে হযে গেল। অতসী গাঙ্গুলি অতসী ঘোষাল হল।

এব পবেব সব-কিছুই যেন তাদেব ইচ্ছাব অনুকূলে সাজানো। তাদেব বলা ঠিক হল না, অতসীব। সমব ঘোষাল যুগপৎ খুশি এবং অবাক হযে দেখছে পবেব সব পদক্ষেপ অতসীব হিসেব মতোই দু'জনকে বাস্তবেব দিকে এগিযে দিচ্ছে।

...ভালো মতো একটু নড়া-চড়া কবতে দেখা গেল অতসীব কথা মিথ্যে নয়, কলেজ-যুনিভার্সিটিব চাকবি যেন তাব জন্য হাঁ কবেই ছিল। মফঃস্বল কলেজেব সবকাবী চাকবি পছন্দ হল না, নর্থবেঙ্গল যুনিভার্সিটিতে লেকচাবাবেব পোস্টটাই পছন্দ। এখানকাব শ্রদ্ধেয ইংবেজিব প্রোফেসাবও এই চাকবিই নিতে পবামর্শ দিলেন। আব বললেন, এ-লাইনেই এলে যখন যত তাড়াতাড়ি পাব ডক্টবেটটা কবে নাও, নইলে এগোতে অসুবিধে হবে।

সমব ঘোষাল তাঁবই আন্ডাবে বিসার্চ কববে স্থিব কবেই বেখেছিল। ভদ্রলোকেব খুবই স্নেহেব পাত্র সে, খুশি হযেই বাজি হযে গেলেন। কযেক দিনেব আলোচনায বিসার্চেব বিষযও স্থিব কবে অতসীকে নিযে সে শিলিগুড়ি বওনা হযে গেল। প্রোফেসাব দূবে থাকলেও অসুবিধে কিছু হবাব কথা নয। মাঝে মধ্যে কলকাতায আসতে হবে, ভেকেশনগুলো আছে, এটা কোনো বাধাই নয।

যুনিভার্সিটি ক্যামপাস কলেজ থেকে অনেকটাই দূবে। এই এলাকায ঘব আগেই ঠিক কবে বেখে গেছল। দোতলা বাড়িব একতলায দু'খানা বড় ঘব, কিচেন বাথ ইত্যাদিব আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাও অপছন্দেব নয। কলকাতাব ঘিঞ্জি পবিবেশ থেকে এ-

রকম ফাঁকা জায়গায় এসে অতসী খুশি। শিলিগুড়ি শহরেও শুনেছে লোকের মাথা লোকে খায়, শহরের ভিতর দিয়ে আসার সময় যেটুকু দেখেছে তাতেই হাঁপ ধরার দাখিল। এখানে এসে ওঠার পর একটু কেবল খুঁতখুঁতুনি থেকেই গেল। বড় হলেও ঘর মাত্র দু'খানা। এরপর লোকজন আসা শুরু হলে তাদের কোথায় বসাবে কি করবে? যাক, অতসী কোন কিছুতে ঘাবড়াবার মেয়ে নয়, পুরুষের বুদ্ধিতে যেটুকু হয়েছে তাই যথেষ্ট, পরে দেখা যাবে।

নতুন একটা সংসার পেতে বসার ঝামেলা যে কত, দেখে প্রায় অসহায় অবস্থা সমর ঘোষালের। ব্যবস্থা করা আর গোছগাছের ঠেলায় অতসীর ফুরসৎ তো নেই-ই, নতুন কর্তাটিরও নাজেহাল দশা। তার ওপরেও ফরমাশ বর্ষণ হয়েই চলেছে, এটা আনো ওটা আনো, এটা করো ওটা করো। অতসীরও তো নতুন সংসারই, সব একেবারে মনে পড়ে না। ফলে যা একবারে হয়ে যায় তার জন্য তিন বার করে ছোটাছুটি। আবার ফরমাশ অনুযায়ী যা আনে তার বেশিরভাগই পছন্দ হয় না, নাক-মুখ কুঁচকে বলে ওঠে, এ-রকম আনলে কেন—ও-রকম পেলে না? এ মা, প্লাস্টিকের এত বড় বালতি আনতে বলেছি তোমাকে! দেখ কাণ্ড, কিচেন বাথরুম টয়লেটের জন্য তিনটেই লাল মগ—কোনো বুদ্ধি যদি থাকত, বদলা-বদলি হয়ে গেলে টের পাবে।

ঘাম ঝরা নাক-মুখ কোঁচকানো মূর্তিখানা চোখে মিষ্টিই লাগে সমর ঘোষালের, তাই বিরক্তির বদলে হাল ছেড়ে বসে পড়ে।—আমার দ্বারা আর কিসসু হবে না, আমার বদলে ওই ছেলেটার ওপর তোমার সর্দারি চালাও।

ছেলে বলতে ওপরতলার ভদ্রলোকের ঠিক-করা কাজের লোকটা। জোয়ান, গাঁটা-গোট্টা চেহারা, ভাবলেশশূন্য পালিশ করা মুখ, নাম শেবিং। এই তিন দিন ধরে তার নীরব দর্শক আর কলের পুতুলের মতো হুকুম তামিলের ভূমিকা। বাংলা বলতে পারে না, ভাঙা-ভাঙা হিন্দি বলতে পারে এবং বোঝে। গত তিন দিন যাবত এই বংগালী মেমসাবটি তার মনোযোগী দ্রষ্টব্যের একজন। অতসী চাপা গলায় গজগজ করে উঠল, একটু গুছিয়ে নিয়েই ওকে আমি তাড়াব, সব টানা-হেঁচড়া করতে করতে কতবার করে বুকের কাপড় কাঁধের কাপড় সরে যাচ্ছে, ওর হাঁ-চোখ দৃষ্টি তখনো নড়ে না—

একটা সিগারেট ধরাবার ফাঁকে সমর ঘোষাল আড়চোখে লোকটাকে দেখে নিয়ে বলল, বুক-কাঁধের কাপড় তাহলে আর একটু বেশি-বেশি সরাও, দেখবে ও খুশি হয়ে আমার থেকে ঢের বেশি পছন্দ মতো তোমার সব কাজ করে কম্মে দেবে।

কিছু একটা উদ্দেশ্য নিয়ে অতসী বড় স্টিল ট্রাঙ্কটার ও-ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঠাট্টার জবাবে গম্ভীর মুখে দেখে নিল একবার তারপর লোকটার দিকে ফিরল।—শেবিং!

দু'চোখ তার মুখের ওপরেই ছিল। গলা দিয়ে বিড়বিড় শব্দ বার হল, জি মেমসাব—

পাঁচ-পাঁচটা বছর মাড়োয়ারী বাড়িতে মাস্টারী করার ফলে অতসী হিন্দিটা মোটামুটি রপ্ত করেছে। আঙুল দিয়ে ট্রাঙ্কটার উল্টো দিক দেখিয়ে হুকুম করল, ইধার আও।

সমব ঘোষাল বুঝল ট্রাঙ্কটা যেখানে ছিল সেখানে বাখা আব পছন্দ নয, অন্যত্র সবাবে। এ-বকম ওলট-পালট কবেই চলেছে। শেবিং এগিযে এসে যথাস্থানে দাঁড়ালো। ভাবলেশশূন্য দু'চোখ তখনো কর্ত্রীব মুখেব ওপব।

—আপনা দো আঁখো জমিন পব বাখো।

এবাবেব হুকুম শুনে সমব ঘোষাল ত্রস্ত একটু। লোকটা তাই কবল। দু'চোখ নিজেব পাযেব দিকে নামালো।

—আব উধাব পাকড়ো—আঁখো মাৎ উঁচানা—

ঝুঁকে অতসী নিজে ট্রাঙ্কেব এ-দিকেব আংটা ধবল।—লে আও।

ধবাধবি কবে ঢাউস ট্রাঙ্ক পছন্দেব জাযগায বেখে অতসী সোজা হযে দাঁড়ালো। কাজ সেবে লোকটাও মুখ তুলেছিল, কিন্তু সমব ঘোষাল আশ্চর্য হয়ে দেখল, কর্ত্রীব সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দু'চোখ আবাব মাটিব দিকে।

আব তুমি বাহাব যা কে ঠাযবো, হম বোলাযগা।

ঘব ছেড়ে বাইবেব বাবান্দায গিযে দাঁড়ালো। দৃষ্টি তাব পবেও পাযেব দিকে।

সমব ঘোষাল এবাব চাপা গলায বলে উঠল, এ-বকম কবলে লোকটা পালাবে যে।

অতসীব গম্ভীব মুখেব দুই ঠোঁটে এবাবে একটু হাসিব ফাটল। বলল, বেশি বাড়লে তোমাবও ওই দশা হবে।

সমব ঘোষালেব মনে হযেছে এই ব্যক্তিত্বেব মাধুর্যটুকুই দু'চোখ ভবে দেখাব মতো।

দিন সাতেকেব চেষ্টায সব-কিছু চলনসই। মনে হল অতসীব। বড় সমস্যা ছিল বান্না নিযে। কাবণ কলকাতায যেভাবে দিন কেটেছে, অতসীব কখনো বান্নাঘবে ঢোকাবও সময হযনি। এ-ব্যাপাবে তার সহজাত ঝোঁকও নেই। ওপবতলাব ভদ্রলোক বলে দিযেছিলেন, বাঙালি বাড়িতে কাজ কবে কবে শেবিং মোটামুটি বান্নাও শিখেছে। দু'তিন দিন যুনিভার্সিটি-ক্যান্টিন থেকে খাবাব আনিযে লাঞ্চ ডিনাব সাবা হযেছে। কিন্তু এ-ব্যবস্থা ক'দিন আব চলতে পাবে, তাছাড়া ক্যানটিন খুব কাছেও নয। শেবিং কলেব মানুষ, তাই কর্ত্রীব কোনো হুকুমে তাব মুখে বিবক্তিব ছাযা নেই। আব তাব দু'চোখও এখন সর্বদা মাটিব দিকে। অতসী লক্ষ্য কবেছে সকালেব ব্রেকফাস্ট চা টোস্ট ডিমসেদ্ধ বা ওমলেট তাব আযত্তেব মধ্যে, বিকেলেবটা এপর্যন্ত পবখ কবা হযনি, কাবণ ক্যানটিনে সে-সময লুচি-পুবি তবকাবি আলুব দম ভালোই মেলে। অতসী হুকুম কবা মাত্র কলেব মানুষটা আশ্চর্যবকম তৎপব হযে তড়িঘড়ি নিযে আসে। অতসী এবপব তাকে বান্না-ঘবে ঠেলেছে। জিগেস কবা মাত্র সে বলেছে বাঙালী বান্না সে সবই জানে। কিন্তু তাব জানাব বহব দেখে প্রথম দিনই সমব ঘোষালেব দু'চোখ কপালে। ভাতে খুব ত্রুটি নেই, কেবল সেদ্ধ একটু কম, ডালেব সঙ্গে ভাজাও ঠিকই আছে, কিন্তু ডালটাকে ফ্রাযেড ডাল বলা যেতে পাবে। তবকাবি যা পাতে পড়ল সেটা একটা স্বাদশূন্য বকমাবি আনাজেব ঘ্যাঁট, মাছেব ঝোল একদিকে আব কড়া ভাজা মাছেব খণ্ড আব একদিকে। তা-ও ছনছনে ঝাল।

প্রথম দিনেব বান্না কিছুটা চালান দিযেই হতাশ গলায সমব ঘোষাল বলে উঠেছিল, এবাবেই হযে গেল, দু'জনেবই আলসাব অনিবার্য।

অতসী কিন্তু মোটামুটি খেতে পেবেছে। ধমকেব সুবে বলেছে, একটু ধৈর্য ধবো তো, বলে দিলে আস্তে আস্তে সব ঠিক হযে যাবে।

কিন্তু সাহেবেব খাওযা দেখে শেবিঙেব নিজেবই খটকা লেগেছে। চাব ভাগেব তিন ভাগ তাব পাতে পডে। নিজেব পাযেব দিকে চোখ নামিযে মেমসাহেবেব কাছে নিবেদন কবেছে, মিট-কাবি, এগ কাবি সুপ-এ-সব হলে সে ভালো খানা পাকাতে পাবে।

দেখা গেল এ-গুলো সত্যিই চলনসই। কিন্তু দু'বেলা এই একই জিনিস কাঁহাতক চলে। দু'দিন না যেতে বিবক্ত হযে সমব ঘোষাল বলে উঠেছে, শোনো, আমাব জন্য সব কেবল সেদ্ধ কবে বাখতে বোলো, আমি সেদ্ধ-ভাত খাব। ডাল তবকাবি সুক্তোব স্বাদ তো ভুলতেই বসেছি।

শোনামাত্র অতসীব তপ্ত মুখ।—আমি যা পাবি না তা নিযে খোঁচা দিযে লাভ কি, তোমাব হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, দেখেশুনে একজন বাঁধুনি বিযে কবলেই ভালো কবতে। বোসো দু'দিন, সব ঠিক হযে যাবে।

দু'দিন যেতে দেখা গেল সত্যি অনেকটাই ঠিক হযে এসেছে। ডাল তবকাবী মাছ সবই মুখে দিতে পাবছে। কি ব্যাপাব? না, অতসী সোজা গিযে ওপবতলাব গৃহিণীব শবণাপন্ন হযেছিল। সমস্যাব কথা শুনে তিনি নেমে এসে হাতে ধবে শেবিংকে এই তিনটি জিনিস বাঁধতে শিখিযেছেন। এখন নাকি সুক্তো বাঁধতে শেখাচ্ছেন। অতসী হেসে সাবা, মহিলা যা দেখান যা শেখান শেবিঙেব মাটিব দিকে চোখ, শেষে ধমক খেযে বুঝেছে বান্না শেখাব জন্য তাঁব দিকে তাকানো যেতে পাবে।

সাত আটদিন যেতে অতসী নিজেব ভাবনা ভাবতে বসল। স্কুলেব চাকবি একটা জোটাতে হবে। কেবল এখানে কেন, কালিম্পং কাবসিযাং দার্জিলিং-এ যেতে হলেও তাব আপত্তি নেই। মেযেদেব হস্টেলে থাকবে, শনি বোববাবে বা অন্যান্য ছুটিব দিনে চলে আসবে। এ ক'টা দিন যেতে সমব ঘোষালও মোটামুটি সুস্থিব। ঘব গোছানো আব সংসাব পাতা নিযে অতসীব ফবমাশেব পব ফবমাশ, অন্যদিকে ছাত্র পডানোব প্রস্তুতি—কোনো দিকে তাকানোব অবকাশ ছিল না। পবামর্শেব জন্য অতসী তাকে টেনে এনে সামনে বসালো—ইংবেজিটা তুমি আমাব থেকে ভালো জানো যখন নিজে আব কষ্ট কবি কেন, আমাব বাযোডাটা দিযে দবখাস্তেব জেনাবেল একটা খসডা কবে দাও, তাবপব চেষ্টা শুরু হোক, এ ক'টা দিন তো নিজেব তালেই কাটালে—

মুখেব দিকে চেযে এই প্রথম কি একটু ব্যতিক্রম চোখে পডল সমব ঘোষালেব। উঠে এসে সামনে দাঁড়ালো। —দেখি দেখি। দু'হাতে মাথাটা ধবে সামনে টেনে নিবিষ্ট চোখে কিছু দেখাব চেষ্টা, সঙ্গে মন্তব্য, একটা মাইক্রোসকোপ থাকলে ঠাওব কবা যেত—

অতসীব গলা দিযে প্রায আর্তনাদেব মতো বেরুলো, কি—পাকা চুলটুল নাকি?

সমব ঘোষাল হাসতে লাগল, বলল, না, লাল আঁচডেব মতো একটু কিছু চোখে পডেছে, এ ক'দিন খেযালই কবিনি, কপালে এমন সুন্দব টকটকে সিঁদুবেব টিপ পবতে, সিঁথিব সিঁদুবও আগুনেব শিখাব মতো জ্বলজ্বল কবত—সে-সব এবই মধ্যে বাতিল।

যাও। অতসী দু'হাতে তাকে ঠেলে সবালো।—কলকাতায তোমাব মাযেব পছন্দে ও-বকম পবতে হত, এখানে আমি ও-বকম গেঁযো সেজে বেড়াবো?

—সঙ কেন, তোমাব ফর্সা কপালে অমন টকটকে সিঁদূব টিপ আমাব তো খুব ভাল লাগত, আব মনে হত একমাত্র আমি ছাড়া আব সক্কলেব বেশি কাছে আসা নিষেধ।

অতসীব মুখে বাগত হাসি।—আব এখন কি মনে হচ্ছে, দু'হাত বাড়িযে সক্কলকে আমি কাছে ডাকছি?

সমব ঘোষাল মাথা নেড়ে সায দিল, অর্থাৎ সে-বকমই লাগছে। তাবপব নিবীহ প্রশ্ন, শেবিংকে ডেকে যাচাই কবে নেব?

—যা বললাম, বসে কববে না এইসব কববে?

জবাবে আগে একটা বড় নিঃশ্বাস ফেলল।—তা কবতেই বা হাত উঠছে কই, এখন ধবো তোমাব যদি কাবসিযঙ বা দার্জিলিং-এ চাকবি হয, আমাব ভালো লাগবে? এখন তো ভাবনা আবো বাড়ল, তোমাকে কুমাবী ভেবে ভালো লোকও যদি বেশি কাছে আসতে চায তাকে দোষ দেওযা যাবে না।

সমব ঘোষাল আশা কবেছিল এতটা বলাব পব ওই ফর্সা কপালে ছোট হলেও একটা সিঁদুব টিপ আব সিঁথিব লাল আচড় আব একটু উজ্জ্বল দেখবে। এ ক'দিনে ওটুকু ভাবী পছন্দেব হযে উঠেছিল।

কিন্তু দেখা গেল না।

তিন দিনেব মধ্যে এই একই প্রসঙ্গে আবাব একটু মজাব যোগাযোগ। অতসী এখানকাব সব থেকে নাম-কবা মেযে স্কুলে এসে হাজিব। ব্যাগে দবখাস্ত। নাবভাস হবাব মেযেই নয সে। অফিসেব কেবানীব কাছে আগে প্রিন্সিপালেব নাম জেনে নিল, মিসেস হৈমন্তী খাসনবিশ। তাবপব বেবিযে এসে স্লিপে নিজেব নাম লিখতে গিযেই ভুল। লিখেছে শ্রীমতী অতসী গাঙ্গুলি। বিবক্তিব একশেষ। দ্বিতীয স্লিপে শ্রীমতী অতসী ঘোষাল লিখে বেযাবাব হাত দিযে পাঠিযে দিল। দু'তিন মিনিটেব মধ্যেই ডাক এলো।

ববাতটাই বোধহয খাবাপ আজ। ঘবে পা দিযে নিজেব অগোচবেই একটু অভব্যতা কবে ফেলল। কাবণ স্কুলেব কোনো প্রিন্সিপালেব এমন দশাসই চেহাবা তাব কল্পনাব বাইবে। পোশাক পবিচ্ছদও একটু বিচিত্র ধবনেব। বিশাল টেবিলেব ওধাবে মস্ত একটা বিভলভিং চেযাব জুড়ে বসে অল্প অল্প দোল খাচ্ছেন। পবনে সাদা সিল্কেব শাড়ি, গাযে কাজ কবা সিল্কেব সাদা ব্লাউস, তাব ওপব সাদা কাজ কবা খযেব্রি বঙেব ঢাউস একটা বুক-খোলা এপ্রনগোছেব হাফ-হাতা লং কোট। মাথায অবিন্যস্ত সাদা-কালো চুলেব বোঝা। নাকের নিচে ঘন লোম, দুই গালেবও অনেকটা আব হাতেব কনুই থেকে যেটুকু চোখে পড়ে তা-ও ঘন লোমে বোঝাই। মুখেব ছাঁদ পুরুষালি। শাড়ি

পবা না থাকলে বা খোলা এপ্রনেব মাঝখানে বক্ষেব বিপুল স্তন-ভাবেব আভাস না দেখা গেলে মেয়ে কি পুরুষ ভেবে দু'চোখ আবো বেশি বিভ্রান্ত হত।

ইযেস? আই অ্যাম মিসেস খাসনবিশ, সীট ডাউন প্লীজ। হোযাট ডু ইউ ওযান্ট?

অতসী ধবেই নিল সে ফেল। মানে মানে এখন সবে পডলেই হয। সেটা কবা আবো বিসদৃশ। দু'হাত জুড়ে একটু বেশি আনত হয়ে শ্রদ্ধা জানালো। মহিলাব দিক থেকে তাব কোনো জবাব মিলল না। বিশাল টেবিলেব এ-ধাবেব চেযাবে মুখোমুখি বসল। কিন্তু তাঁব চোখে চোখ বাখতে মনে হল, উনি যেন প্রথম দর্শনে ওব ভেবা-চ্যাকা খাওয়া মূর্তি দেখে বেশ মজা পাচ্ছেন।

অতসী সবিনযে জানালো, সে একটা চাকবিব চেষ্টায এসে তাকে বিবক্ত কবতে বাধ্য হযেছে, এই এই কোযালিফিকেশন, যদি কোনো সুবিধে হয।

মিসেস খাসনবিশ ঝুঁকে আব একবাব স্লিপেব নামটা দেখলেন। গলাব স্বব এমনিতেই ফ্যাসফেসে, প্রশ্ন আবো রুক্ষ। এম, এ অ্যান্ড বি, এ ফ্রম হোযাট যুনিভার্সিটি?

—ক্যালকাটা যুনিভার্সিটি?

—দেন হোযাই হিযাব?

অতসী সবিনযেই জানালো, হাসব্যান্ড এখানকাব যুনিভার্সিটিতে জযেন কবেছেন তাই সে এখানে। মাত্র আট দশদিন হল তাবা এখানে এসেছে।

তখুনি সেই সিঁদুব প্রসঙ্গেব পবোক্ষ যোগাযোগ। হাসব্যান্ড শুনে প্রিন্সিপাল লোমশ দুই হাত টেবিলেব ওপব বেখে সামনে ঝুঁকলেন, থলথলে মুখেব দু'চোখ তাব দিকে নিবিষ্ট হল। তাবপব মন্তব্য, ইউ আব ম্যাবেড দেন...। ক্রিশ্চিযান?

—না হিন্দু।

শুনে কৌতূহল বাডলো যেন।—কতদিন বিযে হযেছে?

—মাস দুই আগে ।

থলথলে মুখে হাসিব আভাস একটু। আবাবও তেমনি ঝুঁকে বসেই নিবীক্ষণ কবলেন একটু। তাবপব সোজা হযে বসে বললেন, আই অ্যাম সবি, ক্লাস ইলেভেন টুযেলভ-এব জন্য আমাব একজনই ইকনমিকস-এব টিচাব আছে। তাব বিটাযাবমেন্টেব এখনো বছব দুই বাকি—

ফ্যাসফেসে গলাব স্বব একটু সদয মনে হল অতসীব। দ্রুত ভেবে নিল, দু'টো বছব সে যে কোনো নিচু ক্লাসেও পডাতে প্রস্তুত, বলবে কি বলবে না। কিন্তু তাব আগেই মিসেস খাসনবিশ বললেন, বাট আই মে ট্রাই টু হেল্‌প ইউ...জলপাইগুডিব গার্লস স্কুলেব হেডমিসট্রেস আমাব বন্ধু, শী বিগাবডস মি, তাঁব স্কুলে ইকনমিক্স-এব একটা লিভ ভেকেন্সিব পোস্ট খালি আছে শুনেছি, তাঁব ইকনমিক্স টিচাবেব টিউবাবকিউলোসিস ধবা পডতে সে লং লিভ এ আছে, তিন চাব দিন আগে হেডমিসট্রেস আমাকে ফোনে জিগেস কবেছিলেন, আমাব চেনা-জানা কেউ আছে কিনা, আপনি—

অতসী তক্ষুনি বলে উঠল, আমাকে আপনি বলে লজ্জা দেবেন না—

খুশি।—অলরাইট, গো অ্যান্ড সি হার, এর মধ্যে কাউকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে কিনা জানি না, যদি না নেওয়া হয়ে থাকে, ইউ হ্যাভ ফেয়ার চান্স...ইউ মে রেফার মি।

মহিলা এতটা সদয় হতে পারে আশাতীত। জলপাইগুড়িতে চাকরি হলে এখান থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা জল-ভাত ব্যাপার। অতসী আর একটু ঝুঁকে কৃতজ্ঞতায় টুপটুপু সুরে বলল, ইউ আর সো কাইন্ড ম্যাডাম, যেখানেই চাকরি করি দু' বছর বাদে হলেও আমি এখানে আপনার আশ্রয়ে আসব এই আশা নিয়ে যাচ্ছি, আমার সঙ্গে অ্যাপ্লিকেশন আছে, যদি অনুমতি করেন তো এখনই সেটা রেখে যেতে পারি...।

থলথলে মুখের খাঁজে খাঁজে হাসি উছলে উঠল।—ট্যু ইয়ারস...এ লং টাইম মাই ডিয়ার, হাউ এভাব ইউ রিয়েলি দিস বিজনেস...অ্যান্ড দ্যাটস গুড। লোমশ হাত বাড়িয়ে দিলেন, লেট মি হ্যাভ ইট।

ব্যাগ খুলে তৎপর হাতে অতসী অ্যাপ্লিকেশনটা বার করে খসখস করে নিজের নাম সই করল। তারপর একটু থমকে জিগেস করল, ডেট দেব?

—ও সিওর...আই অলওয়েজ ওয়ান্ট টু বি ফেয়ার-ডেট, উইল ক্লেইম প্রায়রিটি, হু নোজ দ্যাট দি প্রেজেন্ট ইকনমিক্স টিচার উইল নট কুইট, আর্লিয়ার...আই ডোন্ট লাইক হার, নাইদার সি ডাজ মি, নাও আই হ্যাভ ওয়ার্কস, টু ডু উইশ ইউ গুড লাক।

বলবে না বলবে না করেও হেসে গড়িয়ে কর্তাটির কাছে প্রিন্সিপাল মিসেস খাসনবিশের তাকে কুমারী ভাবার কথাটা না বলে পারল না। আগে ইন্টারভিউর আদ্যোপান্ত বলে পরে এটুকু শুনিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হতাশায় যেন ভেঙে পড়ে সমর ঘোষাল অতসীর গা-ঘেঁষে শুয়ে পড়ল।—তাহলে বোঝ, ঝানু মহিলারাই তোমাকে কুমারী ভাবছে, পুরুষেরা হামলে পড়বে না কেন?

তাকে ঠেলে সরাতে চেষ্টা করে অতসী হাসতে হাসতে বলল, কিন্তু আমার তো মনে হয়, আমাকে কুমারী ভেবে ঠকেছেন বলেই উনি পরে বেশি সদয়।

সমর ঘোষাল তড়াক করে উঠে বসেছে, মিসেস খাসনবিশ সধবা না বিধবা?

জব্দ করার জন্যেই অতসী জবাব দিল, সধবাই শুনেছি, কিন্তু কপালে সিঁথিতে সিঁদুরের বংশও নেই (শেষেরটুকু সত্যি)।

সমর ঘোষাল চোখ পাকালো তুমি আর ওই স্কুলের ত্রিসীমানায় ঘেঁষবে না।

দেখা গেল চাকরির ভাগ্য অতসীরও খারাপ নয়। জলপাইগুড়ি স্কুলের চাকরিটা পেল। হেড মিসট্রেস তাকে পরের সপ্তাহ থেকেই জয়েন করতে বলেছেন। সমর ঘোষালও আপাতত নিশ্চিন্ত। এখান থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারি করা কঠিন কিছু নয়। সমূহ বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকল না।

কৃতজ্ঞতা আর ধন্যবাদ জানাতে অতসী তার পরদিনই এখানকার মেয়ে স্কুলের প্রিন্সিপাল মিসেস হৈমন্তী খাসনবিশের সঙ্গে দেখা করতে ছুটল। এবার দিনের সাক্ষাৎকারের মিয়াদ মিনিট দুই তিন। বললেন, দ্যাটস ইয়োর লাক, আই অ্যাম গ্ল্যাড। ওঠার আগে একবার শুধু জিগেস করলেন, যে পোস্ট-এই যাও হোল-টাইম সীনিয়র

টিচারের ইলেভেন টুয়েলভ ছেড়ে ক্লাস নাইন টেন-এও পড়াতে হয়...হোয়াট এলস ইউ ক্যান টিচ?

—বি. এ পাস-এ ম্যাথস ছিল...ইংরেজিও পড়াতে পারি।

অতসী পিছু হটার মেয়েই নয়।

—থিংক, দ্যাট উইল ড়ু, ও, কে—উইশ ইউ গুড লাক এগেন।

উঠে আসার আগে অতসী সবিনয়ে বলল, আমাকে যদি আপনি একটু মনে রাখেন...

জবাবে জাঁদরেল মহিলার দু'চোখ ওর মুখের ওপরে উঠে এলো।—ডোন্ট ওয়ারি, আই উইল গেট রিপোর্টস ফ্রম মাই কাউন্টার-পার্ট দেয়ার।

সাদা কথায় তার ছাত্রী পড়ানোর কেরামতির খবর এখানে বসেই তিনি পাবেন, মনে রাখা না রাখা এর ওপর নির্ভর করবে। অতসী আর কথা বাড়ানো নিরাপদ বোধ করল না।

যে সহজ এবং সবল ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ প্রায় সম-বয়সী একটি ছেলে আর একটি মেয়েকে এত কাছাকাছি টেনে এনেছিল, সেই ব্যক্তিত্বের সংঘাতেই দু'জনের দু'দিকে ছিটকে যেতে দু'বছরও সময় লাগল না। অবশ্য এই ব্যক্তিত্ব তখন আর পরস্পরের কারো কাছেই সহজ বা সবল মনে হয়নি। ভুল দু'জনেরই। স্বভাব বা ব্যক্তিত্ব কারোই বদলায়নি, কিন্তু গোড়ায় সেটা বুঝতে ভুল হয়েছে। প্রাথমিক মোহ কেটে যেতে এই ভুল দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

অতসীর ভুল, বিদ্যায় বুদ্ধিতে চাল-চলন আচার-আচরণে পাঁচজনের চোখে পড়ার মতো একজন জোরালো পুরুষকে জীবনের দোসর হিসেবে পেতে চেয়েছিল। সমর ঘোষালের মধ্যে এই গুণগুলোই সে পুরোমাত্রায় দেখেছিল। নিজের ওপর এমনি প্রবল আস্থা যে, বিয়ের পর ধরেই নিয়েছিল এই জোরালো পুরুষটি এর পর ষোল আনা তার। ধরে না নেওয়ার কারণও নেই, একে একে তার সমস্ত ইচ্ছে মেনে নেবার পরেই এই বিয়ে। এর পরেও এই জোরালো পুরুষের সত্তাসুদ্ধ নিজের দখলে টেনে আনতে পারবে তাই বা ভাবতে যাবে কেন? এটুকু পাবার মধ্যেই আনন্দ, পরিতৃপ্তি। নিজের জগতে বরাবরই সে একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী। সম্রাজ্ঞীর জগতে গুণধর শক্তিধর পাত্র-মিত্র থাকবে বই কি। কিন্তু তার ইচ্ছের ষোল আনা অধীনে থাকবে। সম্রাজ্ঞীর জগতের সে সম্রাট হলেও একই কথা। তারও ইচ্ছের অধীনে না থাকাটা বিদ্রোহের সামিল।

এখানেই ভুল অতসীর। তার ঘরের পুরুষের প্রবলতর সত্তার হদিশ সে পায়নি।

সমর ঘোষালের ভুল, অতসীর সব-কিছুর মধ্যে সে অনাড়ম্বর চরিত্রগত দৃঢ়তা দেখত, সহজ ব্যক্তিত্বের মহিমা আবিষ্কার করত। মোহগ্রস্ত না হলে তার মতো মানুষের অনাপোস প্রবল ইচ্ছা আর ব্যক্তিত্বের মধ্যে তফাৎটা চোখে পড়ার কথা। চোখে পড়ার মতো অনেক নজিরই তো তার সামনে ছিল, যা তখন পড়েনি। আর তার ফলে সমর ঘোষাল নিজেও মোহগ্রস্ত হয়ে ছিল না তো কি?

খিটিব মিটিব বাধতে লাগল অতি তুচ্ছ সব ব্যাপাব নিযে। দোষেব মধ্যে সমব ঘোষালেব সবেতে উৎসাহ, সবেতে আগ্রহ। বাড়িতে লোক-জন আসা শুরু হযেছে, ঘবে ভালো এক প্রস্থ টি-সেট ডিনাব সেট এনে বাখা দবকাব। শুনেছে ফ্যান্সি মাবকেটে এ-সব খুব ভালো পাওযা যায। কিন্তু সব-কিছু সেখানে সাদা পথে আসে না বলে পুলিশেব হানাদাবিও হয শুনেছে। ছোট বড হাঙ্গামাও বাধে। তাই অতসীকেও সঙ্গে নিতে ভয। কিন্তু একলা গেলে সমব ঘোষালেব আব ভযেব কি আছে, চোবাই মাল তো আব কিছু কিনতে যাচ্ছে না। স্কুল কবে ট্রেনে ফিবে বাড়ি পৌঁছুতে অতসীব প্রায বাতই হযে যায। এই ফাঁকে তাকে খুশি এবং অবাক কবে দেওযাব জন্য সমব ঘোষাল একাই ফ্যান্সি মার্কেটে চলে গেছে। তাব বিশ্বাস অনেক দেখে আব যাচাই বাছাই কবে চোখ-জুড়ানো জিনিসই এনেছে। কিন্তু দেখে শুনে অতসীব ঠাণ্ডা মুখে চাপা বিবক্তি, তোমাকে এমন সর্দাবি কবতে কে বলেছিল, আব দুটো চাবটে দিন সবুব সইলো না?

সমব ঘোষালেব ভেবা-চ্যাকা খাওযা মুখ।—কেন, তোমাব পছন্দ হল না?

—না হলে কি কবব, টি সেটেব এত হালকা বং ক'দিন চকচকে থাকবে? ডিনাব সেটেব ডিজাইন আবাব তেমনি জববজং—এ বাপু চলবে না, বদলে নিযে এসো।

তিন বাব কবে ছোটাছুটি কবে সমব ঘোষালের হাঁপ ধবাব দাখিল, আব দোকানদাবও বিবক্ত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অতসীব ষোল আনা পছন্দেব জিনিস আনাই গেল না।

অতসীব সময কম, এটা ওটা আনাব হুকুম হযই। নতুন আব এক সেট জানলা দবজাব পর্দাব কাপড আনতে বলে গেছে। একটু বেশি দাম দিযে যতটা সম্ভব পছন্দেব জিনিসই আনতে চেষ্টা কবেছে। কিন্তু দেখা-মাত্র মুখ গম্ভীব এবং বিরূপ মন্তব্য।—তোমাকে আনতে বলাই আমাব ভুল হযেছে, কি যে টেস্ট না তোমাব—এত দাম দিযে এই জিনিস নিযে এলে। থান থেকে কেটে এনেছ আব তো বদলানোও যাবে না—

টেস্ট-এব কথা শুনেই সমব ঘোষাল খাপ্পা।—এগুলো তাহলে বাস্তায ফেলে দাও, টাকা দিচ্ছি নিজেব পছন্দেব জিনিস নিযে এসো, আব কোনদিন আমাকে কিছু আনতেও বোলো না।

অতসীব কানেব দিকটা লাল হযে উঠছে।—তোমাব পছন্দেব সঙ্গে আমাব পছন্দ যদি না মেলে তাতে বাগেব কি হল?

সঙ্গে সঙ্গে তির্যক জবাব, আমাব পছন্দেব সঙ্গে তোমাব পছন্দ মেলে বলেই তুমি আমাব কাছে এসেছ।

—তাব মানে? তুমি দযা কবে আমাকে এনেছ?

—না, তুমি দযা কবে এসেছ।

চাযেব টেবিলে এমনি তুফান লেগেই আছে।

অতসীব নিজেব পছন্দেব কিছু কিনতে হলেও চলনদাব হিসেবে সমব ঘোষালকে সঙ্গে থাকতেই হয। দুটো বেড-শিট আব পছন্দসই একটা বেড-কভাব কেনা হবে।

প্রথমটা নিযে যাচাই বাছাইযেব প্রশ্ন নেই। অনেক দেখে যে দুটো বেড-কভাব নিযে বিবেচনা, সমব ঘোষালেব চোখে তাব একটা তো ভাবী সুন্দব লাগল। কিন্তু মতামত জিগেস না কবা পর্যন্ত সে চুপ।

—বলো, এ দুটোব কোনটা নেব?

সমব ঘোষাল সঙ্গে সঙ্গে আঙুল তুলে দেখালো, ওইটা অনেক বেশি সুন্দব।

ধাবণা, অতসীবও ওটাই বেশি পছন্দ। কিন্তু বলাব সঙ্গে সঙ্গে তাব খুঁতখুঁতুনি বাডতে থাকল। দুটোই আবাব পাশাপাশি খুলে দেখা হল। তাবপব মন্তব্য, ভালো তো...কিন্তু একটু বেশি গবজাস। আবো একটু বিবেচনাব পব অন্যটাই দোকানদাবেব দিকে এগিযে দিল, নাঃ, এটাই দিন।

সমব ঘোষাল নিঃসংশয, সে কিছু না বললে আগেব পছন্দেব জিনিসটাই ঘবে আসত।

কাউকে চাযে বা ডিনাবে ডাকলেও এমনি তুচ্ছ কাবণে মতবিবোধ। ঘবে কেবল চা-কফি ভিন্ন আব কিছু হয না। সবই, সবই কোনো ভালো বেস্তোবাঁ থেকে আসে। সমব ঘোষাল যদি বলে, কাজু খাস্তা কচুবি চিকেন-কাটলেট আব ভালো কিছু সন্দেশ আনাও তো অতসী ভুরু কুঁচকেই প্রথমে সব বাতিল বুঝিযে দেবে, তাবপব বলবে, কাজুব যা দাম তাব বদলে চিপস কবলেই হয। আজকাল ওসব কচুবি মিষ্টি-টিষ্টি অচল। তাব থেকে চীজ পকোডা ফিশ-ফিংগাব চিকেন প্যাটিস আব মিষ্টিব বদলে পেস্ট্রি অনেক ভদ্রস্থ হবে। ডিনাবে একজন যদি বলে বিবিযানি ফিশফ্রাই কোর্মা চাটনি মিষ্টি হোক, অনাজন অবধাবিত বলবে, অত তেল মশলাব হেভি মেনুব দবকাব কি, তাব থেকে ফ্রাযেড বাইস ফ্রাযেড প্রন চিলি-চিকেন আইসক্রিম হলে খাবাপ হবে কিছু?

ডেলি প্যাসেঞ্জাবি কবে এসে ঘবে ফিবে অতসী কিছুটা ক্লান্ত থাকে ঠিকই। মুখ-হাতে জল দিযে বেশ খানিকক্ষণ শুযে থাকে। কিন্তু সে-সময সমব ঘোষালেব কাছে যুনিভার্সিটিব কেউ এলে আব গৃহিণীব খোঁজ কবলে তাকে ডাকতেই হয। অতসীব ফর্সা মুখ থমথমে হযে ওঠে। গলা দিযে চাপা ঝাঁঝ বেবিযে আসেই।—তোমাব কি দযামাযা বলে কিছু নেই? আমি কি তোমাব শো-কেসেব পুতুল, যে আসবে আমাকে টেনে নিযে গিযে দেখাতে হবে।

বাইবেব লোক চলে যেতে তাব পবেও তপতপে মুখ দেখে সমব ঘোষালও বেগে গিযে একদিন কেবল বলেছিল, কে তোমাকে মাথাব দিব্যি দিযে ওই চাকবি কবতে বলেছিল, ছেডে দিযে দেখো না আমি চালাতে পাবি কি না?

সঙ্গে সঙ্গে অগ্ন্যুৎপাত।—কি বললে? আব আমি যদি বলি তোমাব চাকবি ছেডে দিযে দেখো। আমি চালাতে পাবি কিনা—ছাডবে? তোমাব চাকবিটা চাকবি আব আমাবটা নয?

কিন্তু সমব ঘোষাল বিসার্চেব কাজে আব পডাশুনায মন ঢেলে দিতে, দেখা গেল অতসী সব দিন আব অত ক্লান্ত থাকে না।

খানিক বাদে শয্যা ছেডে উঠে আসে, কাছাকাছিব মধ্যে ঘুব ঘুব কবে, এটা ওটা টুকটাক পবামর্শেব দবকাব হয, কিছু কেনাব কথা মনে পডে, নযতো কাবো বাডিতে বা কোথাও যেতে ইচ্ছে কবে।

সমব ঘোষাল বিবক্ত হয, আমাকে বিসার্চেব কাজটা ভালোভাবে কবতে দেবে না কি?

খুব গাযে মাখে না, ঠোঁটে হাসিব আভাস দেখা দেয। সেদিন বলল, ডক্টবেট হযে তোমাব বিদ্যেবুদ্ধি আব এমন কি বাডবে?

—বিদ্যেবুদ্ধি একটুও বাডবে না, সামনে এগোবাব বাস্তাটা পবিষ্কাব হবে।

—সেটা কত এগোবাব বাস্তা—বিডাব প্রোফেসাব ভাইস চ্যান্সেলাব পর্যন্ত? কথাব সুবে শ্লেষ, তখন তোমাব স্কুল মাস্টাব বউ মনে ধববে তো?

সমব ঘোষালেব আগে যা মনে হযনি এখন তা হয।

সে এম এ তে ফার্স্ট ক্লাস না পাওযাব দরুন এই একজনেবই কোনো আক্ষেপ দেখেনি, প্রস্তুতি সত্ত্বেও তাব আই এ এস পবীক্ষা দেওযা বন্ধ কবেছে, আব আজও তাব নাগালেব বাইবে যোগ্যতা আব প্রতিপত্তি অর্জন করুক এটা চায না।

গত দেড বছবেব মধ্যে সমব ঘোষাল বাব তিনেক কলকাতায গেছে। অতসী দুটো ভেকেশনে সঙ্গে এসেছে, কর্তব্যেব দাযে দু'তিন দিনেব বেশি শাশুডীব কাছে থাকেনি, বাপেব বাডিতে থেকেছে। সমব ঘোষালেব কাছে এ-ও কম দৃষ্টিকটু ঠেকেনি, কাবণ বযস্কা বিধবা মা তাদেব অপেক্ষায দিন গোনে, বউকে বুকে আগলে বাখতে চায। কিন্তু এ নিযে কিছু বললে অতসী তেতে ওঠে। বলে, এখানে এসে তো বেশিব ভাগ সময তুমি তোমাব বিসার্চেব প্রোফেসাব আব বই-পত্র নিযে কাটাও, আমাব কাঁহাতক ভালো লাগে—নিজেব মা-বাবা ভাই বোনেব কাছে ক'টা দিন থাকবো তা-ও দোষেব?

সমব ঘোষাল খুব ভালো কবেই জানে ওদেব অনটনেব সংসাবে অতসীব বন্ধনেব শিকডটা কোনদিনই খুব গভীবে পৌঁছযনি। এখনো মাঝে মাঝে মা-কে টাকা পাঠাতে হয বলে তাব বিবক্তি লক্ষ্য কবেছে। পবেব বোন দুটো অকর্মা বলে বাগ কবে।

তৃতীয বাবে অতসী সঙ্গে আসেইনি। তাব সাফ কথা, তোমাব তো এখন ডক্টবেট হওযাব স্বপ্ন, আব আমাব লিভ ভেকেন্সিব চাকবি কবে আছে কবে নেই ঠিক নেই, আমাব তো চেষ্টা কিছু কবতে হবে না এভাবেই চলবে?

—ছুটিব মধ্যে কোথায কি চেষ্টা কববে?

—আমাব যেটুকু চেষ্টা ছুটিব মধ্যেই কবতে হবে, স্কুল কামাই কবে চেষ্টা কবতে গেলে যা আছে তা-ও যাবে—তা'ছাডা এই ডেলি প্যাসেঞ্জাবিব চাকবি আব কতকাল কবব?

তর্ক না বাডিযে সমব ঘোষাল তাকে বেখে একলাই চলে গেছে। আব অতসী দুর্জয বাগে ফুঁসেছে। .ডেলি প্যাসেঞ্জাবেব চাকবি আব ভালো লাগে না এটা ঠিক, তা বলে চাকবি যাবাব ভয আব তেমন নেই বললেই চলে। যাব জাযগায আছে সেই মহিলা বিনে মাইনেয আবো এক বছবেব ছুটিতে। এলেও এই দেড বছবে পডানোয তাব যা সুখ্যাতি হযেছে, আব মেযেদেব কাছে সে এত পপুলাব এখন যে হেডমিসট্রেস তাকে এক-বকম আশ্বাসই দিযে বেখেছেন ওখানে থেকে গেলে ভবিষ্যতেব ব্যবস্থা তিনিই কবতে পাববেন। এদিকে এখানকাব বড স্কুলে চাকবিব আশাব

দিনও এগিযে আসছে। এই দেড বছবেব মধ্যে অতসীব প্রিন্সিপাল মিসেস খাসনবিশেব সঙ্গে দু'বাব দেখা হযেছে। দু'বাবই পুজোব পব গিযে দেখা কবাটা শ্রদ্ধানিবেদনেব সাক্ষাৎকাবই বলা চলে। মিসেস খাসনবিশ অখুশি হননি। বলেছেন, ইওব হেডমিস্ট্রেস স্পিক্স হাইলি অফ ইউ, বোসো আবো কিছু দিন দেখি কি কবতে পাবি।

একটা তুচ্ছ উপলক্ষ্য ধবেই অতসী ঠাণ্ডা মাথায শেষ ফয়সালা কবে ফেলল। এই লোকেব কাছে তাব সম্রাজ্ঞীব আসন টলে গেছে, এটা স্পষ্টই বুঝেছে। কিন্তু সম্রাজ্ঞী নিজে এ আসনচ্যুত হতে বাজি নয, এই এক ব্যাপাবে তাব কোনো আপোস নেই। অতএব শেষ ফযসালাব কিছু একটা উপলক্ষ্য কেবল দবকাব ছিল।

ইদানীং সমব ঘোষালেব কাছে তিনটি মেযে পডতে আসছিল। ছুটিব দিনে সকালে বা সন্ধ্যায। অতসী তাদেব ধাবে কাছে যেত না, ফবমাশ মতো শেবিং চা দিযে যেত। মেযেবা মাস্টাবমশাযেব স্ত্রীকে দেখাব জন্য বা একটু আলাপ কবাব জন্য উৎসুক বুঝেও সমব ঘোষাল এটা-ওটা বলে কাটিযে দিযে গম্ভীব মুখে কাজ সাবাব জন্য ব্যস্ত হয।

দিন কযেক এটা দেখে অতসী সোজাসুজি জিগেস কবেছে, এবা টাকা দিযে বাডতি বিদ্যার্জন কবতে আসে না এমনি?

—এমনি।

—ছেলেবা বুঝি আজকাল আব পডাশুনা নিযে তেমন মাথা ঘামায না, যত চাড মেযেগুলোবই?

বক্রোক্তিব জবাবে ভ্রূকুটি।

—ছুটি-টুটিব দিনে এ-বকমই তাহলে চলবে এখন?

—কেন, তোমাব অসুবিধে হচ্ছে?

—খুব বেশি বকম অসুবিধে হচ্ছে। দু'খানা মাত্র ঘব, উঠতে বসতে চলতে ফিবতে অসুবিধে হয কিনা তুমি বোঝো না?

সমব ঘোষালেব উষ্ণ জবাব, এবা খেলা কবতে আসে না, দু'খানা ছেডে দশখানা ঘব হলেও তোমাব অসুবিধেই হত...মনটাকে আব একটু উঁচুতে তুলতে চেষ্টা কবো অতসী।

—কি? কি বললে তুমি? তোমাব নিজেব মন এত উঁচুতে এখন যে ওই মেযেগুলোকে আমি হিংসে কবি এ-ও ভাবতে পাবলে তুমি? ওবা আমাব ঈর্ষাব পাত্রী?

অতসীব গলা খুব চডছে না কিন্তু দু'চোখ দিযে গলগল কবে বিদ্বেষ ঠিকবোচ্ছে। —চুপ কবে না থেকে জবাব দাও।

—আমি কিছুই ভাবি না, ভাবতে চাই না—তুমিই ভাবিযে ছাডছ।

দেহেব বক্ত-কণা মুখে আগেই জমছিল। মুখ থেকে চোখেব দিকে ছুটেছে। অন্য ঘবে চলে গেল। বাতে দু'জনে মুখোমুখি বসে খাওযা সাবল, কেউ একটি কথাও বলল না। বাতে সমব ঘোষালেব ঘুম আসতে দেবি হল। অতসী তখনো শয্যায আসেনি। সকালে ঘুম ভাঙতে শয্যাব দিকে তাকিযেই বুঝল বাতে সে এ-ঘবে আসেনি।

সকালেব প্রক্ষালন সেবে টেবিলে এসে বসল। মুখোমুখি চেযাবে অতসীও। শেবিং পেযালা চাযেব পট টোস্ট-এব ট্রে টেবিলে বাখতে অতসী দু'জনেব পেযালাতেই চা ঢালতে ঢালতে শেবিংকে বলল, ঠিক হ্যায—

শেভিং টেবিল ছেড়ে সরে গেল। দু'জনে দু-জনের পেয়ালা শুধু তুলে নিল, টোস্ট প'ড়ে থাকল। নিঃশব্দে দুটো চুমুক দেবার পর খুব ঠাণ্ডা গলায় অতসী বলল, শোনো, আমি ভেবে দেখলাম এ-ভাবে আর বাইরের ঠাট বজায় রেখে চলতে চেষ্টা না করাই ভালো, তাতে দিনে দিনে অশান্তি আরো বাড়বে।

পেয়ালা মুখের কাছেই ধরা, সমর ঘোষালেরও ঠাণ্ডা প্রশ্ন, কি করতে চাও?

—করার একটাই আছে, আমার মনে হয় যত ঠাণ্ডা আর শোভনভাবে সেটা করা যায় দু'জনের পক্ষেই ততো ভালো।

—ডিভোর্স...?

অতসীর ভুরুর মাঝে ভাঁজ পড়ল একটু। এইটুকুই জবাব। চায়ের পেয়ালা খালি করে সামনে রাখল।

পেয়ালায় রার দুই চুমুক দিয়ে সমর ঘোষাল জিগ্যেস করল, তোমার এ ডিসিশন ফাইনাল তাহলে?

—হ্যাঁ, ভাঙা পেয়ালা জুড়তে চেষ্টা না করাই ভালো...আমার যতদূর ধারণা, বনিবনা হল না আর চিন্তাধারায় খাপ খেল না বলে মিউচুয়াল কনসেন্টে ডিভোর্স চাইলে ব্যাপারটা সহজেই ফয়সালা হয়ে যায়...যায় না?

—তা যায়।

—তা'হলে তাই করো, সামনের বড় দিনের ছুটিতে আমরা কলকাতা চলে যাই...কিন্তু আমার দিকের কোনো উকিল জানাশোনা নেই...তোমার আছে?

সমর ঘোষাল সন্তর্পণে এক বড় নিঃশ্বাস তল করে নিল।—বাবার এক বিশেষ বন্ধুই এ সবের বড় উকিল, তোমার ব্যবস্থাও তিনি করে দিতে পারবেন। ব্যাপারটা তাতে সহজ হবে।

—খুব ভালো।...তাহলে এই কথাই রইলো, এই বড় দিনের ছুটিতেই আমরা কলকাতা যাচ্ছি, আমি আজ থেকেই আর ফিরছি না, সেখানে মেয়েদের হস্টেলে থাকার ব্যবস্থা করে নেব, স্কুলের টেলিফোন নাম্বার রেখে যাব, তেমন দরকার হলে য়ুনিভার্সিটি থেকে তুমি ফোন করতে পারো।

—হ্যাঁ, এতবড় ব্যাপারেও অতসী ধীর স্থির সম্রাজ্ঞীর ভূমিকা নিতে পেরেছে। সমর ঘোষাল সে তুলনায় কেবল স্তব্ধ এবং তাজ্জব।

অতসীর এটুকুই সান্ত্বনা।

ঘোষাল নয়, অতসী গাঙ্গুলী স্কুলে বসে সমর ঘোষালের ফোন পেয়েছে সাড়ে তিন মাস বাদে। ও-দিকের গলার স্বর ঠাণ্ডা—তোমার একটা চিঠি এসেছে, মনে হয় দরকারি...।

—কোত্থেকে?

—খামে এখানকার মেয়ে স্কুলের ছাপ দেখলাম।

—ও...। অতসীর গলায় আগ্রহ স্পষ্ট।—কি করা যায় বলো তো, রিডাইরেক্ট করলে তো আবার পেতে দেরি হয়ে যেতে পারে।

সমব ঘোষালেব গলায গম্ভীব শ্লেষ, আমাকে হাতে হাতে পৌঁছে দিতে বলছ?

ভিতবে যতই জ্বলুক, অতসীব গলায সম্রাজ্ঞীব হাসি।—খুব ইচ্ছে কবলে নিযে আসতে পাবো...কেন, তোমাব সেই ছাত্রীবা বাডিতে পডতে আসা বন্ধ কবে দিযেছে?

বাগে থমথমে গলা সমব ঘোষালেব। ফোন ছেডে দেব?

—না, চিঠি এই বাতটা তোমাব কাছেই থাক, আমি কাল ভোবেব ট্রেনে গিযে নিযে নেব, মনে হয ওখানকাব স্কুলেব চাকবিটা হল।...থ্যাংক ইউ।

ইচ্ছে কবেই সমব ঘোষাল সকাল সাডে আটটাব মধ্যে বাডি থেকে বেবিযে গেছে। অতসী আসতে শেবিং তাব হাতে চিঠি তুলে দিযেছে। অতসীব ফর্সা মুখ লাল। সম্রাজ্ঞীব ভূমিকায দাঁডিযেই সে এখানে এসেছিল।

প্রিন্সিপাল মিসেস খাসনবিশেব টাইপ কবা দু'লাইনেব চিঠি। যত শীগগিব সম্ভব দেখা কবাব নির্দেশ।

সীট ডাউন প্লীজ। লোমশ হাত দুটো টেবিলে বেখে মিসেস খাসনবিশ সামনে ঝুঁকলেন, এনিথিং সীবিযাসলি বং উইথ ইউ?

অতসী হঠাৎ ভেবাচ্যাকাই খেযে গেল। মনে মনে এই স্কুলে চাকবিতে জযেন কবাব নিশ্চিত আশা নিযেই এসেছে। শুকনো গলায বলল. বেগ ইওব পাবডন ম্যাডাম?

মিসেস খাসনবিশ এটুকুতেই অসহিষ্ণু।—তোমাব জলপাইগুডিব হেড-মিসট্রেস জানালেন, হাসব্যান্ডেব সঙ্গে তোমাব ডিভোর্স হযে গেছে, তবু আমি তোমাব দবখাস্ত থেকে এখানকাব ঠিকানা বাব কবেই চিঠি দিলাম, জাস্ট টু অ্যাভযেড সাসপিশন অফ মাই কাউন্টাব পার্ট দেযাব, সি লাইকস ইউ ভেবি মাচ, এই স্কুলেব খাম দেখলে তাব প্রথমেই সন্দেহ হত, আমি তোমাকে ভাঙিযে নেবাব মতলবে আছি, অ্যান্ড থট এ যুনিভার্সিটি প্রোফেসাব শুড আফটাব অল বি এ জেন্টলম্যান —দ্য লেটাব শুড বিচ ইউ। নাও টেল মি হোযাটস দি ম্যাটাব-হোযাট আই হার্ড...এ ফ্যাক্ট?

নানান অসুবিধে এডানোব জন্য জলপাইগুডিব হেডমিসট্রেসকে বলতে হযেছিল, চাকবি হলে এখানেও গোপন কবা যাবে না। অতসীব মনে ভযই ধবে গেল. এব জন্যে মিসেস খাসনবিশ কি তাকে বাতিল কবে দেবেন?

জবাব দিল, ঠিকই শুনেছেন...।

—বাট হোযাই...মে আই নো?

—বনিবনা হচ্ছিল না...ঠিক অ্যাডজাস্ট কবা যাচ্ছিল না।

—দ্যাট সিম্পল? সেটলড ইট মিউচুযালি?

অতসী মাথা নেডে সায দিল। মহিলাব দিকে চেযে কেন যেন একটুও ক্ষুব্ধ মনে হল না তাঁকে। প্রশ্ন শুনে আবও আশান্বিত।—আব ইউ হ্যাপি ইন জলপাইগুডি অব স্টিল ওযান্ট টু কাম হিযাব?

—আজ বললে আজই জযেন কবতে পাবি।

থলথলে মুখখানা হাসি হাসি।—ইউ হ্যাভ সাম লাক অ্যাট লিস্ট, যাঁর জায়গায় তোমাকে নেবাব কথা বলেছিলাম প্রিপাবেটবি টু বিটাযাবমেন্ট লিভ-এ যাচ্ছেন, ইউ মে জযেন নেক্সট মানডে—ইউ আব অতসী হোয়াট নাও?

—গাঙ্গুলি...।

—ওকে—কাম উইথ এ ফ্রেশ অ্যাপলিকেশন।

এই শিলিগুড়িতেই আবাব জীবন শুরু অতসীর। অতসী গাঙ্গুলিব। মনে হযেছে, এই ডিভোর্সেব ফলেই প্রিন্সিপাল মিসেস খাসনবিশেব তাকে নিযে নেবাব আগ্রহ আবো বেড়েছে। কিছু দিন যেতে ধাবণাটা আবো মনে বসে গেছে।...মহিলা তাঁব কোযার্টাবস-এ একা থাকেন, স্কুলেবই দুটো ক্লাস ফোব কর্মচাবী তাঁব বাবুর্চি এবং পবিচাবক। টিচাববা সকলেই জানে তাঁব স্বামী বর্তমান, কিন্তু চর্মচক্ষে কেউ সে ভদ্রলোককে কখনো দেখেনি। ভদ্রমহিলাব যেমন মেজাজ তেমনি যাকে বলে হুইমজিকাল। আব খেতেও খুব ভালবাসেন। দু'তিন জন পেযাবেব টিচাবকে মাঝে মাঝে বাড়িতে ডেকে এনে খাওযান। স্কুল কম্পাউন্ডেব মধ্যেই মেয়েদেব বোর্ডিং, আলাদা আলাদা ঘব নিযে একপাশে জনা-কযেক টিচাবও থাকে। অতসীবও এখানেই থাকাব ব্যবস্থা হযেছে। আধ বযসী বোর্ডাব টিচাব তিনজনেই অবিবাহিত এবং অনেকটা নিঃসঙ্গ বলেই প্রিন্সিপালেব স্নেহেব পাত্রী হযতো, কেবল তাদেবই নেমন্তন্ন কবে খাওযানো হয। ববাত জোবে অতসীও এদেব সঙ্গে যুক্ত এখন। স্বচক্ষে মিসেস খাসনবিশেব খাওযাব বহব দেখে মনে হযেছে, গতবখানা এমন হবে সে আব দোষেব কি। মহিলাব নতুন বযসেব চেহাবাখানা কল্পনা কবতে চেষ্টা কবেছে।...পুরুষ অতসীব দু'চোখেব বিষ এখন, তবু কাবো সঙ্গে এই মহিলাব সুখেব সংসাব-জীবন ভাবতে গিযে হাসিই পেযেছে।

জলপাইগুড়ি ছেড়ে এখানে আসতে পেবে অতসী ভেবেছিল তাব অতীত নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না, সকলে তাকে কেবল অতসী গাঙ্গুলী বলেই জানবে।...কিন্তু এসব ব্যাপাব বোধহয গোপন থাকেই না। টিচাববা তো জেনেইছে, মেয়েদেবও জানতে খুব সময লাগেনি। হতে পাবে এদেব কাবো-কাবো সঙ্গে যুনিভার্সিটিব কাবো ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। হতে পাবে ওই জাঁদবেল প্রিন্সিপালই পেযাবেব তিন বোর্ডাব শিক্ষয়িত্রীকে বলে দিযেছেন। না, মুখে তাকে কোনো টিচাব এ নিয়ে একটি কথাও বলেনি। কিন্তু তাকে নিযে কথা আব কানা-কানি যে হয এটা খুব ভালোই বুঝতে পাবে।...ঘুবিযে ফিবিযে সে সম্বন্ধে কিছু আভাস দেবাব লোকও একজন এই ক'টা মাসেব মধ্যে জুটেছে। স্কুলে মোট পাঁচজন পুরুষ টিচাব আছে। তিনজনই সাযেন্স গ্রুপেব, একজন জিওগ্রাফি টিচাব, আব একজন অপেক্ষাকৃত কম বযসেব আর্ট বা ড্রইং টিচাব অমবেশ ঘোষ। বোর্ডাব টিচাবদেব মুখে অতসী জেনেছে স্কুল কমিটিব একটি বিশিষ্ট মুরুব্বিব জোবে বছব তিনেক আগে অমবেশ ঘোষেব এখানে চাকবি হযেছে। বছব পঁযত্রিশ ছত্রিশ হবে বযেস। অবিবাহিত।

অতসীব এখন সাতাশ চলছে, সতেব বছব বযেস থেকে পুরুষেব চোখেব স্তুতি দেখে অভ্যস্ত, চিনে অভ্যস্ত। অতসী হলপ কবে বলতে পাবে সে এই স্কুলে আসাব পনেবো দিনেব মধ্যে ওই ভদ্রলোক তাব প্রেমে পড়ে গেছে। আব মাস তিনেকেব

মধ্যে তো আপনারজনের মতো আচরণ তার। এখন স্কুলেই দু'চারটে কথাবার্তা বলার ফাঁক খোঁজে। মাঝে-সাজে অতসী বিকেলের দিকে একটু হাঁটতে বা বেড়াতে বেরোয়। কিছুটা নিরিবিলিতে বেড়ানোর একটাই জায়গা। মহানন্দার দিকে গেলে তার সঙ্গে দেখা আর কথা হবেই। না গেলে অনুযোগ, যে একঘেয়ে জীবন আমাদের, হাঁটা চলার অভ্যাসটুকু ছাড়বেন না, শরীর মন দুই-ই ভালো থাকে, কিন্তু আপনি একদিন আসেন তো পাঁচ দিন আসেন না।

অতসী হাসে, যতটুকু সম্ভব সদ্ভাব রেখেই চলে। তাকে নিয়ে টিচারস রুমে আলোচনা হয় বলে ভদ্রলোক বিরক্তি প্রকাশ করে এবং বেশির ভাগ কি নিয়ে আলোচনা হয় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তা-ও প্রকাশ করে দেয়।

অস্বস্তি গিয়ে অতসীর বরং সুবিধেই হয়েছে। বাইরে বোঝা যায় না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে বেপরোয়া হয়ে উঠতে পেরেছে। এর ওপর বোর্ডার টিচার তিনজনের মুখে প্রিন্সিপাল তার পড়ানোর প্রশংসা শুনে আর স্বচক্ষে ছাত্রীদের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ মেলামেশার ফল দেখে আরো প্রসন্ন। ওই তিন টিচারের একজনকে বলেছিল, দা গার্ল হ্যাজ আ চার্মিং পারসোনালিটি অফ হার ওউন—ভেরি ডিফারেন্ট ফ্রম আদারস।

এরপর আর পরোয়া কাকে করে?

একে একে চার বছরে চার-চারটে ব্যাচ অতসী গাঙ্গুলির হাত দিয়ে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে বেরিয়ে গেল। প্রত্যেক ব্যাচের থেকে প্রত্যেক ব্যাচের ওপর অতসী গাঙ্গুলির হিসেবী আধিপত্য বিস্তার বেড়েই চলেছে। ব্যাচ বলতে সকলে নয়, অতসীর নিজস্ব বাছাই ব্যাচ, অন্য টিচারদের বিবেচনায় ওই দেমাকী টিচারের বিদ্রোহী ব্যাচ। তাদের চাপা আক্রোশ অতসী গাঙ্গুলি মেয়েগুলোর মগজ ধোলাই করে ছেড়ে দিচ্ছে। যে মেয়েরা মুখের দিকে চেয়ে কথা বলত না, তার সেই বাছাই মেয়েগুলো দেখতে দেখতে সেয়ানা হয়ে উঠছে, হেসে-হেসে তর্ক করে ভেরা-চ্যাকা খাওয়ার মতো মুখ করে প্রশ্ন করে, বুদ্ধিমতীর মতো তির্যক মন্তব্য করে, টিকা-টিপ্পনী কাটে।

যেমন, সোস্যাল সায়েন্সের বয়স্ক টিচার কি আলোচনা প্রসঙ্গে একজনের স্মরণীয় উক্তি কোট করেছিলেন, ম্যারেজ ইজ এ গ্রেট ইনস্টিটিউশন—অতসী গাঙ্গুলির এক সুশ্রী পেয়ারের ছাত্রীর আলতো মন্তব্য, মে বি, বাট হু ওয়ান্টস টু লিভ ইন অ্যান ইনস্টিটিউশান?

...ইংরেজি টেক্সটের এক গল্পে বর-কনের বিয়ের বর্ণনা ছিল। দেখতে সুশ্রী একটি ভালো ছাত্রীর হঠাৎ প্রশ্ন, বিয়ের সময় কনের ধপধপে সাদা পোশাক কেন?

শিক্ষয়িত্রীর সাদা-সিধে জবাব, সাদাটা শান্তি আর আনন্দের প্রতীক, মেয়েদের সেটা সব থেকে আনন্দের দিন।

তক্ষুণি প্রশ্ন, বরের গায়ে তাহলে কালো পোশাক কেন, তার কি তাহলে সেটা সব থেকে অশান্তি আর নিরানন্দের দিন?

নিজের বিয়ে-ভাঙা কপাল নিয়ে ওই রূপসী টিচার মেয়েগুলোর মাথা চিবিয়ে খাচ্ছে না তো কি? কিছু বলারও উপায় নেই, খামখেয়ালি প্রিন্সিপালের দিনে-দিনে

চোখেব মণিটি হযে বসছে। খুশি হযে তাঁব উঁচু ক্লাসেব ইংবেজিবও অর্ধেক দিন এই একজনকেই পাঠিযে দিযে নিজে বসে বসে লজেন্স চকোলেট খায। আবাব অবাকও হয, অতসী গাঙ্গুলিব বাছাই মেযেগুলোব একটাবও যদি পবীক্ষাব ফল খাবাপ হত, ইকনমিক্স-এ তো সক্কলেব ভালো নম্বব। অবাক কেবল ড্রইং মাস্টাব অমবেশ ঘোষ হয না, বলে আপনাব হাতে পডে মেযেগুলো সব সোনাব টুকবো হযে উঠছে সেটা যদি এঁবা দেখতেন, কেবল হিংসেব কথা—

অতসী গাঙ্গুলিব ঠোঁটেব ফাঁকে একটু মজা-ছোঁযা হাসি লেগেই থাকে। প্রশ্রযেব সুবে জিজ্ঞেস কবে, কেন, কি বলেন..?

ও-টুকুতেই উৎসাহে টুপটুপু ভদ্রলোক, আব বলেন কেন, ভালো কাবো সহ্য হয, আপনি নাকি নিজেকে এডুকেশন ফ্যাক্টবি ভাবেন একটা, সিলেবাস বা নিযম-টিযমেব ধাব ধাবেন না, কেবল পডানোব চমক দেখান, মেযেগুলোকে আস্কাবা দিযে আদবে বাঁদব কবে তুলছেন।

এই চাব বছবে ভদ্রলোকেব দুর্বলতা মেযেবাও টেব পেযে গেছে, বিশেষ কবে অতসী গাঙ্গুলিব বাছাই ব্যাচেব মেযেবা। নিজেদেব মধ্যে তাবা হাসা-হাসি কানা-কানি কবে, বলে, কেন বামন কি চাঁদেব দিকে হাত বাডায না—নইলে কথাটা এলো কোত্থেকে?

.. অতসী গাঙ্গুলিব আত্মবিশ্বাস ওই কাঞ্চনজঙ্ঘাব চুডোব মতো ঊর্ধ্বমুখী এখন। কাঁচা তাজা একটি মেযেকে তাব হাতে ছেডে দাও, তাব দখলে থাকতে দাও, দেখবে ববাববকাব মতো সে তাব হযে গেল। অতসী গাঙ্গুলি কল্পনায তাই দেখছে, তাই বিশ্বাস কবছে, অদূব ভবিষ্যতে তাবা তাব প্রতিশোধেব এক-একখানা হাতিযাব হযে উঠছে। আপন-আপন জগতে তাবাও এক-একটি সম্রাজ্ঞী হযে উঠছে। কেবল যে মেযেদেব তাব চাই তাদেব মোটামুটি সুশ্রী হতে হবে, পুরুষেব চোখ টানাব মতো কিছু প্রসাদ গুণ (অতসী গাঙ্গুলিব ভাষায ন্যাচাবাল ভাইটালিটি উইথ প্রসপেকটিভ ফেমিনাইন কাব্ভস) তাদেব থাকতে হবে। এটুকু থাকলে রুচি-বোধ, প্রখব বিচাব-বিবেচনা-যুক্তিবোধ, সব থেকে বেশি স্বাধীনচেতা আত্মবোধেব স্বাদ আফিম গিলিযে আপন আপন জগতে তাদেব এক-একটি সম্রাজ্ঞী কবে তোলা এখন কঠিন ভাবে না অতসী গাঙ্গুলি। এবাই তাব প্রতিশোধেব ভবিষ্যৎ হাতিযাব।

তাব বাছাই প্রথম ব্যাচেব পাঁচটি মেযেব মধ্যে বি. এ আব এম এ পডাব ফাঁকে চাবটিব বিযে হযে গেছল। তাদেব মধ্যে দু'জনেব ডিভোর্স হযে গেছে, একজনেব ডিভোর্স কেস কোর্টে ঝুলছে। চতুর্থজন তাব স্বামীকে ভেডা বানিযে বেখেছে। পঞ্চমজন একেব পব এক প্রত্যাশীদেব বাতিল কবে চলেছে। অতসীকে সে বলেছে, তাবও স্কুল টিচাব হবাব ইচ্ছে। হলে তো সোনায সোহাগা। একবাব যাবা তাব কেনা হযে গেছে, সময আব সুযোগ হলেই তাবা তাদেব গুরুদেবীব সঙ্গে যোগাযোগ বাখে। অতএব অতসী সকলেব সব খবব পায।...দ্বিতীয ব্যাচেব চাবজনেব মধ্যে বিযে হযেছে দু'জনেব, একজনেব ডিভোর্স কেস কোর্টে ঝুলছে, অন্যজন কোন এক বড কোম্পানিব বিসেপশনিস্ট-এব চাকবি জুটিযে স্বামীকে বুডো আঙুল দেখিযে চলে গেছে। বাকি

দু'জন প্রার্থীব আশায ছাই ঢেলে চলেছে। তৃতীয আব চতুর্থ ব্যাচেব সাত আব ছয তেবো জন এখনো অপেক্ষাকৃত নতুন। পুলকিত হবাব মতো ঘটনা এখনো ঘটেনি বটে। কিন্তু যোগাযোগ কাবো না কাবো সঙ্গে হযই। যাকে দেখে, কথা-বার্তা শুনে হাসি-খুশিব আত্মপ্রত্যয লক্ষ্য কবে অতসীব মনে হয প্রত্যেকে তাব নিজস্ব জগতেব সম্রাজ্ঞীটি হযেই বসে আছে। তাবা তাদেব দিনেব অপেক্ষায আছে।

এবাবেব বাছাই আটটি মেযেব ব্যাচেব যে-মেযেটি লিডাব, তাব ওপব অতসী গাঙ্গুলিব চোখ আবো চাব বছব আগে থেকে। ও মেযে যখন তাব ছাত্রীই নয, তখন থেকে। এখন বদ্ধ বিশ্বাস তাব এতদিনেব সব বাছাই মেযেদেব ওপব দিযে এই মেযে টেক্কা দেবে। দেবাব মতো সমস্ত গুণই তাব মধ্যে দেখেছে। মনে মনে অতসী গাঙ্গুলি তাকে বুকে আগলে বেখেছে।

.. চাব বছব আগেব সেই কৌতুক প্রহসনটুকু ভোলাব নয। কোন টিচাব অ্যাবসেন্ট থাকলে প্রিন্সিপালেব হুকুম-মতো লিজাব-আওযাবেব টিচাব তাব ক্লাস নিতে যায। ক্লাস এইটেব ম্যাথস টিচাব অনুপস্থিত। অতসী গাঙ্গুলি তাব ক্লাস নিতে ঢুকেছিল। ছাত্রী না হলেও সব ক্লাসেব মেযেবাই তাকে দেখলে খুশি হয।

মেযেদেব ফ্র্যাকশন জ্ঞান দেখাব জন্য অতসী ছোট্ট একটু বুদ্ধিব অঙ্ক দিযেছিল। একটা ফেন্স মানে বেড়াব মধ্যে পনেবোটা ভেড়া আছে, আব তাদেব জন্য তিবিশ দিনেব খাবাব মজুত আছে। কিন্তু একটা ভেড়া ফেন্স টপকে পালিযে গেল। তাহলে বাকি চৌদ্দটা ভেড়াব ওই মোট খাবাবে আবো কতদিন চলবে?

প্রশ্ন শুনে অনেক মেযেবই ধাঁধা লেগে গেল। অনেকেই কলম নিযে খাতাব ওপব ঝুঁকল। কোণেব বেঞ্চেব একটি মেযে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। ভাবী সুন্দব ফুটফুটে মেযে, মুখে আব চোখে দুষ্টু-দুষ্টু মিষ্টি-মিষ্টি হাসে, এখনই বেশ লম্বা আব সুডৌল স্বাস্থ্য, এক মাথা ঝাঁকড়া কোঁকড়া চুল। ছাই বংযেব ওপব টকটকে লাল বর্ডাব দেওযা স্কুল ড্রেসে চমৎকাব মানিযেছে।

অতসী গাঙ্গুলি জিজ্ঞেস কবল, হযেছে?

মাথা নাড়ল, হযনি। তাব পবেই প্রশ্ন শুনে অবাক।—ম্যাডাম, যে-ভেড়াটা ফেন্স টপকে পালালো সেটা কি পালেব গোদা ভেড়া?

অতসী গাঙ্গুলি হাঁ কযেক পলক।—তাব সঙ্গে অঙ্কেব কি সম্পর্ক?

—গোদা ভেড়া হলে তিবিশ দিনেব খাবাবই পড়ে থাকবে, বাকি চৌদ্দটা ভেড়াই ওটাব পেছু পেছু ফেন্স টপকে পালাবে।

অতসী গাঙ্গুলি হেসে সাবা, মেযেবা আবো বেশি। হাসি থামতে বলল, আচ্ছা গোদা ভেড়া নয ধবে নিযেই কবো।

মেযে জবাব দিল—এব আব কবাব কি আছে, একটা ভেড়াব দু'দিনেব খাবাব চৌদ্দটা ভেড়া খাবে—এব একটাব ভাগে ওযান-সেভেনথ পড়বে, তাহলে ট্যু ওযান-সেভেনথ ডে চলবে।

বসে পড়ল। অতসী গাঙ্গুলিব চোখে মুখে ঠোঁটে হাসি। হুকুম কবল, দাঁড়াও।

তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালো।

তোমাব নাম কি?

—নূপুব সবকাব।

—কংগ্র্যাচুলেশনস, তোমাকে আমাব মনে থাকবে। অন্য কযেকটি মেযে বলে উঠল, ও ববাবব আমাদেব ক্লাসেব ফার্স্ট গার্ল ম্যাডাম।

অতসী গাঙ্গুলি মনে বেখেছে। পব পব দু'বছব তাকে ফার্স্ট প্রাইজ নিতে দেখেছে। সঙ্গে ইংবেজিব আবো অনেক প্রাইজ নিতে দেখেছে। ক্লাস টেনে উঠে তাব ছাত্রী হযেছে। অতসী গাঙ্গুলি ইংবেজি এস্ এ-কম্পোজিশন ক্লাস নেয, প্রিন্সিপাল না এলে ইংবেজি টেক্সটও পডাতে হয। প্রিন্সিপালেব থেকে মেযেবা তাব ক্লাসেই বেশি মজা পায। নূপুব সবকাব তখনো অতসী গাঙ্গুলিব বাছাই ব্যাচেব কেউ নয, বাছাই ব্যাচ সে ছেকে তোলে এগাবো আব বাবো ক্লাসেব মেযেদেব থেকে। কিন্তু এই একটি মেযেব প্রতি আগে থাকতেই ষোল আনা মনোযোগ তাব। শুধু চেহাবাপত্র দেখাব মতো হযে উঠেছে তা-ই নয, দুষ্টুমিও বাডছে। এব ওপব তাব সুন্দব ইংবেজি লেখা।

গেল সপ্তাহে এসএ লিখতে দিযেছিল, 'এ পুওব গার্লস কনসট্রাকটিভ ফিউচাব প্ল্যান'। এ-বকম উদ্ভট বিষয নিযে লিখতে মেযেবা মজা পায। যে যতটা পাবে বুদ্ধি ফলাতে চেষ্টা কবে। অতসী গাঙ্গুলি এতদিনে জানে নূপুব সবকাব এখানকাব একজন নামী ডাক্তাবেব মেযে, তাব দাদাও ডাক্তাব। কিন্তু গবীব মেযেব ফিউচাব প্ল্যান বচনায কোনো মেযেই তাব সঙ্গে এঁটে উঠতে পাবল না। সুন্দব লিখেছে।

পবেব সপ্তাহে এব উল্টো বচনা লিখতে দিল সকলকে। ধবো তোমাদেব প্রত্যেকেব কাছে দশ লক্ষ কবে টাকা আছে, এবাবে যাব যাব কনস্ট্রাকটিভ ফিউচাব প্ল্যান লেখ।

সবাই দ্বিগুণ মজা পেযে লিখতে বসে গেল। একটু বাদে অতসী গাঙ্গুলিব চোখ গেল নূপুব সবকাবেব দিকে। সে লিখছে না, চুপচাপ বসে আছে।

—কি হল, ভাবছ?

নূপুব মাথা নাডল, ভাবছে না।

—তাহলে লিখছ না কেন?

জবাবে সেই দুষ্টু-দুষ্টু মিষ্টি-মিষ্টি হাসি। বলল, দশ লক্ষ টাকা থাকলে আমি কিছুই কবব না। এমনি চুপচাপ বসে থাকব।

এই মেযেকে নিযে অতসী গাঙ্গুলি কি কবে, কোথায বাখে? হাসতে হাসতে ভেঙে পডে সব মেযেকেই বলল, থাক বাপু থাক, আমাব ঘাট হযেছে, কাউকেই আব এই এসএ লিখতে হবে না।

সেকেন্ডাবি পবীক্ষায আবো দশ পনেবোটা নম্বব বেশি পেলে নূপুব সবকাব স্কলাবশিপ পেতে পাবত। ক্লাস ইলেভেনে এসে নূপুব আব আবো সাতজন তাব হাতেব মুঠোয। এদেব সকলকে উদ্যোগী হযে সে ইকনমিক্সএ টেনে এনেছে। তাতে বাছাই ব্যাচেব অবধাবিত লিডাব নূপুব সবকাব। লিডাব কাউকে কবতে হয না, ব্যাচেব সব থেকে চৌকস মেযেটি লিডাব আপনি হযে বসে। এই লিডাব বলতে যাব পবামর্শ

আব বুদ্ধি নিযে ব্যাচেব অন্যবা চলে ফেবে ওঠে বসে, গুরুদেবীব ভাব-ভাবনা আযনাব মতো দেখতে পায।

ক্লাস ইলেভেনে নূপুব ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধবেছে। দেখা-মাত্র অতসী গাঙ্গুলিব মনে হযেছে কিশোবীব সমস্ত চিহ্ন মুছে দিযে চট কবে মেযেটা যৌবনেব সিংহাসনে দিব্যাঙ্গনাব মতো বসে গেল।

তাব দিকে চেযে হাসিমুখে অভিনন্দন জানালো কংগ্র্যাচুলেশনস।

—থ্যাঙ্ক ইউ ম্যাডাম।

পড়াশুনাব মেজাজ আনতে গিযে সকলেব উদ্দেশে অতসীব প্রশ্ন, আচ্ছা, ইকনমি বলতে তোমবা কে কি বোঝো বলো তো? নূপুব আগে বলো—

উঠে দাঁড়ালো। অতসী গাঙ্গুলি পুরুষেব চোখ দিযে দেখছে ওকে, আব ভিতবটা ততো খুশি হযে উঠছে। এখন তো ছেনিখোন্তা মাল-মশলা সব তাব হাতে, যাবে কোথায।

নপুব একটু ভেবে জবাব দিল, ইকনমি হল খবচ কবাব এমন একটা আর্ট, যাতে কোনো মজা নেই।

অতসী গাঙ্গুলি জোবেই হেসে উঠল।—আমাব কাছে ফার্স্ট ক্লাস নম্বব পেলে, পবীক্ষাব খাতায গোল্লা।

নূপুব হাসতে হাসতে বসে পড়ল।

দু' বছবেব মগজ ধোলাইযেব ফাকে এই মেযে এমনি হাসিব জবাব অনেক দিযেছে।

প্রশ্ন কমিউনিস্ট আব ক্যাপিটালিস্টেব মধ্যে তফাৎটা কি চাব-চাবে আট লাইনেব মধ্যে লেখ।

নূপুব সবকাব দু'লাইনেব মধ্যে লিখেছে। 'কমিউনিস্ট বলবে এত কাবো থাকা উচিত নয। ক্যাপিটালিস্ট বলবে এতটা অন্তত সকলেবই থাকা উচিত।'

প্রশ্ন এ-দেশে প্রোটেকটিভ ফবেন হেল্প-এব চেহাবাটা কেমন?

নূপুবেব উত্তব লাইক এ ফিমেল ড্রেস উইদাউট অবস্ট্রাকটিং দি ভিউ।

আব একটা তৎপব জবাব মনে পড়লে অতসী গাঙ্গুলি হেসে বাঁচে না। প্রশ্ন ছিল, ডাইবেক্ট ট্যাক্সেশন আব ইনডাইবেক্ট ট্যাক্সেশনেব কিছু ভালো উদাহবণ দাও।

মেযেবা লিখতে শুরু কবে দিযেছে। কোণেব বেঞ্চ থেকে নূপুব আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। দেহেব ছাঁদ বদলেছে, কিন্তু চোখে আব ঠোঁটে সেই দুষ্টু-মিষ্টি হাসি লেগেই আছে।—একটা খুব বিযেল আব ওবিজিন্যাল এগজাম্পল দেব ম্যাডাম?

—ও শিওব?

—আমাব বউদি খবচেব সতেবো ফিবিস্তি দিযে যে-টাকাটা আদায কবে নেয, সেটা হল ডাইবেক্ট ট্যাক্সেশন। আব দাদা ঘুমিযে পড়লে যে টাকাটা তাব পকেট থেকে হাতিযে নেয, সেটা ইনডাইবেক্ট ট্যাক্সেশন।

এই উদাহবণ অতসী গাঙ্গুলিব চিবদিন মনে থাকবে।

এ-ব্যাচেরও বারো ক্লাসের পরীক্ষা এসে গেল। মেয়েরা পড়াশুনায় ব্যস্ত। অতসী গাঙ্গুলিও তার বাছাই ব্যাচকে যতটা পারে এগিয়ে দেবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। এ-বছরের মত তার মগজ ধোলাইয়ের পর্ব শেষ। সে পরিতুষ্ট, পরিতৃপ্ত। কেবল খেদ, নূপুর সরকারের মতো আবার একটি গড়ে তোলার মতো লিডার করে পাবে।

এর মধ্যে আর্ট টিচার অমরেশ ঘোষ মুখখানা বেজার করে বলল, আপনার এবারের ব্যাচের ওই নূপুর সরকার মেয়েটি এত মিষ্টি এত ভালো, কিন্তু বেজায় ফাজিল। আমি তো হঠাৎ বুঝতেই পারিনি কি বলছে।

অতসী গাঙ্গুলি নূপুরের নাম শুনেই সচকিত একটু।—কেন, কি বলেছে?

—স্কুল থেকে কাল বাড়ি যাবার পথে রাস্তায় দেখা হতে আমাকে বলল, একটু নতুন কিছু আঁকুন না সার? কি-রকম জিজ্ঞেস করতে বলল, যেমন ধরুন, উমা নয়, শিব উমার জন্য তপস্যায় বসেছে গোছের...।

অতসী গাঙ্গুলি মনে মনে হেসে অস্থির। এ-রকম কথা নূপুর বলবে না তো কে বলবে। পরে ওর সঙ্গে দেখা হতে ছদ্ম কোপে চোখ পাকিয়েছে, এই মেয়ে আর্ট টিচার অমরেশবাবুকে কি বলেছিস?

ক্লাসের বাইরে নূপুর সরকারের এই ব্যাচটাকে তুমি ছেড়ে তুই বলা শুরু করেছিল। আর এই ব্যাচের মেয়েরাও বাইরে তাকে ম্যাডামের বদলে দিদি বলে। অতসীদি।

পরীক্ষা হয়ে গেল। বিদায়ের দিন এলো। অতসী গাঙ্গুলি প্রত্যেক ব্যাচকে যা বলে, নূপুর সরকারের হাত ধরে এই ব্যাচকেও তাই বলল।—মনে রেখো, ভালো যদি কিছু করে থাকি তোমাদের লয়েলটিটুকুই কেবল আমার প্রাপ্য, আর কিছু চাই না।

অতসী গাঙ্গুলির বাছাই ব্যাচের সব মেয়েরাই যুনিভার্সিটিতে ঢুকে ইকনমিক্স অনার্স পড়ে। এই ব্যাচে ব্যতিক্রম হল, নূপুর সরকার, ইংরেজি অনার্স নিয়ে ভর্তি হল। অতসী গাঙ্গুলি এই মেয়ের বেলায় সেটাই স্বাভাবিক ভেবেছে। এটাই ওর সব থেকে প্রিয় সাবজেক্ট।

মনে মনে ভাবল, এটা মন্দ হল না, একজনের সম্পর্কে টাটকা খবর কিছু কিছু পাওয়া যাবে।

এখন ওই প্রিয় ছাত্রীর বাড়িতে যাতায়াতও সহজ হয়ে গেছে অতসী গাঙ্গুলির। ফাঁক পেলে নূপুরও বোর্ডিং-এ এসে তার সঙ্গে গল্প করে, চা-চপ-কাটলেট রসগোল্লা সন্দেশ খেয়ে যায়।

ঠোঁট টিপে হেসে অতসী গাঙ্গুলি জিজ্ঞেস করে, তোদের ডক্টর ঘোষাল কেমন পড়াচ্ছে?

প্রায় দু'বছর আগে সমর ঘোষালের ডক্টরেট হবার খবর অতসী ঠিকই রাখে।

—খুব ভালো, তবে বেজায় গম্ভীর আর সীরিয়াস। তার প্রসঙ্গ কেন নূপুরও জানে।

—সেটা বরদাস্ত করছিস নাকি তুইও! চোখে মুখে মজার হাসি।—এতদিন আমার কাছে কি শিখলি তাহলে?...এক কাজ করতে পারিস, মেয়েরা স্পেশাল সাহায্যের জন্য ছুটির দিনে তার বাড়িতে পড়তে আসত, গাম্ভীর্য আর সীরিয়াসনেস খাঁটি কি নকল বোঝার জন্য তুইও এ-সুযোগটা নিতে পারিস।

নৃপুব হেসেছে কেবল, জবাব দেয়নি।

বি এ ফাইনালেব ছ'মাস আগে একদিন এসে খবব দিযেছে, কি-যে মুশকিল হল, পবীক্ষাটাব মুখে ডক্টব ঘোষাল এই যুনিভার্সিটি ছেড়ে কলকাতাব না কোন যুনিভার্সিটিব বিডাব হযে চলে গেলেন।

অতসী গাঙ্গুলিব মুখখানা তেতে উঠল।—যাবে না তো কি, নিজেব স্বার্থ ছেড়ে কে আব আমাব মতো তোদেব জন্য প্রাণটা দিযে পড়ে থাকে।

ফাইনাল পবীক্ষাব খবব বেরুতে নৃপুব এসে জানালো জার্নালিজম নিযে এম-এ পড়াব জন্য সে কলকাতায চলল। অতসী গাঙ্গুলি প্রথমে ভাবল, ওব মাথায আসেও। পবে মনে হল, এই সাবজেক্টই ওব পক্ষে ভালো, এ-লাইনে থাকলে গর্তেব অনেক সাপ টেনে বাব কবতে পাববে, অনেকেব মুখোশ ছিঁড়ে-খুঁড়ে দিতে পাববে।

আবো বছব আড়াই কেটে গেছে। অতসী স্কুলে যাবাব জন্য তৈবি হযেছে। বেযাবা তাব হাতে একটা ডাকেব খাম দিযে গেল। খামেব লেখাটা চেনা-চেনা মনে হল। খাম খুলে দেখল তাই। নিচে নৃপুবেব নাম।

শ্রীচবণেষু,

অতসীদি, আশা কবি আমাকে ভুলে যাননি। গত আড়াইটা বছব দ্রুত তালে কেটে গেল। জেনে খুশি হবেন, এম এ জার্নালিজম এ ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছি। তাব আগে থেকে একটা কাগজে শিক্ষানবিসি কবছিলাম, এখন সেই কাগজেব সঙ্গেই যুক্ত হযেছি।

আমাদেব ব্যাচকে বিদায দেবাব কালে আপনি বলেছিলেন লযেলটিটুকুই আপনাব প্রাপ্য, আব কিছু চান না। অন্যদেব কথা জানি না, আমি ভুলিনি। এখানে পড়াব সময ইনভেসটিগেটিভ জার্নালিজম, বিষযটিব ওপব আমি বেশি গুরুত্ব দিযেছিলাম। আপনাব প্রতি লযেলটিব কথা ভেবে আমাব প্রথম অনুসন্ধানেব বিষয ছিল বিবাহ-বিচ্ছেদ। অন্য দেশ বা বাজ্যেব নয, কেবল এই বাংলাব। ভেবেছিলাম কাজটা কঠিন হবে না, কিন্তু শুরু কবে দেখি আমি অথৈ জলে। হাজাব-হাজাব কেস-এব ফযসালা হযে গেছে, হাজাব-হাজাব পেনডিং কেস্ লাখেব দিকে গড়াতে চলেছে। দ্রুত নিষ্পত্তিব জন্য বিদেশেব মতো অদূব ভবিষ্যতে এখানেও ডিভোর্স কোর্ট গজাবে। কাগজেব সঙ্গে যুক্ত থাকাব ফলে কেস স্টাডি কবাব কিছু সুবিধে হযেছে। ডিভোর্স ছাড়া গতি নেই এমন বেদনাকরুণ ঘটনা অবশ্যই অনেক পেযেছি। কিন্তু সামগ্রিক সংখ্যাব তুলনায নগণ্য। শতেকে নব্বুইটিব কাছাকাছি দেখলাম বিচ্ছেদেব মূলে ব্যক্তিত্বেব সংঘাত পাবসোনালিটি ক্ল্যাশ। কত তুচ্ছ কাবণে এই সংঘাত স্বামী-স্ত্রীব মাঝখানে বিচ্ছেদেব প্রাচীব তুলে দিতে পাবে দেখে আমি তাজ্জব। পবস্পবেব সদয বোঝা-পড়াব চেষ্টা, একটু অ্যাডজাস্টমেন্টেব চেষ্টা এমন নির্দযভাবে অনুপস্থিত হয কি কবে? এব নাম ব্যক্তিত্ব না সুপাবইগো? —আত্মকেন্দ্রিক অহংকাব? যাক, এব পবে বেছে-বেছে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকাবে নেমেছিলাম। প্রথমেই কাব কাছে গেছি আপনি নিশ্চয অনুমান

কবতে পাবছেন—ডক্টব সমব ঘোষালেব কাছে। কলকাতায এসে তাঁব সঙ্গে আমাব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়নি। তাঁব সাহায্য সর্বদাই পেযেছি। এ-ব্যাপাবে দেখলাম একমাত্র তিনিই অকপট হতে পেবেছেন, নিজেব দোষ-ত্রুটি স্বীকাব কবেছেন। অন্য স্ত্রী-পুরুষদেব বেশিবভাগ ডিভোর্সেব পবেও আক্রোশ নিযে বসে আছেন, পবস্পবেব বিরুদ্ধে কাদা ছোঁডাছুঁডি কবছেন।

...এবপব আবো একটু সমাচাব আছে। আসছে সপ্তাহে ডক্টব ঘোষালেব সঙ্গে আমাব বিযে। পাবস্পবিক বোঝাপডা বা অ্যাড ়মেন্ট সম্ভব কিনা সেটা ষোল আনা যাচাই কবে দেখাব জন্য একজন ভুক্তভোগীকেই জীবনে টেনে নিলাম। লযেলটিব-এব থেকে বড প্রমাণ আপনাব সামনে আব কি বাখতে পাবি? অবশ্য আপনাব তুলনায আমাব একটু সুবিধেও আছে। বযসে তিনি আমাব থেকে দশ-এগাবো বছবেব বড, আব স্নেহ নিম্নগামী, চেষ্টা সত্ত্বেও আমাব দিক থেকে বোঝাপডাব ত্রুটি দেখলে স্নেহেব দাযে তিনি উপেক্ষা কববেন বা শুধবে দেবেন এই বিশ্বাস আব জোবও আমাব মনে আছে। ...এব মধ্যেও আপনাব কথা আমি ভেবেছি। আপনাব মানসিকতাব অনাপোস জয যদি এখনো চান, মনে হয সে-সমযও একেবাবে ফুবিযে যাযনি, এখনো আপনি আমাদেব আর্ট টিচাব অমবেশ ঘোষেব দিকে ফিবে তাকাতে পাবেন। প্রণতা, আপনাব স্নেহেব নূপুব।

ক্রোধে আব আক্রোশে অতসী গাঙ্গুলি কাপছে থবথব কবে। সেই ক্রোধ আব আক্রোশ চোখ দিযে ভেঙে পডতে শয্যায আছডে পডল। অনেক-অনেকক্ষণ একভাবে পডে বইলো।...প্রথম ঘণ্টাব ক্লাস মিস হযে গেছে। উঠল। মুখ-হাত ধুযে এসে সামান্য কুঁচকে যাওযা শাডিটা বদলে আবো একটু চকচকে শাডি পবল। অভ্যস্ত তৎপবতায আবাব প্রসাধন সেবে নিল। আর্যনায দাঁডিযে বক্তিম দুই কানে, নাকেব ডগায, দু'চোখেব কোণে আব একটু পাউডাব বোলালো। ঘব থেকে বেবিযে দবজা বন্ধ কবে কবিডোব ধবে দ্রুত সিঁডিব দিকে চলল।

দ্বিতীয ঘণ্টাব ক্লাস না মিস হয।

দীপ জ্বেলে যাই

মেন্টাল অবজাবভেটবি। ছবিব মত ঝকঝক কবছে বাডিটা। সামনে-পিছনে বাগান। দু'দিকেব বাস্তাগুলো যেন কালো বার্ণিশ কবা। ভিতবে জনা চল্লিশেক বোগী। বোগী বলা ঠিক হবে না। বোগিণীও আছে চৌদ্দ-পনেব জন। আলাদা আলাদা ঘব। মস্তিষ্ক-বিকৃতিব কাবণ সকলেব এক নয। চিকিৎসা ব্যবস্থাও বিভিন্ন।

অদূবে নার্স কোযার্টার্স। বাঙ্গালী আব ফিবিঙ্গী মেযেব জগা-খিচুডি। একে অপবেব ইযাবকি-ফাজলামোগুলো মক্স কবে। দিশি মেযে মেম-সাহেবেব বাংলা নকল কবে মুখ ভেঙায। মেম-সাহেব দিশি মেযেব পিঠে কিল বসিযে ছুটে পালায। শিথিল অবকাশটুকু হাসি-ঠাট্টায ভবাট থাকে।

তবু এবই মধ্যে একজনকে যেন সমীহ্ কবে চলে ওবা। বাইবে নয, মনে মনে। ঈর্ষা বলা যেত, কিন্তু সে কথা ভাবতে নিজেবাই লজ্জা পাবে। বেখা মিত্র, সিষ্টাব-ইনচার্জ। কর্তামো কবে এ অপবাদ তাব শত্রুও দেবে না। আগেব বুডি ইনচার্জ যা ছিল, বাবা। নাকেব জলে চোখেব জলে এক কবে ছাডত। এ ববং ভালো, দবকাব হলে উল্টে তডপে আসা যায। তাছাডা ছিল তো ওদেবই একজন, এখন না হয মাথাব ওপব উঠে বসেছে। চ্যাবিটি মিশনেব মেযে না হলে এতদিনে বাডি-গাডিওযালা ঘবে ববে ভবে যেত কোন কালে এ সকলেই উপলব্ধি কবতে পাবে। সাবা দেহে রূপ আব স্বাস্থ্য যেন একসঙ্গে মাথা খুঁডছে। কিন্তু এ নিযেও কটাক্ষ কবে না কেউ। কাবণ নিজেই সে নিজেকে আগলে বাখতে বাস্ত। প্রাচুর্যেব আভাসটুকু অবশ্য ঢেকে বাখা সম্ভব নয।

হাসপাতালেব বডকর্তা মনস্তাত্ত্বিক কর্ণেল পাকডাশী। নামেব মত মানুষটিও গুরুগম্ভীব। কাছে এলেই বুকেব ভেতবটা গুবগুব কবে ওঠে। নার্স, এ্যাসিসট্যান্ট সকলেবই। তাঁবই দু'দুটো উদ্ভট এক্সপেবিমেন্ট সফল কবেছে বেখা মিত্র। নির্দেশ মত নিখুঁত অভিনয কবেছে। এতটুকু ভুল হযনি, এতটুকু ত্রুটি ঘটেনি। এক বছবেব মধ্যে পব পব দু'জন মৃত্যুপথযাত্রী বিকৃত-মস্তিষ্ক মানুষ সুস্থ নিবাময হযে ঘবে ফিবে গেল। কর্ণেল পাকডাশী লিপিবদ্ধ কবছেন তাব গবেষণাব ইতিবৃত্ত। হযত বেখা মিত্রবও নাম থাকবে তাতে। কিন্তু ইতিমধ্যে তৃতীয বোগীব আবির্ভাব ঘটল। একই বোগ, একই কাবণে মস্তিষ্ক-বিকৃতি। কর্ণেলেব আগ্রহ বাডে। বেখা মিত্রব ডাক পডে তৃতীয বাবও। প্রথম সফলতাব পবে সহকর্মিণীদেব মনে হযেছে মেযেটা যেন বদলেছে একটু। দ্বিতীয বাবেব পবিবর্তন আবো সুস্পষ্ট। কথা বলা কমিযেছে। অকাবণ হাসিখুশীটুকুও। চলনে-বলনে কেমন যেন একটু বিচ্ছিন্নতা। ফিবিঙ্গি মেযেবা সকৌতুকে নিবীক্ষণ কবে তাকে। স্বজাতীযাদেব মধ্যে চাপা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ কবে ফেলে কেউ কেউ, যশস্বিনী হযে পডেছেন, প্রশংসায পঞ্চমুখ সকলে, মাটিতে পা পডবে কেন।

কর্তব্যবোধে আব একজন হযত থামাতে চেষ্টা কবে তাকে, এই, শুনলে দেবে'খন।

—শুনুক, কর্ণেলেব পকেট-ঘডি হযে থাকলে অমন ববাত সকলেবই খুলত।

—যাঃ, মেযেব মত মানুষ কবেছে, কি আবোল-তাবোল বকিস? বিবক্তি প্রকাশ কবেছিল নার্স মহলেব দ্বিতীয তাবকা বীণা সবকাব। শিক্ষা এবং রুচিজ্ঞান আছে। বুডি সিস্টাব-ইন-চার্জেব পব সেই হতে পাবত সর্বেসর্বা। কিন্তু দু'বছব আগে কোথা থেকে হুট কবে বদলি হযে এলেন কর্ণেল, সঙ্গে এল বেখা মিত্র। তাব দিন গেল।

এবই মুখ থেকে প্রতিবাদ শুনে পূর্বোক্ত শুশ্রূষাকাবিণী চুপসে গেল যেন। প্রসঙ্গ অন্য দিকে ঘুবিযে দিল, সেকথা কে বলেছে, আমি বলছিলাম অমন জযঢাক বাজাবাবও কোন মানে হয না। আসলে পুরুষগুলিই সব ভেডা-মার্কা, রূপসীব মুখে দু'টো নকল ভালবাসাব কথা শুনেই গলে জল হযে গেল। পাগল না হাতী।

কিন্তু এও যে বাগেব কথা সকলেই উপলব্ধি কবতে পাবে। দ্বিতীয বোগীটিব ভাব কর্ণেল প্রথমে বীণা সবকাবকেই দিযেছিলেন। বেখা মিত্রব মতই সুনাম অর্জনেব

আশায প্রাণপণ চেষ্টা কবেছে কর্ণেলেব নির্দেশ কলেব মত মেনে চলতে। অভিনযে এতটুকু ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না তাবও। তবু পাবল না। তাকে সবিযে কর্ণেল বেখাকে নিযে এলেন আবাব। এখনো ভেবে পায না, সেই মুমূর্ষু উন্মাদকেও সে কি কবে ছ'মাসেব মধ্যে একটু একটু কবে সম্পূর্ণ নীবোগ কবে তুলল।

দুর্নিবাব কৌতূহলে ঠাট্টাব ছলেই সে বেখাকে জিজ্ঞাসা কবেছিল, কি কবে কি কবলি বে?

নিজেব ঘবেব চৌকাঠেব কাছে চুপচাপ দাঁডিযেছিল বেখা মিত্র। প্রশ্ন শুনে তাব চোখে চোখ বেখে নীববে চেযেছিল কিছুক্ষণ। পবে তেমনি হালকা জবাবই দিযেছে, গলা জডিযে ধবে বললাম, ভালবাসি প্রিযতম, আগেব সব কথা ভোলো—

বীণা হেসে ফেলেছিল।—ভুলল?

শব্দ কবে হেসে উঠেছিল বেখা মিত্রও।—ভুললই তো।

বীণাব মনে হযেছে, ইচ্ছে কবেই সে তাব প্রশ্ন এডিযে গেল, যশেব ডালি ভবিষ্যতেও আব কাউকে ভাগ কবে দিতে বাজি নয বোধ হয। ভ্রূ কুঁচকে বলল, তা এমন অভিনয কবিস যদি থিযেটাব বাযস্কোপে ঢুকে পড গে যা না, হাসপাতালে পচে মবছিস কেন?

—পাবি। হলিউড থেকে ডেকেও পাঠিযেছে। কিন্তু আমি গেলে তোব ছোট ডাক্তাব হার্ট ফেল কববে, সেজন্যেই যেতে পাবছি না।

হাসতে হাসতে মুখেব ওপবেই দবজা বন্ধ কবে দিযেছিল। বীণা সবকাব স্তব্ধ। ..ছোট ডাক্তাব নিখিল গুহ। বেখা মিত্র না এলে এতদিনে সত্যিই একটা মধুব সম্পর্ক গডে উঠতে পাবত। সে জ্বালা আছেই। কিন্তু তবু বাগতে পাবেনি। কাবণ, আজ পর্যন্ত ছোট ডাক্তাব এই মেযেটিব কাছ থেকে শুধু নীবস অবহেলা ছাডা আব কিছু পাযনি। কর্ণেলেব হাতেব মেযে না হলে এতদিন এখানে আব চাকবী কবতে হত না ওকে।

কিন্তু পুবানো কথা থাক। তিন নম্বব বোগী এসেছে। তৃতীয বাব ডাক পডেছে বেখা মিত্রব। নার্স কোযার্টাবেব আবহাওযা চঞ্চল। কর্ণেলেব তলব শুনলে পডিমবি কবে ছুটে যাওযাই বীতি। কিন্তু ওব ঘবেব দবজা বন্ধ এখনো। কবছে কী? ঘুমুচ্ছে? না সাজছে?

কিন্তু বেখা মিত্র কিছুই কবছে না। শিথিল আলস্যে স্রেফ শুযে আছে কডিকাঠেব দিকে চেযে। বুকেব ওপবেব বইখানা দেখলেও সহকর্মিণীবা হাঁ কবে ফেলত হযত। বিবেকানন্দেব কর্মযোগ। তুলে নিল। উল্টে-পাল্টে দেখল একবাব। হঠাৎ ছুঁডে ফেলে দিল দূবে। ঘবেব কোণে আলনাব নীচে গিযে আশ্রয নিল সেটা। উঠে বসল পা ঝুলিযে। পবনেব বেশ-বাসেব দিকে তাকালো একবাব। চলে যাবে। ঠোঁটেব কোণে হাসিব আভাস। চোখেব সামনে ভাসছে দু'টি মুখ। সমবেশ চক্রবর্তী আব মাধব সোম। সুপুরুষ দু'জনেই। কিন্তু পাগল হলে কি বীভৎসই না হয মানুষ। প্রাণেব জন্য চিবকাল কৃতজ্ঞ থাকবে বলে গেছে। বেখা মিত্র নিজেব মনেই হেসে উঠল।...তা থাকবে হযত।

আযনাব সামনে এসে দাঁডাল। একটু প্রসাধন দবকাব। বুডো কর্ণেল খুঁটিযে খুঁটিযে দেখবে আবাব। চোখ নয ত, যেন দু'খানা এক্স-বে'ব কাচ। কিন্তু আযনাব দিকে চেযে

চেযে আত্মবিস্মৃত তন্ময়তা নেমে এলো কেমন। চেযেই আছে। দেখছে। কিন্তু কে দেখছে কাকে? কে বেখা মিত্র? ওই শুভ্রশ্রী নাবীমূর্তি? কি আছে ওতে।...বক্ত, মাংস, নীল নীল কতগুলো শিবা-উপশিবা। গা ঘিন ঘিন কবে উঠল। তাবপব?...শুকনো, কঠিন, কুৎসিত কঙ্কাল একটা। শিউবে উঠল আবাবও। তাহলে কে দেখছে? আব বাকি থাকল কী?

দবজাব গাযে শব্দ হল ঠক ঠক কবে। বিষম চমকে উঠল সে। আবাব বেযাবা পাঠিযেছে নিশ্চয। দবজা না খুলেই জবাব দিল, 'বলো গিযে এক্ষুনি যাচ্ছি—।' বুড়ো দেবে দফা সেবে। চটপট এপ্রোন পবে নিযে হুডটা মাথায চড়ালো। জুতো বদলাতে গিযে আলনাব নীচে কর্মযোগেব দুর্দশা দেখে জিভ কাটল তিন আঙুল। তুলে নিযে ঝেড়ে-ঝুড়ে একবাব কপালে ছুঁইযে ড্রয়াবে বেখে দিল বইখানা।

নাকেব ডগা থেকে চশমা কপালে তুলে দিলেন কর্ণেল।—বোসো। পেশেন্ট দেখেছ?

বেখা ঘাড় নাড়ল, দেখিনি।

—হাউ এ্যাবসার্ড। —এ থার্ড কনসিকিউটিভ সাকসেস উইল মেক ইউ এ ফিনিসড এ্যাকট্রেস মাই ডিয়াব। হেসে কাজেব কথায এলেন, সেইম কেস, সেইম ট্রিটমেন্ট। কিন্তু একটু গণ্ডগোল আছে। নাটক নভেল কি সব লিখত টিকত। ইউ শুড বি মোব এলার্ট, এমনিতেই আধ পাগল এসব লোক। টাইপ-কবা কেস-হিস্ট্রি বাড়িযে দিলেন তাব দিকে, দেখো—।

কাগজগুলো নিযে বেখা চোখ বুলোতে লাগল। এক অক্ষবও পড়ল না। কাবণ, এবাবে আব বোগী ভালো হবে না সে জানে। আব কিই বা হবে পড়ে। নিঃস্ব, বিক্ত, সর্বগ্রাসী শূন্যতাব মাশুল দিচ্ছে সেই ইতিহাসই তো। তাকে নতুন কবে বোগে ফেলতে হবে আবাব। ভালবাসাব বোগ। যে নাবীব অমোঘ স্মৃতি মানুষটাকে দেউলে কবেছে, বিকল কবেছে, তাব মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে। কিছুদিনেব জন্য তাব মানসপটে অধিষ্ঠাত্রিণী হবে বেখা মিত্র। এটুকুই চিকিৎসা। তাবপব এই নতুন বোগ আব কাচা মোহ ছাড়াবাব কলাকৌশল ভালই জানেন মনোবিজ্ঞানী কর্ণেল। ছদ্ম-গাম্ভীর্যেব আড়ালে বেখা হাসছে মনে মনে। বুড়োব সকল আশায ছাই পড়বে এবাব।

কিন্তু বেখা মিত্রব সঙ্কল্পে ছেদ পড়ল বোধ কবি প্রথম দিনই। দোতলায কোণেব দিকে ঘব। কান পেতেও কোন সাড়াশব্দ পেল না। দবজা ঠেলে ভিতবে প্রবেশ কবল। স্প্রীং-বসানো দবজা আপনি আবজে যায আবাব।

বাহুতে চোখ ঢেকে শুযে আছে লোকটি। আধ মযলা, বোগা মুখে এক-আধটা বসন্তেব দাগ। সুশ্রী বলা চলে না কোন বকমে। পাযেব শব্দে চোখেব ওপব থেকে হাত সবালো সে। হাসল একটু, নমস্কাব, বেশ ভালই আছি আমি।

আগেব দু'জন বোগীব কাছে যাওযাটাও নিবাপদ ছিল না প্রথম প্রথম। চোখে চোখ বেখে বেখা দাঁড়িযে বইল চুপচাপ। সে আবাব বলল, আপনাদেব এই জাযগাটা ভালো, বেশ নিবিবিলি, কোন অসুবিধে হচ্ছে না আমাব। চোখেব ওপব হাত নেমে এলো, আচ্ছা, দবকাব হলে খবব দেব'খন—।

বেখা এগিযে এসে বোগীর চার্ট দেখে নিল, ঠিক ঘরে এসেছে কি না। অমব দত্ত...। ঠিকই আছে। বকিং চেযাবটায এসে বসল। আধ ঘন্টা কেটে গেল, টুঁ-শব্দটি নেই। স্থাণুব মত পডে আছে মানুষটা। তাবপব এক সময হাত সবে গেল আবাব। সবিস্ময়ে তাকালো সে, কি আশ্চর্য। সেই থেকে বসে আছেন আপনি? মিথ্যে কষ্ট কবছেন কেন, দবকাব হলেই আমি ডাকব'খন, আপনি যান—।

বিস্মিত বেখাও কম হযনি।—আপনি ভাবচেন কী?

অস্ফুট শব্দ কবে হেসে উঠল সে।—একটা লাইন কিছুতে মনে কবতে পাবছি নে সেই থেকে। 'সব দিতে সব নিতে যে বাডাল কমণ্ডলু দ্যুলোকে ভূলোকে...'তাব পব ভুলে গেছি। ববি ঠাকুব চুবি কবেছে।...চুবি ঠিক নয, আগে ভাগেই লিখে বসে আছে। নইলে আমি লিখতুম। কিন্তু তাব পবেব কথাগুলো...

নডেচডে সোজা হযে বসল বেখা মিত্র। স্থিবনেত্রে চেযে বইল।

—আপনাব জানা আছে? নেই, না? সুলেখা কিন্তু ফস কবে বলে দিত।

নামটা বলাব সঙ্গে সঙ্গে যেন ইলেকট্রিক শক খেযে চমকে উঠল নিজেই। বিহ্বল, বিমূঢ। মাত্র কযেক মুহূর্ত। কঠোব কঠিন কতগুলো বেখা সুস্পষ্ট হল সাবা মুখে। চোখেব দৃষ্টি গেল বদলে। দুই চোখে আগুনেব হলকা। ঝুঁকে এলো সামনেব দিকে।

—আপনি, আপনিও তো মেযেছেলে?

বেখা চেযাব ছেডে এক পা অগ্রসব হতেই সে গর্জে উঠল আবাব।—দাঁডান ওখানে। আমি জানতে চাই আপনি মেযেছেলে কি না?

বেখা ঘাড নাডল, মেযেছেলেই বটে।

—যান আমাব সুমুখ থেকে। আব কখনো আসবেন না। মেযেদেব আমি আব দেখতে চাই নে কোন কালে। কোন দিন না। এত বড অভিশাপ আব নেই। দাঁডিযে আছেন কি? যাবেন না? যান, যান, বলছি—।

চোখে পলক পডে না বেখা মিত্রব। অদ্ভুত রূপান্তবটা উপলব্ধি কবতে চেষ্টা কবছে। ঠক ঠক কবে কাঁপছে মানুষটা। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে।

দবজা খুলে বেখা বাইবে এসে দাঁডাল। অমব দত্ত বিড বিড কবে বকে চলেছে তখনো। উত্তেজনা বাডছেই। একটা ইনজেকশান নিযে বেখা আবাব ভিতবে এলো। কনুইযে ভব কবে অমব দত্ত আধা-আধি উঠে বসল প্রায।—আবাব এসেছ? সুলেখা পাঠিযেছে, কেমন? তোমাদেব ভয-ডব নেই? আমাব কলমেব ডগায কত বিষ জানো?

—জানি, শুযে পড়ুন।

—ফার্স্ট, ইউ গেট আউট।

ইনজেকশান আব আবকেব তুলোটা এক হাতে নিযে অন্য ..ত কবে বেখা তাব কাঁধে আচমকা ধাক্কা দিযে শুইযে দিল। এবকম একটা সবল নিষ্ঠুবতাব জন্য বোগীও প্রস্তুত ছিল না। হকচকিযে গেল কেমন। ততক্ষণে তাব সামনেব বাহু উঠে এসেছে ওব শক্ত হাতেব মুঠোয। কিছু বুঝে ওঠাব আগেই ইনজেকশান শেষ।

...পাঁচ মিনিটও গেল না। চোখেব পাতা ভাবী হযে আসছে বোগীব। তবু যতক্ষণ পাবল চোখ টান কবে সে দেখতে চেষ্টা কবল এই নির্মম শুশ্রূষাকাবিণীকে।

ইনজেকশান বেখে নীববে অপেক্ষা কবছিল বেখা। সে ঘুমিযে পডতে কাছে এসে দাঁডাল। বিছানাটা অবিন্যস্ত হযে আছে। টান কবে দিল। চুলগুলো কপালেব ওপব দিযে চোখে এসে পডেছে। সবিযে দিল। গাযেব চাদবটা টেনে দিল বুক পর্যন্ত। নিঃশব্দে চেযে বইল তাব পব। ঘুমন্ত মুখেও বহু দিনেব একটা ক্লিষ্ট যাতনা সুপবিস্ফুট যেন। লোকটা ভালো কি মন্দ সে কথা এক বাবও মনে আসছে না তো। তাদেবই এক জনেব জন্য এই মানুষেব সকল বৃত্তি হাবাতে বসেছে। হঠাৎ মনস্তাত্ত্বিক কর্ণেলেব ওপব ক্ষেপে আগুন হযে গেল বেখা মিত্র। তাঁব সকৌতুক কণ্ঠস্বব যেন গলানো সীসে ঢেলে দিতে লাগল কানে, এ থার্ড কনসিকিউটিভ সাকসেস...।

এব পবেব দু'তিন মাসেব চিকিৎসা-পর্বে নতুন কবে বর্ণনাব কিছু নেই। এক নাবীব স্মৃতি মনে এলেই অমব দত্ত চিৎকাব-চেঁচামেচি কবে ওঠে তেমনি, নিঃস্ব হিম-শীতল জীবনেব হাহাকাবে জলে-পুডে খাক হযে যায। বেখা কখনো ঘব ছেডে চলে যায তাব কথা মত, কখনো বা উল্টে ধমকে ওঠে সুষ্ঠু অভিনেত্রীব মত, কখনো বা প্রণযিনীব আকুলতায কাছে এসে গাযে-মাথায হাত বুলিযে দেয। শেষেব দিকে একটু পবিবর্তন যেন উপলব্ধি কবতে পাবে। তর্জন-গর্জন তেমনি আছে, কিন্তু বেশিক্ষণ সে অনুপস্থিত থাকলে অসহিষ্ণুতাও বাডে।

—এতক্ষণ কোথায ছিলেন?

—বাইবে।

—কেন?

—আপনিই তো ঘব থেকে বাব কবে দিলেন।

—আপনি গেলেন কেন?

বেখা হেসে ফেলে, আচ্ছা, আব যাব না। কিন্তু আবাবও তাকে যেতে হয, আবাবও আসতে হয। তবু বেখা বোঝে, দিন বদলাবে। অনেক বদলাবে। কিন্তু বলে না কাউকে কিছু। কর্ণেলেব নীবব প্রশ্ন এডিযে যায। সতকর্মিণীদেব কৌতূহলও জানবাব। বিশেষ কবে বীণা সবকাব ছাডবাব পাত্রী নয।

—নতুন নাগবটি কেমন?

—ভালো।

—তবু, নমুনাটা শুনিই না একটু?

—মর্কটেব মত।

—আঁচডে কামডে দেয?

—দেযনি, দিতে পাবে।

বীণা সবকাব হেসে ওঠে, কিছুতে পোষ মানছে না বল?

হেসে টিপ্পনী কাটে বেখা মিত্রও, ছোট ডাক্তাবকে নিযে পড গে না, আমাকে নিযে কেন—।

অমব দত্ত ভালো হবে। এবাবও এই বিধিলিপি। আবও মাস দুই পবেব সেই বিশেষ মুহূর্তটিব অপেক্ষা শুধু। বেখা বকিং চেযাবে বসে হাসছে মৃদু মৃদু। অল্প অল্প দুলছে চেযাবটা। অ- দত্ত নির্নিমেষ নেত্রে তাব দিকে চেযে চেযে কি যেন দেখছে।

বেখা উঠে গাযেব এপ্রোনটা খুলে চেযাবেব কাঁধে বাখল। মাথাব হুডটাও। খোঁপাব আধখানা পিঠেব ওপব ভেঙ্গে পডল। বসল আবাব। বকিং চেয়াব সজোবে দুলে উঠল।

—কি হল?

—গবম লাগছিল।

—হাসছেন যে?

—এমনি।

—এমনি কেউ হাসে?

—তাহলে আপনাকে দেখে।

—আমি তো কুৎসিত দেখতে।

—ছিলেন, এখন মোটামুটি মন্দ নয।

অমব দত্তও হাসতে লাগল। একটু বাদে হঠাৎ জিজ্ঞাসা কবল, আচ্ছা, আপনি আমাব জন্য এতটা কবেন কেন?

—কতটা কবি?

—বলুন না শুনি?

—আপনি একজন এত বড লেখক, আপনাব জন্য কবব না তো কাব জন্য কবব। কত লোক কত কিছু আশা কবে আপনাব কাছে।

হঠাৎ যেন একটা ঝাঁকুনি খেল অমব দত্ত। সমস্ত বক্ত যেন উবে গেল মুখ থেকে। নিঃসাড, পাণ্ডুবর্ণ। আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, এ তো সুলেখাব কথা। সুলেখা বলত। আমাব মত লেখক নেই, আমাব জন্য সব পাবা যায, সব কবা যায—। এব পব তাবই মত বলে বেডাবেন তো, আমি গবীব, খেতে-পবতে পাই নে ভালো কবে, মুখে বসন্তেব দাগ, পাগল-ছাগলেব মত লিখি যা মনে আসে, দুবাশা দেখে হাসি পায়--বলবেন? বলবেন তো?·

স্থিব, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিবীক্ষণ কবছিল বেখা। উঠে কাছে এলো।—সুলেখা এসব বলেছে?

—হ্যাঁ বলেছে, সর্বত্র বলেছে, হেসে আটখানা হযে বলেছে। আপনিও বলবেন, হাত বাডালেই বলবেন—। আবাব সে কাঁপতে সুরু কবেছে, মুখে দুঃসহ যাতনাব চিহ্ন।

কণ্ঠস্বব কান্নাব মত শোনায এবাব।—আমি তো কোন অপবাধ কবিনি। বুকেব ভেতবটা জ্বলে-পুডে যেতে দেখলে আপনাদেব এত আনন্দ হয কেন? ভযাবহ নিঃসঙ্গতায হাড-পাঁজব শুদ্ধু যখন ভেঙ্গে দুমডে একাকাব হযে যায, সে যাতনা বোঝেন? আকণ্ঠ পিপাসায যখন...

আব কথা বেরুল না। বাহুতে মুখ ঢেকে ফেলল সে। বেখা আস্তে আস্তে হাতখানি সবিযে দিল আবাব। এক পা মাটিতে বেখে শয্যায ঠেস দিযে বসেছে। শুভ্র, নিটোল দুই হাতে মুখখানা ঘুবিযে দিল নিজেব দিকে। ঝুঁকে এলো আবো কাছে।

দু’-চাব মুহূর্তেব নিঃশব্দ দৃষ্টি বিনিময।

অমব দত্তব ঠোঁট দুটো আব একবাব থব-থব কবে কেঁপে উঠল শেষ বাবেব মত। তাব পব এক বিস্মৃতিদাযিনী স্পর্শেব মধ্যে নিবিড কবে আশ্রয পেল তাবা। এত কালেব হাড কাঁপানো হিমশীতল অনুভূতিটা যেন নিঃশেষে মিলিযে যাচ্ছে। উষ্ণ। ...নবম।...তন্দ্রাব মত।...ঘুমেব মত।...ঘুমিযেই পডল।

পবেব ক'টা দিনেব তুচ্ছতা বাদ দেওযা যাক। নির্দেশ মত তাকে নিযে বাইবে বেডানো, সিনেমা দেখা, থিযেটাব দেখা।

বেখা তাগিদ দিল কর্ণেলকে, এব পবে মুশকিলে পডব, তাডান শীগগিব।

কর্ণেল হাসেন, ইউ প্রেটি উইচ।

বেখা প্রতিবাদ কবে, ফিনিস্‌ড এ্যাকট্রেস।

এব পব ক'দিন ধবে কর্ণেলেব ঘবে বসে নিজেব বোগজীর্ণ প্রতিচ্ছবিটি দেখেছে অমব দত্ত। বৈজ্ঞানিক বেকর্ডে নিজেবই দুই একটা পাগলামীব নমুনা শুনে শিউবে উঠেছে। আগেব দু'জন বোগীকে কি কবে ভালো কবেছে বেখা মিত্র তাও শুনল। সব শেষে, একই উপাযে নিজেব আবোগ্য লাভেব ইতিবৃত্ত। নিপুণ মনোবিজ্ঞানীব পবামর্শ এবং সাবগর্ভ উপদেশ শিবোধার্য কবে গৃহপ্রত্যাবর্তনেব উদ্যোগ কবল যখন, তখন মনটাই শুধু ভাবাক্রান্ত হযে আছে ক্লান্তিকব বোঝাব মত। এ ছাডা আব কোন উপসর্গ নেই।

বেখাব প্রতীক্ষা কবছিল। সে এলো।

—যাবাব সময হলো, এই জন্যেই ডেকেছিলাম। .আপনাকে চিবকাল মনে থাকবে আমাব।

সমবেশ চক্রবর্তী বলেছিল। মাধব সোমও বলেছিল। বেখা হাসল।—সেটা কি খুব ভালো কথা হবে?

দুই-একটা মৌন মুহূর্ত। অমব দত্ত হাত তুলে নমস্কাব জানালো, আচ্ছা, চলি—।

হাত তুলে প্রতি নমস্কাব কবল, বেখাও—, হ্যাঁ, আসুন—।

অমব দত্তব কাহিনী শেষ হযেছে। কিন্তু এ কাহিনী অমব দত্তব নয। বেখা মিত্রব। অনেক, অনেক দেবীতে জেনেছে বীণা সবকাব, বেখা মিত্রব বোগী ভালো কববাব বহস্যটুকু কি। অনেক, অনেক দেবীতে জেনেছেন মনোবিজ্ঞানী কর্ণেল পাকডাশী, কোন নির্দেশই তাঁব মেনে চলেনি বেখা মিত্র। অনেক, অনেক দেবীতে জেনেছে বাকি সকলে, বেখা মিত্র বোগী ভাল কবেছে, ফাঁকি দিযে নয, ভালবাসাব অভিনয কবে নয, সত্যিকাবেব ভালবেসে। পব-পব তিন জনকেই।

হাসপাতালে বোগীব সংখ্যা আব একজন বেডেছে। বোগী নয, বোগিণী। সে বেখা মিত্র।

বারমুডা লিলি

কুণাল বোস হেসেই বাঁচে না। শিবু কাকাব দপ্তবে বসেও হেসেছিল। তাই দেখে শিবু কাকা ধমকেই উঠেছিল। বলেছিল, আমি কি তোকে তোযাজ তোযামোদ কবে চলাব

পাত্র, যে মিথ্যে তোকে বাডাতে যাব? না কি আমাব কাগজটা আঁস্তাকুড একটা যে ছাই-ভস্ম যা পাব তাই নিযে ছাপাব জন্য হাঁ কবে থাকব? এত কাল কাগজ চালাচ্ছি, এত লেখা লিখছি কলমেব আঁচড টানা দেখলে কাব মধ্যে কি আছে বুঝতে পাবি না—আঁচ কবতে পাবি না? যে লেখা দেখে তোব বাবা অমন আগুন হযেছে, তোকে কেটে দুখানা কবতে পাবলে শান্তি হয বলে৻হ, আব তাবপব মাথাব বিকৃতি কি না দেখাব জন্য অত চুপিচুপি ডাযেবিটা আমাব কাছে চালান কবেছে—সেই সব ছাইভস্ম লেখাব মধ্যেও একটা সম্ভাবনা দেখেই তোকে আমাব কাছে পাঠাতে বলেছিলাম—নইলে আমাব সময কি কুল গাছ যে তোদেব মতো অকাল কুষ্মাণ্ড এসে ঝাঁকালেও ঝবঝব কবে পডবে? বাঁদব কোথাকাবেব।

নিচেব কুচকুচে কালো ঠোঁটটা ছাতলা পডা দাঁতে ঘযে কুণাল সবিনযে আপত্তি জানিযেছে, ওই জীবটাব অসম্মান কেন কবছেন শিবু কাকা—ববং বাঁদবেতব কোথাকাব বলুন।

শিবুকাকা আবাব বেগে উঠতে গিযে হেসে ফেলেছিল। (কি বললি? বাঁদবেব থেকে ইতব বাঁদবেতব—) হাঃ হাঃ হাঃ—ওই জন্যই তো বলছিলাম আদা জল খেযে লেগে যদি যাস তোব হবে। হলে দুটো পযসাবও মুখ দেখতে পাবি—বাপ-দাদাব হোটেলে খাচ্ছিস বলে দিন-বাত অত লাথি গুঁতোও খেতে হবে না। তা বলে ছাই ভস্ম যা হোক লিখে আনলেই তো আব আমি ছাপব না—সে বকম কিছু থাকলে তবে কথা। সেটা এমনি হয না, বাঁদবামি ছেডে, মানে বাঁদবেতবামি ছেডে অনেক কাঠ-খড পোডালে তবে হয। কালো লম্বাটে বাঁধানো ডাযেবি বইটা শিবুকাকা তাব দিকে ছুডে দিযেছে। যা এখন, অনেক সময ঢেলেছি তোব জন্যে, আব না।

ওটা হাতে কবে কুণাল শিবুকাকাব ঘব থেকে বেবিযে এসেছে। ঝোলানো গোঁফ আব থুতনিব নিচেব অল্প দাডিব গোছায মুখেব হাসি ছডিযে পডছে। তাবপবেই গর্তেব প্রায গোল চোখ দুটো সচকিত। শিবুকাকাব ঘবেব পার্টিশনেব এ ধাবে একজন সাব এডিটব আব দু'জন প্রুফবিডাব মাথা গুজে কাজ কবছে। তাদেব থেকে একটু দূবেব চেযাবে বেশ সুশ্রী একটি মেযে বসে আছে। বযসে কুণালেব থেকে বছব দুই তিন বডই হতে পাবে...বছব পঁচিশ ছাব্বিশেব কম নয। কপাল ফাঁকা, সিঁথিতে সরু একটু সিঁদুবেব দাগ ঝিলিক দিচ্ছে। কুণাল শিবুকাকাব পার্টিশন দবজাব ওধাব থেকে বেবিযে একটু এগিযে আসতেই চোখাচোখি। ও ঘবে ছিল বলেই মেযেটিকে এদিকেব এবা বসিযে বেখেছে মনে হয। কুণালেব লুব্ধ দু'চোখ কযেক নিমেষেব মধ্যে নাবীদেহ ছিঁডে খুঁডে আবাব মুখেব ওপব এসে স্থিব হল। এই চাউনি পডে নিতে বা বুঝে নিতে কোনো মেযেবই ভুল হয না বা সময লাগে না। তখন কত বকম দেখতে হয। সুন্দব মুখে বিবক্তিব আঁচড পডে। ধাবালো হয, ঘোবালো হয, চোখে আগুনও ছোটে। কুণালেব তখন আবও মজা লাগে। মনে হয ও যেন চোখ থেকেই দুটো হাত বাব কবে দিযে কোনো মোহিনী তনু জাপটে ধবেছে, আব বণ-বঙ্গিনী তাই থেকে বেঁকেচুবে গুমবে দুমডে ছিটকে বেবিযে আসতে চেষ্টা কবছে।

সামনের রমণীমুখ ভালো করে তেতে ওঠার আগেই কুণাল বোস লম্বা পা ফেলে তার দু'হাতের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। নিজের চেষ্টায় গড়া চেহারার ছাঁদ ছিরি যেমনই হোক, গলার স্বর যে এই মূর্তির সঙ্গে বেখাপ্পা রকমের মিষ্টি আর নরম তা-ও জানে। নিঃসংকোচে পিছনের দরজাটা আঙুল দেখিয়ে বললে, উনি এখন একা আছেন, আপনি যেতে পারেন।

বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় মেয়েটি নড়ে চড়ে ওঠার আগেই কুণাল বোস ঘরের বাইরে। সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়ালো। এখান থেকেও সামনের দরজা দিয়ে সোজা শিবু কাকার পার্টিশন ঘেরা পর্যন্ত চোখ চলে। মেয়েটি ললিত ছন্দে ওই ঘরের দরজা পর্যন্ত পৌঁছেছে। মেয়েদের সামনে থেকে দেখতে বেশি ভালো লাগে কি পিছন থেকে কুণাল বোস ঠিক হদিস পায় না। অনেক সময় খেয়াল করে দেখেছে, যে মেয়েদের সামনে থেকে ভালো লাগে পিছন থেকে তাদের বেশির ভাগই যেন আরো ভালো লাগে। কিন্তু সামনে থেকে দেখতে যাদের হত-কুচ্ছিত লাগে তাদেরও এক-একজনকে পিছন থেকে দেখতে অদ্ভুত ভালো। এমন একটা অভিজ্ঞতার কথা হাতের এই ডায়েরিটাতেই লেখা আছে।. আজ এক শ্যামাঙ্গী দীর্ঘাঙ্গীকে দেখলাম বিশ গজ আগে আগে হাঁটছে। দেখার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুঠাম রমণীঅঙ্গ ঘিরে আমার গর্তে ঢোকা আদেখলে চোখ দুটো বনবন করে চক্কর খেতে লাগল। পা চালিয়ে ফারাক যত কমিয়ে আনছি, ভিতরের পশুটা ততো থাবা খুলছে। চলার ঠমকে সর্বাঙ্গের জোয়ার ঢেউ খেলে খেলে রেখায় রেখায় তটে তটে পা বেয়ে নেমে আসছে। গা ঘেঁষে তিন পা এগিয়ে গেলাম, ঘুরে তাকালাম। কি কুচ্ছিত কি কুচ্ছিত। কেউ যেন আমার গালে কষে একখানা থাপ্পড় বসিয়ে সব কিছুর ছন্দপতন ঘটিয়ে দিল। তারপর আবার আমি পিছনে। সে সামনে।. দেখে দেখে আমার মনে হচ্ছিল দ্বাপরের মানুষগুলো অনেক অকপট ছিল। যুধিষ্ঠিরকে পর্যন্ত দ্রৌপদীকে কয়েক জায়গায় অয়ি নিতম্বিনী বলে সম্বোধন করতে দেখা গেছে। কিন্তু এ-কালের দ্রৌপদীরা ওই বচন শুনলে সোজা একখানা চড় বসিয়ে দেবে।

লেখার সময় সেই বাস্তব অনুভূতিটা এমনি প্রত্যক্ষ সত্য হয়ে উঠেছিল, যে হাতের ডায়েরি না খুলেও মুখস্থর মতো বলে যেতে পারে। দ্বিধান্বিতচরণ মেয়েটিকে শিবুকাকার দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে যেতে দেখা গেল। মনে হয় কোনো লেখা-টেখার তদবির তদারকে আসা। শিবুকাকা ঘরে একা। তার দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য কে জানে। বোধহয় দুইই। শিবুকাকার বয়স ষাট, সেইজন্য সুবিধে। সুবিধে ক্যাশ করার বয়েস কিন্তু গতর যখন নেই দুর্ভাগ্য ছাড়া আর কি?

সিঁড়ি দিয়ে নেমে রাস্তায়। দোকানের ঘড়িতে বিকেল প্রায় চারটে। এক দেড় ঘণ্টা সময় খামোখা নষ্ট। একেবারে নষ্টই বা বলে কি করে। হাতের এই গাবদা ডায়েরিটা তো উদ্ধার হল। এটা এ বছরের নয়। তিন বছর আগের। কোনো মেয়ে গুরুকে প্রেজেন্ট করেছিল। গুরু বলতে প্রদীপ ব্যাণ্ডো। ডায়েরিটাতে কালোর চেকনাই ঠিকরে পড়ছিল। তার ওপর জ্বলজ্বল করছিল বড় বড় হরফের সোনালি ছাপ। ভিতরে সিল্কের ফিতে। ডায়েরি রসিকদের পছন্দ হবার কথা। কিন্তু কুণাল তখন পর্যন্ত একটুও ডায়েরি

বসিক নয়। ওই কলেজে পডা মেযেই বা অমন ডাযেবি কোথায পাবে! বাপ কাকা দাদা কাবো কাছ থেকে হাঁতডেছে। তাবপব যে মুখ কবে গুরুকে ওটা প্রেজেন্ট কবেছিল, কুণালেব মনে হযেছিল মেযেটা তাব সর্বস্ব ওই হাতে দিযে দিলে, ছ'টাব শোযে সিনেমা দেখাব প্রোগ্রাম পাকা কবে মেযেটা চলে যেতেই গুরু তাচ্ছিল্য ভবে ডাযেবিটা টেবিলেব ওপব ছুঁডে দিযেছিল, সুন্দব মুখে বিবক্তিব হিজিবিজি দাগ ফেলে বলেছিল, ভাল্লাগে না এ-দেশেব মেযেগুলো সব ভীতুব হদ্দ। অন্ধকাবে বসে গা টেপাটেপি কবতে দেবে, সিনেমাব পব ভালো বেস্তোবাঁয নিযে গেলে আব আলাদা ক্যাবিনে নিযে ঢোকাতে পাবলে বড জোব একটু জাপটে ধবতে দেবে আব দুটো চুমু খেতে দেবে—তাব বেশি এগোতে যাও অমনি হৃৎকম্প। আব নিউইযর্কেব মেযেগুলো? শালা বাবো বছব বযসে ছেলেগুলোকে কাচপোকাব মত হিডহিড কবে টেনে নিযে যায—নিজেবা যেমন লোটে তেমনি লুঠতেও দেয।

গুরুব মুখে নিউইযর্কেব গল্প শুনে শুনে কুণালেব দু'কান হেজে পচে যাবাব কথা। কিন্তু উল্টে যেন মজা নদীতে বসেব বান ডাকে। আগে তো শুনেই ওব কান গবম হত, সমস্ত শবীব গবম হত। শুনে শুনে গুরুব নিউইযর্ক কুণালেব কাছেও স্বর্গ। উত্তেজনাব এমন জাযগা পৃথিবীতে আব কোথাও আছে নাকি? সেখানে উত্তেজনাবই অন্য নাম জীবন। সেই জীবনেব স্বাদ ভালো কবে পাবাব আগেই গুরুকে চলে আসতে হযেছে এই খেদ তাব যাবাব নয। গুরুব বাপ ছিল সেখানকাব ডাক্তাব। সেখানে এক একজন ডাক্তাব—মানে কি? আইনেব জাল-ছেঁডা ডাকাত। দু'বেলা দু'পকেট বোঝাই কবে ডলাব আনত। সে কি বাজাব হালে থাকা। তিন তিনটে গাডি ছিল ওদেব। একটা বাবাব, একটা মাযেব, আব একটা ওদেব তিন ভাইযেব। বাবাব গাডি বাবা, মাযেব গাডি মা চালাতো। আব ওদেব তিন ভাইযেব গাডি 'সফাব' চালাতো। সেখানে একজন সফাবেব মাইনে কি তোব ধাবণা আছে? এখানকাব মাসেব দশ হাজাবিবাও সেই মাইনেব ড্রাইভাব বাখতে হলে ফতুব হযে যাবে।

গুরুব সেই ডাক্তাব বাবাব আব ভোঁদা মাযেব কি মতি হল—বাডি ঘব বেচে দিযে কযেক ঝাঁক-বোঝাই টাকা নিযে দেশে চলে এলো। ঢেব সুখ কবা গেছে এখন ছেলেদেব জন্যেই নাকি তাদেব চাটি-বাটি তুলে চলে আসা। বাগে মুখ লাল কবে গুরু বলত, অনেক সুখ তোমবা কবলে, আমাদেব কি হল? ছেলে মেযেব সুখেব এমন বাবোটা যে বাজায তাবা বাবা-মা না শত্রু। এখানে তাবা এসে বিবাট বাডি হাঁকিযে, দাসদাসী বাবুর্চি খানসামা বেখে দিব্যি পাযেব ওপব পা তুলে দিন কাটাচ্ছে। বাবাব প্র্যাকটিসও এখানে নামেই, বিকেলে দু'ঘন্টাব জন্য চেম্বাবে যায—সন্ধ্যায মাযেব সঙ্গে হুইস্কি গেলে। আমাদেব জন্য আসা, আমবাই বা কি দিগগজ হলাম। আমাকে তো অন্তত বি, এ-টাও পাশ কবাতে পাবলে না। ভাই দুটো যা-হোক মেজে-ঘষে গ্র্যাজুযেট হযেছে।

গুরু মানে প্রদীপ ব্যাণ্ডোব বযস এখন সাতাশ। কুণালেব থেকে চাব বছবেব বড। নিউইযর্ক ছেড়ে কলকাতায চলে এসেছিল তেবো বছব বযেসে। কুণালেব পনেব বছব বযেস থেকে সে এই গুরুব চেলা। এদিক থেকে গুরু উদাব বলতে হবে।

সে বয়েস দেখে না, বশ্যতা দেখে। হুকুম তামিল করার কেরামতি দেখে। সেই পনের বছর বয়েস থেকে এ এলাকার এমন কি পাড়ার কত মেয়ের কাছে গুরুর চিঠি চালান করেছে, জবাব নিয়ে এসেছে—সন্ধ্যার পর লেকে দূরে দাঁড়িয়ে তাদের পাহারা দিয়েছে, ঠিক আছে? আদর করে কুণাল মাঝে মাঝে শালা গুরু তুমি বলে কথা ঝাড়ে তাতেও গুরু হাসে। আনন্দে পিঠ চাপড়ায়। গুরুর নিজস্ব একটা ছোট্ট গাড়ি ছিল আরো ছ'বছর আগে পর্যন্ত। গুরুই চালাতো। তার পাশে কোনো না কোনো চটকদার মেয়ে থাকতই। আর পিছনে থাকত কুণাল। শুধু কি বাঙালী মেয়ে? বড় বড় রেস্তোরাঁ বা তার পাশের রাস্তা থেকে অবাঙালী মেয়ে গাড়িতে তোলার ব্যাপারেও গুরু কি কম ওস্তাদ ছিল। চোখা-চোখি হলেই বুঝতে পারত কে উঠবে আর কে উঠবে না।

ওই রকম মেয়ের পাল্লায় পড়ে আর নেশার রসদ জোগানোর তাগিদে গাড়িটা জলের দরে বেচে দিয়েছিল। গুরুর নেশা তো আর মদ বা বিড়ি সিগারেট নয়। সে তখন থেকেই হাসিস আর মারিজুয়ানার খদ্দের। বাবা আবার একটা গাড়ি কিনে দেবে ধরেই নিয়েছিল। কিন্তু আজও দিল না। গুরু এ জন্যে যে ভাষায় নিজের বাবা-মাকে গালাগালি করে শুনে কুণাল মুগ্ধ।

গুরুর সব থেকে বড় পাসপোর্ট তার চেহারা। এখনো। কোনো ছেলে যদি মাখনের দলা হয় অনেক ডাঁশা মেয়ে তাকে পাত্তা দেয় না। কিন্তু সেই মাখনের দলা যদি স্মার্ট হয়, একসঙ্গে চোখ আর ঠোঁটে হাসতে জানে, তার কথার থেকে কাজের হাত যদি বেশি এগোয়—তাহলে কিস্তি মাত। গুরুর এই সাতাশ বছর বয়সে এমন কিস্তি মাত কম দেখল না কুণাল বোস। ভালো ঘরের কলেজে পড়া একে একে দু'দুটো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেখল আর ডিভোর্স দেখল। কোর্টে এ পর্যন্ত তিন তিনটে মেয়ে ফুসলে নিয়ে পালানোর কেস দেখল, কি সেনসেশন, কি উত্তেজনা কুণালেরই তখন। যে উত্তেজনার নাম জীবন, গুরু হাতে-নাতে ওকে তাই দেখিয়েছে। পাড়ার কোনো মেয়ে এখন গুরুর দিকে তাকালে পর্যন্ত বাপ-মা মেয়েকে শাসন করে। কিন্তু তবু গুরুকে ঠেকায় কে? তার লীলা কি শুধু এই পাড়াটুকুর মধ্যে?

গুরুর মধ্যে অভিজ্ঞতার বীজ বোনা হয়েছে কি আজকে? বীজ বোনা হয়েছে সেই তের বছর বয়সে—নিউ ইয়র্কে। একটু ভালো করে বোঝার আগে বাবা মা যে তাকে কি আনন্দ থেকে বঞ্চিত করেছে, মনে হলে তাদের খুন করতে সাধ যায় ছেলের। এই কলকাতা শহরে কত লোক অসময়ে পটাপট মরছে—আর তার বাবা মা যেন একটা বেঁচে থাকার খুঁটি ধরে বসে আছে। সম্ভব হলে, নিউইয়র্ক ছেড়ে চলে আসার জন্যেই বাবা মাকে সে চরম শাস্তি দিত। আর, সেখানকার মেয়েগুলো কি মেয়ে? জলজ্যান্ত আপেল এক একখানা। ফাঁক পেলে পনের ষোল সতের বছরের সেই মেয়েগুলো ওকে বুকে জাপটে তুলে নিয়ে পালানোর জায়গা খুঁজত। চুমু খেয়ে খেয়ে গালে ঠোঁটে জ্বালা ধরিয়ে দিত—ঝোপঝাড়ের আড়ালে গিয়ে ওকে বুকের ওপরে চেপে ধরে শুয়ে থাকত—আরো কত কাণ্ডমাণ্ড করত শুনলে তোর নোলা দিয়ে জল গড়াবে।

জল যেটুকু শুনতো তাতেই গড়াতো কুণালেব।

হ্যাঁ...এই ডায়েরিটাব কথা। তিন বছব আগে টেবিলেব ওপব গুরু ওটা ছুঁড়ে দিতেই বুকেব ভিতবটা চড়চড় কবে উঠেছিল কুণালেব। ওব ততক্ষণে কেমন যেন বদ্ধ ধাবণা, দেবাব আগে ওই কালো ডায়েবিব চকচকে বোর্ডে অন্তত গণ্ডা আষ্টেক চুমু খেয়েছে মেয়েটা। সেই তাপ ওতে এখনো লেগে আছে। তখুনি বলে বসেছিল, গুরু এই ডায়েবিটা আমাকে দেবে?

—ওটা দিয়ে তুই কি কববি?

কি বললে গুরু খুশি হবে আব উদাব হবে কুণালেব ততদিনে ভালোই জানা। জবাব দিয়েছিল মাঝে মাঝে বুকেব ওপব বাখব আব চুমু খাব। আমি আব এব থেকে বেশি কি পাব বলো।

শুনে গুরু হেসে সাবা। হাসি আব থামতেই চায় না। শেষে বলেছে, আমাব শিষ্য হয়ে তোব এ-বকম আনপ্র্যাকটিক্যাল সেলফ-স্যাটিসফ্যাকশন—অ্যাঁ? আবে কল্পনাব ভোগ তো কবিদেব জন্য আব স্পাইনলেস ছেলেদেব জন্য। আমাব শিষ্য হবে মোস্ট বেকলেস প্র্যাকটিক্যাল—সাধ গেলে হাতে হাতে আদায়। এই যে ডায়েবি দিয়ে গেল এব ওপবে আমি বিবক্ত কেন? সাধ আছে, সাহস নেই। আবে বাপু বেখে ঢেকে সব দিক বজায় বেখে কতটুকু পাবে—ভিতবে বান যখন ডেকেছে সব দিক তছনছ কবে দিয়ে ছোটো না, তবে তো থ্রিল—তবে তো একসাইটমেন্ট তবে তো লাইফ। ডায়েবিটা তাবপব ওব দিকে ঠেলে দিয়েছিল, যা নিয়ে যা, দুধেব সাধ ঘোলে মেটা।

তাব পবেই মাথায় একটা উদাব প্ল্যান এসে গেছল। তোকেও ছিটেফোঁটা প্র্যাকটিক্যাল আনন্দ দেবাব ব্যবস্থা কবছি। তোব জন্যে একটা টিকিট কেটে বাখব আব মেয়েটাকে যা বলাব বলে বাখব। ছ'টায় শো, তুই ঠিক সময়ে মেট্রোয় থাকিস।

তিন বছব আগে এই ডায়েবি হাতে কবে বাতাস সাঁতবে নিজেব ঘবে ফিবে দবজা বন্ধ কবে ছিল। ব্যাণ্ডাদা যতই মুখ বাকাক আব ছেলেমানুষ ভাবুক ওকে, এটুকুতেই যে এত থ্রিল এত উত্তেজনা এ কি ভেবেছিল। বয়েস তো সবে তখন কুড়ি। বি, এ ফেল কবে আব পড়া ছেড়ে সবে গুরুব যোগ্য শিষ্য হয়েছে। তাব আগে যেটুকু উত্তেজনাব দিন গেছে তাব বেশিব ভাগ কাল্পনিক। গুরুব চেলাগবি কবে আব তাব ভোগ কল্পনা কবে যেটুকু আনন্দ। কিন্তু এই ডায়েবিটা বা ডায়েবিতে মেয়েটাব স্পর্শ তো আব কল্পনা নয়। ফেবাব আগে ওই মেয়ে যে ডায়েবিব মলাটে গণ্ডাকতক চুমু খেয়ে নিয়েছে তা-ও কল্পনা বলে স্বীকাব কবতে বাজি নয় কুণাল। ঘবে এসে ওই ডায়েবিব মলাটে গাদা গাদা চুমু খেয়ে বাব বাব ওটা বুকে চেপে ধবে বেশ একটু নতুন থ্রিল আব উত্তেজনা উপভোগ কবেছে। কিন্তু সিনেমা হলে আবো থ্রিল ওব জন্যে অপেক্ষা কবছে সেটা ভাবতে গিয়েই শিবায় শিবায় বক্ত গবম। ওব জন্যেও ব্যাণ্ডাদা টিকিট তো কেটে বাখবে, কিন্তু মেয়েটাকে আবাব কি বলে বাখবে? মেয়েব পাশে বসে ছবি যে দেখেনি এমন নয়। আব তখন খুব সংগোপনে আব অন্যমনস্কেব মতো এক একবাব হাত ঠেকিয়েছে, হাঁটুতে হাঁটু লাগিয়েছে—তক্ষুণি আবাব অপ্রস্তুত

ভদ্রলোকের মতো গুটিয়েও বসেছে। একবার তো চিত্তির। বার কয়েক ও রকম করার পর হাফটাইমের আলো জ্বলতে দেখে মায়ের বয়সী একজন।

বিকেলে আধঘণ্টা আগেই মেট্রোর সামনে অপেক্ষা করছিল, আর সব থেকে শস্তার সব চেয়ে কড়া সিগারেট টেনে সময় পার করছিল। ঠিক সময় ধরেই ব্যাগোদা আর সেই মেয়ে হাত ধরাধরি করে হাজির। ও সামনে আসতে ব্যাগোদা (কুণাল অনেক সময় গুরু ছেড়ে ব্যাগোদা বলে কারণ এই ডাকের মধ্যে একটা নতুনের চমক আছে —অন্তত তখন ছিল) পরিচয় করিয়ে দিল। বলল, এই আমার সেই কচি-কাঁচা লাজুক শিষ্য কুণাল বোস—তুমি আসছ তাই লাজুক তো আসতেই চায় না। সঙ্গে সঙ্গে এক চোখ একটু ছোট করে মেয়েটাকে গুরু একটু ইশারাও করল। ভব্যতার খাতিরে সেই মেয়ে কুণালের দিকে ফিরে একটু মাথা নাড়ল, আর ঠোঁটের কোণে হাসল, আর চোখের কোণে ভালো করে দেখে নিল। গুরুর কি কারসাজি ঠাওর করতে না পারার ফলে কুণাল মুখে একটু লাজুক-লাজুক ভাব টানাই বুদ্ধিমানের কাজ ভাবল।

কিন্তু বুকের ভিতরটা সত্যিই তখন একটা বাস্তব থ্রিলের তৃষ্ণায় ধকধক করছিল। এই মেয়ের উঁচু বুক আর টসটসে ঠোঁট দুটো শুকনো ডায়রি নয়—তার থেকে ঢের-ঢের নরম-গরম বাস্তব।

একেবারে সারির শেষের তিনটে সীটে তারা তিনজন। প্রথমে গুরু মাঝে মেয়েটা শেষে কুণাল। কুণালের পরে সেই রো-তে আর সিট নেই। আলো নিভল। ছবি শুরু হল। মেয়ে পুরুষের মাখামাখি লপটা-লপটির হিন্দী ছবি। শুরু থেকে ঢলাঢলি। কিন্তু ছবি দেখবে কি, খানিক বাদেই কুণালের সর্বাঙ্গে কাঁটা। মেয়েটার হাঁটু আর হাঁটুর ওপরের খানিকটা কুণালের একদিকের সঙ্গে ক্রমে সেঁটে যেতে লাগল। আর কাঁধের ওপরের দিকটা ওর কাঁধের সঙ্গে একটা চাপাচাপির খেলা শুরু করে দিল। মাঝে মাঝে অন্ধকারেই আবার ঘুরে তাকায়। কুণালের গালে গরম নিঃশ্বাসের ছেঁকা লাগে।

হাফটাইমের আলো জ্বলতেই মেয়ে আবার শান্তশিষ্ট। মাঝে ভব্যরকমের ফারাক। এক একবার গুরুর কানে মুখ ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বলছে কিছু আর কুঁই কুঁই করে হাসছে। গুরুর তাকানো দেখে মনে হয় মজাটা ওকে অর্থাৎ কুণালকে নিয়েই। রোগাপটকা কুণালের ভিতরে যে তখন মদমত্ত দামাল হাতি দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে সে যদি ওই মেয়ে জানত।

আবার ছবি শুরু হতে একই কাণ্ড শুরু হল। কুণালের শরীরের কণায় কণায় এবারে ডবল সাড়া দেবার ইচ্ছে। কিন্তু ও বুঝে নিয়েছে তাহলে মজা মাটি—ওকে লাজুক ছেলের ভূমিকা নিতে হবে। খানিক এ-রকম চলার পর মেয়েটার একটা আলতো হাত ওর হাতের ওপর এসে পড়ল। পড়ার পর পড়েই থাকল। তারপর উঠল যখন কুণালের হাতখানা সুদ্ধ নিয়ে উঠল। ওর হাতটা গরম হাতে ধরে চেয়ারের হাতলের তলা দিয়ে টেনে নিজের কোলের ওপর ফেলল। তারপরে ওই হাত কোলের ওপর রেখে আর গরম হাতের আঙুলে আঙুলে খেলা চলল।

ছবি শেষ হবার পর বাইরে বেরিয়ে ঠোঁটের কোণে তেমনি হেসে আর চোখের কোণে তেমনি করে চেয়ে মেয়েটা জিজ্ঞাসা করেছিল, ছবি কেমন লাগল কুণাল বাবু?

নিরীহ লাজুক মুখ করে কুণাল জবাব দিয়েছে, ছবি আর দেখতে দিলেন কই।

চারুমুখির দু'চোখ কপালে। আমি আবার কি করলাম।

গুরু হেসে উঠেছিল। বলেছিল, সম্পর্কটা যখন বউদি হতে চলেছে মওকা পেয়ে তুমিও একটু বাড়লে খুব অন্যায় হত না হাঁদা কোথাকারের।

ওকে বিদায় দিয়ে তারা পার্ক স্ট্রীটের দিকে চলে গেছল। আর কুণাল সর্বাঙ্গে জ্বলুনি নিয়ে ঘরে ফিরেছে। পরে গুরুর মুখে শুনেছে, মেয়েটাকে বলে রেখেছিল, শিষ্য—তার দারুণ লাজুক আর দারুণ ভালো ছেলে, সিনেমা হলে বসে ওর যদি ঘাম ছুটিয়ে দিতে না পারো তাহলে মজাই মাটি।

হেসে হেসে গুরু জিজ্ঞেস করেছিল, তা তোর ওটুকু বাস্তব অভিজ্ঞতা কেমন লাগল বল।

কুণাল গলা শুকিয়ে জবাব দিয়েছে, তুমি শালা এক নম্বরের শত্রু গুরু—বুকের মধ্যে এখন সাহারা জ্বলছে—ফের পেলে ওই ভাবী বউদিকে আমি না খুন করে বসে থাকি।

ওই ভাবী বউদিটিই ছ'মাস বাদে গুরুর বিরুদ্ধে কোর্টে কেস ঠুকে দিয়েছিল। গুরু নাকি তাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সঙ্গে মেলামেশা করত। শেষে একদিন তার সর্বনাশ করে সরে পড়েছে। মেডিক্যাল চেকআপে পর্যন্ত সর্বনাশ প্রমাণ হয়েছিল। কিন্তু সর্বনাশটা শেষ পর্যন্ত কার মারফৎ হয়েছে সেটা প্রমাণ হয়নি। কারণ জেরায় জেরায় সাবালিকা মেয়ের অনেক গলদ বেরিয়ে পড়েছে।

যাক, এই সুন্দর ডায়েরিটার পাতা একটা দুটো করে ভরাট হতে শুরু করেছে আরো সাত আট মাস পর থেকে। হঠাৎই খেয়ালের বশে ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল। তারপর গুরুর তারিফ পেয়ে উৎসাহ বেড়েছিল। ব্যাপার আর কিছু না, ভিতরে কোনো বাসনা যখন দুর্বার হয়ে ওঠে, বা কোনো ঘটনায় স্নায়ুগুলো যখন উথাল পাথাল করতে থাকে—তখন ডায়েরির পাতায় সে-সব লেখা। লিখে ফেলে তার ওপরে কিছু মন্তব্য করা।

যেমন প্রথমেই লিখেছিল, এই ডায়েরি যার কাছ থেকে পাওয়া সেই ভাবী বউদির মতো একটি মেয়েকে সমস্ত নিষেধের গণ্ডী থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারলে কুণাল বোস কি করে? ওই ভাবী বউদির মতো স্বভাব চরিত্রের মেয়ে নয়, শুধু তার মতো অমন টসটসে দেখতে—কিন্তু তার ভেতরখানা তখন পর্যন্ত কোন সভ্যভব্য সুপুরুষকে নিয়ে কল্পনার জাল বুনছে। অবাধ্যতার জন্য তার ওপর প্রথমে কি ভাবে নির্মম আঘাত করে তাকে বোবা বানিয়ে দিত আগে তাই লিখেছে। কিন্তু বোবা বাধ্য মেয়ে কোন ছেলে চায়? সেই আক্রোশে তাকে কতভাবে নরকের তলায় টেনে নিয়ে চলেছে তার হুবহু বর্ণনা। কিন্তু মেয়েটা যখন শেষে আর বোঝে না, তাকেই যখন নরকের দোসরে মেনে নিয়েছে, আত্মহুতি সম্পূর্ণ ভাবছে, তখন আবার কুণাল বোস নতুন চমক সৃষ্টিতে মেতে উঠেছে। যে সুন্দরের স্বপ্ন দেখত মেয়েটা, যে স্বপ্নের জাল বুনত, নরক ছেড়ে তাকে নিয়ে সেই দিকে এগিয়েছে। সেই সুন্দরের দরজা তারই বুকের তলায়—একটু একটু করে এবারে সেই দরজা খুলে দিয়েছে। তার সেই স্বপ্নের জালে এসে নিজেই

ধরা দিয়েছে। মেয়েটা হতভম্ব হয়ে দেখছে, যার একদিক এমন কুৎসিত নরক, তারই আব একদিক কি অনির্বচনীয় সুন্দর! লেখার শেষে মন্তব্য, আমি কুৎসিত আমিই, সুন্দর আমার একটাকে যে নেবে সে আধখানা নেবে। আমার শালা একটাতে ক্লান্তি ধরে যায় বলে আমি ভোগে কখনো সুন্দর কখনো কুৎসিত।

ভাবী বউদিব মতো সুন্দর চেহারার মেয়ের ওপব কুণাল বোসের পুরুষের নির্মম অত্যাচাব আব তাকে নিয়ে নবকে তলিয়ে যাবাব প্রত্যক্ষ বর্ণনা পর্যন্ত গুরুর দারুণ ভালো লেগেছিল। বাববাব বাহবা দিয়েছিল। কিন্তু তাকে নিযে আবাব সুন্দরের অভিসারে যাত্রা-পর্ব শুনে নাক সিঁটকেছিল।—ও আবার কি, ক্লাইম্যাক্স থেকে অ্যান্টিক্লাইম্যাক্স—কেটে দে কেটে দে—যত সব সিলি ডে-ড্রিমিং।

খবরেব কাগজ খুললেই রোজ কটা করে ধর্ষণেব খবর। কুণাল বোস সে-সব খুঁটিয়ে পড়ে। যে খবব যত নির্মম তাব প্রতি ততো আগ্রহ। তাব ভিতবে ততো উত্তেজনা। চোখেব সামনে সমস্ত ব্যাপাবটা কল্পনা কবে ভারী আনন্দ পায়। ডায়েরিতে অকপটে সে-সব স্বীকাব-উক্তি আছে। সঙ্গে মন্তব্যও—শালাব খববেব কাগজগুলো ঘটা কবে প্রথম পাতায় এসব খববগুলো ছাপে কেন? পড়ে সুড়সুড়ি লাগে বলেই তো। আবো মন্তব্য, মেযেব মতো মেযে হলে এ ব্যাপাবটা অপছন্দ কবাব কথা নয়—আসলে ভয় আব লোকলজ্জা। শালার কুকুব বেড়াল গোরু ছাগলও এ-ব্যাপাবে মানুষেব থেকে ঢেব বেশি অকপট আর সৎ।

এটা পড়েও প্রদীপ ব্যাণ্ডো খুব পিঠ চাপড়েছিল।

...বোমাঞ্চকব ডাকাতিব খবব পড়তেও তেমনি ভালো লাগে কুণাল বোসেব। ঘটনা যতো বড দবের হয উত্তেজনাও ততো বাড়ে। এ-সবেবও স্বাদ তাকে পেতে শিখিয়েছে তাব গুরু প্রদীপ ব্যাণ্ডো। পযসা খবচ কবে সেক্স আর ক্রাইমেব গাযে কাঁটা দেওয়া বই কিনে আগে নিজে পড়ে, পবে ওকে পড়ায়। বলে, এই তো লাইফ, থ্রিল আর একসাইটমেন্ট যেখানে নেই সে আবাব লাইফ। এই সেক্স আর এই ক্রাইমেব ব্যাপাব কলকাতাযও এখন কম ঘটছে না। ডাযেবিতে নিজের ভাবনা লেখা শুরু কবার পরে মস্ত একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি হয়েছিল। কালো অ্যামবাসাডাবে চেপে ছ'জন লোক এসেছিল। সতেব মিনিটেব আগেই সতেব লক্ষ টাকা হাতিয়ে সবে পড়েছিল তারা। এই অপাবেশন সাবতে গিযে মাত্র দু'জন লোক খুন হয়েছিল আর জন পাঁচেক জখম। ডাকাতদের কেউ ধবা পড়েনি।

ঘটনাটা কুণাল বোসেব কাছে এত সেনশেসনাল মনে হয়েছিল যে তিনবার কবে আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে পড়েছে খববটা। যত ভেবেছে ততো উত্তেজনা বেড়েছে। শেষে ডাযেবি নিয়ে বসেছে।

—মনে মনে আমিও একটা ব্যাঙ্ক ডাকাতি কবে উঠলাম। সঙ্গে সেই ছ'জনই লোক। আমি তাদের লিডাব। সমস্ত প্ল্যান আমাব। অপাবেশন ফরমূলা আমার। প্রথমে ভেবেছিলাম পাঁচজনকে খুন কবলে আর বাবো চোদ্দ জনকে জখম করলেই কাজ হাসিল হবে। তাদের রক্তাক্ত মৃতদেহগুলো আমি আগেই চোখেব সামনে দেখলাম। দেখলাম এই দেখাটা মন্দ উত্তেজনার ব্যাপার নয। কিন্তু শেষে আর ওই প্ল্যান ভালো

লাগল না। কাবণ লোক মাবা আব জখম কবাব উত্তেজনাটা পুবনো ব্যাপাব। তাব থেকে ঢেব বেশি উত্তেজনাব ব্যাপাব কাবো গাযে একটা আঁচড না বসিযে কাজ সাবাটা। কাগজে এমন ডাকাতি নিযে দাৰুণ হৈ-চৈ হবে—পডতে পডতে সকলেব বুকেব তলায একটা ঠাণ্ডা স্রোত বইবে। হ্যাঁ, সেই প্ল্যানেই অপাবেশন পাকা কবলাম। এক-একজনেব বিভলভাবেব মুখে তিনজন কবে লোক পুতুল হযে থাকল। স্ট্রং রুমেব চাবি আমাব হাতে। চোদ্দ মিনিট লাগল টাকাব বস্তা পিছনেব গাডিব ক্যাবিযারে ঢোকাতে। পালাবাব সময ছ'টা বিভলবাব থেকে মাত্র আঠাবটা ফাঁকা আওযাজেব দবকাব হযেছিল।

—কিন্তু কত টাকাব ডাকাতি সেটা ঠিক কবতেই সময লেগেছে একটু। প্রথমে ওই সতেব লক্ষ টাকাব অঙ্কটাই মাথায ছিল। কিন্তু পবে চিন্তা কবে দেখলাম সতেব লক্ষ টাকা আব কত টাকা? ভোগেব শেষ দেখতে হলে এ টাকায আব কদিন চলবে। ডাকাতি তো আমি মাত্র একটাই কবেছি বা কবলাম। টাকাব অঙ্কটা বাডাতে বাডাতে সতেব লাখ থেকে সত্তব লাখে তুললাম। কিন্তু ওতেও ভোগেব শেষ হয না। ডাকাতি কবে সে টাকা তো আব আমি ব্যাঙ্কে বাখতে যাচ্ছি না যে সুদেব টাকায পাযেব ওপব পা তুলে জীবন কাটিযে দেব? শেষে সতেব কোটিতে এসে থামলাম। কোনো ব্যাঙ্কে সতেব কোটি টাকা নগদ থাকে কিনা আমি জানি না। কিন্তু আমাব ডাকাতি আমাবই। থাকতে হবে। আমি কাগজ কলম নিযে হিসেব কবে দেখেছি। মাসে দু'লক্ষ কবে খবচ কবলে (দু'লক্ষ কাকে বলে তা-ও আমি জানি না, কিন্তু আমাব মনে হল ওতে ভোগেব সমস্ত বাস্তা খুলে দেওযা যেতে পাবে।) এক কোটিতে পঞ্চাশ মাস যাব। তাহলে সতেব কোটিতে আটশ পঞ্চাশ মাস অর্থাৎ সতেব বছব দশ মাস চলবে। এখন আমাব বযেস একুশ (তখন একুশই ছিল), তাহলে তখন বযেস দাঁডাবে একানব্বুই বছব দশ মাস। তাব বেশি ভাবাব আব কোনো মানে হয না। ও...আপনাবা ভাবছেন আমাব কাঁচা হিসেব—সঙ্গী ছয জনেব ভাগ কী হবে? আসল থ্রিল তো সেইখানে। আমাব অপাবেশনে লোক মাবা নেই, মানে ব্যাঙ্কেব নিবীহ লোকগুলোকে মাবা নেই। তা বলে শত্রু মাবব না এমন হলপ কে কবেছে? ডাকাতিব বাতে খেযে দেযে ফূর্তি কবে ঘুমিযে আমাব সঙ্গীবা কি আব দিনেব মুখ দেখেছে? কাজটা কত সহজ। মদ খেযে সকলেব তখন টইটম্বুব অবস্থা। সেই অবস্থায আমি নিজেব হাতে প্রত্যেকেব ড্রিংক সাজিযে হাঁক দিলাম, 'লাস্ট ড্রিংক ফব দি বেড'। হ্যাঁ, ডাকাতিব পব কুচকুচে কালো অ্যামবাসাডাবেব বদলে ধপধপে সাদা অ্যামবাসাডাব চেপে আমবা দেডশ মাইল দূবেব এক হোটেলে উঠেছিলাম। একসঙ্গে নয। আলাদা আলাদা। একে একে। কেউ কাউকে চিনি না। একেবাবে শেষে সাদা অ্যামবাসাডাব হাঁকিযে এসেছি একলা আমি। তখন বাত। অন্য ছ'জন যে যাব ঘবে। আমাব গাডিব পিছনেব ক্যাবিযাবে সতেব কোটি টাকা কে আব জানছে। (ক্যাবিযাবে সতেব কোটি টাকা আবাব ধবে তো?) যাক সঙ্গীবাও জানে না, আমি শুধু বাতটুকুব জন্যেই আগাম টাকা দিযে ঘব বুক কবেছি—ভোব বাতে উঠে গাডি নিযে চলে যাবাব কথাও বুকিং ক্লার্ককে বলে বেখেছি। যাক, মনেব আনন্দে আমাব ঘবেব বাতেব আসব শেষে আমাব অর্থাৎ লিডাবেব হাত থেকে সঙ্গীবা লাস্ট ড্রিংক ফব দি বেড নিল। প্রত্যেকেব গেলাসে (নিজেব বাদে)

সেই লাস্ট ড্রিংকে আমি কখন কি মিশিয়েছি সজাগ সচেতন থাকলেও তাবা টের পেত না। তখন তো নেশায় বুঁদ। কি মিশিয়েছি সেটা অবশ্য আমি নিজেও এই লেখাব সময় পর্যন্ত জানি না। এমন কিছু যা মদেব গেলাস শেষ হবার পবেও ওরা যে যাব ঘবে গিযে শুযে পড়া পর্যন্ত কোনো কাজ করবে না। তারপবই ওই ড্রিংক লাস্ট ড্রিংকই হবে। আর উঠবে না। আব এই না ওঠাটা যখন জানা-জানি হবে তখন আমি কোথায আব আমাকে সন্দেহই বা করে কে?

—তারপর আমার ভোগেব পালা শুরু। যত বকমেব ভোগ এই পৃথিবীতে আছে সব আমাব হাতের মুঠোয। সদয ভোগ, নির্দয ভোগ, হিংস্র ভোগ, অহিংস ভোগ. সচেতন ভোগ, অচেতন ভোগ। আমি এই পৃথিবীব একমাত্র ভোগবাজ।

শেষে মন্তব্য, 'শালা ভোগেব কিছু জানো না বলেই এক কথায নিজেকে ভোগবাজ বানিযে শেষ কবলে। অমন ভোগে হাবুডুবু খেতেই যদি পাবো—তখন মনের ঘবে মাসে দু'লাখের বদলে দু'শ টাকা খবচেব জীবন ঢেব বেশি স্বাদেব মনে হবে হযতো—কিন্তু সেটা ওই ভোগেব আগে নয।'

এই শেষেব মন্তব্যটা শুধু গুরুব পছন্দ হযনি। নইলে বাকিটা বেশ লেগেছিল। যাক ডাযেরিব আগাগোড়া কুণাল বোসেব ভিতবেব মনটা এখনি ছড়ানো ছিটানো। শিবুকাকা তাব লেখা একটুও ভালো বলেনি, কিন্তু মন্তব্যগুলোব মধ্যে আব সব জিনিস খুঁটিযে দেখাব মধ্যে কিছু সম্ভাবনা দেখেছে। তবে একটা লেখাব প্রশংসাই কবেছে। গুরুব মতে যেটা কোনো লেখাই নয।

লেখাটাব নাম 'ওড অন এ বাবমুডা লিলি।'

পবীক্ষায় ফেল করুক আব যাই করুক চেঁচিযে পাঠ্য বইযেব ইংবেজি বাংলা কবিতা পড়ত, ইংরেজিতে নম্বব পেত একশর মধ্যে বড় জোব তিবিশ। কিন্তু কীটসএব ওড-অন এ গ্রীসিয়ান আবন তা বলে কম বার চেঁচিযে পড়েনি। কুণাল বোসেব কল্পনায এব বিষয-বস্তুও অনেকটা এক বকম। তবে কুণাল বোসেব ভাব আলাদা।

...বাবমুডা লিলি হল একটা ফুলেব নাম। যা কুণাল কখনো চর্ম-চোখে দেখেনি। ঘবেব বঙিন ক্যালেণ্ডারে দেখেছে। ক্যালেণ্ডাবে লম্বা তকতকে একটা সবুজ ডাঁটাব ওপবে ফুটে আছে বাবমুডা লিলি। তাব লম্বা লম্বা সাদা মসৃণ অদ্ভুত নবম ছ'টি পাপড়ি। ভিতবে বঙ-বেবঙেব ছ'টি কেশব। বিলিতি ক্যালেণ্ডাবেব আর্ট পেপাবে ছাপা ভাবী সুন্দব একটা জীবন্ত ফুল দেখলে মনে হবে ওটা শুচিতাব প্রতিচ্ছবি। কিন্তু ওই সবুজ ডাঁটা বেযে উঠছে বঙিন একটা বীভৎস পোকা। পোকাব লুব্ধ দুটো চোখ ডাঁটাব মাথাব ওই ফুলটার দিকে। ওই পর্যন্ত উঠে ফুলটা কুবে কুবে খেতে পাবলে তাব জন্ম সার্থক, জীবন সার্থক। ক্যালেণ্ডাবেব ওই ছবিটাব দিকে তাকালেই অদ্ভুত একটা শিহবণ হত কুণালেব। ছবিটার দিকে চেযে থাকত আর কল্পনায় দেখত ওই বঙিন বীভৎস পোকাটা স্থির অব্যর্থ গতিতে ওই ফুলটার কাছে পৌঁছাচ্ছে—কিন্তু ফুল জানেও না কি শোচনীয তাব পবিণতি। কল্পনাটা যত ঘন হত ততো যেন গায়ে কাঁটা দিতো কুণালের, একটা অস্বাভাবিক বোমাঞ্চ অনুভব কবত। সেটা দুঃখের কি বীভৎস আনন্দের ঠিক কবে উঠতে পারত না। যদিও জানা কথাই ছবির ওই লোভী পোকা কোনদিনই ফুল পর্যন্ত পৌঁছুতে পারবে না।

ওই ছবিটা দেখে দেখে মাথায হঠাৎ একদিন একটা অদ্ভুত খেয়াল চাপল কুণালেব। ডাযেবিব পাতাব মাপেব এক টুকবো আর্ট পেপার কেটে নিযে ওই ক্যালেণ্ডাব আব কাগজ, তাব এক আর্টিস্ট বন্ধুব কাছে দিয়ে এলো। ক্যালেণ্ডাবেব ওই বঙিন ছবি আর্ট পেপাবে হুবহু তুলে দিতে হবে। ক্যালেণ্ডাবেব ওই বং ফুল পোকা সব একবকম হওযা চাই। ঠিক ঠিক হলে একটা ছোট বোতল তাকে প্রেজেন্ট কববে। বোতলেব লোভে না হোক তাগিদেব চোটে আর্টিস্ট বন্ধু তাই কবে দিল। বং ফুল পোকা এক বকমই হযেছে। সেই আঁকা আর্ট পেপাবটা এনে কুণাল ডাযেবিব বাঁ দিকেব পাতায সাঁটল। তাবপব ডান দিকে ওড অন এ বাবমুডা লিলি লিখল।

—বাবমুডা লিলি, আসলে তুমি এক অনন্তযৌবনা অক্ষতসুন্দব নিষ্পাপ মেযে। তুমি নিশ্চিন্তে রূপেব ডালি ছডিযে বসে আছ। জানোও না কে তোমাকে গুটিগুটি খেতে আসছে—শেষ কবতে আসছে। ও এসে পৌঁছুলে তুমি কি কববে—কেমন চমকাবে? আমাব খুব দেখতে ইচ্ছে কবে। ভযেব ছাযা তো আগে চলে। কিন্তু সুন্দবী, তোমাব মনে কি ভযেব ছাযাও পডে না? এ যৌবন ছডিযে অমন নিশ্চিন্তে আনন্দে বসে আছ কি কবে?...নাকি তুমি জানো, ওই নির্মম যম কোনদিন তোমাব কাছে পৌঁছুতে পাববে না—ওব লুব্ধ চোখ আব জ্বলন্ত ক্ষুধা নিযে ও যেমন আছে চিবকাল সেই বকমই থেকে যাবে?...তাই ঠিক বোধহয। বাসনাব চূডান্ত স্বপ্নেব নাগাল আমবা কে কবে পেযেছি? যাব পবে আব কিছু নেই এমন ভোগবতীব কাছে কে কবে পৌঁছুতে পেবেছি? হযতো তাব হদিশ পেযেছি, ওই ভীষণ বঙিন পোকাটাব মতো লুব্ধ চোখে তাকে দেখেছি, লোভে হাত চেটেছি, গুটিগুটি সেদিকে এগোতে চেযেছি। কিন্তু ওই বাসনাব ডালি মবীচিকাব মতো যেমন দূবে তেমনি দূবে। অনন্তযৌবনা বাসনাব বাবমুডা লিলি লোভেব ডগাব শেষ মাথায চিবকালই ওমনি অক্ষতসুন্দব।'

...আব ডাযেবিব শেষ লেখাটাব পবেব মন্তব্য পডে শিবুকাকা একটু ঘুবিযে প্রশংসা কবেছিল। বলেছিল, ঠিকই তো বুঝেছিস দেখি, তোকে গাধাব মতো গোরু কে বলে? জেনে শুনে উল্লুক হযে বসে থাকলে কে তোকে ঠেলে তুলবে? শিবুকাকা নাকি প্রাচীন ইতিহাস আব সংস্কৃতিব স্কলাব ছিল। নিজেব কাগজে নিজে লেখেও ওই ছাইভস্ম নিযেই। কিন্তু তাব জিভ যখন নডে তখন মনে হয সে প্রাণিবিদ্যাবিশাবদ ছিল। যাক, ওই শেষে কুণাল বোস লিখেছিল তাব পবেব মন্তব্য পডলে গুরু নিশ্চয তেডে মাবতে আসত।

—আমবা জীবন খুঁজছি। জীবনেব অর্থ খুঁজছি। গুরু খুঁজছে। সঙ্গে আমিও। ভোগেব তলকূল দেখতে না পেলে জীবনেব কি অর্থ? ল, এথিকস, ডিসেন্সি—এসব অসাব কথাব লাগাম ছিঁডতে যদি না পাবো তো ভেডা হযে থাকো। ও-সব আবেগ টাবেগেব আমবা ধাব ধাবি না। আমাদেব জীবন মানে সেনসুযাল প্লেজাব। এক ভোগ ছাই কবো, অন্য ভোগেব পিছনে ছোটো। থ্রিল আব উত্তেজনা জীবনেব সাব কথা। সেটাই জীবন। তাই মেযেমানুষেব পিছনে ছুটি, তাকে ভালবাসাব ফাঁদে ফেলি, নাচি (গুরুব খবচে হোটেলেব এক মেযেমানুষেব কাঁধ ধবে দাঁডকাকেব মতো সত্যি আমি খাসা নেচেছিলাম—উঃ, সে কি থ্রিল!) মদ খাই, ম্যাবিজুয়ানা টানি। এই থ্রিল আব

উত্তেজনার লোভেই শুধু একবার আমি বাবার পকেট থেকে তার মানিব্যাগটাই হাপিস করে দিয়েছিলাম। এমনি থ্রিল আর উত্তেজনার মধ্য দিয়েই আমরা জীবন খুঁজে চলেছি।'

মন্তব্য : জীবন খুঁজছ না এই করে তুমি শালা জীবন থেকে পালাচ্ছ সেটা তলিয়ে ভাবার সাহস নেই কেন?

..কুণাল বোসের এই সম্পদখানা অর্থাৎ এই ডায়েরিটা হারিয়ে গেছল। আর সেই কারণে চোখে একটু আধটু সর্ষেফুলও দেখছিল। হারানো ঠিক নয়, চুরি গেছল জানা কথাই। ওর ঘরে বাড়ির কেউই ঢোকে না। রুচি হয় না বলে ঢোকে না। রুচি যাতে না হয় কুণাল নিজেই সে-ভাবে ঘরখানা রাখত। ডায়েরিটা থাকত তার সুটকেসে। গোড়ায় গোড়ায় ওই ডায়েরিটা লোকচক্ষুর আড়ালে রাখার জন্যই চাবি দিত। কিন্তু পরে আর চাবি দেওয়া দরকার মনে করত না। কে আসছে তার ঘরে আর কে-বা দেখছে।...কুণাল খুব ভালো করেই জানে ডায়েরি সরানোটা কার কাজ। বড় বউদি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। বড় বউদি কুণালের থেকে ন'বছরের বড়। কুণাল তার আওতার মধ্যে ছিল যখন, একটু শাসন-টাসনও করত। সে অবশ্য আট দশ বছর আগে। এখন কাছেও ঘেসে না। দূর থেকে সন্দিগ্ধ চোখে দেখে। কুণাল নিজের কানে শুনেছে, দাদাকে একদিন বলছিল, ও যে-রকম মরা মাছের মতো চোখ করে তাকায় ওর কাছে যেতেই ভয় করে। ওর হাড়ে মাংসে শয়তানি ঢুকেছে বলে দিলাম।

কুণাল বোস রাগ করেনি। বরং মনে মনে হেসেছে। ওর কাছে যা জীবন—থ্রিল, এদের বিচারে তা শয়তানি হতেও পারে। যাক, তার কয়েক দিনের মধ্যে সুটকেশ খুলে দেখে ডায়রিটা নেই। নেই তো নেই-ই। খোঁজ খোঁজ খোঁজ। শেষে বুঝল, কেউ সরালে আর খুঁজে লাভ নেই। সরিয়েছে যে তার আর ভুল কোথায়। বাড়ির লোকের মুখের দিকে চেয়েই বুঝেছে সকলের সব চিন্তার বাইরে বিষম কিছু ঘটে গেছে। বাবা শেষ পর্যন্ত কি করে কুণাল সেই অপেক্ষায় ছিল। যতই ক্ষেপে যাক না কেন, মার-ধোর করতে সাহস করবে না। আর দাদারা তো নিরীহ গোছের ভীতু মানুষ। ভাইয়ের পয়সা-অলা গুরুর খবর তারা রাখে, কিন্তু তলায় তলায় কোন গ্যাঙ-ট্যাঙের সঙ্গে মেশে কে জানে। বাড়ির এই অনিশ্চিত অবস্থাটাও মন্দ উপভোগ্য মনে হত না শেষের দিকে। এতেও যেন একটু থ্রিল আছে।

অবশ্য গুরু ব্যাঙোদাকে ব্যাপারখানা বলে রেখেছিল। বাড়িতে ঠাঁই এর পর আর হবে কি হবে না ঠিক নেই। গুরু ঠোঁট উল্টে নিশ্চিন্ত করছে ওকে। বলেছে, আমাদের ডিকশনারিতে আবার ভাবনা বলে কোনো কথা আছে নাকি। তাড়িয়ে দেয় চলে আসবি।

শেষে দেখা গেল ভেবে-চিন্তে বাবা এই কাণ্ড করেছে। ডায়েরিটা শিবুকাকার হাতে তুলে দিয়েছে। বাবা আর শিবুকাকা ক্লাসফ্রেণ্ড ছিল, সেই সুবাদে কাকা। একেবারে উল্টো মানুষ দুজনে। বাবা এমনিতে ঠাণ্ডা ভীতু স্বভাবের হঠাৎ হঠাৎ ক্ষেপে গেলে বাড়ি মাথায় করে তোলে। তারপর আবার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় চুপসে যায়। নানা রকম ভাবনাচিন্তা মাথায় ঢোকে। কুণালের বেলায়ও তাই হয়েছে কোনো সন্দেহ নেই।

আব শিবুকাকা হাসি-খুশি মেজাজী মানুষ, খেতে ভালবাসে, গালমন্দ কবে জিভেব ঝাল ঝাড়তে ভালবাসে। তাব সবেতে উৎসাহ, সবেতে কৌতূহল। এমন না হলে কুণালেব এই ডাযেবি পড়েও কিছু সুসম্ভাবনাব কথা তাব মনে আসে।

ডাযেবি হাতে কুণাল একটা বাসে উঠে পড়ল। এমন খববটা গুরুকে না দিলেই নয। ডাযেবি ফিবে পাওযাব থেকেও 'শিউলি' মাসিক-পত্রেব মালিক আব সম্পাদক শিবু আচার্যি ওব মধ্যে এক ভাবীকালেব লেখককে আবিষ্কাব কবেছে এটাই আবো মজাব খবব। তাছাড়া, আব এক তৃষ্ণা ভিতব থেকে সুড়সুড় কবে ওপবেব দিকে উঠে জিভটাকে বাব বাব শুকিযে দিচ্ছে। সেটা সিগাবেটেব তৃষ্ণা নয। শিবুকাকাব দপ্তব থেকে বেবিযে সিগাবেট তো পব পব দুটো খেল। এটা তাব থেকেও ঢেব কড়া তৃষ্ণা। মাবিজুযানাব তৃষ্ণা। গুরু হযতো তাই টেনে তাব নিচেব ঘবেব ফবাসে চিৎপাত হযে আছে।

. বিকেল ছ'টায প্রায নিযমিত একবাব কবে ঘন্টা দুই আড়াইযেব জন্য পার্ক স্ট্রীটে হানা দিতে হয। আজ আব হযতো সেটা হযে উঠবে না। বাড়িব লোক বেকাব ভাবে কুণালকে। কিন্তু নিজেব খবচ, নিজেব ছোটখাট নেশাব খবচ (বড় নেশাব খবচ তো গুরু গৌবী সেনেব কাছ থেকেই আসে), এমন কি নিজেব জামা কাপড়েব খবচেব জন্যও কাবো কাছে তাকে হাত পাততে হয না। এই বোজগাবেব ব্যবস্থাও গুরুব কল্যাণেই হযেছিল অবশ্য। এখন নিজেব চেষ্টায পসাব বেড়েছে। তাদেবও মতো জীবন খুঁজছে অথচ ভিতবে ভীতুব ডিম এমন লোকেব কি অভাব আছে? এই লোকেবা তাব খদ্দেব। তাদেব মধ্যে বাঙালী আছে, অবাঙালী আছে।. .বছব খানেক আগে গুরুব সঙ্গে একবাব বম্বে আব গোযায বেড়াতে গেছল। সেখান থেকে গুরু গাদা গাদা ব্লু-পিকচাব আব ব্লু-ফিলম কিনেছিল। ততদিনে সে-সব দেখে-দেখে গুরুব তো বটেই, কুণালেবও চোখ পচে গেছল—বক্তমাংসেব জ্যান্ত মেযেগুলোব মধ্যেই এখন আব আগেব মত থ্রিল খুঁজে পায না—এ-তো ছবি আব ফিলম। কিন্তু তবু গুরু কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খবচ কবে এত ছবি আব ফিলম কিনছে কেন মাথায ঢোকেনি। পবে গুরুই বলেছে, কেন? কলকাতায এগুলোব দারুণ ডিম্যাণ্ড—যে দুটো দোকান থেকে গুরু পর্ণোগ্রাফিব বই কেনে বা পযসা দিযে বাড়ি এনে পড়ে, আসাব আগে সেই দুটো দোকান থেকেই বলে দিযেছে ভালো মাল পেলে ভালো দামে কিনবে। হ্যাঁ, গুরুব পর্ণোগ্রাফি পড়াব ঝোঁক এখনো আছে। বলে, মানুষেব ভোগেব নিত্য নতুন যত বকমেব বৈচিত্র্য আছে, কোনো কোনো লেখায তা মেলে। এতে দস্তুবমতো মাথা-খাটানোব স্কোপ আছে। স্টিল ছবি বা ফিল্ম-এব থেকে বইযেব মতো বই হলে ঢেব বেশি ইন্টাবেস্টিং।

গুরু বলল, এগুলো কেমন মোটা লাভে ঝেড়ে দিই দেখিস—তোকেও লাভেব কিছু ভাগ দেব। আব ওই দুটো দোকানেব মালিকেব সঙ্গেও তোব আলাপ কবিযে দেব। খদ্দেব আনাব চৌকস লোক তো তাদেব সব সমযই দবকাব হয। কুণাল বোস এখন এই দালালিব কাজে পাকা হযে গেছে। কাঁচপোকাব মতো খদ্দেব ধবে নিযে আসে। আবাব নিজেও ঘুবে ঘুবে বেশি লাজুক খদ্দেবেব কাছে সাপ্তাহিক ভাড়ায ছবি

আব পর্ণোগ্রাফিব বই পৌঁছে দেয়। এই খদ্দেববাই আবাব ক'দিন গেলে পবদায মুভি ব্লু ফিল্ম দেখাব আশায ওকে তেল দেয।

অকাতবে এব জন্যে তাবা মোটা টাকা খবচ কবে। কুণালেব ঝোপ বুঝে কোপ, অর্থাৎ খদ্দেবেব পকেটেব ওজন বুঝে মাশুল আদায। এই কবে দালালিব বোজগাব বাডছেই। অথচ এক বছব আগেও কি জানত ওই দুটো দোকানেবই গোপনে মুভি ব্লু ফিল্ম দেখানোব এমন পবিপাটি ব্যবস্থা আছে?

যা ভেবেছিল তা নয। গুরু চিৎপাত হযেই তাব 'এক্সক্লুসিভ' নিজেব ঘবেব ফবাসে শুযে আছে। তাব পাশে দুটো পোস্টকার্ড সাইজেব ফটো পডে আছে, হাতেও একটা খুব মনোযোগ দিযে সেই ফটো দেখছে গুরু।

কুণাল শব্দ না কবে পাশে বসল। আলতো হাতে ওই বাকি ফটো দুটো তুলে নিল। দুটো ফটোই একটা মেযেব। ফুটফুটে সুন্দব কচি মুখ। বড জোব বছব সতেবো আঠাবো হবে বযেস। ডাগব চোখ। চোখেব পাতা ফেললে বোধহয নাকেব ডগা অনেকটা ছাডিযে যাবে। মোটাও নয, বোগাও নয। সব থেকে চোখে পডাব মতো মেযেটাব মুখেব কমনীযতা। কেউ যেন ছাঁচে গডে কমনীযতাব বস উপুড কবে ঢেলেছে।

হাতেব ছবিটা সামনে বেখে গুরু আডচোখে কুণালকে দেখছে আব টিপটিপ হাসছে। চোখা-চোখি হতে বলল, দেখে ফেললি তো। তোকে অবাক কবে দেব বলে একমাস ধবে চেপে বসে আছি।

—কি ব্যাপাব গুরু, এ আবাব কোথাকাব হুবী পবী? কিন্তু এ তো একেবাবে কচি।

তেমনি হেসে গুরু জবাব দিল, বাগবাজাবেব। হাতেব ফটোটা এগিযে দিল। দেখে ফেলেছিস যখন এটাও দ্যাখ।

অর্থাৎ এটা কচি বলাব জবাব। একটু আড হযে মেযেটা বাঁ-হাত মাথাব পিছনে তুলে খোঁপা ঠিক কবছে—সেই সমযেব ছবি। ফলে পিছনেব খানিকটা আব বুকেব এক দিকেব সুডৌল মাধুবী যেন উপছে পডেছে। চোখ ফেবানো যায না।

গুরু হৃষ্টমুখে জানান দিল, এ ছবিতে কোন কাযদায কি তুলেছি ও মেযে নিজেও জানে না।...তা কি বকম মনে হচ্ছে?

দারুণ।

চোখে দেখলে বাতে তোব ঘুম হবে কিনা সন্দেহ। দেখবি?

বাগবাজাবে গিযে?

ইদানীং তো আমি প্রায বোজই যাচ্ছি। এই ফটোটা আমাব থাকবে, আজ ওই ফটো দুটো দিযে আসতে যাব। চল...।

কুণাল বিকেল থেকে বাত পর্যন্ত থাকে পার্ক স্ট্রীটে। সে-সময গুরুব কোন লীলা চলছে জানবে কি কবে। লোভ হচ্ছে বটে, আবাব নেশাব লোভ নিযে এসেছিল তা-ও বাতিল কবতে মন চায না। বলল, একটু বড গাঁজাব ইচ্ছে ছিল যে গুরু...।

বড গাঁজা অর্থাৎ মাবিজুযানা। গুরু আমল দিল না। বলল, ও-সব এসে হবে, আগে বড গাঁজাব বাণী দেখবি চল।

গুরু তৈরী হয়ে রাস্তায় বেরুলো। ট্যাক্সি নিল। হুকুম করল, বাগবাজার।

ডায়েরি ফেরত পাওয়া বা কুণালের লেখক হবার সম্ভাবনার মজার খবরটা আর দেওয়াই হল না। ওর হাতের সেই কালো ডায়েরিটা গুরুর চোখে পড়েও পড়ল না। ট্যাক্সি ছুটেছে আর এদিকের বসের ব্যাপারখানা কি থেকে কি গড়াচ্ছে ব্যাঙোদা মনের আনন্দে সেই ফিরিস্তি শোনাচ্ছে শিষ্যকে।...ওই ফটোর মেয়ের মা গুরুর মায়ের ছেলেবেলার খুব বন্ধু ছিল। একদিন দুজনের দুজন'কে না দেখলে চলত না এমন নাকি। হঠাৎ এর মধ্যে একদিন কার মুখে শুনেছে সেই ছেলেবেলার বন্ধু আজ চৌদ্দ বছর ধরেই কলকাতায়। আমেরিকায় নয়। সে দিন-আনা দিন-খাওয়া গরীবের বউ আমেরিকা ফেরত এত বড়লোক বান্ধবীর কাছে আসবে কি আসবে না সেই দ্বিধা ছিল। শেষে ইচ্ছেটাই বড় হয়েছে। ফোন গাইডে ঠিকানা দেখে ছোট মেয়েকে সঙ্গে ক'রে এক-সন্ধ্যায় চলেই এসেছে। নিচে তখন গুরু ছিল। তার সঙ্গেই মা-মেয়ের প্রথম দেখা। সে-যে কি দেখা গুরুই জানে। এত বড় বাড়িতে পা ফেলে দু'জনেই তারা বেশ জড়সড়। চন্দনা মানে ফটোর মেয়ে সেদিন একখানা ঘন নীল শাড়ী পরে এসেছিল। গুরুর মনে হচ্ছিল, নীলের মধ্যে আকাশের চাঁদখানা মুখ বাড়িয়ে আছে।

কাকে চাই শুনে সঙ্গে করে দোতলায় নিয়ে চলল। বাবা মা তখন মুখোমুখি বসে মদ গিলছে জেনেও। ছেলেবেলার বান্ধবী শুনে আর নিরাভরণা মহিলার একেবারে সাদামাটা বেশবাস দেখেই তার মগজে একটা আশা উঁকি ঝুকি দিয়ে গেছে। বান্ধবীকে স্বামীর সঙ্গে মদের বোতল আর মদের গেলাস নিয়ে বসা দেখেই তো মহিলার হয়ে গেল। ওদিকে বাবা-মাও অবাক। গুরুই ভিতরে ডাকল, আসুন মাসিমা ভিতরে আসুন। মা-কে বলল, তোমার ছেলেবেলার বন্ধুকে চিনতে পারছ না?

নাম বলার পরেও ব্যাঙোদার মায়ের চিনতে সময় লাগল একটু। বাবা সাহেবী কায়দায় নিজে উঠে ওদের বসতে আপ্যায়ন করল। তারপর অন্য ঘরে চলে গেল।ওরা জড়সড় হয়ে বসল। ব্যাঙোদা বাইরে থেকে লক্ষ্য করল, চেনার পরেও মা তেমন আগ্রহ দেখালো না। ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করল, ড্রিংক চলে কিনা। মহিলা এমন মাথা নাড়ল যে বাইরে থেকে ব্যাঙোদা হেসেই ফেলল। সে যেন উঠে ওই ঘর ছেড়ে ছুটে বেরুতে পারলে বাঁচে। দু'চার কথায় মা তার ঘরের খবর নিল। মহিলা বাগবাজারে থাকে।চন্দনারা চার বোন। চন্দনা ছোট। বড় তিন বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। স্বামী পোস্ট অফিসের চাকরি থেকে এ বছরেই রিটায়ার করেছে, এখন ডায়বেটিসে প্রায় শয্যাশায়ী। মায়ের জেরার মতো প্রশ্নে দুই এক কথায় এইসব জবাব এসেছে। একটু বাদেই মহিলা বলল, উনি গেলাস রেখে চলে গেলেন, আমি অসময়ে এসেছি, আজ উঠি। ব্যাঙোদার মা আপত্তি করল না, মাথা নাড়ল। ওরা উঠতে বলল, তোর এই ছোট মেয়েটা তো বেশ সুন্দর হয়েছে, বিয়ের চেষ্টা করছিস নাকি? মহিলা মিনমিন করে জবাব দিল, সে-রকম কিছু না, সবে এবার হায়ার সেকেণ্ডারি পরীক্ষা দিল...এখনো ফল বেরোয়নি...বয়েস মাত্র সতের।

তারা নামার আগেই ব্যাঙোদা সরে গেছল। তার বাবাকে বলেছে, তোমার গাড়িটা নিয়ে ঘণ্টাখানেকের জন্য বেরুচ্ছি। রাতে তার বাবা কলেও বেরোয় না গাড়ির ও দরকার হয় না।

মা মেয়ে খানিকটা এগোবাব পব পিছন থেকে গাড়ি থামিযে ব্যাগোদা তাদেব ধবেছে। নেমে এসে পিছনেব দবজা খুলে দিযে মহিলাকে বলেছে, উঠুন মাসিমা —পৌঁছে দিচ্ছি।

মা মেযে দুজনেই খুব হকচকিযে গেছে। মহিলা বলেছে, আমবা তো বাগবাজাবে থাকি—

ব্যাগোদা বলেছে, গাড়িতে বাগবাজাব আব কতক্ষণেব পথ। আব বলেছে, পুবনো বান্ধবীব সঙ্গে বাগবাজাব থেকে এসে আপনি কেমন দেখা কবলেন আমি দেখেছি, আব বুঝেছি, এমন জানলে আপনি আসতেন না। তাই আমিই যেটুকু পাবি প্রাযশ্চিত্ত কবি—উঠুন উঠুন পিছনে গাড়ি দাঁড়িযে গেছে।

মহিলা তাড়া খেযে উঠে বাঁচল। মেযেটা আদব-কাযদা জানে না বলে সেও মাযেব পিছনে উঠল। গাড়ি হাঁকিযে সামনে চোখ বেখেই ব্যাগোদা আলাপ জুড়ে দিল। আব ফাঁকে ফাঁকে বিযাব গ্লাসে মেযেটাকে দেখতে লাগল। সংকোচ কাটিযে মহিলা বলল, তুমি এভাবে গাড়িতে আমাদেব পৌঁছে দিতে চললে, তোমাব মা হযতো অসন্তুষ্ট হবেন।

ব্যাগোদা বেশ গলা ছেড়ে হাসল (ওটা সবলতাব লক্ষণ জানে), জবাব দিল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মাসিমা, আমাদেব কাবো ব্যাপাবে কাবো ইন্টাবফিযাব কবা বীতি নয—একদিক থেকে আমবা সম্পূর্ণ স্বাধীন। তা আমাব মাযেব সঙ্গে এককালে খুব ভাব ছিল বুঝি আপনাব?

—খুব। এই জন্যেই তো

কিছু বলতে গিযে থমকালো। আবাবও হা-হা হেসে ব্যাগোদা বলল, আপনাকে কিচ্ছু লজ্জা পেতে হবে না, আমি এক-নজবেই সব বুঝে নিযেছি। মা অনেক বদলেছে, অনেক বড়লোক হযেছে। তবে আমাব শুধু অনুবোধ বাবা মাকে দেখে আপনি তাদেব ছেলেকে বিচাব কববেন না। মাযেব আচবণে আজ আমি কোথায আঘাত পেযেছি জানলে আমাব জন্য আপনাব কষ্ট হত।

মহিলা বলেছে, সে-কি কথা বাবা, আমি এবই মধ্যে বুঝেছি তুমি সোনাব ছেলে।

বাড়িতে পৌঁছে দিতে গিযে ব্যাগো দেখেছে, নিতান্তই দীন দশা তাদেব। ভদ্রলোক হযতো বড় তিন মেযে পাব কবতেই ফতুব হযেছে। মেযেগুলোব চেহাবা খাসা বলে তবু পাব হযেছে। ভদ্রলোক সত্যিই প্রায অথর্ব। একবাব ডাযবেটিক স্ট্রোক পর্যন্ত হযে গেছে। তাকে দেখাব কর্তব্যেই ব্যাগোদা এবপব ঘন ঘন এসেছে। তাদেব চোখে সে তখন আব সোনাব ছেলে নয, হীবেব টুকবো ছেলে। হ্যাঁ, মহিলা ততদিনে তাবও খোঁজ খবব সব নিযেছে বইকি। অবশ্য ব্যাগোদাব কাছ থেকেই। গেলেই একবাশ ফল মিষ্টি নিযে যায। মহিলা কিছু বলতে গেলে অভিমান কবে, আমাকে ছেলে ভাবলে কিছু বলবেন না, আমাব মা আছে, কিন্তু আপনাকে দেখাব আগে আমি মা পাইনি।

পাঁচ দিন আগে ব্যাগোদা তিন হাজাব টাকা জোব কবে মহিলাব হাতে গুঁজে দিযেছে—মেসোমশাইযেব সব থেকে ভালো চিকিৎসা হওযাই চাই। মহিলা তিন হাজাব টাকা একসঙ্গে দেখেছে বলে মনে হযনি ব্যাগোদাব। তাব যে দেবাব অধিকাব আছে তাব দু'দিন আগে মহিলাকে সে সেটা স্পষ্টই বুঝিযে দিযেছিল। বলেছিল, আমাকে

যদি খুব অপছন্দ না হয়, তাহলে যেদিন বলবেন সেদিন আমি গাড়ি নিয়ে এসে আপনাকে আমার মায়ের কাছে নিয়ে যাব...অবশ্য আমার ব্যাপারে আমার ডিসিশনই ফাইন্যাল, তবু একটা ফরম্যালিটির ব্যাপার আছে তো। আমি মা-কে বলেই রেখেছি, ওঁদের আপত্তি না হলে চন্দনাকে বউ করে ঘরে তোলার জন্য রেডি থেকো।

মহিলা তো আকাশের চাঁদ হাতে পাবেই। মা রাগ করেছে কিনা জিজ্ঞেস করতে ব্যাণ্ডোদা আবার সেই হা-হা হাসি হেসেছিল বলেছিল, এবারে গিয়েই দেখতে পাবেন —তাছাড়া জানেন তো কারো ব্যাপারে ইন্টারফিয়ার করা আমাদের রীতি নয়।

যাক, ব্যাণ্ডোদার অভিমান দেখেই মহিলা সেই তিন হাজার টাকা হাত পেতে নিয়েছে। তারপর এইসব ছবি-টবি তুলতে দিতে আর বাধা কোথায়। ব্যাণ্ডোদার আফসোস, ওই দুটো খুপরি ঘর, চন্দনাকে সেভাবে একলা পাচ্ছে না—তবে পাবার চান্স এবারে একটু হয়েছে। ব্যাণ্ডোদা বলল, মেয়েটা এখনো এমন চেয়ে থাকে না, যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না কি হতে যাচ্ছে। তখন ইচ্ছে করে, ওকে বুকের মধ্যে নিয়ে একেবারে পিষে ফেলি, আর টসটসে চোখ দুটো দাঁতে করে ছিঁড়ে আনি।

ওরা পৌঁছুলো। কুণাল দেখল মেয়েটাকে। ছবি অত সুন্দর, কিন্তু এর বুঝি তুলনা নেই। দেখামাত্র সদ্যফোটা যুঁই ফুলের মতো মনে হল কুণালের। আড়চোখে কুণালকেও দেখল। ঠোঁটের ফাকে হাসির দাগ পড়ল একটু। ছাগলদাড়ি দেখে হাসি পাচ্ছিল বোধহয়। যে-লোকের বন্ধু, কুণালেরও আদর যত্ন কম হবে কেন? যতক্ষণ ছিল ওরা, চন্দনার মায়ের অস্থির অস্থির ভাব। এরই মধ্যে ফাক বুঝে ব্যাণ্ডোদা বার দুই চোখে চোখে কথা কইতে চেষ্টা করল চন্দনার সঙ্গে। কিন্তু চন্দনার আয়ত গভীর কালো চোখে আর দুটো ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসির আভাস খেলা করে গেল শুধু। আর খেয়াল না করে ব্যাণ্ডোদা একটু কাছাকাছি হতে চেষ্টা করলেই তেমনি খেয়াল না করেই যেন ওই মেয়ে একটু তফাতে সরে যায়। দু'বার হয়েছে এমন। আ-হা-হা, কুণালের চোখে পলক পড়ে না—কি যে দেখাচ্ছিল না মেয়েটার মুখখানা তখন—যেন একখানা কালো মেঘের সঙ্গে চাঁদের লুকোচুরি খেলা। উপমা ঠিক হল না। চাদ হাসে। এই মেয়ের মুখে শুধু একটু হাসির আভা ছড়ায়।

ওঠার সময় চন্দনার মা ব্যাণ্ডোদাকে জিজ্ঞেস করল, কাল আসছ তো বাবা? কুণালকেও নিয়ে এসো।

ব্যাণ্ডোদা বলল, কাল হয়ে উঠবে না...দেখি। আপনাকে আমাদের বাড়ি করে নিয়ে যাচ্ছি বলুন?

—যেতে তো হবেই, শীগগিরই যাব...তবে আমার কেমন ভয় করে বাবা।

জবাবে কুণাল ব্যাণ্ডোদার হা-হা হাসির একটা নমুনা দেখল।

আবার ট্যাক্সি। ব্যাণ্ডোদা বলল, কি রকম বুঝলি?

কুণাল ঝুঁকে পায়ের ধুলো নিতে গেল।—তোমার জবাব নেই গুরু, পায়ের ধুলো দাও। দারুণ—দারুণ—আমার বুকে চিতার আগুন জ্বলছে।

গুরু খুশি।

—তোমার মাকে সত্যি বলে রেখেছ?

—না বলার কি আছে! বলতে তো হবেই। তা কেমন লাগল বল।

—বললাম তো জবাব নেই। বয়েস সতেরো হলেও খুব বাড়ন্ত গড়ন।

—বয়েস সতেরো নয়, আঠারো। আমার সাতাশ শুনে ওর মা-ই স্বীকার করেছে। আঠারো না হলে সব-দিকে অমন ডবকা হয়?

—তুমি কাল আসছ না বললে, ফের কবে আসছ?

—পরশু। মুচকি হাসল।—তবে পরশু তোকে আনা যাচ্ছে না।

—কেন?

—চন্দনার বাবাকে নিয়ে ওর মা পনের দিনে একদিন পোলিক্লিনিকে দেখাতে যায়...পরশু শনিবার, যাবে আমি ক'দিন আগেই শুনেছিলাম। ঘণ্টা কয়েকের মামলা। পুরনো ঝি'টা অবশ্য বাড়ি আগলে বসে থাকে, তবু এই মওকায় তাকে এদিক ওদিক সরিয়ে চন্দনাকে দুই একবার বুকে চেপে তো ধরতে পারব আর কষে দু'চার বার চুমুও খেতে পারব—এবারে কোন শালা ঠেকায়।—তা তোর ভিতরটা খুব চড়চড় করছে?

—খাঁ-খাঁ করছে।

—সত্যি বলছিস?

—এই দেখানোর আগে আমার চোখ দুটো তুমি অন্ধ করে দিলে না কেন গুরু।

প্রদীপ ব্যাঙো হাসতে লাগল। খানিক বাদে হঠাৎ বলল, যা এত যখন...ছ'মাস এক বছর বাদে সুবিধে বুঝে তোকেই দিয়ে দেব।

কুণাল আঁতকে উঠল।—দিয়ে দেবে!

—না তো কি। কোন একটা মেয়েকে নিয়ে আমি জীবন কাটাবো ভাবিস নাকি? ঐ আগের অন্য বউ দুটোর মতো হবে না—সাপের মতো ফোঁস-ফোঁস করবে না...ঠিক টিট করা যাবে। তোকে নিয়ে আমার একটা দায়িত্ব আছে না?

রাত ন'টা নাগাদ কুণাল বাড়ি ফিরে দেখে শিবুকাকা বসে আছে। সামনে বাবা আর দাদারাও আছে। ওকে দেখেই শিবুকাকা বলল, তোর কথাই এদের বলছিলাম এতক্ষণ। তোর সাবজেক্ট ঠিক করে ফেলেছি—

বাবা আর দাদাদের মুখ দেখে মনে হল তারা আশার কথাই শুনছিল কিছু। বাবা বলে উঠল, আগে কাকার পায়ের ধুলো নে হারামজাদা পায়ের ধুলো নে।

কুণাল পিতৃ আদেশ পালন করল।

শিবুকাকা বলল, ওই বাদরেতরদের নিয়েই তোর ফীচার স্টার্ট করব। মানে 'তরুণের মন' নাম দিয়ে তুই মাসে একটা করে ফীচার লিখবি। এক এক পর্যায়ের এক-একটা তরুণ বেছে নিবি—তার মনের কথা সুখ দুঃখের কথা শুনবি তারপর লিখবি। শেষে তোর মন্তব্য জুড়ে দিবি। মন্তব্য ওই রকম সরস হওয়া চাই—বুঝলি কোন রকম?

কুণাল সুবোধ ছেলের মতো মাথা নাড়ল, বুঝেছে।

—প্রত্যেকটা লেখার জন্য পঁচিশ টাকা আর ঘোরাঘুরির জন্য পাঁচ টাকা করে পাবি। সেরকম উতরোলে বই ছাপার ব্যবস্থাও আমি করে দেব। বাবাকে বলল, তুমি

কিছু ভেব না ভাযা, ওব ভাব আমি নিলাম—আজ পর্যন্ত অনেক গাধা পিটিযে ঘোডা কবেছি।

বাবা কৃতজ্ঞতায গদগদ।

আবো বাত্রি।

ঘুম থেকে ধডমড কবে একেবাবে বিছানায উঠে বসল কুণাল। বেডসুইচ টিপে আলো জ্বালল। ঘেমে গেছে। এ কি অদ্ভুত স্বপ্ন বে বাবা। ঘুবে ঘবেব কোণেব সুটকেসটাব দিকে তাকালো। না, থাক—স্বপ্ন ছাডা আব কি। কিন্তু বুকেব ভিতবটা ধপধপ কবছে এখনো। হাত বাডিযে ড্রযাবটা খুলল। ছোট হুইস্কিব বোতলটা খুলে কাঁচাই গলায ঢেলে দিল। দুই একবাব গা ঝাঁকানি দিযে টেবিলেব গেলাস থেকে অল্প একটু জল খেল। বোতলটা ড্রযাবে বেখে আলো নিভিযে আবাব শুযে পডল। কিন্তু ঘুম আব আসে না। যতবাব চোখ লেগে আসে, গুরুব মুখ আব চন্দনাব মুখ চোখেব সামনে ভেসে উঠছে।...চন্দনাকে বুকে চেপে গুরু চুমু খেতে যাচ্ছে। কাল বাদে পবশু দুপুবে যা ঘটবে।

বাব কযেক এ-বকম হতে আবাব বেডসুইচ টিপে উঠে বসল। নিজেব উদ্দেশে গাল পাডল, শালা পেট জ্বালিযে দিযে তোব জেগে খোযাব দেখা বাব কবছি। ড্রযাব খুলল। হুইস্কিব বোতলটা এবাবে গলায ঢেলে শেষই কবে দিল।

পবেব দিন।

দুপুব তিনটেয একটা বিকশ চেপে কুণাল বোস বাডি ফিবল। এই দুপুবে ঘবেব বাইবে কেউ নেই, নইলে ওকে দেখলে হাঁ হযে যেত। ট্রাউজাবেব ওপব ওব গাযে শুধু একটা সুতিব গেঞ্জি। জামাটা এক হাতে গোল কবে দলা পাকানো।

বিকশা ভাডা দিযে নিঃশব্দে নিজেব ঘবে চলে এলো। দলা পাকানো জামাটা চৌকিব কোণে ছুঁডে ফেলে দিল। সুটকেস খুলে কালো ডাযেবিটা বাব কবল। ড্রযাব হাতডে একটা পুবনো ব্লেড নিযে বসল। ওড অন বাবমুডা লিলিব পাতাটা খুলল। তকতকে সবুজ ডাঁটাব ওপব বসা বঙিন বীভৎস পোকাটাব মাথাটুকু শুধু ব্লেড দিযে কেটে দিল। তাবপব নতুন পাতায চলে এলো। কলম বাব কবল। শিবু কাকাব কাগজেব জন্য 'তরুণেব মন'এব প্রথম বা শেষ ফীচাব এক্ষুণি লিখে ফেলবে। বাবমুডা লিলিব লেখাটা পছন্দ হযেছিল যখন, এ লেখাটা নিশ্চয আবো ঢেব বেশি পছন্দ হবে।

—আমি এক্ষুণি গুরুব বাডি থেকে ফিবলাম। বেলা বাবোটা থেকে পৌনে তিনটে পর্যন্ত তাব ওখানে তাব সঙ্গেই ছিলাম। গুরু পবেব দিনেব অপেক্ষায মশগুল। আব আমি? না, জীবনে এত থ্রিল আব এমন উত্তেজনাব স্বাদ আমি পাইনি। গ্র্যাণ্ড—যাকে বলে সুপাব গ্র্যাণ্ড। অথচ নেশা কেবল একলা গুরুই কবছিল। আমি যোগান দিযে চলেছিলাম। গুরুব তখন আমাব দিকে মন দেবাব চোখ কোথায। ভাবে মশগুল। তাব থেকে ঢেব বেশি নেশায মশগুল। আমাব নেশা যোগানদাবিব ব্যাপাবটা তো আব খেযাল কবে দেখেনি। কেবল টেনেই চলেছে।...তাবপবে একসময মাথা আব

তুলতে পাবছে না। চোখ আব খুলতে পাবছে না। আমাব থ্রিল আব উত্তেজনা বেড়েই চলেছে। গ্র্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড গ্র্যাণ্ড।

সময় হযেছে মনে হতে গুরুব ড্রযাব খুললাম। খাপ থেকে তাব সোনালি বাঁটেব বিলিতি ক্ষুবটা বাব কবলাম। গুরু ববাবব নিজেব এই ক্ষুবে কামাতে ভালবাসে। গুরুব পাশে বসলাম। বাঁ হাতে তাব বালিশটা ঘাড়েব একটু তলাব দিকে নিযে এলাম। তাবপব সেই হাতেই থুতনিটা একটু ওপবেব দিকে ঠেলে বললাম, গুরু মুখখানা একটু ওপবেব দিকে তোলো তো—

চোখ খুলতে না পেবে গুরু খুব অস্পষ্ট গলায জড়িযে জড়িযে বলতে চেষ্টা কবল, কি কববি

—তোলোই না, যা কবব তুমি টেবও পাবে না। থুতনি আবো ঠেলে তোলাব কাজটা আমিই কবলাম। তাবপব চেপে ধবে চোখেব পলকে যা কবাব করে ফেললাম। ফিনকি দিযে এক ঝলক বক্ত আমাব চোখে মুখে দাড়িতে আব জামায লাগল। কিন্তু নিশ্চিন্ত না হওযা পর্যন্ত আমি থামি কি কবে? ক'সেকেণ্ডই বা লাগল। গুরু বাব কযেক মাত্র হাত-পা ছুঁড়ল। আধ-কাটা খাসীকে আমি এব থেকে ঢেব বেশি পা ছুঁড়ে দাপাতে দেখেছি। নেশাব জন্য অত পাবে নি কি, কি জন্য আমি জানি না। আমাব দু'হাতে লালে লাল। ফবাস বক্তে ভেসে যাচ্ছে। গুরুব বক্ত যে এমন বিষম লাল আব এত গবম কে জানত। ছুটে বাথরুমে এলাম। ভালো কবে মুখ হাত ধুলাম। জামাটা খুলে পুঁটলি কবলাম। আমাব হাতে সময খুব নেই জানি। পুলিশ ধাওযা কবাব আগে বাড়ি গিযে শিবু কাকাব তরুণেব মন লিখে ফেলতে হবে।

বিকশা চেপে বাড়ি চলে এলাম। লিখতে বসলাম। যা বলছিলাম, ওই বীভৎস বঙিন পোকাটা বাবমুডা লিলিব কাছে পৌঁছে যাবে এ কেমন কবে হয? কি কবে হয? অথচ পবশু মাঝবাতে আমি সেই স্বপ্নই দেখে উঠলাম। দেখলাম সেই সবুজ ডাঁটা বেযে বেযে ওটা সত্যি উঠছে। উঠছেই। যত উঠছে ততো ওটাব দু'চোখ আবো লোলুপ বীভৎস হযে উঠছে। প্রায ডগা পর্যন্ত উঠতে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেযে আমাব ঘুম ভেঙে গেল। তাবপব সকালে গুরুব ওখানে যাওযা পর্যন্ত জেগে জেগেই কতবাব যে ওই স্বপ্নেব দৃশ্যটা দেখলাম ঠিক নেই। বাকা চোবা আট দশটা লিকলিকে পা বাব কবে ওটা উঠেই চলেছে।

কিন্তু তা কি কখনো হয? হতে পাবে? এখন আমি নিশ্চিন্ত। ওই লোলুপ বীভৎস বঙিন পোকাটা কোনো দিন আব বাবমুডা লিলিব নাগাল পাবে না।

কোনদিন না। কখনো না।

সোনালী রেখা

আত্মীয-পবিজন সকলেই জানল রুচিবা জিতেছে। আনন্দে ডগমগ হবাব মতো হাবজিতেব খেলা নয এটা। এই হাবজিতেব ওপব স্বস্তি নির্ভব কবছিল। শান্তি নির্ভব

কবছিল। তাই আনন্দে আটখানা না হোক, রুচিবা জেতাব ফলে সকলে খুশী। সকলে বলতে একান্ত শুভার্থী জনেবা। বাবা-মা। দাদা-দিদি। নইলে খববটা জানাজানি হবাব পব মুখ মচকাবে এমনও অনেকে আছে। রুচিবা ফিবে আবাব গাঙ্গুলী হযেছে এটুকুই তাব জিত।

এতদিন ছিল রুচিবা ব্যানার্জী। মিসেস ব্যানার্জী। এখন এই দুপুবেব পব থেকে আব মিস মিসেস কিছুই নয। শুধু রুচিবা গাঙ্গুলী। সাতাশ মাসেব একটা দুঃস্বপ্নেব শেষ। এই সাতাশ মাসেব মধ্যে পনেবো মাস হাতে নোযা বা শাঁখা ছিল না। কপালে বা সিঁথিতে সিঁদুবও ছিল না। তবু অক্টোপাসেব মতো দুটো ক্রুব লোলুপ হাতেব অধিকাব যেন ওকে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকডে ছিল।

সেই দুটো হাত পুরুষেব। শক্ত সবল পুরুষ তাকে বলবে না রুচিবা। গোডায সেই বকমই বুঝেছিল। সেই বকমই ভেবেছিল। স্বযং ইন্দ্রেব মতোই মাথা উঁচু মনে হযেছিল ইন্দ্র ব্যানার্জীব। তাব দর্প দেখে তাব দম্ভ দেখে তখন শুধু পুরুষকাবেব ছটাই বড হযে উঠেছিল রুচিবাব চোখে। তাব সঙ্গে বিযেব যখন সব ঠিক তখনো সেই লোকেব ছোটখাটো দুই-একটা অপবাধেব নজিব সামনে এনে বিযে বববাদ কবতে চেযেছে কেউ কেউ। বাবা-মা শুনে চিন্তায পডেছিলেন। দাদা-বউদি দিদি-জামাইবাবু থমকে ছিল।

চাঁদে কলঙ্ক নেই, গোলাপে কাঁটা নেই—এ কি হয? কোকিল কালো নয—এ কি হয? সোনায কিছু খাদ না মিশলে তা দিযে গযনা হয? ইন্দ্র ব্যানার্জীব চবিত্রেব যেটুকু আভাস পেযে বাডিব সকলে ধাক্কা খেযেছিল, রুচিবাব চোখে পুরুষ প্রবৃত্তিব একটা বেপবোযা দিক মাত্র সেটা। লোকটাব মধ্যে লুকোচুবিব ব্যাপাব নেই, পাযে কোনো ভযেব বেডি নেই। থাকলে সব-কিছু একটা ম্যাডমেডে ব্যাপাব হযে যেত। তাহলে সুশীতল চক্রবর্তীর সঙ্গে তাব কোনো তফাত থাকত না। হাযাব সেকেন্ডাবি থেকে এম. এ. পর্যন্ত নাম-কবা ভাল ছাত্র সুশীতল চক্রবর্তী। বি. এ-তে ফিলসফিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। এম. এ-তেও তাই। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভাল ছেলে। পান-সিগাবেট পর্যন্ত খায না। চোখে পুরু চশমা। তাব ও-ধাবেব একটু ছোট চোখ দুটো বুদ্ধিতে চিক-চিক কবে। জোব-জুলুম কাকে বলে জানে না। মিষ্টি মিষ্টি হাসে। সকলে ভেবেছিল, এত ভাল ছেলে আই. এ. এস-এ বসবে। আব বসলে যে পাঁচজনেব একজন হবে জানা কথাই।

কিন্তু বসল না। কাবণটা রুচিবাকেই কেবল বলেছিল সুশীতল চক্রবর্তী। চোখেব যা পাওযাব তাতে বাতিল হযে যাবাব সম্ভাবনা ষোল-আনা। এই দোষ চাপা দিতে হলে অনেক কাবচুপিব দবকাব। তাব মধ্যে সে নেই। তাছাডা ও-সব লাইন ভালও লাগে না। দু-দুটো ভাল কলেজ থেকে অফাব এসেছে। কলেজেব মাইনে-পত্র আজকাল খাবাপ নয খুব। একটা নিযে নেবে। আবো পডাশুনা কবাব ইচ্ছে। সুযোগ হলে ডক্টবেট কবে নিযে কিছু বই-পত্র লেখাব ইচ্ছে।

এই লোক রুচিবাব জীবনে সেধে এগিযে আসতে চেযেছিল। বিনযদাব নিজেব ছোট মাসতুতো ভাই সুশীতল চক্রবর্তী। বিনযদা হল দিদিব বব। বিলেত-ফেবত

এঞ্জিনীয়াব। এক প্রাইভেট এঞ্জিনীযাবিং ফার্মে মস্ত চাকবি কবে বিনযদা। স্বামীকে নিযে দিদিব ভিতবে ভিতবে বেশ গর্ব আছে। এই বিনযদাব সুবাদে সুশীতল চক্রবর্তীব এ-বাডিতে অল্প-স্বল্প আসা-যাওযা ছিল। রুচিবাব থেকে তিন ক্লাস ওপবে পডত।

এই বিদ্বান মাসতুতো ভাইটিকে বিনযদা ভালবাসে খুব। আব দিদি তাব থেকেও বেশি। দিদি বয়সে বোধহয ওব থেকে বছব দেডেকেব বড হবে। কিন্তু কাছে পেলে বসিকতাব ছলে দিদি একেবাবে বাচ্চা ছেলেব মতো আদব কবত ওকে। একবাব তো রুচিবা আব বিনযদাব সামনেই কি কাবণে খুশী হযে দিদি আচমকা ওব দু-গালে দুটো চুমু খেযে বসেছিল। সুশীতল চক্রবর্তীব মুখখানা দেখতে তখন হেসে গডাবাব মতই হযেছিল।

রুচিবা যখন হাযাব সেকেন্ডাবিতে মোটামুটি ভাল বেজাল্ট কবে ফিলসফি অনার্সে তিন বছবেব কোর্সে বি এ পডতে ঢুকল, সুশীতল চক্রবর্তী তখন এম. এ ফার্স্ট ইযাব। দর্শনশাস্ত্রেব সেতু ধবে তাব পব থেকে দুজনেব মধ্যে দর্শনেব ব্যাপাবটা আবো অনেক সহজ আব স্বাভাবিক হযে উঠেছিল। রুচিবাব যেবাব বি এ পার্ট টু ফাইনাল পবীক্ষা, তাব আগেব বছব এম এ পবীক্ষা দিযে সুশীতল চক্রবর্তী সোনাব মুখ কবে যুনিভার্সিটি থেকে বেবিযেছে। আব সেই অবকাশেব অনেকখানি রুচিবাকে সাহায্য কবাব ব্যাপাবে ঢেলে দিযেছে। মাত্র চাবটি নম্ববেব জন্য বি. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস না পেযে সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হযেছিল রুচিবা। এও তাব কাছে এমন কি বাডিব সকলেব কাছেও আশাতীত। ফার্স্ট ক্লাস না পাওযাব খেদ শুধু ওই সুশীতলেব।

বেজায খুশী হযে দিদি বলেছিল, এবাবে পাযে হাত দিযে তোব মাস্টাবকে প্রণাম কব একটা, আব প্রার্থনা কব এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাস পাস।

আজকালকাব কলেজে-পডা ছেলে-মেযেদেব বীতি অনুযাযী সুশীতলকে নাম ধবে অর্থাৎ বাডিব সকলেব মত শীতল বলেই ডাকত রুচিবা। দিদি এই জন্যেও কম মন্দ বলত না ওবে। শুনলেই চোখ পাকিযে ধমক লাগাত।—এই। বড না তোব থেকে?

দিদি এমন কিছু সেকেলে মেযে নয, মাত্র সাডে চাব পাঁচ বছবেব বড রুচিবাব থেকে। তাব সমযেও কলেজেব সমবযসী বা একটু আধটু বযেসেব ফাবাকেব ছেলেমেযেদেব নাম ধবে ডাকাডাকিব বীতি ছিল। কিন্তু নিজেব আদবেব ওই মাসতুতো দেওবটিব বেলায দিদিব গোঁডামি।

প্রণাম কবাব হুকুম শুনে বেশ মজাব কাণ্ডই কবেছিল রুচিবা। চট কবে গম্ভীব হযে ভাবী গলায ডেকে বসেছিল, শীতল এদিকে আয—

না, একেবাবে আধুনিকাদেব মতো 'তুই' কখনো বলেনি। 'তুমি' কবে বলত। এই ডাক শুনে তো দিদিব চক্ষু কপালে। সে ভাবল হযতো মাঝেব এই তিন বছবে বোনেব এই উন্নতি। সুশীতল কিন্তু মিটিমিটি হাসছিল। জিজ্ঞাসা কবেছিল, কেন?

—দিদি বলল শুনলি না? আয প্রণাম কবি—

সুশীতল তাব পবেও ভালমানুষেব মতো এগিযে আসতে ধাক্কা মেবে তাকে দিদিব গাযেব ওপব ঠেলে ফেলে দিযেছিল। প্রণাম সত্যি কববে দিদি আশা কবেনি, কিন্তু ওই 'তুই-তোকাবি' শুনে বেগেই গেছল। দিদিব মনেব তলায তখনো কি আশা রুচিবা বুঝতে পাবেনি।

বি. এ. পবীক্ষাব সময সপ্তাহে কম কবে চাব পাঁচদিন তাকে পডাতে আসত সুশীতল। এম.এ-তে ঢোকাব গোড়া থেকেই সেই বকমই আসতে লাগল। মুখে কোনো দিন এতটুকু আভাস ব্যক্ত না কবলেও তাবপব থেকে কেন যেন একটু অস্বস্তি বোধ কবছিল রুচিবা। জল হোক ঝড হোক সে ঠিক আসবে। এসে যে কোনো বকম বাজে কথায সময কাটাত তা নয। তখন আবাব কলেজেব নতুন মাস্টাব সুশীতল। উৎসাহ বা উদ্দীপনাব অভাব নেই। গোড়া থেকেই নিযম কবে পড়াশোনাব তাগিদও দিত। কিন্তু ইদানীং ওব এম. এ-তে ভাল বেজাল্টই লক্ষ্য লোকটাব, ভাবা যাচ্ছিল না। যা ভাবছিল, সেই গোছেব ব্যাপাব অনেক সময চোখে-মুখে লেখা হযে যায। রুচিবাব ধাবণা. সে সেটা নির্ভুল পড়ে নিতে পাবছিল। একদিন তাই সবাসবি বলে ফেলেছিল, গোড়া থেকেই এত লেখাপড়া আমাব পোষাবে না বাপু, এ বছবটা অন্তত আগেব মত সপ্তাহে দু'দিনেব বেশি পডছি না, পবীক্ষা এলে তাবপব দেখা যাবে। বেশি পড়লে মাথা ঝিম ঝিম কবে।

পুরু লেন্সেব ওধাবেব চোখ দুটো তাব মুখেব ওপব থমকেছিল একটু।—মাত্র দু'দিন ?

—হ্যাঁ। দু'দিন তোমাব কাছে পড়ব, দু'দিন আবাব গানে লেগে যাব ভাবছি, আব দু'দিন নিজে পড়ব—এমনিতেই তো দিদি কথা শোনায আমাব বি. এ-ব বেজাল্টেব পিছনে সবটাই তোমাব বাহাদুবি।

মুখেব দিকে তেমনি চেযে ছিল সুশীতল। যদি ফিবে জিজ্ঞাসা কবত বাহাদুবিটা সে অস্বীকাব কবে কিনা, রুচিবা তেমন যুৎসই জবাব কিছু দিযে উঠতে পাবত না। কিন্তু সে-বকম দাবি জাহিব কবাব মানুষ সুশীতল চক্রবর্তী নয। তাঁছাড়া সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হওযাটা তাব কাছে কোনো ভাল বেজাল্টই না।

কথা-মতো সপ্তাহে দু'দিন কবেই আসছিল এব পব। কিন্তু মুখে যাই বলুক, একটু ভাল বেজাল্ট কবাব তাগিদ রুচিবাব ভিতবে ভিতবে ছিলই। আব সেটা যে সবটাই সুশীতল চক্রবর্তীব ওপব নির্ভব, তাও স্বীকাব না কবে উপায নেই। ফাইনাল ইযাবে পা দিযেই সুশীতলেব আসাটা দু'দিনেব জাযগায এবাব তিন দিন কবে দেবে কিনা, আপনা থেকেই ভাবছিল।

এবই মধ্যে যা ভাবেনি, এক সন্ধ্যায তাই হযে গেল। পড়ানোব মতো মুখ কবেই সুশীতল বলল, অনেকদিন ধবে একটা কথা তোমাকে বলি-বলি কবে বলা হচ্ছিল না। বউদিকে, মানে তোমাব দিদিকে বলেছিলাম, উনি আবাব আমাকেই ঠেলে দিলেন। কথা আব কিছু নয, তোমাব বাবা মা-কে এবাবে যদি আমি একটা বিযেব প্রস্তাব দিই, তোমাব তাতে আপত্তি হবে কি না।

এমন মুখ কবে বলল, যেন বাজাবেব আলু-পটল কেনাব মতো সাদামাটা প্রস্তাব একটা। কিন্তু তাই শুনেই রুচিবা বিষম চমকে উঠল। অতর্কিতে আক্রান্ত হবাব মতো মুখ।—বাবা-মাযেব কাছে বিযেব প্রস্তাব ...ইযে, মানে আমাকে বিযে ?

পুরু লেন্সের ওধারের দু'চোখে হাসির ছোঁয়া লাগল।—তা না হলে আর তোমার আপত্তি হবে কিনা জিগেস করব কেন?

ভিতরে ভিতরে হাঁসফাঁস দশা রুচিরার।—আমি, মানে, আমি কখনো কিছু এ নিয়ে ভাবিইনি—

—ভাবতে অসুবিধে হচ্ছে?

এমন সঙ্কটে রুচিরা বোধহয় জীবনে আর পড়েনি। ভিতরে ভিতরে দিদির ওপরেই আচ্ছা রাগ হতে থাকল। দিদির মারফত প্রস্তাবটা এলে যা বলার বলে দেওয়া সহজ হত, অন্তত চক্ষুলজ্জার বালাই থাকত না। এবারে জবাব দিতে সময় নিল একটু। তারপর যতটা সম্ভব নরম করে বলল, দেখ, তুমি খুব ভাল, আর তোমাকে আমার ভালও লাগে—কিন্তু এ-রকম চিন্তা আমার কখনো মাথায় আসেনি বা সেভাবে তোমাকে কক্ষনো দেখিনি—

রুচিরার দেখার ভুল নয়। চোখের হাসি মিলিয়ে গেছে। না, এই জবাব আশা করেনি। উল্টে বোধহয় ধরেই নিয়েছিল রুচিরার চোখেমুখে সম্মতির খুশীর ছটা দেখবে। তার দিকেই চেয়ে আছে তখনো। বিস্ময়-আশাহত চাউনি। না বুঝে-শুনে দিদি একে কতখানি আশা দিয়ে বসেছিল কে জানে।

বিড়ম্বনা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা মানুষটার। গলার স্বরও এবারে ঠাণ্ডা একটু।—সে-ভাবে দেখেছ এমন কেউ এসে গেছে?

প্রাণের দায়ে এবারে সোজাসুজি মাথা নাড়ল রুচিরা। অর্থাৎ তাই। এসে গেছে। খুব সত্যি নয়। আবার একেবারে যে মিথ্যে তাও নয়। ইন্দ্র ব্যানার্জী তখন পর্যন্ত ওর মনের দরজা ভেঙে হুড়মুড় করে একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়েনি। তবু এর কাছে স্পষ্ট মনোভাবটাই প্রকাশ করল রুচিরা। এসেই গেছে। একেবারে কেউ না এলেও এই মিথ্যের আশ্রয় নিত কিনা জানে না।

সুশীতল চক্রবর্তীর মুখে আবার বিস্ময়ের আঁচড় পড়ছিল।—তোমার দিদিরও এটা জানা নেই নিশ্চয়?

মরীয়া হয়েই জবাব দিল রুচিরা—দিদি কেন, এখন পর্যন্ত কেউ জানে না। প্লীজ, তুমিও আর দয়া করে জানতে চেও না।

সত্যিই ঠাণ্ডা আর ভদ্র এই মানুষটা। এ নিয়ে আর একটি কথাও বলেনি। আর কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। খানিকটা আত্মস্থ হয়ে উল্টে বলেছিল, কিছু মনে করো না...আমার জানা থাকলে তোমাকে এভাবে অপ্রস্তুত করতাম না।

রুচিরা সাগ্রহে বলেছে, আমি কিছু মনে করিনি, তুমি কিছু মনে করলে না তো?

—না।...আজ কি পড়বে?

—আজ থাক।

টেবিলের বই দুটো একবার নাড়াচাড়া করে আবার রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। —চলি তাহলে?

কেন যেন ভয়ানক বিচ্ছিরি লাগছিল রুচিরার। তেমনি অস্বস্তি। বলেই ফেলল, পড়াশুনার ব্যাপারে আর তোমার সাহায্য পাওয়ার আশা করাটা ঠিক হবে না বোধহয়?

—কেন ?

—আসবে ?

—তুমি না চাইলে আসব না।

ভাবের আবেগে রুচিরা বলেছিল, শীতল, তুমি সত্যি অনেক বড। আমি কিছু না।

সুশীতল চলে যাবার পর ওর কান্নাই পাচ্ছিল। কেন এ-রকম হল ? কেন এ-রকম হয় ? সুশীতল খুব—খুব ভাল এটা সে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু স্বামী হিসেবে তাকে ভাবা যায় না কেন ? ও এমন কি মেয়ে ? পুরুষের চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারে এমন রূপের সম্বল কিছুই নেই। গায়ের রং ঠিক ফর্সা বলা চলে না, স্বাস্থ্য মোটামুটি, নাক-মুখ পটে আঁকা নয়। কেবল, ওপরতলার কিছু প্রসাদ আছে ওর চোখ দুটোতে। যে দেখে সে-ই সুন্দর বলে। লুকিয়ে চুরিয়ে রুচিরাও আয়নায় নিজের এই চোখ দুটোকে কম দেখে না। ওর আর যা-কিছু রূপ তার সবটাই বুকের তলায়। কারো কষ্ট দেখলে দুঃখ হয়, কারও আনন্দ দেখলে খুশী হয়। কারো উদারতা দেখলে ভিতরটা ভরে যায়, নিপীড়ন দেখলে নিজের ভিতরেই যন্ত্রণা হতে থাকে। কত সময় ভাবে, সকলেই একটু উদার হলে, একটু দরদী হলে, একটু নিঃস্বার্থ হলে, এই পৃথিবীটা তো কত সুন্দর হতে পারে।...হয় না কেন ?

চোখ দুটো ছাড়া ওর ভিতরের এই রূপের খোঁজ পেতে হলে স্বাদ পেতে হলে যে অবকাশ দরকার আর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্য দরকার, একমাত্র সুশীতল চক্রবর্তীই সেটা পেয়েছিল। কিন্তু তাকে তো সে সরাসরি বাতিল করে দিল। অথচ তার জন্যও যে কত দুঃখ হচ্ছে রুচিরা সেটা কাকে বলবে ?

সুশীতল চলে যাবার পরদিনই দিদি এসেছিল, গম্ভীর। হাব-ভাবে বুঝিয়েই দিল বোনের ওপর রাগ হয়েছে। বহুক্ষণের মধ্যে ওর সঙ্গে কোনো কথাই বলল না। ফলে রুচিরার রাগ দ্বিগুণ। ও ভাল কথায় জল, মেজাজ দেখালে আগুন। মনে মনে ভাবল, দিদির চেহারা-পত্র ওর থেকে একটু ভাল, সেই দেমাকে ভাবে ওর দেওরের থেকে ভাল বর আর পাব কোথায়।

রুচিরাও সেধে একটি কথাও বলতে এল না।

যাবার আগে দিদি ব্যঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করল, কাকে সব সমর্পণ করে বসে আছিস ?

—তোর বরকে। হল?

যা-ই হোক, বোনকে দিদি ভালই বাসে। হেসে ফেলল।—থাপ্পড় খাবি। কে এমন লোক এল যে শীতলকে একেবারে বাতিল করে দিলি—শুনিই না ?

রুচিরার মেজাজ তখনো ঠাণ্ডা হয়নি। চটপট জবাব দিল, বিনযদার থেকে ভাল এটুকু জেনে রাখ—জানলে তোর হিংসে হতে পারে।

রাগ দেখিয়ে চলে গেল। না গিয়ে করবে কি ? দিদির জেরার মুখে পড়লে কি বলবে ? কার নাম করবে ?

কিন্তু রুচিরা আর যা-ই হোক, মেয়েটা বোকা নয় একটুও। ওরই দিকে চেয়ে একজন বেপরোয়া মানুষ যে থমকে দাঁড়িয়ে গেছে এটা সে অনুভব করতে পারে। তার নাম ইন্দ্র ব্যানার্জী। এই অভিজাত দক্ষিণ এলাকায় তাকে চেনে না এমন কেউ নেই। রুচিরা অন্তত ছেলেবেলা থেকেই চিনত। কলেজে পড়তেই পাড়ার সমবয়সী ছেলেদের মাতব্বর হয়ে বসেছিল। সেই খুনোখুনির রাজনীতির সময় তার সম্পর্কে গা-কাঁটা দেবার মত অনেক গাল-গল্প কানে এসেছে। মোট কথা, সেই দুর্যোগের সময় এই এলাকা একেবারে ঠাণ্ডা ছিল শুধু তার দাপটে। একবার মাত্র এই পাড়ার ওপর হামলার সূচনা হয়েছিল। সুযোগ পেয়ে বাইশ বছরের একটা ছেলেকে কারা ছোরা আর বিভলভার দেখিয়ে জীপে তুলে নিয়ে পালাচ্ছিল। বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে। ঘটনাটা তক্ষুণি পাড়াময় রটে গেছল। সেই বিধবা বুক চাপড়ে রাস্তায় বেরিয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছল। পাড়ার ছেলেরা তাকে ধরাধরি করে রুচিরাদের বাড়ি নিয়ে এসেছিল। রুচিরার বাবা তার চিকিৎসা করেছিলেন। শুধু এ-এলাকার কেন, কলকাতার মধ্যেই একজন নামী ডাক্তার রুচিরার বাবা।

কিন্তু দু'ঘন্টার মধ্যেই পাড়ায় আবার হৈ-চৈ। বিধবার সেই ছেলে অক্ষত অবস্থায় আবার ঘরে ফিরে এসেছে। পরদিন কাগজে খবর বেরিয়েছে, হত্যার উদ্দেশ্যে অমুক জায়গার একটি ছেলেকে কারা জীপে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিল। কোথা থেকে আরো দুটো জিপ হঠাৎ এসে তাদের ওপর চড়াও হয়। অতর্কিতে আক্রান্ত হবার ফলে দুষ্কৃতকারীদের তিনজন গুরুতর আহত হয়, আর বাকি দুজন হত্যার বলি সেই ছেলেটাকে ফেলে পালিয়ে যায়। ছেলেটা নিরাপদে ঘরে ফিরেছে। কিন্তু কে বা কারা তাকে উদ্ধার করেছে জানা যায়নি, কারণ তারাও পুলিস আসার আগে নিজেদের জীপ নিয়ে সরে পড়েছে। ছেলেটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও কিছু জানা যায়নি। মনে হয় এটা কোনো রাজনৈতিক দলাদলির ফল। আহতদের অবস্থা আশংকাজনক।

ওই বিধবার ছেলেটা যে রুচিরার বন্ধু সুমিত্রার পিসতুতো ভাই জানা ছিল না। সে চুপি চুপি রুচিরাকে বলেছিল, এত বুকের পাটা কার জানিস না? ইন্দ্রদার।—খবর কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে দুটো জীপ নিয়ে আর দল নিয়ে ওদের ঘাঁটিতে গিয়ে হানা দিয়েছিল।

শুনে রুচিরা কন্টকিত।—পুলিস জানে না?

—জানলেই বা কি। ইন্দ্রদার বাবা কংগ্রেসের কত বড় চাঁই জানিস না?

তা অবশ্য জানে। অনেক এম এল এ ছেড়ে কংগ্রেসী মন্ত্রীরাও কত সময় ইন্দ্র ব্যানার্জীদের বাড়ি আসে।

ইন্দ্র ব্যানার্জীর বাবা হাই ব্লাডপ্রেসারের রোগী। রুচিরার বাবার পেশেন্ট। বাবা বুদ্ধিমান মানুষ, তাঁর কাছ থেকে ফী নিতেন না। বাবার খবর দেবার জন্য ইন্দ্র ব্যানার্জী কখনো-সখনো তাদের বাড়ি আসত। তখন কখনো কখনো রুচিরার সঙ্গে চোখের দেখা হত শুধু, মনের ব্যাপারের ধারে-কাছেও কেউ নেই। কিন্তু রুচিরার ভিতরে ভিতরে এই বেপরোয়া ছেলেটার প্রতি কৌতূহল ছিল।

রুচিরা যখন বি. এ. পড়ে, তখন সেই বন্ধু সুমিতার কাছেই হঠাৎ একদিন শুনল, ওদের ইন্দ্রদা নাকি রুচিরার চোখ দুটোর খুব প্রশংসা করছিল—

সুমিতা বলছিল আর হাসছিল খুব। রুচিরা অবাক, তোকে কে বলল?

বলেছে সুমিতার সেই পিসতুতো ভাই—যে এখন ওই ইন্দ্রদার অন্ধ ভক্ত।

তার দলের ছেলেরা নাকি নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল, ডাক্তারের ছোট মেয়েটার বড় দেমাক, ঝকঝকে গাড়ি চেপে কলেজে যায়, কলেজ থেকে ফেরে—কোনো দিকে তাকায় না। কত যেন রূপসী, যেন তাকালে ছেলেরা হাঁ করে ওকে গেলার জন্য বসে আছে।

তাই শুনে ইন্দ্র ব্যানার্জী নাকি বলেছে, মেয়েটার চোখ দুটো কি সুন্দর লক্ষ্য করে দেখেছিস তোরা? খবরদার ওর পিছনে লাগবি না।

ছেলেরা নাকি তাদের মুকুটমণি ইন্দ্রদার ওই কথায় মুখ-চাওয়াচাওয়ি করে চুপ মেরে গেছে।

শুনে রুচিরার কেন যেন হঠাৎ রাগ হয়ে গেছে, আবার ভিতরে ভিতরে একটু খুশীও হয়েছে। রাগ ছেলেগুলোর কথা শুনে হতে পারে, আবার ইন্দ্র ব্যানার্জীর মুরুব্বিয়ানার কথা শুনেও হতে পারে। ওর পিছনে লাগার সাহস যেন কারো আছে। আর খুশীর কারণ হয়তো বা ছেলেটার দেখার মতো নিজের দুটো চোখ আছে ভেবে হতে পারে।

কিন্তু ইন্দ্র ব্যানার্জীর সমস্ত চেহারার মধ্যে যে বেশ একটা জোরালো পুরুষের ছাপ আছে এটা রুচিরা নিজের মনেও অস্বীকার করতে পারে না। গায়ের রং মোটামুটি ফর্সা, দস্তুরমতো লম্বা। বুদ্ধিমাখা চাউনি, জোড়া ভুরু। মুখে মিষ্টি মিষ্টি হাসি, কিন্তু ইচ্ছে করলেই চোয়াল দুটো যেন কঠিন হতে পারে। না মোটা না রোগা। মাথার ঝাঁকড়া চুলে চিরুনির বদলে হাত চালায় বেশি। ওদের বাড়ির পাশ দিয়েই গাড়ি চেপে সে কলেজে যায় আর কলেজ থেকে ফেরে। যাবার সময় প্রায়ই নিজের বাড়ির গেটের সামনে দাঁড়িয়ে সাগরেদদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দেখে। ভিতরে একটু কৌতূহল ছিল বলেই হয়তো বাড়ির সামনে চোখ ফিরিয়ে বড় একটা তাকায় না রুচিরা। যেটুকু দেখার দূর থেকেই দেখে নেয়। কলেজ থেকে ফেরার সময় গেটটা ফাকাই দেখে। তখন বড় একটা চোখে পড়ে না।

সুমিতার মুখে এ-খবরটা শোনার পর রুচিরার কেমন মনে হয়েছে, কলেজে যাবার সময় প্রায়ই যে ওই ছেলেকে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কারো না কারো সঙ্গে কথা বলতে দেখে, তার পিছনে ব্যাপার কিছু থাকতেও পারে। ঘরে বসে আড্ডা দেয় না কেন? সুমিতা চলে যেতে সেদিন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের এই দুটো চোখের দিকেই অনেকক্ষণ তাকিয়েছিল রুচিরা। তারপর নিজেই লজ্জা পেয়েছে। ভ্রূ কুঁচকে আয়নার সামনে থেকে সরে এসেছে। কিন্তু একটু খুশীর ছোঁয়া যে মনে লেগেছিল সেটা অস্বীকার করতে পারে না। সুমিতার কাছ থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একটা কথা জেনে নিতে পারলে মন্দ হত না। বীরপুরুষটি লেখাপড়া করছে কিনা, বা কদ্দূর করেছে। নাকি বিদ্যাদিগগজ হয়ে মস্তানি করে বেড়াচ্ছে? আবার ভেবেছে, একেবারে

শূন্যকুম্ভ হলে পাড়াব অল্পবযসী এম. এল. এ. দুজন হামেশাই ও-বাড়ি আসে কেন? বাপেব সঙ্গে হোমবা-চোমবাদেব খুব দহবম-মহবম হলেও ওই দুজনেব তাঁব ছেলেব সঙ্গেই খাতিব বেশি। তাবা লেখাপড়া জানা ছেলে শুনেছে। তাদেব বন্ধুব পেটে একেবাবেই কিছু থাকবে না? তাছাড়া বেপবোযা হলেও হাব-ভাব আচবণ শিক্ষিত ছেলেব মতই।

খেযাল হতে রুচিবা নিজেকেই চোখ বাঙিযেছে আবাব। লেখাপড়া জানা হোক বা ক' অক্ষব গোমাংস হোক, ওব অত ভাবাব দবকাব কি?

দবকাব থাক বা না থাক, পবদিন কলেজ যাবাব সময চেষ্টা কবেও চোখ দুটো অন্য দিকে ফিবিযে বাখতে পাবেনি। অথচ গাড়িতে ওঠাব সময বাব বাব নিজেব মনে সংকল্প কবেছে, কক্ষনো কোনো দিকে তাকাবে না। কিন্তু পবিচিত গেটটা পাব হবাব আগেই চোখ দুটো ঠিক ওই দিকেই ঘুবেছে।

আব যোগাযোগ এমনি যে, এই দিনে গেটেব সামনে একলাই দাঁড়িযে সে। সঙ্গী-সাথী নেই। রুচিবা ঘাড় ফেবানো মাত্র চোখাচোখি। ওই গেট পাব হবাব আগেই। আব সঙ্গে সঙ্গে রুচিবাব নিজেব ওপব বাগ যেমন, ভিতবেব গোঁ-ও তেমনি। চেযে বইল তো চেযেই বইল।

সেই ছেলেও।

গেট ছাড়িযে গাড়িটা এগিযে গেল। রুচিবাব তখন নিজেব ওপবেই এমনি বাগ যে ইচ্ছে কবছিল গাড়িতেই ঘুবে বসে পিছনেব কাচেব ভিতব দিযে সেই দিকে চেযেই থাকে। কাবণ চোখাচোখি হতে ইন্দ্র ব্যানার্জীব ঠোঁটেব ফাঁকে হাসি দেখেছে। যেন বলতে চেযেছে এতদিনে সদয হলে যা হোক—

কিন্তু এবপব এই চোখাচোখি হওযাব ব্যাপাবটা প্রাযই ঘটতে লাগল। রুচিবাব ঠোঁটেব ফাঁকে কখনো হাসিব ছোঁযা লাগে, কখনো বা ভুরুব মাঝে ছদ্ম বিবক্তিব ভাঁজ পড়ে। কথা নেই বার্তা নেই, এ যেন এক মজাব খেলা।

দিন-কতক বাদে পব পব কযেক দিন ওই গেটেব সামনে ইন্দ্র ব্যানার্জীকে দেখা গেল না। অসুখ-বিসুখ কিছু কবেছে এমন নয। দু'দিন আগে ওব বাবা রুচিবাব বাবাব কাছে এসে ব্লাডপ্রেসাব চেক কবিযে গেছেন। ওপব থেকে তাঁব গাড়ি দেখে রুচিবা বাবাব চেম্বাবেব দোবগোড়ায এসে দাঁড়িযেছিল। বাবাকে ধবে নিযে গেলে বোঝা যেত কাবো কিছু অসুখবিসুখ কবেছে। তা যখন নয ঘবে ঢুকে তো আব জিজ্ঞাসা কবতে পাবে না, আপনাব গুণধব ছেলেব খবব কি?

অপ্রত্যাশিত খববটা হঠাৎ কাগজে দেখা গেল। কযেক দিন ধবেই কাগজে জলপাইগুড়িতে ভযাল বন্যাব খবব বেরুচ্ছিল। কাগজেব এ-সব খবব রুচিবা দেখেও দেখে না। কিন্তু সেদিন আব না দেখে বা ঘটনাটাব আদ্যোপান্ত না পড়ে পাবা গেল না। গোড়াতেই ইন্দ্র ব্যানার্জীব ছবি একখানা। তাবপব তাব দুঃসাহসেব প্রশংসাব ফিবিস্তি।

...সর্বগ্রাসী বন্যাব খবব পেযে কলকাতা থেকে কংগ্রেসেব এক তরুণ দল সবকাবী সাহায্যেব ব্যবস্থা নিযে জলপাইগুড়ি চলে গেছল। সেই তরুণ দলেব নাযক ইন্দ্র

ব্যানার্জী। সেখানে গিযে নাযকেব মতই একটি কাজ করেছে। নিজেব প্রাণের মাযা তুচ্ছ কবে জলমগ্ন কুটিরের এক বুড়ীকে উদ্ধার কবে এনেছে। কাগজে যা লিখেছে তা সত্যি হলে ওই ছেলেও যে মস্ত এক ফাঁড়া কাটিয়ে উঠেছে, সন্দেহ নেই। বুড়ীকে আগলে পুরো ছত্তিবশটি ঘণ্টা অনাহাব আব অনিদ্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি বসে থাকতে হযেছিল তাকে।

দিন-কতক বাদে আবার তাকে গেটেব সামনে দেখতে পেল রুচিরা। আগের দিনই তাব আসাব খবব কানে এসেছিল। খুব ঘটা কবে মালাটালা পবিযে পাড়ার ছেলেবা নাকি তাকে স্টেশন থেকে নিয়ে এসেছে।

গাড়িটা ও-বাড়িব গেট পাব হওযাব সময এই একটি দিন আবাব রুচিবা তাকে যেন দেখতেই পেল না। ইচ্ছে কবে রাস্তাব উল্টো দিকে মুখ কবে বসে রইল। ভেবেছে, অত বাহাদুবিব খবব পড়ে রুচিবাও আনন্দে গলে গিযে বীবপুরুষকে নতুন চোখে দেখবে। কিন্তু কাগজেব ছবি দেখে আর খবব পড়ে রুচিবাও যে দুঃসাহসেব প্রশংসা মনে মনে করেনি, এমন নয।

পবেব দিনের ব্যাপাবটা অন্যবকম। রুচিরাব প্রথমে বাগ যেমন হযেছে, পরে মজাও তেমনি লেগেছে। ওব কলেজ যাবাব সময ইন্দ্র ব্যানার্জী সেদিনও গেটের সামনে দাঁড়িযেছিল। সঙ্গে দুজন স্তাবকও ছিল। ও ছেলেব সঙ্গী-সাথীদেব স্তাবক ছাড়া আব কিছু ভাবে না। দূব থেকে ওদেব দেখে এই দিনও রুচিবা অন্য দিকে মুখ ফিবিয়ে বসে ছিল।

হঠাৎ গাড়িটা প্রায় থেমেই যেতে ঈষৎ বিস্মযে ড্রাইভাবেব দিকে তাকাতে গিয়ে রুচিরাব সামনের দিকে চোখ পড়ল। বাস্তাব ঠিক মাঝখানে গাড়িব পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্র ব্যানার্জী। গাড়িটা প্রায় থামিয়ে ড্রাইভারও সবিস্ময়ে তাকিয়েছে সেদিকে।

রুচিবাব সঙ্গে চোখাচোখি হতে ধীব গম্ভীর মুখে রাস্তা ছেড়ে আবাব নিজের বাড়িব গেটের দিকে চলল। রুচিরা ঘাড ফিবিযে দেখে সেখানে অন্য ছেলে দুটো ওব দিকে চেযেই হাসছে ফিক ফিক করে।

রুচিবা সেদিন জ্বলতে জ্বলতে কলেজে চলল। হিন্দুস্থানী ড্রাইভারটা পর্যন্ত কি ভাবল কে জানে। কিন্তু জ্বলুনি থাকল না বেশিক্ষণ। তাব ওপব মজাব প্রলেপ পড়তে লাগল।

এব পবদিন থেকে কলেজ যাবাব সময আবার চোখ দুটোকে ওবাড়িব গেটেব দিকে ফেবাতে হল তাকে। তা না হলে পবদিনই আবাব বাস্তা আগলে দাঁড়াবে কিনা কে জানে। লোকটার ঠোঁটের ফাঁকে জ্বালা-ধবানো হাসি। তাকে অবজ্ঞা কবলে কি হবে সেটাই যেন বুঝিযে দেওযা হযেছে। রুচিরাব এ জুলুম ববদাস্ত করাব ইচ্ছে নেই। কিন্তু বাস্তাব মাঝখানে দাঁড়িযে গেলে ও কববে কি? আব টের পেযে গেলে লোকেই বা ভাববে কি? এব থেকে একবার ঘাড় ফিবিযে তাকানো স্বস্তির ব্যাপার।

আবো কিছুদিন পরের কথা। বাত তখন সাড়ে ন'টা। পড়াশুনার পাট শেষ করে রুচিবা খাবার টেবিলের দিকে যাচ্ছিল। দাদা তাব উদ্দেশ্যে একটা হাঁক দিয়ে বসে গেছে। বাতে দাদা-বউদিব সঙ্গে খায়। দিনেব বেলা যে-যার সময মত খেয়ে নেয। বাতে বাবাব খাওযা একটু দুধ, একটা সন্দেশ, আব খই। তাঁর খাবাবটা মা এর অনেক আগেই ঘরে দিয়ে আসেন।

বাধা পড়ল। পুরনো চাকর মহেশ এসে বলল, একটি বাবু নীচে ডাকছেন।

বাত সাড়ে ন'টায় নীচে বাবু ডাকছেন শুনে রুচিবা হাঁ। ছেলেদেব মধ্যে এ-বাড়িতে একমাত্র আসে সুশীতল। তাকে খবর দিযে আসতে হয না। সরাসরি আসে।

—কে বাবু?

—ইন্দ্রববাবু।

রুচিবা হতচকিত কয়েক মুহূর্ত। কি কববে বা কি বলবে ভেবে পেল না। তাবপব মাযেব চোখেব আড়াল হয়ে চুপচাপ নীচে নেমে এল। বাত সাড়ে ন'টায বাড়ি এসে চাকব দিযে তাকে খবব দেওয়া যে চলবে না এটা প্রথম দিনেই তাকে বুঝিযে দেওযা দবকাব।

বৈঠকখানাব দবজা খোলা। ইন্দ্র ব্যানার্জী সেখানে দাঁড়িযে দেওয়ালেব ছবি দেখছে। মুখ গম্ভীব, একটু ক্লান্তও যেন।

রুচিরা এসে দাঁড়াতেই কোনো ভূমিকা না কবে বলল, আমি ডক্টব গাঙ্গুলীব কাছে এসেছিলাম, কিন্তু এখানকার লোকটা বলল, ডাক্তাববাবুকে এখন আব খবব দেওয়া চলবে না, তাই একটু বিবক্ত কবতে হল। ডক্টব গাঙ্গুলীকে একবাব খবব দিতে হবে, বিশেষ দবকাব।

চোখ-মুখ দেখে রুচিবাব মনে হল কারো বাড়াবাড়ি গোছেব ব্যাপাব কিছু। প্রথমেই তাব বাবাব কথা মনে হল।

—বসুন, আমি খবব দিচ্ছি।

দৌড়ে ওপরে চলে এল। ডাক্তাবেব বাড়ি, এ-সব ব্যাপাবে ঘড়ির নিযম মানা চলে না। বাবা তখন আধ-শোযা হয়ে একটা ডাক্তাবি জার্নাল পড়ছেন। বলল, ইন্দ্র ব্যানার্জীব বাবাব বোধহয বাড়াবাড়ি অসুখ কিছু হবে, সে নীচে তোমাকে ডাকছে, বলল খুব দবকাব—

শুনে রুচিবাব বাবা একেবাবে তৈবি হযে তাড়াতাড়িই নেমে এলেন। পিছনে রুচিরাও না এসে পাবল না। কিন্তু তাবপব দোবগোড়ায দাঁড়িযে যে-কথা শুনল, তার দু-চক্ষু স্থিব। শোনাব পব লোকটার ওপব যত বাগ, বাবাকে না বুঝে-শুনে এভাবে ডেকে আনল বলে তেমনি সংকোচ।

বাবা ঘবে ঢুকতেই দু'হাত তুলে নমস্কাব জানিযে ইন্দ্র ব্যানার্জী বলল, আপনাকে এখনই একবাব আমাব সঙ্গে এক জাযগায় একটু যেতে হবে।

এ-কথা শুনে বাবা অবাক।—কি ব্যাপাব?

—চলুন। সঙ্গে গাড়ি আছে। গাড়িতে বসে বলছি।

এবাবে বাবা বিবক্ত একটু।—এত বাতে আমি কোথাও যাই না—কোথায যেতে হবে?

—পার্ক সার্কাসেব দিকে। আমাব এক বন্ধু কিছুদিন ধরে ভুগছিল, টাকা-পযসার অভাবে ভাল ডাক্তাবও দেখাতে পারেনি। খবর পেয়ে তাকে দেখতে গেছলাম। গিযে দেখি অজ্ঞান হযে আছে। চার টাকা ফী-এব এক ডাক্তাব দেখছিল, সে কিছু বুঝতে পাবছে বলেই মনে হল না। আপনি দয়া কবে চলুন আমার সঙ্গে, আমি নিজে আবার আপনাকে পৌঁছে দিযে যাব—

বিরক্তি চেপে বাবা বললেন, কিন্তু এত বাতে আবার আমি পার্ক সার্কাস যাব—ওদিককাব কাউকে পেলে না?

লোকটার জবাব দস্তুর মত উদ্ধত ঠেকল রুচিরার কানে। সে বলছে, আর দেরি করবেন না, আমি আপনাকেই নিয়ে যাবাব জন্য এসেছি, আমি সঙ্গে থাকছি, আপনার কোনো ভয় নেই। আব রাতও খুব একটা বেশি হয়নি।

বাবা তার মুখের দিকে চেয়ে বইলেন একটু। তারপব বললেন, আচ্ছা, তুমি গাড়িতে গিয়ে বসো, আমি ব্যাগটা নিয়ে আসছি—.

ইন্দ্র ব্যানার্জী ও-দিকের দবজা দিয়ে বেরুলো, বাবা এদিকে ফিবলেন। দবজাব কাছে রুচিরাকে দেখে বললেন, ব্যাগটা এনে দে—

মেয়েব দ্বিধা দেখেই তিনি বুঝলেন সে না বুঝেই তাঁকে ওপর থেকে ডেকে এনেছে। গলা খাটো করে বললেন, ঘাবড়াবাব কিছু নেই, ব্যাগটা নিয়ে আয—না গেলে বরং ঝামেলার ব্যাপার হতে পারে, দিন-কাল ভাল নয।

রুচিবা তক্ষুণি ওপবে এসে বাবাব ডাক্তারি ব্যাগটা এনে দিল। কিন্তু ভিতরে ভিতবে প্রচণ্ড বাগ হচ্ছে তাব ওই লোকটাব ওপর। বাবাকে প্রায শাসিযেই এই রাতে টেনে নিযে যাচ্ছে মনে হতে লাগল তাব।

এক ঘণ্টাব মধ্যেই বাবা বাড়ি ফিবলেন। রুচিবা দোতলায় দাঁড়িযে অপেক্ষা কবছিল। নিজেই জীপ ড্রাইভ কবে বাবাকে বাড়িব দবজায় নামিযে দিযে গেল।

কিন্তু দোতলায় উঠতে রুচিরা দেখল বাবার এখন প্রসন্ন মুখ। তাঁব হাত থেকে ব্যাগটা নিতে নিতে রুচিবা জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল। বাবা বললেন, না বে, ছেলেটার অন্তঃকবণ আছে। গিযে দেখি ওব সেই বন্ধু বলতে গেলে এক বস্তি-ঘরেব ছেলে। তাকে ঘিরে বিধবা মা আব বোন-টোনগুলো কান্নাকাটি কবছে।...হার্ট অ্যাটাক, বেঁচে যেতে পারে হয়তো, কিন্তু ঝামেলা আছে। আমাকে নিয়ে ফেবাব আগে ওই বিধবা মাযের হাতে ব্যানার্জীব ছেলেটা তিনশো টাকা গুঁজে দিযে এল দেখলাম, বলল, কান্নাকাটি বেখে এখন ভাল শুশ্রূষার দিকে মন দিন, কিছু ভাবনা নেই, ভাল চিকিৎসাও হবে, সেবেও যাবে।

রুচিবা তবু ফোঁস করেই বলে উঠল, আব তোমাব ফী?

বাবা হাসলেন। বললেন, দূব পাগলি, এই দেখেও হাত পেতে আমি ফী নিতে পাবি নাকি। চৌষট্টি টাকা ফী দেবাব জন্যেই ঝোলাঝুলি কবছিল, আমি ধমকে উঠতে আর কিছু বলেনি।

শুনল যা তাতে কাবো বাগ হবার কথা নয। শুনে ওরও ভাল খুবই লেগেছে। কিন্তু ওই দাপট দেখিযে বাবাকে টেনে বাব কবে নিযে গেছল যে সেটা কিছুতে ভোলা যাচ্ছিল না।

পরদিন গেটের সামনে ইন্দ্র ব্যানার্জীকে দেখা গেল না। মন বলল, তার সেই অসুস্থ গরীব বন্ধুকেই দেখতে গেছে।

সন্ধ্যের দিকে জীপ হাঁকিযে তাকে বাবার চেম্বারে আসতে দেখেছে পব পব কয়েকদিন। আবাব একদিন দিনেব বেলায় এসে বাবাকে নিযেও গেছে। রুচিবা সব

দোতলা থেকেই লক্ষ্য করেছে। একদিনও নীচে নেমে আসেনি। কিন্তু এখন আর রাগ নেই। ভিতরে ভিতরে উল্টে কেন যেন খুশীই একটু। বন্ধুর কঠিন অসুখে বাবা সাহায্য করছেন বলে কি আর কোনো কারণে, বলা শক্ত।

দুজনের সম্পর্কটা বেশ একটু সরস নাটকের দিকে গড়ালো রুচিরার বি. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুনোর পর। গাড়ি চেপে সেদিন বিকেলের দিকে দিদির বাড়ি যাচ্ছিল, ওই মূর্তি তখন তার বাড়ির গেটে দাঁড়িয়ে। গাড়িতে ওকে আসতে দেখেই গেট ছেড়ে রাস্তায় এসে একটা হাত তুলে ড্রাইভারকে গাড়িটা থামাতে হুকুম করল। আর হিন্দুস্থানী ড্রাইভারটাও কিছু না বুঝে গাড়িটা থামিয়ে নিল।

মিষ্টি মিষ্টি হেসে পিছনের খোলা কাঁচ নামানো জানলায় দু-হাতে ঠেস দিয়ে বলল, কংগ্র্যাচুলেশনস।

রুচিরা হাসছে না। গম্ভীর।—কেন?

—শুনলাম বি এ. পরীক্ষায় তুমি সেকেন্ড ক্লাস ফার্স্ট হয়েছ—

তুমি! শোনার সঙ্গে সঙ্গে হাড়-পিত্তি যেন একসঙ্গে জ্বলে উঠল রুচিরার। আর সঙ্গে সঙ্গে কাণ্ডজ্ঞানও প্রায় খুইয়ে বসল। বলে উঠল, থ্যাংক ইউ। তা তোমার নিজের পড়াশুনার দৌড় কদ্দুর?

এই ঝাপটা খেয়েই ইন্দ্র ব্যানার্জী যেন, সত্যিকারের খুশীতে আটখানা একেবারে। তার যেন কান-মন জুড়িয়ে গেল। এ-যাবৎ মেয়েদের ও স্তব-স্তুতি দেখে অভ্যস্ত। এই এক মেয়ে তার ব্যতিক্রম বটে।

বলল, নিশ্চয় সেটা তোমার জানার অধিকার আছে। তিন বছর আগের কলকাতা য়ুনিভার্সিটির গেজেট খুলে দেখো—কোনরকমে এম. এস-সি-টা পাস করেছিলাম।

এ খবর অপ্রত্যাশিত বটে। সোজা মুখের দিকে আবার তাকাল রুচিরা, মিথ্যে বলল বলে মনে হল না। কিন্তু এ-ভাবে জানলায় ঠেস দিয়ে গাড়ি থামিয়ে রাখাটাই বা বরদাস্ত করে কি করে? তাছাড়া আবারও 'তুমি' বলল, আর বলল, জানার তোমার অধিকার আছে। রুচিরার তার ওপর অধিকার ফলাবার কি দায় পড়েছে?

তেমনি ঝাঁঝালো সুরেই আবার বলে উঠল, তবে আর কি, এতবড় পণ্ডিত হবার পর রাতদিন এখন লোকের ওপর মাতব্বরি করে বেড়ানো ছাড়া আর কি কাজ থাকতে পারে।

—সে কি কথা! উৎফুল্ল অথচ আহত যেন।—আমার ওপর এই বিচার তোমার! তুমি কলেজে চলে যাবার পরেই নাকে-মুখে ভাত গুজে আমাকে ছুটতে হয় কারখানায়, আমি এখন একখানা কেমিক্যাল ফার্মের অর্ধেক মালিক সে-খবর রাখো?

এ জবাব শুনে রুচিরার মেজাজ আরো গরম হল বই ঠাণ্ডা হল না। বলে উঠল, না, আমি তোমার কোনো খবরই রাখি না—বুঝলে? ড্রাইভার!

ড্রাইভারটা কি ভেবে গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করে দিয়েছিল কে জানে। ডাক শুনে তাড়াতাড়ি চাবি ঘুরিয়ে সেলফ টানল।

কিন্তু ইন্দ্র ব্যানার্জী হাসছে। আব তক্ষুনি জানলা ছেড়ে সবেও দাঁড়াল না। বলল, মেযেদেব এমন খামোখা বাগেব কি যে অর্থ কে জানে। আমি আবো খুশী হযে এলাম অভিনন্দন জানাতে। যাক, আমাব সম্পর্কে খবব বাখে না এ তল্লাটে এমন কেউ আছে জানা ছিল না। খবব এবপব আমিই দিতে চেষ্টা কবব তাহলে।

গাড়ি ছেড়ে সবে দাঁড়াতে ড্রাইভাবটাই যেন হাঁপ ফেলে বাচল। গাড়ি ছাড়াব পব রুচিবাব মেজাজ ঠাণ্ডা হতে বেশি সময লাগেনি। সত্যি তাব বাগ কবাব কোনো মানে হয না। পাড়াব মধ্যে নামজাদা মানুষ একটা তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ওই শুরুতেই 'তুমি' শুনে মেজাজটা বিগড়ে গেছল। জবাবে সেও ছেড়ে কথা বলেনি —'তুমি'ই বলেছে। এত হিম্মত এ-তল্লাটেব কোনো মেযের হত বলে মনে হয় না। যেতে যেতে সমস্ত ব্যাপাবটাব মধ্যে একটা অজানা বসেব মতো পেতে লাগল রুচিবা। ...এমন ডাকসাইটে মাতব্বব মানুষ, ওব পাসেব খববটা ঠিক বেখেছে। আবাব রুচিবাব বাগেব জবাবে চান্স পাওযাব সঙ্গে সঙ্গে নিজেব এম এস-সি পাস কবাব খবব জানিযে দিযেছে। রুচিবা এটা সত্যিই আশা কবেনি। এম. এস-সি পাস জেনে এখন যেন একটু ভালই লাগছে। বিদ্বানেব দুবন্তপনা একটু অন্য ব্যাপাব। সেটা মস্তানিব পর্যাযে পড়ে না। তাছাড়া চাকবি-বাকবিব মধ্যে না ঢুকে নিজে কেমিক্যাল কাবখানা কবেছে এটাও পুরুষোচিত কাজ মনে হযেছে। গোলামি কবা রুচিবা দু'চক্ষে দেখতে পাবে না। তাছাড়া ওই লোক কোথাও চাকবি কবতে গেলে বক্তাবক্তি কবে বেরুনোও বিচিত্র নয।

মরুকগে। রুচিবা এ-সব নিযে মাথা ঘামাচ্ছে কেন ? মাথায ব্যাপাবটা তবু ঘুবপাক খেতেই থাকল। কাযদা কবে কাবখানাব আধখানা মালিকানাব কথাও জানিযে দেওযা হল। কিন্তু এব মধ্যে একটা কথা ঠিকই কানে লেগে আছে রুচিবাব। ও গাড়ি চেপে এই গেট ছাড়িযে কলেজেব দিকে চলে গেলেই ওই লোক নাকে-মুখে ভাত গুঁজে কাবখানায ছোটে। তাব মানে, বাড়িব গেটেব কাছে ও-সময তাব দাঁড়িযে থাকাটা শুধু ওবই জন্যে। কথাবার্তাব মধ্যেও কোথাও যদি ছিটেফোঁটা বাখা-ঢাকাব ব্যাপাব থাকত। নির্লজ্জ আবাব কাকে বলে !..এব পব থেকে নিজেই নিজেব খবব দেবে বলে দিল। রুচিবাব অস্বস্তি। এ-লোক মুখে যা বলে কাজেও অনাযাসে তাই কবতে পাবে। কি কববে ? বোজ বাস্তায এভাবে গাড়ি আটকাবে, না, বাড়ি এসে হাজিব হবে ? রুচিবাব ভাবনাই ধবে গেল।

সে যুনিভার্সিটিতে ঢোকাব মুখে এই লোককে নিযে ঝামেলাব মোড় ঘুবল আব এক ভাবে। ঝামেলা ছাড়া আব কি বলবে রুচিবা ? না, গাড়ি আব একদিনও থামাযনি। আব রুচিবাব সমযেব হিসেব পায না বলে বোজ আব গেটেও দাঁড়িযে থাকতে দেখা যায না তাকে। এম. এ. ক্লাসেব রুটিন আব কলেজেব রুটিনে তফাত আছে। কোনোদিন এগাবোটায ক্লাস, কোনোদিন বাবোটায, কোনোদিন একটায। এই রুটিনেব কল্যাণেই এদিক থেকে কিছুটা নিশ্চিন্ত হওযা গেছে। এদিকে যুনিভার্সিটিতে ঢোকাব পব রুচিবাব যাতাযাতেব ব্যবস্থাও কিছু বদলাতে হযেছে। বিকালেব দিকে বাবা বড়জোব এক ঘণ্টা সোযা ঘণ্টাব জন্য গাড়ি ছেড়ে দিতে পাবেন। আগে কাছেই কলেজ ছিল, ড্রাইভাব

এক ফাঁকে গিয়ে তাকে নিয়ে আসত। তাই যাতায়াত দুটোই বাড়ির গাড়িতে চলত। এখন শুধু যাওয়াটা গাড়িতে হয়। আসাটা ট্রামে বা বাসে। কিন্তু রুচিরা এ পর্যন্ত ট্রাম বা এমনি বাসে উঠতেই পারে না। ওই গাদাগাদি ভিড় দেখলেই তার মাথা ঘোরে। দুই একদিন চেষ্টা করে উঠেছিল। কিন্তু ভিড়ের চাপে দম বন্ধ হওয়ার দাখিল। মেয়ে দেখলে অসভ্য লোকগুলোর চাপাচাপি যেন আরো বাড়ে। সবাই যে অভব্য তাই বলে তা নয়, বেশির ভাগই সভ্য। কিন্তু এমন যাচ্ছেতাই ভিড় হলে লোকে করবেই বা কি।

অতএব ওকে আসতে হয় বেশি পয়সা খরচ করে মিনিবাসে। কিন্তু ওই সময়ে মিনিবাসও বেশির ভাগ বোঝাই হয়ে আসে। পর পর কয়েকটা ছাড়লে একটাতে যদি জায়গা মেলে। তাও না হয় হল, কিন্তু কোনো মিনিবাসই তো উত্তর থেকে টানা দক্ষিণ কলকাতায় আসে না। এসপ্ল্যানেডে এসে সেই মিনিবাসও আবার চেঞ্জ করতে হয়। আর এটাই সব থেকে অসহ্য ব্যাপার। এক ঘন্টা দাঁড়িয়েও একটা মিনিবাস ধরতে পারে না এমনও হয়। ফলে রোজই বাড়ি ফিরতে রুচিরার সন্ধ্যে গড়িয়ে যায়, যার ফলে বাড়ি ফেরার পর থেকে মেজাজটা খিঁচড়েই থাকে। সমস্যাটা মাকে বলেছে। মা বলেছে বাবাকে। বাবা ধকলটা অস্বীকার করেন না কিন্তু মুখে বলেন, দশজনে যা করছে তাই একটু-আধটু করতে পারার অভ্যাস থাকা ভাল—তা না হলে রুচির জন্যে তো আবার একটা গাড়ি কিনতে হয়।

আবার একটা মানে দাদার জন্য একটা ছোট গাড়ি আছে এবং সেটা বাবার টাকাতেই কেনা। দাদাও ডাক্তার। কিন্তু তার গাড়ি চাওয়া আর তার একখানা হাত বা পা চেয়ে বসা যেন একই ব্যাপার। দাদার পসার বাবার ষোল আনার এক আনাও না। কিন্তু সকাল থেকে রাত পর্যন্ত তার গাড়ি চরকির মতো কলকাতার রাস্তা চষে বেড়াচ্ছে। গাড়ি পেতে হলে বউদিকেই দস্তুরমতো ঝগড়াঝাটি করে আদায় করতে হয়। তাছাড়া দাদার গাড়ি পেলেই বা কি? চালাবে কে? দাদা তার নিজের গাড়ির নিজেই ড্রাইভার।

গাড়ি আরো একখানা বাবা ইচ্ছে করলে কিনতে পারেন বটে, কিন্তু এম এ. পড়ার জন্য ড্রাইভার সমেত আরো একটা গাড়ি রাখার কথা ভাবতেও রুচিরার লজ্জা।

এই ভাবেই চলেছিল গোড়ার মাস দুই। তারপর হঠাৎ ব্যতিক্রম একদিন। ছুটির পর মিনিবাসের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিল। ঘ্যাঁচ করে পাশেই একটা জীপ এসে থামল। তার পরেই চক্ষুস্থির রুচিরার। সেই জীপে শুধু ড্রাইভার বসে। এবং সে স্বয়ং ইন্দ্র ব্যানার্জী। রুচিরা তাকে না দেখতেই চেষ্টা করল। তাড়াতাড়ি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু জীপ থামিয়ে যে দাঁড়িয়ে গেছে সে এটুকু দেখেই চলে যাবার লোক নয়। জীপের ওই বিতিকিচ্ছিরি হর্নটা টিপে ধরে বসে রইল। আর একটানা সেই শব্দে বাসের জন্য আর যারা অপেক্ষা করছিল, চকিত হয়ে তারা ওদের দুজনকেই দেখতে লাগল।

বিপাকে পড়ে রুচিরাকে আবার ওই জীপের দিকেই ঘুরে দাঁড়াতে হল। আর একগাল হেসে তক্ষুণি ওই বেহায়া বেশ চেঁচিয়েই অতিপরিচিতের মতো বলে উঠল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়াশুনার ধ্যান হচ্ছে নাকি? উঠে এস—

ঠিক যেমনটি হলে রুচিবাব মাথাযও ঝোঁক চেপে যায, এও যেন তেমনি পবিস্থিতি একটি। কোনোদিকে না চেয়ে সোজা জীপে উঠে এল। পাশেব সীটে বসল। তাবপব গাড়ি তিবিশ গজ এগোতেই ঝাঁঝাল গলায জিজ্ঞাসা কবল, এ-বকম অসভ্যতাব মানে কি?

সামনেব দিকে চোখ বেখে হাসিমুখে নির্লিপ্ত গলায ইন্দ্র ব্যানার্জী ফিবে জিজ্ঞাসা কবল, দেখেও না-দেখাব ভান কবে অন্য দিকে ঘাড ফিবিযে থাকাব মানে কি?

—মানে আমাব দেখাব ইচ্ছে নেই।

—আমাবও অসভ্যতাব মানে জোব কবে দেখানোব ইচ্ছে।

আবো বাগত স্ববে রুচিবা বলল, আমি জীপে না উঠলে কি কবতে পাবতে?

—না উঠতে পাবলে তুমি উঠতে না। আমাব ইচ্ছে বাতিল কবা খুব সহজ ব্যাপাব নয।

—তাহলে গাড়ি থামাও, আমি নেমে যেতে পাবি কিনা দেখো।

থামানোব বদলে হাসতে হাসতে গাড়িব বেগ আবো বাড়িযে দিল ইন্দ্র ব্যানার্জী। তাবপব আলতো কবে বলল, এত বাগেব কাবণ কি, ট্রামে-বাসে চাপাচাপি কবে যেতে খুব ভাল লাগত?

—হ্যাঁ, লাগত। তোমাব তাতে কি? সত্যি সত্যি এত বাগ কেন হচ্ছে রুচিবা জানে না।

—হিংসে, স্রেফ হিংসে। তা বাসেব জন্য অপেক্ষা কবছিলে. গাড়ি কি হল? রুচিবা এবাব চেষ্টা কবল ঠাণ্ডা হতে। ও যত বেগে যাচ্ছে, লোকটাব যেন তত মজা। জবাব দিল. গাড়ি ঠিকই আছে. কাবো হিংসে হলেই এখানে চাব বাব কবে গাড়ি যাতাযাত কববে না।

—তাব মানে বোজ. ট্রাম-বাসে যাতাযাত?

—আসি গাড়িতে, যাই মিনিবাসে।

—তাব মানে তো আবাব একদফা এসপ্লানেডে চেঞ্জ!

—তাতে কাব কি?

হাসছে আবাব বলল, এই যুগটাই অন্যবকম। কত ধকল বাঁচালাম, উপকাব কবলাম—তাব বদলে পাচ্ছি বাগ। অবশ্য এও আমাব ভালই লাগছে।

আবাবও বাগেব অনুভূতিটা ঠেলে তবল কবল রুচিবা। ঠাণ্ডা মুখে জিজ্ঞাসা কবল, ধকল বাঁচানো আব উপকাব কবাব জন্য জীপ নিযে ঘুবে বেড়াও?

হাসছে।—কাজ না থাকলে তাও বেড়াই। ধকল বাঁচানো আব উপকাব কবাব মতো মেযে দেখলে তুলেও নিই।

কানেব ভিতবটা বি-বি কবে উঠল রুচিবাব।—আমাকে তুলে নেবাব মতো মেযে ভেবেছ?

সামনে চলন্ত গাড়িব ভিড। তাব ফাঁকেই মুখ ঘুবিযে ওকে একবাব ভাল কবে দেখে নিল। হেসেও উঠল হা-হা কবে। জবাব দিল, তুলে নিলাম কিনা দেখলে না?

রুচিরা গুম হয়ে বসে রইল। মনে মনে নিজেরই মুন্ডপাত করতে লাগল সে। কেন সে জীপে উঠতে গেল। এবারে কিছুটা আন্তরিক সুরে ইন্দ্র ব্যানার্জী বলল, সত্যি অনেক দিন তোমাকে না দেখে মেজাজটা এত খারাপ হয়ে গেছল। আজ ভাগ্যিস ঠিক এই সময়ে এখান দিয়েই যাচ্ছিলাম।

এ-কথা শোনার পর রুচিরার কেন যেন আগের মতো রাগ হল না। দোষ এই লোকেরই। হঠাৎ হঠাৎ মগজের মধ্যে ওলট-পালট কাণ্ড বাধিয়ে দেয়। ইচ্ছে থাকলেও ঠাণ্ডা মাথায় এখন দুটো ভাল কথা বলার উপায় নেই।

এসপ্লানেড ছাড়িয়ে জীপ মাঠের মাঝের ফাঁকা রাস্তা ধরে ছুটল। স্পীড কম করে ষাট মাইল হবে। রুচিরা আড়চোখে দেখছে এক একবার। লোকটার যেন ধৈর্য বলে কিছু নেই, সবেতে হুড়মাড় ব্যাপার।

বাড়ির সামনের মোড়টার কাছে আসার আগেই রুচিরা বলল, এখানে থামতে হবে।

—কেন?

—আমি নামব।

—কেন?

—কেন আবার কি, আমার খুশি।

কেন এখানে নামতে চায় ইন্দ্র ব্যানার্জীর না-বোঝার কথা না। বাড়ির লোকেরা আর পাড়ার লোকের চোখ এড়াতে চায়। আপত্তি না করে জীপ থামাল। রুচিরা নেমেই হন হন করে সামনে এগোলো। পিছনে বসে লোকটা যে হাসছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পরদিনও য়ুনিভার্সিটির শেষ ক্লাস সারা হবার আগে রুচিরার কেমন মনে হল ইন্দ্র ব্যানার্জী আজও জীপ নিয়ে আসবে। প্রোফেসারের লেকচার শোনা হয়ে গেল। আর কিছু কানে ঢুকছে না। ঘন্টা বাজতে রুচিরা বেরিয়ে আসতে আসতে ভাবছিল, তাকে ফাঁকি দেবার জন্য উল্টো দিকের কোনো ট্রামে বা বাসে উঠে পড়বে কি না। কিন্তু ভিতর থেকে সায় মিলল না। তাতে কোথায় যেন নিজেরই লোকসান। আসে যদি, আর কিছু না হোক বাসে ওঠা আর বাস বদলানোর ধকলটা তো বাঁচে।

য়ুনিভার্সিটির গেটের বাইরে পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে সেই পরিচিত হর্ন। রুচিরা বিষম চমকে ঘুরে তাকাল। আজ একেবারে য়ুনিভার্সিটির ফুটপাথ ঘেঁষেই জীপ নিয়ে অপেক্ষা করছে। হাসছে।

রুচিরা থমকে দাড়াল একটু। চোখে চোখ। হঠাৎ হাসি পেয়ে যাচ্ছিল তারও। কিন্তু হাসল না। এমন মুখ করে জীপে গিয়ে উঠে বসল যেন ওরই জীপে ড্রাইভার গোছের কেউ অপেক্ষা করছে। ভিড়ের মধ্য দিয়ে সুপটু হাতে চালাতে চালাতে হৃষ্টমুখে ইন্দ্র ব্যানার্জী বলল, আজও আসব, ভাবনি তো?

—ভেবেছি। তোমার কেমিক্যাল কারখানা কি এদিকে নাকি?

হেসে উঠল।—আমার কারখানা উল্টোদিকে, এখান থেকে বারো মাইল দূরে—সেই যাদবপুর ছাড়িয়ে গড়িয়ার কাছাকাছি।

—তেলের অভাব নেই বোঝা যাচ্ছে।

ইন্দ্র ব্যানার্জী আরো হাসতে লাগল।—এই দিনে আবার তেলের অভাব। একটু তেল দেবার জন্য গৌরী সেনরা সব বসেই আছে।

—বেশ। এ-রকমটা সপ্তাহের মধ্যে ক'দিন চলবে?

—এ-রকমটা মানে?

—এই বারো মাইল ঠেঙিয়ে এসে আমার ট্রাম-বাসের ধকল বাঁচানো?

গম্ভীর মুখেই একটু হিসেব করে নিল।—সপ্তাহে দু'তিন দিন আমাকে চৌরঙ্গীর দিকে আসতেই হয়।

ছদ্ম গাম্ভীর্যে একটা নিশ্বাস ফেলল রুচিরা।— মাত্র।

ইন্দ্র ব্যানার্জী সকৌতুকে ফিরে তাকাল একবার।—বল তো বাকি ক'দিন কারখানার ড্রাইভারকে দিয়ে জীপ পাঠিয়ে দিতে পারি।

রুচিরা এবারে উৎসুক যেন একটু। ঘুরে তাকাল।—দু'তিন দিনই যথেষ্ট, এই দু'তিন দিনও শুধু ড্রাইভারকে পাঠানো যায় না?

ইন্দ্র ব্যানার্জী আবার ঘাড় ফেরালো তার দিকে। রুচিরা হেসেই ফেলল।

বলতে গেলে বছরের মধ্যে ছ'মাসই ছুটি কলেজ-য়ুনিভার্সিটিগুলোর। সব মিলিয়ে বাকি ছ'মাসের মধ্যে সপ্তাহে দু'তিন দিন সত্যিই ইন্দ্র ব্যানার্জীর জীপে চেপে সে বাড়ি ফিরেছে। না, বাড়িতে নয়, সামনের ওই মোড় পর্যন্ত। কিন্তু পাড়ার অনেকের সেটা চোখে পড়েছে। য়ুনিভার্সিটির ছেলে-মেয়েরা তো কিছু একটা ধরেই নিয়েছে। কিন্তু সত্যিই এই একটা বছরে ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো দিন কোনো রকম কথা-বার্তা হয়নি। মানুষটা কত যে বেপরোয়া এই একটা বছরে রুচিরা খুব ভাল বুঝে নিয়েছে। এ-রকম লোককে কথায় কৌতুকে বিদ্রূপে নাজেহাল করতে পারার মধ্যে বেশ একটা মাদকতা আছে। মেজাজ দেখালে রুচিরা ডবল মেজাজ দেখায়। ইন্দ্র ব্যানার্জী ওর দিকে চেয়ে হাসে। বলে, তোমার অদৃষ্টে দুঃখ আছে।

রুচিরা জবাব দেয়, অদৃষ্টের হাত তোমার ইচ্ছেয় ঘুরবে না কোনোদিন।

কিন্তু এর বেশি কথা কখনো হয়নি।

এরপর সুশীতল চক্রবর্তীর ওই প্রস্তাব, আর রুচিরার প্রত্যাখ্যান এবং অস্বস্তি। সুশীতল যা বুঝে গেছে তার অনেকটাই যে সত্যি, রুচিরা সেটা অনুভব করে। কিন্তু সত্যি তো ইন্দ্র ব্যানার্জীর সঙ্গে এ-নিয়ে কোনো রকম ফয়সলায় আসেনি সে।

দু'দিন বাদে তার সঙ্গে দেখা। জীপ একটু ফাঁকায় আসতে রুচিরা জিজ্ঞাসা করল, সুশীতল চক্রবর্তীকে চেনো?

—না। সে আবার কে?

—য়ুনিভার্সিটির নাম-করা ছাত্র ছিল আগাগোড়া, এখন কলেজের প্রোফেসর। সম্পর্কে দিদির দেওর। বি. এ. পড়ার দু'বছর আমাকে বাড়িতে এসে পড়িয়েছে—

মুখে শঙ্কার ভাব এনে ইন্দ্র ব্যানার্জী জিজ্ঞাসা করল, বিনে পয়সায়?

—তাছাড়া আবার কি? এখনও পড়াচ্ছে।

—কি সর্বনাশ। তারপর?

—পরশুর আগের দিন সে এসে বিয়ের প্রস্তাব করেছিল।

রুচিরা হঠাৎ সত্যি সত্যি গম্ভীর দেখল ইন্দ্র ব্যানার্জীর মুখ। জীপটা রাস্তার ধারে থামিয়ে দিতে দেখে আরো অবাক।

ইন্দ্র ব্যানার্জী জীপেই ঘুরে বসল তার দিকে।—লোকটার ঠিকানা কি?

—তার ঠিকানা দিয়ে কি হবে?

—ধড় থেকে মাথাটা নামিয়ে নিয়ে আসি।

রুচিরা হঠাৎ যেন ধাক্কাই খেল একটা। মানুষটা সত্যি-সত্যি ক্রুদ্ধ না ইয়ার্কি করছে তাই বোঝা গেল না। এবারে সেও ঝাঁঝিয়ে উঠল, ইস. মুরোদ কত. তুমি তার গায়ে আঙুল ছুঁইয়ে দেখ দেখি।

এবারে ঠাণ্ডা হল একটু।—তোমার সায় না থাকলে ছোঁয়াব না। তারপর কি দাঁড়াল?

—কি আবার দাঁড়াবে? মাঝখানে তুমি দাঁড়ালে।

এবারে উৎফুল্ল।—সত্যি?

রুচিরা হাসিমুখে মাথা নাড়ল। সত্যি।

আনন্দে জীপ হাঁকাল আবার। একটু ভেবে নিয়ে রুচিরা বলেই ফেলল, কিন্তু এ-ভাবে আর কতদিন চলতে পারে? তোমার মতলবখানা কি?

—আমার মতলব অনেকদিন ধরেই খারাপ। এম. এ. পরীক্ষার আগে তোমার যদি আপত্তি না থাকে তো ঝুলে পড়ি এসো।

রুচিরা ধমকে উঠল, কথাবার্তার ছিরি কি! বাবাকে তো বলতে হবে।

—আজই চল। বলে ফেলি।

রুচিরা হেসে ফেলল। ভাল লাগছে। এই মানুষকে ভয়ানক ভাল লাগছে আজ তার। এরকম ভাল লাগার স্বাদ এই যেন প্রথম। মাথা নাড়ল, তোমাকে বলতে হবে না, আমি মাকে বলে রাখব, আমাদের বাড়ি থেকে তোমার বাবার কাছে প্রস্তাব গেলে তিনি যেন আকাশ থেকে না পড়েন—তাঁকে বলে রেখো। বুঝেছ?

—খুব বুঝেছি। তোমার আমার ব্যাপারের মধ্যে আবার বাবা-মাদের ধরে টানাটানি। ঠিক আছে—

জীপ হাওয়ায় ছুটেছে এখন। এক নাম-করা অভিজাত হোটেলের সামনে এসে থামল সেটা। রুচিরাকে নামিয়ে হাত ধরে টেনে নিয়ে ভিতরে ঢুকল। দিনটা সেলিব্রেট না করে আজ আর বাড়ি ফিরতে দিচ্ছে না তাকে, আগেই বলেছে। রুচিরা হাঁ করে দেখল, এখানকার কায়দা-দুরস্ত মানুষগুলো সব এই লোকের সুপরিচিত। কোট প্যান্ট টাই পরা একজন ছুটে এল। কি কথা হল রুচিরা জানে না। লিফটে করে দোতলায় নিয়ে গিয়ে সে তাদের ছোট্ট ফিটফাট গালচে বিছানো ঘরে এনে ছেড়ে দিল। ঘরে বড় বড় শৌখিন সোফা সেটি পাতা।

লোকটা চলে যেতে রুচিরা জিজ্ঞাসা করল, এখানে কি?

—এখানে খাওয়াদাওয়া আর আনন্দ।

বলেই দরজাটা জোরে ঠেলে দিয়ে মানুষটা আচমকা যে আনন্দে মেতে উঠল তার জন্য রুচিরা একটুও প্রস্তুত ছিল না।

ওর হাড়-পাঁজরগুলোও যেন খসে খসে পড়বে। ওই বুকের সঙ্গে ওর বুক পিষে ফেলার আগে যেন ছাড়বে না। এমন চুমু খেয়ে চলেছে যে দম বন্ধ হওয়ার দাখিল। গোটা দেহটা অবশ করে ফেলছে। তারপর পিঠের ওপর অকরুণ দুটো হাতও যেন অবাধ্য হয়ে উঠছে।

শেষে প্রাণপণ চেষ্টায় রুচিরা ছাড়িয়ে নিল নিজেকে, দূরে সরে গিয়ে হাঁপাতে লাগল। মাথা ঝিম ঝিম করছে তখনো। ইন্দ্র ব্যানার্জী হাসছে তার দিকে চেয়ে।

—আমি এক্ষুনি চলে যাচ্ছি—এই অসভ্যতা করার জন্য আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ?

ইন্দ্র ব্যানার্জীর অবাক মুখ।—এর নাম অসভ্যতা?

আবার এগোচ্ছে ওর দিকে।

—ভাল হবে না বলছি। আমি চলে যাব।

হাসতে হাসতে ইন্দ্র ব্যানার্জী একটা সোফায় বসে পড়ল।

দেড় মাসের মধ্যে বিয়েটা হয়ে গেল। বিয়ে ঠিক হবার পর তাড়া ছেলের তরফেরই বেশি। কারণ, ইন্দ্র ব্যানার্জীর বাবার শরীর হঠাৎ বেশি রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ব্লাডপ্রেসার সর্বদা টঙে উঠে থাকে। কখন কি হয় ঠিক নেই, বিয়ে যখন হবে, আগেই হয়ে যাওয়া ভাল।

এই দেড় মাস সাগ্রহে একটি একটি করে দিন গুনেছে রুচিরাও। এই দেড় মাসের অবাধ মেলামেশায় রুচিরার বাড়ির দিক থেকেও কোনো আপত্তির প্রশ্ন ওঠেনি। তাই এই সময়টুকুর মধ্যে লোকটার পুরুষকারের ছটা আরও যেন অনেকগুণ বেশি চোখে পড়েছে। তার সঙ্গে তাদের ক্লাবে গেছে, পার্টিতে গেছে, কংগ্রেসের উৎসবে গেছে। ওই লোকের সর্বত্র সমাদর। বড় বড় ঘরের মেয়েরা পর্যন্ত তার পিছনে পিছনে ঘোরে, একটু তোয়াজ তোষামোদ করতে পেলে বর্তে যায়। মদ খাওয়া রুচিরা পছন্দ করে না, দাদা চুপিচুপি মাঝেসাঝে খায় টের পায়। কিন্তু মদ খাওয়ার পর সকলের যে মূর্তি, এর তা নয়। মদ আর জল দুই-ই যেন সমান তার কাছে। চোখ আর মুখ সামান্য লাল হয় শুধু, আর কোনো বিকার নেই, তার পরেও দিব্যি গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ায় ওকে নিয়ে।

এত সব রূপসী চটকদার মেয়ে থাকতে এই লোক ওর মধ্যে কি দেখল রুচিরা সময় সময় ভেবে পায় না। দেখে-শুনে মনে হয়েছে, যাকে ডাকত সেই বর্তে যেত।

রুচিরার দিন গোনার আরো একটা কারণ, ভয়। এই মানুষের বেপরোয়া মতিগতির কিছু বিশ্বাস নেই। অভিজাত হোটেলের সেই ঘরে আরো একাধিক দিন ওকে নিয়ে গিয়ে তুলতে চেয়েছে। রুচিরা সরাসরি বেঁকে বসতে অবুঝের মতো রাগও করেছে। সঙ্গে আরো ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা ছিল বলে একদিন নির্ভয়ে গেছল। হোটেলের

ওই ঘবটা যেন এবই দখলে। চাইলেই মেলে—ঘণ্টা দেড দুই খানাপিনা হৈ-হুল্লোডেব পব রুচিবা বেশ বুঝল চালাকি কবেই অন্য মেয়ে-পুরুষদেব জুটিগুলোকে একে একে বিদায দেওযা হচ্ছে। বিযেব তখন মাত্র আব ন'দিন বাকি। শেষ জুটি বিদায নিযে বেবোবাব আগেই রুচিবা উঠে পডল। যাবে। গম্ভীব মুখে ইন্দ্র ব্যানার্জী বলল, বিল নিযে আসছে, মিটিযে দিযে বেরুচ্ছি, বসো।

তাবপবেই এগিযে গিযে চোখেব পলকে দবজাব লক টেনে দিল।

সেই একদিনেব মতোই ব্যাপাব শুরু হল তাবপব। কিন্তু শেষ কোন দিকে গডাচ্ছে, মতলবখানা কি রুচিবা স্পষ্ট বুঝতে পেবেছে। সেটা চোখেমুখে স্পষ্ট লেখা। কিন্তু এ-দিন আব অপ্রস্তুত ছিল না। জোব কবে বাব বাব তাকে ঠেলে সবিযেছে। শেষে বেগেই গেছে অবুঝ মানুষটা।

—কেন ?

—না।

—না কেন, বিযেব তো ন'দিন মাত্র বাকি আব।

বাগ হযে যাচ্ছিল রুচিবাবও।—সেই কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে তো ওই ন'দিন আগে তুমি আমাকে ছোঁবে না পর্যন্ত বলে দিলাম।

—আচ্ছা, অবাধ্যতাব ফল টেব পাবে। প্রচণ্ড বাগ চেপেই ঘব থেকে বেবিযেছে ইন্দ্র ব্যানার্জী।

ন'টা দিন এবপব ভালয ভালয কেটেছে। বিযে হযে গেছে। কিন্তু ফুলশয্যাব বাতে ভিতবে ভিতবে বেশ একটু ধাক্কাই খেযেছে রুচিবা। ভিতবে ভিতবে মানুষটা সত্যি নিষ্ঠুব কিনা ভেবে পাযনি। ন'দিন আগেব সেই অবাধ্যতাব জবাব দেবাবই যেন বাত এটা। সাবাক্ষণ শিকাবীব মতো সময আব সুযোগেব অপেক্ষায ছিল যেন। সেটা মিলতেই ঝাঁপিযে পডেছে।

তাবপব এই দেহটা যেন শুধু তাবই বেপবোযা ভোগেব সামগ্রী। এব সঙ্গে আব কাবো যেন আনন্দেব যোগ নেই। ছিঁডে-খুঁডে একাকাব কবে দিযে মত্ত উল্লাসে বিস্মৃতিব অতলে ডুবে যাওযাব তাডনা। না বলেও পাবেনি।

এ বকম কবছ কেন ? আমি কি ফুবিযে যাচ্ছি যে একেবাবে খেযে না ফেলা পর্যন্ত শান্তি নেই ?

চোখে-মুখে সেই বকমই উল্লাস নিযে ইন্দ্র ব্যানার্জী সদর্পে বলেছে, আমাব কথা শোননি কেন ? আমাব অবাধ্য হযেছিলে কেন ?

রুচিবাব দিক থেকে প্রথম ফুলশয্যাব বাত ব্যর্থ গেছে।

মেজাজ-পত্র তাব ঠাণ্ডা হলে কি হত বলা যায না, মন বুঝে মানিযে নিতে চেষ্টা কবলে কি হত তাও বলা যায না। কিন্তু রুচিবাব মনে হত সে-ভাবে চলা মানে একজনেব ইচ্ছা-অনিচ্ছাব দাসী হযে থাকা। পবিচযেব গোডায যে-ভাবে ফোস কবে উঠত, এখনো তাব সেই মেজাজ। বিযেব আগে ইন্দ্র ব্যানার্জীব কাছে তাব এই মেজাজ একটা বড আকর্ষণ ছিল। বিযেব পবে বউযেব এই মেজাজ নিজেব একচ্ছত্র বশে আনাব অহংকাবে ঘা পডলে সেও কডা দাপটেব মানুষ।

প্রথম পনেবো বিশটা দিন তৃষ্ণা যেন মাথায় চেপেই থাকল তাব। বেপবোযা সম্ভোগে কোনোবকম বাধা ববদাস্ত কবাব পাত্র নয। কিন্তু মদ খেযে এলে রুচিবা সাফ বলে দিযেছে, ও-সব খেযে এদিক ঘেঁষবে না। ব্যস. তাবপব আবো বেশি খাবে আব জোব কবেই আবো বেশি ঘেঁষবে, দখল নেবে। তাবও সাফ কথা, দেখো, আমাব ইচ্ছেটাই সব, যখন যেমন চেযেছি তেমনি হযে আসছে, আব তেমনি হবে। তুমি এটা মনে বাখলে ভাল, না বাখলে কিছু এসে যায না, তবে তাতে তোমাবই অশান্তি।

আব এক ব্যাপাবে রুচিবা গোডাতেই সাবধান কবে দিযেছিল। এম. এ. ফাইনাল পবীক্ষাব আগে কোনো ছেলেপুলে নয। তাবও সাফ জবাব, ও তোমাব ব্যাপাব তুমি ভাববে, সাবধান হতে হয নিজে হবে—ওসব আমাব কোষ্ঠীতে লেখা নেই।

গোডা থেকেই বুকেব তলায ঘা পডছিল রুচিবাব। কিন্তু এখনো সে ভাবতে চায না জীবনেব সব থেকে বড ব্যাপাবে সব থেকে বড ভুলটাই সে কবে বসেছে। কিন্তু সে-বকম কোনো গণ্ডগোল দানা বেধে ওঠাব আগেই বাডিব কর্তা অর্থাৎ রুচিবাব শ্বশুব হঠাৎ বেশিবকম অসুস্থ হযে পডলেন। তখন আবাব এই ছেলেব মতি-গতি অন্যবকম দেখল। রুচিবাব বাবাব তাকে হাসপাতালে পাঠানোব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু শ্বশুবেব তাতে আপত্তি। ছেলে দু'হাতে পযসা খবচ কবে হাসপাতালেব সমস্ত সুব্যবস্থা বাডিতেই কবে ফেলল। শাশুডী অনেককাল আগেই গত হযেছিলেন, রুচিবা ভিন্ন বাডিতে আব দ্বিতীয মেযেছেলে নেই। চব্বিশ ঘণ্টাব জন্য দুজন নার্স বাখা হল, আযা বাখা হল। বোগীব অবস্থা যত ঘোবালো হযে উঠছে, ইন্দ্র ব্যানার্জীব মনেব অবস্থাও তত খাবাপ হচ্ছে। দিন-বাত বাপেব কাছে বসে থাকে, কাবখানাযও যায না। পাগলেব মতো সাত ব'ব কবে রুচিবাব বাবাব কাছে ছোটে। বাবাকে সাবিযে তুলতেই হবে —আব কি কবা যায ?

সেদিন তো রুচিবাব সামনে ওব বাবাকে ধমকেই উঠল প্রায, একটুও তো সুবিধেব দেখছি না. আবো বড ডাক্তাব কে কোথায আছে ডাকুন।

এই বোগে রুচিবাব বাবাই নামজাদা স্পেশালিস্ট। কিন্তু জামাইযেব মানসিক অবস্থা দেখে কোনো অভিমান না বেখে ভদ্রলোক আবো দুজন নাম-কবা ডাক্তাব নিযে এলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না শেষ পর্যন্ত। ওদেব বিযেব আডাই মাসেব মধ্যে শ্বশুব চোখ বুজলেন।

...এই দাপটেব ছেলেকে তখন বাপেব বুকেব ওপব আছডে পডে কাঁদতে দেখেছে রুচিবা। একেবাবে অসহায বাচ্চা ছেলেব মতো কান্না। রুচিবাই তখন সান্ত্বনা দিযেছে তাকে। টেনে তুলতে চেষ্টা কবেছে। ওই লোক তখন অকাবণে বাগ কবলে বা বিবক্ত হলেও ওব সহিষ্ণুতায ফাটল ধবেনি।

কিন্তু মানুষেব চবিত্র যাবে কোথায ? আবাব দু'মাস যেতে-না-যেতেই যে-কে সেই। বাবা ঘবে থাকাব দরুন ঘবে যেটুকু সংযম ছিল সেটুকুও গেল। আবাব খটাখটি বাধতে লাগল। রুচিবা যদি চুপচাপ দেখে যায়, যা বলে প্রতিবাদ না কবে শুনে যায়,তাহলে হযতো কোনো গোল থাকে না। কিন্তু অন্যায দেখলে বা স্নাযুতে ঘা খেলে রুচিবাও যুঝতে ছাডবে না। যা বলাব সোজাসুজি বলে দেবে। কিন্তু বাধা পেলেই মানুষটাব

ভিতরে যেন কি বিষের ক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। অন্যায় বা জুলুম বুঝলেও জোর করেই তা করবে। সব কিছুই তখন যেন একটা চ্যালেঞ্জের ব্যাপার হয়ে যায়। উল্টে শাসায়, কারো বাবার ধার ধারি না, ভাল না লাগে চুপ করে থাক, মাস্টারি করতে এসো না।

রুচিবার ধারণা, ও পছন্দ করে না বলেই বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাড়িতে বসেই এক-এক সন্ধ্যায় মদ গেলে এখন। রাগ করে রুচিরা বাপের বাড়ি চলে এলে দস্তুরমত শাসায়, এ-ধরনের অবাধ্যতা বরদাস্ত করার ধাত নয় তার। সেই মত্ত অবস্থাতেই এক-এক রাতে জোর করে দখল নিতে আসে। নেয়ও। ও কিছুতে আপত্তি করলেই সেটা আরো বেশি করে করার দুরন্ত ঝোঁক চাপে লোকটার। এমন কাণ্ড করে যে রুচিরার মাথা খারাপ হবার দাখিল এক-একসময়।

তার স্তাবকের সংখ্যা আরো অনেক বেড়েছে। আড্ডায় বসে গেলে কারখানা কামাই করে। বলতে গেলে ঝাঁঝালো জবাব দেয়, আমি কারখানায় যাই বা না যাই তোমার তাতে কি?

অবশ্য রুচিরা যখন বলতে যায় তখনো সেটা একেবারে শ্লেষশূন্য হয় না। এদিকে কোথা থেকে তাড়া তাড়া নোট আসছে, রুচিরা ভেবে পায় না। ওড়াচ্ছে, ফূর্তি করছে। কিছু বলতে গেলেই দাবড়ানি। কিন্তু বলার যা রুচিরাও বলবেই। আরো খারাপ লাগে যখন সাঙ্গোপাঙ্গর মারফত একে-ওকে হুমকি দিয়ে পাঠায়। রুচিরা বলে, এটা কি মগের মুলুক নাকি?

সে হেসে জবাব দেয়, মগের মুলুক কিনা দেখছ না?

রুচিরার ভিতরটা বিষিয়েই যেতে থাকল। মনের অবস্থা এমন দাড়াল যে সে-বছর আর তার এম. এ. পরীক্ষাই দেওয়া হল না। হেসে হেসে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে ছড়াল ইন্দ্র ব্যানার্জী। বলল, ভালই হল, এই বিদ্যের ঝাঁঝেই অস্থির আছি।

মেয়ে কেমন আছে রুচিরার বাবা-মায়ের কাছেও সেটা গোপন থাকল না। একদিন জামাইকে এ নিয়ে দু'কথা বলতে এসে বাবা দস্তুরমতো অপমানিত হয়ে ফিরে গেলেন।

গোঁ ধরে রাতে এক-একদিন বাড়িই ফেরে না ইন্দ্র ব্যানার্জী। রুচিরা একদিন কটূক্তিই করে উঠেছিল। জবাবে সে বলেছে, হোটেলের সেই একটা ঘর তো তুমি চেনো, সে-ঘরে তোমার আগেও মেয়ে এসেছে, এখনো আসে—বুঝলে?

শুনে রুচিরা স্তব্ধ। তখন থেকেই পরিত্রাণের রাস্তার কথা ভাবতে লেগেছে কিনা বলা যায় না। এর কিছু দিনের মধ্যে শেষ ঘনাল সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার নিয়ে।

যে-বাড়িতে থাকে তার ভাড়া মাসে ছ'শো। এখন এ-বাড়ি ছাড়লে ভাড়া তার ডবল হবে। শ্বশুর থাকতে কখনো বাড়ি-ভাড়া বাকি পড়েনি। কিন্তু এখন চার মাসের ভাড়া বাকি। বার কয়েক লোক পাঠিয়ে বয়স্ক বাড়িঅলা নিজে এসেছেন ভাড়ার তদবির করতে।

তাকে দেখেই ইন্দ্র ব্যানার্জী খাপ্পা—লোক পাঠিয়ে উত্যক্ত করছেন, এখন নিজে এসেছেন ভাড়া আদায় করতে, কেমন? যান, দেব না—হিম্মত থাকে কোর্টে গিয়ে ভাড়া আদায় করুন।

শুকনো পাংশু মুখে ভদ্রলোক চলে যেতেই লজ্জায় অপমানে রুচিরা ঝলসে উঠল।—এ-সবের মানে কি আমি জানতে চাই। এদিকে টাকা ওড়াচ্ছ, ফুর্তি করছ, আর চার মাস ভাড়া দাওনি লজ্জা করে না? নিজে দোষ করে আবার ছোটলোকের মতো ভদ্রলোকের ওপর হম্বি-তম্বি করছ?

'ছোটলোকের মত' শুনেই ইন্দ্র ব্যানার্জীর মাথায় রক্ত উঠে গেল। মুখের সামনে এগিয়ে এসে দাঁড়াল। চোয়াল দুটো এঁটে বসল।—কি বললে?

—কি বললাম তুমি শোননি?

—শুনেছি। আর একবার বল তো?

—বললে তুমি কি করবে?

—একটা একটা করে ওই দাঁতগুলো খুলে নেব।

রুচিরা থমকাল। তক্ষুণি মনে হল, পারে। এও পারে।

দুপুরে সে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রুচিরা নিজের ট্রাঙ্ক গোছাল। গয়নাপত্র সব বার করে নিল। তারপর একটা ট্যাক্সি ডেকে সোজা বাপের বাড়ি।

তারপর দিন গেছে, মাস গেছে, একে একে দুটো বছর ঘুরেছে। ওই এক মানুষকে নিয়ে এই বাড়িতে, এ-বাড়ির রাস্তায় অনেক ঝড় বয়ে গেছে। হুমকি শাসানি আর শেষ পর্যন্ত বোমাবাজীর ভয় পর্যন্ত দেখানো হয়েছে।

গোঁ রুচিরার বাবারও কম নয়। নামী ডাক্তার, পাঁচজন হোমরা-চোমরা মানুষ খাতির করেন তাঁকেও। তাঁদের সহায়তায় বোমাবাজীর হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছেন। বাড়িতে তবু বাড়তি দরোয়ান রাখতে হয়েছে। রুচিরাকেও একলা কোথাও বেরুতে দেওয়া হয়নি।

এদিকে কেস চলেছে। জোর ও-তরফেরও কম নয়। বিচ্ছেদের মামলা আনা হয়েছিল রুচিরা স্বামীর ঘর ছাড়ার পাঁচ মাস বাদে। কোর্টের রায় বেরুতে আরো ন-দশ মাস।

সব মিলিয়ে সাতাশ মাসের একটা অধ্যায় শেষ। এর পরেও হামলা হত কিনা বলা যায় না। কিন্তু দেশের হাওয়া রাতারাতি বদলেছে। দিল্লীর শাসন-ক্ষমতা জনতার হাতে এসেছে গত মার্চের শেষে। এখানকার এতদিনের ডাকসাইটে পাণ্ডাদের মাথায়ও আচমকা বজ্রাঘাত ঘটে গেছে যেন। এপ্রিলের এই গোড়াতেই কোর্টের রায় বেরুল।

এক বছর বাদ গেছে, তার পরের বছরেই এম. এ. পাস করে ঘরে বসেছিল রুচিরা। এতদিন সাহস পায়নি, এখন একটা কাজ-টাজ দেখে নেবার ইচ্ছে। নইলে সময় কাটে কি করে?

কিন্তু মুক্তি পাওয়ার পর কোথা থেকে যে রাজ্যের ক্লান্তি এসে ছেঁকে ধরেছে তাকে কে জানে। কিচ্ছু ভাল লাগে না। ওই দাপটের মানুষের এখন আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। কেউ আর কেয়ার করে না তাকে। শুনেছে, বাড়িঅলাও এবার তার বিরুদ্ধে কেস ঠুকে দিয়েছে।

দিদিব আবাব মতলব, সুশীতলেব সঙ্গেই এবাব তাব বিযেটা হোক। এ-পর্যন্তও সে বিযে কবেনি। দিদি প্রাযই বোনেব মন বুঝতে আসে। কিন্তু রুচিবা কি বলবে? নিজেব মনেব হদিস নিজেই ভাল পায না।

সুশীতল চক্রবর্তী নিজেই এল একদিন। রুচিবাব হাঁস-ফাঁস দশা। কথা উঠলে কি বলবে জানে না।

কিন্তু নবম কবে সুশীতল যে-কথা বলল, এ-বকমটা শোনাব জন্যও প্রস্তুত ছিল না। বলল, দেখ তোমাব দিদিব একটা মতলব টেব পাচ্ছি। সেই জন্যই তোমাকে দুটো কথা বলতে এলাম, নইলে তুমি ভাববে হযতো আমাব ইচ্ছে বুঝেই তিনি এই মতলব কবছেন। কিন্তু আমি তোমাকে সত্যি কথা বলছি, আমি এতে বাজী নই আমাব মতো মানুষকে ভালবাসতে পাবলে তুমি আগেই বাসতে। তুমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস কবেই একজনকে ভালবেসে তাব ঘবে গেছলে। যা হযে গেল সেটা দুর্ভাগ্য, সেটা তোমাব ভালবাসাব দোষ নয। এই দুর্ভাগ্যেব সুযোগ নিযে আবাব আমি এগিযে এসে ভালবাসাব দাবী কবব—এটা বোধহয আবো বেশি ভুল হবে। আমি ববং প্রার্থনা কবব, যে ধাতেব মানুষকে তুমি ভালবাসতে পাব সে-বকম একজনকেই যেন পাও।

সুশীতলেব কথাগুলো অনেক ভেবেছে রুচিবা। প্রতিটি কথা যে সত্যি সে আব ওব থেকে বেশি কে অনুভব কবতে পাবে?

ডিভোর্সেব দেড মাসেব মধ্যে বাবা হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মাবা গেলেন। এতবড ডাক্তাব, নিজেব কোনো বকম চিকিৎসাব সুযোগটুকুও দিলেন না।

রুচিবাব আবো বুক ফেটে কান্না এল যখন জানতে পাবল বাবা এব আগেই ওব জন্য ভবিষ্যতেব কি ব্যবস্থা কবে গেছেন। তাব উইলে বাডিব দু ভাগ দাদা আব দিদিব, একভাগ রুচিবা আব মাযেব। এ ছাডা শুধু রুচিবাব জন্য ব্যাঙ্কে বেখেছেন নগদ দু লক্ষ টাকা। না, রুচিবাকে খাওযা-পবাব ভাবনা ভবিষ্যতে কোনোদিন ভাবতে হবে না।

কিন্তু দিন বাতই ভাবছে। বাবাব কাজ-কর্ম চুকে যেতে শোকতপ্ত মাকে নিযে বেশ কিছুদিনেব জন্য বাইবে বেবিযে পডল সে। কাবণ বাবা থাকতে মাযেব মুখেব একটা খেদ সে অনেকবাব শুনেছে। জীবনে এ-পর্যন্ত এক কলকাতা ছাডা আব কোনো তীর্থেব জাযগা দেখা হল না। তীর্থেব টান রুচিবাব একফোটাও নেই, কিন্তু এখানে যেন দম বন্ধ হযে আসছিল তাব। মা তীর্থ করুক, ওব ঘুবে বেডানোটাই লাভ।

কাশী মথুবা বৃন্দাবন সেবে দিল্লী হযে হবিদ্বাবে এল তাবা। ফেবাব তাডা কিছু নেই। প্রায দুটো মাস কেটে গেছে। হবিদ্বাবে দিন পনেবো থাকবে। মাঝে ঋষিকেশ লছমনঝোলা যাবে, দেবাদুন আব মুসৌবিটাও ঘুবে আসবে। রুচিবাব এই ভেসে বেডানোব মতো ব্যাপাবটা ভাল লাগছিল। তীর্থেব টান থাক না থাক, প্রকৃতিব সঙ্গে বুকেব তলায কোথায একটা বড যোগ আছে, সেটা বেশ অনুভব কবা যাচ্ছিল।

হবিদ্বাবে এসে মাযেব সঙ্গে যোগাযোগ একজনেব। লোকটা সাধু-সন্ন্যাসী কিনা জানে না। পবনে ধপধপে সাদা থান, গাযে সাদা ফতুযাব ওপব সাদা চাদব। লম্বা দোহাবা চেহাবা, গাযেব বং ফর্সা নয, তামাটে। মাথাব চুলে কদমছাঁট। দাডি-গোঁপ কামানো পবিষ্কাব হাসি-হাসি মুখ। বছব বত্রিশ-তেত্রিশেব মধ্যে বযেস।

প্রথম দেখা হব কী পিযাবীব ঘাটে। জনাকয়েক আধবযসী মেযে-পুরুষ ঘিবে দাঁড়িযেছিল তাকে। হাত নেড়ে হাসিমুখে তিনি সামনেব আছাড়ি-পিছাড়ি গঙ্গাকে দেখিযে কি বলছিলেন। এব মধ্যে নতুন যাবা আসছে তাবা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম কবছে তাঁকে। কে প্রণাম কবছে না কবছে ভদ্রলোক তাও খেযাল কবছিলেন না।

মাযেব সঙ্গে একটু দূবেব উঁচু ধাপে দাঁড়িযেছিল রুচিবা। কথা বলতে বলতে মানুষটিব হঠাৎ এদিকে চোখ পড়ল। দূব থেকেও রুচিবাব মনে হল চোখ দুটো ভযানক ঝকঝকে। আব তাব থেকে যেন একটু হাসিব আভাস ছিটকে বেবোয। রুচিবা অন্য দিকে মুখ ফেবাতে যাচ্ছিল। কিন্তু এবাবে মনে হল অপলক চোখে ভদ্রলোক এখন মাকে দেখছেন। তাকে ঘিবে যাবা ছিল, এই দেখাটা তাদেবও চোখে পড়েছে। তাবাও এ-দিকে ঘুবে তাকাচ্ছে।

তাদেব সবিযে মানুষটি হঠাৎ এদিকে আসতে লাগলেন। রুচিবা ভেবে পেল না কি ব্যাপাব। কাছে এসে হেসে মাকে বললেন, মাসিমা, চিনতে পাবেন?

মা হকচকিযে গেলেন। দূব থেকে আগে মা-ও একে দেখেছেন আব মস্ত কোনো সাধু-টাধু ভেবে বসেছিলেন। মাসিমা ডাক শুনে তাব হতচকিত হবাব কথাই।

উনি হেসে বললেন, চিনতে পাবলেন না তো, আপনাদেব কলকাতাব সেই উমাদিদিব ছেলে শঙ্কব—মনে পড়ছে না?

মাযেব সমস্ত মুখে যে বিস্মযেব আচড়গুলো পড়তে থাকল রুচিবা তা ঠিকই লক্ষ্য কবছে। মা যেন ঠিক ধবতে-ছুতে পেবেও পাবছেন না। তাবপবেই মনে পড়ল। ব্যগ্র মুখে বললেন, সেই ঈশ্বব গাঙ্গুলী বোডেব আমাদেব পিছনেব বাড়ির উমাদি? উমা চ্যাটার্জী?

হেসে মাথা নাড়লেন।—এবাবে চিনেছেন? দেযাল টপকে আপনাদেব বাড়ি গিযে কত দৌবাত্ম্য কবেছি, যখন-তখন খেতে চেযেছি, মনে পড়ে? আমি তো এই বাইশ বছব বাদেও আপনাকে দেখেই চিনে ফেললাম।

মাযেব মুখখানা যেন হঠাৎ ব্যাকুলতায ভবে গেল একেবাবে।—হ্যা বাবা চিনেছি —কিন্তু তুমি এখানে আছ, উমাদি জানেন? তুমি তাদেব সঙ্গে যোগাযোগ কবেছ? উমাদি কি এখনো ঈশ্বব গাঙ্গুলী বোডেব সেই বাড়িতেই আছেন?

মানুষটি হাসছেন। চোখ দুটো আশ্চর্য ঝকঝকে বটে। একবাব রুচিবাব দিকে তাকালেন। মনে হল ওই দুটো চোখেব একটা বিদ্যুৎ-তবঙ্গ বুঝি গাযে এসে লাগল। হঠাৎ কেন যে একটু অস্বস্তি বোধ কবতে লাগল রুচিবা জানে না।

—মা দু'বছব আগেই গত হযেছেন। আমি তখন বাইবে। আব সব ও-বাড়িতেই আছেন।

ব্যাকুল মুখে মা বলে উঠলেন, সেই বিশ বছব বযসে ঘব ছেড়ে চলে গেছলে, এতকালেব মধ্যে তোমাব মাযেব সঙ্গে আব দেখাই হল না?

—মা মাবা যাবাব সময আমি তাঁর কাছেই ছিলাম।

রুচিবাব মনে হল তাব মা যেন স্বস্তিব নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। একটা ব্যাপাবে একটু অবাকই লাগল। মা বলছেন বিশ বছব বযসে ঘব ছেড়েছে, আর ইনি একটু

আগে বললেন, বাইশ বছব বাদেও দেখেই মাকে চিনেছেন—মানুষটিব বযেস কি তাহলে বাইশ আব কুড়ি বিযাল্লিশ এখন? মুখ দেখলে এব কাছাকাছি মনে হয় না।

রুচিবাব মা বললেন. যাক, তবু তাহলে মাকে শেষ সময়ে শান্তি দিতে পেবেছ একটু। বলা নেই কওযা নেই, বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে আব উমাদি একেবাবে পাগলেব মতো হয়ে গেল—দেখে আমাদেব চোখে জল আসত। মাকে এভাবে কষ্ট দিযে কি যে পুণ্য হয আমি বুঝি না।

হাসিমুখেই মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক। বললেন পুণ্য হয না।

তাব পবে ঘুবে তাকালেন রুচিবাব দিকে। গভীব, একেবাবে ভেতব দেখে নেবাব মতো চাউনি। এমন যে, রুচিবাব মনে হতে লাগল গাযে যেন যথেষ্ট আববণ নেই। একটু বাদে মাযেব দিকে ফিবলেন আবাব। জিজ্ঞাসা কবলেন, মেযেব বিযেটা বুঝি সুখেব হল না?

শোনাব সঙ্গে সঙ্গে রুচিবা চমকেই উঠল। মাও প্রথমে হতভম্ব, তাবপবে ব্যাকুল।

—তুমি দেখে বুঝলে বাবা? তুমি সেই শঙ্কব—না কোনো মহাপুরুষ তুমি?

হাসছেন।—আমি মহাপুরুষ টুরুষ কিছু নই মাসিমা।

—না না। ও-সব আমি শুনছি না. তুমি সব জান, সব বুঝতে পাব নইলে তুমি জানলে কি কবে? তুমি বল ওব কি হবে? ওব অদৃষ্টে কি আছে? ওব কথা ভাবলে আমাব প্রাণটা একেবাবে শুকিযে যায।

এব মধ্যে একজন লোক এসে তাব কানেব কাছে মুখ এনে কি বলতে মাথা নেড়ে তিনি আবাব মাযেব দিকে ফিবলেন।—আপনি বিশ্বাস করুন মাসিমা, আমি কিচ্ছু জানি না, ও-সব বিদ্যে আমাব নেই। আমাব ওখানে একদিন এলে খুশী হব। মিশনে লোক এসেছেন, এখন আমি যাই—

মিশনেব নাম এবং হদিস বলে দিযে চলে গেলেন।

মা ব্যাকুল চোখে সেদিকে চেযে বইলেন।

ধবমশালাব তিনতলায একটা সুইট ভাড়া কবে মাকে নিযে উঠেছিল রুচিবা। ঘবে ফিবে দু-চাব কথায মাযেব কাছে ব্যাপাবটা শুনে নিল। উমাদি বলতে মাযেব সত্যি সম্পর্কেব কেউ নয। শঙ্কবেব বাবা ছিলেন উকিল, কিন্তু খুব পসাব ছিল না। রুচিবাব বাবা মা-ও তখন ঈশ্বব গাঙ্গুলী বোডে এক ছোট বাড়িতে থাকতেন। রুচিবাব মনে থাকাব কথা নয, কাবণ তাব তখন মাত্র বছব তিন-চাব বযেস। সেই বাড়িব ঠিক পিছনে ছোট একটা ভাঙা পৈতৃক বাড়িতে উমাদি আব অনেকগুলো মেযে আব এই একটা ছেলেকে নিযে থাকতেন সেই উকিল ভদ্রলোক। এই ছেলেটা সত্যি খুব দুবন্ত আব খেযালী ছিল। রুচিবাব মাযেব কাছে যখন-তখন আসত, খেতে চাইত। ওদেব বিশেষ কবে রুচিবাকে নিযে নাকি লোফালুফি খেলত। তাই দেখে রুচিবাব বাবা নাকি একদিন খুব বকেও দিযেছিলেন তাকে। শঙ্কব নিজেব মাকে আব রুচিবাব মাকেও এক-এক সময বলত, বেশিদিন সে আব এ সংসাবে থাকছে না—তাব ভাল লাগে না। কিন্তু তাব সে-কথায কেউ কান দিত না। রুচিবাব মা ভাবতেন অভাবেব সংসাবে ভাল খেতে পবতে পায না বলেই এ সব কথা বলে।

কিন্তু বি. এ. পবীক্ষা দিযে সত্যিই আব সে ঘবে থাকল না। দু-লাইনেব এক চিঠিতে মাকে তাব জন্য ভাবতে বাবণ কবে কোথায যে চলে গেল কেউ জানে না। ভালমানুষ উমাদিব অনেকগুলো মেযে আব ওই একটাই ছেলে। সে পাগলেব মতো হযে গেল। এব বছব দেডেকেব মধ্যে রুচিবাব বাবা-মা ও-বাডি ছেডে অন্য বড বাডিতে উঠে আসেন। আবো বছব দুই-তিন যাতাযাত ছিল। কিন্তু তখনো উমাদি ছেলেব কোনো খবব পাযনি। এবপব রুচিবাব বাবা এখনকাব এই বাডি কবে উঠে আসেন। তাবপব থেকে আব যোগাযোগ ছিল না।

রুচিবাব মাযেব মনে কি আশা কে জানে। পবদিনই বিকেলে সেই মিশনেব উদ্দেশ্যে ছুটলেন। রুচিবাব সঙ্গে না গিযে উপায নেই। মাকে একলা ছেডে দেওযা যায না। দেড মাইলেব মধ্যে সেই মিশন। টাঙ্গাঅলাকে বলতে সে-ই নিযে গেল। বিবাট এলাকা, বিশাল ব্যাপাব। সেখানে সাধন-ভজন ছাডাও সেবাব্রত একটা বড কাজ বোঝা গেল। ভিতবে ডিসপেনসাবি, হাসপাতাল। পযসা দিযে পডতে পাবে না এমন ছেলে-মেযেদেব প্রাথমিক শিক্ষা-ব্যবস্থাও আছে।

ঝকঝকে মস্ত একটা হলঘবে বক্তৃতাব আসব বসেছিল। শঙ্কব চ্যাটার্জীব খোঁজ কবতে ওদেব সেখানে নিযে যাওযা হল। অনেক বিদেশীব সমাগম ঘটেছে সেদিন। আব বহু গেরুযা-পবা সাধুও বসে। বিদেশীদেব কাবণেই হযতো ইংবেজিতে বক্তৃতা কবছেন শঙ্কব চ্যাটার্জী। বিশুদ্ধ উচ্চাবণ বলাব সাবলীল ভঙ্গি। সকলে একাগ্র মনে শুনছেন। ধর্মীয দর্শনেব কিছু একটা ব্যাখ্যা চলেছে। রুচিবাব ভাল লাগছে। কান পেতে শুনতে এবং বুঝতে চেষ্টা কবল সেও।

বক্তৃতাব পবে মা সেদিন আব তাঁকে নিবিবিলিতে পেলেন না। কাবণ এব পবেই তাঁব অন্যত্র কোথায যাবাব কথা। তবু হাসিমুখে সামনে এসে দাঁডালেন একটু। মাযেব সঙ্গে পাঁচ-সাত মিনিট কথা বললেন। রুচিবা একটু দূবে দাঁডিযে। বাব কযেক ওকেও ঘুবে দেখলেন তিনি। কিন্তু রুচিবাব সেই আগেব দিনেব গঙ্গাব ঘাটেব মতোই অস্বস্তি। তাকালেই ভদ্রলোক যেন বড বেশি দেখতে পান। পুরুষেব এই দেখাটাকে রুচিবা খুব যেন বিশ্বাস কবে উঠতে পাবে না।

পবদিন সকালে টাঙ্গা নিযে মা একলাই চলে গেলেন সেখানে। রুচিবাকে ডাকতে সে স্পষ্ট বলে দিল তাব ভাল লাগছে না। ঘণ্টা দুই বাদে মা ফিবে ওই লোকেব প্রশংসায পঞ্চমুখ। সকালেও উনি কোথায চলে গেছলেন বলে মাযের ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা কবতে হযেছিল। সেই সময এক বুডো সাধুব সঙ্গে মাযেব অনেক কথা হযেছে। তাঁব মুখে মা শুনেছেন, শঙ্কব চাটুজ্যে সাধু-টাধু কিছু নন কিন্তু এখানকাব সব সাধুবাই তাঁকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা কবেন। তাঁবা তাঁকে পবম সমাদবে ওখানে বেখেছেন, কখন হুট কবে আবাব চলে যান সেই ভাবনা সকলেব। ভদ্রলোক টানা ষোল বছব বিদেশে কাটিযেছেন। পৃথিবীব বহু জাযগায ঘুবেছেন। এই আশ্রমেব সঙ্গে তাঁব যোগ পাঁচ বছবেব, তাব মধ্যেও দু-বাব কাউকে কিছু না জানিযে একবাব এক বছব আব একবার ন'-মাসেব জন্য কোথায চলে গেছলেন। আধ্যাত্ম জগতেব শিক্ষিত মানুষেবা এখানে এলে তাঁব কথা, তাঁব ব্যাখ্যা শোনাব জন্য ছুটে আসেন। সেই জন্যেই সপ্তাহে একদিন

করে এক একটা বিষয়ের ওপর তাঁর বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। আগের দিন সেই বক্তৃতাই তারা শুনে গেছল। অন্যান্য দিন এখানকার সাধুদেব তিনি এক ঘন্টা দু ঘন্টা কবে দেশ-বিদেশের দর্শনশাস্ত্র পড়ান। সাধুবাও তাঁকে তেমনি ভক্তি-শ্রদ্ধা করেন।

এর পব শঙ্কর চ্যাটার্জীর সঙ্গে মায়েব দেখা হয়েছে, এক ঘন্টা ধবে অনেক কথা হযেছে। তাঁব কথা শুনলে নাকি কান-মন জুড়িযে যায। মাযের মুখখানা আনন্দে বিহ্বল। ঠিক কোন প্রত্যাশায, রুচিবা ঠাওর কবতে পাবল না। মা যে গলগল কবে ওই লোকেব কাছে মেযেব সর্ব দুর্ভাগ্যের কথা বলে এসেছেন তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। ওব প্রসঙ্গে উনি নাকি হেসেই মাকে বলেছেন, আপনাব মেযে আমাকে ঠিক পছন্দ করতে পাবছে না তাই আসেনি।

রুচিবা কেন যেন তেতে উঠল হঠাৎ।—কি-বকম পছন্দ কবতে হবে তাঁকে?

মা থতমত খেলেন। তাবপব ধমকেব সুবে বললেন, মহাপুরুষদেব নিযেও কি ভাবে যে কথা বলিস ঠিক নেই। বিকেলে তোকে নিযে যাব বলেছি।

—কেন? মহাপুরুষদেব কাছ থেকে কি আশা কব তুমি? কি কববেন?

মা জবাব দিলেন, কেন বাগ কবিস বুঝি না। মায়েব ভাবনা জানিস না?...এবা কত কি দেখতে পায়, বোঝে. হয়তো তোব ভাল হবে এমন কিছু বলে দেবে—নইলে এদেব কাছে মানুষ ছুটে ছুটে আসে কেন?

রুচিবা আব কিছু বলল না। নিজেব জ্বালায বাগ কবে। নইলে ওই লোকটি সম্পর্কে মায়ের মুখে শোনা বৃদ্ধ সাধুব কথাগুলো ভারি ভাল লেগেছে। সেদিনের বক্তৃতাব অংশ মা হযতো বোঝেনি, কিন্তু যেটুকু শুনেছে তাতেই ওব মনে দাগ পড়েছে। অসাধাবণ কিছু আছেই ওই লোকেব মধ্যে, নইলে এ-ভাবে কেউ জীবন কাটাতে পাবে না। আশ্চর্য, আজ সেখানে যাবাব জন্য দুপুব থেকে ও নিজেই কিবকম একটা তাগিদ অনুভব কবছে। ওই লোকেব চোখ দুটোকে কেমন ভয-ভয কবে, আবাব টানেও যে খুব সেটা অস্বীকাব কবাব উপায় নেই।

বিকেলে একটুও আপত্তি না কবে মাযেব সঙ্গে বেরিয়ে পড়ল। আশ্রমের আঙিনায পা ফেললে মনটা আপনা থেকে খুশী হয। এখানে-ওখানে পবিচ্ছন্ন বাগান। গাছ-গাছড়া। মালি কাজ করছে, সঙ্গে দু-চাব জন সাধুও। অদূরেব হাসপাতালের দিকে সাধু আব লোকজনেব যাতাযাত বেশি। এই পবিবেশেব ভারী একটা আকর্ষণ আছে।

মা শঙ্কব চ্যাটার্জীব ঘব চেনেন। ওকে নিয়ে সোজা সেদিকে চললেন।

ভদ্রলোক দবজাব সামনে দাঁড়িযে ছিলেন। একমুখ হেসে এগিযে এসে সমাদবে ওদেব ঘবে নিযে এলেন। পবিচ্ছন্ন ঘব। দেযালে কোনো দেবদেবীব ছবি নেই। কাঠেব চৌকিব ওপব পাতলা শয্যা বিছানো। সামনে খান-দুই মোড়া।

মা রুচিরাকে বললেন, প্রণাম কব—

রুচিবা বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে গেল। ওই ঝকঝকে চোখে চোখ পড়তে ভদ্রলোক হেসেই বললেন, কেন ওকে ব্যস্ত করছেন মাসিমা—আপনি বরং আশ্রমটা একটু ঘুবে টুরে দেখে আসুন, অনেক দেখার আছে—আমি ততক্ষণ দিদির সঙ্গে একটু গল্প করি।—বোসো দিদি, তুমি বোসো—

'দিদি' শুনেই রুচিরার মনে হল মানুষটি যেন ওর মনের তলার কোনো সংশয়ের জবাব দিলেন। মা কিছু একটা আশা নিয়েই আশ্রম দেখার জন্য ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন।

রুচিরা তাকাল তাঁর দিকে। সেই ঝকঝকে চোখ। হাসছেন। কিন্তু আপনা থেকেই এখন সমস্ত সংকোচ ধুয়ে-মুছে যাচ্ছে রুচিরার। মানুষটির চোখে মুখে হাসিতে যেন জাদু আছে। অদ্ভুত ভাল লাগছে।

এগিয়ে এসে প্রথমে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল, তারপর মোড়ায় বসল।

চৌকিতে বসে শঙ্কর চ্যাটার্জী বললেন, তোমার মায়ের মুখে সব শুনলাম। বড় দুঃখের কথা। ভাল ভাবে এম. এ. পাস করেছ শুনলাম; কোনো মেয়ে-কলেজে কাজ-টাজ দেখে নাও না।

হঠাৎ একটু আগ্রহ নিয়েই রুচিরা বলল, আপনাদের এই সব জায়গায় আমরা কোনো কাজ-টাজ করতে পারি না?

হেসে বললেন, পার, কিন্তু তাতে অন্যের কাজ পণ্ড হবে।

—কেন? মেয়ে বলে?

শঙ্কর চ্যাটার্জী হাসিমুখে মাথা নাড়লেন। তাই।

এই সংস্রবে এটুকু সময়ের মধ্যে রুচিরা প্রায় মুখরা হয়ে উঠল কি করে জানে না। বলল, সাধুরা তাহলে কিরকম সাধু?

হাসছেন।—শরীর ধরলে কেউ সবটা সাধু নয়, আবার সবটা অসাধু নয়। যখন যার চাষ হয় সে বাড়ে। খাঁটি দুধও জলে ফেললে মিশে যায়, মাখন তুলে সেটা ফেললে জলে ভাসে। সাধুদের বেশির ভাগ মাখন হতে চাইছেন, হননি এখনো। হলে পরে ভয় থাকে না।

সহজ কথা। কিন্তু নিগূঢ় তাৎপর্য আছে। রুচিরা তবু ফস করেই জিজ্ঞাসা করে বসল, আপনার কোন অবস্থা?

জোরেই হেসে উঠলেন শঙ্কর চ্যাটার্জী। বললেন, তুমি বড় সাদা মনের ভাল মেয়ে দিদি, তোমার এরকম বরাত হবার কথা নয়। আমি একটা রক্ত-মাংসের মানুষের ঢেলার বেশি কিছু নয়।

—রক্ত-মাংসের মানুষ হলে কেউ মাকে ছেড়ে পালায়?

হাসতে লাগলেন। তারপর বললেন, ওটা একটা নেশা। নেশায় পেয়ে বসলে কে আর বাপ-মা মানছে?

এই মানুষ নিজের প্রসঙ্গে কিছু বলবেন না রুচিরা বুঝে নিল। কিন্তু সত্যি ভাল লাগছে তার, হালকা লাগছে। বলল, মায়ের খুব বিশ্বাস আপনি আমার জন্য কিছু করতে পারেন, কিছু দৈব অনুগ্রহও পাইয়ে দিতে পারেন।

হেসে মাথা নাড়লেন।—না, আমি সে রকম ম্যাজিক কিছু জানি না।

—না জানলে আমার বিয়ে সুখের হল না, গঙ্গার ঘাটে আমাকে দেখেই সে কথা বললেন কি করে?

এবারে অবাক একটু। তার পরেই আবার হাসি।—ও, এই জন্যে তোমরা একটা কিছু ভেবে বসে আছ? বছর তিন সাড়ে তিন আগে মাকে দেখতে যখন কলকাতায়

গেছলাম, এক রাস্তায় তোমার দাদা সঞ্জয়ের সঙ্গে হঠাৎ দেখা আমার। সে চেনেনি, আমি চিনেছি। তাকে খবর জিগেস করতে সে বলেছিল তোমাদের দু বোনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। তা আমার পোশাক-আশাক দেখে সেও আমাকে তোমার মতোই ভণ্ড-টণ্ড কিছু ভেবে সরে গেছল। তেমন পাত্তা দেয়নি।

মানুষটার সরলতা দেখে রুচিরা মুগ্ধ হল, আবার লজ্জাও পেল একটু। সরল না হলে বিয়ে সুখের হল না বলার কৃতিত্বটুকু নিজেই নিত। আর লজ্জা পেল কারণ, গঙ্গার ঘাটে প্রথম দেখে সত্যিই অস্বস্তি বোধ করেছিল। তবু জিজ্ঞাসা করল, দাদার মুখে বিয়ের খবর শুনতে পাবেন, কিন্তু সুখের হল না জানলেন কি করে?

—এটা জানা যে সহজ সে এখন তুমি নিজে ভাবলেই বুঝতে পারবে। যাক, তোমাকে আমার বড় ভাল লেগেছে দিদি, একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

রুচিরা আবার কেন একটু অস্বস্তি বোধ করছে জানে না। মাথা নাড়ল।

—তোমার মত মেয়েও একটা লোককে ধরে রাখতে পারল না, ফেরাতে পারল না, এটা ভাবতে আমার কষ্ট হচ্ছে। কেন পারলে না? চেষ্টা করেছিলে?

রুচিরার ভিতরটা হঠাৎই তেতে উঠল।—তাকে জানলে আপনি এ কথা বলতেন না।

শঙ্কর চাটার্জী চুপ করে রইলেন। কিন্তু মুখ দেখে মনে হল ঠিক অনুমোদন করতে পারলেন না যেন।

—আপনার বিশ্বাস হল না?

—না।

রুচিরা প্রায় তীক্ষ্ণস্বরে বলে উঠল, কেন? আপনি তার কতটুকু জানেন?

—একটুও জানি না। শান্তমুখেই বললেন, কিন্তু সামনা-সামনি কাউকে দেখলে আমি তার অনেকটা ভেতর দেখতে পাই। তাছাড়া তোমার মায়ের কাছেও অনেক কথা শুনেছি।...তুমি সোনার মেয়ে। সোনা গড়িয়ে গহনা করা যায়, আবার ডাণ্ডা বানিয়ে তা দিয়ে ঘা দিলেও আঘাত লাগে। আমি ভাবছি সে-রকম কোনো ভুল হয়ে গেল কিনা।

কথাগুলি সুন্দর, কিন্তু একটা দুর্বল জায়গায় আবার ঘা পড়ল রুচিরার। বলল, আপনি তাকে জানলে এ-কথা একবারও বলতেন না।

এখন আর হাসছেন না। ঝকঝকে চোখ দুটো ওর মুখের ওপর আটকে আছে। —বিয়ের আগে ইন্দ্রর সঙ্গে কতদিন মিশেছিলে?

নামটা মায়ের কাছে শুনে থাকবেন। জবাব দিল, এক বছর।

—এই এক বছরে তার মধ্যে যা দেখে তোমার ভাল লেগেছিল, যা দেখে তাকে তুমি ভালবেসেছিলে—সেটা মিথ্যে হতে পারে না। তোমার চোখে পড়া মনে ধরার মতো তার মধ্যে কিছু ছিলই—সেও মিথ্যে হতে পারে না, একটু আগে তোমাকে বলছিলাম, শরীর ধরলে কেউ সবটা ভাল নয়, আবার সবটা মন্দও নয়, যখন যেটা চাষ হয় সেটা বাড়ে। তুমি ভালটা দেখেছিলে, মন্দটা দেখনি। সেই মন্দের ছায়াটা দূর করতে হলে অহংকার আর অভিমান ছেড়ে তারই ভালর আলোটুকু সব থেকে

জোবালো কবে তুলতে হয। আমাব ভুল হতে পাবে, তোমাব অভিমানে ঘা পড়েছিল কিনা সে আমাব থেকে তুমিই ভাল জান। এব পবেও তুমি তাব মন্দটাই যদি একমাত্র সত্যি বলে ভাবো তাহলে তাব আবো দুর্ভাগ্য, তোমাবও আবো বেশি অশান্তি। কিন্তু ভাল স্বীকাব কবাব আব ভাল বড় কবে তোলাব এমনি জোব যে সেটা পাবলে এখনো তোমাব সব শেষ হযে গেল আমি ভাবি না। কোনো কিছুবই শেষ বলে কিছু নেই।

রুচিবা আব কিছু বলেনি। কিন্তু ভিতবটা বিষাক্ত লাগছিল তাব। অথচ এই লোকেব সঙ্গে তর্ক কবাবও কেন যেন আব সাহস নেই।

রুচিবা মাকে নিযে বেবিযে পড়েছিল জুন মাসেব মাঝামাঝি। এখানেও কংগ্রেস শাসন উৎখাত হযে বামজোটেব দল ক্ষমতায এসেছে। তখন সত্যিকাবেব আনন্দ হযেছিল তাব। দু'মাস বাদে অর্থাৎ আগস্টেব মাঝামাঝি কলকাতায ফিবল। সুস্থিব হযে দু'দিন না কাটতে দাদা-বৌদিব মুখে যে সুখববটা শুনল তাতে রুচিবাবও আনন্দে আটখানা হবাব কথা। ইন্দ্র ব্যানার্জীব সব দিক থেকেই ভবাডুবি হযেছে। তাব বাড়িঅলা কেসে জিতেছে, কোর্ট-থেকে বকেযা ভাড়া মিটিযে দেবাব হুকুম হযেছে। তাব ওপব বাড়ি ছাড়াব কেস ঝুলছে। এদিকে নতুন সবকাব তহবিল তছরুপেব অভিযোগে তাকে থানায টেনে নিয়ে গেছে। আগেব সবকাবেব আমলে চল্লিশ হাজাব টাকা সে তাব কেমিক্যাল কাবখানা সম্প্রসাবণেব জন্য পেযেছিল। বলা বাহুল্য, সেটা তখনকাব সমযেব ধবা-কবাব ব্যাপাব। কিন্তু এখন ধবা পড়েছে, সে টাকাব এক পযসাও সেই কাবখানায যাযনি, কাবখানাব বাকি অর্ধেকেব মালিক সেই টাকাপ্রাপ্তিব ব্যাপাব স্রেফ অস্বীকাব কবছে। এবং সেও পার্টনাবশিপ বাতিলেব ব্যবস্থা পাকা কবে এনেছে, কাবণ, সেখানেও ইন্দ্র ব্যানার্জীব নামে বহু টাকা ব্যক্তিগত ধাব হিসেবে লেখাপড়া কবা আছে। তাতে ইন্দ্র ব্যানার্জীব সইও আছে। অনেক তদবিব-তদাবক কবে সে এখন জামিনে খালাস আছে। কিন্তু সুদ-সহ ওই চল্লিশ হাজাব টাকা সবকাবকে বুঝিযে দিতে না পাবলে তাব জেল অনিবার্য। চল্লিশ হাজাব দূবে থাক, চল্লিশ টাকা বাব কবাবও তাব মুবোদ নেই এখন।

শুনে সকলে ছেড়ে মা পর্যন্ত খুশী। ধর্মেব কল বাতাসে নড়ে। খুশী রুচিবাও হতে চেষ্টা কবেছে। কিন্তু কোথায যেন একটা কাঁটা খচ-খচ কবে বিঁধছে। শঙ্কব চ্যাটার্জীব সেই হাসি-হাসি মুখ আব ঝকঝকে দুটো চোখ আব তাব কথাগুলো চেষ্টা কবেও মন থেকে তাড়াতে পাবে না। আগেও ওই মুখ ওই চোখ আব ওই সব কথা বাব বাব সামনে ভিড় কবে এসেছে। কিন্তু রুচিবা আব কিছু ভাবতে চায না, সে-সব মন থেকে ঠেলে সবিযেছে।

এখন আব তাও পাবছে না।...শঙ্কব চ্যাটার্জী বলেছিলেন, একটা বছবেব মেলামেশাব মধ্যে ওব চোখে পড়া মনে ধবাব মধ্যে কিছু ছিলই—সেটা মিথ্যে হতে পাবে না।...বলেছিলেন, তুমি সোনাব মেযে, সোনা গলিযে গয়না কবা যায, আবাব ডাণ্ডা বানিযে তা দিযে ঘা দিলেও আঘাত লাগে, আমি ভাবছি অভিমান-বশে সে-বকম কোনো ভুল হযে গেল কিনা।

...তিনি বলতে চেয়েছিলেন, সোনার স্পর্শ দিয়ে তার মন্দটা তুমি দূর করতে পারলে না কেন।

রুচিরা ভাবতে চায় না। কিন্তু ভাবনা আসছেই। আসছেই। তিনি বলেছিলেন, ভালটুকু স্বীকার করার আর ভালটুকু বড় করে তোলার এমনি জোর যে সেটা পারলে এখনো তোমার সবশেষ হয়ে গেল আমি ভাবি না।

...কিন্তু কি শেষ হয়ে গেল ভাবেন না তিনি? রুচিরার তাতে মনের প্রসারতা বাড়বে? আর কিছু না হোক শান্তি আসবে? ওই নির্মম দাম্ভিক লোকের মধ্যে ভাল দেখার মতো কি আছে? কি ছিল?

চকিতে এক অদেখা বিধবা মায়ের মুখ যেন চোখে ভেসে উঠল তার। ওর বান্ধবীর সে পিসিমা। যার ছেলেকে হত্যা করার জন্য গাড়িতে তুলে নিয়ে পালিয়েছিল। একটি লোক নিজের প্রাণের ভয়-ডর বিসর্জন দিয়ে বেপরোয়ার মতো সেই দুষ্কৃতকারীদের আড্ডায় হানা দিয়ে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে সেই বিধবা মায়ের ছেলেকে উদ্ধার করেছে ...জলপাইগুড়ির বন্যায় ত্রাণের সাহায্য করতে গিয়ে নিজের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে একটি অতি-বৃদ্ধ প্রাণকে জীবনের আলোয় ফিরিয়ে এনেছে। ..অসুখে বস্তির.এক গরিব বন্ধুর প্রাণের আশংকা দেখা দিতে ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসে বাবাকে প্রায় হুমকি দিয়েই ধরে নিয়ে গেছে চিকিৎসার জন্য। তারপর সেই অসুস্থ বন্ধুর মায়ের হাতে থোকে টাকা গুজে দিয়ে আসতে দেখে ফিরে এসে বাবা পর্যন্ত বলেছিলেন, লোকটার দরাজ অন্তঃকরণ সন্দেহ নেই...নিজের বাপের মৃত্যুতে ওই দাপটের লোককে বাচ্চা ছেলের মতো মাটিতে গড়াগড়ি করে কাদতে দেখেছে রুচিরা নিজের চোখে।

...শঙ্কর চ্যাটার্জী এ আপনি আমার কি করে দিলেন? এখন আমি কি করব?

দু'দিন পরে। গাড়ি করে দিদির বাড়িতেই যাচ্ছিল রুচিরা। ওই বাড়ির গেটের দিকে চোখ পড়তেই বুকের তলায় একটা অদ্ভুত মোচড় দিয়ে উঠল তার। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। পরনে আধময়লা পা-জামা, গায়ে আধময়লা গেঞ্জি। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি। বিবর্ণ মুখ।

রুচিরা দেখল।

সেও দেখছে। ক্রুর খরখরে চাউনি।

গাড়িটা গেট পেরিয়ে যেতেই রুচিরা ড্রাইভারকে বলল, থামো।

গাড়ি থামতে নেমে এল। কাছে এল।

ইন্দ্র ব্যানার্জী এ-রকমটা ভাবেনি। চেয়ে আছে। চোয়াল দুটো এঁটে বসছে।

রুচিরা শান্ত মুখে বলল, আমি দু'মাসের ওপর এখানে ছিলাম না। তোমার শরীর তো খুব খারাপ হয়ে গেছে দেখছি।

—তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

—না।

—বল কি? কেন?

—কারণ, আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম।

হঠাৎ যেন একটু আশাব আলো লাগল ইন্দ্র ব্যানার্জীব বিবর্ণ মুখে। তবু অবিশ্বাসভবে বলল, এখন? অনুকম্পাব দরুন গাড়ি থেকে নেমে এলে?

—না, এখনো তোমাব ভালই চাই।

—ভাল চাও? সত্যি তুমি ভাল চাও?

মুখেব দিকে পবিষ্কাব চেয়ে রুচিবা মাথা নাড়ল। চায়।

চোখে-মুখে আগ্রহ উপচে উঠল ইন্দ্র ব্যানার্জীব।—আমাব এখনকাব অবস্থা সব শুনেছ তুমি? জানো?

—জানি।

—তাহলে একটু ভিতবে আসবে? দুই-একটা কথা বলাব ছিল...শুনবে?

রুচিবা চুপচাপ চেয়ে বইল কয়েক নিমেষ। ওই ব্যাকুল মুখেব দিকে চেয়ে বুকেব তলায় আবাব মোচড় পড়ছে।

বলল, আমি শুনে কি কবতে পাবি জানি না। আমাব এখন যাওয়া সম্ভব নয়, তুমি ইচ্ছে কবলে আমাব ওখানে আসতে পাব। শুনব।

—কবে?

—কাল, পবশু—যেদিন তোমাব ইচ্ছে।

আবাব গিয়ে গাড়িতে বসল। দিদিব ওখানে যেতে আব ইচ্ছে কবল না। একটু ঘুবে-টুবে আবাব বাড়ি ফিবে এল।

সমস্ত বাত ঘুম হল না রুচিবাব। ভেবেছে। শুধু ভেবেছে।

...পবশু নয়, ওই লোক কালই আসবে জানে।

এল।

বাড়িব লোক, দাদা বউদি মা সকলেই বিবক্ত। ওকে দেখা কবতে নিষেধ কবল। রুচিবা বলল, আমি তাকে আসতে বলেছিলাম।

সকলে অবাক।

রুচিবা এল। ইন্দ্র ব্যানার্জী বসেছিল। উঠে দাঁড়াল।

—বসো।

ইন্দ্র ব্যানার্জী বলল, তুমি বসো।

রুচিবা বসল।—বল।

সোফাটা একটু কাছে টেনে ইন্দ্র ব্যানার্জী বলল, আমি সত্যি বিশ্বাস কবব আমাকে তুমি ভালবেসেছিলে?

—কি বলবে বল?

—সব মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজাব টাকা আমাব ভয়ানক দবকাব। না পেলে আমাব জেল হবেই। আমি জানি এ-টাকাটা তুমি ইচ্ছে কবলেই দিতে পাব। পাব না?

—পাবি।

—তুমি আমাকে এবাবেব মতো বাঁচাও রুচি, আমাব আব কোনো পথ খোলা নেই। তুমি অনেক বড়, সব ভুলে এবাবেব মতো আমাকে বক্ষা কব। তাবপব তুমি

কি বিচার করবে না করবে জানি না, কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি, আমি ভাল হতে চেষ্টা করব, সৎ হতে চেষ্টা করব।

আগ্রহের আতিশয্যে সে উঠে দাঁড়াল। রুচিরা চেয়ে আছে। দেখছে।

—চেষ্টা করবে? চেষ্টা?

—রুচি, আমি কি বলতে চাই তুমি বুঝেছ। প্লীজ।

—টাকা না দিলে তোমাব কত দিনেব জেল হবে?

ইন্দ্র ব্যানার্জী থমকাল।—কম কবে পাঁচ বছবের। কিন্তু টাকা তুমি দেবে না?

—না। অটল ঠাণ্ডা মুখ রুচিবাব।—তুমি যে পুরুষ ছিলে সেই পুরুষ কখনো দযা চায না। দযা দেখিযে কাউকে ফেবানো যায না। আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম না শুধু, এখনো ভালবাসি। পাঁচটা বছর প্রায়শ্চিত্ত কবে যদি এটুকু বুঝতে পার, তাহলে পাঁচটা বছরকে ভয না কবে জঞ্জালমুক্ত হযে এস। আমি যাকে ভালবাসি তার ভয সাজে না। আমাব কথায যদি বিশ্বাস কবতে পাব, তাবপব এস। টাকা পাবে, আমাকেও পাবে।

ইন্দ্র ব্যানার্জী আস্তে আস্তে সোজা হযে দাঁড়াল। নির্বাক হতভম্বেব মতো চেয়ে বইল খানিক। তাবপর ঝড়েব বেগেই ঘব থেকে বেবিযে গেল।

রুচিরা নিস্পন্দেব মতো বসে। স্থিব, শান্ত।

সুলক্ষণা

পাঠক ধবে নেবেন না একটা গল্প লেখাব তাগিদে বাইশ বছব বাদে শেষে হবিব দুযাবে এসে তাব সঙ্গে হঠাৎ এভাবে দেখা হযে গেল। হবিব দুযাব বলতে হবিদ্বাব। আব তাব সঙ্গে মানে সুলক্ষণা দযালেব সঙ্গে। খববটা আমাকে দিযেছিল ছেলেবেলাব বন্ধু জযন্ত বঙ্গ। নতুন বযসেব কালে কোনো বাজনীতিব দলে ভিড়েছিলাম। হালকা গোছেব ব্যাপাব সেটা। তবু উৎসাহ আব উদ্দীপনা কম ছিল না। জায়গাটা এলাহাবাদ। সর্ব ব্যাপাবেই বেশ নিবাপদ গোছেব পটভূমি। শাসক দলের সব কাজে প্রতিবাদেব ঝড় তুললেও গর্দান যাবাব ভয ছিল না। এমন কি হাজত বাসেব ঝুঁকিও যতটা সম্ভব এড়িযে চলতাম। বেকার জীবনেব স্বল্পমেয়াদী শৌখিন বাজনীতিব অধ্যায বললে যতটুকু বোঝায। যুক্তিব থেকে তর্কেব ঝোঁক বেশি ছিল। শোনাব থেকে শোনানোব।

জযন্ত বঙ্গ সেই সময়ের আব সেই দলের অন্তবঙ্গ একজন। পেশার ক্ষেত্রে এখনো সতীর্থই বলা চলে তাকে। ইউ. পি-র এক নামী কাগজেব হোমরাচোমবা সাংবাদিক। বছবে দু-একবাব কলকাতায় আসে। তখন দেখা হয। মন-খোলা গল্পও হয়। গেল মাসে এসেছিল। খবরেব কাগজের মানুষ। প্রথমেই জোরদাব খবব দেবাব মতো করে বলল, মাঝে দিন কযেকের জন্য হবদোযাব বেড়াতে গেছলাম, সেখানে হব কী পিয়ারীর ঘাটে হঠাৎ তোমাব সুলক্ষণাব সঙ্গে দেখা—

কার কথা বলছে বা কি বলছে ভেবে না পেয়ে আমি অবাক একটু।—আমাব সুলক্ষণা। সে আবাব কে?

চোখ পিটপিট করে জয়ন্ত বলল, ক্যা তাজ্জব কি বাত—এলাহাবাদেব সেই সুলক্ষণা দযাল—কৃষ্ণকুমারেব বোন—ভুলে গেলে? তোমার সেই ঝুমরি।

শোনাব সঙ্গে সঙ্গে আমার মগজেব মধ্যে একটা ওলটপালট কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। যার ফলে তখনো বোধ হয হাঁ করে চেযেই ছিলাম ওব দিকে। এবারে হালছাড়া গলায চোস্ত উর্দুতে জযন্ত বঙ্গ রসিকতা করে উঠল, কি বকম বসেব কাববাবী তুমি, যে মেযেব মন পাবাব জন্য আমাকে কাটতি দিযে গাযে আতব মেখে দু বেলা কৃষ্ণকুমাবের বাড়ি পলিটিক্স কপচাতে যেতে, আর হঠাৎ নিপাত্তা হযে যেতে যাব খোঁজে তামাম এলাহাবাদ চষে বেড়িযে শেষে আমাব গলা চেপে ধবলে—সেই পহেলী চিড়িয়াকে বেমালুম ভুলে মেবে দিলে।

ভুলিনি। বিস্মবণেব পলস্তবা পড়ে ছিল। শোনাব সঙ্গে সঙ্গে বাইশ বছবেব একটা ভাবী পর্দা চোখেব সামনে থেকে সবে গেছে। এক বাড়িব মেযে পুরুষ ছেলে বুড়ো সক্কলেব গাযেব চামড়া চোখে লাগাব মতো ধপধপে ফর্সা। সকলেব মধ্যে ব্যতিক্রম শুধু উনিশ-কুড়ি বছবেব একটি মেযে। যাব গাযের বঙ ফর্সা নয। তা বলে কালোও ঠিক নয। কিন্তু বাড়িব লোকেব পাশে কালোই দেখাতো। বাড়িব মানুষেবা তাব গাযের বং নিযে খুঁতখুঁত কবত। কিন্তু সেই মেযেব আয়তপক্ষ্ম নিবিড় কালো চোখেব তাবায আমি যে আলো ঠিকবোতে দেখেছি, আব তাব সুচারু দুই ঠোঁটেব ফাঁকে যে অধবা-হাসিব ঝিলিক দেখেছি, এই খুঁতখুঁতুনিব কথা শুনলে বাড়িব মানুষগুলোকে আমাব অন্ধ মনে হত। কৃষ্ণকুমাব অবশ্য বলত, ঝুমরিব গাযেব বং একটু চাপা হলেও অমন রূপ কটা মেযেব হয। এবা সব মিথ্যে ভাবে, ওব খুব ভালো বিযে হবে আমি বলে দিলাম।

ঝুমবি বা সুলক্ষণা কৃষ্ণকুমাবেব মামাতো বোন। এ-বাড়িব সমাদবেব আশ্রিতা। বছর দুই আগে কলেজে পড়াব নাম কবে বাপেব বাড়িব সংস্রব ছেড়ে এলাহাবাদে পিসিব কাছে চলে এসেছিল। কলেজে পড়ছিলও। কিন্তু পড়াশুনায তেমন মতি আছে আমাব মতো নীবব ভক্তও সে-কথা বলবে না। কৃষ্ণকুমাব বলত, ঝুমবিব মাথা খুব, একটু পড়লেই ভাল বেজাল্ট কবতে পাবে, কিন্তু পড়তে ডাকলেই ওব গাযে জ্বব আসে—

যেটুকু বলত তাব থেকেও বেশি বিশ্বাস কবতাম আমি। ঝুমরিব মাথা খুব, বুদ্ধি খুব। এত বুদ্ধি আব এত মাথা বলেই যেন ওব নিযম কবে কৃষ্ণকুমারের কাছে বই নিয়ে বসাব দাযটাকে বড় কর্তব্য ভাবতাম না। ওব নাম সুলক্ষণা। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবটুকুই যেন তাই। আবার সুলক্ষণাব ভিতবটা যদি নদীব মতো খবস্রোতা হয় তাহলে ওই পোশাকী নাম ছেড়ে ঝুমবি নামটাই যেন সব থেকে মানায় ভাল। আমার চোখে ও আড়াল হলে সুলক্ষণা, সামনে এলে ঝুমবি।

বাড়ির লোকেব অবিবেচনা-প্রসঙ্গে কৃষ্ণকুমাব ওব রূপেব কথা তুললে ঝুমবি মিটিমিটি হাসত আর আড়ে-আড়ে আমাকে লক্ষ্য কবত। আমার মুখ থেকে নীরব সমর্থন ভিন্ন কোনো বকম মন্তব্য আশা করত না। দু-একটা কটাক্ষেই বুঝে নিত ভিতবে ভিতরে কতগুণ বেশি সায় দিলাম। তারপর আবো বেশি মজা পেত যেন। চোখের

তাবায আব ঠোঁটেব ফাঁকেব হাসিব ছোঁযাটুকু আবো তীক্ষ্ণ মনে হত তখন। ফাঁক পেযে চাপা ঝাঁঝালো গলায ঝিলিক তুলে একদিন আমাকে বলেছিল, আমাব চেহাবা নিযে কৃষ্ণদাব তোমাব কাছে মাথা ব্যথা কেন—আমাকে ভেতো বাঙালীব কাছে গছাবাব মতলব নাকি।

জবাব হাতডে না পেযে হাসতে চেষ্টা কবেছিলাম। কিন্তু আমাব বুকেব তলায যে ঝড উঠেছিল সেও ওই মেযে ঠিকই আঁচ কবেছিল মনে হয।

কৃষ্ণকুমাবেব মনে মুখে লাগাম নেই। ঝুমবিব দুঃখেব খববও শুনিযেছে আমাদেব। আব একই প্রসঙ্গে নিজেব মামাবও রূঢ সমালোচনা কবেছে। মামাব শিক্ষা-দীক্ষা আছে, কিন্তু স্বভাব-চবিত্র ভাল নয। হৃদয বলেও কিছু নেই। মামীটা জ্বলে পুডে খাক হযে অকালে চোখ বুজেছে। বছব না ঘুবতে মামা একটা বাজে মেযেছেলেকে বিযে কবে ঘবে এনে তুলেছে। দুজনে মিলে মেযেটাকে নির্যাতন কবত। কিন্তু ঝুমবি মাযেব মতো মুখ বুজে সহ্য কবাব মেযে নয। স্কুলেব পবীক্ষা সাবা হতেই এক জামাকাপডে বাডি থেকে পালিযে এসেছে। এলাহাবাদ থেকে খবব যেতে মাবমুখী বাপ মেযেকে শাসন কবতে আব নিযে যেতে এসেছিল। সেই মামাকে কৃষ্ণকুমাব বলতে গেলে ঘাড ধাক্কা দিযেই তাডিযেছে। বাজনীতিতে কৃষ্ণকুমাব আমাব থেকে অন্তত ঢেব বেশি মাথা গলিযেছিল। টানা ছ'মাস জেলও খেটেছে একবাব। তাছাডা তখনো কাল বোগে ধবেনি তাকে। নীতিগত ব্যাপাবে সেই নবম-সবম মিষ্টি ছেলেটাব এক ধবনেব অনাপোস মেজাজ ছিল। গোঁ ছিল। ফলে আত্মীয পবিজনেবা বেশ সমীহ কবে চলত তাকে। মামা সেই যে প্রস্থান কবেছে আব কোনোদিন মেযেব খোঁজও নেযনি।

জযন্ত বঙ্গ খুব মিথ্যে ঠাট্টা কবেনি। সুলক্ষণাকে নিযে ওব সঙ্গে বেশ একটা বেষাবেষি ছিল আমাব। বলত, মনে ধবলেই বা ইউ পি-ব মেযেকে নিযে বাঙালীবাবুব কি আশা। সুলক্ষণাব সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দেখলে সামনে চোখ পিটপিট কবত, আডালে বিচ্ছিবি কবে হাসত। বাজনীতিব আলোচনায গলা চডালেই টিপ্পনী কাটত, ঝুমবি তো কাছেই বসে আছে, অত চেঁচিযে গলাব শিবা ফোলানোব কি দবকাব? ঝুমবিব অনুপস্থিতিতে চুপ মেবে গেলেও জযন্ত হুল ফোটাতে ছাডত না। বলত, মেঘ দেখলে তবে মযূব নাচে। শ্রীমতী কাছে না থাকলে বাঙালীবাবুব জিভ নডে না। কৃষ্ণকুমাবকে চুপিচুপি একবাব সতর্কও কবে দিতে চেষ্টা কবেছিল শুনেছি। ঝুমবিব ব্যাপাবে আমাব হাবভাব নাকি ভাল নয। কৃষ্ণকুমাব কানে তোলেনি। ঝুমবিকেই বলে দিযেছিল। সে-কথা শুনে ঝুমবিব কি বাগ। আমাকেই বলেছিল, ফাঁক পেলেই ও আমাকে কি জ্বালান জ্বালায তোমবা তাব খবব বাখো? কৃষ্ণদাকে বলি না বলে—

বললে খুশি হতাম। আমাব হাবভাব যা-ই হোক তাতে কোনোবকম নোংবামি ছিল না। তবু এ-কথা ঠিক, আচমকা অতবড একটা অঘটন ঘটে না গেলে ওই মেযেকে নিযে নিজেব বাডিব লোকেব সঙ্গে বড বকমেব কোনো বিদ্রোহেব সূচনা হত কিনা বলা যায না। ঝুমবিকে নিযে আমি সম্ভব অসম্ভব অনেক বকমেব কল্পনাব জালে জডিযে পডছিলাম।

কৃষ্ণকুমারের ভবিষ্যৎবাণী ঠিক হয়নি। ঝুমরির ভালো বিয়ে হওয়া দূরে থাক, এ-ভাবে যে ও নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে আনতে পারে কেউ কল্পনাও করেনি। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতোই বিমূঢ় হয়ে গেছলাম আমরা। ও বাড়ির লোকেরাও। এ আশ্রয় ছেড়ে, বিশেষ করে কৃষ্ণকুমারের মায়া ছেড়ে হঠাৎ এক রাতে ও নিখোঁজ হয়ে যেতে পারে—এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড কে ভাবতে পারে? কৃষ্ণকুমারের অবস্থা তখন ভাল নয়। কাল ব্যাধি। গলা দিয়ে প্রায়ই রক্ত ওঠে। ঝুমরির তার জন্য দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। কৃষ্ণকুমারের বাবা ছিলেন গোঁড়া কবিরাজ। নাম যশও ছিল। গোঁ ধরে ছেলের কবিরাজি চিকিৎসাই চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। তাঁর মতে আয়ুর্বেদের ওপর আর কোনো চিকিৎসা নেই। কৃষ্ণকুমারও তাই মেনে নিয়েছিল কিনা জানি না। নিজের চিকিৎসা নিয়ে বাপের ওপর কখনো কথা বলেনি। কিন্তু আমরা বলতাম। ঘর ছাড়ার দিন কতক আগেও ঝুমরি আমাদের ওপরেই ফুঁসে উঠেছিল, কৃষ্ণদাকে তোমরা এখান থেকে নিয়ে চলে যেতে পারো না? অন্য চিকিৎসা করাতে পারো না? কৃষ্ণদা মরতে চলেছে দেখেও বুঝতে পারছ না?

বুঝতে পেরেও আমরা কিছুই করিনি বা করতে পারিনি। কিন্তু ঝুমরি এ কি করল? তার কৃষ্ণদাকে পর্যন্ত এত বড় আঘাত দিয়ে চলে গেল! শোনার পরেও ও সত্যি কারো সঙ্গে স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়ে চলে গেছে এ কিছুতে বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলাম না। ক্ষেপে গিয়ে কৃষ্ণকুমারের বাবা বার বার বলেছে, রক্তের দোষ। রক্তের দোষ যাবে কোথায়! বাপ যেমন মেয়ে তেমন। কৃষ্ণকুমারের মা বেচারীর লজ্জায় আর অপমানে মাথা নীচু। রক্তের দোষ বললে তারও লাগার কথা। নিজের ভাইয়ের মেয়ে, রক্তের যোগ তার সঙ্গেও আছে। ঝুমরির খোঁজে আমার ছোটাছুটি আর হয়রানি দেখে কৃষ্ণকুমারও শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়েই বলেছে, কোথাও পাবে না, যেখানেই যাক ও নিজের ইচ্ছেতেই গেছে। শুনে আমি দমে গেছি, কিন্তু বিশ্বাস হয়নি। ঝুমরির মধ্যে কোনো মন্দের ছিটেফোঁটাও আছে ভাবতে পারতাম না। হাসি খুশি বুদ্ধিমতী মেয়েটা প্রয়োজনে তীক্ষ্ণ হতে পারে, কঠিন হতে পারে, সেটা বুঝতে পারতাম। বাপের কারণে হোক বা যে-কারণেই হোক ওর ভিতরটা যে খুব সুস্থির নয় তাও অনুভব করতে পারতাম। কিন্তু তা বলে ঝুমরির এমন মতি হবে, কৃষ্ণকুমার বললেও মন সেটা মেনে নিতে চায়নি। উল্টে বরং মনে হয়েছে বিপাকে পড়ে ঝুমরি হয়তো আমাকেই সব থেকে বেশি স্মরণ করছে। আমি আছি বলেই হয়ত তার উদ্ধারের প্রত্যাশা।

ফলে কৃষ্ণকুমার যা বলেছে সেটা আমাকে বিচলিত করলেও মনের সায় মেলেনি। সন্দেহটা প্রথমে যার ওপর ঘোরালো হয়ে উঠেছিল সে এই জয়ন্ত বস্ত। ও যে রসিকতা করল তা অবশ্য করিনি। গলায় হাত দিইনি। তবে তার দিক থেকে গলদ কিছু থাকলে গলা যে কাটা যাবেই হাবভাবে সেটা ওকে ভাল করেই বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। বড়লোকের ছেলে। চটুল মতি। মুখের কথা খসালে ঝুমরির জন্য অনেক খরচ করত। প্রায়ই সিনেমা দেখাতে চাইত, রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে চাইত। ঝুমরি ওকে একেবারে যে বাতিল করত তা নয়, কিন্তু আড়ালে বলত, পাজির পা-ঝাড়া একটা। কিন্তু আমি যদি কখনো

বলি, ওকে প্রশ্রয় দাও কেন—ঝুমরি ফোঁস করে উঠেছে, বেশ করি, তোমার গায়ে জ্বালা ধরে কেন?

ঝুমরির চোখের আগুন আব ঠোঁটেব হাসির এই বীতি। আর আমার চোখে এও তাব রূপ। ও নিখোঁজ হবাব পব জয়ন্তকে ধরে ঘুবিয়ে-ফিরিয়ে অনেক জেবা কবেছি। আর আড্ডা দেবার ছলে কম কবে পনের দিন কড়া নজরে বেখেছি ওকে। ওকে সঙ্গে করেই ঝুমবির খোঁজে এলাহাবাদ চষেছি।

জয়ন্ত রঙ্গকে বাতিল কবার পব আব একটা বাজে লোককেও সন্দেহ হয়েছিল আমাব। তাব নাম মধু যাদব। বিহাবেব লোক। জীবিকাব তাগিদে কেমন করে কৃষ্ণকুমারদেব বাড়ি এসে জুটেছিল জানা নেই। ঝুমবি আসাবও বছব দুই আগে থেকে ও-বাড়িতে ছিল সে। বযসে আমাদেব থেকে বছব তিনেক বড হতে পাবে। খাওযা থাকা ছাড়া কৃষ্ণকুমারেব বাবা সেই দিনে মাসে চল্লিশ টাকা মাইনে দিত ওকে। ফলে ঠিক চাকবেব পর্যাযে পড়ে না লোকটা। তবে বাড়িব লোক ফরমাশ কবলে মুখ বুজে চাকরের কাজও কবত। আব ঝুমবি বললে তো কথাই নেই। মুখেব কথা খসালে গন্ধমাদন বযে নিয়ে আসবে। আড়ালে আবডালে আমরা ঠাট্টা কবতাম সীতা দেবীব হনুমানেব মতোই সুলক্ষণাব ভক্ত হনুমান মধু যাদব। শুনে ঝুমরিও হাসত খুব। কখনো বলত, দাঁড়াও বলছি ওকে।

লোকটাব গায়েব জোব কখনো পরখ কবে দেখাব সুযোগ হযনি। তবে দেখলেই মনে হত অসুবেব শক্তি বাখে। ঝুমবি উসকে দিলে আমাদেব ধড থেকে মাথা ছিঁড়ে নেওযাও ওর পক্ষে অসম্ভব নয় হযতো। মিশকালো গাযেব রঙ। খুব লম্বা নয় আবার বেঁটেও নয়। এক মাথা ঝাঁকড়া চুল, ড্যাবডেবে দুটো চোখ। সে-চোখে পলক পড়তে দেখা যায না বড। মুখেব দিকে চেযে থাকলে অস্বস্তি হয। ওব মধু নাম একটা বিতিকিচ্ছিরি বসিকতা যেন।

ওব আসল কাজ কবিবাজিব মালমশলা সংগ্রহ কবা আব ওষুধ বানানোব ব্যাপাবে কৃষ্ণকুমাবেব বাবাকে সাহায্য কবা। বনবাদাড়ে ঘুবে ঘুবে ওষুধেব শিকড়-বাকড়, লতাপাতা, ফলমূল যোগাড় কবে আনে। কোন জিনিসগুলো মনিবেব বেশি দবকাব এ ক'বছবে ভালই বুঝে নিয়েছে। ওব অপলক ড্যাবডেবে চাউনিব কথা উঠলে কৃষ্ণকুমাব হেসে বলত, ওব চোখ আছে, বাবা একবার যা ওকে দেখিয়ে দেয সহজে ভোলে না। ঠিক চিনে নিযে আসে। কৃষ্ণকুমারেব বাবা শুধু বিচক্ষণ নয, টাকা-কড়িব ব্যাপাবেও বেশ একটু হাত-টান আছে। তা সত্ত্বেও ভদ্রলোক সেই দিনে খাওযা পবাব ওপবে মাসে চল্লিশ টাকা মাইনে কেন ওকে দেন সেটা আঁচ কবা যেত। বনে জঙ্গলে ঘুবে ঘুবে মধু যা সংগ্রহ কবে আনত সে-সব আর বাজার থেকে কিনতে হত না। ফলে অনেক সাশ্রয় হত। তাবপব সেসব বাছাবাছি করে ধুয়ে শুকিয়ে গুঁড়িযে পিষিয়ে কবিবাজ মশায়ের হাতেব কাছে এনে মজুত করা কম ধকলের ব্যাপার নয। কিন্তু মধু যাদব অনাযাসেই তা কবত। যেন কলেব মানুষ একটা যন্ত্রের মতোই খাটতে পাবে।

এ-হেন মানুষেব একটু রসজ্ঞানের পরিচয়ও আমরা পেতাম, আব নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি কবতাম। সুলক্ষণা বা ঝুমবিব গানের গলাটি ভাল ছিল। যেমন লোকই হোক,

গান-বাজনাব প্রতি ঝোঁক ছিল ওব বাবাব। মাস্টাব বেখে মেযেকেও একটু আধটু শেখাতে চেষ্টা কবেছিল। এখানে আসাব পব কৃষ্ণকুমাব সে-ব্যবস্থা বাতিল হতে দেযনি। সামান্য মাইনেয তাব খাতিবেব এক বুড়ো ওস্তাদেব বাড়ি গিযে ঝুমবি গান শিখত। মাঝে মাঝে ওস্তাদও বাড়িতে আসতেন। কৃষ্ণকুমাবেব বাবা ওই কটা টাকাই বাজে খবচ ভাবত। কিন্তু ছেলেব ব্যবস্থা নাকচ কবাব সাহস তাব ছিল না। এই গান শেখাব ব্যাপাবেও ঝুমবিব খুব যে একটা নিষ্ঠা ছিল তা নয। তবে ওব গলা মিষ্টি, আব গানেব ঢংটুকু আমাব চোখে অন্তত আবো মিষ্টি। মেজাজ এসে গেলে গান গাইতে গাইতে অল্প অল্প দুলত, কালো চোখেব গভীবেব হাসিব ছোযাটুকু তখন অদ্ভুত মাযাচ্ছন্ন মনে হত। ঝুমবিব গানেব সব থেকে সেবা আব নীবব ভক্ত ছিল বোধকবি মধু যাদব। বাইবেব অন্ধকাব দাওযায একখানা পাথবেব মূর্তিব মতো চুপচাপ বসে থাকত। যতক্ষণ গান চলত ওব নড়াচড়া নেই। সে-সময কেউ কোনো কাজেব ফবমাশ কবলে ও একদম কালা বনে যেত। নেহাত বাড়িব কর্তা বা কর্ত্রীব ডাক না পড়লে দাওযা থেকে ওকে নড়ানো যেত না। আগে শুনেছি, ঝুমবিব গানেব সময ও নাকি দবজাব সামনেই এসে ঠায দাঁড়িযে থাকত। ঝুমবি নিষেধ কবাব পব আব দাঁড়ায না। নিষেধ না কবে উপায কি, চোখেব ওপব ও-বকম সঙেব মতো দাঁড়িযে থাকলে ঝুমবিব হাসি পেযে যায।

ঝুমবি বাড়ি থেকে নিখোঁজ হবাব মাত্র তিন সপ্তাহ আগে এই মধু যাদবকে বাড়ি থেকে তাড়ানো হযেছিল। তাব আগে দস্তুবমতো থানা পুলিস কবা হযেছিল ওকে নিযে। চুবিব ব্যাপাব। ঝুমবিব হাব চুবি। সে-চুবি ঝুমবি বলতে গেলে স্বচক্ষেই দেখেছে। ওব মাযেব হাব। মাযেব স্মৃতি। ওটাব ওপব যে ঝুমবিব অত মাযা জানতাম না। আমাব ধাবণা মধুকে তলায তলায একটু স্নেহই কবত ও। কিন্তু হাব খোযা যাওযা আব প্রায হাতে-নাতে ধবা পড়াব পবেও মধুকে অস্বীকাব কবতে দেখে ঝুমবি বাগে ঠক ঠক কবে কাঁপছিল। দু চোখে আগুন ছুটেছিল। বাথকুম থেকে সবে স্নান সেবে বেবিযেছে। হাবটা খুলে তাকেব ওপব বেখেছিল। ওটা ফেলে এসে নিজেব ঘবেব আযনাব সামনে দাঁড়াতেই চোখে পড়েছে গলায হাব নেই। তক্ষুনি আবাব ফিবে আসতে দেখে বাথকুমে মধু কলেব নিচে বালতি বসিযেছে। মনিবেব স্নানেব জল বোদে দেবে। বাথকুমেব দোবগোড়া থেকেই ঝুমবি দেখে তাকেব ওপব হাবটা নেই। ধবেই নিল, হাব পড়ে আছে দেখে মধু তাকে দেবাব জন্যেই নিযেছে ওটা। হাত বাড়িযে বলেছে, দাও—

জবাবে মধু ড্যাব ড্যাব কবে মুখেব দিকে চেযে বইল শুধু।

বিবক্ত হযে ঝুমবি আবাব বলেছে, কি হল, হাবটা দাও?

এবাবে মধু নিজে থেকেই ঘুবে দেযালেব তাকটা দেখেছে। তাবপব তাব দিকে ফিবেছে। আবাব অপলক চাউনি, মুখে কোনো বকম ভাববিকাব নেই।

ঝুমবিকে সহিষ্ণু মেযে কেউ বলবে না। ঝাঁঝিযে উঠল, হাঁ কবে দেখছ কি চেযে, ওই তাক থেকে তুমি হাবটা তোলোনি?

মধু মাথা নেড়েছে। তোলেনি।

আব যায় কোথায়। ঝুমবির মাথায় বক্ত উঠে গেল। সে চেঁচিয়ে উঠল, চালাকি পেয়েছ ? এক মিনিট হয়নি আমি ঘরে গেছি আব এসেছি, এব মধ্যে তুমি ছাড়া আব এখানে কে ঢুকেছে ? হাবটা আকাশে উড়ে গেল ? ভাল চাও তো এক্ষুনি দিয়ে দাও।

মধু আবাব মাথা নাড়ল। সে নেয়নি, অথবা সে কিছু জানে না।

ক্ষিপ্ত হয়ে ঝুমরি পিসিব কাছে ছুটল। বাড়িতে এ-সময় ঝি-চাকব কেউ নেই। এব মধ্যে একমাত্র পিসী যদি বাথরুমে ঢুকে থাকে আর হাব তুলে থাকে। যদিও জানে তা হতে পাবে না, কাবণ পিসী তখন বান্নায় ব্যস্ত। মোটা শবীব নিয়ে তাব বান্নাঘব থেকে এ-পর্যন্ত আসতেই দু-চাব মিনিট লাগাব কথা।

যা ভেবেছিল তাই। পিসীও শুনে আকাশ থেকে পড়ল। বাগে কাঁপতে কাঁপতে ঝুমবি আবাব এদিকে ছুটে এলো। সেই সঙ্গে হাঁকডাক কবে আমাদেবও ডাকল। কিন্তু এটুকু সময়েব মধ্যেই বাথরুম ছেড়ে মধু হাওয়া। সব শুনে আমবা স্তম্ভিত। বাড়িতে আব কাক-পক্ষী নেই। এক মিনিটেব মধ্যে ফিবে গিয়ে ঝুমবি ওকেই দেখেছে বাথরুমে। হারেব খোঁজ নেবাব সঙ্গে সঙ্গে লোকটা তাকেব দিকেও তাকিয়েছে বোকাব মতো। অর্থাৎ যেখানে হাব ছিল সেখানে আপনা থেকেই চোখ গেছে। আব ধবা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে বালতি ফেলে ও নিখোঁজ। ও যে হাব নিয়েছে তাতে আব সন্দেহেব কি থাকতে পাবে ? কিন্তু আমবা আবো হতবাক এই কাবণে, মধু শেষ পর্যন্ত ঝুমবিব জিনিস চুবি কবতে পাবে। এব থেকে অবিশ্বাস্য আব যেন কিছু নেই। আব ঝুমবিবও হয়তো এত বাগ সেই কাবণেই। তলায় তলায় ওই লোকটাকে সে নিজের দাসানুদাস ভাবত। বাগে জ্বলে জ্বলে বাব বাব বলতে লাগল, এই চুবি একবকম স্বচক্ষেই দেখেছি আমি--যখন চাইলাম তখন হাব ওব কাছেই ছিল—বোকাব মতো মামীব কাছে ছুটে যেতেই হাব সবানোব জন্য ও চোখে ধুলো দিয়ে গেল।

বেশ একটা উত্তেজনাব হাওয়া থিতিয়ে উঠল বাড়িতে। কৃষ্ণকুমাবেব বাবাও সব শুনে স্তম্ভিত। কৃষ্ণকুমাবও নির্বাক। মোট কথা, মধু এ-বকম কাজ কবতে পাবে কাবো কল্পনাব মধ্যেও ছিল না।

বেশি খোঁজাখুঁজি কবতে হল না। আধ ঘণ্টাব মধ্যে ও মূর্তি নিজেই এসে হাজিব আবাব। তেমনি ড্যাবডেবে চাউনি, ভাবলেশশূন্য মুখ। এ-বকম বিশ্বাসঘাতকতাব ফলে বাড়িব কর্তা অর্থাৎ কৃষ্ণকুমাবেব বাবাবও অগ্নিমূর্তি। সে আসাব সঙ্গে সঙ্গে হুমকি দিয়ে উঠলো, হাব বাব কব।

মধু মাথা নাড়ল। নেয়নি বা জানে না।

কর্তা ঠাস কবে একটা চড় বসিয়ে দিল গালে।—নিসনি তো হার গেল কোথায় ? বাব কর শিগগিব।

কালো মুখে চড়ের লালচে দাগ পড়ে গেল। চুপচাপ কর্তাব মুখের দিকেই চেয়ে বইল সে।

কর্তা গর্জে উঠলো, এই আধঘণ্টা কোথায় ছিলি তুই ? কোথায় গেছলি ?

মধু জবাব দিল, দিদিমণি চোব বলাতে দুঃখ হল, তাই বাগানে বসেছিলুম।

এর মধ্যে আমরা ওর খোঁজে বাগানে ঘুরে এসেছি। এই মিথ্যেও হাতে-নাতে ধরা পড়ল। অব্যক্ত রাগে হাত আমাদেরও নিশপিশ করছিল। কিন্তু আমাদের চেঁচামেচির জবাবে ও যে-ভাবে তাকাচ্ছিল এত বড় অপরাধের পরেও কি জানি কেন গায়ে হাত তোলার সাহস আমাদের হল না।

কর্তাই আরো কটা চড়চাপড় বসালো, অনেক ভয় দেখালো, ভাল কথায় হার ফেরত দিতে বললো, কিন্তু মধুর কানে তুলো, পিঠে কুলো। শেষে পুলিসে খবর দেওয়া হল। তারা ওকে থানায় ধরে নিয়ে গিয়ে তিন দিন আটকে রেখে অনেক জেরা করল, মারের চোটে হাড় গুঁড়িয়ে দেবার উপক্রম করল, কিন্তু কবুল করাতে পারল না। ফলে ছেড়ে দিয়ে ওর ওপর চোখ রাখার মতলব ফাঁদল তারা। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। বাড়ির দাওয়ায় না এসে মধু সোজা বাগানে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। রাতে খেতেও এলো না। কেউ ডাকেওনি ওকে। পরদিন ভোরে ওর আর টিকি দেখল না কেউ। আবার পুলিসে খবর গেল। কিন্তু পুলিসও তার নাগাল পেল না।

মধু যাদবের অধ্যায় এখানেই শেষ। আর কখনো কেউ তাকে এলাহাবাদেই দেখেনি। মায়ের স্মৃতি ঝুমরির সেই হার খোয়া যেতে আমাদেরও একটু দুঃখ হয়েছিল বটে, কিন্তু ওই মূর্তি বিদেয় হবার ফলে এক ধরনের স্বস্তি বোধ করেছিলাম। লোকটা যেন জানত, অসুখের দরুন কৃষ্ণকুমারকে সঙ্গ দিতে আসা, বা রাজনীতি আলোচনার লোভে এ-বাড়িতে ছুটে-ছুটে আসার লোভটাই সব নয়, এ ছাড়াও আরো কিছু বাড়তি আকর্ষণ আছে। ভাবলেশশূন্য মুখে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থেকে ও যেন এটুকুই ভাল করে বুঝিয়ে দিত আমাদের। এমনও মনে হয়েছে, কখন না জানি টুঁটি টিপে ধরে সোজা যমের দোর দেখিয়ে দেয়।

এই লোক গেছে আপদ গেছে।

মধু যাদব বিদেয় হবার তিন সপ্তাহের মধ্যে সুলক্ষণা উধাও। আগের দিনও তাকে দেখেছি, কথা বলেছি। আমাদের মনে এতটুকু খটকা লাগার মতো কোনো কারণ ঘটেনি। ওর হাব-ভাব আচরণের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম চোখে পড়েনি আমাদের। কেবল শেষের দিন দশ-বারো কৃষ্ণকুমারের সেবাযত্ন বেশি করছিল। আর, একটা জলজ্যান্ত লোক বাপের চিকিৎসার দম্ভের চোটে কোন খেয়া পাড়ি দিতে চলেছে, অথচ আমরা চোখ কান বুজে বসে আছি—ইদানীং সেই ঝাঁঝের কথাও একটু বেশি শোনা যাচ্ছিল। এর কোনোটাই ও-মেয়ের ভিতরের কোনো মতলবের নজির নয়। তাই খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা হকচকিয়ে গেছি, দিশেহারা হয়েছি। কৃষ্ণকুমারেরও একই রকম অবস্থা প্রথম। তারপর হঠাৎ কি রকম যেন ঠাণ্ডা মেরে গেছে। বিবর্ণ পাংশু মুখ। তার পাশে বসেই তার বাবার তর্জন-গর্জন শুনেছি। স্ত্রীর মানসিক অবস্থা দেখে ভদ্রলোকের মেজাজ আরো বেশি তপ্ত। চিৎকার করে থেকে থেকে এক কথাই বলেছিলো।—কার জন্য এমন হা-হুতাশ করছ, কি জন্য খবর করতে বলছ? যে মেয়ে এ-ভাবে মুখে চুন-কালি দিয়ে চলে গেল, খুঁজে-পেতে তাকে ধরে এনে আবার ঘরে ঢোকাব? একেবারে মুখ বুজে বসে থাকো, কেউ জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে বাপের

বাড়ি চলে গেছে। গেছে কিনা তোমাব ভাইকে একটা চিঠি লিখে দেখতে পারো। যাক না যাক, এখানে আর জায়গা হবে না এও পষ্ট কবে জানিয়ে দিও।

এ-ঘরে বসে সবই শোনা যাচ্ছিল। বিমনাব মতো কৃষ্ণকুমাব আমার মুখের দিকেই চেয়েছিল। একটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল, ঝুমবি সেখানে যায়নি, যেতে পাবে না।

কৃষ্ণকুমারেব বিবেচনাব ওপব আমাব অটুট আস্থা। সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্ভাবনা আমিও বাতিল কবেছি। আর তিন দিনেব মধ্যে খববও এসেছে ঝুমবি সেখানে নেই। সেখানে যায়নি। কিন্তু কৃষ্ণকুমাবেব বাবাব কথাব মধ্যেও সতোব ছিটে-ফোঁটা আছে বলে ভাবিনি। নিজেব এত বড় সর্বনাশ ঝুমবি স্বেচ্ছায ঘটাতে পাবে না। বড বকমেব অঘটনই ঘটে গেছে কিছু। চবম কোনো বিপদে পড়ে ঝুমবি হয়তো নিঃশব্দে আর্তনাদ কবছে, হাহাকাব কবছে। ঝুমবিব চোখে যে-আগুন জ্বলে, নবক-যন্ত্রণাব মধ্যে পড়ে দিবা-বাত্র এখন হয়তো সেই আগুনই জ্বলছে। কৃষ্ণকুমাবেব বাবাব কথা শুনে উল্টে ভদ্রলোককে নির্মম নিষ্ঠুব মনে হয়েছে আমাব। চেনা-জানা মুখগুলো আঁতিপাতি কবে খুঁজেছি তারপব। কে হতে পাবে? ঝুমবিব এত বড সর্বনাশ কে কবতে পাবে?

জয়ন্ত বঙ্গ খুব একটা জোবালো লোক নয়। কিন্তু বাপেব টাকাব জোব আছে। ঝুমবিকে ঘিরে ওব বাসনাব আঁচও পেতাম। বাসনা বেপবোযা হয়ে উঠলে মানুষ অমানুষ হতে কতক্ষণ। তাছাড়া এ-পর্যন্ত তাব দেখা নেই কেন? এ-পর্যন্ত বলতে পবদিন এই সকাল পর্যন্ত। সব দিনেব মতোই ঝুমবি খেযেদেযে কলেজ গেছল। সেই কলেজ থেকে আব ফেবেনি। একটা বাত কেটে গেছে। পবদিন সকাল ন'টায কৃষ্ণকুমারেব কাছে এসে দেখি, নির্বাক বিবর্ণ মুখ। বাড়িব হাওয়া থমথমে। কিছু বোঝার আগেই কৃষ্ণকুমাব বিড়বিড় কবে বলেছে, ঝুমবি আমাদেব ছেড়ে চলে গেছে, কাল কলেজ থেকে আব বাড়ি ফেবেনি।

খবরটা এমন আকস্মিক যে আমাব বুঝতেই সময লেগেছিল। ফ্যাল ফ্যাল কবে ওব দিকেই চেযেছিলাম আমি। কৃষ্ণকুমাব আবাব বলল, কলেজে খোঁজ কবা হযেছিল, ঝুমরি কাল কলেজে মোটে যাযইনি।

আমি হতভম্ব। বুকেব তলায ঠক-ঠক কাঁপুনি ধবেছিল। ঠিক সেই সময় বাইরে থেকে ঘবে ফিবেছে কৃষ্ণকুমাবেব বাবা। গনগনে ধাবালো মুখ। ছেলেব মুখেব ওপর একটা বিবক্তিব ঝাপটা মেবে ভিতবে চলে গেছে। তাবপর ভিতব থেকে ওই তর্জন-গর্জন শোনা গেছে।

ঝুমবি বাপেব বাড়ি যাযনি, যেতে পাবে না, কৃষ্ণকুমাবের মুখে এ-কথা শোনাব পব আব বেশিক্ষণ ওর কাছে বসে থাকতে পাবিনি। জয়ন্ত বঙ্গব চপল মুখ বাব বার চোখেব সামনে এগিয়ে আসছিল। সাইকেল নিযে সোজা তাব বাড়ি ছুটেছি। ধমনীব বক্ত তখন টগবগ কবে ফুটছে। আমাব সবুজ পৃথিবী নিমেষে বর্ণশূন্য হযে গেছে। সেই রিক্ত আগুন-ঝরা পৃথিবীব এখন ভেঙে ফেটে চৌচির হবাব প্রতীক্ষা শুধু।

কিন্তু দিন-কযেক যেতেই বোঝা গেছে জয়ন্ত রঙ্গ নয। ওব সেই সাহস নেই, সেই মেরুদণ্ড নেই। তাবপবে আবো মনে হযেছে, জযন্তব মতো ছেলেকে ঝুমবি

অনায়াসে নিজেই টিট করতে পারে। ওর ওপর দখল নিতে পারে এমন মরদ এই ছেলে নয়।

জয়ন্ত বঙ্গকে বাতিল করার পরে চকিতে আর একটা সন্দেহ মনে এসেছে আমার। আর তক্ষুনি সেই সম্ভাবনাই অবধারিত মনে হয়েছে। এর ঢের আগেই ঝুমরির বাপের বাড়ি থেকেও খবর এসেছে সে সেখানেও যায়নি। তাহলে?

তাহলে মধু যাদব। একমাত্র সে ছাড়া কার আর এত বড় দুঃসাহস হতে পারে? হার চুরি দূরের কথা, আমার বদ্ধ ধারণা অনায়াসে ওই শয়তান মানুষও খুন করতে পারে। একটাও স্নায়ু কাঁপবে না, একটুও হাত কাঁপবে না। সে ভিন্ন বাড়ি ছাড়ার মাত্র তিন সপ্তাহের মধ্যে এত বড় অঘটন ঘটে কি করে? এই পৃথিবীতে ঝুমরির ওপরেই তো সব থেকে বেশি রাগ তার। ওর জন্যেই পুলিস তাকে তিন দিন থানায় আটকে বেদম মার মেরেছে। সে মারের এ-রকম প্রতিশোধ একমাত্র ওই লোকই নিতে পারে। তা ছাড়াও আমার স্থির বিশ্বাস ঝুমরিকে নিয়ে প্রথম থেকেই খারাপ মতলব ছিল ওর। ঝুমরি যদি সীতা দেবী হয়, ও তার হনুমান নয়। রাবণ। এ-কাজ ওর ছাড়া আর কারো নয়।

মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় আগুন জ্বলেছে। আবার অসহায়ও বোধ করেছি কেমন। ওই নৃশংস মানুষটার কবল থেকে ঝুমরির মুক্তির আশা দুরাশাই বুঝি।

...কিন্তু এ-সম্ভাবনার কথা কৃষ্ণকুমারের বাবা মায়ের মনে এলো না কেন? বিশেষ করে কৃষ্ণকুমারের মাথায় এলো না কেন? থানায় খবর দিয়ে মধুর নামে হুলিয়া বার করা হল না কেন? এখনো সময় আছে। কৃষ্ণকুমারের কাছে ছুটে এলাম আমি।

সন্দেহের কথা শুনে কৃষ্ণকুমার চুপচাপ মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। এতটুকু উত্তেজনার আভাস না পেয়ে উল্টে অবাক। একটু বাদে ও ক্লান্ত স্বরে জবাব দিল, তা নয়, ঝুমরি নিজের ইচ্ছেতে অন্য কারো সঙ্গে চলে গেছে।

অবিশ্বাসের সুরে আমি জোর দিয়ে বলে উঠলাম, তুমি কি করে জানলে? এ হতেই পারে না—আমি এক্ষুনি থানায় গিয়ে যা করার করে আসি।

কৃষ্ণকুমার আবার খানিক চুপ করে থেকে মাথা নাড়ল শুধু। অর্থাৎ আমাকে নিষেধ করল। তারপর আস্তে আস্তে যে কথাগুলো বলল, শুনে ভয়ানক দমে গেলাম আমি।...সেদিন সকালে কলেজ যাবার আগে পর্যন্ত ঝুমরি নাকি প্রায় সারাক্ষণ কৃষ্ণকুমারের কাছেই ছিল। এগারোটায় কলেজ, সকাল সাড়ে দশটা পর্যন্ত। তার সেবা-যত্ন করেছে, নিয়ম করে ওষুধ-পত্র খাওয়া আর সময়ে ঘুমনোর ব্যাপারে পাকা গিন্নীর মতো উপদেশ দিয়েছে। বেলা সাড়ে দশটার সময় উঠে গিয়ে সামান্য কিছু নাকে-মুখে গুঁজে কলেজ যাবার জন্য তৈরি হয়ে আবার ঘরে এসেছে। বলেছে, মাথাটা একটু তোলো দেখি—

কিছু না বুঝেই কৃষ্ণকুমার উঠে বসেছিল। বলা নেই কওয়া নেই ঝুমরি তার পায়ে মাথা ঠেকিয়ে একটা প্রণাম সেরে নিল। অবাক হয়ে কৃষ্ণকুমার জিজ্ঞাসা করেছে, কি ব্যাপার রে, পরীক্ষা-টরীক্ষা কিছু নাকি?

ঝুমরি হেসেই জবাব দিয়েছে, দারুণ পরীক্ষা, জীবন-মরণ নির্ভর একেবারে। হাসতে হাসতে চলে গেছে।

বেদনা-বিবর্ণ মুখে কৃষ্ণকুমার বলেছে ও আর ফিরবে না জেনেই প্রণাম করে গেছে আর ওই কথা বলে গেছে। তারপর কৃষ্ণকুমার ওর কলেজের দুজন পরিচিতা শিক্ষয়িত্রীকে ডেকে খবর নিয়েছে। পরীক্ষা-টরীক্ষা কিছুই ছিল না সেদিন। তাদের মুখ থেকেই শুনেছে, পাঁচ-সাতদিন আগে থেকেই মাঝে মাঝে ক্লাস পালানো শুরু করেছিল ঝুমরি। ওই শিক্ষয়িত্রীদের একজনের মেয়ে ঝুমরির সঙ্গে পড়ে। সে নাকি তার মাকে বলেছে, একটা মস্ত ঝকঝকে বিলিতি গাড়িতে একজনের পাশে বসে ঝুমরিকে এখানে-সেখানে যেতে দেখেছে। কলেজের অনেক মেয়েই দেখেছে।

আমার মুখে আর একটিও কথা সরেনি। কৃষ্ণকুমারকে আর কোনো সান্ত্বনার কথা বলতে পারিনি। নিজের বুকের তলায় যে কাটা ছেঁড়া চলেছিল তাও প্রকাশ করতে পারিনি। কৃষ্ণকুমারদের বাড়ি আসাই কমিয়ে দিয়েছিলাম এর পর। একটা মেয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেছে বলে নয়, কৃষ্ণকুমারের মুখখানা বড় বেশি অসহায় আর করুণ মনে হত। মেয়েটা যেন ওর জীবনের শেষ সলতেটা নিভিয়ে দিয়ে চলে গেছে।

বিতৃষ্ণা-ভরা একটা আক্রোশ নিয়েই সেই মেয়েকে আমি মন থেকে ছেঁটে দিচ্ছিলাম। কিন্তু মাঝেসাঝে চেনা-পরিচিত মুখের মারফত দু-একটা খবর কানে আসত। সুলক্ষণা দয়ালকে কখনো লক্ষ্ণৌর ওমুক অভিজাত হোটেলে দেখা গেছে, কখনো বেনারসে কখনো বা আলমোড়ায়। আমার মনে হত, ওই রসের খবর যারা দিচ্ছে তলায় তলায় তারা মুচকি মুচকি হাসছেও। আমাকে বিঁধতে চায়। কিন্তু আমি আর বিদ্ধ হতে রাজি নই। কে সুলক্ষণা দয়াল তাই যেন চট করে মনে পড়ত না আমার।

কিন্তু ঘর ছাড়ার ঠিক এক বছর দু' মাস বাদে এক বিজাতীয় আক্রোশে ওই সুলক্ষণা দয়ালকেই মনে মনে সব থেকে বেশি খুঁজেছিলাম আমি। কৃষ্ণকুমার মারা গেল। শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে ওর শূন্য দু' চোখ একবার ঘরের মধ্যে চক্কর খেয়ে কাউকে যেন খুজেছিল। এর পরেই যদি সুলক্ষণা দয়ালের দেখা পেতাম কোথাও, আর এ-খবরটা যদি সকলের আগে হেসে হেসে তার কানে তুলে দিতে পারতাম!

বাইশ বছর বাদে জয়ন্ত বক্সর মুখে আবার সেই সুলক্ষণা-প্রসঙ্গ।

এবারে গোড়ায় হঠাৎ ঠাওর করতে না পারাটা ভনিতা কিছু নয়। বাইশ বছরে গঙ্গায় অনেক জল বয়ে গেছে, বুকের তলার অনেক নরম জায়গায় শুকনো চড়া পড়ে গেছে। কিন্তু মানুষের একটা বয়েস চিরকালই বোধহয় নিজের অগোচরে কোনো এক জায়গায় আটকে থাকে। বিস্মৃতির পর্দাটা সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই আগের দিনের মতোই নাড়াচাড়া খেলাম একপ্রস্থ। ভিতরটা উন্মুখ হয়ে উঠল।

হেসে একটা চোখ একটু ছোট করে জয়ন্ত বলল, কত হবে বলো তো তোমার ঝুমরির বয়েস এখন? কম করে বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ না? কিন্তু এখনো বেশ মাইরি! আগের থেকে সামান্য মোটা হয়েছে, গায়ের রং এখন ফর্সাই বলতে পারো, এক-পিঠ খোলা চুল, ইচ্ছে করলে এখনো সেই আগের মতো হাসতে পারে—তাকাতেও পারে।

শ্লেষের সুরে জিজ্ঞাসা করলাম, হরিদ্বারে কি করছে—জপ-তপ আর প্রায়শ্চিত্ত?

—তাই তো বলল। আমি খোঁজ নিতে দিব্যি হেসে জবাব দিলে, সব খুইয়ে আমার মতো মেয়েরা শেষে কাশী মথুরা বৃন্দাবন বা হরিদ্বার ছাড়া আর কোথায় এসে ঠেকবে?

কিন্তু খুব একটা প্রায়শ্চিত্ত করছে বলে জয়ন্তর মনে হয়নি। রসিকতার মেজাজটি এখনো নাকি দিব্যি আছে।

...জয়ন্ত বঙ্গর সঙ্গে সুলক্ষণা দয়ালের দেখা হয়েছিল বিকেলের হর-কী-পিয়ারী ঘাটে। সকালের দিকে সেখানে পুণ্যার্থীদের চিঁড়ে-চ্যাপ্টা ভিড়, বিকেলের দিকে হাওয়া-বিলাসীদের। জয়ন্ত বঙ্গ চুপচাপ দাঁড়িয়ে গঙ্গার শোভা দেখছিল, ছেলে-ছোকরাদের শিকল-ধরে গঙ্গায় হুটোপুটি খাওয়া দেখছিল। কোত্থেকে একজন মহিলা পাশে এসে রাজ্যের বিস্ময় গলায় ঢেলে জিজ্ঞাসা করল, ও মা—বঙ্গ সাহেব না?

তাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ চিনেছে, কারণ চেহারায় শুধু বয়েসের প্রসন্ন ছোঁয়া লেগেছে একটু—কিছুই খোয়া যায়নি।

অনেক কাল বাদে অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে যেমন হয় তেমনি আনন্দ সুলক্ষণার। জয়ন্তকে ঘাট থেকে একটা নিরিবিলি দিকে টেনে নিয়ে গেছে। গঙ্গার ধারে দুজনে পাশাপাশি বসেছে। নিজের প্রসঙ্গে প্রায় কোনো কথাই বলেনি বা বলতে চায়নি। জয়ন্ত কিছু জিজ্ঞাসা করলে মুখ টিপে হেসেছে. আর শেষ বয়সে তাদের মতো মেয়েদের যে এ-সব জায়গাতে আশ্রয়—সেই কথাই বলেছে। কিন্তু সেই বলার মধ্যেও কোনো পরিতাপ ছিল না।

জয়ন্ত ঠাট্টা করেছে. শেষ বয়েস বলে তো একটুও মনে হচ্ছে না তোমাকে দেখে?

জবাবে হেসে ভ্রূকুটি করেছে সুলক্ষণা। বলেছে, এখনো তোমার চোখের দোষ। বোসো, নিজের এই চুলের বোঝা ছেঁটে ফেলব ভাবছি, তাহলে তোমাদের আর অসুবিধে হবে না।

নিজের কথা কিছু না বললেও বিশেষ করে আমার কথা নাকি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে সুলক্ষণা। কৃষ্ণকুমারের নামও মুখে আনেনি। এই থেকেই বোঝা গেছে সে-যে নেই সেটা ও জানে। জয়ন্ত বলল, তুমি লিখে নাম-টাম করেছ শুনে সুলক্ষণা যেমন অবাক তেমনি খুশি। তোমার বউয়ের কথা আর ছেলেপুলের কথা শুনতে চাইল—আমি আর কতটুকু জানি যে বলব।

আবার দেখা করার জন্য জয়ন্ত বঙ্গ তার হরিদ্বারের আস্তানার হদিস পেতে চেয়েছিল। ঘুরিয়ে সে-আবেদন নাকচ করেছে সুলক্ষণা। তরল জবাব দিয়েছে, ঠিকানা আর কোথায়, ঠিকানাই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি। যদি থাকো তো এই হর-কী-পিয়ারীর ঘাটেই দেখা হবে আবার।

আরো তিনদিন হরিদ্বারে ছিল জয়ন্ত বঙ্গ। তিনদিনই ঘাটে এসে ঘন্টা-দুঘন্টা করে অপেক্ষা করেছে। সুলক্ষণা দয়াল আর আসেনি। আর দেখা হয়নি।

জয়ন্ত বঙ্গ চলে যাবার পর এক মাস কেটে গেছে। স্বাভাবিক ভাবেই সুলক্ষণা দয়ালের কথা আবার ভুলেছি। এক মাস বাদে হঠাৎ দিল্লীতে একটু কাজ পড়ে গেল আমার। আর দু'দিনের মধ্যে সে-কাজও শেষ হয়ে গেল। আমার ফিরতি টিকিটের

তারিখে পৌঁছুতে মাঝে পাঁচটা দিন বাকি এখনো। এই পাঁচ-পাঁচটা দিন কি করব ভেবে পাচ্ছিলাম না। দিল্লী আমার কাছে প্রায় কলকাতার মতোই পুরনো।

রাতের নিরিবিলিতে হঠাৎ সুলক্ষণা দয়ালের কথা মনে পড়ে গেল। আবার দেখা হওয়াটা ভবিতব্য ছিল বলেই হয়তো মনে পড়ল। ছেলেবেলার মতো এখন আর সে-রকম ভাবপ্রবণ তাড়না কিছু থাকার কথা নয়—ছিলও না। তাছাড়া মনের যে আসন থেকে সেই মেয়ে সরে গিয়ে প্রবৃত্তির পাতালে ডুব দিয়েছে—তারপর সে হরিদ্বারেই থাকুক বা মথুরা বৃন্দাবন করে বেড়াক—সেই আসনে আর সে কোনোদিন ফিরে আসবে না জানি। তবু তাকে আর একটি বার দেখার জন্য ভিতরটা কেমন উন্মুখ হয়ে উঠল।

দিল্লী থেকে সকালে হরিদ্বারের লাক্সারি বাস ছাড়ে। ভিড়ের সময় নয়, বাসের টিকিট পেলাম। বাস ন'টায় ছাড়ে, আড়াইটে তিনটের মধ্যে হরিদ্বারে পৌঁছয়।

বাসে বসেও অনেক বার মনে হয়েছে নেমে যাই। ফিরে যাই। বাইশ বছর আগের সব স্মৃতি বুকের তলায় আজও যে তেমনি তাজা আছে কে জানত? কেন যাচ্ছি, কি জন্যে দেখতে যাচ্ছি? একদিন যেমন চেয়েছিলাম তেমনি করে কৃষ্ণকুমারের মৃত্যুর ছবিটা মর্মান্তিক করে তোলার অকরুণ লোভে? না, সেই মেজাজ এখন আর নেই। আবার মন বলছে রওনা হয়েছি যখন যাওয়াই যাক না। সুলক্ষণার সঙ্গে দেখা যে হবেই তার কি মানে। জয়ন্ত বঙ্গর সঙ্গে আর তো দেখা হয়নি। সে যে ইচ্ছে করেই ওকে নিজের বাড়ির হদিস দেয়নি বা আর এসে দেখাও করেনি, তাতেও আমার মনের তলায় বিস্ময়ের আঁচড় পড়েছে। প্রায়শ্চিত্তের তাগিদেই সে-যে হরিদ্বারে এসেছিল এই বা কে জোর দিয়ে বলতে পারে? প্রদীপের নিচেটাই তো অন্ধকার। পুণ্যস্থানে এ-যাবৎ পাপের মিছিলও আমি কম দেখিনি। দেখা হলে হবে, নয়তো দিন দুই একটু বেড়িয়ে আবার ফেরা যাবে।

কিন্তু এও জানি, এ-সবই আমার নিজেকে ভোলানোর চিন্তা। নিজের বিবেক একটু পরিষ্কার রাখার তাড়না। নইলে ভিতরে ভিতরে ওকে দেখার একটু ইচ্ছে যে ছিলই সেটা মিথ্যে নয়।

হরিদ্বার আমার মোটামুটি চেনা জায়গা। চেনা বলতে বেড়াবার জায়গাগুলো আর স্নানের ঘাট-টাটগুলো চিনি। কিন্তু বাড়ির হদিস বা ঠিকানা জানা না থাকলেও সেখান থেকে এক রমণীকে খুঁজে বার করতে পারব এমন ভরসা ছিলই না। একটা হোটেলে আস্তানা নিয়েছিলাম। তারপর সকালে বিকেলে ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা হর-কী-পিয়ারীর ঘাটে হাজিরা দিচ্ছিলাম। প্রথম বিকেলটা কাটল, পরের দুটো দিনের সকাল বিকেলও কাটল। হর-কী-পিয়ারীর ঘাটে দুবেলা আমার দুটো চোখ অভদ্রের মতো মেয়েদের দিকে ধাওয়া করেছে। দেখা মিলল না। আর মিলবেও না ধরেই নিয়েছিলাম। কালকের দিনটা দেখে আবার দিল্লী ফেরার সঙ্কল্প। আমার বাইরেটা মোটামুটি নির্লিপ্ত। সুলক্ষণার দেখা না পেয়ে খুব হতাশ হয়েছি, নিজের কাছে সেটা স্বীকার করতেও সংকোচ। জায়গাটা ভালো। দেখা হলে আরো ভালো হত। হল না যখন কি আর করা যাবে। দু'-বেলা ওই হর-কী-পিয়ারীর ঘাটও একটা দেখার জায়গা, বেড়ানোর জায়গা। দুপুরের রোদ চড়া না থাকলে এখানে তিন-চার মাইল হেঁটে বেড়ানোর মধ্যেও আনন্দ আছে।

দেখা হল। পরদিন নয়, এই বিকেলেই। ঘণ্টাখানেক ঘাটে পায়চারি করার পর নেমে সোজা একদিকে পা চালিয়ে দিয়েছিলাম। সেটা কোন দিক আমি জানি না। রাস্তাটা নির্জন। ফাঁকায় ফাঁকায় এক-একটা ডেরা। হঠাৎ এক জায়গায় এসে পা দুটো মাটির সঙ্গে যেন আটকে গেল।

যে জায়গার কথা বলছি, ঘাট থেকে কম করে মাইল তিনেক দূরে। এখানে সন্ধ্যা নামে দেরিতে। সবে তখন বিকেলের আলোয় টান ধরেছে। চারদিকে বাঁশের বেড়া দেওয়া ছোট একটা আঙিনা। তার এক প্রান্তে একটা টালির দালান। তার সামনের প্রাঙ্গণে ঘাসের ওপর বসে আছে পাঁচ-ছ'টি রমণী। নিজেদের মধ্যে গল্প করছে, কেউ কেউ হাসছে। ঠিক তাদের পিছনেই দাওয়ার ওপর যে বসে, তাকেই আমি খুঁজছি তার জন্যেই দিল্লী থেকে এখানে আসা।

বেড়ার বাইরে কোনো পুরুষ যদি দাড়িয়ে গিয়ে গুটিকতক মেয়েকে দেখতে থাকে, সেটা চোখে পড়তে সময় লাগে না বোধহয়। ঘাসের ওপর যারা বসেছিল, তাদের বয়েস অনুমান বাইশ চব্বিশ থেকে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে। আর এখান থেকে অন্তত সকলকেই বেশ সুশ্রী মনে হল আমার। তারাই প্রথম দেখেছে আমাকে। কারণ আমি যাকে দেখছি তার হাতে একখানা বই কি বাধানো খাতা বোঝা যাচ্ছিল না। তার দৃষ্টি সেদিকেই।

মেয়েগুলো নিজেদের মধ্যে হয়তো বলাবলি করল কিছু। আগেও হাসছিল আমাকে দেখার পরের হাসিটা ভিন্ন বিষয়গত কিনা জানি না। দুই-একটি বয়স্কার বেশ বিরক্ত মুখও দেখলাম। তাদেরই একজন মুখ ফিরিয়ে পিছনের দাওয়ায় বসা রমণীটিকে বলল হয়তো কিছু। কারণ বই বা খাতা থেকে তার দৃষ্টিটা এই বাশের ফটকের দিকে ঘুরল।

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না, মনে হল স্থির নিশ্চল কয়েক মুহূর্ত। তারপর উঠল। তারপর বেশ ধীরেসুস্থে এদিকে এগিয়ে আসতে লাগল।

আমি চেয়েই আছি। জয়ন্ত বঙ্গ খুব বাড়িয়ে বলেনি। সামান্য মোটার দিক ঘেষলেও শ্রী যেন আগের থেকেও বেড়েছে। এক পিঠ খোলা চুল। তেলের সঙ্গে যোগ কম বলেই হয়তো লালচে দেখাচ্ছে একটু। গায়ের রংও আগের থেকে ফর্সাই মনে হয়। পরনে চওড়া হলদে ছাপা পাড়ের পাতলা সাদা শাড়ি। গায়ে মুগো রঙের ব্লাউস। হাতে কিছু কাচের চুড়ি।

..সেই সুলক্ষণা দয়াল এখন তাহলে এই। আসতে আসতে একবারও আমার দিক থেকে চোখ ফেরায়নি সে। আমিও না। ঠোঁটের ফাকে সামান্য হাসি। চোখেও। আগের মতো তীক্ষ্ণ নয় আদৌ। উল্টে কৌতুকমাখা।

সামনে এলো। দেখল আর একবার। হাসল আবার একটু। দড়ি বাধা গেটটা খুলে দিয়ে ডাকল, এসো।

বাইশ বছর নয়, যেন কিছুদিন আগেই আমাকে দেখেছে সে। আজ আবার দেখল। এখন ভিতরে ডাকছে।

স্থান কাল ভুলে আমি ওর দিকেই চেয়ে আছি। ওকেই দেখছি। সবার আগে আমার মগজে যে চিন্তাটা ঘা দিয়েছে, নিজের অগোচরে এরই মধ্যে হয়তো তার

জবাবও খুঁজছি। বিগত বাইশটা বছরের মধ্যে এই মেয়ের কতগুলো বছর পুরুষের অশুচি বাসনার সহচরী হয়ে কেটেছে জানি না। এখনো যেমনটি দেখছি, পুরুষের চোখে না পড়ার মতো নয়— ডাক পড়ে কিনা জানি না। কিন্তু কোনো ব্যভিচারিণী মেয়ের চোখে মুখে হাসিতে এই প্রসন্নতা লেগে থাকে কি করে?

—কি হল, এসো? ওই মেয়েগুলো ভাবছে কি?

ভিতরে এলাম। তারপর পাশে পাশে টালি ঘরগুলোর দিকে এগোলাম। সুলক্ষণা হালকা হেসে বলল, তোমার সঙ্গে শীগগিরই একদিন দেখা হয়ে যাবে আমি ঠিক জানতাম।

—কি করে?

—বাঃ তোমার সঙ্গে জয়ন্তর দেখা হয়নি?

মাথা নাড়লাম।—হয়েছে, কলকাতায়।

—সে তোমাকে আমার কথা বলেনি?

—বলেছে। বলেছে, হর-কী-পিয়ারীর ঘাটে হঠাৎ সুলক্ষণার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। কে সুলক্ষণা আমি হঠাৎ বুঝতেই পারিনি।

ঘাড় ফিরিয়ে ভ্রূ-ভঙ্গি করে তাকালো মুখের দিকে।—বা-ব্বাঃ, তাহলে তুমি মস্ত একজনই হয়েছ বটে। তারপর কি করে বুঝলে?

—ও যখন বলল, ঝুমরির সঙ্গে দেখা হয়েছে।

ইচ্ছে করেই আমাদের চলার গতি শিথিল। আবার সেই হাসিমাখা ভ্রূ-ভঙ্গি। —ওই মেয়েদের সামনে তুমি আবার আমাকে ঝুমরি-টুমরি ডেকে বোসো না যেন। ওদের কাছে আমি সুলক্ষণাদিদি।

আমি ওর মুখের দিকে তাকালাম শুধু একবার। ও আবার ঘাড় ফিরিয়ে ফিক করে হেসে নিল একটু।—কি দেখলে? সুলক্ষণা ডাকার মতো কিছু চোখে পড়ছে না বুঝি?

মনে মনে বললাম, সবটাই সুলক্ষণা দেখছি—আর সেই জন্যেই অবাক লাগছে। মুখে বললাম, আমার সঙ্গে শীগগিরই দেখা হবে ভাবলে কি করে, জয়ন্তর মুখে তোমার কথা শুনে কলকাতা থেকে ছুটে আসব ধরে নিয়েছিলে?

মাথা নেড়ে সুলক্ষণা জবাব দিল অত ভাগ্যি ভাবিনি, তবে এদিকে এলে একবার খোঁজটোজ করবে আশা ছিল।

বললাম, তাই বা করব ভাবলে কি করে, জয়ন্তকে তো নিজের বাড়ির হদিস দাওনি। হর-কী-পিয়ারীর ঘাটে আবার দেখা হবে বলেও আর সেদিক মাড়াওনি। দেখা হতে পারে ভেবে আমিও ওই ঘাটে দু'দিন দু'বেলা করে হাজিরা দিয়েছি। কাল ফিরব, আজ হঠাৎ দেখা হয়ে গেল।

ঘাড় ফিরিয়ে দু' চোখ বড় বড় করে তাকালো সুলক্ষণা। সেই চোখে হাসি উপচে পড়ছে। মুখে বিড়ম্বনার ছোঁয়া।—কি কাণ্ড! আমারই পোড়া কপাল, ইস, দু-দুটো দিন এ-ভাবে পণ্ড হয়ে গেল।...জয়ন্তর কাছে শুনে সত্যিই কি কলকাতা থেকে চলে এসেছ নাকি?

—না, দিল্লী থেকে, দিল্লীতে কাজে এসেছিলাম। একটু শ্লেষেব লোভ সামলানো গেল না, বললাম, তা হঠাৎ জয়ন্তকে ওভাবে কাটতে দিলে কেন—লজ্জায় না ভয়ে?

হাসতে লাগল। ওই মেয়েদেব কাছে পৌঁছনোব আগে একটু সময় নেবাব জন্যেই হয়তো সামনেব বাগান ঘুবে চলেছে। যেখানে ফুল বেশি ফুটে আছে, সেখানে দাঁড়াচ্ছেও দুই-এক মিনিট কবে। হাসিমুখে সাদা-সাপটা জবাবও দিল। বলল, কাটান দিলাম, কাবণ জয়ন্ত এখনো সেই আগেব জয়ন্তই আছে মনে হল, আব আমি কেমন মেয়ে জানে বলেই কথাব ফাঁকে ফাঁকে আমাব মুখ থেকে পা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে নিতেও ছাড়েনি—আব. বাড়িব সন্ধান পেলে ওব হয়তো দুই-এক বাত আমাব কাছে কাটিয়ে যেতেও আপত্তি হত না।

শোনাব সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণায় ভিতবটা বি-বি কবে উঠল আমাব। এই কথাগুলো এমন অনায়াস কৌতুকে বলতে পাবল বলেই বাগ। দাঁড়িয়ে গেলাম। বললাম, দেখা তো হল, আজ চলি তাহলে?

দাঁড়িয়ে গিয়ে থমকে তাকালো আমাব দিকে। তাবপব তেমনি পলকা বসিকতাব সুবেই পাল্টা জবাব দিল, যাবে যাও—অত ভয় দেখাচ্ছ কি? তাবপবেই হেসে বলল. তোমাকে জয়ন্ত ভাবছি না. এসো—

এব পবেও আঘাত দেবাব ইচ্ছেটাই প্রবল আমাব। বললাম, জয়ন্ত হলে বা জয়ন্ত ভাবলেই বা তোমাব এমন কি সাংঘাতিক ক্ষতি আব আপত্তি?

আবাবও দাঁড়িয়ে গেল। কয়েক পলকেব জন্য সমস্ত মুখ লাল একটু। আমাব মনে হল কালো চোখেব তাবায় সেই আগেব মতো আবাব এক ঝলক বিদ্যুতও ঝলসে উঠতে পাবে। না, তা উঠল না, একটু দেখেই নিল শুধু। তাবপব মুখ টিপে হেসে বলল, এই বাইশ বছব বাদেও তোমাব ভয়ানক বাগ দেখছি আমাব ওপব। কেন গো?

এবাবে নিজেবই কানেব কাছটা গবম ঠেকছে। সুলক্ষণা বলল, চলে এসো, ওই মেয়েগুলো কি ভাবছে ঠিক নেই—

তাব সঙ্গ ধবে আবাবও শ্লেষ মাখানো জবাব দিলাম, তোমাব পুবনো কোনো প্রীতিব পাত্র ভাবছে হয়তো।

হেসে ফেলল। মাথা দুলিয়ে জবাব দিল, তাহলে তো ঠিকই ভাবছে।

জিজ্ঞাসা কবলাম, ওই মেয়েবা কাবা?

—আমাব কাছেই থাকে, আব আমাকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা কবে। বড ভালো মেয়েগুলো। কিন্তু ওদেব এক-একজনেব কথা শুনলে তুমি হয়তো এখান থেকে বেবিয়ে গিয়ে সোজা কলকাতাব গাড়িতে চেপে বসবে।

যা বোঝাব এটুকু থেকেই বোঝা গেল।

আমবা সামনে আসতে মেয়েগুলো উঠে দাঁড়াল। তাদেব ভক্তি-শ্রদ্ধাব পাত্রটি অমন হাসিমুখে এতক্ষণ ধবে কাব সঙ্গে আঙিনা পাড়ি দিল, তলায় তলায় হয়তো সেই কৌতূহলও আছে।

সুলক্ষণা বলল, এই মেয়েরা, কাকে দেখে তোবা হাসাহাসি কবছিলি। কলকাতাব একজন নামকবা লেখক। বামুন মানুষ, প্রণাম কব।

আমার অস্বস্তির একশেষ। ওবা একে একে পা ছুঁযে প্রণাম সারল। আমাব দিকে চেযে সুলক্ষণা হেসে জিজ্ঞাসা কবল, আমিও ঠুকব নাকি একটা?

গম্ভীব মুখে আমি আঙুল দিযে নিজেব পা দেখিযে দিলাম। ও ছদ্ম কোপে ফোঁস কবে উঠল, উঃ! বয়ে গেছে—

আগন্তুক দেখে ভিতব থেকে আবো তিন-চারটি মেযে এসে দাঁডিযেছে। খুব না হোক, এবাও মোটামুটি সুশ্রী। আব বযেস বাইশ থেকে ছাব্বিশেব মধ্যে। আমি বাঙালী লেখক পবিচয পেলেও আমাব সঙ্গে তাদেব সুলক্ষণাদিদিটিব সম্পর্ক কি এবা জানে না। আব সুলক্ষণাবও আব বেশি পবিচয দেবাব উৎসাহ দেখা গেল না। সকলেব উদ্দেশেই সে বলল, চা কব, তোবাও খা আমাদেবও দে—এঁব জন্যে একটু খাবাব-টাবাবও কবিস। আমাদেব আজ বাইবে কোনো প্রোগ্রাম নেই তো?

ওবা মাথা নাডল। নেই।

—বাঁচা গেল। আমি এঁকে নিয়ে একটু ঘবে বসছি, সময হলেই ডাকিস—

কিসেব সময হলে কেন ডাকবে বোঝা গেল না। দিনেব আলো এখন শেষ প্রায। টালির ঘবগুলোতে আলো জ্বালা হযেছে। একটি পবিচাবিকা ঘবে ঘবে লণ্ঠন বেখে যাচ্ছে দেখলাম।

আমাকে নিযে সুলক্ষণা দাওযাব সামনেব ঘবটাতেই ঢুকে পডল। পাশাপাশি একই সাইজেব চাবটে ঘব। তারপব শেষেব দিকে আব একটা বড হলঘবেব মতো। টালিব ছাদ হলেও ঘবেব মেঝে সিমেন্টেব, আব ইট-সুবকিব দেযাল। পবিষ্কাব তকতকে ঘব। দেযালে ঝোলানো ক্যালেণ্ডাবে গোপালেব মূর্তি। কোণেব দিকে একটা নেযাবেব খাটিযা পাতা। তাতে পবিচ্ছন্ন সাদাসিধে শয্যা বিছানো। আলনায খান-দুই শাডি আব জামা ঝুলছে। এদিকের দেয়ালে একটা আযনা টাঙানো।

কোথাও এতটুকু আতিশয্য নেই। এ-বকম একটা ঘবে এসে দাঁডালে ভিতবটা আপনা থেকে খুশী হয।

সুলক্ষণা জানালো, এটা তাব ঘব। এতগুলো মেযেব মধ্যে শুধু তাবই একলাব একখানা ঘব। অন্য ঘবগুলোব এক-একটায তিন-চাবটে কবে মেযে থাকে।

বসিকতা কবে বললাম, প্রমীলাবাজ্যে এসে গেলাম মনে হচ্ছে।

হেসে মাথা নেডে সুলক্ষণা সায দিল। বলল, সমস্ত বাডিতে পুরুষও একজন আছেন—তিনি গোপাল। আব দ্বিতীয পুরুষ তুমি এলে।

বললাম, গোপালেব তাতে হিংসে হবে না?

—একটু হলেই বা, সেও তো খুব সুবিধেব পুরুষ নয। হাসিমুখে একটা আসন টেনে নিয়েও থমকালো একটু, তাবপব হেসে আসনটা আবাব যথাস্থানে বাখতে বাখতে বলল, যাকগে, তুমি ওই বিছানাতেই বসো—গোপালের আব একটু বেশি হিংসে হোক!

আমিও ঠাট্টা করলাম, ঠাকুব দেবতাব হিংসে কুডিযে কাজ কি।

—আচ্ছা তুমি বসো তো, ঠাকুব দেবতা আমি মেযেটা কেমন ভালো করেই চেনে।

শয্যাব এক ধাবে বসলাম। একটা ভাঁজ কবা কম্বলেব ওপব চাদব বিছানো। নিজেকে নিযে ও অনায়াসে যে ইঙ্গিত কবল, সেটুকুব জন্যেই আমাব বাইশ বছবেব ক্রোধ আব পবিতাপ। অথচ আশ্চর্য, সব জানা থাকা সত্ত্বেও সুলক্ষণাব দিকে চেযে আমাব বাব বাব মনে হচ্ছিল, একটা শুচিতা যেন ওকে ঘিবে আছে।

ও সামনে এসে দাডাল। চাউনিটা গভীব একটু।

—কি দেখছ ?

—তোমাকে। সেই বাইশ বছব আগেব মতোই কাঁচা কাঁচা লাগছে। বিযে কবেছ শুনেছি—বউ কেমন ?

হেসে জবাব দিলাম, বিযে তো সেই কোন যুগে কবেছি—এখন আব কেমন-এব কি আছে ?

চোখ পাকালো।—তাব মানে বউ পুবনো হযে গেছে ? হাসলও সঙ্গে সঙ্গে। —ছেলে মেযে পডছে ?

মাথা নাডলাম।

ও ছেলেমানুষেব মতোই বলে উঠল, আমাব ছুটে গিযে দেখে আসতে ইচ্ছে কবছে।

—চলো না।

—ইস, কি পবিচয দেবে ?

—বলব, তোদেব অদেখা অনেককাল আগেব এক হাবানো মাসি।

হেসে উঠে লঘু সুবে সুলক্ষণা বলল, কেন পিসী বলবে না ?

বাইশ বছবেব সঠিক ইতিবৃত্ত কিছুই জানি না। কিন্তু এটুকু সমযেব মধ্যেই আমাব ভালো লাগছে, হালকা লাগছে। মাথা নাডলাম, নাঃ, অতটা নীবস হতে পাবব না।

সুলক্ষণা হাসছে। চেযে আছে। বললাম, বসো—

তেমনি চেযে থেকেই বসিকতা কবল, এক্ষুনি চা দিতে আসবে, তুমি ওখানে বসে আছ দেখেই অবাক হবে, পাশে আমাকে দেখলে তো কথাই নেই। সামনে দাডিযেই ভালো লাগছে। জযন্ত বলছিল, অনেক নাকি বই-টই লিখেছ ?

—লিখেছি।

—কি বই ?

—গল্প, উপন্যাস।

টিপ্পনীব সুবে একটু বিস্ময প্রকাশ কবল সুলক্ষণা, তোমাব মধ্যে এত বস আছে জানতাম না।.. দু-একখানা পাঠাও না, এককালে তো আমাকে বাংলা শেখানোব কি ঝোঁক ছিল তোমাব—ঠেকে ঠেকে ঠিক পডে নিতে পাবব।

—হিন্দী অনুবাদও আছে, তাই পাঠাব, ঠেকে ঠেকে পডতে হবে না।

সুলক্ষণা ছেলেমানুষেব মতোই খুশী হযে উঠল। মুখে বলল, তুমি এখান থেকে বেবিযেই ভুলে যাবে। বাইশ বছবেব মধ্যে একদিনও আমাব কথা মনে পডেছে ?

—তোমাব পডেছে ?

—আমাব ! হুঃ। তাহলে তো খুব উপন্যাস লেখো তুমি ! কি মনে হতেই আবাব হাসি—আমাব গল্প লিখবে না ?

বললাম, তুমি সদয় হলেই লিখতে পারি।

ছদ্ম ভয়ে দু চোখ বড় করে ফেলল একটু, সদয় হলে মানে? কি করতে হবে?

—মাঝের বাইশটা বছরের ফাঁরাক জুড়তে হবে, অর্থাৎ বাইশ বছরের খবর সব বলতে হবে।

সুলক্ষণা বলল, না শুনেই তো ঘেন্নায় চলে যেতে চাইছিলে, শুনলে তো এ নাম আর মুখেও আনবে না—কলম ধরা তো দূরের কথা।

সেই বিরূপ অনুভূতিটা এরই মধ্যে নিঃশেষে মিলিয়ে গেল কি করে ভেবে পাচ্ছিলাম না। এখন থেকে থেকে কেন যেন কেবলই মনে হচ্ছে শোনার মতো অনেক কথা আছে, আর শুনলে পর কলমও ধরা যাবে। গম্ভীর বক্তৃতার সুরে বললাম, লেখক হিসেবে আমি ভালো-মন্দ সুন্দর-কুৎসিত সব দেখি আর শুনি, শেষে তাই থেকেই জীবন-সোনা ঝালিয়ে তুলি।

সুলক্ষণা তেমনি চোখ বড় বড় করে আমাকে দেখতে লাগল। তারপর বলল, ও বাবা। থাক, এটুকু শুনেই আমি ঘাবড়ে যাচ্ছি।

চায়ের ট্রে হাতে একটি মেয়ে ঘরে ঢুকল। দু পেয়ালা চা, একটা ডিশে কিছু ঘরের তৈরি খাবার। একটা কাগজ পেতে দিয়ে সেই ট্রেও শয্যার ওপরেই রাখতে বলল সুলক্ষণা। এটুকুও ব্যতিক্রম মনে হল আমার। কারণ, মেয়েটির মুখে বিস্ময় মাখা সম্ভ্রম দেখলাম।

মেয়েটি চলে যেতে সুলক্ষণা ট্রে থেকে নিজের পেয়ালাটা শুধু তুলে নিল। বললাম, আর কিছু নেবে না?

—নাঃ, তোমার খাতিরে চা খাচ্ছি, নইলে এ-সময় কিছুই চলে না। তুমি খাও—

একটু বাদে হালকা সুরে জিজ্ঞাসা করল, জয়ন্ত আমার কথা আর কি বলেছে তোমাকে?

—বলেছে, বয়েস হলেও এখনো বেশ মাইরি, চোখ ফেরানো যায় না।

হাসতে গিয়ে চা আটকে বিষম খেল সুলক্ষণা। তারপর আধা-খাওয়া পেয়ালা ঘরের কোণে সরিয়ে রাখতে রাখতে হেসেই রাগ দেখালো, বরাবর ওটা 'পাজির পা-ঝাড়া একটা—

আমি নরম প্রতিবাদ করলাম, কেন, খুব মিথ্যে তো বলেনি।

হ্যাঁ, চাইলে ওর চোখে বাইশ বছর আগের সেই হাসি এখনো ঝিলিক দিয়ে উঠতে পারে বটে। মুখে তরল ঝাঁঝালো সুরে বলল, দেখো, তুমি ওর সঙ্গে গলা মিলিও না বলছি।

খেতে খেতে নিরীহ প্রশ্ন ছুঁড়লাম, মেলালে ওর মতোই গলাধাক্কা দেবে?

—ও মা, ওকে গলাধাক্কা কখন দিলাম!

—বাড়ির হদিস দিলে না, আসবে বলে এলেও না—গলাধাক্কা আর কাকে বলে?

ও হাসতে লাগল। তারপর বলল, নাঃ, তোমার সঙ্গে ওর মতো ব্যবহার করব না, হাজার হোক দুর্বলতা একদা ছিলই—

—কার ছিল, তোমার না আমার?

—তুমি বড জেবা কবো। প্রসঙ্গ ঘুবিযে জিজ্ঞাসা কবল, এখানে কোথায উঠেছ?

বললাম। একটু ভেবে নিযে সুলক্ষণা বলল, লোভ হলেও এখানে তোমাকে থাকতে বলতে পাবছি না, জানলে কত জনেব চোখ টাটাবে ঠিক নেই। তাব থেকে দুপুবে আব বাতে এখানে এসে খাবে—বেশি দূব নয, টাঙায মিনিট দশেক লাগে।

—আমি তো কালই দিল্লী চলে যাচ্ছি।

যেন আমাব ওপব এখনো জোব আছে, এমনি কবে সুলক্ষণা বলল, কাল তুমি মোটেই যাচ্ছ না।

আপত্তি নেই খুব, কাবণ সুলক্ষণাব জীবনেব মাঝেব এই বাইশটা বছব নিযে এখন দুর্বাব কৌতূহল আমাব। এতগুলো মেযেব মধ্যে ওকে ঠিক এই পবিবেশে না দেখলে এত আগ্রহ হত না হযতো।

একটু বাদেই ওদিক থেকে শাঁখেব আওযাজ কানে এলো। একটি মেযে সাঁঝেব ধূপধুনো দিযে গেল। তাবপবেই খোলকবতালেব আওযাজ শুনলাম। সুলক্ষণা আমাকে নিযে ঘব থেকে বেরুলো। শেষেব বড ঘবটায এসে ঢুকলাম ওব সঙ্গে। সেখানে এ-মাথা ও-মাথা শতবঞ্জীব ওপব ফবাস পাতা। সেই ফবাসে এখন তিবিশ-চল্লিশটি মেযেছেলে বসে। বেশিব ভাগই বযস্কা আব বিধবা। ঘবেব এক মাথায মালা গলায বেশ বডসড গোপাল মূর্তি। তাব সামনে হাবমোনিযাম, তবলা, খোল কবতাল। সেখানে এখানকাব অর্থাৎ এই ডেবাব মেযেবা বসে। তাদেব সামনে বেশ সুন্দব একটা আসন পাতা।

আমাকে সামনেব দিকে বসিযে সুলক্ষণা এগিযে গিযে মাটিতে মাথা ঠেকিযে গোপাল প্রণাম কবল। কম কবে তিন-চাব মিনিট মাথা ঠেকিযে পডে বইল সে। তাবপব উঠে আস্তে আস্তে সেই খালি আসনটায গিযে বসল।

গান শুরু হল। একটানা ভজন গান। মূল গাযিকা সুলক্ষণা। অন্য মেযেবাও থেকে থেকে সুব মেলাচ্ছে, সুলক্ষণা থামলে তাবা সেই বিবতিটুকু ভবাট কবে বাখছে। প্রায ঘণ্টাখানেক চলল এই গান। না, এবকম গান আমি খুব বেশি শুনিনি। গলা ববাববই মিষ্টি ছিল সুলক্ষণাব। সেই গলা কত যে ভালো হযেছে আবো, কানে না শুনলে বিশ্বাস হত না। কিন্তু এই গানেব গলা আব সুবই যেন সব নয, সমষ্টিগত সত্তাব নিবিড যোগ না থাকলে এমন গান হয না, এ-বকম পবিবেশ সৃষ্টি হয না।

বাইবেব মহিলাবা সব উঠে উঠে গোপাল প্রণাম কবে টাকা আধুলি সিকিটা ফেলে চলে যেতে লাগলেন।

আমি উঠে পাযে পাযে আবাব সুলক্ষণাব ঘবে এসে বসলাম। বাইশ বছব আগেব সুলক্ষণাব সঙ্গে একে যেন কিছুতে মেলাতে পাবছিলাম না।

মিনিট পনেব বাদে সুলক্ষণা ঘবে এলো। চোখে মুখেব সেই তন্ময ভাবটুকু গেছে। হালকা সুবেই জিজ্ঞাসা কবল, কেমন লাগল?

—বেশ।

ঠিক এইটুকু জবাব আশা কবেনি হযতো। মুখেব দিকে চেযে বইল। ভিতবটা আমাব হঠাৎই আবাব কেন যে অসহিষ্ণু হযে উঠল জানি না। হযতো, সুলক্ষণাব

বাইশ বছর আগের ঘব ছাড়া, আর এই গোপাল চরণে আত্মসমর্পণ—এব কোনোটার সঙ্গেই আপোস নেই আমাব।

বললাম, সবটুকুই ভক্তি না এর সঙ্গে জীবিকাব যোগও আছে?

থমকে তাকালো মুখেব দিকে। মনে হল বেদনাব ছায়াও পড়ল একটু। জবাব দিল, জীবিকার ব্যবস্থা না থাকলে ভক্তি আসবে কোথেকে?

—কিন্তু এই দিয়েই তোমাদেব এতগুলো মেয়েব দিন চলে যায়?

হয়তো এই প্রশ্নে তির্যক কটাক্ষ ছিল একটু। কিন্তু সুলক্ষণা দয়ালেব একটা পরিবর্তন স্পষ্ট। আগেব মতো সহজে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে না, ঝলসে ওঠে না, হয়তো বা অনেক নিগ্রহেব পরে এই সংযমটুকু আয়ত্ত করেছে। যাক, আমাব কথাব জবাবে ও যা বলল, সেও অবাক হবাব মতোই। সপ্তাহে কম কবে তিন-চারদিন বাইবেব ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গানেব প্রোগ্রাম থাকে তাদেব। হবিদ্বাবে কোথাও না কোথাও সে বকম অনুষ্ঠান লেগেই আছে। সবাব আগে তাদেবই ডাক পড়ে। সুলক্ষণাদেব বিশেষ কিছু দাবিদাওয়া নেই, যাবা যেমন দেয়। এখন নাম হয়েছে বলে খুব কমও দেয় না কেউ। এমন কি হরিদ্বাবেব বাইবেও বহু জায়গায় গাইতে যেতে হয়। দিন বেশ ভালোই চলে যায় তাদেব, অভাব-টভাব নেই।

জিজ্ঞাসা কবলাম, এই গানেব দল তুমি কতদিন গড়েছ?

একটু ভেবে নিয়ে ও বলল, তা প্রায় বছব নয় হবে।

এবাবে আমি সত্যিই অবাক একটু। ন'বছর আগে হলে তখন তেত্রিশ চৌত্রিশ হবে ওব বয়েস। এখন যা দেখছি, সে-সময় নিশ্চয় ওর ভবা যৌবন, ভবা রূপ। সব ছেড়ে সেই সময় থেকে ও গোপাল আশ্রয় কবেছে—এটা স্বাভাবিক ব্যাপাব নয় আদৌ। আমি চেয়ে আছি, ওব মুখ থেকেই সেই অস্বাভাবিক ব্যাপাবটা টেনে বাব কবতে চেষ্টা কবছি। শেষে বলেই ফেললাম, ও-বয়সে এ-বকম তো হবাব কথা নয়, গোপাল এমন টানা টানলে, কি ব্যাপাব?

মুখেব দিকে চেয়ে টিপ-টিপ হাসতে লাগল। তাবপর বলল, গোপাল টানলে এমনিই হয়।...তখন ভব-ভবতি অবস্থা আমাব, পায়ে কবে পুরুষেব মন মাড়িয়ে যেতেই আনন্দ, তাবই মধ্যে কি কাণ্ড—একেবাবে চুলেব মুঠি ধবে টেনে এনে নিজেব পায়ে মুখটা আচ্ছা কবে ঘষে দিয়ে তবে ছাড়লে—ছাড়লেই বা বলছি কেন, এখনো এই দুষ্টুমিই চলছে।

শুনতে ভালো লাগছে, কিন্তু কিছুই বোঝা গেল না। আমি চেয়েই আছি।

আত্মস্থ হয়ে সুলক্ষণা বলল, অত ব্যস্ত কেন, সব শোনাব বলেই তো ধবে রেখেছি। বোসো, নিজেব ভিতরটা আবো ভালো কবে খুঁজে দেখে নিই আগে—

হেঁয়ালিব মতো লাগল। ভিতবেব তাগিদ সত্ত্বেও আর জোর করলাম না। কি মনে হতে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার এই মেয়েদের পেলে কোথায়?

নিঃসঙ্কোচে সুলক্ষণা দয়াল জবাব দিল, নিজে থেকেই এসেছে, আগে মাত্র একটি চেনা মেয়ে ছিল, এখন ওরা ন'জন।...সবই আমাব মতো, কেউ নিজে ভুল করেছে, কাউকে বা জোর করে ভুল কবানো হয়েছে।

জিজ্ঞেস করলাম, ওদেরও ভিতর-বার এখন গোপালের পায়ে?

হেসে ফেলল।—তাই যাতে হয় আমি তো চেষ্টা করি, আর নেবার আগে যতটা পারি যাচাই বাছাই করে নিই। তবু গণ্ডগোল কি হয় না, এ-পর্যন্ত দু-দুটো মেয়ে ফের আবার লোভে পড়ে এখান থেকে সরে গেছে—আর তোমাদের পুরুষের লোভও বলিহারি, ঠাকুরঘরে থাকো আর যেখানেই থাকো, জাল ফেলার কামাই নেই, পুণ্যিস্থানে যেন আরো বেশি পাপের বাসা।

সুলক্ষণার সঙ্গে দেখা হবার পরেও চার দিন চার রাত হরিদ্বারে ছিলাম। বলতে গেলে দু বেলাই ওদের এখানে এসেছি। বাড়ির বাইরে দু'দিন গানের প্রোগ্রাম ছিল সেখানেও গেছি। এখানকার মেয়েরা আমাকে শুভার্থী আত্মীয় ভেবেছে। সুলক্ষণা তাদের কি বলেছে জানি না, কিন্তু আমার প্রতি তাদেরও কোনো রকম পলকা কৌতূহল দেখিনি। উল্টে অবিমিশ্র শ্রদ্ধাই দেখেছি।

ফাকে ফাকে অনেক কথা হয়েছে সুলক্ষণার সঙ্গে, কিন্তু একটি বারও সে এর মধ্যে কৃষ্ণকুমারের বা তাদের বাড়ির কারো নামও উচ্চারণ করেনি। ক্রমে আমারই ধৈর্য কমে আসছিল। ফাক পেলেই তাগিদ দিচ্ছি, বলবে বলেও তো কিছুই বললে না—এবার যেতে হচ্ছে আমাকে।

গতকালও বলেছিলাম। ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে একটু চেয়ে থেকে ঝাঁঝ দেখিয়েছে, আমি কি তোমাকে ধরে রেখেছি?

বলেছিলাম তা অবশ্য রাখোনি—

তেমনি করেই ও আবার বলেছিল, পুরুষের স্বভাবই ওই রকম, এতবড় দেবস্থানে এসেও নরকের কথা শোনার লোভ।

আমি হেসেই জবাব দিয়েছিলাম, নরকের কথা তো নয়, নরক থেকে ওঠার কথা। সেটা শোনার মধ্যে পুণ্যি আছে।

—ছাই আছে। ওঠা তো ভাবি, এই যে তুমি চলে যাবেই, তোমার বাড়ি-ঘর স্ত্রী ছেলেমেয়ে আছে—অথচ তোমাকে সত্যি ধরে রাখতে ইচ্ছে করছে।

দু' কান ভরে শোনার মতো কথা, একটু চুপ করে থেকে বলেছিলাম, করলেই বা এ ইচ্ছের মধ্যে তো নরক নেই।

..ওর চোখেমুখে যে সুন্দর হাসিটুকু দেখেছিলাম তাও ভোলার নয়।

আজ সকালে আবার বললাম, কাল সকালে আর না গেলেই নয়, কাজের খুব ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে—রিজারভেশান পেলে সোজা এখান থেকে কলকাতাই চলে যাব।

সুলক্ষণা বলল, ঠিক আছে, নাম-গানের দৌলতে আমার একটু চেনা-জানা আছে, একেবারে অসম্ভব না হলে রিজারভেশান পেয়ে যাবে।

সন্ধ্যায় রিজারভেশানের টিকিট আমার হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'নিশ্চিন্ত?

আমিও হেসেই মাথা নাড়লাম।

এই রাতটুকুই প্রত্যাশা আমার। ছিলামও রাত প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত। কিন্তু এ-দিন দেখলাম একলা পাওয়াই ভার ওকে। মেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত, আমার খাওয়ার

ব্যাপারে ব্যস্ত। কাল ট্রেনে আমার সঙ্গে কি কি খাবার যাবে—মেয়েদের সেই নির্দেশও দিচ্ছে।

রাতে হোটেলে ফেরার মুখে ওকে কাছে দেখলাম না। একটি মেয়ে বলল, দিদি এইমাত্র তাঁর ঘরে গেলেন—

পায়ে পায়ে তার ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে ভিতরে এসে দাঁড়ালাম। স্টীলের বাক্স খুলে ওদিক ফিরে কিছু একটা করছে ও।

—ঝুমরি...।

চমকে ফিরে তাকালো। তারপর হেসেই ফেলল। বলল, বাইশ বছর বাদে এ ডাক শুনে ভয়ানক চমকে গেছলাম।—

চললে?

—হ্যাঁ।

এগিয়ে এলো। হাসছে তখনো।—ঠিক আছে। তোমার খাবার নিয়ে সকালে ঠিক সময়ে আমি স্টেশনে যাব'খন।

এসেছে। একলাই। ট্রেন ছাড়তে তখন আর মিনিট দশেক মাত্র বাকি। খাবারের পাত্রটা জায়গা মতো রেখে এ-দিক ও-দিক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, জল কোথায়?

—আছে। বসো তুমি। আমি ভাবলাম আর এলেই না।

কুপেতে তখন পর্যন্ত আমি একা। আমার হাতখানেক তফাতে বসে সুলক্ষণা বলল, তোমাদের তো ওই রকমই ভাবনার দৌড়।...কলকাতায় পৌঁছে চিঠি দেবে তো?

—চিঠি দিলে জবাব পাব?

হাসিমুখেই মাথা নাড়ল, তা অবশ্য পাবে না। আচ্ছা তোমাকেও চিঠি লিখতে হবে না, দেখা হল, এই ভালো। গোপালের দয়ায় নিরাপদে পৌঁছুবে জানিই তো।

ঘড়ি দেখলাম। আর পাঁচ মিনিট মাত্র বাকি। অভিমানাহত সুরে বললাম, আমারই শেষ পর্যন্ত কিছু জানা হল না।

—হবে, হবে। হাতের ঝোলা খুলে বাদামী রংয়ের বড় খাম বার করল একটা।—তুমিও যেমন, এ-সব কথা মুখে বলা যায় নাকি। খামটা হাতে দেবার আগে থমকালো একবার।—কিন্তু একটা কথা, আমাকে নিয়ে কোথায়ও কিচ্ছু লিখবে না।

—কেন?

লিখলে তুমি ঠিক আমাকে বাড়াবে জানি। সব কবুল করতে পেরে আমার মনে একটু শান্তি এলো—ব্যস, এর বেশি আর কিছু চাই নে। রাস্তায় যেতে যেতে পড়বে, তারপর ছিঁড়ে কুচি কুচি করে জানলা দিয়ে ফেলে দেবে। ঠিক তো?

হাত বাড়িয়ে ওর হাত থেকে খামটা নিলাম। বললাম, সেটা না পড়া পর্যন্ত বলতে পারছি না—তবে বাড়াবো না, কথা দিলাম।

ঘড়ি ধরে গাড়ি ছেড়েছে। তার আগে সুলক্ষণা নেমে জানলার কাছে দাঁড়িয়েছে। চলন্ত ট্রেন থেকে যে কয়েক সেকেন্ড দেখা গেছে তাকে, দেখেছি। তারপর খাম খুলে বসেছি।

কথাব খেলাপ কবব না। বাড়ানোব ভয় আছে বলেই, সুলক্ষণা দয়াল যা লিখেছে সেটুকুই শুধু তুলে ধবছি।

বাঙালীবাবু বাতে যাবাব আগে তুমি ঝুমরি বলে ডাকলে, আমারও বাইশ বছর আগেব প্রিয নামে তোমাকে ডাকাব সুবিধে হয়ে গেল। আমার মেয়েদেব কাছে এ ক'দিন তোমাকে বাঙালীবাবুই বলেছি, আর আমাব নিজেবই দু'.কান যেন ভবে গেছে।

তোমার অনেক জানতে চাওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বড নোংরা ব্যাপাব সব। সাধকরা বলেন, পাপ ধুয়ে ফেলতে চাও তো পাপ স্বীকাব করো। কিন্তু কার কাছে স্বীকাব কবব? ঘবেব দেওযালেব কাছে? তোমাকে দেখাব সঙ্গে সঙ্গে তোমাব জানাব লোভ থেকে আমাব জানানোব লোভটা কম ছিল না। কিন্তু দোহাই তোমার, সবটুকু পড়াব আগেই ঘেন্নায ছিঁড়ে ফেলে দিও না।

...জীবনে প্রথম যে মানুষকে দেখলে আমাব দু'চোখ ঘৃণায ঠিকবতো, আব মাথায খুন চাপতো, সে আমাব বাবা। একদিন আমি এই বাবাকেই দুনিযাব সেবা সুন্দব পুরুষ ভাবতাম। বাবা যখন গান-বাজনা নিয়ে বসত, আমি চেয়ে চেয়ে দেখতাম আব ভাবতাম ওবকম গানেব আসবে কবে আমারও জাযগা হবে।

বাবা মদ খেত তাও আমাব কাছে খুব একটা দোষেব কিছু নয। মা বাগ কবত, আব আমি ভাবতাম মা-ই ইচ্ছে কবে ঝগড়া বাধায। আমাব পনেব বছর বযসেব সময মাযেব শবীব একেবাবেই ভেঙে গেল। চড়া ডাযবেটিস। উঠতে বসতে মাথা ঘোবে। একদিন বাথরুমে মাথা ঘুরে পড়ে গেল। তখন সন্ধ্যা হয-হয়। বাড়িতে কেউ নেই, উর্ধ্বশ্বাসে আমি ছুটলাম দুর্গা মাসিব বাড়ি। বাবা সেখানে আড্ডা দিতে যায়। এই দুর্গা মাসিব সম্পর্কেও পাড়ার লোকে ভালো বলে না। দুর্গা মাসিব কেন বিয়েই হল না, তাই নিযেও এক-একজন এক-এক রকম বলে। কিন্তু ও-সবেও আমি কান দিই না। কাবণ দুর্গা মাসি হাসে খুব, আমি গেলে আদব কবে কাছে টেনে নেয। ভালো ভালো খেতে দেয।

বাড়ি থেকে পনেব মিনিটেব হাঁটা পথ এক ছুটে চলে এসেছি। বেদম হাঁপাচ্ছি। কিন্তু দুর্গা মাসিব বাড়ি এসে মনে হল, কেউ নেই। দুটো ঘবই অন্ধকাব। সামনেব ঘবেব দবজা খোলা, পিছনের অর্থাৎ দুর্গা মাসিব ঘবেব দবজা ভেজানো। ঠেলতেই দবজা খুলে গেল। ভিতবে ঢুকে আলো জ্বাললাম।

তাবপবে কযেক পলকেব জন্য যেন পাথব আমি। কি দেখলাম তা আর বলে কাজ নেই। ঘব থেকে ছিটকে বেবিযে এলাম আবাব। আবো দ্বিগুণ ছুটে সোজা বাড়ি। এর মধ্যে বিকেলেব ঠিকে ঝিটা এসেছিল। মাকে ওই অবস্থায দেখে সেই পাড়াব লোক ডাকাডাকি করে তাকে ঘরে এনেছে।

আমি সে-ঘবেও আব থাকতে পারলাম না। বাইবেব দাওয়ায় দাঁড়িযে ঠকঠক করে কাঁপছি। সমস্ত পৃথিবীটা আমাব কাছে একটা দগদগে ঘাযের মতো বীভৎস লাগছে।

মিনিট কুড়ির মধ্যে বাবা এলো। এসেই আমাব গালে প্রচণ্ড একটা চড় বসিযে দিল। এমন চড় যে আমি ঘুরে পড়ে গেলাম।

মা আর সে-যাত্রা বক্ষা পেল না। তার তিন মাসেব মধ্যে বিযে করে বাবা দুর্গা মাসিকে ঘবে নিয়ে এলো। দুর্গা মাসি গোড়ায় গোড়ায় আমাব মন পেতে চেষ্টা কবেছিল। কিন্তু তাকে দেখলেই আমাব দু'চোখে গলগল করে ঘৃণা ঠিকবতো। ফলে বাবা আমাকে শাসন করত। তাব ফলও উল্টো হত।

ভালবাসা ঠিক কাকে যে বলে আমি তখনো জানি না। শুনলে তুমি কানে আঙুল দেবে কিনা জানি না, আমাব জীবনে প্রথম ভালবাসাব মানুষ কৃষ্ণদাদা। ওই 'কাজিন' বিযে না কি বলে, আমাদেব সমাজে সেটা চালু থাকলে যে কবে হোক কৃষ্ণদাকে নিযে আমি পালাতাম, প্রাণ দিযে চিকিৎসা করতাম, তাকে ভালো কবে তুলতাম। কৃষ্ণদাদাব ঝাঁঝবা বুকেব সঙ্গে নিজেব বুকটা বদলাবদলি কবা সম্ভব হলে তাও করতাম বোধহয়। আমাব ভালবাসা কৃষ্ণদাকে শুধু সুস্থ কবে তুলতে চেযেছে, আব কিছু না। এই ভালবাসা কি পাপ?

কিন্তু এখানেও নিজেব বাবাব মতোই একজনকে আমি ঘৃণা কবতে শুরু কবলাম। সে কৃষ্ণকুমাবেব বাবা। আমাব পিসেমশাই। তাব সেই বড আদবেব বন্ধু যজ্ঞেশ্ববাবুকে নিশ্চয মনে আছে তোমাব? বযসে পিসেমশাইযেব থেকে পাঁচ-ছ' বছরেব ছোট, পিসেমশাইকে দাদা-দাদা কবত। পযসাঅলা মানুষ, আমি এলাহাবাদে আসাব আগেই তাব বউ মবেছে শুনেছিলাম। তখন উনিশ পেবিযে সবে কুড়িতে পা দিযেছি আমি, বোনকে একদিন আমাকে দেখাতে নিযে এলো যজ্ঞেশ্ববাবু। ওই বোনেব ছেলে মস্ত সবকাবী চাকুবে, তাব বিয়ে দেওযা হবে। ভালো মেযে চাই। দাবিদাওযা নেই। পিসেমশাই আব পিসিব অনুবোধ ঠেলতে না পেবে যজ্ঞেশ্ববাবু বোনকে নিযে এলো মেয়ে দেখাতে। মানে আমাকে দেখাতে। আমি জোব কবে বলতে পাবি সেই বোনেব আমাকে পছন্দ হয়েছিল। নানাভাবে আমাকে যাচাই কবে দেখে আব গান শুনে খুশীতে আটখানা হয়ে চলে গেছল। কিন্তু পবে গম্ভীবমুখে পিসেমশাই এসে খবব দিল তাব নাকি মেযে পছন্দ হযনি।

পছন্দ না হওযাব কাবণটা দুদিন না যেতেই বেশ বোঝা গেল। সন্ধ্যায পিসেমশাই কেমন যেন চুপিচুপি এক জায়গায যেতে হবে বলে আমাকে ধবে নিযে গেল। বাস্তায বলল, যজ্ঞেশ্ববেব শবীবটা ভালো না, তোব গান শোনাব ইচ্ছে হযেছে, তাই—

তখনো সাদা মনেই গেছি আমি। বিবাট চক-মিলানো দালান। যজ্ঞেশ্ববাবুব ঐশ্বর্যের কথা বলতে বলতে পিসেমশাই আমাকে তাব কাছে নিযে গেল। যজ্ঞেশ্ববাবুর ছেলে তিনটে কাছাকাছিই ছিল, বড ছেলেটা আমাব থেকে বড হবে বযসে—সে আমাকে চোখ দিযে গিলতে গিলতে আব একদিকে চলে গেল।

যজ্ঞেশ্ববাবুকে একটুও অসুস্থ মনে হল না আমাব। দিব্যি হাসিখুশি ফুর্তিব মেজাজ। আমাকে আব পিসেমশাইকে একবাশ খেতে দিল। তাবপব গান নিযে বসলাম। গাইতে গাইতে ওই লোকটাব সঙ্গে বার কয়েক চোখাচোখি হতেই আমাব মনে হল কিছু একটা গোলমেলে ব্যাপাবেব মধ্যে পডতে চলেছি। গান একটুও ভালো হল না। কিন্তু যজ্ঞেশ্ববাবু প্রশংসায় পঞ্চমুখ। একে একে অনেকগুলো গান গাইযে ছাডলে।

ফেরার সময় পিসেমশাই আমাকে খোলাখুলি যা বলল, তার সার কথা—যজ্ঞেশ্বরের মতো অত ভালো লোক আর হয় না, যেমন পয়সা তেমনি দরাজ মন। বয়েস একটু হয়েছে, তাও পঁয়তাল্লিশ-ছেচল্লিশের মধ্যে—ব্যাটাছেলের সেটা এমন কিছু বয়েস নয়। তার খুব পছন্দ তোকে, রানীর হালে থাকবি—মাথা ঠাণ্ডা করে ওকেই বিয়েটা করে ফেলা উচিত।

শোনার পর সর্বাঙ্গ রি-রি করে উঠল আমার। জবাব না দিয়ে আমি শুধু মাথা নাড়লাম। অর্থাৎ তা হবে না।

তাইতেই পিসেমশাই রেগে উঠল। আমার অবাধ্য হবি? আমি তোর ভালো বুঝি না?

আমাকে চুপ দেখে একরকম শাসিয়েই দিল তারপর। যা হবার পরে ভেবে-চিন্তে হবে, কিন্তু এ নিয়ে যেন বাড়ির কাউকে একটি কথাও না বলি।

তার ভয় কৃষ্ণদাদাকে। কিন্তু তাকেও কিছু বলতে পারা গেল না। বললে কতবড় অশান্তির সৃষ্টি হত জানি। আর তখন কৃষ্ণদার যা শরীরের হাল।

ক'দিন না যেতে পিসেমশাই আবার আর একদিন যজ্ঞেশ্বরবাবুর বাড়ি নিয়ে যেতে চাইল। আমি গেলাম না। পিসেমশাই রাগে ফুঁসতে লাগল। এর একদিন পরেই যজ্ঞেশ্বরবাবু বাড়ি এসে হাজির। পিসেমশাইও ঘটা করে তার আদর আপ্যায়ন করল। তারপর আমার ডাক পড়লো, গান শোনাতে হবে। কৃষ্ণদাই আমাকে ঠেলে পাঠালো, ভদ্রলোক এসেছেন বাড়ি বয়ে, গান শোনাবি না তো গান শিখিস কেন?

এক ঘণ্টা ধরে গান হল। আর সেই এক ঘণ্টা ধরে দুই চোখ দিয়ে আমার শরীরটা যেন চেটেপুটে খেল যজ্ঞেশ্বরবাবু। চলে যাবার পর পিসেমশাই আমাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে প্রায় শাসিয়েই দিল, আমার অবাধ্যপনা বরদাস্ত করা হবে না, দু'দিন আগে হোক পরে হোক বিয়ে ওখানেই হবে। তোর পিসিকেও আমি বুঝিয়ে শুনিয়ে রাজী করিয়েছি—এর থেকে ভালো যে আর কিছু হয় না সেটা সেও বুঝেছে। আর তার শেষ কথা, ছেলে এখন অসুস্থ, তাকে যেন এখন এ-সব কথা শুনিয়ে একটুও বিরক্ত না করা হয়। আমাকে প্রস্তুত থাকতে হবে এটুকুই তার নির্দেশ।

আমি চারদিকে তখন অন্ধকার দেখছি। এর ওপর পরদিনই আবার কৃষ্ণদার গলগল করে রক্ত পড়ল গলা দিয়ে। আমার মনে হল কৃষ্ণদা দশ-বিশ দিনের মধ্যেই চলে যাবে। তারপর? ওই পিসেমশাই আর ওই যজ্ঞেশ্বরের হাত থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে? বিশ্বাস করো বাঙালীবাবু, আমার তখন প্রথমেই তোমার কথা মনে হয়েছিল। তোমাকে ভালো লাগে, বাঁচার তাগিদে তোমাকে নিয়ে পালাতে আমার একটুও আপত্তি হত না। আর সেভাবে আঁকড়ে ধরতে পারলে তুমিও আমাকে ছাড়তে পারতে না। কিন্তু তারপরেই মনে হল, তোমার অন্য রকম সমাজ, অন্য রকম পরিবার। আমার প্রতি তোমার একটু দুর্বলতা আছে বলে এমন একটা শাস্তি তোমার ওপর চাপিয়ে দেব। নিজের সমাজ, সংসার থেকে বঞ্চিত হয়ে একদিন তুমিই কি আমাকে ঘৃণা করবে না?

তোমাকেও বাতিল করে দিলাম। তখন থাকল আর একজন। তার খবর তোমরা কেউ রাখো না। তার নাম কিশোর শেঠ। যে ওস্তাদের কাছে আমি গান শিখতাম, তারই আর এক শিষ্য। মাখনখানার মতো চেহারা। দু'হাতের পাঁচ আঙুলে পাঁচটা আংটি ঝকমক করত। জামায়ও হীরের বোতাম পরত। নিজের ঝকমকে একখানা গাড়ি হাঁকিয়ে আসত সে। আমার সপ্তাহে যে দু'দিন গান শেখার পালা, তার সেদিন আসার কথাও নয়। কিন্তু দু-চারবার দেখা হয়ে যাওয়ার পর ক্রমে দেখা গেল ওই দু-দিনই সে সব থেকে নিয়ম করে আসত। গুরুর কাছে আসবে, তালিম দেওয়া শুনবে—তাতে আর কার কি বলার আছে। তাছাড়া ওই ওস্তাদের মতো ভালো মানুষও কম হয়।

কিশোর শেঠ কেন যে আসত আমিই শুধু ভালো বুঝতাম। এক-একদিন গাড়ি নিয়ে সে একটু দূরে অপেক্ষা করত। আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চাইত। আমি তার সঙ্গে কথা বলতাম না, চোখ দিয়ে চাবকে অন্য দিকে ফিরে চলে আসতাম।

কলেজ যাবার সময়ও এক-একদিন তার গাড়ি আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে যেত। গাড়িতে আমাকে কলেজে পৌঁছে দেবার জন্য অনুনয়ই করত। আমি ঝাঁঝিয়ে উঠতাম, ফের এ-ভাবে আমার পিছু নিলে মুশকিল হবে। কিশোর শেঠ হাসত, বলত, তুমি নারাজ, এর থেকে মুশকিল আর কি হতে পারে?

বড়লোক শিষ্যকে গুরু যে একটু বেশি খাতির করতেন সে আমার নিজের চোখেই দেখা। সেখানে বলে কিছু সুবিধে হবে না। বাড়িতে কৃষ্ণদার এই হাল। মাঝখান থেকে লোক জানাজানি হয়ে একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড হবে। আমি রাগে ফুলতাম, কিন্তু সহ্যও করতে হত। লোকটারও মুণ্ডু যে ভালোভাবেই ঘুরেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। গুরুর বাড়ির আর কলেজ যাওয়ার পথ যে আকুতি নিয়ে গাড়িতে বসে থাকত, তাই দেখে সময় সময় হাসিও পেত। আমাকে একটু চোখের দেখা দেখতে পেলেও যেন জীবন ধন্য ওর।

আমার সেই সংকটের সময় ওর কথাই মনে এলো আমার। সঙ্গে সঙ্গে একটা ভাঙচুরের নেশা যেন পেয়ে বসল আমাকে। এই করলে বাবার ওপর শোধ নেওয়া হবে, পিসেমশাইয়ের ওপরেও।

সেদিনও কলেজের পথে কিশোর শেঠের গাড়ি দাঁড়িয়ে দেখলাম। সোজা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে তার পাশে বসলাম। এ-রকম ভাগ্য ওর কল্পনার বাইরে। আনন্দে ডগমগ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, কলেজে তো?

—না। যেখানে খুশি।

হাওয়ায় ভেসে চলল কিশোর শেঠের গাড়ি। আমি সোজা ঘুরে বসলাম তার দিকে। জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি ঠিক ঠিক কি চাও বলো?

ও বলল, তোমাকে।

—বিয়ে করবে?

দম বন্ধ করে ও মাথা ঝাঁকিয়ে জবাব দিল, করব।

—তোমাদের বাড়িতে আপত্তি হবে না?

মুখ কাঁচুমাচু করে ও বলল, তা একটু হবে হয়তো...।

—তাহলে ?

ও প্রাণপণে এই তাহলের জবাব হাতড়ে বেড়াতে লাগল। আমিই রাস্তা দেখালাম, আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে ?

ও লাফিয়ে উঠল। তক্ষুনি রাজী। আমি বললাম, আজ নয়, সময়ে বলব। বাড়িতে বলে রেখো কিছুদিনের জন্য বাইরে যাচ্ছ, নইলে তোমার বাড়ি থেকেও আবার খোঁজাখুঁজি শুরু হবে। আর বেশ কিছুদিন চলার মতো টাকাকড়ি সঙ্গে নিও।

অত বলার দরকার ছিল না। ব্যবস্থামতো আমরা চলে এলাম বেনারসে। এক নাগাড়ে কোথাও বেশিদিন থাকতাম না। ইউ পি-র সর্বত্র প্রায় মাসখানেক ঘোরাঘুরি করে কাটল। কিশোর শেঠ আমার কেনা গোলাম যেন। যা বলি তাই শোনে। আমার একটু সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর আনন্দের জন্য দেদার খরচ করে। ওকে যতটুকু পাগল করা দরকার করেছি। বিকেল হতে না হতে রাতের প্রত্যাশায় বসে থাকত। কিন্তু বিয়ের কথা তুললেই ওর মুখ ছাইয়ের মতো ফ্যাকাশে হয়ে যেত। বলত, হবে, খুব শীগগিরই হবে, তুমি অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ?

আমার সন্দেহ বাড়তে থাকল। শেষে জেরার ফলে একদিন ধরা পড়ে গেল। দু-বছর আগেই ওর বিয়ে হয়ে গেছে। ঘরে বউ আছে। হাঁটু গেড়ে আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে ওর সে-কি আকুতি। বিয়ে করলেও আমিই ওর ধ্যান জ্ঞান, আমিই সব। বিয়ে ও আমাকে ঠিকই করবে, কিন্তু তার আগে সব দিক গুছিয়ে নেবার জন্য ওর কিছু সময় দরকার।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙেছে। ওর বুকে একটা ধারালো ছোরা বসিয়ে দিতে পারলে মন ঠাণ্ডা হত। সেই রাতে আমার শয্যার দিকে ওকে ঘেঁষতে দিলাম না। সমস্ত রাত বসে ভাবলাম। একদিন ওই কিশোর শেঠ আমাকে ছেড়ে চলে যাবে ঠিক জানি। কিন্তু তার আগে ওকে অবলম্বন করেই আমাকে দাঁড়াতে হবে, ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা দূর করতে হবে। এটুকু যদি না পারি, আমার রূপ যৌবন চোখের আগুন সব মিথ্যা।

পরদিনই আবার ওকে কাছে টেনে নিলাম। খুব হাসলাম। খুব আদর করলাম। বললাম, তুমি এত ছেলেমানুষ আমি জানতাম না, প্রথমেই সব আমাকে খুলে বললে পারতে—সত্যিকারের ভালবাসার মানুষকে ওটুকুর জন্যে কেউ কি ফেলে দিতে পারে, না কি সত্যিকারের ভালবাসা সমাজসংসারের পরোয়া করে ?

কিশোর শেঠ বর্তে গেল।

আমি আরো নিশ্চিন্ত করে দিলাম তাকে। বললাম, যাকগে, বিয়ের ভাবনা আর তোমাকে ভাবতে হবে না, আমি তোমার প্রেয়সী হয়েই থাকব—কিন্তু তুমি আমাকে তোমার রুচির যোগ্য করে তোলো, এই যৌবনের ফুল শুধু তোমার জন্যেই যেন সম্পূর্ণ হয়ে ফুটতে পারে সেই ব্যবস্থা করো।

ব্যবস্থাটা কি প্রথমে বোঝেনি, পরে বোঝার পর আনন্দে আত্মহারা হয়েছে। হবে না কেন, টাকার তো অঢেল জোর। ওকে নিয়ে আমি লক্ষ্ণৌ চলে এসেছি। সেখানে অনেক খরচ করে গুণী ওস্তাদ রেখে আবার গান বাজনার তালিম নিতে শুরু করেছি।

নাচও বাদ দিইনি। নামী বাঈজীর কাছে সহবৎ শিক্ষা করেছি। না, বোকাব মতো কিশোব শেঠকে আমি সেখানে আটকে বাখিনি। সে তারই ইচ্ছে মতো বাড়িতে গেছে এসেছে। যখনই এসেছে দু' পকেট বোঝাই টাকা এনেছে। আমি অম্লান বদনে সে-টাকা নিজেব দখলে বেখেছি, আর প্রতি বাবেব থেকে প্রত্যেক বারে বেশি প্রেমের অভিনয করেছি। ওকে পাগল করাটাই আমাব লক্ষ্য। পাগল করেছি।

খুব বেশি সময় লাগেনি। গলা তো অনেকটা তৈরিই ছিল, বছব চাবেকেব মধ্যেই আমাকে নিযে টানাটানি পডতে লাগল। আমাব রূপ যৌবন কটাক্ষ সবই কাজ করত, ফলে টাকাও বেশি পেতাম। নাচ গান তো আছেই, আবো প্রত্যাশায টাকাব মানুষেবা পাযে এসে গড়াগড়ি খেত। প্রাপ্যগুণ্ডা মনের মতো হলে তাদেবও করুণা কবতে আমাব আপত্তি হত না। আমাব ভিতবে সেই থেকেই শুধু ধ্বংসেব আগুন জ্বলছে। সেই আগুনে নিজেকে পোড়ানো আব মত্ত উল্লাসে পুরুষ পোড়ানোই একমাত্র লক্ষ্য। সে-সময়ে যদি তোমাব দেখা পেতাম বাঙালীবাবু, তাহলে তোমাবও কি সর্বনাশ যে হত কে জানে। কৃষ্ণদা অনেক আগেই মাবা গেছে সে-খবব কিশোব শেঠ আমাকে এনে দিযেছিল। আমাব কাছে দুনিযাব বাকি সব পুরুষ নবকেব জীব। তাবা যত বেশি জ্বলবে আমাব তত উল্লাস।

এব পব আমাব প্রথম কাজ কিশোব শেঠকে ছিবডেব মতো বাতিল কবা। আমাব আশা ছেড়ে তাকেও একদিন জ্বলতে জ্বলতে ঘবে ফিবতে হযেছে। আমাব ব্যাঙ্কেব জমা টাকা বাডছেই, অলঙ্কারেব ঐশ্বর্যও বাডছেই। পুবনো হযে যাবার ভযে খুব বেশিদিন কাউকে আমি এক নাগাড়ে ধবে বাখি না। ফলে নতুন নতুন মানুষেব ধর্ণা দেওয়া আব মাথা খোঁড়ারও বিবাম নেই।

এবাবে নিশ্চয ঘৃণায শিউবে উঠছ বাঙালীবাবু। আবো একটু বাকি—শোনো। তখন আমাব বযেস বত্রিশ পেবিযেছে। অর্থাৎ এলাহাবাদ ছাড়াব পব তেব-চোদ্দ বছব কেটে গেছে। কিন্তু পুরুষ তখনো আমাকে নিযে এমনি মত্ত যে বযেস দেখাব চোখ কাবো নেই। এদিক থেকে ভগবানেব কিছু মাত্র কার্পণ্য ছিল না বলে বযেস চোখে পড়াব কাবণও নেই। সেবারে এক ধনীব দুলালেব সঙ্গে এসেছি মধ্যপ্রদেশেব কোনো এক জাযগায। টাকাব অঙ্ক সে-বকম হলে তাতেই বা আপত্তি কি? এ-বকম কত সময কত জাযগায় গেছি, ঠিক নেই।

জঙ্গলেব মধ্যেই মাঝারি আকাবেব একটা ডাক-বাংলো। ফুর্তির জাযগা হিসেবে আমাব সঙ্গী সেই বাংলোটাই বেছে নিয়েছে। বাংলোয আমি আব সে ছাড়া আব যে লোকটাব অবস্থান, মানুষ না বলে তাকে জানোযাবই বলা চলে। বছব সাঁইতিবিশ-আটতিরিশ হযতো বযেস, পা থেকে গলা পর্যন্ত গবম কম্বল জড়ানো, মাথাব চুল পিছন দিকে পিঠে এসে নেমেছে, আব গাল বোঝাই দাড়ি বুকেব দিকে। গাযেব আব চুল দাড়ির রং মিলেমিশে একাকাব। এখানে আসাব পব এমনি হাঁ কবে আমাব দিকে তাকিযেছিল যেন জীবনে আর কখনো মেযেছেলে দেখেনি। আমাব সঙ্গী ধমকে উঠতে তবে সে আত্মস্থ হয়েছে।

লোকটা এই বাংলোর চৌকিদার।

আমবা বিকেলেব দিকে এসেছি। দিন দুই থাকাব ইচ্ছে। সন্ধ্যা নামতেই সঙ্গী মদেব গেলাস নিযে বসেছে। ওবা যত মদ গেলে আমাব তত সুবিধে। হামলা হুজ্জোত কম হয। ওকে সঙ্গ দেবাব জন্য আমিও গেলাস নিযে বসেছি। আব খাচ্ছিও একটু বেশিই। সেই সঙ্গে গুনগুন কবে বসেব গানও গেযে উঠছি। এক-একবাব উঠে নাচাব চেষ্টাও কবছি।

বাত তখন ন'টা-দশটাব বেশি নয। কিন্তু এখানে তখন নিঝুম বাত। খাওযাদাওযাব পবে আবাব এক-প্রস্থ মদ গিলল লোকটা। তাবপব আমাব দিকে এগলো। ঘবে সবুজ আলো জ্বলছে। আমাব ঘুম পাচ্ছে। কতক্ষণে অব্যাহতি পাব ভাবছি।

হঠাৎ ঠাস কবে ঘবেব ভেজানো দবজা দুটো খুলে গেল। কেউ যেন প্রচণ্ড এক লাথি মেবে দবজা খুলে ফেলল। ঘবে এসে দাঁডাল যমদূতেব মতো সেই চৌকিদাব। জন্তুব মতোই জ্বলছে তাব দুটো চোখ। গাযেব কম্বল ফেলে এগিযে এসে আমাব বুকেব ওপব থেকে সঙ্গীকে যেন ছোঁ মেবে টেনে তুলে নিযেই এক আছাড। লোকটা আর্তনাদ কবে উঠল। আমি কাঠ। যমদূতেব মতো ওই চৌকিদাব আবাবও এগিযে গেল তাব দিকে, আবাবও টেনে শূন্যে তুলে নিল। তাবপব তাকে নিযে চোখেব পলকে ঘব থেকে বেবিযে গেল।

আমি কাঁপছি থবথব কবে। কি চায লোকটা? কি মতলব ওব? একে একে দুজনকেই খুন কববে আমাদেব?

একটু বাদেই মোটব স্টার্ট দেবাব শব্দ কানে এলো। কি হল? আমাকে বেখে সঙ্গীকে গাডিসুদ্ধ তাডিযে দিল। ওই শীতেও আমি ঘামছি। শয্যায উঠে বসে কাপছি।

সাক্ষাৎ যমেব মতো ওই চৌকিদাব ফিবল আবাব। আমাব দু হাতেব মধ্যে দাঁডিযে মুখেব দিকে অপলক চেযে বইল। এখন আব ওই দুটো চোখ জানোযাবেব মতো জ্বলছে না। তাব বদলে গলগল কবে যেন ঘৃণা ঠিকবোচ্ছে। সেই ঘৃণা আমাব চোখে মুখে ঝাপটা মেবে যাচ্ছে।

কিন্তু এবকম অপলক চাউনি আমি আব কি দেখেছি? কাব দেখেছি? কবে দেখেছি? কোথায দেখেছি? এ কাকে দেখছি আমি? আমাব সামনে দাডিযে এ কে?

লোকটা নিজেব মোটা মযলা জামাব পকেটে হাত ঢোকালো। কি যেন বাব কবল। তাবপব সেটা আমাব সামনে, সজোবে আমাব বিছানাব ওপব আছডে ফেলল।

জিনিসটা চিকচিক কবে উঠল। দু চোখ বিস্ফাবিত কবে আমি দেখলাম একটা হাব। আমাব মাযেব দেওযা সেই চুবি যাওযা হাব।

মুখ তুলে দেখলাম, লোকটা ঘব ছেডে চলে যাচ্ছে।

এবাবে চিনলাম। সেই মধু। সেই মধু যাদব।

...তাব পব থেকে বাঙালীবাবু, তুমি যা দেখলে আমি তাই। এক বছব বাদে মধ্যপ্রদেশেব জঙ্গলেব সেই বাংলোয আব একবাব গেছলাম মধুব খোঁজে। সে নেই। কোথায গেছে কেউ জানে না। আমি এখনো গান গাই আব গোপাল পুজো কবি। আমাব গোপালেব মুখ আব মধুব মুখ আজও মাঝে মাঝে মিলেমিশে একাকাব হযে যায। সেও কি পাপ?

আমি জানি না।

দ্বিতীয় বাসর গাঁজাখুরি

১

কাহিনীর নামের প্রসঙ্গ পরে। কাহিনী প্রসঙ্গও পরে।

একজোড়া দম্পতি ঘাটশিলা বেড়াতে গেছেন সেটা গাঁজাখুরি ব্যাপার কিছু নয়। বেড়ানোর মৌসুমে বহুজোড়া দম্পতি গিয়ে থাকেন। এটাও বেড়ানোর অথবা স্বাস্থ্যোদ্ধারের মৌসুম। এই বছরেরই অর্থাৎ আশি সালের আশ্বিন মাস। সালটা টাটকা বটে, কিন্তু ওই দম্পতি টাটকা বা কাচা কিছু নয়। চৌষট্টি আর সাতান্ন। মোহিনী সরকার চৌষট্টি। লম্বা, কালো। একমাথা কাঁচা-পাকা চুল। চাউনিতে বুদ্ধির ছাপ। এই বয়সেও শক্ত-সমর্থ মনে হয়। কিন্তু বছর দুই আগে একবার ছোট-খাটো হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে। হাইকোর্টের নামী অ্যাডভোকেট। সকাল সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত সেরেস্তা-কোর্ট সেরেস্তা করে অভ্যস্ত। কিন্তু দু'বছর আগে ওই অ্যাটাকটি হয়ে যাবার পরে জীবনের দোসর সাতান্নটি অর্থাৎ বিভা সরকার তার সময়ের ওপর প্রকাণ্ড একটা থাবা বসিয়েছেন এবং ফাক পেলেই বসিয়ে চলেছেন। বিভা সরকারের ডাক্তার বাবা এখনো বেচে, আর ডাক্তার দাদা তো বহাল তবিয়তে বেঁচে। তাঁদের পরামর্শের পরোয়ানা নিয়ে বিভা সরকার দাবি করেছিলেন, প্র্যাকটিস থেকে সম্পূর্ণ অবসর নিতে হবে। অনেক বাক-বিতণ্ডার পর আপসরফা হয়েছে। বাছাই দু'চারটে কেস শুধু নেবেন, তার বেশি নয়। সপ্তাহে বড়জোর তিন দিন কোর্টে যাবেন, তার বেশি নয়। আর বছরে অন্তত তিন বার বেড়াতে বেরুবেন, তার কম নয়।

বিভা সরকারের সাদা সাপ্টা হিসেব। মানুষ যা কিছু চায় সবই তো হয়েছে বাপু, আর কেন? নিজের মস্ত বাড়ি হয়েছে, দু-তিন বছর অন্তর নতুন নতুন গাড়ি হচ্ছে, ব্যাঙ্কে টাকা যা আছে দেড়শ' বছর বেঁচে থেকে বসে খেলেও ফুরোবে না —এ ছাড়া ওপরে নিচে দুটো দুটো করে এয়ারকুলার, দুটো ফ্রিজ, টি-ভি—কি না হয়েছে। আর কি চাই বা কত চাই? তার মতে কেবল কাজ করা আর টাকা আনা একটা অভ্যাসের রোগ ছাড়া আর কিছু নয়।

মায়ের সঙ্গে একেবারে একমত তাদের ব্যারিস্টার ছেলের। একমাত্র ছেলে। আর কোনো সন্তান নেই। অতএব তার মতেরও রীতিমতো জোর থাকাই স্বাভাবিক। ব্যারিস্টার ছেলের যা আয় তার বেশির ভাগ বাবার জুনিয়র হিসেবে। বাধ্য হয়েই এই বাস্তব তাকে মেনে নিতে হয়েছিল। বাবা প্র্যাকটিস কমানো মানেই তার প্র্যাকটিস বাড়া। কারণ বাবা যখন একেবারে সরে দাড়াচ্ছে না, তখন মক্কেলরাই বা একেবারে সরে যাবে কেন?

অগত্যা একা মোহিনী সরকার সকলের সঙ্গে আর কত যুঝতে পারেন? তাই বুদ্ধিমানের মতো অনেকটা অবকাশের কোলে গা ছেড়ে দিয়েছেন। তার মনে মনে ধারণা, ছোটখাটো হার্ট অ্যাটাকের ফলে স্ত্রী-টি ভিতরে ভিতরে একটু খুশিই হয়েছেন। তাঁর কাজকর্মের ওপর এত জারিজুরি আর কখনো খাটাতে পারেন নি। এই বয়সে এসে স্বামীটিকে মোটামুটি দখলের ওপর পেয়েছেন। গোড়ায় গোড়ায় মোহিনী সরকারের

এত অবকাশ ভালো লাগত না। হাঁপ ধরে যেত। এখন সয়ে যাচ্ছে শুধু নয়, তাঁরও ভিতরে একটু গা-ছাড়া ভাব এসেছে। এই দেশটা যে বেশ একটু ঘুরে বেড়াবার জায়গাও এটা অনুভব করছেন। এখন অনেক কিছু খুঁটিয়ে দেখেন যা আগে দেখতেন না। অনেক কিছু পড়েন যা আগে পড়তেন না।

হালের গল্প-উপন্যাস ছেড়ে রবি ঠাকুরের কবিতা পড়েও বেশ রস পাচ্ছেন আজকাল। পড়ার ব্যাপারে তাঁর গাইডের কাজ করছেন বিভা সরকার। এককালে স্ত্রীটির লেখিকা হবার সখ ছিল। বয়েসকালে কিছু লেখা খুব সংগোপনে মাসিক-সাপ্তাহিকের দপ্তরে পাঠিয়েছেন এবং তা ফেরতও এসেছে। ক্রমে লেখিকা হবার সাধ গেছে, কিন্তু গল্প-উপন্যাস পড়ার ঝোঁক বেড়েছে। নেশা বলতে এখন ওই একটাই। হাতে গোনা যে দু'চারজন লেখকের লেখা তাঁর ভালো লাগে তা বারকয়েক পড়া না হলে তৃপ্তি নেই। দিনে হোক রাতে হোক ভালো গল্প উপন্যাস পড়ার অভ্যাসটা শুয়ে এবং বই বুকে নিয়ে। তাই দেখে মোহিনী সরকার কত ঠাট্টা করেছেন। বলেছেন, তোমার ভালো লেখকদের ভাগ্য বটে, ষোল থেকে সত্তর বছরের তরুণী যুবতী প্রৌঢ়া আর বৃদ্ধার বুকে বুকে ঘুরে বেড়ান। এমন জানলে ওকালতির দিকে না গিয়ে লেখক হতাম।

বিভা সরকারও সমান তালে জবাব দিতেন, মেয়েদের বুকে ওঠার মতো লেখক ইচ্ছে করলেই হওয়া যায় না—বুঝলে। এ তোমার পেনাল কোড না যে ঝেড়ে মুখস্থ করে মেরে দিলেই হল। লেখক হতে হলে জীবন দেখার আর জীবন-জটিলতা বোঝার আলাদা চোখ আলাদা মন দরকার।

মহিলার বাছাই-করা লেখকদের বই বেরুলে তিনি কিনেই ফেলেন। লাইব্রেরি থেকে এনে পড়ার অপেক্ষায় থাকেন না। এই করে তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরিটি কম বড় নয়। এখন সেখান থেকে বই বেছে বেছে নিয়ে তিনি স্বামীকে পড়ান। পড়ার পর আলোচনা করেন। এক-একঁ সময় জোর তর্কও বেধে যায়। কারণ স্ত্রীটির যে লেখক যত প্রিয়, তার এই সমালোচনায় মোহিনী সরকার ততো নির্মম। স্ত্রীর কাছে ভালো লাগার দিকটা এড়িয়ে কেবল খুঁতগুলোই বড় করে তোলেন এবং স্ত্রীর তর্কের মেজাজ দেখে মনে মনে খুশি হন। মোটকথা স্ত্রীর পাল্লায় পড়ে আর সময় কাটানোর দায়ে ইদানীং গল্প-উপন্যাস পড়তেও ভদ্রলোকের ভালোই লাগে।

এবারে কাছাকাছির মধ্যে সস্ত্রীক ঘাটশিলায় এসেছেন। ছেলে বা ছেলের বউ তাঁদের সঙ্গে কখনো বেরোয় না। এদিকে মোহিনী সরকার সস্ত্রীক আসা মানে সঙ্গে পুরনো খানসামা আসা, একটা ছোকরা চাকর আসা, চাকরের থেকে প্রমোশন পাওয়া বয়স্ক অথচ কর্মঠ কেয়ারটেকারের আসা। সকলেই এসেছে। সেই সঙ্গে কলকাতা থেকে আরামে বা ভালো থাকার জন্যে যেসব সরঞ্জাম আনা সম্ভব তা-ও এসেছে। অথচ সরকার দম্পতি এখানে একমাস থাকবেন কি এক সপ্তাহ সেটা কেমন লাগে তার ওপর নির্ভর। বেশ নিরিবিলি ছিমছাম জায়গা. স্বাস্থ্যকর তো বটেই, আশা করা যায় ভালোই লাগবে।

এখানে এসে তিন চার দিন ধরে মোহিনী সরকার আর বিভা সরকার আর একজোড়া ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাকে লক্ষ্য করছেন। এদের দৃষ্টিতে তাঁরা আর

যা-ই হোন দম্পতি বলে মনে হয় নি। মোহিনী সরকার উকিলের চোখ দিয়ে তাঁদের দেখছেন। আর বিভা সরকার তাঁব সহজাত মেয়েলি কৌতূহলের চোখ দিযে। খুব সকালে তিন মাইল দূরেব বাজারে বা কিছুটা কাছের হাটে দুজনকে দেখেছেন। এখানে খুব সকালে ভিন্ন বাজার থেকে পছন্দের মাছ তরকারি বা মাংস মেলা ভাব। বেড়ানোর মৌসুমে লোকের ভিড়ে তো বাজাব আরো আকাল হয়ে ওঠে। মোহিনী সরকার সস্ত্রীক সাইকেল রিকশয় আসেন, হাট বা বাজাব সেবে তাতেই ফেরেন। তাঁদের লক্ষ্যের ওই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাও তাই। মোহিনী সবকাব তাঁদের বাজাব করাও একটু-আধটু লক্ষ্য কবেছেন। ভদ্রলোককে এই বযসেও একটু পেটুক মনে হয় তাঁব। কাবণ, সামনে যা দেখেন সঙ্গিনীকে তাই কিনতে বলেন। আব সঙ্গিনীটি সুন্দব মুখে একটু ভুরু কুঁচকে বা একটা হাত অল্প একটু নেড়ে তাব বেশির ভাগই বাতিল কবে দেন। মোহিনী সবকাব বেশ লক্ষ্য কবেছেন, মহিলা নিজের বিবেচনামতো পবিমিত বাজাব কবেন। নিজেই শক্ত হাতে বাস্কেট বা ব্যাগ নিয়ে বাজাব বহন কবেন। মাথায কাপড থাকে না তখন, শাড়িব আঁচল গাছকোমর কবে জড়ানো থাকে। মোহিনী বা বিভা সবকাবেব বাজাবের ব্যাগ আব থলে অবশ্যই ছোকবা চাকবটাব হাতে। সময় হিসেব কবে তাকে আগেই পাঠিয়ে দেওযা হয। বাজাব শেষে ছোকরাটা হেঁটে ফেবে, আর বাজার ফেবে তাঁদেব রিকশয।

হাটে বা বাজারে ছাড়া বাস্তায দেখা হচ্ছে, শীর্ণ সুবর্ণরেখাব ধাবে বা কাছেব পাহাড়ী টিলাটাব কাছেও দেখা হচ্ছে। কাছাকাছির মধ্যে বেড়াবাব জাযগা এই দুটোই। শহবেব মধ্যে বেড়াতে বেরুলে এব এক জাযগায না এক জাযগায দেখা হবেই। কিন্তু বেড়াতে তো আবো অনেকেই বেরিযে থাকেন। অথচ সবকাব দম্পতিব অবধারিত লক্ষ্য ওই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাটি।

লক্ষ্যেব প্রধান কাবণ বোধহয দুজনেব বযসেব ফাবাক। ফাবাকটা অবশ্য সবকার দম্পতিব বিবেচনায। দুজনেবই ধাবণা, ভদ্রলোকেব বযেস সত্তবেব কিছু ওপবে ছাড়া নিচে হবে না। মাথায চুল যেটুকু আছে সবই সাদা। গাযেব বং না কালো না ফর্সা। চোখে মোটা কাচ আব মোটা ফ্রেমেব চশমা। লাঠি ব্যবহার করেন না বটে তবে ধীবেসুস্থে পা ফেলে হাঁটেন। মুখখানা হাসি-হাসি, কিন্তু, মহিলাব তুলনায কথা কম বলেন যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যখনই দেখা হয, মহিলাকে বেশ সুন্দব ভঙ্গীতে একটু একটু হাত নেড়ে কথা বলতে দেখা যায়। ভদ্রলোকেব বেশির ভাগ শ্রোতাব আব অল্প অল্প হাসাব ভূমিকা।

কৌতূহলেব বা লক্ষণীয হযে ওঠাব আসল কাবণ ওই মহিলা। দুজনেরই মতে তাঁর বয়েস খুব বেশি হলে সাতচল্লিশ কি আটচল্লিশ। মাথায় একবাশ কুচকুচে চুলেব ওপব দিযে কতগুলো রুপোলি চুল ছড়িয়ে না থাকলে বা কানেব দুপাশেও কিছু পাকা চুল দেখা না গেলে সাতচল্লিশ আটচল্লিশও আদৌ বলা যেত না। গায়ের রং রীতিমতো ফর্সা, মুখশ্রীও সুন্দবই বলতে হবে। কিন্তু অমন ফর্সা বা অমন মুখশ্রীও হামেশাই দেখা যায়। এ ছাড়াও মহিলাব মধ্যে দর্শনীয় কিছু আছে যা চট কবে ঠাহব করা যায না, অথচ অনুভব কবা যায়। বযেসকালে প্রায় দীর্ঘাঙ্গী মহিলার স্বাস্থ্য-সম্পদ নিশ্চয়

চোখে পড়াব মতো ছিল। তাবই তৎপবতাটুকু এখনো যেন সর্ব অঙ্গে ছড়িয়ে আছে। তাঁব বাস্কেট হাতে বাজাব কবা, হাঁটা চলা কথা বলাব সময় ঈষৎ চঞ্চল ভঙ্গীতে সুডৌল হাত নাড়া—সবকিছুব মধ্যে সেই সুতৎপব মাধুর্যটুকু বমণীয় হয়ে ওঠে। সুগৌব কপালে ছোটব ওপব জ্বলজ্বলে সিঁদুবেব টিপ, সিঁথিতে সিঁদুবেব জ্বলন্ত আঁচড়। এ বকমই হয়তো সকলে পবে, কিন্তু মহিলাব সজীবতাব দরুন তা-ই হয়তো একটু বেশি উজ্জ্বল মনে হয়। মহিলাব মধ্যে দর্শনীয় কি মোহিনী সবকাবেব ধাবণা তিনি ধবতে পেবেছেন এবং স্ত্রীকেও বলেছেন। সাতচল্লিশ বা আটচল্লিশ যে বয়েসই হোক এখন, মহিলাব চাল-চলনে তা-ও যেন একটু তফাতে সবে আছে—ছুঁয়ে থেকেও ছুঁতে পাবছে না। বিভা সবকাব এই মন্তব্যেব সঙ্গে খুব দ্বিমত হননি।

এখন প্রশ্ন বা কৌতূহল, ভদ্রমহিলা ভদ্রলোকেব কে হতে পাবেন? আত্মীয়া তো বটেই। তাঁদেব বাড়িব আধ মাইলেব মধ্যে বেল লাইনেব কাছাকাছি দু'খানা ঘবেব একটা ছোট্ট বাংলোয় ওঁবা আছেন—আসতে যেতে সবকাব দম্পতি তা-ও দেখে বেখেছেন। আত্মীয়া ভিন্ন ওই বুড়োব সঙ্গে এসে এক বাড়িতে থাকা, এক বিকশয় চেপে বাজাবে যাওয়া বা বিকেলে একসঙ্গে বেড়াতে যাওয়া সম্ভব কেউ ভাবে না। আত্মীয়া তো বটেই, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়াই মনে হয়। কিন্তু সেটা কি হতে পাবে? অবকাশ অঢেল, তাই আলোচনাতেও আলস্য নেই। মোহিনী সবকাব আব বিভা একটু হিসেবও কবেছেন। বিভা বলেছেন, ধবা যাক ভদ্রলোকেব বয়েস বাহাত্তব, তাব বেশি ছাড়া কম কিছুতে হবে না, আব ওই মহিলাব বড়জোব আটচল্লিশ—তাহলে তফাৎ কত হল?

—চব্বিশ।

বিভাব মন্তব্য, আগেব দিনেব মানুষদেব বিয়ে তো একটু আগেই হত—তাহলে ভদ্রলোকেব মেয়ে হওয়াই সম্ভব।

মোহিনী সবকাবেব উকীলেব মাথা, তাব ভাবনাও একেবাবে অত সহজ বা সবল কিছু না। জবাব দেন কিন্তু মেয়ে মনে হয় না। প্রথম কথা, ভদ্রলোককে মহিলাব আগলে বাখাব মধ্যে একটু মিষ্টি শাসনেব ভাব আছে যা বাদ দিলে তোমাব সঙ্গেও একটু আধটু মেলে।

বিভা ছোট্ট প্রতিবাদ কবলেন, আ-হা—

—দ্বিতীয় কথা, আজই তোমাতে আমাতে ওই ঢিবিতে বেড়াতে গিয়ে দেখলাম, বিকেলেব আলোয় টান ধবতে না ধবতে ব্যাগ থেকে চাদব বাব কবে মহিলা নিজেব হাতে বেশ কবে ভদ্রলোকেব গায়ে গলায় জড়িয়ে দিলেন, যা অনেকটা শবৎবাবুব নায়িকাদেব সঙ্গে মেলে। কিন্তু তাদেব মধ্যে একমাত্র শেষ প্রশ্নে তাজমহলে বেড়াতে এসে আশু বদ্যিব মেয়ে মনোবমাকে বাব দুই বলতে শুনেছি বাবা ওঠো, তোমাব ঠাণ্ডা লাগবে। নিজে হাতে কিছু কবে নি। মোট কথা, ওভাবে চাদব জড়িয়ে দেওয়াটা বাবা মেয়েব সম্পর্কেব মতো আমাব একটুও মনে হয় নি।

কি বলতে চান বিভা অতটা তলিয়ে না ভেবেই জিজ্ঞাসা কবলেন, তাহলে কি অনেক ছোট বোন-টোন হবে?

মোহিনী সবকার হালছাড়া গলায বললেন, এত আধুনিক বই গিলে শেষে এই ছন্দপতন। ভাই-বোনেব ছাঁদ-ছিরিতে এমন অসম্ভব তফাৎ হয়। হলেও আমাব ভাবতেই নীবস লাগে। আমি বলছিলাম, ভদ্রমহিলা ভদ্রলোকেব তৃতীয় বা চতুর্থ পক্ষেব উনি হতে বাধাটা কি—তা হলে অনেকগুলো কনডাক্ট রুল মানে আচবণ-বিধি মেলে।

বিভা সবকার বক্র শ্লেষে তক্ষুণি সেই সম্ভাবনা বাতিল কবেছেন।—হুঁঃ, খোঁজ নিযে দেখো গে যাও বযেসকালে প্রথম পক্ষ কবাব জন্য কত ছেলে ও মেযেব পাযেব কাছে গড়াগড়ি খেযেছে—দেখলে বুঝতে পাবো না? অমন খ্যাংবাকাঠিব তৃতীয-চতুর্থ হবাব তাব দায পড়েছে।

—তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু অমনটি হলেই একটু বসেব হয না?

—বাজে বোকো না, শেষে দেখবে বাপ-মেযে বা সেই গোছেব কিছু, তখন বস বেবিযে যাবে। তুমি যে বলেছিলে, কদিন দেখাব পব ভদ্রলোকেব মুখখানা একটু চেনা-চেনা ঠেকছে, কোথাও দেখেছ মনে হচ্ছে—মনে পড়ছে?

দু'তিন দিন দেখাব পব মোহিনী সরকাবেব সত্যি মনে হযেছে ভদ্রলোকেব ওবকম একখানা মুখেব আদল, বিশেষ কবে ওই গোছেব একটু মিষ্টি মিষ্টি হাসি কবে কোথাও দেখেছেন। ওকালতিতে আইনেব ধাবা পড়ে পড়ে হোক বা যে কাবণেই হোক, আজও তাঁব প্রখব স্মবণশক্তি। কিন্তু অনেক ভেবেও তিনি ঠিক কবতে পাবেন নি, এই ভদ্রলোকটিকে কোথাও তিনি দেখেছেন কি দেখেন নি। অথচ মনে হয দেখেছেন।

জবাব দিলেন, না, কত অচেনা লোককেই তো অনেক সময চেনা-চেনা মনে হয।

স্ত্রীটি তক্ষুণি সন্দিগ্ধ।—আসলে তোমাব মেমবি খাবাপ হযে যাচ্ছে।

আবো দু'দিন বাদে চাক্ষুস দেখা আব সামনা-সামনি আলাপ। বিকেলেব দিকে মোহিনী সবকাব আব বিভা সবকাব বেল লাইনেব দিক ধবে বেড়াতে বেড়াতে আসছিলেন। ওই দ' ঘবেব বাংলোব সামনেব ঘবেব দবজা খোলা। দরজা আগলে বৃদ্ধ ভদ্রলোক দাঁড়িযে। গাযে একটা আধা গবম চাদব জড়ানো। তাঁদেব দিকেই চেযে আছেন।

মোহিনী সবকাবও তাঁব দিকে চেযে হঠাৎ হাসলেন একটু। অবশ্যই সৌজন্যেব হাসি।

ভদ্রলোকও তক্ষুণি হাসলেন এবং মিষ্টি হাসি।

মোহিনী সবকাব আব বিভা সবকাব তখন বাংলোব দশ গজেব মধ্য দিযে পাশ কাটিযে যাচ্ছিলেন। মোহিনী সবকাব হঠাৎ দাঁড়িযে পড়ে হাসিমুখে দু' হাত কপালে ঠেকিযে নমস্কাব জানালেন।

ভদ্রলোকও তক্ষুণি প্রতি-নমস্কাব কবে অন্তবঙ্গ অভ্যর্থনা জানালেন, আসুন আসুন—বেড়িযে ফিবছেন?

মোহিনী সবকাব ঘুরে স্ত্রীব হাসিছোঁযা মুখখানা একবাব দেখে নিযে ভদ্রলোকের দু' গজেব মধ্যে এসে দাঁড়ালেন।—হ্যাঁ... আপনাবা আজ বেরোন নি?

মুখখানা একটু বিবস কবে ভদ্রলোক জবাব দিলেন, নাঃ, আমাব শবীবটা নাকি আজ খুব ভালো নেই।

শুনে মোহিনী সবকাব এবং তাঁব পিছনে বিভা সবকাব অবাক। নিজে বলছেন, শবীবটা নাকি ভালো নেই—এ আবাব কি কথা?

ভদ্রলোক আবাব সাদব আহ্বান জানালেন, আসুন, ভিতবে আসুন।

তাঁবা তবু একটু দ্বিধান্বিত। অসুবিধে হবে কিনা জিজ্ঞেস কবতে যাচ্ছিলেন। তাব আগেই ভদ্রলোকেব পিছন থেকে কচি ছেলেব গলাব মতো মিষ্টি বমণীকণ্ঠ শোনা গেল, কাব সঙ্গে কথা হচ্ছে?

ভদ্রলোকেব এবাবেব জবাবও অদ্ভুত। পাশেব ঘবেব দিকে সামান্য ঘাড ফিবিযে জবাব দিলেন, আমাদেব সেই ওঁবা—

না বুঝে ঈষৎ বিস্মযে ভিতবেব মহিলা এগিযে এসে ভদ্রলোকেব পাশ দিযে দেখলেন। তাবপবেই হাসিমুখে ব্যস্ত আহ্বান জানালেন, ও... আসুন আসুন। আঃ, দবজা আগলে দাঁডিযে থাকলে ওঁবা আসেন কি কবে।

শেষেবটুকু ভদ্রলোকেব উদ্দেশে। তিনি অপ্রস্তুত মুখে সবে দাঁডালেন। মোহিনী আব বিভা সবকাব ভিতবে ঢুকলেন। মহিলা সামনেব কাঠেব চেযাব দুটো দেখিযে বললেন, বসুন—

চেযাব দুটোব পাশেই একটা ইজিচেযাব পাতা। বিভা হাসি হাসি মুখে একটা কাঠেব চেযাবেব দিকে এগোলেন। কিন্তু বসাব আগেই বাধা পডল। মোহিনী সবকাব প্র্যাকটিস অনেক ছেঁটে দিলেও বাঘা উকিল তো বটেন। মনে মুখে তেমন লাগাম টেনে কথা বলাব অভ্যেস নেই। তিনি ভদ্রলোকেব দিকে ফিবে বলে উঠলেন, দাঁডান, একটা জিনিস আগে বুঝে নিই, উনি (মহিলা) কাব সঙ্গে কথা হচ্ছে জিজ্ঞেস কবতে আপনি জবাব দিলেন, আমাদেব সেই ওবা—মানে, আপনাদেব আমবা... কি বকম ব্যাপাব?

বিভা সবকাবেব চোখে কৌতুক, মহিলাব অপ্রতিভ মিষ্টি মুখ। ভদ্রলোকেব বাইবেটা একটু নির্লিপ্ত গম্ভীব বটে, কিন্তু কথা একটু কৌতুক-ছোঁযা হেযালি গোছেব। বিনীত জবাব দিলেন, আমাব বলাব মধ্যে একটু ভুল হযেছে। বলা উচিত ছিল বাইবে দেখা হযে গেলে আমবা যাঁদেব সেই ওঁবা।

জবাব শুনে তুখোড চালাক মানুষ মোহিনী সবকাব ভিতবে ভিতবে একটু হোঁচট খেলেন। অথচ কথাগুলো সঠিক বোধগম্য হল না। মহিলা তাডাতাডি ব্যস্ত হযে উঠলেন, আপনাবা বসুন, ওঁব কথায কান দেবেন না—

বসাব আগে মোহিনী সবকাব বললেন, দাঁডান, আগে নিজেবা নিজেবা পবিচয কবে নিই। আমি মোহিনী সবকাব, পেশা হাইকোর্টেব ওকালতি—আব ইনি আমাব স্ত্রী মিসেস সবকাব—আপাতত প্র্যাকটিস অর্ধেকেব বেশি ছেডে দিযে এঁব শাসনে আছি—

ভদ্রলোক গম্ভীব গলায বলে উঠলেন, আ-হা, সুশাসন বলুন। নমস্কাব, নমস্কাব। আমাব যে নামটা ইদানীং সব থেকে প্রিয সেটা হল খোকা—যত বয়েস হচ্ছে এই নামেব টান ততো বাডছে। তাই আমি খোকা গাঙ্গুলি।

মোহিনী সরকার এবারে বুঝলেন, ভদ্রলোক বাইরে যেমনই হোক ভিতরে রসিক মানুষ। হাসিমুখে নিজেও তক্ষুণি একটু রসিকতা করে বসলেন, আপনাকে তাহলে খোকাবাবু বলে ডাকব?

—নিশ্চয় ডাকবেন। একদিকে মিষ্টি, অন্যদিকে লোকে শুনলে মজা পাবে।

পরিচয় শেষ হবাব আগেই থেমে যাবাব উপক্রম দেখে একটু বেশি আগ্রহ নিয়েই হয়তো মহিলাকে দেখিয়ে মোহিনী সরকাব জিজ্ঞেস কবলেন, ইনি...?

নির্লিপ্ত গম্ভীর গলায় খোকা গাঙ্গুলি বললেন, ইনি আমাব ছোট শালী।

শোনামাত্র মোহিনী সবকাব আব বিভা সবকাব বিমূঢ়, হতচকিত। এটা বাইবেব ঘব, যত বয়সই হোক শালী নিয়ে একঘবে...

কিন্তু ভালো কবে মাথায কিছু ঢোকাব আগেই ভদ্রলোকেব উদ্দেশে মহিলাব ধমক শোনা গেল।—কি হচ্ছে? মুখ লাল করে অভ্যাগতদেব দিকে ফিরে সুন্দব দু'খানা হাত জোড কবে বললেন, আমি মিসেস গাঙ্গুলি।

পলকে ঘব ছেড়ে পাশেব ঘব থেকে একটা মোড়া নিয়ে এলেন।—বসুন আপনাবা, আমি এতে বসি।

যে যাব আসন নিলেন। সরকাববা দু'জন কাঠেব চেয়াবে, খোকা গাঙ্গুলি ইজি-চেয়াবে। বসাব পবেই মোহিনী সবকাব অপ্রস্তুত। কাবণ বসার ফাঁকটুকুব মধ্যে স্ত্রীব দিকে চেয়ে তিনি একটা বিজয়ীব দৃষ্টি হেনেছেন, তাবপব মুখ ফিরিয়েই দেখেন, ভদ্রলোকেব নির্লিপ্ত দু'চোখ তাঁবই মুখেব ওপব। চোখোচোখি হওয়ামাত্র খোকা গাঙ্গুলি আলতো করে জিজ্ঞেস কবলেন, কি হল? আপনি জিতেছেন আব আপনাব স্ত্রী হেবেছেন?

শুনে ববাববকাব স্মার্ট মানুষ মোহিনী সবকাব হঠাৎ ভ্যাবাচ্যাকাই খেলেন একটু। —কি বলছেন?

—দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান, না, মানে সবুব করুন। গম্ভীর মুখে ঈষৎ ভ্রূকুটি।—সেই প্রথম থেকে দেখছি আপনি আমাব সোজা-সোজা কথাগুলোও বুঝতে পাবছেন না। আচ্ছা, গোড়া থেকে একে একে বোঝাপড়াটা হয়ে যাক—

এ পর্যন্ত বলেই স্ত্রীব দিকে ফিবলেন।—এঁদেব একটু চা দিতে বলো... আমি আধ পেযালাব বেশি না।

সকোপে তাঁব দিকে ফিবে তাকাতে গিয়ে মহিলা হেসে ফেললেন। অতিথিদেব বললেন, আসলে এঁর দু'বাব হয়ে গেছে বলে আব সিকি পেয়ালাও জোটাব কথা নয়—

ভদ্রলোক গম্ভীব গলায তাগিদ দিলেন, তাড়াতাড়ি। এঁদেব সঙ্গে বোঝাপড়াটা শুরু কবতে পারছি না।

মহিলা তক্ষুণি উঠে গেলেন। প্রথম পরিচয়পর্ব এমনি অভিনব যে সৌজন্যেব খাতিরেও দু'জনেব কেউ চা থাক বলাব ফুবসত পেলেন না। খোকা গাঙ্গুলি আধবসা থেকে তিন কোয়ার্টার শুয়ে পড়লেন। আব সেই ফাঁকে সরকাব-দম্পতি বার দুই দৃষ্টিবিনিময় কবে নিলেন। কাজেব লোকটিকে চায়ের কথা বলে মিসেস গাঙ্গুলি এক মিনিটের মধ্যে ফিরে হাসিমুখে আবাব মোড়ায বসলেন।

মোহিনী সরকার ভিতরে ভিতরে বেশ কৌতুকবোধ করছিলেন। সপ্রতিভ মুখে বললেন, খোকাবাবু এবারে বোঝাপড়া শুরু হোক—

খোকাবাবু আবার সোজা হলেন। কিন্তু অতিথির কথা কানেও গেল না যেন। স্ত্রীর দিকে ঝুঁকলেন, বেন্দাটাকে কি বলে এলে, আমাকে এই একটুখানি অন্তত দেবে তো? আঙুলে করে পরিমাণ দেখালেন।—না কি এঁরা খাবেন আমি বসে বসে দেখব?

সরকার-দম্পতি একটু জোরেই হেসে উঠলেন। মহিলার হালছাড়া হাসিটুকু আরো সুন্দর। বললেন, এই রকমই বলার স্বভাব, আপনারা ভাবছেন আমি ভালো করে খেতেই দিই না—

সঙ্গে সঙ্গে খোকা গাঙ্গুলির ভ্রূকুটি এবং বিস্ময়।—সোমা। তুমি আর যা-ই করো, মিথ্যের আশ্রয় তো নাও না। ওঁরা ভাবছেন কি রকম? সামান্য একটু চা নিয়েই যা ব্যাপার, বৃহৎ ব্যাপারে তুমি কি করো সে-কি এঁদের বুঝতে বাকি যে তুমি এঁদের অন্যরকম ভাবাতে চাইছ।

এ ক'দিনের দূর থেকে দেখা মানুষটার এমন রসের ফল্গুধারা কল্পনা করা যায় নি। তাঁদের বিশেষ জল্পনা-কল্পনা ছিল এই সোমা গাঙ্গুলিকে নিয়ে। সোমা নামটাও বেশ লাগল মোহিনী সরকারের। খোকা গাঙ্গুলি ছাড়া হাসছেন সকলেই। সোমা বললেন, লোকের সামনে আমাকে নাকাল করতে পারলেই ওঁর খুব আনন্দ।

মোটা ফ্রেমের পুরু কাচের চশমার ওধারে খোকাবাবুর দু' চোখ এবার মোহিনী সরকারের মুখের ওপর।—কি বলছিলেন.. বোঝাপড়া? হ্যাঁ, আমি বলছিলাম আপনি আমার জলের মতো কথাগুলোও বুঝতে পারছেন না। যেমন, এক—যেমন, আমরা আজ বেরুইনি কেন জিজ্ঞেস করতে আমি বললাম, আমার শরীরটা নাকি আজ ভালো নেই। ওই 'নাকি' শুনে আপনি অবাক। অথচ একটু আগে আপনি নিজেই বললেন, প্র্যাকটিস অর্ধেকের বেশি ছেড়ে এখন স্ত্রীর শাসনে আছেন। সেই শাসনটা যদি আস্তে আস্তে নিখাদ সুশাসনের দিকে গড়ায় তাহলে দেখবেন আপনার শরীরের খবর আপনার থেকে আপনার স্ত্রী ঢের বেশি রাখেন।

—দুই। আমি স্বীকারই করলাম, আপনাদের আমাদের সেই ওরা বলা ঠিক হয়নি —বলা উচিত ছিল, বাইরে দেখা হয়ে গেলে আমরা যাদের সেই ওঁরা। তাই শুনেও আপনি বিলক্ষণ অবাক। অথচ বাইরে দেখা হয়ে গেলেই আপনারা যে আমাদের বেশ খুঁটিয়ে দেখেন, একজনের চোখে না পড়লে আর একজনকে খোঁচা দিয়ে বা ইশারায় আমাদের দেখান, আর আমাদের নিয়ে আলোচনা করেন—এসব আমার থেকে আপনারাই ভালো জানেন। এবারে আমার জবাবটা বুঝতে আর বোধহয় খুব অসুবিধে হচ্ছে না।

—তিন। সোমা আমার স্ত্রী শুনেই যেভাবে আপনি আপনার স্ত্রীর দিকে তাকালেন, আমার ধারণা, শুধু বাজী জিতলেই অমন করে তাকানো যায়। কিন্তু আমি জেতা-হারার কথা বলতে আপনি বুঝতেই পারলেন না।

বিভা সরকারের দু' চোখ কপালে। লজ্জিত আর অপ্রস্তুত তো বটেই, অদ্ভুত ভালোও লাগছে। অথচ এই মানুষকে দেখে দূর থেকে স্বল্পভাষী মনে হত। আডভোকেট

মোহিনী সবকাব চক্ষুলজ্জার ধাব ধাবেন না। এ যাবৎ অনেক মানুষ দেখেছেন, অনেক মানুষ চবিয়েছেন। সামান্য আলাপে এই লোকেব বিচক্ষণ দৃষ্টিশক্তি আব অতি সহজে দু'যে দু'যে চারে পৌঁছানোব ক্ষমতার প্রশংসা না কবে পাবলেন না। কোনো কথাব প্রতিবাদ না কবে অল্প অল্প হাসছিলেন তিনি। মুখেব দিকে চেয়েছিলেন। হঠাৎ একটু উৎসুক হয়ে জিজ্ঞেস কবলেন, আচ্ছা, এব আগে আপনাকে কি আমি কখনো কোথাও দেখেছি—অথবা আপনি আমাকে দেখেছেন?

ভালো কবে মুখের ওপব একটু চোখ বুলিয়ে খোকাবাবু জবাব দিলেন, শাস্ত্রমতে দু'জনেই দু'জনকে দেখেছি।

—সেটা কি বকম? মোহিনী সবকাব উৎসুক।

—শাস্ত্র বলে আমাদেব প্রত্যেকটা যোগাযোগ পূর্বনির্দিষ্ট। আগেব যোগাযোগ ভিন্ন কোনদিন কাবো সঙ্গে পবেব যোগাযোগ হয় না।

—আগেব বলতে?

—আগেব বলতে আগেব জন্মেব হতে পাবে—তাব আগেবও হতে পাবে।

মোহিনী সবকার হাসলেন একটু।—না আমি এই জন্মেব কথাই বলছি।

খোকাবাবু আবাব তাঁকে দেখলেন। বললেন,. মনে পড়ছে না।

বৃন্দাবন ট্রে তে তিন পেয়ালা চা আব ডিশে বিস্কুট নিয়ে এলো। সোমা মোড়া ছেড়ে উঠে ভবতি পেয়ালা দুটো অভ্যাগতদেব দিলেন আব কম চায়েব পেয়ালাটা তৃতীয় জনকে। বিভা সবকাব জিজ্ঞেস কবলেন, আপনারটা?

জবাব দেবাব আগেই খোকা গাঙ্গুলি বলে উঠলেন, চলে না, চলে না—আমাব আব এক দুর্ভাগ্য দেখুন, চায়েব সঙ্গী পর্যন্ত নেই। স্ত্রীব দিকে ফিবলেন, তুমি আব এক পেয়ালা দুধ নিয়ে বোসো না, লজ্জা কি?

অন্যদিক থেকে কোপেব প্রতিক্রিয়াটুকু অবিমিশ্র মিষ্টি লাগল মোহিনীবাবুব।

পবপব কয়েক চুমুকে নিজেব পেয়ালা খালি কবে এবং সেটা ইজিচেয়াবেব পাশে বেখে খোকা গাঙ্গুলি নিশ্চিন্ত। একটু চুপ কবে থেকে বললেন, এবাবে আমাদেব নিয়ে আপনাদেব আসল যা কৌতূহল সেটা ব্যক্ত কবে ফেলুন—একটুও লজ্জা কববেন না, আমি ও জিনিসটা অনেককাল বর্জন কবেছি।

মোহিনী সবকাব ঠোঁট-কাটা মানুষ, কিন্তু এ এমনি এক পবিস্থিতি যে অজ্ঞতাব ভান কবা ছাড়া উপায় নেই। বললেন, আব কি কৌতূহল?

—বলেন কি মশায়! ভদ্রলোক সত্যেব অপলাপ দেখেই যেন আবো অবাক। —উনি আমাব দ্বিতীয় পক্ষ না তৃতীয় পক্ষ নাকি চতুর্থ পক্ষ এই প্রশ্ন আপনাদেব মনে নেই বলতে চান?

কর্তাব থেকেও এবাবে বিভা সবকাব বেশি ফাঁপবে পড়লেন। সোমা গাঙ্গুলি এবাবে ধমকেই উঠলেন, সেই থেকে তুমি যা করছ ওঁবা আব এদিক মাড়াবেন না।

মোহিনী সবকার বললেন, নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাবা না চাইলেও আমরা নিশ্চয় মাড়াবো, কাবণ দোষী হয়েও এত আনন্দ কমই মেলে—লোকচরিত্র পাঠে উনি সিদ্ধ মানুষ এ অস্বীকাব কবতে পাবছি না।

লজ্জা পেযেও সোমা গাঙ্গুলি বলতে গেলেন, শুনুন এব মধ্যে ওঁব শবীবটা—

খোকা গাঙ্গুলি একটা হাত তুলে বাধা দিলেন।—থামো, অপ্রাসঙ্গিক কথা আমি ববদাস্ত কবি না জানোই তো। গম্ভীব।—কথা তোমাকে নিযে আমাকে নিযে নয। এঁদেব কৌতূহল এমন বৃদ্ধেব অমন প্রায-তরুণী ভার্যা কেন—বা কোন্ পক্ষেব। মোহিনী সবকাবেব দিকে ফিবলেন।—ঠিক কি না?

মোহিনী সবকাব ওকালতিব মাথা খাটালেন। জবাব দিলেন, কৌতূহল যদি অস্বাভাবিক না হয, অপবাধ স্বীকাব কবছি।

—খুব স্বাভাবিক। আমাব মতো বৃদ্ধ কাবো কৌতূহলেব বিষয নয, ওঁব মতো মেযেও কাবো কৌতূহলেব ব্যাপাব নয—দুই অসমেব সাতপাকেব অঘটনটুকুই কৌতূহলেব স্বাভাবিক কাবণ। এই কাবণ না থাকলে আপনাবা হযতো আসতেনই না। স্ত্রীব দিকে ফিবলেন. অতিথিদেব বিমুখ না কবে তুমিই বলে দাও কোন পক্ষ। এব মধ্যে লজ্জা পাবাব বযেস তো কাবো নেই—

সোমা গাঙ্গুলি প্রায ধমকেব সুবে বললেন, চালাকি কবে কেবল কথা ঘোবাচ্ছ, তুমি আমাকে বলতে দিচ্ছ? বিভাব দিকে ফিবলেন।—শুনুন, যা বলছিলাম, এই ছ' মাস হল—

—অবজেকশন মাই লর্ড অ্যান্ড লেডি—অবজেকশন। ইবেগুলাব, ইব্যাশানাল অ্যান্ড ইমমেটিবিযাল। মোহিনী সবকাবেব দিকে তাকিযে গলা খাটো কবলেন খোকা গাঙ্গুলি।—আপনাদেব ভাষাটা ঠিক হল? তাবপবেই আবাব গলা চড়ালেন।—শুনুন, মেযেবা—না মানে আমাব স্ত্রী অন্তত ঘোবা পথে চলেন, অর্থাৎ সোজা প্রশ্নেব সোজা জবাব দিতে চান না, এ প্রমাণ তাহলে হযেই গেল। ঠিক আছে, জবাব আমিই দিচ্ছি। পক্ষ বিচাবে আপনাদেব সব অনুমানই ভুল, এ সম্পর্কে একটা বিচাবই খাটে—উনি চিবদিনই আমাব বিপক্ষ।

হাসিব মধ্যেই বিভা সরকাব ঈষৎ বিস্মযে বলে উঠলেন, তাব মানে উনি তাহলে প্রথম পক্ষ?

—একেবাবে খাঁটি ধবেছেন ম্যাডাম। আদি এবং অকৃত্রিম। স্ত্রীব লাল মুখেব দিকে চেযে এবাবে গম্ভীব আবাব।—তাহলে একটা প্রশ্ন থেকেই যায—প্রজাপতিব এমন অসম নির্বন্ধ ঘটে কি কবে। অতিথি দুজনকে সচকিত কবে স্ত্রীকে হঠাৎ রুক্ষ কণ্ঠে ধমকে উঠলেন তিনি, কতদিন বলেছি বযেসেব সার্টিফিকেটটা গলায ঝুলিযে নাও—লোকেব কাছে আমাকে এমন অপ্রস্তুত কবাব মানে কি?

বকুনিব শেষ শুনে সবকাব-দম্পতি আবও মজাদাব বিস্মযেব আঁচ পেলেন। সোমাব লালচে মুখে হাসি চুঁযে পড়ছে। বললেন, নিজে অসমযে সাত বুড়োব এক বুড়ো সেজে বসে আছ লজ্জাও কবে না।

অন্য দুজন মুখ চাওযা-চাওযি কবছেন। খোকা গাঙ্গুলিব মুখে স্বভাবসুলভ গাম্ভীর্যেব ফাঁকে টিপটিপ হাসি। বললেন, এবাবে তাহলে উপসংহাবে আসা যাক। যদিও মেযেদেব বযেস নিযে আলোচনা এটিকেটেব বাইবে, তবু এই জমাটি পবিবেশেব খাতিবে আমবা অকপট হতে পাবি। বিশেষ কবে যা নিযে এত কাণ্ড—দু'চোখ মোহিনী সবকাবেব দিকে।—এবাব আপনি তাহলে আমাব মিসেসেব বযেসটা অনুমান করুন।

মোহিনী সবকাব বোকা নন আদৌ। অনুমানেব বেশ ওপরেই উঠলেন—পঞ্চাশ একান্ন...

হাসিমুখে সোমা গাঙ্গুলি ঘোষণা কবলেন, আটান্ন।

—কক্ষনো না। প্রতিবাদ বিভা সবকাবেব। তাঁব থেকেও মহিলা এক বছরেব বড এ বিশ্বাস কবেন কি কবে?

সোমা গাঙ্গুলি তেমনি হেসেই বললেন, তা হলে কলকাতায ফিরে একদিন বাডিতে আসুন, এজ্ সার্টিফিকেট দেখাব।

মোহিনী সবকাব বলে উঠলেন, তাহলে কংগ্র্যাচুলেশনস—অনেক কংগ্র্যাচুলেশনস সোমা দেবী। এভাবে বযসেব চোখে ধুলো দেওযাটা আমি দস্তুবমতো ক্রেডিট মনে কবি।

ঘবেব লোককে দেখিযে এবাবে টিপ্পনীব সুবে সোমা গাঙ্গুলি বললেন, তাহলে ওঁকেও একটু কংগ্র্যাচুলেট করুন, আমাব থেকে উনিও বযেসেব চোখে কম ধুলো দেননি--উনি সবে তেষট্টি এ কেউ বিশ্বাস কববেন, আমাব থেকে মাত্র পাঁচ বছরেব বড।

অর্থাৎ মোহিনী সবকাবেব সমবযসী। অন্য দু'জনকে এবাবেও একটু হকচকিয়ে যেতে দেখা গেল। খোকা গাঙ্গুলি বললেন, বিশ্বাস কববেন না। আপনাব বৃদ্ধেব তরুণী ভার্যাব বস্টুকুই মাটি তাহলে।

—থামো। অন্যাদেব দিকে ফিবলেন সোমা গাঙ্গুলি।—এই জন্যেই আমাকে বাব বাব থামিযে দিচ্ছিলেন, বুঝলেন?... ক'মাস আগে ওঁব একটা অপাবেশন হয়ে গেল, প্রোসট্রেট অপাবেশন—সঙ্গে আবো সতেব ব্যাপাব—অপাবেশনেব পবেই তাব ওপব নিউমোনিযা—যমে-মানুষে এমন টানাটানি আমি আব দেখিনি। তাবপবেই মাথাব চুলগুলো সব সাদা হযে গেল আব শবীবেব এই হাল। দেখলে কেউ ভাবতেও পাববে না কি চেহাবা কি হযে গেল।

খোকা গাঙ্গুলি গম্ভীব।—অর্থাৎ তখন ওঁব মতে আমি রূপবান পুরুষ ছিলাম।

মোহিনী সবকাব আর বিভা সবকাবেব সত্যি ভাবি ভালো লাগছিল। বিভা বললেন, আপনি যা-ই বলুন, অনেক ঠকেছি আমরা, আব আপনাব কথাব ফাঁদে পডতে বাজি নই।

খোকা গাঙ্গুলি স্ত্রীকে বললেন, এবাবে শুধু ওঁদেবই তাহলে আর এক পেয়ালা করে চা হোক।

মোহিনী সরকাব তাডাতাড়ি বাধা দিলেন, আব চা না, আমাবও বেশি চাযে একটু অসুবিধে আছে—গল্প কবতে খুব ভালো লাগছে... আপনাদেব সময নিচ্ছি না তো?

—দয়া কবে সময় দিচ্ছেন, খোকা গাঙ্গুলিব বিনীত জবাব, একটা বিকেল সন্ধ্যা ভালো কাটছে।

ভালো বিভারও খুব লাগছে। গলা একটু খাটো কবে সোমাকে বললেন, অসুস্থ মানুষকে একলা নিয়ে বেবিযে পড়েছেন, আপনাব ছেলেপুলে...?

খোকা গাঙ্গুলি বলে উঠলেন, সে কথা তুলে আর লজ্জা দেবেন না, একটা দুটো নয়, একেবাবে পাঁচটি। প্রথমে দুই ছেলে পবে তিন মেয়ে। গেলবারে ছোট মেয়েটাবও বিয়ে হযে যেতে এখন আমাদেব নির্ঝঞ্ঝাটি হনিমুন।

যিনি বলছেন, তাঁরই শুধু সিরিয়াস মুখ। অন্য সকলের হাসির ফাঁকে বিভা সরকার পাঁচ ছেলেমেয়ের মায়ের স্বাস্থ্যের ওপর আর একবার চোখ না বুলিয়ে পারলেন না। সোমা গাঙ্গুলি জিজ্ঞেস করলেন, আপনারাও তো দু'জনেই এসেছেন দেখছি... আপনার?

—একটি ছেলে। ব্যারিস্টার। উনি প্র্যাকটিস কমিয়ে দিতে ওর ওপর চাপ বেশি—বেড়াবার সময়-টময় হয় না।

খোকা গাঙ্গুলি গম্ভীর মন্তব্য করলেন, ইন্দিরা গান্ধীর প্রাইজ দেওয়া উচিত আপনাদের—ছোট পরিবার সুখী পরিবার।

তেমনি নকল গাম্ভীর্যে মোহিনী সরকার বললেন, আপনাদের দেখে অসুখী যারা বলবে তাদের জরিমানা হওয়া উচিত। একটু কৌতূহল হচ্ছে, আপনার পেশাটি জানতে পারি?

খোকা গাঙ্গুলি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, ব্যবসা।

—ব্যবসা বলতে?

—মিথ্যেকথার ব্যবসা। যত মিথ্যে বলি লোকে ততো খুশি আর ব্যবসাও ততো জমজমাট।

মোহিনী সরকার বিভা সরকার দু'জনেই চেয়ে আছেন। সোমা অল্প অল্প হাসছেন। খোকা গাঙ্গুলি বললেন, বুঝলেন না তো? তাহলে শুনুন—

নিজের ইজি-চেয়ারেই জমিয়ে বসলেন একটু। তেমনি গম্ভীর। পুরনো দিনের কথা মনে করার মতো করে বলে গেলেন, সে অনেক কাল আগের কথা, বিলেত থেকে এক জাহাজ মিথ্যেকথা চালান এসেছিল আউট্রাম ঘাটে। আমার তখন বেকার দশা। শুনে পড়ি-মরি করে ছুটলাম। কিন্তু গিয়ে দেখি সর্বনাশ কাণ্ড। আগেভাগে টের পেয়ে বাঘা-বাঘা ব্যবসায়ীরা এসে সব কিনে নিয়ে গেছে। আমার মনে দুঃখ শুধু হল না, ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখতে লাগলাম। রাগে শোকে ওই গঙ্গাতেই প্রাণ বিসর্জন দেব ঠিক করে ফেললাম। বেগতিক দেখে মা গঙ্গা উঠলেন। বললেন, বাছা আত্মঘাতী হয়ে কাজ নেই, এখন থেকে মিথ্যাই তোর স্বচ্ছন্দ জীবিকার অবলম্বন হবে। ব্যস, আর কি, তারপর থেকে ওই মিথ্যের নৌকোতেই ভেসে চলেছি।

বিভা সরকার হাসতেও পারছেন না, হাসি চাপতেও পারছেন না। সোমা গাঙ্গুলি সকৌতুকে স্বামীর গম্ভীর মুখের দিকেই চেয়ে আছেন। মোহিনী সরকার ধরে নিলেন, ব্রোকারি অর্থাৎ দালালি টালালি হবে ভদ্রলোকের জীবিকা। মিথ্যের ফুলঝুরি ওই লাইনেই বেশি ছোটাতে হয়। তাই আর জেরার মধ্যে না গিয়ে তারিফ করলেন, আপনি তো ভাগ্যবান, অসৎ রাস্তা ধরেন নি—আমরা সত্যকে মিথ্যে করছি আর মিথ্যেকে সত্য বানাচ্ছি। যাক, এখানে আছেন কতদিন?

—জানি না। উনি যদি মনে করেন আমার শরীর ভালো যাচ্ছে তাহলে চট করে নড়া-চড়ার কোনো প্রশ্ন নেই। আপনারা?

—আপনার মতো অতটা না হলেও আমারও উনিশ বিশ একই ব্যাপার। দু'বছর আগে একটু মাইলড স্ট্রোক হয়েছিল, সেই থেকে ওঁর বিবেচনায় খুব সুস্থ থাকছি না।

খোকা গাঙ্গুলি বলে উঠলেন, বাঃ এদিক থেকে আমরা তাহলে সতীর্থ।

বিভা সরকাব এবারে উঠে দাঁড়ালেন, এখন চলো, অনেক জ্বালিয়েছি, আব না। খোকা গাঙ্গুলির দিকে ফিরলেন, আপনাবা আমাদের বাড়িতে কবে যাচ্ছেন বলুন, অনেকক্ষণ সময় নিয়ে যেতে হবে—আর আপনি কি খেতে ভালবাসেন বলুন।

খোকা গাঙ্গুলি নিজেব স্ত্রীব দিকে তাকালেন।—দেখলে, কেবল তুমিই বলো কথার চোটে কান ঝালা-পালা—কথাব জাদু দেখলে? বিভাব দিকে ফিবলেন, খাওয়ার ব্যাপারে আমি ভেজ ননভেজ দুইয়েবই উপাসক—মোচাব কাটলেট আব চিকেন কাটলেট দুইই সমান রেলিশ কবে খাই। আপনি যেভাবে বলছেন, কাল যেতে পাবি, পরশু যেতে পাবি, তবশু যেতে পারি—আবাব কাল পরশু-তবশু বোজই যেতে পারি।

বিভা সবকাব হাসি মুখে মাথা নাড়লেন, বেশ তো যাবেন—এমন কান ঝালাপালাব আশায আমবা খুব আগ্রহ নিযে অপেক্ষা কবব।

পবদিন না হোক, তাব পবদিন সত্যিই এসেছেন তাঁবা। সবকাব-দম্পতি খুশিব অভ্যর্থনা জানিযেছেন। আব ভদ্রলোকেব গল্প জমাবার প্রতিভা দেখে এদিনও মুগ্ধ হয়েছেন। আব খোকা গাঙ্গুলি মুগ্ধ হযেছেন এমন অল্প সমযেব মধ্যে খাওযাব ব্যবস্থা দেখে। সত্যি গবম চিকেন কাটলেট এসেছে, চমৎকাব স্যালাড এসেছে, ফ্রাযেড পোটাটো এসেছে, শেষে পুডিংও। খোকা গাঙ্গুলি হাঁ কবে খানিক দেখলেন। তাবপব না হেসে সোল্লাসে বলে উঠলেন, আপনি একি জাদু জানেন—ঘাটশিলায এই সব।

বিভা বললেন, আমাব বাহাদুবি নেই, উনি বাইবে বেরুলে আমি সঙ্গে না থাকলেও চলে—পুবনো খানসামাটা না হলে চলে না—তাকে সঙ্গে আনাই চাই।

—খানসামা! আ-হা! সোমাব দিকে ফিবলেন, দেখো, এবাব থেকে ওঁদেব আব কষ্ট কবে আমাদেব ওখানে যাওয়াব দরকাব নেই, আমবাই যখন পাবি এসে যাব'খন।

বিভা খুশিমুখে রাজি।—আসবেন, ও জন্যে ঘাবড়াই না। স্বামীকে দেখিযে শোনালেন, উনি সেদিন বলছিলেন, ভদ্রলোকেব কথা শুনলে আব তাঁব সঙ্গে কথা বললে মনে হয খানিকটা আয়ু বাড়ল। তবে এব পরে আপনাব খাওযাব ব্যাপাবে আপনাব মিসেসেব মতামত নেব কিন্তু।

—নিশ্চয নেবেন। সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীব সায।—তবে দযা করে আমাব খাওযাব আগে নয, পরে।

খাওয়াব শেষে বড কবে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন।—আঃ, আমাবও পরমাযু কিছু বাড়ল!... তবে আমাদের তফাৎ খুব নেই বুঝলেন, আমি খাই-খাই কবে খাই আব উনি (স্ত্রীকে দেখিযে) ভালো জিনিস হলে খাই-না খাই-না ভাব দেখিযে খান।

সোমা গাঙ্গুলিব পুডিং খাওযায ছেদ পডল। হেসে ফেললেন।

বিভা তাড়াতাড়ি বললেন, আপনি খান তো। ভদ্রলোকেব দিকে ফিবলেন, আপনি সব থেকে বেশি মজা পান দেখছি ওঁব পিছনে লেগে।

খোকা গাঙ্গুলির নিরীহ মুখ।—অন্যেব পিছনে লেগে অত নিরাপদ বোধ করি না।

মোহিনী সরকাব হা-হা শব্দে হেসে উঠলেন।—আপনাকে কথাশিল্পী বলি, না কথাসাগব বলি।

এই সামান্য কথায় সোমা গাঙ্গুলিব বেশ একটু আনন্দ দেখা গেল। মন্তব্য কবলেন, তাই বললে যদি একটু জব্দ হন।

আব এই সামান্যতেও খোকা গাঙ্গুলি দমে গেলেন।—অমন কাণ্ডটি কববেন না, শুনলে সাহিত্যিকেব দল আপনাকে ঘেবাও কববে। যাক, ঘাটশিলায বেড়ালেন কেমন?

বিভা জবাব দিলেন, এখানে ওই সরু পাথুবে সুবর্ণবেখা আব ওই টিবি ছাড়া বেড়াবাব কি আছে—দেখাবই বা কি আছে!

খোকা গাঙ্গুলি বললেন, সুবর্ণবেখাব বিক্রম দেখতে হলে বর্ষায আসবেন। মৌভাণ্ডাবেব কপাব কর্পোবেশন তো মাত্র দেড় মাইলেব মধ্যে—দেখে আসতে পাবেন। ..কপাব মাইন অবশ্য মাইল ছযেক হবে এখান থেকে, মোসাবাণী থেকে বাখা মাইনস পর্যন্ত চলে গেছে। সাইকেল বিকশ নিযে তা-ও ঘুবে আসতে পাবেন। একটু থেমে আবাব বললেন, এই ঘাটশিলাকে হেলাফেলা কববেন না—একদিন এই ঘাটশিলা ছিল ধলভূমেব বাজধানী। ধলভূম বামেব অধিষ্ঠাত্রী দেবী বংকিণীব মন্দিবও দেখে আসতে পাবেন—এই আশ্বিনেই সেখানে সাঁওতালদেব বিন্দ মেলা হয, টানা পনেব দিন চলে —ওদেব সব থেকে বড় উৎসব এখানকাব।

সবকাব-দম্পতি মন দিযে শুনছিলেন। বিভা সবকাব বললেন, কিছুই তো দেখি নি এখনো . আপনি বুঝি অনেকবাব এখানে এসেছেন?

খোকা গাঙ্গুলি তক্ষুণি মাথা নাড়লেন।—আমাবও এখানে এই প্রথম, আব এখন পর্যন্ত সুবর্ণবেখা ছাড়া আব কিছুই দেখি নি।

তাঁবা অবাক।—সে কি?

সোমা মুখ টিপে হেসে জবাব দিলেন, এটা মিথ্যে নয, যেখানে যখন যান, আগে লাইব্রেবি থেকে বই আনিযে সে জাযগা সম্পর্কে খুঁটিযে পড়ে নেন।

অন্য দুজনেব কৌতূহল স্বাভাবিক। মোহিনী সবকাব জিজ্ঞেস কবলেন, কেন, পবে দেখতে সুবিধে হয বলে?

সোমা গাঙ্গুলি তেমনি জবাব দিলেন, মিথ্যেব ব্যবসাবও কিছু সুবিধে হয বোধহয।

ওঁবা না বুঝেও হাসলেন। সন্ধ্যা গড়িযে গেছে, এবাব ওঠাব তাড়া। অবশ্য বিকশতেই যাবেন, অল্প বাস্তা হলেও হিম লাগাব ভযে সোমা তাঁব ভদ্রলোককে হাঁটতে দেবেন না।

সকলে একসঙ্গে নেমে আসতেই খোকা গাঙ্গুলিব দু'চোখ তামাব খনিব দিকে গেল। ওদিকটা গনগনে লাল। সেই লালেব আভা আকাশ পর্যন্ত ছড়িয়েছে। বাত হতে না হতে বোজই সকলেব চোখে পড়ে তামাব খনিব অগ্নিকুণ্ডেব আগুন। সেদিকে চোখ বেখে খোকা গাঙ্গুলি নিস্পৃহ মন্তব্য কবলেন, ওই তপতপে লাল দেখতে বেশ লাগে আমাব, ঘবে যিনি আছেন তাব সঙ্গে ওটাব প্রাযই খুব মিল দেখি।

মোহিনী সবকাব জোবেই বলে উঠলেন, অবজেকশন—অবজেকশন। একজন মহিলাব ওপব আপনি মিথ্যে অপবাদ চাপাচ্ছেন।

সোমা চাপা গলায ঠেস দিলেন, মিথ্যেব ব্যবসা পেশা নিজেই তো স্বীকাব কবেছেন—অবজেকশন দিযে কি লাভ।

পরেব তিনদিন বোজই হাটে বা বাজারে আব সুবর্ণবেখার ধারে দেখা হয়েছে। এই অন্য জুটিকে পেয়ে সরকার-দম্পতির দিন বেশ হাসিখুশিব মধ্যে কাটছে। সেদিন বাজাবে এসে তাঁবা অন্য জুটিকে দেখলেন না। অবশ্য বাজারে ওঁবা রোজ আসেন না, মাঝে মাঝে বৃন্দাবন আসে। তাকেই দেখলেন। তক্ষুণি দুজনেব মধ্যে প্ল্যান হল। একটু ঘটা করেই বাজাব সারলেন তাঁবা। বিকেল সাডে তিনটে নাগাদ দুজনে বেড়াবাব জন্য তৈবি হযে বাংলো থেকে বেরুলেন। সোজা রেল লাইনের দিকে অর্থাৎ গাঙ্গুলি বাডিব দিকে চললেন। উদ্দেশ্য বাতে বাডিতে ওঁদেব ডিনাবেব নেমন্তন্ন কববেন। সকলে একসঙ্গে বেডানো সেবে ওঁদেব সঙ্গে কবে বাংলোয ফিববেন।

পৌঁছুলেন। সামনেব ঘবেব ভেজানো দরজা দুটো চাব-ছ' আঙুল ফাঁক। মোহিনী সবকাব দরজা ঠেলতেই মেঝেতে তিনটে খাম চোখে পডল। ডাক-পিওন দবজাব ফাঁক দিযে ফেলে দিযে গেছে। খাম তিনটে তিনি ম্যাট থেকে কুডিযে নিযে সোজা হবাব ফাঁকে একটা খামেব ওপবে চোখ পডতেই থমকালেন একটু। তাবপবেই বিমূঢ কেমন। ভুরু কুঁচকে পবেব খামটাব নাম ঠিকানা দেখলেন। তাব পবেবটাবও। তাবপব আকাশ থেকে পডা মুখ কবে স্ত্রীর দিকে তাকালেন।

স্বামীব এই আচবণ দেখে বিভা সবকাবও কম অবাক নন। তিনি কিছু বলতে যেতেই একটা আঙুল ঠোঁটে ঠেকিযে মোহিনী সবকাব তাঁকে কথা বলতে নিষেধ কবলেন। তাব পবে তিনটে খামেবই ওপবেব নাম দেখালেন। ঠিকানাব ওপরে প্রত্যেকটাতে নাম লেখা, মহাদেব গাঙ্গুলি।

বিভা সবকাবও প্রথমে বিমূঢ কযেক মুহূর্ত। তাবপবেই বেশ বড় সড় ঝাঁকুনি খেলেন একটা। ওই খামেব নামেব ওপব দ' চোখ ঠিকবে পডাব দাখিল—দেখেও বিশ্বাস কবতে পারছেন না। নিজেব অগোচবে গলা দিযে অস্ফুট একটা শব্দই বেবিযে এলো। সেটা আনন্দেব থেকে ঢেব বেশি বিস্মযেব।

ভিতব থেকে খোকা গাঙ্গুলিব গলা শোনা গেল, দেখ তো ওঁরা এলেন বোধ হয়।

সোমা গাঙ্গুলি এলেন। হেসে আপ্যাযন জানাতে গিযেও থমকালেন। বিশেষ কবে বিভা সরকারেব মুখ আব চাউনি কি বকম লাগল, বললেন, কি ব্যাপাব, ওঁকে কি ছুটিয়ে নিযে এলেন নাকি?

মোহিনী সবকাবের হাত দুটো পিছনে। জবাব দিলেন, না, এখানে এসে ছুটছেন। আপনাব ভদ্রলোককে ডাকুন।

ডাকতে হল না। নিজেই এলেন। সেই চিবাচবিত গম্ভীব মুখ।—এই যে আসুন, আজ একটু সকাল সকাল মনে হচ্ছে...।

সে কথাব জবাব না দিয়ে মোহিনী সবকার একটা খাম তাঁব দিকে বাডিযে দিলেন। —এই মেঝেতে পডেছিল, দেখুন তো পিওনটা ভুল করে দিয়ে গেল নাকি!

খামটা হাতে নিযে চোখ বোলাবাব সঙ্গে সঙ্গে মোহিনী সবকাব এই প্রথম ভদ্রলোকেব মুখে চকিত বিডম্বনার ছাযা দেখলেন একটু। অস্ফুট কথাও শুনলেন, তাই তো দেখছি...

—এটা? দ্বিতীয় খাম সামনে ধবলেন মোহিনী সবকাব।

—এ-ও তো...

—আব এটা? কিছু বলাব আগেই তৃতীয় খাম।

তৃতীয় খামটাও হাতে নেবাব পব ভদ্রলোকেব মুখে বিড়ম্বনাব হাসি একটু।—এ যে দেখি মহাদেব গাঙ্গুলিব ট্রায়ো একেবাবে।

সোমা গাঙ্গুলি দ্বিতীয় খাম দেখাব পবেই ব্যাপাব বুঝেছেন। হাসি চাপাব চেষ্টায মুখে আচল চাপা দিয়েছেন।

মোহিনী সবকাব তাঁব স্ত্রীব দিকে ফিবলেন। গম্ভীব আদেশেব সুবে বললেন, চলো—

সোমা ব্যস্ত।—ও কি, বসুন।

—বসব। ওব নামে আমি ক্রিমিন্যাল কেস আনব—নাম ভাঁড়ানোব মজাখানা উনি টেব পাবেন।

সোমা হেসে বললেন, বেশ আনবেন। এখন তো বসুন।

বিভা সবকাবেব মুখে বাগ-বিবাগেব কোনো চিহ্নই নেই। দেখলে মনে হবে হঠাৎ যেন তিনি এক নতুন জগতে ঢুকে পড়েছেন। সেই উত্তেজনায দাড়াতেও পাবছেন না। একটা চেযাবে বসে পড়লেন। দ্বিতীয় চেযাবেব দিকে এগোতে এগোতে মোহিনী সবকাব বললেন, হ্যা মশাই এতগুলো দিন দিব্যি নিজেকে খোকা গাঙ্গুলি বলে চালিযে দিলেন?

মহাদেববাবুব শুধু ঠোঁটেব কোণে একটুকবো হাসি। জবাব দিলেন, মা গঙ্গাব সেই আশীর্বাদে আমাব অদৃষ্টখানা দেখুন—সত্যি বললেও সেটা মিথ্যে হযে যায। ওই নামটাও মিথ্যে নয, বাপ-মাযেব আদবেব নাম।

—আমবা তো আপনাব বাপ-মা নই, আমাদেব কাছে ওই আদবেব নাম চালানোব অর্থ কি?

ইজি-চেযাবে শবীবটাকে আবো একটু শিথিল কবে জবাব দিলেন, প্রাণেব দাযে মশাই, প্রাণেব দাযে। এখানে একটা কলেজ আছে জানি, আব এসে জানলাম বড একটা পাবলিক লাইব্রেবি আছে—আব অন্যদিকে দেযালেবও কান আছে। তাই এখানে এসেই আমি খোকা গাঙ্গুলি।

মোহিনী সবকাব জিজ্ঞেস কবলেন, কলেজ আব লাইব্রেবি আছে তাতে কি?

—এবা থাকা মানেই সাহিত্যিক শিকাবেব ফাদ পাতা—সাহিত্য সভা—সাহিত্য মিটিং—হবিবল।

—আব এখন যদি আমবাই খবব দিযে দিই?

—প্রাণে মাবা যাব। ওব (স্ত্রীকে দেখিযে) সেই মূর্তি আপনাবা দেখতে পাববেন?

সোমা গাঙ্গুলি হাসতে হাসতে বললেন, বসুন, চা আনি।

মোহিনী সবকাব চেযাব ছেড়ে উঠে দাড়িযে পড়লেন।—দাঁড়ান।

নিজেই গটগট কবে ভিতবেব ঘবে ঢুকে মোড়াটা এনে পেতে দিলেন।—বসুন। এখানে চা নয। যে ভাঁওতাবাজি ইনি আমাদেব সঙ্গে কবেছেন, আপনিও চুপ কবে

থেকে ওঁব অ্যাকসেসবি হযেছেন, তাব জেব আপনাদেব সামলাতে হবে। আমাব বায আমি পবে দিচ্ছি। তাছাড়া আমাব আবাব না ডাক্তাবেব কাছে ছুটতে হয, ইনি কে জানাব পব আমাব স্ত্রীব কথা বন্ধ হযে গেছে। যাক, আগে আপনি বসুন—

নিজেব চেযাব টেনে নিযে আবাব মহাদেব গাঙ্গুলিব মুখোমুখি।—আপনাব মিথ্যেব ব্যবসাটা তাহলে এই?

মহাদেববাবু অম্লানবদনে সায দিলেন। এই।

বিভা সবকাবেব এতক্ষণে জিভ নড়ল।—আপনি এত বড় স্রষ্টা বলেই নিজেব সৃষ্টিকেও অনাযাসে মিথ্যে বলতে পাবছেন।

মোহিনী সবকাব মন্তব্য কবলেন, বাচা গেল, ডাক্তাবেব কাছে যেতে হবে না। সোমাকে বললেন, ওঁব এখনকাব কথাব মধ্যে কেবল সুপাবলেটিভ ডিগ্রিটা লক্ষ্য কবে যাবেন।

সোমা হেসেই বললেন আপনিও তো ওব পিছনে কম লাগেন না দেখি। উনি বুঝি গল্প-উপন্যাস পড়তে খুব ভালবাসেন?

—মুখ দেখে বুঝে নিন। তবে গল্পকাব ও ঔপন্যাসিক মাত্র দুই একজনকে মাবাত্মক ভালবাসেন। এখন আমিই ওঁকে নিযে কলকাতায সবে পড়ব কিনা ভাবছি।

মহাদেব গাঙ্গুলি গুরুগম্ভীব গলায বলে উঠলেন, কি ভাগ্য—কি ভাগ্য।

মহিলাবা দু'জন কেবল হাসছেন। মোহিনী সবকাব ভদ্রলোকেব দিকে ফিবলেন। —এই বছব তিনেক আগে আপনাকে একবাব কলকাতাব বোটাবি ক্লাবে আনা হযেছিল?

একটু ভেবে মহাদেববাবু জবাব দিলেন, হযেছিল।

—আপনি সেদিন অ্যাংবি জেনাবেশন আব জেনাবেশন-গ্যাপ সম্পর্কে বলেছিলেন?

আবাবও ভেবে জবাব দিলেন, হবে...।

—হবে না। আমি বোটাবিযান, সেদিন উপস্থিতও ছিলাম। চেনা চেনা মনে হতেও চিনতে পাবি নি, কাবণ উনি (সোমা) ঠিক কথাই বলেছিলেন—আপনাব ওই অসুখ আপনাব কতটা খেযে দিযেছে এখন বুঝতে পাবছি। যাক, বোটাবি থেকে ফিবে আমাব স্ত্রীকে আপনাব কথা বলতে উনি টানা তিন দিন অভিযোগ কবেছিলেন, কেন কিছু একটা ব্যবস্থা কবে তাঁকে নিযে যাওযা হল না।

মহাদেব গাঙ্গুলি আবাব বলে উঠলেন, ভাগ্য—ভাগ্য।

এবাবে জোবালো অনুযোগেব সুবে বিভা সবকাব বললেন, কিন্তু আমাদেব তো আপনি দুর্ভাগ্যেব দিকেই ঠেলে দিযেছিলেন। আপনাব লেখা পড়ে মনে হয মানুষেব জন্য আপনাব কত মমতা, কিন্তু নিজে কত নির্মম হতে পাবেন তাব প্রমাণ পেলাম। আজ এই খাম ক'টা ওঁব হাতে না পড়লে আমবা জানতেও পাবতাম না কাব সঙ্গে এত দিন ঘুবলাম বেড়ালাম কথা কইলাম। এ কথা মনে হতে এখন আপনাব ওপব আমাব বাগই হচ্ছে।

জবাবে মহাদেববাবু আবাব একটা ভাবী নিঃশ্বাস ছেড়ে শুধু বললেন, বেচাবা খোকা গাঙ্গুলি।

গম্ভীব মুখেব যে কৌতুক এতদিন এমনি ভালো লাগছিল এখন সেটা দ্বিগুণ ভালো লাগছে দু'জনেবই। মোহিনী সবকাব এবাব হুকুমেব সুবে সোমাকে বললেন, দশ মিনিট সময দিলাম, এব মধ্যে বেডি হযে আসুন।

সোমা বললেন, দাঁড়ান, আগে চা হোক, ওঁবও এখন পর্যন্ত জোটেনি।

—নো টি। মোহিনী সবকাবেব বিচাবেব মুখ।—এখন আপনাবা দু'জনেই আমাদেব আসামী—আমাদেব খুশিমতো আমবা আসামী ধবে নিযে যাব। চটপট বেডি হোন।

সোমাই জিজ্ঞেস কবলেন, কোথায?

—আগে ঠিক ছিল এখানে এসে আপনাদেব নিযে বেড়াতে বেরুব। বেড়িযে আপনাদেব আমাব বাডি নিযে যাব, কাবণ সেখানে আপনাদেব বাতেব ডিনাব বেডি থাকবে—

মহাদেব গাঙ্গুলি তাঁব বলাব মাঝে গুরুগম্ভীব আর্তনাদ কবে উঠলেন, যাঃ কলা, এখন সেটা বাতিল নাকি?

বিভা সবকাব হেসে উঠলেন। মোহিনী সবকাব বললেন, না, আজ বেড়ানো বাতিল —এক্ষুণি আমাদেব বাড়িতে আপনাদেব হাজতবাস, বাতেও ফিবতে পাবছেন কিনা সন্দেহ। স্ত্রীব দিকে ফিবে গলা খাটো কবলেন, কেমন, জাঁদবেল লেখকেব সঙ্গে কথাবার্তা সমান তালে হচ্ছে তো?

জবাব মহাদেববাবুই দিলেন, বললেন, বেশ হচ্ছে। কিন্তু নিযে গিযে তাবপব উত্তবপ্রদেশ থেকে মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত শাস্তিব ব্যবস্থাটা কেমন হবে?

প্রশ্নটা হঠাৎ না বুঝে মোহিনী সবকাব থতমত খেলেন একটু। তাবপব জোবে হেসে উঠলেন।—মুখ থেকে পেট পর্যন্ত শাস্তিব বাবস্থা? . তা ভালোই হবে। ইংবেজি, বাংলা দু'বকমেবই শাস্তিব আযোজন। মোচাব কাটলেট পাবেন আবাব চিকেন কাটলেটও পাবেন, ফ্রাযেড পোটাটো পাবেন ফ্রাযেড ফিশও পাবেন, ভাত পাবেন ফ্রাযেড বাইসও পাবেন, মাছেব কালিযা পাবেন চিকেন কাবিও পাবেন, কাস্টার্ড পাবেন আবাব বসগোল্লাও পাবেন—

—ব্যস ব্যস ব্যস, আমি বসেব অতলে মানে বসাতলে চলে যাচ্ছি। স্ত্রীব দিকে ফিবে তাড়া দিলেন, কই, ওঠো না শীগগিব। এত শাস্তি কি একবাবে সহ্য কবতে পাবব—এখন থেকেই শুরু হোক। শীগগিব যাও, আব দেবি কোবো না।

বাংলোয পা দিযে এইদিন মোহিনী সবকাব সোজা তাঁদেব শোবাব ঘবে নিযে এলেন। সামনে বইযেব তাকে তিনটে মোটা বই, আব তিনটে বিপুল আকাবেব পূজাসংখ্যা। তিনটে বইযেবই লেখক মহাদেব গাঙ্গুলি। একটা শ্রেষ্ঠ গল্পেব সংকলন, একটা লেখকেব নির্বাচিত গল্পগুচ্ছ আব একটা হালেব ছাপা পরিপুষ্ট আকাবেব উপন্যাস। এবাবেব ওই পূজাসংখ্যা তিনটেতেও মহাদেব গাঙ্গুলিব তিনখানা উপন্যাস আছে। মোহিনী সবকাব বললেন, তাহলে বুঝুন আমাব গৃহিণীব হৃদযে আপনাব জাযগাটি কোথায।

বিভা সবকাব প্রতিবাদ কবলেন, কেন, তুমি পড়ো না?

মোহিনী সরকার জবাব দিলেন, পড়তে হয়। কারণ আলোচনা যখন হয় তখন আমি তোমাকে বিপাকে ফেলার মতো তবলচির কাজ কবি। যেমন ধরো ওই পূজাসংখ্যাটায় ওঁর এবারের উপন্যাস 'দ্বিতীয় বাসব' পড়ে আলোচনায় আমি তোমাকে যে-রকম কোণ-ঠাসা করেছিলাম, যাব ফলে তুমি একেবারে দাম্পত্য কলহের পর্যায়ে চলে গেছলে।

বিভা সরকার তক্ষুনি তাঁকে সামলাবার জন্য ব্যস্ত।—থাক থাক, আমি ঠিক জানি তুমি সব ছেড়ে ওঁব এই লেখাটা নিয়েই পড়বে। লেখকেব দিকে ফিবলেন, ওকালতি করে করে লোকেব কেবল ছিদ্রি বার করতেই শিখেছে—বুঝলেন?

—বুঝলাম। মহাদেববাবু গম্ভীর মুখে সায দিলেন।—কিন্তু আমাদেব তো বিকেল থেকেই শাস্তি শুরু হবাব কথা ছিল।

সাহিত্য-বিতর্ক আপাতত চাপা পড়ে গেল। চা আব পবিপাটি জলখাবাব সহযোগে গল্পে-গল্পে শীতের ছোট বেলা পার। সন্ধ্যাব একটু পবেই মোহিনী সবকাব মহাদেববাবুর কানে কানে কি বলতে তিনি মুখখানা এমন কবলেন যেন দুনিযার সব থেকে বড় সমস্যাব সমাধান হযে গেল। বলে উঠলেন, নিশ্চয় নিশ্চয, আপনাব নিখুঁত আতিথেয়তা নিয়েই আমাকে কিছু লিখতে হবে—বিকেলে মধ্যপ্রদেশে যা চালান গেছে একটু ওষুধ না পড়লে রাতে ওব ওপব আবাব চাপাব কি কবে! আপনার বিবেচনাব জয় হোক!

অন্য দুই মহিলা সঙ্গে সঙ্গে বুঝলেন ব্যাপারখানা। বিভা সবকার ঈষৎ বিব্রত মুখে সোমা গাঙ্গুলিব দিকে তাকালেন একবার, তাবপব সকোপে স্বামীব দিকে ফিবলেন। —আজ খুব সুবিধে পেযে গেছ, না?

মোহিনী সবকাব বললেন, অতিথিব দরকাব কিনা খোঁজ নিলাম।... তুমি সঙ্গ দাও তো আমি ছোঁবও না। লেখকেব দিকে ফিরলেন, গৃহিণী ডাক্তাব হলে যে কি বিপদ মশাই আপনিও তো নিশ্চয জানেন। ডাক্তাব পবোয়ানা দিয়েছে, একটু-আধটু চলতে পারে, তাতে হার্টেব ক্ষতি হবাব কোনো আশংকা নেই। কিন্তু ওঁর বিশ্বাস সাংঘাতিক ক্ষতি হবাব আশংকা, আমি ঘুষ দিযে ডাক্তাবকে বশ কবেছি। সঙ্গে আছে অথচ নির্জলা বাত কাটছে। যাক, অতিথিব দবকাব যখন কি আব কবা যাবে?

বিভা সরকাব মাথা নেড়ে সোমাকে দেখালেন, ওঁব পাবমিশন না হলে দেব না।

সোমা গাঙ্গুলি হেসে ফিবে বললেন, আপনাব কি ধাবণা, উনি আমার কথায় ওঠেন-বসেন?

বিভা হালকা জবাব দিলেন, আপনাদের সঙ্গে আলাপ হওযাব আগে পর্যন্ত তাই কিন্তু ভাবতাম। এখন দেব কিনা বলুন—

—ক'টা দেবেন আগে কডাব করে নিন।

বিভা সরকাব হাসিমুখে মহাদেববাবুর দিকে তাকালেন। জবাবে তাঁর সীবিয়াস মুখ।—খেলে উনি আমাকে দুটোর বেশি খেতে দেন না, আজ মনে হচ্ছে, তিনটেতে আপত্তি করবেন না।

বিভা সরকাব বলে উঠলেন, ওঁর কিন্তু দুটোব বেশি কখখনো চলবে না। দুটোতেই দেখবেন কেমন স্পষ্ট বক্তা হযে উঠেছেন।

মহাদেববাবু সায দিলেন, দুটোব বেশি চলাব দবকাব নেই তাহলে। প্রথমে ওঁকে একটা পুবো দেবেন, পবেব দুটো হাফ হাফ।

বিভা সবকাব উঠে হুইস্কিব বোতল গেলাস আব জল এনে সামনে বাখলেন। বিলিতি জিনিস দেখে কর্তাব দিকে চেযে মহাদেববাবু মন্তব্য কবলেন, উকিল না হযে আপনাব ওমব খৈযাম হওযা উচিত ছিল—ঘাটশিলায বিলিতি জিনিস। স্ত্রীব দিকে ফিবলেন, ও-গো, তুমি কি তিন'টাকে চাব কবতে পাবমিশান দেবে?

সোমা গাঙ্গুলি বললেন, আমাব তিনেই আপত্তি।

—থাক থাক, তাহলে আব চা-বে কাজ নেই।

প্রথম দফা শুরু হতে নিজেব গেলাসে বাবকযেক ছোট ছোট চুমুক দিযে মহাদেববাবু একটা আবামেব নিঃশ্বাস ফেলে স্ত্রীব কথাই সমর্থন কবলেন যেন। সীবিযাস মুখ কবে বললেন. বেশি না খাওযাই ভালো।. একবাব এক ভদ্রলোক বাব থেকে বেবিযে নিজেব গাডিতে উঠে হাঁ। ড্রাইভ কববেন কি. তাঁব স্টিযাবিং. ব্রেক, অ্যাকসেলাবেটব, ক্লাচ, ড্যাশবোর্ড—সব কিছু চুবি হযে গেছে। তক্ষুণি নেমে ছুটে গিযে তিনি ওই বাব থেকেই পুলিশে ফোন কবলেন। এমন তাজ্জব চুবিব কথা শুনে পুলিশও পাঁচ মিনিটেব মধ্যে ছুটে এলো। এসে দেখে স্টিযাবিং-এ হাত দিযে ভদ্রলোক বিমর্ষ মুখে বসে আছে। তাবা উঁকি দিযে দেখল, কিছুই চুবি যায নি। সবই ঠিক আছে। তখন তাবা বেগে আগুন। ভদ্রলোক তখন বললেন, আমাব সত্যি একটু ভুল হযে গেছে, তখন আমি ভুল কবে পিছনেব সীটে উঠে বসেছিলাম ।

সকলকে ছাডিযে মোহিনী সবকাব হা-হা শব্দে হেসে উঠলেন। বললেন আপনি তাহলে সর্বদা অত সীবিযাস গল্প লেখেন কেন মশাই—হাসিব গল্প লিখলে তো এব থেকে ঢেব বেশি ভালো কবতেন।

শুনেই মহাদেববাবু দস্তুবমতো গম্ভীব। একচুমুকে গ্লাসের বাকিটুকু শেষ কবলেন। বিভা সবকাবেব দিকে তাকাতে তিনি উঠে দ্বিতীয দফা তাব গেলাস সাজিযে দিলেন। দেখাদেখি মোহিনী সবকাবও চটপট তাব গেলাস শেষ কবে ওটা সামনে এগিযে দিলেন। বিভা সবকাব তাকে মেপে অর্ধেকই দিলেন।

নিজেব গেলাসটা তুলে নিযে মহাদেব গাঙ্গুলি আগেব কথাব জেব টেনে মোহিনী সবকাবকে জিজ্ঞেস কবলেন. সীবিযাস গল্প বলতে একটা নমুনা দিন। দ্বিতীয বাসব?

দ্বিতীয গেলাস হাতে নেবাব পব মোহিনী সবকাবেবও ভিতব চাঙ্গা একটু। জবাব দিলেন, তা তো বটেই, ওটা আপনাব সীবিযাস উপন্যাসেব সব থেকে অসাব নমুনা—

বিভা সবকাব বলে উঠলেন, তখনই বলেছিলাম এসব খেলে—

একটা হাত তুলে মহাদেব গাঙ্গুলি তাঁকে থামিযে দিলেন। গেলাসে একবাব চুমুক দিযে ওটা সামনে বাখলেন। পলকা গম্ভীব চাউনি মোহিনী সবকাবেব মুখেব ওপব। —'দ্বিতীয বাসব' আপনি মন দিযে পডেছেন?

—পডেছি।

—'দ্বিতীয বাসব গাঁজাখুবি' পডেছেন?

—তা-ও পড়েছি।

—কোনটা আগে পড়েছেন?

মোহিনী সরকার একটু আমতা-আমতা করার ফাঁকে বিভা সরকার জানান দিলেন, 'দ্বিতীয় বাসর গাঁজাখুরি' পড়েই তো আমাকে জব্দ করার জন্য তাড়াতাড়ি ওই পূজাসংখ্যাটা নিয়ে বসেছিলেন।

'দ্বিতীয় বাসর গাঁজাখুরি' একজন ক্ষ্যাপা অথচ নামী সমালোচকের সমালোচনার হেড-লাইন। একে একে তিনি এবারের নামী লেখকদের লেখা নিয়ে একটা নামকরা কাগজে আলোচনা করেছেন। প্রথমেই মহাদেব গাঙ্গুলির 'দ্বিতীয় বাসর' নিয়ে পড়েছেন আর বাস্তবশূন্যতার তীক্ষ্ণ মন্তব্য করে হেড-লাইন দিয়েছেন, 'দ্বিতীয় বাসর গাঁজাখুরি'।

নিজের গেলাসে আর একটা চুমুক দিয়ে মহাদেব গাঙ্গুলি বললেন, বেশ।... পূজাসংখ্যায় কিছুটা তাড়াহুড়োর মধ্যে লিখতে হয়, কি লিখেছি না লিখেছি মনেও থাকে না। নিজেকে ডিফেন্ড করতে হলে গল্পটা আগে ভালো করে মনে পড়া দরকার। 'দ্বিতীয় বাসরে' কি আছে আপনি ছোটর ওপরে বলতে পারবেন?

চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার মতো করে মোহিনী সরকার জবাব দিলেন, নিশ্চয় পারব।

—বলুন তাহলে। আমার বক্তব্য পরে।

পরিবেশ জমে উঠেছে। মোহিনী সরকার মাঝে মাঝে গেলাসে চুমুক দিয়ে যা বললেন, সংক্ষেপে 'দ্বিতীয় বাসর'-এর কাহিনী মোটামুটি তাই। এবং সেটা এইরকম।

—দু'টি গ্রামের ছেলেমেয়েকে নিয়ে গল্প। ছেলেটি জগৎ মিত্র। কাছাকাছির শহরের কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে তিন বছর যাবৎ কলকাতার এক বে-সরকারী অফিসে চাকরি করছে। বয়েস চব্বিশ। চাকরি করলেও গান তার ধ্যানজ্ঞান। কলেজে পড়তে ছাত্রমহলে তার গানের সুনাম হয়েছিল। কলকাতার ছোট, মাঝারি, বড় আধুনিক গানের আসরেও ইদানীং তার ডাক পড়ছে। রেডিওয় চান্স পাচ্ছে। তার গাওয়া এক ছবির দুটো গান রীতিমতো হীট করেছে। জগৎ মিত্র আশা করছে, শীগগিরই আর তার চাকরি করতে হবে না। কারণ গানের রোজগার আশাতিরিক্ত বাড়ছে।

মেয়েটির নাম রত্না। একই গাঁয়ের মেয়ে। বসু ছিল, মিত্র হয়েছে। সে-ও ওই কাছাকাছি শহরের আত্মীয়ের বাড়িতে থেকে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। চেনা-জানা ঘর, জগৎ মিত্রের অথর্ব বাবার আগে থাকতে মেয়েটার ওপর চোখ ছিল। ছেলে চাকরিতে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। এই বিয়েতে প্রেমট্রেমের কোনো ব্যাপার নেই। মেয়েটাকে রূপসী না বললেও বেশ সুশ্রীই বলতে হবে। তার বয়েস উনিশ। সে গ্রামে থেকে প্যারালিটিক শ্বশুরের পরিচর্যা করে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক এই চঞ্চল বউটিকে দারুণ ভালবাসেন। তাঁর শাসন নেই বলেই রত্নার আচরণ গাঁয়ের বউয়ের মতো নয়—শ্বশুরের আদুরে মেয়ের মতো। শ্বশুরের সেবা-যত্ন করে, পুকুরে সাঁতার কাটে, ওর থেকে বয়সে ছোট ছেলেমেয়েদের ধরে ধরে চোবায়, দুপুরে নিরিবিলি। পেয়ারা, কুল, আতা, জামরুল গাছে ওঠে, নয় তো এক মাইল দূরের বাপের বাড়িতে টহল দিয়ে আসে। প্রত্যেক শনিবারের বিকেলে জগৎ আসে, সোমবার খুব ভোরে চলে যায়। এই শনিবারটার জন্য রত্না যে উন্মুখ হয়ে থাকে জগৎকে তা বুঝতে দেয় না। দুষ্টুমি মাথায়

চাপলে সে আসাব পব বিকেল থেকে বাত পর্যন্ত শ্বশুবকে নিযে বা বাঁধা-বাড়া নিযে এমন ব্যস্ত থাকে যে, জগৎ তাকে ধবা-ছোঁযাব মধ্যে পায না। ফলে তাব বাগ হবেই। সে অন্য পাশ ফিবে চুপচাপ শুযে থাকে। কিন্তু বত্নাব বাগ ভাঙানোব বীতিটাও আসুবিক। সুড়সুড়ি দেবে, কথা না বলে খুনসুড়ি কববে, তাবপব একসময জগৎকে জাপটে ধবে খাটেই গড়াগড়ি খাবে। জগৎ তখন ছাড়াতে চেষ্টা কবেও পাবে না। তবু বাগ দেখায। বলে, সামনেব শনিবাব আমি আসছি না—

বত্না বড় বড় চোখ কবে বলে, তুমি হলে গিযে আমাব জগৎ। না এলে তো অন্ধকাব দেখব।

—অন্ধকাব দেখবে। তাহলে এতক্ষণ কি হচ্ছিল?

বত্না হেসে গড়িযে জবাব দেয, এতক্ষণ জগৎ-এব সঙ্গেই বসকবা হচ্ছিল।

এব পবে আব বাগেব আয়ু কতক্ষণ? গুনগুন কবে অন্তত চাব-পাঁচখানা গান শোনাতে হয। জোবে গাওযাব উপায নেই, বাবাব ঘুম ভেঙে যাবে। কলকাতায কবে কোথায, কি গাইল সেই গল্প কবে। মাসেব বোজগাবেব বাইবে গানেব কল্যাণে কত বাড়তি বোজগাব হল বলে। আব, আবো কিছু বোজগাব বাড়লে কলকাতায বাসা ঠিক কবে বত্নাকে আব বাবাকে নিযে যাবাব কথাও বলে। বত্না সাগ্রহে শোনে, কিন্তু রুগ্ন শ্বশুব যে গাঁযেব বাড়ি ছেড়ে আর কোথাও যাবে না তাও জানে। আব এত সুন্দব জাযগা ছেড়ে ওব নিজেবও দু'খানা খুপবিব মধ্যে গিযে উঠতে কেমন লাগে সে সন্দেহও আছে।

জগৎ-এব ইচ্ছা ছিল, বউ কলেজে পড়ুক। ফার্স্ট ডিভিসনে ম্যাট্রিক পাশ কবেছে, কলেজে পড়লেও খাবাপ বেজাল্ট কববে না নিশ্চয। কিন্তু শ্বশুবেব দোহাই দিযে বত্না সে-প্রসঙ্গ এড়াতে চেষ্টা কবে। আসলে দিব্যি আনন্দে আছে, এব মধ্যে আবাব পড়াশুনাব ঝামেলাব মধ্যে কে ঢোকে। জগৎ প্রাইভেটে আই. এ. পবীক্ষা দেবাব জন্য তাকে তৈবী হতে বলে। বত্না তখন তাকে কাজেব যে ফিবিস্তি দেয, তাতে পড়াশুনা ছেড়ে কাবো নিঃশ্বাস ফেলাবও সময হবাব কথা নয।

এই সুখেব দিন হঠাৎ ফুবালো।

তাব সূচনাও আকস্মিক। কলকাতাব সমস্ত অফিসেব কর্মচাবীবা হঠাৎ একদিনেব ধর্মঘটে নেমেছিল। তাঁদেব মিছিলে জগৎকেও টেনে নামানো হযেছিল। সেটা একচল্লিশ সাল। স্বাধীনতাব দাবি বা ইংবেজ শাসনেব কোন-না-কোন অন্যায উপলক্ষে কলকাতায তখনও মিছিল লেগেই ছিল। অভিযোগ অন্য কোন অফিসেব একজন কর্মচাবীকে ইংবেজেব পুলিশ ঠেঙিযে মেবে ফেলেছে। তাই সমস্ত অফিসেব কর্মচাবীদেব পবদিন অফিস বযকটেব ডাক। একে যুদ্ধেব সময সেটা। দু'-পক্ষই মাবমুখী। সবকাব ট্রাম-বাস গাড়ি চলাচল বন্ধ হতে দেযনি। অন্যদিকে এই বিশাল মিছিলও পথ আগলে মনুমেন্টেব দিকে এগোচ্ছে। ফলে বাস্তা জ্যাম। ট্রাম, বাস, মোটব, লবিব লম্বা জট। এক জাযগায মিছিলও দাঁড়িযে গেছে, ওগুলোও। জগৎ মিত্র কেটে পড়াব তাল খুঁজছিল। এক্ষুণি হযতো পুলিশ এসে কাঁদানে বোমা ছুঁড়বে আব লাঠিপেটা কবে মিছিল ভেঙে দিতে চাইবে।

এই সময় পাশের একটা গাড়ির দিকে দু'চোখ আটকে গেল। পিছনের সীটে একটি মেয়ে বসে আছে, বছর একুশ হবে বয়েস। মেয়েটির চোখে বড়-সড় একটা সানগ্লাস। একটু লালচে চুল, বেশ ফর্সা। গাড়ি এভাবে আটকে যাওয়ার দরুন মুখে বাজ্যের বিরক্তি। জগৎ হাঁ করে তাকেই দেখতে লাগল। মেয়েটা তার পাশেই দু'হাতের মধ্যে।

সেই মেয়েও দেখল তাকে। বার কয়েকই দেখল। দেখছে যে, সানগ্লাসের দরুন জগৎ সেটা বুঝতে পাবল না। নইলে অমন বোকাব মতো চেয়ে থাকত না।

মেয়েটা হঠাৎ একঝটকায় সানগ্লাসটা খুলে ফেলে মুখটা গাড়ির জানালা দিয়ে একটু বার কবে, দু'চোখ টান কবে তাব দিকে চেয়ে বইল। বাগত মুখেব ভাবখানা, কত দেখবে দেখো, খুব ভালো কবে দেখো। এই যাদের স্বভাব তাবা আবাব পথ আগলে দেশ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

জগৎ হঠাৎ এত ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল যে, মেয়েটা একটু বাদে ফিক কবে হেসেই ফেলল। আর কথা নেই। জগৎ এদিক-ওদিক চেয়ে হঠাৎ লাইন থেকে সটকান। গাড়িটার পাশ দিয়ে পালানোব সময মেয়েটা জোবেই হেসে উঠল। জগৎ-এব দু'কান গবম। এদিকেব ফুটপাথে উঠে ঘুবে তাকালো। মজা পেযে মেয়েটা এদিকেব জানলায় সবে এলো। আব সোজা ওব দিকে চেয়েই হাসতে লাগল। জগৎ হনহন কবে উল্টো দিকেব রাস্তা ধবল।

মেয়েটাব ওই হাসি আব ওই চাউনি ওব গাযে জ্বালা ধবিয়ে দিল। অন্যদিকে আত্মাভিমানও চাড়িযে উঠতে লাগল। আগামী দিনেব কতবড এক গায়ক ঐ মিছিলে দাঁড়িযেছিল মেযেটা যদি জানত, আক্কেল হত। মেসে ফিবে কল্পনায় আক্কেল হওযাব ছবিটা ধবতে চেষ্টা কবল। করে প্রতিশোধ নিতে পারাব আনন্দ পেতে চেষ্টা করল। শেষে কলম নিয়ে বউকে চিঠি লিখতে বসল। সেটা সবে সোমবার, শনিবাব পর্যন্ত ঘটনাটা পেটে চেপে বাখা কঠিন।

লিখে সেই দুপুবেই পোস্ট কবে দিল।

তাব ঠিক দু'দিনেব মধ্যে সত্যিই এক বিচিত্র যোগাযোগ। বালিগঞ্জেব এক বডলোক বন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে নেমন্তন্ন খেতে গেছল। জগৎ মিত্র সেখানে মাননীয় অতিথি। তাব সোলো গানের আসব হবে। বন্ধুব বাযনা অন্তত দশখানা গাইতে হবে। গাড়ি পাঠিযে তাকে নিয়ে যাওযা হযেছে। সেই গাড়িতে জগৎ তাব হারমোনিয়াম নিযেছে। তবলচি বন্ধুই জোগাড কবে রেখেছে। বেডিও আর্টিস্ট, কযেকটা গান বেকর্ড হযেছে, দু' দুটো গান ছবিতে সুপাবহীট—এমন ছোট আসবে দারুণ খাতিব কদব হবে না কেন?

ছেলের থেকে মেয়েব ভিডই বেশি। তাদেব মুখে মুখে বাযনা এটা গান, ওটা গান। এক-একটা গান শেষ হলেই আবাব বাযনা। পাঁচখানা গান গাওযার পর ষষ্ঠ গান সবে শুরু করবে, সামনের মেয়ে পুরুষদেব ঠেলে সবিয়ে যে মেযেটি সামনে এসে দাঁড়ালো তাকে দেখেই জগৎ-এর দু'চক্ষু স্থির। মিছিলেব রাস্তাব সেই মোটরগাড়ির মেযে। কল্পনার প্রতিশোধ যে এমন বাস্তব হয়ে উঠতে পারে ভাবা যায় না।

মেয়েটি খুব সপ্রতিভ মুখে বলল, আমার নাম সুমিত্রা চৌধুরী—আমি আপনার এখানকার বন্ধুর স্ত্রীর বন্ধু। আচ্ছা, আপনাকে আমি খুব শীগগিরই কোথায় দেখেছি বলুন তো—দেখেছি ঠিক, কিন্তু মনে করতে পারছি না।

একটু দম নিয়ে জগৎ বলল, তরশুদিন দুপুরে রাস্তায় মিছিলে দেখেছিলেন... আপনি গাড়িতে বসেছিলেন, আমি আপনার পাশেই মিছিলে ছিলাম।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে আকাশ থেকেই পড়ল সুমিত্রা চৌধুরী।—এই খেয়েছে। আমি কার সঙ্গে কি ব্যবহার করেছি। তাই তো—আপনিই তো সেই—মিছিল ছেড়ে একেবারে ছুটেই পালিয়ে গেলেন। ছি ছি ছি, আচ্ছা আপনার গান শেষ হোক, তারপর ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

জগৎ আবার গান ধরল। এমন মনপ্রাণ ঢেলে আর কখনো গেয়েছে কিনা জানে না। একে একে আরো চারখানা গান। সকলে বাহবা বাহবা করে উঠল। খাওয়ার পরে সুমিত্রা চৌধুরী এসে ধরল তাকে।—চলুন, আমার বাড়ি একবারটি যেতে হবে।—এই কাছেই।

জগৎ মিত্র বলল, আজ থাক, সঙ্গে হারমোনিয়াম আছে, গাড়ি না পেলে অসুবিধে হবে।

কানেই তুলল না। বলল, আপনার হারমোনিয়াম অলরেডি আমি আমার গাড়িতে তুলিয়েছি—ওটা আর তার মালিককে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। আসুন, ছাড়া পাচ্ছেন না—সেদিনের কাণ্ড আমি বাড়ি এসেই বাবা-মাকে বলেছিলাম আর হেসে গড়িয়েছিলাম—ছি ছি ছি ঃ না জেনে—কি কাণ্ড করেছি বলুন তো।

জগৎ বলল, দোষ হয়তো আমারও কিছু ছিল।

অম্লানবদনে সুমিত্রা চৌধুরী বলল, তা তো ছিলই। মিছিলে দাড়িয়ে আপনি ড্যাবড্যাব করে আমাকে দেখছিলেন—আপনি জগৎ মিত্র সেই লোক জানলে তো উল্টে গর্ববোধ করতাম।

জগৎ আরো লজ্জা পেল। তাকে বাড়িতে ধরে নিয়ে গিয়ে সেই মেয়ে এক হৈ-চৈ কাণ্ড বাধিয়ে দিল। কত বড়লোকের মেয়ে বাড়িতে ঢুকেই জগৎ টের পেয়েছে। তকতকে সাজানো-গোছানো সব ঘর, জেল্লা ঠিকরানো আসবাবপত্র। সুমিত্রার বাবা-মায়ের সঙ্গে আলাপ হল। তারাও অমায়িক। আর একমাত্র মেয়ের প্রতি বাবা-মায়ের অন্ধ স্নেহেরও আঁচ পেল। চাকর দিয়ে হারমোনিয়াম নামিয়ে জোর করে আবার তাকে বসিয়ে দিল—বাবা-মাকে দুটো গান অন্তত শোনাতে হবে।

জগৎ-এর মনে হল, এই মেয়েটার ইচ্ছেতেই যেন জগৎ চলছে। কোনো বাধা মানার বা আপত্তি শোনার পাত্রী নয় সে। দুটো গানের পর বাবা-মায়ের সামনে সে কথা আদায় করতে চাইল, সামনের রবিবার সন্ধ্যায় এখানে আসবে এবং খাবে। কারণ আজ নেমন্তন্ন খেয়ে আসার পর আর খাওয়ানোর প্রশ্ন ওঠে না। ফাঁপরে পড়ে জগৎ মিত্র বলল, রোববারে আমি কলকাতায় থাকি না, দেশে যেতে হয়।

সুমিত্রার মা জিজ্ঞেস করলেন, দেশে কে আছে তোমার?

—অসুস্থ বাবা। আব কে আছে সেখানে সেটা যে বলা হল না জগৎ মিত্রব ও-বাড়ি থেকে বেবিযে আসাব পবে মনে হযেছে।

ববিবাব বাদ দিযে পবেব সোমবাব জগৎ এখানে আসবে, গাইবে, গল্প কববে, খাবে কথা দিযে তবে নিষ্কৃতি। একেবাবে নিষ্কৃতি, ঠিক বলা যায না। কাবণ, সুমিত্রাও তাব সঙ্গে এসে গাড়িতে উঠল। মেসে পৌঁছে দিযে ফিববে। তাব বাবা-মা আদবেব মেযেব স্বাধীনতায এতটুকুও কটাক্ষ পর্যন্ত কবেন না লক্ষ্য কবল।

জগৎ-এব ভালোও লাগছে, আবাব বেশ অস্বস্তি বোধ কবছে। দু'জনেব মাঝখানে চাব-ছ' আঙ্গুলও ফাবাক নেই, মেযেটাব সেদিকে হুঁশ নেই। মাঝে মাঝে কাঁধে কাঁধ ঠেকছে, ওব তপ্ত নিঃশ্বাস মুখে লাগছে। খুশি মেজাজে সুমিত্রা বকেই চলেছে। এ-বকম এক অদ্ভুত যোগাযোগেব ফলে ওব নাকি দাকুণ মজা লাগছে। আজকেব গানগুলোব প্রশংসা কবল, এমনি একখানা বেকর্ড আব ছবিব হীট গানেব বেকর্ড তাব কালেকশানে আছে জানালো। আবাব কবে নতুন বেকর্ড বেরুবে খোঁজ নিল। ফাকে ফাকে নিজেব কথাও ঘুবিযে বলল। বি-এ পাশ কবে এবাবে এম-এতে ভর্তি হযেছিল—আব পডতে ভালো লাগল না বলে ছেডে দিল। গান তাব দাকুণ ভাল লাগে—ওবও ইচ্ছে কবে বড বড শিল্পীব মতো গাইতে। একজন ওস্তাদ বাখা হযেছিল, কিন্তু তিন মাস ধবে সে সা বে গা মা পা ধা নি নিযে ওকে এমন নাকানি-চোপানি খাওযাতে লাগল যে, সুমিত্রা তাকে বিদায কবে বাঁচল। আব শেষে জিজ্ঞেস কবল, আপনি সেদিন মিছিলে দাডিযেছিলেন কেন—চাকবি কবেন নাকি?

এত বডলোকেব মেযেব কাছে সামান্য চাকরিব কথা বলতেও লজ্জা। জবাব দিল, এখনো কবছি, আব বেশিদিন বোধহয দবকাব হবে না।

—তা তো হবেই না, এবই মধ্যেই যা নামখানা কবে ফেলেছেন। জানেন, আপনাব বন্ধুব বউ প্রমীলাব সঙ্গে আমাব এমন কিছু খাতিব নেই—ও মনে মনে আমাকে হিংসা কবে—কিন্তু আপনি আসছেন খবব পেযে ফোন কবে নিজে সেধে নেমন্তন্ন নিলুম। তখন কি জানি আপনি—সেই মিছিলেব আপনি।

গলিব মধ্যে মেসবাড়ি। গাডি ঢোকে না। হাবমোনিযামটা ড্রাইভাবকে দিযে মেসে পাঠানো হল। দ্বিধা কাটিযে জগৎ বলল, মেসবাড়িব যা দশা আপনাকে ডাকতে পাবছি না—

—আব ডেকে কাজ নেই। কিন্তু আপনিই বা এ-বকম একটা জাযগায থাকেন কেন? খুব পযসা জমাচ্ছেন বুঝি?

—না. দেখেশুনে উঠে যাব ভাবছি কিন্তু সময হযে ওঠে না।

তাব অফিসেব ফোন নম্বব লিখে নিযে আব সোমবাব বাতেব কথা আবাব মনে কবিযে দিযে সুমিত্রা চলে গেল। জগৎ মিত্রেব মনে হল একঝলক বিদ্যুৎ সবে গেল।

পবদিন বত্নাব চিঠি পেল। পাবতে চিঠি লেখে না। কিন্তু মিছিলে এক মেযেব কাছে হেনস্তাব খবব জেনেই লিখেছে নিশ্চয। তাই। ছোটব ওপব সুন্দব চিঠি।—তোমাব চোখেব ভাষায নিশ্চয কিছু ছিল। নইলে অচেনা অজানা ভদ্রলোকেব মেযে ও-বকম কবতে যাবে কেন? যাক, ওতেও যদি তোমাব শিক্ষা না হযে থাকে তাহলে বাকি

শিক্ষা আমি দেব। তবে একটু আশ্বাস দিতে পাবি, সুন্দবী মেযেব দিকে তাকানো আমাব মতে ছেলেদেব খুব বড অপবাধ নয। আব বে-আবরু না তাকালে মেয়েরা সেটা অপছন্দও কবে না। তুমি সেই মেযেব দিকে কিভাবে তাকিযেছিলে এখানে এসে তাব মহডা দিতে হবে—তবে বিচাব কবতে পাবব। এবপব বাবাব সম্পর্কে খুঁটিনাটি খবব। তাব শবীবটা নাকি বেশ ভেঙেই পডছে।

শনিবাবে দেশে যেতে পবেব খবব বিস্তাবিত শোনাব পব বত্না হাঁ একেবাবে। তাবপব সে কি হাসি। হাসি আব থামতেই চায না। শেষে বলল, বেচাবি সুমিত্রা চৌধুবী—তোমাব ঘবে যে বউ আছে তাকে সেটা বললেই না?

—বলাব আব চান্স পেলাম কোথায! সোমবাবে নেমন্তন্ন খেতে গিযে বলব।

বত্না সাবধান কবল, তাহলে খাওযাব পবে বোলো, নইলে কপালে কি জুটবে কে জানে।

কিন্তু সোমবাব নেমন্তন্ন খেতে এসে জগৎ মিত্রেব আবাবও দিশেহাবা দশা। সুমিত্রা তাব একগাদা বান্ধবীকে নেমন্তন্ন কবেছে, ডজনখানেক বন্ধুকে নেমন্তন্ন কবেছে, সেই সঙ্গে আব যাকে নেমন্তন্ন কবেছে তাকে দেখে তো জগৎ-এব দস্তুবমতো বোমাঞ্চ। এক বেকর্ড কোম্পানীব হর্তা-কর্তা সেই ভদ্রলোক। এদিকে হাবমোনিযাম আব তবলাব ব্যবস্থাও কবে বেখেছিল। এদিনও গুণে গুণে দশখানা গান হ'ল। বেকর্ড কোম্পানীব ভদ্রলোক প্রশংসা কবতেই সুমিত্রা তাকে নিযে পডল।—মাত্র দু-খানা বেকর্ড কেন ওঁব? শুধু মুখে প্রশংসা কবলেই হবে? কবে বেকর্ড কববেন বলুন, আমি নিযে যাব।

ভদ্রলোক দিন তাবিখ বলাব পব বেহাই পেলেন। আব তাব পবেও মাঝে মাঝে বেকর্ড কববেন কথা দিলেন।

খাওযা-দাওযা সাবা হতে এই বাতেও সুমিত্রা তাকে নিজেব গাডিতে পৌঁছে দিতে এলো। আগেব দিনেব থেকেও বেশি ঘন হযে বসে ফিক কবে হেসে বলল, কেমন--মিছিলে ওভাবে জব্দ কবাব পুবস্কাব পেলেন তো? বছবে ক-খানা কবে আপনাব বেকর্ড কবাই এবাবে দেখবেন।

জগৎ মিত্র জিজ্ঞেস কবল, ওই ভদ্রলোকেব সঙ্গে আপনাদেব কি সম্পর্ক?

—সম্পর্ক আবাব কি, উনি চ্যাটার্জি আব আমবা চৌধুবী ক্রিশ্চিযান। বাবাব সঙ্গে অল্পস্বল্প খাতিব ছিল, বাবা নিজে ইন্টাবেস্ট নিযে ওঁব বাডিটা খুব কম খবচে কবে দেবাব পব থেকে আমাদেব বাডিব সঙ্গেই এখন দারুণ খাতিব। উনি নিজেব ক্ষমতায ডবল খবচ কবেও অত বড বাডি কবতে পাবতেন না। বাবা বিবাট কণ্ট্রাক্টব জানেন তো?

জগৎ বলল, আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি না।

—হুঁঃ। শুকনো ধন্যবাদ নিতে আমাব বযে গেছে। আব শোনো, ওসব আপনি-টাপনি আমাব ভালো লাগে না, ফ্রম নাও অন উই আব ফ্রেন্ডস—বুঝলে?

বোঝাব চমকে জগৎ-এব ঘাম ছোটাব দাখিল। গলিব মুখে নামতে সুমিত্রা মনে কবিযে দিল, বেকর্ড কবাব ডেট মনে আছে তো? ঠিক সময ধবে গলিব বাইবে দাঁডিযে থাকবে, আমি গাডি নিযে আসব।

জগৎ মাথা নাড়ল। মাথাটা ঝিম-ঝিম কবছে। আব ভিতবটাও কি-রকম মোহাচ্ছন্ন। গাড়িতে আজ অনেকবার কাঁধে কাঁধ ঠেকেছে, গাযে গা ঠেকেছে। ও চলে যাবাব পবেও একটা উষ্ণ স্পর্শ যেন তাকে ঘিবে আছে। সেই কারণে প্রচণ্ড অস্বস্তি। কিন্তু তারই তলায কোথায একটু লোভও। টেব পাওযা মাত্র নিজের ওপবেই বাগ। মাথা ঝাঁকিযে সেটা অস্বীকাব কবেছে। বত্নাকে সে ভালবাসে—দারুণ ভালবাসে।

কিন্তু এবাবে দেশে গিয়ে বত্নাব অনেক জেরাব জবাবে মুখ যদি বা একটু-আধটু খুলল মন খুলতে পাবল না। দু-চাব কথায শুধু জানালো, নেমন্তন্ন খেতে গেছল, খুব আদবযত্ন পেযেছে, অনেকগুলো গানও গাইতে হয়েছে।

এব বেশি আব কিছু বলল না। বলা সহজ নয। বত্নাব তাতে ভুল বোঝাব সম্ভাবনা ষোল আনা। তাছাড়া বাবার শবীবটা বেশি খাবাপ বলে বত্না বাববাব সে-প্রসঙ্গ তোলবাবও খুব সময পেল না। বাবাকে শহবেব ডাক্তাব এনে দেখানো নিযেই বেশি কথা হল। জগৎ একদিন কামাই কবে ডাক্তাব দেখিযে সোমবাবেব জাযগায মঙ্গলবাব কলকাতায ফিরল।

টিফিনে সুমিত্রাব টেলিফোন। দেশে যাবাব আগে ও প্রায বোজই টেলিফোন কবেছে। প্রথম দিনেই জগৎ বলে দিযেছিল, ফোন কবলে যেন টিফিনে কবে, সেকশনাল হেড-এব ঘব তখন ফাঁকা থাকে।

—কাল অফিসে আসোনি কেন?

—দেশে বাবাব অসুখ বেড়ে যেতে শহবেব ডাক্তাব এনে দেখাতে হযেছে।

—এখন ভালো?

—ভালো খুব না।

—সেবে যাবে, ভেব না। পবশু বেকর্ডিং তোমাব মনে আছে তো?

—আছে।

—কি গাইবে ঠিক আছে?

—আছে।

—আচ্ছা, দুটো গানেবই এক লাইন কবে শোনাও তো?

জগৎ আঁতকে উঠল, টেলিফোনে শোনাব কি।

—আঃ শুধু সুরটা শোনাও না। ঘব তো ফাঁকা?

—হ্যাঁ, তবু এটা ঠিক হবে না...।

ওধাব থেকে সুমিত্রা বেগেই গেল, দেখো, আমাব মুখ দিয়ে একবাব বেবিযেছে যখন, বেহাই পাচ্ছ না—এক লাইন করে শোনাও!

অগত্যা খুব গলা চেপে এক লাইন কবে শোনালো।

—ঠিক বুঝতে পারলাম না কতটা ভালো। আচ্ছা, পবশু আগে গাড়িতে বসে শুনব।

গাড়িতে বসে জোব করেই পুরো দুটো গান শুনল। তাব আগে দু-দিকেবই জানলাব কাচ তুলে দিয়েছিল জগৎ। তাব পবেও চাপা গলায় গেযেছে। গাযে গা ঠেকিয়ে

বসে প্রায় মুখের কাছে কান এনে সুমিত্রা প্রথম গানটা শুনেছে। শেষ হতেই ধমক।—অমন গলা চেপে গাওয়ার কি হয়েছে—আচ্ছা নার্ভাস লোক তো। পরেরটা জোরে গাও।

দু-মাস কেটে গেল। জগৎ মিত্রের ভিতরটা সর্বদা অস্থির। এক মুহূর্তের শান্তি নেই। রাত্রে ঘুম নেই। দ্রুততালে সে একজনের দখলের মধ্যে চলে যাচ্ছে বুঝেও যেন অসহায়। সুমিত্রা প্রায় রোজই টেলিফোন করে, দুই-একদিন পরে পরে ঠিক ছুটির মুখে গাড়ি নিয়ে অফিসে আসে, বাড়িতে ধরে নিয়ে যায়, সিনেমায় নিয়ে যায়, নয় তো এমনিই কলকাতার রাস্তায় চষে বেড়ায়। তার চোখে জগৎ মিত্র এক দুর্লভ আবিষ্কার। গানের জগতে তাকে একেবারে সামনের সারির প্রথম দিকে এগিয়ে আনা যেন তারই গুরুদায়িত্ব। কিছুটা এগিয়ে আনতে পারলে আনন্দে আটখানা হয়। না পারলে ফুসে ওঠে। যা চায় তা হতেই হবে। যা চায় তা পেতেই হবে। এর মধ্যে কোনো মাঝপথ নেই। আপস নেই। সভায় বা রেডিওতে গাইতে গেলে সে নিজেই আগে থাকতে গাড়ি নিয়ে চলে আসে। রেকর্ড কোম্পানীর—সেই ভদ্রলোককে ধরে আবার দুটো গান রেকর্ড করিয়েছে। যতক্ষণ সুমিত্রা চৌধুরী কাছে থাকে, জগৎ মিত্রর মোহগ্রস্ত দশা। চোখের আড়াল হলে যন্ত্রণা, বিবেকের দংশন। হ্যাঁ, ভালো সে আজও রত্নাকেই বাসে। তার জায়গায় আর কাউকে ভাবতে পারে না। কতবার ভেবেছে, আর না, এবার সুমিত্রাকে বলবে সে বিবাহিত। কিন্তু সুমিত্রা কাছে এলেই সব ভণ্ডুল। বলি-বলি করেও বলতে পারে না। তখন সুমিত্রা যেন কাচের আবরণে একঝলক আগুনের শিখা। সেই কাচে পতঙ্গের মতো মাথা খুঁড়ে মরা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

এই দু-মাসেও প্রতি শনিবার জগৎ বাড়ি এসেছে। বাবার অসুখটা বেশি বাড়াবাড়ির দিকে বলে রত্না একটু ব্যস্ত। জগৎও ব্যস্ত ভাব দেখাতেই চেষ্টা করে। তবু রত্না কিছু পরিবর্তন আঁচ করছে, লক্ষ্য করছে তা-ও টের পায়। পাওয়ার কথাই। ভালো করে রত্নার দিকে তাকাতে পারে না, আগের মতো কথা বলতে পারে না। রাতে আগে ভাগে খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুমের ভান করে পড়ে থাকে। অবশ্য বাবাকে ঘুম পাড়িয়ে ওর ঘরে আসতে বেশ দেরিই হয়। কিন্তু তবু যে-ভাবে রাত কাটে সে-ভাবে কাটার কথা নয়।

গোড়ায় গোড়ায় রত্না জিজ্ঞেস করেছে তোমার কি হয়েছে বলো তো দিন দিন তুমি এ-রকম হয়ে যাচ্ছ কেন?

জগৎ মিত্র তাতেই বিরক্ত—অফিসে নানারকম ঝামেলা শুরু হয়েছে বলেছি না? এরপর শনিবার আসতে পারব কিনা তারও ঠিক নেই।

রত্না একদিন বলেছিল, ঝামেলা তো চাকরি ছেড়ে দাও না—অন্যদিকের রোজগার তো এখন ভালই হচ্ছে।

জগৎ আরো তেতে উঠেছিল।—যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বোলো না। বাবার অসুখ, খরচের অন্ত নেই—চাকরি ছেড়ে বসে থাকলেই হল।

রত্না এখন কিছু বলে না, কিছু জিজ্ঞাসাও করে না। কিন্তু মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ চোখে তাকে লক্ষ্য যে করে হঠাৎ হঠাৎ সেটা টের পায়। জগৎ বেশির-ভাগ সময় অন্যমনস্ক থাকে তারপর হঠাৎ টের পেয়ে ধড়ফড় করে ওঠে।

কলকাতায় সেদিন। সুমিত্রা অফিসে এসে জগৎকে বাড়ি ধরে নিয়ে গেছে। বিকেল থেকে বেশ বৃষ্টি হচ্ছিল। তার মধ্যেই গাড়ি নিয়ে এসেছে। তুলে নিয়ে গেছে। ওদের বাড়ি পৌঁছানোর পরেও অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে! বিকেলের জল-খাবারের পাট চুকতেই মা-কে বলে দিয়েছে রাতে বিরিয়ানি আর কষা চিকেন খাবে তারা। মুখের কথা খসলেই এখানে সেটা তামিল করা জলভাত। বৃষ্টির বিরাম নেই।

সন্ধ্যার পরে সুমিত্রার বাবাও আড্ডায় যোগ দিলেন। কথায় কথায় হঠাৎ তিনি মেয়েকে বললেন, তোরও তো একসময় বেশ মিষ্টি গলা ছিল, এখনো গুনগুন করে নিজের মনে গান করিস যখন ভালো লাগে—জগৎকে পেয়েছিস যখন পছন্দমতো দুই একখানা গান তুলে নে না।

সুমিত্রা লাফিয়ে উঠল—দি আইডিয়া। একটা গান তুলে নেবার কথা তো আমার অনেকবার মনে হয়েছে। জগৎকে ডাকল, চলে এসো, আজই চেষ্টা করা যাক—

তাকে ধরে নিয়ে নিজের ঘরে এলো। তারপর দরজা বন্ধ করল। সামনের জানালাটাও। বলল, যা গলার ছিরি আমার এখন, জানলেই আশপাশের বাড়ির লোক গলা বাড়াবে।

কাছে এসে দাঁড়ালো। খুব কাছে। কপট গম্ভীর।—কি মাইনে দিতে হবে?

জগৎ-এর অজানা অস্বস্তি।—মাইনে আবার কি, হারমোনিয়াম আনো—

—নাঃ, এমনিতে আমি কাউকে খাটাই না।

বলেই আচমকা দু-হাত বাড়িয়ে তাকে বুকে টেনে আনল। তারপর পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে উষ্ণ ঘন নিবিড় চুমু খেল একটা।

—হল?

জগৎ তখনো তার বাহুবন্দী। ঠোঁট দুটো জ্বলে যাচ্ছে। তার মুখের অবস্থা দেখে সুমিত্রা খিল খিল করে হেসে উঠল। বলল, তুমি একটা রামভীতু। এতদিন তোমার সঙ্গে যেভাবে মিশেছি, অন্য কেউ হলে ঢের আগেই হাত বাড়াতো। বলার সঙ্গে সঙ্গে আবার চুমু। আবার হাসি। বলল, যতক্ষণ না তুমি খাচ্ছ ততক্ষণ আমি খেয়ে যাব।

জগৎ মিত্র আস্তে আস্তে তার হাত ছাড়িয়ে নিল। মাথা টলছে। শরীর জ্বলছে। বলল, সুমিত্রা একটা কথা তোমাকে অনেকবার বলতে চেষ্টা করেছি। আমি বিবাহিত। দেশে আমার বউ আছে।

সুমিত্রা ছিটকে তিনহাত পিছনে সরে গেল। স্তম্ভিত চোখে দেখল একটু। তারপর চেঁচিয়ে উঠল।—কি বললে? তুমি কি?

—বিবাহিত।

—স্কাউনড্রেল। জোচ্চোর। আমি তোমাকে জেল খাটাব! প্রথম দিনেই তুমি মা-কে বলেছিলে, দেশে কেবল তোমার বাবা আছেন।

—বাবার অসুখ, তাঁর জন্যেই প্রতি রবিবারে দেশে যেতে হয় বলেছিলাম।

—কিন্তু এত দিনের মধ্যে তুমি বলারই সময় পেলে না?

এর জবাব কি দেবে—জগৎ মিত্র চুপ।

সুমিত্রা তার খাটে বসল। রাগে সমস্ত মুখ লাল। দু-চোখে খানিক ভস্ম করল সামনের মানুষটাকে। তারপর আচমকা আবার হেসে উঠল। বলল, তুমি হাড়বজ্জাত আর অতিমাত্রায় লোভী। বাবা-মা শুনলে কি বলবে বল তো?

—তাঁদের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

—থাক, তোমাকে আর ঘটা করে কিছু করতে হবে না। বিয়ে করা বউকে কত যে ভালোবাসো আমার সঙ্গে মেশা দেখেই বুঝেছি।... তোমাকে ক্রিশ্চিয়ান হয়ে রেজিস্ট্রি বিয়ে করতে হবে। ও কি? আঁতকে উঠলে কেন—তোমাদের হিন্দু বিয়ে একটা ছেড়ে পাঁচটা করলেই বা আটকাচ্ছে কি—এখন পর্যন্ত তো আইনের বাধা কিছু নেই। বোসো এখানে, আমি আসছি।

বেরিয়ে গেল।

জগৎ মিত্র স্তব্ধ। বাইরে মুষল ধারে বৃষ্টি হচ্ছে। কলকাতা ভেসে গেল বুঝি।

মিনিট কুড়ি বাদে একেবারে বাবা-মাকে নিয়ে সুমিত্রা ফিরল। তাঁরা গম্ভীর। ভদ্রলোক তাঁর মেয়েকেই বললেন, বুঝলাম ওর কোনো দোষ নেই—কিন্তু তুই আর ক'টা দিন ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে নে না, এত তাড়া-হুড়ো করার কি আছে?

—আঃ বাবা, তোমাকে অত করে বললাম কি? আমার ভাবার আর কিছু নেই—ওকে ছাড়া আমার চলবে না—আমাকে ছাড়া ওর চলবে না—ব্যস। যত টাকা লাগে লাগুক, একমাস আগের তারিখে নোটিশ দিয়ে তুমি সাত দিনের মধ্যে আমাদের রেজিস্ট্রি বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও। তুমি তো বললে টাকা খরচ করলে হতে পারে।

—তা পারে, কিন্তু—

—আর কিন্তু-টিন্তু নেই। ডান।

·

রাতে এ বাড়িতেই থাকার ব্যবস্থা হয়েছে জগৎ মিত্রর। রাস্তায় বেরুনোর উপায় নেই। কলকাতা জলের তলায়। এত বৃষ্টি স্মরণীয়কালের মধ্যে আর হয়েছে মনে পড়ে না। ডানলোপিলোর নরম শয্যায় শুয়ে জগৎ ছটফট করছে।—তার চোখে ঘুম নেই। দোতলার সব আলো অনেকক্ষণ নিভে গেছে। নিঝুম। জগৎ মিত্রর সংকল্প স্থির কাল সকালে উঠে ও কাউকে কিছু বুঝতে দেবে না।... যতটা সম্ভব স্বাভাবিক থাকতে হবে। অফিসে গিয়ে বাবার অসুখের কথা লিখে লম্বা ছুটি নেবে। তারপর বেলা সাড়ে এগারোটার ট্রেনেই দেশে চলে যাবে। দেশের হদিস এরা জানে না। যাতে না পায় সে ব্যবস্থাও করে যাবে। পেলেও জগৎ নিপাত্তা হলেই সব বুঝতে পারবে। আর দেশ পর্যন্ত ধাওয়া করবে না।

হঠাৎ বিষম চমকে উঠল জগৎ মিত্র। অন্ধকারে তার শয্যার্য বসল কেউ। নারী দেহ। পরনে রাতের বাস। তাকে ঠেলে পাশে শুয়ে পড়ল। উষ্ণ নরম দুই বাহু বেষ্টনে টেনে আনল। তারপর অমোঘ অব্যর্থ রসাতলের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

সকাল। দুপুর। বিকেল। জগৎ মিত্র মেসে ফিরল। একে একে দিন গড়াতে লাগল। শনিবার এলো। দেশে গেল না। অফিসে যাচ্ছেই না।

আট দিনের দিন রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে গেল।

তার দু-দিন বাদে রত্নাকে রেজিস্ট্রি চিঠি পাঠালো একটা। আর কারো হাতে না পড়ে, তাই। আর অবশ্য যাতে পায়, তাই। কি ঘটেছে সংক্ষেপে লিখল। আর লিখল, বাকি জীবন কেবল অভিশাপ দিয়ে যাও। সেটা আমার প্রাপ্য। জগৎ নতুন শ্বশুরবাড়িতে আছে। সেই ঠিকানা দিল।

চারদিন বাদে রত্নার জবাব এলো। খুব ছোট চিঠি। তোমার বাবার শরীরের অবস্থা এখন আশংকাজনক। সময় হয়ে আসছে বোঝা যায়। তাকে কিছু বলার দরকার নেই। এ শনিবারও যদি দেশে না আস তাহলে পরের শনিবার পর্যন্ত টিকবেন কিনা বলা যায় না। এক সপ্তাহ না আসাতে তিনি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন।

জগৎ অফিসের চাকরি রিজাইন করেছে। সে করেনি, সুমিত্রা করিয়েছে। তবু শনিবার পর্যন্তই অপেক্ষা করল। শনিবার আরো অনেক দূরে হলে যেন ভালো হত।

বাবার অবস্থার কথা সুমিত্রাকে জানিয়ে শনিবার দেশে গেল। বাবা তার হাত দুটো ধরে কাঁদতে লাগলেন। বললেন, আমার এই অবস্থা আর তুই পনের দিন পরে এলি। আমি যে তোকে দেখার জন্যেই প্রাণটা ধরে বসে আছি।

সত্যিই তাই। তিনদিনের মধ্যে ছেলের কলকাতায় ফেরা হলনা। তিনি চোখ বুজলেন। দাহ কাজ শেষ করে জগৎ সেদিনই কলকাতায় এলো। টাকা নিয়ে আবার সেদিনই রাতে ফিরল। এ ক'দিনের মধ্যে রত্নার সঙ্গে তার একটিও কথা হয়নি। সে শ্বশুরের ঘরে শ্বশুরের কাছেই থেকেছে। এরই মধ্যে দু-বেলার রান্না সারতে হয়েছে। জগৎ-এর খাবার তার ঘরে ঢাকা দিয়ে রেখে গেছে। তার খাওয়ার সময়েও সামনে থাকেনি।

রাতে ফিরতে খুব ঠাণ্ডা মুখে রত্না সামনে এলো। বলল, গ্রামের লোককে জানিয়ে দিতে হবে বাবার কাজ কলকাতার কালীঘাটে হবে।

মনের অবস্থা যা-ই হোক জগৎ অবাকই হ'ল একটু।—কালীঘাটে হবে?

—হ্যাঁ। তা না হলে আমার কাজ করতে অসুবিধে।

—তুমি কাজ করবে।

রত্না ঠাণ্ডা দু-চোখ তার মুখের উপর তুলল।—আমি ছাড়া আর কে করবে?

ঘর ছেড়ে চলে গেল। কথাটা জগৎ-এর মাথায় ঢুকল। সে এখন ক্রিশ্চিয়ান। শাস্ত্রমতে বাবার কাজ করার অধিকার এই জন্যেই নেই। কিন্তু ছেলে থাকতে এখানে বসে পুত্রবধূ শ্বশুরের কাজ করছে দেখলে সকলে হাঁ হয়ে যাবে।

রাতে রান্নার প্রশ্ন নেই। কারণ ফলাহার জলাহার বিধি। রত্না দুধ আর ফল তার ঘরে ঢাকা দিয়ে রেখে গেল। তার দিকে তাকালো না বা একটি কথাও বলল না। জগৎ মিত্রর বুকের ভিতরটা একটা যন্ত্রণায় দুমড়ে মুচড়ে যেতে লাগল। একবার ইচ্ছে হল রত্নাকে জোর করে ধরে আনে, বলে কি অবস্থায় পড়ে তাকে এ কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু সেটা আরো হাস্যকর।

পরদিন সকালে বাবার ঘরে এসে বত্নাকে বলল, ব্যবস্থাপত্রব জন্য আমি তাহলে কলকাতায চলে যাই?

বত্না জবাব দিল, হ্যাঁ। না গেলে আমাব এখানে তিন বাত থাকতে অসুবিধে হবে—যিনি চলে গেছেন তাঁব জন্যে এখানে তিন বাত থাকা দবকাব। ব্যবস্থা কবাব কিছু নেই, আমাব বাবা কলকাতা চলে গেছেন, সেখানে মামাবা ব্যবস্থা কববেন।

কলকাতায বত্নাব মামাব বাড়ি। বড অবস্থা তাঁদেব। জগৎ এ-ও বুঝল তাব শ্বশুবকে মেযে সব জানিযেছে। এমন অসহায অবস্থা বলেই জগৎ হঠাৎ বেগে গেল। —আমাব বাবাব শ্রাদ্ধেব খবচ যোগাবেন তোমাব বাবা আব মামাবা?

ঠাণ্ডা দু-চোখ এবাবে তাব মুখেব ওপব উঠে এলো। বলল, যা খবচ হবে বাবা তাব হিসেব বাখবেন। কাজেব পব তাঁকে দিলে সে টাকা যেন তিনি নেন আমি বলে দেব।

তেমনি বাগত মুখেই জগৎ আবাব বলল, আমিই যখন তোমাব আব কেউ না, আমাব বাবাব জন্য তুমি এত কষ্ট কবতে যাবে কেন?

—সেটা আমাব রুচি। আপত্তি থাকলে টাকা দেবাব দবকাব নেই।

এব আধঘণ্টাব মধ্যে জগৎ কলকাতায বওনা হল।

বাবাব কাজেব দিন কালীঘাটে এলো। কাজেব বাবস্থা, দান-সামগ্রী সবই পবিমিত বটে, কিন্তু পবিচ্ছন্ন সুন্দব। জগৎ অদূবে দাঁড়িযে সমস্তক্ষণ কাজ দেখল। কেউ তাব সঙ্গে একটি কথাও বলল না। শ্বশুব বা মামাশ্বশুব বা বত্না তাব দিকে একবাব তাকালোও না। পুবোহিত মন্ত্র পডিযে গেলেন, অনুষ্ঠান পালন কবালেন। বত্না মন্ত্র পডছে, যা বলা হচ্ছে, তাই কবছে। তাব পবনে টকটকে লালপেডে গবদ। মাথাব খোলা চুল পিঠ বেযে কোমব ছুযে আছে। কপালে সিঁথিতে টকটকে সিঁদুব। জগৎ মিত্রব ভিতব থেকে একটা অব্যক্ত কান্না গুমবে উঠতে লাগল। দু'চোখ খবখবে শুকনো।

কাজ শেষ হল। জগৎ বত্নাব এক মামাতো ভাইকে বলল, কত খবচ হল একটু জেনে দিতে হবে।

দু' মিনিটেব মধ্যে সে ফিবে এসে দু' পাতাব একটা হিসেব তাব হাতে দিল। খবচেব শুধু মোট অঙ্কটা দেখে নিযে জগৎ সে-টাকা বত্নাব মামাতো ভাইযেব হাতে দিযে চুপচাপ চলে গেল।

দেশে এলো একমাস বাদে। বত্নাব ভবণপোষণেব দাযিত্ব যখন আইনত আব ন্যাযত তাব, একটা ফযসালা কবতেই হবে। সে-জন্যেই আসা।

বাড়ি তালা বন্ধ। তাই হবে ভেবেছিল। শ্বশুববাড়িতে এলো। শ্বশুব বাইবেই বসেছিলেন। ভিতবে ডাকলেন না বা বসতে বললেন না। গলা দিযে কযেকটা শব্দ উচ্চাবণ কবলেন।—বত্না এখানে থাকে না।

দ্বিধা কাটিযে জগৎ জিগ্যেস কবল, কোথায...?

—জানাব দবকাব নেই।

জগৎ চলে এলো। অপমানে মুখ কালি। তাব কেন আসা শ্বশুবকে সেটা শুনিযে আসতে পাবত। তা-ও পাবল না।

কলকাতা। জগৎ মিত্রর ষষ্ঠ অনুভূতি প্রখরই বলতে হবে। তার ধারণা, বত্না কলকাতায়। মামাবাড়িতে থেকে কলেজে পডছে। ভবিষ্যতে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ভাবনা থাকলে সেটাই স্বাভাবিক।

এক ববিবারে সেখানে গেল। নীচে বত্নাব সেই মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। জিগ্যেস কবল, রত্না এখানে?

বিরস মুখে সে মামাতো ভাই মাথা নাডল। এখানেই।

—কোন কলেজে পড়ছে?

কোন কলেজে বলল।

—একবাব ডেকে দিতে হবে। তাব খরচপত্র চালানোব দাযিত্ব আমাব। সে-সম্পর্কে কথা বলব।

সে চলে গেল। মিনিট তিনেকেব মধ্যে ফিবেও এলো।—বত্না বলল, তোমাব কোনো দাযিত্ব নেই। তাই দেখা কবাবও দবকাব নেই।

দিন যায়। জগৎ মিত্রব ভিতবটা দিনে দিনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। আব সুমিত্রাব ততো মোহ ভাঙছে। তাব ইচ্ছেয লোকটার ছবিতে গান গাওয়া, রেকর্ড কবা, সভায গাইতে যাওযা, সিনেমা-থিয়েটাব দেখা, ওঠা-বসা-চলা-ফেবায বাধা আসতে পাবে এ তাব কল্পনার বাইবে। কিন্তু ক্রমে সেইবকমই ব্যাপার দাঁড়াতে লাগল। ফলে একতরফা ঝগডাঝাঁটি আব শাসনও বাডতেই থাকল। সে-ও মেয়েই। মেয়েলি অনুভূতিতে সন্দেহের আঁচড় পড়তে লাগল। বিযেব পব থেকেই লোকটাকে অন্যরকম দেখছে, বদলে যেতে দেখছে। তাব সন্দেহ, এই লোকেব মন আব একদিকে পডে ·আছে। তাহলে সেটা আগেব বউ ছাড়া আব কাব দিকে হবে? নইলে বিয়ের পব থেকেই এমন হযে যাচ্ছে কেন? এই সন্দেহ মনে এলেই সুমিত্রা ক্ষিপ্ত হযে ওঠে। যা মুখে আসে তাই বলে। গালাগালি কবে। অন্যদিকে মুখে বা নেই। তার কানে তুলো, পিঠে কুলো। কিন্তু সে যেমন চলছে, তেমনই চলছে।

মোহ একেবাবেই ছুটে গেল, বা আচমকা জগৎ মিত্রই ছুটিযে দিল ন' মাসেব মাথায। সুমিত্রাব শাসন আব আগেব বউ নিযে ঠেস সেদিন মাত্রা ছাডিযেছে। তাব ওপর দিযে জগৎ মিত্র হঠাৎ গর্জন কবে উঠল। বলল, তুমি আমাব সর্বনাশ কবেছ--বুঝলে? এত বড সর্বনাশ কেউ কাবো কবে না—যাব কাছ থেকে তুমি আমাকে ছিনিয়ে এনেছ তুমি তার পাযেব নখেব যোগ্যও নও—বুঝলে?

বোঝার সেখানেই শেষ। সুমিত্রার বাবা তাকে কেবল গলাধাক্কা দিযে বার কবতে বাকি বেখেছেন। আব শাসিযেছেন, বিযে ভাঙিয়ে ফেব বিয়ে কবাব জন্য তিনি তাকে জেল খাটাবেন—আব মেয়েব খোবপোষ আদায় করে তাকে ফতুব করবেন।

শেষ পর্যন্ত কিছুই করেন নি। মেয়ে রেজিস্ট্রি বিয়ে নাকচের ডিভোর্স স্যুট ফাইল করেছে। তাতে অনেক অত্যাচার, অসদাচরণের অভিযোগ। জগৎ মিত্র কনটেস্ট কবা দূরে থাক, কোর্টে পর্যন্ত যায় নি। তাবা একতরফা ডিক্রি পেয়েছে।

জগৎ মিত্র মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছে।

আরো মাসখানেক অপেক্ষা করে বত্নাকে একখানা চিঠি লিখেছে। তার প্রায়শ্চিত্তের কথা লিখেছে। মুক্তির কথা লিখেছে আর একটিবার দেখা করার অনুমতি ভিক্ষে করেছে।

চিঠির জবাব মেলে নি।

আরো পনের দিন পরে তাকে কলেজে যাবার পথে ধরেছে। বত্না আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়িয়েছে। চোখে চোখ রেখে অনুচ্চকঠিন গলায় বলেছে, আর কখনো এ-ভাবে থামালে রাস্তার লোক ডাকতে হবে।

চলে গেছে।

একে একে বছর ঘুরেছে। একটা, দুটো করে ছ'টা। প্রতিবারের পরীক্ষার ফল বেরুলে জগৎ মিত্র গেজেট দেখেছে। বত্না মিত্র আই-এ পাশ করল, ইংরেজিতে ভালো অনার্স পেয়ে বি-এ পাশ করল, তারপর ইংরেজিতেই ভালোভাবে এম-এ পাশ করল। এখন সে একটা নতুন বেসরকারী মেয়েকলেজে ইংরেজি পড়ায়। জগৎ মিত্রর বয়েস একত্রিশ—বত্নার সাতাশ।

জগৎ মিত্র একটাই আশা বুকে ধরে নিয়ে বসে আছে। বত্নার নামের পরে এখনো মিত্র চলছে, মিত্র বাতিল করে এখনো বাপের পদবী বসুতে ফিরে যায় নি। আর সেই যে রাস্তায় দেখা হয়েছিল তখনো সিঁথিতে খুব সূক্ষ্ম সিঁদুরের আঁচড় দেখেছিল। জগৎ মিত্র গান ছাড়ে নি। গান নিয়ে আছে। নাম ডাকও হয়েছে। রেকর্ডের সংখ্যা বেড়েছে। বাড়ছে। রোজগার ভালো। কিন্তু তার গানের ধারা বদলেছে। যে গানের স্পর্শ প্রাণের গভীরে পৌঁছয় সেই গানই শুধু গায়। রেকর্ডে, রেডিওয়, উৎসব-অনুষ্ঠানেও তাই। সিনেমায় হালকা চটুল গানের ডাক পড়লে বাতিল করে দেয়।

এইবার সে শেষ চেষ্টার জন্য প্রস্তুত হল। বত্নার কলেজে গেল। দারোয়ানের হাত দিয়ে একটা স্লিপ পাঠালো। স্লিপে শুধু নিজের নাম। তারপর অফিসঘরে বসে অপেক্ষা করতে লাগল।

মিনিট পাঁচ-সাত বাদে হিন্দুস্থানী দারোয়ান সেই স্লিপটাই তার হাতে দিল। ভাজ খুলে দেখল, উল্টোদিকে লেখা, দেখা হবে না।

জগৎ মিত্র চলে এলো। তার প্রতীক্ষার শেষ। আশারও।

পরের টানা নয় মাসের মধ্যে জগৎ মিত্রর আর কেউ দেখা পেল না। উৎসব-অনুষ্ঠান, রেডিও, রেকর্ড, সিনেমা—সর্বত্র সে অনুপস্থিত। রেডিও-শ্রোতার সন্ধিৎসু চিঠির জবাবে সেখানকার কর্মীরা বেতারেই শ্রোতাদের জানাচ্ছে, জগৎ মিত্র দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ বলেই দীর্ঘদিন ধরে তাঁর গান বেতারে শোনা যাচ্ছে না। সিনেমার পত্র-পত্রিকাগুলোতেও জগৎ মিত্রকে নিয়ে কিছু জল্পনা-কল্পনা চলেছে।

ন'মাস বাদে একদিন কলকাতার সব কাগজে বড়বড় হরফে খবর বেরুলো সঙ্গীতশিল্পী জগৎ মিত্রর সন্ধান মিলেছে। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁকে হিমালয়ের দূর-দুর্গমের নেশায় পেয়েছিল। চরৈবেতির ডাক শুনে মুসাফিরের মতো তিনি মাসের পর মাস পাহাড়ে ঘুরেছিলেন। এবারে যমুনোত্রী থেকে ফেরার পথে তিনি প্রাকৃতিক দুর্যোগে গুরুতর আহত হন। আশংকাজনক অবস্থায় তিনি এখন দেরাদুন হাসপাতালে।

খবর মিথ্যে নয়। জগৎ মিত্র সব থেকে বেশি চোট পেয়েছিলেন মাথায়। দেরাদুনের ডাক্তাররা সেই কারণেই অবস্থা আশংকাজনক ঘোষণা করেছিলেন। অবশ্য দু'দিন বাদে তাঁরা ফাঁড়া কাটার কথাও বলেছেন।

রাতে ঘুমের ওষুধের ঘোরে জগৎ মিত্র বেশ বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছে। চোখ মেলে তাকাতেই মাথার পাশের চেয়ারে যাকে দেখল সে স্বপ্ন না সত্যি—হঠাৎ ভেবে পেল না।

বত্না। সে চোখ মেলে তাকাতে চেয়ারটা আরো একটু কাছে টেনে নিয়ে এলো।

দু'জনে দু'জনার দিকে চেয়ে আছে।

দ্বিতীয় বাসর এখানেই শেষ।

চেয়েই আছে।

মোহিনী সরকারের বলার ফাঁকে তাঁর গেলাসের শেষের হাফ শেষ। আর মহাদেব গাঙ্গুলির তৃতীয় গেলাসও শেষ। তিনি বললেন, আপনি তো খুব মন দিয়েই গল্পটা পড়েছেন দেখছি।

মোহিনী সরকার এখন একটু মেজাজে আছেন। ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, তাতে কি প্রমাণ হল?

—কিছু না। মহাদেব গাঙ্গুলির গম্ভীর দু'চোখ এবার বিভা সরকারের দিকে।—গল্পটা আপনার গাঁজাখুরি মনে হয়েছে?

একটু ইতস্তত করে বিভা সরকার জবাব দিলেন, উনি যে-রকম বলছেন, সে-রকম নয়। পড়তে তো আমার বেশ ভালোই লেগেছে।... তবে আপনার অন্য বইয়ের মতো অতটা বাস্তব নয়।

—কোন কোন জায়গা অবাস্তব?

বিভা সরকার একটু ফাঁপরে পড়লেন। আগ বাড়িয়ে জবাব দিলেন মোহিনী সরকার। বললেন, আপনি সত্যি বড় লেখক, কিন্তু এই গল্পের কোথায় অবাস্তব আপনার সত্যি চোখে পড়ছে না? এই গল্পের ভিতটাই তো অবাস্তব। বিবাহিত জগৎ মিত্রর ওভাবে এক মেয়ের পাল্লায় পড়া অবাস্তব, বত্নার মতো বউকে ছেড়ে তাকে বিয়ে করা অবাস্তব, সব থেকে বেশি অবাস্তব আপনার কলমের খোঁচায় বত্নাকে আই-এ, বি-এ, এম-এ ভালভাবে পাশ করিয়ে প্রোফেসারির চেয়ারে বসিয়ে দেওয়া—সেদিক থেকে রবিঠাকুরের সাধারণ মেয়ের অসাধারণ হয়ে ওঠার কল্পনাকে আপনি হার মানিয়েছেন—তারপরে বিরহী নায়কের হিমালয় ভ্রমণ অবাস্তব, অ্যাকসিডেন্ট এত মামুলি বলেই অবাস্তব —মিলনও অবাস্তব। এ সবই লেখকের ইচ্ছেয় হয়েছে।

—বুঝলাম। গম্ভীর মুখে সামান্য মাথা নেড়ে মহাদেব গাঙ্গুলি সায় দিলেন।... মা গঙ্গার আশীর্বাদের অমোঘ ফল বুঝতে পারছি। নড়েচড়ে সোজা হলেন একটু। দু'চোখ সোজা নিজের স্ত্রীর মুখের ওপরে।—তুমি কি বলো?

অন্য দু'জনের এবার খেয়াল হল, সোমা গাঙ্গুলির সমস্ত মুখ টকটকে লাল। ওই মুখে কেউ যেন হালকা করে আবির গুলে দিয়েছে। আগেও মাঝে মাঝে ওই মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিলেন দু'জনেই। তাই তাঁরা অবাকই একটু।

সোমা গাঙ্গুলি বসা থেকে উঠে দাঁড়ালেন। ওদেব দুজনেব দিকে চেয়ে তেমনি আবক্ত মুখে বললেন, উপন্যাসেব সব জায়গায় গায়ক আব গান বদলে লেখক আব লেখা কবে নিন, বেকর্ড কোম্পানীব জায়গায় পাবলিশাব করুন, ছবিব গানেব জায়গায় বেডিওব গল্প পডা করুন—আব আব (মুখ আবো লাল) নায়ক-নায়িকাব নাম দুটো শুধু বদলে নিন—তাহলে কিছুই অবাস্তব নয়—সবই ঘটেছে।

বলতে বলতে সোমা গাঙ্গুলি ঘব ছেড়ে দ্রুত বাবান্দায় চলে এলেন।

মোহিনী সবকাব আব বিভা সবকাবেব অবাক দৃষ্টি প্রথমে বাবান্দাব দিকে। তাবপব হতভম্ব বিমূঢ় চোখে পবস্পবেব দিকে চেয়ে বইল।

সদা-গম্ভীব মহাদেব গাঙ্গুলিব ঠোঁটেব ফাঁকে টিপ-টিপ হাসি।

একাকী জোনাকী

এই পবিণাম আমাব জানা ছিল। সেটা কবে আসবে, কখন আসবে, কোন পথ ধবে আসবে বা শেষেব আসব ঠিক এই বকমই জমে উঠবে কিনা আমাব বিক্ষিপ্ত চিন্তাব মধ্যে সেটা তেমন বড হয়ে ওঠে নি। জীবনেব শুরুতে কোনো ভ্রষ্টলগ্নে আমি কক্ষচ্যুত হয়েছিলাম। তখন থেকে নিজেব গোচবে হোক বা অগোচবে হোক, একটা লক্ষ্যবর্তিকা আমাব মনেব তলায় উঁকি-ঝুঁকি দিত। মনে হত, ওই বাতিটা হাতে নিতে পাবলে দস্যুব মতোই আবাব সেই হাবানো কক্ষেব একান্ত নিভৃতে নিজেব জায়গাটি অধিকাব কবে নেব।

ওই বাতি হাতে পাওয়াটাই লক্ষ্য, সেটোই পবিণাম। এই লক্ষ্য পবিণামকে বেষ্টন কবে একটা ঘূর্ণাবর্তেব মধ্যে পড়ে কেবলই পাক খেয়ে চলেছিলাম। তাই ওই আলোব দিকে আমাব হাত বাডানোটা এত বিসদৃশ, এমন অস্বাভাবিক। অন্ধ আবেগে সেটা ভয়াল নিষ্ঠুব কুটিল। আমাব সত্তা দ্বিখণ্ডিত, সেই আক্রোশে নিজেব মধ্যে আমি এক আত্মধ্বংসী ঘাতক পুষেছি, এক হিংস্র পশুকে লালন কবেছি। ওই আলো দিয়ে আমাব খণ্ডিত সত্তা কোনো আলো জ্বালতে চায় নি, কাবো বুকেব তলাব অন্ধকাব দূব কবতে চায় নি। মশাল জ্বালতে চেয়েছে, আগুন জ্বালাতে চেয়েছে।

সেই মশালেব আগুনে হিংস্র ক্ষমাশূন্য উল্লাসে নিজেব তাণ্ডব নৃত্য কত দেখেছি, ঠিক নেই। শব্দশূন্য চিৎকাবে প্রতিশোধেব একটা জ্বলন্ত গোলা এক বমণীব বক্ষ লক্ষ্য কবে ছুঁড়ে দিয়েছি—মা ইন্দুমতী, তুমিও দেখো, তোমাব ছেলে কেমন জ্বলছে আব পুডছে, দেখো। দেখো দেখো দেখো।

আজ যখন ওই আলোব কিনাবায় এসে দাঁড়িয়েছি, হাত বাডালেই ধবা যায় এত কাছে—তোমবা শিউবে উঠছ, ওই পবিণামেব গহ্বব থেকে আমাকে টেনে ফেবাতে চাইছ। তোমাদেব বেদনার্ত মুখ দেখে আমি অট্টহাসি হেসে যাব, ভেবেছিলাম। কিন্তু তাব প্রয়োজন ফুবিয়েছে। আমি অবাক হয়ে দেখেছি এ কোনো মশাল নয়, ক্ষতবিক্ষত জীবনেব এ কোনো বক্তেব আখবে লেখা মাশুলও নয়। এই পবিণামেব মুখে পা

ফেলামাত্র সর্বগ্রাসী পঙ্কিলতাব সেই ঘূর্ণাবর্ত ছাযাব মতো মিলিযে গেছে। ভয়াল দুঃস্বপ্ন ঘুমের ঘোবে যেমন অন্তরাত্মা কাঁপিযে তোলে, কিন্তু চোখ মেলে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায, তেমনি। একটা স্বস্তিব নিঃশ্বাসে বুক ভরে ওঠে তখন। আমারও তাই হযেছে. তাই হচ্ছে। এই অস্তিত্ব যেন এক স্বস্তিব সমুদ্রেব ওপর হালকা ভেলাব মত ভাসছি। তার প্লাবনে পৃথিবী বিহ্বল বুঝি।

পবিণামেব এই আলোব বঙে আমাব চোখেব সামনে সমস্ত দুনিযাব বঙ বদলেব উৎসব শুরু হযেছে। আমাব এই জড দেহেব শিবায শিবায সেই অলক্ষ্য দক্ষশিল্পী তীব্র বেদনাব মীড টেনে চলেছে। তাই দেখে বাববাব তোমরা শিউবে উঠছ। কিন্তু বিশ্বাস কবো, এক আসন্ন প্রত্যাশাব নিবিডতায আমাব এই নিথব দেহেব সমস্ত শিরা উপশিরাব তলায তলায এক অদ্ভুত স্পন্দন চলছে। খণ্ডকালেব এই ছোট পিঞ্জবটার মধ্যে আব আমি কুলিযে উঠছি না দেখে তোমাদেব এমনি আতঙ্ক কেন? এত আকুলতা কেন?

নিজেব আনন্দে বিভোব, তাই তোমাদেব করুণ মুখগুলো আমি ঝাপসা দেখছি। মা ইন্দুমতী, তোমাব মুখখানা এমন পাথব কেন? এত সব সেরা অভিনয কবাব পব একটা সাদামাটা অঙ্কে এসে এই কাণ্ড তোমাব। তুমি কি বুঝতে পারছ না, মবীচিকাতে প্রেতের নাচ শেষ কবে তোমাব সুমন অনেক অনেক ব্যবধান পেরিযে যেখানে ছিল ঠিক সেইখানেই ফিবে এসেছে? তুমি শিল্পী. আব ওই অলক্ষ্য শিল্পীর কাজ দেখে তুমি মুগ্ধ হতে পাবছ না? তাহলে তোমাব পাশে তাকাও, বাবাব মুখখানা দেখো, আব তাব পাশে নতুন মাযেব মুখখানাও। এবাবে পাবছ মুগ্ধ হতে? ওই শিল্পী বসিক কতো, বুঝতে পাবছ?

যশোদা, তুমিও এসে গেছ। কী কাণ্ড. ঘবে তোমাব গোপাল কাঁদছে না? আর শোভা মিতা তোমবাই বা খবব পেলে কি কবে? বেডিও আব খববেব কাগজগুলো সব দেশ থেকে তুলে দেওযা যায না।

দোহাই তোমাদেব, তোমবা আব যাই কবো, শোক কবো না। আমাব এই স্তব্ধ অনাবিল মুহূর্তগুলিকে শোকেব শেকল পবিও না। এই কপালে শোকেব তিলক কেটে দিযে তোমাদেব অতি সাধাবণ সুমনকে অসাধাবণ কবে তুলতে চেও না। মিনতি বাখো, শোক কবো না—শোক কবো না।

* * * *

চোখ বুজলে এমন কি চোখ চেযেও অনেক সময সাত বছবেব কালো-কোলো একটা মিষ্টি-মুখ ছেলেকে আমি দেখতে পাই। ওই ছেলেও চেযে চেযে দেখে আমাকে, কাবণ আমি তাকে অহবহই ডাকি। দুষ্টু-দুষ্টু ডাগব চোখ. এক-মাথা ঝাঁকড়া চুল, ফোলা-ফোলা দুই গালে যেন টোকা দিলেই অভিমান ঝববে। আমি ওকে বলি, হ্যাঁ বে, তুই কি কোন দিন বড হবি নে, কাছে আসবি নে?

ওই ছেলেটা আমি নিজেই। ওর নাম সুমন।

ও আমাব ডাক শোনে, কথা শোনে না।

আমি ওকে বলি, দেখ সুমন, আসলে তো তুই আর আমি এক, তুই ছোট সুমন আমি বড সুমন। কিন্তু তুই আলাদা হযে গিয়ে আমার ভিতরটা আধখানা করে

বেখেছিস। তুই কাঁদিস, ককিযে উঠিস আব সেই যন্ত্রণায আমিও অস্থিব হযে উঠি। তুই নিজে অমনি ছোট হযে থেকে আমাকেও পঙ্গু কবে বাখিস কেন? তাব থেকে তুই আমাব কাছে চলে আয, দুজনে এক হযে যাই—তোবও মুক্তি, আমাবও মুক্তি।

ও গাল ফুলিযে চোখ পাকিযে বলে, আসলে নিজেব মধ্যে নিযে তুমি আমাকে মেবে ফেলতে চাও। তুমি তো একটা খুনে—দিন-বাত কেবল মাকে মেবে ফেলাব বুদ্ধি আঁটছ মাথায, যেই তাকে মাবাব জন্য হাত তোলো আমি আর্তনাদ কবে উঠি আব তখন তুমি হাত গুটিযে নাও। সেই জন্যেই নিজেব মধ্যে নিযে গিযে আমাকে মাবাব মতলব তোমাব।

কচি মুখেব ওই কথা শুনে আমাব তাজ্জব লাগে। বলিস কি বে! আমি তো শুধু মাঝে মাঝে নিজেকেই মাবতে চাই।

একই কথা। সেই মাবও শেষ পর্যন্ত মাযেব বুকে গিযে লাগবে, তুমি ভালই জানো। আমাব সঙ্গে তোমাব অনেক তফাত, আমি মাযেব জন্য কেঁদে মবছি, আব তুমি মাযেব ওপব কেবলই ফুঁসছ।

কিন্তু তোব ফোঁস-ফোঁসানি জমা কবে কবেই তো আমি এত বড হযেছি, আব আমাব এই হাল হযেছে। এখনো এই দুর্দশাই চলেছে। বোকাব-মতো নিজেও ভুগছিস, আমাকেও ভোগাচ্ছিস। তাব থেকে চলে আয আমাব কাছে আমাব মধ্যে থেকেও এভাবে আলাদা হযে থাকিস নে।

না না না। ও মাথা ঝাকিযে ক্ষোভটা আমাব দিকে ছুডে দেয। আমি আলাদা বলেই আমাকে তুমি কোলে নিযে ঘুবে বেডাচ্ছ। আমাব জন্যে তুমি আধখানা হযে না থাকলে এতদিনে তুমি ক'টা খুন কবে বসতে ঠিক নেই। মাযেব কথা ছেডে দাও, আমি না থাকলে ওই যশোদা আব শোভা আব ওই মিতাকেই কি তুমি আস্ত বাখতে? মবে কালি মেবে যেত না ওবা এতদিনে?

আমি যখন ওকে আদব কবে ডাকি, ও আমাকে তখন এমনি কবেই নাস্তানাবুদ কবে। বললাম, তুই তো ওই ছোটটিই হযে আছিস, ওবা কে কেমন, বা আমাব কাছে কি চেযেছিল আব কোন মৃত্যুব স্বপ্নে বিভোব হযেছিল, তুই জানবি কি কবে?

ও মুখ মুচকে জবাব দিল জানাব দবকাব কি। মেযেছেলে দেখলেই তুমি তাব মধ্যে ভব-ভবতি মেযে দেখো আব অমনি অপমানেব আগুনে তাকে দগ্ধে মাবতে চাও। আব আমি তাদেব মধ্যে মা-কে খুঁজি, মা-কে খুঁজে বাব কবে তোমাব চোখে আঙুল দিযে দেখিযে দিলে তবে তুমি হাত গোটাও। শোভা-মিতাবা ভাবে, বাইবে তুমি যেমনই হও, ভিতবটা তোমাব কত সুন্দব দবদেব পাতে মোডা। ওদেব ছেডে নিজেব পঁযতাল্লিশ বছবেব মাকে তুমি কোন মূর্তিতে দেখো এক এক সময জানো না? সেদিন থিযেটাব হলে গ্রীনরুমেব একগাদা মেযেব সামনে মাযেব গলা টিপে ধবাব জন্য তোমাব হাত নিশপিশ কবে ওঠেনি? সেদিনও আলাদা হযে তোমাকে না আটকালে কি হত?

ওব সঙ্গে তর্ক কবে লাভ নেই। আমাবই বুদ্ধি নিযে ও এঁচডে পেকেছে। না, হাত যতই নিশপিশ করুক, বক্ত যতই মাথায় উঠুক—কিছুই আমি কবতাম না। ওই খুদেটা আমাব ভিতব দেখতে পায বলে ভয পায।

হ্যাঁ, মনে আছে। নতুন চমক লাগানো নাটক 'চক্র' দেখতে আমিও গেছলাম। অনেক আগে থেকে চেষ্টা করে টিকিট সংগ্রহ করতে হয়েছে অন্যের মারফত। অপরের মারফত কারণ, সিনেমা রাজ্য আর থিয়েটার জগতের প্রায় সমস্ত কর্মকর্তারাই মায়ের দৌলতে আমাকে চেনে। এও আমার এক বড় রকমের দুর্ভাগ্য। দেখে ফেললে আর চিনে ফেললে সকলেই খাতির করে, ঘটা করে আপ্যায়ন জানায়।

'চক্র' নাটকে নামধন্যা নায়িকা বিপাশা দেবীর রঙ্গমঞ্চে দ্বিতীয় দফা এই বৃহৎ আবির্ভাব। প্রথম বার প্রায় এক বছর ধরে 'বিজয়িনী' নাটকে অভিনয় করে থিয়েটারের মালিকদের টাকার তহবিল ফাঁপিয়ে তুলেছে। সেটা ছিল ইতিহাসভিত্তিক আখ্যান। এটা সামাজিক।

মা ইন্দুমতী চিত্রজগতের যশস্বিনী নায়িকা বিপাশা দেবী। আজ অনেক বছর হয়ে গেল ওই নামের সঙ্গে দেবী যুক্ত। ব্যক্তিজীবনে বার কয়েক পদবী বদল হয়েছে কিন্তু শিল্পী-জীবনে দেবী স্থায়ী আসন নিয়েছে। গোড়ায় ছিল বিপাশা সরকার—ঘরে যখন ইন্দুমতী সরকার।

বাইশ থেকে উনচল্লিশ—এই দীর্ঘ আঠার বছর সে ছিল ছায়াচিত্র জগতের সম্রাজ্ঞীর মতো। উদ্ধত আত্মচেতন অনন্যাগোছের কেউ নয়। বরং উল্টো। মার্জিতরুচি, সরলবুদ্ধি, বিনয়নম্র, নির্ভরশীল আচরণ সকলের সঙ্গে। এটাই তার বড় আকর্ষণ, এতবড় সাফল্যের পিছনে এটুকুই বড় পুঁজি। আমি তাকে কাছ থেকে দেখেছি, দূর থেকে দেখেছি। তার কোন আচরণ অভিনয় আর কোনটা নয়, তা আজও আমার কাছে স্পষ্ট নয় খুব। বাঘা সমালোচকরা তার সম্পর্কে বলে থাকে, মহিলা কোনো সময় অভিনয় করে না বলেই, এত বড় অভিনেত্রী সে। এক বড় অভিনেত্রী সে। এক-একসময় মনে হয়, খুব অতিশয়োক্তি নয়। ছবিতে যেমন, ছবির বাইরেও তেমনি। শান্ত স্নিগ্ধ, ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু মৃদু হাসি, ডাগর সরল চাউনি—আবার প্রয়োজনে অটুট গম্ভীর তীক্ষ্ণ কঠিন অচপল অচঞ্চল। ছবিতে তার এই দুই রূপ, ঘরেও। অবশ্য আমি যে ঘরের কথা বলছি সেটা আমাদের ঘর- উনিশ বছর আগের আমাদের সেই ঘর। তারপরেও এ যাবত বহুবার তাকে দেখেছি, তার ঘরে দেখেছি, ঘরের বাইরেও দেখেছি। আমার ধারণা ওই রূপের রকমফের খুব একটা হয় নি। আর ভিতরে বাহরে ওই রূপ মিশে আছে। ওই দুটো রূপ তার ঘর ভেঙেছে আবার নতুন ঘরের হাতছানি আর আশ্বাসও জুগিয়ে এসেছে। তার থেকেও বড় কথা—ওই দুটো রূপই তার এতবড় প্রতিষ্ঠার মূল ভিত্ত। তাই এমন এক সার্থক রূপের আজও খুব একটা রং-বদল হয়েছে বলে মনে হয় না।

এত বড় অভিনেত্রী ইদানীং রঙ্গমঞ্চের দিকে ঝুঁকেছে কেন, সে সম্পর্কেও আমার একটা সাদা-সাপটা ধারণা আছে। পঁযতাল্লিশ বছর বয়সের দাগটা ক্যামেরায় ফাঁকি দেওয়া সহজ নয়। উনচল্লিশ বছর পর্যন্ত প্রসাধন আর মেক-আপ-এর দৌলতে টেনেটুনে চালানো গেছে। চালানো গেছে বলতে নায়িকার ভূমিকা উতরে দেওয়া গেছে। তারপর আর সেটা সম্ভব হয়ে উঠছিল না, বয়সের ছাপ পড়ছিলই। ফলে এখন আর নায়িকা নয়, নায়িকাসদৃশার ভূমিকা তার। আজও বক্স-অফিস আর্টিষ্ট হিসেবে বিপাশা

দেবীব নামটা তুচ্ছ নয়, কিন্তু প্রযোজক বা পরিচালকেব তাগিদে গল্পেব লেখককে তার কাহিনীতে নায়িকাসদৃশা দিদি বা বউদিব ভূমিকা বুনে দিতে হয। ছোট ছেলে বা মেয়ে বা মায়ের গুরুত্বপূর্ণ কোনো বোল থাকলেও সবাব আগে তার ডাক পড়ে।

কিন্তু এ-দেশের ছবিব গল্পে অক্ষত কুমাবীকন্যাব চাহিদা যতো, ততো আর কিছু নয। ছবিতে প্রেমেব কাহিনী রূপায়ণ একমাত্র বাণিজ্যিক বস্তু। সেই প্রেম কোনো বিধবাব অথবা কোনো বিবাহিতা বমণীব (স্বামী-প্রেম নয) হলে সেটা পবিত্যাজ্য। টাকা ঢেলে কোনো প্রযোজক ছবিতে সেই জটিল প্রেম সচল কবাব ঝুঁকি নেবে না। ছবিব প্রেম নিতান্তই বিশুদ্ধ নিকষিত হেম হওয়া চাই।

ফলে যত নামজাদা অভিনেত্রীই হোক, ছবিব বাজাবে বিপাশা দেবীব চাহিদা স্বাভাবিকভাবেই কমে আসছিল। কিন্তু শুধু সেই কাবণেই কি মঞ্চেব দিকে ঝুঁকেছে সে? আমাব মনে হয না। কাবণ এই আকর্ষণেব পিছনে আর্থিক অপ্রাচুর্য অথবা মোহ কিছু থাকাব নয। একটানা দশ বছব ছবিব বাজাবে সব থেকে চড়া দামেব শিল্পী ছিল সে। শুনেছি, ওই ক'টা বছব ছবি পিছু খুব কম কবে এক লক্ষ টাকা দেবাব ক্ষমতা না থাকলে কোনো প্রযোজক তাব দিকে এগোতেও সাহস কবত না। মহিলাব সঞ্চযেব পবিমাণ নিযে কখনো মাথা ঘামাই নি, তবু ধাবণা, ফেলে ছড়িযে পঁচিশ তিবিশ লক্ষ টাকাব কম হবে না। এছাড়া নিজেব বাড়ি-গাড়ি-সোনা-গযনা তো আছেই।

না টাকাটা বোধহয কোনদিনই তাব অভিনয-জীবনেব একমাত্র কাম্য বস্তু ছিল না। এ-দেশের ছবিব বাজ্যে ওই শিল্পীব মাথায যখন অনন্যাব মুকুট ঝলমল কবছে, বোম্বাই বা মাদ্রাজেব ধনকুবের হিন্দী ছবিব প্রযোজকবা তখন তাব কাছে হামেশাই ছুটে এসেছে। সে-খবব কাগজে আব সিনেমাব মাসিক সাপ্তাহিকে ছাপা হযেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্তও কোনো হিন্দী ছবিব চুক্তিপত্রে স্বাক্ষব কবাব খবব বেবোয নি। যে স্বাক্ষবেব রূপালি মূল্য বাংলা ছবিব পাঁচ-সাত গুণ বেশি।

আব সেই সূত্রে সিনেমাব মাসিক সাপ্তাহিকগুলোতে শিল্পীব মাথায যে কতভাবে স্তুতি আব প্রশংসা বর্ষণ কবা হযেছে, ঠিক নেই। অত্যুৎসাহী গুণমুগ্ধ চিত্র সাক্ষাৎকাবেব বিববণও ফলাও কবে ছাপা হয়েছে।

প্রশ্ন, হিন্দী ছবিওযালাবা এভাবে ডাকাডাকি কবছে, আপনি যাচ্ছেন না কেন?

হিন্দী জানি নে।

সেটা কোনো সমস্যাই নয়, কত আর্টিস্ট তো দিব্যি শিখে-পড়ে কাজ চালিযে নিচ্ছে।

জবাব, তাঁবা আমাব থেকে ঢেব বড় গুণী হবেন।

চিত্র সাংবাদিক (সহাস্যে) : এটা যে ঠিক বললেন না, এও আপনি নিশ্চয জানেন?

জবাব (সহাস্যে) : নিশ্চয জানি না। তবে মনে হয, শিখে পড়ে ফুলেব ওপব রচনা লেখা যায, ফুল ফোটানো যায না।

মুগ্ধ চিত্র সাংবাদিক : তাহলে এটা ধরে নিতে পাবি, শিল্পী-জীবনে টাকাটা আপনার আদৌ বড় লক্ষ্য নয়, আপনাব শিল্প প্রতিভা কোনবকম জোড়াতাপ্পির সঙ্গে আপোসে নারাজ?

স্মিত জবাব : ধবে নিযে ও-কথা কাগজে লিখে দিলে বেশ বাহবা পাব। কিন্তু আসলে সেটা ডাহা মিথ্যে—নতুন কোনো পবীক্ষাব মধ্যে ঝাঁপিযে পডতে চাই না ভযে।

চিত্র সাংবাদিক (সবিস্ময়ে) : এত দিনেব এত অভিজ্ঞতাব পবেও আপনাব ভয়। এটা কি বিশ্বাসযোগ্য কথা।

বিশ্বাস না কবলে আমাব সুবিধে। (এই জবাবে মিষ্টি হাসিব আধিক্য ছিলই মনে হয)।

চিত্র সাংবাদিক (নাছোডবান্দা তবু) : কিন্তু ভয কেন?

সবল সুললিত জবাব আসলে তো আমি খুব একটা সাধাবণ মেযে। প্রতিভাব চটকদাব বোঝা যত আপনাবা মাথায চাপাচ্ছেন ভিতবে ভিতবে ততো ভয। তবু আপনাদেব দেওযা ওই সার্টিফিকেটেব প্রতি লোভ তো আমাব আছেই, তাই মনে হয, নতুন কিছুব মধ্যে গিযে ধবা পডে মবি কেন।

জবাব শুনে শুধু কি ওই চিত্র সাংবাদিক মুগ্ধ হযেছিল? না, পডে আমিও মুগ্ধ হযেছিলাম। আগে কত শত সহস্র জন মুগ্ধ হযেছিল, ঠিক নেই। বিপাশা দেবী, তোমাব অস্তিত্ব থেকে মা ইন্দুমতীকে সবাতে পাবলে আমিও যে তোমাব কত বড এক ভক্ত, জানো না। মানুষকে মুগ্ধ কবাব সহজাত কৌশল তোমাব স্বভাবেব সঙ্গে মিশে আছে। তাই ভাবতে অবাক লাগে, এ কৌশল তুমি একজনেব ওপব খাটালে না কেন, খাটাতে পাবলে না কেন? খাটাতে পাবলে না, না কি খাটাতে চাইলে না? সেই জন্যেই লোককে মুগ্ধ কবাব তোমাব এই সহজ কৌশলই আমাব অভিনয মনে হয।

কোনো বোঝাপডা হবে, হবেই, সেইদিন আমি বুঝে নেব, তুমি শিল্পী বড কি অভিনেত্রী বড। ঠিক এই গোছেব কথা শুনে শোভা গাঙ্গুলি একদিন বড অবাক হযেছিল, মনে আছে। বলেছিল, শিল্পী কি অভিনেত্রী নয, না কি অভিনেত্রী শিল্পী নয, দুইযে তফাত কি?

জবাব দেব কি, এই গোছেব বোকা বোকা প্রশ্নেব জবাব হয না, আপনা থেকে না বুঝলে বোঝানো যায। নিজেব বুকে একটা আঙুলেব টোকা মেবে বলেছিলাম, এইখানটায একটু তফাত আছে।

তফাত বোঝাব আগ্রহে শোভা গাঙ্গুলি একটা স্থূল জাল ফেলতে চেষ্টা কবেছিল আমাব চোখেব সামনে। টেবিলে দুই কনুই ভব দিযে দু'হাতেব চেটোয দুই গাল বেখে আমাব দিকে একটু ঝুকে বসে বেশ নিবিষ্ট মাধুর্যে কথা কইছিল আব কথা শুনছিল। এবাবে বাঁ হাতটা গাল থেকে নামিযে চাঁপাব কলিব মতো মধ্যমা বাব দুই-তিন নিজেব বুকে ঠুকে আবাব জিজ্ঞাসা কবেছিল, অভিনেত্রীদেব কি এই জাযগাটা নেই।

বেচাবী শোভা গাঙ্গুলি। আমাব হাসি পেযেছিল অবশ্য, কিন্তু চাউনিটা বোধহয খবখবে হযে উঠেছিল। বলেছিলাম, আমাব মা হলে কি কবত জানো? গাল থেকে হাত দুটো নামিযে একটু নডেচডে বসাব ফাঁকে শাডিব আঁচলটা আব একটু ভালো কবে টেনেটুনে দিত তাবপব সাদামাটা হোমিওপ্যাথিক বিস্ময়ে মুখেব দিকে চেযে থাকত খানিক, তাবপব চোখেব পাতা দুটো শুধু একবাব নীচেব দিকে নামিযে ঠিক তোমাব মতো কবেই জিজ্ঞাসা কবত, অভিনেত্রীদেব কি ও-জাযগাটা নেই?

শোভা গাঙ্গুলির কান-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ওব বং ফসা। মাযেব তুলনায ঢেব বেশি সুশ্রী। ওব প্রতিক্রিযা লক্ষ্য না কবেই যেন বক্তব্যটা আব একটু নবম আব প্রাঞ্জল কবে তুলতে চেষ্টা কবেছিলাম। চটকদাব অভিনেত্রী আব জাতশিল্পীব মধ্যে এও একটা বড তফাৎ, বুঝলে? চটকদাব অভিনেত্রীব চমক বেশি, প্রকাশ বেশি, আব জাতশিল্পী যেটুকু অনাবৃত কবে, তাব থেকে যেন ঢেকে বাখে বেশি—উঁকি-ঝুঁকি দিযে দেখতে লোভ জাগে।... তবে আমি যে তফাতেব কথা বলছিলাম সেটা অন্য ব্যাপাব। একটা ধবো ডালিযা আব একটা বজনীগন্ধা।

যাক, কথা হচ্ছিল মাযেব মঞ্চাভিনযেব প্রতি আকর্ষণ আব তাব লেটেষ্ট অবদান চক্র' নাটক প্রসঙ্গে। আমি নিঃসংশয—এ-ঝোঁক অর্থেব তাগিদে নয। টাকা তাব প্রচুব আছে এবং আবো একশ' বছব বেচে থাকলেও ওতে টান ধববে না। তাছাড়া ইচ্ছে কবলে দিদি-বউদি অথবা কিশোব-কিশোবীব মাযেব বাছাই কবা বোল-এ তাকে পাবাব নামী পবিচালক প্রযোজকবা এখনো হামেশাই তাব কাছে ছোটাছুটি কবে। তাদেব ডাকে সাড়া দিলে এখনো মঞ্চেব বিশ তিবিশ গুণ বেশি বোজগাব হতে পাবে। কিন্তু বেশিব ভাগ পবিচালক প্রযোজককেই সে ফিবিযে দিযে থাকে।

এতটা উৎসাহ আব উদ্দীপনা নিযে মঞ্চে নেমে আসাব দুটো কাবণ বোধহয। প্রথম এব মাদকতা ভিন্ন স্বাদেব। কবিব কাজ অভিনেতা অভিনেত্রী আব কলাকুশলীদেব মধ্যে সীমাবদ্ধ। ক্যামেবাব আব শব্দ-যোজনাব কাবসাজিতে অনেক ফাক আব ফাকি ভবাট কবে দেওযা যায। কিন্তু মঞ্চে সোজাসুজি বসপিপাসু খদ্দেবেব যাচাই বাছাইযেব মুখোমুখি এসে দাড়ানো। এখানে কোনো ফাকিব কাববাব নেই। গোটাগুটি নগদ বিদাযেব ব্যাপাব। সে বিৰূপ হলে তাব অভিব্যক্তি মুখেব ওপব ছুডে মেবে দেবে, খুশি হলে সবব উচ্ছ্বাসেব অর্ঘ্যও পাঠাবে।

বিপাশা দেবীব মঞ্চপ্রীতিব আডালে এটাই একমাত্র কাবণ মনে হয না। আসল কাবণ, বযেস যেমনই গডাক, নিজেব কাছে নিজে সে এখনো দ্বিতীয বহিতা। তাই প্রথম সাবিতে এখনো স্থান চাই তাব। সে বিশ্বাস কবে এই পঁযতাল্লিশেও তাব দেবাব বস্তু ফুবিযে যায নি। এই দেবাব সংস্কাব ভিতবেব সম্পদ এখনো পঁচিশ তিবিশেব মতো তাজা আছে। এখনো সে ফলভাবে আনত, ক্যামেবাব ভ্রুকুটিতে নিষ্ফলা হযে যেতে বাজি নয। ক্যামেবায বযসেব দাগ পডে, কিন্তু সুপটু প্রসাধনে হল-ভর্তি সাবি সাবি স্থূল চক্ষুগুলোতে তাব দাগ পডে না। এই মরুভূমিতে সে যে ৰূপ নিযে এসে দাডাবে, সে তাই। তাব দেবাব বস্তু নেবাব জন্যেই সাগ্রহে বসে আছে সব, যতদিন 'দতে পাববে ততদিন বুক ভবে আব মন ভবে নিযে যাবে।

'বিজযিনী' নাটকে তাই নিযে গেছে সব। এই পঁযতাল্লিশেও সম্পূর্ণ বিজযিনী হযে ফিবেছে সে। যে বিজযিনীব কোনো বযেস স্থূল হিসেবেব মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ নয, যে বিজযিনীব নিভৃতেব অন্তঃপুবিকাটি শাশ্বত চিবযৌবনা।

সামাজিক 'চক্র' নাটকেও ওই বিজযিনীকেই স্বতঃস্ফূর্ত কবে তোলাব দ্বিতীয অভিযান তাব। ভিন্ন ৰূপ আব আবো একটু বিশ্বাসযোগ্য আঙ্গিকে ওই বিজযিনীব স্বাক্ষব অপ্রতিহত বাখাব অটুট অভিলাষ।

আমার বিবেচনায় বা বিচার বিশ্লেষণে চক্রের কাহিনী এমন কিছু বর্ণোজ্জ্বল নয়। বরং মামুলি আখ্যান বলা যেতে পারে। কিন্তু নাটক লোক-চক্ষুর সামনে মঞ্চস্থ হবার আগেই বিজ্ঞাপনের চটকে অভিনবত্বের ছাড়পত্র পেয়েছে। এসব ক্ষেত্রে রামের আগে রামকাণ্ড রচনার মতো প্রচারের আবহাওয়া সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। কাগজে সে সব চুটকি ব্যাপারগুলো ফলাও করে ছাপা হয়।... যেমন, শুধু ছায়াচিত্রের নয়, মঞ্চেরও অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী অভিনেত্রী দিনের পর দিন মাসের পর মাস নাট্যকারের সঙ্গে বসে নিজের ভূমিকা গঠনের কাজে বিপুল সহায়তা করেছেন। সংযোজন এবং পরিবর্জনের তুলাদণ্ড হাতে বসে আপন ভূমিকাটি আত্মিক সম্পদ করে তুলেছেন। অতএব অনন্যা শিল্পীর এ যে এক স্মরণীয় সৃষ্টি হয়ে থাকবে তাতে আর সংশয়ের অবকাশ কোথায়?

নাটকের কাহিনী তখনো অজ্ঞাত আমার। বিজ্ঞাপনের ওই চমকের জবাবে মার্কা মারা এক তেরছা চরিত্রের কাগজে স্বনামে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। লিখেছিলাম, আমাদের সাহিত্য আর নাটক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সঙ্গগুণে আর সহৃদয় সহযোগিতায় কোন সার্থকতার দিকে গড়াতে চলেছে? যে নাট্যকার কোনো অভিনেত্রীর সঙ্গে বসে তার সহযোগিতায় সৃষ্টিপথে বিচরণ করেন, নাট্যসরস্বতী তাঁর ওপর কতটুকু নির্ভর করতে পারেন? আর নামী অভিনেতা অভিনেত্রীরাই বা এই সহযোগিতা দেবার স্পর্ধায় এগিয়ে আসেন কোন গুণে? কারা সাহিত্যের এই বন্ধ্যা যুগের কান্না শুনে গিরীশ ঘোষ কি আবার রমণীর রূপ ধরে পুনর্সম্ভবামি হয়েছেন?

বলা বাহুল্য, চিঠিখানা ওই তেরছামুখো চরিত্রের কাগজে ছাপা হয়েছিল। চিঠির গুণে নয়, ছাপা হয়েছে আমার গুণে। আমার সঙ্গে ওই অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী অভিনেত্রীর সম্পর্কটা কাগজের কর্মকর্তাদের জানা আছে বলে। ছাপা কাগজের এক কপি যে ডাকে ওই অভিনেত্রীর কাছেও চলে গেছে তাতেও কোনো সন্দেহ থাকলে ও চিঠি ছাপাই হত না।

নাটকের মূল কথা স্বল্পপরিসরে পংক্তিবদ্ধ করা যেতে পারে। গরিবের ঘরের এক ছেলে ডাক্তার হয়ে বসার পর এই কালের লোভের বলি হতে চলেছে। সেবার বদলে সে মৃত্যুবাণ হাতে নিয়েছে। যত তার পসার বাড়ছে, ততো তার লোভ বাড়ছে, আর কালো রাস্তাটি প্রশস্ত হয়ে উঠছে। বাধা কোথাও নেই, বাধা শুধু তার ঘরে।

বাধা তার ঘরের অতি সাধারণ বিবাহিতা স্ত্রীটি। প্রথম অধ্যায়ে সে স্বামীর গরবে গরবিনী, অর্থাগমের প্রাচুর্যে সুহাসিনী। কিন্তু ক্রমে কাঁটার মতো একটা সংশয় বিঁধতে শুরু করেছে তার হৃদয় নামে কোমল বস্তুটির ওপর। আর তারপর যত দিন যাচ্ছে, সেই কাঁটা ছুরির ফলা হয়ে তার বুকের তলায় কাটাছেঁড়া করে চলেছে। স্বামীর লোভের ব্যাধি এতদূর গড়িয়েছে যে তাকে ফেরানোর সকল চেষ্টা ব্যর্থ। শেষে কোনো রোগিনীর মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে আদালতে এক চাঞ্চল্যকর বিচারের অনুষ্ঠান। আসামী ওই ডাক্তার, আর প্রমাণসহ তার বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী তার স্ত্রী। দুনিয়ার একটি মাত্র ভালবাসার মানুষকে কঠিন সঙ্কল্পে শুচিশুদ্ধ করে তোলার সাদা নজির রেখে গেল যে রমণী, আর সে অতি সাধারণ নয়, বড় বিচিত্র।

বলা বাহুল্য, আজকেব দিনেব লোভ পাপ ব্যাভিচাব আব হানাহানিব ঝড়ো হাওযায এই গোছেব এক ভাবপ্রবণ নাটকেব সাফল্যেব সবটুকু অভিনয। কিন্তু মিথ্যে বলব না, আত্মস্থ অভিনযগুণে ওই বমণী দর্শকেব চোখে ক্রমশ বিচিত্র রূপিণীই হযে উঠেছিল। তাব প্রথম দিকেব হাসিখুশি আব স্বামীব প্রতি সবল বিশ্বাস আব নির্ভবতা পুরুষ মাত্রেবই লোভেব বস্তু যেন। তাব বোষ তাব ঘৃণা তাব বিদ্বেষ তাব নীবব যন্ত্রণাও শুদ্ধ অনুবাগ আব অব্যক্ত আকুতিব তাপে মহিমান্বিত। এই মহিমাব সামনে দাঁড়িযে পুরুষ মুগ্ধ হতে আব অবনত হতে বাধ্য।

আমি জানি, বঙ্গালযেব এত শত দর্শকেব মধ্যে আমাব মতো নির্মম-ক্রুব সমালোচনাব চক্ষু নিযে আব একজনও বসে নেই। অথচ আশ্চর্য, আমিও যেন অবিশ্বাস থেকে এক লোভনীয বিশ্বাসেব দুনিযাব দিকে পা বাড়িযেছি। ওই বমণী যেন অভিনেত্রী নয, যা ঘটছে তাব সবকিছুব সঙ্গে বুঝি তাব জীবনেব যোগ। সেই জীবন যত ছিন্নভিন্ন হযে যাচ্ছে, তাব চোখে মুখে আচাবে আচবণে বমণীসত্তাব ওই দুর্লভ দুর্লঙ্ঘ্য মহিমা ততো বেশি এঁটে বসছে। পুরুষকে ফিবতে হবে, সে না ফিবে যাবে কোথায?

তিন অঙ্কেব নাটক। দ্বিতীয অঙ্কেব শেষে দর্শকেব বিপুল কবতালি আব স্বতস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসেব ডালি নিযে দৃপ্ত সংহত নাযিকা মুগ্ধ দর্শকেব চোখেব আড়ালে চলে গেছে। ড্রপ সীন নেমেছে। সমস্ত আলো জ্বলে উঠছে।

আমাব ভিতবে ভিতবে সেই থেকে কী একটা যন্ত্রণা শুরু হযেছিল। নিভৃতেব কোন পাতাল থেকে একটা আক্রোশ ঠেলে উঠে শিবায শিবায ছড়িযে পড়েছিল। উঠলাম। বাইবে এলাম। তাবপব অনেকটা নিজেব অগোচবে যেন উইংস-এব দবজা দিযে পিছনেব অন্দবে চলে এলাম। ভিতব থেকে শব্দশূন্য অব্যক্ত গর্জন উঠছে একটা। —এই যদি সত্যি হয, পুরুষ যদি কল্পনাযও এ-ভাবে ফিবতে পাবে তাহলে যে-ঘবে আমি ছিলাম, সেই ঘব এভাবে ভেঙে গেল কেন? পুরুষ ফেবানোব এই সঙ্কল্প সেদিন তোমাব কোথায ছিল? সাত বছবেব একটা ছেলেকে হত্যা কবে আজ তুমি বমণীব মহিমা দেখাতে এসেছ? তোমাব এই মহিমা দেখে যাবা ভুলছে ভুলুক, আমি তোমাকে ক্ষমা কবব না, তোমাব ক্ষমা নেই—

পিছনে পাশাপাশি দুটো সাজঘব। একটা পুরুষদেব, অপবটা মেযেদেব।

আসুন আসুন, মা-কে খুঁজছেন বুঝি? মেযেদেব ঘবেব দবজাব কাছ থেকে আপ্যাযন জানালো যশোদা। ফিবে দাঁড়িযে ডাকল, মা, কে এসেছে দেখুন।

যশোদা তিন-চাব বছব যাবৎ চেনে আমাকে। দেখলে যতটা সম্ভব মুখে খুশিব ভাব ফোটায, কিন্তু ভিতবে ভিতবে একটু যেন বিব্রত বোধ কবে। ডাকসাইটে অভিনেত্রীব স্নেহ কেড়েছে, তাকে ভালবাসে, মা বলে ডাকে। তাব কাছেই থাকে। আমাকে দেখলেই বোধহয মনে হয, ও আমাব জাযগা জুড়ে বসে আছে। বেশ মিষ্টি মেযে, মিষ্টি কথা-বার্তা। মিষ্টি মিষ্টি হাবভাব। কোথা থেকে কি-ভাবে এসে অতবড় অভিনেত্রীব বুকেব কাছে একটু জাযগা কবে নিযেছে সেটা ভিন্ন প্রসঙ্গ। শিল্পী হবাব সাধ যত ছিল সাধ্য ততো ছিল না। রূপ সাধাবণ, প্রতিভাও তাই। ছবিতে বা মঞ্চে

দ্বিতীয অথবা তৃতীয সাবিব শিল্পীব কাজ জোটে তাব। নিজেই বলে, মাযেব আশ্রয না পেলে কোথায ভেসে যেতাম ঠিক নেই, কেউ একটা ঝিযেব বোল দিযেও জিগ্যেস কবত না। এখন যেটুকু শিখেছি তাও মাযেব দযাতেই।

বড শিল্পীব সুপাবিশে অনেকেব ভাগ্য ফেবে, সেটা নতুন কিছু নয। কিন্তু যশোদাব মাতৃভক্তি দেখলে আমাব কেমন হাসি পায। ওব এই ভক্তিটা অন্ধ অকৃত্রিম মনে হয বলেই হযতো। ওই মা ওব কাছে শুধু গুরু নয, দেবীও।

কিন্তু সেদিন আমাব হাসি পাচ্ছিল না।

ওব ডাক শুনে শিথিল চবণে দবজাব কাছে এগিযে এলো যে বমণী, সে অনন্যা শিল্পী বিপাশা দেবী, কি চক্রেব অন্তঃপুবসীমন্তিনী, কি আব কেউ—সেটুকুই যেন আগে যাচাইযেব বিষয আমাব।

কি বে, তুই এসেছিস। নাটক দেখছিস নাকি?

এতক্ষণেব নিভৃতেব সেই গর্জনেব অনুভূতিটা আমাব দুটো হাতেব মধ্যে এসে আকুলি-বিকুলি কবতে লাগল হঠাৎ।

এই হাত দুটো যা চাইছে এখন তাই যদি হয বমণীব ওই নবম গলাব ওপব যদি আস্তে আস্তে উঠে আসে, ধীব অব্যর্থ অমোঘ নিষ্পেষণে, ওই আত্মস্থ নবম দেহেব প্রাণটুকু যদি এই দুটো হাতেব মুঠোয টেনে বাব কবে নিযে আসে—তাহলে কে যাবে? শিল্পী বিপাশা দেবী, না চক্রেব অন্তঃপুবসীমন্তিনী, না কি আব কেউ?

মাথা নেডেছিলাম। নাটক দেখছি।

নিজে না আসিস, একটা ফোন কবেও তো জানা'লে পাবতিস, দেখতে আসবি, আমি ব্যবস্থা কবে বাখতুম।.. কেমন লাগছে?

খুব ভালো।

হুঁঃ, তোব ভালো আমি জানি না, কালই হযতো কাগজে দেখব হুল ফুটিযে চিঠি লিখেছিস।.. কোথায বসেছিস, ঠিক মতো দেখতে শুনতে পাচ্ছিস তো?

মোটামুটি। দু'টাকাব পেছনেব দিকেব সীট, কথা কিছু কিছু মিস হবেই।

চকিতে আমাব আপাদমস্তক চোখ বুলিযে নিল একবাব। পবনেব জামা কাপড ধোপ দুবস্ত নয তেমন। পলকেব ভ্রূকুটি। আমাব ঠাণ্ডা মূর্তিও হযতো চোখে শুকনো শুকনো ঠেকল। খাবি কিছু?

হাত দুটোকে সংযত কবাব জন্যই পকেটে ঢোকালাম। ঠোঁটে হাসি টেনে আনাব চেষ্টাটা সেদিন এমন শক্ত লাগছিল কেন, জানি না। তবু চেষ্টাব কসুব কবিনি। পিছনেব আধখানা আডালে দাঁডিযে যশোদাও আমাকে দেখছিল। আমাব মধ্যে সর্বদাই ও যেন দেখাব খোবাক পায কিছু।

মাথা নাডলাম, খাবাব বাসনা নেই।

পবেব অঙ্কেব প্রথম ঘণ্টা বাজল। বিপাশা দেবী ঈষৎ ব্যস্ত গাম্ভীর্যে ঘব থেকে আধা-আধি বেবিযে এদিক ওদিক তাকালো। ফলে আমাব গাযেব সঙ্গে তাব গা ঠেকল।

এই মুহূর্তে ওই স্পর্শটুকু আচমকা নিষ্ঠুবভাবে নিবিড কবে ফেলতে পাবি, অবাধ্য হাত দুটোকে স্বাধীনতা দিতে পাবি।... তাবপব কে থাকবে? বিপাশা দেবী, না চক্রেব

অন্তঃপুর-সীমন্তিনী, না আর কেউ? মা ইন্দুমতী থাকবে বোধহয়, একটা দুর্বার লোভ দমন করে হাত দুটো শক্ত করে পকেট দুটোর মধ্যে আটকে রাখলাম।

দু'দিক থেকে দুটো লোক হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো একসঙ্গে। চক্রের এই নায়িকার হাতে তাদেরও দণ্ডমুণ্ডের চক্র যেন।

একে একেবারে প্রথম রো-তে বসিয়ে দিন তো।

লোক দুটোই মাঝখান থেকে আচমকা বিপাকে পড়ল যেন। মুখ কাঁচুমাচু করে একজন বলল, প্রথম দিনের প্রথম শো, হাউস একেবারে প্যাক্ট আপ

শোনামাত্র মুখে বিরক্তির আভাস। কিন্তু সেও অশোভন মাত্রায় নয়। -যা বললাম ব্যবস্থা করুন, দরকার হলে এক্সট্রা চেয়ার দিন। আমরা দিকে ঘুরল। ঈষৎ তপ্ত একটা নিঃশ্বাসের স্পর্শ মুখে এসে লাগল।

এদের সঙ্গে যা। শো-এর শেষে দেখা না করে পালাস না যেন।

ভিতরে ঢুকে গেল। দ্বিতীয় বেল বেজে উঠবে এক্ষুণি।

অসুবিধের কথা বলে ফেলে লোক দুটো আরো বেশি বিব্রত যেন। তাদের একজন সবিনয়ে ডাকল, আসুন স্যর—উইংস-এর বাইরে আসতে আসতে আবার বলল, কিছু মনে করবেন না স্যর, এক্সট্রা চেয়ার যে কত পড়ে গেছে, উনি তো জানেন না

বললাম, ব্যস্ত হবেন না, কিছু দরকার নেই।

না না না তা কি হয়। উনি আদেশ করেছেন যখন, কে আর কি বলবে, আপনি আসুন।

মুখ দেখে মনে হল, তার সঙ্গে সম্মানের আসনে গিয়ে না বসলেই বরং লোকটা বিপদে পড়বে। আলো নিভতে শুরু করেছে। শশব্যস্ত তৎপরতায় অনেকের অসন্তোষ উপেক্ষা করে একেবারে সামনের সারির দুই রো-র ফাঁকে চেয়ার পেতে বসিয়ে দিল আমাকে।

ড্রপ সীন ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় নাটক আবার জমে উঠল। আখ্যানের নায়ক নায়িকা এক অমোঘ পরিণতির দিকে বেগে ছুটেছে। নায়িকার বুকের তলায় এবার এক আপোসশূন্য নিষ্পত্তির আগুন জ্বলে উঠেছে। ফলে দর্শকের চোখে আরো দৃপ্ত, আরো মহীয়সী হয়ে উঠেছে সে।

কিন্তু আমার ভিতরের সুরটা কেটে গেছে। দুই অঙ্কের সেই জমাট বাঁধা মানসিকতা থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। স্টেজের গা-ঘেঁষা চেয়ারে বসে আমিই শুধু উসখুস করছি।

ঠিক সেই মুহূর্তটাই আমি বেছে নিলাম। যে মুহূর্তে নায়িকা তার চরম ঘোষণাটি জ্বলন্ত আগুনের মতো ভ্রষ্ট নায়কের মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে স্টেজের একেবারে সামনে দর্শকদের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। তার পিছনে ভ্রষ্ট নায়কের স্তব্ধ ভয়াল মূর্তি, পাদপ্রদীপের সামনে পাষাণ-স্ফুলিঙ্গ রমণীর মূর্তি, তার সামনে দুরুদুরু বক্ষ মন্ত্রমুগ্ধ দর্শক। ঠিক ওই মুহূর্তটি বেছে নিয়েই আস্তে আস্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম আমি। আশপাশ থেকে আর পিছন থেকে বিরক্তিসূচক চাপা শব্দ উঠল একটা। এ-ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে যা আশা করেছিলাম তাই অবধারিতভাবে ঘটল। পার্ট ভুলে, স্থান-কাল

ভুলে ওই অনন্যা নায়িকা বিমূঢ় কয়েক মুহূর্ত। সম্ভব হলে সেও আমাকে বাধা দিত, বসতে বলতো।

কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে নির্লিপ্ত মুখে আবছা অন্ধকার পেরিয়ে আমি দরজার দিকে এগোলাম।

পরদিনের কাগজে 'চক্র' নাটকের প্রথম দিনের প্রথম অভিনয় প্রসঙ্গে সাড়ম্বর প্রশংসা ছাপা হল। প্রশংসা অভিনেত্রী বিপাশা দেবীরই বেশি। কিন্তু তার মধ্যে দুটো কাগজ অন্তত লিখেছে, দ্বিতীয় অঙ্কের গোড়ার দিকে নাটকের সঙ্কটমুহূর্তে স্বনামধন্যা শিল্পীর অভিনয়ে স্বল্পক্ষণের জন্য অন্তত কিছু ত্রুটি দেখা গেছল। তখন দুই-একবার তাঁর পার্টও ভুল হয়েছিল, যা কখনো হয় না। অবশ্য পরের অভিনয়ে সেই ত্রুটিটুকু তিনি পুষিয়ে দিতে পেরেছেন।

* * * *

আমি কি জাতিস্মর? চোখ বুজে তন্ময় হলে পূর্বজন্মের দৃশ্য দেখতে পাই?

চোখ বুজে তন্ময় হওয়ার ধাতটা আমার ন'বছর বয়েস থেকেই। কত সময় মালতী মাসি ঠেলা মেরে সেই তন্ময়তা ভঙ্গ করেছে। মনে মনে মালতী মাসির ওপর রেগে আগুন হয়ে গেছি। অথচ মুখে কিছু বলতে পারি নি। সেইজন্যই রাগ হলে আমার কষ্ট আরো বেশি হত। আমার ধারণা নিছক একটা রাগারাগির ফলে একজনকে হারিয়েছি। সেটা বাবা আর মায়ের রাগারাগি। সেই থেকে জিনিসটাকে আমি বিলক্ষণ ভয় করি। বাবা যখন মালতী মাসিকে রাগের সুরে কিছু বলে তখনো ভিতরে ভিতরে আমার কেমন কাঁপুনি ধরে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মালতী মাসির পিছনে তখন ঘুর ঘুর করি। স্কুলে বসেও সেদিন মালতী মাসির জন্য ভিতরটা উদ্বেগে অস্থির হয়ে পড়ে কেমন। কেবলই মনে হয়, বাড়ি ফিরে যদি দেখি, মালতী মাসিও আর নেই?

বিমনা হওয়ার দরুন মাষ্টারমশাইদের বকুনি খাই। বাড়ি ফিরে মালতী মাসিকে না দেখা পর্যন্ত সেই অস্থিরতায় বুকটা সর্বক্ষণ ধুকপুক করতে থাকে।

অথচ আশ্চর্য, রাগকে ভয় করি, রাগকে ঘৃণা করি, কিন্তু কারণে অকারণে রাগ বোধহয় আমারই সব থেকে বেশি হয়, বাবার ওপর রাগ। হঠাৎ একদিন রাত থেকে আর তারপর দিনের পর দিন ধরে যাকে আর বাড়িতে দেখলাম না তার ওপর রাগ, মালতী মাসির ওপর রাগ, নিজের ওপর রাগ, এক এক সময় দুনিয়ার সকলের ওপর আর সকল কিছুর ওপর রাগ। দিনের পর দিন ওই রাগের প্রকোপ আমার মধ্যে বেড়েই চলেছে, প্রকাশ না করে সেটা হজম করে ফেলতে চেষ্টা করার দরুন কষ্টটাও বেড়েই চলেছে। সেও আমার নিজস্ব একেবারে একলার কষ্ট, কেউ টের পায় না।

আমার অনেক কিছু জ্ঞান আর ধারণার গুরু মালতী মাসি। আমি তাকে সবজান্তা ভাবতাম। পূর্বজন্ম ইহকাল পরকালের সমাচার তার কাছ থেকেই জেনেছি। আমার মনের তলায় কত সময় কত রকমের উদ্ভট প্রশ্ন জাগত ঠিক নেই। শিশুকাল থেকে শহরের এক অভিজাত এলাকায় বাস আমাদের। ছবির মতো সুন্দর সাজানো গোছানো বাড়ি। আশপাশে যারা থাকে তারাও রীতিমতো সভ্যভব্য। এর মধ্যে কয়েক ঘর মাত্র বাঙালি, বেশির ভাগ বাসিন্দারা নানা রাজ্যের পয়সাঅলা মানুষ। তাই ঠিক বাড়ি বসে

সর্বসাধারণের বাস্তবরূপ বা বাস্তব জীবন-যাপনেব চিত্র খুব বেশি দেখতে পেতাম না। মাঝে সাজে বেডাতে বেবিয়ে বা স্কুলে যাওয়া আসাব সময যেটুকু দেখতাম, তাই এক এক ধবনেব কৌতূহলের উদ্রেক করত।

মনে আছে, মায়েব সঙ্গে এক বিকেলে গাডি কবে যাচ্ছিলাম কোথায়। পুলিশ হাত দেখানোর দরুন গাড়িটা থেমে গেছে। সামনে পব পর অনেকগুলো গাডি। চেযে দেখি ফুটপাথের ওপর শুয়ে আছে কতকগুলো নোংরা ছেলে মেযে আব বউ। আমাব মতো বয়সেব হদ্দ কুচ্ছিত ছেলেও আছে দুটো। আব কযেকটা মানুষ খালি গা, পবনে নোংরা খাটো ধুতি, গাডিগুলোব সামনে হাত বাডিযে ভিক্ষে চাইছে।

আমাদের গাড়ির সামনেব বুডো মতো লোকটা মাযেব সামনে হাত পেতে করুণ সুবে পয়সা চাইতে লাগল, আব কত কি বলতে লাগল।

মা-গো, এই ছেলেমেযেগুলোব দিকে চেয়ে দেখুন, সমস্ত দিন কিছু খায নি মা, চাব আনা পযসা ওদেব মুখ চেযে দিযে যান মা, খিদেব জ্বালায মরে যাচ্ছি মা-গো, মা মা-গো মা মা—

গাড়িটা চলতে শুরু করাব পবেও লোকটা মা মা কবে খানিক এসে তাবপব থেমে গেল।

আমি অবাক বিস্মযে একবাব ওই লোকটাকে দেখছিলাম আব একবাব মা-কে দেখছিলাম। গম্ভীর বিবক্তিতে মা অন্যদিকে মুখ ফিরিযে বসেছিল।

আমাব ঠিক ছ'বছব বয়েস তখন। এরমধ্যে কত সময় মাকে কত কি দিতে দেখেছি লোককে, অথচ এত কাকুতি মিনতি শুনেও মা অমন নির্বাক থাকল কি কবে, আমাব কাছে সেটাই বিস্ময।

আমি জিজ্ঞাসা কবলাম, মা ওই লোকটা পয়সা চাইছিল কেন?

মা ছোট জবাব দিল, ভিক্ষে কবছিল।

ভিক্ষে করছিল কেন?

খেতে পায না বলে।

খেতে পায না কেন?

খাবার কেনাব পযসা নেই বলে।

তোমাব কাছে তো পযসা আছে, অত কবে চাইল, তুমি দিলে না কেন?

মা এবাবে বিরক্ত হয়ে ধমকে উঠল, চুপ কবে বসে থাকো।

খানিক বাদেই আবার আব এক কাণ্ড দেখলাম। তখনো ভিডে আমাদের গাডিটা দাঁডিয়ে গেছে। পাশের ফুটপাথ ঘেঁষে কতকগুলো লোক আব একটা লোককে খাটে শুইয়ে বিকট স্বরে বলো হবি, হবি বোল— বলো-ও হরি, হরি বোল বলে চিৎকার কবতে করতে চলেছে। মা-ও একবার তাকালো সেদিকে, তাবপব অন্যদিকে মুখ ফিবিযে নিল।

আমি শুনেছিলাম, কেউ মবে গেলে তাকে ওভাবে খাটে শুইয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। কোথায় নিয়ে যাওযা হয়, নিয়ে গিযে কি করা হয, জানি না।

জিজ্ঞাসা করলাম, মা খাটের ওই লোকটা মরে গেছে?

হুঁ।

লোকটা মরে কোথায় যাচ্ছে?

হরি ঠাকুরের কাছে।

ওই লোকগুলো ওভাবে চেঁচাচ্ছে কেন?

হবিনাম শোনাচ্ছে।

হরিনাম এবকম বিচ্ছিবি কেন?

মাযের আবাব ধমক, চুপ কবে থাকো।

কিন্তু বেশিক্ষণ চুপ কবে থাকা গেল না। আবার জিজ্ঞাসা করলাম, যে মরে গেছে, ওই লোকেবা তাকে হবি ঠাকুরেব কাছে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে?

হুঁ।

হবি ঠাকুর কোথায় থাকে?

স্বর্গে।

এবোপ্লেনে কবে নিযে যাবে?

চুপ করবি তুই, না কি? কেবল বকব-বকর, বকব-বকর—

দু'কথাব পব তিন কথাতেই মা অমনি কবে ধমকে থামিযে দিত আমাকে। কিন্তু মালতী মাসি ঠিক উল্টো তাব। প্রশ্নেব জবাব দিযে দিযে আমার হাজাবো বকমেব কৌতূহল মেটানোব ব্যাপাবে তাব ক্লান্তি নেই, বিরক্তি নেই। বাবাব সঙ্গে বাগারাগি কবে মা ছেড়ে চলে যাবাব পব থেকে মালতী মাসি প্রাযই আমাব ঘবে শোয। বাবা টের পেলে রেগে যাবে সেই ভয়ে নিজের চৌকিটা এ-ঘরে নিযে আসে না, আমি ঘুমিয়ে পড়লে মেঝেতে শোয। এক একদিন আবার নিজের ঘরে চলে যায। মোট কথা ঘুমিযে পড়াব আগে আমি তাকে কোনদিন ছাড়ি না। রাতেব খাওযা-দাওয়া সেবে মালতী মাসিব বুক ঘেঁষে শুয়ে গল্প শোনাটা আমাব একটা নেশাব মতো হযে উঠেছিল। এব ব্যতিক্রম হলে কিছুতে ঘুম আসত না, অনেক বাত পর্যন্ত ছটফট কবতাম।

মানুষ মরে গেলে স্বর্গে হবি ঠাকুরেব কাছে কি কবে যায, সেই কৌতূহল মালতী মাসিই মেটাতে চেষ্টা কবেছে। শরীরেব মধ্যে নাকি আত্মা থাকে, সে যায হবি ঠাকুবেব কাছে।

মডা নিয়ে যাবার দৃশ্য আমি তাব মধ্যে আগে দুই একটা দেখেছি। হরি বোল কবতে কবতে শবীবটাকে ওই লোকগুলো তাহলে কোথায় নিযে যায?

কেন শ্মশানে, শ্মশানে নিযে গিযে পুড়িযে ফেলে।

আমি আঁতকে উঠি। পুড়িয়ে ফেলে, মানে আগুনে পুড়িয়ে ফেলে? লাগে না?

মাসি হাসে। দূব পাগলা, প্রাণ না থাকলে আবাব লাগবে কি।

কিছুই বোধগম্য হয না, অস্বস্তি বাড়তে থাকে। মবে গেলে সব্বাইকে পুড়িযে ফেলা হয়?

পুড়িযে না ফেললে শবীবটা পচে গলে নষ্ট হযে যাবে না।

এই চিন্তাটাই মাথার মধ্যে অনেক দিন পর্যন্ত ঘুরপাক খেয়েছে আমার। মৃতদেহেব এই শেষ গতি মনঃপূত হয়নি একটুও। পবিচিত মুখগুলো চোখের সামনে ভেসে ওঠে, বিশেষ করে রাতে বিছানায় গা ঠেকালে। মায়ের মুখ, বাবাব মুখ, মালতী মাসিব মুখ, স্কুলেব ছেলেদেব আব মাষ্টারদেব মুখ, নিজেব মুখও। সকলের জ্বলন্ত দেহ আমি

কল্পনায় দেখে আঁতকে উঠেছি, নিজেবটা আব মায়েবটা সব থেকে বেশি দেখেছি। দৃশ্যটা ঠেলে সবাতে চাই অথচ সবে না।

এই মালতী মাসিব কল্যাণেই ক্রমশ পূর্বজন্ম ইহকাল পবকাল সম্পর্কে আমাব বেশ জ্ঞান লাভ হযেছে। এই তিনকালেব যাবতীয় কিছু যেন চোখেব সামনে তাব। যেমন আমবা সব এক ধাব থেকে জন্মে জন্মে যাচ্ছি। এ পর্যন্ত যে কত ঘবে কতবার জন্মেছি তার ঠিক ঠিকানা নেই। পূর্বজন্মেব বৃত্তান্ত শুনতে মজাই লাগত। চোখেব সামনে যত লোক দেখছি তাদেব মধ্যে কত জনে কোন জন্মের বাবা ছিল বা মা ছিল বা ভাই ছিল বা বোন ছিল তাব ঠিক আছে। অথচ এমনই মজা যে কেউ কাউকে চিনতেও পাবছি না।

হঠাৎ বুকেব তলায় মোচডও পডেছিল একটা। সেই যে বাস্তাব ভিখিবিগুলো খাবাব জন্য পযসা চেযেছিল আব মা তাদেব দিক থেকে মুখ ফিবিযে ছিল, এমন যদি হয ওদেব মধ্যে কেউ একজন পূর্বজন্মে আমাব মতই মাযেব ছেলে ছিল, তাহলে? সঙ্গে সঙ্গে ভিতব থেকে কে যেন চিন্তাটাকে পূর্বজন্ম থেকে এই জন্মেই ঠেলে নিযে এলো। আমি যদি না খেযে অমনি যন্ত্রণা পেতে থাকি, মা কি কবে?... আ-হা এমন যদি হয, আমি না খেযে আছি আব মা সেটা জানতে পাবছে। আশ্চর্য মাযেব সেই ছটফটানি কল্পনায দেখে আমাব এমন আনন্দ হযেছিল কেন।

এ-জন্ম সম্পর্কে মালতী মাসিব বক্তব্য, ভালো হযে থাকতে হয, ভালো চিন্তা কবতে হয আব সর্বদা লোকেব উপকাব কবতে হয—তাহলেই পবেব জন্মে আব সুখেব অন্ত থাকবে না। শযতান লোকেবা মবে গিযে ভূত হয, তাবপব ভগবানেব কাছে সাঙ্ঘাতিক সব শাস্তি পায। কাউকে আগুনে পোড়ানো হয, কাউকে ফুটন্ত তেলে ভাজা হয়, কাউকে মলেব মধ্যে ডুবিযে বাখা হয আব কাউকে বা কবাত দিযে কাটা হয। শাস্তিব শেষে আবাব তাঁবা ইঁদুব বেড়াল শেযাল কুকুব হযে জন্মায।

এ-জন্মেব সঙ্গে পবেব জন্মেব যোগ। তাই এ-জন্ম নিযেও আমাব দুর্ভাবনাব অন্ত ছিল না। নিজেব কোনো কাজেব মধ্যে তেমন ভালো কিছু চোখে পডত না, আব কিছু একটা অন্যায কবে বসলে তাবপব পবেব জন্মেব শাস্তিব কথা মনে হলে দস্তুব মতো ভাবনা ধরে যেত। কুকর্মেব কথা মাসিকে চুপিচুপি বলে জিজ্ঞাসা কবতাম, পবেব জন্মেব আগে খুব শাস্তি পাব, তাই না। মাসি সর্বজ্ঞেব মতই অম্লান বদনে অভয দিত তখন। বলত, দোষ কবে স্বীকাব কবলে আব পাপ থাকে না।

ফলে অন্যায কিছু কবলে (আমাব মতে হামেশাই কবতাম) কোনো এক ফাঁকে মালতী মাসিব কাছে অন্তত সেটা স্বীকাব কবতাম।

যাক, এই শিক্ষাগুণেই মাঝে মাঝে আমাব মনে হত পূর্বজন্মেব এক একটা দৃশ্য যেন আমি হঠাৎ দেখতে পাই। তন্ময হয়ে দেখি-ও। দেখি, ছোট্ট তিন বছবেব একটা ছেলেকে সামনে বসিয়ে মা আদর কবে তার চুল আঁচড়ে দিচ্ছে, সাজিযে দিচ্ছে, তাবপর আদব কবে চুমু খাচ্ছে, দুষ্টুমি কবলে বকছে আবাব আদব কবে বুকে টেনেও নিচ্ছে তক্ষুনি। আদবে আদরে সেই ছোট্ট ছেলেটা যেন ভরাট হযে আছে। এবকম কত কি স্বপ্ন দেখি।

মাসি শুনে হেসে বাঁচে না। বলে, পূর্বজন্ম কি রে, এ-সব তো এ-জন্মেরই কথা তোর! কি ভালই না বাসত তোকে, শুটিং-এর পর বাড়ি ফিরে মা তোর পাঁচ মিনিটও তোকে ছেড়ে থাকতে চাইতো না। সন্ধ্যা আর রাত্তিরেও তো হামেশা লোকজন আসত দেখা করতে, তাই তোকে নিয়ে বাড়ি থেকে পালিয়েই যেত এক একদিন—বাবু মাঝে মাঝে সে-জন্য কম রাগ করত।

আমি লালায়িত হয়ে শুনতাম। বাবা কেন রাগ করত বুঝতাম না কিন্তু বাবার রাগের কথা শোনামাত্র তার ওপর কেমন একটা নির্মম প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে করত। মায়ের আদরে আদরে আমার সেই ভরাট চিত্রটা এ-জন্মেরই ব্যাপার, এ যেন সহজে বিশ্বাস হত না। আবার অবিশ্বাসই বা করি কি করে। সেই মিষ্টি মিষ্টি মায়ের মুখখানা তো অবিকল এই জন্মের মায়ের মুখের মতই।

ন'দশ বছরের সেই ছোট ছেলেটার বুকের তলায় সে-কি যন্ত্রণা। দু'বছর আগে মা এ-বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। পূর্বজন্মের ভেবে যে চিত্রটা দেখতাম সেটা কত আর আগের? এত ভালোবাসত যে মা, সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল কেন? যেতে পারল কি করে?

কেন গেল, যেতে পারল কি করে, আমি জানি। মালতী মাসি মায়ের থেকেও কম করে তিন বছরের বড়। মনে হয় তার বুকের তলায়ও অনেক ক্ষোভ অনেক যন্ত্রণা অনেক বাসনা পুঞ্জীভূত ছিল। মা চলে যাবার পরেই তাকে আমি কাছে পেয়েছি, এত কাছে বোধহয় জীবনে আর কাউকে পাই নি। আমার তেরো বছর বয়সের সময়ও সে আমাকে হঠাৎ-হঠাৎ এক-একদিন বুকে টেনে নিয়ে এমন আদর করা শুরু করত যে আমার ভয়ানক লজ্জা করত। তেরো বছর বয়সে ওই মালতী মাসিকে আমার জীবন থেকে বিদায় নিয়ে সরে যেতে হয়েছে। তার আগে পর্যন্ত মালতী মাসির সব থেকে কাছের জীবিত প্রাণী আমি। বুঝি না বুঝি, ফাঁক পেলেই অনর্গল গল্প করত আমার সঙ্গে। বেশির ভাগই নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলত, মায়ের আর বাবার গল্প করত। পরে, অনেক পরে মনে হয়েছে, ওই রকম গল্প করে করে মাসি তার নিজের ক্ষোভ আর যন্ত্রণা হাল্কা করত। আর মনে হয়েছে, ধাপে ধাপে মা কি করে অত বড় আর্টিস্ট হয়ে উঠল, সেই গল্প যে করত তাও মাসির নিজের অপূর্ণ বাসনার একটা বিপরীত দিক, নইলে ওই বয়সের ছেলের কাছে মায়ের বড় হবার চিত্রটা অমন প্রত্যক্ষ গোচর করে তোলার কথা নয়। অনেক কিছুই বুঝতাম না তখন কিন্তু আমার শোনার আগ্রহ থেকে মাসির বলার আগ্রহ কিছুমাত্র কম মনে হয় নি।

তখন না বুঝলেও পরে বুঝেছি। পরে বলতে খুব পরে নয়। পনের বছর বয়সেই আমার ভাবনা চিন্তাগুলো অন্য ছেলেদের তুলনায় অনেক পরিণত আকার নিয়েছে। সেটা সম্ভব হয়েছে সাত বছর বয়সে আমার সত্তার ওপর যে ক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছিল, তারই যন্ত্রণার ফলে।

এদিকের ঘরে মা আর আমি শুই। ওদিকের বড় ঘরটায় বাবা থাকে। আমাদের ঘর থেকে বাবার ঘরে যেতে হলে বারান্দা দিয়ে ঘুরে যেতে হয়, কারণ মাঝের দরজাটা বরাবর বন্ধ থাকে। দিনের বেলায় কখনো-সখনো খোলা হয়, তাও বাবা বাড়ি না থাকলে।

ধু-ধু মনে পড়ে, কবে যেন সকলেই আমরা বাবার ওই বড় ঘরে শুতাম। বোধহয় বছর তিনেক আগে পর্যন্ত। মস্ত বড় খাটের একদিকে বাবা শুতো, মাঝে মা আর মায়ের পাশে আমি। আর মনে পড়ে মায়ের সঙ্গে বাবার প্রায়ই কি নিয়ে যেন ঝগড়াঝাঁটি কথা কাটাকাটি হত। মা কোনদিনই বেশি কথা বলা বা চেঁচামেচি করার লোক নয়। ঝগড়াঝাঁটি বাবার সঙ্গে মায়ের ওই এক রাতের আগেও প্রায়ই হয়েছে। আমি কখনো সভয়ে, কখনো বা সকৌতুকে লক্ষ্য করেছি, বাবা একধার থেকে বকাবকি রাগারাগি করে চলেছে, মা বেশির ভাগ সময় চুপ—আর তারপর এমন একটা দুটো কথা বলল যে বাবার রাগ মুহূর্তের মধ্যে একেবারে মাথায় উঠে গেল। তখন ডবল গর্জন বাবার। বাবার সেই তর্জন গর্জন দেখলে বা শুনলে ভেতরে ভেতরে ভয়ে কাঁপতুম আমি। মনে হত, বাবা বুঝি এই মেরেই বসল মা-কে। কিন্তু অবাক লাগত মায়ের মুখের দিকে তাকালে। তার চোখে মুখে ভয়-ডরের লেশমাত্র নেই। বাবার রাগারাগি চেঁচামিচির জবাবে বেশির ভাগ সময় খুব ঠাণ্ডা চোখে তার দিকে শুধু তাকাতো এক-একবার। অবশ্য সামনে থেকে দেখতাম না, আড়াল থেকে দেখতাম। কারণ ওই ঝগড়ার সময় আমি কাছে থাকলে মা আমাকে ধমকে তাড়াতো। যাই হোক মায়ের মুখ দেখে এটুকু বেশ স্পষ্ট বুঝতাম বাবার এত রাগারাগি তর্জন গর্জনের মা একটুও পরোয়া করে না। মা এত জোর পায় কোথা থেকে ভেবে অবাক লাগত আমার।

ঠিক কবে থেকে আর কি উপলক্ষে আমি আর মা এই আলাদা ঘরে শুচ্ছি এখন আর একটুও মনে নেই। বাবার সঙ্গে বাবার ঘরে শুতে হয় না, এটা যেন একটা পরম শান্তির ব্যাপার আমার কাছে। মনে মনে ধারণা, বাবা কি সব বিচ্ছিরি জিনিস খায় আর মুখ দিয়ে গা দিয়ে বিচ্ছিরি গন্ধ বেরোয়, আর বাবা তখন যা মুখে আসে তাই বলে গালাগালিও করে, এই সব কারণেই মা আমাকে নিয়ে এই ঘরে সরে এসেছে। আর ওই জন্যেই দু'ঘরের মাঝের দরজাটা ওইরকম বন্ধ থাকে।

ঘুমুবার সময় মা-কে বিশেষ কাছে না পেলেও মাঝরাত্তিরে অনেক দিনই ঘুম ভেঙে যেত আমার। তখন আবছা অন্ধকারে মা-কে পাশে দেখতাম। এক একদিন উঠে বসে দু'চোখ রগড়ে সামনে ঝুঁকে মায়ের মুখখানা দেখতাম। নয়তো ঘুম জড়ানো চোখে সন্তর্পণে মাকে জড়িয়ে ধরে আবার ঘুমিয়ে পড়তাম। কিন্তু ওই করতে গিয়ে মায়ের ঘুম এক-একদিন ভেঙেও যেত। তখন পাশ ফিরে আমার দিকে শুতো, আলতো করে একখানা হাত আমার গায়ের ওপর ফেলে রাখত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার কেমন মনে হত, মা-ও যেন একটু একটু বদলাচ্ছে। মনে হত, কবে যেন মা বেশ জোরেই আমাকে বুকে চেপে শুয়ে থাকত। সে-রকম আর হয় না।

একদিনের কথা মনে আছে। ওই রকম ঘুম ভাঙতে উঠে বসে দেখে নিলাম, মা পাশে ঘুমুচ্ছে। সেদিন আমার একটু বাড়তি উদ্বেগের কারণ ছিল। সন্ধ্যার পরেই বাবা আর মা-তে তুমুল এক পশলা ঝগড়া হয়ে গেছে। সেদিন শুধু থমথমে মুখ নয়, মায়ের চোখ দুটোও যেন নিঃশব্দে জ্বলতে দেখেছি দরজার আড়াল থেকে। আর বাবাকে চিৎকার করে বলতে শুনেছি, ওই রকম করে চেয়ে থাকলে যাদের টনক

নড়ে তাদের কাছে যাও—আমার ওপর ওই কায়দা ফলাতে এলে চোখ দুটো কোনদিন আমি উপড়ে ফেলে দেব, জেনে রেখো। চোখের খেলা দেখাতে এসেছে আমাকে—

তারপর থেকে মাকে অনেকবার লক্ষ্য করেছি। ওই কঠিন মুখের দিকে তাকাতে আমারও কেমন ভয়-ভয় করেছে। খানিক বাদে মায়ের কাছে কাকা আসতে আমিও যেন একটু স্বস্তি বোধ করেছি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মা মুখের ওপর আলতো করে একটু পাউডার পাফ বুলিয়ে আর নিজের আপাদমস্তক একবার দেখে নিয়ে নীচে নেমে গেল। আমার আশা, বাইরের লোকের সঙ্গে একটু গল্প-সল্প করে মায়ের মেজাজ হয়তো ভালো হবে একটু।

তারপর ওই বেশি রাতে ঘুম ভাঙার আগে মায়ের সঙ্গে আর দেখা হয় নি। আলো না জ্বেলে বাথরুম থেকে ঘুরে এসে কোনরকম শব্দ না করেই বিছানায় উঠলাম আবার। তারপর উপুড় হয়ে মায়ের দিকে ঝুঁকলাম, রোজকার মতই ঠাণ্ডা ঘুমন্ত মুখ কিনা দেখব।

আবছা অন্ধকারে একটু চোখ বসতেই ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। মা ঘুমোয় নি, আমার দিকে চেয়ে আছে চুপচাপ।—কি দেখছিস?

লজ্জা পেয়ে আমি মায়ের বুকে মুখ গুঁজলাম। কেন যেন আশা হয়েছিল এভাবে ধরা পড়ার ফলে আমাকে একটু আদর করবে, নিবিড় করবে। কিন্তু মা তা করল না। আবার জিজ্ঞাসা করল, কি দেখছিলি?

তোমাকে। তুমি আজকাল আর আমাকে আগের মতো ভালবাসো না।

শিথিল দেহ ছড়িয়ে মা শুয়ে আছে। তার একটা হাতও আমার পিঠের ওপর উঠে এলো না। বলল, রাত দুপুরে এখন আর ভালবাসতে হবে না, ঘুমো—

তার বুকের কাছ থেকে মুখ তুলে সোজা হয়ে বসলাম একটু।—বাবার সঙ্গে তোমার এত ঝগড়া হয় কেন? বড় হলে বাবাকে আমি কেটে কুচিকুচি করে ফেলব।

অস্ফুট কঠিন সুরে মা ধমকে উঠল, তুই ঘুমুবি এখন?

সরে এলাম। মাকে কষ্ট দেয় আর গালাগালি করে বলে বাবার ওপরে অফুরন্ত রাগ ঘৃণা বিদ্বেষ। মন্ত্রগুণে শক্তি অর্জন করে মনে মনে বাবাকে যে কতদিন কতরকমের শাস্তি দিয়েছি, ঠিক নেই। কিন্তু কে জানে কেন, এই মুহূর্তে মায়ের ওপরেও আমার অভিমান কম নয়।

তারপর সেই একটা রাত। যে রাতে সাত বছরের একটা শিশু বিছানায় শুয়ে ভয়ে কাঁপছিল ঠক ঠক করে। তার ছোট বুকটা যেন ভেঙে দুমড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছিল আর তার সত্তার ওপর গভীর একটা ক্ষত সৃষ্টি হয়েছিল।

রাত কত হবে তখন জানি না। মালতী মাসি কখন আমাকে ঘুম পাড়িয়ে উঠে গেছে টের পাই নি। আমি মায়ের কাছেই শুই বটে কিন্তু ঘুমুবার সময় মা-কে আরো কম পাই আজকাল। এক-একদিন বেশি রাত করে বাড়ি ফেরে, নয়তো লোকজন বাড়িতে আসে। এ-দিকে ঠিক ন'টা বাজলেই মালতী মাসি আমাকে চেপেচুপে ঘুম পাড়াবেই।

ঘুমুবাব আগে আজ গায়ে কাঁটা দেওয়া একটা দৈত্যেব গল্প ফেঁদেছিল মালতী মাসি। এক রাজার মেয়েকে সাঁ সাঁ কবে বাতাস সাঁতরে নিজেব পুরীতে নিয়ে এসেছিল।

হঠাৎ একটা বিকট গর্জন কানে আসতে ভযানক চমকে উঠলাম আমি। নিঃসংশয দৈত্যটা এসেছে বাজাব মেয়েকে ধবে নিযে যেতে। কিন্তু অবাক লাগছে, আমি তো বিছানায় শুয়ে, ঘরে আলো জ্বলছে।

কি বললে? কি বললে তুমি?

আবার সেই গর্জন। ঘুমের শেষ বেগটুকুও কেটে গেল। মশাবিব ভিতব থেকে দু'চোখ টান কবে আমি সভযে দেখলাম দৈত্য নয়, বাবা, তাব হাতে বোতল একটা, বাগে বীভৎস দেখাচ্ছে বাবার সমস্ত মুখ। আব উল্টো দিকেব কোণেব আলমাবিটাব কাছে মা দাঁড়িয়ে, তাবও দু'চোখ যেন ধক ধক করে জ্বলছে।

বাবাব গর্জনেব জবাবে খুব চাপা অথচ অদ্ভুত কঠিন গলায মা বলল, চেচিও না, ছেলে ঘুমুচ্ছে। তুমি শযতান, তুমি পিশাচ।

সঙ্গে সঙ্গে হাতেব বোতলটা বাবা প্রচণ্ড জোবে মায়ের পাযেব দিকে ছুঁড়ে মাবল। বোতল ভাঙাব সেই ঝনঝন শব্দে সমস্ত ঘবটাই বুঝি কেঁপে উঠল। তাব ক'টা টুকবো মাযেব গায়ে পায়ে গিযে লাগল কিনা জানি না।

গল্পে শোনা সেই দৈত্যেব থেকেও ভযঙ্কব মুখ যেন বাবাব। গলা দিযে অস্ফুট আগুন ঝবাতে ঝবাতে মাযেব দিকে এগিযে আসতে লাগল। আমি শযতান... পিশাচ আব তুমি মস্ত সতী, কেমন?

মনে হল, বাঘেব মতো দুটো থাবা মাযেব দুই কাঁধে বসে গেল। তাবপবই দু' কাঁধ ধবে বিষম ঝাঁকুনি গোটা দুই তিন। মশাবিব ভিতব থেকে আমাব মনে হল, ওরকম ঝাঁকুনি দিযেই বাবা বুঝি মাকে মেবে ফেলবে। সম্ভব হলে আমি আর্তনাদ কবে উঠতাম। কিন্তু আমাব গলা দিয়ে শব্দ বেরুলো না।

ঝাঁকুনি খাবার পবেও মাযেব দু'চোখ জ্বলছে তেমনি। সেই জ্বলন্ত চোখ মশাবি ফুঁড়ে একবার আমাব দিকে ফিবল। সেই মুহূর্তে এক হ্যাচকা টানে মা দু'-তিন হাত সামনে সবে এলো, হাতটা বাবাব শক্ত হাতের মুঠোয ধরা না থাকলে মা ভাঙা কাচেব ওপবেই মুখ থুবড়ে পডত। টাল সামলাবাব আগেই খপ কবে মাযেব কোমবটা অন্য হাতে জডিযে ধবে চোখেব পলকে বাবা আসুবিক বলে দবজাব বাইবে টেনে নিযে গেল, মা এতটুকু বাধা দেবাবও ফুরসত পেল না। দু'জোড়া জুতোর চাপে ঘবে ছড়ানো কাচেব টুকবো মচমচ শব্দে গুঁডিয়ে গেল।

আমি বিছানায উঠে বসলাম। বুকের ওপব যেন ঠক ঠক করে হাতুড়ি পিটছে কেউ। ঘেমে গেছি। ভয়ে ত্রাসে গলা শুকিযে কাঠ। আমি কি করব এখন? বাবা কি মাকে মেবে ফেলার জন্য নিয়ে গেল? মেবে ফেলছে? মাযেব আর্তনাদ কানে আসে কিনা শোনাব জন্য দু' কান উৎকর্ণ আমার। মাঝের দরজাটা ববাবরকার মতই বন্ধ। বারান্দা দিযে যাবাব দরজাটা খোলা। ছুটে গিয়ে মাকে উদ্ধাব কবে আনতে চেষ্টা করব? মাবলে বাবা না হয় দু'জনকেই মাববে।

মশারি টেনে সরিয়ে মাটিতে নামলাম। কি করব আমি? একটা টুঁ শব্দও কানে আসছে না কেন? মা-কে তাহলে শেষ করেই দিল? চিৎকার করে মালতী মাসিকে ডাকব?

উঃ! বারান্দার দরজার দিকে এগিয়েছিলাম, বেশ বড় একটা কাচের আধখানাই পায়ে বিঁধে গেল বোধহয়। কোনরকমে বিছানায় এসে বসলাম আবার। পায়ের তলা রক্তাক্ত। কি করব ভেবে না পেয়ে আমি হতভম্বের মতো বসে রইলাম।

খানিক বাদেই আমার পায়ের যন্ত্রণা মনেও থাকল না। পা বেয়ে রক্ত বিছানার ধপধপে চাদরটায় লাগছে তাও খেয়াল নেই। এক-একবার মায়ের বন্ধ দরজার দিকে তাকাচ্ছি আর এক-একবার বারান্দার খোলা দরজার দিকে। সমস্ত বাড়িটা যেন এক নিঝুম পুরী হয়ে গেছে। দৈত্যের মতই মাকে বাবা ধরে নিয়ে গেছে, দৈত্য রাজকন্যাকে প্রাণে মারে নি, কিন্তু বাবা.. বাবা কি করবে? বাবাকে এই মুহূর্তে দৈত্যের থেকে ভয়ানক মনে হয়েছিল আমার।

কতক্ষণ ওই রকম ত্রাসে বোবার মতো বসেছিলাম জানি না। পনের মিনিটও হতে পারে, আধঘন্টাও হতে পারে। কিন্তু আমার কাছে এক যুগ যেন। হঠাৎ সামনের আয়নার দিকে চোখ পড়তে মনে হল পিছনের জানলার ওধারে আবছা অন্ধকারে কেউ এসে দাড়িয়েছে। তাড়াতাড়ি ঘুরে তাকালাম। মালতী মাসি। গলা দিয়ে একটা অস্ফুট স্বর ঠেকরে বেরুলো যেন।—মাসি শীগগির এসো।

মালতী মাসি বারান্দায় দরজার কাছে এসে দাড়িয়ে গেল। মেঝেময় কাচ ছড়ানো অবস্থাটা দেখল চেয়ে চেয়ে। বোতল ভাঙার শব্দ আগেই শুনেছিল নিশ্চয়। ইশারায় আসছে জানিয়ে চলে গেল। এক মিনিটের মধ্যেই বাবারের চপ্পল পায়ে গলিয়ে ফিরে এলো।

ইস, কি সর্বনাশ! করেছিস কী! তাড়াতাড়ি কাটা পা'টা নিজের হাটুর ওপর তুলে নিয়ে খুঁটিয়ে দেখল, কতটা জখম হয়েছে। রক্তাক্ত চাদরটার দিকেও তাকালো একবার।

আমি বলে উঠলাম, মাসি, বাবা মা-কে হিঁচড়ে টেনে ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেল, এতক্ষণে মেরেই ফেলল বোধহয়, তুমি শীগগির গিয়ে দেখো।

মাসি থমকে তাকালো আমার দিকে। আমার উদ্বেগ আর ত্রাস দুই-ই অনুভব করল বোধহয়। কিন্তু অবাক। এতবড় সংবাদ শুনেও মাসি নির্বিকার, মায়ের কাছে ছুটে যাবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। উল্টে আমার ভয় দেখে তার ঠোটের ফাকে একটু হাসির মতো দেখা গেল কিনা ঠিক বুঝলাম না।

বিছানায় রক্ত না লাগে এই ভাবে পা'টা নামিয়ে রেখে মাসি ঘরের দুরবস্থাটা আর এক প্রস্থ দেখে নিল।

তারপর চটপট বেরিয়ে গিয়ে একটা ঝাঁটা আর জলের বালতি হাতে ফিরে এলো তক্ষুনি। আগে ঘরটা ঝাঁট দিয়ে ভাঙা কাচগুলো সব এক কোণে জড় করতে লাগল।

তাই দেখে আমার রাগ হয়ে গেল, বলে উঠলাম, তুমি যাচ্ছ না কেন? মায়ের কি হাল দেখে আসছ না কেন?

দ্রুত ঘব ঝাঁট দিতে দিতে মাসি জবাব দিল, তোব মাযেব কিছু হয নি।

হযেছে, নিশ্চয হযেছে! তুমি দেখো নি বাবা কিভাবে মাকে টেনে নিযে গেল! মা এখনো আসছে না কেন? বাবা নিশ্চয মেবে ফেলেছেে

না বে না, আদব-টাদব কবছে বোধহয।

মাসিব মুখ দেখা যাচ্ছে না, শব্দ না কবে খুব তাডাতাডি ঘব ঝাঁট দেওযা শেষ কবছে। এত বড সঙ্কটেব মুখে এ-কথা শুনে আমি তাজ্জব। বাবা মা-কে আদব কবতে পাবে এমন অসম্ভব কথাও আব যেন শুনি নি।

ঘব ঝাঁট দেওযা শেষ কবে ভাঙা কাচেব স্তূপ এককোণে জমিযে বাখল। তাবপব তেমনি চটপট হাতে বালতিব ভিজে ন্যাকডা দিযে সমস্ত মেঝেটা মুছে ফেলল। নইলে কাচেব কুচি পডে থাকতে পাবে। শেষে জল-ন্যাতাব বালতি বাইবে বাব কবে দিযে তুলো আব ডেটলেব শিশি হাতে আমাব সামনে মোডা টেনে বসল।

শুশ্রূষা শুরু হবাব আগেই আমি চমকে ফিবে তাকালাম। মা নিঃশব্দে ঘবে এসে দাঁডিযেছে। সমস্ত মুখ বিবর্ণ কিন্তু থমথমে। শুকনো চুলেব কযেক গোছা একদিকেব গালেব সামনে চলে এসেছে।

খবখবে দু'চোখ ঘবেব মেঝেতে বুলিযে নিল একবাব। তাবপব মালতী মাসিব দিকে তাকালো। খসে পডা শাডিব আঁচলটা গাযে জডাতে জডাতে আমাব দিকে তাকালো। তাবপব আস্তে আস্তে সামনে এসে দাঁডাল।

মা-কে বাবা মেবে ফেলে নি। মস্ত নিশ্চিন্ত ব্যাপাব এটা আমাব কাছে। কিন্তু এই মুখ দেখেও আমাব কেমন ভয ভয কবছে। মনে হচ্ছে নিজেব ঘবে নিযে গিযে বাবা যেন মাবধব কবেছে মা-কে।

ঝুঁকে আমাব পাযেব ক্ষত দেখল। বক্তাক্ত চাদবটা দেখল। তাবপব আচমকা ঠাস কবে আমাব গালে চড বসিযে দিল একটা। এত জোবে যে আমি বিছানায উল্টে পডেই যাচ্ছিলাম। অস্ফুট কঠিন গলায বলল, মাটিতে নামতে গেছলি কেন?

আমি জবাব দিলাম না। মুহূর্তেব মধ্যে একটা অভিমান যেন শবীব বেযে উঠে চোখ বেযে নামতে চাইল। যে মাযেব জন্য এত দুর্ভাবনা এত ত্রাস আমাব, তাব কিনা এই ব্যবহাব। কিন্তু মাযেব দিকে চেযে আমি কি দেখলাম। মুখে আব গলাব কাছে কযেকটা দাগেব মতো, আব জামাব কাঁধটা ছেঁডা—কিন্তু আসলে আমাব চমক লেগেছে মাযেব চাউনি দেখে। সাত বছবেব শিশু সেই বাতেব চাউনি বিশ্লেষণ কবতে পাবে নি, কিন্তু পবে পেবেছে। আবো পবে ওই আচমকা চড মাবাব আসল হেতুও আমাব কাছে স্পষ্ট হযেছে। সেই বাতে মাযেব চোখে আমি দগদগে ঘৃণা দেখেছিলাম। আমি ওই বাডিব ছেলে তাই ঘৃণা—মাযেব চাউনি থেকে ঠিক ওই বকম ঘৃণা আমি বাবাব দিকে একাধিক দিন ঠিকবে পডতে দেখেছি।

ক্ষত জাযগা থেকে দু'দুটো বেঁধা কাচ মালতী মাসি টেনে তুলল। ভযানক যন্ত্রণা সত্ত্বেও আমি শক্ত হযে বসে বইলাম। ডেটল দিযে পবিষ্কাব কবাব পব পা দুটো বেশ কবে ব্যাণ্ডেজ কবে দেওযা হল। মা ততক্ষণ বিছানায অন্য দিকে মুখ ফিবিযে বসে বইল। হাতেব সবঞ্জাম বেখে এসে আব একটা ধপধপে পবিষ্কাব চাদব

নিয়ে মালতী মাসি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল খানিক। সাহস করে মাকে উঠতে বলতে পারছে না।

মা আস্তে আস্তে ঘুরে তাকালো তার দিকে। চেয়েই রইল খানিক। তারপর চুপচাপ উঠে দাঁড়াল।

মালতী মাসি রক্তমাখা চাদরটা তুলে ফেলে হাতের চাদরটা চোখের পলকে যেন টানটান করে পেতে দিয়ে ঘর থেকে চলে গেল। গুমরনো অভিমান সত্ত্বেও আমি অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, মালতী মাসি একবারও মায়ের দিকে সোজাসুজি তাকালো না।

অনেক রাত পর্যন্ত আমার ঘুম হয় নি। ঘরের আলো নেভানো। মা অনেকক্ষণ বাদে তার জায়গায় এসে শুয়েছে। আমি ছটফট করছিলাম, এ-পাশ ও-পাশ করছিলাম। তখনো যদি মা কাছে এসে দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে বুকে টেনে নিত আমার অভিমান জল হয়ে যেত। মনের রাগ তখন শুধু বাবার ওপরেই বর্ষাতো।

কিন্তু মা তা করল না। স্থাণুর মতো বিছানায় পড়ে থাকল। তার নিঃশ্বাসের শব্দও কানে এলো না।

পরদিন।

সকাল থেকেও মায়ের ওই রকমই থমথমে মুখ। অভিমানের থেকে আমার বুকের তলার অজানা ভয়টাই যেন বেশি এখন। মাস্টার এসে দেড় ঘণ্টা আটকে রাখল আমাকে। বার বার বিমনা হবার ফলে পড়া বলতে না পেরে বার কয়েক ধমক খেলাম তার কাছে। মাস্টার চলে যাবার পরের রুটিন চান খাওয়া তারপর স্কুল। খুব আশা করতে লাগলাম মা যদি বলে কাটা পা নিয়ে আজ আর স্কুল যেতে হবে না। কিন্তু মা তা বলল না।

গাড়ির হর্ণ বেজে উঠতে একটা জমাট বাঁধা রাগ নিয়ে ব্যাগটা কাঁধে ফেলে আমি মায়ের কাছে এসে দাঁড়ালাম। মা যেন শক্ত একখানা পাথরের মতো বিছানায় বসে।

দু'বছর হল আমার এই শাস্তি অর্থাৎ স্কুল শুরু হয়েছে। আর এই দু'বছর ধরেই গাড়িতে ওঠার আগে আমি মাকে আদর করি আর মা আমাকে আদর করে। একদিনও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

আমি মায়ের দিকে তাকালাম। মা-ও আমার দিকে চেয়ে আছে। কালকের মতো না হলেও এই চাউনিতেও যেন একটুও দরদ নেই। আমি গিয়ে আদর করলেও মা আমাকে ফিরে আদর করবে কিনা সন্দেহ।

রাগ আর অভিমান বুঝি একসঙ্গে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল আমার। এক ঝটকায় ঘুরে দাঁড়িয়ে দুপদাপ পা ফেলে আমি নীচে নেমে চলে এলাম। গাড়িতে এসে উঠে শব্দ করে দরজাটা বন্ধ করলাম। কিন্তু গোঁ সত্ত্বেও দোতলার বারান্দার দিকে একবার না তাকিয়ে পারা গেল না। গাড়ি চোখের আড়াল হবার আগে মা ওই বারান্দায় দাঁড়িয়ে হাত নাড়ে।

আজ আর ওখানে দাঁড়াবেও না ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু না, দাঁড়িয়েছে। আমার দিকে চেয়ে আছে।

আমি সরোষে ঘাড় ফিরিয়ে নিলাম।

স্কুল থেকে ফিরে মা-কে বাড়িতে দেখব না জানা কথাই। বলতে গেলে রোজই শুটিং থাকে। ছ'টা সাড়ে ছ'টা নাগাদ বাড়ি ফেরে। তবু গাড়ি থেকে নেমে সমস্ত বাড়িটা একবার ঘুরে দেখে নিলাম। চাকর-বাকর দুটো ঘুমুচ্ছে, মালতী মাসিও ঘুমুচ্ছে।

বিকেল পর্যন্ত একটা অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়ে দিয়ে মায়ের জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম। রাগ আর অভিমানের থেকেও ভিতরে ভিতরে আমার অজানা ভয়টাই যেন বেশি। কাল রাত থেকে যে-মুখ দেখেছি মায়ের অমন আর কখনো দেখি নি।

বিকেলে বাবা ফিরল। তখন পর্যন্তও তার গম্ভীর আর নির্দয় মুখ। খেলাধুলো ছেড়ে আমি ঘরে বসে আছি দেখে একবার সামনে এসেছিল। আমি ঘৃণায় তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি। গতকালের জন্য নয়, বাবাকে আমি কোনদিনই বিশেষ পছন্দ করি না।

তোর পায়ে কি হয়েছে?

কেটে গেছে।

কি করে কাটল?

কাল রাতে তুমি বোতল আছড়ে ভেঙ্গেছিলে, সেই কাচে।

বাবা ঘর ছেড়ে প্রস্থান করল। মুখের ওপর কিছু বলা গেল ভেবে আমি মনে মনে একটু খুশি হলাম।

বিকেল গেল, সন্ধ্যা পার হল, রাত বাড়তে থাকল—মায়ের দেখা নেই। সন্ধ্যার পরে আমার একবর্ণও পড়া হল না। অস্থির হয়ে আমি এ-ঘর ও-ঘর করতে লাগলাম। স্টুডিওতে ফোন করার জন্য তিন বার করে আমি মালতী মাসিকে তাগিদ দিতে সে বিরক্ত হয়ে বলল, তোর মা কি এখনো স্টুডিওতে বসে আছে নাকি।

যত সময় যাচ্ছে, আমার বুকের ভিতরে যেন একটা কাঁপুনি ধরছে। কেবলই মনে হচ্ছে মা যদি আর না-ই আসে? মায়ের যে রকম ভয়াবহ চোখ মুখ দেখেছি কাল রাত থেকে, সবই যেন সম্ভব। ওই সম্ভাবনার চিন্তাটাকে যতবার আমি নির্মূল করতে চাইলাম ভিতর থেকে ততো যেন ওটা বুকের ওপর চেপে বসছে। শেষে আর থাকতে না পেরে বাবার ঘরের দরজার কাছে এসে দাড়ালাম। বাবা অনেকক্ষণ পর্যন্ত লক্ষ্য করল না আমাকে, গেলাসে ওই বোতলের জিনিস ঢেলে খাচ্ছে আর সিগারেট টানছে।

মা এখনো বাড়ি ফেরে নি।

নিজের গলার স্বর কানে আসতে নিজেই যেন অপ্রস্তুত আমি। হঠাৎ যেন একটা ঝাঁঝ বেরিয়ে এলো গলা দিয়ে।

বাবা মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো। ঠিক যেন বুঝে উঠল না কি বলছি। —ভিতরে আয়।

কয়েক পা এগোতে একটা বিচ্ছিরি গন্ধ নাকে আসতে দাঁড়িয়ে গেলাম।

কি হয়েছে?

মা এখনো ফেরে নি।

বাবা আমার দিকে চেয়েই রইল, তার মুখটা যেন হিংস্র হয়ে উঠতে লাগল। —ফেরে নি তো আমি কি করব?

আমি বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম।

গেট আউট।

চলে এলাম। মনে হল, অবাধ্য হলে বাবা আমাকেও বোতল ছুঁড়ে মারতে পারে।

মালতী মাসি টিকটিক করতে থাকল বলেই খেয়ে নিলাম। নইলে মাকে আক্কেল দেবার জন্যেই খাবার ইচ্ছে ছিল না। এক সময় শুয়েও পড়লাম। মালতী মাসি আমাকে গল্প বলে ঘুম পাড়াতে এলো। রাগ করে আমি অন্য দিকে ফিরে শুয়ে রইলাম।

মালতী মাসি আর আমার কাছে ঘেষতে সাহস করল না। ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে চুপচাপ বসে রইল। আমার সমস্ত জমাট বাধা রাগ আর অসহিষ্ণুতা আর ভয় জল হয়ে চোখ বেয়ে গড়াতে লাগল। সেই জলে বালিশ ভিজছে। আমি মনে মনে কেবল বলছি, মা তুমি শীগ্‌গির চলে এসো, আমি তোমার খুব ভালো ছেলে হব, আর কক্ষনো তোমাকে বিরক্ত করব না, আর বড় হয়ে বাবাকে খুব শাস্তি দেব।

...রাত কত তখন জানি না। মনে হয় মাঝ রাত্রি হবে। হঠাৎ ঘুম ভাঙতে অন্ধকারে বিষম চমকে উঠলাম। মা আমাকে জড়িয়ে ধরে তার জায়গায় শুয়ে আছে। আমি চমকে উঠতে আরো নিবিড় করে জড়িয়ে ধরে থাকল আমাকে।

আমিও তাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরে অভিমানহীন স্বরে বলে উঠলাম, অত রাত পর্যন্ত তুমি কোথায় ছিলে, সমস্তক্ষণ আমি কষ্ট পেয়েছি জানো না।

মা আমাকে আরো কাছে টেনে নিয়ে গালে মুখে চুমু খেল। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো একটা ঝাঁকুনি খেলাম আমি।

স্নেহের ওই উষ্ণতাকে কেমন অপরিচিত মনে হল আমার। মায়ের গায়ের চেনা গন্ধও নাকে আসছে না।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ধড়মড় করে উঠে বসলাম আমি। ঘরটা আজ অন্য দিনের তুলনায় বেশি অন্ধকার। ওদিকের দুটো জানলাই বন্ধ বোধহয়। অন্ধকার ফুঁড়ে দেখতে চেষ্টা করলাম কে শুয়ে আছে। ঠিক বোঝা গেল না। চোখ থেকে ঘুম ছুটে গেছে, একটা তপ্ত আক্রোশ যেন মাথার দিকে ধাওয়া করেছে। মশারিটা হ্যাঁচকা টানের চোটে ছিঁড়েই গেল বোধ হয়, আমি ছিটকে বেরিয়ে এসে খট করে আলো জ্বাললাম।

মশারির ভিতর দিয়ে দেখি মায়ের জায়গায় মালতী মাসি কাঠ হয়ে শুয়ে আছে। আর সভয়ে আমার দিকেই চেয়ে আছে।

আমার ধারণা মালতী মাসি আমাকে তো ভালোবাসেই আমিও মালতী মাসিকে কম ভালোবাসি না। কিন্তু সেই রাতে সাত বছরের এক শিশুর মাথার মধ্যে কি যে আগুন জ্বলে উঠেছিল কেউ কল্পনা করতে পারবে না। দু'হাতে মশারিটা টেনে একেবারে ছিঁড়েই নিয়ে এলাম আমি।

তুমি এখানে কেন? কে তোমাকে মায়ের জায়গায় এসে শুতে বলেছে? বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও বলছি এ-ঘর থেকে।

মালতী মাসি শশব্যস্তে উঠে বসে দু'হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরতে চেষ্টা করল। —সুমু লক্ষ্মী বাবা, এত রাতে এ-ভাবে চিৎকার করতে নেই, আয় ঘুমুবি আয়।

না না, আমি ঘুমুব না, রাগে কাঁপতে কাঁপতে আরো ডবল চিৎকার করে উঠলাম আমি।—তুমি চলে যাও, তুমি আমার মায়ের জায়গায় কেন শুয়েছ? আমার মা কোথায়?

মালতী মাসি সভয়ে সামনের বন্ধ দরজার দিকে তাকালো একবার, তারপর খাট থেকে নেমে আমাকে ধরার জন্য এগিয়ে এসে বলল, লক্ষ্মী মাণিক, শুবি আয়, মা নিশ্চয় কোথাও শুটিং-এ গেছে, সকালেই ঠিক ফিরবে দেখিস—

আমি তিন পা পিছিয়ে গিয়ে তেমনি ক্ষিপ্ত রোষে চিৎকার করে উঠলাম, মিথ্যে কথা, তুমি মিথ্যেবাদী। মা কক্ষণো শুটিং-এ যায়নি, আমাকে না বলে মা কক্ষণো শুটিং-এ যায় না, তুমি চলে যাও এ-ঘর থেকে, আমার কাউকে দরকার নেই, কাউকে চাই না আমি।

বন্ধ দরজার ও-দিকে একটা শব্দ হতে দু'জনেই সেদিকে থমকে তাকালাম। দু'ঘরের মাঝের বন্ধ দরজা আস্তে আস্তে খুলে গেল। দরজাটা এদিক থেকে বন্ধ থাকে—কখন কে খুলে রেখেছে জানি না। ও-ঘরের অন্ধকার থেকে বাবা এ-ঘরে এসে দাঁড়াল। বোতলের ওই সব জিনিস খেলে বাবা খুব ঘুমোয় দেখেছি, কিন্তু আজ বাবার দু'চোখ লাল। আমার চিৎকারে ঘুম ভাঙা স্বাভাবিক, কিন্তু লাল চোখ দেখে মনে হল বাবাও অত রাত পর্যন্ত জেগেই আছে।

ঘরের মধ্যে কয়েক পা এগিয়ে এসে প্রথমে বিছানার ওপর ছেঁড়া-খোঁড়া মশারিটার দিকে তাকালো, তারপর আমার দিকে ফিরতে গিয়ে আগে মালতী মাসির দিকে চোখ গেল। বাবাকে দেখামাত্র শুধু যে আগুনের ওপর ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা পড়েছে তাই নয়, চোখাচোখি হতে মাসিও হকচকিয়ে গেল কেমন। মাসির গায়ে জামা ছিল না, মনে হল ঘাবড়ে গিয়ে মাসি শাড়ির আচলটা ভালো করে গায়ে জড়াতে লাগল।

বাবা এবার আমার দিকে ফিরল, কি হয়েছে?

আমি নির্বাক।

মশারিটা ওভাবে ছিঁড়ল কি করে? আর রাত করে এত চেচামিচি কিসের?

আমি ঠোঁট কামড়ে চুপ করে রইলাম। রাগে বাবার ফর্সা মুখ লাল হচ্ছে। মাসি ভয়ে ভয়ে বলল, মায়ের জন্যে কান্নাকাটি করছে—

বাবা আবার তার দিকে তাকাতে মালতী মাসি আবার থতমত খেয়ে চুপ করে গেল।

আঙুল তুলে বিছানা দেখিয়ে বাবা হুকুম করল, গো টু বেড।

আমি গোঁ ধরে দাঁড়িয়েই রইলাম। বাবা এবার হুঙ্কার দিয়ে উঠল, গো টু বেড। ফের যদি এরকম বাদরামো আর চেঁচামিচি করতে দেখি তো চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেব।

আমি বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। রাগে সমস্ত শরীর কাঁপছে। কিন্তু বাবা তক্ষুনি ঘর ছেড়ে চলে গেল না দেখে আমি শুয়ে শুয়েই ঘাড় ফেরালাম একটু।... বাবা কি এবার মাসিকে বকবে নাকি। অমন করে চেয়ে আছে কেন? চুপচাপ দাঁড়িয়ে

মাসিব মাথা থেকে পা পর্যন্ত বাব দুই তিন তাকালো বাবা। না, বাবাব এই চাউনিটা একটু আগেব মতো বাগে ভবাট নয়, কেমন যেন ঘোলাটে ঘোলাটে। আব তাইতেই মাসি হঠাৎ যেন একেবাবে জডসড হযে দাঁডিযে আছে।

নিজেব অন্ধকাব ঘবেব দিকে ফিবে যেতে যেতে বাবা বলল, ও ঘুমোক. তুমি শুনে যেও তো একটু—কথা আছে।

আমি তাবপবেও অবাক চোখে কিছুক্ষণ মালতী মাসিকে দেখলাম। না, বাবাব গলাব স্ববে আব বাগেব লেশমাত্র নেই, তবু মাসি হঠাৎ এমন কাঠ হযে গেল কেন ভেবে পেলাম না। আমি ওই বকম বেযাদপি কবেছি বলে বাবা নিশ্চয মাসিকে নিজেব ঘবে ডেকে নিযে গিযে বকাবকি কববে না।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে ওঘবে মৃদু গম্ভীব গলা খাঁকাবিব শব্দ কানে আসতে মাসিব যেন হুঁস ফিবল। চমকেই উঠল একবাব। তাবপব আমাব দিকে তাকালো। বিছানাব কাছে এসে দাঁডাল। মাসিব এই মূর্তি দেখে আমাব যেন মাযা হল একটু।

ঘবেব আলোটা জ্বেলে বেখেই মাসি আস্তে আস্তে বাবাব অন্ধকাব ঘবেব দিকে এগিযে গেল।

আমি লাফ দিযে উঠে আলোটা নিভিযে দিযে আবাব শুযে পডলাম।

তখন বুঝিনি, এব ঢেব ঢেব পবে বুঝেছি মালতী মাসি আলো থেকে কোন অন্ধকাবেব মধ্যে ডুবে গেল।

এবপব একটানা আবো ছ'বছব মালতী মাসিব সঙ্গে এ-বাডিতে কাটিযেছি। তাব মধ্যে সাডে পাঁচ বছব ধবেই আমাব মনে হযেছে মাসি যেন সেই এক বাতেব পব .থকে বাতাবাতি অনেক বদলে গেছে। সে আমাকে আগেব থেকে আবো বেশি ভালোবেসেছে। দিনেব পব দিন মাযেব কত গল্প কবেছে ঠিক নেই। কিন্তু তবু আমাব মনে হযেছে, যে মা আব এলোই না এ-বাডিতে শুধু তাব ওপবেই যেন মাসিব স-বকম দবদ নেই।

মাযেব গল্প বলতে মালতী মাসি খুব সাধাবণ আর্টিস্ট থেকে এত বড অভিনেত্রী হযে ওঠাব গল্পই বেশি কবত। শুনতে ভালো লাগত, কিন্তু মাসিব অনেক কথাব তাৎপর্য আব ইংগিত বোধগম্য হত না। আমি বুঝি বা না বুঝি সে যেন অনেকটা নিজেব বলাব ঝোঁকে বলে যেত। বুদ্ধি বিবেচনা একটু পবিণত হযে উঠতে কিছুই আব অস্পষ্ট ছিল না অবশ্য, কিন্তু মাসি ততোদিনে আমাব জীবন থেকে বিদায নিযে নিজেব ভবিষ্যতেব পথ ধবেছে।

মালতী মাসিব মুখে যা শুনেছি, নিজেব চোখে যেটুকু দেখেছি, আব যা দেখি নি বা শুনি নি অথচ সম্ভাব্য সত্য বলে আমাব কল্পনায এসেছে—সেই সবকিছু মিলিযে এই সবকাব বাডিব জীবন-যাত্রাব একটা চিত্র আমাব চোখেব সামনে স্থিব হযে আছে। আমি এব ওপব কোনো মন্তব্য কবিনে, কবতে চাইনে—নির্লিপ্ত দর্শকেব মতো সেটা শুধু চেযে চেযে দেখি।

মা আমার চোখে দুনিয়ার সেরা রূপসী বটে (এখনো কি?), কিন্তু মাসির মতে রূপের বাজারে ওই রূপের দাম নেই কিছু। গায়ের রং তো কালোই বলতে হবে। ঘষে-মেজে যেটুকু দাঁড়িয়েছে তাকেও ফর্সা বললে রীতিমতো অত্যুক্তি হবে। আর নাক-চোখ-মুখেরও এমন কিছু বাড়তি বৈশিষ্ট্য নেই যা নিখাদ রূপের পর্যায়ে পড়তে পারে। মাথার চুলও কাঁধ পিঠের আধা-আধি নামে নি। তবে লম্বাটে গড়ন, স্বাস্থ্য ভালো, আর হাসলে ঝকঝকে দাঁতের সারি দেখলে মনে হয় যেন নিখুঁতভাবে সাজিয়ে বসানো।

মাসির মতে মা চিরঋণী 'ক্যামেরা' নামে যন্ত্রটার কাছে। অমন ক্যামেরামুখো ভাগ্য সচরাচর নাকি কারো হয় না। ওই যন্ত্রটাই মাকে রূপের ছাড়পত্র দিয়েছে। যখন যে-ভাবে যে ঢঙে ছবি তুলুক, তাই চোখে পড়ার মতো সুন্দর। ওই যন্ত্রটার কল্যাণেই মা প্রায় দু'যুগ ধরে তার স্তাবক আর অনুরাগীদের চোখে অনন্যার আসনে বসে থাকতে পেরেছে। তবে মায়ের দুটো গুণের কথাও মালতী মাসি একবাক্যে স্বীকার করেছে। এক, চোখের ভাষা। তা এত নীরব অথচ এত স্বচ্ছ, গভীর আর স্পষ্ট যে, সেটাই নাকি মায়ের বিশেষ একটা রূপ। দুই, জোরালো আলো আর ক্যামেরার সামনেও খুব সহজ আর স্থির থাকতে পারার গুণ। ওই জন্যেই মায়ের অভিনয় কোনো সময় অভিনয় বলে মনে হয় না।

কিন্তু এই সব গুণের কদর হয়েছে ঢের পরে। অনেক হতাশার দিন গেছে। মায়েরা ছিল পাঁচ বোন আর তিন ভাই। মা সকলের ছোট। দাদু অর্থাৎ মায়ের বাবা ছিল মার্চেন্ট অফিসের নিচের দিকের কেরাণী। যে মাইনে পেত তাতে মাসের বিশ দিনও টেনে-টুনে চলত না। তাই মাসিরা আর মামারা অল্প বয়স থেকেই যে-যার ভবিষ্যতের রাস্তা নিজেরাই বেছে নিয়েছে। মামাদের মধ্যে বড়জন স্কুলের মাষ্টার, দ্বিতীয়জন ইনসিওরেন্সের দালালী করতে করতে একবার এক শাঁসালো পার্টির মোটা টাকা মেরে অনেক দিন জেলখাটার পর ফেরারী হয়েছে। এখন কোথায় আছে বা কি করছে, কেউ জানে না। ছোট মামা দেশব্রতী হিসেবে কিছু নাম করেছে। নরম গরম লেকচার দিয়ে বেড়ায়, গোটাকতক ইউনিয়নের পাণ্ডাগিরি করে, চাকরি বাকরি করেনি কোনদিন অথচ বিয়ে থা করেছে, ছেলে-পুলে আছে—আর তার অবস্থাই মোটামুটি সচ্ছল একটু।

ওদিকে মাসিরাও অল্প বয়স থেকেই যে যার নিজের নিজের রাস্তা খুঁজে নিতে চেষ্টা করেছে। বড় মাসি কলেজে পড়তে পড়তে এক পয়সাওয়ালা মাড়োয়ারী ছেলের ঘরণী হয়ে বসেছে। মেজ মাসিও সেই গোছের কিছু চেষ্টা করতে গিয়ে কোথায় ভেসে গেছে, কেউ জানে না। ন'মাসি আর ছোট মাসি অন্য বোনেদের তুলনায়ও কুচ্ছিৎ দেখতে। তাদের একজন প্রাইমারি মেয়ে স্কুলের মাষ্টার, অন্যজনের ধর্মে মতি। সে নামকরা সেবায়তনের দীক্ষিতা কর্মী। তার মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, গেরুয়া ধুতি পরা, বাস্তব চাওয়া-পাওয়ার জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন।

সকলের ছোট মা, রুচির দিক থেকে তার বাবার ধাত পেয়েছিল। দাদু নাকি অ্যামেচার পার্টি আর আপিসের বাৎসরিক নাট্যানুষ্ঠানের নামকরা কমিক অভিনেতা ছিল। আপিসের সামান্য কেরানী বাপ হওয়ার বাস্তব কমিকটা ভোলার জন্যেই

অভিনযেব এই অঙ্গটি আঁকড়ে ধবেছিল কিনা কেউ বলতে পাববে না। মা যেবাবে স্কুল ফাইনাল পবীক্ষা দিল, সেবাবে 'আট' ছেলে মেয়েব বাপ ওই ধবনেব কমিক অভিনেতাব মৃত্যুব খবব আব ছবি কাগজেও বেরিযেছিল, শুনেছি।

দাদু মাবা যাওযাব পব তাব বিধ্বস্ত সংসাবেব হালছাড়া দশা। স্কুল-মাষ্টাব বড মামা তাব বাপেব আমলেই পৃথক হযে গেছল। দেশব্রতী ছোট মামাব ভগ্ন-দশা তবীব হাল ধবাব আগ্রহ আগেও ছিল না, পবে সে আবো উদাসীন। বড মাসি কিছু কিছু সাহায্য কবত, আব ভবসা ন' মাসিব প্রাইমাবি স্কুলেব সামান্য বেতন। তাবও আনকোবা নতুন চাকবি তখন। তাদেব মাযেব অর্থাৎ আমাব দিদিমাব বুকেব ব্যামো লেগেই ছিল। কিন্তু বড মাসিব করুণা না হলে সমযে একটু ওষুধও জুটত না।

টেনেটুনে স্কুল ফাইনাল পাশ কবে মা প্রায দু'বছব ঘবে বসে ছিল। ন' মাসি তখন তাব জন্যও স্কুলে চাকবিব চেষ্টা কবেছে, আব বোনেব নিজেব গবজেব অভাব দেখে বকাবকি কবেছে। ন' মাসি চাকবি জুটিযে দিতে পাবলে মা সেই চাকবি কবত হযতো কিন্তু আসলে ওই চাকবি মাযের দু'চোখেব বিষ।

সংসাব যখন একেবাবে অচলপ্রায মা তখন হঠাৎ একদিন সাহসে কোমব বেঁধে পাডাব অবিনাশ সবকাবেব সঙ্গে দেখা কবতে গেল। এখানকাব অ্যামেচাব নাটকেব সংস্থাটি তাবই হাতে গডা। মাযেব বাবা এই সংস্থাবই পাকাপোক্ত কমিক অভিনেতা ছিল, আব ওই ভদ্রলোক তখন সামান্য কবণিক বলে দাদুকে অবজ্ঞা কবত না, ববং ভালোবাসত। অ্যামেচাব ক্লাব হলেও কোনো সামান্য অবস্থাব শিল্পী কিছু কিছু টাকা পেত, বিশেষ কবে মেযে শিল্পীবা। বিনা টাকায মেযে-শিল্পী সংগ্রহ কবা খুব সহজ হত না। মালতী মাসি তখন ওই ক্লাবেব সবেতন শিল্পী একজন। তাব বাডি ঘবেব পবিচয আজও আমাব জানা নেই। অবিনাশ সবকাব এমনিতে রুক্ষ মেজাজী মানুষ, কিন্তু ভিতবটা দবদী। মা জানত, দবকাবেব সময ভদ্রলোক বাবাকে অনেকভাবে সাহায্য কবত।

মাযেব মুখে সে সংসাবেব দুববস্থাব কথা শুনল, আব মা যে স্কুলেব নাটকে অভিনয কবে দু'-তিন বাব মেডেল পেযেছে, তাও জানল।

সেই থেকে মাযেব অভিনয-জীবন শুরু। আব তাব সাযাহ্নে আবাব সেই মঞ্চেই পদার্পণ। খববেব কাগজে এই যোগাযোগেব খববও ফলাও কবে ছাপা হযেছিল।

মালতী মাসি বলত, পাডাব এক বস্তিতে থাকতুম, তোব মাযেব সঙ্গে আগে থেকেই একটু ভাব-সাব ছিল। আমাব কাছ থেকে ভবসা পেযেই অবিনাশ সবকাবেব সঙ্গে গিযে দেখা কবেছিল। আব তোব মা এসে ছ'মাসেব মধ্যেই কিনা আমাব জাযগাটি জুডে বসল। শুধু তাই, আপিস বা ক্লাব থেকে প্লে কবাব জন্যও আমাব বদলে তোব মাযেব ডাক পডতে লাগল। উপকাব কবতে গিযে আমি শেষে উপোস কবে মবি আব কি।

বছব খানেকেব মধ্যে শৌখিন নাটক মহলে মাযেব বেশ নাম হযে গেছল। নানা জাযগা থেকে ডাক আসত, আব টাকা-কডিও বেশ পেত। অবিনাশ সবকাবেব ক্লাবও তখন মাযেব দৌলতেই বেশ ফেঁপে উঠেছিল। সেই কাবণে মাযেব প্রতি সবকাব

মশাইযেব স্নেহ ভালবাসাও দিন দিন বাডছিল। মাযেব বেশ কডা গার্জেন হযে উঠেছিল সে। শহবেব বাইবে থেকে অথবা বেশি দূবেব কোনো অনুষ্ঠানে অভিনযেব ডাক এলে বেশি টাকা পাওযাব সম্ভাবনা সত্ত্বেও ভদ্রলোক যাবাব অনুমতি দিত না। শহবেব মধ্যে হলেও মাকে একলা ছাডত না, হাতে সময থাকলে নিজে সঙ্গে যেত, নযতো বেশিব ভাগ সময নিজেব অনেক দিনেব বিশ্বস্ত চাকব হীবা সিংকে সঙ্গে দিত। সবকাব মশাইযেব অনুমতি ভিন্ন মাযেব কোথাও অভিনয কবাব উপায ছিল না। শুনেছি, ওই বুডো হীবা সিংও মাকে ভালবাসত খুব। কোথাও গেলে মাকে চোখে চোখে বাখত।

কিন্তু ওই হীবা সিংকে অবিনাশ সবকাব চাবুক নিযে তাডা কবেছিল একদিন। কাবণ, সেদিন সে জেনেছে, হীবা সিং তাব সঙ্গেই সব থেকে বেশি বিশ্বাসঘাতকতা কবেছে। তাব ছেলেব সঙ্গে মাযেব ভাব-সাবেব ব্যাপাবটা অনেক দিন পর্যন্ত সকলেব চোখে গোপন ছিল তাব জন্যেই। বাবুব ছেলে যে নিজেব কাজকর্ম ফেলে মাযেব প্রত্যেকটা নাটক দেখতে ছোটে, আব ফেবাব সমযে বাসে যাবাব জন্য ওব হাতে দু'-পাঁচ টাকা গুঁজে দিযে মাকে নিযে ট্যাক্সি কবে ফেবে—সেটা একমাত্র ও ছাডা আব কে জানত?

অবিনাশ সবকাবেব ছেলে বিজন সবকাব, সেই আমাব বাবা।

নাট্যবসিক অবিনাশ সবকাবেব নিজেব ছিল পৈতৃক আমলেব ডেকবেটিংযেব চালু ব্যবসা। নিজেব আমলে সেই ব্যবসা সে আবো অনেক বড কবে তুলেছিল। এই ব্যবসায তাদেব নাম ছিল। তাব অন্য দুই ছেলে বাপেব ব্যবসায যোগ দিযেছিল, কিন্তু বড ছেলে বিজন সবকাব উৎসবে অনুষ্ঠানে অন্য লোকেব ঘব বাডি সাজানো বা পেযালা প্লেট আব খাওযা-দাওযাব বাসন সবববাহ কবাটাকে সম্মানজনক ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ কবতে পাবে নি। সে লেখাপডা শিখে ইলেক্‌ট্রিক্যাল এনজিনিযাব হযেছে। কিন্তু বংশেব কেউ চাকবি কবায অভ্যস্ত নয, বিজন সবকাবও কোনো চাকবিতে বেশিদিন টিকে থাকতে পাবে নি।

তাব স্বপ্ন লাখ দেড দুই টাকা পেলে মস্ত একটা ইলেকট্রিক্যাল ওযার্কশপ খুলে বসবে। দিশি বিলেতি যন্ত্রপাতি সাজ সবঞ্জাম থাকবে, অনেক লোকজন কাজ কববে, ব্যবসা কাকে বলে বাবাকে দেখিযে দেবে। কিন্তু অনেক টানা হ্যাঁচডাব পব ভদ্রলোক ছেলেব হাতে মাত্র দশটি হাজাব টাকা গুনে দিযে বলেছিল, এই দিযে যা পাব কবো, এব বেশি আব এক কর্পদকও দেবাব ক্ষমতা নেই।

সেই দশ হাজাব টাকায বিজন সবকাব যে ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল, তাব নিজেব চোখেই সেটা একটা খেলনাব মতো। এই হতাশাব দরুন তাব মেজাজ-পত্র ভালো ছিল না কোন দিন। আব ওই ক্ষোভেব দরুন বাডিব কাবো সঙ্গে তেমন বনিবনাও ছিল না।

সেই ছেলে এমন একটা কাণ্ড কবে বসতে পাবে, অবিনাশ সবকাবেব কল্পনাব বাইবে। কাবণ নিজেব ক্লাবেব কোনো অনুষ্ঠানে ছেলেকে কোনদিন দর্শকেব আসনে এসে বসতেও দেখেনি। সেই ছেলে যখন আচমকা ঘোষণা কবে বসল, মা-কে বিযে কববে, ভদ্রলোক স্তম্ভিত। ছেলেব উপার্জন কি জানে না, অতএব সঙ্কল্প শুনে তাব

তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাছাড়া ভদ্রলোক যত বড় নাট্যকারই হোক, আর মায়ের কল্যাণে তার সংস্থাটির আয় পয় বেড়েছে বলে তাকে যত স্নেহই করুক, পাঁচ জায়গায় থিয়েটার করে পাচজনের প্রেমিকা সেজে টাকা রোজগার করে যে মেয়ে, তাকে একেবারে ঘরে বউ করে আনার প্রস্তাবটা সে ভাবতেও পারে না। হীরা সিংকে ডেকে জেরা করতে ব্যাপার কি করে এত দূর গড়ালো সেটা ফাঁস হয়ে গেল। তাকে ধরে মারতে বাকি রাখল প্রথম। বেচারা হীরা সিংয়ের দোষ কি, সে জানে, দাদাবাবু যখন বিয়েই করবে দিদিমণিকে, তখন আগে থেকে একটু আধটু মেলামেশা করলে কি আর এমন দোষ? এতকাল কলকাতায় থেকে কম তো দেখল না।

অবিনাশ সরকার ছেলেকে ডেকে জবাব দিল, বউ নিয়ে অন্যত্র বাস করার মুরোদ থাকলে বিয়ে করতে পারে, তার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

ছেলেও গোঁয়ার। তেমনি পাল্টা জবাব দিল, ঠিক আছে।

কিন্তু এই পর্যায়ে বেঁকে বসল আমার মা। সরকার মশাই পিতৃতুল্য তার, অসময়ে আশ্রয় দিয়েছে, সামান্য হলেও একলার চলে যাওয়ার মতো রোজগারের রাস্তা খুলে দিয়েছে। মায়ের আশা ছিল, সরকার মশাই প্রস্তাব শুনে খুশি হবে, তার ছেলেও সেই রকম আশ্বাসই দিয়েছিল। তার উগ্র মূর্তি দেখে মা হতভম্ব। মায়ের সঙ্গেও ভদ্রলোক যথেষ্ট দুর্ব্যবহার করেছে। সকলের সামনে অকৃতজ্ঞ বলে গালাগাল করেছে।

বাবাকে ডেকে মা জানিয়ে দিয়েছে, এ বিয়ে হবে না,কারো অশান্তির কারণ সে হতে চায় না, তার জন্য কারো পরিত্যক্ত হবারও দরকার নেই।

আমার ধারণা—মায়ের আমি অবাঞ্ছিত সন্তান। অনেক পরে ধারণাটা বদ্ধমূল হয়েছে। আট-ন' বছরের ছেলের কাছে মাসি হেসে হেসে গল্প করেছে, তোর বাবাকে ফিরিয়ে দেবার পর কি সঙ্কটই না গেছে তোর মায়ের। বাড়ি ছেড়ে আমার সঙ্গে আমার বস্তিঘরে এসে থেকেছে। আর তারপর আত্মহত্যা করার ফিকির খুঁজেছে। তোর মায়ের সেই চোখ-মুখ আর রকম সকম দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। একদিন এক পোঁটলা ঘুমের ওষুধ পেলাম তার বাক্স ঘেঁটে। সেই রাতেই সেগুলো নিয়ে সরকারমশাইকে দেখালাম, আর বললাম, এ বিয়ে না হলে ইন্দুমতীর বাঁচার উপায় থাকবে না। আমার মুখে সব শুনে সরকার মশাই পাথরের মতো বসে রইল খানিক। তারপর উঠে সোজা আমার বস্তিঘরে চলে এলো। মায়ের মাথায় হাত রেখে বলল, আমি তোমার ছেলে, ছেলের দোষ নিও না, আমি তোমাকে মা লক্ষ্মীর মতই আমার ঘরে নিয়ে যাব।... এর পাঁচ দিনের মধ্যে তোর বাপের সঙ্গে তোর মায়ের বিয়ে, আর বিয়ের ঠিক সাত মাসের মাথায় তুই এসে হাজির হলি।

বাবা-মায়ের বিয়ের গল্প শুনে আট-ন' বছরের এক অবোধ ছেলের মালতী মাসির প্রতি কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। সঙ্কটের সময় সে-ই মাকে আশ্রয় দিয়েছে, আত্মহত্যার হাত থেকে মাকে রক্ষা করেছে, মা আত্মহত্যা করলে আমার কি দশা হত, আমি কেমন করে এই পৃথিবীর মুখ দেখতাম? অবিনাশ সরকারকে বলে বাবা-মায়ের বিয়েও সে-ই ঘটিয়ে দিয়েছে, মালতী মাসির থেকে ভালো আর আপনার জন দুনিয়ায় কে

আছে? কিন্তু পরে, অনেক পরে একটা চেতনার যন্ত্রণা আমার মাথায় কেটে কেটে বসেছে।... মায়েব সঙ্কটটা কি, কেন বাড়ি ছেড়ে তাকে মাসির সঙ্গে বস্তিঘরে এসে থাকতে হযেছিল, আর কেন-ই বা সে আত্মহত্যার ফিকির খুঁজছিল? সবেরই একটাই জবাব। আমি আসছিলাম বলে। আমিই মাযের তখন সঙ্কট বলে। আমি তখন অবাঞ্ছিত বলে। আমাকে নিয়েই মাযের যত সমস্যা।

তখন মনে হত, আমার সকলের থেকে বড শত্রু কেউ থাকে তো সে মালতী মাসি। এই দুঃসহ অস্তিত্বটা টানতে হচ্ছে শুধু তার জন্যেই।

মাসি বলত, তোর বাবা গোঁয়ার হলে কি হবে, তার চোখ ছিল। বিয়ের আগেই মাকে বলত, থিযেটার করে কোনদিন কিছুই হবে না, একটা সিনেমায় একবার নাম করতে পারলে টাকাও যেমন খ্যাতিও তেমনি। সিনেমায় নামতে চেষ্টা করো। তোর মাযেবও মনে মনে সেই আশা, ফিল্ম আর্টিস্ট হবে, কি করে সেটা হওযা যায় আমার সঙ্গে সেই পবামর্শ করত... তোর মায়ের ফটো খুব সুন্দর ওঠে, সেটা তোর বাবা আগেই জানত, বিয়ের কিছুদিন পবেই ভালো স্টুডিও থেকে সে তোর মাযেব একগাদা ফটো তুলে ফেলল। কত ঢংয়েব কত রকমের ছবি সব—

হ্যাঁ, সেই ছেলেবয়সে মা-খোয়ানোব ক্ষত বুকে চেপে সেই সব ছবি আমি নিজের চোখেই দেখেছি। বাবার কাছ থেকে চাবি সরিযে, মাযেব দেরাজ বা আলমারি থেকে সব জিনিসপত্র টেনে বার করে তছনছ কবে ফেললে কে নিষেধ করবে, কে ধমক লাগাবে? ওই কবতে গিযেই দেরাজ থেকে মাযের দু'-তিনটে ফটো অ্যালবাম বেরিযেছে। ওই অ্যালবাম আমাব আগেও চোখে পড়েছে কিন্তু মা কখনো সে-সব নেড়েচেড়ে দেখতে দেয় নি।

শিশুমনেব এক জমাট বাঁধা আক্রোশ নিযে সে-সব খুলে বসতাম। কিন্তু কখন যে মা-কে দেখাব মধ্যেই তন্ময হয়ে যেতাম, টেব পেতাম না। মা যে কত সুন্দব সেটা যেন আগে দেখি নি, আগে বুঝি নি। বাড়িতে এই মায়েবই হাসিমুখ দেখেছি, গম্ভীব মুখ দেখেছি, সুন্দব ভ্রূকুটিও দেখেছি, তবু ছবিতে ওই সব দেখে মনে হত, এমন আব কখনো দেখি নি।

এই সব ছবি বাছাই কবে বাবা নাকি সিনেমাব কর্তাদেব কাছে পাঠিয়ে দিত। ছবির সঙ্গে মাযের পবিচয় থাকত। অল্পস্বল্প নাম তো থিয়েটাবেব জন্যই হযেছিল, তাই ছবি দেখে ওই ছবিওয়ালাদের কারো কাবো আগ্রহ হল।

হলে কি হবে, সেই গোড়া থেকে তুই সোজা জ্বালিয়েছিস তোব মাকে! মালতী মাসি বলত, ও-সময চেষ্টা করার জন্য তোব বাবাব সঙ্গে ঝগডা পর্যন্ত হযে গেছে, তোর মা কারো সঙ্গে তখন দেখা করতেই বাজি নয।

অর্থাৎ আমি আসছি সেটাই অন্তরায তখন।

অ্যালবাম থেকে মায়ের ফটোগুলো খুলে সামনে ছড়িযে রাখতাম, আব ভাবতে চেষ্টা করতাম, মা কোথাও যায় নি, নানান মূর্তিতে আমাব সামনেই আছে। ভাবতে না পারলে বলতাম, আমি আসার পরে আব তো তোমাকে বেশি জ্বালাতন করি নি, বিরক্ত করি নি। আগে যা হয়েছে তার জন্যে আমাব কি দোষ? তুমি আমাকে ফেলে

গেলে কেন, আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে না কেন? আমি মা ছাড়া থাকতে পারি না, জানো না? তুমি ছেলেকে ছেড়ে থাকতে পারছ কি করে?

আমি জন্মাবার ছ'মাস বাদে বাবা আর মা একসঙ্গে আবার ছবির জগতে হানা দিয়েছে। মালতী মাসি বলে, সংসার তখন প্রায় অচল তোদের, তোর জন্য ঠিক একটু দুধ জোটানও শক্ত হয়ে উঠছিল।

এমন দুরবস্থায় পড়ার কারণ, দাদু অর্থাৎ বাবার বাবা সরকার মশাই হঠাৎ চোখ বুজেছে। তারপরেই ভাইদের মধ্যে অশান্তি। ছোট দুই ভাই বলেছে, দশ হাজার টাকা দিয়ে বাবা তাকে আলাদা ওয়ার্কশপ করে দিয়েছে অতএব ডেকোরেটিং-এর ব্যবসায় তার কোনো ভাগ নেই। বাবা ভয়ঙ্কর জেদী আর একরোখা মানুষ—ভাইদের সঙ্গে ঝগড়া করে মা-কে নিয়ে আর আমাকে নিয়ে বাড়ি ছেড়েই চলে এসেছে। তখন সস্তাগণ্ডার দিন, তাই পঞ্চাশ টাকায় দুটো ঘর ভাড়া পাওয়া গেছল। কিন্তু সেই পঞ্চাশ টাকাই বা আসে কোথা থেকে? মালতী মাসির অবশ্য খুব ইচ্ছে ছিল, মা আর মাসি দু'জনে মিলে সরকার মশাইয়ের থিয়েটারটা চালায়। থিয়েটার একেবারে বন্ধ হবার ফলে তারও তো চরম দুরবস্থা তখন।

রে-গতিক দেখে মায়ের অনিচ্ছা ছিল না খুব, কিন্তু বাবার তখন মা-কে সিনেমা-স্টার বানাবার ঝোঁক চেপেছে মাথায়—একবার নাম করে ফেলতে পারলে অঢেল টাকা। তখন নিজের মনের মতো একটা ইলেকট্রিক্যাল কারখানা জাঁকিয়ে তোলা জল-ভাত ব্যাপার। সেই ভবিষ্যতের আশায় ছোট যে ওয়ার্কশপটা ছিল তার মূলধন ভেঙে আর যন্ত্রপাতি বেচে কায়ক্লেশে সংসার চলছিল।

তোর মায়ের একখানা বরাত বটে, বুঝলি। সামনাসামনি দেখে খুশি না হলেও ফটো দেখে দুই-একজন সিনেমার লোক খুশি হয়েছিল। তোর বাপের মতো চোখ ছিল তাদেরও, প্রথম ছবিতে নায়িকার থেকেও কাগজে তোর মা বেশি প্রশংসা পেয়ে গেল। দ্বিতীয় ছবিতেও তাই। তৃতীয় ছবিতে সরাসরি নায়িকা হয়ে বসল একেবারে। একচোখা ঠাকুর মুখ তুলে তাকালে ওই রকম করেই তাকায়, সেই এক ছবিতে বাজার মাৎ।

তারপর? তারপর কি জানি, লাফিয়ে লাফিয়ে ভাগ্য ফিরতে লাগল আমাদের। যে-ভাগ্য লোকে স্বপ্নে কল্পনা করে থাকে, সেই রকমই ভাগ্য। আর তলায় তলায় দুর্ভাগ্যও সঞ্চিত হচ্ছিল কিছু, কিন্তু সেটা টাকার ঝকমকানির তলায় চাপা পড়েছিল।

মালতী মাসির প্রতি মা অকৃতজ্ঞ হয় নি। ভাগ্যের মোড় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিজের কাছে এনে রেখেছে। মালতী মাসি আমাদের দুঃখের ভাগীদার, সুখেরও। পরে মায়ের বড় হবার গতি যখন আরো দুর্বার ঊর্ধ্বমুখী, তখন ছোটখাট রোলে তাকে ঠেলে দিতে কার্পণ্য করেনি মা। কিন্তু মাসির কেন যেন আর দুপায়ে দাঁড়াবার মতো উৎসাহ বা উদ্দীপনা ছিল না। পরিতুষ্ট মুখে মাসি আমাকে বলত, সমস্ত জীবন নিজের ভাবনা ভেবেছি আর কাঁহাতক ভালো লাগে বল, সুখের ঘরে খেয়ে দেয়ে দিব্যি মুটিয়ে যেতে লাগলাম।

...সুখের ঘর! মা এই ঘর ছেড়ে চলে যাবার পরেও মাসি সুখের ঘর বলতে পেরেছিল কি কবে সেটা বিশ্লেষণ করার বয়স নয় আমার তখন। পরে মাসির বাক-চাতুরীর সেতু ধরেই আমাদের সুখের ঘরের রূপটা আমি চোখ বুজে কল্পনা কবতে পেরেছি।

...মাযেব সঙ্গে বাবার প্রকাশ্যে মনোমালিন্য শুরু হযেছিল আমার চাব বছর বয়সেব সময় থেকে। বাবা সেই জাতের মানুষ, যাবা নিজের স্বার্থের প্রযোজনে উদারতাব সুতোটা গড়গড কবে ছেড়ে দিযে বসে থাকতে পাবে। কিন্তু প্রয়োজন ফুবোলে সে সুতো গুটোবে। আমাদেব সুখেব ঘবে বাবার তখন ওই সুতো গুটোবার মেজাজ। মা চড়চড কবে খ্যাতির শিখবে উঠতে লেগেছে তখন। বছবে চার-পাঁচটা করে কণ্ট্রাক্ট সই করছে। একটাব থেকে আর একটাব প্রাপ্তিব অঙ্ক বেড়ে চলেছে। এ-সব ব্যাপারে বাবার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। টাকা পযসাব ব্যাপাবে পার্টির ফযসালা কবতে হবে বাবাব সঙ্গে। গোড়ায় গোডায় সঙ্কোচবশেই দেনা-পাওনাব হিসেব নিকেশ মা বাবার হাতে ছেড়ে নিশ্চিন্ত ছিল। কিন্তু পবে এই নিযেও খিটির-মিটির বাঁধতে লাগল। মা কারো প্রতি সদয হযে বা প্রযোজন বোধে কোথাও অল্প টাকায কাজ কবতে রাজি হলে বাবাব সঙ্গে দস্তুবমতো ঝগডা বেধে যেত। বাবাব ভিতবে ভিতবে তখন নানারকম সন্দেহের কাটাছেঁড়া শুরু হত। তা ছাড়া পযসাওয়ালা সব পার্টি বাবাব এই আধিপত্য প্রীতিব চোখে দেখবে কেন? লেন-দেনেব ব্যাপাবেও তারা অনেকে সোজাসুজি মায়েব সঙ্গেই কথা-বার্তা কইতে চাইত। মা তাতে রাজি হলেই বাবা খাপ্পা।

প্রথম দিকে বাবা প্রায সর্বক্ষণ মাযেব সঙ্গে স্টুডিওতে থাকত। বিকেলে মাকে নিয়ে বাডি ফিরত। নিজেব মস্ত ফ্যাক্টবী করাব সঙ্কল্প একবকম ধামাচাপা। বাবা সঙ্গে থাকার দরুন গোড়ায় মায়েব সুবিধে হত, কিন্তু নতুন জগতেব যাবতীয কিছু বুঝে সুঝে নিতে কত আব সময় লাগে? ফলে ক্রমশ বাবাব উপস্থিতি অস্বস্তির কারণ হযে উঠতে লাগল। আর কিছু না হোক, আডালে যে বাবাকে নিযে পাঁচজনে পাঁচ বকমেব বসিকতা কবে সেও মায়ের ভালো লাগত না। স্ত্রী অভিনয় কবছে আব স্বামী সাক্ষীগোপালেব মতো বসে তাকে পাহাবা দিচ্ছে, এ কাব ভালো লাগে? লোকে আডালে অন্তত হাসি ঠাট্টা করবেই।

বাবাকে মা সেটা বোঝাতে চেষ্টা কবেছে। বলেছে, এখন আর তোমাব বোজ এত সময নষ্ট কবাব দরকার কি, নিজের কাজকর্মে এবাবে একটু মন দাও না।

মা এ-কথা বললেই বাবার দু'চোখেব চাউনি ধাবালো হযে উঠত নাকি। টাকা পয়সা আদাযের ব্যাপাব না থাকলে নিজে থেকেই স্টুডিওয আসা কমাতে হল তাকে। আউটডোর শুটিং এর জন্য আগে যখন দু'-পাঁচ দিন বাইবে কাটাতে হত, বাবা সঙ্গে না থাকাতে মা অসহায় বোধ করত। কিন্তু মা পবে আভাসে ইঙ্গিতে বাবাকে কয়েক আপত্তি জানিয়ে শেষে সরাসরি একদিন বলে দিল, তোমার আসার দবকাব নেই, এবার থেকে মালতীদিকে নিয়ে যাব।

মালতী মাসি হেসে হেসে গল্প করত, কুটকুট করে তোর বাবার সঙ্গে মা কি ঝগড়াই না করত। আর তোর বাবা ফুঁসতে থাকত।

বাইবে যাবাব ব্যাপাবেও ছেঁটে দিতে চাওযাব ফলে বাবা বাগত গম্ভীব মুখে জিজ্ঞাসা কবেছিল, কেন, আমি সঙ্গে থাকলে তোমাব অসুবিধে হয?

একটু হয। ঠিক মতো কাজে মন দিতে পাবি না।

আগে তো পাবতে?

মা জবাব দিযেছিল, আগেব অভিনযেব মান ছাড়িযে যেতেই চাই। তাছাড়া নিজেব কাজকর্ম ছেড়ে সবসময স্ত্রীব সঙ্গে সঙ্গে ঘুবলে—লোকে বলে কি?

মা কথা কাটাকাটি কমই কবত, কিন্তু কি চায না চায, সেটা স্পষ্ট কবে বুঝিযে দিত।

মালতী মাসি অবশ্য এক এক সময মাযেব দিক টেনেও কথা বলত। তোব বাপেবও বুদ্ধিব দোষ, আগে তোব মাকে ফিল্মস্টাব বানাবাব জন্য ওই লাইনেব পযসাওযালা লোকদেব কতভাবেই না তোযাজ তোষামোদ কবেছে। তখন এত উদাব যে কোনো পার্টি থেকে তোব মা বাত বাবোটায কাবো গাড়িতে বাড়ি ফিবলেও টুঁ শব্দটি কবে নি, আব যেই টাকাব বৃষ্টি শুরু হযেছে মাথায অমনি শেকলে বাধাব মতলব তোব মাকে—তাও কখনো হয।

মালতী মাসিব মুখে শুনেছি, চাব বছব বযসেব সময আমাব একটা বোন হযেছিল, সেই বোনকে আমি চোখে দেখি নি কখনো। মা দিনকযেক মাত্র বাড়ি ছিল না, বাইবে শুটিং থাকলেও তো দু'-পাঁচদিন কবে হামেশাই বাড়ি থাকে না, কোথায গেছল, আমি কি কবে জানব? .নার্সিং হোমে মবা বোন হযেছিল আমাব, সেখান থেকেই সব ঝামেলা চুকেবুকে গেছে। কিন্তু বোন আসাব ব্যাপাবেই নাকি বাবাব সঙ্গে মাযেব ঝগড়া লেগেই থাকত। মাযেব জন্য তখন নাকি তিন-চাব মাস ধবে অনেকেব অনেক টাকা লোকসান হযেছে —কাবণ মা তো তখন আব কাজ কবতে পাবে নি, তিন-চাবটে ছবি আধা-আধি শেষ কবে ফেলে বাখতে হযেছিল। সেইজন্যেই নাকি বাবাব সঙ্গে মাযেব তখন অত ঝগড়া।

মনে মনে আমি তখন নানাবকম কল্পনা কবতাম। ওই অদেখা বোনেব ওপব আমাব ভাবী মাযা পড়ে গেছল। সে নিশ্চয মাযেব ওপব বাগ কবে একেবাবে মবে জন্মেছে। মা আমাকেও চায নি, ওকেও চায নি। আমিও যদি ওই অদেখা বোনেব মতই মাযেব ওপব শোধ নিতে পাবতাম। মবে জন্মাতে পাবি নি, কিন্তু এখন যদি মবে যাই? লোকে মবে যায কি কবে, সেও তখন আমাব কাছে আবাব এক গবেষণাব বস্তু।

নার্সিং-হোম থেকে ফিবে এসেই মা আমাকে নিযে ঘব বদল কবেছে। বাগেব চোটে বাবা নাকি বাড়িতেই ছিল না ক'দিন। আব তাবপব থেকেই বাড়িতে বসে মাযেব চোখেব ওপব মদ খাওযা ধবেছে। কিন্তু শক্ত ধাতেব মা আমাব, ও-সবে পবোযা কবাব মেযে নয।

এই ঘব টিকবে না, বাবা তাব ঢেব আগে থেকেই বুঝেছিল। গোঁ ভবে যা-ই করুক, বুদ্ধি নেই তাব, এ-কথা কেউ বলবে না। মাকে একটি কথাও না বলে খুব গোপনেই সে আবাব নিজেব ভবিষ্যৎ নির্বিঘ্ন কবে তুলতে চেযেছিল। মাযেব বোজগাবেব টাকা তখন মা আব বাবাব দু'জনেব নামে ব্যাঙ্কে জমা হত। ইচ্ছে কবলে দু'জনেব যে কোন একজন সেই টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলতে পাবত। তাছাড়া সমস্ত টাকাই ব্যাঙ্কে

থাকত না, ইনকাম ট্যাক্সের হানাদারী ঠেকাবার জন্য অনেক কাঁচা টাকা ঘরেও মজুত থাকত। এতদিন পর্যন্ত ব্যাঙ্কের চেক-বই আর ঘরের টাকা সবই বাবার হেপাজতে ছিল। মালতী মাসির ধারণা, বাবার মস্ত এক ইলেকট্রিক্যাল কারখানা ফেঁদে বসার ব্যাপারটা যখন জানাজানি হয়ে গেল, তার আগে ব্যাঙ্কে নগদ মিলিয়ে লাখ চারেক টাকা ছিল। কিন্তু টাকার খোঁজ পড়তে দেখা গেল, চারশ' টাকাও নেই।

জানাজানি হয়ে গেল এই বাড়ির জমিটা কেনার সময়। জমিটা দেখে মায়ের তো পছন্দ হয়েই ছিল, বাবারও অপছন্দ হয় নি। পাঁচ কাঠা জমি, এক লাখ তিরিশ হাজার টাকা দাম।

মা বলল, কিনে ফেলো।

বাবা বলল, কিনব কোত্থেকে, টাকা নেই।

মা অবাক। টাকা নেই মানে?

মানেটা বোঝার পর মা স্তব্ধ একেবারে। মালতী মাসি পর্যন্ত দু'-তিনদিন তখন মায়ের সঙ্গে একটা কথা বলতেও সাহস করে নি।

পাঁচ-দিনের মধ্যেই শুধু মায়ের নামে এই জমি কেনা হয়েছে। তখন তো টাকার থলে নিয়ে মায়ের পিছনে লোক ঘুরছে। গোটা তিনেক ছবির আগাম বায়না নিতে সমস্যা মিটেছে। কিন্তু ঘরের সমস্যা দ্বিগুণ বেড়েছে। বোকা তো মাও নয়, ওই অতবড় কারখানা চালু করতে বাবার বড় জোর লাখ দুই টাকা লেগেছে। বাকি সব টাকা সরিয়ে বাবা যে শুধু নিজের দখলে রেখেছে, সেটা বুঝতে বাকি থাকে নি। মা এরপর সমস্ত পার্টিকে জানিয়ে দিয়েছে, প্রাপ্য টাকা শুধু তার হাতেই দিতে হবে আর কাউকে নয়। কন্ট্রাক্টর এসে এই জমিতে বাড়ি তোলার কাজে হাত দিয়েছে। তখনো মা একদিনের জন্যেও বাবার সাহায্য চায় নি। বাড়িও মায়ের নামে হয়েছে।

মালতী মাসির অনুপ্রাস আর ব্যঞ্জনা স্মরণ না করেও তার পর থেকে এই সরকারবাড়ির জীবন-যাত্রা আমি অনায়াসে কল্পনা করতে পারি। একসঙ্গে বিশ্বাস আর টাকার ওপর দখল খুইয়ে বাবা বেপরোয়ার মতো এরপর মায়ের ওপর দখল নেবার জন্য যে মরিয়া হয়ে উঠছিল, তার নজির তো আমি নিজের চোখেই দেখেছি একদিন। বাবা এই মেজাজেরই লোক। তাছাড়া যে বস্তুটার দংশনে এ-যাবৎ বহু প্রেমিক-প্রেমিকার ঘর ভেঙেছে দুনিয়ায়, সেই ঈর্ষার কীট-দংশনই সর্বদাই তখন বাবার মগজেও কেটে বসছিল মনে হয়। সেই পয়সাওয়ালা ঈর্ষার মানুষ যারা, এ-বাড়িতে তাদেরও আমি অনেক দেখেছি।

আরো একটা সত্য আমার কাছে স্পষ্ট। বাবাকে মা ভয় করত। সমীহ করত না, শ্রদ্ধা করত না, শুধু ভয় করত। আর ঘৃণা করত। কত যে ঘৃণা করত, সেটা মায়ের দু'চোখে উপচেও উঠত সময় সময়। কিন্তু ঘৃণার দরুন মা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়নি, গেছে ভয়ে। নিজের বাড়ি, ভয় না করলে অনায়াসে বাবাকেই তো বাড়ি থেকে সরিয়ে দিতে পারত। আদালতে খুব সংগোপনে বাবা-মায়ের বিয়ে নাকচ হয়ে গেছে। কিন্তু এ-সব খবর গোপন থাকে না। বাবাকে ভয় না করলে এ ফয়সালাও মা এ-বাড়ির ওপর দখল রেখেই করতে পারত।

*　　*　　*　　*

মা চলে যাবার পব দিনকতক এক অব্যক্ত হাহাকারের মধ্যে কাটিয়েছি আমি। নানারকম ক্ষোভের আকারে সেটা প্রকাশ পেত। দিনগত সমস্ত ব্যাপাবে আমার রুদ্রমূর্তি। বাবা টের পেলে ঠাস ঠাস চড় বসিয়ে দিত গালে, তার শক্ত হাতের আঙুলের দাগ বসে যেত। মাযেব ওপর আমার রাগ, কিন্তু আরো ছেলেবেলা থেকে ওই বাবার ওপর আমাব বিদ্বেষ।

সেই মানসিক অবস্থার মধ্যেও একটা ব্যতিক্রম লক্ষ্য করেছি। যে মালতী মাসি মা বাড়ি ছেড়ে যাবার আগে পর্যন্তও বাবাব মুখোমুখি পড়ে গেলে ভয়ে চুপ মেবে থাকত, মা যেদিন থেকে আর বাড়ি ফিবল না, সেই বাতেও বাবা কথা শোনার জন্য তাকে ঘবে ডাকতে ভযে কাঠ হযে যেতে দেখেছি—সেই মাসি কিনা এরই মধ্যে দিব্যি সহজ হাসিমুখে বাবার ঘবে চলে যায, তাব সঙ্গে কথা-বার্তা বলে, এমন কি নাওযা-খাওযা বা স্কুলে যাওয়া নিযে আমি বেশি গোঁয়ার্তুমি করলে বাবাকে বলে দেবে বলে শাসাযও। সেদিনেব সেই অপবিণত মনও আমাকে বলে দিযেছে, মালতী মাসি যতই ভালবাসুক আমাকে, মা চলে গেছে বলে ওই মাসি আমাব মতো ব্যথা একটুও পায নি। বোজকার মতো তার পরেও সে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে গেছে, কিন্তু একদিনেব জন্যও মাযের ওই জায়াগাটা আমি তাকে দখল করতে দিই নি।

বাইবে আমাব উগ্র ভাবটা দিন পনেবোব মধ্যে কমে এলো। ভিতবে যে ফাঁকা যন্ত্রণাটা থিতিযে থাকল, সেটা কেউ দেখতে পায় না।....কি জন্যে স্কুলেব ছুটি ছিল সেদিন। দুপুবে মাসি চুপি চুপি আমাকে জিজ্ঞাসা কবল, এই, তোব মাযেব সঙ্গে দেখা করতে যাবি?

আমি চমকে উঠলাম। মা কোথায?

আছে এক জাযগায়। যাবি তো চল, তোব মাযেব আজ ছুটি। বিকেলে তোব বাবা আসাব আগেই চলে আসব আবাব। খবর্দাব, তোর বাবাকে একটি কথাও বলবি না!

আমি চুপচাপ খানিক মাসিব মুখখানা দেখে নিলাম। মা কোথায আছে আব আজ ছুটি, তুমি জানলে কি কবে?

একটু আগে তোব মা ফোন কবেছিল, আগেও দুই একদিন ফোনে তোব খবব নিয়েছিল।

আমি চেঁচিযে উঠলাম, আমাকে তুমি কিচ্ছু বলো নি কেন? কেন বলো নি? দাও, আমাকে ফোন নম্বব দাও।

আমার রাগ দেখে মাসি গায়ে পিঠে হাত বোলাতে এলো। ছিঃ বাগ কবতে হয় না, তোর মা যে তোকে ফোন নম্বর দিতে বারণ কবেছে।

একটা দগদগে ক্ষতেব ওপরে যেন আগুন ছিটিযে দিল কেউ। ঠিক আছে, আমি যাব না, মা-কে বলে দাও, সুমন মবে গেছে!

ছুটে চলে এসে নিজের বিছানায় মুখ গুঁজে শুয়ে পড়লাম। একটু পরে মাসি আবাব গায়ে-পিঠে হাত বোলাতে এলো, আমি তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা কবলাম।

লক্ষ্মী মাণিক, অমন কবে না, মাসিব মিছবি-ভেজানো গলা একেবাবে, তোব মা যে তোকে ডেকেছে, তুই যাবি বলে আজ কোথাও বেরুচ্ছে না—না গেলে এমন বাগ কববে যে আব কোনদিন হয়তো তোব সঙ্গে দেখাই হবে না—চল, চটপট ঘুবে আসি, সন্ধ্যাব আগেই আবাব ফিবে আসতে হবে তো।

উঠে বসলাম। মুখ গুঁজে পড়ে থাকলেও চোখ দিয়ে আমায জল গড়াচ্ছিল না। ভিতবে যা-ই হতে থাকুক, ওই বযস থেকেই চোখ আমাব খবখবে শুকনো। বাগ পড়ে নি, কিন্তু মা-কে দেখবাব জন্য ভিতবটা আমাব লালাযিত।

ট্যাক্সি থেকে নেমে আমাব হাত ধবে একটা মস্ত বড় বাড়িতে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে একটা চাকব আব একটা দাবোযান গোছেব লোক ছুটে এলো। আমাদেব খুব খাতিব দেখিয়ে দোতলায নিয়ে গেল।

দোতলায় উঠেই দেখি, একটা ঘবেব সামনে মা দাঁড়িয়ে। সেই মা—পিঠেব ওপব খোলা চুল, পবনে সাধাবণ একটা ফর্সা শাড়ি, বাড়িতে যেমন পবত।

বযস আমাব মাত্র সাত তখন, তবু মাযেব কি বেশ ব্যগ্র মুখ দেখেছিলাম আমি? মনে হয, দেখেছিলাম। আব দেখেছিলাম বলেই আমাব ভিতবেব অভিমান অমন চাড়িয়ে উঠেছিল।

এসো মালতীদি। তাড়াতাড়ি এগিযে এসে হাত ধবে মা আমাকে একটা মস্তবড় ঘবেব মধ্যে টেনে নিয়ে গেল। আলনায শাড়ি-টাড়ি দেখে বুঝলাম, এটাই মাযেব শোবাব ঘব এখন। আমাকে বিছানায বসিয়ে গা ঘেঁষে মা-ও বসল। মালতী মাসি আমাদেব সামনেই একটা গদি-আঁটা মোড়া টেনে নিল।

দিব্যি হাসিমুখে মা জিজ্ঞাসা কবল, আমাব ওপব বুঝি খুব বাগ হযেছে তোব।

আমি জবাব দিলাম না।

তোব মাসি বলছিল, তুই খুব লক্ষ্মী ছেলে হযে গেছিস, একটুও দুষ্টুমি কবিস না, সকলেব কথা শুনিস—'

অভিমান ও বাগ বাড়ছে। কেন যে প্রতিবাদ কবা একান্ত দবকাব হল, জানি না। মাসি মিথ্যে কথা বলেছে।

ও মা, সে কি বে। মাযেব গলাব স্ববে তখনো হাল্কা কৌতুক।

আগেব থেকে আবো বেশি দুষ্টুমি কবি, কাবো কথা শুনি না।

মা আমাব দিকে চেযে বইল, হাসিমাখা চাউনি, কিন্তু মুখেব দিকে চেযে যেন ভিতবটা দেখে নিচ্ছে। ঠিক মতো খাওযা দাওযা কবিস তো?

না।

পড়াশুনা?

বই ছুঁইও না।

খুব খাবাপ কথা, মা গম্ভীব একটু, পড়া না পাবলে স্কুলে বকে না?

খু-ব। বাড়িব মাষ্টাবমশাই সেদিন কানটা ছিঁড়ে নিচ্ছিল প্রায।

কেন যে কথা ক'টা মুখ দিয়ে বেবিয়ে গেল, কে জানে। বলাব পর মনে হল, শুনে মা যেন একটু যন্ত্রণা বোধ কবল। মা থাকতে বাড়িব মাষ্টাব সত্যিই কোনদিন

আমাব গাযে হাত দেয নি। মাষ্টাবমশাযেব কাছে আমাব অপবাধেব প্রসঙ্গ অনুক্ত থাকল। তিনবাব কবে বলাব পবেও আমি যখন পডায মন দিচ্ছিলাম না, মাষ্টাবমশাই জোব কবে আমাব মাথাটা বইযেব দিকে ফিবিযে দিযেছিল, আব আমি তখন হঠাৎ বেগে গিযে বিকটভাবে তাকে ভেংচি কেটে উঠেছিলাম।

মা মালতী মাসিব দিকে তাকালো একবাব। চাপা গলায হুকুম কবল, গাযে হাত তুলতে বাবণ কবে দিও।

শোনামাত্র আমাব বাগ আবাব শযতানিব আকাবে চাডা দিযে উঠল। আমাব ওপব গঞ্জনাটা মাযেব একটু যন্ত্রণাব কাবণ, সেটা আবো স্পষ্ট কবে বোঝা গেল। বললাম, মাষ্টাবমশাই কি এমন গাযে হাত তোলে, বাবাব এক-একটা চড খেযে প্রাযই মাথা ঘুবে পডে যেতে হয—

মাযেব চোখে-মুখে এবাবেব যন্ত্রণা দেখে আমি বীতিমতো আনন্দ পাচ্ছি। এই যন্ত্রণা বাগ হযে জমাট বাঁধছে। মাসিব দিকে তাকিযেছি আবাব।

মালতী মাসি যেন বেশ অস্বস্তি বোধ কবছে। মাযেব চোখ এডিযে আমাব দিকে ফিবল, তুই বেশি বেশি বলিস না তো।

বেশি বেশি। সামান্য কথাযও কেন যে এত বাগ হচ্ছে আমাব, জানি না। প্রথম দিন চড খাবাব পব জল দিযে ঘষে আমাব গাল থেকে তুমি বাবাব আঙুলেব দাগ তুলতে চেষ্টা কবো নি, বাবাব চামাবেব হাত বলোনি? মাযেব দিকে ফিবলাম, মাসি তো এখন বাবাব দিক টেনে বলবেই, বাবাব সঙ্গে খুব যে এখন—

নিঃশব্দে কিছু একটা চকিত কাণ্ড হযে গেল, মনে হল। মাসি যেন ধডফড কবে উঠল, তাব কালো মুখখানা শুকিযে আমসি। আব মাও যেন স্বস্তি বোধ কবছে না একটুও। জোব কবেই যেন বিস্মিত দু'চোখ মাসিব দিকে ফেবালো।

মালতী মাসি খানিকটা আমতা আমতা কবে বলল, তুমি নেই, তাই আমাব কাছ থেকেই সর্বদা ওব ঘবোযা খবব নেয..

মৃদু-কঠিন স্ববে মা জিজ্ঞাসা কবল, কিন্তু ওকে হঠাৎ এত শাসন কবাব দবকাব হযে পডল কেন?

দিনকতক ভযানক দুষ্টুমি কবছিল আব অবাধ্য হযেছিল, খাওযা দাওযা কবছিল না, স্কুলে যাচ্ছিল না—

তুমি যে ফোনে বলতে, খুব ভালো হযে আছে ও, ওব জন্যে কিছু ভাবতে হবে না?

তেমনি বিব্রত মুখ কবে মাসি জবাব দিল, গোডায ক'টা দিন খুব অবাধ্যপনা কবছিল, এখন আব কবে না...অশান্তিব মধ্যে আব তোমাব ভাবনা বাডাতে চাই নি বলে বলিনি।

জবাবদিহি শোনাব পবেও মাকে একটু তুষ্ট মনে হল না। বাগ সত্ত্বেও ভিতবে ভিতবে আমাব এক ধবনেব আনন্দ হচ্ছে।

মা আবাব আমাব দিকে ভালো কবে ঘুবে বসল। এত দুষ্টুমি কবিস কেন?

বেশ কবি।

আগে মুখেব ওপব এমন কথা কখনো বলেছি কিনা, মনে পড়ে না। অবাধ্য হলে মাযেব দুই ভুরুব মাঝে যেমন বিবক্তিব ভাঁজ পডত, আব চাউনিব মধ্যে যেমন বকুনি মিশে থাকত—তেমনি দেখছি।

ফেব এ-বকম শুনলে খুব বাগ কবব।

পিছনে কিসেব শব্দ হতে ঘুবে তাকালাম। একটা চাকব ছোট টেবিল পেতে দিল, আব একজনেব হাতে মস্ত দুটো খাবাবেব ডিশ। আমাব সাত বছব বয়সের মগজে তক্ষুনি আবাব একটা দুষ্টুমিব ছাপ পড়ে গেল। আমি জানি, এখন কি করলে মা আবো কষ্ট পাবে। কিন্তু তাব আগে আমাব কিছু বুঝে নেবাব আছে।

জিজ্ঞেস কবলাম, কি কবে বাগ কববে, শুনবে কি কবে?

তুই কখন কি কবিস, না কবিস, এখানে বসেই আমি খবব পাব।

তুমি আব বাড়ি যাবে না?

না।

আমাকে এখানে থাকতে দেবে?

মা যেন থতমত খেল একটু। তা কি হয, ওটা আসলে তোবই নিজেব বাড়ি, খুব লক্ষ্মী হযে থাকবি, ভালো কবে পড়াশুনা কবে বড় হবি।

আমি কিচ্ছু হব না, কিচ্ছু না। যা ইচ্ছে তাই কবে বেড়াব, তুমি যত খুশি বাগ কবো। ছিটকে উঠে দাঁড়ালাম, আব সঙ্গে সঙ্গে মাথাব মধ্যে আবো কি যে হযে গেল, কে জানে—এক ধাক্কায ছোট টেবিলেব খাবাব ভর্তি ডিশ দুটো উল্টে ফেলে দিযে ছুটে ঘব থেকে বেবিযে এলাম। সোজা নিচে, তাবপব গেটেব বাইবে।

মালতী মাসিও পিছন পিছন ছুটে এসেছে। খপ কবে একটা হাত ধবেছে আমাব। হাত ছাড়াবাব অজুহাতে আমি সবোষে ঘুবে দাঁড়িযেছি।, মা দোতলাব বাবান্দায বেলিং-যেব সামনে দাঁড়িযে আছে। আমাব দিকেই চেযে আছে। ভেবেছিলাম, হাত নেড়ে আবাব ডাকবে আমাকে। ডাকল না। শুধু চেযেই বইল। আমি মুখ ঘুবিযে নিলাম।

বাড়ি ফেবাব আগেই বোঝা গেল মাসি কত চটেছে আমাব ওপব। সমস্ত পথ একটি কথাও বলল না। সন্ধ্যায বাবাব ঘবেব দিকে যেতে দেখলাম তাকে। কি কথা হল, জানি না, তাব খানিক বাদে বাবা আমাব ঘবে এলো, আগে হলে ওই মুখ আব ওই চাউনি দেখে, ভযে কেঁপে উঠতাম আমি।

কিন্তু আশ্চর্য, সেই মুহূর্তে আমাব ভয ডবেব লেশমাত্র নেই।

মাযেব কাছে গিযে কি বলেছিস? আব অমন অভদ্রতা কবে এসেছিস কেন?

আমি চুপ। বাবাব দিকে চেযে আছি। আমাকে পিটতে এসেছে, তাও বেশ ভালই বুঝতে পাবছি। কিন্তু আমাব সব ভয যেন ঘৃণা হযে কিলবিল করছে ভিতবে।

বাবাব হাত দুটো পিছনে ছিল। সেই হাত সামনে আসতে দেখলাম, মুঠোব মধ্যে তাব শৌখিন চাবুকটা। হ্যাঁচকা টানে আমাকে কাছে নিয়ে এলো।

তাব পবেই আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল একটা। চাবুকসুদ্ধ বাবাব হাত উঠল, নেমেও এলো, তাব আগেই আমি চোখ বুজে ফেলেছিলাম। কিন্তু ওটা আমাব গায়ে না পড়ে শপাং কবে আব কাবো গাযে পড়ল যেন। ভালো কবে কিছু বোঝাব আগেই মালতী

মাসি আমাকে ছিনিযে নিযে সবে গেল। তাবপব দু'হাতে আমাকে জাপটে আগলে বেখে বাবাব দিকে ঘুবে তাকালো।

ছাড়ো বলছি! বাবা চাপা গর্জন কবে উঠল।

আমি অবাক! মাসিব দিকে চেযে আব মাসিব কথা শুনে। এ কি সেই মাসি, ক'দিন আগেও যে ভযে জড়সড় হযে থাকত! মাসিব কালো মুখও বাগে থমথম কবছে। হাত ধবা অবস্থায আমাকে পিছনে বেখে ঘুবে দাড়াল। বলল, ওব মা অনেক জেনেছে, এও জানতে বাকি থাকবে না।

বাবা চেঁচিযে উঠল, আই ডোন্ট কেযাব, তুমি সবো!

মাসি সবল না, নড়ল না। পিছন না ফিবে আমাকে বলল, সুমন চলে যা এখান থেকে—

আমি যতো ত্যাঁদড়ই হই, বযস তো মাত্র সাত। পালাবাব ফাক পেলে কে আব সেধে মাব খেতে চায! পিছনেব দবজাব পর্দা ঠেলে প্রস্থান কবলাম। পিছনেব ঘবটা অন্ধকাব। নিবাপদ ব্যবধানে এসে আমাব পা আব নড়ল না। আলো না জ্বেলে ঘুবে দাঁড়ালাম।

পর্দাব ফাঁক দিযে দু'জনকেই দেখা যাচ্ছে। বাবা আব মালতী মাসি মুখোমুখি দাঁড়িযে। আমাকে বাঁচাতে গিযে চাবুকেব এক ঘা মাসিব ওপব পড়েছে, এখন আবাব কি হয, কে জানে।

মাসিব গলায এই সুবও অদ্ভুত যেন।—হঠাৎ ওকে শাসন কবাব দবকাব হল কেন?

বাবা ঝাঁঝিযে উঠল, তা দিযে তোমাব কি দবকাব?

দবকাব আছে। তখন যা সব বললাম সেটা তোমাকে সাবধান কবাব জন্যে, ওকে শাসন কবাব জন্যে নয। মা চলে যেতে ছেলেটা ভিতবে ভিতবে পুড়ছে, চাবুক নিযে ওব ওপব বিক্রম দেখাতে লজ্জা কবা উচিত।

মাসিব কথা শুনে আমাব কান জুড়োলো বটে, কিন্তু আমি তাজ্জবও তেমনি। মালতী মাসি বাবাকে তুমি কবে কথা বলছে!

সেই বাতেই আবাব মাসিকে অদ্ভুত ভালো লেগেছে আমাব। বাত্রিতে যখন আমাকে ঘুম পাড়াতে এলো, তাব বুকে মুখ গুঁজে পড়ে থাকাব লোভও ভিতবে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল।

আসলে আমাব সব দুষ্টুমি আব শযতানিব লক্ষ্য মা। অর্জুন যেমন আব একদিকে চেযে লক্ষ্যভেদ কবেছিল, আমাব সমস্ত আচবণও তেমনি যে পথেই ধাওযা করুক, আসলে সেগুলো মাযেব বক্ষ ভেদ কবতে চেযেছিল।

দিন গেছে, মাস গেছে, একটা দুটো কবে গোটা ক'যেক বছব ঘুবেছে, কিন্তু আমাব ভিতবটা ঠাণ্ডা হওযাব বদলে সর্বদাই মাকে আঘাত কবতে চেযেছে। মা আমাব খোঁজ খবব কবে, আমাব ভালো শুনলে খুশি হয, মন্দ শুনলে দুঃখ পায, এটা টেব পাওযাব সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ভালোব সঙ্গে আমাব সম্পর্ক ছেঁটে দিতে ইচ্ছে কবেছে। আমি

কি কবলে মা কষ্ট পাবে, যন্ত্রণা পাবে, তাব নতুন নতুন বাস্তা বাব কবতে পাবাটাই যেন মস্ত কাজ।

পবেব পাঁচ-ছ' বছবেব মধ্যে মাযেব কাছে আবো অনেক বাব গেছি। মালতী মাসি যখনই বলে, চল তোব মাযেব ওখান থেকে ঘুবে আসি একটু, তক্ষুনি বুঝতে পাবি, মা আমাকে দেখতে চায। মাসিব বেশি আগ্রহ দেখলে ভিতবেব হাজাব লোভ চেপে না গিযে মাযেব ইচ্ছেটাই যেন ববাবাদ কবে দিযেছি। মা যদি বলে ডাইনে যেতে আমি অবধাবিত বাঁযেব বাস্তা ধবব, যদি বলে উত্তবে হাঁটতে, আমাব পা দক্ষিণে ছোটাব জন্য সুডসুড কববে।

ভিতবেব এই পুঞ্জীভূত আক্রোশ থেকে কোনদিন মুক্তি পাব কিনা, জানি না।

এ-ক'বছবেব মধ্যে একে একে দুটো বাডিতে বাস কবতে দেখেছি, মা-কে। সেই বাডিতে অন্য পুরুষ মানুষও দেখেছি। ব্যাপাবটা বুঝতে আমাব একটুও সময লাগে নি। সেই দুটো বাডিব দুই কর্তাই আমাকে আদব কবে কাছে টানতে চেযেছে। না, তাদেব সঙ্গে সামনাসামনি কোন বকম অভদ্র আচবণ কবতে পাবিনি। সেটা কবেছি মাযেব সঙ্গে। মা কখনো বিবক্ত হযেছে, কখনো বেগে গেছে, কখনো বা অসহায বোধ কবেছে। আমাব ব্যাপাবে মাযেব ভিতবেব প্রতিক্রিযা আমি মুখেব দিকে তাকালে অনুভব কবতে পাবি। বাবো-তেবো বছব মাত্র বযস তখন, আমাব খণ্ডিত সত্তাব বহির্মুখী অংশ ওই বযসটাকে অনেক ছাডিযে গেছে।

একগাদা মন্দ ছেলে আমাব সঙ্গী-সাথী তখন। পাজি ছেলেদেব সঙ্গে মিশলে মা মন্দ বলে, বাবাও বাগ কবে। অতএব ওবাই প্রিয আমাব। তাছাডা সঙ্ঘবদ্ধভাবে শযতানি কবাব মধ্যে এক ধবনেব বোমাঞ্চ আছে। তাবা আমাকে লুকিযে সিগাবেট খেতে শিখিযেছে, মেযেদেব বহস্যেব দিকে তির্যক দৃষ্টি হানতে শিখিযেছে। এদেব মধ্যে সব থেকে পাকা ছেলে জিতু, জিতেন পোদ্দাব। বযসে আমাব থেকে বছব তিনেকেব বড হবে, গাযে শক্তিও বাখে তেমনি। বছব দুই ফেল কবে আমাব সহপাঠী হযেছে। স্কুলেব মার্কামাবা ছেলে হযে উঠেছিল সে এবই মধ্যে। মিশনাবি স্কুল, তাই ফিবিঙ্গী বেক্টব সাহস কবে ওকে স্কুল থেকে তাডাতে পেবেছে। এখন তাব পাডাব স্কুলে ভর্তি হযে আবো মাতব্বব হযে উঠেছে। আমাদেব খুদে দলেব লিডাব সে-ই।

আমাব সঙ্গে খাতিব—কাবণ আমি ওকে সিনেমা দেখা, সিগাবেট আব চপ কাটলেট খাওযাব খবচ জুগিযে থাকি মাঝে মাঝে। কোনো একটা দবকাবেব অজুহাতে টাকা চাইলেই মাসি দেয। আমাব ধাবণা, ধাবণা কেন, আমি ঠিক জানি, মা তাব হাতে আমাব জন্যেই টাকা দেয। আমাব স্কুল-বই-খাতা-জামাকাপড ইত্যাদিব যাবতীয খবচ এখনো নিশ্চয মা দেয বলে বিশ্বাস।

সেই জিতু পোদ্দাব হঠাৎ সকলেব সামনে এক চোখ বুজে আমাকে ডাকল, এই শোন—

কাছে যেতে জিজ্ঞাসা কবল, তোব মা এখন কাব সঙ্গে থাকে বে?

শোনামাত্র আমাব মাথাব মধ্যে কি-যে হযে গেল, কে জানে। আমি পাগলেব মতো ঝাঁপিযে পডলাম ওব ওপব, সঙ্গে সঙ্গে ঘুষি-চড-লাথি।

আচমকা আক্রান্ত হয়ে ও হকচকিয়ে গেছল। কিন্তু এমন মান্যগণ্য লিডার, স্তাবকদের সামনে এ-অপমান হজম করার পাত্র নয় সে। ওর বাবা পর্যন্ত এখন এ-ভাবে গায়ে হাত তুলতে সাহস করে না। সামলে নিয়েই এক ঘুষিতে আমাকে চিৎপাত করে ফেলল।

তারপর...

তারপর আমার মুখ আর মাথা মাটিতে থেঁতলে দিতে লাগল। আমার চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু হিংস্র জানোয়ারের মতো ও আমাকে একেবারে শেষ না করে ক্ষান্ত হবে না বুঝি। আমার নাক-মুখ রক্তে ভাসছে।

কোন রকমে টলতে টলতে বাড়ি ফিরলাম যখন, আমাকে দেখে মাসি আর্তনাদ করে উঠল। তারপর আর আমার কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হতে দেখি, ডাক্তার আমার মাথায় আর কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধছে। পাজি ছেলের সঙ্গে মারামারি করে এই দশা হয়েছে আমার সেটা বাবা নিজেই বুঝে নিয়েছে হয়তো। দাঁত কড়মড় করে বলে উঠেছে, শিক্ষা হয়েছে তো? বেশ হয়েছে, আর মিশতে যাবি ওই সব ছেলের সঙ্গে?

পারলে বাবা আমাকে ধরে আর একপ্রস্থ লাগায়।

জিতুর সঙ্গে মারামারির কারণটা মাসিকে বলেছি। জানি, মাসিকে বললেই মায়ের কানে যাবে। আমার সর্বব্যাপার সে মা-কে বলে থাকে। আমি চাই, মা-ও শুনুক। দিন কতক বাদে যখন মায়ের সঙ্গে দেখা, তখনো আমার মাথার আর কপালের দু'তিন জায়গায় পট্টি। মা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল খানিক। কি হয়েছে বা কেন হয়েছে, একটি কথাও জিজ্ঞাসা করল না বলেই ভিতরে ভিতরে এক ধরনের নিষ্ঠুর আনন্দ আমার। মাসি বলেছে, কেন কি হয়েছে সবই বলেছে।...ও ক্ষত সারাবার জন্য পরে মস্ত সার্জন এসেছে, মাথার এক্সরে করা হয়েছে। এ-সব কার তাগিদে আর কার টাকায় হয়েছে, তা আমি এখন বুঝতে পারছি।

মা শুধু বলেছে, তুই ও-সব ছেলের সঙ্গে মিশিস কেন?

এটুকুর মধ্যেই আমার জন্য তার উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে। তাইতেও ক্রুর আনন্দ আমার, অঘটন এর থেকে বেশি হলেও অখুশি হতাম না বোধ হয়। ভালো মুখ করে বলেছি, কেন, জিতু তো বেশ ভালো ছেলে, যেমন সাহস তেমনি গায়ের জোর— আমারই খামোখা বিচ্ছিরি রাগ হয়ে গেল বলে ও-রকম হল।

মা চুপ। আর একটি কথাও বলে নি। মুখের দিকে চেয়ে আমার ভিতরের বয়সটা যে অনেক এগিয়ে গেছে, তাই যেন অনুভব করেছে।

ওই তেরো বছর বয়সেই বুকের তলায় আবার একটা আকস্মিক ক্ষত সৃষ্টি হল। আমি যদি ডাক ছেড়ে কাঁদতে পারতাম, মাটিতে মাথা ঠুকতে পারতাম, তাহলে আবার হয়তো স্বাভাবিক হয়ে ওঠা সহজ হত। আমার খণ্ডিত সত্তা, যে ওই সাত বছর বয়সের মধ্যে আটকে আছে, সে তাই করছে। কিন্তু আমি তা পারি না। সেইজন্যেই আমার ক্ষোভের শেষ নেই, দুর্ভোগের অন্ত নেই।

মালতী মাসি চলে গেছে। আমি দ্বিতীয় বার মা হারিয়েছি।

কিছুদিন ধরেই খুব গম্ভীর দেখছিলাম তাকে। বেশ বিমনাও। মাঝে মাঝে আমার দিকে কি-ভাবে যেন চেয়ে থাকত। দুটো চোখের করুণ তৃষ্ণা আমার শরীরটাকে যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেত। রাতে ঘুম পাড়াতে এসে গল্প করে না। আমি ঘুমিয়ে পড়েছি মনে হলে খুব আলতো করে আমাকে বুকে চেপে রাখে, যাতে আমার ঘুম না ভাঙে।

মাসি একদিন বলল, হ্যাঁ রে, যদি আমি আর না থাকি, তোর খুব কষ্ট হবে?

আমি ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাবে?

যদি যাই কোথাও। ধর, যদি মরেই যাই—

সে তো আমিও না থাকতে পারি, আমিও মরে যেতে পারি।

বালাই ষাট। মাসি দু'হাতে আঁকড়ে ধরল আমাকে। আমি বাধা দিলাম না। সেটাই যেন তার সুখের ব্যাপার কিছু।

জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ও-কথা বললে কেন?

এমনি।

এমনি কক্ষনো না, কি হয়েছে তোমার বলো? তুমি হঠাৎ ভয়ানক বদলে গেছ।

খানিক চুপ করে থেকে বলল, মনটা একটু খারাপ রে, তোর নতুন মা আসছে, তোর জন্যই ভাবনা হয়।

আমি হতভম্ব খানিকক্ষণ। কথাটা বোঝার মত বয়স বা বুদ্ধি হয়েছে। নতুন মা আসছে মানে বাবা আবার বিয়ে করছে। নাড়াচাড়া খাবার মতই খবর বটে একটা। কিন্তু তার জন্য মাসির এত ভাবনাচিন্তার কারণ কি, সেটাই আমার কাছে স্পষ্ট নয় খুব। অথচ এখন যেন মনে হচ্ছে, দিন কতক ধরে মাসির সঙ্গে বাবার বাক্যালাপও বন্ধ।

বললাম, তাতে তোমার কি, আর আমার জন্যে তোমার ভাবনাই বা হবে কেন?

মাসি জবাব দিল, তোর নতুন মা এসে আমাকে এ-বাড়িতে না থাকতে দিতে পারে।

আমার হাসি পেল, মাসি আমাকে কি ছেলেমানুষই ভাবে। বললাম, নতুন মা তাড়াবার কে, আমরা বাবার খাই, না পরি, না বাবার বাড়িতে থাকি?

মাসি সচকিত হঠাৎ। এ-সব কথা তোকে কে বললে?

কে আবার বলবে। তুমিই কত সময়ে গল্প করেছ। মায়ের টাকা ভেঙে বাবার ব্যবসা, বাড়িও মায়ের, আর তোমার হাতে মা যে মাসে মাসে টাকা দেয়, সেও আমি খুব ভালোই বুঝি।

মাসি হাঁসফাঁস করে উঠল, কক্ষনো আমি তোর কাছে এ-সব গল্প করি নি।

কিছু কিছু করেছ, আর কিছুদিন আগে বাবাকে তুমি এই সব বলে শাসাচ্ছিলে, আমি নিজের কানে শুনেছি। বাবা তখন মদ খাচ্ছিল—

মাসি চুপ একেবারে।

আমি তাকে আশ্বস্ত করার জন্য বললাম, যেই আসুক, তোমার কোনো ভাবনা নেই, কোন রকম অসুবিধে হলে তুমি মা-কে জানাবে, ব্যবস্থা যা করার মা-ই করবে।

না বে না, মাসি হঠাৎ বিকাবেব বোগীব মতো আমাকে দু'হাতে আঁকডে ধবে বলে উঠল, তোব মাকেও আব আমি মুখ দেখাতে পাবব না। সব আমাব পাপেব ফল। সব আমাব লোভেব ফল। তোদেব কত ক্ষতি আমি কবেছি তোবা জানিস না। তোবা কিছু জানিস না।

আমি বিস্ময়ে বোবা খানিকক্ষণ। মাসি কাঁদছে, টেব পাচ্ছি। উঠে আলো জ্বেলে তাব মুখখানা দেখতে ইচ্ছে কবছে।

বহুক্ষণ বাদে আমি ঘুমিয়েছি মনে কবে মাসি আস্তে আস্তে উঠে চলে গেল। এই প্রথম আমাব মনে হল, শুধু এই একটা বাতেব জন্য মাসি মাযেব জাযগা নিলে, মাযেব জাযগায ঘুমিয়ে থাকলে, আমাব তেমন খাবাপ লাগত না। কিন্তু আমি তাকে ডাকতে পাবি নি।

আজও বহুক্ষণ জেগে ছটফট কবেছি। মাসি কি বলে গেল, বুঝতে চেষ্টা কবেছি। যে সব ছেলেদেব সঙ্গে আমি মিশি তাদেব সঙ্গগুণে বাবাব সঙ্গে মাসিব মাঝেব ক'টা বছব খাতিবেব অর্থটা এখন আব একটু স্পষ্ট আমাব কাছে। কিন্তু সে তো আমাব মা-ও জানে, সেই প্রথমবাবেব দেখায বাগেব ঝোঁকে আমি ফাঁস কবে দিয়েছিলাম। কিন্তু মা তো তাব পবেও আমাব যাবতীয ব্যাপাবে তাকেই বিশ্বাস কবেছে, তাব ওপবেই আমাব সমস্ত ভাব দিযে নিশ্চিন্ত থাকতে চেষ্টা কবছে।...তাহলে মাসি মা-কেও আব মুখ দেখাতে পাববে না, বলছে কেন? কোন পাপ আব কোন লোভেব ফল বলছিল মাসি? আমাব বা মাযেব এখনো কি জানতে বাকি।

দূবে কোথা থেকে একটা সানাইযেব শব্দ ভেসে এলো কানে। আমি চমকে উঠলাম। ...স্কুল থেকে এসে পর্যন্ত বাবাকে দেখি নি। বাতেও দেখি নি। সন্ধ্যাব পব বাবা তো বাইবে থাকে না বড। নিজেব ঘবে বসে মদ খায।...আজ কোনো বিযেব দিন নাকি?

উঠলাম। ঘবেব আলো জ্বাললাম। বাবাব আব আমাব ঘবেব মাঝেব দবজা আবাব আমিই বন্ধ বাখতুম। সেটা খুললাম। বাবাব ঘব অন্ধকাব। ভিতবে ঢুকে সুইচ টিপলাম।

ঘবে কেউ নেই।

কত বাতে ঘুমিয়েছিলাম, জানি না। সকালে উঠে মালতী মাসিকে কোথাও দেখলাম না। আমাব বুকেব ভিতবটা ছ্যাৎ কবে উঠল। একটা চাকবকে জিজ্ঞেস কবতে সে জানালো, খুব ভোবে উঠে মালতী মাসি ট্যাক্সি ডাকিয়ে কোথায চলে গেছে। সঙ্গে তাব স্যুটকেস আব ছোট একটা বিছানা ছিল।

একদিন স্কুল থেকে ফিবে এসে মা-কে দেখি নি। আজ ঘুম ভেঙে উঠে মালতী মাসিকে দেখলাম না।

আমাব খণ্ডিত সত্তাব সাত বছবেব দিকটা ডুকবে কেঁদে উঠতে চাইল। আব তেব বছবেব আমি সুমন সবকাব তাব টুঁটি চেপে ধবলাম।

মাযেব টেলিফোন নম্বব আমাব জানা ছিল। কিন্তু এতদিনেব মধ্যে সেধে কখনো ফোন কবি নি। আজ এই প্রথম একটু বেলা হতে মাকে টেলিফোনে ডাকলাম।

আমি সুমন। মাসি খুব ভোবে বাডি ছেডে চলে গেছে।

সে কি রে। মায়ের গলার স্বরেই বোঝা গেল, মাসি তাকেও গোপন করেই গেছে, কোথায় গেল?

জানি না। কাল রাতে আমাকে বলেছিল, তোর নতুন মা আসছে। বাবা কাল থেকে বাড়ি নেই, আজ নতুন মাকে নিয়েই বাড়ি ফিরবে বোধ হয়।

ও-দিকের সাড়াশব্দ নেই, অর্থাৎ মা স্তব্ধ।

খানিকক্ষণ বাদে গলা শোনা গেল, গাড়ি পাঠাচ্ছি, তুই আয় একবার।

না।

টেলিফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলাম।

মালতী মাসির গত রাতের স্পর্শটা আমাকে ছেঁকে ধরে আছে, আর তার কান্না-ভরাট কথাগুলো কানে লেগে আছে। আমি শুধু ভাবছি আর ভাবছি, ভাবছি। ভিতরের যে অবুঝটা অব্যক্ত যাতনায় ছটফট করছে, তাকে আমল দিচ্ছি না। শুধু ভাবছি, মাসি কোন পাপ আর কোন লোভের কথা বলল গত রাতে?

কোনো হদিস মেলে নি। পরে পরিণত বয়সে একটা সম্ভাব্য সমাধান আমার মাথায় এসেছে। সেটাই সত্য বলে বিশ্বাস।

মায়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ির আগে বাবার সন্দেহ আর ঈর্ষা রোগের আকার নিয়েছিল। মা বাইরে শুটিং-এ গেলে মাসি সঙ্গে থাকত, স্টুডিওতেও যেত মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে। মনে হয়, বাবার ওই সন্দেহ আর ঈর্ষা রোগের রসদ মাসিই জুগিয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্য, ধারণাটা সত্যি হলেও মালতী মাসির ওপর আমার এতটুকু রাগ নেই, ক্ষোভ নেই। বরং অফুরন্ত মায়া তার ওপর।... যেখানেই থাকুক, যদি থাকে আজও তার বুকের যন্ত্রণা জুড়োক।

বলা বাহুল্য, শুরু থেকেই নতুন মা-টিকে আমি একটুও সুনজরে দেখি নি। এ-বাড়িতে তার প্রথম পদার্পণের রাতেই তাকে তেরো বছরের ছেলের বিদ্রোহ মূর্তি দেখতে হয়েছিল। সেই ছেলের ভিতরের বয়স কত, সে জানবে কি করে?

বিদ্রোহের ফলও বাবা হাতে হাতেই দিয়েছিল। কিন্তু সে আমার গায়ের ধুলো।

সন্ধ্যার ঠিক পরেই নতুন মানুষ সঙ্গে নিয়ে বাবা বাড়ি ফিরেছে। দোতলা থেকে দেখে আমি নিজের ঘরে ঢুকে গেছি।

একটু বাদে হাসি-হাসি মুখে বাবা ঘরে ঢুকল। পিছনে সেই একজন। আমার পড়ায় অখণ্ড মনোযোগ। বাবার গলার এমন মোলায়েম স্বর আর শুনি নি, বলল, সুমন, দেখ কে এসেছে—তোর নতুন মা।

বই থেকে মুখ তুলে আমি ফিরে তাকালাম। নতুন মায়ের সঙ্গে চোখাচোখি হল। হাসি-মাখা বেশ সুন্দর মুখখানা। কিন্তু ও-সব দেখার চোখ নয় আমার তখন। অবশ্য কি দেখছি, তাও জানি না।

তুমি ওর সঙ্গে কথা বলো। বাবা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

নতুন মা হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে এগিয়ে এলো। চেয়ার ঘেঁষে দাঁড়াল। একটা সুঘ্রাণ নাকে এলো আমার। গলায় মোটা ফুলের মালা আর সেন্টের মিষ্টি গন্ধের মিশেল।

তুমি সুমন?

আমি· সামান্য মাথা নাড়লাম কি নাড়লাম না। দেখছি। বছর ছাব্বিশ সাতাশের বেশি বয়স হবে না, মায়ের এখন বত্রিশ। মায়ের থেকে স্বাস্থ্যও খারাপ। মায়ের থেকে ফর্সা আর বেশ সুশ্রীও, কিন্তু মায়ের মতো মিষ্টি মুখ নয়, চোখ তো নয়ই।

হঠাৎ নিজের ওপরেই কেমন রাগ হয়ে গেল আমার। একে দেখামাত্র মায়ের সঙ্গে তুলনা কেন?

তুমি আমাকে দেখে একটুও খুশি হও নি তো?

জবাব না দিয়ে আমি বইয়ের দিকে চোখ ফেরালাম। নতুন মা আরো একটু কাছে এলো। হাত বাড়িয়ে বইটা তুলে নিল, দেখল কি বই, তারপর আবার সেটা সামনে রাখল।

আমাদের সময় অ্যালজেব্রা পড়তে হত না, খাতায় কষতে হত, তোমাদের বুঝি মন দিয়ে অ্যালজেব্রা পড়তে হয়?

আমি আবার ফিরে তাকালাম। বললাম, পড়তে হয় না, আসলে আমার এখন তোমার সঙ্গে গল্প করার ইচ্ছে নেই।

দু'চোখ আমার মুখের ওপর থমকে রইল একটু। তারপর আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল। তার দোষ নেই, সে আমাকে তের বছরের একটা ছেলেই ভেবেছিল শুধু।

মালতী মাসি নেই, মালতী মাসি আর এ-বাড়িতে কোনদিন আসবে না, আমার রাতে ঘুমুবার সময় আর কোনদিন পাশে থাকবে না— ভিতরের এই ক্ষুব্ধ যন্ত্রণাটা নতুন করে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল।

বাবা মনের আনন্দে নতুন মা-কে বাড়ি-ঘর দেখাচ্ছে। নীচের তলায় ঘুরে এলো, দোতলার সব ক'টা ঘরে চক্কর খেলো, ছাতেও ঘুরে এলো নতুন মা-কে নিয়ে। তারপর নিজের ঘরে ঢুকল। ঘণ্টা দুই কাটল সবসুদ্ধু।

কিন্তু এর মধ্যে বাবা একবারও মালতী মাসির খোঁজ করল না। বিয়ে করে বাবার কি এত আনন্দ হয়েছে যে মালতী মাসি বাড়ি নেই তা খেয়ালও করল না। এত বছর ধরে, মা যাবার আগের থেকেও এ-বাড়ির কর্তৃত্ব বলতে গেলে মালতী মাসির হাতে, সে বাড়ি নেই, বাবার চোখেও পড়ল না এতক্ষণে?

আমার মন বলছে, তা হতে পারে না। আমার মন বলছে, বাবা খুব ভালো করে জানে মাসি নেই, মাসি আর আসবে না। কি করে জানল? তাহলে বাবাই কি তাড়িয়েছে মাসিকে? বিয়ে করতে যাবার আগে বলে গেছে ফিরে এসে যেন এ-বাড়িতে তোমাকে আর না দেখি?

সেটা সম্ভব কি অসম্ভব জানি না। আমার মাথায় আগুন জ্বলছে। সামনের আবছা অন্ধকার বারান্দায় এসে পায়চারি করতে লাগলাম- বাবার ঘরের দোর পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসছি। উদ্দেশ্য, বাবার চোখে পড়ুক।

পড়ল। ডাকল, সুমন এ-দিকে আয়—

ঘরে ঢুকলাম। নতুন মা খাটের একদিকে বসে। আমার দিকে তাকালো কিন্তু কাছে ডাকতে সাহস করল না।

নতুন মাযেব সঙ্গে ভাব হযেছে তো? তোকে খুব ভালোবাসবে, দেখিস—

সে কথায কান না দিযে সোজা বাবাব দিকে তাকিযে আমি বললাম, মালতী মাসি খুব ভোবে বাড়ি থেকে চলে গেছে, আব ফেবে নি— ট্যাক্সিতে তাব বাক্স আব বিছানাও নিযে গেছে।

নতুন মা ঈষৎ বিস্মযে বাবাব দিকে তাকিযেছে। বাবাব মুখখানা দেখাব মতো তখন। গম্ভীব কিন্তু ভিতবে-ভিতবে যেন ধড়ফড় কবছে।

ঠিক আছে, খেযেদেযে শুযে পড়ো গে।

বেবিযে এসে নিজেব ঘবেব সামনে বাবান্দাব বেলিং ধবে দাঁড়ালাম। মাথাব মধ্যে তখনো কত আগুন জ্বলছে আমাব, কেউ কল্পনা কবতে পাববে না। একটু বাদে আবছা অন্ধকাব বাবান্দায ছাযা পড়ল। নতুন মা পাযে পাযে আমাব দিকেই এগিযে আসছে। আমাব পাশ ঘেঁষে দাঁড়াল। অস্ফুট মৃদু স্ববে জিজ্ঞাসা কবল, মাসি চলে গেছে বলে তোমাব খুব মন খাবাপ বুঝি?

আমি জবাব দিলাম না। সুযোগেব প্রতীক্ষায আছি। বাবাব সামনে যেটুকু বলে এসেছি, তা যেন কিছুই নয। সকলেব সুখ-শান্তি তছনছ কবে দেবাব মতো ভিতবটা গনগন কবছে আমাব।

তেমনি মৃদুস্ববে নতুন মা আবাব জিজ্ঞাসা কবল, মালতী মাসি কে? তোমাব নিজেব মাসি?

যে সুযোগেব অপেক্ষায ছিলাম সেটাই যেন এগিযে এসেছে। সাত বছবেব বযসে না বুঝে শুধু ক্ষোভেব মুখে মা-কে যেকথা বলেছিলাম, তোবো বছব বযসে নতুন মা-কে অনেকখানি বুঝেই সেই কথা বলে দিলাম।...তেবো বছব বযসটা ও বড় কবে দেখবে না, অবোধ ছেলেমানুষই ভাববে, কিন্তু ধাক্কাটা যেখানে লাগাব ঠিক গিযে লাগবে।

না, মাযেব বন্ধু। আমাব জন্মেব আগে থেকে এ-বাড়িতে থাকত। মা চলে যাবাব পব বাবাব সঙ্গে খুব ভাব হযেছিল কিন্তু তুমি আসবে বলে এখন বাবাই বোধ হয মাসিকে তাড়িযেছে বাড়ি থেকে!

হঠাৎ হ্যাঁচকা টানে কে আমাকে টেনে নিল পিছন থেকে। নতুন মা-ও চমকে ঘুবে দাঁড়াল। বাবা। ঘাড় ধবে আমাকে ঘবেব মধ্যে এত জোবে ঠেলে দিল যে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে বেঁচে গেলাম।

কিন্তু এ-অপমান গাযে একটুও লাগল না আমাব। সকাল থেকে আমাব মাথাব মধ্যে যে শযতান দাপাদাপি কবছিল, এতক্ষণে সে বুঝি একটু ঠাণ্ডা হযেছে।

দিন তিনেকেব মধ্যে আব এক ব্যাপাবেব সূত্রপাত। সে আমাব কাছে এক উপভোগ্য প্রহসন। সকালে মস্ত ঝকঝকে গাড়ি হাঁকিযে এক অপবিচিত ভদ্রলোক বাড়িতে হাজিব। আমি তখন নিচেব বসাব ঘবেই ছিলাম।

ভদ্রলোক এসে বাবাব খোঁজ কবল, বাবা আছে শুনে একটা কার্ড আমাব হাতে দিযে তাকে খবব দিতে বলল। আমি পা বাড়াবাব আগেই জিজ্ঞাসা কবল, তুমি সুমন সবকাব?

আমি মাথা নাড়লাম।

ঠিক আছে, বাবাকে খবর দাও।

যেতে যেতে কার্ডটা উল্টে দেখলাম, নামের নিচে লেখা আছে, 'অ্যাটর্নি'। একটু বাদে কার্ড হাতে বাবা অবাক মুখে নিচে নেমে এলো। আমারও হঠাৎ কৌতূহল কেমন .ভদ্রলোক আমার নাম জানল কি করে। আমিও বসার ঘরের পিছনে এসে দাঁড়ালাম।

তারপর উৎকর্ণ হয়ে ভদ্রলোকের সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শুনলাম। সে বিপাশা দেবীর অ্যাটর্নি, এই বাড়ির যাবতীয় স্বত্ব বিপাশা দেবী আগামীকাল নাবালক সুমন সরকারের নামে দান-পত্র করে দিচ্ছেন। যতদিন না সুমন সরকার সাবালক হচ্ছে ততোদিন সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব বিপাশা দেবীর নিজের হাতেই রাখছেন।

এ-সব আমাকে বলার কারণ? বাবার গম্ভীর গলা।

অমায়িক সুরে ভদ্রলোক জবাব দিল, বিপাশা দেবী আপনাকে খবরটা জানিয়ে রাখতে বলেছেন, তাই।

আচ্ছা, ঠিক আছে।

বাবা ঘর থেকে বেরুবার আগেই আমি ছুটে ওপরে চলে এলাম। বেশ উত্তেজনা বোধ করছি। খবরটা কোনো ফিকিরে নতুন মা-কে জানিয়ে দিতে পারলে বেশ হত। নতুন মা আবার তখন আমার ঘরে দাঁড়িয়েই সাগ্রহে দেয়ালে টাঙানো মায়ের ছবি দেখছে। তার এ আগ্রহ এরই মধ্যে আরো অনেকবার লক্ষ্য করেছি। আর তার মুখ দেখে আমি কল্পনা করে নিয়েছি, বাবার ওপর ভিতরে ভিতরে অন্তত এই নতুন মা সদয় নয়, সদয় হতে পারে না।

পরদিন বাড়ি আমার নামে রেজিস্ট্রি হবার কথা। হয়েছে নিশ্চয়। তার পরদিন আমি এলাম মায়ের কাছে। মা ডাকে নি, নিজে থেকে এসেছি। মায়ের দুর্বলতা আমার জানা হয়ে গেছে, সেটাই আমার মস্ত জোর—বাড়ি আমার নামে লিখে দিয়েছে বলেই আমি তাকে রেহাই দেব। অমন শর্মা সুমন সরকার নয়।

আমাকে দেখে মা খুশি আবার উতলাও একটু। মুখের দিকে চেয়ে মায়ের ভিতরটা আজকাল অনেক বেশি দেখতে পাই আমি।

কার সঙ্গে এলি, একলা নাকি?

মাথা নাড়লাম, তাই।

বাসে এলি?

ট্রামে।

একা এভাবে ট্রামে-বাসে আসবি না, যখন আসতে ইচ্ছে হবে, ফোন করে দিবি, গাড়ি যাবে। আর এরকম হঠাৎ আসতে ইচ্ছে হলে ট্যাক্সি নিবি।

ট্যাক্সির পয়সা পাব কোথায়?

মা থমকালো একটু। মালতী মাসি নেই, নতুন করে মনে পড়ল বোধহয়। বলল, বাজে খরচ করবি না কথা দিলে তোর হাতে আমি কিছু টাকা দিয়ে রাখতে পারি।

ঠোঁট উল্টে জবাব দিলাম, তোমার টাকা নিতে যাচ্ছে কে।

বাগত মুখে মা বলল, বেইমান কোথাকাবেব।

এতকাল ধবে যে মাসিব মাবফত আমাব সব খবচ সে-ই চালিযে আসছিল, সে-কথা মুখে বললে না। একটু বাদে জিজ্ঞাসা কবল, বাডিব খবব কি?

ভালই তো।

নতুন মা কেমন?

খুব চমৎকাব। হঠাৎ দশগুণ বাডিযে বলাব ঝোঁক চাপল কেন, জানি না। আব পবীব মতো দেখতে একেবাবে।

আমাব ধাবণা—নতুন মাযেব সঙ্গে কোনকালেও দেখা হবে না। এই নির্জলা উচ্ছ্বাসেব মধ্যেও মাযেব চোখে যেন কিছু গলদ ধবা পডল। সন্দিগ্ধ সুবে জিজ্ঞাসা কবল, চমৎকাব বুঝলি কি কবে, তোকে আদব যত্ন কবে?

কবতে আসে। আমি পাত্তা দিই না।

মা আবাব খানিক চুপ কবে থেকে জিজ্ঞেস কবল, মাসি নেই, সময়মতো চান-খাওয়া-দাওয়া সব কবিস তো?

জবাব দেওয়াব দবকাব বোধ কবলাম না। মাসি না থাকাব ক্ষতটা বুকেব তলায় এখনো দগদগ কবছে।

একটু ভেবে মা বলল, তোকে যদি খুব ভালো কোনো হস্টেলে বেখে দিই, থাকবি?

কেন?

কেন আবাব কি, ভালো হযে থাকবি, পডাশুনা কববি।

আমাকে হস্টেলে বেখে বাবাকে ওই বাডি থেকে তাডাবে?

মা সত্যিই অবাক।—তাডাব কেন?

তাহলে বাডি আমাব নামে দানপত্র কবলে? বাবা এমন কি দোষ কবেছে, তাকে ছেডে এসে তুমি দু'-দ'বাব বিযে কবলে, বাবা তো শুধু একবাব কবেছে—

মনে হল, মা এই বুঝি আমাব গালে ঠাস কবে চড বসিযে দিল একটা। তা কবল না, ঠাণ্ডা চোখ দুটো আমাব মুখেব ওপব চক্কব খেল এক প্রস্থ। তাব তেব বছবেব ছেলে অকালে কত পেকেছে, তাই যেন নতুন কবে অনুভব কবল। তাবপব গম্ভীব মুখে ঘব ছেডে চলে গেল।

একটু বাদে আবাব ফিববে জানি। ঝি বা চাকবেব হাতে থালা ভর্তি খাবাব থাকবে। আমি সামনে বসে খেলে মা খুশি হয, নির্নিমেষে দেখে চেযে চেযে।

আজ সে-সুযোগ দিলাম না। উঠে নিঃশব্দে বেবিযে এলাম গেট পাব হযে, ফিবে তাকালাম একবাব। ঠিকই অনুমান কবেছি, বাবান্দাব বেলিং-এ দাঁডিযে—আমাব দিকেই চেযে আছে। গম্ভীব কিন্তু অসহায মুখ। ভেবেছিলাম, ডাকবে।

ডাকল না।

*　　　　*　　　　*

ঘৃণা, বিদ্বেষ বা প্রতিশোধেব নেশা আসলে বোধ হয নিজেবই অগোচবেব উন্মাদ দশা কিছু। নইলে বুকেব তলায় ওই আগুন জ্বেলে বসলে সর্বক্ষণ নিজেকেই দগ্ধায কেন? প্রতিহিংসাব অর্ন্তদৃষ্টি নেই। নখদন্ত মেলে সে ঝাঁপিযে পডাব ছল খোঁজে আব তাবপব

অন্ধ আক্রোশে নিজেকেই ছিন্নভিন্ন করে। তোমার ঘৃণা, তোমার বিদ্বেষ, তোমার হিংসার শিকার তুমি নিজেই।

এখন বয়স আমার একুশ। চোদ্দ বছর ধরে বিয়োগান্ত নাটকের নায়কের মতই একটা আত্মহননের অমোঘ নেশা আমাকে পেয়ে বসেছে, সেটা মাঝে মাঝে অনুভব করলেও তার থেকে অব্যাহতি নেই।

বাইরে আমি ঠিক তেমনিই আছি, কিন্তু ভিতরটা আরো অনেক গুণ উগ্র আর অশান্ত। একই বাড়িতে বাবা আর আমি দু'টি বিভিন্ন প্রবাসী প্রাণী বাস করছি যেন। সামনাসামনি পড়ে গেলেও একজন আর একজনের পাশ কাটিয়ে চলা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। আরো চার-পাঁচ বছর আগে থেকেই বাবা অনুভব করেছে, আমি তার শাসনের আওতার বাইরে চলে গেছি। আর আমার দিক থেকে বাবার সঙ্গে সম্পর্ক শুধু টাকার। সঙ্গী-সাথীর কল্যাণে টাকার চাহিদা আমার কম নয়। নিঃশব্দে তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে হলে টাকার জোরটা একটা বড় জোর। দরকার হলেই নতুন মাকে জানিয়ে দিই, অত টাকা চাই। নতুন মা ভিতরে ভিতরে শঙ্কা বোধ করলেও মুখে কিছু বলে না। এনে দেয়। টাকা দিতে বাবার অসুবিধে হবার কথা নয় কারণ তার ব্যবসা পুরোদমে চলছে। এখন নতুন মায়ের জন্যেও আলাদা একটা গাড়ি কিনে দিয়েছে। কিন্তু ছেলের হুকুম মতো বাবার টাকা বার করে দিতে একটু আপত্তি বোধ হয়। মা আমার জন্য টাকা চাইতে গেলে তার চাপা তর্জন গর্জন একটু আধটু কানে আসে। কিন্তু আমাকে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে না বা ঘাঁটায় না কখনো। টাকা দিয়ে দেয়। কারণ আমার টাকা চাওয়ার মধ্যে প্রচ্ছন্ন জোরের দিকটা বাবা অনুভব করে বোধ হয়।

নতুন মা আমার জীবনে কোনো সমস্যা নয়। আমার কাছে অনেকখানি নিষ্প্রভ অস্তিত্ব তার। নতুন মা আমাকে ভালবাসে কি না জানি না, কারণ ভালবাসার তেমন সুযোগ তাকে কখনো দিই নি। সে আমাকে সমীহ করে, আমি কার ছেলে, সেটা ভোলে না কখনো। এখনো আমার মায়ের মস্ত অনুরাগিণী ভক্ত এই নতুন মা-টি। সুযোগ সুবিধে পেলেই মায়ের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে, আর যেতে আসতে মায়ের পায়ে ঢিপ ঢিপ প্রণাম করে। না, মালতী মাসিকে সরিয়ে সে এ-সংসারে এসেছে বলে আমার মনে কোনো ক্ষোভ নেই। সঙ্গতভাবে চিন্তা করলে বরং মায়া হবার কথা। নিতান্ত গরিব ঘরের বি-এ পাশ মেয়ে, তার বাপ বাবার কারখানায় সাধারণ চাকরি করত একটা। বাবার শ্বশুর হয়ে বসার পর থেকে অবশ্য কিছুটা অসাধারণ হয়েছে। ঘোড়া-রোগ ছিল ভদ্রলোকের, মাইনের টাকার অর্ধেকের বেশি রেসের মাঠে যেত, ফলে ধার-দেনায় মাথা বিকিয়েছিল। তার স্ত্রী চিঠি লিখে বাবাকে অনুরোধ করেছিল, মাইনের টাকা যেন স্বামীর হাতে না দেওয়া হয়। মাস-কাবারে এই নতুন মাকে পাঠিয়ে দিত বাপের মাইনের টাকা আনতে। আমার বাবার সামনে বাপ সই করত আর মেয়ে টাকা নিত। মাত্র মাস কয়েকের ওই যোগাযোগের পরেই বাবা ওই মেয়েকে ঘরে নিয়ে এসেছে। নতুন মায়ের বাপের বাড়ির মানুষেরা সেই জন্য আমার বাবার প্রতি কৃতজ্ঞ। মনে হয়, অবস্থার দিক বিবেচনা করলে নতুন মা-ও অকৃতজ্ঞ নয়। কিন্তু

কৃতজ্ঞতা আর প্রেমপ্রীতি ভিন্ন জিনিস। বাবাকে কোনো মেয়ের মনে ধরতে পারে, এ আমার বিশ্বাস হয় না। আমার মায়ের প্রতি নতুন মায়ের আকর্ষণটা বরং ঢের খাঁটি মনে হয়। আর মাও তাকে কিছুটা স্নেহ আর বিশ্বাস করতে পেরে খুশি। কারণ, আজও তার দায় আমি। আমাকে কেন্দ্র করেই তাদের মধ্যে একটা হৃদ্যতা গড়ে উঠেছে। আমার ব্যাপারে মা আগে মালতী মাসির ওপর নির্ভর করত, এখন নির্ভর করছে নতুন মায়ের ওপর। নির্ভর আর বিশ্বাস করতে যে পেরেছে, এ-টুকুই নতুন মায়ের সত্যিকারের গুণ বলতে হবে। এ-দিকে তার সচলতা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই।

কিন্তু আমি বিচ্ছিন্ন সকলের কাছ থেকে। আমার খণ্ডিত সত্তা অশান্ত ক্ষোভে আজও ঠিক তেমনি করেই মাথা খুঁড়ে মরছে।

মা আবার একটা আলাদা বাড়ি করেছে। নিজস্ব বাড়ি। তার জীবনের তৃতীয় ভদ্রলোকটিকেও সরে যেতে হয়েছে। মা আমার বাবাকে বরদাস্ত করতে পারে নি, জানি। অপর দু'জনকে পারল না কেন, জানা নেই। মায়ে নিজের একান্ত রুচিবোধের ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে, মনে হয়, অন্য সকলের ক্ষেত্রে সেটাই শেষ পর্যন্ত অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই চল্লিশ বছর বয়সেও মায়ের অভিনয়জীবনের জৌলুসে টান ধরে নি, ওই জগতে এখনো অনন্যা সে। কিন্তু ব্যক্তিজীবনে তার আর কোনো আগন্তুক আসবে বলে মনে হয় না। নতুন বাড়ি করার পর আমাকে অনেকবার অনুরোধ করেছে, এখানে চলে আয় না, তোতে আমাতে থাকি।

একদিন আমি হাসি-মুখে জবাব দিয়েছিলাম, অনেক দেবি করে ফেলেছ মা, অনেক দেরীতে ডাকলে। তোমাকে একটা মরা ছেলের মা হিসেবে দেখতেই আমার বেশি ভালো লাগে।

তারপর আর এই অনুরোধ করে নি।

গোটা তিনেক আয়া আর ঝি, আধ-বয়সী একটা চাকর, আর গেটে প্রহরারত একটা দরোয়ান নিয়ে মা তার নতুন বাড়িতে একলা থাকে এখন। না, একলা বলছি কেন, যশোদাও তো সেই থেকেই মায়ের সঙ্গে থাকে।

আমার সতের বছর বয়স থেকে মায়ের কাছে যশোদাকে দেখছি। ওর বছর বারো বয়স তখন। ফ্রক পরত। কিন্তু বয়সের তুলনায় বাড়ন্ত গড়ন বলে পনের বছরে পা দেবার আগেই শাড়ি ধরেছে। মাঝ বয়সে পরলোকগতা এক মাঝারি গোছের নামী অভিনেত্রীর মেয়ে যশোদা। মারা যাবার আগে মেয়েকে মায়ের হাতে সঁপে দিয়ে যায়। সেই থেকে মায়ের কাছেই আছে। বাড়িতে দু'জন মাষ্টার রেখে মা ওকে লেখাপড়া শেখাচ্ছে। আবার কয়েকটা ছবিতে ওকে ছোটখাট পার্ট করতেও দেখা গেছে। অনেকের ধারণা মায়ের কাছে আছে যখন, কালে-দিনে আর্টিস্ট হবে।

যশোদা মায়ের প্রিয়পাত্রী হয়ে উঠেছে, সে-ও আমার চক্ষুশূল। মেয়েটা গোড়া থেকেই তা বুঝতে পারতো বোধ হয়। তাই আমাকে একটু ভয়ের চোখে দেখত। মায়ের সঙ্গে আমার বেপরোয়া আচরণ আর কথাবার্তার ধরণ-ধারণ দেখে শুনেও দস্তুর

মতো সমীহ করত। আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখলেই ছুটে গিয়ে মাকে খবর দেয়, তাবপর মায়ের পাশ ঘেঁষে বসে বড় বড় চোখ মেলে আমাকে দেখে।

এখন অবশ্য ভয়েব ভাবটা কেটেছে। দেখলে হাসি-মুখে গল্প করতে চায়, যখন তখন মায়েব অশান্তিব কাবণ ঘটাই বলে মৃদুমন্দ অনুযোগও কবে। আমার ধারণা, যদি আমি ওই যশোদার প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খাই, মা তাতেও আপত্তি কববে না, ববং খুশি চিত্তে ওব সঙ্গে আমাব বিয়ে দিয়ে তখন ছেলে-বউ দু'জনকেই আগলে বাখবে।

আমাকে পাবাব মাযেব এই নিভৃত আকাঙ্ক্ষা টেব পেলেই আমাব ভিতবটা যেন আবো হিংস্র আবো নিষ্ঠুব হয়ে উঠতে চায়।

এদিক থেকে স্বভাব আমাব ভিতবে ভিতবে ঢেব বেশি উগ্র আব নির্দয হযে উঠেছে, মা যা চায়, আমি তা চাই না। মা চায়. আমি লেখাপড়া শিখে মস্ত একজন হয়ে উঠি। সেই জন্যেই বোধহয় বইযের সঙ্গে সম্পর্ক কম আমাব, হাযাব সেকেণ্ডাবী পরীক্ষাব পব মা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা কবেছিল, কেমন দিলি?

আমি নিস্পৃহ জবাব দিয়েছিলাম, ফেল কবব, জানা কথাই তো।

আমাবও তাই বাসনা ছিল। কিন্তু ফল বেরুতে দেখা গেল, ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ কবেছি। আব তাবপব মাযের আনন্দ দেখে ভিতবে ভিতবে বাগে জ্বলেছি। লিখতে বসে পবীক্ষাব খাতায কেন হিজিবিজি কেটে এলাম না, সেই অনুশোচনা হযেছে।

মাযেব ববাবব ভয—পাছে অসৎ সঙ্গে মিশি। ফলে ওই অসৎ সঙ্গ-ই একমাত্র আশ্রয় যেন আমাব। সেই জিতু পোদ্দার আব তাব দলবল অন্তরঙ্গ-সাথী এখন। জিতু পোদ্দাব আগেব থেকেও অনেক দুবন্ত, অনেক দুঃসাহসী হযেছে। দলবল নিয়ে হামলা কবে নানা ভাবে টাকা বোজগাব কবা শুরু কবেছে। ওবা দেখেছে. দু'চাবটে বোমাপটকা, ছোবা-ছুবিতে বেশ কাজ হয। স্রেফ হুমকি দিযে বা উড়ো চিঠি ছেড়েও অনেক সময় পকেটে ভালো টাকা আসে। ফলে ওদেব সাহস বেড়েই চলেছে। আমি ওদের সঙ্গে মিশি শুধু উত্তেজনাব লোভে। নিজেকে ছাড়িযে যাবাব মধ্যে বেশ একটা বোমাঞ্চ আছে। ওদেব হাতে কাবো নিগ্রহ বা নির্যাতন দেখলে কষ্ট হয না, এমন নয। আমি সামনে থাকলে, পাযে-হাঁটা পথেব মানুষদের ওপব ওকে হামলা কবতে দেখলে বাধা দিতে চেষ্টা কবি। কিন্তু সুখেব জোযাবে ভাসছে এমন বাড়ি-গাড়ি-ওযালাদের হেনস্থা কেন যেন বেশ উপভোগ্য লাগে। অবশ্য ওদেব টাকা বোজগাবেব কোনো পবিকল্পনাব বা অভিযানেব সঙ্গে আমাব কোনবকম প্রত্যক্ষ যোগ নেই। আমাকে ভাগ দিতে হয় না বলে জিতু পোদ্দাবেব দল খুশি বই অখুশি নয়। আমাব শুধু দূবে দাঁড়িযে দ্রষ্টাব ভূমিকা। কখনো-সখনো দুই একটা প্ল্যান বাতলে দিই, এই পর্যন্ত।

ওরা অন্তরঙ্গ ভাবে বটে, কিন্তু আসলে ওদের থেকেও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন আমি। আমাব আনন্দের দোসব নেই, ব্যথারও ভাগীদাব নেই। এক একলাব জগতে আমি নির্বাসিত। সেখানে টিপটিপ করে জ্বলছি আব নিভছি।

বি-এ ফাইন্যাল পরীক্ষার দিনকতক আগেব এক সন্ধ্যায় মায়ের কাছে এলাম। মাঝে অনেক দিন আসি নি। মা টেলিফোনে নতুন মায়ের কাছে শুনেছে, বেশ মন

দিযে পডশুনা শুরু কবেছি। তাই আব আমাকে ডাকাডাকি কবে বিবক্ত কবে নি। আব আমাব মতিগতি ফিবল বলে মনে মনে হযতো খুশিও হযেছে।

অনার্স ছাডব-ছাডব কবেও ছাডি নি। তাই মন দিযেই পডাশুনা কবছিলাম বটে দিনকতক। কিছুই ভালো লাগে না বটে, কিন্তু অযোগ্যতাব ছাপ কপালে পডবে সেটা তেমন বাঞ্ছিত নয। ববং পাশ কবে ডিগ্রীব ছাডপত্র অনাযাসে ছিঁডে ফেলে দিতে পাবি।

হঠাৎ মনে হল, মা-কে অনেকদিন দেখিনি। না দেখা মানেই তাব দিনবাতেব চিন্তাব থেকে নিজেকে অনুপস্থিত বাখা। এই স্বস্তিটুকু তাকে দিতে আমাব বিশেষ আপত্তি।

গিযে দেখি, মা নেই, যশোদাও নেই। আযা জানালো, দু'জনে বেবিযেছে একটু, খানিকক্ষণেব মধ্যেই ফিববে। আমাকে বসিযে চা-কফি খাওযাবাব জন্য সে বীতিমতো তোযাজ তোষামোদ শুরু কবে দিল। অর্থাৎ আমি এসেও ফিবে গেছি শুনলে মাযেব ওব ওপবে বিরূপ হবাব সম্ভাবনা।

খানিকক্ষণেব মধ্যেই ফিবল বটে দু'জনে। যশোদা বেশ সাজগোজ কবে বেবিযেছিল, মাযেব সাজটা ববাববই চাপা গোছেব। যশোদা গোটাকতক শাডিব বাক্স বুকে কবে ঘবে ঢুকল। পিছনে মা।

ও মা, আপনি কতক্ষণ।

জবাব না দিযে ওকে দেখলাম একটু ভালো কবে। বেশ সুন্দবই দেখাচ্ছে। মা আডচোখে আমাব দেখাটা লক্ষ্য কবল। সে-জন্যে আমাব সঙ্কোচেব লেশ মাত্র নেই। যশোদা দস্তুব মতো মহিলা গোছেব হযে উঠেছে।

কোথায় গেছলে?

মা নিযে মার্কেটে বেরুলো। খুব সুন্দব সুন্দব শাডি কিনে দিযেছে, দেখবেন?

আমি হাসলাম একটু। বললাম, তুমি ভাগ্যবতী দেখছি।

যশোদাব দু'চোখ আমাব জামা-কাপডেব ওপব থমকালো। পবনেব জামা বা কাপড ধোপদুবস্ত নয, জামাব কাঁধেব কাছটা ছেঁডাও একটু। পাশেব সোফায বসে মা-ও তাই লক্ষ্য কবছিল। বলল, চল, আবাব বেবোই একটু, গাডিটা তোলা হয নি এখনো—

মাযেব দিকে ফিবলাম।—জামা-কাপড কিনে দেবে?

মা জোব দিযে বলল, দেব তো, জামা-কাপডেব এ কি ছিবি তোব, নেই কিছু?

ঢেব আছে। সোফাব কাঁধে মাথা বেখে আবো গা ছেডে বসলাম আমি।

তাগিদ দিযে ফল হবে না বুঝেই মা আব আমাকে তোলাব চেষ্টা কবল না। তক্ষুণি আযা ডিশভর্তি খাবাব নিযে এলো। আমি এলে এটুকু ববাদ্দ, আযা ভালো কবেই জানে। মা যশোদাব দিকে তাকালো, তুই তো বিকেলে খাস নি কিছু এই সঙ্গে খেযে নে না?

যশোদা বলে উঠল, খেযে খেযে মুটিযে গেলাম, অত খা' খা' কবো না তো।

ওব দিকে ফিবলাম আবাব।...মেযেটা আজ চোখ টানছে। দেখতে ভালো লাগছে।

মা প্রসঙ্গ ঘোবালো। খুব মন দিযে লেখা-পডা কবছিস, শুনলাম?

জবাব নিষ্প্রয়োজন। খাবাবেব ডিশ খালি কবাব দিকে মন দিয়েছি। বেশ খিদে পেয়েছিল।

মা আবাব বলল, ভালো কবে পাশ কবলে তোকে আমি বাইবে পাঠিয়ে দেব, ইংল্যাণ্ড, আমেবিকা—যেখানে তোব খুশি। সেখান থেকে ডিগ্রী-ফিগ্রী নিয়ে মস্ত মানুষ হয়ে ফিববি, বাজি আছিস?

আমি মন দিয়ে পড়াশুনা কবছি শুনেই মায়েব এত আনন্দ, এত আশা। উৎসুক আগ্রহে আমাব দিকে চেয়ে জবাবেব প্রতীক্ষা কবছে। মুহূর্তেব মধ্যে আমাব মাথায় সেই পবিচিত উষ্ণ বাযবিক স্রোতটা ওঠানামা কবতে লাগল। দবকাব হলে আমিও এখন একটু আধটু অভিনয় কবতে পাবি। তাব আগ্রহে ইন্ধন জুগিয়ে সাগ্রহে বললাম, সত্যি বলছ, ঠিক পাঠাবে?

মা আবো খুশি—আমি তোকে মিথ্যে বলব নাকি? বলিস তো, তোকে সঙ্গে কবে নিয়ে গিয়ে স্থিতি কবে দিয়ে আসব।

যশোদা বলে উঠল, বা বে তাহলে আমি?

মনেব আনন্দে মা তাকেও প্রতিশ্রুতি দিয়ে ফেলল।—আচ্ছা, তোকেও নিয়ে যাব'খন।

যশোদা হেসে উঠল, তাহলেই সুমনদাব পড়া হয়েছে—

মা বলল, কেন হবে না, আমবা কি ওব মতো দু'-তিন বছব থাকতে যাচ্ছি, মাস দুই থেকে দেখে-শুনে বেড়িয়ে আবাব চলে আসব।

এবপব বিদেশে যাওযাব জটলাটা তিনজনেব মধ্যে জমে উঠল বেশ। মা-কে প্রস্তুত থাকতে বললাম, কাবণ আমাব পবীক্ষা এসেই গেছে প্রায, আব ভালো ফলও ইচ্ছে কবলেই কবতে পাবি।

মায়েব গাড়ি নিয়েই বাড়ি ফিবলাম। তাব স্বস্তিভবা পবিতুষ্ট মুখখানা চোখে ভাসছে। মায়েব কি হয জানি না, কিন্তু অভিনয় কবতে গেলে আমাব মাথাব ভিতবে কেমন একটা দপদপানি শুরু হয। আজ সেটা খুব বেশি হচ্ছে।

গাড়িটা দাঁড় কবিয়ে বেখে বাড়ি ঢুকলাম। বাবা এতক্ষণে মদেব গেলাস আব বোতল নিয়ে বসে গেছে। আমাব নতুন মা-কে দবকাব।

টাকা দাও তো কিছু।

এ-সময়ে টাকা চাইতে নতুন মা অবাক একটু।—কত?

তিন শ' চাব শ', যা পাবো দাও।

হঠাৎ অত টাকা দিয়ে কি হবে?

দিনকতকেব জন্য বাইবে যাব, দেবি কবো না, শীগগিব আনো।

নিজেব ঘবে এসে পাঁচ মিনিটেব মধ্যে সুটকেসটা গুছিয়ে নিলাম। মাথাব দপদপানি বাড়ছে। কত সময মনে হয়েছে, নিজেকে ধ্বংস কবে দিলে মায়েব মুখখানা দেখতে কেমন হয? এখনো সেই গোছেবই অনুভূতি।

টাকাব জন্য এ-সময নতুন মা বাবাকে বলবে না, জানা কথাই। কাবণ মা যে আমাব খবচেব জন্য মাঝে মাঝে তাব হাতে টাকা দেয সে খবব বাখি। আমি নিজেব

হাতে কিছু নেব না জানে বলেই ওই কবে। মা এখন নতুন মাকে আগেব থেকেও বেশি অন্তবঙ্গজন ভাবে।

নতুন মা ঘবে এসে বলল, সত্যিই কি তুই যাবি নাকি? কোথায যাবি, কি জন্যে যাবি?

আমি ধমকেব স্ববে জিজ্ঞাসা কবলাম, টাকা এনেছ?

থতমত খেয়ে নতুন মা তাডাতাডি হাত বাডিযে দিল। —তিনশ টাকা আছে। ...কিন্তু কোথায যাবি, কতদিনেব জন্য চললি, বলবি তো?

গিযে চিঠি দেব। ভালো কথা, তুমি মাকে খানিক বাদে একটা ফোন কবে দিও তো।

সুটকেস হাতে কবে নেমে এসে গাডিতে চেপে বসলাম।—হাওডা স্টেশন।

কোথায কতদূবে চলেছি, আমিও জানি না। টেলিফোন পাবাব পব আমাব অভিনেত্রী মাযেব মুখখানা কি বকম হবে দেখতে সেটাই কল্পনা কবতে ভালো লাগছে। সঙ্গে সঙ্গে অকাবণে যশোদাব ওপব বাগ হতে থাকল।...মাযেব যন্ত্রণাব ওপব প্রলেপ দেবাব জন্য একজন কেউ আছে মাযেব কাছে। ছেলে খুইযে মা মেযে পেযেছে মনে হয।

ফিবলাম প্রায মাস দুই বাদে। বি-এ পবীক্ষা তাব ঢেব আগে চুকেবুকে গেছে। মাযেব বাসনায বাদ সাধতে পাবাব আনন্দ কতদিন আব জিইযে বাখা যায? আবাব যেন দ্বিগুণ অবসাদেব সমুদ্র।

ফিবে এসে মাযেব গম্ভীব মুখখানা দেখে অবশ্য তুষ্টিলাভ কবেছিলাম। কোথায গেছলাম, কেন গেছলাম, মা একটা কথাও জিজ্ঞাসা কবল না। গাম্ভীর্যেব আডালে তাব হতাশাটুকুও অগোচব থাকল না আমাব। শুধু জিজ্ঞাসা কবল, পডাশুনা এখানেই শেষ তাহলে?

হ্যাঁ, আব ভালো লাগে না।

আব আডালে অনুযোগেব সুবে যশোদা বলল, আপনাব মাথাব ঠিক নেই, কি কাণ্ড যে কবেন এক-একসময...মাকে এ-ভাবে দুঃখ দেন কেন?

কি?

গলাব স্বব শুনেই যশোদা ঘাবড়ে গেল। আব কিছু বলল না।

একভাবে দিন চলছিল। বছবখানেক বাদে আবাব একটু বৈচিত্র্যেব স্বাদ পেলাম যেন। দু'টি মেযেব পদার্পণ ঘটেছে আমাব জীবনে। তাদেব একজন মিতা বোস আব একজন শোভা গাঙ্গুলি। দু'জনেবই বছব কুডি হবে বযস। তাব মধ্যে মিতা বোস দস্তুবমতো সুশ্রী। চেহাবায আব সাজ-পোশাকে স্মার্টনেসেব চটক আছে। ইউ, পি-তে তাব দাদুব কাছে থেকে বি-এ পডত। ফেল কবে কলকাতায বাপেব বাডি চলে এসেছে। আমাদেব বাডিব উল্টো দিকে তিনখানা বাডিব পব ওদেব বাডি। মিতা বোসেব বাবা মার্চেন্ট আপিসেব বড চাকুবে আব মা দস্তুবমতো আধুনিকা।

শোভা গাঙ্গুলির চেহারায় বা চাল-চলনে মিতা বোসের মতো চমক নেই বটে, কিন্তু ওই মেয়েটাও বেশ সুশ্রী। ওদের বাড়ি-ঘর আমি দেখি নি, মাইল দুই-তিন দূরে, শুনেছি। হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করার পর আর পড়াশুনার সুযোগ হয় নি। বাড়ির অবস্থা তেমন সুবিধের নয় বোধহয়, কিন্তু সাদামাটা বেশবাসে ওই মেয়েটাও মিতা বোসের থেকে খারাপ লাগে না আমার।

শোভা গাঙ্গুলি জিতেন পোদ্দারের দলের নতুন রিক্রুট—মনা গাঙ্গুলির খুড়তুতো বোন। মনা গাঙ্গুলি জিতুর পরের দিকের সেই সাধারণ স্কুলের সহপাঠী ছিল।

বেশ চৌকস ছেলে, আই-এস-সি পাশ করার পর কোন ফার্মে টেকনিসিয়ানের ট্রেনিং-এ ছিল কিছুকাল। সেই ফার্ম লক আউট হয়ে যাবার ফলে বাপ-কাকার ব্যবসায় ঢুকেছিল। সেটাও ফেল পড়তে আর চাকরি-বাকরি না জোটার ফলে জিতু পোদ্দারের দলে ভিড়ে গিয়ে এখন বহাল তবিয়েতে আছে।

মায়ের সুপারিশে খুড়তুতো বোন শোভা গাঙ্গুলিকে সিনেমায় ঢুকিয়ে দেবার জন্য মনা গাঙ্গুলি আমার পিছনে লেগে আছে। জিতু পোদ্দারও আমাকে ওর হয়ে অনুরোধ করেছে।

আর ঠিক ওই বাসনা নিয়েই আপ-টু-ডেট মেয়ে মিতা বোস নিজে এসে আলাপটা এখন একটু ভাবের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছে।

জিতু পোদ্দার আর মনা গাঙ্গুলি শোভাকেও একদিন আমাদের বাড়ি নিয়ে এলো। আর তাকেও মন্দ লাগল না আমার। কথা দিলাম, চেষ্টা করব, তবে লেগে থাকতে হবে—

মিতাকেও একই কথা বলেছিলাম। লেগে থাকার অর্থটা ওরা ঠিকই বুঝে নিয়েছে। মিতার বাড়ি এক মিনিটের পথ, সে সপ্তাহের মধ্যে চার পাঁচদিন আসে। দূরে থাকে বলে শোভা অত ঘন ঘন আসতে পারে না, তবু সপ্তাহে দিন দুই অন্তত এসে ঘণ্টাখানেক ধরে বসে গল্প করে চা খেয়ে যায়।

এই দুই মেয়ের আনাগোনা দেখে নতুন মায়ের চক্ষুস্থির। তা দেখেও মজা লাগে আমার। মায়ের কাছে নতুন মায়ের টেলিফোনে খবর জানানো সারা। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে, তোর কাছে নাকি দুটো মেয়ে খুব যাওয়া আসা করছে আজকাল?

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ফিরে জিজ্ঞাসা করি, কেন, তোমার আপত্তি আছে?

আপত্তি করলে কি ফল হবে মায়ের জানা হয়ে গেছে। জবাব দিয়েছে, না, আমি তোর কে, যে আপত্তি হবে. ।

হেসে বললাম, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই আসা যাওয়া করছে তারা, শীগগিরই টের পাবে।

টের পেয়েছে, একে একে দুজনকেই নিয়ে মায়ের কাছে এসেছি। মায়ের সামনে ভক্তি-শ্রদ্ধায় অবনত দুজনেই। মিতা বোস তো পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বসল। আমার মার্জিতরুচি অভিনেত্রী মা—দু'জনের সঙ্গেই সদয় ব্যবহার করেছে, যত্ন করেছে, কিন্তু কাজের বেলায় গম্ভীর মুখে বলেছে, বড় শক্ত, দেখি কি করতে পারি।

মিতা বোস বলেছে, আপনাব স্নেহ পেলে আব কিছু চাই না, সব সহজ হযে যাবে।

শোভা গাঙ্গুলি কিছু বলে নি। দু' চোখে শুধু আশা জমাট বেঁধেছে।

পবে মা ধমকেব সুবে বলেছে, এ-সব কি আবম্ভ কবেছিস তুই, আমি কাবো জন্যে কিছু কবতে পাবব না।

আমি নির্লিপ্ত।—চেষ্টা কবে দেখো না, কালে-দিনে তোমাব থেকেও বড আর্টিস্ট হতে পাবে ওবা।

একদিন নয, শোভা গাঙ্গুলিকে পবেব ছ'মাসেব মধ্যে দিন চাবেক আব মিতা বোসকে দিন দশেক মাযেব কাছে এনেছি। পবেব জনকে মাযেব সামনেই উসকে দিযেছি, ঠিক মত হামলা কবতে পাবছ না, হবে কি কবে! হামলায সাহায্য কবাব জন্য ওকে নিযে স্টুডিওতেও এসেছি।

ভিতবে ভিতবে মা ভযানক বিবক্ত। একলা পেযে ধমকে উঠেছে, আমি কিছু কবতে পাবব না, বলেছি না?

চেষ্টা কবো, কিছু না পাবো আশ্বাস দাও, তাছাডা হবে না-ই বা কেন, ওই মিতা বোস অন্তত ভালই পাববে মনে হয—

চাপা বিবক্তিতে মা ঝাঁঝিযে উঠল, আমাব দ্বাবা কি-চ্ছু হবে না, এবাবে এলে স্পষ্ট বলে দেব।

বলে দেখো তো...!

বললে তুই কি কববি, শুনি?

ধীবে-সুস্থে জবাব দিলাম, কিছু একটা কবব নিশ্চয, কি কবব সেটা পবেব বিবেচনা...কালই মিতা বোসকে নিযে আসছি আমি, বলে দিও।

আমাব বলাব মধ্যে 'এমন কিছু ঠাণ্ডা হুমকি ছিল যে মা শুধু মুখেব দিকে চেযেছিল চুপচাপ। পবদিন মিতা বোস আসতে মা তাকে ফটো সমেত স্টুডিও-তে দেখা কবতে বলেছে। দুই-একজন প্রডিউসাব আব ডাইবেক্টবেব সঙ্গে আলাপ কবিযে দেবে।

আনন্দে মিতা বোস হাওযায ভেসেছে। ট্যাক্সিতে আমাব পাশে ঘন হযে বসেছে। অসঙ্কোচে আমাব এক হাত ওব কাঁধে উঠে এসেছে। এই গোছেব প্রশ্রয ও আগেই দিযেছে। আজ দাবি বাডালেও আপত্তি কববে না, জানি।

বাত সাডে ন'টাব পব ওকে বাডিতে ছেডে দিযে আমি ফিবেছি। মাথাটা ঝিমঝিম কবছে কেমন। নিজেব ঘবে এসে আযনাব সামনে দাঁডাতেই ধাক্কা খেযেছি একটা। আমাব ঠোঁটে দগদগে লিপস্টিকেব দাগ। হঠাৎ বিপবীত প্রতিক্রিযায, গা-টা ঘুলিযে উঠল কেমন। ওটা যেন বক্তেব দাগ।

আশ্চর্য, এবপব শোভা গাঙ্গুলিকে নিযে ববং বেডাবাব ঝোঁকটা বেডেছে আমাব। ও বড জোব মুখে একটু পাউডাব বুলোয। ওব গাযে-কাঁধে হাত দিলে কেমন শক্ত হযে ওঠে। নার্ভাস হয। আমাব তাই ভালো লাগে। ওকেও মাযেব কাছে নিযে গিযে বলেছি, ফোটো সমেত মাযেব সঙ্গে স্টুডিও-তে দেখা কবো, মা চুপ। আব শোভা

কেমন যেন অসহায় বোধ কবেছে। ফেরার সময় ট্যাক্সিতে গা ঘেঁষে বসে নি। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছে, স্টুডিও-তে গেলে আপনি সঙ্গে থাকবেন না?

আমার হাসি পেযেছে, আবাব ভালও লেগেছে। মিতা আমাকে 'তুমি' করে বলে, নাম ধবে ডাকে। কিন্তু এ-মেয়েটা অন্যরকম। তা বলে দু'জনেব কাবো ওপরই মাযা মমতা নেই আমার। ফিল্ম-আর্টিস্ট হতে চায় বলেই যেন আমাব খেসাবত আদায়ের অধিকাব। আকর্ষণটা মিতা বোসের থেকে আপাতত শোভা গাঙ্গুলিব প্রতি বেশি বলেই ওর ওপব মমতা আবো কম।

ভিক্টোবিযা মেমোবিযালে এক নিরিবিলি কোণে বসে দু'হাত বাড়িযে ওকে সজোরে কাছে টেনে আনতে ও ধবফড কবে উঠল একেবারে। অস্ফুট স্ববে বলে উঠল, না না, না না—

জোরে কবেই দূবে বসল তাবপব। ভযে শুকনো মুখ, কাঁপছেও মনে হল। আমাব বাগ হযে গেল হঠাৎ, সশ্লেষে বলে উঠলাম, এত ভয নিযে তুমি ফিল্ম-আর্টিস্ট হবাব স্বপ্ন দেখো।

শোভা চুপ করে বইল অনেকক্ষণ, তাবপব আশাহতেব মতো বলল আমাকে দিযে সত্যিই কিছু হবে না, সুমনদা...আমি নিজেই তা বুঝতে পাবছি, কিন্তু আমি কি কবব, ব্যবসা অচল হতে বাবাব অত অসুখ...ছোট ভাইগুলো না খেযে মুখ শুকিযে ঘোবে, মাত্র হাযার সেকেণ্ডাবি পাশ, কে চাকবি দেবে আমাকে—মনাদা আপনাব কথা বলে ফিল্মলাইনেব লোভ দেখালো, কিন্তু আপনাব মায়েব সামনে গেলে পর্যন্ত আমাব পা দুটো ঠকঠক কবে কাঁপে, পারব না, নিজেই বুঝতে পাবি... পবে আবাব মনে হয, না পাবলে সবাইকে তো উপোস কবে মবতে হবে।

মেযেটা ফুঁপিযে কেঁদে উঠল। আমি নির্বাক, হতভম্ব। আমাব ভিতবেব শযতানটাব গালে কে যেন ঠাস ঠাস কবে দুটো চড কষিযে দিল।

কি ভেবে আবাব ওকে ট্যাক্সিতে তুলে নিযে বাড়ি পৌঁছে দিতে চললাম।

অন্ধকার গলিব মধ্যে স্যাঁতসেঁতে জীর্ণ বাড়ি একটা। ঘবে হাবিকেন জ্বলছে, টাকা দিতে না পাবাব দরুন ইলেকট্রিক বন্ধ বোধ হয। দাবিদ্র্যেব এই দশা আমি কল্পনা কবতে পাবি না। শোভাব আমাকে ভিতবে ঢোকাবাব ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু ঢুকে পডলাম যখন কি আর করবে। প্রথমে মায়েব সঙ্গে পবিচয কবিযে দিল, মনাদাব বন্ধু, এঁবই মাযের মারফত চাকবির চেষ্টা হচ্ছে—

শীর্ণমূর্তি মহিলা। মযলা লালপেড়ে শাড়ি পরনে। গাযে জামা নেই বলে ওটা ভালো করে জডিযে নিল। তাব কপালে জ্বলজ্বলে সিঁদুবের মস্ত টিপ একটা, সিঁথিতেও চওড়া কবে সিঁদুব টানা। মুখেব দিকে তাকালে ওই দুটো বস্তুই আগে চোখে পড়ে। আমার অন্তত পডছে। পাঁচ-ছ'টা রোগা বোগা ছেলে মেয়ে ঘবে ভিড কবে দাঁডিয়ে দেখছে আমাকে। ওরা শোভাব নিজের আর খুডতুতো ভাই-বোন।

শোভাব কাকা বোজগাবের ধান্ধায বেরিয়েছে। ওব বাবাকে দেখলাম। শয্যাশায়ী লালচে মুখ, লালচে দেহ। শুনলাম ড্রাই ওয়াশিং-এব ব্যবসা ছিল। ফেল পড়ার পর থেকে ব্লাডপ্রেসারে শয্যাশায়ী। ব্যবসা ফেল পড়ার কারণ, দোকানে ছোটখাট ডাকাতি

হযে যায হঠাৎ। পাঁচ-ছ'হাজাব টাকাব মাল চুবি হবাব ফলে এই হাল। খদ্দেববা গলায গামছা দিযে মালেব দাম আদায কবে নিযে গেছে। পাঁচ বছবেব লিজ ছিল বলেই দোকানঘবটাই শুধু তালাবন্ধ আছে এখনো। আঘাত পেযে ভদ্রলোকেব মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিযেছে একটু, হাজাব সাতেক টাকা হাতে পেলে ব্যবসা এবাবে কিভাবে চালু কবা যেতে পাবে, সেই হিসেব কষে, ভাইযেব সঙ্গে সেই পবামর্শ আগেব থেকেই সেবে বাখতে চায। কিন্তু আব সকলে জানে, সাত-আট হাজাব টাকা আকাশকুসুম স্বপ্ন তাদেব কাছে। ভদ্রলোক আমাব দু'হাত ধবে কাকুতি মিনতি কবে বলল, দেখো না বাবা, কেউ যদি দেয টাকাটা। আমি তাকে অর্ধেক অংশ লেখাপডা কবে দেব, বাকি অর্ধেক আমাদেব দু' ভাইযেব থাকবে, তাকে কিছু কবতে হবে না, সে শুধু ঘবে বসে লাভেব অংশ পাবে।

জীবনযন্ত্রণাব একটা বদ্ধ গুমোট থেকে বেবিযে এলাম যেন। কিন্তু বাডি আসাব পবেই সেই যন্ত্রণাটা মগজে ঘুবপাক খেতে থাকল। বাবাব ঘবে উঁকি দিলাম একবাব। চেযাবে মাথা বেখে নেশাটা উপভোগ কবছে।

পবদিন সকালে সোজা তাব সামনে এসে দাডালাম। আমাব কিছু টাকা দবকাব।

বাবা বীতিমতো অবাক, কাবণ সামনাসামনি টাকা চাওযা এই প্রথম। কত?

আট হাজাব।

কত! নিজেব কানেব ওপব হঠাৎ যেন বিশ্বাস হাবালো বাবা।

আবো স্পষ্ট কবে বললাম, আট হাজাব।

বাবা হতভম্ব খানিক। আমাব আপাদমস্তক নিবীক্ষণ কবল একবাব। অত টাকা কি জন্যে দবকাব?

দবকাব আছে, টাকাটা আজই ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনতে ভুলো না।

বাবা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল একেবাবে, কি দবকাব না বললে এক পযসাও পাবে না, বললেও পাবে কিনা সেটা আমি বিবেচনা কবে দেখব। মুখেব কথা খসলেই আট হাজাব টাকাব বৃষ্টি হযে যাবে, কেমন? আট টাকা বোজগাব কবে দেখেছ কখনো?

সবোষে অন্য দিকে মুখ ফিবিযে নিল। অর্থাৎ আব কোনো কথা নেই।

খুব ঠাণ্ডা স্ববে বললাম, আমাব দলেব ছেলেবা আমাব জন্যেই আজও তোমাব কাছে টাকাব দাবি কবে নি, তাবা চাইলে আট হাজাবেব ঢেব বেশিই চাইত। আমাব আপত্তি না থাকলে তাবা কম কবে হাজাব পঁচিশেক আদাযেব ব্যবস্থা কববে।

বাবা সত্রাসে ফিবে তাকালো আমাব দিকে। খববেব কাগজ সেও পডে। টাকা ওদেব দিতে হবে?

না, আমাব-ই দবকাব।

বাবা গর্জন কবে উঠল, আমাকে ভয দেখিযে টাকা আদায কবতে এসেছিস? তোদেব সক্কলকে পুলিশে দেব আমি!

চেষ্টা কবে দেখো!...টাকাটা আজই চাই! আজ ন'বছব হল আমাব বাডিতে আছ, খুব কম হলেও মাসে সাডে সাতশ' টাকা ভাডা হবে এব—এক বছবেই আমাব ন'হাজাব

টাকা পাওনা হয়। এই আট হাজাব বাদে মাসে এরপর অন্তত পাঁচ শ' টাকাব অর্ধেক আমার নামে কালই ব্যাঙ্কে-জমা কবে দেবে।

নিজেব ঘবে চলে এলাম। নতুন মা হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে ছিল। বিকেলে সে-ই আমাকে টাকা এনে দিল। বাবাব আর আমার মুখ দেখতেও আপত্তি বোধ হয।

*   *   *   *

আট হাজাব টাকা পেযে শোভা গাঙ্গুলির বাবা পাগলেব মতো কবতে লাগল। হাসছে কাঁদছে আব আমাকে বাববাব জডিযে ধবতে চেষ্টা কবছে। শোভাব মা, কাকা আর শোভা নিজেও বাকশক্তিবহিত যেন। আমাব মাথায় কিছু গণ্ডগোল আছে কিনা তাই যেন সন্দেহ তাদেব। শোভাব বাবা বলছে, কেমন, বলেছিলাম না, ভগবান ঠিক আবাব মুখ তুলে তাকাবে।

শোভাব মাযেব কোটবাগত চোখে চাপা শঙ্কা। আমাকে আডালে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা কবল, তুমি অত টাকা দিচ্ছ কেন, বাবা?

হেসেই জবাব দিলাম, মনে করুন, শোভাব কোনো দাদাব কিছু টাকা আছে, সে দিযেছে।

মহিলাব দু'চোখ অস্বাভাবিক চকচক কবতে লাগল।

শোভার কাকাও কাছে এসে জিজ্ঞাসা কবল, টাকাটা ঠিক কি শর্তে দিলেন, বুঝলাম না...

বিবক্তিকব। মোলাযেম সুবেই জবাব দিতে হল, ছেলে-মেযেগুলো আর শোভা লেখা-পডা শিখে মানুষ হবে, এই শর্তে।

ভদ্রলোক হাঁ করে আমাকে দেখতে লাগল।

এই গুমোটেব মধ্যে বাতাস টানতে কষ্ট হচ্ছিল। বেবিযে এলাম।

সুমনদা!

অন্ধকাব গলিব মধ্যে দাঁডিযে গেলাম। পিছন থেকে শোভা বেশ কাছে এসে বলল, আপনি কি অদ্ভুত মানুষ!

একটা তপ্ত নিঃশ্বাস আমাব মুখে লাগল। ও এবাব ফিসফিস কবে জিজ্ঞাসা কবল, আমাকে স্টুডিওতে কবে যেতে হবে?

মাথাটা আমাব খারাপ কিনা আমাব নিজেরই মাঝে মাঝে সন্দেহ হয। জবাব না দিযে অন্ধকাব গলির মধ্যে অত বড মেযেব গালে ঠাস কবে একটা চড বসিযে দিয়ে আমি বেবিয়ে এসেছি।

বাডি ফিরে নিজেব অনুভূতিপ্রবণতার বহর দেখে নিজেরই হাসি পেয়েছে। আযনার সামনে দাঁড়িযে নিজেকে বলেছি, সুমন সবকাব তুমি একটা গাধা।

অথচ ভিতবে ভিতবে ঠিক তাবপর থেকেই ঠাণ্ডা পরিবর্তন এসেছে একটা। আমার ক্রুর অভিলাষেব আওতা থেকে শুধু শোভা নয়, মিতাও কেমন যেন মুক্তি পেযে গেছে। শোভা এখনো আসে মাঝে মাঝে। কৃতজ্ঞতায ভবাট মুখ। অন্ধকার গলির সেই চডটা যেন ওব যোগ্য পুরস্কাব।

মিতা বোসের আরো অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে আপত্তি নেই। মা ওকে দস্তুর মতো আশাই দিয়েছে। ওর কৃতজ্ঞতার ধরন-ধারণ অন্যরকম। লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্য ও যেন যে কোনো মাশুল দিতে প্রস্তুত।...না, মাশুলও ঠিক নয় হয়তো, ও সানন্দে আশা করছে, ভবিষ্যতে ওর সঙ্গে কোনো বড় সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে। চালাক মেয়ে, এখন একাই মায়ের সঙ্গে দেখা করে। আমার প্রতি মায়ের দুর্বলতাটুকু ও হয়তো আঁচ করতে পেরেছে। মনে মনে তাকেও আমি অব্যাহতি দিয়েছি। আমার ঠোঁটের সেই লিপস্টিকের দাগ আজও ভালো করে উঠল না, এমন একটা অসম্ভব অস্বস্তি বোধ করি মাঝে মাঝে।

সেদিন মিতা বলল, সুমন, তুমি আমাকে ঠিক আগের মতো পছন্দ করো না।

আমি অস্বীকার করি নি।—ঠিকই ধবেছ।

ও আহত মুখে জিজ্ঞাসা করল, কেন করো না?

আমি জবাব এড়াতে চেষ্টা করেছি।—তা ঠিক বলতে পারব না, হযতো আগের থেকে আমি একটু উদাব হযে পড়েছি।

ও পবিহাস ভেবে হেসেছে। কিন্তু ভিতবে ভিতবে আমি কেমন বিবক্ত বোধ করেছি।

দিন কাটে। নিজের অস্তিত্বটাই বোঝাব মতো মনে হয় এক এক সময়। ভাবি, আমি না জন্মালে এত বড় দুনিয়াটার কি ক্ষতি হত? মায়েব সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ আগের থেকেও কমিয়ে দিয়েছি। তার ছবিগুলো কিন্তু খুঁটিযে দেখি: প্রায সমস্ত ছবিতেই বমণীর মাধুর্যেব দিকটা বিশেষভাবে প্রতিভাত। এই বিশেষত্ব যে গল্পে নেই, সেই ছবিতে মা অভিনয়ই করবে না। অথচ রমণী চবিত্রের এই বৃহৎ দিকটা দেখলেই ভিতরে ভিতবে এক অন্ধ আক্রোশে ফুলতে থাকি আমি। মনে হয়, মা ওই রকমই মহৎ আব সুন্দর হতে পাবতো, তাব প্রতি ওপর-অলাব দাক্ষিণ্যের প্রসাদ আছে। কিন্তু মা তা হয নি।

যে উপলক্ষ নিয়ে আমি আচমকা পাগলেব মতো কাণ্ড করে বসলাম, সেও মায়ের নতুন একটা ছবি। ছবিটাব প্রশংসায সমস্ত কাগজগুলো পঞ্চমুখ। দিনেব পর দিন 'হাউস ফুল' যাচ্ছে। দেখব দেখব কবেও দেখা হযে ওঠে নি অনেক দিন। যশোদা কতবার বলেছে, শিল্পী কাকে বলে মায়ের এই ছবিতে দেখে আসুন।

টিকিট পেয়ে সেদিন হঠাৎ ঢুকে পড়েছিলাম। ফলে মানসিক প্রস্তুতির অভাব ছিল। ছবিটা যতো দেখছি, শরীরের সমস্ত রক্তকণাগুলো যেন ফুটে ফুটে মাথার দিকে ধাওয়া করছে আমার। কাহিনীর বিষয়বস্তু এক মদ্যপ স্বামীর সংশ্রব ত্যাগ করে পাঁচ বছরের ছেলে নিয়ে নিরুদ্দেশ তার তেজস্বিনী মা। তার একমাত্র সঙ্কল্প—ছেলেকে বাপের মতো হতে দেবে না, তাকে সে নিজের আদর্শে মানুষ করবে। কিন্তু অন্তরায় তার বয়স, অন্তরায় তার রূপ যৌবন। আশ্চর্য সুষমামণ্ডিত তেজে এই সব অন্তরায় সে প্রতিহত করতে পেরেছে। কিন্তু বিধাতার নির্মমতম পরীক্ষা সামনে তখনো। ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়ল, তার জীবন সঙ্কট। হাসপাতালের যে বিরাট ডাক্তারটির ওপব প্রধান

নির্ভর, সেই মানুষটি এক প্রবল পুরুষ—রমণীব প্রতি যার সজাগ চুলচেরা দৃষ্টি। সেই দৃষ্টি রমণীর মহিমা আবিষ্কার করতে জানে। নামজাদা সেই ডাক্তার পুরুষের মতই সবল হাত বাড়িয়েছে ছেলেটির মায়ের দিকে।...একদিকে ছেলের জীবন, অন্যদিকে সত্তার সংঘাত। মহিলা এই মদ্যপ স্বামীকেই ভালবাসে, ছেলের ভিতব দিয়ে আদর্শের একটা সাদা নজির রেখে যেতে চায় তার কাছে। শেষ পর্যন্ত বিচিত্র সংঘাতেব মধ্যে দিয়ে আদর্শেরই জয়, মহিলাব নিখাদ রমণীসত্তা এক শুচিশুভ্র দীপ্ত মাধুর্যে ভাস্বর —প্রবল পুরুষ সেই ডাক্তাবও অবনতমস্তক তার কাছে...সুস্থ ছেলের হাত ধবে সে যখন বিদায় নিযে হাসপাতাল থেকে চলে যাচ্ছে, নামজাদা সেই ডাক্তারেব দু'চোখ আনন্দে চিকচিক কবছে, সে তাব সহকারীকে বলছে, এমন মা-ও যে দেশে আছে, সে দেশেব দুর্ভাগ্য, কে বলে?

সেই ছবি দেখার পব সমস্ত বাত আব তাব পরদিন সমস্ত সকাল আমার মাথায় দাউদাউ আগুন জ্বলেছে শুধু। দুপুবের দিকে অসহ্য লাগতে বাস্তায় বেরিয়ে একটা ট্যাক্সিতে চেপে বসলাম। আশা কবছি, বাড়িতেই পাব মাকে, গত বাতে নতুন মা বলছিল, দিদিব জ্বর হযেছে একবার দেখে আসি, চল।

আমি কেন চলেছি, কৈফিযত নিতে? মায়েব সঙ্গে যে অদৃশ্য বন্ধনটুকু আছে, নির্মমভাবে সেটা ছিঁড়ে ফেলে দিতে? নাকি জীবনেব এতবড় মিথ্যেকে অভিনয় কবে এমন সত্যের রূপ দিতে পেবেছে বলে কনগ্র্যাচুলেট করতে?

আমি জানি না, কেন যাচ্ছি। ভিতরটা কি যেন এক চূড়ান্ত নিষ্পত্তিব আঘাত হানাব জন্য অস্থিব কঠিন।

দারোয়ান চেনে, সে সেলাম ঠুকল। দোতলার সিঁড়ির বারান্দার দূরেব কোণে আয়া দুটো তকতকে মেঝেতে পড়ে ঘুমুচ্ছে। নিঃশব্দে পর্দা সরিয়ে মায়েব ঘরে ঢুকলাম।

তারপরেই চিত্রার্পিতেব মতো দাঁড়িযে গেলাম।

পালঙ্কে শুযে মা ঘুমুচ্ছে। তাব একদিকেব কাঁধে মাথা বেখে বলতে গেলে প্রায় বুকের ওপর শুযে যশোদা ঘুমুচ্ছে। ওর একটা হাত মাযেব বুকটা বেষ্টন কবে আছে। মাযের বুকে যশোদা আধাআধি উপুড় হয়ে শুযে আছে।

অপলক চোখে দেখছিলাম। একটা ঝাঁকুনি খেযে সজাগ হলাম। ঝাঁকুনি নয়, শযতানেব চাবুক, মগজের মধ্যে শযতানের কাটাছেঁড়া। শবীরের রক্ত এখন বুঝি চোখ দিয়ে ফেটে বেরিয়ে মুখেব দিকে গড়াবে। নিজেব রক্তেব নোনা স্বাদ আমি আগেই পাচ্ছি কেন?

যেমন এসেছিলাম তেমনি নিঃশব্দে বাড়ি থেকে বেরিযে এলাম। দারোয়ানটা এরই মধ্যে আমাকে চলে যেতে দেখে অবাক হল একটু।

না, আমাব মাথায় বুকে সর্বাঙ্গে এমন আগুন আর কখনো জ্বলে নি। এ-আগুন আমি নেভাতে চাইনে, এ-আগুনে আমি সব কিছু ধ্বংস করতে চাই।

অপ্রত্যাশিত সুযোগ মিলল। মাথা ঠাণ্ডা থাকলে ওপর-অলার এ-চক্রান্ত ধরতে পারতুম। কিন্তু মাথা ঠাণ্ডা আর বোধহয় এ-জীবনে হবে না।

ঘুবতে ঘুবতে জিতু পোদ্দাবেব আড্ডাব জাযগায এসেছি। তখন বিকেল। আমাকে দেখে ওবা আনন্দসূচক ধ্বনি ছাড়ল একটা। জিতু বলল, চাঁদুব যে দেখাই নেই আজকাল, বলি প্রেমে-টেমে পড়লে নাকি কাবো?

ঘবে তখন চাবজন ছিল ওবা। ওদেব কাছে আমাব এখন মান খুব। শোভা গাঙ্গুলিব বাপেব হাতে আট হাজাব টাকা দিযেছি। মনা গাঙ্গুলি সেটা এদেব কাছে গোপন বাখে নি। জিতু আড়ালে আমাকে বলেছিল, একটা মেযেব জন্য আট হাজাব—ওই টাকায যে অমন আটটা মেযে ঘাযেল কবা যেত, দোস্ত...।

এবপব থেকে আমাব টাকাব সম্বন্ধে ওবা নিজেদেব মধ্যে অনেক জল্পনা-কল্পনা কবেছে, বুঝতে পাবি। আমাকে দেখলেই সকলে ছেঁকে ধবে, ভালো-মন্দ একটু হযে যাক, বন্ধু—

ওদেব ভালো-মন্দ মানে মদ। জিতুব বাছাই দলকে অনেকদিন বাব-এ নিযে গেছি। ওদেব সঙ্গে আমিও গিলেছি। তবল পদার্থ বুকেব ভিতবটা জ্বালিযে দিযে জঠবে নেমেছে। এটা মন্দ লাগে না। একটা যন্ত্রণা দিযে আব একটা যন্ত্রণা ঘাযেল কবাব মতো। পবে আবো ভালো লাগে।

সেদিনও আপত্তি না কবে বাব-এ নিযে গেলাম। আমাব নিজেবই দবকাব ছিল।

ওদেব আনন্দ সবে জমাট বেঁধেছে তখন। জিতু হঠাৎ বলল, কাববাবে মন্দা পড়েছে এখন, শালাবা সেযানা হযে উঠেছে, দলে একটা মক্ষীবাণী থাকলে বেশ হত, টোপ ফেলে অনেক মক্কেল ঘাযেল কবা যেত, নিজেদেবও আনন্দে কাটত।

এটাই ওপবতলাব কাবসাজি। শযতানেব এই টোপ যে শুধু আমাব উদ্দেশেই ফেলা, কি কবে বুঝব। নেশা শুরুব মুখে মনেব মতো আলোচনাব বসদ পেযে ওবা উদ্দীপিত। হৈ-হৈ কবে সকলে গুরুব প্রস্তাবনাব তাবিফ কবল। সকলে একবাক্যে স্বীকাব কবল, সুশ্রী চালাক-চতুব একটি মক্ষীবাণী সংগ্রহ কবা গেলে কাববাব জামিযে তোলা যায বটে। কিন্তু আসল সমস্যা তেমন মক্ষীবাণী জোটানো যায কি কবে।

আমাব মগজেব মধ্যে অদ্ভুত দাপাদাপি শুরু হযে গেল তক্ষুণি। মাযেব ওই অভিনযেব পুবস্কাব দিতে হবে...একটাই পুবস্কাব তাব যোগ্য। যশোদাকে তাব বুক থেকে ছিনিযে নিতে হবে, ছিনিযে নিযে মাযেব বুক আবো খালি কবে দিতে হবে। এটুকু পাবলেই শুধু আমাব মাথাব আগুন বুকেব আগুন নিভবে। সব জ্বালা যন্ত্রণা জুড়োবে।

ঘোলাটে চোখে তাকালাম ওদেব দিকে। অপ্রত্যাশিত উক্তি শুনে ওদেব নেশা চটে যাবাব দাখিল।

আমি পাবি জুটিযে দিতে, কিন্তু তোমবা তাকে আগলে বাখতে পাববে? মক্ষীবাণী বানাতে পাববে?

এক নিঃশ্বাসে গেলাস খালি কবে জিতু পোদ্দাব বলল, জান কবুল, পাবলে সেদিন থেকে তুমিই আমাদেব গুরু। সত্যি পাববে, না মদেব ঝোঁকে বলছ?

আমি মাথা নাড়লাম। সত্যি পাবব। তোদেব হাতেব মুঠোব মধ্যে এনে দেব।

জিতু পোদ্দাবেব তবু সংশয, কেমন দেখতে?

তোমবা যা আশা কবছ তাব থেকে ভালো।

ওদেব বুকেব তলায একটা উত্তেজনাব ঝড় বইতে লাগল যেন। শুধু মনা গাঙ্গুলি হা কবে দেখছে আমাকে। ভাবছে, হযত বোনেব দুঃখে দবাজ হাতে আট হাজাব টাকা দিযে ফেলতে পাবে যে তাব মুখে এই প্রস্তাব সম্ভব কি কবে।

জিতু বলল, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, হাতেব মুঠোয যদি তেমন মেযে পাই, দবকাব হলে পিষে ফেলেও মক্ষীবাণী বানিযে ছাড়ব।

পবদিন সকালে জিতু পোদ্দাব আব বাকি তিনজনেব সঙ্গে বসে ঠাণ্ডা মাথায সমস্ত ব্যবস্থাব প্ল্যান হযে গেল।

দুটো নিস্তবঙ্গ নিথব দিন কেটে গেল।

তৃতীয দিনে মা স্টুডিওয গেছে, খবব পেলাম। বিকেল পাঁচটা নাগাদ আমি তাব বাড়িতে হাজিব। মেক আপ তুলে মাযেব বাড়ি ফিবতে সাড়ে ছ'টা।

যশোদা আমাকে দেখে একমুখ হেসে এগিযে এলো। আমাব ববাদ্দ চা জলখাবাব এসে গেল। ও এটা সেটা গল্প কবতে লাগল।

ঘড়িতে সাড়ে পাঁচটা। আমি প্রস্তাব কবলাম, চলো একটু বেড়িযে আসা যাক, সঙ্গে গাড়ি আছে।

যশোদা অবাক আবাব খুশিও। একটু বসুন না, মা ঘণ্টা খানেকেব মধ্যেই এসে যাবে।

তাহলে তুমি থাকো, আমি চললাম।

ওমা সে-কি, মাযেব সঙ্গে দেখা কববেন না?

আমি বাগত মুখে বললাম, তুমি দশ মিনিটেব মধ্যে তৈবি হযে আমাব সঙ্গে বেরুবে কি না?

যশোদা ঘাবড়েই গেল। আমাব খামখেযালী স্বভাব জানে। সমীহও কবে। আমাকে খুশি বাখতে মাযেব থেকে কম চেষ্টা কবে না সেও। তাড়াতাড়ি বলল, আচ্ছা আসছি, বসুন—

গাড়ি আমি চালাচ্ছি। ফাঁকা বাস্তায গতিব কাটা পঞ্চাশ মাইলেব দাগ ছুঁযেছে। পাশে যশোদা বসে। মাঝে মাঝে অবাক হযে আমাব দিকে তাকাচ্ছে। আমি ওব কাছে ববাববই একটা বিস্ময—এমন গাড়ি চালাই, সেটাও। ও জানে না, স্কুলে পড়তেই মাযেব গাড়ি আমি কত চালিযেছি। আব জোবে চালিযে মাযেব কত বকুনি খেযেছি। কথা-বার্তা এতক্ষণ ওই বলছিল এক তবফা। তাবপব ক্রমে ওব অস্বস্তি বাড়ছে, টেব পাচ্ছি।

চলেছেন কোথায?

সমুদ্রেব হাওযা খেতে।

অ্যাঁ, এতদূব। না না, আব একদিন যাব, ফিরুন, যেতেই বাত হযে যাবে, মা ভাববে।

আমাব সঙ্গে এসেছ, সকলেই জানে, কিছু ভাববে না।

যশোদাব মুখেব হাসি আগেই কমে গেছল। ক্রমে কথাও বন্ধ হল। ওর মুখ শুকিযে গেছে, সন্দিগ্ধ চাউনি।

গন্তব্যস্থানে পৌঁছুলাম যখন সন্ধ্যা পাব হযে গেছে। একটা ভাঙা নির্জন বাগান বাডিব খোলা ফটকেব মধ্যে গাডি ঢুকিযে দিলাম। যশোদা আঁতকে উঠল।—এ কোথায় আনলেন আমাকে?

আমি হাসলাম এবাবে। বেশ ভালো জাযগা।

ভাঙা গাডি-বাবান্দাব নিচে গাডি থামতে জিতু পোদ্দাবেব দল তিনটে বড বড টর্চ হাতে দৌডে এলো। আমি নেমে এসে এদিকেব দবজা খুলে যশোদাকে হাতে ধবে টেনে নামালাম। তাবপব জিতু পোদ্দাবেব দিকে ঠেলে দিলাম। এই নাও মক্ষীবাণী!

তিনটে টর্চই যশোদাব নির্বাক বিবর্ণ মুখেব ওপব জ্বলে উঠেছে। ওদেব চোখে মুখে চাপা উল্লাস। টর্চ নিভে গেল। জিতু খপ কবে যশোদাব একটা হাত ধবে ভিতবেব দিকে টানল, চলো গো সুন্দবী, কিছু ভয নেই।

পিছন ফিবে অন্ধকাবে আমাব দিকে চেযে যশোদা অস্ফুট আর্তনাদ কবে উঠল, সুমনদা!

আমাব কানেব ভিতবটা জ্বলে যেতে চাইল বটে কিন্তু জ্বলতে দিলুম না।

সামনে মস্ত ঘব। দবজা-জানালা বন্ধ, ভিতবে পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। পাশেব ঘব দুটোয হ্যবিকেন জ্বলছে টিমটিম কবে। যশোদাকে বড ঘবে টেনে এনে মাঝেব গদি-আঁটা মযলা ফবাসেব ওপব জোব কবে বসিযে দিল জিতু। তাবপব খুশিব আতিশয্যে আমাব পা ছুঁযে একটা প্রণাম কবল। দেখাদেখি বাকি তিনজনও।

ভযে কণ্টকিত যশোদা বিস্ফাবিত নেত্রে আমাকে দেখছে। আমাব মুখে শযতানেব হাসি দেখছে বোধহয।

বললাম, এতদিন একবকমেব অভিনয কবেছ, এখন মক্ষীবাণী হযে ঢেব বেশি বাস্তব অভিনয কববে, অত ঘাবডাবাব কি আছে?

যশোদা হঠাৎ ডুকবে কেঁদে উঠল, তাবপব চিৎকাব কবে বলতে লাগল, আমাকে মাযেব কাছে দিযে এসো সুমনদা, তোমাব পাযে পডি, আমাকে মাযেব কাছে দিযে এসো—

আমাব কান দুটো আবাব জ্বলে যেতে চাইছে বলেই ভিতবে ভিতবে আবো নৃশংস আমি। জিতু শক্ত হাতে ওব মুখ চেপে ধবে গলা বন্ধ কবে দিল। তাবপব কোমবে গোঁজা বিভলভাবটা টেনে বাব কবে দেখালো। অন্যহাতে ওব কাঁধ ধবে দুটো ঝাঁকুনি দিযে বলল, মেযেছেলে খুন কবাব সাধ নেই, কিন্তু দবকাব হলে বাধাও নেই—বুঝে-শুনে অবাধ্য হযো।

যশোদা আবাব নির্বাক, স্তব্ধ। এব পবেও ও শুধু আমাব দিকেই চেযে আছে কেন! বিবক্তিকব।

এতবড় সৌভাগ্য জিতু আর তার সঙ্গীরা কল্পনাও করতে পারে নি। লোলুপ চোখে ওরা যেন সর্বাঙ্গ জরিপ করছে মেয়েটাব। পারলে এখনি ঝাঁপিয়ে পড়ে ছিঁড়ে খায়। এই রাতেই ওরা সর্বনাশ করবে মেয়েটাব, আমি ওকে রক্ষা করতে পারব না।

বিরক্তিকর। রক্ষা করার কথা ভাবতে যাচ্ছি কেন? বক্ষা করব বলে ধরে এনেছি! তবু হঠাৎই এক বিপরীত প্রতিক্রিয়া মাথাব মধ্যে ওঠা-নামা করতে লাগল। তাড়াহুড়োর ব্যাপাবটাই শযতানের অনুকূল, মাযের বুক খালি করবই আমি, কিন্তু তবু এদের হাতে মেযেটাকে আজই সঁপে দিতে মন চাইল না। মাঝে একটু কিছু যেন ভাবাব আছে। যা কবাব কাল করব, সঁপে দিতে হয় কাল দেব...আব সঁপে যদি দিতেই হয তাহলে...

লুব্ধ চোখে তাকালাম যশোদাব দিকে। আমন্ত্রণ পেযে শযতান এবাব আমাকেই ঠেলে দিতে চাইল ওব দিকে। কিন্তু ভিতর থেকে প্রচণ্ড বাধা দিচ্ছে কে?

গম্ভীব মুখে জিতু পোদ্দাবকে লক্ষ্য করে সকলের উদ্দেশেই বললাম, শোনো, আনন্দে আটখানা হবার সময় নয় এখন, আনন্দ পবে করো। আর একটুও দেরি না কবে বাস ধবে যে যাব বাড়ি চলে যাও!

ওরা সবিস্ময়ে একসঙ্গে আর্তনাদ কবে উঠল।—সে কি! কেন?

বললাম, একটু বুদ্ধি খবচ কবলেই বুঝবে, কেন।...তোমাদেব মক্ষীবাণীকে আমি বাড়ি থেকে নিযে বেবিযেছি, সকলেই জানে, রাত বেশি হলে মা পুলিশে খবব দেবে, পুলিশ আমাকে না পেযে আমাব অন্তবঙ্গ সঙ্গী সাথী অর্থাৎ তোমাদেব খোঁজ করবে। সেই খোঁজ করাব আগে তারা যেন তোমাদের প্রত্যেককে বাড়িতে পায, খোঁজ নিতে এলে তাদেব ভুল বাস্তা দেখিযে দেবে। বলবে, একটা মেয়েকে নিয়ে হাওড়া ষ্টেশনের দিকে যেতে দেখেছ, কিংবা উত্তব কলকাতার দিকে।

ওবা হকচকিযে গেল কেমন। জিতুর সঙ্গীবাও ঘাবড়াল হযতো একটু। কিন্তু জিতু পোদ্দাব বলল, আমবা যদি সকলে মিলে তোমাব মতই গা-ঢাকা দিযে থাকি?

ক'দিন থাকবে, খাবে কি? তাছাডা আমাব মাযেব কত টাকা তোমরা জানো না—দরকাব হলে হাজাবখানেক পুলিশ সমস্ত জাযগা চষে ফেলবে। আব দেরি কবো না, চলে যাও, কাল বেশ বেলাবেলি এসো, পবের ব্যবস্থা ঠিক করতে হবে।

জিতু জিজ্ঞাসা কবল, তুমি কি এই মেয়েটাকে তোমার মাযের কাছ থেকে ধরে এনেছ নাকি?

হ্যাঁ।

আমার বলাব মধ্যে বা চোখে মুখে এমন কিছু ছিল, যা ওবা একটুও অবিশ্বাস করল না। তাছাড়া ঠিক যে ভাঁওতা দিযেছি ওদের, তাও নয। কেবল এই রাতটার মতো সবাতে চেযেছি ওদের।

যাবার আগে জিতু আমার কানে কানে অশ্লীল প্রশ্ন করল একটা। আমি মাথা নাড়লাম, অর্থাৎ সেই রকমই ইচ্ছা।

জিতু মুখ দিয়ে কুৎসিত চুকচুক শব্দ করল। তারপর চোখ দিযেই যশোদার সর্বাঙ্গ লেহন করে বাকি তিনজনকে নিয়ে চলে গেল।

এত ত্রাসেব মধ্যেও যশোদা যেন স্বস্তি বোধ কবল একটু। তাই দেখে আমাব আবো বাগ হয়ে গেল। মাথাব আগুন নিভবে ভেবেছিলাম কিন্তু আবো যেন দ্বিগুণ জ্বলছে। ঘবেব মধ্যে পাযচাবি কবছি আব কি-যে উল্টো-পাল্টা চিন্তা কবছি, বুঝতে পাবছি না।

সুমনদা।

ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালাম। সবোষে তাকালাম ওব দিকে। যশোদা প্রাণপণে সাহসে বুক বাঁধতে চেষ্টা কবছে, বুঝতে পাবছি। কিন্তু এটুকুও আমি তচনচ কবে দিতে চাই। অথচ পাবছি না কেন?

এদিকে এসো, বোসো।

সামনে এলাম। দাঁড়িযে বইলাম। নির্দয চোখে তাকালাম।

সুমনদা তুমি এত নিচে নেমে গেছ! আমি যে বিশ্বাস কবতে পাবছি না।

বিশ্বাস কবো। তাহলে যন্ত্রণা কমবে।

না না, বিশ্বাস কবব না, তুমি এ-কাজ কেন কবলে?

মাযেব বুক খালি কবাব জন্যে।

ও স্তব্ধ একটু। তাবপব আকুতিভবা সুবে বলল, সুমনদা তোমাব মা-কে আমি মা বলি, উনি আমাব কাছে মাযেব থেকেও বড—তাই তুমিও আমাব কাছে দাদাব থেকে বেশি কিছু।

কানে যেন গলানো সীসে ঢুকল এক প্রস্থ। সবোষে জবাব দিলাম, এটা অভিনযেব জাযগা নয, বুঝলে? ধুপ কবে বসে হ্যাঁচকা টানে ওকে বুকে টেনে আনলাম।

আমি কেমন দাদা, এই বাতেই টেব পাবে সেটা।

যশোদা আস্তে আস্তে ছাড়িযে নিল নিজেকে। কেন যে ছাড়লাম, কেন যে নৃশংস পাষণ্ড হযে উঠতে পাবছি' না, আমাব সেই বাগ সেই যন্ত্রণা।

বসন একটু সম্বৃত কবে নিযে ও সোজা মুখেব দিকে চেযে বইল খানিক। আস্তে আস্তে বলল, সুমনদা, একটি ছেলেকে আমি ভালবাসি, মা বলেছে আসছে ফাল্গুনে তাব সঙ্গে আমাব বিযে দেবে. তুমি কি আমাদেব দু'জনকেই পাগল কবে দেবে? আমাকে দযা কবতে পাবো না?

কি হল আমাব! আষ্টে পৃষ্ঠে এত চাবুক চালাচ্ছে কে? ভালবাসা আবাব কি জিনিস? যশোদাব ওই ঠাণ্ডা চোখেব সামনে আমি বসে থাকতে পাবছি না কেন? এই কাণ্ড কবে বসে ওবা সব ঠিক থাকল, মাঝখান থেকে আমাব মাথাটাই শুধু গণ্ডগোল হযে গেল?

উঠলাম। ঘবেব মধ্যে আবাব পাযচাবি কবতে লাগলাম। মাথায জমাট-বাঁধা আগুন ঠাণ্ডা হযে আসছে কোন যাদুমন্ত্রে? পাযচাবি কবছি আব মাঝে মাঝে ওব দিকে তাকাচ্ছি। যশোদা অপলক চোখে আমাব দিকেই চেযে আছে। ওব মুখখানা এত সুন্দব লাগছে কেন এখন? দাদাব মতই সামনে গিযে ওকে আদব কবতে ইচ্ছে কবছে কেন একটু?

কি কাণ্ড, ও নাকি একটা ছেলেকে ভালবাসে। ভালবাসা নামে আছে বোধহয কিছু। নইলে যশোদাব মুখখানা এত ভালো লাগছে কেন দেখতে?

আসছে ফাল্গুনে ওদেব বিযে হবে। ছেলেপুলে হবে।...যশোদাব ছেলেব নাম কি হবে, গোপাল? কি আশ্চর্য, মাথাটা কি সত্যিই খাবাপ হযে গেল আমাব।...যশোদাব গোপালেব মুখখানা আমি চোখেব সামনে এত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কি কবে? গোপাল হাসছে খলখল কবে, যশোদা হাসছে, ওদেব হাসিতে আমাব স্নাযুগুলো সব যেন ভবাট হযে যাচ্ছে।

* * *

অন্ধকাবে গাড়ি ছুটছে। যশোদা আমাব পাশে নির্বাক বসে। ওব দিকে তাকিযে এখন আমাব কেমন হাসি পাচ্ছে।

বাড়ি। আমাব মাযেব বাড়ি। বাত তখন একটা, কিন্তু বাড়িব সব আলো জ্বলছে। গেটেব সামনে গাড়ি থামতে যশোদা নেমেই ভিতবে ছুটল। আধা-আধি গিযেই থমকে ফিবল। আবাব আমাব দিকে আসছে। আমাকে নামিযে নিতে আসছে। দোতলাব বাবান্দায কাবা ছুটে এসে দাডাল? মা আব তাব দুই আযা বোধ হয।

সুমনদা, নামো শীগগিব।

ওকে বিষম চমকে দিযে আমি গাড়ি হাঁকিযে চলে গেলাম।

কি এক অদ্ভুত অনুভূতিব মধ্যে কেটে গেল বাতটা। সকালে জিতু পোদ্দাবেব বাড়ি এলাম। আমাকে দেখে ও হা। মক্ষীবাণীকে ঘবে ফিবিযে দিযেছি শুনে ওব চাউনি ক্রূব হযে উঠল। পবে ওব দলবল আসতে তাবাও ক্রুদ্ধ। সকলেবই অবিশ্বাস।

ওদেব ঠাণ্ডা কবতে পাঁচশ' টাকা খেসাবত কবুল কবলাম আমি। চবিত্র জানি, দুনিযা টাকাব বশ।

কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত আব স্থিব থাকতে পাবলাম না। মা-কে নয, যশোদাকে দেখাব এত লোভ আব কখনো হযনি। বোকাব মত কাল পালিযে এলাম কেন? সমস্ত দিন এভাবে না কাটিযে দাদা তাব বোনেব কাছে গিযে হাজিব হলেই তো পাবতো। এতক্ষণ গেলাম না কেন?

গেট বন্ধ। গেটেব সামনে দাবোযান দাড়িযে। ঠাণ্ডা পালিশ কবা মুখ যেন তাব। যা বলল—তাব সাবমর্ম, মাইজি আমাকে আব বাড়িতে ঢুকতে দিতে নিষেধ কবেছে।

পাযেব নিচে মাটি এত দুলছে কেন? মাথাটাই বা এ-ভাবে ঘুবছে কেন? বডবকমেব ভূমিকম্প-টম্প হচ্ছে কিছু?

* * *

জীবন কি? দুর্নিবীক্ষ্য কোনো অদৃষ্টকাবেব ছকে বাঁধা পবিকল্পনা কিছু? সেকবম কোনো শক্তিব অস্তিত্ব আমাব জানা নেই। এব থেকে আব এক দার্শনিক জীবন-সংজ্ঞা মনে বেখাপাত কবে... আমাদেব জীবন একখানা ডাযেবিব খাতা। এতে আমবা এক গল্প লিখতে চাই কিন্তু লিখে বসি আব এক গল্প। আমাদেব সব থেকে বিনীত মুহূর্ত সেইটি, যা লিখেছি আব যা লিখতে চেযেছিলাম, এই দুই-ই পাশাপাশি চোখেব সামনে বেখে শান্ত মনে বিচাব করতে পাবি।

আমার সঙ্গে মেলে। আমার এক গল্প লেখার কথা, আর লিখে বসেছি অন্য। জনারণ্যের মধ্যে থেকেই জীবন সার্থক করার সমস্ত রসদ আমার নাগালের মধ্যে ছিল। অথচ জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানের এই আল বাঁধা ক্ষেতে আমি এক নিঃসঙ্গ পথিক নিজের গড়া অন্ধকার সমুদ্রে ছোট এক জোনাকির মতো আশা আর নিরাশায় টিপ টিপ করে জ্বলেছি আর নিভেছি।

ভবিতব্য অনেক সময় আগে-ভাগে নাকি তার ছায়া ফেলে। আজ দু'বছর ধরে সেই ছায়া আমি অহরহ দেখতে পাচ্ছি। সেটা নড়ছে দুলছে আর খুব ধীরে অথচ অব্যর্থ গতিতে কাছে এগিয়ে আসছে। আসছেই। আমার নিঃসঙ্গ যাত্রা পরিণামের এক স্থির তটের দিকে এগিয়ে আসছে আর আমি যেন নিশ্চিত জানি, এ-যাত্রার মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে।

কিন্তু কেমন করে কোন পথ ধরে এ-শেষ হবে, আমার কোন ধারণা নেই। এ নিয়ে মাথাও ঘামাই নি। জীবনের এই বিনীত মুহূর্তটিকে এ-সব ভাবনা দিয়ে অত ভাবাক্রান্ত করতে চাই নে।

তিন বছরের মধ্যে মায়ের সঙ্গে আর দেখা করিনি। মায়ের সঙ্গে দেখা একবার অবশ্য হয়েছে যশোদার বিয়ের রাতে। মা ত্যাগ করলেও ওই মেয়েটা আমাকে ছাড়তে পারেনি। নিজে এসে আমাকে নেমন্তন্ন করেছে, যাবার জন্য ঝোলাঝুলি করেছে। গেছি। বিয়ের জন্য মস্ত একটা বাড়ি ভাড়া করা হয়েছিল, সেই বাড়িতে গেছি। পরের বছর ওর একটা ছেলে হয়েছে। যশোদার গোপাল, গোপালকে ও বাড়িতে এনে আমাকে দেখিয়ে গেছে। আমি ওদের শুভ কামনা করেছি। শুভ কামনার সেই স্বাদও আগে কখনো টের পাই নি।

আশ্চর্য, মায়ের দরজা আমার সামনে বন্ধ হয়ে গেছে, সেই জন্যে আর আমার একটুকু রাগ নেই ক্ষোভ নেই। শুধু একটুকু অভিমান যেন মনের কোণে লেগে আছে। তার বেশি কিছু নয়।

আমি শুধু এই নিঃসঙ্গ যাত্রার শেষ লগ্নের প্রতীক্ষায় বসে আছি। মন কেবলই বলছে, আর খুব দেরি নেই।

কিন্তু শেষের সেই মুহূর্ত হঠাৎ যেন একটু আড়ম্বর করেই এসেছে। কিন্তু এসেছে বড় অনায়াসে। খবরটা খুব জাঁকজমক করে কাগজে বেরিয়েছে বোধহয়, কিন্তু আমার মতে শেষ শেষই—কেমন করে এলো তা নিয়ে অত ঘটা কেন?

জিতু পোদ্দারের দল এই তিন বছরে দ্বিগুণ বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল। প্রয়োজনে অনায়াসে জীবন ছিনিয়ে নেবার খেলায় মেতে উঠেছিল ওরা। ওর প্রধান সাগরেদ মনা গাঙ্গুলি ও আরো দু'জন।

জিতু আর আমার দু'জনের জীবনের খেলাই যে একসঙ্গে ঘনিয়ে এসেছে, আচমকা ঘটনাটা ঘটে যাবার পাঁচ মিনিট আগেও কেউ জানতুম না...রাতে দক্ষিণের এক নির্জন রাস্তায় ওদের চারজনের তিনজনকে একটা বন্ধ দোকানের রকে বসে থাকতে দেখে আমার কেমন সন্দেহ হয়েছিল, ওদের কিছু মতলব আছে। আমাকে দেখে জিতু বলেছিল, তুমি আবার মরতে এ-সময় এখানে কেন, পথ দেখো না!

আমি হেসে বললাম, বেলা চারটে থেকে আজ শুধু পথই দেখছি, এবারে বসি একটু।

ঘণ্টাব পর ঘণ্টা আমাব টো-টো কবে পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর খবর বাখে ওরা। এই নিয়ে ঠাট্টা তামাসা করে। কিন্তু আজ যেন সে-রকম মুড নেই ওদের।

যেখানে বসে আছি, সেই জাযগায় অনেকখানি জুড়ে আবছা অন্ধকাব। আলো নেই। এক-একটা মোটর বা ট্রাক আসছে হেড লাইট জ্বেলে, সঙ্গে সঙ্গে ওদের তিন জোড়া চোখ যেন এক সঙ্গে সেদিকে ঝলসে উঠছে।

একটু বাদে দূরেব আলোয় দেখলাম, মাঝারি গতিতে একটা বড ঝকঝকে মোটব আসছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের তিনজনেব মধ্যে চোখেব ইশাবা খেলে গেল।...ওরা যে-কোনো মোটামুটি পছন্দসই শিকাবেব আশায বসে ছিল। শহব কলকাতার দৈনন্দিন স্বাভাবিক ঘটনা। চোখেব পলকে উঠে গেল ওবা, একজন একটা ভাঙা ঠেলা সামনে ধবতেই গাডিটা থেমে গেল। গাডিতে সামনে ড্রাইভার আব পিছনে মাঝবযসী একটি মহিলা। দু'জনেব হাতে ঝকঝকে ছোবা উঁচিযে উঠল, জিতু পোদ্দাবেব হাতে রিভলভাব।

দশ হাত দূরে বকে বসে নির্বাক মূর্তিব মতো দেখছি আমি। দবজা খুলে সঙ্গী দু'জন ড্রাইভারকে আগলে বাখতে চাইল, আর বিভলভাব হাতে জিতু পোদ্দার পিছনেব দবজা খুলে মহিলাকে প্রায আধা-আধি টেনে নামালো। সেই সঙ্গে চাপা গর্জন, নেমে এসে দশ সেকেণ্ডের মধ্যে গাযে যা আছে খুলে দিন, আব সঙ্গে যা আছে দিযে দিন...দেবি কবলে এ-জীবনে আব গযনা পবাব সুযোগ পাবেন না।

আমি বিস্ফারিত চোখে দেখছি, মহিলাব এক গা গয়না...সে কিছুতে গাড়ি থেকে বেবিযে আসতে চাইছে না...আমি দেখছি, একবোখা ড্রাইভাবটা জোব কবে নেমে এসে দু'জনেব সঙ্গে যুঝতে গিয়ে ছোরাব ঘায়ে মাটিতে লুটিযে পড়েছে—কিন্তু তখনো মনা গাঙ্গুলিকে আঁকড়ে ধবে আছে। এদিকে মহিলাকে প্রায় টেনে নামিযেছে জিতু পোদ্দাব —মহিলা ব্যাকুল ত্রাসে হঠাৎ আমাকে দেখে আর্তনাদ কবে উঠল, বাঁচাও বাবা, বাঁচাও, মেবে ফেলল, বাঁচাও—

সঙ্গে সঙ্গে কি যে হযে গেল আমার মাথার মধ্যে, কি যে বিভ্রম ঘটল আমার চোখের তাবায—মুহূর্তেব মধ্যে মহিলাব মুখ মুছে গেল। মনে হল, আমাব মাযেব মুখখানা স্পষ্ট দেখলাম, মনে হল, আমার মাকে টেনে নামাচ্ছে—মেবে ফেলছে।...মেবে ফেলবেই জানি, কারণ ওদেব বিলম্ব সয় না, কোনরকম বাধা ববদাস্ত করে না।

চোখের পলকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্যেব মতো জিতু পোদ্দাবের ওপব ঝাঁপিযে পডলাম আমি। এই বাধার জন্য ও একটুও প্রস্তুত ছিল না, ওব বিভলভাব আমাব হাতে, আচমকা আঘাতে মাটিতে হুমডি খেযে পডতে পডতে টাল সামলালো। মহিলাকে ...না দিশেহাবাব মতো আমাব মা-কেই আমি আবাব গাডির মধ্যে ঠেলে ঢোকাতে চেষ্টা করলাম!

আঃ! পিঠে আমার বিঁধে গেল কি, সত্তা নিঙড়ানো যন্ত্রণা একটা। তাবপবেই ঠিক ঘাড়ে আবার সেই আঘাত। মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম...মাথাব ওপব আবাবও জিতু পোদ্দারের ছোরা ঝলসে উঠেছে।

হাতের রিভলভার আমি সজ্ঞানে ছুঁড়েছি কিনা জানি না। জিতু পোদ্দারের ছোরা আর নামল না। আমার গা ঘেঁষেই ঢলে পডল সে। সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপর আবাব

একটা উদ্যত ছোবা...সামনে মনা গাঙ্গুলিব মুখ...আবাবও আমাব হাতেব রিভলভাবেব শব্দ। মনা গাঙ্গুলি তিন পাক ঘুবে মাটিতে পডল। হ্যাঁ তখনো জ্ঞান আছে আমাব, জ্ঞান হাবাতে দিচ্ছি না...তৃতীয লোকটা কোথায...মা-কে কি আমি বাঁচাতে পেবেছি ?

একটা গাডি থামাব শব্দ। লোকজন চেঁচামেচি। একটু বাদে আবো কাবা যেন ছুটে আসছে। উত্তেজিত স্ববে কি বলাবলি কবছে সব। বমণীব গলা কানে আসছে। কাবা আমাকে টেনে তুলতে চেষ্টা কবছে।...আমাব পাশেব লোকটা মবে গেছে বলছে...পবেব লোকটা নাকি উরুতে গুলি খেযে কাতবাচ্ছে...ড্রাইভাবটা জখম হযে অজ্ঞান হযে আছে ..মহিলা তাবস্ববে সকলকে বলছে কি...আমাকে ধবাধবি কবে গাডিতে তুলল কারা... বমণীব নবম বুকে আমাব মাথা।

আঃ। মা নাকি।

এই পবিণাম আমাব জানাই ছিল। সেটা কবে আসবে, কখন আসবে, কোন পথ ধবে আসবে বা শেষেব আসব ঠিক এই বকমই জমে উঠবে কিনা আমাব চিন্তাব মধ্যে সেটা বড হযে ওঠেনি।...তোমবাও বড কবে দেখো না। শিউবে উঠো না।

পবিণামেব এই আলোব বঙে আমাব চোখেব সামনে সমস্ত দুনিযাব বঙবদলেব উৎসব শুরু হযেছে। আমাব এই জড দেহেব শিবায শিবায এক অলক্ষ্য দক্ষশিল্পী তীব্র বেদনাব মীড টেনে চলেছে। তাই দেখে বাব বাব তোমবা শিউবে উঠছ। কিন্তু বিশ্বাস কবো. এক আসন্ন প্রত্যাশাব নিবিডতায আমাব এই নিথব দেহেব শিবা উপশিবাব তলায তলায এক অদ্ভুত স্পন্দন চলেছে।

. .নিজেব আনন্দে বিভোব, তাই তোমাদেব করুণ মুখগুলো আমি ঝাপসা দেখছি। ...মা ইন্দুমতী, তোমাব মুখখানা এমন পাথব কেন ? এতসব সেবা অভিনয কবাব পব এমন একটা সাদামাটা অঙ্কে এসে এই কাণ্ড তোমাব ? তুমি কি বুঝতে পাবছ না, মবীচিকাব প্রেতেব নাচ শেষ কবে তোমাব সুমন অনেক অনেক ব্যবধান পেবিযে যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই ফিবে এসেছে ? তুমি শিল্পী, ওপবেব ওই অলক্ষ্য শিল্পীব কাজ দেখে তুমি মুগ্ধ হতে পাবছ না ? তাহলে তোমাব পাশে তাকাও, বাবাব মুখখানা দেখো, আব তাব পাশে নতুন মাযেব মুখখানাও। এবাব পাবছ মুগ্ধ হতে ? ওপবেব ওই শিল্পী বসিক কত, বুঝতে পাবছ ?

যশোদা, তুমিও এসে গেছ। কী কাণ্ড, ঘবে তোমাব গোপাল কাঁদছে না ? আব শোভা মিত্র তোমবাই বা খবব পেলে কি কবে ? বেডিও আব খববেব কাগজগুলো সব দেশ থেকে তুলে দেওযা যায না।

দোহাই তোমাদেব, তোমবা আব যা-ই কবো, শোক কোবো না। শোকেব অহঙ্কাবে আমি অনেক ভুগেছি। আমাব এই স্তব্ধ অনাবিল মুহূর্তগুলিকে আব শোকেব শিকল পবিও না। এই কপালে শোকেব তিলক কেটে দিযে তোমাদেব অতি সাধাবণ সুমনকে অসাধাবণ কবে তুলতে চেও না। মিনতি বাখো, শোক কোবো না।

মা ইন্দুমতী, এ-ও সত্যিই অভিনযেব বেশি কিছু নয... শোক কোবো না।

মহাবিহার

বিদায় অনুষ্ঠানেও শীলাবতীর অভ্যস্ত সংযম আর গাম্ভীর্যের ব্যতিক্রম দেখল না কেউ। মেয়েরা তাঁকে ভক্তি করত এবং ভয় করত। শিক্ষয়িত্রীরা তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন এবং ভয় করতেন। এই চিরাচরিত ভক্তি শ্রদ্ধা ভয় কাটিয়ে শেষ বিদায়ের দিনেও কারো পক্ষে তাঁর খুব কাছে আসা হল না যেন। সকলের কাছে থেকেও শীলাবতী যেমন দূরে ছিলেন, তেমনি দূরেই থেকে গেলেন।

অল্প দু-চার কথায় স্কুলের উন্নতি কামনা করে সকলকে শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বিদায় গ্রহণ করলেন।

কর্মজীবন থেকে অবসর নিলেন শীলাবতী। তাঁর বয়স চুয়ান্ন। সরকারি বিধি অনুযায়ী আরো একবছর স্বচ্ছন্দে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে বহাল থাকতে পারতেন। সরকারি চাকরির মেয়াদ আরো তিন বছর, অর্থাৎ আটান্ন পর্যন্ত টানার জল্পনা-কল্পনা চলছে, এই একবছরের মধ্যে সেই নির্দেশও হয়ত এসে যেত। মোটমাট আরো চারটে বছর অনায়াসে স্কুলের সর্বে-সর্বা হয়ে থাকতে পারতেন শীলাবতী। এই দীর্ঘকাল ধরে যেমন ছিলেন।

কিন্তু স্বেচ্ছায়, বলতে গেলে, তদবির তদারক করেই অবসর গ্রহণ করলেন তিনি তার স্বাস্থ্য টিকছে না। স্কুলের এতবড় দায়িত্বভার বহন করতে তিনি অক্ষম।

এই বয়সেও তাঁর শরীরের বাঁধুনি দেখলে স্বাস্থ্যহানি ঘটেছে কেউ বলবে না। চুয়ান্নকে অনায়াসে চুয়াল্লিশ বলে চালানো যায়। অবশ্য, তাঁর হার্টের রোগ, বাইরে থেকে তাই অসুস্থতার ব্যাপারটা চট করে বোঝা যায় না। আর রাতে যে ভালো ঘুম হয় না, সেটা বাড়ির দুই একজন পরিচারিকা ভিন্ন আর কেউ টের পায় না। স্কুলে যখন আসেন, তাঁর ধীর-শান্ত গাম্ভীর্যের আড়ালে সব ক্লান্তি ঢাকা পড়ে যায়।

শুভার্থীজনেরা পরামর্শ দিতে এসেছিলেন, একেবারে অবসর নেবার দরকার কি, লম্বা ছুটি নিয়ে কোনো স্বাস্থ্যকর জায়গায় চলে গেলেই তো হয়, এক বরাদ্দ ছুটি ছাড়া আর কখনো কোনো ছুটিই তো শীলাবতী নেননি।

শীলাবতী মাথা নেড়েছেন। জীবনভোর তো শুধু চাকরিই করলেন। চাকরি আর নয়। এবারে বাধা-বন্ধনশূন্য ছুটি।

যে-মহিলা আজীবন বিরামশূন্য কর্তব্যের মধ্যে ডুবে রইলেন, আত্মীয় পরিজনবিহীন এই ছুটি তাঁর ক্ষতি করবে বলেই অনেকের ধারণা। সময় কাটবে কি করে, আদর্শপ্রাণা মহিলা কি নিয়ে থাকবেন এর পরে?

কিন্তু বিদায় নেবার পরমুহূর্ত থেকে কেউ তাঁকে দেখলে অবাক হতেন। টাঙ্গা করে একা বাড়ি ফিরছেন তিনি। সামনের আসনে বিদায়ী মালার বোঝা। শীলাবতী আপন মনে হাসছেন মৃদু মৃদু। কে তাকে কটা দিন হাসতে দেখেছে আপন মনে? ভালো লাগছে, হালকা লাগছে। চাকরি জীবনের সব আকর্ষণ, কর্তৃত্বের মোহ, কর্তব্যের শেকল—সব ওই কণ্ঠচ্যুত মালাগুলোর মতো জীবন থেকে খসে গেছে। এই মায়া কাটানোর জন্যে দীর্ঘকাল ধরে অনেক যুঝতে হয়েছে তাঁকে, অনেক বিনিদ্র রজনী

যাপন কবতে হযেছে। ওবা জানে না, জীবনে এই প্রথম সুখেব মুখ দেখতে চলেছেন শীলাবতী।

দেখতে দেখতে এই দিনটা কাটবে। এক ঘুমে এই বাত কাটবে। সকালেব ট্রেন ধববেন তিনি। তাবপব দেড়শ মাইল পথ ফুবোতে আব কতক্ষণ? শীলাবতীব আনন্দে ভবপুব চোখেব সামনে দেড়শ মাইল দূবেব সেই শান্ত স্নিগ্ধ মহাবিহাবেব পবিবেশটি ভেসে উঠল। বুদ্ধ তথাগতেব চবণস্পর্শে সোনা হযে আছে যেখানকাব মাটি, যেখানকাব বাতাসে মিশে আছে তাঁব সম্বোধিবাণী, যেখানকাব ধূলিমাটিতে, স্তূপে, তপোবনে, সংগ্রহশালায ছড়িযে আছে তাঁব প্রব্রজিত মহিমাব কত স্মৃতি।

কিন্তু কোনো পুণ্যস্মৃতিব আকর্ষণে ওই মহাপবিনির্বাণ স্থানে মন উধাও হযনি শীলাবতীব। তিনি সেখানে যাচ্ছেন একজনকে গ্রহণ কববেন বলে, একজনকে কাছে টানবেন বলে। খুব কাছে, একেবাবে বুকেব কাছে। সেখানকাব বহু গাইডেব মধ্যে যে ছেলেটা একেবাবে স্বতন্ত্র, এতবাব দেখাশোনাব ফলে যে-ছেলেটা এখন তাঁকে দেখলেই 'মাদাব মাদাব' বলে কাছে ছুটে আসে। মুখ খুললে অনর্গল প্রাযশুদ্ধ ইংবেজী বলে, গাল-গপ্প ফেঁদে সাগ্রহে মহাবিহাবেব ধূলি-কণা পর্যন্ত চেনাতে চেষ্টা কবে তাঁকে, তাবপব বিদায নেবাব আগে মুখেব দিকে চেযে দুষ্টু-দুষ্টু হাসে, বলে—এতক্ষণ তোমাব সঙ্গে কাটালুম, এতসব দেখালুম, ইউ সুড অ্যাটলিস্ট গিভ মি এ ফাইভ-রুপি নোট মাদাব।

তাকে। তাকেই আনতে যাচ্ছেন শীলাবতী। নিজেব অগোচবে আপন মনে আবো বেশি হাসছেন তিনি। ছেলেটা যেন তাঁব সামনেই দাঁড়িযে, হাসছে মুখ টিপে। প্রতিবাবেব মতোই দুষ্টুমি কবে বলছে—মাদাব আই অ্যাম বাহুল, বিমেম্বাব মি?

একবাশ ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল, দেখলেই মন-পাখি ওগুলোব প্রতি উৎসুক হযে ওঠে। ফবসা বঙ অযত্নে তামাটে দেখায, জোড়া ভুরু, টানা চোখেব স্বচ্ছদৃষ্টি সর্বদা চঞ্চল। ঠোঁটেব ফাঁকে এক টুকবো হাসি যেন লেগেই আছে, হাসলে আবো সুন্দব দেখায। বছব চব্বিশ হবে এখন বযস, হিসেবে ভুল হবাব কথা নয শীলাবতীব —কিন্তু দেখায যেন আঠাবো-উনিশ। খুব লম্বা নয একটু বোগা ধবনেব, ট্রাউজাবেব দুই পকেটে হাত ঢুকিযে সামনেব দিকে একটু ঝোঁক নিযে হাঁটে, আব মুখে অনর্গল খই ফোটে।

গেল বাবেব কথা মনে হতে আবো বেশি হাসি পেল শীলাবতীব। তিন দিন ছিলেন, তিন দিনই মহাবিহাবে গিযেছিলেন। স্কুলে পব পব কযেকদিন ছুটি থাকলেই গিযে থাকেন। গেল বাবেব তৃতীয দিনে বাহুল অন্য-দর্শক জুটিযে ফেলেছিল তিনি যাবাব আগেই। তাকে না পেযে চুপচাপ দাঁড়িযে ছিলেন। অদূবেব কতগুলো ভগ্নস্তূপেব ফাঁক দিযে ছেলেটাই প্রথম দেখল তাঁকে। দেখে তাব দল ছেড়ে কাছে এগিযে এল। ঠোঁটেব ফাঁকে হাসি ঝবল—তুমি আসবে, কাল বলে যাওনি তো মাদাব, আই অ্যাম এনগেজড, হাউ-এভাব, আ-অ্যাম গিভিং ইউ এ গুড গাইড।

মুখেব দিকে চেযেছিলেন শীলাবতী, হেসেছিলেনও হযত একটু আব অল্প মাথা নেড়েছিলেন। অর্থাৎ, তাতে হবে না।

ছেলেটা বিব্রত হয়েছিল, আবাব একটু খুশিও হয়েছিল।

—ওয়েট হিযাব, লেট মি সি।

একটু বাদে দর্শকদলটিকে অন্যেব হাতে গছিযে দিযে সে ফিবে এসেছিল।

—কাম অন মাদাব, আ-অ্যাম ফব ইউ নাও।

সেদিন শীলাবতী ইচ্ছে কবেই ছেলেটাকে জ্বালিযেছিলেন একটু। এখানে যত স্মৃতি ছড়িযে আছে এক বছব ধবে তাব বিববণ শুনলেও ফুবাবে না। তাঁব প্রদর্শক যে-গল্পই ফেঁদে বসে, শীলাবতী বাধা দেন, বলেন—সত্যেব মধ্যে তুমি গল্প মেশাচ্ছ, আমি তো শুনেছি এটা এই, এটাব এই-এই ব্যাপাব—

বাব কযেক থমকে গিযে ছেলেটা ঈষৎ বিস্মষ মেশানো কৌতুকে নিবীক্ষণ কবেছে তাঁকে।—আব ইউ এ হিস্টোবিযান, মাদাব?

ইতিহাসে বিশেষজ্ঞা তিনি, সেটা আগে কখনও প্রকাশ পাযনি। আগে কান পেতে তিনি ছেলেটাব কথাগুলো আস্বাদন কবেছেন শুধু, তাৎপর্য খোঁজেননি। সেদিনও প্রশ্নেব জবাব এড়িযে হাসিমুখে বলেছিলেন—কেন, আমাব মতো দর্শককে বোঝাতে গিযে খুব সুবিধে লাগছে না বুঝি?

অপ্রতিভ না হযে ছেলেটা দিব্যি হেসেছিল, বলেছিল—তা কেন, তোমাদেব ওই শুকনো ইতিহাস আওডালে এখানে লোক আসা ছেড়ে দেবে আব আমাদেবও উপোস কবে মবতে হবে।

—তা বলে লোককে বানিযে বানিযে গল্প বলবে, সত্যি বলবে না?

বড বিচিত্র জবাব দিযেছিল ওই দুষ্টু ছেলেটা। এখনো কানে লেগে আছে। মুখেব দিকে চেযে মিটিমিটি হেসেছিল আব বলেছিল।—এই বানানো গল্পই আমবা সত্যি বলে বিশ্বাস কবি, আব লোকেবও বিশ্বাস কবতে ভালো লাগে মাদাব। ভগবানেব মহিমা বলাব মধ্যে আবাব মিথ্যা কি আছে। তাছাডা, তোমাব ওই ইতিহাস যাবা লিখেছে, তাবা সব নির্জলা সত্যি লিখে গেছে, তাই বা কি কবে জানলে?

এবপব শীলাবতী আব একটাও তর্ক তোলেননি।

আবাব হাসি পাচ্ছে। বিদাযেব আগে ছেলেটা মুখখানা গম্ভীব কবে তুলতে চেষ্টা কবে অসঙ্কোচে বলেছিল—তোমাব জন্য একটা বড দল হাতছাড়া কবেছি মাদাব, দিস টাইম ইউ সুড গিভ মি এ টেন-রুপি নোট।

টাকা আদাযেব বেলায ছেলে লাজ-লজ্জাব ধাব ধাবে না। ফস ফস কবে বলে বসে। ছদ্ম বিস্মযে চোখ কপালে তুলেছিলেন শীলাবতী।—পাঁচ থেকে একেবাবে দশ। কেন, অত টাকা দিযে কি হবে?

তক্ষুণি বুঝেছে পাবে। তাই জোব দিযে বলেছিল—তোমাদেব কাছে আবাব অত কি মাদাব। কিছু বেশি পেলে একটু ভালো থাকতে পাবি, একটু ভালো খেতে পাই, একটু ভালো পবতে পাবি—অথচ ও-কটা টাকা তোমাদেব কাছে কিছু নয।

শীলাবতী ওব হাতে একটা দশ টাকাব নোট গুঁজে দিযে তাড়াতাড়ি চলে এসেছিলেন। সেদিন বুকেব হাড-পাঁজব টনটনিযে উঠেছিল। আজ হাসছেন। আজ নিজেব সঙ্গে সব বোঝাপডা শেষ বলেই হাসতে পাবছেন। অস্ফুটস্ববে নিজেব মনেই

বলছেন কিছু। বলছেন, বক্তে লেগে আছে সুখেব স্বাদ, ভালো থাকতে খেতে পবতে চাইবে না কেন। দেখি, এবাব থেকে কত সুখে থাকতে পাবিস তুই, আব তোকে লোকেব কাছে হাত পেতে বেড়াতে হবে না।

বাড়ি।

গাম্ভীর্যেব বর্ম-আঁটা কর্ত্রীব বদলে এইদিনে একখানা হাসিখুশি মুখ দেখবে, বাড়িব পবিচাবক-পবিচাবিকা ক'টিও আশা কবেনি হযত। আবো বিস্মিত হল, কর্ত্রী তাদেব ঘবে ডেকে এনে ভাবি সদয মুখে দু মাসেব কবে মাইনে আগাম দিযে বিদায দিলেন যখন। এই বাত পোহালে তাবা অন্য কাজ দেখে নেয যেন, তিনি এখান থেকে চলে যাচ্ছেন।

জিনিস-পত্র একবকম গোছগাছ কবাই ছিল। স্যুটকেসটা গুছিযে নিলেন। আব যা থাকল, সকালেই হযে যাবে। স্যুটকেস থেকে শীলাবতী তাঁব তরুণ গাইডেব ছবিটা বাব কবে টেবিলে বাখলেন। হাসছেন মুখ টিপে। গাইডই বটে। বাকি জীবনটা ওই ছেলেব সর্দাবীতে চলতে হবে। ছেলেটাও যেন তাই বুঝেই হাসছে তাঁব দিকে চেযে।

ছবিটা অনেকদিন আগে শীলাবতী নিজেব হাতে তুলেছিলেন। ওব পবিচয সম্বন্ধে একেবাবে নিঃসংশয হবাবও আগে। ওকে দেখে অনেক সম্ভব-অসম্ভব যখন মনেব মধ্যে ভিড কবে আসত, তখন। ওকে দেখলে কবেকাব কোন বিস্মৃত স্মৃতিব উৎসে যখন বান ডাকত, তখন। ওব মুখেব দিকে চেযে হাসলে বুকেব শুকনো হাডপাঁজবে যখন সুখেব প্রলেপ লাগত, তখন।

তিন বছব আগে এই ছবি যে তিনি তুলে এনেছিলেন সেটা শঙ্কব আচার্যও জানতেন না। যিনি অনেক প্রত্যাশীকে বাতিল কবে এই গাইড তাঁকে ঠিক কবে দিযেছিলেন। আব সে-সমযে কিছু গোপন কবাব জন্য যিনি সন্তর্পণে এক ছদ্ম গাম্ভীর্যেব বিববে নিজেকে প্রচ্ছন্ন বাখতে চেষ্টা কবেছিলেন।

ছবিটা তুলে এনে শীলাবতী এই ঘবেব এই টেবিলেই বেখেছিল। দেখে পবিচিতেবা জিজ্ঞাসা কবেছেন, এ কে ?. কেউ বা সমনোযোগে দেখে শুধিযেছেন, ছোট ভাই-টাই কেউ নাকি ? অনেকটা আপনাব মতোই মুখেব আদল—

না, তখনো শঙ্কব আচার্য তাঁকে বলেননি এ কে। কিন্তু মর্মস্থলেব অনুভূতি দিযে যা বোঝবাব শীলাবতী বুঝে নিযেছিলেন। অতিথি অভ্যাগতেব প্রশ্ন এবং মন্তব্য শুনলে আশায উদ্দীপনায তাঁব মুখ লাল হত। গাম্ভীর্যেব আড়াল নিতে হত তাঁকেও।

শীলাবতীব জীবনে দুটো ঝড গেছে। একটা ছোট, একটা বড। যাঁকে কেন্দ্র কবে ওই বড ঝড, তিনি শঙ্কব আচার্য।

যা হবাব কথা নয, শীলাবতীব জীবনে একে একে তাই হযেছে। তাই ঘটেছে। ব্লাডপ্রেসাবে কাবু দবিদ্র ইস্কুল মাস্টাবেব পনেব বছবেব বিধবা মেযে সসম্মানে এম. এ. পাশ কবে নিজেব দু পাযে ভব কবে একদিন সোজা হযে দাঁড়াবে—সে আশা সেদিন সুদূব স্বপ্নেব মতো ছিল। কিন্তু সেই স্বপ্ন সত্য হল যখন, তখন এক মর্মান্তিক আঘাতে বুক ভেঙে গেল তাঁব। সেই ভাঙা বুক আব জোড়া লাগেনি।

কিন্তু সে সব অনেক পবেব কথা। তাব অনেক আগে ভবিতব্যেব কথা। মেয়ে সুশ্রী, চৌদ্দ বছবে বিযে দিযেছিলেন। এক বছব না ঘুবতে ঝডজলে নৌকাডুবি হযে তবতাজা জামাই খোযালেন তিনি। পনেব বছবেব মেযেব বৈধব্য দেখলেন। তাও সহ্য কবলেন।

গঙ্গাব গর্ভে যাঁকে হাবালেন, তাঁকে ভালো কবে চেনা হযনি শীলাবতীব। কিন্তু প্রায পনেব বছব বাদে এক বিচিত্র গোধূলিতে সেই গঙ্গাব বুকেই যে একজনকে পেলেন, তাঁকে একেবাবে ছেঁটে দিতে কোনোদিনই পাবেননি শীলাবতী। আগেও না, পবেও না।

তিনি শঙ্কব আচার্য।

অবস্থাপন্ন, বক্ষণশীল উত্তবপ্রদেশীয পবিবাবেব ছেলে। বাডিতে বাবো মাসে তেব পার্বণেব প্রচলন।

দূব সম্পর্কেব আত্মীয শীলাবতীদেব। শীলাবতীব বাবা তাঁদেবই অনুগৃহীত ছিলেন। একই বাডিতে এক বিচ্ছিন্ন অংশে থাকতেন। শীলাবতী বিধবা হবাব পব সেই বাডিব কৃতি সন্তান শঙ্কব আচার্যই একটা অবলম্বনেব পথ দেখালেন। শঙ্কব আচার্য তখন বাইশ-তেইশ বছবেব তরুণ। বিশ্ববিদ্যালযেব বত্নবিশেষ। তাঁব আগ্রহে উৎসাহে উদ্দীপনায হতাশাব মধ্যে একটুকবো আলো দেখলেন দুঃখী পবিবাবটি। শীলাবতীব পডাশুনা চলতে লাগল।

আচার্যগৃহে একটা চাপা সংশয দেখা গেল আবো সাত-আট বছব পবে। কূলেব গৌবব অমন হীবেব টুকবো ছেলে বিযে কবতে চায না কেন? শঙ্কব আচার্য তখন অধ্যাপনা কবেন। ছোট এক ভাইযেব বিযে হযে গেল, কিন্তু তিনি বিযেব কথা কানেও তোলেন না। আবো তিন চাব বছব বাদে বাডিব লোকেব সন্দেহ আবো ঘনীভূত হল। বত্রিশ-তেত্রিশ বছব বযসেও ছেলেকে বিযেতে বাজি কবানো গেল না।

চেষ্টা শীলাবতীও কবেছেন। বলেছেন—ব্যাপাবটা ভালো হচ্ছে না। পাঁচজনে পাঁচ বকম ভাবছেন। তাঁব বিযে কবা উচিত। তাঁব জীবনে শঙ্কব আচার্য বিধাতাব পবম আশীর্বাদেব মতোই এসেছেন, কেউ তাঁকে হেয চোখে দেখলে তাঁব পবিতাপেব সীমা থাকবে না।

শঙ্কব আচার্য এ-কথাও কানে তোলেননি। প্রথমে বলেছেন, ও-সব ঝামেলা পোযানোব সময নেই তাঁব। পবে সবাসবি বলেছেন, তিনি পৈতৃক সম্পত্তিব প্রত্যাশা বাখেন না, বিধবা বিবাহ কবলে আপত্তি কি।

শুনে শীলাবতী কানে আঙুল দিযেছেন। পবে তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা কবেছেন। কিন্তু কথা তুললে শঙ্কব আচার্য ওই এক কথাই বলেন। শীলাবতীকে বেশি বিরূপ হতে দেখলে বলেন্ন, একটা সমস্যাকে বড কবে তুলে লাভ কি, তাব থেকে আমি যেমন আছি থাকতে দাও—বিযে না কবলেও মানুষেব দিন কাটে।

তা-ই কাটতে লাগল। এবও তিন বছব বাদে শীলাবতীব শেষ পবীক্ষা হযে গেল। আশাতীত ফলেব ঘোষণা যেদিন কানে এল, কৃতজ্ঞতায শীলাবতীব দুচোখ ছলছল কবে উঠেছিল। এই সাফল্যেব ষোল আনাই কাব প্রাপ্য, এ তাঁব থেকে ভালো আব কে জানে?

সেইদিনই শঙ্কব আচার্য এক সময তাঁকে জানালেন, কিছু আলোচনা আছে। ব্যবস্থামতো এক জাযগায সাক্ষাৎ হল দুজনাব। তখনো সন্ধ্যা হযনি। কি ভেবে শঙ্কব আচার্য একটা নৌকো ভাডা কবলেন। এই দূবেব এলাকায কেউ তাঁদেব চিনবে না। তাছাডা একটু বাদেই দিনেব বিদাযী আলো নিশ্চিহ্ন হবে।

কিন্তু কথা কিছু হল না। মুখোমুখি দুজনে চুপচাপ বসে বইলেন। মাঝি তাব ইচ্ছেমতো নৌকা বেযে চলল।

অনেকক্ষণ বাদে শীলাবতী জিজ্ঞাসা কবলেন, কি বলবে?

শঙ্কব আচার্য হেসে বললেন—অনেক বলব, অনেক বোঝাব ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কিছুই বলাব নেই, কিছুই বোঝাবাব নেই। যা-ই বলি ঘুবে ফিবে সেটা এই ভেসে বেডানোব কথাই।

সমস্তক্ষণেব মধ্যে আব কথা হযনি। দুজনে মুখোমুখি বসেছিলেন—মাঝে বেশ খানিকটা ব্যবধান। দুজনে দুজনকে এক-একবাব দেখেছেন শুধু।

কিন্তু সেদিন আকাশে ষডযন্ত্র ছিল। বাতাসে জাদুব মোহ ছিল। ভবা জ্যোৎস্নায থালাব মতো চাঁদেব বুকে সব-খোযানোব ইশাবা ছিল। সেই জ্যোৎস্না-ধোযা জলেব কলকাকলিতে সর্বনাশা কানাকানি ছিল।

শঙ্কব আচার্য হাত ধবে নৌকা থেকে নামালেন যখন, শীলাবতী তখনো আত্মবিস্মৃত, বিহ্বল। হাতেব স্পর্শেও সর্বাঙ্গ থব থব কেঁপে উঠল।

তাবপব বাত্রি। নিঝুম, নীবব বাত্রি। দবজায মৃদু শব্দ হল। শীলাবতী চমকে উঠলেন। দুই কান উৎকর্ণ। তিনি জানতেন কেউ আসবে। তিনি জানতেন বন্ধ দবজা খুলে দিতে হবে।

খুলে দিলেন।

এই বাতেব যৌবনঃবাস্তবেব আগন্তুককে ফেবাবাব সাধ্য তাঁব নেই। ফেবাবাব ইচ্ছেও নেই।

সেই বিহ্বলতাব মধ্যেই একে একে আবো অনেকগুলো বাত কেটে গেল। দিনেব অবসানে উন্মুক্ত দুটি হৃদযেব একটি প্রতীক্ষা। বাতেব প্রতীক্ষা।

এব পব শঙ্কব আচার্যই আত্মস্থ হলেন প্রথমে। তিনি ঘোষণা কবলেন শীলাবতীকে বিবাহ কববেন।

বনেদী বক্ষণশীল সংসাবে যেন বাজ পডল একটা। শঙ্কব আচার্যব বাবা নির্মম হযে উঠলেন। এদিকে তেমনি বজ্রাহত হযেছিলেন শীলাবতীব বাবা। তাব ওপব বুকে অপমানেব শেল বিদ্ধ হল। বৃদ্ধ প্রভু আচার্য বডো নির্মমভাবে তাঁকে শাসালেন, বিশ্বাসঘাতক বেইমান বললেন, সেই মুহূর্তে মেযে নিযে তাঁকে দূব হযে যেতে বললেন।

সেই মুহূর্তে না হোক, দুদিনেব মধ্যে শীলাবতীব বাবা বডো আঘাত নিযে এই জগৎ-সংসাব থেকেই দূব হযে গেলেন। ব্লাডপ্রেসাবেব বোগী, কটূক্তি শুনতে শুনতেই এক সময মাথা ঘুবে পডে গেলেন। মৃত্যুব দু ঘণ্টা আগে একখানা হাত তুলে কিছু যেন নিষেধ কবতে চেষ্টা কবেছিলেন শীলাবতীকে। সেটা আব কেউ না বুঝুক শীলাবতী বুঝেছিলেন।

একটা সামান্য চাকরি সংগ্রহ করে শীলাবতী বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছিলেন। কিন্তু শঙ্কর আচার্য পবিত্যাগ করতে চাননি তাঁকে। স্থির সঙ্কল্প নিয়েই এসেছিলেন। ত্যাজ্যপুত্র হবেন, এতবড় বিষয়-আশয় থেকে বঞ্চিত হবেন—বাপেব এই ঘোষণারও পরোযা করেননি। কিন্তু শীলাবতী রাজি হননি। শান্ত, দৃঢ কণ্ঠে বলেছেন—তোমাকে আমি কোনোদিন চিনতে ভুল কবিনি, তবু এখানেই এর শেষ হোক।

তাঁকে বোঝানো সম্ভব হয়নি।

শেষ সেখানেই হল না। নিজের দেহের অভ্যন্তবেই নতুন বার্তার সূচনা উপলব্ধি কবলেন কিছুদিন যেতে না যেতে। আগন্তুক আসছে। শীলাবতী এইবার বিচলিত হলেন একটু। নতুন কবে মনস্থিব কবতে হল আবার। শঙ্কব আচার্যকে ডেকে পাঠালেন।

শুনে শঙ্কর আচার্য আব এক দফা মত বদলাতে চেষ্টা কবলেন শীলাবতীর। অনেক অনুরোধ কবলেন, অনেক অনুনয কবলেন, বাগ অভিমান পর্যন্ত কবলেন। কিন্তু বিযেতে রাজি করাতে পাবলেন না তাঁকে। শীলাবতীব এক কথা, যে আসছে তাব ব্যবস্থার ভাব শুধু তুমি নাও, নিযে আমাকে মুক্তি দাও। তোমাকেও আমি তার সঙ্গে জড়াতে বলছি না, তোমাব অর্থেব জোব আছে, অনেক বকম ব্যবস্থাই তোমাব পক্ষে সহজ।

যথাসমযে সন্তান এসেছে। নির্মম শান্ত চিত্তে শীলাবতী আটদিনের ছেলেকে তাঁর হাতে তুলে দিযেছেন। বলেছেন,—তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি, তোমাব ওপর আমার কোনো অভিযোগ নেই। তুমি যে ব্যবস্থা কববে তাই আমি ওব পক্ষে ভালো বলে ধরে নেব।

এব পব অনেকদিন আব শঙ্কব আচার্য তাঁর সঙ্গে দেখা কবেননি। তবু একদিন শীলাবতীব কানে খবব এল একটা। শঙ্কর আচার্যেব বাবা তাঁকে বিষয-আশয থেকে বঞ্চিত কবাব সিদ্ধান্ত করেছেন নাকি ! তাঁর বিশ্বাস, তাঁব অবর্তমানে ছেলে শীলাবতীকেই ঘবে এনে তুলবে। শীলাবতী ভেবেচিন্তে একটা চিঠি লিখলেন শঙ্কব আচার্যকে। লিখলেন, আমাকে যদি ভালোই বেসে থাক কোনোদিন, বোকামি করে এত বড শাস্তি তুমি আমার মাথায চাপিয়ে দিও না। আমাব কাজেব ব্রত পণ্ড কোবো না, কাউকে ঘরে এনে তাব প্রতি সুবিচাব করলে আমিই সব থেকে খুশি হব।

তারপর শঙ্কব আচার্য বিয়ে করেছেন. খববটা পাওযা মাত্র শীলাবতীব বুক থেকে মস্ত একটা বোঝা নেমে গিযেছিল যেন।

দু বছর চাব বছব বাদে এক-একবাব দেখা হযেছে তাঁদেব। আশ্চর্যবকম সহজ হতে পেরেছেন দুজনেই। গোড়ায় একবার মাত্র ক্ষণিকেব জন্য এক শিশুব প্রসঙ্গে ঈষৎ কৌতূহল দেখা গিযেছিল শীলাবতীব। শঙ্কর আচার্য হাসিমুখে বলেছিলেন, জানতে চেও না। তাব পক্ষে যা ভালো তাই করেছি।

দশ বারো বছব-বাদে শীলাবতী হঠাৎ আর একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন—সত্যি আছে, না গেছে ?

—আছে। ভালোই আছে। কিন্তু আজ তোমাব দুর্বলতা দেখলে আমি রাগ করব।

শীলাবতী তৎক্ষণাৎ নিজেকে সংযত করেছেন। কঠিন তাডনায় নিজেকে কর্তব্যেব পথে টেনে নিয়ে গেছেন। অবকাশ কখনো চাননি। অবকাশ শত্রু।

বছর তিনেক আগের কথা। মহাবিহারে এসেছিলেন। সঙ্গে শঙ্কর আচার্য ছিলেন। এই বয়সে নির্লিপ্ত সহজ মেলামেশাটা আরো সহজ হয়েছে।

এত গাইডের মধ্যে শঙ্কর আচার্য খুঁজে পেতে ওই বাহুলকে বার করলেন। ছেলেটা তাঁকে খুব ভালো করে চেনে আর ভক্তিশ্রদ্ধাও করে মনে হল। হঠাৎ কি মনে হতে হৃৎপিণ্ডের রক্তচলাচল থেমে আসার উপক্রম শীলাবতীর। ছেলেটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে অন্তস্থলে এমন একটা আলোড়ন উঠল কেন তাঁর। এই ঈষৎ চঞ্চল মিষ্টি কচিমুখখানা বড়ো কাছের, বড়ো আকাঙ্ক্ষার এক স্বপ্নের চেনা বলে মনে হল কেন তাঁর! শঙ্কর আচার্যের মুখের অভিব্যক্তি যেন অন্যরকম।

সম্ভাবনাটা সমূলে বাতিল করতে চেষ্টা করলেন শীলাবতী। অসম্ভবই ভাবলেন। কিন্তু ছেলেটাকে ভারি ভালো লাগল তাঁর। চটপটে, ছটফটে। মুখে হাসি লেগেই আছে —আর অনর্গল কথা।

সাহস করে গাইড প্রসঙ্গে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করলেন না শীলাবতী। যা ভাবছেন, সত্যি তো নয়ই, উল্টে যে দুর্বলতা প্রকাশ পাবে, তা হয়ত আর গোপন করা সম্ভব হবে না।

কিন্তু বাড়ি ফিরে একটা অস্বস্তিই বড়ো হয়ে উঠতে লাগল আবার, শঙ্কর আচার্য বেছে বেছে ওকেই ডাকলেন কেন? সকৌতুকে বার বার তাঁকেই দেখছিলেন কেন? কিছুকাল বাদে আর এক ছুটিতে শীলাবতী একাই এলেন মহাবিহারে। খুঁজে খুঁজে ওই গাইডকেই বার করলেন। দিব্যি আলাপ জমে উঠল সেবারে।

এরপর মাঝে মাঝেই আসতে লাগলেন তিনি। কয়েকদিনের ছুটি পেলেই আসেন। কি এক অদৃশ্য আকর্ষণ তাঁকে যেন টেনে আনে। ছেলেটা 'মাদার মাদার' বলে হাসিমুখে সামনে এসে দাঁড়ায়। শীলাবতী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সে ইংরেজি বলে কেন, মাতৃভাষা জানে না?

ছেলেটা হেসে বলেছিল, জানে। তবে ছেলেবেলা থেকে মিশনে মানুষ বলে ইংরেজি বলতেই সুবিধে হয়। আরো হেসে মন্তব্য করেছিল, তোমাদের মতো শিক্ষিত দর্শকদের কাছে তার কদরও বেশি হয় মাদার।

ধারণাটা ক্রমশ বদ্ধমূল হয়ে আসছিল শীলাবতীর। তাঁর ঘরে ওর ছবি দেখেও তো অনেকে জিজ্ঞাসা করেছে, কে হয়। তারা তো কিছু কল্পনা করে নি, তারা মিল দেখে কি করে?

আর সহ্য করতে না পেরে শেষে শঙ্কর আচার্যকে চিঠি লিখলেন। সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন, তাঁর ধারণা সত্যি কি না।

দিনকয়েক বাদে জবাব এল, সত্যি।

এই কটা দিন অধীর আগ্রহে উন্মুখ হয়েছিলেন শীলাবতী। জবাব পাওয়ামাত্র দেহের সমস্ত রক্ত যেন মুখের দিকে ছোটাছুটি করতে লাগল। আত্মস্থ হওয়ার পর প্রথমেই ভয়ানক রাগ হল শঙ্কর আচার্যর ওপর। অন্যের কাছে হাত পেতে জীবিকা অর্জনের পথে ঠেলে দিয়েছেন বলে জীবনে আর যেন ক্ষমা করতে পারবেন না তাঁকে। অথচ মন বলছে, ওই পথে এসেছে বলেই ছেলেটার অমন সুন্দর অমলিন মুখ আজও। দেখলেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে।

রাতেব ঘুম গেছে শীলাবতীর। আগের দিনেব চেয়ে পবের দিন শবীব বেশি খারাপ মনে হয়েছে। কাজে মন দেওয়া শক্ত হয়েছে। জানার পব আব মহাবিহারে যাননি। সব বোঝাবুঝির অবসান হয়েছে, সব পিছুটান গেছে। এইবার যাবেন।

মহাবিহারে পৌঁছুলেন যখন, প্রায় বিকেল। দুপুবে সামান্য বিশ্রামেব সময় বলে ইচ্ছে কবেই দেবিতে এলেন একটু।

খুঁজতে হল না। হাসিখুশি মুখে সাগ্রহে সে নিজেই এগিয়ে এল। বলল, এবাবে তুমি অনেক দিন পবে এলে মাদাব।

শীলাবতীও হাসলেন।—হ্যাঁ, তুমি ভালো ছিলে?

—পা-ফেকটলি। বাট অয়্যাব ইউ অল বাইট মাদাব ?—তাব দৃষ্টিতে ঈষৎ সংশয়।

শীলাবতীব ইচ্ছে হল দু হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে আনেন। হাসিমুখে জবাব দিলেন—ভালোই তো ছিলাম—কেন, তুমি খাবাপ দেখছ ?

এ-প্রসঙ্গ বাতিল কবে দিয়ে ছেলেটা তডবড কবে বলল—এস, তোমাকে শোনাব বলেই এবাবে অনেক নতুন কিছু স্টাডি কবে বেখেছি।

দ্বিধাজডিত কণ্ঠে শীলাবতী বললেন—কিন্তু আজ তোমাব সঙ্গে আমাব অন্য কিছু কথা ছিল বাহুল।

ছেলেটা হাসিমাখা কৌতুকে দুই-এক মুহূর্ত দেখল তাঁকে। তাবপব চিবাচবিত চঞ্চল ব্যস্ততায় বলল—কথা পবে শুনব, ও দিকে আলো কমে আসছে, আগে তোমাকে দেখিয়ে শুনিয়ে দিই, নইলে টাকা আদায় কবব কোন মুখে ? দিস টাইম অলসো আই এক্সপেক্ট এ টেন-রুপি নোট।

শীলাবতী সতৃষ্ণচোখে চেয়ে আছেন তাব দিকে। বললেন—তাব থেকে অনেক বেশিই দেব।

—বিযেলি ? হাউ লাকি !—খুশিব আতিশয্যে মাথা ঝাঁকিয়ে পা বাড়াল, এসো শীগগিব, এবপব কিছু দেখতে পাবে না, আবো আগে আসা উচিত ছিল—

অগত্যা নিরুপায় শীলাবতী অনুসবণ কবলেন তাকে। সে পাথব দেখাচ্ছে, মূর্তি দেখাচ্ছে, স্তূপ দেখাচ্ছে, আব মন্তব্য জুডছে। কিন্তু শীলাবতীব কানে কিছুই যাচ্ছে না। তিনি শুধু দেখছেন তাকে। খেযাল হলে মাঝে মাঝে মাথা নাডছেন, অর্থাৎ মনোযোগ দিয়েই শুনছেন যেন তিনি। একবাব শুধু তাব কথা শুনে বুকেব তলায মোচড পডেছিল একটা। একদিকে আঙুল দিযে দেখিয়ে বাহুল বলছিল, ওটা অজ্ঞাতকৌণ্ডিল্যেব স্তূপ—একেবাবে অজ্ঞাতকুলশীল একজন তপস্যাব জোবে তথাগতকে পবিতুষ্ট কবেছিলেন—ওটা তাঁব স্মৃতি।

ঈষৎ অসহিষ্ণু মুখে শীলাবতী বলেছিলেন—তা তো হল, আমাব কথা শুনবে কখন ?

হাসিমুখেই ছেলেটা নিশ্চিন্ত কবেছিল তাঁকে—আমাব সঙ্গে থাকলে কেউ তোমাকে যেতে বলবে না, ছ'টা বাজুক—এই দেখো, মৃগদাব তপোবন। এবারে কত বাডানো হয়েছে, আব এত হবিণও তুমি গেল বারে দেখনি—মৃগদাবেব গল্প জানো তো ?

শীলাবতী মাথা নাড়লেন, জানেন। ছেলে আবার মহা উৎসাহে স্তম্ভ আর মূর্তি আর সংগ্রহ-বিশ্লেষণে মেতে গেল।

ছ'টা বাজল। ছ'টা পর্যন্তই নির্দিষ্ট মেয়াদ এখানকার। বড় করে একটা দম ফেলল ছেলেটা। ঈষৎ শ্রান্ত। মিষ্টি করে হাসল তাঁর দিকে চেয়ে। বলল—আচ্ছা, এবারে এস গল্প করা যাক।

একটা বড় হলের ভেতর দিয়ে কোথায় নিয়ে চলল তাঁকে জানেন না। লোকজন চলে যাওয়ায় ফাঁকা পরিবেশ স্তব্ধ লাগছে।

তাঁকে নিয়ে গোটা হল পেরিয়ে আর একটা বড় হল ঘরে এল সে। সেই ঘরে প্রায় ছাদ-ছোঁয়া বুদ্ধের এক প্রকাণ্ড মর্মর মূর্তি। ছেলেটা সোজা সেই মূর্তির পায়ের কাছে বসে পড়ে সেই পায়েই বেশ আরাম করে ঠেস দিল। নরম করে একটু হেসে বলল—কাজ না থাকলে আমি এখানে বসে বিশ্রাম করি। ভালো লাগে। তুমি ওই শিলার ওপর বোস মাদার, তারপর বল কি কথা আছে—

শীলাবতী বসলেন। কি এক অস্বস্তি যেন তাঁকে পেয়ে বসছে। তবু সঙ্কোচ করলে চলবে না। মৃদু শান্ত মুখেই বললেন—তোমাকে আমি নিতে এসেছি, আমার সঙ্গে চল, আমার কাছেই থাকবে তুমি।

এটুকু মাত্র বলে নিজেই বিস্মিত তিনি। শোনামাত্র বিষম অবাক হবে ভেবেছিলেন, হতভম্ব হবে ভেবেছিলেন। কিন্তু তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রাহুল হাসছে মিটিমিটি। তার মুখে চোখে অপ্রত্যাশিত কিছু শোনার চিহ্নমাত্র নেই। এমন সুন্দর হাসিও শীলাবতী আর যেন দেখেননি।

একটু অপেক্ষা করে খুব সহজ মুখে রাহুল বলল—মাদার, তুমি কে আমি জানি। গেল বারে মিস্টার আচার্য বলেছেন। আমার বাবা কে বলেননি, কিন্তু তোমাকে তিনি চিনিয়ে দিয়ে গেছেন। তুমি একদিন এই ইচ্ছে নিয়ে আসবে জেনেই হয়ত তিনি জানিয়ে রাখা দরকার মনে করেছিলেন—

আশায় আশঙ্কায় শীলাবতীর সর্বাঙ্গের স্নায়ুগুলি কাঁপছে থরথর করে। জীবনের চরম কথা অথবা পরম কথা—যা হোক একটা কিছু যেন তিনি শুনবেন এক্ষুনি।

বুদ্ধের মসৃণ পায়ের দিকটায় হাত বুলাতে বুলাতে খুব মিষ্টি করেই রাহুল আবার বলে গেল—দেখো মাদার, জন্মের পর থেকে এত বড় বঞ্চনারও এতটুকু দাগ লাগেনি যাঁর দয়ায়, এই বয়সে তাঁর পায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে আজ আর কতটুকু আশ্রয় তুমি আমাকে দিতে পারো বলো। তুমি কষ্ট পেও না, আমি খুব ভালো আছি। আমাকে এখান থেকে নিয়ে গিয়ে আমাকে তুমি নিরাশ্রয় করতে চেও না মাদার।

উঠল। শান্ত মুখে আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে চলে গেল সে।

শূন্য ঘর।...সমুন্নত বিশাল-বক্ষ প্রসন্ননেত্র শিলাময় অমিতাভ মূর্তি।

সামনে চিত্রার্পিতা শীলাবতী।

অভিরতি

গাঁয়ের নামে নাম বউটিব।

পাহাড়ঘেঁষা রুক্ষ গ্রামটাব নাম 'ভবানী'। আর মহেশকরের ঘবের বউয়ের নাম 'ভবানীবাঈ'।

তা বিয়ের আগে নামেব মুখরক্ষা করেছিল বটে মেয়েটা। মাবাঠী রাজপুত দলবী ঘরেব মেযে। পোষ মানাতে গেলে ফোঁস কবে ওঠা স্বভাব। তার ওপব ছেলেবেলা থেকে মাথার ওপর কড়া অভিভাবক না থাকার ফলে অপবিণত বয়সের স্বাধীন ইচ্ছায বাধা-বিঘ্ন তেমন পড়ে নি। ভাই ফৌজে চাকবি করে। বছরে দু-বছরে কখনো-সখনো এসে দু-দশদিনের জন্য ঘুবে যায়। বাপ অন্ধ। বসন্ত হয়ে প্রথমে একটা চোখ গিয়েছিল, পরে দ্বিতীয়টারও দৃষ্টি গেছে। দাবিদ্র্যেব সংসাব সামাল দিতে দিতেই মাযের হিমসিম অবস্থা, মেয়েকে আগলাবে কখন?

ফলে সময়ে বিযেও হয নি মেয়েটাব। ওদের ঘবে ছোট বয়সে বিয়ে হয়। তার ওপর চোখে পড়ার মতো চোখা রূপ নেই যে কেউ সেধে এসে ঘবে নিযে যাবে। মোটামুটি সুশ্রী হলেও দুবন্তপনা আব বেয়াড়াপনাব ফলে চেহারায় একটা পুরুষালি কাঠিন্য দিনকে দিন বেশি প্রাধান্য লাভ কবছিল। তাব জ্বালায অস্থির পড়শিনীদের অনেক সময মন্তব্য কবতে শোনা গেছে, ওটা মেয়ে না হযে ছেলে হলে অন্ধ বাপের কাজে লাগত, ও-মেযে নির্ঘাত হাত-পা ভেঙে বাপেব বোঝা হবে একদিন।

পারলে এমন মেয়ের হাত-পা হযত ভেঙেই দিত কেউ। হাত-পা অল্প-স্বল্প ভেঙে একটু শিক্ষা হোক এমন আশাও যে কেউ কবে না এ-কথাও হলপ করে বলা যায় না। ভোব হতে না হতে ছেলেমেযের দঙ্গল নিযে ভবানী হুড়মুড় করে একেবারে ওই পাহাডেব ডগায় গিযে উঠবে। পাহাডটাব আডাল থেকে সূর্যোদয় হয বলেই ওটাব নাম সুবয পাহাড। সূর্যোদয় দেখে তাবা আবার দৌড়ঝাঁপ কবে নেমে আসে। এই ওঠা-নামার বেষাবেষিতে ছেলেরাও পেরে ওঠে না তার সঙ্গে। আব ওই মেয়ে জখম হওয়াব বদলে একটু আধটু জখম অন্যেব ছেলেমেয়েরাই হয়।

পাহাডের অনতিদূবে ছাতলি নদী। নামেই নদী, বারো মাস শুকনো নুড়িপাথরের হাড়-পাঁজব বার কবেই আছে। ওই শুকনো নদীতেই হুটোপুটি কবে সকলে, আর দৈবাৎ কখনো বেশি বর্ষা হলে বা বান ডাকলে আশেপাশেব বাসিন্দাবা প্রমাদ গোনে। ওই দস্যি মেয়েকে তখন রুখবে কে, সকাল-সন্ধ্যায চাববাব কবে সেই খরজলে ঝাঁপাঝাঁপি করবেই। করুক, তাতে আপত্তি নেই, কিন্তু সেই সঙ্গে ঘবের ছেলেমেয়েদেরও যে ঠেকানো-যায় না। একবাব তো একজনের মেযে ডুবতে ডুবতে বেঁচেছে, আর একবার একটা ছেলে পাথরে চোট খেয়ে পুরো একদিন অজ্ঞান হয়ে ছিল।

এটা মৌজা গ্রাম, অর্থাৎ দোকান-পাট হাট-বাজার নেই। ভবানী রোজ কসবায যায় হাট-বাজার সওদাপত্র করতে। যেখানে ওসব আছে তার নাম 'কসবা'। তা সেখানেও নিত্য ঝগড়া করে আসে। যে দামে যে জিনিস পাওয়ার অভিলাষ তা আদায় না করে নড়বে না। দোকানীকে কটু কথা বলবে, সুবিধে বুঝে ভয়ও দেখাবে।

সকলেই তিক্ত বিবক্ত তাব ওপব।

এবপব আবো কিছু বযেস হতে মেযেটাব দুবন্তপনা অতটা প্রত্যক্ষগোচব না হোক, তাব বেযাড়াপনাব আঁচ সকলেবই গাযে লাগে। মেযেব বিযে নিযে ওব বাপ-মাকে দুকথা শোনাতে গেলে, এমন কি দুটো সৎ পবামর্শ দিতে গেলেও ওই মেযেব বসনাব ঘাযে পালাবাব পথ মেলে না। অথচ, এ ব্যাপাবেও তাদেব তৎপব না হযে উপায কি? উঠতি বযেসেব ঘবেব ছেলেগুলো যে ওব আশেপাশেই ছোঁক ছোঁক কবে বেড়ায!

শেষে ওদেব এক-ঘবে কবাবই মতলব ফেঁদেছিল পাড়াপড়শীবা। এত বযেস পর্যন্ত অমন মেযে ঘবে পুষে বাখাটা অপবাধেবই সামিল। কত বুড়ো-হাবড়া অন্ধ-খঞ্জ আছে, একজনেব হাতে গছিযে দিলেই তো হয।

বযস্ক মাতব্ববেবা কথাটা তুলল গাঁযেব পাটিল ও মোড়ল কেশবকবেব কাছে। কেশবকব প্রায বৃদ্ধ, কিন্তু বেশ সবল পুরুষ। মস্ত যোদ্ধাবংশেব সন্তান, তাকেও বীবপুরুষ জ্ঞানে মান্য-গণ্য কবে সকলে। তাদেব বীব-বংশেব অনেক কথা আজও উপকথা হযে আছে। এই গুণেই গাঁযেব পাটিল সে। গ্রামেব বিপবীত প্রান্তে থাকে। দূবে থাকলেও সূবয পাহাড়েব ধাবেব এক দুর্বিনীত দুবন্ত মেযেব খবব তাব কানে আগেই এসেছিল।

এব বিহিত কবতে গিযেই এক তাজ্জব ব্যাপাব ঘটল। শুনে গ্রামবাসীবা অন্তত তাজ্জব বনে গেল। পাটিল কেশবকব নিজে এলো ভবানীব অন্ধ বাপেব সঙ্গে দেখা কবতে, সেই সঙ্গে তাব দৃপ্ত মেযেটাকেও দেখল। ডাকতে হয নি, বাপেব বিচাব হবে কথাটা কানে আসতে কোমবে হাত দিযে নিজেই সামনে এসে দাঁড়িযেছিল।

তাবপব বৃদ্ধ মোড়লকে আবো দুই-একদিন এসে মেযেব বাপেব সঙ্গে শলাপবামর্শ কবতে দেখা গেল। অন্ধ বাপ তাব দু-হাত ধবে আনন্দে গদগদ।

পাটিল একটা বিহিতেব মতোই বিহিত কবল বটে। শুনে প্রথমে হাঁ হযে গেল সবাই। কেশবকব নিজেব ছেলে মহেশকবেব সঙ্গে বিযে ঠিক কবেছে ভবানীব।

প্রথম বিস্ময কাটতে সকলেব হাড়ে হাতাস লাগল। মেযেটা মোক্ষম জব্দ হবে এইবাব।

ঈর্ষাব বদলে তাদেব এই আনন্দেবও বিশেষ একটা কাবণ আছে। মহেশকব বিপত্নীক। বছব দেড়েক হল, ওব বউ বাণীবাঈ আত্মহত্যা কবেছে। বাণীবাঈযেব রূপ ছিল। সেই রূপেব জোবেই বোধহয দুর্দান্ত একবোখা মহেশকবকে সে বশ কবতে পেবেছিল। দুজনে দুজনকে ভালোবাসতও খুব। সেই বাণীবাঈ আত্মঘাতিনী হল। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেউ তাব নিন্দা কবে নি, ববং তাকে মহীযসী বলেছে। আত্মঘাতিনী হবাব কাবণ, ছেলেমানুষি কৌতূহল নিযে সে কার্তিক পূজো দেখে ফেলেছিল। সংস্কাব, সধবা স্ত্রীলোক কার্তিক পূজো দেখলে তাব অবশ্যম্ভাবী ফল বৈধব্য। বাণীবাঈ অতশত জানত না, পবে জানল। জেনে নিজেব হাতে বৈধব্যযোগ খণ্ডন কবে দিযে গেল।

মহেশকর ফৌজে চাকরি করে তখন, বিদেশেই থাকে। বীর-বংশের ছেলে বীরপুরুষই হয়—অল্প সময়ের মধ্যেই সে হাবিলদার হয়েছিল। সুযোগ সুবিধে পেলেই এবার বউকে নিয়ে আসবে ভাবছিল। তার মধ্যে এই দুর্ঘটনা। শুনেই দেশে ছুটল সে। তারপর চেষ্টাচরিত্র করে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বসল।.

সকলেই প্রায় বউয়ের নামে ধন্য ধন্য করল তার কাছে। এমন কি মহেশকরের বাপ-মাও। কিন্তু দুই-একজন অতি নির্ভরযোগ্য পড়শী-বন্ধু তার কান বিষিয়ে দিয়েছিল। তারা আড়ালে জানালো রাণীবাঈ বৈধব্যযোগ খণ্ডন করার জন্য আত্মত্যাগ করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু তার আগে কার্তিক পূজো দেখে ফেলার অপরাধে শ্বশুর-শাশুড়ীর গঞ্জনাও বড় কম ভোগ করে নি। একমাত্র ছেলের শঙ্কায় তারা বউয়ের ওপর বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হয়েছিল।

দুনিয়ায় শুধু এই বাপের মুখের দিকে চোখ তুলে কখনও কথা বলে নি মহেশকর। এরপরেও বলল না। কিন্তু বাপের সঙ্গে একটা নীরব বিচ্ছেদ সৃষ্টি হয়ে গেল।

আবার বিয়ের কথা শুনে ভিতরে ভিতরে ফুঁসে উঠল মহেশকর। বাধার আভাস পেয়ে কেশবকর জানিয়ে দিল, বিয়ে না করলে বাপের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকবে না। অতএব মহেশকর বাধা দিল না। সে চাকরি করে না, বর্ধিষ্ণু বাপের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচে গেলে তার চলবে না। এই সঙ্গে বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত সে আর আপত্তি করল না। কিন্তু বাপের সুনজরে পড়ে রাণীবাঈয়ের জায়গা দখল করতে যে মেয়েটা আসছে—সব রাগ বিদ্বেষ গিয়ে পড়ল তার ওপর।

এদিকে সকলের হাড় জুড়লো, কারণ তারা ভাবল যোগ্যে যোগ্য মিলন হয়েছে। যেমন বেয়াড়া মেয়ে, তেমনি মুগুর জুটেছে। আক্কেল হয়েছে।

মহেশকরকে এখনও ভয়ই করে সকলে। ওই ছেলে ফৌজে চাকরি না করলে, বা এভাবে প্রথম বউ না মরলে, তার দাপটে গাঁয়ে টেকা দায় হত বোধ করি। যেমন রগচটা তেমনি একরোখা। তবে ফৌজী দলে ছিল বলে, আর নিজেকে বীরপুরুষ ভাবে বলে, আগের সেই ছেলেমানুষি অত্যাচারের ঝোঁক গেছে। সমবয়সীরা এখন তাকে তোয়াজ করে চলে—গাঁয়ের খণ্ডোবার সঙ্গে তার তেজস্বিতার তুলনা দেয়। ঘোড়ায় আসীন অসি-হস্তি খণ্ডোবা হলেন দেশরক্ষক দেবতা—মহাদেবের অবতার।

মদের গেলাসের ইয়ার-বন্ধুরা ঠাট্টা করল—স্বয়ং ভবানী আসছেন, এবারে কার দাপট বেশি দেখা যাক।...এরও তাৎপর্য আছে, ভবানী হলেন গ্রাম-রক্ষয়িত্রী দেবী—প্রতি গ্রামেই ভবানী-মূর্তি আছে।

আশা সফল হল। বিয়ের মাস না ঘুরতেই দেব-দেবীর খণ্ডযুদ্ধ বেধে গেল। একে তো কার জায়গায় এসে বসেছে নতুন বউ সেই হিসেব করে চলে না, তার ওপর চোখ রাঙাতে গেলে ফিরে যে-ভাবে তাকায়, তা বরদাস্ত করার মানুষ নয় মহেশকর। তাছাড়া বাপ এনেছে বলে রাগ তো আছেই। ভ্রূকুটি গ্রাহ্য করে না বলে হাত নিশপিশ অনেকদিন থেকেই করছে, কিন্তু সেদিন মৃতা রাণীবাঈ সম্পর্কে কি একটা উক্তি করে বসতে আর সহ্য হল না। হাতের লোহার মতো পাঁচটা আঙুল ভবানীবাঈয়ের গালের ওপর ফুটে উঠল।

হতভম্ব ভবানী অতিকষ্টে চোখেব জল সামলালো। দাঁতে কবে ঠোঁট কামডে খবচোখে মুখেব দিকে চেযে বইল।

মহেশকব শাসালো, এই মুখে ফেব ওই নাম আনবি তো মুখ একেবাবে ভেঙে দেব।

সেই থেকে শুরু। ভবানী ওই নাম মুখে এনেও মাব খেযেছে, আব স্বামীব দাপটেব ওপব দাপট কবেও মাব খেযেছে। বউ শাসন কবা একটা মনেব মতো কাজ হযেছে মহেশকবেব। আব ওই জেদী দুর্বিনীত মেযেকে শাসন কবাব ব্যাপাবে একটা সুবিধেও আছে। অত মাব খেযেও জোবে কাঁদে না, কাঁদেই না বলতে গেলে। আব শ্বশুবেব কাছে নালিশও কবে না। শ্বশুব বাডি না থাকলে সমান তালে রুখে ওঠে, ফলে আবো বেশি মাব খায। বাগে বিদ্বেষে ভবানীবাঈ এক-একসময স্বামীব লোকান্তবিত প্রিযা অর্থাৎ বাণীবাঈযেব উদ্দেশেও কটূক্তি কবে বসে। ফল কি হবে জেনেও কবে। অন্ধ আক্রোশে কিল-চড পডতে থাকে তখন। ভবানীবও শক্ত সবল হাত আছে দুটো, যতক্ষণ সম্ভব যোঝে সে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাল ছাডতে হয। অমন অসুব শক্তিব সঙ্গে সে পাববে কেন।

কিন্তু হাল ছাডলেও হাব মানে না। ফলে মহেশকবেব বউকে শাযেস্তা কবাব গোঁ আবো বাডে।

এই পুরুষেব বাতেব নিভৃত বাসনাব মুহূর্তগুলিও কেমন নির্মম হিংস্র মনে হয ভবানীব। মহেশকব জঠবে মদ ঢেলে বাসনাব তাপ জুডতে চেষ্টা কবে প্রথম। এক-একসময বিফল হয যখন, তখনই শুধু কাছে আসে। আব আসে যখন, ভবানীব ওপব দিযে একটা বড বকমেব ধকল যায। নিষ্ঠুব জড পেষণেব মতো লাগে। মাযামমতাশূন্য পবপুরুষ কবলিত মনে হয নিজেকে।

বছব না ঘুবতে কেশবকব হঠাৎ চোখ বুজল। মহেশকবেব বউ শাসনেব স্বাধীনতা আব একটু বাডল। এই কবে আবো দুটো বছব কেটে গেল। স্বভাবেব ধাত বদলায নি কাবো। কিন্তু ভিতবে ভিতবে দুজনেই কিছুটা শ্রান্ত।

দোলেব দিন সেটা। এখানকাব যোদ্ধাবংশীযবা এই দিনে ঘটা কবে বীব-উৎসব কবে। মহেশকবেব বাডিতেও এই বীব-উৎসব বহুকাল ধবে চলে আসছে। এ সবে মহেশকবেব উৎসাহ খুব। শিবপূজাতেও সে বীবেব মতো শোণিত-সুবাব অর্ঘ্য দেয। মদেব পাত্রে নিজেব বাহু কেটে অনেকটাই বক্ত দিযে ফেলে। প্রথমবাব তাব বক্ত দেওযা দেখে ভবানী ভিতবে ভিতবে একটু শঙ্কিত হযেছিল।

হোলিব সন্ধ্যাস অতিথি-অভ্যাগতবা এসেছে মহেশকবেব বাডিতে বীব-পূজায যোগ দিতে। একটু আগে মদ খেযে আগুনেব চাবদিকে নাচ-গান কবেছে সকলে। মেযে-পুরুষে আগুনেব চাবদিক ঘিবে বসেছে। এইবাব মৃত বীব ব্যক্তিদেব উদ্দেশে শ্রদ্ধা জানানো হবে, তাদেব যশেব কথা, খ্যাতিব কথা, বীবত্বেব কথা বলে এই উৎসবে আবাহন কবা হবে তাদেব। বিশ্বাস, তাদেব আত্মা আসে, এক-এক সময কোনো একটি আত্মা এসে ভবও কবে তাব পবিবাবেব বা অন্য কাবো ওপব। ভব হলে মহা আনন্দেব ব্যাপাব। যাব ওপব ভব হয, সে অজ্ঞান হযে যায। তাব মুখ দিযে মৃত আত্মা তখন কথা বলে।

সকাল থেকেই ভবানীর শরীরটা অসুস্থ ছিল। সেও ঘরের এক কোণে চুপচাপ বসে আছে, থেকে থেকে ঝিমুনি আসছে।

মৃত আত্মাব স্তুতি এবং আবাহনের মাঝামাঝি সময়ে দেখা গেল, সে হঠাৎ ঢলে পড়েছে! হাত-পা ছুঁড়ে কার সঙ্গে যেন যুঝতে চেষ্টা কবল একটু, তাব পরেই জ্ঞান হারালো।

হকচকিয়ে গেল সকলেই। মুখ চাওয়া-চাওয়ি কবতে লাগল। মৃত আত্মা রমণীব ওপরে ভব কবে এ-রকমটা শোনা নেই বড।

সহসা চমকে উঠল সকলে। ভবানীবাই আস্তে আস্তে উঠে বসেছে। তার চোখমুখ স্বাভাবিক নয় খুব। উজ্জ্বল দুই চক্ষু মেলে সে চেয়ে আছে মহেশকরেব দিকে।

—আমি বাণীবাঈ এসেছি!

সকলে নির্বাক। মহেশকর বিমূঢ় বিভ্রান্ত। এ-বকম কণ্ঠস্বরও যেন কেউ শোনে নি আব।

তেমনি স্থিব স্পষ্ট স্ববে ভবানীবাঈযের মুখ দিয়ে বাণীবাঈ বলে যেতে লাগল, তাব স্বামী বীব, বীব স্বামীব ভালোবাসাব টানে সে কোথাও যেতে পারছে না; সর্বদা পাশে পাশে ঘুরছে। আজ সপত্নীব আশ্রযে সে স্বামীর কাছে এসেছে—এসেছে, কাবণ স্বামী সর্বদাই তাকে স্মবণ কবছে। এই আশ্রয় সে সহজে ছাড়বে না, স্বামীর মন বুঝে দুঃখ-বেদনা বুঝে, সে মাঝে মাঝে আসবে।

ভবানীবাঈযেব দুচোখ আবাব ঘোলাটে হযে আসতে লাগল। মাথা আবাব ঢলে পড়ল।

ঘবেব মেযে-পুরুষেবা স্তব্ধ। মহেশকরেব মুখে বক্ত নেই।

সকলে যখন চলে গেছে, সেই রাতে স্ত্রীর শুশ্রূষায প্রথম বসেছে মহেশকর। পাখাব বাতাস কবেছে, গায়ে পিঠে হাত বুলিযে দিযেছে।

ভবানীবাঈ চোখ মেলে তাকালো তাব দিকে। মহেশকর মুখের কাছে ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করল—কেমন আছিস?

ভবানীবাঈ জবাব দিল না। ক্লান্ত দুই চোখ বুজে এলো আবার।

পবের ছ-সাত মাসে সত্যিই বাব পাঁচেক বাণীবাঈযেব ভর হল ভবানীবাঈয়েব ওপর। এবারে ভব যখন হয, তখন আর বাইরেব লোক কেউ থাকে না, শুধু বাড়িব লোক থাকে। বাণীবাঈ কথা বলে মহেশকরেব সঙ্গে। মহেশকব চেযে থাকে। সব শোনে। কথা বলে না।

দেখতে দেখতে মহেশকবেব মধ্যে একটা বড বকমেব পরিবর্তন দেখা গেল। স্ত্রীকে অর্থাৎ ভবানীবাঈকে মার ধব কবা দূরে থাক, তাব ওপব বাগ পর্যন্ত কবে না। ভবানীবাঈ ইচ্ছে কবে দোষ করলেও না। স্ত্রীর দিকে তাকিযে হাসে, স্ত্রীকে আদর করতে আসে। ঘর ছেড়ে বাইরে থাকতে চায় না বেশিক্ষণ। তার মুখের রুক্ষ কঠিন ছাপটা ক্রমশই মুছে যাচ্ছে।

কিন্তু পরিবর্তন কিছু ভবানীবাঈয়েরও হয়েছে। বিপরীত পরিবর্তন। কারণে অকারণে তার মেজাজ চড়ে। মহেশকরের হাসি দেখলে তাব গা জ্বলে। আদর করতে

এলে তাকে ঠেলে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। সে তো জানে এত আদর সোহাগ ভালোবাসা কার উদ্দেশ্যে। সে তো উপলক্ষ মাত্র। শুধু সে কেন, মহেশকরের এমন পরিবর্তনের কারণ বাইরের লোকেরাও জানে। রাণীবাঈয়ের ভর হবার পরে সকল বৃত্তান্ত অন্যেরাই ভবানীবাঈকে সাগ্রহে শুনিয়ে যায়।

ভবানীবাঈয়ের ভিতরে ভিতরে শুকনো টান ধরছে একটা। চোখ জ্বলে, মন জ্বলে, বুক জ্বলে। অসহ্য লাগে এক-একসময়।

আশ্বিনের দশেরার দিন এলো।

এই দিনের দিবাভাগে পুরুষেরা ঘোড়া পূজা, অস্ত্র পূজা, শাস্ত্রগ্রন্থ পূজা করে। মহেশকরের এ-সব অনুষ্ঠানেও ত্রুটি নেই। সন্ধ্যায় স্ত্রীরা কপালে নতুন সিঁদুর দিয়ে, মাথায় আতপ চালের ডালা রেখে স্বামীকে আরতি করে। তারপর তাকে আদর করে বসিয়ে নারকেল বাতাসা খেতে দেয়। স্বামী রুপোর টাকা দেয় স্ত্রীকে।

সন্ধ্যায় মহেশকর ঘরে বসে আছে। কিছুর যেন প্রতীক্ষা করছে সে। অদূরে মেঝেতে ভবানীবাঈ বসে। রুক্ষ, কঠিন মূর্তি। লোকটা বসে আছে বলেই তার রাগ।

স্ত্রীর ভাবগতিক সুবিধের না ঠেকলেও মহেশকর আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করল —আমাকে বরণ করবি না, আরতি করবি না?

জবাবে ভবানীবাঈ শুধু দুই চোখে আগুন ছড়ালো এক পশলা।

মহেশকর আবার বলল—এত ভালোবাসিস তুই আমাকে, আরতি করবি না? কর না—আমি রুপোর টাকা রেখেছি তোর জন্যে।

ভবানীবাঈ ঘোরালো চোখে তাকালো তার দিকে, বুকের আগুন মাথায় উঠেছে। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল—আমি তোমাকে একটুও ভালোবাসি না, তোমাকে ভালোবাসে রাণীবাঈ।

বলতে বলতে হঠাৎ আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সে, একেবারে কাণ্ডজ্ঞান খুইয়ে বসল। দিশেহারা ক্রোধে এতদিনের সব জ্বালা যেন উদগিরণ করতে লাগল। মহেশকরের হাসিমুখ ঝলসে দিয়ে বলতে লাগল—আমি তোমাকে একটুও ভালোবাসি না, তুমি আকাট বোকা, তাই ভাবো রাণীবাঈ আসে তোমার কাছে— তোমার কাছে কেউ আসে না, আমার ওপর কেউ কোনোদিন ভর করে নি—কেউ ভর করে না—সব আমি ইচ্ছে করে করি, তোমার মতো বোকাকে ভোলাবার জন্যে আমিই সব করি—বুঝলে? আমি তোমাকে একটুও ভালোবাসি না, আমি তোমাকে ঘৃণা করি, ঘৃণা করি—

আত্মঘাতী স্পর্ধাভরে ভবানীবাঈ চেয়ে রইল তার দিকে।

এইবার কি স্ত্রী-হত্যা ঘটে যাবে একটা?

কিন্তু পরমুহূর্তে ভবানীবাঈ হতভম্ব। ওই মুখে বিস্ময় বিরাগ ক্রোধের চিহ্নমাত্র নেই। মুখের দিকে চেয়ে মহেশকর হাসছে। অনুরাগের ভরপুর হাসি।

বলল—আমি জানি, আমার কাছে কেউ কখনো আসে নি—আসে না। এই করে শুধু তুই-ই আসিস। আমাকে যদি ভালোই না বাসবি তাহলে নিজেকে খুইয়ে রাণীবাঈ হয়েও আমাকে পেতে চাস কেন তুই?

বাগ গেছে, ঘৃণা গেছে, ওই হাসিমুখেব দিকে ভবানীবাঈ ফ্যালফ্যাল কবে চেযে আছে শুধু। দেখছে। চোখেব কোণ দুটো ঝাপসা হযে আসছে, সর্বাঙ্গে কি এক অজ্ঞাত শিহবণ অনুভব কবছে। হঠাৎ ধডমড কবে উঠে ঘব ছেডে ভাঁডাবেব দিকে ছুটল সে—ববণ-ডালা সাজাতে হবে।

আজ ভবানীবাঈ স্বামীব আবতি কববে।

মান

দেযালেব দিকে কচি আঙুল তুলে তিন বছবেব ছেলে জিজ্ঞাসা কবত—ও কে?

বিষ্ণুচবণ বলত, তোব মা। আব, ওই তুই, মাযেব দুধ খাচ্ছিস।

কচি ছেলেটা দুষ্টু চোখে চেযে চেযে দেখত। কবে মাযেব বুকেব দুধ খেত মনে নেই, কিন্তু একটু স্মৃতিব মতো কিছু যেন লেগে আছে। তাই ওই মস্ত ছবিটাব মধ্যে মজাব এক খোবাক পেত সে। স্তনভাবেব একটি তাব মুখে গোঁজা, মুখেব চাবভাগেব তিন ভাগ ওব আডালে পডে গেছে। বুকেব কাপডেব আধখানা সবিযে অন্যটিও তাব কচি হাতেব দখলে বেখেছে। অর্থাৎ ওটিও তাবই সম্পত্তি।

অবোধ শিশুব এই কৌতূহলেব আবো একটা কাবণ থাকতে পাবে। তিন বছব বযসেই এই মাকে ত্রাসেব চোখে দেখত। উঠতে বসতে কর্কশ ধমক, কিল চড, আছাড-ঝাঁকানি ছাডা আদব-টাদব বড একটা জোটে নি। সেই মা একদিন তাকে এমনি কোলে শুইযে দুধ খাওযাতো, এও হযত শিশু-মনেব কম বিস্ময নয।

বিষ্ণুচবণেব তখন আজকেব মতো ছবি-বাঁধাই আব ছবি-বিক্রিব দোকান ছিল না। সে তখন এক নাম-কবা ফোটো-স্টুডিওব খাস বেযাবা ছিল। তাব সততা কর্ম-তৎপবতা আব উপস্থিত-বুদ্ধিব জন্য স্টুডিওব বিদেশী-মালিক পছন্দ কবত তাকে, অন্যান্য কর্মচাবী আব ফটোগ্রাফাববাও ভালোবাসত। সকলেব মাথাব উপব তাব মাথাটা আধহাত উঁচিযে থাকত বলে, স্টুডিওব অনেকে তাকে ডাকত 'লম্বাচবণ'।

বিষ্ণুচবণেব চেহাবাটা ভব্যসভ্য ছিল, থাকতও বেশ পবিচ্ছন্ন। সাহেবপাডায স্টুডিও। কত সাহেব-মেম হোমবাচোমবা মেযেপুরুষ ছবি তোলাতে বা ক্যামেবা কিনতে আসত ঠিক নেই। এব মধ্যে মলিন বেশ-বাস নিজেব চোখেই বে-খাপ্পা লাগত বিষ্ণুচবণেব, তাছাডা মালিকও অখুশী হত। জামা-কাপড কেনা বা সে-সব পবিষ্কাব পবিচ্ছন্ন বাখাব বাডতি খবচটা সে মালিকেব ওপব দিযেই পুষিযে নিত।

বিষ্ণুচবণেব ভিতবে ভিতবে একটা সহজাত কৌতূহলেব উৎস ছিল। ফোটোগ্রাফাববা কেমন কবে ছবি তোলে, সুন্দব সুন্দব মেযে-পুরুষেবা এমন হুবহু ছবিব মধ্যে কি কবে ধবা পডে—এই সব জানাব প্রতি তাব বিষম ঔৎসুক্য। হেড-ফোটোগ্রাফাবেব সঙ্গেই ছিল তাব সব থেকে বেশি খাতিব। ভদ্রলোক সত্যিকাবেব শিল্পী ছিল বলেই বিষ্ণুচবণেব কৌতূহল প্রশ্রয় পেত। বিনিমযে বিষ্ণুচবণও তাব পাদমূলে অজস্র তৈল সিঞ্চন কবত, সর্বদা তোযাজ তোষামোদ কবত তাব। অসুখ-

বিসুখ হলে তাব বাড়ি গিযে খোঁজ-খবব নিত, এমনকি সেবা-শুশ্রূষাও কবত। তাব কাছ থেকেই বিষ্ণুচবণ গোপনে অনেক সুন্দবী মেযেব ছবিব কপি সংগ্রহ কবেছিল। আব এই ভদ্রলোকই তাব ছবি-তোলা শেখাব গুরু।

মালিকেব অগোচবে এবং অনুপস্থিতিতে স্টুডিওব দবজা বন্ধ কবে গোপনে তাব শিক্ষাব মহড়া শুরু হযেছিল। প্রথমে সস্তা ক্যামেবায হাত পাকিযেছিল সে। শিক্ষা-গুরুটি তাব মধ্যেও বোধ কবি একটা সুপ্ত শিল্পিসত্তা আবিষ্কাব কবেছিল। তাব তৎপবতা, বিচাব-বিবেচনা, সহজাত পবিমিতি বোধ, ইত্যাদি দেখে অনেক সময সে অবাক হযেছে। অবকাশ সময়ে গোপনে প্রায ঝোঁকেব বশেই ক্রমশ দামী দামী ক্যামেবায হাত দিতে দিযেছে তাকে।

কযেক বছব যেতে গুরু নিজেই তাকে পবামর্শ দিযেছে—এখানে বেযাবাগিবি না কবে কোনো ছোটখাটো ফোটোগ্রাফিব দোকানে ঢুকে পড, অনেকেব থেকেই ভালো ছবি তুলবে তুমি।

গুরুটি একাধিকবাব তাকে দিযে ফ্লাশ-বালবে কোনো প্রতিষ্ঠানেব অভ্যন্তবেব ছবি তুলিযে নিজেব বলে চালিযেও ধবা পড়ে নি।

কিন্তু বিষ্ণুচবণ এতবড স্টুডিও আব এই গুরু ছেড়ে নডতে চায নি। এখানে থেকে উঁচু নজব হযে গেছে তাব। ক্যামেবা প্রাণেব জিনিস, চেষ্টাচবিত্র কবে গুরুব সাহায্যে ধাবে সস্তাব ক্যামেবা একটা অনাযাসে সে কিনতে পাবত, কিন্তু অতকাল আগেবও সেই দামী দামী ক্যামেবায হাত মক্স হওযাব ফলে সস্তাব ক্যামেবা তাব মনে ওঠে নি। ভগবান দিন যদি দেন কখনো, ওই দামী ক্যামেবাই একটা হবে তাব।

ইতিমধ্যে বিষ্ণুচবণ ঘবে বউ এনেছিল। তাদেব ঘবে বেশ সুন্দবী বউ বলতে হবে। মোটা-সোটা গোল-গাল গডন, ফবসা। বউযেব রূপ দেখে গুণেব দিকে তাকানোব কথা মনেও হয নি তাব। এই না-তাকানোব খেদ ঘোচবাব নয। যাই হোক, বিষ্ণুচবণ বিযে কবেছিল এবং যথাসমযে ছেলে শম্ভুচবণেব আবির্ভাব ঘটেছিল।

ছেলেব যখন সাত-আটমাস বযেস, তখনই সেই অভিনব ব্যাপাবটা ঘটেছিল। স্টুডিওব মালিক দিন কযেকেব জন্য বাইবে গিযেছিল। ফলে বিষ্ণুচবণেব গুরু সর্বেসর্বা তখন। সে কাকুতি মিনতি কবে ধবেছিল গুরুকে, দুঘণ্টাব জন্য একটা ভালো ক্যামেবা দিতে হবে, দুঘণ্টার আগেই সে ফিবিযে দিতে চেষ্টা কববে—

—কাব ছবি তুলবি ?

বিষ্ণুচবণ সলজ্জে জবাব দিযেছে—আজ্ঞে বউ-ছেলেব—

ক্যামেবা হাতে পেযে হাওযায উডতে উডতে বাডি এসেছে। বাড়ি বলতে ব্যাবাকেব মতো একটা একতলা দালানেব দেডখানা ঘব। আশপাশেব ঘবেব বাসিন্দাবাও সব তাবই মতো স্বল্পবিত্তেব মানুষ।

দুপুব ভালো কবে গডায নি তখনো। ক্যামেবা হাতে বিষ্ণুচবণ ঘবে ঢুকে দেখে বউযেব ওই মূর্তি। মেঝেতে বসে আছে, মুখেব ঘুমেব দাগ ভালো কবে মিলায নি তখনো। আদুড গা। শাডিব আঁচলটা বুকেব একদিক ঢেকে কাঁধে জডিযে আছে—অন্যদিকটা অনাবৃত। ঈষৎ ঝুঁকে ছেলেব মুখে বুকেব আহাব যোগাচ্ছে। ছেলেব মুখেব

বেশীর ভাগ ঢাকা পড়ে গেছে, কাপড়ের তলা দিয়ে তাব একটা কচি হাত আহারের দ্বিতীয় সম্পদটি আগলে আছে।

দেখা মাত্র বিষ্ণুচবণের বউকে সাজগোজ কবিযে ছবি তোলাব জল্পনা-কল্পনা উবে গেল। ওদিকে কুসুমবালাও এ-সময়ে লোকটাকে দেখে অবাক হয়েছে, আরো অবাক হয়েছে তার হাতেব অচেনা বস্তুটা দেখে। কিন্তু বিস্ময় প্রকাশ কবার আগেই বিষ্ণুচরণ গম্ভীর মুখে বলল—চুপ। কথা বোলো না। নোড়ো না। ঠিক অমনি থাকো। কি মজা হয এক্ষুণি দেখো।

কিছু না বুঝেই কুসুমবালা অবাক চোখে চেয়ে ছিল তাব দিকে।

কিন্তু কয়েক মুহূর্ত যেতেই মজার চোটে সে আঁতকে উঠল প্রায। মুখের ওপর আচমকা ফ্ল্যাশ-বালব ঝলসে উঠেছে। বৃন্তচ্যুত ছেলেটাও কেঁদে উঠল। কিন্তু বিষ্ণুচরণের কাজ ততক্ষণে সারা। জীবনেব একটা পরম মুহূর্তকেই সে যেন ধবে ফেলেছে। দাঁত বাব কবে সে হাসতে লাগল। আব একটা ছবি তোলার কথাও মনে হল না তাব। হাসতে হাসতে, উডতে উডতে আবার স্টুডিওয ফিরে চলল।

সব অভিনব শিল্প-সৃষ্টিই এমনি আকস্মিক কিনা বলা যায় না। যে ছবি তুল্য বিষ্ণুচবণ, সমস্ত জীবনেব সচেতন চেষ্টায অমন আব দ্বিতীযটি তুলতে পাববে কিন ঠিক নেই। ছবি দেখে তাব গুরু অবাক। ছোট ছবি বড কবা হল, তাবপব আরো বড়। শেষেবটা দেড হাত প্রমাণ হল প্রায। গুরু বলল—এটা আমায় দাও, স্টুডিওব শো-কেসে বাখি—কেউ জানবে না।

বিষ্ণুচবণ বাজী হল না। ঘরেব পরিবাবেব ছবি যে...

রুচি আছে তার। বড় ছবিখানাব ওপর স্টুডিওব সব থেকে সেবা আর্টিস্টকে ধবে-পডে পাকা-বঙেব কাজ কবিয়ে নিল। কার ছবি বা কে তুলেছে ব্যক্ত না করে তাকে দিয়ে এই কাজ কবাতে বেশ কযেক টিন দামী সিগাবেট উপঢৌকন দিতে হল। কাজে হাত দিযে শিল্পেব টানেই যত্ন করে রঙের কাজটুকু করে দিয়েছিল শিল্পী। বিষ্ণুচরণ তখনো বাড়িতে কিছু বলে নি।

দামী ফ্রেমে ছবিটা একবাবে বাঁধিয়ে কাগজে মুডে ঘবে নিয়ে গিযে হাজিব হল একদিন। বউ তখন রান্নায ব্যস্ত। দেয়ালেও অনেক পেরেক লাগানই আছে।

জায়গা বেছে ছবিটা একেবাবে টাঙিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত।

ছবি দেখে কুসুমবালা প্রথমে হতভম্ব খানিকক্ষণ। তারপর তাব স্বভাবসুলভ বসনা খনখনিয়ে উঠেছিল।

—এই বস কবা হযেছিল সেই দিন, আঁ ! আদুড গাযে পরিবাবকে সকলেব চোখেব সামনে টাঙিয়ে রাখাব সখ—বলি স্বভাব-চরিত্তির কি একেবাবে খেয়ে বসেছ ? কি ঘেন্না, কি ঘেন্না, শীগগিব নামাও বলছি ওটা, নইলে আছডে ভাঙব আমি—

বউয়ের বচসায় সচরাচর চুপ করেই থাকে বিষ্ণুচরণ। অসীম ধৈর্য তার। বলতে গেলে মুখ বুজেই সহ্য করে। কিন্তু ক্বচিৎ কখনও সহ্যেব সীমা ছাড়ালে তখন একেবারে মারমুখী মূর্তি। তখন অতবড কুঁদুলে বউও ঘাবড়ে যায়। কিন্তু এই সামান্য কথায যে ওই মূর্তি দেখবে ভাবে নি।

বিষ্ণুচবণ ছবিব দিকে দুপা এগিযে গেল, তাবপব বউযেব দিকে ঘুবে দাঁডাল। অস্বাভাবিক রুক্ষ কঠিনস্ববে শাসালো—ওতে হাত দিবি তো তোব ওই হাত আমি দুমডে ভেঙে দেব।

বাগ হলেই 'তুমি' ছেডে 'তুই তুকাবি' কবে।

তবু সামলাতে না পেবে কুসুমবালা অস্ফুট ঝাঁঝে বলে উঠতে যাচ্ছিল—গলায দডিও—

—যা গলায দডি তুই নিজে দে-গে যা, আমাব হাড জুডোয তাহলে।

দিনে দিনে তাবপব ওই ছবি কুসুমবালাব চোখেও সযে গেছে। আডাল থেকে এক এক সময দাঁডিযে দাঁডিযে তাকে ছবিটা দেখতেও দেখেছে বিষ্ণুচবণ। আব বছব তিনেক বযেস না হতে ছেলেও ওটা চিনে ফেলেছে। ফেললেও বাপেব কোলে উঠলেই আঙুল দিযে দেখিযে জিজ্ঞাসা কবত—ও কে?

বিষ্ণুচবণেব সংসাব-সুখ বলতে কিছু ছিল না। দেখতে দেখতে একদিন সবই ছাবখাব হযে গেল। দুর্যোগ যেন হাঁ কবে গিলতে এল তাকে। গিলেই ফেলল। তাকে আব তাব সাডে তিন বছবেব ছেলে শম্ভুচবণকে। বউ জন্মেব শোধ নিল।

বউযেব বুকে বিষ ছিল। মুখে বিষ ছিল। বিষে বিষে বিষ্ণুচবণেব হাড মাস কালি। কাবণে অকাবণে কোনো স্ত্রীলোকেব এত বাগ সে বোধহয আব দেখে নি। হযত রূপেব জোবে আবো একটু সচ্ছল ঘবে পডবে, এ-বকম আশা ছিল বউযেব। তা না হলে বিষ্ণুচবণেব অস্তিত্বটাই ওব চোখে এমন চক্ষুশূল হবে কেন। অবশ্য শুধু তাব ওপব নয, তপ্ত বসনাব ঝাঁটা সে সকলেব ওপবেই বুলোয—ওব ভযে তাব ঘবে একটা ফেবিঅলা পর্যন্ত আসে না।

অতি ক্ষুদ্র কাবণে বিপর্যয ঘটল একদিন। ঘটবে বলেই হযত বিষ্ণুচবণেবও কাঁধে শনি ভব কবেছিল সেদিন।

কি কাবণে তাব তালা-বন্ধ ট্রাঙ্ক খুলে এক পাঁজা ছবি হাতে পেল বউ। যে ছবিগুলো সে তাব গুরুব কাছে চেযে-চিন্তে সংগ্রহ কবত। বেশিব ভাগই নতুন বযসেব ছেলে-মেযেব ছবি, বিচিত্র বেশ-বাসেব অবাঙালী এবং বিদেশী মেযেব ছবিও আছে অনেকগুলো। স্বামীব চবিত্রহীনতাব এমন জলজ্যান্ত প্রমাণ আব বুঝি হয না। তাব ওপব বিষ্ণুচবণ ভুল কবল বউযেব হাত থেকে ছবিগুলো ছোঁ মেবে কেডে নিযে। তাব ভয, বউ ওগুলো নষ্ট কবে ফেলবে।

ব্যস, তুমুল ব্যাপাব শুরু হল। গলা ছেডে স্বামীব গুণকীর্তন বর্ণনা কবতে লাগল কুসুমবালা, চবিত্রহীন লম্পট মাতাল বলে তাবস্ববে গাল পাডতে লাগল। আশপাশেব বাসিন্দাবা সব সচকিত হযে উঠল। তাবাও কৌতূহলী হযে ভাবল, কুঁদুলি বউ হাতে নাতে এমন কিছুই ধবেছে, যাব দরুন সাত-সকালে এই সম্ভাষণ আব এমন কুরুক্ষেত্র। তাদেব উঁকিঝুঁকি দিতে দেখে কুসুমবালাব স্বামী-ঝাঁটানোব ক্ষিপ্ত উদ্দীপনা ক্রমশ চডতেই লাগল।

কতক্ষণ সহ্য করেছিল বিষ্ণুচরণ জানে না। উঠল হঠাৎ। মাথার মধ্যে দাউ-দাউ আগুন জ্বলছে।

হাতের পাঁচটা আঙুল আচমকা সাঁড়াশীর মতো বউয়েব গলায় বসে গেল। ঠেলতে ঠেলতে তাকে খুপবি ঘরটার মধ্যে নিয়ে ঢোকাল। বউয়ের দম বন্ধ, হাত ছাড়ানোর বিফল চেষ্টা—মুখ লাল।

বিষ্ণুচবণ এক ধাক্কায় দেয়ালের দিকে ঠেলে দিল তাকে। দেয়ালের সঙ্গে লাগল ঠাস করে। বলল, ফের গলা খুলবি তো ওই গলা আমি চিরকালের জন্য বন্ধ কবে দেব।

বউ গলা আব খোলে নি। বিষ্ণুচবণ জামা গায চড়িয়ে তক্ষুণি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে।

বাগ পডতে ফিরল ঘন্টাখানেক বাদে। কাজে বেরুতে দেবি হয়েই গেছে, চানটা করে না-খেযেই ছুটতে হবে।

বাডির কাছে এসে হতভম্ব। লোকে লোকারণ্য। চিৎকাব চেঁচামেচি। একটা অজ্ঞাত ভয বিদ্যুৎকষার মতো আঘাত কবল তাকে। তারপবেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল।

সেই খুপরি ঘবের দবজা ভেঙে কুসুমবালাকে বার কবতে হয়েছে। কুসুমবালাকে নয়, বীভৎস দগ্ধ একটা নারীদেহকে। সর্বাঙ্গে কেরোসিন ঢেলে গায়ে আগুন দিযেছে কুসুমবালা। তখনো প্রাণ আছে, তখনো আর্ত-যাতনায় প্রাণান্তকর ছটফট করছে।

হাসপাতালে দুদিন বেঁচে ছিল। বেহুঁস অবস্থায ভুল বকেছে। এই পবিণামের সমস্ত আক্রোশ সে স্বামীব মাথায় ঢেলে দিযে গেছে।

বিষ্ণুচবণেব চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল পড়ে নি। কাঁদার অবকাশও সে পায় নি। একটা মৃত্যু তাকেও নিঃসীম মৃত্যুব দিকেই টেনেছে। পুলিশের টানা-হেঁচডায একটানা দেডমাস দেহেব বক্ত শুকিযেছে, বাতেব ঘুম গেছে। দুধেব ছেলেটাকে পাশেব ঘবেব একজন আশ্রয় দিযেছে বটে, কিন্তু তাব কান্না সে-যেন কোর্ট আর থানায দাঁড়িযেও শুনেছে।

দেড মাস বাদে মুক্তি পেল। মুক্তিব বোঝা টেনে টেনে কোনো বকমে বাড়ি এল। প্রথমেই চোখে পড়ল দেযালে টাঙানো কুসুমবালাব সেই মস্ত বাঁধানো ছবিটা। একটানে দেয়াল থেকে ছিঁড়ে নিযে এল সেটা। আছড়ে ভাঙতে গিযেও ভাঙতে পাবল না। ওটা শুধু কুসুমবালাই নয়, তাবও ভিতবেব একটা সৃষ্টি। কিন্তু ছবিটাব দিকে আব তাকাতে পাবল না, যে আগুনে কুসুমবালা মবেছে তাব থেকে বেশি আগুন ওব বুকে সে জ্বেলে বেখে গেছে।

ফ্রেমে বাঁধানো ছবিটা একটা বড কাগজে প্যাক কবে ঘবেব কোণে চোখেব আডালে রেখে দিল। পরে ঘব থেকে সবাবে। দেযালেব গায়ে চৌকো কালো দাগ পড়ে আছে একটা। গামছা ভিজিযে ঘষে দাগটা তুলে ফেলল। তাবপব ছেলে শম্ভুচরণকে নিযে এল।

গোড়ায গোড়ায ছেলে কয়েকদিন আঙুল দিয়ে শূন্য দেযালটা দেখিয়ে ছবির খোঁজ করেছে, তারপর ভুলে গেছে।

দুর্যোগ একা আসে না। আসেও নি। স্টুডিওতে গিয়ে শোনে তাব ফোটোগ্রাফার গুরু বড় কাজ নিয়ে বাইরে কোথায় চলে গেছে। সেই সুযোগে ঈর্ষা যাবা কবত,

তারা মালিককে জানিয়েছে প্রশ্রয় পেয়ে বিষ্ণুচরণ কি-ভাবে দামী দামী ক্যামেরা নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করত। ফলে মালিকও আর তাকে নেয় নি।

দুই-একটা ছোটখাটো দোকানে বিষ্ণুচরণ ফোটোগ্রাফার হতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নিজেই অবাক হয়ে দেখল, মূর্খ হয়েও ভিতরের আগ্রহের তাড়নায় যেটুকু শিখেছিল পেশাদারীর পরীক্ষায় তার সবটাই অচল। কাঁপা হাতে দুই একটা ছবি যা তুলেছে তারপর আর কোনো প্রত্যাশা নিয়ে নিজেই দাঁড়ায় নি।

প্রায় বিশ বছর কেটে গেছে তারপর।

বড় রাস্তার ফুটপাথের গা-ঘেঁষা ছবি-বাঁধাই আর ছবি-বিক্রির দোকান বিষ্ণুচরণের আগে ফুটপাথে ঘুরে আর বসেই ছবি, রঙিন ক্যালেণ্ডার, ম্যাপ ইত্যাদি বিক্রি করত তারপর দেড়-হাত প্রমাণ বসার জায়গা পেয়েছিল একটা, পেয়েই ছবি বাধাইয়ের কাজ শুরু করেছিল।

এখন মাঝারি সাইজের দোকান-ঘর হয়েছে একটা। ঘর ভরতি ছবি ঠাসা—ছবির ছোটখাটো গুদাম একটা। সারি সারি তাকে থাকে-থাকে ছবি—আর এত ছবি টাঙানো যে দেয়াল দেখাই যায় না। দেশ-বিদেশের মনীষীদের ছবি, রাজপুরুষদের ছবি, রাজনীতিজ্ঞদের ছবি, ধর্মাত্মাদের ছবি, পৌরাণিক ছবি, যৌবনোজ্জ্বল চিত্রতারকাদের ছবি, দেব-দেবীর ছবি, স্বর্গের ছবি, নরকের ছবি, কল্পিত যৌবনাভিসারিকাদের ছবি —নেই এমন ছবি নেই।

ছবি বাঁধাইয়ের জন্য স্বল্প বেতনে কারিগর রাখতে হয়েছে একজন। সারাক্ষণ মুখ গুঁজে বসে সে ছবির মাপে ফ্রেম ঠিক করে, বোর্ড কাটে, কাচ কাটে, হাতুড়ি দিয়ে ঠুক ঠুক করে। অবকাশ সময়ে ছেলে শম্ভুচরণ নিজেও ছবি বাঁধে—বাঁধাইয়ের কাজ সেও শিখেছে।

সম্প্রতি বাপ আর ছেলের একটাই বাসনা সর্বদা বুকের তলায় শিখার মতো জ্বলছে। পাশের চিলতে খুপরিটা খালি হয়েছে, সেটা পেয়ে গেলে দোকানটা মনের মতো করে সাজানো চলে। এই স্বল্প পরিসরে খদ্দের নড়তে চড়তে পারে না, অনেক খদ্দের ফিরেও যায়। ওই জায়গাটুকুর মালিকের পায়ে তেল দিয়ে দিয়ে হন্যে হয়েছে বাপ ছেলে। ওই চিলতে খুপরির জন্য সাড়ে সাতশ টাকা সেলামী হেঁকে বসে আছে সে—এক কপর্দকও নামাবে না। কায়ক্লেশে ঘরের জিনিস বেচে সাড়ে তিনশ টাকা সংগ্রহ করে তার হাতে-পায়ে ধরেছে বিষ্ণুচরণ—বাকি টাকাটা মাসে মাসে ভাড়ার সঙ্গে মিটিয়ে দেবে কথা দিয়েছে। কিন্তু মালিক কর্ণপাতও করে নি।

বাকি চারশ টাকা ধার পাবারও অনেক চেষ্টা করেছে বাপ-ছেলে মিলে, কিন্তু তাদের ধার দেবে কে?

তবু বিষ্ণুচরণ আশা ছাড়ে নি এখনো, মালিকের আড়ালে অশ্লীল কটু-কাটব্য করে। তার এই মস্ত ঢ্যাঙা শুকনো পাকানো দেহের কোথাও কমনীয়তার লেশমাত্র নেই। ছেলেকেই শুনিয়ে বলে, ওটা না পেলে শালাকে খুন করব আমি।

শম্ভুচরণের বয়স এখন তেইশ। বাপের মতো লম্বা নয় আদৌ। সুশ্রী সভ্যভব্য।

তার ওপর অনেক মেহনত করে আব দোকানে খেটেও তৃতীয় বিভাগে একটা পাস দিয়েছে। অর্থাৎ রীতিমতো শিক্ষিত সে। ফলে বাপেব সঙ্গে আদৌ বনে না তার। এক ধবনের সততার আদর্শ কেমন করে যে ছেলের ভিতরে দানা বেঁধেছে, সেটা আশ্চর্য। ওদিকে বাপ ঠিক উল্টো। সততার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। মুখেব দিকে তাকিয়েই খদ্দেবেব মন আর পকেট ওজন কবতে পাবে যেন। সুবিধে বুঝে দরও হাঁকে। খদ্দেব চালাক না হলে বাতকে দিন বানায, নকলকে মৌলিক বলে চালায়। অল্পবয়সী মেযেবা আসে ছবি কিনতে, সভ্য-ভব্য ছেলেব দিকে আড়ে আড়ে তাকায বিষ্ণুচবণ। ছেলে সবিনয়ে দব বলাব আগেই একটা দব হেঁকে বসে সে। বলে—ওই ছবিব ওই দাম...মাযেবা বাজাব ঘুবে দেখে আসুন, তফাৎ বুঝবেন।—তাবপরই সেই ছবিব প্রসঙ্গে মিথ্যে আজগুবি গল্প ফেঁদে বসে। শম্ভুচরণ অস্বস্তি বোধ কবে।

শুধু এই নয। খদ্দেব বুঝে নিবিবিলিতে গুদামেব কোণাঘুপচি থেকে এমন সব ছবি বাব কবে বাবা, যা দেখলে শম্ভুচবণের কান লাল হয। অশ্লীল, নগ্ন ছবি। কোথা থেকে যে এসব সংগ্রহ কবে ভেবে পায না। আব এই সব ছবিই চড়া দামে বিকোয। এক একটাব অবিশ্বাস্য দামও মেলে। এই সব কারণে, ছেলে কোনোদিন শ্রদ্ধার চোখে দেখে নি বাপকে।

সেদিন এই বাপ-ছেলেব বিধাতা একটা ষডযন্ত্রে লিপ্ত হযেছিলেন বোধ করি। নইলে এ বকম হবে কেন!

বাত ন'টা বাজে। দোকান বন্ধ কবাব উদ্যোগ কবছিল তারা। পাঁচ-ছ'টি বিদেশী শ্বেতাঙ্গ খদ্দেব এসে ঢুকল। বযেস কাবো বেশী নয়। শাঁসালো টুরিস্ট সম্ভবত। খাঁটি দেশীয নিদর্শন সংগ্রহেব আশায এসেছে। দুই-একজনেব মুখ থেকে মদের গন্ধও নাকে আসছিল।

বিষ্ণুচরণ লাফিয়ে উঠল—আইযে আইযে সাব—

এদেব থেকে প্রিয় আব বোধ হয় কেউ নয বিষ্ণুচবণের। গেল যুদ্ধে এদের মতো দিলদরিয়া খদ্দেবেব কল্যাণেই তাব দোকানঘর হযেছে।

তাবা মিটি মিটি হাসে আব ছবি দেখে। কিন্তু লাস্যময়ী অপ্সবা থেকে হাস্যময়ী চিত্রতাবকা পর্যন্ত কারো ছবি পছন্দ হয না তাদেব। মাথা নাড়ে আর বলে, দিশি জিনিস দেখাও।

এবারে গোপন সংগ্রহের দিকে হাত দিল বিষ্ণুচবণ। নির্ভেজাল জিনিসই বাব কবল। একটা চোখে লাগাতে পাবলে দব যা হাঁকবে সে-ই জানে। ঘাড বাঁকিযে সেই সব ছবিব দিকে তাকিয়ে শম্ভুচরণেব মুখ লাল। কুৎসিৎ সব ছবি।

কিন্তু যে দেশেব লোক এই খদ্দেবরা, তাদের চোখে এসব ছবি কিছুই নয়। তা ছাড়া এ জিনিসও ঠিক চায় না তারা।

বিষ্ণুচরণের রোখ চেপেছে। কয়েকটা অর্ধনগ্ন আদিবাসীর বড় ছবি শিল্পী দিয়ে আঁকিযে এবং বাঁধিযে কোনো এক থাকে লুকিয়ে রেখেছিল। খুঁজে খুঁজে একটা বড় ফ্রেম টেনে বার করল। একটানে ওপরেব কাগজটা টেনে ছিঁড়ে ফেলল।

তাব পবেই তড়িৎস্পৃষ্টেব মতো কাঠ একেবাবে। বিমূঢ় হতভম্ভ।

শ্বেতাঙ্গ খদ্দেববা বাঁধানো ছবিটা তাব হাত থেকে টেনে নিল। সঙ্গে সঙ্গে তাদেব চোখে-মুখে আগ্রহ দেখা গেল। এই ধবনেব দিশি জিনিসই তাবা চেযেছিল যেন। ফ্রেমেব ওপবে কিছু ধুলো জমেছিল নিজেবাই রুমালে কবে মুছে দিল। ছবিব তাজা বঙ ফুটে বেরুলো। ওটা হাতে হাতে ঘুবল তাদেব। ভাবি পছন্দ হযেছে। খাঁটি দিশি জিনিস —আদুড় গাযে শাড়ি জড়িযে সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী গৃহস্থবধূ বুকেব দুধ খাওযাচ্ছে ছেলেকে —কচি শিশুব অন্য হাতে খাদ্য আগলানো দেখেও খুশীতে আটখানা তাবা।

একজন জিজ্ঞাসা কবল, দাম কত?

অনুভূতিশূন্য মূর্তিব মতো ছবিটা হাতে নিল বিষ্ণুচবণ। দেখল ফ্রেমটায ছাতা পড়েছে শুধু, নইলে এতকাল আগেব ছবি ঠিক তেমনি জীবন্ত এখনো। বিমূঢ় নেত্রে ছেলেব দিকে তাকালো একবাব। ছেলেও বাপেব হঠাৎ এই মর্তি দেখে অবাক হযেছে।

বিষ্ণুচবণ দেখছে। বউ চেযে আছে তাব দিকে। তাব চোখে যেন ভর্ৎসনা। সে যেন ফিস ফিস কবে বলছে—ছিঃ আমি না-হয অন্যাযই কবেছি একটা, তা বলে নিজেব পবিবাবকে বেচে দেবে?

ক্রেতাবা অসহিষ্ণু হচ্ছে। বিষ্ণুচবণ একটা উদ্গত অনুভূতি সামলে নিযে বিড়বিড় কবে জানালো, এ ছবি বিক্রিব না।

লোকটা দাঁও মাবতে চায ভেবে একবাবেই চড়া দাম হাঁকল একজন।

বিষ্ণুচবণ মাথা নাড়ল।

তাবা আবো দাম বাড়ালো।

আবো।

বিষ্ণুচবণ মাথা নাড়ল।

আবো খানিকটা দামাদামি কবে তাবা বাগতভাবে হুড়মুড় কবে নেমে গিযেও তখুনি আবাব ফিবে এল। যে লোকটা বেশি মদ খেযেছিল সে বিষ্ণুচবণেব মুখেব সামনে ধবধবে পাঁচটা আঙুল তুলে বলল, দেখো পাঁচশো রুপযা দেগা, উইল ইউ সেল?

বিষ্ণুচবণেব মাথাটা ঘুবে উঠল। চোখেব সামনে তাব বড় দোকান ভাসছে— পাশেব চিলতে খুপবি পেযেছে। শুধু তাব চোখে নয, ছেলেব চোখেও তাই ভাসছে।

...ছিঃ, আমি না হয অন্যাযই কবেছি একটা, তা বলে নিজেব পবিবাবকে বেচে দেব?...

বিষ্ণুচবণ মাথা নাড়ল। হঠাৎ বেগে গিযে জোবেই ঝাঁঝিযে উঠল—এ ছবি বিক্রিব নয।

তাবা চলে গেল। ছেলে বিমূঢ় বিস্মযে চেযে আছে তাব দিকে। এক ঝটকায ছবিটা হাতে নিযেই বিষ্ণুচবণ দোকান থেকে বেবিযে গেল।

দোকান বন্ধ কবে শম্ভুচবণ ঘবে ফিবল। দেখল ছবিটা দেযালে টাঙিযে বাপ তাব সামনে দাঁড়িযে আছে চুপচাপ। ছেলেও ভিতবে এসে দাঁড়াল। পিছন থেকে দেখল ছবিটা। গোটা মুখ থমথমে গম্ভীব। তেইশ বছবেব ছেলে জিজ্ঞাসা কবল, ও কে?

বিষ্ণুচরণ আস্তে আস্তে ফিবল তার দিকে। চোখ দুটো অস্বাভাবিক চকচক কবছে। বলল—তোর মা। আর, ওই তুই—মায়েব দুধ খাচ্ছিস।

দুজনেই নির্বাক।

ছেলেব থেকে বাপ অনেক লম্বা। মুখ তুলে মুখ দেখতে হয। আজ এই বাপেব মাথাটাই হঠাৎ এত উঁচুতে মনে হল শম্ভুচবণেব যে ঘাড উঁচিযেও ভালো কবে দেখা যায না।

সম্পাদক

কলকাতা থেকে ট্রেনে উনিশ মাইল মাত্র পথ। শহবেব এত কাছে এমন অজপাড়াগাঁও আছে জানতাম না। অবশ্য তখনো পর্যন্ত এসে পৌঁছুই নি আমবা। ট্রেনে বসে গাঁযেব কথা শুনছিলাম। বক্তা শ্রীবিলাসবাবু। ট্রেনেব ঝাঁকানিতে ঝিমুনি আসছিল। তাই দেখে আমাদেব চলনদার শ্রীবিলাসবাবু পানসিক্ত ঠোঁটে একটু সঙ্কোচেব হাসি মিশিযে বলল, আপনাদেব কষ্ট হবে, এখনো দেড ঘণ্টাব পথ।

আমাদের কষ্ট হবে, এই কথাই ঘুবিযে-ফিবিযে নানাভাবে অনেকবাব বলেছে শ্রীবিলাসবাবু। অথচ তাবই অনেক দিনেব কব-জোডেব আকূতিতে আমাদেব পা বাডানো। কিন্তু আবো দেড ঘণ্টাব পথ শুনে অবাক হলাম। আধ ঘণ্টা হল ট্রেন ছেডেছে, কিছুটা পথ এসেছিও। উনিশ মাইলেব বাকিটুকু যেতে আরো দেড ঘণ্টা লাগবে কেন।

জিজ্ঞাসা কবলাম, কেন, দেড ঘণ্টা লাগবে কেন আরো?

জবাবে শ্রীবিলাসবাবু ভযে ভযে একবাব কোণেব জানালাব দিকে তাকালো। ওই কোণে ঠেস দিযে স্থূলবপু ভবনাথবাবু বসে। আজকেব অনুষ্ঠানেব তিনিই সভাপতি। তাঁকে নিযে যাবার জন্যেই শ্রীবিলাসবাবুব এতদিনেব এত তোডজোড, এত কাকুতিমিনতি।

জানালা-ঘেঁষা কোণটায পিঠ আব মাথা ঠেকিযে ভবনাথবাবু চোখ বুজে বসে আছেন। খুব সম্ভব ঘুমুচ্ছেন।

তবু গলাব স্বর আব একটু খাটো কবে শ্রীবিলাসবাবু অপবাধীব মতো ঢোক গিলে বলল, ইয়ে, আপনার গিযে তাই তো প্রায লাগবে, ধামুযা থেকে দেড ক্রোশটাক তো আবাব গরুব গাডিতে যেতে হবে—তা আজ্ঞে আমি আপনাদেব জন্যে খুব তেজি বলদেব গরুব গাডি ঠিক কবে এযেছি, কিছু কমও লাগতে পাবে।

এইবাব আমি বেশ ভযে ভয়ে ওই কোণেব দিকে তাকালাম। ভবনাথবাবু ঘুমিযেই পডেছেন, আপাতত কিছু কানে যায নি হয়ত। কিন্তু ট্রেন থেকে নেমে তাঁর মুখের দিকে তাকানো শক্ত হবে। আমাবই বিশেষ সুপারিশে তাঁর আসা। একটু দমে গিযে বললাম, গরুব গাডির কথা আগে বলেন নি তো?

এই অসুবিধেব কথাটাও বলে ফেলাব পব শ্রীবিলাসবাবুব সঙ্কোচ গেছে। এই বকমই বীতি তাব। একবার ব্যক্ত কবে ফেলার পব, ওটুকু অসুবিধে কিছুই না, বলে

নিজেই আবার উড়িযে দেয়। বলল—তা আজ্ঞে ও তো প্রায সবাই জানে—কিন্তু আপনাদের একটুও খাবাপ লাগবে না, শহুরে মানুষ গরুর গাড়িটাড়িতে তো চড়েন না—ভালোই লাগবে।

অতএব সেই ভালো লাগার জন্যও মনে মনে প্রস্তুত হতে চেষ্টা করলাম।

গাঁযের প্রসঙ্গ ছেড়ে শ্রীবিলাসবাবু হঠাৎ একসময সবিনযে নিবেদন করল, এবারে আপনারা সেই মহিলাটিকে একটি দেখবেন কিন্তু, আপনারা বিদ্বান পণ্ডিত লোক কি ব্যাপাব ভালো বুঝবেন—

আমি অবাক—কোন মহিলা?

এ-বকম বিস্মৃতি শ্রীবিলাসবাবুর ভালো লাগল না বোধ হয়, ঈষৎ আহত বিস্ময়ে সে-ও ফিরে তাকালো আমার দিকে। তাবপব স্মবণ কবিযে দিতে চেষ্টা করল—সেই যে কনকদেবীব কথা বলেছিলাম আপনাদেব, কবিতা বলেন—

মনে পড়ল। সশ্রদ্ধ বিস্মযে এক গ্রাম্য মহিলাব প্রসঙ্গ শ্রীবিলাসবাবু দুই-একবার উত্থাপন কবেছিল বটে। কিন্তু তাব বলাব আগ্রহেব সঙ্গে আমাদের শোনাব আগ্রহের তেমন যোগ ঘটে নি বলে সবিস্তারে কিছু জানা হয নি। শুধু এইটুকু মনে আছে, মহিলা লিখতে পডতে জানেন না; অক্ষরপবিচযও নেই, অথচ তাঁব মুখে অনর্গল কাব্য ঝবে। শোনার মতোই কাব্য, গাঁয়েব লোকেবা শুনে অবাক হয়।

বললাম—তা তাঁকে কি দেখব?

শ্রীবিলাসবাবু জবাব দিল—আমাদেব শুনতে ভালো লাগে, এই পর্যন্ত—আমবা কতটুকু আব বুঝি বলুন। আপনাবা হলেন গিযে জহুবী, একনজব দেখলে বা দুলাইন শুনলেই কোন দরেব জিনিস, ঠিক বুঝে নেবেন।

অক্ষরজ্ঞানবর্জিত মহিলার কবিতার পাল্লাযও পডতে হবে জেনে বিরক্তির বদলে অসহায় বোধ করতে লাগলাম। ট্রেনে যখন উঠে বসেছি, নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছুবাব আগে নামার প্রশ্ন. নেই। কিন্তু ফেরার সময, আর ফেবার পবেও অনেকদিন পর্যন্ত আমাব ওপর দিয়ে দস্তুরমত একটা ধকল যাবে। অদূবেব জানালায তন্দ্রামগ্ন ভদ্রলোককে যেমন নিরীহ দেখাচ্ছে, আদৌ তেমনটি নন তিনি। তাঁব বসনার পাল্লায় পডলে অনেক হোমরাচোমবা ব্যক্তিও চুপসে যান। একটু আগে ভাবছিলাম, পরেব দুর্ভোগ যা হয় হোক, আজকেব সভাস্থলে মান বাঁচলে বাঁচোয়া। কিন্তু নিরক্ষরা বমণীর কাব্যাঘাতেব সম্ভাবনায় সেই আশাও দূবে সরতে লাগল। মুখেব ওপব সেখানে কি যে বলে বসবেন ভবনাথবাবু, ঠিক নেই। যাদেব এ অভিজ্ঞতা আছে, ভাবতে গেলে তাদের অন্তত গায়ে জ্বর আসার কথা।

শ্রীবিলাসবাবুকে সময়ে সতর্ক করে রাখা উচিত। কিন্তু সে অবকাশ মেলাও ভার। সাগ্রহে কনকদেবী প্রসঙ্গ বিস্তারে মন দিয়েছেন তিনি। যা বলে গেলেন তাব সার কথা, গাঁয়ের এক মানী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেব কন্যা কনকদেবী। পণ্ডিতের কথকতায় নাম ছিল খুব, শোনার জন্য পাঁচ গাঁয়ের লোক ভিড় করে আসত। ঘটা করে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তিন বছরের মধ্যে একটি মাত্র সন্তান কোলে সেই মেয়ে বিধবা হতে পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি কিছুটা ম্লান হয়েছিল। বিধবা হওয়ার পর থেকে

ছেলে নিয়ে কন্যাটি বাপের কাছেই থাকতেন। বাপের অবস্থা মোটামুটি সচ্ছলই ছিল, জমি-জমাও মন্দ রেখে যান নি। বাপ চোখ বুজতে পুঁজি ভাঙিয়ে, আর কিছু কিছু জমি বিক্রি করে ছেলেকে মানুষ করে তুলতে চেষ্টা করেছিলেন কনকদেবী। বড় আশা ছিল ছেলেটা মানুষের মতো মানুষ হবে। কিন্তু তা হল না। ছেলে উল্টে বিপথে পা বাড়ালো। তার মতি ফেরানোর জন্য মায়ের সেই বুক চাপড়ে কান্না, গোঁ ধরে একটানা দু-তিনদিন নিরম্বু উপোস করা—এ-সব শ্রীবিলাসবাবুরাই স্বচক্ষে দেখেছে, শুনেছে। ছেলে এখন উড়িষ্যায় কোন কারখানায় চাকরি করে। বিয়ে-থা করেছে, ছেলে-পুলে হয়েছে—কিন্তু ভুলেও একবার মায়ের খোঁজ নেয় না, মাকে দেখতে আসে না। ছেলের ব্যবহার মায়ের বুকে শেলের মতো বিঁধত, পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ হয়ে বসে থাকতেন দিনরাত। কনকদেবী শ্রীবিলাসবাবুর থেকে বয়সে খুব বেশি বড় হবেন না, তবু শ্রীবিলাসবাবু তাঁকে মাসী বলে ডাকে। তার ছেলে সত্যবিলাস দিদিমা ডাকে। ছেলেটা খুব ছেলেবেলা থেকেই এই দিদিমার নেওটা। তাকে ভোলাবার জন্য আর খুব সম্ভব নিজের শোক ভোলবার জন্যেই কনকদেবী অনেক সময় মুখে মুখে ছড়া পাঁচালি বলে যেতেন। ছেলে যত হাঁ করে শুনত, তাঁর মুখে মুখে কাব্য-কাহিনী বানানোর ঝোঁকও তত বাড়ত। ছেলে বড় হতে তার বন্ধুবান্ধবেরাও কাব্যের শ্রোতা হয়ে পড়ল। এইভাবেই ব্যাপারটা রটে গেল। মুখে মুখে অজস্র কাব্যকাহিনী রচনা করেন তিনি, ছেলেমেয়ে বুড়ো-বুড়ীরা দল বেঁধে এসে শুনতে বসে। শোনে আর অবাক হয়। শ্রীবিলাসবাবুর ছেলে এখন ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে। সে দিদিমার একটা কাব্যের খাতা করেছে। দিদিমা কাব্য বলে, আর সে লেখে। কনকদেবী অক্ষর চেনেন না, কিন্তু কোন পাতায় কোন কবিতা লেখা আছে, একবার চোখ বুলিয়েই তা বলে দিতে পারেন। ওই খাতাখানাই এখন প্রাণ তাঁর। সত্যবিলাস বা লিখতে জানে এমন কেউ তাঁর ঘরে এলেই আদর যত্ন করে জলটল খাইয়ে মহিলা খানিকটা কবিতা লিখিয়ে নেন।

এখন যে সামান্য একটু জমি আছে, শ্রীবিলাসবাবুদের চেষ্টায় তারই চাষের সামান্য আয়ে কায়ক্লেশে কোনোরকমে দিন চলে কনকদেবীর। কিন্তু এই কষ্টের জন্য এতটুকু তাপ-উত্তাপ বা খেদ নেই তাঁর। দিনান্তে কাউকে ধরে দু-চার লাইন কবিতা লেখাতে পারলেই খুশী তিনি, আর কিছু চান না।

—আপনারা, বিশেষ করে ভবনাথবাবুর মতো এমন একজন নামজাদা ব্যক্তি গাঁয়ে আসছেন শোনার পর থেকে ভেতরে ভেতরে খুব একটা উত্তেজনা চলছে ভদ্রমহিলার।

উত্তেজনার কারণ সভয়ে অনুমান করতে পারছি। তবু জিজ্ঞাসা করলাম—কেন ?

—আপনারা আসছেন শুনেই উনি খাতাটা আপনাদের একবার দেখাবার জন্যে ধরেছেন যে। —শ্রীবিলাসবাবু মাথা চুলকে বলল—আমি কথা দিয়েছি চেষ্টা করব। সেই থেকেই তাঁর কখনো আনন্দ, কখনো ভয়। যখন ভাবেন আপনারা ভালো বলবেন, তখন খুশীতে ভরপুর, আবার যখন মনে হয় আপনাদের ভালো নাও লাগতে পারে, তখন ভয়ানক মুষড়ে পড়েন। —শ্রীবিলাসবাবু নিজের মন্তব্য যোগ করল, আমরা অবশ্য তেমন বুঝি নে, তবু মনে হয় আপনাদের ভালোই লাগবে, আর সত্যি ভালো লাগলে কিছু সুবিধেও হতে পারে।

ভদ্রমহিলা অর্থাৎ কনকদেবীব প্রতি সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও মনে মনে শ্রীবিলাসবাবুব মুণ্ডপাত কবলাম। তাব দিকে তাকিয়েই বোঝা গেছে, আমাদেব যে ভালো লাগবেই এ-আশ্বাস সে মহিলাটিকে দিয়েছে, আব ভালো লাগলে যে দু-একটা কবিতা ছাপাব ব্যবস্থাও হয়ে যাবে সে কথাও নিঃসন্দেহে বলেছে।

নির্লিপ্ত গম্ভীব মুখে প্রস্তাবটা গোড়াতেই ছেঁটে দিতে চেষ্টা কবলাম।

—একদিনে এ-সব হবে-টবে না, অন্য একদিন দেখা যাবে. আজই এ-সব নিয়ে ওঁকে বলতে গেলে উনি অসন্তুষ্ট হবেন।

উনি অর্থাৎ ভবনাথবাবু। শ্রীবিলাসবাবু ঘাড ফিবিয়ে তাকে দেখল একবাব। জানালাব কোণে ঠেস দিয়ে তেমনি তন্দ্রামগ্ন। আবাব আমাব দিকে ফিবে মুখখানা করুণ কবে ফেলল শ্রীবিলাসবাবু, যেন তাবই কবি-মূল্য যাচাইযেব প্রস্তাবটা নাকচ কবা হল। সানুনযে বলল. ভদ্রমহিলা বড আশা নিয়ে বসে আছেন স্যব, আপনাবা এটুকু অনুগ্রহ না কবলে ভাবি হতাশ হবেন।

বিবক্তি গোপন কবাব জন্যেই বাইবেব দিকে চোখ ফেবালাম। আমাব বিবক্তি এবং অস্বস্তিব কাবণ শ্রীবিলাসবাবুব সঠিক বোঝাব কথা নয। এক নামী সাপ্তাহিক পত্রেব ডাকসাইটে সম্পাদক ভবনাথবাবু। নিক্তিব ওজনে লেখা বিচাব কবেন। লেখা ছাপাব জন্যে কেউ সুপাবিশ কবতে এলে সেই লেখা না পডেই বাতিল কবেন। একান্ত পবিচিতজনেবাও এই বসকষশূন্য প্রাযবৃদ্ধ সম্পাদকটিকে বীতিমত সমীহ কবে চলে। কিন্তু সম্পাদক হিসেবে যত না নাম তাঁব. তাব থেকেও বেশি সুনাম অথবা দুর্নাম, কঠিন সমালোচক হিসেবে। অনেক নামী সাহিত্যিকেব লেখা তাকে ছুঁডে ফেলে দিতে দেখেছি। আমবা লেখা না দিলে ঠাস ঠাস কথা শোনান, আবাব দিলেও কপালে কি আছে ভেবে শঙ্কায ভিতবটা ভবে ওঠে।

আমাদেব ধাবণা এ-দেশেব মেয়েদেব লেখাব ব্যাপাবে ভদ্রলোকেব এক ধবনেব অ্যালার্জি আছে। মনে হয, মেয়েবা লিখবে সাহিত্য কববে, এটা বোধ হয তাঁব পছন্দ নয। শুধু সংসাব আব ঘব-কবনা নিয়ে থাকুক তাবা, মনে মনে এ-ই চান হযত। তাব নির্মম বিচাবেব ফলে ওযেস্ট পেপাব বাস্কেটে মেয়েদেব লেখাই বেশি জমে। লেখা কেন ছাপা হল না জিজ্ঞাসা কবলে জবাব দেন. লেখা হলে ছাপা হত।

ভদ্রলোক সবথেকে বেশি বেগে যান কোনো মহিলা লেখা নিয়ে নিজে তাব দপ্তবে হাজিব হলে। স্বল্প দুই-এক কথায তাঁকে জানিয়ে দেন, ট্রাম-বাসেব পযসা খবচা কবে না এসে, ডাকে পাঠিয়ে দিলেই তো হত।

একবাব একজন আমতা আমতা কবে বলেছিলেন—ডাকে পাঠালে লেখা অনেক সময ঠিক জাযগামত পৌঁছয না।

ভবনাথবাবু জবাব দিয়েছিলেন—নিজে নিয়ে এলেও জাযগামত পৌঁছয না।

তিন-চাবদিন আগেও এমনি একটা ব্যাপাব হয়ে গেছে। উত্তব-তিবিশ এক সুশ্রী মহিলা লেখা নিয়ে এসেছিলেন। তাঁব ইচ্ছে, লেখাটা তখনই পড়ে দেখা হোক। লেখাটা আমাব দিকে ছুঁডে দিয়ে ভবনাথবাবু জবাব দিলেন, পবে খবব পাবেন।

মহিলা চলে যেতে উল্টে-পাল্টে দেখতে গিয়ে লেখাটা পড়েই ফেললাম। সত্যি ভালো লেখা। আমার বিচারে অন্তত ভালো। দিন তিনেক পরে দেখলাম, ভবনাথবাবু সেই লেখাটা পড়ছেন। সব লেখা যেমন খুঁটিয়ে পড়েন এটাও তেমনি পড়লেন, তারপর পাশের আর কতকগুলো লেখার সঙ্গে সেটা রেখে দিলেন।

কিন্তু আরো তিন-চারদিন না যেতেই ভদ্রমহিলা আবার এসে হাজির। প্রত্যাশাভরা হাসি হাসি মুখ, সযত্ন বেশবাস, সুচারু প্রসাধন। ভবনাথবাবুর সামনে বসে ঈষৎ আব্দারের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার লেখাটা পড়লেন?

জবাবে ভবনাথবাবু মুখ তুলে দুই-এক মুহূর্ত দেখলেন, তারপর পাশের রচনাগুলোর মধ্যে থেকে তাঁর লেখাটা বার করে দিয়ে বললেন, নিয়ে যান।

মহিলার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল।—মনোনীত হল না বুঝি?

অন্য লেখা পড়তে পড়তে ভবনাথবাবু মাথা নাড়লেন। অর্থাৎ, হল না।

শুকনো মুখে মহিলা আবেদন জানালেন—ত্রুটিগুলো যদি একটু বলে দিতেন—

ভবনাথবাবু আবার মুখ তুললেন। খানিক নিরীক্ষণ করে জবাব দিলেন—সেটা বলা একটু শক্ত।

যে-রকম নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে বললেন কথা ক'টা, মহিলা হকচকিয়ে গিয়ে লেখাটি তুলে নিয়ে নীরবে প্রস্থান করে বাঁচলেন।

আমার বিশ্বাস লেখাটা ছাপা হবে বলেই ওখানে ছিল। মহিলা আবার তদবির করতে না এলে ওটা ছাপা হত।

এমন কি, অতটা সচেতন বেশবাস, সুচারু প্রসাধন না করে এলে, বা ও-রকম হাসিমুখে তার আবির্ভাব না ঘটলেও হয়ত ছাপা হত।

সভাপতিত্ব করতে ডেকে এনে এ-হেন লোককে অক্ষরজ্ঞানবর্জিত রমণীর কবিতা শোনানো বা কবিতা ছাপার সুপারিশের নামে গায়ে জ্বর আসবে না তো কি?

গাঁয়ে নতুন পাঠাগার উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য ভবনাথবাবুর আগমন। কোথাও আসেন না বড়। শ্রীবিলাসবাবুর ধড়-পাকড়ে পড়ে আমি বিশেষভাবে আবেদন জানাতে তবে রাজী হয়েছেন। পাঁচখানা গ্রামের উদ্যোক্তারা অনেক জল্পনা-পরিকল্পনার পরে এই সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করতে চলেছে। সমস্ত এলাকায় আর দ্বিতীয় লাইব্রেরি নেই। এর জন্যে ঘরে ঘরে চাঁদা তোলা হয়েছে, একজন জমি দিয়েছেন, আর পাঁচজন অবস্থাপন্ন ভদ্রলোক মিলে ঘর তুলে দিয়েছেন। বেশ কিছু টাকার বইও কেনা হয়েছে। এতবড় ব্যাপারটা অনুষ্ঠানশূন্যভাবে শুরু করতে কারো মন ওঠে না। গ্রামবাসীদের এত উৎসাহের কথা শুনেই ভবনাথবাবু শেষপর্যন্ত আসতে আপত্তি করেন নি।

শ্রীবিলাসবাবু গাঁয়ের ওই উদ্যোক্তাদের একজন। অনেক মাথা ঘামিয়ে আমার সঙ্গে একটা আত্মীয়তার যোগ আবিষ্কার করেছে সে। অবশ্য তার সঙ্গে জানাশুনা অনেক দিনের। কিন্তু সম্প্রতি তার আত্মীয়তা বজায় রাখার নিষ্ঠা দেখলে সম্পর্কটা দূরের কেউ বলবে না। গাঁয়ে লাইব্রেরি করার উৎসাহ এবং উদ্দীপনার পিছনে তার ছোটখাটো রকমের একটু স্বার্থও আছে। ওই গাঁয়ে তার বইয়ের দোকান। এতদিন

শুধু ইস্কুল-বই বিক্রির ওপর নির্ভর করতে হত। লাইব্রেরি হলে গল্প-উপন্যাস মাসিকপত্র সাপ্তাহিকপত্রও তার মারফতই কেনা হবে জানা কথাই।

এখন প্রস্তাব শুনে আমার চক্ষুস্থির।

যথাসময়ে ট্রেন ধামুয়া স্টেশনে পৌঁছুলো। আরো জনাকতক লোক আমাদের নিতে এসেছে। সকলেরই ব্যস্তসমস্ত ভাব, সশ্রদ্ধ চাউনি। এদের সামনে শ্রীবিলাসবাবুকে দেখে মনে হল, সে যেন দিগ্বিজয় করে ফিরেছে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরুবার সময় ভবনাথবাবুর উদ্দেশে মুখ কাঁচুমাচু করে বললাম —এখন আবার গরুর গাড়িতে উঠতে হবে শুনছি!

হৃষ্ট মুখে ভবনাথবাবু জবাব দিলেন, এখানে তুমি ট্রাম-বাস পাবে ভেবে এসেছিলে নাকি! এককালে কত গরুর গাড়িতে চড়েছি—!

কিছুটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। ছেলেরা আর শ্রীবিলাসবাবু টেনে-টুনে ভবনাথবাবুকে গাড়িতে তুলল। মোটা শরীর ভবনাথবাবুর, এটুকু ধকলেই অল্প অল্প হাঁপ ধরেছে —কিন্তু তাঁকে এত খুশী আর বোধহয় দেখি নি। এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা ধরে গরুর গাড়ি চলেছে, দুদিকে ধানী-জমি, মাঠ, গাছ-গাছড়া, ঝোপঝাড়। ভবনাথবাবু আমাকে গাছপালা চেনাচ্ছেন, আর শহুরে মানুষ বলে টিকা-টিপ্পনী কাটছেন।

—ওগুলো কিসের ঝোপ বলো তো? বনতুলসী—নাম শুনেছ, না তাও শোন নি? আর ওগুলো? শহুরে সাহিত্যিক জানবে কি করে—ওগুলো আটিশ্বরী।—শেষে আকন্দের জঙ্গল চিনতে পারলুম না দেখে প্রায় রেগেই গেলেন তিনি, বললেন তোমাদের শহুরে সাহিত্যিকদের ধরে ধরে কিছুকালের জন্য বনবাসের মতো গ্রামবাসে পাঠানো উচিত।

মোটকথা আমাকে জব্দ করতে করতে বেশ আনন্দের মধ্যেই তিনি গন্তব্যস্থানে এসে পৌঁছলেন। আমিও হাসছিলাম বটে কিন্তু বিকেলের কথা ভেবে শঙ্কার ছায়াটাকে মন থেকে সরানো যাচ্ছিল না।

গ্রামবাসীদের সরল অনাড়ম্বর প্রীতি-অভ্যর্থনা মনে লেগে থাকার মতো। দুপুরে খানিক বিশ্রামের পর সভার কাজ শুরু হল। শীতকাল, অসুবিধে কিছু নেই। ভবনাথবাবু বক্তৃতা করলেন। তাঁর সাদা-মাটা আন্তরিক বক্তৃতা শুনে এই সাধারণ লোকেরা ভারি খুশী।

অনুষ্ঠান শেষ হল।

আমাদের ফেরার গাড়ি সেই রাত আটটায়। তার ওপর শোনা গেল, তিন-চার ক্রোশ দূরের কোনো এক ভদ্রলোকের দুটো সাইকেল-রিকশ সংগ্রহ করা গেছে—তাই ফেরার সময় গরুর গাড়ির মতো অত সময়ও লাগবে না। এখান থেকে সাতটায় বেরুলেও আমরা হেসে-খেলে পৌঁছুবো।

অতএব আপাতত ঘণ্টা দুই-আড়াইয়ের অখণ্ড অবকাশ।

কিন্তু এ অবকাশ আমি চাই নি। ভবনাথবাবুর বক্তৃতার ফাঁকেও আমার দুচোখ নিজের অজ্ঞাতে অক্ষরজ্ঞান-শূন্য সেই কবি-মহিলাকে খুঁজেছে। কিন্তু ভবনাথবাবুর পাশে মঞ্চে বসে ঠিক ঠাওর করতে পারি নি।

সভা শেষে লাইব্রেরি-ঘরে এসে আবার বসলাম আমরা। শীতেব বিকেল শেষ হতে না হতে সন্ধ্যে। শুধু শ্রীবিলাসবাবু নয়, অন্যান্য মাতব্বররাও সাগ্রহে কনকদেবীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করল। মহিলাব মুখে মুখে কবিতা বানানো তাদের কাছে মস্ত বিস্ময়। প্রশংসার ছলে সেই বিস্ময জ্ঞাপন কবল তারা, কবিতাগুলো একবাব দেখাব জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালো।

ভবনাথবাবু বললেন—বেশ তো নিযে আসুন না, মহিলাটিকেও আসতে বলুন, দুই-একটা কবিতা শোনা যাবে।

তক্ষুনি লোক ছুটল।

আমার অস্বস্তি বাড়ছে। কবিতা প্রসঙ্গে অত স্তুতিব বদলে এবা যদি মহিলাটির বেদনাককণ জীবনেব আখ্যানটুকু শোনাতো, তাতে বরং কাজ হত। স্বভাবকঠোব সম্পাদকের মনটা হযত বা নবম থাকত। কিন্তু এবা জনে জনে শুধু মহিলাব আশ্চর্য ক্ষমতার কথাই পঞ্চমুখে বলে গেল।

দশ মিনিটের মধ্যেই কনকদেবী এলেন। না, এঁকে সভায দেখি নি বটে। সাধাবণ আটপৌরে বিধবার বেশবাস। তামাটে গাযেব রঙ, এককালে বেশ ফবসা ছিলেন মনে হয। বযস পঞ্চাশেব ওধাবে, চাপা উদ্দীপনায মুখখানি ঈষৎ আবক্ত। হাতে একখানি কালো মোটা বাঁধানো খাতা।

ভবনাথবাবুব পাযের কাছে মাথা রেখে প্রণাম করলেন। তাবপব খাতাখানা তাঁর পাযেব কাছেই বাখলেন।

আমাব মনে হল, আত্মজ সন্তানকে পবম নির্ভয়ে গুরুপাযে সমর্পণ কবে দিলেন।

—বসুন মা, বসুন—। ভবনাথবাবু গম্ভীব। সভযে তাঁব মুখে সম্পাদকেব সেই চিবাচবিত গাম্ভীর্য দেখছি আমি।

তিনি খাতাটা তুলে নিলেন। একটি একটি করে পাতা উল্টে দেখে যেতে লাগলেন। সকলে উন্মুখ। তাঁর একটি কথা, একটি মন্তব্যের ওপর যেন অনেক কিছু নির্ভর কবছে।

অনেকক্ষণ ধরে দেখে তিনি একটিও কথা না বলে খাতাটা শুধু আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

সেটা নেবাব ফাঁকে মহিলার দিকে চোখ পড়ল। মনে হল, দুই চোখে এমন অধীর প্রতীক্ষা, এমন নীরব প্রত্যাশা, আমি আব দেখি নি।

পাতাগুলো শুধু উল্টেই গেলাম, পড়া হল না। আঁকা-বাঁকা কাঁচা ছাঁদেব লেখা, খাতা বোঝাই কবিতা। কংসেব অত্যাচার, দেবকীব মনোবেদনা, শ্রীকৃষ্ণেব জন্ম, বেহুলাব শোক, গান্ধারীর বিলাপ, সাবিত্রীর সঙ্কল্প, লব-কুশের বীরত্ব—এমনি অজস্র প্রসঙ্গে এক পাতা দু পাতা করে এক-একটা কবিতা।

মুখ তুলতেই ভবনাথবাবু আবার হাত বাড়িয়ে খাতাটা নিয়ে নিলেন। অস্ফুট স্বরে বললেন—আশ্চর্য!—তারপর একটা পাতাব ওপর চোখ বুলিয়ে মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি অক্ষর চেনেন না, অথচ কোন পাতায় কোন কবিতা আছে দেখলে বলে যেতে পারেন?

কনকদেবী যেন জীবনের সব থেকে বড় সংশয়টা উত্তীর্ণ হয়েছেন। অদ্ভুত কমনীয় দেখাচ্ছে মুখখানা। প্রত্যয়ভরা দু'চোখ মেলে তাকালেন তাঁর দিকে, তারপর মাথা নাড়লেন।...পারবেন।

—আচ্ছা, এই কবিতাটা বলুন তো শুনি।

ঈষৎ ঝুঁকে পাতাটা ভালো করে দেখতে চেষ্টা করলেন কনক দেবী। ভবনাথবাবু খাতাটা এগিয়ে দিলেন।

কিন্তু তার আগেই কবিতাটা হয়ত চেনা হয়ে গেছে। আবার যথাপূর্ব স্থির হয়ে মহিলা মাথা নুইয়ে বসে রইলেন একটু। সংকোচ কাটিয়ে ওঠার চেষ্টাও হতে পারে। ঘরসুদ্ধ সকলে উৎকর্ণ। আমিও।

টানা সুরের আবৃত্তি কানে এল। মৃদু কণ্ঠ ক্রমশ স্পষ্ট হতে লাগল:

'প্রহ্লাদ কহে, আমার অন্তর্যামী যিনি
সর্বত্র বিরাজেন তিনি।
শূন্যে জলে স্থলে সমুদ্রে পর্বতে
তিনি বিনা কিছু নাই নিখিলে ভবেতে।
তারে যদি চাহ পিতা অশ্রুজলে ভাসি
তোমারে দিবেন দেখা মৃদু মৃদু হাসি।
দর্পভরে চাহ যদি দেখিবারে তারে
দর্পহারী রূপে তিনি আসিবেন দ্বারে।
ভক্তসখা রূপে যদি নাও তারে ররি
দেখিবে সম্মুখে তোমার দাঁড়ায়ে শ্রীহরি।'

ভাষা ভাব ছন্দ মিলের কথা কিছু মনে হল না, অনুচ্চ রমণীকণ্ঠের একটুখানি মূর্ত আবেগ যেন কানে লেগে থাকল। ঘরের জোড়া জোড়া মুগ্ধ চোখ এবারে ভবনাথবাবুর মুখখানাকে ছেঁকে ধরল। তাদের উক্তি যে একবর্ণও মিথ্যে নয়, তাই যেন প্রমাণ হয়ে গেল।

ভবনাথবাবুও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠলেন বোধহয়। কবিকে দেখলেন একটু। কনকদেবী অধোবদন।

ভবনাথবাবু বললেন—এই খাতায় নেই এ-রকম একটা কবিতা বলুন শুনি—

অর্থাৎ, এইখানে বসে মুখে মুখে কবিতা বানানোর আশ্চর্য ক্ষমতাটুকুও যাচাই না করে নড়বেন না তিনি। কনকদেবী আবার মুখ তুললেন। আশায় আশ্বাসে তামাটে মুখখানা উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। প্রথমবারের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তাঁর আস্থা বেড়েছে, আর এবারেও যে উত্তীর্ণ হবেন, তাতেও কোনো সংশয় নেই।

চোখ বুজে ভাবলেন খানিক। নিশ্চল মূর্তির মতো দেখাচ্ছে। ঘরের মধ্যে আবারও একটা স্তব্ধতা ভরাট হয়ে উঠেছে। যারা চেয়ে আছে কবির দিকে, দেখলে মনে হবে পরীক্ষা তাদেরই। বেশ একটু সময় নিয়ে কনকদেবী চোখ মেলে তাকালেন। তিনি প্রস্তুত।

আগের বারের মতোই একটা আবেগ ঘরের মধ্যে পুষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। এবারের এই আবেগ জ্বালাভরা, বেদনাভরা, দরদভরা। একটা তীব্র অনুভূতি যেন কবির মুখে শিখা হয়ে জ্বলছে।

'...করজোড়ে নতশিরে লভিবারে সাজা
মুনির সমুখে আসি দাড়াইল রাজা।
পুত্রশোকে মুনি কান্দে, কান্দে মুনিজায়া
কেমনে বাঁচিবে তারা—প্রাণ বিনা কায়া।
সহসা শোকানলে জ্বলি মনি কহেন রাজারে
শব্দভেদী বান হানি শুধু হিংসা কবিবারে
পানরত গজভ্রমে বধিলে সিন্ধুরে
বাঙাইলে সরযূর নীরে।
হারায়ে প্রাণের ধন
এই প্রাণ মোর দিব বিসর্জন।
তোমা পরে রাজা এই অভিশাপ
তুমিও ত্যাজিবে দেহ লভি পুত্রশোক-তাপ।
অবাক বিষণ্ণ রাজা কাঁপে থর-থর
নিঃসন্তানেরে একি অভিশাপ দিলা মুনিবর।
মুনি বরে অভিশাপ সত্য যদি হয়
সন্তান গেহে তবে আসিবে নিশ্চয়।'

অনেকক্ষণ বাদে নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসলেন ভবনাথবাবু। সমাধি-ভঙ্গ হল যেন। কবিতা প্রসঙ্গে কোনোরকম আলোচনা করলেন না, ভালো-মন্দ একটি কথাও বললেন না। কিন্তু যে কথা বললেন, শুনে শুধু আমারই বিস্ময়ের শেষ নেই।

বড় করে একটা নিঃশ্বাস ফেললেন ভবনাথবাবু, তারপর বললেন—আপনার এই খাতাটা আমাকে দেবেন? আপনার তো এটা কোনো কাজে লাগবে না, আমি দেখি যদি কিছু করতে পারি।

এক ঝুড়ি প্রশংসার থেকেও এই ক'টা কথার মূল্য বেশি। ঘরের সবক'টি লোকের মনে যেন এক নীরব খুশীর তরঙ্গ বয়ে গেল। তৃপ্তিতে কৃতজ্ঞতায় কনকদেবী একটি কথাও বলতে পারলেন না। ভবনাথবাবুর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করে আস্তে আস্তে উঠে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন তিনি। কবিতার খাতা ভবনাথবাবুর হাতে।

যথাসময়ে আমরা আবার স্টেশনে পৌঁছুলাম। শ্রীবিলাসবাবু এবং আর একজন আমাদের ট্রেনে তুলে দিয়ে গেল। শ্রীবিলাসবাবু আনন্দে ডগমগ, ট্রেন ছাড়ার আগে আমার কানে কানে আর একবার বলল, খাতাটার কথা ওঁকে মাঝে মাঝে মনে করিয়ে দেবেন কিন্তু, আমি পরে খবর নেব।

গাড়ি ছাড়তে ভবনাথবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—শ্রীবিলাস কি বলে গেল?

—ওই খাতাটার কথা আপনাকে মনে করিয়ে দিতে বলল।

ইতিমধ্যে কবি বা কবিতা প্রসঙ্গে আব একটি কথাও হয নি। এখনো কিছু না বলে ভবনাথবাবু বাইবেব অন্ধকাবেব দিকে দৃষ্টি ফেবালেন। কিন্তু আমি চুপ কবে থাকতে পাবলুম না, ভেতবটা থেকে থেকে অসহিষ্ণু হযে উঠছে। উষ্ণ হযে উঠছে।

সাদাসিধে ভাবেই জিজ্ঞাসা কবলাম—খাতাটা চেযে নিযে এলেন কেন, সত্যিই কবিতা ছাপবেন নাকি?

ঈষৎ বিস্ময মেশানো গাম্ভীর্যে আমাব দিকে ফিবলেন তিনি।—এ কবিতা ছাপব কি কবে?

—তাহলে নিযে এলেন কেন? ভদ্রমহিলা আশা কবে থাকবেন, শ্রীবিলাসবাবুও তাগিদ দিতে ছাড়বে না।

নির্লিপ্ত মুখে ভবনাথবাবু জবাব দিলেন—কিছুদিন বাদে খাতাটা হাবিযে যেতে দোষ কি?

আমি হতভম্ব কযেক মুহূর্ত।

এতকাল ভদ্রলোকেব প্রতি আমাব শ্রদ্ধাব অন্ত ছিল না। কিন্তু সামান্য চক্ষুলজ্জা বাঁচানোব জন্য তিনি এই কাণ্ড কবে এলেন মনে হতে সব যেন এক মুহূর্তে যেতে বসল। নিজেব অগোচবে প্রায রূঢকণ্ঠেই বলে উঠলাম, ভদ্রমহিলাব সব কথা জানলে এভাবে তাঁকে আপনি—

থেমে গেলাম। কেন, বা কি দেখে থামলাম জানি না।

ভবনাথবাবু বললেন, আসাব সময শ্রীবিলাস তোমাকে বলছিল, শুনছিলাম—

আবাবও বিস্ময। অর্থাৎ, আসাব সময ট্রেনে তিনি আদৌ ঘুমোন নি। কনকদেবীব বৃত্তান্ত সব শুনেছেন।

আমি বিমূঢ মুখে অপেক্ষা কবছি। ভবনাথবাবু বাইবেব অন্ধকাব দেখছেন। শেষে আমাব নীবব প্রতীক্ষা অনুভব কবেই যেন মুখ ফেবালেন। বললেন—শুনেছি বলেই খাতাটা নিলাম। না নিলে আজ হোক, কাল হোক, মেযেটিব এই কবিতাব আশ্রযটুকুও যেত। আমাব হাত দিযে খাতাটা খোযা গেছে শুনলে ভযানক দুঃখ পাবে, পাঁচজনেব কাছে দুঃখেব কথা বলবে, মনে মনে হযত আমাকে ঠিক বিশ্বাসও কববে না। . তবু তাতে সান্ত্বনা থাকবে, নিজেব কাছে তাব কবিতাব দাম কমবে না। ববং বাডবে। আবাব নতুন খাতা হবে। আশ্রযটা হযত আবো পাকাপোক্ত হবে।

ট্রেন ছুটছে।

দূবে দূবে এক-একটা ল্যাম্প-পোস্টেব আব কুঁডেঘবেব আলো চোখে পডছে। অন্ধকাব সমুদ্রেব মধ্যে ওগুলোও যেন এক অজ্ঞাত অখ্যাত কবি-বমণীব মুখেব মতো। আঁধাবে মেশে না।

ভবনাথবাবু জানলায ঠেস দিযে চোখ বুজে বসে আছেন। সৌম্য, গম্ভীব। থেকে থেকে আমি তাঁকেও দেখছি। মনে হচ্ছে, এত কাছ থেকে আব বুঝি তাঁকে কোনোদিন দেখি নি।

নাগরী

জানালার তলার পাট দুটো বন্ধ করে দিয়ে সেখানে বসে বসে মালা ভাবছিল, পুরুষের কি হৃদয় বলে বস্তু নেই?

মামার কথাগুলো মালা শুনেছে। এক মামী ছাড়া আর কারো শোনার কথা নয়। মামীকেই বাইরে দরজার আড়ালে পরদার এধারে দাঁড়িয়ে বলছিল। মালাও শুনছিল। তার শোনার তাগিদ ছিল। তার হাতে মামার জন্যে এক পেয়ালা দুধ ছিল। কেউ দেখে ফেললেও কিছু ভাবত না।

বেশী কিছু কথা নয়। মামা বেশী কথা বলে না। ও-বাড়িতে গিয়েছিল। ছেলের সঙ্গেই কথা হয়েছে। ছেলে দু-চার কথায় তাকে বিদায় করেছে। তার জ্যাঠামশাইয়ের অনুপস্থিতিতে তদবিরে গিয়েছিল বলেও প্রচ্ছন্ন বিরক্তি প্রকাশ করেছে। স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, জ্যাঠামশাইয়ের বিবেচনার ওপর আর কারো কোনো কথা নেই। কিছু অনুরোধ করার থাকলে তাঁকেই বলা দরকার।

মামা তবু আশা ছাড়তে পারে নি, তবু চলে আসতে পারে নি। বলেছে—তাঁর কাছেই তো যাব বাবা, তবু তুমি মেয়েটিকে একবার দেখো না—।

মামার শেষ আশা, তাকে ডেকে এনে সামনাসামনি একবার দেখাতে পারলে আর তারপর ঘরের অবস্থাটা খোলাখুলি ব্যক্ত করতে পারলে হয়ত শুভ সম্ভাবনাটা একেবারে ভেস্তে নাও যেতে পারে।

ছেলে কিন্তু সাফ জবাব দিয়েছে, তার দরকার নেই। সে স্পষ্টই বিরক্ত হয়েছে। ঘর থেকে চলে যেতে বলতে পারে নি। গম্ভীর মুখে নিজের কাজ নিয়ে বসেছে। সেটুকুই যথেষ্ট ইঙ্গিত। মামা চলে এসেছে।

মামা অপমানিত বোধ করেছে। যেটুকু করেছে, দায় উদ্ধারের আশাতেই করেছে। আর মামীর তাড়ায় করেছে। এতদিন এই চেষ্টা করছিল না বলে মনে মনে মালাই ক্ষুণ্ণ হয়েছিল মামার ওপর। তার স্থির বিশ্বাস ছিল আসল লোকটার কাছে গিয়ে পড়লে তার জ্যাঠামশাইয়ের হিসেবনিকেশ সব শূন্যে মিলিয়ে যাবে। টাকা চাইলেই আকাশ থেকে টাকা পড়ে না, সেটা সে অন্তত বুঝবে। আজ সকালেও মনে মনে মামা-মামীর বুদ্ধির তারিফ করছিল সে। তারা যে ওই জ্যাঠামশাইটির অনুপস্থিতির প্রতীক্ষায় ছিল, আগে বোঝে নি। কাল রাতে নমিদি কথায় কথায় বলে গেছে, বাবা মক্কেলের কাজে চার-পাঁচদিনের জন্যে বাইরে গেছেন। ...মামা একদিনও সময় নষ্ট না করে আজই গেছে।

রাগে দুঃখে চোখে জল আসার উপক্রম মালার। দাঁতের চাপে নীচের ঠোঁটটা কেটে বসার উপক্রম। হতাশার প্রথম ধাক্কায় আগে মামার অপমানটাই বুকে বিঁধেছে। এভাবে চেষ্টা করার ফলে মামাকে প্যাঁচালো লোক ভেবেছে ওরা। কিন্তু মামার মতো লোক যে হয় না, সেটা তার থেকে আর কে বেশী জানে।

বে-সরকারী কলেজের অধ্যাপক বিমলেন্দুবাবু।...বিমলেন্দু বসু। বয়েস হয়েছে। দীর্ঘকাল যাবৎ লো-প্রেসারে ভুগছেন। খাটুনি বেশী বলেই হয়ত। কলেজের পুরনো

মাস্টাব, মাইনে মন্দ নয একেবাবে। কিন্তু এ-বাজাবে কিছুই নয। তাঁব নিজেব সংসাবটিও ছোট নয একেবাবে। তাব ওপব দু'বছব হল চাবটে ভাগ্নে-ভাগ্নী আশ্রিত। কলেজেব খাটুনি, বাডিতেও দুবেলা ছেলেবা আলাদা মাইনে দিযে পডতে আসে। তাব ওপব ফাঁক পেলেই নিজেব পডাশোনা। মালা এক-একসময অবাক হযে ভাবে, মামাব বক্তচাপ তো বাডাব কথা, মাথায সর্বক্ষণ বক্ত উঠে থাকাব কথা।

মালাব বাবা এক মফঃস্বল ইস্কুলেব সহকাবী হেডমাস্টাব। কডা নীতিবাগীশ, সাদাসিধে বেশবাস, মাথাব চুল কদম-ছাঁট। তাঁব নীতিব দাপটে ইস্কুলেব ছেলেবা ভযে জডসড—বাডিতে ছেলে-মেযেবাও। দুই ছেলে দুই মেযে। মেযে দু'টি বড। মফঃস্বল ইস্কুলেব সহকাবী হেডমাস্টাবেব মাইনে সেই বকমই। মাসেব শেষে সংসাবেব প্রায অচলাবস্থা হত। সেই কাবণেও মেজাজ সব সময চডা থাকত ভদ্রলোকেব। তাঁব স্ত্রী, অর্থাৎ মালাব মা যতদিন বেচে ছিলেন ততদিনই তাঁকে সংসাব চালাতে না-জানাব খোঁচা খেতে হযেছে। বছব তিনেক হল ভদ্রমহিলা চোখ বুজেছেন।

আব বছব দেডেক হল নীতিবাগীশ লোকটি সংসাব চালনায পটু নতুন ঘবনী এনেছেন। নতুন কর্ত্রী এসে অনটনেব সংসাবে ওই ছেলেমেযেগুলোকে বাডতি আপদ ভিন্ন আব কিছু ভাবেন নি। অমন বযসেব একজনেব ঘবে আসাব ফলে একটু বেশী সুখস্বাচ্ছন্দ্য আব আবাম তাঁব পাওনা বলেই ধবে নিযেছিলেন। কিন্তু চাব-চাবটে মুখ সামনে হাঁ কবে আছে, সুখস্বাচ্ছন্দ্য জুটবে কোথা থেকে? অতএব তাঁবও মেজাজেব সমাচাব খুব কুশল ছিল না।

ছেলেমেযেগুলোব দুববস্থাব কথা তাদেব মামা বিমলেন্দুবাবু প্রথম শুনেছিলেন এক বন্ধুব মুখে। ভগ্নীপতিব আবাব বিযে কবাব খববটাই মস্ত ধাক্কা তাঁব। বোনটাকে ভালোবাসতেন তিনি—অনেক ছোট তাঁব থেকে। তাবপব যে-খবব শুনলেন, যদিও সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয খুব, কিন্তু তাব আংশিক সত্য হলেও স্থিব থাকা কঠিন।

বিমলেন্দুবাবুব অস্থিবতা লক্ষ্য কবে তাঁব স্ত্রী-ই একদিন জোবজাব কবে তাকে দেখতে পাঠালেন। সৎমা এলেই পাঁচজনে পাঁচবকম সন্দেহেব চোখে দেখে, তিলকে তাল কবে।

বিমলেন্দুবাবু গেলেন, আব বেডাবাব নাম কবে ভাগ্নে-ভাগ্নীদেব একেবাবে সঙ্গে কবে ফিবলেন। তাঁব স্ত্রী আডালে যেটুকু শুনলেন তাতেই তাব চোখে জল আসাব উপক্রম। শুধু বললেন—নিযে এসে ভালো কবেছ, এমন নির্লজ্জও মানুষ হয।

দু'বছব হল মালাবা এসেছে এখানে। ষোল বছবে এসেছিল, এখন তাব বযেস আঠাব। নিবাশ হবাব মতো বযেস নয একটুও। গলিব ওধাবে ওই মস্ত দালানেব ওই ঘবেব লোকটা তাকে বাতিল কবে দিলেও না। দু'বছব ধবে এই কোণেব জানালাব এখানটাই প্রধান আশ্রয মালাব। বাবান্দাব বেলিংযে গিযে দাঁডালেই বাঁযেব দালানেব পাজামা-পবনে ছেলেটাব যেন বাস্তা দেখাব দবকাব হযে পডে। আব কোণঘেঁষা ডাইনেব বাডিটাব ফেত্তা দিযে কাপড-পবা সঙ্গীতজ্ঞ পুরুষটিও চৌকাঠে দাঁডিযে মালাকে শুনিযে শুনিযে গান ভাঁজতে থাকে। অন্ধকাব বাত না হলে মালাব বাবান্দায দাঁডানো হয না। আব বাতেও দেখা যাক না যাক, সে দাঁডিযে আছে অনুভব কবলেই দু'দিক থেকে দু'জনেব আবির্ভাব ঘটে।

অতএব ঘরের কোণের জানালাটাই ভরসা মালার। সেখানে বসেই পড়ে বা বোনে, বা যা হোক কিছু করে। কখনো কপাট খোলা থাকে জানালা দুটোর, কখনো বা নিজের সুবিধেমতো একটু আধটু। সবটা খোলা থাকে যখন গলির ওধারের ও-ঘরের বাসিন্দাটি অনুপস্থিত। জানালার এই কোণটি থেকে নীচের ওই ঘরটার ভিতরসুদ্ধ দেখা যায়। ওটা ঘর ঠিক নয়, বড় একটা হলঘরের মতো। ঘরের মধ্যে কাজের কত রকম সরঞ্জাম, কত রকমের ছবি। হলঘরের ভিতর দিয়ে যে ঘরটার আভাস, সেটা শোবার ঘর।

এই হলঘরটা রহস্যের মতো লাগে মালার। দু'বছর ধরেই তাই লাগছে। সেখানে ঘরের মালিক যখন কর্মনিবিষ্ট, মালার এই কোণের জানালাটা তখন অল্প ফাঁক থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে অবাক বিস্ময়ে দেখে মালা। অত নিবিষ্টচিত্তেও কাজ করতে পারে কেউ। সমস্ত দুনিয়াটা যেন অনুপস্থিত লোকটার কাছে। উপস্থিত শুধু ওই মস্ত ফ্রেমটা, আর তাতে আঁটা ক্যানভাসটা, আর পাশের রঙ-তুলি আর জলের বাটি। কখন নতুন ক্যানভাসে রঙ ছোঁয়ানো হল, আর করে সেটা শেষ হল, মালা তার পুঙ্খানুপুঙ্খ জানে। কিন্তু কি শেষ হল, সেটা জানার উপায় নেই। জানার জন্যে ছটফটানিরও শেষ নেই। ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে দেখে আসে। লোকটার মুখের তৃপ্তি দেখে বা বিরক্তি দেখে শুধু বুঝতে পারে, কোনটা মনের মতো হল, আর কোনটা হল না।

ইচ্ছে করলেই মালা ওই ঘরে ঢুকতে পারে, ইচ্ছে করলেই দেখতে পারে। নমিদি তো কতদিন তাকে যাবার কথা বলেছে। এই বয়সেই এত লজ্জা দেখে রাগ পর্যন্ত করেছে। কিন্তু রাজ্যের সংকোচ মালার। আর ওই ঘরে ঢোকা। বাবা রে বাবা। নমিদি বলেছে, যখন তখন গৌতমদার ঘরে ঢুকলে তাকে সুদ্ধ নাকি রাগ করে ঘর থেকে বার করে দেয়। আঁকা-টাকার গল্প উঠলে তার গৌতমদার প্রশংসায় নমিদি পঞ্চমুখ। তার মতে অমন শিল্পী আর আছে কিনা সন্দেহ। নমিদির থেকে মাত্র তিন বছরের বড় খুড়তুতো দাদাটি। ওই বাড়িটার অর্ধেক মালিক। নমিদি এম. এ. পড়ে। তার এই দাদা বি. এস-সি. ডিস্টিংশনে পাস করে আঁকার কলেজে ঢুকেছিল। সেখানেও আগাগোড়া ফার্স্ট। এই বয়সেই এখন সেই আঁকার কলেজে মাস্টারি করে। অবসর সময় ঘরের দরজা বন্ধ করে নিজের কাজ করে।

মামীর সঙ্গে খুব ভাব নমিদির। প্রায়ই গল্প করতে আসে। মালা যায় না বলে মামীকে অনুযোগ করাতে মামী অনেক দিন ঠেলে পাঠাতে চেষ্টা করেছেন তাকে। সে-চেষ্টার পিছনে মামীর একটু আশাও ছিল। মালা শেষে নমিদিকে বলেছিল—পরীক্ষাটা হয়ে গেলে যাবে।...নমিদি হেসে ফেলেছিল—এখান থেকে লাফালে আমাদের ঘরে গিয়ে পড়বে—পরীক্ষার জন্য যেতে পারছ না?

পরীক্ষা, অর্থাৎ স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা। মামাই তোড়জোড় করে ওর পড়াশুনার ব্যবস্থা করেছিলেন আর অন্য ভাইবোনগুলোকে স্কুলে ভরতি করে দিয়েছিলেন। ওর পরীক্ষার পর নমিদিরাই দু-তিন মাসের জন্য কোথায় যেন গিয়েছিল। কিন্তু মালা তারপর যাবে কি, লজ্জায় মুখ লুকোতে পারলে বাঁচে—সে থার্ড ডিভিশনে পাস করেছে।

পাস করার পরেও তাকে কলেজে ভর্তি করানো যায় নি। তার লজ্জাই বেশী। মামা আবারও বাড়িতে পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। কিন্তু পড়াশোনা মালার কমই

হয। সামনে বই খোলা থাকে, এই পর্যন্ত। চোখ থাকে আধ-পাটখোলা জানালাব ভিতব দিযে গলিব ওধাবেব ওই বড ঘবটাব দিকে। খুব ক্লান্ত লাগলে লোকটা তুলি-টুলি ফেলে হাত-পা ছডিযে সিগাবেট টানতে থাকে। আব সিগাবেট একবাব ধবল তো একেবাবে দুটো তিনটে খাবে। মালা শুনেছিল বেশী সিগাবেট খেলে গলায ও বুকে অনেক সময ব্যামো হয। মালা ভুরু কোঁচকায, কেন, কি দবকাব অত সিগাবেট খাবাব।

জানালাটা যে সব সময একেবাবে মাপমতো বন্ধ থাকে তা নয। এক-আধ সময হযত খোলাই থেকে যায অনেকটা। কাজে মন দিলে কোনোদিকে তো আব তাকাবে না লোকটা—তাই সব সময সতর্ক থাকাব প্রযোজন হয না মালাব। ফলে এক-একদিন দেখা হযে যায, চোখোচোখি হয। তখনো খুব যে খেযাল কবে দেখে ওকে, মনে হয না। মালা অবশ্য জানালাটা ঠেলেই দেয। নমিদিব মুখে নাম শুনেছে, গৌতম। গৌতমই বটে। মালাব এক-একদিন ইচ্ছে হয, স্কুল ফাইন্যালেব ইতিহাস বইটা এনে 'গৌতমেব ধ্যান' অধ্যাযটা চেঁচিযে চেঁচিযে পডে। তাবপব উদ্ভট ইচ্ছেটাব কথা ভেবে নিজেব মনেই হেসে বাঁচে না।

একদিন মালাব দুই চক্ষু বিস্ফাবিত। জানালা বন্ধ কবতেও ভুল হযে গেল। একি কাণ্ড। ছোট ছেলেব মতো একতাল কাদামাটি ছানাছানি কবছে লোকটা। তাই দিযে কিছু একটা গডতে চেষ্টা কবছে, আবাব তালগোল পাকিযে দিচ্ছে। প্রায ঘণ্টাখানেক ধবে কাদাব তালটাকে কিছু একটা আদলে আনাব চেষ্টায হাল ছেডে শেষে জানালাব কাছে এসে দাঁডাল। মালাব তখনো খেযাল নেই, সে হাঁ কবে দাঁডিযেই আছে। লোকটাব মুখে হাসিব আভাস দেখে খেযাল হযেছে, হুডমুডিযে ছুটে পালিযেছে সেখান থেকে।

মামী একদিন নমিদিব কাছে ভাগ্নীব বিযেব ভাবনাটা প্রকাশ কবে ফেললেন। মালা কাছেই ছিল। নমিদিব মন্তব্য কানে এল—ওব জন্যে আপনাব ভাবনা কি, ওই চেহাবাব মেযে ক'টা হয, যে দেখবে সেই লুফে নেবে।—এবপব আব একদিন মনেব বাসনাটা নমিদিব কাছে প্রকাশই কবে ফেললেন মামী। বললেন, দুবাশা তো বটেই, তবু ভাগ্নীব ওই চেহাবাটুকুব জন্যেই ভবসা কবে প্রস্তাবটা কবা। গৌতম সোনাব টুকবো ছেলে, এমন ভাগ্য তাঁদেব হবাব নয, তবু নমি যদি তাঁদেব মুখ চেযে একটু চেষ্টাচবিত্র কবে, যদি তাব বাবাকে একটু বলে কযে দেখে।

রূপেব যতই প্রশংসা করুক, এই আশা তাবা কবতে পাবে সেটা নমিদি ভাবে নি বোধহয। দূব থেকে তাব মুখ দেখে সেই বকমই মনে হযেছিল মালাব। তবে কথা দিযেছিল, বলে দেখব।

বলেছিল। কিছুদিনেব মধ্যেই ভাইপোব জন্যে আনুষ্ঠানিকভাবে মেযে দেখে গেলেন নমিব মা-বাবা। মেযে যে তাদেব পছন্দ হযেছে সেটা সেখানেই তাঁবা নির্দ্বিধায বলে গেলেন। মেযে মোটামুটি তাঁবা নিজেদেব ঘবে বসেই অনেকদিন ধবে দেখে আসছেন। সুখেব ঘবে রূপেব বাসা, কিন্তু এই ঘবে এই রূপ এল কেমন কবে, তাই বোধ হয মনে মনে অবাক হযে ভাবতেন তাঁবা।

বিমলেন্দুবাবুকে কথাবার্তা বলাব জন্য বাডিতে আসতে বলা হল। মস্ত আশা নিযে তিনি গেলেন। কিন্তু তাবপব মুখ অন্ধকাব। আলোচনাব ছলে মোটামুটি একটা

ফর্দ পেশ করলেন নমির বাবা। সেই ফর্দ বিমলেন্দুবাবু তাঁর নিজের দুটো মেয়ের বিয়েতেও মেটাতে পারতেন কিনা সন্দেহ। তার ওপর নগদ তিন হাজার এক টাকা পণ। দায়দায়িত্ব সবই জ্যাঠার যখন, ছেলেটা কোনোদিন না ভাবে জ্যাঠা তার পাওয়া-থোয়ার ব্যাপারে উদাসীন ছিল।

বিমলেন্দুবাবুর মাথাটা ঝিমঝিম করছিল। লো-প্রেসার কি হাই-প্রেসার বুঝছিলেন না। একটু সুস্থির হয়ে প্রথমে মেয়ের বাপের বাড়ির, পরে নিজের বাড়ির সংসারের চিত্রটা তাঁর চোখের সামনে স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিলেন। বলেছিলেন—আপনাদের দয়ার ওপর নির্ভর—

নমির বাবা নিরাসক্ত মুখে জবাব দিয়েছেন—তাহলে আর কি হবে।

তবু একটু অনুনয় করতে যাচ্ছিলেন বিমলেন্দুবাবু, কিন্তু ভদ্রলোক সেটা পছন্দ করেন নি। বলেছেন—এ নিয়ে আর কথা বাড়িয়ে লাভ কি—

না, কথা আর বাড়ে নি। তারপর মামীর তাড়নায় পড়ে এই শেষ চেষ্টাটা করেছিলেন বিমলেন্দু। ছেলেকে একবার এনে দেখানোর চেষ্টা। তারও এই ফল।

জানালা থেকে উঠে বাইরের বারান্দার রেলিংয়ে এসে দাঁড়াল মালা। এদিকের পাজামা-পরা লোকটা আর ওদিকের গায়ক গুটি-গুটি এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে টের পেল। দুদিকের দুজোড়া চোখ তাকে গিলছে, তাও উপলব্ধি করল। কিন্তু মালা আজ এই প্রথম দাঁড়িয়েই রইল। নির্লিপ্ত, উদাসীন। জগৎটাই যেন মৃত মূর্ছাতুর হয়ে পড়ে আছে তার সামনে।

এর মাস সাতেক বাদে এ-সংসারের সব থেকে অভিনব বিয়োগান্ত নাটকটা সুসম্পন্ন হয়ে গেল। মামা চোখ বুজলেন। লো-প্রেসারের স্ট্রোক। তিন দিন অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। জ্ঞান আর হয়ই নি। মামী ডাক ছেড়ে কেঁদেছিলেন। মালা কাদতে পারে নি। কাদবে কেমন করে, কান্না শোনার কান কি ওই বিশাল বিস্তৃত মহাকাশে কোথাও আছে ?

এ-কাহিনীর শেষ অধ্যায়ের সূচনা দশ বছর বাদে।

শহরের অভিজাত অঞ্চলে হয়ত সব থেকেই অভিজাত আদব-কায়দার হোটেল ওটা। এখানে পকেটের বসদের হিসেব কষে কেউ ঢোকে না। হিসেব জিনিসটাই অচল এখানে। এখানকার রাতের অঢেল যৌবন। এখানকার আলোর কণায় কণায় যৌবনের নেশা। বাঙালী মাদ্রাজী পার্শী শিখ নেটিভ-সাহেব খাস-সাহেব—সকল জাতের সকল বর্ণের সর্বোচ্চ পর্যায়ের মানুষদের অবসর-বিনোদনের বা শ্রান্তি-ক্লান্তি মোচনের জায়গা এটি। অর্থকৌলীন্যে যিনি যত বেশী মেজাজী কুলীন, তাঁর তত সহজ আনাগোনা এখানে।

আইন ? কানুন ? সে-সবের কড়াকড়ি ছোট জায়গার জন্যে। বড় জায়গার স্পেশ্যাল পরোয়ানা। প্রয়োজন দেখাও, টাকা ঢালো—পরোয়ানা মিলবে। হোটেল কর্তৃপক্ষ রাতের মিয়াদ ভোরের দিকে টেনে নেবার জন্যে পরোয়ানা সংগ্রহে পিছ-পা নয়, টাকা ঢালতে গররাজী নয়। কারণ তারা ঘরের টাকা ঢালছে না।

গৌতম দত্তব ছোট গাড়িটা হোটেলেব সামনেব ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়াল যখন, বাত তখন দশটাব ওধাবে। নিজেই ড্রাইভ কবে। না, সে নিযমিত আগন্তুক নয এখানকাব। যা সে খুঁজছে, একজন বন্ধু তাব হদিস দিযেছিল। বলেছিল, দেখ গে, পছন্দ হবে হযত, যদি বাজী কবাতে পাব—

আজ নিযে পব পব এই তিন দিন আসছে সে। দুদিনই দেখা পেযেছে, আজও পাবে হযত। পছন্দ হযেছে, যতটা চেযেছিল তাব থেকেও বেশী পছন্দ। কিন্তু আলাপ কবা হযনি। প্রস্তাব কবা হযনি। চেযে চেযে দেখেছে শুধু।

এখানকাব ক্ষণ-সহচবীদেব একজন। বাঙালী মেযে। বাঙালী মেযে বোধহয এই একজনই আসে এখানে। অ্যাংলো-ইণ্ডিযান আছে, পার্শী আছে—সুন্দবীও বটে। সুন্দবী না হলে এখানে ঠাঁই মেলে না। শুধু রূপ থাকলে হবে না, বেশবাস, আচাব-আচবণ, কথাবার্তায সূক্ষ্ম মার্জিত রুচিবোধ থাকা চাই। তা-ই আছে সকলেব। কিন্তু আব কাবো দিকে চোখ পড়ে নি গৌতম দত্তব। ওই একটি মেযে ছাড়া। আশ্চর্য, এমন মেযেও আসে এখানে।

গৌতম দত্ত নামজাদা শিল্পী। তাব ছবি, তাব মডেলিংযেব আলাদা মর্যাদা। কিন্তু সম্প্রতি মডেলই খুজে বেড়াচ্ছে সে। মনেব মতো মডেল। যে মডেল পেলে আন্তর্জাতিক সমঝদাবদেবও টনক নড়বে। অনেকবাব অনেক মডেল নিযে কাজ কবেছে। কিন্তু তেমন মন ওঠে না। শিল্পী নিজে মুগ্ধ না হলে, মুগ্ধ কববে কাকে? মন না ভবলে, গড়াব চেষ্টা বিড়ম্বনা। এজন্যে টাকা খবচ কবতেও প্রস্তুত সে।

আগেব দু'দিন যেখানে বসেছিল আজও সেই কোণটাই বেছে নিযে বসল। বিযাবেব অর্ডাব দিল। এখান থেকেই মেযেটিকে দেখেছে দু'দিন। আজও দেখছে। মুখখানা গত দু'দিনেব মতোই চেনা-চেনা লাগছে। একজন ফিটফাট শিখ তরুণেব সঙ্গে হাসিমুখে কথা কইছে মেযেটি। আব এক-আধবাব ঘাড় ফিবিযে ওকেও দেখছে। আগেব দু'দিনও দেখেছিল।

গৌতম দত্ত অল্প অল্প বিযাবে চুমুক দিচ্ছে, চোখ দুটো তাব অদূবেব নাবীতনুতে আটকে আছে। গত দু'দিনেব মতোই বিশ্লেষণ কবে দেখছে—নাক, মুখ, চোখ, ঠোঁটেব বক্রাভাস, চিবুক, গলা। তাবপব বক্ষাভাস—মার্জিত চোখে যতটুকু সয ততটুকুই স্পষ্ট, ততটুকুই সুন্দব। তাবপব কটিদেশ। তাবপব আবো নীচে, আবো নীচে—একেবাবে পা পর্যন্ত।

আজই প্রস্তাব কববে গৌতম দত্ত।

শিখ তরুণটিব পানাহাবেব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান কবে হাসিমুখে উঠল মেযেটি। আগেব দু'দিনও প্রত্যেককে প্রত্যাখ্যান কবতে দেখেছে। চাহিদা বজায বাখাব এটাই বোধহয বীতি।

অনেক পুরুষেবই পবিচিতসুলভ ব্যবহাব মেযেটিব সঙ্গে। কেউ হেসে অভ্যর্থনা জানায, কেউ বা অভিবাদনে। মেযেটি হেসে কাবো সামনে দু-পাঁচ মিনিট বসে, কাবো সামনে দাঁড়িযে দু-চাবটে কথা বলে। আবাব এগোয। হোটেল কর্তৃপক্ষ যেন এখানকাব মাননীয অতিথিবর্গেব সুখ-সুবিধেব ভাব তাব ওপবেই অর্পণ কবেছে। কাবো হাসিমুখেব আমন্ত্রণ দেখলেই হাসে, কাছে এসে খোঁজখবব কবে।

দুটো টেবিলের ওধার দিয়ে যেতে যেতে আবারও দৃষ্টি বিনিময়। গৌতম দত্ত হাসল। যেমন করে ওরা হাসে। তাব থেকেও ভালো করে। কাছে আসাব অনুরোধের মতো হাসি।

মেয়েটি থমকে দাঁড়াল। হাসি মিলিয়ে আসছিল। সেটা খেয়াল হতেই হাসিব জবাব দিল। সুন্দর সুচারু হাসি। তারপর টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল।

—বসুন না।

গৌতম দত্ত শশব্যস্তে দাঁড়িয়ে উঠে অভ্যর্থনা জানাল।

বসল। মুখোমুখি গৌতম দত্তও। আবারও মনে হল, মুখখানা চেনা-চেনা।

—আপনাকে কিছু দিতে বলি?

—না না, ধন্যবাদ, আপনি খান। আপনাকে নতুন দেখছি ক'দিন ধবে, নাকি আগে অন্য সময়ে আসতেন?

—না, এই তিনদিন এলাম।—গৌতম দত্ত থমকালো একটু, তাবপব বলে ফেলল —তিনদিনই আপনাব জন্যে আসছি।

—খুব ভাগ্য।—মেয়েটি হাসল। কিন্তু মনে হল এ-বকম কথা শুনে সে অভ্যস্ত।

গৌতম দত্ত দ্বিধা জানে না, কাজ বোঝে। হাতে এমন সময়ও নেই যে ভণিতা করে সময় কাটাতে পারে—অনেকেব অনেক জোড়া চোখ এই টেবিলে। মেয়েটিও এব মধ্যে ঘড়ি দেখেছে একবার। এই এক হাতেব মধ্যে তাকে দেখে গৌতম দত্ত কাজেব ফযসালাটা কবে নেবাব জন্য ভিতবে ভিতরে বেপবোযা হযে উঠেছে। বলল, —আমাব একটু বিশেষ আলোচনা ছিল আপনাব সঙ্গে, একটা দবকাবী প্রোপোজ্যাল. কিন্তু এটা ঠিক সিবিযাস আলোচনাব আবহাওযা নয, আমাব সঙ্গে গাড়ি আছে, আপনি যদি দযা কবে খানিকক্ষণের জন্যে আমার সঙ্গে আসেন।

এবারে মেযেটির থমকাবাব পালা। টানা টানা চোখ দু'টি গৌতম দত্তব চোখেব গভীবে। জবাব দিল না চট করে।

গৌতম দত্তব বলাব মধ্যে এবাবে প্রচ্ছন্ন অনুনযেব সুব।—আপনি বিশ্বাস করুন, সত্যি খুব দরকাবী আলোচনা, আপনাব কোনো ভয নেই, আমি আবার আপনাকে হোটেলে পৌঁছে দিযে যাব।

—না, ভয আব কি, চলুন।—অল্প কবে হাসল মেয়েটি।

গৌতম দত্তব মনে হল, এই হাসিটুকুও এঁকে বাখার মতো সুন্দর।

রিয়াবেব গ্লাস থাকল পড়ে। গ্লাসে একটা নোট চাপা দিযে উৎফুল্ল চাপা আনন্দে সসঙ্গিনী নীচে নেমে এল। মোটবে উঠল। গাড়ি মাঠেব ধার দিযে একটা নির্জন রাস্তা ধবে চলল। গৌতম দত্ত কি ভাবে কথাটা পাড়বে ভেবে নিচ্ছিল...সঙ্গিনী পাশেব গদিতে গা ছেড়ে দিযেছে।

এবাবে একটু ভণিতা করা যেতে পাবে। গৌতম দত্ত বলল—আচ্ছা আপনাকে যেন কোথাও দেখেছি বলে মনে হচ্ছে।

অস্ফুট হাসিব শব্দ।—বিলিতী ক্যালেন্ডারে দেখে থাকবেন।

কিন্তু কোনো ক্যালেন্ডারে গৌতম দত্ত দেখেছে বলে মনে পড়ল না। দেখলে এ-মুখ মনে থাকার কথা।

মেয়েটি হালকা গাম্ভীর্যে বলল—আপনাকে তো এসব দিকে আনাড়ী মনে হয়, অচেনা কাউকে এভাবে গাড়িতে ডেকে তুলবেন না, বিপদ হতে পারে। কত রকম যে থাকে—

—না, ইয়ে—আমার অন্য কথা ছিল—

—সে তো শুনলাম। নমিদি কেমন আছে? কোথায় বিয়ে হল—ছেলেপুলে কী?

গৌতম দত্ত হতভম্ব।—আপনি নমিকে চেনেন?

—ওমা, চিনব না কেন? কতদিন পাশাপাশি কাটালাম, দিনরাত ঘরে বসে আপনার কত ছবি-আঁকা দেখতাম।

গৌতম দত্তর প্রায় মনে পড়ল বুঝি এবার, বিয়ের কথাও উঠেছিল পাশের বাড়ির কার সঙ্গে যেন—এই নাকি! কি কাণ্ড! হলে তো হয়েছিল আর কি! কিন্তু তার আশাও বাড়ল। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল—তোমার—আই মিন আপনার নামটি কী?

—নাম মালা—অস্ফুট মিষ্টি হাসি তেমনি—নামে কি চিনবেন, দিনরাত চোখ-কান বন্ধ করে কাজ করতেন আপনি।

প্রশংসার কথাই। গৌতম দত্ত মনে মনে খুশী হল। স্তুতি অনেক জোটে, কিন্তু যার কাছে স্বার্থ তার স্তুতিটা বেশী কাম্য। স্টিয়ারিং হাতে থাকায় ঘাড় ফিরিয়ে ভালো করে দেখার সুবিধে হচ্ছিল না। বলল—তখন নিজের খেয়ালে আঁকতুম, শিল্পী হিসেবে এখন একটু-আধটু চেনে অনেকেই—

মালা সায় দিল।—চিনবে জানতুম।—তা দরকারী আলোচনাটা কি আপনার, মডেল চাই?

গৌতম দত্ত অবাকই হচ্ছে মনে মনে। এই চেহারার এমন এক মেয়ে তার বাড়ির গায়ে থাকত, অথচ ভালো করে সে লক্ষ্যও করে নি কোনোদিন।...বছর দশেক হয়ে গেল বোধহয়, বয়েস তো তাহলে আটাশ-উনত্রিশের কম নয়—অথচ এত কাছ থেকেও সে বাইশ-তেইশের বেশি ভাবে নি। কারণ থাক আর না থাক, গৌতম দত্ত এই জন্যেও বোধহয় আরো খুশী মনে মনে। কিন্তু পেশাগত আলোচনার মুখে আগ্রহটা খুব বেশী দেখানো উচিত নয়।

মাথা নাড়ল। বলল—হ্যাঁ, একের পর এক দেখে যাচ্ছি, তুমি—মানে আপনি রাজী হলে—

—'তুমি' 'আপনি'তে বড় গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। একটা ঠিক করুন। 'তুমি'ও বলতে পারেন, আপত্তি করব না—

আপত্তি করবে না। সুতরাং তার আসা সার্থক, সেটা গৌতম দত্ত ধরেই নিয়েছে। বলল—তুমি রাজী হলে সেটল করে ফেলি।

মালা ভাবনায় পড়ল যেন একটু।—আমার কি সময় হবে—

লাগোয়া বাড়ির পড়শিনী ছিল একদিন, সেই কারণে গৌতম দত্তর যেন দাবিই আছে। জোর দিয়ে বলল—এ একটা মস্ত কাজ। আমার অনেক নতুন আইডিয়া আছে, অনেক প্ল্যানও আছে—আমার বিশ্বাস বিদেশেও কম কদর হবে না, আর মডেল হিসেবে তোমারও নাম ছড়াবে—এ রকম যোগাযোগ সব সময় ঠিক হয় না।

অর্থাৎ যোগাযোগটা মালার দিক থেকেও সৌভাগ্যসূচক। মালাও সেটা বুঝল যেন, বলল—লোভ হচ্ছে। আচ্ছা, এবাবে গাড়ি ফেবান, যেতে যেতে কথা বলি।

গৌতম দত্ত গাড়ি ফেবাল। অন্তব তুষ্টিতে ভরপুর। লোভের আরো একটু ইন্ধন যোগাল। বলল, এক আধ বছবেব মধ্যে হয়ত বাইরেও যাব আমবা—

মালা চুপচাপ ভাবল একটু। বলল—আপনাব মডেল মানে তো—ক্যালেন্ডাব-ট্যালেন্ডারে যে রকম সিটিং দিই, সে রকম নয় বোধহয়?

গৌতম দত্ত মাথা নাডল।—না সে বকম নয়। রিয়েল মডেল বলতে যা বোঝায, মানে—

বলাটা সহজ হচ্ছিল না। মালা হেসে থামিযে দিল।—থাক, বুঝেছি। আচ্ছা, কি বকম কি ব্যবস্থা হবে বলুন—

—তুমি বললেই ভালো হয়, কি বকম দবকাব—

—দবকাব তো কম নয।—হাসি-হাসি মুখখানা হিসেবে মগ্ন একটু।—তা দিনে কাজ, না বাত্রিতে?

—দিনেব বেলাযও দবকার হতে পাবে, তবে রাত্রিতেই কাজ কবি—

হিসেব ভুলে মালা সকৌতুকে ঘাড ফেবাল তাব দিকে।

—বিযেল মডেল নিযে বাত্রিতে কাজ কবলে আপনাব স্ত্রী বাগ কবেন না? বিযে কবেছেন তো?

কাজেব প্রসঙ্গে এই মেযেলী কথা ভালো লাগল না গৌতম দত্তব। এককথায় দুটো জবাব সাবল।—তিনি জানেন এটা পেশা আমাব।

মালা মাথা নাডল। অর্থাৎ, সেটা ঠিক কথা। জিজ্ঞাসা কবল—কতদিনেব কাজ আপনাব?

—কাজ অনেকদিনেব, এক বছবেব না হয় তিন বছবেবই কন্ট্রাক্ট কবে নিতে বাজী আছি আমি। তাবপবেও কাজ শেষ হবে না, কন্ট্রাক্ট আবাব রিনিউ হবে।

মালা খানিকটা নিশ্চিন্ত বোধ কবল যেন। মনে মনে আবাব একটু হিসেব করে নিযে বলল—দিনে কম হলেও দেডশ টাকা—মাসে ধরুন সাডে চাব হাজার টাকা বোজগাব আমাব, বেশীও হয়—

গৌতম দত্ত আঁতকে উঠল একেবাবে। গাডিটা সুদ্ধ নডেচড়ে গেল একটু। মনের মতো মডেল পেলে সে মোটা টাকা খরচ কবতে প্রস্তুত—সেই মোটা টাকার অঙ্কটা খুব বেশী হলে হাজার টাকা মাসে। এই একটা অঙ্ক শুনে রাজ্যেব হতাশা যেন গ্রাস করতে এল তাকে। নিজেকে খানিকটা বঞ্চিত কবে আর পৈতৃক সম্পত্তিব জোরে টেনেটুনে বড জোব দেড় হাজারে উঠতে পারে। সেও এই ঝোঁকে, এই মডেলের জন্যে।

শুকনো মুখে বলল—আমি অত পেবে উঠব কেন, এতবড় কাজেব দিকটা ভেবে আর শিল্পীব দিকটা ভেবেই তুমি যদি অনুগ্রহ কবে রাজী হও—

চরম হতাশার মুহূর্তেও একটুখানি আশার আলো দেখছিল কি গৌতম দত্ত? সামনের দিকে নজব রাখা ভুলে পার্শ্ববর্তিনীব দিকেই চাইছে ফিবে ফিরে। আবেদনেব ফলে একটু ভাবছেই মনে হল।

মালা বলল—মুশকিলে ফেললেন। আচ্ছা, মোটামুটি ওই চার হাজার পর্যন্ত পাবি, তার নীচে আর পাবি না।

গৌতম দত্তর সময় লাগল আত্মস্থ হতে। গাড়ি হোটেলের কাছাকাছি এসে গেছে। অস্ফুট স্বরে বলল—না, সেও আমার সাধ্যের বাইরে।

মালা তক্ষুণি সান্ত্বনার সুরে বলল—তাতে কি, কমে কি আর পাওয়া যায় না? আমার সঙ্গেই তো কত সময় কত জনের দেখা হয়, আর তারা সব দেখতেও ভালোই। আপনার স্টুডিও এখনো বাড়িতেই তো? সুবিধেমতো কাউকে পেলে আপনার ঠিকানা দিয়ে দেব'খন।

গৌতম দত্ত নিরুত্তর।

গাড়ি হোটেলের সামনে দাঁড়াল। মালা নেমে এসে স্মিতমুখে দুহাত জুড়ে নমস্কার জানাল।—বেড়িয়ে বেশ লাগছে, অনেক ধন্যবাদ। চলি।

ফুটপাথ পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে গেল।

পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বার করল গৌতম দত্ত। সিগারেট ধরাল। তারপর গাড়িতে স্টার্ট দিল।

হোটেলের সিঁড়ি পর্যন্ত টকটকিয়ে এসে মালা দাড়িয়ে পড়ল। দোতলার দিকে তাকাল একবার। আজ আর ইচ্ছে করছে না দোতলায় উঠতে। চল্লিশ-পঞ্চাশটা টাকা লোকসান কম করে। হোকগে। মনটা ভালো লাগছে খুব। শিথিল চরণে আবার বাইরে এসে একটা ট্যাক্সিতে উঠে বসল সে।

এই স্পীডে গৌতম দত্ত গাড়ি চালায় না কখনো। ঘণ্টায় বিশ মাইলও হবে কিনা সন্দেহ। তার জীবনেরই খানিকটা গতি কমে গেছে যেন।

অবসাদগ্রস্তের মতো গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবছিল গৌতম দত্ত, মেয়েদের কি হৃদয় বলে কোনো বস্তু নেই?

ঝড়

খুব বেশি দিনের কথা নয়।

একদিনের মাত্র কয়েক ঘণ্টার প্রচণ্ড ঝড়ে শহর কলকাতার স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা লণ্ডভণ্ড হয়ে গিয়েছিল। বড় বড় গাছগুলো শিকড় উপড়ে পথের ওপর মুখ থুবড়ে পড়েছে। পরদিন দেখে মনে হয়েছে যুদ্ধ-হত এক-একটা অতিকায় দানব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছড়িয়ে আকাশের দিকে মুখ করে অভিযোগ জানাচ্ছে। ভাঙা ডাল, ছেঁড়া তার আর উড়ন্ত টিনের চাল সরিয়ে চলাচলের পথ সুগম করতে এক সপ্তাহ লেগেছিল।

কিন্তু আমি সেদিনের কথাই বলছি। সেই প্রলয়-সন্ধ্যার কথা।

কাক চিল পটাপট মাটিতে আছাড় খেয়ে মরেছে। গাছ আর ভাঙা বাড়ি চাপা পড়ে অনেক লোক হতাহত হয়েছে। ট্রাম-বাস বন্ধ হওয়ায় বহু মেয়ে-পুরুষ পথে

আটকে গেছে, আর ঘরে ফিরতে পাববে কিনা, সেই ত্রাস চোখ ঠেলে উঠেছে। যারা ভাগ্যক্রমে আগেই ঘবে পৌঁছে গিয়েছিল তারা ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েছে।

কিন্তু সেই সন্ধ্যাটাকে আমি প্রত্যক্ষভাবে দেখি নি। কিছু শুনেছি, কিছু অনুমান করেছি। বাড়িতে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সকলে দুটো করে চোখ কপালে তুলে নিরীক্ষণ করেছে আমি সেই লোক কি না, আমাব হাত-পাগুলো সব যথাযথ আছে কি না। আশঙ্কা কাটতে মা-ই প্রথম মুখব্যাদান কবেছেন— তুই এব মধ্যে এলি কি কবে, বিপদ-আপদ হয নি তো? এদিকে যে কাণ্ড, ঠাকুর বক্ষা করেছেন—

দুই এক কথায় সকলকে আশ্বস্ত কবে কাণ্ড শোনার দিকে মন দিতে চেষ্টা কবেছি। নিজেকে ভুলতে হলে, নিজেকে ছাড়িযে যেতে হলে, অন্যেব কথা মন দিয়ে শোনাব মতো ওষুধ আব নেই। কিন্তু সে পারা বড় শক্ত। আমারও সহজ হচ্ছিল না।

ঝড় থেমে গেছে, তাই এবা ঝড়ের গল্প করতে পারছে। কার কত বড ফাঁডা গেল তাব রোমাঞ্চকর বিবরণ কানে আসছে। বিপদ হতে পারত বই কি, খুব বিপদ হতে পাবত।

কিন্তু আমাব বুকেব ঝড এখনো থামে নি। দেহের সবগুলো স্নায়ুতে টান ধবে আছে। ওদের কথা শুনতে শুনতে সেগুলিকেই শিথিল কবার চেষ্টা। সহজ হওয়াব চেষ্টা।

আমি তখন আকাশে ছিলাম।

একটা মালবাহী প্লেনে। যাব পাইলট ক্যাপ্টেন সিং। যোগীন সিং। আব একটু বিস্তৃত কবে বলা দবকাব। কলকাতা থেকে কুচবিহাব ট্রেনে প্রায দুদিনেব পথ, প্লেনে দেড ঘণ্টাব। খববেব কাগজেব কাজে প্রাযই তখন এদিকে আসতে হত। এই সূত্রে যোগীন সিংয়েব সঙ্গে আলাপ। মাসে চাববাবও প্লেনে যাতাযাত কবেছি। তাছাড়া দুই একবাব আসাম বা বাগডোগবা থেকে ফেবার সময়ও যোগীন সিংয়ের প্লেন পেয়ে গেছি। ছোট একটা বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রধান পাইলট যোগীন সিং। গোড়ার জীবনে তিন বছর মিলিটারীতে ছিল। সেই সুবাদে ক্যাপ্টেন। মিলিটারীব ওপবঅলাদের সঙ্গে বনিবনা না হওযাতে পার্মানেন্ট কমিশন পায নি বা নেয নি। প্রথম শর্তেব মিয়াদ ফুবোতেই ছেড়ে এসেছে।

বনিবনা না হওযাবই কথা। তার মেজাজেব ওপব মেজাজ দেখানোর লোক থাকলে যোগীন সিংযের সেখানে টিকে থাকার কথা নয। তাব মতো পাইলট নিয়মিত সার্ভিসেব অনেক বড বড প্রতিষ্ঠানেও অনাযাসে মোটা মাইনেব কাজ জোটাতে পাবত। মাসে দু-দশ বাব ইংল্যাণ্ড আমেবিকা কবতে পারত। কিন্তু সে কাজ করতে হলে নিয়মের বশ হতে হয, মেজাজও কিছুটা খাটো করতে হয।

যোগীন সিংয়েব সঙ্গে চেনা-যাত্রী হিসেবে আমার আলাপ বটে, কিন্তু হৃদ্যতার আরো একটু কারণ ছিল। বছব তিন চার আগে খবরেব কাগজে একটা ফ্রী-ফাইটেব ছবি ছাপা হয়েছিল সেটা আজ আর কাবো মনে নেই বোধহয়। কলকাতার বাইরেব এক অভিজাত হোটেলে বয়সের গবমে আর টাকার গরমে তিনটি ধনী সন্তান নিজেদের ভাষায় এক বিদেশী তরুণী মহিলার উদ্দেশে তবল টিকা-টিপ্পনী কাটছিল। মহিলা ভাষা

না বুঝলেও তাকে নিয়েই কিছু হচ্ছে বুঝে ক্রুদ্ধ এবং আরক্ত হয়ে উঠছিলেন। যোগীন সিং মদ খাচ্ছিল আর ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিল। উঠে গিয়ে প্রতিবাদ করতে ধনীর দুলালের তিনজনেই একসঙ্গে রুখে উঠল এবং মাতাল বলে কটূক্তি করে উঠল। একে তিনজন তারা, তায় স্বাস্থ্যও কারো খারাপ নয়। যোগীন সিং আর কিছু না বলে নিজের টেবিলে এসে মদের গেলাস খালি করল, তারপর উঠে চুপচাপ বাইরে চলে এল।

একটু বাদে চায়ের পাট শেষ করে আমি বাইরে এসে দেখি, যোগীন সিং নির্লিপ্ত মুখে হোটেলের বাইরে দাঁড়িয়ে। চোখাচোখি হতে নিস্পৃহ উক্তি করল—হ্যালো।

আমিও বললাম, হ্যালো।

আলাপ তখনো এর বেশি নয়। এরোড্রোম থেকে বেরিয়ে অনেক সময় এক হোটেলে এসে উঠলেও, লোকটাকে অত মদ খেতে দেখে, আমি তেমন বেশি কাছে ঘেঁষি না। কিন্তু সেদিন আমার সাংবাদিক চোখে কি যেন একটা সম্ভাবনার অস্বস্তি দেখা দিল। ট্যাক্সি ধরার অছিলায় আমিও দাঁড়ালাম। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় নি। ভিতরের মহিলাটি আগেই চলে গিয়েছিলেন। লোক তিনটিও একটু পরেই বেরুল। তারপর ফুটপাথের ওপরেই খণ্ড যুদ্ধ। দুজনের নাক মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুতে লাগল—তারা ফুটপাথে গড়াগড়ি খাচ্ছে। তৃতীয় জন প্রাণ বাঁচিয়ে মোটরে উঠে চম্পট দিয়েছে।

আমি কিছুই করি নি। শুধু দাঁড়িয়ে দেখেছি, আর ঠিক যে মুহূর্তটির ছবি তোলা দরকার, সেই মুহূর্তের একটা ছবি তুলেছি। তারপর ঘটনার বিবরণ লিখে কাগজে পাঠিয়ে দিয়েছি।

এই থেকেই হৃদ্যতা। পরে যোগীন সিং হাসতে হাসতে বলেছে, তার উপকার করেছি আমি। সে অনেক জায়গা থেকে অনেক সাবাস পেয়েছে বলে নয়। লোকগুলোর টাকার জোর আছে, তারা কেস করত, অন্যভাবেও জব্দ করার চেষ্টা করত। কিন্তু খবরের কাগজে এভাবে ফলাও করে সব প্রকাশ হয়ে পড়াতে নিজেরাই গা ঢাকা দিয়ে আছে। খবরের কাগজ তার জোরালো সাক্ষীর কাজ করেছে।

আমি প্রীত হয়েছিলাম। কিন্তু এও জানি, যোগীন সিং কারো উপকারের পরোয়া না রেখেই যা করার করেছিল।

এরপর বাইরের এরোড্রোম থেকে বেরিয়ে সে যখন যে হোটেলে উঠেছে, আমাকেও সেখানেই টেনে নিয়ে গেছে। আমি বসে বসে তাকে অনেক মদ খেতে দেখেছি, কিন্তু মাতাল হতে দেখি নি। তাকে দেখলে বা কথাবার্তা বললে পাঞ্জাবী বলবে না কেউ। দাড়ি-গোঁফের বালাই নেই, আমাদের মতোই পরিষ্কার বাংলা বলে। ছেলেবেলা থেকে বাংলাদেশেই মানুষ।

যাক, বর্তমানের কথা বলি। কুচবিহার থেকে আমার ফেরার তাড়া ছিল। কিন্তু দু'দিনের আগে প্লেনে সীট পাব, সে আশা ছিল না। ইতিমধ্যে যোগীন সিংয়ের প্লেন দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। সে আবার পরদিনই বিকেলে প্লেন নিয়ে ফিরছে জেনে, তাকে ধরলাম, নিয়ে যেতে হবে। যোগীন সিংও তক্ষুনি রাজী। তার এক টেলিফোনে

ফেবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। কারো আপত্তির প্রশ্ন ওঠে না, যোগীন সিং বলেছে যখন, মালেব ওপর বসিয়ে নিয়ে গেলেও নিয়ে যাবেই জানি।

পরদিন। দুপুব থেকে আকাশের অবস্থা ঘোরালো। কাগজেও ঝড়েব আভাস দিয়েছে। শাঁ শাঁ কবে বাতাস বইছে, থমথমে মেঘের গুরু গুরু ডাকটা অন্যবকম।

যোগীন সিংকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই ওয়েদাব, যাবে কি কবে?

সে নির্ভাবনায় জবাব দিল, যেতে হবে। অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

অবাক হযে জিজ্ঞাসা করলাম— কোথায় অ্যাপযেন্টমেন্ট, কলকাতায?

মাথা নাড়লে। হাসলও একটু।

এ ধরনেব হাসি আমি চিনি। বললাম—তাহলে তো বেশ জটিল অ্যাপয়েন্টমেন্ট মনে হচ্ছে, সময়ে না গেলে নিশ্চয কোনো লেডিব বিবাগ ভাজন হবাব ভয় আছে?

যোগীন সিং আবো হেসে আরো বেশি মাথা ঝাঁকালে। আমাব শোনাব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সদাব্যস্ত যোগীন সিংয়ের প্রণয কথা ফেঁদে বসার মেজাজ ছিল না। টুকটাক দু-চার কথা মাত্র জানা গেল। মহিলাব নাম যশোধরা। ক্রিশ্চিয়ান। মস্ত ব্যবসাযীব মেযে ছিল, কিন্তু তাদের বড অবস্থাব সময় যোগীন সিং ও-মেয়েব পাত্তা পায় নি। বাপের ব্যবসা লাটে উঠতে খানিকটা সুবিধে হযেছে। তখনো যোগীন সিংযেব টান দেখে —না, টান আবো বাডতে দেখে, যশোধবা বুঝেছে যোগীন সিংযেব লোভ তাব বাবাব টাকাব ওপব নয, লোভ তারই ওপব। সে অনেক ব্যাপাব—

যোগীন সিং হাসি মুখে স্বীকাব কবেছে, অ্যাপযেন্টমেন্ট ফেল করলে রক্ষা নেই সেটা সত্যি কথাই। মেয়েব যেমন মেজাজ তেমনি অভিমান, একবাব অ্যাপযেন্টমেন্ট ফেল কবাব ফলে সে কি কাণ্ড।

যোগীন সিং অন্যমনস্ক হযে পডল। কাণ্ডবিস্তারে আগ্রহ দেখা গেল না। একটু বাদেই গা-ঝাড়া দিযে উঠে ব্যস্ত পাযে কোথায চলে গেল। কিছু হযত মনে পড়ে থাকবে।

যথা সময়ে এযাব অফিসে এসে হতাশ হলাম। এই আবহাওযায প্লেন ছাড়বে মনে হয না। ঝোড়ো বাতাস ক্রমে বাড়ছে, আকাশেব অবস্থা ভযাবহ। এ সময কুচবিহাব থেকে ওই একটাই প্লেন ছাডার কথা। ছোট বে-সবকাবী প্রতিষ্ঠানেব মালবাহী প্লেন। ছাড়বে কি ছাডবে না এ নিযে কেউ তেমন মাথা ঘামায় না। তবু ক্যাপ্টেন যোগীন সিং আসতে অফিস থেকে তাকে জানানো হল, সব জাযগাবই ওযেদাব বিপোর্ট খারাপ —টেক অফ করা ঠিক হবে না।

যোগীন সিং কান দিলে না, নিঃশঙ্ক জবাব দিল—ও কিছু না, উপর দিয়ে চলে যাব।

আমাব ভয় ধবল একটু। এক ফাঁকে তাকে ধরে জিজ্ঞাসা করলাম—এব মধ্যেই তুমি যাবে?

—তুমি থেকে যাও না, কাল যেও!

নিজেব কাজে চলে গেল। দ্বিধা কাটিয়ে নিজেকে চাঙ্গা করে তুলতে চেষ্টা কবলাম। প্লেন যাবে, যোগীন সিং যাবে, এত মালপত্র যাবে, সঙ্গে যাত্রীও যাবে আরো—এর

মধ্যে নিজেব প্রাণটাব জন্য এত ভাবতে লজ্জা কবল। তাছাড়া সত্যিই বিপদেব সম্ভাবনা থাকলে যোগীন সিংই বা বওনা হতে চাইবে কেন?

প্লেন উঠল। আমবা চাবজন মাত্র যাত্রী। এ ছাড়া পাইলট, কো-পাইলট এবং দু-চাবজন ক্রু। কিছুক্ষণেব মধ্যেই আমাদেব, অর্থাৎ যাত্রীদেব অবস্থা সঙিন। মালবাহী প্লেনেব বসাব আসনেব ব্যবস্থা প্যাসেঞ্জাব প্লেনেব মতো নয। মালেব সঙ্গে খানিকটা মালেব মতো হযেই আসা। তবে কোমবে বাঁধাব বেল্ট গোছেব কিছু আছে। সামনেই মুহুর্মুহু লাল আলো জ্বলছে, ফ্যাসন ইওব বেল্ট—বেল্ট বেঁধে বসুন। কিন্তু ওই বেল্ট বাঁধা সত্ত্বেও স্থিব হযে বসে থাকা অসম্ভব।

বাইবে ঝড় কতটা হচ্ছে টেব পাচ্ছি না। কিন্তু ঝাঁকানি দোলানিতে প্রাণ ওষ্ঠাগত। ঘড়ি দেখলাম। সময অনুযাযী আমবা কলকাতাব ওপবে এসে পড়েছি। কিন্তু কিছুক্ষণেব মধ্যেই ভয আব ত্রাসে শবীবেব বক্ত হিম হযে এল। অনেক উঁচু দিযে প্লেনটা চক্রাকাবে ঘুবছে। নীচে নামাব এক একটা চেষ্টাব মুখে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড—আমবা কে কোথায হুমড়ি খেযে পড়ছি ঠিক নেই। মনে হচ্ছে ঝড়েব মুখে কুটোব মতো এখুনি সব নিঃশেষ হযে যাবে।

চোখেব সামনে মৃত্যু দেখছি আমবা। মৃত্যু প্রতীক্ষা কবছি। এবই মধ্যে ঝড়েব তাণ্ডব এড়িযে কোনোমতে প্লেন সম্ভবত অনেক উঁচুতে উঠে স্থিব হল একটু। ভিতবে সকলে চিৎকাব কবে বলাবলি কবতে লাগল, প্লেন আবাব ফিবিযে নিযে যাওযা হোক, যেখান থেকে এসেছি সেইখানে, অথবা যে-কোনো দূব দূবান্তে যেখানে ঝড় নেই। আমিও একমত, কিন্তু জানাব কাকে?

জানাবাব সুযোগ হল। কি কাবণে মিনিট দুইযেব জন্য কো-পাইলটেব হাতে প্লেন ছেড়ে একবাব ভিতবে এল ক্যাপ্টেন সিং। মনে হল, ভগবান আমাদেব আবজি শোনাবাব জন্যেই তাকে ভিতবে পাঠালেন। বিপদ সম্বন্ধে আমবা বেশি বুঝি, কি সে বেশি বোঝে সেই জ্ঞানও তখন আমাদেব নেই। শুধু বাচতে চাই, বাচাব আকুতি।

অন্য যাত্রীবা তাকে দেখেই চেচামেচি কবে উঠল। তাবা আশ্বাস চায, বাচাব আশ্বাস। প্লেন ফিবিযে নিযে যেতে বলল তাবা। কিন্তু অনুভূতিশূন্য পালিশ-কবা মূর্তি যোগীন সিংযেব। কাবো কথাব জবাব দিলে না। ভিতবেব একটা ছোট্ট খুপবিব মধ্যে গিয়ে ঢুকল, আব দু' মিনিট বাদেই বেবিযে এল।

এইবাব তাকে দেখা মাত্র আমাব ত্রাস আবো বেড়ে গেল। কাবণ আমাব মনে হল, ওখানে গিযে সে গলায খানিকটা মদ ঢেলে এলো। সত্যি মিথ্যে জানি না। কিন্তু আমাব তাই মনে হল, বিশ্বাস হল। বাগে ক্ষোভে আব ভযে দেহ অবশ। মনে হল, এক বদ্ধ পাগলেব পাল্লায পড়েছি আমবা। এই দুর্যোগ থেকে আব অব্যাহতি নেই প্রাণেব আশা নেই।

যোগীন সিং ভিতবে চলে গেল। কোথা দিযে কোথায উড়ছি জানি না, তবে প্লেনেব দাপাদাপি অপেক্ষাকৃত কম। ভাবতে চেষ্টা কবলাম, হযত আমাব অনুমান মিথ্যা, যোগীন সিং হযত কোনো কাজেই ওই খুপবিব মধ্যে ঢুকেছিল। ডিউটিব সময মদ খাবেই বা কোন সাহসে। আশা কবতে ভালো লাগল, আমবা হযত কোনো নিবাপদ

স্থানেই ফিরে চলেছি। তখন সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে। কোন দিকে চলেছি কিছু ঠাওর করা যাচ্ছে না।

অকস্মাৎ মিনিট কয়েকের জন্য সাক্ষাৎ মৃত্যুর বিবরের মধ্যেই যেন ঢুকে পড়লাম আমরা। দেহের সব রক্ত প্রবল বেগে শিরশির করে উঠতে, বুঝলাম শাঁ-শাঁ করে নীচের দিকে নামছে প্লেন। ঝড়ের সামান্য একটু বিরতির অপেক্ষায় ছিল যোগীন সিং। তারপরেই সব বোঝাবুঝির বাইরে আমরা।

দশ মিনিট গেছে, কি দশ ঘণ্টা গেছে, কি অনন্তকাল গেছে--কিছুই জানি না। একসময় সচেতন হয়ে দেখলাম প্লেন থেমে আছে, আর আমরা বেঁচে আছি। সেটা এমনই বিস্ময় যে চট করে বিশ্বাস হয় না।

দরজা খোলা হতে বাইরের দিকে চেয়ে আরো বিস্ময়। এরোড্রোমেই নেমেছি আমরা। ঝোড়ো হাওয়ায় তখনো দু'পায়ের ওপর ভর করে দাড়ানো শক্ত। এই বিপদ দেখেই ছোট একটা গাড়ি এসে আমাদের প্লেনের চত্বর থেকে তুলে নিয়ে অফিসে এনে ছেড়ে দিল।

সর্বাঙ্গ অবসন্ন। শান্তি। নিশ্চিত মৃত্যু থেকে জীবনের আলোয় ফিরে আসার শান্তি। অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ার মতো শান্তি।

কিন্তু যাব কী করে? এ প্যাসেঞ্জার প্লেন নয় যে কোম্পানির গাড়ি করে তাদের এয়ার অফিস পর্যন্ত অন্তত পৌঁছে দেবে। এদিকে প্লেন চলাচল সব বন্ধ, অন্য কোনো কোম্পানীর গাড়িও যাতায়াত করছে না। বাসও নেই। নির্জীবের মতো এরোড্রোমের রেস্তোরাঁয় ঢুকে এক কাপ কড়া কফি নিয়ে বসলাম। প্রাণে যখন বেঁচেছি, সমস্ত রাত এখানে কেটে গেলেও খুব আপত্তি নেই।

—হ্যালো।

যোগীন সিং। মুখ লাল, কিন্তু ঠোঁটের কোণে হাসির আভাসও একটু। যে লোকের খপ্পরে পড়ে প্রাণ যেতে বসেছিল, তাকে দেখেই আবার অন্য আশা জাগল। যোগীন সিংয়ের ছোট গাড়ি আছে একটা। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট সাউথে, না এদিকেই?

—সাউথে। কেন?

—আমাকে যতটা সম্ভব এগিয়ে দাও না, যাব কি করে?

ঘড়ি দেখল। তারপর পিঠ চাপড়ে বলল—কাম অন—

একটি কেবিনের দিকে এগোল সে। কফির পেয়ালা তুলে নিয়ে আমিও তার সঙ্গে কেবিনে গিয়ে ঢুকলাম। যোগীন সিং দুজনের খাবারের অর্ডার দিল। খাবার না আসা পর্যন্ত চুপচাপ বসে রইল। কিছু ভাবছে মনে হল।

খাবার আসতে পরদা টেনে দিয়ে কিট থেকে মদের বোতল বার করল। আমি অবাক। প্রেয়সী সন্নিধানে যাবার আগেও এ বস্তু গলাধঃকরণ করতে পারে ভাবি নি।

খেতে খেতে ঈষৎ ব্যঙ্গস্বরে বলল, দুর্যোগে ওখানকার নিষেধ সত্ত্বেও প্লেন ছেড়েছি বলে আমার বিরুদ্ধে স্টেপ নেওয়া হবে শুনছি। ইডিয়েটস।

ঈষৎ বক্তিম দেখালো মুখ। যে বিপর্যযেব মধ্যে পডেছিলাম তা আব স্মবণ কবতে ইচ্ছে কবে না। তবু বললাম—এভাবে প্লেন না ছেডে আব একটু দেখে নিলেও তো পাবতে।

—দেখতে গেলে আব প্লেন নিয়ে ওঠাই যেত না, সে আমি আকাশেব অবস্থা দেখেই বুঝেছিলাম। সে জন্যে পাঁচ মিনিট আগেই প্লেন স্টার্ট দিযেছিলাম।

অর্থাৎ সব জেনেশুনেই সে প্লেন ছেডেছে। এ বকম লোককে কিই বা বলি।

যোগীন সিং নিবিষ্ট মনে আহাব কবছে। আব মদ খাচ্ছে। যেভাবে খাচ্ছে, মনে হল ধীবে সুস্থে গোটা বোতলটাই শেষ কববে।

বললাম—এসে যখন এই বিপদ দেখলে তখনই বা প্লেন ফেবালে না কেন? সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হতে পাবত—

বিবক্তিব সুবে পাল্টা প্রশ্ন কবল, ফিবব বলে প্লেন ছেডেছিলাম? তোমাকে তো বলেছি আজ না এলেই নয।

অর্থাৎ তাব অ্যাপযেন্টমেন্ট আছে। এক বমণী তাব জন্য অপেক্ষা কবছে, বা কববে। এদিকে নিশ্চিন্ত মনে সে পানাহাবে মগ্ন। আমি হতভম্ব। এই দুর্যোগে অ্যাপযেন্টমেন্ট না বাখতে পাবলে এক পাগল ভিন্ন আব কেউ বাগ কবে না। বিশেষ কবে যে লোককে আকাশ-পথে উডে আসতে হবে।

কিছু শোনাব জন্যেই টিপ্পনীব সুবে বলতে ছাডলাম না, এইদিনে না যেতে পাবলেও কি তিনি বুঝতেন না?

মাথা নাডল। বুঝত না। বলল, বড অবুঝ মেযে, বোঝাবুঝিব মধ্যে নেই। একবাব এই অ্যাপযেন্টমেন্ট ফেল কবে যে দুর্ভোগ হযেছে, সে যদি জানতে— পডবি তো পড, আজ আবাব সেই দিন, সেই তাবিখ।

ভিতবে ভিতবে উৎসুক হযে উঠেছি। কুচবিহাবেও একবাব বলেছিল, অ্যাপযেন্টমেন্ট না বাখতে পাবলে বক্ষা নেই, মেযেব যেমন মেজাজ তেমনি অভিমান—একবাব সমযমতো যেতে না পাবাব ফলে কি কাণ্ডই না হযেছিল। প্রাণেব মাযা তুচ্ছ কবে সেই আসাই এলো বটে। কিন্তু এসে এখানে বসে মদ গিলছে। সত্যি কথা বলতে কি, যে মেযে যোগীন সিংযেব মতো বেপবোযা লোককে এভাবে নাকে দডি বেঁধে টেনে আনতে পাবে, তাকে একটিবাব দেখতে ইচ্ছেও হচ্ছিল খুব।

জিজ্ঞাসা কবলাম, তা এসেও তুমি এখানে দেবি কবছ কেন?

সংক্ষিপ্ত জবাব দিল, সাডে আটটায যাবাব কথা।

এমনভাবে বলল, যেন ওই সমযেব দু-দশ মিনিট আগেও যাওযাব কোনো প্রশ্ন ওঠে না। এমনও হতে পাবে, নির্দিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট কোনো সমযে ওদেব সাক্ষাৎ হওযাব কথা। হযত ঠিক সময়ে বমণীটি অভিসাবে আসবেন।

ঘডি দেখলাম। সাতটা বাজতে তখনো পাঁচ মিনিট বাকি। জিজ্ঞাসা কবলাম—কথা না বাখতে পেবে একবাব খুব মুশকিলে পডেছিলে বুঝি?

—খুব। আজকেব এই দিনেই—

মদ খাচ্ছে বলেই হয়ত ওর চোখের পাতা ভারি ঠেকছিল। আর মদ খাচ্ছিল বলেই হয়ত সেই মুশকিলের কথা সহজে জানা গেছে। কিন্তু মোটামুটি শোনার পরেও সেই মুশকিলটা এমন প্রাণ তুচ্ছ করে ছুটে আসার মতো মনে হয় নি আমার। যোগীন সিংয়ের মতে যশোধরার ব্যবসায়ী বাবা লোকটা আদৌ সুবিধের নয়। মেয়েকে টোপ করে মস্ত পয়সাঅলা জামাই গাঁথবার মতলব ছিল তার। ওই করে শেয়ার-বাজারের ঘা সারাবে ভেবেছিল। কিন্তু মেয়ের জন্যেই তা হচ্ছিল না। মেয়ে ওদিকে বাপের কাছে একজন মস্ত মানুষ বানিয়ে রেখেছে যোগীন সিংকে। মস্ত টাকার মানুষ নয় —মানুষের মতো মস্ত মানুষ। তার এক গোঁ তাকে ছাড়া কাউকে বিয়ে করবে না।

নিরুপায় হয়ে বাপ তখন সামনাসামনি যোগীন সিংয়ের সঙ্গে একবার কথাবার্তা কয়ে বুঝে শুনে নিতে রাজি হয়েছিল। সেও অনেক দিন অনেক চেষ্টার পর মেয়ে বাপকে এই সাক্ষাৎকারে রাজি করাতে পেরেছিল। দিনক্ষণ ঠিক হল। কিন্তু এমন কাণ্ড, বলতে গেলে একরকম অকারণেই যোগীন সিং আসতে দেরী করল। এমন কিছু দেরী নয়, মিনিট বারো-চোদ্দ। ঘোড়েল বাপ ঘড়ি ধরে ঠিক দশটি মিনিট অপেক্ষা করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে গেল। যোগীন সিং গিয়ে দেখে যশোধরাও নেই। ব্যাপারটা শুনল তার মায়ের কাছে। বাপ বেরিয়ে যাওয়ার পর রাগে জ্বলতে জ্বলতে মেয়েও গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেছে।

সম্ভব অসম্ভব অনেক জায়গায় যোগীন সিং খুঁজে বেড়াল তাকে। আর বাপটাকে মনে মনে ধরে আছড়ালো বারকতক। ঘণ্টাখানেক বাদে নিজের বাড়িতে এলো দেখতে, যশোধরা সেখানে অপেক্ষা করছে কি না। এসে শুনল, টেলিফোনে খবর এসেছে যশোধরা হাসপাতালে আছে। রাগে আর অভিমানে মেয়ে এমন গাড়ি চালিয়েছে যে সরাসরি অ্যাকসিডেন্ট।

হাসপাতালেও এই মেয়ে সহজে মুখ ফিরিয়ে তাকায় নি তার দিকে। যোগীন সিং অনেক ক্ষমা চেয়ে, অনেক নাক-কান মলে জীবনে আর কোনোদিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ফেল করবে না প্রতিজ্ঞা করে তবে তার মুখে হাসি ফোটাতে পেরেছিল।

মনে মনে বললাম, যেভাবে এসেছ জানতে পারলে আজও একবার নাক-কান মলে তোমাকে আবার কিছু প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম, অত মদ যে খাচ্ছে তাই বা ওর প্রেয়সী বরদাস্ত করবে কি করে। কিন্তু তার আগে ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে সচকিত হলাম, সাতটা পঁয়ত্রিশ। এখন না উঠলে সে সাড়ে আটটায় পৌঁছবে কি করে? ঘড়ির দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে একটুও তাড়া দেখা গেল না। অস্ফুট জবাব দিল, সময় আছে। অন্যমনস্কের মতো আবারও কিছু ভাবছে মনে হল।

আরো ঠিক দশ মিনিট কাটল এইভাবে, আমি উসখুস করছি, অবাকও হচ্ছি। মদের নেশায় সময়ের গণ্ডগোল হয়ে গেল?

পৌনে আটটা।

—এসো।

বোতলে আরো খানিকটা আছে, সেখানেই পড়ে থাকল। বড় বড় পা ফেলে গাড়িতে এসে উঠল। পাশে আমি। পিছনে দেখলাম এক গোছা ফুল রয়েছে। এই দিনে ফুল কোথা থেকে সংগ্রহ হল ভেবে পেলাম না।

গাড়ি ছুটেছে।

হেড লাইটে রাস্তার অবস্থা দেখে আমার দুই চক্ষু স্থির। ঝোড়ো বাতাস আর নেই, বৃষ্টি পড়ছে। ভাঙা ডাল আর গাছের পাতায় সমস্ত রাস্তা ঢেকে গেছে। কোথাও মস্ত মস্ত টিনের চালা পড়ে আছে—তার ওপর দিয়েই মড় মড় শব্দে গাড়ি পার হতে টের পাচ্ছি বস্তুটা কি।

এ-রকম রাস্তায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটে দমদম এরোড্রাম থেকে দক্ষিণ কলকাতায় পৌঁছানোর সংকল্প শুনলেও লোকে পাগল বলবে। কিন্তু গাড়ির স্পীড দেখে আমার অস্বস্তি হচ্ছে। অস্বস্তি বাড়ছে।

এক সময় স্বাভাবিক ভাবেই বলতে চেষ্টা করলাম, যে রাস্তা, তোমার সাড়ে আটটায় পৌঁছনোর প্রশ্নই ওঠে না—

জবাব দিল না। কিন্তু গাড়িতে স্পীড আরো বেড়ে গেল।

রাজ্যের ভয় আমাকে গ্রাস করতে এলো। এবারে মনে হল, আমি যথার্থই এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি। একবার প্রাণে বেঁচেছি, এবারে আর রক্ষা নেই। প্রায় এক বোতল মদ গিলে গাড়ি চালাচ্ছে। কি করছে একটুও হুঁশ নেই নিশ্চয়। ক্ষোভে দুঃখে নিজেরই হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল। একবার ওভাবে বেঁচে, আর চোখের সামনে অত মদ খেতে দেখেও কেন আমি যেচে সঙ্গে এলাম। মৃত্যু না ঘনালে এমন মতি হবে কেন আমার?

বাধা পেয়ে গাড়ি এক-একবার বিষম লাফিয়ে উঠছে। সামনে মস্ত মস্ত এক-একটা ডাল, বা হয়ত একটা আস্ত গাছই পড়ে আছে। স্পীড না কমিয়ে খেলনার মতোই অপরিসর ফাঁক দিয়ে গাড়িটা পার করে আনছে যোগীন সিং।

শ্যামবাজার পেরিয়ে সার্কুলার রোড ধরে নক্ষত্রবেগে গাড়ি ছুটেছে। রাস্তায় জনমানব নেই, পুলিশ নেই, অন্তত আমি কিছুই দেখছি না। আমি শুধু দেখছি, সামনে মৃত্যু। মৃত্যু হাঁ করে আছে।

ডাক ছেড়ে চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছে আমার। দুহাতে তাকে জাপটে ধরে থামাতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তার দিকে চেয়ে কিছুই করতে পারছি না। পাথরের মূর্তির মতো বসে গাড়ি চালাচ্ছে সে। ওকে বাধা দেওয়ার থেকেও যেন মৃত্যুর গহ্বরে গিয়ে ঢোকা সহজ।

আমি তারই প্রতীক্ষা করছি। চকিতে একবার মনে হলো লোকটা বোধহয় আত্মঘাতী হতে চায়। এই জন্যই অমন দুর্যোগে অনায়াসে প্লেন ছাড়তে পেরেছে, আর এই জন্যেই এই গাড়ি নিয়ে এমন পাগলা ছোটা ছুটেছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অ্যাকসিডেন্ট হল না। গাড়ির গতি কমল। রাস্তার পাশে হঠাৎ এক জায়গায় ঘ্যাঁচ করে থেমে গেল। ঘড়িতে সাড়ে আটটা।

আমারও হুঁশ ফিরল যেন। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি পার্ক স্ট্রীটের এক জায়গায় এসেছি। তারপর হঠাৎ এক ধাক্কা খেয়ে বিমূঢ় আমি। ফুলের গোছা নিয়ে যোগীন সিং এখানে কোথায় নামছে! আমার শরীরের রক্ত এবারে দ্বিগুণ শিরশির করে পা বেয়ে নেমে যাচ্ছে।

এপাশে সাদা দেয়াল-ঘেরা বিস্তৃত সমাধি-ভূমি। দুর্যোগের অন্ধকারেও এখানকার সমাহিত সাদাটে পরিবেশ চোখে পড়ে।

নিজের অগোচরেই মুখ দিয়ে কথা বেরুল, এখানে কোথায় যাচ্ছ?

ফুল হাতে যোগীন সিং থমকে দাঁড়াল একটু। শান্ত গভীর দৃষ্টি মেলে আমার দিকে তাকালো। হঠাৎ আমার মনে হল, দুই চোখে কত জল জমাট বেঁধে আছে ঠিক নেই। ঝরছে না, শুধু চকচক করছে—

বিড়বিড় করে বলল—এখানেই তো, হাসপাতাল থেকে সোজা নিয়ে এসেছিলাম তাকে, এখানেই আছে। বসো, বেশি দেরি হবে না—

শ্রান্ত পা দুটো টেনে টেনে সমাধিস্থানের দিকে এগিয়ে গেল সে।

আমি নির্বাক, নিস্পন্দ।

মন পবনের নাও

নিকুঞ্জবিহারীবাবুর একটা গল্প ছাপা হয়েছে। সেও কোনো হেঁজিপেঁজি কাগজে নয়। দস্তুরমতো নামজাদা এক সাপ্তাহিক-পত্রে। অদূরে ঘাড় গোঁজ করে তাঁর স্ত্রীটি বসে আছে। নিকুঞ্জবিহারীবাবু সেইদিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছেন। লজ্জায় সঙ্কোচে আনন্দে বিড়ম্বনায় স্ত্রী সুধারাণী মাটির সঙ্গে মিশতে পারলে বাঁচে।

এখন পর্যন্ত সুধারাণীর সঙ্গে নিকুঞ্জবিহারীর একটি কথাও হয় নি। গত দশ-বারো দিন দু'জনার কথাবার্তা বন্ধ। তার আগে বড় মর্মান্তিক কথা বলেছিলেন নিকুঞ্জবিহারীবাবু। বলেছিলেন—তোমার জন্য হয় আমাকে পাগল হতে হবে, নয়তো জঙ্গলে পালাতে হবে। আর এতই যদি অযোগ্য ভাবো, তাহলে কোর্টে ডাইভোর্সের জন্য দরখাস্ত করে দাও।

কথাগুলো শেলের মতো বিঁধেছিল সুধারাণীর। নয় বছরের বিবাহিত জীবনে স্ত্রীকে এরকম শক্ত কথা আর কখনো বলেন নি নিকুঞ্জবিহারীবাবু।

এই কথার পরে কথাবার্তা বন্ধ।

সুধারাণীর বয়েস এখন আঠাশ। ছেলেবেলায় সকলেই তাকে বেশ সুশ্রী বলত। এখনো বলে। একটা মাত্র ছেলে। স্বাস্থ্যের বাঁধুনি এখনও ঢিলে হয় নি। ঢলঢলে কাঁচাভাবটুকু এখনো আছে। এরই দাক্ষিণ্যে একটা লোকের ওপর সুধারাণীর অনেক আধিপত্য খাটে বলেই বিশ্বাস। এবং দিনকে দিন তার এই আধিপত্য বাড়ছিল।

ব্যাপারটা আরো অনেক আগে থেকে বলা দরকার। সুধারাণীর বয়েস যখন এগারো-বারো, তখন থেকে। তখন থেকেই পোড়ারমুখি ইন্দিরা তার শত্রু।

খুব সাদামাটা বুদ্ধির মেয়ে ছিল সুধারাণী। কোনো প্যাঁচ-ঘোঁচ বুঝত না। উঠতে বসতে বাড়ির লোক বোকা বলত তাকে। এই খেদে ইস্কুলে তার চালাক হবাব একটু চেষ্টা ছিল। বিশেষ কবে ইন্দিরার কাছে। ইন্দিরার রূপ কোনাদিন তাব থেকে বেশী ছিল বলে সে মনে করে না। কিন্তু চাল-চলন আচাব-আচরণে সবাই সেরা রূপসী ভাবত তাকে। এমনকি সুধাবাণী নিজেও তাই ভাবত। ওই বয়সেই ইন্দিরা অনেক জানত, অনেক বুঝত, অনেক বিচিত্র কথা বলত, আর অনেক বকম ভ্রূ ভঙ্গিতে হাসতে পাবত। মোট কথা সুধারাণীব ভিতবে ভিতবে তখন থেকেই একটা ইন্দিবা-কমপ্লেক্স দানা পাকিয়ে উঠেছিল।

ওই বযসেই কি জব্দই না হযেছিল একবাব ইন্দিবার কাছে। মনে পডলে এখনো লজ্জা পায সুধাবাণী। ইন্দিবা তখন থেকেই ছেলেদেব আচাব-আচবণ কিছুটা বুঝতে শিখেছিল। আভাসে ঠাবে-ঠোবে অনেক কথা বলত সে। এমনি একটা প্রসঙ্গে চুপিচুপি একদিন জিজ্ঞাসা কবেছিল—সত্যি কবে বল তো, তুই কাবো প্রেমে পড়েছিস ?

শুনে সুধাবাণী বাইবে ইন্দিবাব মতোই মুখ টিপে হেসেছিল, কিন্তু ভিতবে ভিতবে একটু বিড়ম্বনাব মধ্যে পড়ে গিযেছিল। আসলে প্রেমে-পড়া ব্যাপাবটা ঠিক যে কি, ভালো কবে জানে না। অথচ প্রশ্নের ধবন-ধারণ কেমন যেন নিগূঢ়। প্রেম বলতে বাড়িতে মাস্টাব মশাইযেব কাছে ভগবানেব বিশ্বপ্রেম সম্পর্কে ছোটদেব একটা কবিতা পড়েছিল সে—মাস্টাবমশাই বুঝিযেছিলেন, ভগবান এত বড যে অতি ছোট অতি ক্ষুদ্রকেও তিনি অবহেলা কবেন না।

কিন্তু ভাববাব সময নেই, ইন্দিরা জবাবেব প্রতীক্ষা করছে। সুধাবাণী সমঝদাবেব মতো তক্ষুণি মুচকি হেসে মাথা নেড়েছিল।

—কাব সঙ্গে বে ? কার সঙ্গে ? বল না! আমি কাউকে বলব না।—ইন্দিবার উৎসুক চাপা আগ্রহ দেখে ভিতবে ভিতবে সুধাবাণী ফাঁপবে পড়েছিল। কাউকে বলবে কি বলবে না এই সংশযেব ফাঁকে সে একটু ভেবে নেবাব সুযোগ পেযেছিল। প্রেমে পড়তে হলে দ্বিতীয একজন লোক দবকাব, আব যতদূব মনে হয পুরুষমানুষই হওযা দরকার। আব, সেই পুরুষমানুষ খুব বড কেউ হওযা বাঞ্ছনীয।

—মাস্টার মশাইযেব—

শোনামাত্র ইন্দিবা একেবারে হাঁ। সুধারাণীব মাস্টাব মশাইকে ইন্দিরাও জানে। ওদের বয়েস বাবো, আব তিনি বাষট্টি।

সুধারাণীব কল্পনায ভগবানেব পবেই মাস্টাব মশাই বড। কিন্তু ইন্দিবার চোখমুখ দেখেই মনে হল তার জবাবটা বেখাপ্পা গোছেব হযেছে। তাই আবো জোর দিয়ে বলল—মাস্টাব মশাই যে কত বড়, তুই ভালো কবে জানিস না তো—

—সে কী রে। একটা বুড়ে-হাবড়া, তুই ফাজলামো কচ্ছিস—

ইন্দিরার কি মনে পড়ে গিয়েছিল। আত্মপক্ষ সমর্থনেব মতো করে বলেছিল—কেন শিব ঠাকুরও তো বুড়ো-হাবড়া, নামেবও মিল আছে—শিবশঙ্কর।

ইন্দিরা পেটে হাত চেপে হাসার উপক্রম করতেই সুধারাণী বুঝেছিল কিছু একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। তাই তাড়াতাড়ি ইন্দিবার একটু আগেব সংশয়োক্তি আঁকড়ে ধরল।

—আচ্ছা বোকা তুই, ঠাট্টাও বুঝিস না!

সেই ইন্দিরা কলেজের সেকেন্ড ইয়ারে পড়তে কলেজের থার্ড ইয়াব ফোর্থ ইয়াবের ছেলেগুলোবও মুণ্ডু ঘুবিযে দিযেছিল। সুধাবাণী তখন নিঃসন্দেহ, রূপ ইন্দিবাব থেকে তাব কম নয়। কিন্তু ইন্দিবার চটকেব কাছে কলেজের সব মেযেই প্রায নিষ্প্রভ।

ওই সমযেই সুধাবাণীকে একটা রোগে ধরল। ইন্দিবা তখন এক উঠতি তরুণ লেখকের প্রেমে পড়েছে। যাব গল্প-উপন্যাস তাবা ছাপাব অক্ষবে পড়েছে। অনেক বড বড কাগজ যাব লেখাব সমালোচনা কবছে, টীকা-টিপ্পনী কাটছে। যে তরুণ লেখককে একবাব চোখেব দেখা দেখতে পেলেও চক্ষু সার্থক হত, বক্ত-মাংসেব সেই মানুষটাবই কিনা প্রেমে পড়েছে ইন্দিবা। তাব সঙ্গে বেড়ায, সিনেমা দেখে, তাব লেখা চিঠি ওদেব দেখায়। সেই সব চিঠিও এক একটা জীবন্ত কাব্যেব মতো। ভাগ্য আব কাকে বলে।

সুধাবাণীব তখন মনে হত, প্রেমিক লেখক না হলে জীবনই বৃথা। যে দু-চাবজন ছেলে অন্তবঙ্গ হযে ওঠার আগ্রহে তাব আশে-পাশে ঘুরঘুব কবত, সুধাবাণী তাদেব প্রতি কঠিন হয়ে উঠল। ওদেব একটাও না লেখক, না কবি। বেস্টুবেন্টে বসে শুধু চপ-কাটলেট সাবডাতে ওস্তাদ সব। তখন থেকেই এক তরুণ লিপি-যাদুকবেব মূর্তি মনেব তলায় লালন কবতে লাগল সে।

কিন্তু ইতিমধ্যে বাডিব লোকেবা যেন ষডযন্ত্র কবেই একজনেব সঙ্গে বিয়েব সম্বন্ধ পাকা কবে ফেলল তাব। মা বাবা খুশী, ভালো জামাই সংগ্রহ কবেছেন তাঁবা। বব কোন এক বড সাহেবেব পি-এ। ভালো মাইনে। কিন্তু ভাবী ববেব নাম শুনেই দুই চক্ষু কপালে উঠল সুধারাণীব—নিকুঞ্জবিহাবী। কোথায় ইন্দিবাব মৃণাল বসু, আব কোথায তার নিকুঞ্জবিহারী। শুধু এই নামেব ধাক্কা সামলাতেই দিন কযেক সময লাগল সুধাবাণীর। তারপর যুক্তি দিয়ে আশাব আলো টানতে চেষ্টা কবল সে। বড বড স্মবণীয লেখক বা কবিদের নাম মনে করতে চেষ্টা কবল—বঙ্কিমচন্দ্র, কালীপ্রসন্ন, প্যাবীচাঁদ, হেমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শবৎচন্দ্র, তাবাশঙ্কব—নাম হিসেবে এগুলো এমন কি মিষ্টি নাম। অথচ এখন তো মনে হয শুধু ওই নামেই মানায় ওঁদেব। আসলে নাম কিছু নয়, গুণই সব। পি-এ যখন—সমস্ত দিন লেখালেখিই করতে হয। লেখার অভ্যাস থাকলে গল্প-কবিতাই বা লিখতে পাববে না কেন?

সুতরাং বিয়ে হযে গেল। প্রথম দর্শনে স্বামীটিকে মোটামুটি মন্দ পছন্দ হল না সুধাবাণীর। বেশ চোখা সপ্রতিভ চেহাবা। বাসরের প্রথম সঙ্কোচ কাটতে সুধাবাণী ঈষৎ আগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, তুমি লেখো?

নিকুঞ্জবিহাবী অবাক। —না তো, কি লিখব?

—এই গল্প, কবিতা—যা হোক?

নিকুঞ্জবিহারী চালাক মানুষ। বাসরে স্ত্রীকে নিবাশ করতে মন সরল না। বললেন —এক কালে কলেজে থাকতে লিখতাম-টিকতাম, এখন আর অভ্যেস নেই—কেন তোমাব বুঝি ওসব খুব ভালো লাগে?

—খু-উব। অভ্যেস কবলেই আবাব লিখতে পারবে, তাছাড়া অফিসে তো কত কি লিখতেই হয তোমাকে। একেবাবে অভ্যেস নেই বলতে পাবো না। কলেজেব ম্যাগাজিনে তোমাব লেখা ছাপা হত?

নিরুপায নিকুঞ্জবিহাবীকে মাথা নাড়তে হয।—হত।

সুধাবাণীব মুখে খুশী ধবে না।

পি-এর চাকবিব দরুনই হোক, বা যে জন্যেই হোক, লোককে খুশী বাখাব চেষ্টাটা একটা অভ্যাসে দাঁড়িযে গেছে নিকুঞ্জবিহাবীব। এবপব দিনে দিনে স্ত্রীব স্বপ্নেব দিকটা চিন্তা কবেই অফিসে বা বাতেব নির্বিবিলিতে একটু আধটু লিখতে চেষ্টা কবেছেন তিনি। প্রথমে কবিতা দিযে শুরু কবেছিলেন। তাবপব গল্প। তাবপব প্রবন্ধ। সবই স্ত্রীকে দেখিযেছেন। আব সুধাবাণীব সবই অদ্ভুত ভালো লেগেছে। স্বামীকে না বলেই সেই সব লেখা সে ডাকটিকিট দিযে একে একে মাসিকে সাপ্তাহিকে পাঠিযে দিযেছে—দিযে দুরু দুরু বক্ষে প্রতীক্ষা কবেছে। বলা বাহুল্য সে-সব লেখাই আবাব একে একে তাব কাছে ফেবত এসেছে।

মান বাঁচাবাব জন্য নিকুঞ্জবিহাবী বলেছেন—এটা কোটাবীব যুগ, দলে না মিশলে বা পেছনে লোক না থাকলে, না পড়েই মাসিক সাপ্তাহিকেব সম্পাদকবা তা ফিবিযে দিযে থাকেন।

সুধাবাণী বিশ্বাস কবেছে আব সেই সব অদেখা সম্পাদকদেব ওপব মনে মনে জ্বলেছে।

এই কবেই একে একে অনেকগুলো বছব কেটে গেছে। কিন্তু সুধাবাণী এখনও আশা ছাড়ে নি। আব সেই আশাব তাগিদে এখনো মাঝে-সাজে নিকুঞ্জবিহাবীকে কিছু না কিছু লিখতে হয।

সুধাবাণী যে এখনো আশা ছাড়তে পাবে নি, তাব একটা বিশেষ কাবণ আছে। ইন্দিবাব সঙ্গে এখনও মধ্যে মধ্যে দেখা হয। সেই লেখকেব সঙ্গেই তাব বিযে হযেছে। তাই দেখা হলে লেখাব প্রসঙ্গ ওঠেই। বিযেব পব অনেকদিন বাদে যখন প্রথম দেখা হয, সুধাবাণী তখনই তাকে ফিস-ফিস কবে বলেছিল—এবও লেখাব বোগ আছে বে!

ইন্দিবা উৎসুক হযে জিজ্ঞাসা কবেছিল—তাই নাকি, কোন কোন কাগজে লেখেন, নাম-টাম দেখি না—

ঢোক গিলে সুধাবাণীকে বলতে হযেছিল—সে-কথা আব বলিস না, আমি ছেড়ে বন্ধুবান্ধববাও বলে, অত সুন্দব লেখা ছাপাও না কেন? তা ওব এক কথা, লেখাব আনন্দেব জন্যেই লিখি, ছেপে কি হবে—

সুধাবাণীব ধাবণা, ইন্দিবা মুখে কিছু না বললেও মনে মনে অবিশ্বাস কবেছে এবং ঠোঁট বাঁকিযেছে। অতএব স্বামীকে লেখক বানাবাব ঝোঁক সুধাবাণীব এখনো কাটে নি।

স্ত্রীব এত আগ্রহ দেখে তলায তলায স্বামীরও বাসনা, দুই একটা লেখা অন্তত ছাপা হোক, মান-মর্যাদা বাঁচুক। তাছাড়া একটা লেখা ছাপা হযে গেলে স্ত্রীব কাছ থেকে যে উষ্ণ সমাদব লাভ হবে, তাও লোভনীয।

চেষ্টা-চবিত্র কবে একটা খববেব কাগজেব রবিবাসবীয সাহিত্যপত্রে শেষ পর্যন্ত একটা লেখা অনুমোদন কবিযে ছাড়লেন তিনি। শুক্রবাবেব কাগজে ববিবাবেব লেখক-সূচীর চিত্তাকর্ষক বিজ্ঞাপন বেবোয। সেই বিজ্ঞাপনে নিকুঞ্জবিহাবীব নাম বেরুলো—ববিবাবে তাঁব অমুক নামে একটা সাবগর্ভ বচনা থাকবে।

সুধারাণীব এতকালেব আশা সফল। বাড়িতে সেই বাতে যেন নন্দনকাননেব বাতাস বইল।

কিন্তু ববিবাব হতেই মুখ একেবাবে আমসি সুধাবাণীব। লেখাটা বেবোয নি। সম্পাদক লিখেছেন—'যান্ত্রিক গোলযোগ বশতঃ নির্ধাবিত সব লেখা এ সপ্তাহে প্রকাশ কবা সম্ভব হল না।'

স্ত্রীব মুখ দেখেই বেশী বকম আঘাত পেলেন নিকুঞ্জবিহাবীবাবু। তাকে বোঝাতে চেষ্টা কবলেন, কিছু একটা কাবণে এবাবে আটকে গেছে, লেখা মনোনীত হযেছে যখন সামনেব বাবে নিশ্চয বেরুবে।

কিন্তু শুনে কিছুমাত্র আশ্বস্ত হল না সুধাবাণী। তাব সমস্ত মুখ বিবর্ণ পাংশু। একসময সচকিত হযে দ্রুত উঠে চলে গেল সে।

সোম মঙ্গল দুটো দিন কাজেব চাপে অবকাশ মেলে নি নিকুঞ্জবিহাবীব। বুধবাব স্ত্রীব এই ক'দিনেব শুকনো মর্তি স্মবণ কবেই উক্ত কাগজেব সাহিত্য-সম্পাদকের দপ্তবে হানা দিলেন তিনি, লেখাটা আগামী সপ্তাহে বেরুচ্ছে কি না, সেই খবব নিতে।

গম্ভীব মুখে সম্পাদক বললেন—ভেবেছিলাম বেরুবে। কিন্তু বেরুবে না, আপনাব লেখা ফেবত নিযে যান।

নিকুঞ্জবিহারী বিমূঢ়।—কেন?

সম্পাদক তিনখানা পোস্টকার্ড তাব চোখেব সামনে তুলে ধবলেন। বললেন—আপনাব লেখা না বেরুতেই সেই লেখা সম্পর্কে পাঠকেব কাছ থেকে তিনখানা প্রশংসাপত্র এসেছে—লেখা ছাপা হলে কি কাণ্ড হবে ঠিক কি।

হতভম্ব নিকুঞ্জবিহাবী ভ্যাবা-চ্যাকা খেযে উঠে এলেন শেষ পর্যন্ত। ট্রামে বাড়ি ফেরাব অবকাশে মাথা কিছুটা সাফ হল।

প্রথমেই স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা কবলেন—তুমি কি করেছ?

সুধাবাণী ঢোক গিলে অস্ফুট জবাব দিল।—কেন, আমি তো আবাব তাদেব চিঠি লিখে বাবণ কবে দিযেছি।

তাব দিকে একটা জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ কবে নিকুঞ্জবিহারী ঘবে চলে গেলেন।

সুধাবাণী বুঝল যে ভয কবেছিল, তাই ঘটে গেছে। শুক্রবাবেব বিজ্ঞাপন দেখেই খুব অন্তরঙ্গ আত্মীয-পবিজনদেব পাঁচ-ছ'জনকে টেলিফোন কবেছিল সে, আব কলকাতাব বাইবে পাঁচ-ছ'খানা চিঠি লিখেছিল। লিখেছিল, তারা যেন ববিবাব পেরুলেই অমুক কাগজে অমুক লেখাব বিশেষ প্রশংসা করে সম্পাদককে চিঠি দেয়। বাইরে

সেই কাগজ যদি নাও পায়, তাহলেও যেন চিঠি অবশ্যই সম্পাদককে পাঠায়—বিশেষ কারণ আছে পরে জানাবে।

এইভাবেই স্বামীর লেখার প্রতি সম্পাদকের বিশেষ দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চেয়েছিল সুধারাণী। তাই রবিবারে সেই লেখা না বেরুতে মাথায় বাজ পড়েছিল তার। টেলিফোন যাদের করেছিল তাদের আবার টেলিফোনে নিষেধ করেছে। আর চিঠি যাদের লিখেছিল, মরিয়া হয়ে তাদেরও আবার নিষেধ করে চিঠি দিয়েছে। কিন্তু বিভ্রাট যা হবার তা হয়েই গেছে।

সুধারাণী যেন আসামী। একটু ঠাণ্ডা মাথায় নিকুঞ্জবিহারী প্রশ্ন করে করে সব বার করে নিলেন। তারপর রাগের মাথায় ওই কথা বললেন। বললেন—তোমার জন্যে হয় আমাকে পাগল হতে হবে, নয়তো জঙ্গলে পালাতে হবে। এতই যদি অযোগ্য ভাবো, তাহলে কোর্টে ডাইভোর্সের জন্য দরখাস্ত করে দাও।

সুধারাণী দাঁতে করে ঠোঁট কামড়ে চোখের জল সামলাতে চেষ্টা করেছে। তারপর থেকে এই দশ-বারোদিন বাক্যালাপ বন্ধ।

কিন্তু নিকুঞ্জবিহারীর মাথা সত্যিই ঠাণ্ডা। এই ঠাণ্ডা মাথায় স্ত্রীর অগোচরে একটা গল্প লিখলেন তিনি। স্ত্রীর স্বপ্ন থেকে শুরু করে লেখা ছাপানোর এই বিভ্রাটের গল্প। লিখে এক নামী সাপ্তাহিকের সম্পাদকের হাতে দিয়ে এলেন।

গল্পটা সম্পাদকের এত পছন্দ হয়ে যাবে নিকুঞ্জবিহারীবাবুও আশা করেন নি। পরের সপ্তাহেই সেটা ছাপা হয়ে গেল এবং ডাকে কাগজ এল।

আড়াল থেকে স্ত্রীকে রুদ্ধশ্বাসে সেই লেখা পড়তে দেখেছেন তিনি। পড়া হতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

নিকুঞ্জবিহারীবাবু তাঁর দিকে চেয়ে হাসছেন মিটিমিটি।

আর, লজ্জায় সঙ্কোচে আনন্দে বিড়ম্বনায় সুধারাণী মাটির সঙ্গে মিশতে পারলে বাঁচে।

বীতশোক

চকিত উত্তেজনা ঘোরালো হয়ে উঠতে পারত। সুবেশা, চোখে ঘোর-লাগানো রমণীর অপমানে পথ-চলতি খদ্দেরের রোষ আরো লোক টেনে আনতে পারত। জনতার মেজাজ চড়লে ছোট দোকানের ছোট্ট আশা নির্মূল হতে পারত। তবু, কোনো পরিণাম না ভেবেই এই কাণ্ড করে বসল সদানন্দ।

পিছন ফিরে ঘুরে দাঁড়িয়ে একাগ্র মনোযোগে শৌখিন বেসাতির সামগ্রী সাজিয়ে গুছিয়ে রাখছিল সে। আট-দশজন ফুটপাথের খদ্দের জিনিস দেখছে, যাচাই বাছাই করছে জেনেও ফিরে তাকায় নি। যেন দোকান গোছানোটাই আপাতত বড় কাজ। এমন কি তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও এই খদ্দেররা বা উৎসুক দর্শকরা সচেতন ছিল না।

হঠাৎ হকচকিযে গিযে তাবা ওই সতেবো আঠাবো বছবেব জোযান ছেলেটাব কাণ্ডকাবখানা দেখছিল, আব কটুভাষণ শুনছিল। আব উদগ্র বিস্মযে অতি আধুনিকাটিব শুকনো বিডম্বিত মুখখানি পর্যবেক্ষণ কবছিল। মেযেটাব আসল চেহাবা বুঝে নিতে চেষ্টা কবছিল তাবা।

ফুটপাথ বিপনীব মালিক সদানন্দব দিকে কাবো চোখ ছিল না। মাত্র কযেক মুহূর্তেব মধ্যে এই দ্বিতীয নাটকেব জন্যেও কেউ প্রস্তুত ছিল না।

ঘুবে দাঁডিযে সদানন্দ আচমকা গর্জনে ছেলেব টুঁটি কামডে ছিঁডতে এল যেন। কৌতূহলী ক্রেতা আব দর্শকবা আঁতকে উঠল একেবাবে। জোযান ছেলেটা হতভম্ব। এমন কি, যাকে কেন্দ্র কবে এই পবিস্থিতি. সেই সুবেশা প্রসাধনপটিযসী তন্বী-সদৃশাটিও বিমূঢ হঠাৎ।

ছেলেকে যেন ছিঁডেই ফেলবে সদানন্দ, গর্জে উঠে ছেলেব দিকে ঝুঁকতে চেষ্টা কবল সে।—চোপ! পাজী বদমাস অভদ্র ইতব কোথাকাব, আজ তোকে আমি খুন কবব! সবে আয বলছি এদিকে. লোকেব সঙ্গে ভদ্র ব্যবহাব কবতে পর্যন্ত শেখো নি উল্লুক কোথাকাব, সবে যা ওদিকে! নইলে আজ তোকে—

তাবপব খদ্দেবেব ঘাডে পডাব ভযেই হযত উদ্যত ঘুসিটা নামিযে নিল। হতভম্ব ছেলেটাও কুঁকডে গিযে নিজেব অগোচবে কোণেব দিক ঘেঁষে বাপেব নাগালেব বাইবে সবে দাঁডাল। চুপসে গেলেও তাব বিস্মযেব ঘোব কাটে নি।

দু'হাত জুডে সদানন্দ কাকুতি মিনতি কবে বলল—অপবাধ নেবেন না মা-লক্ষ্মী, ছেলেব বাপেব দিকে চেযে ওকে ক্ষমা করুন। এই পাঁচ টাকাব নোটটা আপনিই দিযেছিলেন তো... দিযে আপনি অন্য জিনিস দেখছিলেন দেখে আমি একটু এদিকে ব্যস্ত হযে পডেছিলাম, ওই পাজীটা না দেখেই...ইযে, তাহলে পার্সটাব দাম হল গিযে দু'টাকা বাবো আনা, আপনি ফেবত পাবেন গিযে দু'টাকা চাব আনা. .

বলতে বলতে তাডাতাডি কাঠেব বাক্সটা খুলে একটা দু'টাকাব নোট আব খুচবো চাব আনা পযসা মেযেটিব হাতে দিযে আবাব হাত জোড কবল।—দোষ নেবেন না মা লক্ষ্মী. আপনাবও খেযাল ছিল না, আমিও ওদিকে জিনিস সামলাচ্ছিলাম...পাজী ছেলেটাব কাণ্ডজ্ঞান নেই, এবাবেব মতো ক্ষমা করুন।

মা-লক্ষ্মী ক্ষমা কবলেও সমবেত উৎসুক দর্শকবা হযত অত সহজে ক্ষমা কবত না. যদি না প্রসাধনবিলাসিনীটি অমন বিমূঢ চোখে মলিন অথচ কমনীযদর্শন প্রৌঢটিব দিকে ফ্যালফ্যাল কবে খানিক চেযে থেকে ফেবত টাকা ও খুচবো পযসা ভ্যানিটি ব্যাগে পুবতে পুবতে দ্রুত প্রস্থান কবত সেখান থেকে। আব, যদি না ছেলেব অপবাধেব দরুন অতটাই আন্তবিকতা ফুটে উঠত প্রৌঢ সদানন্দব মুখে। উৎসুক দর্শকদেব মধ্যে দুই-একজন মন্তব্য কবতে ছাডল না তবু। ছেলেটাব দিকে চেযে বলল—খদ্দেবেব সঙ্গে বিশেষ কবে মহিলাব সঙ্গে এবকম ব্যবহাব কবলে মাবেব চোটে হাড গোড গুঁডোবে কোন দিন, দোকান কবাও বেবিযে যাবে।...

আব একজন বলল—মেযেটা ভালো তাই, নইলে থাপ্পডেব চোটে দাঁত নডে যেত।

ছেলেটি সভযে বোবাব মতো দাঁডিযেই আছে, সদানন্দব দুই হাত তখনো উত্তেজনাপিপাসু সমবেতদেব উদ্দেশে যুক্ত। ফলে আব গণ্ডগোলেব আশা ছেড়ে তাবা একে একে চলে গেল।

বাত বাডছে। সাদাটে আলোব ছটায মহানগবীব অভিজাত যৌবন বাডছে। নতুন খদ্দেব আসছে, যাচ্ছে। বাঙালীব থেকে অবাঙালীব আনাগোনা বেশী এদিকটায। যেতে আসতে তাবা থমকে দাঁড়াচ্ছে। শৌখিন সিগাবেট কেস দেখছে, পার্স দেখছে, ঘডিব ব্যাণ্ড দেখছে, গগলস দেখছে। শো-কেসে আব সামনেব খোলা কেসে এ-বকম হবেক সখেব সামগ্রী সাজানো আছে। এখানে কেনাব থেকে দেখাব লোকই বেশি। কিন্তু কিছু বিক্রী হলে অন্য জাযগা থেকে চড়া দামেই বিকোয। কেউ দাঁডিযে দেখছে, কেউ কিছু হাতে নিযে পবখ কবছে, আব কেউ বা দাম জিজ্ঞাসা কবছে। কিনছেও কেউ কেউ। দোকান আপাতত সদানন্দ একাই চালাচ্ছে। থমথমে মুখ। ছেলেব দিকে একবাবও তাকায নি এতক্ষণেব মধ্যে।

ছেলে বিষ্ণু ওধাবেব টুলটায চুপচাপ বসে আছে সেই থেকে। তাব দোকানেব দিকে চোখ নেই, কে কি দেখছে বা নিচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য নেই, সে শুধু বাপেব দিকেই চেযে আছে। ঘুবে ফিবে বাপকেই দেখছে।

বাপেব সেই আচমকা গর্জনে সে ঘাবডে গিযেছিল, তাবপব জনতাব বাগেব ফলাফল ভেবে সে ভযও পেযেছিল। কিন্তু সব সত্ত্বেও কি যেন ভোজবাজীব ব্যাপাব ঘটে গেছে একটা। গোটা ব্যাপাবটা তাব কাছে দুর্বোধ্য এখনো।

অনেকদিন শিকাবীব মতো ওত পেতে থেকে আজ মেযেটাকে ধবেছিল বিষ্ণু। তাব স্থিব বিশ্বাস ছিল হাতেনাতেই ধবেছে, গেল বাবেব মতো এই দিনেও সে দাম না দিযেই জিনিস ব্যাগে পুবে চলে যাচ্ছে। বাবা অবশ্য বলে, গেল বাবেও দাম দিযেছে। কিন্তু বিষ্ণুব সন্দেহ যায নি। গেল বাবেব সেই দিনে খদ্দেবেব ভিড একটু বেশি ছিল। দু-চাবটে চলনসই বর্কমেব সুশ্রী মেযে এসে দাঁডালেই দু-দশজন পুরুষও এসে দাঁডায, সেটা বিষ্ণু লক্ষ্য কবেছে। সেদিনও তাই হযেছিল। ওই মেযেটা কলম নিযে ঘাঁটাঘাঁটি কবছিল। একটা কলম মোটামুটি পছন্দ হযেছিল। একটু বাদে বিষ্ণু দেখে সেই মেযেটাও নেই, কলমটাও নেই। বিষ্ণু তপ্তমুখে তক্ষুণি বাপকে বলল—ওই মেযেটা কলমেব দাম দিযে গেল না?

সাধাবণ স্থলে উল্টে বকুনি খাবাব কথা বিষ্ণুব। কিন্তু শোনামাত্র বাবা কেমন যেন হকচকিযে গিযেছিল। বলেছিল—কোন কলমেব দাম?...ও, দিযেছে বোধ হয।...হ্যা দিযেছে।

কিন্তু বিষ্ণুব সংশয যায নি। তাব ধাবণা মেযেটা অত্যন্ত খাবাপ, প্রাযই তাকে এক একটা লোকেব সঙ্গে কেমন ধবনেব সাজগোজ কবে ঘোবাফেবা কবতে দেখে। অত বঙ-কবা ঠোঁটেব হাসি বিশ্রী দেখায। দশহাত দূবেব ওই যাদুলালেব আইসক্রিম সোডা লিমনেড আব সিগাবেটেব দোকানে স-সঙ্গী প্রাযই বাত ন'টা দশটাব সমযেও দেখা যায তাকে। দু'জনেই সোডা লিমনেড খায, কিন্তু সঙ্গী কি খায এক নজব তাকিযেই বিষ্ণু বুঝতে পাবে। যাদুলালেব দোকানে শৌখিন অবাঙালী খদ্দেবেব ভিড বেশি কেন,

বিষ্ণু তা খুব ভালো করেই জানে। সোডা লিমনেডের বোতলে অন্য মালও রাখে সে। খদ্দের বুঝে বার করে দেয়। ওই রকম লোক যার সঙ্গী, সে আর কেমন মেয়ে হবে? এই বিরূপ ধারণা থেকেই বিষ্ণুর বিশ্বাস, কলমটা খোয়াই গেছে, দাম না দিয়েই মেয়েটা কলম নিয়ে সরে পড়েছে। বাবার খেয়াল নেই, তাই বলছে দাম দিয়ে গেছে।

আজ আবার সেই মেয়ে যখন মেয়েদের শৌখিন পার্সগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করছিল —বিষ্ণু তখন থেকেই মনে মনে প্রস্তুত। সে আসার সঙ্গে সঙ্গে বাবা পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে অন্য কাজ করতে লাগল বলে বিষ্ণুর মনোযোগ অত প্রখর। কিন্তু চেয়ে ছিল আর একদিকে, এই শ্যেন প্রতীক্ষা বুঝতে দিতে সে রাজী নয়। তারপর মেয়েটা পা বাড়াবার উপক্রম করতেই এক লাফে উঠে এসে সরাসরি হাত চেপে ধরেছিল তার।

—দাম না দিয়ে ব্যাগ নিয়ে চলে যাচ্ছেন যে? দু'টাকা বারো আনা দাম ওটার, অমনি নেবার জন্যে নয়—

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটার পুরু প্রসাধন-খচিত মুখও বিবর্ণ। বিড়ম্বনার ভাব কাটাতে চেষ্টা করে শুকনো ব্যস্ততায় বলল—দাম দিই নি বুঝি, ভুল হয়ে গেছে—

তাড়াতাড়ি ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে দাম দেবার জন্যে তার মধ্যে হাত পুরে দিল। কিন্তু শূন্য হাতটাই উঠে এল আবার। এবারের বিস্ময় আরো শুকনো, আরো শঙ্কামিশ্রিত। এই যাঃ, নোটটা...আশ্চর্য, নোটটা তো—

—নোটটা হাওয়া হয়ে উড়ে গেছে। সেদিন আমাদের চার টাকা দামের কলমটাও অমনি খোয়া গেছে আপনার হাতে, ওসব চালাকি রেখে দামটা গুনে দিয়ে যান—

অন্যান্য খদ্দেররা উৎসুক হয়ে উঠেছিল। আর দু-পাঁচজন দাঁড়িয়েও গিয়েছিল। এরই মধ্যে বাবার ওই আচমকা গর্জন, আর ওই মূর্তি—

রাত হয়েছে, আর একটু বাদে দোকান বন্ধ করে ঘরে ফিরবে তারা। সদানন্দ এতক্ষণ বাদে ছেলের দিকে তাকালো হঠাৎ। মোলায়েম করে জিজ্ঞাসা করল—কি রে রাগ হয়েছে খুব?

বাবাকে আজ বেশ কিছুদিন ধরেই বিমর্ষ, চিন্তাচ্ছন্ন দেখছে সে। ঘণ্টা আড়াই আগে আজ ওই ব্যাপার ঘটে না গেলে তার মুখের নিবিড় বেদনার ছায়াটাই হয়ত বিষ্ণু আগে লক্ষ্য করত। ওধারের টুল থেকে সে বাবার দিকে থমকে চেয়ে রইল একটু, তারপর ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করল—মেয়েটা টাকা দিয়েছিল?

সদানন্দ মাথা নাড়ল।...দেয় নি।

কিন্তু এই উত্তরটুকুই যে সব নয়, খেয়াল করল না। অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল একটু। খানিক বাদে সচকিত হল। ছেলে তেমনি স্থির চোখে দেখছে তাকে। তার মনে পাঁচ রকমের প্রশ্ন উদয় হতে পারে, সেটা খেয়াল হল। এ-রকম একটা মেয়ের জন্য এই দরদ স্বাভাবিক নয়।

একটু থেমে আস্তে আস্তে বলল—তোর একটা বোন ছিল তোর থেকে পাঁচ বছরের বড। তোর মনে নেই, তোর মাত্র দু' বছর বয়েস তখন।...এই মেয়েটাকে দেখার পর থেকে আমার কেবলই মনে হয়, মেয়েটা থাকলে এ রকমটাই হয়ত দেখতে হত...

মা-বাবার মনে কিছু একটা দুর্ঘটনার চাপা ব্যথা আছে, তার আভাস ক্বচিৎ কখনো ছেলে পায়। তবে জীবন ধারণের সতেরো ঝঞ্ঝাটে থাকে বলে খেয়াল করে না। রাগ বা অভিমান ভুলে বিষ্ণু উদগ্রীব মুখে জিজ্ঞাসা করল—সে কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে মুখের ভাব বদলালো সদানন্দর। সংক্ষিপ্ত জবাব দিল—মরে গেছে।

একটু বাদে আবার অন্যমনস্কের মতো বলল—তোর মাকে এ সব বলিস না কিছু, বড ভালোবাসত, মনে পডলে খুব মন খারাপ হবে।

বাপের কথা শুনে বিষ্ণু মনে মনে নিশ্চিন্ত হল। বোন ছিল শুনে সে-ই কিনা ভেবে ঘাবডে গিয়েছিল। মরা মেয়েকে মনে পডার দরুন কতবড বিপদে ফেলার ব্যবস্থা করছিল ওকে, সে-কথা ভেবে ভিতরে ভিতরে উষ্ণও হয়ে উঠল একটু। তবু এই নিয়ে আর আঘাত দিতে মন সরল না। বিষ্ণুর সব আক্রোশ গিয়ে পডল ওই মেয়েটার ওপর, যে মেয়েটা দু-দুবার ঠকিয়ে গেল তাদের। সব-জায়গায় এ-ই করে বেডায় নিশ্চয়। বাপের অসাক্ষাতে কোনোদিন বাগে পেলে দেখে নেবে। বয়েস হলে লোকের জ্ঞানগম্যিও কমে যায় বোধ হয়, চুরি করতে দেখেও করেকার কোন মরা মেয়ের শোক উথলে ওঠে।

বাপ ছেলে দুজনে ঘরের উদ্দেশে পা বাডিয়েছে। সামনের রাস্তাটা পার হবার মুখে এক সঙ্গে দু'জনারই পা যেন মাটির সঙ্গে আটকে গেল হঠাৎ।

রাস্তার একটু আডালে একটা দেয়ালের ধার ঘেঁষে সেই মেয়েটা দাঁডিয়ে আছে। একা। তাদের দেখে দু'পা এগিয়েও থমকে দাঁডাল। বিষ্ণুর মনে হল তাকে দেখেই দাঁডিয়ে গেল। মনে হল, বাবার অপেক্ষাতেই দাঁডিয়ে ছিল। তাকে একা পেলে কাছে আসত, বলত কিছু।

তার জামাটা ধরে একটা টান দিয়ে রুক্ষস্বরে সদানন্দ বলল—দাঁডালি কেন, চল—

হন হন করে রাস্তাটা পার হয়ে গেল সে। দ্রুত পা চালিয়ে তবে বিষ্ণু বাপের নাগাল পেল।

ছেলেকে গোটাগুটি সত্য বলে নি সদানন্দ। মেয়ে সত্যিই মরে গেছে কিনা জানে না। সকলের অগোচরে স্ত্রী অনেক সময় গজগজ করেছে, কতকাল আর ওই পোডারমুখির জ্বালা বুকে চেপে বসে থাকবে, আর কতকাল ভাববে?

সদানন্দ কখনো চুপ, কখনো বলেছে—ও মরে গেছে শুনলে আর ভাবতাম না, জ্বালাও জুডতো...

একটানা ষোলটা বছরের ঘাত-প্রতিঘাত গেছে এই জীবনের ওপর দিয়ে, তবু ক্ষতটা মনে হয় সেদিনের। একেবারে তাজা। সংসারের দুঃখে-দারিদ্র্যে স্ত্রী বরং অনেকটা ভুলেছে, কিন্তু সদানন্দ ভুলতে পারে নি। ছেলের কাছে যাই বলুক, সাত বছরের সেই দুরন্ত সুশ্রী মেয়েটা আসলে চোখের মণি ছিল তারই।

ওই মেয়েরও আগে ছেলে ছিল আর একটা। তারপব মেয়ে। মেয়ে হওয়াব পর স্ত্রীব স্বাস্থ্য ভেঙেছিল। পাঁচ বছর বাদে বিষ্ণু এসেছে। আর তার দু'বছর যেতে কোলে আব এক ছেলে এসেছে। এই তিন ছেলে আব এক মেয়ে নিয়ে সেই সচ্ছলতাব দিনেও হিমসিম অবস্থা। মোটামুটি লেখাপড়া শিখেছিল সদানন্দ, পদ্মা-পারেব একটা ছোট ব্যাঙ্কে কেরানীব চাকবি কবত। বেতন সামান্য। তবু ভদ্রঘবের ছেলে সদানন্দ, ভদ্রবংশেব সন্তান।

স্ত্রীর এক নিঃসন্তান বড় ভাই থাকত লাহোবে। তাদেব তুলনায বেশ অবস্থাপন্ন। দেশে কিছু হল না দেখে বিদেশে গিযে ব্যবসা ফেঁদে বসেছিল। খুব ছোট থেকে বড হয়েছে। সে একবাব পদ্মা পেবিযে এসে মাস খানেকেব জন্য বোনের অতিথি হল। মামাব সঙ্গে ওই সাত বছবেব মেয়ের ভাবি ভাব হয়ে গেল। মিষ্টিমুখ মেযেটা সকলেবই চোখে পডত। মামাবও মন টানলো। বোনেব অবস্থা দেখে নিজেই প্রস্তাব দিল, মেযেটাকে সে নিযে যেতে পাবে, মামীব কাছে মানুষ হবে, লেখাপডা শিখবে। বছরে একবাব করে না-হয বাবা-মাযেব কাছে আসবে। আব তাহলে ভালো বিযে-থাও হবে মেযেব।

স্ত্রী তক্ষুণি মেযে দেবাব জন্য ব্যগ্র হযে উঠল। নিজেদের তো এমনিতেই দিন চলে না। মেযেব উজ্জ্বল ভবিষ্যতেব লোভ সে কিছুতেই সামলাতে পাবল না। তাছাডা নিঃসন্তান অবস্থাপন্ন বড ভাইয়ের সঙ্গে এ-রকম একটা যোগাযোগ স্থাপিত হলে আখেবে অনেক দিকে সুবিধে হতে পাবে।

কিন্তু সদানন্দ খুঁতখুঁত কবেছিল। বড ছেলেটাকে এমনকি দু'বছবের ছেলেটাকে নিতে চাইলেও হযত তাতে অত মন খাবাপ হত না। কিন্তু স্ত্রীব ভয়েই শেষ পর্যন্ত বাধ সাধতে পারল না সে।

ওবা বওনা হবার দিন সকালেই বাড়ি থেকে পালাল। ফিবে আসতে স্ত্রীও মন খাবাপ করে জানালো, যাবাব আগে মেযেটা নাকি হাপুস নযনে কেঁদেছে আর বাবাকে খুঁজেছে।

এব তিন মাসেব মধ্যে মাত্র কযেকদিনেব জ্বরে বড ছেলেটা চোখ বুজল। আব ছ'মাসেব মধ্যে সমস্ত দেশের শান্তি লণ্ডভণ্ড হযে গেল। দেশ বিভাগেব ফলে দেশেব অগণিত মানুষেব হৃৎপিণ্ড টুকরো টুকবো হযে গেল। সমস্ত পবিবাবটিকে টেনে হিঁচডে সদানন্দ যখন কলকাতায এনে ফেলল, তখনো যেন বিকাবেব ঘোর কাটে নি। তখনো মনে হয়েছে কিছু একটা দুঃস্বপ্ন দেখছে, এই নাডীছেঁডা দুর্বিপাকেব সবটাই সত্যি নয।

স্নাযুগুলো বশে আনতে অনেক সময় লেগেছে। এব ওপর জীবনধারণের বসদেব চিন্তা কবতে হয়েছে। আর, এবই মধ্যে এক একটা খবব কানে এসেছে। শুধু পূর্ববঙ্গে নয অনেক জাযগাতেই মবণযজ্ঞের নবকোৎসব হয়ে গেছে। পাঞ্জাবে—লাহোবেও হযেছে।

সম্বন্ধীর কাছে একে একে অনেকগুলো চিঠি লিখেছে সে, অনেক ভাবে খবব নিতেও চেষ্টা কবেছে। কিন্তু তাবা যেন দুনিয়া থেকেই মুছে গেছে। একটানা ষোল বছবে তাদের একটা খবরও পায় নি।

দোকানের ওই অভিজাত এলাকায মেয়েটাকে সে বিষ্ণুর আগেই দেখেছিল। মেযেব সাত বছব বয়েসেব সঙ্গে আবো ষোলটা বছব যোগ করে তাকে চেনার কথা নয।

সদানন্দ চেনে নি। এমন কি প্রথম দর্শনে বাঙালী মেয়ে বলেই মনে হয় নি তার। তাছাড়া, অবাঙালী সঙ্গীব সঙ্গেই ঘোরাফেবা করতে দেখছে তাকে। কিন্তু ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে সদানন্দ চমকে উঠেছিল কেন? পদ্মাপারেব সাত বছরের একটা মেয়েব স্মৃতি বুকেব তলায় আকুলি-বিকুলি করে উঠেছিল কেন?

আশ্চর্য! সদানন্দ জানে না কেন।

এখনো একটুও নিঃসংশয় নয়, হয়ত একটা উদ্ভট কল্পনা নিয়েই আছে সে। তবু মোহগ্রস্তেব মতো নিজেব অগোচরে ওই মেয়েব অনুসরণ কবেছে, তাব পিছু পিছু ঘুবেছে; ওব অসুন্দর জীবনযাত্রাব চিত্রটি কল্পনা কবে এক অস্বাভাবিক বেদনায় শ্বাস রুদ্ধ হয়েছে। তাবপব কতবাব সঙ্গীব সঙ্গে ওই মেয়ে পাশেব সোডা-লিমনেডেব দোকানে এসে দাঁড়িয়েছে, তার এখানেও এসেছে, দাম না দিয়ে কলম নিয়ে চলে গেছে, আব মানিব্যাগ নিতে গিয়ে ধবা পড়েছে। নিজেব সঙ্গে অনেক যুঝেছে সদানন্দ, যুঝেছে আব ভাবতে চেষ্টা কবেছে, সবই তাব আজগুবী কল্পনা, নিছক মিথ্যে।

দুপুবেব মধ্যে মেয়েটা অনেকবাব দোকানেব পাশ দিয়ে ঘোবাফেরা কবে গেল। আজ আর অত প্রসাধন নেই। মুখে চোখ-তাতানো সাজসজ্জা নেই। কি এক অমোঘ আকর্ষণেই মেয়েটা যেন বার বাব এই ফুটপাথ দিয়ে আসা-যাওয়া কবছে। আব, প্রতিবাবই খুব ভালো কবে লক্ষ্য কবছে সদানন্দকে। কিন্তু ভবসা কবে কাছে আসছে না, আসতে পাবছে না।

সদানন্দ সমস্ত মুখ থমথমে গম্ভীব। তার গালেব একটা দিক ওই মেয়েটাব দৃষ্টিব ঘায়ে কটকট কবে উঠছে—যেখানে পুবনো পোড়াব বড় ক্ষতচিহ্ন বয়েছে একটা। সাত বছবেব মেয়ে সর্দাবি কবে বাপেব তামাকেব জ্বলন্ত কলকেয় ফুঁ দিতে নিয়ে এসেছিল। সদানন্দ শুয়েছিল তখন। গবম সামলাতে না পাবাব দরুন সেই আগুনসুদ্ধ কলকে বাপেব গালেব ওপব পড়েছিল। একটা মস্ত অঘটনই ঘটে যেতে পারত। মা মেয়েটাকে মেবে একেবাবে আধমবা কবেছিল সেদিন।

ছেলে বিষ্ণু সকাল থেকে বাবকতক মেয়েটাকে লক্ষ্য কবেছে, আব আড়ে আড়ে বাপকে দেখছে। আজও মেয়েটাব ওপব মনে মনে জ্বলছে সে।

দুপবে সদানন্দ উঠে বড় বাস্তাব ওধাবেব পুকুবটাব দিকে চলল। বোজই দুপুবে সেখানে গিয়ে গাছেব ছায়ায় খানিক বসে জিবোয়। মাছ-ধবা দেখে, কখনো বা গাছেব গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে একটু ঘুমিয়ে নেয়।

বাধা পড়ল। মেয়েটা আজও যেন তাব প্রতীক্ষাতেই দাঁড়িয়ে ছিল। এখনো খায় নি বোধ হয়। মুখ শুকনো। কিন্তু শুকনো মুখেও কি এক আশাব তাড়না স্পষ্ট যেন। সদানন্দ দাড়িয়ে গেল, পায়ে পায়ে মেয়েটা তাব দিকেই এগিয়ে আসছে।

সামনে এসে দ্বিধা কাটিয়ে মেয়েটা বলল—আপনি কাল আমাকে বাঁচালেন কেন? আমি তো সত্যি পার্সটা চুবি কবেছিলাম...

সদানন্দব জানা দবকাব, সদানন্দর বোঝা দবকাব কতখানি উদ্ভট কল্পনায় ডুবে আছে সে। মেয়েটাকে খুব ভালো কবেই দেখল। দেখে আঁতকে উঠল। ঘষা মোছা প্রসাধনের আড়ালে যেন এক আর্তনারী সম্বল খুঁজছে—আশ্বাস চাইছে। মুখে

বলল—আমার একটা ছোট মেয়ে ছিল, মনে হয়েছে, বড় হলে সে তোমার মতোই হত—এই জন্যে।

মেয়েটার দুই চোখে শুকনো মুখে আগ্রহের আলো জ্বলে উঠল যেন। গালের ক্ষতচিহ্নটার দিকে চেয়ে কি এক বিস্মৃতির পরদা আকুল আগ্রহে ছিঁড়েখুঁড়ে সরাতে চেষ্টা করছে সে। জিজ্ঞাসা করল—মেয়েটা কোথায়? হারিয়ে গেছে?

সদানন্দর না জানলেই নয়, সংশয় না ঘুচলেই নয়। মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, তাই।

—কোথায় ছিল সে? কোথা থেকে হারিয়েছে?

সদানন্দর মনে হল, এমন মর্মছেঁড়া আকুতি সে আর দেখে নি। মনে হল, জীবনের সব সম্বল, সব আশা খুইয়ে এক মুমূর্ষু নারী যেন শেষ আশায় দুহাত বাড়িয়ে তাকেই আঁকড়ে ধরতে চাইছে। সদানন্দ নীরব। দেখছে।

—কি নাম ছিল তার? তার নাম কি...তার নাম কি...

আবার কি যেন স্মরণ করার প্রাণান্তকর চেষ্টায় চোখমুখ কুঁচকে গেল তার। তারপরেই উদ্ভাসিত হঠাৎ—তার নাম কি ঝুমুর?

একটা ঝাকুনি খেয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল সদানন্দ। আত্মস্থ হল। দিশা ফিরল। কঠিন বাস্তবের ওপর দুই পা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। ঠাণ্ডা নির্লিপ্ত মুখে মাথা নাড়ল। নাম ঝুমুর ছিল না। ঈষৎ রুক্ষ কণ্ঠে বলল—তুমি এ-রকম করছ কেন? আমার মেয়ে তো মরে গেছে—অনেক কাল আগেই মরে গেছে, বুঝলে?

মুহূর্তের মধ্যে সব আশা আর সব আগ্রহের অবসান হয়ে গেল। নিঃসাড় বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে মেয়েটা চেয়ে আছে তার দিকে। সদানন্দ আর অপেক্ষা করল না। কোথায় যাচ্ছিল ভুলে গেছে। দোকানেই ফিরে এল আবার।

তারপরেও মেয়েটা বার কয়েক এখান দিয়ে যাতায়াত করেছে। খুব সচেতন ভাবে নয়। চেয়ে চেয়ে দেখেছে। তাও আত্মবিস্মৃতের মতোই। তার যেন এখনো কিছু বুঝতে বাকি, জানতে বাকি।

রাত্রি।

আর একটু বাদেই দোকান গুটোবে তারা। বিষ্ণু সারাক্ষণ ব্যস্ত ছিল, কারণ দোকান বলতে গেলে আজ একাই চালাতে হয়েছে তাকে। এই ব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকেও বাবার মুখের দিকে চেয়ে কেমন শঙ্কা বোধ করেছে। বাবার এমন অন্যমনস্ক গাম্ভীর্য আর যেন দেখে নি সে।

হঠাৎ রাস্তার ওধারে অদূরের পুকুরটার দিকে একটা গণ্ডগোল উঠল। লোকজন দৌড়োদৌড়ি ছুটোছুটি করতে লাগল। বড় রকমের উত্তেজনার কিছু একটা ব্যাপার ঘটেছে ওইখানটায়। ভিড় বাড়ছে, পুলিশও দৌড়চ্ছে দেখা গেল।

বিষ্ণুও ছুটল কি ব্যাপার দেখতে। বিশ পঁচিশ মিনিটের মধ্যেই হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে ফিরে এল আবার। দু'চোখ কপালে তুলে বলল—বাবা, সেই বদমায়েস—ইয়ে, সেই মেয়েটা জলে ডুবে আত্মহত্যা করেছে, তার লাশ তোলা হয়েছে দেখে এলাম—

আবো কি বলতে গিযে বিষ্ণু বাপেব মুখেব দিকে চেযে থমকে গেল হঠাৎ।

সদানন্দ অন্যদিকে চোখ বেখে পাথবেব মূর্তিব মতো বসে আছে।

একজন মিসেস নন্দী

মুখ না তুলেও ডক্টব বসু টেব পেলেন আব একজন কেউ ঘবে এলেন।

ছোট মেযেটাব হাতসুদ্ধু একটা আঙুল তাঁব এক হাতেব থাবাব মধ্যে। অন্য হাতে গ্লাস-স্লাইডে আঙুলেব বক্ত লাগিযে নিচ্ছেন। মুখও চলছে। ছোট মেযেটিকে ভোলাবাব জন্যে অনেক হাসিব কথা বলছেন। কিন্তু আঙুলে আচমকা পিনেব খোঁচা খেযে আব বক্ত দেখে মেযেটা ভবসা কবে হাসতে পাবছে না। ডক্টব বসু আব একটা গ্লাস-স্লাইডে ঘষে ঘষে এই স্লাইডেব বক্তটা শুকিযে নিযে জোড়া-স্লাইড দুটো সামনেব চামড়াব বাক্সেব খুপবিতে বাখলেন। তাবপব আগন্তুক দাঁড়িযেই আছে মনে হতে ঘাড় ফেবালেন।

একজন মহিলা। বছব ত্রিশ-বত্রিশ হবে বযেস।

এখানে অবাবিত-দ্বাব সকলেব। পুরুষ আসে, মহিলা আসে—যাব প্রযোজন সে-ই আসে। বক্ত ইত্যাদি পবীক্ষা কবানোব চার্জ এখানে কিছু বেশি। এই বেশিটুকু দেবাব যাঁদেব সংগতি আছে, বা কিছু বেশি দিযেও যাঁবা সততাব ওপবে নির্ভব কবেন —তাঁবাই আসেন। বোগেব ব্যাপাবে এ-বকম লোকেব সংখ্যাই বেশি।

ডক্টব বসুব চকিত-বিভ্রান্ত, প্রায-বিমূঢ় অভিব্যক্তিটুকু মহিলাব পদার্পণেব দরুন নয। তাঁব সামনেই তো আব এক মহিলা বসে। যে ছোট মেযেটাব বক্ত নিচ্ছেন, তাব মা। ডক্টব বসুব পবিবর্তন এই একজনকে দেখেই।

—বসুন।

ঈষৎ ব্যগ্রমুখে মহিলা বলতে গেলেন—আমাব বিশেষ একটু—

—বসুন।

অর্থাৎ হাতেব কাজ শেষ না কবে তাঁব শোনাব অবকাশ নেই। ডক্টব বসু বাশভাবী মানুষ। কম কথা বলেন। এক কাজেব ফাঁকে আব এক কাজেব কথা শুনে নেওযাব অভ্যেস নেই। কিন্তু যেভাবে বললেন, নিজেব কানেই বিসদৃশ লাগল। কণ্ঠস্বব ঈষৎ অসহিষ্ণু রূঢ় শোনাল। এমন কি, বাচ্চা মেযেটিব মাও একবাব ফিবে নবাগতাকে দেখলেন।

বিব্রত মুখে মহিলা একটা চেযাবে বসে পড়লেন।

ধীবে-সুস্থে হাতেব কাজ সাবতে লাগলেন ডক্টব বসু। তিন জোড়া স্লাইডে বক্ত লাগানো, দুটো সরু টিউবে বক্ত টেনে আবকে মেশানো—এসব কাজে এমনই অভ্যস্ত যে চোখ বুজে কবতে পাবেন। অত গম্ভীব নিবিষ্টতায সম্পন্ন কবাব মতো কিছুই নয। আসলে মনটা তাঁব এই কাজেব দিকে নেইও। সুশ্রী বমণীটিকে দেখাব সঙ্গে সঙ্গে

তাঁর অন্দরমহলে দুর্বোধ্য আলোড়ন শুরু হয়েছে একটা। তিনি কিছু স্মরণ করতে চেষ্টা করছেন। কিছু হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।

কোনো একদিনের কোনো এক পুঞ্জীভূত বিরূপতার উৎসে হঠাৎ নাড়া পড়েছে যেন। অথচ এই উৎসটার সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন না আদৌ। এ-রকম বীত-রাগের হেতু নিজেই জানেন না। নিজের অগোচরে স্মৃতির আয়নায় কোনো একখানি মুখ ধরা আছে হয়ত। কিন্তু ধরা যে আছে সেটা অনুভব করলেন এই সুযৌবনা রমণীটিকে এক-নজর দেখে। দেখামাত্র একটা বিমুখ প্রতিক্রিয়া অনুভব করলেন। অথচ আশ্চর্য, কাজের ফাঁকে নিজের নিভৃতে বিচরণ করেও তিনি ওই স্মৃতি-তটে পৌঁছুতে পারলেন না। কিছুই মনে করতে পারলেন না ডক্টর বসু।

ঘুরে বসে আর একবার সুন্দর মুখখানা দেখার ইচ্ছে। সুন্দর কিন্তু সুবাঞ্ছিতা নয়। ঘুরে বসলেন না। দেখার অবকাশ এক্ষুণি মিলবে। কিন্তু কার সঙ্গে কাকে মেলাবেন মনে না পড়লে দেখে কি করবেন? মনে পড়ছে না।

হাতের কাজ সারলেন। সরঞ্জামগুলো চামড়ার বাক্সয় গুছিয়ে রাখলেন। ছোট মেয়েটার মায়ের কাছ থেকে ফী নিলেন। পেশেন্টের বাড়ি যেতে হলে ডবল চার্জ, এখানে এলে অর্ধেক। তাঁকে বললেন, বিকেলে লোক পাঠিয়ে রিপোর্ট নিয়ে যেতে। মেয়ের হাত ধরে মা চলে গেলেন।

ডক্টর বসু ঘুরে বসলেন।

...সেই রকমই দীর্ঘাঙ্গী স্বাস্থ্যবতী।...গৌর তনু, রূপসী...সেই রকমই ঢলঢলে মুখ। সেই রকম বাঁকা সিঁথি।

কিন্তু কোন রকম? কার মতো?

—হ্যাঁ, বলুন।

সুন্দর মুখখানি ভারি শুকনো, ক্লান্ত, উৎকণ্ঠাভরা। এই রূপের আড়ালে অনেকদিনের একটা দুশ্চিন্তা যেন থিতিয়ে বেঁধে আছে। স্বল্প প্রতীক্ষার দরুন ঈষৎ অধীরও। বললেন—আপনাকে দয়া করে এক্ষুণি একবার আমার বাড়িতে আসতে হবে, আমার ছেলেটির—

—বাড়ি কোথায়?—কথার মাঝেই বাধা পড়ল।

—বেশি দূর নয়, আমার সঙ্গে গাড়ি আছে—

ডক্টর বসু চেয়ে আছেন। লক্ষ্য করছেন। বাঁকা সিঁথির ফাঁকে সিঁদুরের আঁচড়, কমনীয় ভুরু, টানা চোখ। বললেন—গাড়ি একটা আমারও আছে, আপনি বাড়ির ঠিকানা বলে যান, যাব—

মহিলা থতমত খেলেন একটু। এ-রকম গম্ভীর নির্লিপ্ততার কারণ খুঁজে পেলেন না। ঠিকানা দিলেন। তারপর সানুনয় অনুরোধ করলেন—কেসটা খুব আরজেন্ট ডাক্তারবাবু, আপনার ব্লাড-রিপোর্টের ওপর আমার ছেলের প্রাণ নির্ভর করছে।

বলতে বলতে টানা চোখের কোণদুটো একবার কেঁপে উঠল বুঝি। সামলে নিয়ে বললেন—বড় ডাক্তার বিশেষ করে আপনাকে দিয়ে ব্লাড করানোর কথা বলে দিয়েছেন—

ডক্টর বসু প্যাথলজিস্ট। রোগীর চিকিৎসা করেন না। রোগের বীজাণুর হদিস দেন। কিন্তু এই কাতরোক্তি শুনেই হোক বা তাঁকে আর একটু বসিয়ে, আরো একটু লক্ষ্য করে কোনো ভুলে-যাওয়া স্মৃতির দরজা খোলার তাড়নাতেই হোক, জিজ্ঞাসা করলেন—কি হয়েছে?

মহিলা সাগ্রহে জানালেন কি হয়েছে। জানিয়ে যেন ভরসা পেতে চাইলেন। কিন্তু ডক্টর বসু যা শুনলেন সত্যি হলে ভয়ের ব্যাপার। সাত বছরের ছেলে। রক্তের শ্বেত-কণিকা অসম্ভব রকম বেড়ে যাচ্ছে। লিউকিমিয়া। এই রোগ হলে বাঁচেই না বলতে গেলে। আগে অন্যত্র ব্লাড করানো হয়েছিল। সেখানকার ওই রিপোর্ট ছিল। আজ আবার একজন ডাক্তার এসে দেখে গেছেন। তিনি একটু সংশয় প্রকাশ করেছেন, ওই রোগ নাও হতে পারে। অবিলম্বে তিনি আর একবার রক্ত-পরীক্ষা করাতে বলেছেন। আর বিশেষ করে ডক্টর বসুরই নাম করেছেন।

ডক্টর বসু শুনলেন। মায়ের ব্যাকুলতা দেখলেন। সুন্দর মুখে একমাত্র ছেলের মৃত্যুর ছায়া কাঁপছে। ডক্টর বসুর মনে হল তবু মেয়েটি যুঝছে—ছেলে বাঁচবে না বিশ্বাস করতে চাইছে না, মুখের ওপর ওই ছায়াটাকে বসতে দিতে চাইছে না।

কিন্তু তবু এই আকুতি যেন মর্মস্থলে পৌঁছুচ্ছে না ডক্টর বসুর। তাঁর কেবলই মনে হচ্ছে, তিরিশ-বত্রিশের এই স্থিরযৌবনে দোলা লাগলে, এই সুন্দর মুখে হাসি ঝরলে, ওই টানা বিষণ্ণ চোখের গভীরে কটাক্ষের বিদ্যুৎ ঝলসালে কার সঙ্গে যেন মিলবে। যার স্মৃতি বাঞ্ছিত নয় আদৌ, যার স্মৃতি একরাশ বাষ্পীয় ক্ষোভের মতো অবচেতন মনের তলায় জমাট বেঁধে আছে।

কিন্তু কার স্মৃতি? ভেবে না পেয়ে ডক্টর বসু নিজেই অবাক।

—আপনি যান, আমি যাচ্ছি।

মহিলা এবারে হয়তো অন্যরকম আশা করেছিলেন। ভেবেছিলেন তাঁর সঙ্গেই আসবেন। আবার অনুরোধের ভরসা না পেয়ে কাতর মিনতি-ভরা চোখে তাকালেন শুধু।

—আপনি যান, আমার দেরি হবে না।

চলে গেলেন। গেট পর্যন্ত দেখা গেল। ডক্টর বসু দেখলেন। এই রমণীর চলা-ফেরা, গাড়িতে ওঠা—মাধুর্য-ভরাই বটে। কিন্তু ডক্টর বসু তা দেখলেন না। মায়ের বিষণ্ণ করুণ মাধুর্য দেখলেন। আর, কি এক মস্ত মিলের মধ্যে ঠিক ততবড়ই একটা বিপরীত অমিল দেখলেন।

ডক্টর বসু মানুষটা বাইরে রুক্ষ হলেও নির্দয় নন আদৌ। বরং উলটো। তাঁর কাজের নিষ্ঠা আর একাগ্রতা সুবিদিত বলেই বড় বড় ডাক্তাররা তাঁর কাছে কেস পাঠান, তাঁর রিপোর্টের ওপর অসংশয়ে নির্ভর করেন। যা শুনলেন, হাতের সব কাজ ফেলে তাঁর তক্ষুণি ছোটার কথা, তবু উঠতে একটু দেরিই হল।

ডক্টর বসু ভাবছেন। ভাবা ঠিক নয়, অতীত হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। নিজের এমন অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার দরুন নিজেই হতভম্ব তিনি। ছেলেবেলায় অবশ্য খুবই আবেগপ্রবণ ছিলেন। একটু কিছু হলেই ভিতরে ভিতরে চাপা অভিমানে গজরাতেন। বাবাকে মনেও

পড়ে না। শুধু মা ছিল। এই মাকে ঘিরেই যত মান-অভিমান। অথচ দু-দণ্ড ওই মা চোখের আড়াল হলে অন্ধকার দেখতেন চোখে।

বিগত দিনেব পরিচিত মুখগুলো মনে কবতে চেষ্টা কবলেন ডক্টর বসু। কিন্তু এই মুখ মনে পড়ছে না। তাঁব পবিচিতের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়, তাদের সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগ নেই বললেই চলে। দিবারাত্র কাজে ডুবে থাকেন, সামাজিক উৎসব অনুষ্ঠানে যোগ দেবাব ফুবসতও মেলে না। অনভ্যাসেব দরুন এখন অবকাশ পেলেও যান না কোথাও।

কোনো পেশেণ্টেব বাড়িতে কেউ তাঁব সঙ্গে দুর্ব্যবহার কবেছিল কিনা ভাবতে চেষ্টা কবলেন। দু-দশটা বাড়ি থেকে বোজই কল আসে। গিযে বক্ত নিয়ে আসতে হয। কিন্তু এই ঠিকানায কখনো গেছেন বলে মনে পড়ল না।

এ-ধবনেব স্থূল ব্যাপাব কিছু নয, ডক্টর বসু নিজেই ভালো জানেন। সামান্য ঝগড়া-বিবাদে বা কাবো দুর্ব্যবহারে এ-বকম প্রতিক্রিয়া তাঁর হয় না। নিজেব যে চাপা আবেগটাকে তিনি খুব ভালো কবে চেনেন, সেটাই কোনো কারণে আঘাত খেযে জখম হযেছিল। অন্যথায এ-রকম হতে পাবে না। কিন্তু ও-ভাবে আঘাত দেওয়া দূরে থাক, ওই মেযেও তো জীবনে তাঁকে এই প্রথম দেখল মনে হয। অথচ এমন বিরূপতাব মূলে এই মেযেব সঙ্গেই যে নিবিড় যোগ কোথাও আছে, ডক্টব বসুর তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

ঘড়িব দিকে চোখ পড়তে সচকিত হলেন। আবো আগেই ওঠা উচিত ছিল। তাড়াতাড়ি গাড়ি বাব করলেন।

বাড়িব নম্বব মিলিযে গাড়ি থেকে নামতে প্রথমেই দোতলাব দিকে চোখ গেল। বাবান্দাব বেলিংযে ঝুঁকে মহিলা দাঁড়িযে আছেন। তাঁবই প্রতীক্ষায উদগ্রীব মনে হল। চোখাচোখি হতে ওপবে উঠে আসতে ইঙ্গিত কবলেন তিনি। নিজেও বেলিং থেকে সবে গেলেন।

বাঙ্গালী-অবাঙ্গালীব মিশেল অভিজাত এলাকা এটা। ছবিব মতো ছোট বাড়ি। বাড়িব গাযে শুধু নম্বব ছাড়া কাবো নামেব চিহ্ন নেই। ভিতবে ঢুকেও মালিকেব রুচিব পরিচয মেলে। বসাব ঘবেব ভিতব দিয়েই ঢুকলেন তিনি। পবিপাটি করে সাজানো। সুপরিচিত শৌখিন আসবাবপত্র। দেওযালে অজ্ঞাত শিল্পীব দুই-একটা হালকা রঙিন ছবি। মেঝেতে পুরু নরম কার্পেট।

ডক্টর বসু এগিযে যাবাব আগে তাঁকে নিয়ে যাবাব জন্য মহিলাটি নিজেই তবতর করে সিঁড়ি ধবে নিচে নেমে এলেন। তাঁব আগে আবো একটি মাঝবয়সী রমণী সামনে এসে দাঁড়িযেছিল। খুব সম্ভব পবিচাবিকা। কর্ত্রীকে দেখে সে সসম্ভ্রমে সবে দাঁড়াল।

—আসুন ডাক্তারবাবু।

মহিলা আগে আগে ওপবে উঠতে লাগলেন। ডক্টর বসু তাঁর দুই সিঁড়ি পিছনে। আবাবও তাঁকে দেখামাত্র সেই অস্বস্তি, সেই বিরূপ অভিব্যক্তি। মনের এই অবস্থাটা যেন তাঁর দখলেব বাইরে। কোনো সুশ্রী মহিলার বাঁকা সিঁথি দেখলে এই রকম হয কিনা চিন্তা করে নিলেন। তক্ষুণি নিজেই আবার বাতিল কবলেন চিন্তাটা। সিঁড়ি দিয়ে এভাবে

নেমে আসা, ধীর পায়ে এভাবে ওঠা—এও যেন অচেনা নয়, অথচ তিনি চিনতে পারছেন না। তাঁর চোখে এই তনুমাধুর্যও যেন অপরাধ।

ডক্টব বসু নিজেকে সংযত করতে চেষ্টা করলেন। ভদ্রমহিলা ছেলের অসুখে চিন্তাগ্রস্ত, কাতর। আর তিনি কর্তব্যেব ডাকে এসেছেন—এ-কথাই ভাবতে চেষ্টা কবলেন। ওপরে উঠেও আবো জনা-দুই মেয়েছেলের মুখই দেখলেন, কোনো পুরুষেব মুখ দেখা গেল না।

চারদিক খোলা একটা পরিচ্ছন্ন ঘবেব মাঝামাঝি পুরু গদির খাটে বোগী শয়ান। সাত বছবেব ফুটফুটে ছেলে। রোগের ধকলে বিবর্ণ, কিন্তু তাও সুন্দর। শিযবেব কাছে নার্স দাঁড়িয়ে।

ব্যাগ বেখে ডক্টর বসু তাব সামনে বসলেন। চোখেব কোল টেনে পবীক্ষা কবলেন, আঙুলেব ডগা টিপে দেখলেন। একটুখানি আশ্বাসেব আশায তাব মা সশঙ্ক নেত্রে চেযে আছেন অনুভব কবলেন। যে-মনটা তখনো খোঁজায মগ্ন, তাকে ডক্টব বসু জোর করেই যেন এবাবে কাজেব দিকে ফেবালেন।

ব্যাগ খুলে ধীরে-সুস্থে কর্তব্য সম্পন্ন করলেন। বক্ত নেওযা হল। ডক্টব বসু উঠে দাঁড়ালেন। এবারে মহিলাব সঙ্গে চোখোচোখি হতে মৃদু গম্ভীব স্ববে জিজ্ঞাসা কবে বসলেন—আপনার নাম?

যেন রিপোর্ট লেখাব জন্যই নামটা জানা দবকার।

—মিসেস নন্দী।

মিস্টাব নন্দী কে বা কোথায থাকেন জিজ্ঞাসা কবাটা আব বিপোর্টেব সঙ্গে সংযুক্ত মনে হবে না। তাই জিজ্ঞাসা কবা হল না, নইলে জানাব ইচ্ছে ছিল।

মহিলা বিনীত অনুবোধ করলেন—ডাক্তারবাবু রিপোর্টটা যদি একটু তাডাতাডি পাওয়া যায—যাবে না?

মায়ের এই কাতবতা আর উদ্বেগে তো ভেজাল নেই, তবু যেন কি দেখতে চেষ্টা কবছেন ডক্টব বসু।

—তিনটে সাড়ে-তিনটেয লোক পাঠাবেন।

—আমি নিজেই যাব, ওটা নিয়ে তক্ষুণি আবাব—

বলতে বলতে ফীয়েব কথা মনে পড়ল। তক্ষুণি প্রায় ছুটেই ওধাবেব কোণের একটা টেবিলের ড্রযাব খুলে কযেকটা নোট হাতে ফিবে এলেন।—কত দিতে হবে আমি তো—

ডক্টর বসু জানালেন কত দিতে হবে। টাকা নিযে বেবিয়ে এলেন। বাবান্দা, সিঁডি, সেই বসাব ঘব, বাস্তা, নিজেব গাড়ি। গাডিতে স্টার্ট দিযে আব একবাব দোতলাব বারান্দার দিকে তাকালেন। কেউ নেই। ডক্টব বসু নিজেব ওপবেই বিলক্ষণ বিরক্ত। হযত কিছুই না, নিছক একটা কাল্পনিক আবেগের ধকল চলছে সেই থেকে। আব, কিছু হলেও এ-রকম আবেগপ্রবণতা ডাক্তারের অন্তত থাকা উচিত নয়।

বাড়ি ফিবে ল্যাববেটাবিতে ঢুকলেন। এই কাজটাই আগে সারবেন। কাজ নিযে বসলেন। তন্ময় হলেন। যত পরীক্ষা করছেন, মায়ের মুখ সরে গিয়ে ছেলেটার মুখই

চোখেব সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। বুকের ভিতবটা কেমন খচখচ করছে ডক্টর বসুর।

শেষ হল। তার পবেও চুপচাপ বসে বইলেন খানিক। তাবপব রিপোর্ট লেখায় মনোযোগী হলেন। হাতে লেখেন না, ছাপা ফর্মে একবাবে টাইপ করে ফেলেন। টাইপ শেষ হল। খামও টাইপ হয়ে গেল।...মায়েব মুখখানাই চোখে ভাসল এবার।

সঙ্গে সঙ্গে কোন মন্ত্রবলে চোখেব সামনে থেকে একটা কালো পর্দা সরে গেল যেন। আশ্চর্য, এতক্ষণ এত হাতড়েও যাব হদিস মেলে নি, এক মুহূর্তে তাই যেন দিনেব আলোব মতো স্বচ্ছ স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটা ঘটনাস্রোত যেন পর পর চোখের সামনে দেখতে পেলেন ডক্টব বসু। খুব অভিনব ঘটনাও কিছু নয়, উলটে মামুলিই বলা চলে। কিন্তু যৌবনস্বরূপিণী বমণীব হিংস্র নির্মম প্রভাবটুকুই বোধ করি ওই ঘটনাব অন্তবালে বুকেব তলায দুর্ঘটনাব মতো চেপে বসেছিল ডক্টব বসুব। অবচেতন মন থেকে এতকালেও সেটা যায নি।

দৃশ্যগুলো একে একে আবাব চোখেব সামনে দেখতে পাচ্ছেন যেন।...একটি মেয়ে, ওই মিসেস নন্দী, সেদিন কি তাব পবিচয় সেটা আজ আব মনে নেই—জীবন-বাস্তবে আর যৌবন-বাস্তবে এক পুরুষকে সে চেয়েছিল। চাইতে গিয়ে চাওযা আব পাওযার মধ্যে কিছু ফাবাক আছে, সেই প্রথম অনুভব কবেছিল। একটা কটাক্ষে, একটুখানি ভ্রূভঙ্গিতে, ঠোঁটেব এক টুকবো বিলোল হাসিতে যে দুনিযা জয কবতে পারে, এই পবাজয আগুন হয়ে তাব বুকেব তলায ধিকি ধিকি জ্বলছিল। যাকে পেল না তার সুখেব ঘবে আগুন ধবাবার জন্য সেই জ্বালা সে সন্তর্পণে পুষেছে। তারপব আগুন ধরিযেছে। কামনাব নগ্ন পঙ্কিলতার মধ্যে সে একদিন সেই ভাগ্যহত পুরুষকে টেনে নামিযেছে, নামিয়ে তাবপব জাহান্নমেব পথে ঠেলে দিয়েছে। পুরুষেব অসহায স্ত্রীটি ছেলে-কোলে কবে তার কাছে এসে নতজানু হয়ে স্বামীকে ভিক্ষা চেযেছে —ভিক্ষা মেলে নি। সুন্দবী বমণীব হিংসা. মাতৃত্বেব সঙ্গেও তাব আপোষ নেই।

সত্যি ঘটনা নয. অবাস্তব বাংলা ছবি একটা।

কিন্তু এক যুগ আগে এই ছবি দেখেই ভিতবে ভিতবে ভযানক অস্বস্তি আব গ্লানি বোধ কবেছিলেন ডক্টব বসু, তাব ভিন্ন কাবণ। বমণীব মাতৃত্ববোধশূন্য এই অসুন্দবেব দিকটা এত দর্শকের মধ্যে শুধু তাঁকেই হযত বিশেষভাবে আঘাত কবেছিল।

একটু বেশি বযসে বিযে কবেছিলেন তিনি। সিনেমা-টিনেমা বড দেখেন না, কিন্তু নতুন বউ নিযে দৈবক্রমে সেদিন এই ছবিটাই দেখতে এসেছিলেন। আব দেখাব পবে মনে হযেছিল, এটা যেন তাব জীবনেই একটা কালো ছাযা বিস্তাব কবতে এগিযে আসছে।

প্রেম নয, একটি মেযেকে মনে ধবেছিল। ভিন্ন বর্ণেব. ভিন্ন গোত্রের মেয়ে। সুশ্রী, সপ্রতিভ. মিষ্টি মেযে। সেও তাঁকে অপছন্দ কবত না। কিন্তু মা বেঁকে বসেছিলেন। মা-ছেলে দু'জনাবই অভিমান বড কম নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছেলে আর বিযেই করে না দেখে মা-ই প্রথম ভেঙে পডলেন একদিন। কেঁদে ফেলে বললেন—তোর যাকে খুশি নিয়ে আয, ঘর সংসাব কর. আমি আব বাধা দেব না, বউ এলে আমাকে কাশী পাঠিযে দিস।

ডক্টর বসু তারপর বউ ঘরে এনেছেন। নিজের যাকে খুশি তাকে নয়, মায়ের যাকে খুশি তাকে। মা পিঠে হাত বুলিযে বলেছিলেন—তোদেব জীবন খুব সুখের হবে দেখিস।

ডক্টর বসু বিশ্বাস করেছিলেন, মাযেব কথার থেকে বড কিছু নেই। অ-সুখেরও নয তাঁর সংসাব।

কিন্তু সেদিন ওই ছবি দেখে একটা বড বকমের নাড়া-চাড়া খেয়েছিলেন ডক্টর বসু। বিয়েতে সেই মেযেও এসেছিল, হাসিমুখে উপহার দিয়েছে, অভিনন্দন জানিয়েছে, নেমন্তন্ন খেয়ে গেছে। ততটা তো এগোন নি ডক্টর বসু, কোনোরকম দাগ পড়ার কথা নয। তবু সেই মেযেব চোখ-দুটো এক-একবার যেন বেশি চকচকিযে উঠছিল মনে হয়েছে। ক'দিনেব মধ্যে এই ছবিব প্রতিক্রিযা। যাকে একদিন মনে ধবেছিল তাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা কবতেন ডক্টব বসু। সেই শ্রদ্ধার মেযেকে ছবিব এই মেযে কেমন কবে যেন গ্রাস কবেছিল। ভীতি-বিহ্বল চোখেই ছবিটা দেখেছিলেন। শেষে ছেলে নিযে এসে ভিক্ষা চাওযা সত্ত্বেও যখন আব এক রমণীর মাতৃত্ববোধ বড হযে উঠল না, সেদৃশ্য আব যেন সহ্য করে উঠতে পারছিলেন না ডক্টব বসু।

অভিনেত্রীটি অর্থাৎ আজকেব মিসেস নন্দী এই ধরনের ভূমিকাব সুপরিচিতা সেই আর্টিস্টই হবেন বোধ কবি। কাবণ, ছবি শেষ হতে অনেকের, বিশেষ কবে স্বল্প মাসুলেব দর্শকদেব, অনেকবকম চটুল বসালো মন্তব্য শোনা গিযেছিল। ছবিব কষ্ট-কল্পিত আবেদনের থেকেও ছলা-কলামযী রমণী-যৌবনেব সেই নির্মম স্থূল দিকটাব আকর্ষণ যাদেব কাছে অনেক বেশি।

ছবিটা দেখাব পব থেকে ডক্টব বসু সেই মনে-ধবা মেযেটির সঙ্গে কোনো যোগাযোগই আর বাখেন নি।

সাড়ে-তিনটের দু-পাঁচ মিনিট আগেই মিসেস নন্দী বিপোর্ট নিতে এলেন। শুকনো উদগ্রীব মুখ, আশায় আশঙ্কায চাপা অস্থিবতা সুস্পষ্ট।

ডক্টব বসু নিঃশব্দে বিপোর্টেব খামটা তাঁব দিকে বাডিযে দিলেন।

খামটা হাতে নিলেন তিনি। চোখে কাতব প্রশ্ন, কি শুনবেন সেই শঙ্কায সাহস করে মুখ ফুটে জিজ্ঞাসাও কবে উঠতে পাবছেন না। কিন্তু চুপচাপ ফিবে যেতেও পাবলেন না শেষ পর্যন্ত।

—কি দেখলেন?

আগের সেই প্রতিক্রিযা আব অনুভব কবছেন না ডক্টব বসু। ববং একটু বিচলিত বোধ করছেন।

—তেমন ভালো মনে হল না, আপনাব ডাক্তারবাবুকে দেখান, তিনি বুঝবেন।

এক নিমেষে সমস্ত আশা যেন নির্মূল হয়ে গেল। স্থাণুর মতো মহিলা দাঁড়িয়ে বইলেন খানিক। তারপব ঝরঝব কবে কেঁদে ফেললেন। নিঃশব্দ কান্না। নিজেকে সংববণ করতে না পেরে দ্রুত ঘর থেকে বেবিয়ে গেলেন।

গাড়িটা চলে না যাওয়া পর্যন্ত ডক্টব বসু ঘাড় ফিরিয়ে দেখলেন।

প্রায় বছরখানেক পবে।

ডক্টর বসু বাংলা ছবি দেখতে এসেছেন আবাব একটা।

কতকাল বাদে সিনেমা দেখছেন ঠিক নেই। হঠাৎ আসেন নি, অবকাশ বিনোদনেব জন্যেও নয়, কাগজে এক বমণীমূর্তিব বিজ্ঞাপন আব নাম চোখে পডতে এসেছেন।

বহুকাল আগের সেই গোছেবই একটা ভূমিকা। তবে এই ছবিতে কিছুটা আত্মত্যাগের মিশেল আছে। হাস্যলাস্যময়ী এক বমণী নিজের যৌবনের অস্ত্রে এক প্রবল প্রমত্ত পুরুষকে বশীভূত কবে তাব কোপ থেকে এক সাধাবণ মানুষকে বক্ষা কবছে। ওই সামান্য মানুষটিই একদা তাব অনুবাগেব পাত্র ছিল।

ছবিব প্রগলভ মুহূর্তগুলিতে অনেক হাসাহাসি, স্থূল মন্তব্য, কটূক্তি এমন কি সামনের দিক থেকে শিসও শোনা গেছে। কিন্তু ডক্টব বসু নির্বিকাব চিত্তে দেখে গেছেন, দেখাব পরে তেমনি নির্বিকার মুখেই প্রেক্ষাঘব থেকে বেবিযে এসেছেন। এবাবেও চটুল উক্তি কানে এসেছে দুই-একটা। কে একজন তাব তরুণ সঙ্গীকে কনুইযের গুঁতো দিযে বলছে—কেমন বঙ-ঢঙ দেখলি—একখানা পার্ট দেখালে বটে।

সঙ্গী পালটা উচ্ছ্বাস জ্ঞাপন কবল—তাব থেকেও চোখেব ভাষা দেখেছিস?—মাইবি, যেন কটকট কবে।

ডক্টব বসু নির্লিপ্ত মুখে নিজেব গাড়িতে এসে উঠলেন। তিনি কিছুই দেখেন নি। আব দেখে থাকলেও এবই মধ্যে সব মুছে গেছে। তাঁর চোখে শুধু একটা দৃশ্যই লেগে আছে। সে-দৃশ্য তাঁবই বাড়িব নিচের একটা ঘরেব। ছেলের ব্লাড-বিপোর্ট হাতে তাঁব সামনে দাঁডিযে এক বমণী ঝবঝব কবে কাঁদছে।

সেই মুখেব সঙ্গে সকলেব মাযেব মুখই খানিকটা কবে মেলে বোধ কবি।

রানীদিন

ক্যালেণ্ডাবে আজকেব তাবিখটাব দিকে তাকাতেই প্রায উনিশ বছর আগেব ঠিক এই তারিখটাই আমাব চোখেব সামনে এগিযে এলো। সাত সাগব বাতাসে টপকে ইংলণ্ডেব বাণীব পদার্পণ ঘটেছে ভাবতে, উনিশ বছব আগেব এই তাবিখে তিনি কলকাতায।

সেই দিনটিকে কেন্দ্র কবে একটি পবিবাবেব যে মানসিক ছবিটি তুলে ধবতে চলেছি, পাঠক জেনে বাখুন বিশেষ কারণে তাঁদের সঠিক নাম ক'টি এখানে বদলাতে হযেছে।

সেদিন আকাশ নির্মেঘ ছিল। কলকাতাব বাতাসে রোমাঞ্চ ঠাসা ছিল। আবালবৃদ্ধবনিতার বুকেব তলায রূপকথাব শিহবণ লেগেছিল। যাই যাই কবেও বিদায়ী

শীত হঠাৎ আবার থমকে দাঁড়িয়ে নতুন উদ্দীপনায় তার শেষ পুঁজি উজাড় করে দিচ্ছিল। হয়ত পুঁজি ছিলই না, আগামী শীতের থেকে কিছুটা ধাব কবে খরচা করছিল।

আমি ভাবছিলাম দেশটা অতিথি-পবাযণ বটে। এই দেশেরই পুরাণের পুণ্য পাখিরা সপরিবারে ক্ষুধার্ত অতিথির সেবায় আগুনে দেহ দান করেছিল। পুরাণ-মাহাত্ম্য কল্কিব বহু ধ্বংসযজ্ঞেও লুপ্ত হয়ে যায়নি একেবারে। সেই অতিথি-পবায়ণতার ঐতিহ্যের শীর্ণতর আব সূক্ষ্মতর ধাবা যুগেব পর যুগ পেরিয়ে তলায় তলায় তরতরিয়ে বইছে। বাণী এসে গেছেন সাত সমুদ্র তের নদী পেরিয়ে। রূপকথার বাণী নয়, স্বপ্নেব বাণী নয—রক্ত মাংসেব তবতাজা রাণী। এই রাণীর জঠরেব ক্ষুধা ভাবাটাও বিদ্যাসাগবীয গদ্য গোছের। এই বাণীব চোখের ক্ষুধা। অতিথিপবাযণ দেশ তাঁর চোখেব সামনে গোটা মনটি বিছিয়ে দিযেছে। শুধু মানুষ কেন, তাই আকাশও সেদিন অত তকতকে নীল ছিল, বাতাসও রোমাঞ্চভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছিল, আর বিদায়ী শীতও অতিথি-সম্বর্ধনাব দাযিত্বে চকিত হযে ঘুবে দাঁড়িয়েছিল।

ক'দিন আগে থেকেই সাজ সাজ বব। বুড়ী কলকাতাব কতক অঙ্গ বং পালিশ আলোব বন্যায নতুন-যৌবনে ঝলমলিয়ে উঠেছে। রক্ষা, সকল অঙ্গে চোখ ফেবাবাব মত সময নেই বাণীর। মন্ত্রীদের আব মন্ত্রণা দপ্তবের মাথাওযালাদেব ক'দিন ধবেই আহার নিদ্রা ঘুচে গেছে—ভাবনায ভাবনায মাথাব ঘিলু তাঁদেব টগবগিযে ফুটছে। তাঁদেব বউযেবা ছেলেমেযেবা অসুখেব কথা বলতে এসে বা বাজার-খবচেব তাগিদ দিতে এসে ধমক খেযে মবেছে। স্বামীদেব মনে হযেছে, কাণ্ডজ্ঞানহীনতাবও একটা সীমা থাকা দবকার।

পুলিস দপ্তবেব সকল স্তবের সকল পর্যায়েব কর্মচারীব দিশেহাবা ব্যস্ততায নাড়ী-ছাড়া ভাব একেবাবে। দমদম এবোড্রোম থেকে গভর্নরেব বাড়ি পর্যন্ত আট মাইল পথেব শান্তিরক্ষার মহড়া দিতে দিতে গলদঘর্ম তারা। লাঠিব ঘাযে কিছু একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড ঘটিযে শান্তি স্থাপন কবা ববং সহজ, কিন্তু এ-ক্ষেত্রে লাঠি হাতে থাকবে অথচ কারো পিঠ দুবমুশনো চলবে না—দেখলে রাণী কি ভাববেন। এদিকে শান্তিব খুঁটি নড়চড হলেই তো সোজা নিজেব ঘাড়ে কোপ। ভাবনা কম? ভাবনায ভাবনায মস্তিষ্ক বিকল হবাব উপক্রম। গল্প শুনছিলাম, কোন একজন মাঝাবী অফিসাবকে তাঁব নাম জিজ্ঞাসা কবতে অন্যমনস্কতায তিনি তাঁব ঠাকুবদাব নাম বলে দিযেছিলেন।

খববেব কাগজেব দপ্তবে আব এক এলাহী কাণ্ড। তুলো থেকে সূক্ষ্মতম সুতো বাব করাব মতো বাণীব বংশপঞ্জী আব দিনপঞ্জী থেকে সেখানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিস্ময়ের খোরাক আহবণ কবে খববেব হবপে সাজানোর ধুম পড়ে গেছে। বাণীব রূপ, গুণ, ঐশ্বর্য, আয়, ব্যয, বিলাস, ব্যসন, আহার, নিদ্রা, অনুচর সহচবী—সব খবব আব সকলেব খবব ইস্কুলেব তিনবাব ফেল-কবা ছেলেটাও গড়গড়িযে বলে দেবে। পরীক্ষাব খাতায় ববীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ আব দ্বাবকানাথেব সম্পর্ক বিশ্লেষণ কবতে গিয়ে যে ছেলে বাপ-ঠাকুরদা ওলটপালট কবে ফেলেছে, তাব মুখেও রাণীব ছেলেপুলে স্বামী আর বাপ-ঠাকুরদাব নির্ভুল সমাচাব শোনা গেছে।

—ভেবে দেখো, একশ হাজাবে এক লক্ষ আব একশ লক্ষয এক কোটি—

আলোচনায় আব উদ্দীপনায় ট্রাম-বাস সরগরম। অল্পবয়সী একজন বাঁয়ে ঘেঁষা নব্যপন্থী ঝাঁঝালো তর্কের সুবে বাণী সমাগমে দেশের খরচ বোঝাচ্ছিল তার সহযাত্রীকে। —গোটা দেশের এই উপোসের মুখে রাণী নিযে আসার আড়ম্বরে এক কোটি টাকা খরচ ভারতবর্ষের—ভাবতে পারো?

--এক কোটি কি মশাই! দু চোখ কপালে তুলে ঘাড বেঁকিয়ে ফোঁস করে উঠলেন সামনেব সীটের এক যাত্রী।—একুশ কোটি বলুন! এক কোটি তো মশাই গভর্নমেন্টেব আডমোড়া ভাঙতেই বেবিযে যায়!... রাণী আসা একুশ কোটিব ধাক্কা, বুঝলেন?

ট্রামেব সকলেব চোখ বক্তাব মুখের ওপর। আর, আচমকা বিডম্বনায় এক কোটিওয়ালা হাবুডুবু। ক্ষীণ প্রতিবাদ, খববেব কাগজে এক কোটি দেখেছিলাম যেন...

—ছাপাব ভুলে তাহলে এক-এব বাঁযে 'দুই'টা পডে গেছে। একুশ কোটিওযালার নিঃসংশয মন্তব্য।

—আপনাবও কিন্তু একটু ভুল হল মশাই। পাশেব আসন থেকে গুরুগম্ভীব প্রতিবাদ ছাডলেন মাঝ-বযেসী আর একজন ভদ্রলোক। বাণী আসাব ব্যাপাবে গোটা ভাবতবর্ষ থেকে আসলে খরচা হচ্ছে ছাব্বিশ কোটি; একুশ কোটি নয়—নেট এক্সপেনডিচাব টুযেন্টিসিক্স ক্রোবস—প্রমাণ চান, চলুন যে-কোনো কাগজেব অফিসে।

এক কোটি, একুশ কোটি আব ছাব্বিশ কোটিব বিতণ্ডার মধ্যে কণ্ডাক্টাব এগাবো নযা পয়সাব টিকিট কাটাব প্রত্যাশায় হাত বাডিযে সেই থেকে ঠায় দাঁড়িযে।

বুডোবা অর্ধশতাব্দীগত স্মৃতি বোমন্থন কবে একবাবের রাজা আসাব গল্প ফেঁদে বসেছেন। প্রৌঢাবা ট্রাঙ্ক থেকে তিন যুগ আগেব বেনাবসী বার কবে সঙ্গোপনে রোদে দিয়ে ঝেডে মুছে বাখছেন। এই হিড়িকে ছেলেপুলেব জন্যে নতুন এক প্রস্থ প্যান্ট জামা জুতো কবিযে নেবার জনো উঠে পডে লেগেছেন মধ্যবিত্ত ঘবণীরা। পুবনো গযনা ভেঙে নতুন কবে গডিয়েছেন অনেকে। গিন্নিবা বাণী দেখতে যাবেন শুনে অনেক প্রৌঢ চোখ কপালে তুলেছেন, আব অনেক তরুণ ঠাট্টা-ঠিসারা করেছেন। অফিস থেকে সোজা বেরিযে ও-কাজটি একেবারে সেবে বাড়ি ফেবাব বাসনা তাঁদের, এব মধ্যে ছেলেপুলে গিন্নিবা বেবিযে পডলে খানিকটা দুর্ভাবনাব কথাই।

সেই দিন। রাণী দিন। দিনটাব এব থেকে ভালো নাম আব সঠিক নাম কিছু হতে পারে না। সকাল থেকে গোটা শহর উত্তব কলকাতার পথে ভেঙে পড়েছে। শুধু কলকাতা শহর কেন, মফঃস্বল শহবেবও আধা-আধি। কি কবে কোন কোন পথ দিয়ে তাবা গন্তব্যস্থলে পৌঁছেছে সঠিক করে কেউ বলতে পারবে না। আমি অন্তত পাবব না।

আমিও গিযেছিলাম। প্রথমে নিস্পৃহভাবে নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, জনতা দেখতে যাচ্ছি, ভিড দেখতে যাচ্ছি, লোকেব হুজুগ দেখতে যাচ্ছি। লেখার কাজে লাগবে। কিন্তু সেটা সত্যের অপলাপ। আসলে আমিও রাণী দেখতেই যাচ্ছি। বাণী তরুণী, বাণী রূপসী, রাণীর কুবেবের ঐশ্বর্য, সব থেকে বড় কথা—এ রাণী রাণীই, বাজার স্ত্রী হিসেবে রাণী নয়—একেবারে সর্বপ্রধানা, স্বয়ং-সম্পূর্ণা বাণী। রাজা হলে যেতাম কিনা সন্দেহ, রাণী বলে যাচ্ছি। মনেব তলায় রূপকথার রাজ্যে যে-রাণীর অবস্থান সেই বাণী, সেই রকম রাণী।

বাস থেকে নামতে হয়েছে গন্তব্য স্থানের বেশ খানিকটা দূরে। যেখানে দু-দশটা চাপা দিয়েও আর বাস চলার পথ ছিল না—সেইখানে। তারপব পাযে পাযে কখন একসময় জনতার সমুদ্রে মিশে গেছি খেয়াল নেই।

না, মানুষ দেখে এমন বিস্ময় জীবনে আর কখনো অনুভব কবিনি। বাণী আসতে তখনো অনেক দেরি, এই ভিড়েব মধ্যেই নারী-পুরুষ নির্বিশেষে একে ঠেলে ওকে ফেলে কখনো-বা ভিড়েব চাপে শূন্যে উঠে প্রায় আধ মাইল পথ আমি বিচবণ করেছি আর সেই বিস্ময় উপলব্ধি করেছি। সময় লেগেছিল ঘড়ি ধবে তিন ঘণ্টা।

কি দেখেছি? মারামাবি, হুড়োহুড়ি, কথা-কাটাকাটি, পুলিসেব তর্জন গর্জন? না, এব একটাও না। লক্ষ লক্ষ মেযে-পুরুষেব এক তারে বাঁধা একটি মাত্র প্রতীক্ষার রূপ দেখেছি, রূপ উপলব্ধি কবেছি। একটা মাবামাবি হাতাহাতিও আমাব চোখে পড়েনি। পুলিসকে নিজের পেটেব কাছে লাঠি শুইয়ে জনতা ঠেকানো ছাড়া একবারও লাঠি উঁচোতে দেখিনি। ট্রামে বাসে মেযেদেব গাযে গা লাগলে যেখানে সোবগোল পড়ে যায়—সেখানে ভিড়েব চাপে চিঁড়ে চ্যাপটা হযেও অশোভন আচরণেব একটিও বামাহুঙ্কার অথবা পুরুষগর্জন কানে আসেনি! কে যে কাকে ঠেলছে সেই দিকেই চোখ নেই কাবো। আব, পকেটমাববা কি এই ভিড়েও বাণিজ্যেব লোভে আসেনি বলতে চান? এসেছিল নিশ্চয, কিন্তু পকেটমাব বলে তাদের কি হৃদয নেই, না সেই হৃদয়ে বাণীব আসন নেই? পরদিন তন্ন তন্ন করে আমি খববের কাগজ খুঁজেছি, কিন্তু বাণীদিনেব সেই জন-সমুদ্রে একটি পকেটমাবেব বিপোর্টও আমার চোখে পড়েনি। বাণী দেখাব আগ্রহে তাবাও পেশা ভুলেছিল মনে হয।

যাক, রাস্তাব দু'পাশে লক্ষ লক্ষ লোকের একতাল মানুষ, আব দু'-পাশেব বাড়ির একতলা দোতলা তিনতলাব বেলিং-এ আব ছাতের আলসেতে চোখ-ধাঁধানো বসন-ভূষণে মোড়া চাপ চাপ মেযেছেলে। কাবো কাবো ধাবণা, মাথা-পিছু দু'টাকা কবে আদায করে ওই দু'ধাবেব বাড়িব অনেক মালিক অনেক টাকা কামিযেছে সেদিন।

আমি দেখছিলাম, আব আত্মাটাকে একদিকেব ফুটপাতেব জনতার ঢেউযে ছেড়ে দিযে আত্মবিস্মৃত হযে পড়ছিলাম।

হঠাৎই বিষম একটা ধাক্কা। না, ভিড়েব ধাক্কা নয়। আত্মগত ধাক্কা।

আমাব সামনেব দু'হাতের মধ্যে যে-লোকটি সকলের মাথাব উপর দিয়ে আধ হাত গলা বাড়িযে সামনেব ফাঁকা বাস্তাটাই একবার দেখে নেওযাব জন্যে কসরৎ কবছে, তাকে আমি চিনি। আব, কলকাতা ছেড়ে গোটা বাংলাদেশেব লোক এখানে ভেঙে পড়লেও ওই একজনেব এখানে আসাব কথা নয।

আমার বহুদিনেব পবিচিত চাটুজ্জে বাড়িব বড়দা—মণিদা।

পরস্পরের দেখা হযে গেলে কে অপ্রস্তুত হবে না ভেবেই আমি তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে উল্টোদিকেব ভিড়ে ভেসে পড়লাম। আধ ঘণ্টার চেষ্টায় বেশ খানিকটা তফাতে আসা গেল। তাব পরেই একটা বন্ধ দোকানেব উঁচু ধাপেব দিকে চোখ যেতেই আবাব ধাক্কা! চোখের দোষ নেই, বেশ একটি সুশ্রী মেযে ভিড় বাঁচিযে দোকানের বন্ধ দরজায় পিঠ ঠেকিযে দাঁড়িযে ছিল।

কিন্তু আমি চমকে উঠেছি, কারণ ওই মেয়েও চাটুজ্জে বাড়ির একজন। বড়দা অন্যথায় মণিদাব ছোট বোন জয়ন্তী। আমার সঙ্গে ওই বাড়ির আত্মীয়তাব সূতোটায় প্যাঁচঘোঁচ অনেক। মাসতুতো বোনের শ্বশুরবাড়িব সম্পর্কটাকে কোনোভাবেই কাছের সম্পর্ক বলা চলে না। কিন্তু সর্বদা যাওয়া-আসার ফলে সম্পর্কটা কাছেরই হয়ে গেছে।

এবারে আব নিঃশব্দে আড়াল হওয়া গেল না। চেষ্টা-চরিত্র করে, আব, অনেকেব ভ্রূকুটি উপেক্ষা কবে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

দেখার সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তী একদফা থতমত খেয়ে উঠল। ভিড় ঠেলে উঁচু ধাপটা থেকে নেমে আসতে আসতে সামলে নিল একটু। কাছে এসে হাসতে চেষ্টা কবে কৈফিয়তেব সুরে বলল, কাণ্ড দেখুন লোকেব, এমন আটকে গেছি যে নড়াচড়াব উপায় নেই।

জয়ন্তী ইস্কুলে মেয়ে পড়ায়, উক্তিটা যে ছেলেমানুষেব মতো হয়ে গেল নিজেই বুঝেছে। ওদেব বাড়ি যেতে হলে এতটা আসতে হয় না. আটকে যাওযাবও প্রশ্ন ওঠে না। প্রসঙ্গ এড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, যাচ্ছিলেন কোথায়?

বললাম, কোথাও না, এখানেই এসেছি।

জয়ন্তী আবাবও ঢোঁক গিলল। ভিড়ের মধ্যে কয়েক পা এগিয়ে বলল, চলুন, বাড়িব দিকে যাই... কিন্তু বেরুবেন কি কবে?

একটা জায়গা দেখে দাঁড়াই চলো, এসেছি যখন দেখেই যাই।

জয়ন্তী থমকে গিয়ে মুখেব দিকে তাকালো। অপ্রতিভ হাসিব আভাস, একটু অসহিষ্ণুও।—বাড়ি গিয়ে আবাব হড়বড়িয়ে বলে দেবেন না তো?

—না।... তাছাড়া ওদিকে মণিদাও সকলেব মাথাব ওপব দিয়ে ঘাড় উঁচিয়ে দেখাব চেষ্টায় গলদঘর্ম হচ্ছে দেখলাম।

শুনে জয়ন্তী ঘুবে দাঁড়ালো একেবারে।—বড়দা? কই?

এখান থেকে দেখবে কি করে! আছে...। চলো, ওদিকে চলো—

বিস্ময় কাটিয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত মনে আবাব সামনের দিকে এগলো সে। একটা অপবাধপ্রবণতাব অনুভূতি জোব কবেই বিলুপ্ত কবার চেষ্টা। বলে উঠল, আসবে না কেন, এব সঙ্গে অন্য কিছুব সম্পর্ক কি?

আমার নীববতাটুকুই সাযের মতো। দু' চোখ আপাতত দু'জনেব মতো একটু জায়গা আবিষ্কাবেব চেষ্টায় মগ্ন।

এবারে একটু পূর্ব কথা বলে নেওয়া দরকার। জয়ন্তীব ওপবে তিনটি দাদা—ও-ই সকলের ছোট। ওদেব বাবা বিপ্লবী হবিশ চ্যাটার্জীব আপন বড় ভাই। ইংরেজ শাসনে যে হরিশ চ্যাটার্জীর প্রায় তিরিশ বছব আগে ফাঁসি হয়ে গেছে। জয়ন্তী ছেড়ে জয়ন্তীর ছোড়দাও জন্মায় নি তখনো। তাহলেও সেই কাকাব আত্মাহুতির এক নিবিড় স্পর্শেব মধ্য দিয়ে বড় হয়েছে ওই বাড়িব সবক'টি ছেলে মেয়ে। কাকীমা আছেন, তাঁর বয়েস পঞ্চাশ ছাড়িয়েছে। ওই বাড়ির তিনিই শুচিশুভ্র আদর্শ। ভাই বোন সকলেরই ওই কাকীমা-অন্ত-প্রাণ. তাঁরই প্রভাবে মানুষ ওরা। কাকীমা পূজা-আহ্নিক করেন, সেই ঘরে দেবতার পাশেই বিপ্লবী স্বামীব ফোটো। বোজই মালা দেওযা হয় ফোটোতে।

জয়ন্তীরা ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুর প্রণাম যত না করে, কাকার ফোটোতে প্রণাম করে তার থেকে বেশী। কাকীমাও বলতে গেলে দিবারাত্রি ওই ঠাকুরঘরেই থাকেন, ঠাকুরঘরের মেঝেতে শোন।

হরিশ চ্যাটার্জীব ফাঁসির পব ও-বাড়িতে কোনো বিলিতি সামগ্রী ঢোকা দূরের কথা, বিলিতি বাতাসটুকু পর্যন্ত ঢুকতে পায়নি। আজও না। সেবাবে কাকীমাব অত বড় অসুখটাতেও এক ফোঁটা বিদেশী ওষুধ চলেনি। কাকীমা বলেছেন,. মরবই তো একদিন তাতে কি, কিন্তু তোরা মারিস না।

মনের জোরে কাকীমা কবিরাজী চিকিৎসাতেই সেবে উঠেছিলেন।

বাণীর আসার ব্যাপারে আমি ওই এক বাড়িতেই শুধু আলোচনা শুনিনি। সকলকেই নিস্পৃহ, নিবাসক্ত দেখেছি। ঠিক তাও নয, উল্টে যেন সকলেব মনেব তলায এক ধরনের গাম্ভীর্য থিতনো দেখেছি।

বাণী এলেন। বাণী চলে গেলেন। জনতাব অভ্যর্থনার উল্লাস আকাশে গিয়ে ঠেকল। শৃঙ্খলাবদ্ধ জনতা বাঁধভাঙা বন্যাব মতোই তারপব আলোড়িত হযে উঠল। তার ভিতব দিযে পথ কবাব চেষ্টাও বিপজ্জনক।

বাণীদর্শনতৃপ্ত একটু-আধটু আলোচনা কানে আসছে। বাণীব রূপেব ব্যাখ্যা, পঁযত্রিশ বছর বয়েস, তিনটি ছেলেমেযেব মা—অথচ দেখে মনে হয বাইশ বছবেবটি—না জানলে বিবাহিত কিনা বোঝা শক্ত—বাণীর পরনে কি ছিল, কোন দিকে তাকিয়েছিলেন বাণী, কাব চোখে চোখ পড়েছে, এই ভিড আব এই অভ্যর্থনা দেখে রাণীর কতটা খুশি হওযা সম্ভব, রাণীব স্বামী ওই ফিলিপ ভদ্রলোক বেচাবী না ভাগ্যবান, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আবো ঘণ্টাখানেক পবে পাশাপাশি জযন্তীদেব বাড়িব দিকে চলেছি। একটু সহজ হবাব জন্যেই বোধহয জযন্তী জিজ্ঞাসা কবল, কেমন দেখলেন?

বললাম্, তোমাব থেকে সুন্দব নয ভাবতে চেষ্টা কবছি।

আ-হা, একটু খুশি হযে ও মন্তব্য কবল, আমি ওব তুলনায পেত্নী।

কিন্তু আমাদেব হালকা হবাব চেষ্টা ব্যর্থ। বাড়ির কাছাকাছি যে দু'জন ঘুবে দাঁড়িয়েছে, তাবা জযন্তীব মেজদা আব ছোড়দা। এক নজব তাকিযেই বোঝা গেল, তাবাও যেখান থেকে আসছে, আমবাও সেখান থেকেই। কিন্তু কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করল না। জযন্তীর ছোড়দা শুধু চোখেব ইশাবায পিছনেব দিকটা দেখিযে দিল। আমবা ঘাড ফিরিযে দেখি, পায়ে পাযে এগিযে আসছে মণিদাও। ওদেব বড়দা।

তাব শুকনো মুখে অপ্রতিভ হাসিব আভাস। কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু সেও বাণী প্রসঙ্গ তুলল না, বা কিছু জিজ্ঞাসা করল না। শুধু দৃষ্টি বিনিমযেই চাব ভাইবোনের মধ্যে একটা নীরব প্যাক্ট হযে গেল যেন। তারপব ভাইদের আমার দিকে চোখ পড়তেই জযন্তী তেমনি নিঃশব্দ ইশারায় আশ্বস্ত কবল, এ-দিক ঠিক আছে।

দোতলায় উঠেই সিঁড়ির পাশে কাকীমাব পুজোর ঘর। সন্ধ্যার মুখ তখন। মুখ হাত ধুয়ে কাকীমা এ-সমযটা আধঘণ্টা খানেকের জন্য বৈকালিক জপে বসেন। আজও বসেছেন।

কাকীমা সকলকে একে একে তাঁর ঘরটা অতিক্রম করতে দেখলেন। আমার দিকে চোখ পড়তে প্রসন্ন আহ্বান জানালেন, এসো, খবর ভালো তো?

আমি ঘাড় নাড়লাম। নিজেব অগোচরে কাকীমার স্বামীর ফোটোখানার দিকে চোখ গেল। ফোটোব গলায প্রতিদিনেব মতই টাটকা মালা। ঘাড় ফিবিযে দেখি, জয়ন্তী আর তার দাদারাও অদূরে দাঁড়িয়ে গেছে। সশঙ্ক, অপরাধী দৃষ্টি।

খুব সাদাসিধেভাবেই কাকীমা জিজ্ঞাসা কবলেন, রাণী দেখে এলে বুঝি?

এমন বিড়ম্বনায় জীবনে পড়িনি বোধহয়। আমি যে বাণী দেখে এলাম সে কি আমাব মুখে লেখা ছিল? কিন্তু এই ঘবেব দোবগোড়ায দাঁড়ালে সত্যি জবাব যা সেটা আপনিই মুখ দিযে বেরিয়ে আসে। নিজেব অগোচবেই বলে ফেললাম. হ্যাঁ—। তাবপর শুকনো হাসি. আমার তো লেখা-টেখাব ব্যাপারে দেখতেই হবে।

তেমনি সহজ সবল কৌতূহলে কাকীমা আবার জিজ্ঞাসা কবলেন, কেমন দেখলে?

হঠাৎ কি যে হল কে জানে। অকাবণ জোব আব অকারণ উৎসাহভবে বলে ফেললাম, চমৎকাব, এত সুন্দব আগে ভাবিনি।

তাই নাকি। কাকীমাব প্রসন্ন বিস্ময। তাবপব ভাশুরঝি আব ভাশুবপোদেব নির্বাক মুখেব দিকে চোখ পড়ল।—ওবা কিছু বলছে না যে, ওদেব ভালো লাগেনি বুঝি?

বোন আব ভাইযেবা বিমূঢ কয়েক মুহূর্ত। ধবা পড়ে হঠাৎ কাকীমাব ওপরেই যেন সব রাগ গিযে পড়ল জয়ন্তীব। এক পা এগিযে এসে তবল উদ্দীপনায় বলে উঠল, খুব ভালো লেগেছে কাকীমা, কত সুন্দব ভাবতেও পারবে না, দেখলে চোখ ফেবানো যায না. একসঙ্গে যেন লক্ষ্মী সবস্বতী।

সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে তাব ছোড়দা তেমনি ছদ্ম আগ্রহে যোগ দিল. খববেব কাগজের ছবিতে যেমন দেখো তাব থেকে অনেক সুন্দব—কাগজে কিছুই ওঠে না।

আমাব তীক্ষ্ণ দৃষ্টি কাকীমাব মুখেব ওপব। কিন্তু সেই মুখে কৃত্রিমতাব আভাসও চোখে পড়ল না। সহজ সবল কৌতূহল। দেখে সকলে খুশি হযেছে তাইতেই খুশি যেন। প্রসন্ন মন্তব্য, হবাবই কথা, সুন্দরেব গুষ্টি ওবা শুনেছি—আ-হা. বেঁচে থাক—

জয়ন্তীকে বললেন, মুখ হাত ধুয়ে ওদেব খেতে দে, নিজেও খেযে নে—খিদেয মুখ চোখ বসে গেছে সব।

জপে মন ফেবানোব জন্যে ঘুবে বসলেন।

আমবা নির্বাক। মুখ চাওযা-চাওযি কবছি। ইংবেজ রাজদুহিতাব উদ্দেশে কাকীমার ওই সাদাসিধে আশীর্বাদটুকু আমাদেব কানেব ভিতব দিযে বুকেব কোথায গিযে পৌছুল হঠাৎ ঠাওর করে উঠতে পাবছি না।

নিজের অগোচরে আবো একবাব তাকালাম।... অমন মাতৃত্বমণ্ডিত মুখ আব যেন দেখিনি আমি।

আজও থেকে থেকে মনে হয়, ভারতবর্ষ দেখতে এসে রাণী ভারতবর্ষের জনতা দেখে গেলেন শুধু, আর ভারতবর্ষেব ভূগোল-পথে বিচবণ কবে গেলেন। ভারতবর্ষ দেখতে পেলেন না।

ফল

ট্রেনে ওঠা মাত্র লোকটার দিকে চোখ গেল তার দুটো কারণ। প্রথম, তার ছ' জনকা স্লিপার বার্থ-এর খুপরিটা আমার জানলার ধারের রিজার্ভ বেঞ্চের নাক বরাবর। দ্বিতীয় কারণ, বাস্তসমস্ত পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে তার অসহিষ্ণু চিৎকার চেঁচামেচি। জিনিসপত্র গোছগাছ করা আর শয্যা বিছানোর দ্রুত চেষ্টার ফাঁকে বউটা অজ্ঞাত অপরাধে বার দুই ধমক খেল, আর ছেলে-মেয়ে ক'টা বার তিনেক তাড়া খেল। আমার ধারণা, এর সবটুকুই ট্রেনে ওঠার উত্তেজনার দরুন।

মিনিট দশেকের মধ্যে শোয়া এবং বসার পরিপাটি ব্যবস্থা করে আধময়লা রুমাল বার করে ঘাম মুছতে মুছতে লোকটা নিজেই আগে বসে পড়ল। তারপর কর্কশ গলা যথাসম্ভব মোলায়েম করে আহ্বান জানালো, কই গো, বোসো না।... এই ছেলে-মেয়েগুলো, তোরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন, এখন বসতে পারিস না?

হুকুম পেয়ে হুড়মুড় করে প্রথমে ছেলে-মেয়ে চারটে যে-যার পছন্দমতো জায়গা দখল করল। দুটো ছেলে দুটো মেয়ে। তাদের বয়েস বারো থেকে ছয়ের মধ্যে। তাদেরও চোখে মুখে ট্রেনে ওঠার উত্তেজনার ছাপ। বউটির মুখ দেখা গেল না ভালো করে, ভুরুর নিচে পর্যন্ত ঘোমটা টানা। একটু রোগা ধরনের। যতটুকু দেখা গেল গায়ের রঙ ফরসাই মনে হল। বসার আদেশ পেয়ে সেও এগিয়ে গিয়ে ওধারের জানলার কাছে গুটিসুটি হয়ে বসল। লোকটি আবার উঠে দাঁড়িয়ে সমনোযোগে দ্বিতীয় দফা জিনিসপত্র পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

লোকটির বয়েস বছর ছেচল্লিশ সাতচল্লিশ হবে। সঠিক অনুমান করা শক্ত, কারণ সমস্ত মুখে বসন্তের দাগ। দাগগুলো বেশ গভীর আর সংখ্যায় অগুণতি। পরনে কালো চওড়া পাড়ের ধুতি, গায়ে প্রায় হাঁটুছোঁয়া কোঁচকানো সিল্কের পাঞ্জাবি, মাথার চুল বেশ পাট করে আঁচড়ানো।

আমার বেঞ্চে দুটি তরুণ সাহিত্যিক বসেছিল। তারা আমাকে তুলে দিতে এসেছে। আমার প্রতি তাদের সবিনয় হাব-ভাব দেখে হোক বা যে-কারণেই হোক লোকটি আমাকেও বার দুই পর্যবেক্ষণ করে নিল। তারপর ও-দিক ফেরা রমণীটির উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ল, পান খাবে নাকি গো?

জবাবে তার মাথা দু'পাশে নড়ল একটু। অর্থাৎ খাবে না।

—এনে তো রাখি। এই তোরা চুপচাপ বসে থাকবি, খবরদার জায়গা ছেড়ে উঠবি না।

শেষের অনুশাসন ছেলে-মেয়েগুলোর উদ্দেশে। পান আনতে গেল। একটু বাদে আমি ঘড়ি দেখলাম। ট্রেন ছাড়ার সময় হয়েছে। তরুণ সাহিত্যিক দু'জন বিদায় নিয়ে নেমে যেতেই ঘণ্টা পড়ল। লোকটা তখনো উঠল না দেখে বউটির চকিত মুখখানা একবার এদিকে ঘুরল, তারপর একটা ছেলেকে সরিয়ে সে জানলার দিকে ঝুঁকল।

ট্রেন ছাড়ার আগেই লোকটা নির্বিঘ্নে উঠল আবার। হাতে পানের ঠোঙা। তারপরেই আমি অবাক। এক-গাল হেসে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।—পান খাবেন স্যর?

সৌজন্যেব খাতিবে হেসে মাথা নাড়লাম, খাই নে।

তাড়াতাড়ি সিল্কেব জামাব পকেটে হাত ঢোকালো।—সিগাবেট?

আবারও মাথা নাড়লাম। তাও চলে না।

পবক্ষণে 'সাব' থেকে একেবাবে 'মশাই'যে অবতবণ।—পান না সিগাবেট না. আপনি কেমনতব সাহিত্যিক মশাই। সঙ্গে সঙ্গে এক-গাল হাসি। আপনাব পবিচয আপনাব সঙ্গেব ওই ছেলে দু'টিব কাছ থেকে জেনে গেছি... একজন মহাশয ব্যক্তিব সঙ্গে চলেছি, বড সৌভাগ্য আমাব।

বলেই বেশ একটু উত্তেজনা-মেশানো আনন্দ নিয়ে খুপবিব মধ্যে ঢুকে গেল। বউযেব হাতে পানেব ঠোঙা চালান কব. ' ফাঁকে চাপা গলায কি বলল ট্রেনেব ঘডঘড শব্দে শোনা গেল না। বউটি সন্তর্পণে এদিকে একবাব মুখ ফেবালো।

লোকটা তক্ষুণি আমাব বেঞ্চ-এব সামনে ফিবে এলো আবাব। বসন্তেব দাগভবা মুখ খুশিতে ভবাট তেমনি।

—আপনাদেব মত গুণীজনেব সঙ্গে দুটো কথা বলাব সৌভাগ্য হল, বড আনন্দ পেলাম। বসি একটু, আপনি বিবক্ত হবেন না তো?

—না না, বসুন। আপনি যাবেন কোথায?

—বেনাবস। পাশে বেশ জাঁকিযে বসল। জন্ম বযসেব কম্ম. কোথাও তো বেরুনো হয না... সেই কবে বসন্ত হযে পটল তুলব-তুলব কবছি. বউটা তখন বাবা বিশ্বনাথেব চবণে মাথা খুঁডেছিল, এত বছব বাদে বাবা টেনেছেন—পডলাম দুর্গা বলে বেবিযে। ...তা আপনি তো লক্ষ্ণৌ চলেছেন শুনলাম?

—হ্যাঁ।

উৎসুক দু' চোখে আমাকে পর্যবেক্ষণ কবল একটু।—হ্যাঁ মশাই, আমি শুনেছিলাম. আজকালকাব সাহিত্যিকবা কলম ধবলেই পযসা, অঢেল বোজগাব কবে এক-একজনে... আপনাব তো তাব ওপব একগাদা বই-পত্র, আমাব বউ পাড়াব লাইব্রেবি থেকে এনে এনে পড়ে, ভালো লাগলে আমাকে গল্প শোনায—আপনি ফার্স্ট ক্লাসে না গিযে আমাদেব মত স্লিপাবে চলেছেন যে?

বললাম, আমাব এতেই সুবিধে হয, তাছাড়া আপনাদেব মত দু-পাঁচ জনেব সঙ্গে আলাপ পবিচযও হয।

—তাই বলুন. আলাপ পবিচয না হলে লিখবেন কি কবে। কিন্তু... থাক. নিন্দে কবব না। ঘুবে খুপবিব দিকে তাকালো।—এই তোবা ফল খা না—শুনছ। ওদেব ফল বাব কবে দাও. আব এখানেও পাঠাও।

আমি বাধা দিতে যাচ্ছিলাম. কিন্তু তাব আগেই বাপেব হুকুম পেযে ছেলেবা বেঞ্চিব তলা থেকে যে বিশাল ঝুড়িটা টেনে বাব কবল তাব কাপডেব ঢাকনা সবাতে আমাব চক্ষুস্থির। অতবড ঝুড়িটা ফলে ঠাসা। বড বড আপেল, ন্যাশপাতি. বেদানা. আঙুব, কলা, খেজুব, আবো কত কি। বাসি বা শুকনো নয, লোভনীয বকমেব তাজা। একসঙ্গে বিবাট ঝুড়ি ভবতি এমন ভালো ভালো ফল নিযে বেরুতে আর কাউকে দেখি নি।

ছেলে-মেয়েরা যে-যাব খুশিমত ফল তুলে খেতে লাগল। এর মধ্যে বউটিকে কিছু বাছা ফল তুলে নিয়ে বেশ করে ধুয়ে দুটো ডিশে সাজাবার উদ্যোগ করতে দেখে আমি তাকে শুনিয়েই বললাম, ওঁকে বারণ করুন, অসময়ে আমি কিছু খাব না।

—ফলের আবাব সময অসময কি। আপনি খাবেন, ওই ফলেব ভাগ্যি। দাও গো, তুমি দাও!

উঠে গিয়ে নিজেই ফলের ডিশ দুটো নিয়ে এলো। আমি সত্রাসে আবাবও বাধা দিলাম, এত ফল কেউ খেতে পারে।

—খুব পাবে, গল্প কবতে কবতে খান, দেখবেন ফুবিয়ে গেছে, হেঁজিপেঁজি ফল তো নয়! বলতে বলতে নিজে আডাইশ' গ্রামের একটা আপেল তুলে নিয়ে কামড় বসালো।

অগত্যা ফলাহাবে মন দিয়ে আমি বললাম, আপনার নামটি জানা হল না এখনো।

—আমাব নাম বামতাবণ, রামতারণ ঘোষ। সাগ্রহে আমার দিকে ঝুঁকল একটু। —এককালে আমি দেড় মাসেব জন্য পাবলিশার হয়েছিলাম, বুঝলেন, দেড মাসে হাজার টাকা লোকসান। তাব আগে কলেজ স্ট্রীটে জুতোব দোকান ছিল, সেই জুতোব দোকান তুলে দিয়ে বাতারাতি পাবলিশাব—টেকে কখনো।

আমি হতভম্ব। জুতোব দোকান থেকে পাবলিশাব।

আপেল চিবুতে চিবুতে সলজ্জ জবাব দিল, আর বলেন কেন, কপালে ভোগান্তি থাকলে খণ্ডাবে কে।... যাক সে কথা। আপনাদেব মতো দু-একজন সাহিত্যিকেব সঙ্গে আমাব খুব আলাপ কবাব ইচ্ছে ছিল অন্য কাবণে।

আমি জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকালাম। বামতাবণ ঘোষ চট কবে একবাব ঘুবে খুপরিব দিকে তাকালো। তাব বউ বাইবেব দিকে ফিবে বসে আছে। আবো ঘন হয়ে বসে একটু গলা খাটো করে সে বলল, আচ্ছা মশাই, আপনারা যে এত ঝুড়ি-ঝুডি প্রেমেব গল্প লেখেন, এমন সব মেয়েব কথা লেখেন যা পড়ে রাতে ভালো ঘুম হতে চায় না—তার মধ্যে কোথাও সত্যি কিছু আছে, নাকি সব ফানুস?

ভিতবে একটু নডবডে অবস্থা আমাব। জিজ্ঞেস কবলাম, কেন বলুন তো? আপনি নিজে বুঝি কখনো প্রেমে পডেছিলেন?

সচকিত।—ঐ যাঃ, আপনি ঠিক ধবেছেন। কিন্তু আমাব প্রেম তো আকাশে উঠে ফানুসেব মত ফটাস কবে ফেটে গেল, শুধু ফেটে গেল না, আগুন ধরে গেল —কিন্তু আপনাদেব প্রেমেব গল্পে সে-বকম বিতিকিচ্ছিবি কাণ্ড তো একটাও ঘটতে দেখি না।

প্রশ্ন চাপা দিয়ে তাব ফানুস-ফাটা প্রেমেব কাহিনী শোনাব লোভ আমার। জবাব দিলাম, ও গল্পে অনেক ভেজাল অনেক জোড়াতাপ্পি থাকে... আপত্তি না থাকলে আপনার ব্যাপারটা শুনতে ইচ্ছে কবছে।

বসন্ত-গুটিব ছোপ-ধরা মুখে এবাবে সত্যিকারেব লজ্জাব কারুকার্য দেখলাম। বলল, আমার প্রাণান্ত দশাই হয়েছিল, কিন্তু শুনলে আপনি ভযানক হাসবেন।

আমি মাথা নেড়ে আশ্বাস দিলাম, হাসব না। শেষে দেখা গেল আমার শোনার আগ্রহ থেকে তার বলার আগ্রহ কম নয়। রাত প্রায় সাড়ে-ন'টা পর্যন্ত দু'-তিন দফায় সে আমাকে যে বাস্তব কাহিনীটা শোনালো তার বহু শাখা-প্রশাখা পত্র-পল্লব বাদ দিলেও সেটা বর্ণশূন্য মনে হবে না বোধহয়। কিন্তু কাহিনীটি এমন যে সেটুকুও হুবহু তার নিজের ভাষায় ব্যক্ত করলে বর্ণবৈচিত্র্য আরো বাড়বে বলেই বিশ্বাস।

'বুঝলেন মশাই, আমি যাকে বলে আসল প্রেমে পড়েছিলাম সেই উনিশ বছর বয়সে। মল্লিকা দত্তর বয়েস তখন বছর ষোল। তার আগে একটা প্রেমভাব চলছিল আমার বছর দুই-তিন ধরে—মল্লিকা যখন স্কার্ট-ফ্রক পরে বেণী দুলিয়ে স্কুলে যেত —তখন থেকে। ঠিক সেই সময় আমি আমাদের ভাঙাচোরা বাড়ির সামনের গলির মুখে দাঁড়িয়ে থাকতাম। আমার ঠাকমার যখন শ্বাস-কষ্ট উপস্থিত, আর বাড়ির লোকের সঙ্গে আমি হাপুস নয়নে কাঁদছি—তখনো ঘড়িতে ঠিক সাড়ে ন'টা বাজতে চোখ মুছতে মুছতে গলির মুখে ছুটে না এসে পারিনি। ও বেণী দুলিয়ে চলে যেতে ঘরে ফিরে এসে সকলের সঙ্গে মড়া-কান্না কেঁদেছিলাম।

'হঠাৎ একদিন দেখি ও ফ্রক ছেড়ে শাড়ি ধরেছে। আর তখনি আমার মুণ্ডু ঘুরে গেল। ষোল-ছোঁয়া একটা কাঁচা সুর যেন ওর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে। ওদের বাড়ি আমাদের গলির সামনের যে রাস্তাটা ঘুরে নাচের ঢঙে বেঁকে গেছে—সেই রাস্তার শেষের মাথায়। আমাদের গলির মুখ থেকে মিনিট পাঁচেকের পথ। স্কুল যেদিন বন্ধ থাকত সেদিন কম করে বার পঞ্চাশেক আমি ওদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাতায়াত করতাম।

'মল্লিকাকে ভালবাসার পর থেকেই আমার জীবনে একটা ম্যাজিক হয়ে গেল। কুড়ি বছর বয়সে সেবারে আমি থার্ড ডিভিশনে স্কুল ফাইন্যাল পাস করে ফেললাম। তার আগে মশাই চার-চারবার ঘোল খেয়েছি, বুঝলেন—সেবারে পাস। অবশ্য মল্লিকা দত্তও সেবার স্কুল ফাইন্যাল দিচ্ছে জানতুম, তাই সেই প্রথম ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যেন পাস করি। সেই পাস করলাম, আমি থার্ড ডিভিশন, মল্লিকা সেকেণ্ড ডিভিশন।

'ভিতরে ভিতরে আমার একটা ভূমিকম্পের মত পরিবর্তন হয়ে গেল। আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, এবার থেকে ভয়ঙ্কর রকমের ভালো ছেলে হব। বিছানায় চিৎপাত হয়ে কল্পনায় দেখতাম, মল্লিকাকে আমি পড়াচ্ছি, সাহায্য করছি—আর মল্লিকা আমার দিকে মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছে।

'কিন্তু বাদ সাধল আমার বাবা। হার্টের ব্যামো ধরিয়ে বসল। চিঁচিঁ করে আমায় হুকুম করল, আর বিদ্যেয় কাজ নেই, ঢের হয়েছে—কাল থেকে গিয়ে দোকানে বোসো।

'ভাবুন একবার আমার অবস্থাখানা। কোথায় আকাশে সাতরানো প্রেম আর কোথায় কলেজ স্ট্রীটের ঘুপচির মধ্যে জুতোর দোকান। বিশ্বাস করুন, আত্মহত্যা করার জন্য ক'বার যে আমি বাড়ির ভাঙা কার্নিসের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, ঠিক নেই।

'সেই জুতোব দোকান নিযেই পডতে হল। সকালে বেবোই, বাতে ফিবি। চাব মাসেব মধ্যে কতগুলো অঘটন ঘটল। প্রথম, মল্লিকাব বাবা বাড়ি বদল কবল। আমাব মাথায পব-পব দু'বাব আকাশ ভাঙল। সর্ববক্ষা, আমাব তিনটে দিদিব বিযে বাবা আগেই দিযে গেছল। আমি তখন মাযেব সবেধন নীলমণি।

'এবও মাস আষ্টেক বাদে আমাব হৃৎপিণ্ডটা বেদম জোবে লাফিযে উঠল একদিন। মল্লিকা আমাব দোকানে এক দুপুবে জুতো কিনতে এলো। আমাব বুকেব মধ্যে তখন এই ট্রেন ঝাঁকানিব মত ঝাঁকানি, বুঝলেন! হ্যাঁ, নিজেব হাতে জুতো পবালাম তাকে —কত জোড়া যে পবালাম ঠিক নেই। যত অপছন্দ ততো খুশি আমি, বাব বাব ওই সুন্দব দুটো পাযে হাত ছোঁযাতে পাবছি। আপনাদেব কোনো গল্পেব কোনো প্রেমিক এভাবে নাযিকাব পাযে হাত দিযেছে কোনোদিন?

'জুতো পছন্দ কবিযে শেষে কেউ শুনতে না পায এমন কবে জিজ্ঞাসা কবলাম, চিনতে পাবলেন? জবাবে সে হাঁ কবে মুখেব দিকে চেযে বইল। আমি তখন নিজেব বাড়িব ঠিকানা বললাম, ও কোন বাড়িতে থাকত বললাম, ওব নাম বললাম, ওব বাবাব নাম বললাম। গলিব মুখে আমাকে দাঁড়িযে থাকতে দেখে যেমন মিটিমিটি হাসত, তেমনি হাসতে লাগল মল্লিকা। আমি ধবে নিলাম চিনতে পেবেছে, এবং আগে পাবেনি বলেই লজ্জা পাচ্ছে। যে দামে সে জুতো নিযে চলে গেল, দেখে দোকানেব কর্মচাবীবা হাঁ। আমাব পব পব তিন বাত ঘুম হল না।

'এব পবেব দেখা ওই কলেজ স্ট্রীটে, আড়াই বছব বাদে। আমাব মা তখন স্বর্গে গেছে। আব আমি একটা বড দাঁওযে নডবড়ে জুতোব দোকান বেচে দেবাব মওকা খুঁজছি। বেচতে পাবলে কি কবব তখনো ঠিক কবে উঠতে পাবিনি। পাশেব বইযেব দোকানেব ছোকবা মালিকটিব সঙ্গে দাঁড়িযে গল্প কবছিলাম। হঠাৎ আমাব সর্বাঙ্গে ঝাঁকুনি। দেখি বইপত্র বুকে চেপে মল্লিকা দত্ত বইযেব দোকানগুলো দেখতে দেখতে চলেছে। আমাব আলাপী ছোকবাটি তাকে দেখিযে যে টিপ্পনী কাটল শুনে আমাব ভেতবটা কি-বকম যেন হযে গেল। বইযেব দোকানেব ছোকবা হেসে হেসে যা জানালো তাব সাবমর্ম, ওই মেযেটিব নাম মল্লিকা দত্ত, এম এ পড়ে। নানা কাগজে তাব কিছু কবিতা ছাপা হযেছে। এখন কবিতাব বই ছাপাব বাই চেপেছে মাথায। সেই সব ছাপা কবিতা আব বাঁধানো একখানা কবিতা ভবতি খাতা নিযে সমস্ত পাবলিশাবেব দোবে দোবে ঘোবে। তাব দোকানেও নাকি দু'দিন এসে কবিতাব বই ছাপাব জন্য ঝকাঝকি কবে গেছে।

'ভিতবে আমাব তখন কি-যে হচ্ছিল আমিই জানি। মল্লিকাকে তখনো দেখা যাচ্ছিল। আমাব দু' চোখ জুড়িযে যাচ্ছিল আব সেই সঙ্গে আধা-গোচব একটা সংকল্পে বুকেব ধুকপুকুনি বাড়ছিল। এব ঠিক চাব দিনেব মধ্যে 'দাঁওযে'ব অনেক কম টাকায জুতোব দোকান বেচে দিলাম। দেনাপত্র চুকিযে হাতে পেযেছিলাম মাত্র সাড়ে পাঁচ হাজাব। কলেজ স্ট্রীটে তখন জলেব দবে ঘব পাওযা শক্ত নয। চল্লিশ টাকায সেদিনই একটা খুপবিঘব ভাড়া নিলাম। আব তাব সাত দিনেব মধ্যে আমাব কাঠেব ব্যাক, কাচেব ব্যাক, সামনেব কাউন্টাব, ঝকঝকে সাইন বোর্ড বেডি। আমি তখন কল্প-ভাবতী

বুক-সেলার অ্যান্ড পাবলিশারের একমাত্র মালিক। দোকানের সামান্য আসবাবপত্রের জন্য আমার সেদিনে খরচ পড়েছিল চারশ' নব্বুই টাকা, বাজার থেকে চালু বই কমিশনে দোকান সাজাতে আরো খরচা হয়েছিল ছ'শ' চল্লিশ টাকা। তাছাড়া পাখা লাইট ইলেকট্রিক ইত্যাদির দরুন আরো বেরিয়ে গেছল ধরুন একশ পঁচিশ টাকা। তখন পর্যন্ত মোট খরচ দাড়ালো গিয়ে তাহলে বারো শ' পঁচানব্বুই টাকা। কিন্তু আমার উদ্দীপনা তখন এত প্রবল যে অচিরে আমি বাংলা দেশের সব থেকে বড় পাবলিশার হয়ে বসবই তাতে একটুও সন্দেহ নেই।

'কুড়ি টাকা মাইনের সদ্য নিযুক্ত ছোকরা চাকরটার হাতে দোকান ছেড়ে দিয়ে আমি গেলাম য়ুনিভার্সিটির দোরে ধরনা দিতে। প্রথম দিন দেখা হল না, দ্বিতীয় দিনে বেলা বারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থেকে পায়ের সুতো যখন ছেঁড়ে ছেঁড়ে, তখন দেখা। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে গেলাম। হেসে জিজ্ঞাসা করলাম, 'চিনতে পারছেন?' বলা বাহুল্য, চিনতে পারল না। আড়াই বছর আগের জুতোর দোকানের সাক্ষাৎ ভুলে মেরে দিয়েছে দেখে আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম। সেই গলির বাড়ির কথা আর ওদের পুরনো বাড়ির কথা বললাম। তখনো নিস্পৃহ। তার পরেই যে কথা বললাম, তার প্রতিক্রিয়া দেখে নিজেই আমি মুগ্ধ। বললাম, অনেক কাগজে আপনার কবিতা পড়ি, আর সেই থেকে অনেক সময় ভেবেছি একবার দেখা হলে ভালো হত, নতুন পাবলিশার তো আমি... সেই থোড়-বড়ি-খাড়া ছেড়ে নতুন কিছু করতে চাই। তা আসুন না একদিন আমার দোকানে, এই কাছেই...।

'মল্লিকার সমস্ত মুখখানা উত্তেজনায় রাঙিয়ে উঠল। বিশ্বাস করবে কি করবে না ভেবে পাচ্ছে না। এবারে আমাকে চিনতেও পেরেছে মনে হল। বলল, আজ গেলে হয় না, কবিতাগুলো আমার সঙ্গেই ছিল. .

'পরম সমাদরে আমি তক্ষুনি তাকে দোকানে নিয়ে এলাম। চপ-কাটলেট আনালাম। তারপর কাব্য-জগতে নেমে কখন যে রাত হয়ে গেল, দু'জনার কারোই হুঁশ নেই। এরপর টানা একটা মাস স্বপ্নের ঘোরে কেটে গেল আমার। আমি মল্লিকার বাড়ি যাই, মল্লিকা দোকানে আসে রোজ। তার কবিতার রাশি আমার হেপাজতে— তার অনেকগুলো কবিতা আমার মুখস্থ হয়ে গেল। কেউ যদি তখন বলত রবি ঠাকুর ওর থেকে ভালো কবিতা লিখেছে, আমার সহ্য হত কি না সন্দেহ। রোজ আমরা প্ল্যান করি কিভাবে ছাপা হবে, কত অভিনব সজ্জা-বিন্যাস সম্ভব। কবিতার বইয়ের দরাজ অঙ্কের রয়েলটি আমি আগাম দিয়ে ফেললাম লেখিকাকে। দুনিয়ার পরম প্রীতিবদ্ধ যেন শুধু আমরা দু'টি প্রাণী। এই রোমাঞ্চ ভোলবার নয়।

'একটা তর-তাজা গাছকে আচমকা বাজ পড়ে ঝলসে যেতে দেখেছেন? দেখেননি? কল্পনা করুন। বিনা মেঘে বজ্রাঘাতে একেবারে জ্বলে পুড়ে ঝলসে গেলাম আমি। পর-পর দু'দিন মল্লিকার দেখা পেলাম না, তৃতীয় দিনে যখন তার বাড়ি যাব ভাবছি, ডাকে একটা বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠি পেলাম। মল্লিকার বিয়ে। আমি জ্বলে জ্বলে পুড়ে পুড়ে কবরের তলার মানুষের মতো ঠাণ্ডা হয়ে গেলাম।

'তিন দিনের মধ্যে আবার সব বেচেটেচে দিয়ে আমি মোটমাট হাজার খানেক টাকা লোকসান খেলাম। মল্লিকার কবিতার খাতাপত্র রেজিস্ট্রি করে তার বাড়ির ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম।'

এই পর্যন্ত বলে রামতারণ ঘোষ উঠে তার খুপরিতে ঢুকে ঝুড়ি থেকে দুটো আপেল তুলে নিয়ে আবার এসে বসল। একটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল,

শুকিয়ে গেছে, খান।

আমি ব্যস্ত হয়ে মাথা নাড়লাম—এত রাতে আর না। আর একবার অনুরোধ করে সে নিজের আপেলে কামড় বসালো। আমার ধারণা তার গল্প বলা শেষ হয়েছে। জিজ্ঞাসা করলাম, এখন আপনি কি করছেন?

—ফলের স্টল। ট্রাম-রাস্তার ধারে চার মাথার ওপর দোকান... বেশ ভালই চলছে। হঠাৎ বন্ধ করে চলে এসেছি, কয়েকটা দিন লোকসান খেতে হবে।... বসন্তে যাই-যাই অবস্থা হয়েছিল যখন, আমার স্ত্রী বাবা বিশ্বনাথের কাছে মানত করে বসেছিল তো। সেও আট বছর হয়ে গেল, কত আর দেরি করব—বেরিয়ে পড়লাম।... তারপর গল্পটা শুনুন—

আমি নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বসলাম।

'—সময়ে বিয়ে করলাম বটে, কিন্তু মল্লিকার স্মৃতি আমার মধ্যে ছড়িয়ে থাকল। কোথায় মল্লিকা আর কোথায় এই বউ। মোট কথা দুটো ছেলেপুলে হবার পরেও বউকে আমি ভালো চোখে দেখতাম না। বউকে এক-এক সময় মল্লিকা ভাবতে চেষ্টা করে আরো খারাপ লাগত।

'. বছর আটেক আগের কথা। বসন্ত রোগে একেবারে যমের মুখ থেকে ফিরে এলাম ছ'মাস বাদে আবার ফলের স্টলের দরজা খুলেছি। হাতে তখন একটা পয়সা নেই আমার চালু দোকান, অনেকে জানে বলেই গলাকাটা সুদে ধার দিয়েছে। আগের মতো ফলের স্টক বাড়াতে হলে মূলধন তো চাই।

'একদিন বসে আছি, টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা নাড়াচাড়া খেয়ে আমি দাঁড়িয়ে উঠলাম। আমার স্টলে মল্লিকা ফল কিনতে এসেছে। সঙ্গে একটি লোক, বোধ হয় দেওর-টেওর হবে। মাঝে চোদ্দ-পনের বছর কেটে গেছে, তবু তাকে দেখামাত্র চিনলাম। সেই মল্লিকা নয়, তবু সেই মল্লিকাই যেন। কিন্তু মল্লিকা আমার মুখের দিকে তাকায়নি, সাগ্রহে আপেল দেখছে। একেবারে অসময়ের আপেল, একমাত্র আমার স্টলে ছাড়া এ তল্লাটে আর কারো কাছে নেই। নিতান্ত অসুখ-বিসুখের দায়ে না পড়লে ও-সময়ে কেউ আপেল কেনে না। মুখ দেখে মনে হল, মল্লিকাও সেই গোছের দায়েই পড়েছে। আপেল পছন্দ হতে মল্লিকা আমার দিকে তাকালো। চোদ্দ-পনের বছর বাদে চার চোখের মিলন। চিনতে পারা দূরে থাক, আমার বসন্তের দাগে-ছাওয়া মুখ দেখে কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণার ভাব।

' "কত করে?"

'সম্ভব হলে বা আগের দিন হলে আমি হয়ত বিনে পয়সায় জোর করে আপেল গছিয়ে দিতুম। আ-হা, সেই মল্লিকার কোনো ছেলে হয়ত অসুখে ভুগছে। কিন্তু আমারও

তো সেই অবস্থা। অসময়ের আপেল, আট টাকা করে কেনা আমার, দশ টাকায় বেচি। তবু কেনা দামই বললাম।—আট টাকা কিলো।

'সঙ্গে সঙ্গে মল্লিকার মুখে প্রচণ্ড বিরক্তি।—"কম হবে না?"

'বুঝুন আমার অবস্থা। আমি জবাব দিতে পারলাম না। শুধু মাথা নেড়ে অক্ষমতা জানালাম। রাগে গজ-গজ করতে করতে মল্লিকা চার টাকা দিয়ে পাঁচশ আপেল কিনল। তার আগে তিনবার করে ওজন দেখল। আপেল নিয়ে দাম দেবার সময়ে তার আঙুলে আমার আঙুল ঠেকল। তখনো কেমন বিহ্বল অবস্থা আমার। ফলের ঠোঙা নিয়ে তারা এগলো। নিজের অগোচরে তাদের পিছনে আমিও তিন-চার পা এগিয়েছি। তারপরেই কাঠ আমি। মল্লিকার ঝাঝালো গলা, পাশের লোককে বলছে, "পাঁচশ আপেল চার টাকা, এই সব গলা-কাটা লোকগুলোকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে চাবকে গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নেওয়া দরকার।"'

আমি নির্বাক। একটু চুপ করে থেকে রামতারণ ঘোষ বলল, আট বছর আগে সেই বিয়াল্লিশ বছর বয়সে মল্লিকা-জ্বর ছাড়ল আমার। আর তার পর থেকে নিজের স্ত্রীটিকেই অন্যরকম লাগতে শুরু করল। বসন্তের দাগে-ভরা চোখে-মুখে সলজ্জ হাসি। —নিজের এই পরিবারটিকেই বেশ লাগে মশাই এখন. বুঝলেন।

বলতে বলতে জানলার ধারে ও-দিক ফেরা বউয়ের দিকে তাকালো সে।

আমার মনে হল এমন সপ্রেম দৃষ্টি আর বুঝি দেখিনি।

আপস

এটা গল্প ঠিক নয়, মনস্তত্ত্বগত হিউম্যান বিহেভিয়ারিজম বা মানবিক আচরণের একটা অতিবাস্তব নজির বলা যেতে পারে। পল্লব গুপ্ত বয়সে আমার থেকে ঢের ছোট হলেও বন্ধুস্থানীয়। দাদা বলে ডাকে কিন্তু জিভ ছুটলে মনে-মুখে লাগাম নেই। এক এক সময় ওর কথা শুনলে আমারই কানের ডগার রং বদলায়। কিন্তু ও ছেলের এতটুকু সংকোচের বালাই নেই।

এক-একজন থাকে যার স্বভাব-চরিত্রের অবাঞ্ছিত দিকগুলোও বেশ অনায়াসে বরদাস্ত করা যায়. অন্যায় করে বেড়ালেও খুব অসহ্যরকমের অন্যায় মনে হয় না। সেগুলো—দোষের ব্যাপারগুলো জানা থাকলেও তার সঙ্গ-সান্নিধ্য ভাল লাগে। পল্লব গুপ্ত সেই গোছের একজন।

পৈতৃক অবস্থা ভাল, নিজে মস্ত ফার্মের মোটা মাইনের পাবলিক রিলেশনস অফিসার। অনেকের মতে, এই চাকরিটাই ওকে আরো তরল-মতি করে তুলেছে। পকেটে সর্বদা দামী সিগার মজুত, হাতেও একটা জ্বলছেই। বড় বড় পার্টিকে বশে আনার দায় তার, সেই কারণে ওর কোম্পানির অঢেল খরচা করতেও দ্বিধা নেই —আর তাদের চিত্তবিনোদনের এই সব খরচাই হয়ে থাকে পল্লব গুপ্তর মারফত। পি. আর. ও.—পাবলিক রিলেশনস অফিসার, অতএব সে-ই হোস্ট। ফলে, বড় বড়

ড্রিঙ্ক পার্টিতে সকলের কাছে নিজেকে ইনটারেস্টিং করে তোলাটা চাকরির অঙ্গ। আর তার ফলে দস্তুরমত পানাসক্ত যে হয়ে পড়ছে এও নিজেই স্বীকার করে। নিজেই এক-এক সময় বলে, এ-শালার চাকরি থেকে কোনো একদিন রিটায়ার করার পর অবস্থাখানা যা হবে আমার, স্বভাব-চরিত্র একেবারে খেয়ে দিলে। কিন্তু এ নিয়ে ও সত্যি এতটুকু দুশ্চিন্তায় পড়েছে এ কোনদিন মনে হত না। পৈতৃক সম্পত্তি যা আছে তাতেও দুই-এক পুরুষ চোখ বুজে জাহান্নমে যেতে পারে।

পল্লব গুপ্তর স্বভাব-চরিত্রের আরো একটা দুর্বল দিক আছে। সেটা সুরূপা রমণী সংক্রান্ত। দিলখোলা হাসি-খুশি মিষ্টি চেহারার ছেলেটার মেয়েমহলেও বেশ কদর। এই ব্যাপারে বারকয়েক বিপাকে পড়তে পড়তে কোনরকমে পিছলে বেরিয়ে এসেছে। তবু মেয়েদের নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে আনন্দে কাটানোর নেশাটা ছাড়তে পারেনি। একবার এক উঠতি ফিল্ম-আর্টিস্টের পিছনে এমন মেতে গেল যে চাকরি-বাকরি শিকেয় ওঠার দাখিল। আমরাও ধরেই নিলাম ওই ফিল্ম-আর্টিস্টই ওর গলায় ঝুলল। শেষে একদিন ও এসে নিজে থেকেই বলল, বাপের পুণ্যিতে খুব কাটান দিয়ে এলাম দাদা —বারোটা বেজে গেছল আর কি।

কৌতূহল চেপে জিজ্ঞাসা করেছি, এত কি ভয়ের ব্যাপার ছিল?

—আর বলেন কেন দাদা, এমন বুদ্ধু বনে গেলাম না যে নিজেকেই রামছাগল বলে গালাগাল না দিয়ে পারলাম না। আচ্ছা দাদা, আপনার কাছেও তো এনেছিলাম একদিন, নিজেই দেখেছেন—এমন নরম-সরম মিষ্টি হাবভাব দেখলে কোন শালা না ধরে নেবে অক্ষত কুমারীটি একেবারে—আরও ভেবেছিলাম বারো ভূতে দেবে এমন একটা মেয়েকে লুটে-পুটে শেষ করে, তার আগে নিজেই পাকা-পাকি দখল নিয়ে বসি। অনেকটা এগিয়েও ছিলাম বেশ, শেষে বলে কিনা: তোমাকে ছাড়া আর আমার চলছে না—এবারে ডিভোর্স স্যুট ফাইল করা যাক একটা, খরচপত্র যা লাগে তুমিই দেবে কিন্তু বাপু। শেষে জেরায় এগিয়ে আমি তো চিত্তির—শুধু বিবাহিতা নয়, দু'দুটো মেয়ে আছে মহিলার।

—তারপর?

—তারপর আর কি, আমি বললাম, তার ডিভোর্স সহজ হলেও আমার ডিভোর্স সহজ হবে না, আমার গৃহিণীটি আঁশ-বঁটি নিয়ে তাড়া করবে দুজনকেই। আমিও বিবাহিত শুনে সে প্রথমে তাজ্জব, তারপর ঠক-প্রবঞ্চক রাস্কেল-টাস্কেল বলে বিদায় দিল আমাকে। আমি মনে মনে গঙ্গার চান সেরে সোজা আপনার এখানে, কারণ আপনি প্রকারান্তরে এগোতে বারণই করেছিলেন আমাকে।

কেন বারণ করেছিলাম সঠিক বলতে পারব না, ফিল্ম-আর্টিস্টকে নিয়ে ওর সংসারযাত্রা খুব সুনির্বিঘ্ন হবে মনে হয়নি সম্ভবত। কিন্তু ছেলেটার উপস্থিত-বুদ্ধি দেখে খুশি হয়েছি। ধাক্কা খেয়ে তক্ষুনি নিজেকেও বিবাহিত বলে চালিয়ে দিয়ে এসেছে। কিন্তু ওই গোছের আরো ছোট-খাটো দুই-একটা ধাক্কা খাবার পরেও ও-যে রমণীসঙ্গবিবর্জিত জীবন যাপন করছে, এমন নয়। এখনো অনেক সময় অনেক রকম মেয়ের সঙ্গে ওকে মেলামেশা করতে দেখা যায়। আর অম্লানবদনে নিজের এমন

সব কীর্তির কথা বলে যে সাধারণস্থলে কান গবম হবাব কথা। কিন্তু পল্লব গুপ্তব বলার ঢংটাই এমন যে না শুনে পাবা যায না—শোনার পব ধমক-ধামকেব প্রশ্ন।

এ-হেন পল্লব গুপ্ত একদিন এসে মুখ বেজাব করে বলল, এবাবে সত্যিই একটা যন্ত্রনার মধ্যে পড়ে গেলাম দাদা, কি যে কবি—

জিজ্ঞাসা কবলাম, কি ব্যাপাব—কোনো মেয়ে?

—তাছাড়া আব কি।

—আবাব ফেঁসেছ?

—ফেঁসে যাবাব জন্য এবাবে তো আমি হাঁ কবে আছি, কিন্তু সে-ভাগ্য হবে কি হবে না সেই চিন্তাতেই তো এত যন্ত্রণা। আচ্ছা দাদা, এব নামই কি প্রেম?

জবাব না দিয়ে আবাব জিজ্ঞাসা কবলাম, মেয়েটা কে, আবাব কোনো ফিল্ম-আর্টিস্ট?

—না না, সে-বকম কিছু নয—সোজাসুজি এক ভাল মধ্যবিত্ত ঘবেব মেয়ে—বলেই ফেলি আপনাকে, আমাব মাসির ভাশুবেব মেয়ে। সেই চৌদ্দ বছব বযসে দেখেছিলাম মেয়েটাকে, ভাল কবে ফিবেও তাকাইনি—তখন বিশ বছব বয়েস আমাব, আঠেরো-বিশেব শাড়ি-পবা সেই সব ডবকা ইযেব মেয়ে ভিন্ন কাবো দিকে তাকাতামই না। কিন্তু সেই চৌদ্দ বছবেব মেয়ে যে বাইশ বছব বযসে এ-বকম হয তখন কি ছাই একবাবও মনে হয়েছে। বিশ্বাস কববেন না দাদা, পাশ ঘেঁষে চলে গেলেও মনে হয গাযে এক ঝলক গবম বাতাসেব ছেকা লাগল। আব চোখে চোখ বেখে হেসে হেসে কথা বলে যখন, উঃ! এক গেলাস জল খাওযান দাদা—

হাসি চেপে জল এনে দিয়ে জিজ্ঞাসা কবলাম, তা কতদিন এই দশা চলেছে তোমাব?

—টানা দু'মাস হয়ে গেল। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে দাদা আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি। মাথাব মধ্যে বুকেব মধ্যে চোখেব মধ্যে কেবল ওই মঞ্জবী সেনই ঘুবপাক খাচ্ছে দিবাবাত্র।

—তোমাকে সে-বকম পাত্তা দিচ্ছে না?

—একেবাবে দিচ্ছে না বললেও ঠিক হবে না। হাজাব হোক বাপেব বিষযেব সুপুত্তুব হয়ে বসেছি, ভাল চাকবি কবি, নিজেব একটা ঝকঝকে গাড়িও আছে—সকলেব চোখে আমাব দাম যে কিছু আছে সেটা ও মেয়েও বোঝে। কিন্তু ওই চেহাবাপত্তর নিযে সে এই বাইশ বছব পর্যন্ত নিজেকে আগলে বসে আছে বলে তো বিশ্বাস হয না—দখলদাবিব জন্যে কে হাঁ কবে আছে জানতে পাবলে তবে তো ডুয়েল-টুয়েল লড়তে পাবি—সেটাই যে কিছু আঁচ কবতে পাবছি না। মাসিব মুখে শুনেছি, এম. এ. পাস না কবে বিযে কববে না ঘোষণা কবেছিল নাকি—কিন্তু আসলে সেটা কাউকে কিছু সময় দেবার ছল কিনা কে জানে—এবারে এম. এ. পাস করেছে শুনে আমাব বুকের প্যালপিটেশানে ধড়াস ধড়াস শব্দ হচ্ছে।... ভাল কথা, মঞ্জবীব সঙ্গে কাল কিছু সাহিত্য-আলোচনা হয়েছিল। সেই কবে ইংবেজিতে এম. এ. পাস কবেছিলাম, এতদিনে সব গুলে খেযে বসে আছি! আব বাংলা সাহিত্যেব দৌড বঙ্কিম আব শরৎ পর্যন্ত,

তাও বঙ্কিমের নায়িকার সঙ্গে শরৎবাবুর নায়িকা গুলিয়ে গেছে—কিন্তু মঞ্জরী দেখলাম আধুনিক সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে, আপনার নামও দু-চারবার করল, কি ছাই লিখেছেন খানকতক বই বার করুন তো, প্রেসটিজটা বাঁচাই—

ওর পাল্লায় পড়লে আমারই প্রেসটিজের দফারফা হবার সম্ভাবনা। কিন্তু আলমারির বইয়ের কলেবর দেখে পল্লব আঁতকে উঠল।—এ আমার পড়ার সময় হবে কখন। তার থেকে বরং দু-চারখানা বইয়ের পাঁচ-সাত লাইনের মধ্যে জিস্ট বলে দিন তাই দিয়েই সামলে নেব।

অব্যাহতি পাবার আশায় বললাম, তার থেকে তুমি বরং কিছু জানান না দিয়ে মঞ্জরী সেনকে এখানে একদিন ধরে নিয়ে এসো. সে তার ইচ্ছেমত বই বেছে নেবে'খন, আর সাহিত্যিকদের সঙ্গে তোমার যোগাযোগ আছে এও ধরেই নেবে।

ও বলল, মতলবটা ভালই দিয়েছেন। দেখা যাক।

যাবার আগে মঞ্জরী সেন সম্পর্কে আরো একটু খবর দিল পল্লব গুপ্ত। সমবয়সী মাসতুতো ভাই বলেছে. মঞ্জরী সে-রকম কোন ছেলেকে ধরে বসে আছে বলে মনে হয় না। তবে একটা ছেলে—তার নাম অনিমেষ সরকার, সে এখনো প্রায়ই ওদের বাড়িতে আসে। আগে মঞ্জরীদের পাড়াতেই থাকত সেই লোক. ভাড়া না পেয়ে বাড়িওলা কেস করে তাদের উঠিয়েছে। লোকটা রাজনীতি করত, জেল-টেলও খেটেছে। মঞ্জরী নাকি আদর্শ নিয়ে খুব মাথা ঘামায়, তাই তার কাছে এই লোকটির কদর। তাকে নিয়ে মঞ্জরীর ভবিষ্যৎ কোন পরিকল্পনা আছে কিনা সেটা অবশ্য মাসতুতো ভাই সঠিক বলতে পারল না। ওদের বাড়ি গিয়ে সেই অনিমেষ সরকারকে মঞ্জরীর সঙ্গে কথা বলতেও দেখেছে পল্লব—একদিন নয়, দুদিন দেখেছে। আর তারপর থেকে গুণ্ডা লাগিয়ে খতম করা যায় কিনা সে-কথাও ভাবছে।

সব মিলিয়ে বোঝা গেল মঞ্জরী সেন নামে একটা মেয়ের জন্য পল্লব গুপ্তর এখন আহার-নিদ্রা ঘুচতে বসেছে।

সত্যিই মঞ্জরীকে একদিন বাড়ি নিয়ে এলো সে। আর আমারও ভালই লাগল। রূপসী না হোক বেশ সুন্দরীই বটে। আর সমস্ত মুখে ভারী একটা লাবণ্য মাখা। আমি পল্লবের প্রশংসা করলাম খুব, আর খানকতক বইয়ে তার নাম লিখে দিলাম। পরদিনই পল্লব লাফাতে লাফাতে এসে হাজির।

—দাদা, কাল আমার প্রেসটিজ যে কি বেড়ে গেছে ভাবতেই পারবেন না—বেরিয়ে এসে আমাকে চোখ রাঙালো, এ-রকম একজন লোকের সঙ্গে এত খাতির আমাকে কক্ষনো বলেননি পর্যন্ত। দাদা, আপনি যে এ-রকম একজন লোক সে তো আমিও এই প্রথম শুনছি।

আমার হাসিই পাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলাম, অনিমেষ সরকারের খবর কি?

হেসে হেসে পল্লব বলল, অনিমেষ সরকারের?—তার খবরও মাসতুতো ভাইয়ের মুখে যা শুনলাম আশাপ্রদ। আমার বরাত-গুণে লোকটা নিতান্ত গরীব—আর এরই মধ্যে নাকি কতগুলো ছোট ছোট ভাই-বোন রেখে তার বাবা মারা গেছে—বাবার বদলে অনিমেষ সরকার গেলে আরো একটু খুশি হওয়া যেত। তবে আর একটা ভাল খবর

শুনলাম, মঞ্জবীব মা নাকি সাংঘাতিক গবীব ঘবেব মেয়ে ছিল, রূপেব জোবে সুখেব ঘবে এসেছে। তাই মেয়েব কোন গবীব ছেলেব সঙ্গে চেনা-জানা আছে শুনলেও নাকি ত্রাস তাব। এই কাবণেই অনিমেষ সবকাবকে মা দুচক্ষে দেখতে পাবে না। আব মাসতুতো ভাই বলে মঞ্জবীও গবীবানা চালে থেকে অভ্যস্ত নয়—যতই স্বদর্শ আদর্শ করুক।

এবপব পল্লব গুপ্ত আবাব একদিন এসে আনন্দেব আতিশয্যে আমাকে ধবে দুটো ঝাঁকানি দিল। তাবপব বিয়েব নেমন্তন্ন-পত্র হাতে দিল। বলল, এ যে এত সহজ ব্যাপাব হবে ভাবতেও পাবিনি দাদা—ওদেব লক্ষ্যাও যে আমি এ কি ছাই আগে বুঝেছি। তাহলে নির্লিপ্ত থেকে নিজেব আব একটু কদব বাড়ানো যেত।

কিন্তু ওদেব বিয়েব তিন মাসেব মধ্যেই আমাব কেমন মনে হল সমাচাব খুব কুশল নয়। গণ্ডগোলেব সূত্রপাত মঞ্জবীব দিক থেকে। দিলদবিয়া পল্লব গুপ্তব কেমন হাসফাঁস দশা একটু। গম্ভীব মুখে মঞ্জবী একদিন আমাকে স্পষ্টই বলল, প্রথম দিন আপনি বাড়িয়ে বলেছিলেন দাদা, ওব অনেক খাবাপ অভ্যাস আছে।

আমি আমতা আমতা কবে বলেছি, কেন, এ বকম খোলামেলা চবিত্র—

বাধা দিয়ে ঈষৎ ঝাঝালো সুবে মঞ্জবী বলল, চবিত্রেবও গলদ আছে।

বেচাবা পল্লব জানালা দিয়ে মনোযোগ সহকাবে বাস্তা দেখছে।

আবো মাস ছয় বাদে মনে হল গণ্ডগোলটা বেশ পাকিয়ে উঠেছে। পল্লবেব সর্বদাই বিষণ্ণ অথবা বিবক্ত মুখ। একদিন ঘবে টেনে বসিয়ে জেবা শুরু কবলাম, কি ব্যাপাব সব খোলাখুলি বলো তো?

ও বলল, আমাব বিরুদ্ধে অনেক মাবাত্মক অভিযোগ, এ বকম জানলে ও নাকি আমাব ছায়াও মাড়াত না।

—কি অভিযোগ?

—প্রথম, আমাব কোন বকম আদর্শেব বালাই নেই।

—তাবপব?

—দ্বিতীয়, সিগাব।

—সিগাব কি?

—আমি সিগাব খাই, আমাব সমস্ত গায়ে নাকি চুরুটেব গন্ধ। চুমু খেতে গেলে ধাক্কা মেবে ঠেলে সবায়। ডেটল দিয়ে মুখ কুলকুচি কবে আব গায়ে সেন্ট মেখে তবে কাছে আসতে হয়—ততক্ষণে আমাব চুমু খাওয়াব তেষ্টা চলে যায়।

ওব খোলাখুলি বলাব নমুনা দেখে আমি ঘাবড়ে গেলাম। পল্লব বলে চলল, তৃতীয় অভিযোগ, ড্রিঙ্ক কবা। যত ভাল জিনিসই খাই ও ঠিক টেব পায় আব তাবপব কুরুক্ষেত্র। চতুর্থ অভিযোগও ওব কাছে তেমনি মাবাত্মক—আমি মেয়েদেব পিছনে ছোটাছুটি কবি। আমাব আগেব চালচলন কিছু কিছু জেনে ফেলেছে, তাছাড়া বাড়িতে অনেক মেয়েব টেলিফোন আসে—

বললাম, একটু সামলে-সুমলে চললেই তো পাবো।

ও বেগে গিয়ে বলল, সব ছেড়ে-ছুড়ে পরমহংস হয়ে বসে থাকব? আমি তো মঞ্জরীকে শাসিয়েছি, এ-রকম করলে চাকরি-বাকরি ছেড়ে বিষয়-আশয় বিলি করে দিয়ে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব—তাতেও ঘাবড়ায় না।

আরো মাস তিনেক বাদে একদিন দু'জনেই এসে হাজির আমার বাড়িতে। সেদিন আবার ভিন্ন মূর্তি দুজনেরই। পল্লব গুপ্ত আগের মতোই হাসিখুশি আর মঞ্জরীও যেন আগের সেই লাবণ্যময়ী মিষ্টি মেয়েটি। ওদের কথাবার্তা থেকেও বোঝা গেল মাঝের একটা বছরের সমস্ত অশান্তি আর মনোমালিন্য অপগত। এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, কি হে, কিছু একটা ম্যাজিক-ট্যাজিক হয়ে গেছে মনে হচ্ছে?

খুশিতে ডগমগ পল্লব বলল, ম্যাজিক বলে ম্যাজিক—একেবারে নিদারুণ ম্যাজিক দাদা।

—কি করে হল?

—সেই অনিমেষ সরকারের কল্যাণে।

শুনে আমি অবাক।

তারপর মঞ্জরীকে ও-ঘরে আমার স্ত্রীর সঙ্গে গল্প করতে বসিয়ে দিয়ে ও মনের আনন্দে যে ফিরিস্তি দিল, তাতে আমি আরো অবাক। মঞ্জরী ওর সঙ্গে আপোস করেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যার পরে পর্যন্ত গোটা ছয় সিগার চলতে পারে, ড্রিঙ্ক একেবারে ছাড়তে হবে না, বড় পার্টি হলে মাত্রা রেখে খেতে হবে, আর মেয়েদের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করে বেড়ানোতেও আপত্তি নেই, তবে মঞ্জরীর অনুপস্থিতিতে সেটা করা চলবে না—যেখানে যাবে সে-ও সেখানে উপস্থিত থাকবে।

বলা বাহুল্য, পল্লব গুপ্ত সানন্দে রাজী। ম্যাজিকের ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই রকম :

...সেদিনও মেজাজপত্র বিগড়েই ছিল পল্লব গুপ্তর। তিন দিনের মধ্যে মঞ্জরী কাছে আসেনি, ওকেও কাছে ঘেঁষতে দেয়নি। সামনা-সামনি রাগও করতে পারে না পল্লব, কারণ সে রাগলে মঞ্জরী ডবল রাগে—আর তখন আরো বেশি আক্কেল দিতে চেষ্টা করে।

বিকেলে ওই রকম মেজাজ খারাপ নিয়েই বেরিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ফুটপাথের পাশে একেবারে একটা হ্যাগার্ড মার্কা লোককে দেখে গাড়ি থামাল। জামা-কাপড় আর ওই মূর্তি দেখলে কেউ তাকে ভদ্রলোক ভাববে না। তার ওপর একগাল দাড়ি, মাথার রুক্ষ চুল ঘাড় আর কান বেয়ে নেমেছে। গালের হাড় উঁচিয়ে আছে, দু চোখ গর্তয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনিমেষ সরকারকে চিনতে পারল পল্লব গুপ্ত। বিয়ের আগে দু-দুটো দিন মঞ্জরীর ঘরে বসা দেখেছে—এ মুখ ভোলার কথা নয় তার।

কিন্তু অনিমেষ সরকার পল্লব গুপ্তকে দেখেও নি, চেনেও না। গাড়ি থেকে নেমে কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, আপনি এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে?

কোটরের দুই চোখ তুলে লোকটা তাকালো, বুভুক্ষু চাউনি।—আপনি...?

—আমাকে চিনবেন না, আমি আপনাকে চিনি। আদর্শ মানুষ ছিলেন, এক সময় দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

লোকটার সেই ক্ষুধার্ত চোখ দুটো জ্বলে উঠল একবাব। বিড়বিড় করে বলল, আদর্শ আর দেশের কাজ কোথায় আমাকে এনেছে দেখতেই পাচ্ছেন।... চেনেন যদি একটু উপকাব কবতে পারেন?

—বলুন?

-গোটা দশেক টাকা দিতে পাবেন—ভাই-বোনদেব নিয়ে তিন দিন ধরে উপোস চলছে!

পল্লব গুপ্ত চকিতে ভেবে নিল কি। তারপর বলল, আসুন আমার সঙ্গে, দশ টাকার পাঁচ গুণ দেব—

লোকটা হতভম্বের মতো তাব গাড়িতে উঠল। তাকে নিয়ে পল্লব গুপ্ত সটান বাড়ি। অকারণে হর্ন বাজিয়ে যা আশা করেছিল তাই হল। মঞ্জবী দোতলাব বাবান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। পাশ থেকে অনিমেষ সবকাব তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

পল্লব গাড়ি থেকে নামল, গলা একটু চড়িয়েই ডাকল, আসুন অনিমেষবাবু—। অনিমেষ সরকাব যথার্থই হকচকিয়ে গিয়ে কোনদিকে না তাকিয়ে তাব সঙ্গে ঘবে এসে বসল।

পল্লব গুপ্ত চট কবে বাইবে এলো একবাব। যা ভেবেছে তাই। অবাক বিস্ময়ে মঞ্জবী সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে আসছে। পল্লব তাড়াতাড়ি তাব দিকে এগিয়ে গেল। বলল, তোমাব সেই আদর্শ পুরুষ অনিমেষ সবকাব কিছু আশা নিয়ে আমার কাছে এসেছে, তুমি এক্ষুণি ঘবে ঢুকো না।

মঞ্জবী হতভম্ব। যাকে দেখেছে ওপব থেকে সে অনিমেষ সবকার কি তাব কঙ্কাল ভেবে পেল না। আব এই বকম বেশবাস...

পল্লব বসাব ঘরে ফিবে এলো আবাব। দবজাব ওধাবে শ্রীমতীব অবস্থান স্বতঃসিদ্ধ ধবে নিয়েছে। প্রতিটি কথাও ঠিকই কানে যাবে।

—তাবপব অনিমেষবাবু, এটা তাহলে আপনি সত্যি কথাই বলছেন—আপনাব আদর্শই আজ আপনাকে এই অবস্থায় এনে দাঁড় কবিয়েছে?

ক্লান্ত স্ববে উত্তেজনা ফুটিয়ে অনিমেষ সবকাব জবাব দিল, চুলোয় যাক আদর্শ—পেটেব জ্বালায় সবসুদ্ধ মবলাম—এব থেকে যদি মিস্ত্রীগিবিও শিখতাম—

পল্লব বলল, কিন্তু আপনি দশ টাকা চেয়েছেন, ওতে আপনাব ক'দিন চলবে? তিনদিন ধরে তো উপোস চলেছে বলছেন—

—দু'দিন চললে দু'দিনই বাঁচলাম। খিদেব জ্বালা যে কি আপনি বুঝবেন না।

—তাই তো... ইয়ে, আমার কাছে খুব ভাল বিলিতি হুইস্কি আছে, খাবেন একটু?

—ওসব আমি কিছু খাই নে মশাই, দুটো বেলা ডাল-ভাত খাবার মতো আমাকে কিছু দিন দয়া করে।

পল্লব গুপ্ত ওদ্বিকেব দরজার দিকে তাকালো একবার। তারপব পকেট থেকে সিগাব-কেস বার করল।—আচ্ছা, ভাল চুরুট ধবান একটা!

—চুরুট আমি খাই নে, আমাব যা দবকাব তাই দিয়ে দিন সাব—

—ও, পল্লব গুপ্ত ব্যস্ত, কি করে যে আপনাকে আনন্দ দেব একটু, আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না, আমার ভাল ভাল কিছু মেয়ের সঙ্গে ইয়ে মানে অন্তরঙ্গতা আছে —চলুন না যাই, সময়টা ভাল কাটবে।

ক্রুদ্ধ অনিমেষ সরকার উঠে দাঁড়াল। বলে উঠল, একজন ক্ষুধার্ত মানুষের সঙ্গে আপনি রসিকতা করছেন কিনা বুঝতে পারছি না—এসব অভ্যেসও আমার নেই— এখন আমার দরকার শুধু কিছু খাবার—দশটা টাকা চেয়েছিলাম, অন্তত পাঁচটা টাকা দিয়ে আজকের মতো বাঁচান আমাকে।

এবারে পল্লব গুপ্ত ধীরে-সুস্থে মানি-ব্যাগ বার করল পকেট থেকে। অনিমেষ সরকার এদিকে ফিরে আছে, ওদিকের দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে নির্বাক বিস্ময়ে মঞ্জরী দেখছে তাকে।

পল্লব গুপ্ত বলল, দশ টাকার পাঁচ গুণ দেব বলেছিলাম, তাই দিচ্ছি। এই নিন পঞ্চাশ টাকা—

লোকটা পাগল কিনা অনিমেষ সরকার ভেবে পেল না। লোভে দু'চোখ চকচক করে উঠল তার। ছো মেরে টাকা ক'টা নিয়ে সামনের দরজা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল সে।

বিবর্ণ পাংশু মুখে মঞ্জরী সামনে এসে দাঁড়াল।—কি ব্যাপার? এঁকে কোত্থেকে ধরে আনলে?

-রাস্তা থেকে। উপোসের জ্বালায় রাস্তায় ভিক্ষে করতে বেরিয়েছিল।.. দশ টাকা চেয়েছিল, পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিলাম।

একটা বড় রকমের ধাক্কা সামলে নিল মঞ্জরী। তারপর জিজ্ঞাসা করল, তার জন্যে এঁকে বাড়িতে ধরে নিয়ে এলে কেন, টাকা তো পকেটেই ছিল?

পল্লব গুপ্ত জবাব দিল, এনেছি তোমার জন্যে। ড্রিঙ্ক করে না, সিগার খায় না, মেয়েদের পিছনে ছোটে না—এ-রকম আদর্শ ব্যক্তির হাল কি হয় সেটা তোমাকে দেখাবার জন্যে।... আমাকেও তুমি এই অবস্থার দিকেই ঠেলে দিচ্ছ।

মঞ্জরী হাঁ করে চেয়ে রইল খানিক, তারপর ছুটে চলে গেল।

একমুখ হেসে পল্লব গুপ্ত সিগার-কেস বার করে দামী সিগার ধরাল একটা। বলল, তারপর এই আপোস।

হিসেবের বাইরে

সকাল সাতটাও নয় তখন। বাইরের বাঁধানো দাওয়ায় গরম চাদর মুড়ি দিয়ে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলাম। একটু আগে এখানে বসেই প্রাথমিক চায়ের পর্ব শেষ হয়েছে। শীতের সকাল কুয়াশায় ঢাকা। রোদের ছিটেফোঁটাও নেই এখন পর্যন্ত। তাছাড়া কলকাতা থেকে এখানকার এই খোলামেলা জায়গায় শীতও বেশি। নিউ ব্যারাকপুরের লোকালয় ছাড়িয়ে একটু নিরিবিলিতে বন্ধুর এই বাড়ি। না শহর না গ্রাম। বন্ধুর আমন্ত্রণে দু'দিনের

অবকাশ কাটাতে এখানে আসা। একই আপিসে পাশাপাশি চাকরি করি। তবে চাকরিতে বন্ধুটি আমার থেকে কিছুটা পদস্থ। তার ওপর অফিস ইউনিয়নের হোমরা-চোমরা একজন। সকলেই মান্যগণ্য করে। এমন কি মালিকরাও তাঁকে একটু-আধটু সমীহ করে। কলকাতা থেকে একটু দূরে থাকার বাসনায় এইখানে জমি কিনে বছরখানেক আগে এই ছিমছাম ছোট বাড়িটি করেছেন ভদ্রলোক। এখান থেকেই ডেলি প্যাসেঞ্জারি করেন এখন। দিনের কাজকর্ম চুকিয়ে একবার বাড়ি এসে বসতে পারলেই কি-যে মহাশান্তি সেকথা অজস্রবার শুনিয়েছেন। আর, একবার এসে দেখে যাবার তাগিদও বহুবার দিয়েছেন। গত সন্ধ্যায় আপিস ফেরত দু'জনে এক সঙ্গেই চলে এসেছি। আগামী কালটা দু'জনেই ছুটি নিয়েছি। তার পরদিন রবিবার। অতএব প্রাণখোলা আড্ডার ঢালা অবকাশ।

শীতের সকালে কলকাতায় সাড়ে সাতটা-আটটার আগে লেপের তলা থেকে বেরুতে পারি না। কিন্তু এখানে ছ'টা না বাজতে কেউ যেন ঠেলে তুলে দিল। তার বেশ খানিক আগে থেকেই পাখির কিচির-মিচির কানে আসছিল। ভোরের আলোয় তারা যেন মিষ্টি আলাপের আসর বসিয়েছে। এখানে কুয়াশা মাখা সকাল কলকাতার মতো নয়। ধোয়ার গন্ধের লেশমাত্র নেই। লেপের মায়া ছেড়ে উঠে পড়েছিলাম। ঘরের পিছনের দিকের জানলার সামনে চুপচাপ খানিক দাঁড়িয়েছিলাম। অনেকটা জায়গা জুড়ে ধানী জমি। কুয়াশায় ভালো চোখ চলে না, তবু মনে হল ওই জমিটার পাশ দিয়ে সরু পায়ে হাঁটা রাস্তা চলে গেছে। রাস্তার শেষ কোথায় গিয়ে মিশেছে তা আর আদৌ ঠাওর হচ্ছিল না।

বাইরের দাওয়ায় বন্ধুর সাড়া পেয়ে বেরিয়ে এসেছি। তিনি রাত থাকতে ওঠেন, সন্ধ্যা আহ্নিক করেন। এরই মধ্যে তার সব কিছু সারা। মুখ হাত ধুয়ে তার পাশে এসে বসলাম। তিনি হেসে বললেন, এত ঘুমোও কি করে বাপু! তুমি উঠবে-উঠবে করে গিন্নি সেই কখন চায়ের জল চড়িয়ে বসে আছে।

বললাম, আজ তো তবু ঢের আগে উঠেছি, সাড়ে ছ'টাও নয় এখন—

দু-পাঁচ মিনিটের মধ্যে চা এসে গেল। সর্ব ব্যাপারে আমার এই বন্ধুটির হিসেবের বায়ু আছে। হিসেবের ভিতর দিয়ে সব-কিছুরই একটা পাকা চিত্র ছকে ফেলার ঝোঁক। চা খেতে খেতে যখন শুনলেন কলকাতায় সাড়ে সাতটার আগে আমার ঘুমই ভাঙে না, ছুটির অবকাশে তক্ষুনি একটা হিসেব মাথায় ঢুকে গেছে তাঁর। এগারোটায় শুয়ে সাড়ে সাতটায় ওঠা মানে কম করে আট-সাড়ে আট ঘণ্টার ঘুম—আট ঘণ্টাই ধরা যাক। তাহলে এক মাসে অর্থাৎ তিরিশ দিনে দু'শ' চল্লিশ ঘণ্টা ঘুমিয়ে কাটে—বছরে হল গিয়ে দু'শ' চল্লিশ ইনটু বারো—হল গিয়ে দু হাজার আটশ' আশী ঘণ্টা। তাহলে ধরো মোট যদি পঁচাত্তর বছর বাঁচো তাহলে—

আমি ভাবলাম এই হিসেবটা আর মুখে মুখে এগোচ্ছে না। কিন্তু তিনি বলে উঠলেন, ধ্যেৎ ছাই আমি বোকার মতো এভাবে হিসেব করছি কেন—আট ঘণ্টা ঘুমনো মানে দিনের চব্বিশ ঘণ্টার তিন ভাগের এক ভাগ ঘুমনো—তাহলে পঁচাত্তর বছরের তিন ভাগের এক ভাগ হল গিয়ে পঁচিশ বছর—সোজা হিসেব। তাহলে দেখো পঁচাত্তর বছরের মধ্যে পঁচিশটা বছর তুমি স্রেফ মরার মতো ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলে।

হেসেই বললাম, থামো এখন তোমার হিসেবের কলে পড়ে আমার মাথা ঝিমঝিম করছে—এক্ষুনি না আবার ঘুম পেয়ে যায়।

হাসতে লাগলেন বন্ধুও। বললেন, না, এই হিসেবের ফল ঠিক উল্টো—সর্বব্যাপারে মিতাচারী হবার মহৌষধ। দেখো, আগে আমি সিগারেট খেতাম কম করে দিনে দশটা। পঁচাত্তর বছরের জীবনে হিসেব করে দেখলাম দু লক্ষ সত্তর হাজার সিগারেট খেতে হবে—ব্যস সিগারেটের নেশা খতম। পান খাওয়াও এই হিসেব করেই কমিয়ে ফেলেছি—

শুনতে মজা লাগছিল বেশ। চোখ টিপে গলা খাটো করে বললাম, তোমার যৌবনকালের গার্হস্থ্য ধর্মেও এই হিসেব মাথায় ছিল না তো?

বন্ধুর ছেলে মাত্র একটি, মেয়ে নেই। হা-হা শব্দে হেসে উঠে হাঁক দিলেন, ওগো শুনছ—।

সচকিত হয়ে বললাম, আমি কিন্তু উঠে পালাব তাহলে—

কিন্তু হাক শুনে তাঁর গৃহিণী এসেই গেছেন। অগত্যা হাসি সামলে বন্ধু বললেন, চায়ের পেয়ালাগুলো নিয়ে যেতে বলো—

এই সাত সকালে দাওয়ায় বসে কিছু রঙ্গরস চলছে, তাঁর গৃহিণী সেটা আঁচ করে হালকা সন্দিগ্ধ চোখে আমাদের দু'জনের দিকে একবার তাকিয়ে চলে গেলেন।

হাসি গোপন করার চেষ্টায় আমি সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কুয়াশা অনেকটা হালকা হয়ে এসেছে। তার ওপর রোদ ঝিকমিক করছে। হঠাৎ অদূরে একটা দৃশ্য দেখে আমার দু' চোখ সেদিকে আটকালো। সামনের ওই রাস্তাটা ধরে শ্লথ পায়ে একটি রমণী এগিয়ে আসছে। পা ফেলে ফেলে তার এগিয়ে আসার ধরনটা যেন কেমন। দূর থেকে চেহারাপত্র ভালো ঠাওর করা গেল না। তবে বেশ মজবুত স্বাস্থ্যের মেয়ে এটুকু বোঝা যাচ্ছে। পরনে খয়রী রংয়ের একটা খাটো ডুরে শাড়ি। কিন্তু মেয়েটা এভাবে পা ফেলে ফেলে আসছে কেন।

বন্ধুর উপস্থিতি ভুলে সেদিকেই চেয়ে ছিলাম। আরো কাছে আসতে পরিষ্কার দেখলাম। বেশবাস দেখে বোঝা যায় খেটে-খাওয়া দুঃস্থ গরিব ঘরের বৌ। কিন্তু সুন্দর সুঠাম স্বাস্থ্য। আধফর্সা মুখখানাও বেশ সুশ্রী। মাথায় খাটো ঘোমটা। বয়েস বত্রিশ তেত্রিশ হতে পারে। ঢিমে তালে এলোমেলো পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছে। আর যেভাবে আসছে, মনে হল মাথা ঘুরে পড়েও যেতে পারে।

যে কোনো কারণে রমণীটি বেশি-রকম অসুস্থ হয়ে পড়েছে ভেবে উতলা চোখে আমি বন্ধুর দিকে ফিরে তাকালাম। দেখি বন্ধু আমাকেই দেখছেন আর মিটিমিটি হাসছেন। চোখাচোখি হতে জিজ্ঞাসা করলেন, এটা দেখার রোগ না লেখকের রোগ?

বললাম, মেয়েটাকে অসুস্থ মনে হচ্ছে. কিভাবে পা ফেলছে আর ঢুলতে ঢুলতে আসছে দেখছ না?

—ওটা রস-সিক্ত পদক্ষেপ আর রসের ঢুলুনি। মেয়েটার পিছনে যে আসছে তাকেও দেখো।

বন্ধুব কথা শুনে যেমন অবাক আমি, ওই মেয়েটাব পিছনে গজ বিশেক পিছনে পিছনে যে আসছে তাকে দেখেও তেমনি অবাক। বছব চৌদ্দব একটি ছেলে। পবনে হাফ প্যান্ট, গায়ে ছেঁড়া শার্ট। আদব-যত্ন পেলে ওই কচি মুখটাও সুশ্রী দেখাত হয়তো। আমি অবাক এই কাবণে যে ওই ছেলেটাও সামনেব বমণীটিব মতোই টলতে টলতে ঢুলতে ঢুলতে পথ ভেঙে এগিয়ে আসছে।

সবিস্ময়ে আবাব বন্ধুব দিকেই ফিবলাম আমি।—এই সাত সকালে দুটোতেই মদ গিলে ঘবে ফিবছে নাকি? কে ওবা—মা আব ছেলে?

বন্ধু জবাব দিল, তাই। তুমি আব ড্যাব ড্যাব কবে ওদিকে তাকিয়ে থেকো না। ওই বজ্জাতও নতুন মানুষ দেখে তোমাব দিকে মন দিয়েছে দেখছি—বসিক জন ভেবেছে বোধহয়।

বাস্তাটা বেকে বাড়িটাব পাশ ঘেঁষেই সামনেব দিকে এগিয়ে গেছে। মেয়েটা অপলক চোখে সত্যি আমাকে দেখতে দেখতেই, বাড়িটা পাব হল। অস্বস্তি তাব পবেও। বাড়ি ছাড়িয়ে কিছুটা এগিয়ে যেতে যেতেও ঘাড় ফিবিয়ে আমাকেই দেখছে। তাব পবেব বিস্ময় অভাবনীয়। দাড়িয়েই গেল এবং ঘুবে এদিকেই চেয়ে বইল। এদিকে বলতে বন্ধুব দিকে নয়, শুধু আমাব দিকে। মাকে ওভাবে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে ছেলেটাও মায়েব কাছাকাছি গিয়ে ঘুবে তাকালো।

ব্যাপাব কি না বুঝে আমি বন্ধুব দিকে তাকালাম। মেয়েটাব এবকম দুঃসাহস দেখে বন্ধুও কিছুটা অবাক আব কিছুটা বিবক্ত হয়ে ভ্রূকুটি কবে ওদেব দিকে চেয়ে আছেন।

পায়ে পায়ে মেয়েটা এবাব আমাদেব এই দাওয়াব দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। মদেব ঝোঁকে আবাব কি কাণ্ড বাধায় আমাব সেই অস্বস্তি। বন্ধুও হকচকিয়ে গিয়ে থাকবেন।

পায়ে পায়ে মেয়েটা এসে একেবাবে দাওয়া ঘেঁষে দাড়াল অপলক চাউনি আমাবই মুখেব ওপব। নেশাব ঘোব কেটে গিয়ে তাবও যেন কিছু বিস্ময়েব কাবণ ঘটেছে। অভাবেব ছাপ এটে বসা কমনীয় মুখ উসকো-খুসকো ঈষৎ কোকড়া লালচে চুল। খাটো ডবে শাড়ি পবা সঠাম গড়ন শবীবেব সবটুকুব পক্ষে ওই ছোট শাড়ি আদৌ যথেষ্ট নয়। বছব তিবিশ-বত্রিশেব বেশি বয়েস মনে হয় না। মাথাব ছোট ঘোমটাটাও এব মধ্যে খসে গেছে। আমি কেমন বিমূঢ় হঠাৎ। এই গোছেব একখানা মুখ আমি কি কোথাও কখনো দেখেছি? একেবাবে অচেনা লাগছে না কেন?

পাশ থেকে বন্ধু প্রায় খেঁকিয়েই উঠলেন, কি চাই এখানে?

ধমক খেয়ে মেয়েটাব বিস্ময়েব ঘোব কাটল যেন। এবাব বন্ধুব দিকে তাকালো। তাব ভয়লেশশূন্য সাদাসাপটা কথা শুনে আমি হতভম্ব।—তাড়া দেন কেন বাবু, আমি কি চুবি কবতে এয়েছি? পবক্ষণে আমাব দিকে ফিবতে ঢুলু ঢুলু চোখে আগ্রহ যেন উপচে উঠল। জিজ্ঞাসা কবল, কলকাতাব মুখুজ্জে বাড়িব সেজবাবু না?

আমাব বিস্ময়েব অন্ত নেই। এবাবে অবাক বোধ হয় বন্ধুটিও। নিজেব অগোচবে মাথা নেড়েছিলাম কিনা খেয়াল নেই। নিজেব বাড়িতে আমি সেজবাবুই বটে।

চোখেব পলকে মেয়েটা এবার দাওয়ায উঠে এলো। তাব পরেই উপুড হয়ে পাযে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম। আমি বাধা দেবারও সময় পেলাম না। প্রণাম সেবে উঠে দাঁড়াল। বাড়িব মালিকেব দিকে ভ্রূক্ষেপও না করে ঘাড় ফিবিয়ে ছেলেব উদ্দেশ্যে হাঁক দিল, ভুলু, শীগগিব আয!

ছেলেটারও হযতো নেশা ছুটে গেছে। সে হন্তদন্ত হয়ে কাছে আসতেই বলে উঠল, দেবতাব দেখা পেযে গেলি আজ, গড কর শীগগিব, গড় কব।

ছেলেটাও কিছু না বুঝেই তাড়াতাড়ি প্রণাম সেবে উঠল। আমি তখনও আঁতিপাতি কবে খুঁজছি কে হতে পাবে এবা।

মেয়েটাব চোখে মুখে আনন্দ ঠিকবে পডছে. আপনি এখানে সেজবাবু! বেডাতে এযেছেন?

—হ্যাঁ, আমাব এই বন্ধুব বাড়ি এটা।

—বাড়িব সকলে ভালো আছেন? সেজ-মা ভালো আছেন?

সেজ-মা বলতে আমাব স্ত্রী। আমি বললাম. সব ভালো. কিন্তু তোমাব নাম কি বলো তো?

সে বলে উঠল, ও-মা, এখনো এই পোড়ারমুখিকে চিনতেই পাবলেন না সেজবাবু! আমি আপনাদেব বাড়িব সেই কমলা দাসীব মেয়ে সবস্বতী।

শোনাব সঙ্গে সঙ্গে চোখেব সামনে থেকে বিস্মৃতিব পর্দাটা সবে গেল। এবাব তাকাতেই মনে হল ষোল বছবেব আধফর্সা কোঁকড়া কচি-কাঁচা মিষ্টি মুখেব সঙ্গে আবো সতেবটা বছব জুডলে এবকমই হতে পাবে বটে। মগজে একবাশ স্মৃতি একসঙ্গে ভিড করে আসছে। আবাব একটা বিপবীত প্রতিক্রিযাও দেখা দিল সঙ্গে সঙ্গে। কিছুটা নির্লিপ্ত গাম্ভীর্যে বললাম. এবাবে চিনেছি। কেষ্টব খবব কি?

—ঘবে আছে। অষ্ট পহব ঘবেই থাকতে হয, ঘব থেকে বেরুনোব উপায নেই। সাগ্রহে আঙুল তুলে মেঠো বাস্তাটা দেখিযে বলল. ওই মাঠ ছাড়ালেই বস্তি এলাকায আমাদেব ঘব—মাঠ ভেঙে গেলে কাছেই—আপনি এখানে দিন কযেক থাকবেন সেজবাবু?

মুখে বলতে সাহস কবল না বটে, কিন্তু এমন কবে বলল যে পাবলে এক্ষুনিও আমাকে ওদেব ঘব দেখাতে টেনে নিযে যায।

বন্ধুব বিবক্তি-ছাওয়া মুখেব দিকে তাকিযে আমি আবো গম্ভীব। বললাম, না, পবশু ভোবে চলে যাব। তাবপব প্রায রূঢ গলায জিজ্ঞাসা কবলাম. তুই এভাবে হেঁটে আসছিলি কেন—সকালেই মদ গিলেছিস আব ছেলেটাকেও খাইয়েছিস?

সবস্বতী থতমত খেল একদফা। দেখতে দেখতে সমস্ত মুখটাই বিষাদে ছেযে গেল। বলল. আপনি 'নেদায' হলে ভগবান আমাকে আবো কত মাববেন ঠিক নেই, আপনাব কথা আমবা এখনো বলি. আপনি দযা বাখবেন সেজবাবু! বিষ না খেযে আমাদের পেটে ভাত জোটে না যে, কি কবব...

বলতে বলতে একটা উদগত কান্না ভিতবে ঠেলে দিযে ছেলেব হাত ধবে তাড়াতাড়ি দাওয়া থেকে নেমে গেল। তাবপব হনহন কবে পথ চলল।

শেষের এই কথাগুলো শুনে কেন যেন আমার বুকেব তলায মোচড দিযে উঠল। কি ব্যাপাব আমি ভেবে পেলাম না। ওর স্বামী কেষ্ট ঘোষেব ঘব ছেড়ে বেরুনোর উপায নেই কেন? বিষ না খেলে পেটের ভাত জোটে না বলার মানে কি? মদ গিলে আগে বিবেকেব গলা টিপে মেরে তাবপর নিজেব দেহ বেচে স্বামী পুত্রেব ভাত জোটাতে হচ্ছে? তাহলে ছেলেটা সঙ্গে যাবে কেন? ছেলেটাও মদ গিলবে কেন?

বন্ধুব বিরস মুখেব দিকে চেয়ে বললাম, মেয়েটা ভাবী মিষ্টি আব ভালো ছিল এক সময—

বন্ধু বাধা দিযে উঠলেন, এক সময বলতে সেই সতেব বছব আগে তো? এব মাঝে আব দেখেছ?

মাথা নাড়লাম। দেখিনি।

তাহলে এখন আব ভালোটালো বিচাব কবতে বোসো না। তবে এখনো অনেক লোকে ওকে মিষ্টি দেখে। ওই মেযে এই দাওযায উঠে কথা বলছিল দেখে ক'টা লোক অবাক হযে এদিকে চাইতে চাইতে চলে গেল তুমি খেযাল কবোনি। ওব সুনাম কেমন বুঝছ?

সবস্বতীব এ-বাড়িব দাওযায উঠে কথা বলাটা বন্ধুব একটুকুও পছন্দ হযনি বোঝা গেল। আবাব বললেন, তোমাব ওই ভালো মেযে এখন ছেলে নিযে বোজ সন্ধ্যায কলকাতা যায চোলাই মদ বিক্রী কবতে আব সকালে ফেবে। বুঝলে? কাপড়েব নীচে ওদেব কোমবে চোলাই মদ পাচাব কবাব ব্লাডাব বাঁধা থাকে। যা বেচতে পারল বেচল, বাকিটা মা আব ছেলে মিলে যে সাবড়ে দেয সে তো ওদেব নিজেব চোখে দেখেই বুঝতে পাবলে। এই কবে ঘবেব পঙ্গু স্বামীব আব ছেলেব ভাত জোটাস বুঝলাম, তা বলে নিজেবা খাস কেন। তাছাড়া তোমাব ওই ভালো মেযেব পিছনে অনেক লোক লেগে আছে, তাব মধ্যে পযসাওলা লোকেবও অভাব নেই শুনেছি। ওই বস্তি এলাকায ওব কিছু পিযাবেব লোকও আছে—কাবো সঙ্গে বনিবনা না হলে ওদেব লেলিযে দেয, দু-চাবজন ভদ্রলোকেব সঙ্গে মাবপিটেব খবব‌ও আমাব কানে এসেছে।

শুনে আমাব কান মন দুই-ই বিষিযে গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে সতের বছব আগেব একটা ঘটনাও বাব বাব মনে আসতে লাগল। ফলে ভিতবটা আবো বেশি ভাবাক্রান্ত হযেই থাকল।

খাওযা-দাওয়াব পাট চুকতে বেলা একটা। ভাবী খাওযাব ফলে বন্ধু তাঁব ঘবে একটু গড়াগড়ি কবে নিতে গেলেন। আমাকেও তাই কবতে বললেন।

গড়াগড়ি কবতে গিযে হিসেব ভুলে বন্ধু ঘুমিযেই পড়েছিলেন নিশ্চয। কাবণ তাঁব আবাব এ-ঘবে পদার্পণ ঘটল বেলা তখন চাবটে। কিন্তু ঘবে পা দিযেই তিনি হা একেবাবে।

আমি আমাব শয্যাতেই বসে আছি। আমাব সামনে মেঝেতে বসে আছে সবস্বতী। এখন তাব সঙ্গে ছেলেও নেই।

গৃহস্বামীব হতচকিত অবস্থা দেখে সরস্বতী বিব্রত মুখে তাঁব দিকে তাকিযে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল।

আমি ওকে উদ্দেশ্য করে হালকা সুরেই বললাম, বাড়ির মালিক ঘুমুচ্ছিলেন বলেই তুই এক ঘন্টা ধবে এখানে বসে যেতে পারলি। যা পালা এখন, সাড়ে পাঁচটা নাগাত তোব ছেলেকে পাঠিয়ে দিস—কেষ্টকে দেখে আসতে যাব'খন।

সবস্বতীব ঠাণ্ডা মুখে খুশির ছোঁয়া লাগল। কিন্তু সাহস কবে সেটুকু প্রকাশ করতে পারল না। আস্তে আস্তে ঘব ছেড়ে চলে গেল।

বন্ধু আমাব দিকে চেয়ে আছেন, আমাকেই দেখছেন। মাথাব বিকৃতি কি আর কিছু তাই ভাবছেন। আমাকে হাসতে দেখে তাঁর পিত্তি জ্বলে গেল বোধ হয। ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, আমাব সকালেব এত কথা তোমাব কানে গেল না? তুমি ওব বাড়ি যাবে?

—শুনলেই তো। মাথা ঠাণ্ডা কবে বোসো। ঘুরে এসে তোমার হিসেবেব বাইবে তোমাকে যদি কিছু না শোনাতে পাবি তো আজ বাতেই আমাকে গলা ধাক্কা দিযে তাড়িয়ে নিশ্চিন্ত হযো।

বলার ধবনেব ব্যতিক্রমটুকু কানে লেগেছে।—এখনি বলো শুনি, এক ঘন্টা ধবে মেযেটা তোমাকে কি এমন বলে গেল যে তুমি গলে জল হয়ে গেলে?

বললাম. এখন না, আগে ঘুবে আসি।

ঘুবে এলাম। এ-সব জাযগায শীতকালেব সাড়ে সাতটা মানে বাতই। ঘরে পা দিযেই মনে হল বন্ধু আব বন্ধু-পত্নী দুজনেই আমাব জন্যে উদগ্রীব হযে অপেক্ষা কবছেন। আমি যে ঘবে আছি সেই ঘবেই বসে ছিলেন তাঁবা। বন্ধু-পত্নী উঠে দাঁড়িযে বললেন, আগে এক পেযালা চা খাওযাই আপনাকে।

বাধা দিলাম. কিছু দবকাব নেই, বসুন, এব মধ্যে দু' পেযালা হযে গেছে।

বন্ধু বলে উঠলেন, কোথায হল, তোমাব ওই সবস্বতীব ওখানেই?

—হ্যাঁ। শয্যায বসে তাব দিকে ফিবলাম।—যা বলব সে যদি তোমাব হিসেবের বাইবে হয, আমাব একটা অনুবোধ তোমাকে রাখতে হবে, আব সে অনুবোধ বাখাটা তোমাব একটুও সাধ্যেব বাইরে নয—বউদি আপনি সাক্ষী।

বন্ধু বললেন. ভণিতা ভালই হযেছে এখন ব্যাপাবখানা কি শুনি।

এবপব যে চিত্রটা ওদেব গোচবে এনেছিলাম, পাঠকেব সামনেও সেটুকুই তুলে ধবছি।

সবস্বতীব মাযেব নাম কমলা দাসী। আমাদের বাড়িব ঝি ছিল। বাবো বছবেব মেযে সবস্বতীকে নিযে সকালে আব বিকেলে আমাদেব বাড়ি কাজ কবতে আসত। কমলাব বযেস তখন বেশি হলে সাতাশ-আটাশ। স্বামী নেই, শুনেছি বছব দেড দুই আগে বিধবা হযেছে। আমাদের বাড়ির বউবা কাজে-কর্মে খুব একটা খুঁত ধবতে পারত না তাব. তবু ওব ওপব তেমন খুশি ছিল না। বলত ওব স্বভাব চবিত্র সুবিধেব নয, কবে কাব সঙ্গে কোন বাস্তায নাকি ওকে দেখা গেছে একাধিক দিন। পবে বউবা তাকে জিজ্ঞাসা কবতেও নাকি বলেছে আমার অমুক সম্পর্কের আত্মীয়। তাছাড়া চাল-চলনও ভালো নয। বাড়িব ঠাকুরটার সঙ্গে নাকি ঠাবে ঠোরে কথা বলে, ফাঁক পেলে হাসাহাসি কবে, যাব দরুন ঠাকুবটা ওকে দু' বেলাই বেশি-বেশি চা-রুটি দেয ইত্যাদি।

মেয়েদেব এ-সব কথায় আমি বড় একটা কান দিইনি। ভেবেছি, ওদেব শ্রেণীর মেয়েদের তুলনায কমলা দাসীব চেহাবাপত্রের চটক বেশি, আব মোটামুটি সুশ্রী আব স্বাস্থ্যবতী বলেই মেয়েদের ওই গোছের সন্দেহ। তাছাড়া কান না দেবাব আবো কারণ, ওব মেয়েটা সত্যিই স্নেহের পাত্রী হয়ে উঠেছিল আমার। সুন্দবী না হোক ভারী মিষ্টি দেখতে, না ফর্সা না কালো, মাথায একবাশ কোঁকড়া চুল, বড় টানা-টানা দুটো চোখ। মুখ বুজে মায়েব কাজে সাহায্য কবত, তারপর ফাঁক পেলেই দোতলায চলে আসত। সকালে আমি নিজেব মেয়ে আর ভাইঝিদের পড়াতাম, সন্ধ্যায় তাদের গল্প শোনাতাম। এই দু বেলাব আসবে ওব উপস্থিত থাকা চাই-ই। ওব এত আগ্রহ দেখে ওকেও ছাত্রী করে নিলাম। বাড়িতে থাকতে বিনা বেতনেব প্রাইমাবি স্কুলে পড়ত। আবাব ভর্তি কবে দিলাম। খুশিতে কৃতজ্ঞতায় মেয়েটা যেন আমাব কেনা হযে গেল।

চাব বছব বাদে সবস্বতীব মা কমলা মেযে ফেলে সত্যি কার সঙ্গে উধাও হযে গেল। বাড়িব মেযেবা তখন সবস্বতীকেও বিদায দিল। ও তখন ষোল বছবের মেয়ে, বাড়ন্ত গড়ন। মেযেদেব বিশ্বাস ওবও স্বভাবচবিত্র মাযেব মতোই হবে। কাবণ পাড়াব ভদ্র ঘবেব একটা বখাটে ছেলেব সঙ্গে ওব ভাবসাব দেখা যাচ্ছে। আব ওদের বস্তির কতগুলো ছোকবাও নাকি বাড়িব আশপাশে সর্বদা ঘুবঘুব কবে। ভদ্রঘবেব ওই ছেলেটা আস্কাবা পায বলে ওদেব নাকি সবস্বতীব ওপব ভযানক বাগ। সেই ভদ্রঘবেব ছোকবাকে আমি চিনি। নাম কৃষ্ণ ঘোষ, সকলে কেষ্ট বলে ডাকে। লেখাপড়ায স্কুলের বেড়া পাব হতে পাবেনি। তখন শ্যামনগব না কোথায একটা কাগজের কলে ঢুকেছে। হাতে কিছু পযসা আসতেই বিড়ি ছেড়ে সিগাবেট ধবেছে।

বিদায দেবাব তিন-চার দিনেব মধ্যেই আলুথালু অবস্থায এক সন্ধ্যায় সবস্বতী এসে আমাব পায়ের ওপর আছড়ে পড়ল। কান্না আব থামেই না। শেষে যা বলল তাব মর্ম, বস্তিব তিনটে জোয়ান ছেলে জোব করে ওকে নিযে পালিযে যাবাব ব্যবস্থা কবেছে, যে পাতানো মাসিব কাছে থাকে এখন তাকে টাকা দিযে বশ কবেছে, আব সবস্বতীকে শাসিযেছে এতটুকু অবাধ্য হলে তাকে একেবাবে খুন কবে ফেলা হবে। সে তিন-চাবটে দিন মাত্র এ বাড়িতে আমাব আশ্রযে থাকতে চায, তাবপব আব কোনো ভাবনা নেই। ভাবনা না থাকাব কাবণ শুনেও তাজ্জব আমি। কেষ্ট ঘোষ তার কাজের জায়গায ঘব খুঁজছে, তিন-চাব দিনেব মধ্যেই পাওযাব আশা। তাবপবেই তাকে কালীঘাটে নিয়ে গিযে বিযে কবে ঘবে তুলবে।

মেযেটাব কান্না দেখে আব কথা শুনে মাযা হল। কিন্তু কেষ্ট ঘোষকে বিশ্বাস কবতে পাবছিলাম না। বাতে তাকে ডেকে পাঠালাম। আমি অবাক, ছেলেটাও কাঁদছে, সেই সঙ্গে কাকুতি-মিনতি. তিন-চারটে দিন ওকে আশ্রয় দিন দযা করে, আমি এব মধ্যে ব্যবস্থা কবছি। ভালো কাযেতের ছেলে, সবস্বতীকে বিযে কবে নিজেদেব ঘবে তোলা চলবে না—বাড়ি থেকে গলাধাক্কা দিযে তাড়াবে জানা কথা। তাই ক'টা দিন সময দরকার।

আমি কঠিন গলায় ওকে বললাম, এবপব ওকে ফেলে আবার একদিন ঘরের ছেলে ঘবে ফিরে আসবি তো?

কেষ্ট কালীর দিব্যি কাটল, মরা বাপের নামে শপথ করল।

সরস্বতীকেও বললাম, আর তুই তোর মায়ের মতো হবি না তো?

ও আমার পায়ে মাথা রেখে বলল, ওকে কখনো ছেড়ে গেলে আমার যেন কুষ্ঠ হয়—আমার ছেলে হলে আমি যেন তার মরা মুখ দেখি!

চার-পাঁচটা দিন সরস্বতীকে আগলে রাখার মধ্যে বিপদ ছিল। ক'টা গুণ্ডা ছেলে সর্বদা বাড়ির আশপাশে ঘোরাফেরা করেছে। কিন্তু আমি থানা-পুলিশের ভয় দেখাতে গণ্ডগোল পাকাতে সাহস করেনি।

পাঁচ দিনের মধ্যেই কেষ্ট বিয়ে করে সরস্বতীকে তার কাজের জায়গায় নিয়ে গেছে। আমি ওকে একটা ভালো শাড়ি কিনে দিয়েছিলাম।

দু' বছরের মধ্যে সরস্বতীর কোলে ছেলে এসেছে। গরিব হলেও আনন্দের হাট বসে গেছে তখন। কেষ্টর মতিগতি অনেক ভালো হয়েছে, সে তখন প্রাণপণে বেশি উপার্জনের রাস্তা খুঁজছে।

ছেলেটার সাত বছর বয়সের সময় বজ্রাঘাত হয়ে গেল। কলে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে কেষ্টর একটা পা একেবারে ছেঁচে গেল, একটা হাতও ভয়ানক জখম হল। পা-টা কেটে বাদ দিতে হল, হাতেরও খানিকটা। কলের মালিক সব-কিছু কেষ্টর দোষে হয়েছে বলে প্রমাণ করতে চাইল। অনেক চেষ্টার পর ক্ষতিপূরণ যেটুকু পেল তাই দিয়ে এখানকার এই মাথা গোঁজার ঠাঁইটুকু করা গেছে।

...তারপর সংসার অচল। মাসের পর মাস একবেলা আধ পেটা খেয়ে থেকেছে। সরস্বতী ভদ্রলোকের বাড়ি ঝিগিরি করতে চাইলে কাজ মেলে। কিন্তু সব বাড়িতেই দেখা গেছে ওকে নিয়ে কিছু না কিছু গণ্ডগোল বাধছে। ওর দিকে কারো না কারো চোখ পড়েছে। সে-রকম লোক বাড়িতে না থাকলেও পাড়ায় আছে। পঙ্গু কেষ্টরও সন্দেহ হত সরস্বতী বুঝি ওকে ছেড়ে চলে যাবে। সরস্বতী সেই আগের কথাই বলেছে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, তোমাকে ছেড়ে গেলে ছেলের মরা মুখ দেখতে হবে আমাকে।

অভাবে না খেয়ে মর-মর দশার সময় চোলাই মদ বিক্রির রাস্তা ধরেছে। মদ চোলাই যারা করে তাদের অনেক টাকা। সরস্বতী, তার ছেলে আর এমনি অনেকের মারফত সে-সব কলকাতায় বা অন্যত্র চালান হয়, বিক্রি হয়। ওরা তার অংশ পায়। পুলিসের হুজ্জোত হলে মালিক সামাল দেয়, তখন সংসার চালায়।

সরস্বতীর আর তার ছেলের কলকাতার খদ্দের কয়েকটি মাঝারি নামী বার। চোলাই মদ তাদের কাছে বিক্রি করে। তারা ভালো মদের সঙ্গে সেগুলো মিশেল দেয়। প্রথম দুই-এক দফা খাঁটি মদ পেটে পড়ার পর খদ্দের আর ভেজাল ধরতে পারে না।

কিন্তু চোলাই মদ মেশানোর বিপদ আছে। যদি বিষাক্ত হয়? যদি খেয়ে লোক মরে যায়? সেই কারণেই মা আর ছেলেকে জিনিস যাচাই হিসেবে প্রত্যেক দফার মাল ওদের সামনে খেয়ে দেখাতে হয়। খাওয়ার পর রাত বারোটা একটা পর্যন্ত ভিতরের কোথাও পড়ে থাকতে হয়। মাল বিষাক্ত নয়, এ-ভাবে যাচাই হবার পর টাকা মেলে। সেই নিষুতি রাতে মা-ছেলে কোন রকমে হেঁটে শিয়ালদা আসে। সেখান থেকে ভোরের প্রথম ট্রেন ধরে ঘরে ফেরে। এত সবের পরেও অনেক ভদ্রঘরের নেকড়েরা ওর

পিছনে লাগতে ছাড়ে না। ওর কোমবে সর্বদা একটা ধাবালো ছোরা গোঁজা থাকে। আত্মবক্ষাব জন্যেই বস্তি এলাকাব একদল ছেলে জুটিযেছে, যারা ওর থেকে সস্তায় চোলাই মদ পায, খাবাব-টাবাবও পায়। তারা ওকে দিদি বলে ডাকে। কেউ পিছনে লাগলে বা বেশি জ্বালাতন করলে সরস্বতী ওদেব লেলিযে দেয।

আমাকে দেখে কেষ্ট ফুলে ফুলে কেঁদেছে। আর সবস্বতী পায়েব ওপব থেকে মাথা তোলেই না। কেবল বলে, ভগবান আপনাকে পাঠিযেছেন সেজবাবু, আমার ছেলেটাব যা-হোক একটা ভালো কাজেব ব্যবস্থা কবে দেন, সেই টাকায় আমবা একবেলা খেযে থাকব—তা না হলে ছেলেটা আমাদেব লিভাব পচেই মরে যাবে। এখনই মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা হয।

আমি বন্ধুকে বললাম, এবার যদি সব কিছু তোমাব হিসেবেব বাইবে মনে হয় তো সবস্বতীব ছেলেটাব জন্য তুমি কিছু করবে। ইউনিযনেব মস্ত মাতব্বব তুমি, ইচ্ছে কবলেই কর্তাদেব বলে তুমি ওকে একটা বেযাবাব কাজে ঢুকিযে দিতে পাবো। ছেলেকে নিযে আমি ওকে কাল সকালে তোমার এখানে আসতে বলেছি।... আব, ঘরে বসেও সবস্বতী কি কবে কিছু রোজগাব কবতে পাবে সে-কথাও ভাবব বলে তাকে কথা দিযে এসেছি।

বন্ধু নির্বাক। স্তব্ধ। তাঁব স্ত্রীব চোখে জল।

সাধিকা

ভব দুপুবে সত্যিই আমাকে অত দূরেব মহাশ্মশানেব দিকে পা বাড়ানোব জন্য প্রস্তুত হতে দেখে সুবসিক শ্রী মুখোপাধ্যায ফাঁপবে পড়লেন যেন। অনেকটা নিজেব ওপরেই দোষাবোপ কবে বললেন, পাগলকে সাঁকো নাড়তে নিষেধ কবে মুশকিলে পড়া গেল দেখি। তাছাড়া আজও সে ব্যাটা বেঁচে আছে কিনা ঠিক কি, কতকাল আব ও-পথ মাড়াইওনি দেখিওনি ওকে—

ঝোলাটা কাঁধে ফেলতে ফেলতে বললাম, লেটেস্ট খববটা আমিই আপনাকে দিতে পাবব তাহলে, দেখে আসি—

শ্রী মুখোপাধ্যাযেব অনুবাগী পাশেব প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি আমাব কানে কানে বললেন, কাঁধে আবার ঝোলা কেন, বাধু ভৃঙ্গীব হৃদয জয করাব কিছু বসদটসদও সঙ্গে নিলেন নাকি?

হেসে জবাব দিলাম, না, ওটা আমার পর্যটন-সঙ্গী...তবে আগে জানলে ভাবতাম।

সাদা কথায় ঝোলাতে সুবাব বোতল-টোতল কিছু আছে কিনা সেই ঠাট্টা করেছেন তিনি। শ্রী মুখোপাধ্যায়ও সেটা বুঝেছেন, কিন্তু সেদিকে কান না দিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে আমার খেয়ালটা নাকচ কবতে চাইলেন তিনি। বললেন, আবে বাবা সে কি এখানে, যেতে-আসতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে, কি ফ্যাসাদে পড়ো ঠিক আছে, যে দিন-কাল পড়েছে—

এই স্থানে আমার পদার্পণও এক আকস্মিক খেয়ালের ব্যাপার বললে অত্যুক্তি হবে না। এসেছিলাম শান্তিনিকেতনেব পৌষ উৎসবে। বয়সের দোষে চোখের প্রসাদ আর নিভৃতেব বর্ণবৈচিত্র্য কতটা খোয়া গেছে জানি না, বহুবারের দেখা এই উৎসবের সবটাই ছকে বাঁধা আনুষ্ঠানিক মনে হচ্ছিল। আসল কথা, কবি-গুরুব চিবকিশোব রসের কাবিগবটি যে কারণেই হোক আমাব মধ্যে যে একেবারে অনুপস্থিত সেটাই অনুভব করছিলাম। দু'দিনেই হাঁপ ধবে গেছল, অথচ হাতে ঢালা অবকাশ।

ঝোলা কাঁধে বেরিযে পডেছিলাম। স্টেশনে এসে এই লাইনেব একেবারে শেষ মাথাব এক জায়গাব টিকিট কেটে ট্রেনে চেপে বসেছি। সেখানে আমাব এক আত্মীয় থাকেন, দিনকতক তাঁব কাছে কাটিযে আসা যাবে।

কিন্তু টিকিট যেখানকাবই কাটি, সেটাই যে গন্তব্যস্থান হবে তাব কি মানে। মোটকথা আমাব গন্তব্যস্থান আমি নিজেই জানতুম না। দিগন্তছোঁযা ধানকাটা শুকনো মাঠ আব শীতেব শুকনো খাল-বিল দেখতে দেখতে দু'চোখ ক্লান্ত। দিবানিদ্রাব অভ্যাস নেই তবু ঝিমুনি এসে গেছল।

শীতেব ছোট বেলা পড-পড তখন। এক জাযগায ট্রেনটা থামতে চোখ মেলে আর তাবপব জানলায ঝুঁকে স্টেশনেব নামটা দেখে নিতে গেলাম।

যোগাযোগ বলতে হবে। সেই মুহূর্তে আমাব গন্তব্যস্থল বদলে গেল। স্টেশনেব নামটাই হঠাৎ যেন আমাকে ঘাড ধবে টেনে নামাতে চাইল। ট্রেন বডজোব এক মিনিট দাঁডাবে, তাব মধ্যে আধ মিনিট কাবাব। ঝোলাটা টেনে নিযে ব্যস্ত সমস্তভাবে দবজাব দিকে এগোলাম। পাশেব যে বযস্ক ভদ্রলোকটিব সঙ্গে ঘন্টাখানেক আগেও গল্প কবছিলাম, আমাব কাণ্ড দেখে তিনি হাঁ। কাবণ আমাব গন্তব্যস্থান কোথায সহযাত্রীব স্বভাবগত কৌতূহলে আগেই তিনি জেনে নিযেছিলেন। কিন্তু তাব বিস্ময নিবসনেব আব সময় ছিল না। গাড়ি থেকে লাফিযে নামতেই জানলা দিযে ঝুঁকে তিনি চেঁচিযে উঠলেন, ও মশাই আপনি এখানে নামলেন যে?

জবাবদিহি কবলাম, এখানে একজনেব কথা মনে পডে গেল তাই—

এতক্ষণ কোনো পাগলেব পাল্লায পডেছিলেন কিনা ভদ্রলোকেব দুই গোল চোখে সেই সংশয। ওদিকে গাডি ততক্ষণে আবাব নডেছে। ভদ্রলোক তখনো জানলায ঝুঁকে আছেন। তাঁর মুখখানা দেখে কৌতুক বোধ কবেছিলাম বলেই সেই মুখ দৃষ্টিব আড়াল না হওযা পর্যন্ত আমি দাঁডিযেই বইলাম।

প্ল্যাটফরম ততক্ষণে ফাঁকা। অল্প কযেকজন লোক মাত্র নামা-ওঠা কবেছে। আমি যখন বেরুলাম টিকিটটা নেবার জন্য গেটে চেকাবও দাঁড়িযে নেই।

স্টেশন থেকে নেমে মাটিতে পা ফেলাব সঙ্গে সঙ্গে গোটাচারেক সাইকেল-বিকশা একসঙ্গে যেন তেডে এলো আমাব দিকে। মিলিত গলায ডাকাডাকি বেষাঝিষি। সেই মুহূর্তেব মধ্যেই মনস্থিব কবে ওদেব সকলের উদ্দেশেই মাথা নেড়ে সামনেব নাক-ববাবব একটি মাত্র সোজা বাস্তায পা বাডালাম। দু'দিকে ধানী জমিব মাঝখান দিয়ে লাল মাটিব উঁচু রাস্তা কম কবে মাইলখানেক প্রায সোজাই চলে গেছে। পথ হাবাবাব বা ভুলচুক করাব সম্ভাবনা নেই। তাবপব গাঁযে পা দিলে যাকেই জিজ্ঞাসা করব সেই

শ্রী মুখোপাধ্যাযের বাড়ির হদিস বাতলে দেবে। এক বছবও হযনি শ্রী মুখোপাধ্যায় নিজেই আমাকে বলেছিলেন, স্টেশন থেকে সাইকেল রিকশয উঠে আমাব নাম কোরো, সে সোজা আমাব বাড়িতে দবজায় এনে নামিযে দেবে তোমাকে। আব গাঁযে পা দিয়ে যাকে জিজ্ঞেস কববে সে-ই বলে দেবে।

বলা বাহুল্য যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিব বাড়িতে ধূমকেতুব মতো আমি গিযে হাজিব হতে চলেছি, ট্রেন থেকে স্টেশনেব নাম দেখামাত্র এই শ্রী মুখোপাধ্যাযেব হাসি-খুশি মুখখানাই আমাব মনে পড়েছে। শ্রী মুখোপাধ্যাযেব নামটা অনুক্ত বাখাব কারণ, বাংলাদেশেব সাংস্কৃতিক আব তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞদেব তালিকায অন্তত ওটা সুপবিচিত নাম। তাঁব অনেক বচনা স্নাতক-পাঠ্য। তাছাড়া তাত্ত্বিক বিশেষজ্ঞ বলতে কোনো খটমট বস্তু তাঁব গবেষণাব বিষয় নয, উল্টে ববং বসতত্ত্বেব কাববাবী হিসেবে তাঁব সুনাম আছে। মোট কথা বিদগ্ধ জনেব কাছে তিনি জ্ঞানী এবং গুণী হিসেবে শুধু সুপবিচিত নয, বিশেষ শ্রদ্ধাব পাত্রও। তাই কাহিনীব মধ্যে সবাসবি তাঁব নামটা টেনে আনতে আপত্তি। আপত্তি আমাব থেকেও তাঁব বেশি। আসাব আগে হাসিমাখা সস্নেহ অনুযোগে বলেছিলেন, বাড়ি গিযে এবপব কি কববে বুঝতেই পাবছি, যাই কবো তাই কবো তোমাদেব ওই গাঁজাব চমকেব মধ্যে আমাব হাতেই যেন কল্কেটি চাপিযে দিও না।

শ্রী মুখোপাধ্যায এই বর্ধিষ্ণু গাঁযেব এক বক্ষণশীল নামী পবিবাবেব মানুষ। তাঁব পিতৃপুরুষেবা নিষ্ঠাসহকাবে ধর্মচর্চা কবেছেন আবাব নিষ্ঠাসহকাবে নিজেদেব জমিজমাও বক্ষা কবে গেছেন। শ্রী মুখোপাধ্যাযেব আমলে সেই ভিটেমাটি জমি-জমাব পবিধি আবো বেড়েছে।

বছব দুই আগেও কলকাতাব সঙ্গে তাঁব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। মাসে দুই একবাব আসতেনই। নিজেব বইপত্রেব তদাবকে আসতে হত, তত্ত্বতথ্যেব গ্রন্থাদি ঘাঁটাঘাঁটিব তাগিদেও আসাব দবকাব হত। তাছাড়া স্নেহবদ্ধ বহু শুভার্থীজনেব তাগিদ তো ছিলই। বযসেব দরুন যাতাযাত ক্রমশ কমেছে। বছবখানেক হল আসা একেবাবেই বন্ধ হযে গেছে। আমি তাঁব দীর্ঘদিনেব স্নেহেব পাত্র। ওবকম খাঁটি স্নেহ এই যুগে বিবল। চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল। শেষ চিঠিতে তিনি লিখেছেন, দেহ-যন্ত্র ঢিলে-ঢালা হযে এসেছে, আব ছোটাছুটি পোষায না, তাছাড়া যে দিন পড়েছে মনেব অবস্থাও সর্বদা বিষ-বিষ। তোমাদেব দেখতে ইচ্ছে কবে, কিন্তু নিজে না ছুটলে তো তোমাদেব দেখা পাওযা ভার।

এই চিঠিও মাস ছযেক আগেব।

...স্টেশনেব নামটা চোখে পড়া মাত্র এই মানুষই দু'খানা অদৃশ্য হাত বাড়িযে আমাকে যেন হিড়হিড় কবে টেনে নামিযেছেন।

দেযাল-ঘেবা অনেকটা জমিব মধ্যে দালান-কোঠা। টিনেব গেট সবিযে ভিতরে ঢুকলে মাঝেব বাস্তাটা চক্রাকাবে বেঁকে দালানেব সিঁড়িব মুখে ঠেকেছে। এই পথটুকুতে আলো নেই বটে ; তবু চাঁদেব আলোয বোঝা যায বাস্তাব একদিকে ফুলের বাগান অন্যদিকে সবজি অথবা ফলেব ক্ষেত। টিনেব গেট সবানোব সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে গোলাপের গন্ধের ছড়াছড়ি।

আমাকে দেখামাত্র বৃদ্ধেব মুখেব সেই বিস্ময আব খুশিব কারুকার্য ভুলব না। চোখেব সামনে দেখেও তিনি যেন বিশ্বাস কবতে পাবছেন না।

শ্রী মুখোপাধ্যাযকে এত কাছে আব এমন ঢালা অবকাশেব মধ্যে আব কখনো পাইনি। নিঃসঙ্গ জীবনে আমি যেন তাঁব পবম লোভনীয কেউ একজন। তাঁব গৃহিণী সর্বদা পুজো আর্চা নিযে থাকেন আব তিনি নিজেব পুঁথিপত্র নিযে। তাঁদেব দুটি ছেলেই কৃতী এবং বাইবে হোমবাচোমবা চাকুবে। এখানে তাঁব জ্ঞাতিবাই আছে জনাকতক, আব আশপাশে বযস্ক ভক্ত আছে কিছু। এখানে আসাব পবদিন সকালেই নিজেব হাতে তিনি আমাব বাড়িতে চিঠি লিখে জানান দিযেছেন আমি এখানে আছি এবং দিন-কতক থাকব।

প্রথম দিন কযেক একলা আমাকে কোথাও যেতে দেননি ভদ্রলোক। নিজে সঙ্গে নিযে ঘুবেছেন আব দূবে বেড়াবাব ইচ্ছে দেখলে সাইকেল বিক্সা ডাকিযে আগেব ভাগে তিনি ওতে চেপে বসেছেন। নিজেই আবাব কৈফিযত কবেছেন, তুমি অচেনা মানুষ, দিন-কাল ভালো নয হে

তাঁব ভযটা অনুমান কবতে পাবি। খববেব কাগজে ইদানীং এ অঞ্চলেব আপদ-বিপদ সম্পর্কে কিছু লেখালিখি চলেছে কলকাতা থাকতেই লক্ষ্য কবেছি।

সন্ধ্যে না হতে বাইবেব সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। তখন ঘবে বসে কেবল গল্প আব গল্প। গোড়ায গোড়ায বাত বাবোটা একটাও বেজে গেছে। আমি বলেছি, আপনাব শবীব খাবাপ হবে যে, শুতে যান—

উনি বলেন, হুঁঃ তোমাদেব আজকালকাব ছেলে ছোকবাব শবীব পেযেছ।

সন্ধ্যাব আসবে গৃহস্বামীব জনাকতক ভক্ত এসে যোগ দেন। একটা নৈমিত্তিক ব্যাপাব। এখানকাব মানুষদেব সুখ সুবিধে আপদ বিপদেব কথাই বেশি হয। বর্তমানেব নানা সমস্যা আব সেই সমস্যাব দুর্নিবীক্ষ্য সমাধান নিযে মাথা ঘামান। আমি নীবব শ্রোতা।

খাওযা-দাওযাব পব সেদিন দু'জনে মুখোমুখি গল্প কবতে বসে জিজ্ঞাসা কবলাম, দিনকালেব হাওযা তো এই, আপনাব যে এত জমি-জমা, লোকেব চোখ টাটায না?

শ্রী মুখোপাধ্যায হেসে জবাব দিলেন, টাটানোটাই তো স্বাভাবিক, তবে আমি শুরু থেকেই কিছুটা ভাগ কবে ভোগ কবে আসছি বলে এখনো অনেকে সদয আমাব ওপব। এটুকুও বেশি দিন থাকবে না, আব খাবাপ দিন আসছেই তাব কোন ভুল নেই।

—আপনাব ভয কবে না?

—ভয কবে কি লাভ, তবে অস্বস্তি হয বটে..এত বছবেব লোভেব সংস্কাব চট কবে কাটিযে ওঠা তো সহজ কথা নয বে ভাই, তা যা খাবাব ভাবনা একটু থেকেই যায।

কাবো প্রতি অভিযোগ নেই, নিজে সব ছেড়েছুড়ে দিতে পাবছেন না সেটাই যেন সমস্যা। একটু বাদে অনেকটা নিজেব মনেই তিনি যে কথাগুলো বললেন কান পেতে শোনাব মতই। বললেন, ইংবেজ শাসন ফুবোবাব ঢেব আগে থেকেই এ-দেশেব

মানুষ তাব নীচেব মানুষেব ওপব অত্যাচাব চালিযে এসেছে। আব পঁচিশ বছবেব. এই স্বাধীনতাব পবেও তাব বকমফেব হযনি। নীচেব মানুষ আব কতকাল নীচে পড়ে মাব খাবে বে ভাই...এখন আমবা হায হায কবলে কি হবে, যা হবাব তাই হচ্ছে।

কথায কথায নিজেব দেখা কিছু কিছু অত্যাচাবেব গল্প কবলেন তিনি, প্রতিশোধেব নেশা কেমন বক্তে এসে যায সেটাই বক্তব্য।

এই প্রসঙ্গে হঠাৎ এমন একটা গল্প মনে পড়ল তাঁব যাব সামান্য কাঠামোটা শুনে আমি নড়েচড়ে সোজা হযে বসলাম। গল্পে গল্পে তখন অবশ্য আমবা দিন-কালেব সমস্যাব প্রসঙ্গ থেকে অনেকটাই সবে এসেছিলাম। গল্পই কবছিলাম আব গল্পই কবছিলাম আব গল্পই শুনছিলাম। এবই মধ্যে তাঁব ওই শোনা ঘটনাটা মনে পড়ে গেল। শোনা ঘটনাব পবিণামটা যে যথার্থ, তাতে কাবো সংশয নেই। কাবণ শেষেব ওই মর্মান্তিক ঘটনাব সেই বঙ্গমঞ্চ এখান থেকে মাত্র মাইল কযেক দূবেব মহাশ্মশান। ...দীর্ঘকাল আগেব সেই ব্যাপাবটা শোনাব পব বিভ্রান্ত হতচকিত হযে গেছল এখানকাব মানুষ। পবে বুকেব তলায কাঁপুনি ধর্বেছিল সকলেব। সে-দিনেব অনেক বৃদ্ধ আজও বেঁচে আছে, বোমহর্ষক একটা দৃশ্য অনেকে চাক্ষুষ দেখেও এসেছে। তাই ব্যাপাবটা পুবনো হযনি আজও...মহাশ্মশানেব কাপালিক বাবাব আসন শূন্য পড়ে আছে এখনো, মাথা ঘামাক আব না ঘামাক এ-গল্প অন্তত এখানকাব ছেলে-ছোকবাবাও জানে।

দু'যে দু'যে যোগ কবলে যেমন চাব হয, মহাশ্মশানেব ঘটনা যাঁবা দেখেছেন বা শুনেছেন তাঁবা একটা সহজ যোগসাধন কবেছেন আব তাবপব তেমনি সহজ একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কিন্তু শ্রী মুখোপাধ্যায তাঁদেব থেকে একটু বেশি জেনেছিলেন, একটু বেশি বুঝেও ছিলেন। কাবণ সেই তরুণ বযসে ওই মহাশ্মশানে তিনি প্রাযই যেতেন আব তাব ফলে সেখানকাব একটি বিশেষ লোকেব সঙ্গে তাঁব হৃদ্যতা হযেছিল।

...সেই লোকেব নাম বাধু ভৃঙ্গী। শ্মশানে বাস তাব, শবদাহ কবা তাব কাজ। ওই মহাশ্মশানে আব শবদাহ হয না দীর্ঘ দিন হযে গেছে। কিন্তু বাধু ভৃঙ্গী আজও স্থান ত্যাগ কবেনি, সেখানেই ডেবা বেধে আছে। সমস্ত ঘটনাব একমাত্র সাক্ষী সে। আজও লোকটা সেই দিনেব মতই স্মৃতিব যন্ত্রণায স্তব্ধ শোকাহত কিনা শ্রী মুখোপাধ্যায জানেন না।

...সেদিনেব সেই ঘটনা আগুনেব মতো এখানে ছড়িযে পড়তে উনিও মহাশ্মশানে ছুটে গেছলেন। অবশ্য গাঁযে ছিলেন না বলে তাব যেতে একটু দেবি হযেছিল, তাঁব পৌঁছুতে দুপুব গড়িযে বিকেল হযেছিল।...কিন্তু লোকটা ওই বাধু ভৃঙ্গী তাব সেই পাথবেব মতো বিশাল কুচকুচে কালো শবীবটা টান কবে, কোমবে দুই হাত বেখে তাব বাবাব ডেবা আব মাযেব ডেবাব মাঝেব অশ্বত্থ গাছটাব দিকে ঘাড় উঁচিযে চেযে হা-হা-হা-হা শব্দে হাসছিল। অন্তবাত্মা কেঁপে ওঠে এমন হাসি। ওব সেই হাসি নাকি সকালে আবো বেশি শোনা গেছে। সকলে ধবে নিযেছিল লোকটা পাগল হয়ে গেল।

...শ্রী মুখোপাধ্যায ওকে হাসতে যেমন দেখেছেন, দুই এক দিনেব মধ্যে আবাব স্তব্ধও হতে দেখেছেন তিনি। ওব মুখ থেকেই অসংলগ্ন এমন কিছু কিছু উক্তি শুনেছেন

তিনি যে সমস্ত ব্যাপারটার কার্যকারণ তিনি অন্যভাবে দেখতে চেষ্টা করেছেন। আর তার ফলে, প্রতিশোধের নেশা রক্তে মিশলে প্রাণপাত চেষ্টা করেও তার থেকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় কিনা সেই সংশয় আজও কাটেনি তাঁর।

মোটামুটি ঘটনাটা শুনে আমিও স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম খানিক। কি ভেবে হঠাৎ উনি মন্তব্য করলেন, অনুমান যা-ই করি না কেন, আমার এখনো কিছু জানতে বাকি বুঝলে...ওই বাধু ব্যাটার সঙ্গেও কোনো একটা মেয়ে-টেয়ের ঘটঘট ব্যাপার ছিল কিছু বুঝলে...কিন্তু ওই সাংঘাতিক ঘটনার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক সেটা আজও জানি না।

উৎসুক মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, এ-রকম ভাবছেন কেন?

—লোকটাকে কঠিন পাথর বনে যেতে দেখে একদিন সান্ত্বনা দেবার জন্য বলেছিলাম, তুই তো মরদ আছিস রে, শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়া—। ও বিড়বিড় করে জবাব দিল, শক্ত তো আছি, কিন্তুক ভাবছি..। জিজ্ঞেস করলাম, কি ভাবছিস? ও ঘোলাটে চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল, অনেকক্ষণ পর্যন্ত পলক পড়ে না, শেষে তেমনি বিড়বিড় করে বলল, মুন্নিকে আখুন কুথা পাই? আমি অবাক হয়ে বার বার জিজ্ঞেস করতে লাগলাম, মুন্নি কে? যত শুধোই একটা যন্ত্রণা যেন ওর সেই গোল গোল কালো চোখ দিয়ে ঠেলে বেরুতে থাকে—তারপর রেগে গিয়ে আমাকে তেড়ে মারতে এলো প্রায়। যে ক'দিন মুন্নির কথা জিজ্ঞেস করেছি, ও ক্ষেপে উঠেছে, যাচ্ছেতাই গালাগালি করে আমাকে তাড়াতে চেয়েছে। শেষে শাসিয়েই দিল, ফের ওর কাছে এসে ঝামেলা করলে ও চেলা-কাঠ দিয়ে মেরে আমাকে জন্মের মতো ঠাণ্ডা করে দেবে।. এর পরেও গেছি অবশ্য, শেষ গেছি বছর দশেক আগে, তখন অনেক ঠাণ্ডা মানুষ, গোড়ায় ভালো করে চিনতেই পারেনি, তারপর বলেছে, বাবার আসনটা খালি পড়ে থাকল, কেউ আলো না, কেউ বসল না, উ আসন খালিই থাকল রে বাবু...।

এ পথে পা বাড়াতে পেরেছি আরও দিন চারেক পরে। আমাকে নাছোড়বান্দা দেখে বাড়ীর কর্তাটি শেষে সঙ্গে লোক দিতে চাইলেন। কিন্তু আমার তাতে প্রবল আপত্তি। এতদিনে আমি এপারে অনেকটা পরিচিতি লাভ করেছি। তাছাড়া যে এলাকাটি আমার লক্ষ্য সেই জনমানবশূন্যস্থানে লোক-বসতির জটিল মানসিকতার কোনো ঢেউ গড়ায়নি। অতএব শ্রী মুখোপাধ্যায়ের যে দুশ্চিন্তার খুব একটা কারণ নেই সেটা তিনি নিজেও জানেন।

চলেছি...।

নির্জন পথে নিঃসঙ্গ চলার একটা আকর্ষণ আছে। দুই চোখ ভরাট করে করে চলার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিতে পারার আনন্দ আমার অনেকখানি বড়। এক কথায় সব-কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে থেকেও 'আমি' নামে ছোট গণ্ডীর মানুষটাকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

উত্তর দক্ষিণ পূব পশ্চিম যে-দিকে চোখ যায়, যতদূর চোখ যায় কেবল ধান ক্ষেত আর ধান ক্ষেত। চারদিক থেকে যেন দিগন্ত ছুঁয়ে আছে। ধান কেটে নেওয়ার ফলে ধু-ধু রিক্ত দশা। তারই ভিতর দিয়ে আঁকা-বাঁকা পায়ে চলা সরু পথ ধরে চলেছি।

শীতকাল না হলে আলাদা-গোখবাব ভয়ে অনেক ঘোবা-বাস্তা ধবতে হত। জাযগায জাযগায ছোট ছোট ঝোপ ঝাড জঙ্গল। ধান ক্ষেতেব সবুজেব মিতালী খুইযে ওগুলো যেন নিঃসঙ্গ হযে আছে। উত্তব দিকে সরু একটা নদী। নদীটা হেজে মজে গেছে। শুনেছি বর্ষায জল এলে এই নদীই চাবদিকেব চাষেব জমি ভাসিযে দেয। চাষীবা নাকি উপকাবী বন্ধুব মতো ভাবে এই নদীটাকে। এটা আছে বলেই এখানে চাষ আবাদ আছে।

শুকনো নদী হেঁটে পাব হলাম। মহাশ্মশানে পা পডল।

এই শ্মশানেব পবিধি ভিতবে বহু দূব পর্যন্ত চলে গেছে। শবদাহ তো সর্বদাই নদীব ধাবে হযে থাকে, শ্মশান ভিতবেব দিকে বিস্তৃত হল কেমন কবে?

...হল, কাবণ এক মহাতান্ত্রিক সাধকেব পদার্পণ ঘটেছিল এখানে। তিনি জনসমাগমেব ধাবে কাছে থাকতে চাননি। ভিতবেব দিকে চলে গিযে মনেব মত নির্জন সাধনাব জাযগা বেছে নিযেছিলেন। লোকে বলাবলি কবেছে দীর্ঘ অনুসন্ধানেব পবে মহাতান্ত্রিক নাকি তাব সাধনাব স্থান খুঁজে পেযেছেন। হাজাব বছবেব পুবনো এই মহাশ্মশান। কিছুকাল আগে পর্যন্ত এইখানেই বহু দবেব মানুষেবও দাহ-কর্ম সম্পন্ন হত। এখন গাঁযেব লাগোযা শ্মশান হযেছে, এখানে আব শবদাহ হয না।

কিন্তু আজও মহাশ্মশান বলতে এটাই।

নদীব ধাব ছেড়ে খানিকটা ভিতবেব দিক ধবে এগিযে চলেছি। কোথাও কোনো প্রাণেব চিহ্ন নেই। এমন কি একটা শেযাল কুকুবও চোখে পডল না। তাই আপন অস্তিত্ব এখানে যেন বড বে-খাপ্পা বকমেব সচেতন।

অনেকটা এগোবাব পব একটা ছোট্ট জীর্ণ মন্দিবেব কাঠামো চোখে পডল। আব ঠিক তখনি আমাব সমস্ত তন্ময়তা একাগ্র হযে উঠল।...মন্দিবেব থেকে পঞ্চাশ গজেব মধ্যে দুটো পর্ণকুটীবেব ধ্বংসাবশেষ এখনো দাডিযে আছে। ধ্বংসাবশেষ বলতে কতগুলো কবে পোকায-খাওয়া কাঠেব থাম আব মাটিব ভিত। মাথাব ওপব চালা নেই একটাবও। এতকালেব ঝডে জলে নিশ্চিহ্ন হযে গেছে।

...দুটো কুটীবেব মাঝে চল্লিশ গজেব মতো ফাবাক। ওই দুটো ঘবেব কাঠামোব মাঝে আজও সেই অশ্বত্থ গাছটা দাঁডিযে—যেটাব দিকে তাকিযে বাধু ভৃঙ্গী অট্টহাসি হেসে লোকেব হাড-পাঁজবে কাঁপুনি ধবিযে দিযেছিল।

ওই দিকেই আবো কম কবে একশ গজ তফাতে আব একটা কুটীব। সেই তৃতীয কুটীবও জীর্ণ কিন্তু এ-দুটোব মতো ভগ্নদশা নয। মাথাব ওপব চাল আছে। আমাব মন বলে দিল ওটাই লক্ষ্য। ওখানে বাধু ভৃঙ্গী থাকে।...আগেও থাকত, এখনো থাকে।

কিন্তু এখানে আসাব পব আমাব যেন তাডা নেই আব। হাতে যেন অঢেল সময। স্থান মাহাত্ম্য কিনা জানি না।...একদিন এখানে লোক এসে আব নডতে চাইত না। অনেকে বাতেব পব বাত হত্যা দিযে পডেও থাকত। পাযে পাযে আমি ওই ভগ্নজীর্ণ মন্দিবেব সামনে এসে দাডালাম। কিন্তু মন্দিব বা মন্দিবেব বিগ্রহ আমাব চোখ টানছে না। উৎসুক চোখে খানিক দূবেব বাঁধানো বেদীটাব দিকে তাকালাম। পাযে পাযে সেদিকে এগিযে গেলাম।...না বেদীব ওপব বাঘেব বা হবিণেব কোনো চামডাব আসন বিছানো নেই। থাকাব কথাও নয।

কাবণ ওই বেদীটাই আসন। মহাতান্ত্রিক সাধকেব সহস্রমুণ্ডীব আসন।

...আচ্ছা, সোজা গিযে যদি ওটাব ওপব বসে পডি? কি হবে? কি বিপর্যয় ঘটবে? ...ভিতবটা কি সত্যিই জ্বলে যাবে? পুডে যাবে? জ্বলতে জ্বলতে পুডতে পুডতে সত্যিই কি মবণ ছোটা ছুটতে হবে আমাকেও?

যাক, আমি এখানে নাটক কবতে আসিনি, চোখেব ভোজ আব মনেব ভোজেব এক অলক্ষ্য আমন্ত্রণ আমাকে এখানে টেনে এনেছে।

.. সেই মহাতান্ত্রিক সাধক এইখানেই প্রথম সাধনায বসেছিলেন। লোকে দূব থেকে দেখত তাঁকে, কাছে আসাব সাহস ছিল না। প্রাণেব দাযে কেউ যদি কাছে আসত চোখেব আগুনে তিনি জ্যান্ত ভস্ম কবতে চাইতেন তাকে। তাতেও কাজ না হলে চিমটে নিযে তাড়া কবতেন। সে-বকম দবকাব কমই হত, ভক্তব প্রাণ তাব আগেই খাঁচা-ছাড়া হত প্রায। কিন্তু মাঝেমধ্যে মহাতান্ত্রিক নিজেই আসতেন নদীব ধাবে শবদাহ দেখতেন, সকৌতুকে মৃতেব আত্মীয পবিজনদেব কান্নাকাটি দেখতেন। একবাব এক অভাবিত কাণ্ড ঘটে গেল। মাযেব একমাত্র সন্তান বছব দশেকেব এক ছেলে মাবা গেছে। সেই ছেলেব মা পাগলিনীব মতো ছুটে এসেছে। কেউ তাকে ধবে বাখতে পাবছে না। শ্মশানে এসেও সে ছেলেকে আঁকডে ধবে আছে, কিছুতে নিতে দেবে না। আত্মীয পবিজনেবা নিরুপায হযেই দেহ ছিনিযে নেবাব উপক্রম কবছে।

অনতিদূবে মহাতান্ত্রিক দাডিযে দেখছিলেন। হঠাৎ চিৎকাব কবতে কবতে ছুটে এলেন। আত্মীয পবিজনদেব ধাক্কা মেবে সবিযে দিলেন। তাবপব গর্জন, ছেলেটাব দেহে প্রাণ আছে এখনো, পাষণ্ডবা তাকে চিতায দিতে যাচ্ছিস। তোবা যা, তোবা চিতায উঠগে যা।

...আধ ঘণ্টাব মধ্যেই সকলে দেখল সেই ছেলেব দেহে প্রাণ আছে বটে। এই ঘটনাব সাক্ষী কেউ নেই,, কাবণ এই মহাশ্মশানে মহাতান্ত্রিকেব পদার্পণ দেড়শ' বছব আগেব কথা কি তাবও বেশি কেউ বলতে পাবে না। কিন্তু সদ্যদেখা কিছুব মতই ওই সাধুব কথা আব তাব অলৌকিক ক্রিযাকলাপেব কথা আজও তাজা আছে।

যাক. তাবপব থেকেই সাধুব নির্জন বাস ঘুচে গেল প্রায। তাব বুকেব তলায যে স্নেহমাযা মমতাব ফল্গুধাবা বইছে এটা গ্রামবাসীবা টেব পেযে গেল। এবপব জ্বলন্ত চেলাকাঠ নিযে তাড়া কবেও ভক্ত হটানো যেত না।

তাদেব ভিড বাডতেই থাকল, ভক্তি বাডতেই থাকল। দূব দূবান্তে সাধুব মাহাত্ম্যেব কথা ছড়াতে থাকল। অলৌকিক উপাযে সাধু মানুষেব ব্যাধি দূব কবছেন, দুর্দৈব খণ্ডন কবছেন। সাধুব কৃপায বাজা মেযেমানুষও সন্তানবতী হযেছে। জমিব অজন্মা ঘুচে গিযে ফসলেব জোযাব এসেছে—এমন কত তাজ্জব কাণ্ড। সাধু মুশকিলআসান।

মুগ্ধ ভক্তেব সংখ্যা বাডছেই, বাডছেই। তাবা সাধাবণ লোক, কাছেব দূবেব দশ গাঁযেব মানুষ। তাদেব উৎসাহে বিপুল টাকা সংগ্রহ হল, শ্মশানে ওই কালীমন্দিব প্রতিষ্ঠা হল। আব প্রতিষ্ঠা হল মহাতান্ত্রিকেব ওই সহস্র মুণ্ডীব আসন। তাঁব বাসেব পর্ণকুটীবও তৈবি কবে দিল তাবা। বছব ঘুবেছে অনেকগুলো। মহাতান্ত্রিক ওই সহস্রমুণ্ডীব আসনে বসেই দেহবক্ষা কবেছেন।

এরপর শ্মশান থাকল, মন্দির থাকল, ভক্তদের আনাগোনাও অব্যাহত থাকল কিছুকাল। কিন্তু বাবার সহস্রমুণ্ডীর আসন শূন্য। আর সেই শূন্যতা সমস্ত মানুষের বুকের তলায়। কে বসবে ওই আসনে? বিভিন্ন জায়গা থেকে সাধু সন্ন্যাসীরা এসেছে, লোভে পড়ে বাবার আসনে বসেছে। কিন্তু দু'দিনও টিকতে পারেনি। আসন ছেড়ে উঠে পাগলের মতো যেন মরণ ছোটা ছুটেছে তারা। আর আর্তনাদ—জ্বলে গেলাম, জ্বলে গেলাম—পুড়ে গেলাম। সেই সব সাধুদের গাঁয়ের কোথাও দেখা যেত না আর।

যুগের পর যুগ কেটে যাচ্ছে। আসন তেমনি ফাকা। ওটা এমনি ভীতির কারণ হয়েছে যে আর কোনো সাধু তেজ দেখিয়ে ওতে বসতে চেষ্টা করে না। খুব স্বাভাবিকভাবেই গাঁয়ের মানুষেরা ওই সিদ্ধাসনের কথা ভুলতে বসেছে।

হঠাৎ কাছে দূরের সব গাঁয়ে বিষম চমক একদিন। সেই চমকের সাক্ষী শ্রী মুখোপাধ্যায়, তার সমসাময়িক আরো অনেক বৃদ্ধ। কাতারে কাতারে লোক ছুটল মহাশ্মশানের দিকে।

এত যুগ পরে মহাতান্ত্রিকের সেই সিদ্ধাসনে এসে বসেছে এক তরুণ সাধক। খুব বেশি হলে বছর উনিশ কুড়ি হবে বয়েস। একে একে তিনদিন অনাহারে ওই তন্ত্রাসনে ধ্যানমগ্ন হয়ে আছে। মাথা বিগড়োয়নি এতটুকু, কোনোরকম তাপ উত্তাপের চিহ্ন মাত্র নেই।

সেই তরুণ তান্ত্রিককে প্রথম আবিষ্কার করেছে বাধু চণ্ডাল। তার শ্রেণীর মধ্যে সে তখন ডাকসাইটে যুবক। শ্মশানে শবদাহ করে বটে কিন্তু স্বজাতীয়দের সঙ্গে থাকে না। দূরের ওই পর্ণকুটীরে বাস তার। আড়ালে সকলে বলাবলি করে, স্বভাব চরিত্র ভালো না, রাতে মাঝে মাঝে মেয়ে নিয়ে আসে আর ভয়ানক নেশা করে বলে স্বজনের সঙ্গে থাকে না। সামনে কেউ কিছু বলে না কারণ, লোকটার স্বভাব যেমন দুর্দান্ত তেমনি উগ্র।

অমাবস্যার গভীর রাত্রিতে সেই প্রথম ওই তরুণ তান্ত্রিককে সহস্রমুণ্ডীর আসনে তপোমগ্ন দেখেছে। নেশার ঘোরে কিছু দেখেছে কিনা নিজেরই সেই সন্দেহ হয়েছিল। পরপর তিনদিন তিনরাত ওই আসনে দেখেছে ওই বালক সাধুকে। ওই তিনদিন বাধু তার কাছ থেকে নড়েইনি বলতে গেলে। কাজেও যায়নি। কাণ্ড দেখে বুকের ভিতরে তোলপাড় শুরু হয়েছে তার। নতুন বাবাকে একবার চোখ খুলে তাকাতে পর্যন্ত দেখেনি।

তারপর সে-ই অপরকে জানান দিয়েছে। দেখতে দেখতে নতুন বাবার কথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে।

গাঁয়ের মানুষ নতুন বাবা বলেই ডেকেছে সেই কিশোর তান্ত্রিককে। শ্রী মুখোপাধ্যায়ও স্বচক্ষে দেখেছেন তাকে। ভয়ানক কৃশ দেহ, অথচ তাই থেকে সত্যিই যেন আগুনের ছটা বেরুচ্ছে। একমাথা ঝাকড়া চুল। বয়েস কুড়ির মধ্যে মনে হয়েছে। কিন্তু তারই মধ্যে রটনা শুরু হয়ে গেছে, বয়সের গাছ-পাথর নেই নতুন বাবার —কারণ সহস্রমুণ্ডীর সেই মহাতান্ত্রিকই নব দেহ ধারণ করে মানুষের কল্যাণের জন্য আবার ওই আসনে এসে বসেছেন।

তাকে দেখে ভিতবটা খচখচ কবেছিল শ্রী মুখোপাধ্যাযেব। অমন একটি নিষ্পাপ কচি মুখ আব বুঝি দেখেননি।..এ কোথা থেকে এলো এই ভীষণ শ্মশানে? কোথায ছিল, কোন মাযেব বুক খালি কবে এই পথে ছুটে বেবিযেছে?

জবাব পাননি।

নতুন উত্তেজনায দিন কাটতে লাগল। দিনেব পব দিন মহাতান্ত্রিকেব সহস্রমুণ্ডীব সিদ্ধাসনে নতুন বাবা সাধনায নিবিষ্টচিত্তে বিকাবশূন্য। একটি কথা বলে না, কাবো দিকে তাকায না। প্রায অনাহাবী।

ভক্ত-মানুষদেব আনন্দ ধবে না। কত যুগেব শূন্যতা ভবাট হযে গেছে। আপদে বিপদে তাবা ছুটে যেতে পাববে কাবো কাছে, কৃপাব আশায ধর্ণা দিতে পাববে। মহাতান্ত্রিকেব সেই পর্ণকুটীবেব স্থানেই নতুন বাবাব কুটীব তৈবি কবে দিল তাবা। ভেট আসতে লাগল থবে থবে। ভক্তেব সংখ্যা দলে দলে বাডতে থাকল। নানা উৎসবে শ্মশান মেতে উঠল।

কিন্তু এত উৎসাহেব এত মূলে যে নতুন বাবা তাব কিন্তু কোন দিকে হুস নেই। অপার্থিব সাধনায নিযত মগ্ন। সহস্রমুণ্ডীব আসনে উপবিষ্ট দিন-বাতেব বেশিব ভাগ সময। ভেট ফেলে ছডিযে একাকাব কবে। নিতান্ত খেযাল হলে কিছু মুখে দেয। আব নিতান্তই খেযাল হলে কুটীবে এসে বাত্রি যাপন কবে। নযতো আসনে কাটায, অথবা শ্মশানেই গডাগডি দেয।

এই নতুন বাবাব প্রথম কৃপাধন্য বাধু-চণ্ডাল। ওকেই প্রথম চোখ মেলে দেখেছিল, আব ওঁব সঙ্গেই প্রথম বাক্যালাপ। প্রাযই আব নিজেব ডেবাব যেত না বাধু। সমস্ত বাত কাছাকাছি বসে থাকত। নির্নিমেষে দেখত। ঘুমিযে পডলে চমকে জেগে উঠে আবাব দেখত। ওব ধাবণা নতুন বাবা ছদ্মবেশী মহাদেব ছাডা আব কেউ নয।

এমনি একটা বাতেব তখন তিন প্রহব হবে বোধহয। বাধু দেখে নতুন বাবা ওব দিকে ড্যাব ড্যাব করে চেযে আছে। শিউবে উঠে বাধু দুই হাত জোড কবল।

বাধু অবাক, নতুন বাবা হাসছে ওব দিকে চেযে।

—না খেযে এখানে পডে আছিস কেন?

সেই কণ্ঠস্বব কানে যেতে বাধুব সর্বাঙ্গে শিহবণ। জবাব দিযে বসল, তুমি তো ক'দিনেব মধ্যে খাওনি।

নতুন বাবা আবো হাসল, বলল, তুই ব্যাটা পাজীব শিবোমণি। বলে সামনেব ছডানো খাবাব তুলে নিযে ওব হাতে দিল, নে খা—।

নিজেও খেল।

আনন্দে আত্মহাবা বাধু বলেছে, তোমাকে আমি ঠিক চিনলাম গো, তুমি মহাদেও।

আবাব সেই হাসি। – তা চিনবি না, তুই যে আমাব নন্দীভৃঙ্গীব একজন...তুই ভৃঙ্গী।

সেই থেকে বাধু চণ্ডাল বাধু ভৃঙ্গী। আব তাবপব থেকে ও যেন নতুন বাবাকে খাওযাবাব একটা ফিকিবও পেযে গেল। বাবা দু'দিন না খেলেই ও নিজেও না খেযে বসে থাকে। বাবা বেগে যায আবাব হাসেও। সেই হাসি দেখলে মনে হয তিন বছবেব একটা কচি ছেলে হাসছে।

তাকে শ্মশানের মাটিতে গড়াতে দেখলে কুটীরে নিয়ে যাবার জন্য বাধুর ভিতরটা ছটফট করতে থাকে। কিন্তু খাওয়াবার মতো সে-রকম কোনো বুদ্ধি মাথায় আসে না।

ছ'মাসের মধ্যে মহাশ্মশানে দ্বিতীয় চমক আবার।

দ্বিধা-দ্বিপ্রহর সেদিন। মাথার ওপর সূর্যটা আগুনের গোলার মতো জ্বলছে। পা ফেলা যায় না শ্মশানের মাটি এমন তপ্ত। শ্মশান খাঁ-খাঁ করছে. রোদ চড়ার আগে ভক্তরা বিদায় নিয়ে গেছে। সকাল থেকে সেদিন আর নতুন বাবাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখেনি কেউ। সহস্রমুণ্ডীর আসনে গত রাত্রি থেকে সমাসীন, তপোমগ্ন।

হঠাৎ নিজের কুটীরে বসে বাধুর মনে হল ওই নির্জন দুপুরে ধ্যান-নিবিষ্ট বাবার সামনে দাঁড়িয়ে কেউ। বাধু দিনমানেই ডেরায় লুকিয়ে মদ খাচ্ছিল। এখন এ জিনিসটা লুকিয়ে চুরিয়ে খেতে হয়—বাবা টের পেলেই ধমক-ধামক করে। বাধু অবশ্য বলে, মহাদেওর ভৃঙ্গী নেশা করলে দোষ কি। প্রসন্ন থাকলে বাবা সেই কথা শুনে হাসে।

দু'চোখ ভাল করে রগড়ে নিয়ে দেখতে লাগল বাধু ভৃঙ্গী। ঠিক দেখছে না মদের ঘোরে দেখছে? কারণ বাবার সামনে এক রমণীকে দেখছে সে। এক পিঠ খোলা চুল কোমরের নীচে নেমে গেছে। পরনে থান। সোনার বরণ দুই হাত কোমরে।

রমণী অবশ্য অনেক আসে কিন্তু এই নির্জনে একলা কে আসবে? পাগল-টাগল নাকি।

নেশার পাত্র রেখে বাধু ছুটে এলো। তারপর হতভম্ব সে। রমণীই বটে। কিন্তু এমন রূপসী রমণী কি সে আর দেখেছে? তার সর্বঅঙ্গ যেন আগুনের লাল হল্কা নিয়ে তৈরি। রমণী বাবাকে দেখছে। দেখছেই দেখছেই দেখছেই। তার চোখ দিয়ে মুখ দিয়ে সর্বঅঙ্গ দিয়ে যেন আগুনের তাপ ঝরছে।

অদূরে দাড়িয়ে বিস্ফারিত নেত্রে তাকে দেখছে বাধু ভৃঙ্গী।

হঠাৎ এতবড় শ্মশানের স্তব্ধতা খানখান করে রমণী হেসে উঠল। খিল খিল হাসি। এমন রক্ত জল করা বেদম হাসিও বাধু আর দেখেনি বা শোনেনি। হাসছে তো হাসছেই। দুই হাত কোমরে তখনো। হাসির দমকে সেই অবস্থায় তার অঙ্গ বেঁকে চুরে যাচ্ছে।

বাধু ভাবল, এ পাগলিনী। নইলে কাঠফাটা রোদে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে এভাবে কেউ হাসতে পারে না।

কিন্তু পরক্ষণে তার কথা শুনে বাধু বিষম চমকেই উঠল বুঝি। রমণী হাসছে তেমনি আর বার বার করে বলছে, আমি চিনেছি ঠিক চিনেছি, তুমি আমাকে ফাঁকি দেবে ভেবেছ? আমাকে?

আবার সেই হাসি।

বাধু নিস্পন্দ। কিন্তু যাকে দেখে রমণীর এত হাসি এত উল্লাস, সেই নতুন বাবা তেমনি স্থির নিশ্চল ধ্যানমগ্ন। একবারও চোখ মেলে তাকায়নি, হাসিতে বা কথার এতটুকু রেশ কানে ঢোকেনি।

এই ব্যতিক্রমটা বমণীবও চোখে পডল যেন, মুখেব হাসি মেলাযনি, আবাব ভুরু কুঁচকে দেখতে লাগল বাবাকে। তাবপব বিডবিড কবে বলতে লাগল, চিনেছি, ঠিক চিনেছি, ঠিক ঠিক ঠিক—

বাধুব নেশা ছুটে গেছে ততক্ষণে। বুকেব ভিতবটা টিপ টিপ কবছে।

বমণীব চোখে এবাব হাসিব আগুন ঝবল। বলল, হাঁ মহাদেও—আব তুই বুঝি তাব চেলা?

সভযে মাথা নাডল বাধু। বলল, আমি ভৃঙ্গী।

আবাব এক পশলা হাসি। হাসিব শেষে বাবাব দিকে ফিবল। বাবা তেমনি তপোনিবিষ্ট। বমণী ভুরু কুঁচকে এবাবে একটু বিস্মযভবেই দেখতে লাগল তাকে।

নতুন বাবাকে চিনেছে শুনেই আব পাগল-টাগল ভাবাব সাহস নেই বাধুব। সভযে জিজ্ঞাসা কবল, তুমি কে আছ গো মা?

—আমি? আমি কে দেখেও চিনতে পাবছিস না হাঁদা কোথাকাবেব। জ্বল-জ্বল মুখখানা বাবাব দিকে ফেবালো আবাব।—হ্যা বে, তোব মহাদেওব চোখ-কান সব আছে তো, না-কি খেযে বসে আছে?

বাধু হাঁ কবে চেযে বইল তাব দিকে।

বিকেলেব মধ্যে এক গাঁ ছেডে তিন গাঁযে বটে গেল ব্যাপাবটা। তাবপব আবো দূবে দূবে। দলে দলে লোক ছুটল মহাশ্মশানেব দিকে। এই বিচিত্র বমণীব আগুনেব মত ৰূপ দেখে নির্বাক, তাব উচ্ছল হাসি দেখে ত্রস্ত, কথা শুনে হতভম্ব। তাকে দেখাব আগে সাধাবণ মানুষেব ঔৎসুক্য একবকম, আবাব দেখাব পবে অন্যবকম। দেখাব পবে বসালো মন্তব্য কবতে বা জটিল কিছু ভাবতে ভয।

বাবাব বিশেষ স্নেহেব পাত্র হিসেবে বাধু ভৃঙ্গীব তখন ভক্তদর্শকদেব কাছে বিশেষ প্রতিপত্তি। বাবাব সঙ্গ নিযে আছে অতএব তাব মতামত ফেলনা নয। তাব মন্তব্য নতুন শ্মশানচাবিণী কোনো মহাযোগিনী না হযে যায না। নইলে এসেই বাবাকে চেনে কি কবে, অমন কবে হাসে কি কবে, অমন সব কথা বলে কি কবে?...এই ওই বাবাব খেলা কি ওপব থেকে বাবাব বাবাব খেলা কে জানে! মাযেব দিকে তাকালে আমাব তো হাডে কাঁপুনি ধবে গো বাবুবা।

তিন দিনেব মধ্যেও ওই অদ্ভুত বমণী যখন মহাশ্মশান ছেডে নডল না সকলে ধবেই নিল এখানে থাকবে বলেই এসেছে। নতুন বাবা তাকে দেখে একটুও অবাক হযনি, তাব সম্পর্কে ভালো-মন্দ কোন কথাই বলেনি, তাকে থাকতেও বলেনি তাডিযেও দেযনি। নতুন বাবা নির্বিকাব। দু'দুটো বাত যুবতী বমণীকে শ্মশানে খোলা আকাশেব নীচে কাটাতে দেখে তৃতীয বাতেব দ্বিতীয যামে নতুন বাবা আঙ্গুলেব ইশাবায বাধুকে নিজেব পর্ণকুটীব দেখিযে দিযেছে অর্থাৎ একে ওইখানে গিযে থাকতে বলো।

বাবাব ইঙ্গিত বুঝে মা-টি নাকি তাব মুখেব ওপবেই সেই প্রথম দিনেব মতো খিল খিল কবে হেসে উঠেছিল। তাবপব সত্যিই বিনা দ্বিধায বাবাব কুটীবে গেছে বাধুব সঙ্গে। বাধুব জ্বালানী কাঠেব আলোয সকৌতুকে ঘবটা দেখেছে, তাবপব বলেছে, খাসা ঘব, আমাব জন্যেও এমনি একটা ঘব তুলে দিস তো। তাবপব বলেছে, যা

পালা এখন, দু'বাত্তিব না ঘুমিযে আমাব বেজায ঘুম পেযেছিল সেটা তোব মহাদেও বাবা বুঝেছে দেখছি।

এই বিচিত্র বমণী যে মহাসাধিকা কোনো তাতে আব কাবো সন্দেহ থাকল না। নইলে এই বযসে এমন রূপ যৌবন নিযে সমস্ত ভয-ডব বিসর্জন দিযে এভাবে কেউ শ্মশানবাসিনী হতে পাবে?

গাঁযেব মানুষেবা তাঁব নাম দিযেছে বামাসাধিকা। শুনে এই বমণী নিজেই হেসে বাঁচে না। বলে, বামা তো বটে কিন্তু সাধিকা আবাব কি বে মুখপোড়াবা।

ভক্তবা তোড়জোড় কবে অশ্বত্থ গাছটাব ওপাশে বামাসাধিকাব পর্ণকুটীব তুলে দিযেছে। সেই কুটীব দেখে সাধিকাব আনন্দ ধবে না।

যত দিন গেছে একটা ধাবণা বাধুব বিশ্বাসে পবিণত হযেছে। বাবাব সেবাব তবেই সাধিকা-মা এখানে এসে শ্মশানবাসিনী হযেছে। হযতো এই সেবাটাই তাব আসল সাধনা। বাবা যেন ছোট ছেলে একটা। তাব ওপব মাযেব হম্বি-তম্বি ধমক-ধামক পর্যন্ত চলে। অবশ্য বাবা যখন সহস্রমুণ্ডীব আসনে বসে একেবাবে পাথব হযে থাকে, তখন ওই মা'টি কি-চ্ছু বলে না, কোনবকম ব্যাঘাত ঘটায না। ঘন্টাব পব ঘন্টা বাবাব মুখেব দিকে চেযে বসে থাকে, কখনো কখনো আবাব আকাশেব দিকে চেযে থাকে। যোগিনীব তখন যেন এক ভযংকব বকমেব স্তব্ধ রূপ। কিন্তু বাবা যখন ধ্যানমগ্ন নয, তখনই মাযেব ইচ্ছে মতো সেবাশাসন চলে তাব ওপব। খাবাব সাজিযে তাকে টেনে এনে খেতে বসায, এক এক বাতে হিড়হিড় কবে কুটীবে টেনে খড়েব বিছানায শুইযে দেয। যা মুখে আসে তাই বলে বকাবকি কবে।

কিন্তু বাবা সেই ববাববকাব মতো শান্ত প্রসন্ন নির্লিপ্ত।

..শ্রী মুখোপাধ্যায বামাসাধিকাকে এই মহাশ্মশানে প্রথম পদার্পণেব পবেও দেখেছেন আবাব বছব পাঁচেক বাদেও দেখেছেন। আব তাব মাঝেও বাব কযেক দেখেছেন। না তাব রূপ সম্পর্কে কেউ অতিশযোক্তি কবেনি। কিন্তু শ্রী মুখোপাধ্যাযেব নিজস্ব ধাবণা বমণীটি অপ্রকৃতিস্থ। বাধুব সঙ্গে কথা বলে বলে ধাবণাব অনুকূলে তিনি কিছু বসদও সংগ্রহ কবেছিলেন। তাছাড়া, সে-বকম কোনো মানসিক বিপর্যয না ঘটলে এই বযসেব আব এই রূপেব বিপদ নিযে আত্মীয পবিজনেব আওতা ছেড়ে কেউ বেবিযে আসতে পাবে না। প্রথম যখন দেখেছিলেন তাকে, তখন বছব চব্বিশ বযেস মনে হযেছিল। অর্থাৎ নতুন বাবাব থেকেও বছব চাবেকেব বড় হবে। পাঁচ বছব বাদে সেই শীর্ণ কৃশ নতুন বাবাব শিখা-দীপ্ত অবযবে ভবা যৌবনেব স্পষ্ট রূপান্তব দেখেছেন—যদিও তখন সে আগেব থেকেও কঠিন তপোনিবিষ্ট, আগেব থেকেও বেশি শান্ত প্রসন্ন নির্লিপ্ত। কিন্তু শ্রী মুখোপাধ্যাযেব অবাক লেগেছিল পাঁচ বছব বাদেও সেই রূপসী সাধিকাকে দেখে। তাব যেন একটা দিনও বযস বাড়েনি, সেই জ্বলন্ত যৌবন কি-যেন এক জাদুব শেকলে বাধা পড়ে গেছে। ববং চোখেব বিভ্রম কিনা শ্রী মুখোপাধ্যায জানেন না, পাঁচ বছব বাদে বামাসাধিকাকে যেন ওই নতুন বাবাব থেকেও বযসে ছোট মনে হযেছে একটু। আব শ্রী মুখোপাধ্যায আমাকে বলেছেন, সাধিকাব স্থিব রূপই দেখেছেন বটে তিনি—কিন্তু তাঁব ধাবণা সেই রূপ ভযংকব অস্থিবও হযে উঠতে

পাবে, আব তাব আলো কবা রূপেব শিখাই দেখেছেন বটে তিনি—তবু মনে হযেছে ওই শিখা কখনো বুঝি দাউ দাউ কবে জ্বলে উঠতেও পাবে। অবশ্য, গোড়া থেকেই বমণীটিকে অপ্রকৃতিস্থ বলে ধবে নিযেছিলেন বলেই এই গোছেব ধাবণা তাঁব মনে আসাটা বিচিত্র নয, এ-কথাও স্বীকাব কবেছেন।

লোকটা বাইবেব কাঁচা মাটিব দাওযাব একটা কাঠেব থামে ঠেস দিযে বসেছিল। খালি গা, কুচকুচে কালো বঙ, পবনে হাঁটুব ওপব তোলা বিবর্ণ খাটো ধুতি। মাথাব ঝাঁকড়া চুল এখনো কালোব দিক ঘেষা। তেলজলেব অভাবে লালচে দেখাচ্ছিল। দাড়িব বোঝা গাল বেযে বুকে এসে ঠেকেছে। সেই দাড়ি অবশ্য কাঁচা পাকাব মিশেল। সোজা হযে বসে মুখ তুলে আমাব দিকে তাকালো যখন, দেখলাম চুল-দাড়িতে একাকাব মূর্তি একখানা।

বললাম, একটু জল খাওযাতে পাবো বাধু. অনেক পথ বোদে হেঁটে বড তেষ্টা পেযে গেছে।

পবিচিতেব মতো নাম ধবে কথা বলতে শুনে ও ফ্যালফ্যাল কবে চেযে বইল খানিক। ছোট্ট চোখ. কিন্তু লক্ষ্য কবলাম চাউনিতে যেন জবাব ছোঁযা লাগেনি খুব বেশি।

কোন কথা না বলে উঠল। বিশাল একটা কাঠামোয প্রাণবস্তু সক্রিয হতে সময লাগল একটু। দাঁড়াবাব পব বোঝা গেল দাওযায ঝুঁকে বসেছিল না, ওব ওই অতবড দেহটাই সামনেব দিকে বেঁকে গেছে একটু। বযসেব ভাবে আব হযতো বা অনশনে অর্ধাশনে মোটা মোটা হাড়েব ওপব কালো চামড়া ঝুলে পড়েছে।

এগোতে গিযেও দাঁড়াল আবাব। বলল. আমি জেতে চণ্ডাল—

ঝোলাটা কাধ থেকে নামাতে নামাতে আমি দাওযাব ওপব বসে পড়লাম। হেসে বললাম, তুমি মহাশ্মশানেব শ্মশানবন্ধু. তোমাব আবাব জাত কি গো। জল দাও, তৃষ্ণায ছাতি ফেটে গেল।

ও তাড়াতাড়ি ভিতবে চলে গেল। একটু বাদে ওব গাযেব বঙেব মতই একটা কুচকুচে কালো পাথবেব গেলাসে জল আব শালপাতায একটা বড বাতাসা এনে সামনে বাখল। কোথাকাব জল, কি জল, খাওযা উচিত কিনা পথে বেরুলে এ-সব নিযে আমাব খুঁতখুঁতুনি নেই। কালো পাথবেব গেলাস হাতে নিযে খুশি মুখে বললাম, বাঃ, তুমি পাথবেব গেলাসে জল খাও নাকি. কোথায পেলে?

—আমি খাই না. ওটা ঘবে ছেল। বলতে বলতে শতখানেক গজ দূবেব ওই দুটো কুটিবেব ধ্বংসাবশেষেব দিকে দৃষ্টি ঘুবে গেল ওব। আমাব মনে হল, কযেক নিমেষেব জন্য বিমনাও হযে গেল। তাবপব চোখ ফিবিযে আস্তে আস্তে আমাব দিকে তাকালো আবাব।—জল খেযে নাও, কোথা পেলাম উ খোঁজে কাজ কি?

জল, বাতাসা খেযে স্বস্তিব নিশ্বাস ফেললাম।—তুমি বোসো বাধু, দাঁড়িযে কেন?

আমাব মুখেব ওপব ওব ছোট ছোট চোখ দুটো নডেচডে বেড়াতে লাগল। ওই থামে ঠেস দিযেই মুখোমুখি বসল আবাব।—আমাব নাম তোমাকে কে বলে দেল?

শ্রী মুখোপাধ্যাযেব নাম বলে দিলাম। জিজ্ঞাসা কবলাম, চিনলে?

ও চুল-দাডি বোঝাই মাথা নাডল। চিনল না।

গাঁযেব নাম কবতেও চিনল না, চেহাবাব বর্ণনা দিতেও না। হঠাৎ ওকে একটা বে-পবোযা ধাক্কা দেবাব মতলব এলো আমাব। বললাম, তোমাব কাছে সে প্রাযই আসতো গো, তুমি তাকে খুব মান্যি কবতে, তাব কাছে সেই নতুন বাবা আব বামাসাধিকাব গল্প কবতে—আব তাঁকেই শুধু একদিন তোমাব মুন্নিব কথা বলেছিলে, জিজ্ঞেস কবেছিলে, মুন্নিকে এখন কোথায পাই? . মনে পডছে?

দু'চোখেব জবা ঠেলে ঠেলে ও আমাকে দেখতে লাগল। সন্দিগ্ধ, কুটিল চাউনি। স্পষ্টই বোঝা গেল শ্রী মুখোপাধ্যাযকে এবাবে চিনেছে। কিন্তু ওই কালো মুখ সদয নয একটুও।—তুমি উ ঠাকুবেব ছাওযালি বটে?

—ছেলে নয, ছেলেব মতো. আব ছেলেব থেকেও বেশি। কলকাতায থাকি. ওঁব কাছে এসেছি। তোমাব গল্প শুনে তোমাকে না দেখে থাকা গেল না—

ছোট ছোট দুই চোখ চিকচিক কবছে. কিছুটা বিস্মযে সংশযে।

—তুমি এত পথ আলে আমাকে দেখতে?

হাসিমুখে বিশ্বাসযোগ্যভাবে মাথা নাডলাম। কিন্তু বাধুব মুখভাব ক্রমে যেন বিবক্তিতে ছেযে যেতে থাকল। ও যেন বুঝেছে আমি ওব শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাতে এসেছি।

জিজ্ঞেস কবলাম, তোমাব বযস কত হল বাধু?

বিডবিড কবে জবাব দিল, কে জানে, দু'তিন কুডি হবে—

আমাব হাসি পেযে গেল, দু' কুডি আব তিন কুডি ওব কাছে কাছাকাছি ব্যাপাব। শ্রী মুখোপাধ্যাযেব থেকে কিছু ছোট হলেও ওব বযেস সাডে তিন কুডি অর্থাৎ সত্তবেব কম নয।

আমাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা কবে ও দূবেব ধান ক্ষেতেব দিকে চেযে বইল। মনে মনে ও আমাকে এখন বিদেয কবতেই চাইছে। আমি নাছোডবান্দাব মতো বললাম, এতদূব থেকে এলাম তোমাকে দেখতে, তোমাব কথা শুনতে. আব তুমি মুখ ফিবিযে বইলে?

—দেখা তো হ'ল...

—কিন্তু কথা তো হল না।

আবাব সেই বিবক্তি, আব চোখেব তাবায সংশয।—আমি কি ভদ্দবলোক যে তোমাব সঙতে হুডহুড কবে কথাটি ক'ব—

জবাব দিলাম, ভদ্রলোকেব কথা শুনতে হলে তো সেখানেই যেতাম, এই বোদে এত পথ তেতেপুডে তোমাব কাছে আসব কেন?

এবাবে গলাব স্ববও কর্কশ ওব।—তুমি কে বটে? ইখেনে কেন আসলে?

আমিও গলাব স্বব একটু চডিযে জবাব দিলাম. এক্ষুণি তো শুনলে কে—আব কেন এসেছি সেটা না বুঝলে তুমি বেগে যাচ্ছ কেন?

ছোট ছোট দু'চোখ পাকিয়ে ও চেয়ে রইল। ওর চোখে চোখ রেখে আমি একটু জোরেই হেসে বললাম, দেখো বাধু, মুখুজ্জেমশাইকে মানে সেই ঠাকুরকে তুমি চেলা-কাঠ নিয়ে তাড়া করেছিলে শুনেছি, কিন্তু তুমি রাগই করো আর যাই করো এখন তোমার সে-বয়েস আছে না সেই জোর আছে?

নেই যে, সেই খেদও ওর চোখে-মুখে ফুটে উঠছে। তাই গলার সুর নরম করে বললাম, তবে সত্যিই যদি তুমি মনে ব্যথা পাও তো সে আলাদা কথা, বলো—চলে যাই।...কিন্তু সত্যিই বড় লোভ নিয়ে তোমার কাছে এসেছিলাম বাধু ভৃঙ্গী, ভেবেছিলাম এখন তো তোমারও বয়েস হয়েছে, মনের কথা মনের মধ্যে পুষে রেখে কত কাল ধরে একটা যন্ত্রণা ভোগ করছ—কিন্তু এখন এ-বয়সে তোমার আর লজ্জা-ভয় নেই, রাগ-ঘৃণা নেই—এখন তুমিই হয়তো সব কথা বলে ওই যন্ত্রণা হাল্কা করার জন্য কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছ। আমি তোমার সেই লোক হতে এসেছিলাম বাধু ভৃঙ্গী...এখন দেখছি ওই যন্ত্রণা বুকে চেপে মরে ভূত হয়ে এখানেই তুমি ঘুরঘুর করবে।

না, এবারে আর রাগ নয়, বিরক্তি নয়, কি একটা ভয় যেন জমাট বাঁধতে থাকল ওর ওই ছোট ছোট চোখে। একটু বাদে বিড়বিড় করে শুধালো, বুক হাল্কা না হলে মুক্তি হয় না বাবু?

ওর ভয় দেখে কেন যেন আমার কষ্ট হল। ও-রকম না বললেই ভালো হত যেন। অভয় দেবার মতো করেই জবাব দিলাম, ও একটা কথার কথা বললাম, কি করে মুক্তি হয় আমিই কি জানি?...তবে শেষ বয়সে লোকে সব কিছুর মায়া কাটিয়ে হাল্কা হতে চেষ্টা করে শুনি, তোমারই বা আর কিসের সংকোচ। তাছাড়া এত বছর ধরে এ-ভাবে কাটিয়ে তুমি তো একটা খাঁটি মানুষ হয়েই গেছ—ক'জন পারে এতকাল এ-ভাবে কাটাতে।

বুড়ো বাধু ভৃঙ্গী যেন ঠাণ্ডা হয়ে গেল আস্তে আস্তে। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে দাড়ি ভরতি থুতনিটা ঘষতে লাগল। ও যেন অনেক দূরের কিছু দেখছে আর বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। বলল, না গো বাবু, আমি একটো শয়তান আমি একটো ডাকু...বাবার আসনে আর কেউ বসল না, মুক্তির লেগে আমি শুধু বসেই থাকলাম...কেউ আসল না রে বাবু।

—ওই বসে থেকে থেকেই তোমার মুক্তি হয়ে গেছে বাধু, ভগবানের মতো মানুষ না থাকুক, ভগবান তো আছেন—তিনিই তো সব দেখলেন সব বুঝলেন, মানুষ না-ই বা এলো।

কথাগুলো বুঝতে চেষ্টা করল। নির্বোধ অথচ ব্যাকুল চাউনি। শেষে জিজ্ঞাসা করল, কিন্তুক উ আসনের তাহলে কি হবে?

সান্ত্বনা দেবার মতো করে জবাব দিলাম, সময় হলে ভগবান পাঠাবেন কাউকে, বেঁচে যদি থাকি তখন না হয় তাঁকে এসে তোমার কথা বলে যাব...একটা লোক কতকাল ওই আসনের মালিকের আশায় শ্মশান আগলে বসেছিল সেই কথা—

নিজেই হেসে ফেললাম। ওরও কালো বিমর্ষ মুখে এবারে যেন একটু হাসির আভাস দেখা গেল। মন্তব্য করল তুমি বেশ লোক বাবু...।

খানিকক্ষণেব জন্য আমি ভিন্ন প্রসঙ্গে চলে এলাম। এখানে ওব খাওযা-দাওযা সংগ্রহ কোথা থেকে, খাবাব জল পায কোথায, বর্ষাব সময জাযগাটাব কি অবস্থা দাঁড়ায, দারুণ শীতেব সমযেই বা এই খোলা জাযগায কি কবে কাটায, গাঁযেব লোকালযে কখনো যায কিনা, ইত্যাদি খুঁটিনাটি ব্যাপাবে দস্তুবমতো আগ্রহ দেখালাম।

বাধু ভৃঙ্গী টুকটাক জবাব দিতে লাগল। এই আলাপেব মধ্যেই ও যেন একটু একটু কবে সহজ হতে লাগল।

আলাপেব মোড ফিবিযে উৎসুক আগ্রহে প্রায আচমকা জিজ্ঞাসা কবে বসলাম, আচ্ছা বাধু, মুখুজ্জেমশাযেব কাছে শুনেছি তোমাদেব সেই বামাসাধিকাব নাকি এমন ৰূপ ছিল যে চোখ ফেবানো যেত না, সত্যি নাকি?

ওব দু'চোখ যেন আমাব মুখেব ওপব হোঁচট খেল একপ্রস্থ। কুতকুত কবে চেযে বইল, কিন্তু আগেব মতো বিবক্ত নয।

—দেখো বাধু, এখন তুমি দিব্যি বুডো হযেছো, আব তোমাদেব সেই সাধিকা মা বেঁচে থাকলেও এতদিনে সে থুত্থুডি বুডি হযে যেত—আব হেসে হেসে নাতিব বযসী ছেলেদেব কাছে নিজেই হযতো নিজেব ৰূপেব কথা গল্প কবত। তোমাব মুখ দেখে মনে হচ্ছে এখনো যেন তুমি তোমাব সেই বযসেব মধ্যেই আটকে আছ।

শুনল মন দিযে, মাথা নেডে সায দিল।—তাই হইনছে গো বাবু, ওই কালেব মধ্যেই আটকে গেলম, তুমি আমাকে টেনে বাব কবতে লেগেছ...।

টেনে বাব কবছি সেটা যেন ওব মন্দ লাগছে না এখন। আমাব সাগ্রহ প্রতীক্ষাটুকু ও ঠিকই অনুভব কবল বোধহয। আস্তে আস্তে জবাব দিল, সে কেমন ৰূপ তুমি ভাবতে পাববে না গো বাবু..দূবে নদীব ধাবে যখন চিতা জ্বলত আমি মাযেব মুখেব পানে চেযে চেযে দেখতম, আমাব চোখে মাযেব ৰূপেব আগ চিতাব আগুনেব পানা লাগত, কিন্তুক চিতাব আগুনেব মতো গিলতে আসত না—হেসে হেসে মা সেই আগুন যেন জলে ভিজিযে দেত গো বাবু!

ওব বক্তব্য বোঝা গেল। উপমাটুকু অদ্ভুত ভালো লাগল কানে। হাসিভেজানো ৰূপেব আগুনেব উপমা আব কখনো শুনিনি।

দ্বিধা কাটিযে পাপ কবুল কবাব মতো কবেই একটু বাদে বাধু ভৃঙ্গী আবাব বলল, আমি একটো শযতান দুশমন ছিলম..খুব খাবাপ ছিলম...খুব খাবাপ ছিলম, উ মাযেব দিকে আমাব চোখ লাগত, কামি ভুলতম, দিশা ফিবলে তখন শযতানেব টুঁটি ছিঁডতে লাগতম আব নিজেব চোখ তুলে আনাব জন্যি ঘবপানে ছুটে যেতম...কিন্তুক চোখ গেলে মা-কে দেখতি পাবনি, বাবাব সেবা কবতে পাবনি, তখুন তো জেবন যাবে। শেষে কেবল মা-মা মা-মা কবতে লাগলম, আব মাযেব কাছে আলে ছোট বাচ্চাব পানা কেবল মা-মা মা-মা কবতম।

আমি কান পেতে শুনছি। সর্বক্ষণ কথায কথায ওই মা-মা শুনে সাধিকা নাকি এক-একসময বেগে গিযে ভেঙচি কাটত, বলত, কেবল মা-মা কবে কান ঝালাপালা কবিস কেন, মা-কি তোব মবেছে—সামনে দেখতে পাচ্ছিস না।

ওব মুখ দেখে নাকি সেই বাগেব মুখেই আবাব হাসি ঝবত। বলত, কি ববাত আমাব, সব খুইযে শেষে কিনা এক চণ্ডাল ছেলে...।

বাধুব মোট বক্তব্য, মাযেব এমনই রূপ যে বহুদিন কেবল মা-মা কবে বিবেকেব চাবুক হেনে তবে তাব পাপ চক্ষু ঠাণ্ডা কবতে হযেছে। অথচ প্রথম দেখাব দিন থেকেই ওই মা-কে সে যেমন ভয কবত তেমনি ভক্তি শ্রদ্ধা কবত।

শ্রী মুখোপাধ্যাযেব ভযে সেদিন আব দেবি না কবে উঠে পডতে হযেছে। এবপব হযতো শ্মশানেই লোক পাঠিযে বসবেন তিনি। বাধুকে বলেছি, কাল আবাব আসব।

আপত্তি তো কবেইনি, মুখে যেন একটু নীবব আগ্রহ দেখেছিলাম ওব। পবদিন এসেছি। তাব পবেব দিনও। কাধেব ঝোলাতে ওব জন্যে কিছু খাবাব এনেছিলাম। সেগুলো দেখে খুশি যেন ওব মুখ বেযে দাড়ি চুঁইযে পডেছে। কতকাল ও ভালো খাবাব চোখেও দেখেনি মনে হতে ভিতবটা আমাব কেমন যেন মোচড দিযে উঠেছিল।

তৃতীয দিন আবো বেশি খাবাবেব সঙ্গে চাল-ডাল তবি-তবিকাবিও এনেছিলাম একটা মুটেব মাথায ঝুডি চাপিযে। সেই সব দেখে তো ওব ছোট চোখ জোড' গোল একেবাবে। পযসা দিযে মুটে বিদেয কবে দেখি ওব সেই চোখে জল টল-টল কবছে। হাত ধবে আমাকে দাওযায বসিযে বিডবিড কবে বলতে লাগল, তুমি কেতো ভালো গো বাবু, কেতো ভালো.

বললাম, থাম তো বাপু, তুমি নিজে যে কতো ভালো তুমি নিজেও জানো না

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা যেন বিগডে গেল। ছোট চোখ ঘোবালো কবে তাকালো আমাব দিকে। তাবপব ধমকেই উঠল যেন, তোমাকে বললম না আমি ভালো না—আমি শযতান আমি, দুশমন—উ এক কথা আব কেতো বাব বলব?

—আচ্ছা বাবা হযেছে, আমাব তাকে ঠাণ্ডা কবাব চেষ্টা, অমন শযতান একটা কবে সকলেব মধ্যেই থাকে সে তুমি না বুঝলে আব কি কবা যাবে।

সঙ্গে সঙ্গে ওই তপ্ত কালো মুখই বিষণ্ণ আবাব। আমাব ওপব ও-ভাবে ঝাঝিযে ওঠাব দরুন হতে পাবে আবাব কোনো স্মৃতিব দংশনেব জন্যেও হতে পাবে। একটু বাদে ঝাঁকডা চুল-দাডি বোঝাই মাথা-মুখ ডাইনে-বাঁযে নেডে ক্লান্ত সুবে বলল, না গো বাবু না, তুমি জানো না আমি খুব খাবাপ দুশমন..আমাব লেগেই মহাশ্মশান খালি হইন গেল, আমাব লেগে উ হামাব মণ্ডাব আসন খালি হইন গেল, আর আমাব লেগে মা সবকুছুতে আগ লাগাযে দেল—

আমি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওব দিকে চেযে আছি। যে প্রশ্ন কবতে যাচ্ছি, বুঝতে পাবলে ওই বৃদ্ধেব বুকে নতুন কবে আঘাত পডবে একটা জেনেও সেই মুহূর্তে অন্তত অকরুণ আমি।—তুমি ঠিক বলছ যা হযেছে সব তোমাব জন্যে? আব কানো কাবণ নেই? তুমি তোমাব ওই মাযেব নামে শপথ কবে বলতে পাবো?

বাধু ভৃঙ্গী ভ্যাবাচ্যাকা খেযে আমাব দিকে চেযে বইল খানিক। আচমকা এই প্রশ্নটা বোধেব অতীত যেন।

আরো স্পষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার জন্যে সব গেছে, সব নষ্ট হয়েছে—সেটা তোমার ঢের ঢের পরের চিন্তা, নাকি সেই ভয়ংকর দিনেও তোমার এই কথাই মনে হয়েছিল, এই অনুশোচনা হয়েছিল?

এবার যেন একটু অস্বস্তিবোধ করছে ও। আমি কিন্তু তেমনিই অকরুণ।—তোমার জন্যেই যদি সব নষ্ট হয়ে থাকে তো সেই দিন ওই অশ্বত্থ গাছের দিকে চেয়ে কেবল গলা ফাটিয়ে হেসেই চলেছিলে কেন? আর কেন তারপর তোমার মুন্নির জন্যে হাহাকার করে উঠেছিলে?

বাধু ভৃঙ্গী স্থাণুর মতো বসে। অসহায় দৃষ্টি। দীর্ঘ দিনের একটা শোক আর অনুশোচনার আশ্রয় থেকেও যেন ওকে টেনে বার করে আনা হল।

আবার সেই একই প্রশ্ন করলাম আমি, এবারে ভেবে বলো—যা হয়েছে সব তোমার জন্যেই হয়েছে? আর কোনো কারণ নেই? এ-কথা তুমি তোমার ওই মায়ের নামে শপথ করে বলতে পারো?

অনেকক্ষণ বাদে বাধু ভৃঙ্গী আস্তে আস্তে মাথা নেড়েছে। বলতে পারে না। মর্মছেঁড়া সত্যি কবুল করার মতো করে যা বলল তার সারমর্ম, ওই নয়া বাবার ওপর বামাসাধিকা প্রতিশোধ নিয়েছে, পুরনো হিংসার মোকাবিলা করেছে...বাধু সেটা আগে বুঝতে পারেনি, সব শেষ হয়ে যাবার পরে বুঝেছে। কিন্তু তবু সব কিছুর জন্য বাধু নিজেকে দায়ী করে কারণ সমস্ত সর্বনাশের সে উপলক্ষ—ওর আর মুন্নির জন্যই শেষ পর্যন্ত সাধিকার শিরার রক্তে পুরনো হিংসার আগুন জ্বলল...নইলে সাধিকা সেটা ভুলতে চেষ্টা করেছিল, ভুলতে চেয়েছিল, নয়া বাবার সেবা করে হিংসা ক্ষয় করতে চেয়েছিল, ক্ষয় করছিল।

শ্রী মুখোপাধ্যায়ের মুখে শোনা কাহিনীর কাঠামোর সঙ্গে এবারে মিলছে। প্রতিশোধের নেশা কেমন করে রক্তের সঙ্গে মিশে থাকতে পারে সেই আলোচনার প্রসঙ্গ থেকেই তার এই কাহিনীর সূত্রপাত। কাহিনীটা নিজের কাছেই অসম্পূর্ণ মনে হয়েছিল শ্রী মুখোপাধ্যায়ের। কারণ সেখানে বাধু ভৃঙ্গীর ভূমিকাটি অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু রোমহর্ষক সেই সংঘাতে বাধুর সেই ভূমিকা প্রায় অবিচ্ছেদ্য বলা যেতে পারে।

...বাধু ভৃঙ্গীকে যুক্ত করে শ্রী মুখোপাধ্যায়ের কাহিনীর চিত্রটি এবারে সম্পূর্ণ করা যেতে পারে।

...মহাশ্মশানের সেই মুখর দিনে নতুন বাবা আশপাশের দশ গাঁয়ের মানুষের হৃদয় মন জয় করে বসেছিল বললেও বেশি বলা হবে না। ওই বয়সের অমন নির্লোভ স্থিতধী তাপস আর বুঝি দেখেনি কেউ। আর এক বছর যেতে অমন তাপসের কিনা গার্জেন হয়ে বসল বামাসাধিকা। তার কি শক্তি কম? গাঁয়ের মানুষেরা আদ্যাশক্তির জাগ্রত অংশ ভাবত তাকে। সব থেকে বেশি ভাবত বাধু নিজে।

শ্মশানগত ভক্তদের কাছে বামাসাধিকা মায়ের মতই সরল তরল, অন্য দিকে অগ্নিস্তব্ধ তেজের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। বাধুর এক-একসময় মনে হত ওই মায়ের কল্যাণেই হয়ত সমস্ত দেশের মানুষ একদিন এই মহাশ্মশানে এসে নয়া বাবার পায়ে ধন্না দেবে। মায়ের এমনি তেজ এমনি আকর্ষণীয় শক্তি।

ভাবেব আবেগে কথায় কথায় বাধু মা-কে একদিন সে-কথা বলেও ফেলেছিল। শুনে বামাসাধিকা হেসে বাঁচে না। বলেছিল, তোব মহাদেও বাবা তো ওই অশ্বত্থ গাছটাব মতো একটা কাঠেব গুঁড়ি—গাছটা তবু ডালপালা ছড়ায় ছায়া দেয়, তোব বাবাব কাছে এসে ধন্না দিয়ে কে কি পাবে?

বাধু বাগ কবে পাল্টা জবাব দিয়েছিল, যাব ভাগ্যে আছে সে পাবে—তুমি পাচ্ছ কি পাচ্ছ না?

ও-কথা শুনেও মায়েব সে-কি হাসি। তাবপব বলেছিল, আমি পেতে এসেছি তোকে কে বলল বে?

শুনে বাধু থতমত খেয়েছিল। মনে হয়েছিল সাধিকা মা হয়তো বাবাকে প্রতিষ্ঠা কবে দিয়ে যেতেই এসেছে এখানে।

কিন্তু বাবাকে কাঠেব গুঁড়ি বললেও তাব ওপব বামাসাধিকাব প্রতিপত্তি কিন্তু দিব্যি বাড়ছিল। নয়া বাবা সহস্রমুণ্ডীব আসনে সাধনায় বসে থাকে যতক্ষণ, ততক্ষণ অবশ্য কাঠেব গুঁড়িই বসে। নিশ্চল দেহটা শুধু আসনে বসে থাকে, তিনি যে কোথায় চলে যান কে জানে। কিন্তু অন্য সময় বাবাব ওপব মায়েব শাসন আব হম্বিতম্বি লেগেই আছে। বয়সে অবশ্য নয়া বাবা মায়েব থেকে চাব বছবেব ছোট কিন্তু অমন মহাযোগীকে কে আব বয়েস দিয়ে বিচাব কবে? কিন্তু মায়েব কাছে বাবা যেন ছোট্ট ছেলে একটা, যেমন কবে খুশি নাড়বে-চাড়বে খাওয়াবে বসাবে ঘুম পাড়াবে। কথাব অবাধ্য হলে বাগে আব তেজে বাবাকে যেন ভস্ম কবে ফেলবে একেবাবে। মায়েব সেই বাগ আব সেই তেজ আব সেই ধক-ধকে চাউনি দেখে বাধুব কতদিন যে হৃৎকম্প হয়েছে ঠিক নেই। আব কি নিয়ে যে মা হঠাৎ বাবাব ওপব বেগে যেত বাধু বেশিবভাগ সময় তাও ঠাওব কবে উঠতে পাবত না।

..বাবা যখন তাব আসনে ধ্যানে বসে তখন মায়েব মুখ সেলাই একেবাবে। এক-একদিন এমন কবে চেয়ে থাকত দূবে বসে যে বাধুব অবাক লাগত। কত দিন দেখেছে, মায়েব চোখে পলক পড়ে না, চেয়েই আছে চেয়েই আছে। সে এক অদ্ভুত চাউনি।

বাধু কতদিন জিজ্ঞেস কবেছে, বাবাব দিকে চেয়ে চেয়ে তুমি কি দেখ?

মা বেশিবভাগ দিনই হেসেছে, কিন্তু একদিন জবাব দিয়েছিল, বলেছিল, দেখে দেখে নিজেব বুকেব তলায় আগুন নেভাই বে—নেভাতে চেষ্টা কবি কিন্তু সে কি সহজে নেভে বে।

বাধু চমকে উঠেছিল। অস্বস্তিব একশেষ তাবপব।...মা কোন আগুনেব কথা বলছে? বাসনাব আগুন? তক্ষুনি সবোষে নিজেব কান মলেছে নাক মলেছে বাধু। হয়তো ভগবান দেখাব বাসনা মায়েব, তাকে না দেখতে পেয়ে মায়েব বুক জ্বলছে —তাই মানুষেব মধ্যে ভগবানকে দেখে মা জ্বালা জুড়োয়। তাই হবে, তাছাড়া আব কি হতে পাবে।

একবাতে বাধুব জ্বব হয়েছিল বেশ। এই শবীবে জ্ববজ্বালা হত না বড়, তাই একটু কাহিল হয়ে পড়েছিল। ঘব ছেড়ে বেবোয়নি। বাত্রিতে বামাসাধিকা এলো ওকে দেখতে। মাথায় গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিল। বাধুব মনে হচ্ছিল সাক্ষাৎ দেবী এসে ওব জ্বালা যন্ত্রণা দূব কবে দিচ্ছে।

একটু রাত হতে রামাসাধিকা চঞ্চল হয়ে উঠল। বলল, যাই, এতক্ষণে আসনে বসে গেছে বোধহয়...।

বাবা আসনে বসলেই মায়ের সেখানে ওঠা চাই, বসে বসে অমনি অপলক চোখে তাকে দেখা চাই।

রাধু সেই পুরনো আব্দার ধরল, তুমি কি দেখো মা, বলো না?

মা বিরক্ত মুখ করে জবাব দিল, বলেছি না দেখি না, নিজেকে ভুলি।

—কি ভোলো? রাধুর এত আগ্রহ কারণ তারও বুকের তলায় অনেক পাপ আর অনেক যন্ত্রণা।...মুন্নি ওকে বাবার কাছ থেকে কেড়ে নেবে বলে শাসিয়েছে। কিন্তু মা-কে তো সে-সব বলা যায় না।

মা জবাব দেয়নি। বাবা আসনে বসে গেছে, তার আর সময় নেই। কিন্তু আধ ঘণ্টার মধ্যেই আবার ফিরে এলো। বলল, আজ আসনে বসবে না, তাই তোর কাছেই চলে এলাম।

কিন্তু রাধুর মনে হল মায়ের মুখখানা রাগে গনগন করছে। রাগলে অত ফর্সা মুখের আলতা-গোলা রঙ হয়ে যায়। রাধু নিঃসংশয়, নিশ্চয় বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছে। বাবা তো ঝগড়া করার মানুষ নয়, মা বকা-ঝকা করলেও কেবল হাসে।

মা হঠাৎ তপ্ত মুখে জিজ্ঞেস করে বসল, হ্যাঁ রে, পাজীর পা-ঝাড়া—কে একটা খারাপ মেয়েমানুষ নাকি তোর মাথাটা চিবিয়ে খাচ্ছে?

শোনামাত্র রাধুর দিশেহারা অবস্থা। মাটি দু'ফাক হলে তার মধ্যে ঢুকে বাঁচে। কিন্তু একটু বাদে ভিতরে ভিতরে অবাক ও। মা কি এই নিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া করে এলো নাকি।

রাধু অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে, কিন্তু বুকের ভিতরটা ঠকঠক করে কাঁপছে ওর।

সেই রকম ঝাঝে মা আবার শুধিয়েছে, বজ্জাত মেয়েটার সোয়ামী আছে না?

মুখ না ফিরিয়েই রাধু ভয়ে ভয়ে মাথা নেড়েছে।—ছেল, অখুন নাই—গেল রাবে সাপে কেটেছে।

—ও, নিশ্চিন্ত হয়ে শয়তানী এখন বুঝি তোর কাঁধে ভর করেছে।

মা যত তপ্ত সুরেই কথা বলুক, রাধুর কেমন বদ্ধ ধারণা নয়া বাবার সঙ্গে মা ওর হয়ে ঝগড়া করে এসেছে। মরিয়া হয়েই বলে বসল, মুন্নির বাপের অত্যাচারে আর সোয়ামীর অত্যাচারে ওদের দু'জনের এই হাল হয়েছে—বাপটা শয়তান আর সোয়ামীটাও শয়তান ছিল, অবশ্য মুন্নিও পাজী খুব সেটা ও অস্বীকার করে না, কিন্তু ওর মরদটা অমন বদমাস না হলেও কথা ছিল, ওকে সাপে না কাটলে ও রাধুর হাতেই মরত একদিন।...মুন্নিকে ও একদিন বাঘ দিয়ে খাওয়াবার জন্য রাতে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে এসেছিল। বাপটা তিনবার বিয়ে করেছে, কিন্তু মুন্নিকে ধরে ঠেঙায় এখনো, ও অমন বাপের কাছে থাকবে কেন? রাধুর বক্তব্য অমন অত্যাচার মা কল্পনাও করতে পারবে না।

অত্যাচাবেব ওপব একটু বেশি জোব দিযে বলাব বিশেষ একটা কাবণ আছে। কেউ কাবো ওপব অত্যাচাব কবেছে শুনলেই মাযেব মেজাজ বিগডে যায, চোখ দিযে মুখ দিযে আগুন ছোটে। কত লোক তো কত বকমেব আবজি আব সমস্যা নিযে আসে এখানে। অত্যাচাবী বাপেব হাত থেকে স্বামীব হাত থেকে শাশুডীব হাত থেকে অব্যাহতি লাভেব আশাযও কত মেযে বউ ছুটে আসে এখানে। মা তুকতাকেব ধাব দিযেও যায না—সেই সব অত্যাচাবীদেব লোক দিযে ডেকে পাঠায. মা ডাকলে না এসে পাবে কি কবে, ছুটেই আসতে হয। তাবপব মাযেব সেই মূর্তি দেখে আব শাসানি শুনে তাদেব মবণদশা যেন একেবাবে—যোগিনীব কোপ থেকে বাচাব আশায মাটিতে গডাগডি কবে কাঁদে, নাকে খত দেয আব ক্ষমা চায।

অত্যাচাবেব কথা শুনে সেদিন কিন্তু মাযেব মুখে ওই গোছেব কোপ দেখা গেল না। ববং যেন বিমনা হযে বইল অনেকক্ষণ। তাবপব অনেকটা নিজেব মনেই বলল, মা স্বচক্ষে যেমন অত্যাচাব দেখেছে তেমনও বোধহয কেউ দেখেনি।

শোনাব আগ্রহে বাধু উন্মুখ তক্ষুনি।

মেজাজ ভালো থাকলে মা অনেক সময ওব সঙ্গে অনেক বকমেব গল্প কবত। কত দেশ ঘুবেছে. কত জাযগায কত লোকেব কত বকমেব কাণ্ডকাবখানা দেখেছে এই সব। আজও চট কবেই মাযেব মেজাজ ঠাণ্ডা হযে গেল কি কবে জানে না। খেযালেব বশে বেশ সহজ মুখেই একটা অত্যাচাবেব গল্প বলে গেল।

শোনাব পব বাধু স্তব্ধ।

এই কাহিনী শ্রী মুখোপাধ্যায আমাকে বলেছিলেন। সব নিঃশেষ হযে যাবাব পব এই চিত্রটা তিনিও বাধুব কাছ থেকেই সংগ্রহ কবেছিলেন।

...বছব সতেবব একটি বউ। তাব রূপেব খ্যাতি গ্রাম ছাডিযে শহবেবও অনেক জাযগায পৌঁছেছিল। গবিব বাপেব মেযে, কিন্তু অমন মেযে ঘবে নেবাব জন্য অনেক বডলোকেব দূত ওই গবিব বাপেব কাছে আনাগোনা কবত। কিন্তু বাপেব পছন্দ তাবই মতো গবিব ঘবেব এক দুর্দান্ত ছেলে। ছেলেবেলা থেকেই বাপেব ভাবী পছন্দ ওই ছেলেকে।

..সেই ছেলেব সঙ্গেই রূপসী মেযেব বিযে হযে গেল। বিযে হযে গেল না, বিপদেব আঁচ পেযে সেই দুবন্ত ছেলে ওই মেযেকে যেন ছিনিযে নিযে বিযে কবে বসল।

সেই বিযেই কাল হল।

মেযেব সংসাবে সেই দুবন্ত স্বামী আব তাব বিধবা মা। বিত্ত না থাকলেও সুখেব সংসাবই হবাব কথা। হযেওছিল।

কিন্তু যে-ভূস্বামী দু'টিব প্রজা ওই ছেলে আব তাব মা—তাবা নির্দয, নৃশংস মানুষ। সেই ভূস্বামীবা দুই ভাই—প্রজাদেব তাবা দণ্ডমুণ্ডেব মালিক। দু'জনেই অত্যাচাবী, তবে বড ভাই আবো বেশি। ছোট ভাই তাব পাপেব ফল হাতে-নাতে পেযে ঠাণ্ডা হযে গেছে। তাব একটি কন্দর্প-কান্তি ছেলে—বছব তেবো সবে বযেস—জঙ্গলেব ধাবেব কোন এক সাধু তাকে দেখতে পেযে কাছে ডেকে নেয—তাবপব তিন দিনেব মধ্যে

আব সেই ছেলেব পাত্তা নেই। ওব বাপ ছেলেব শোকে পাগলেব মতো হযে গেল। তিন দিন বাদে ছেলে ফিবল—কিন্তু একেবাবে আব এক ছেলে যেন। এব আগে থেকেই অবশ্য ছেলেটাব অন্যবকম মতি-গতি ছিল. বংশেব অন্য ছেলেদেব থেকে একেবাবে ভিন্ন ধাতেব—কোথাও পূজা-আর্চা-যজ্ঞ-টজ্ঞ দেখলেই স্থানকাল ভুলে একেবাবে নিবিষ্ট হযে যেত ঘণ্টাব পব ঘণ্টা বসে দেখত। সেই ছেলে ফিবে এসে বাপ-মাকেও ভালো কবে চেনে না—বিড়বিড় কবে অষ্টপ্রহব কি নাম কবে. হাসে কাঁদে. সর্বদাই কি যেন খোঁজে আব বাড়িব আবহাওযা থেকে ছুটে বেবিযে যেতে চায। সকলে ধবে নিযেছে অমন সোনাব চাঁদ ছেলেটাকে সাধু পাগল কবে দিযেছে। বাপ চিকিৎসা কবে হন্যে হযেও ছেলেকে সাবিযে তুলতে পাবেনি।

অন্যদিকে বড ভাই অর্থাৎ ভূস্বামীবও এক ছেলে আব গোটাকতক মেযে। বাইশ বছব বযেস না পেরুতে ছেলেটা লম্পট হযে উঠল। তাব বাপ ওই রূপসী মেযেব বাপেব কাছে ছেলেব জন্য তাব মেযেকে চেযে বসল। কোথায অমন ঘবে মেযে দিতে পেবে গবীব বাপ আকাশেব চাদ হাতে পাবে, তাব বদলে দ্বিধা দেখে বড ভূস্বামীব ভ্রূকুটি কুটিল হযে উঠল। স্পষ্ট শাসিযে গেল তাব ছেলেব হাতে মেযে না দিলে বিপদ হবে।

মেযেব বাপ সত্যিই চোখে অন্ধকাব দেখল। কিন্তু তাব পছন্দেব সেই দুঃসাহসী ছেলে রুখে উঠল। ঠিক দু'দিন বাদে বিযেব তাবিখ ছিল। সে মেযেব বাপকে জানিযে দিল ওই দিনই বিযে হবে—কোনো ব্যবস্থাব দবকাব নেই, মেযেকে শাঁখা সিঁদুব পবিযে দিলেই হবে।

জনাকতক বন্ধু আব পুরুত নিযে সে যথাসমযে উপস্থিত। বাধ্য হযেই মেযেব বাপ তাব হাতে মেযে সপে দিল।

খববটা কানে যাওযা মাত্র বড ভূস্বামীব বক্তে যেন আগুন লাগল। মেযেব বাপ তাব অবাধ্য হযনি শুধু, তাব সব থেকে চক্ষুশূল এক ছেলেব সঙ্গে মেযেব বিযে দিযেছে। ঘাযেব ওপব নুনেব ছিটে যেন এটা। ওই ছেলে এবই মধ্যে বাবকযেক তাব প্রজা ক্ষেপিযেছে। এখন কিনা এতবড শত্রুতা।

মেযেব বাপকে ছেড়ে আসল কাটা উচ্ছেদে মনোযোগী হলো সে। মেযেব বাপ তো চুনো-পুঁটি, যখন খুশি শেষ কবে দিতে পাবে।

প্রথম এক-দফা ওই ছেলেব বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা রুজু কবে তাকে নাজেহাল কবা হল। তাবপবে তাকে ডেকে সোজা শাসিযে দেওযা হল. জমিব মালিক যে-ভাবেই হোক তাব জমি দখল কববেই, বাড়াবাড়ি না কবে যে যেন এই গ্রাম ছেড়ে চলে যায।

জবাবে সেই ছেলে ফুঁসে উঠল। মুখেব ওপব অপমানকব কথা শুনিযে দিল তাকে।

সোজাসুজি সংঘাত শুরু হল সেই থেকে। দিন বদলেব হাওযা বইতে শুরু কবেছে তখন। দেশেব বহু জাযগায ভূস্বামীদেব অস্তিত্ব বিলোপেব জিগিব উঠেছে। সাধাবণ মানুষও দল পাকিযে তাদেব বিরুদ্ধে শক্তি সংগ্রহ কবছে—তাদেব অত্যাচাবেব প্রতিবাদে

মুখব হয়ে উঠছে।...ওই দুঃসাহসী ছেলেও সেই সময় গাঁযেব বহু তকণকে বড ভূস্বামীটিব বিরুদ্ধে দস্তুবমতো তাতিযে তুলছিল। তাব যে-কোনো কাজ অন্যায মনে কবলে দল বেঁধে সব রুখে উঠতে শুরু কবেছে।

বড ভূস্বামীব সহ্যেব সীমা ছাডালো। বিযেব ছ'মাস না যেতে সেই অসীম সাহসী ছেলেকে শুধু গ্রাম ছেড়ে নয, দুনিযা ছেড়েই চলে যেতে হল। বড নৃশংস মৃত্যু। এক সাঁঝেব আঁধাবে জংলা ভূমিব ধাবে মৃত্যু ঘাপটি মেবে বসেছিল, জানত না। সেই পথ দিযেই আসছিল, বাডি মাত্র তিন মিনিটেব পথ। আচমকা দু' তিনটে লোহাব ডাণ্ডাব আঘাতে কপাল মাথা ফেটে চৌচিব।

কিন্তু সেই অবস্থাতেও ছেলে তীবেব মতো ছুটে বাডিব দাওযায এসে আছড়ে পড়েছে। দাওযা বক্তে ভেসে গেছে, মবাব আগে সেই ছেলে শুধু চিৎকাব কবে বলেছে, এব শোধ নিও, ক্ষমা কোবো না।

বিধবা মা আর্তনাদ কবে উঠেছেন, পাগলেব মতো হাতে কবেই ছেলেব বক্ত মুছে দিতে চেযেছেন, তাবপব সেই বক্তাক্ত হাতে নিজেব বুক চাপড়েছেন, ক্ষিপ্ত আক্রোশে পাথব-মূর্তি কচি বউটাকে টেনে এনে তাব কপালে সেই বক্তাক্ত হাত দিযে আঘাত কবেছেন, আব সজোবে চিৎকাব কবেছেন, শুনলি—ও কি বলে গেল শুনলি? আমাব কপাল ভেঙেছে তোব কপাল ভেঙেছে—এব প্রতিশোধ আমবা নেব নেব নেব—ওদেব সব বক্ত শুষে নেব, ওদেব সর্বনাশ কবব। আয আয শীগগিব।

উন্মাদিনীব মতো কপালে বক্তমাখা বউযেব হাত ধবে হিডহিড কবে টানতে টানতে পথে বেবিযেছেন। কেউ তাদেব বাধা দিতে পাবেনি। সোজা সেই ভূস্বামীদেব বাডিব অন্দবে ঢুকে পড়েছেন।

ঘবে সেই দুই ভাই-ই ছিল, আব সেই ছোট ভাইযেব সেই চাঁদ-পানা ছেলে, সাধু যাকে অকালে ধর্মেব পথে এগিযে দিযে পাগল কবেছে বলে সকলেব বিশ্বাস। আবো ছিল কেউ কেউ।

—কোথায, কোথায সেই শযতান আমি একবাব দেখে যাই। উন্মাদিনী বিধবা মা বউযেব হাত ধবে সকলকে স্তব্ধ বিমূঢ় কবে ঘবেব মধ্যে ঢুকে পড়েছেন। দু' ভাইকে একসঙ্গে দেখে হিংস্র উল্লাসে চিৎকাব কবে উঠেছেন, এই যে পিশাচেব দল, তোমাদেব লোক আমাব ছেলেকে হত্যা কবতে পেবেছে, এ খবব তোমবা পাওনি এখনো? এই দেখো ছেলেব বক্তে চান কবে আমবাই তোমাকে খববটা দিতে এসেছি। ছেলে বলে গেছে শোধ নিতে, আমবা শোধ নেব নেব নেব। যদি চন্দ্র সূয্যি সত্যি হয, যদি আমবা সতী মাযেব মেযে হই—তোমাদেব সর্বনাশ কেউ ঠেকাতে পাববে না, কেউ না। তোমাদেব বংশে বাতি দিতে কেউ থাকবে না, কেউ না।

হঠাৎ কচি গলাব আর্তনাদ কানে আসতে সচকিত সকলেই। চাঁদ-মুখ তেব বছবেব সেই ছেলেটা কপালে বক্ত মাখা বউযেব দিকে চেযেছিল, সে-ই আচমকা এই আর্তনাদ কবে ঘব থেকে ছুটে বেবিযে গেল। তাব বাপ ধবে নিল এই বীভৎস ব্যাপাব দেখে ভয পেযে চিৎকাব কবে উঠে ছেলেটা অন্যত্র পালালো।

সেই উন্মাদিনী বিধবা মা তাই দেখে বীভৎসভাবে হেসে উঠল, ও বুঝেছে ওদেব সক্কলকে খাব আমবা, তাই পালালো—কিন্তু যাবে কোথায়, কেউ বক্ষা পাবে না, আমাদেব হাত থেকে কাবো নিস্তাব নেই।

আসল অপবাধী যে, সে-পর্যন্ত এই দৃশ্য দেখে আব এই অভিসম্পাত শুনে ভযে কাঠ কযেক মুহূর্ত। তাবপব অবশ্য দবোযান দিযে ওই উন্মাদিনী আব তাব ছেলেব বউকে বাডি থেকে বাব কবে দিযেছে।

সকলেব বিশ্বাস, বিধবা মাযেব সেই অভিসম্পাত ওই বাত থেকেই ফলতে শুরু কবেছে। কাবণ, ছোট ভূস্বামীব সেই যে ধর্ম-পাগল ছেলেটা আর্তনাদ কবে ঘব ছেডে ছুটে পালিযেছিল তাব সন্ধান আব মেলেনি। আসলে ছেলেটা বাডি থেকেই ছুটে বেবিযে গেছল। সমস্ত লোকেব মনোযোগ সেই উন্মাদিনী মাযেব দিকে ছিল বলে কেউ লক্ষ্য কবেনি। ক'দিন ধবে দশ বিশখানা গ্রাম তোলপাড কবেও তাকে খুঁজে পাওযা যাযনি।

পুত্রশোকাতুবা উন্মাদিনী বিধবা আব একটা দিনও সুস্থ হযনি। যতদিন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিতে ফেলতে পেবেছে, ওই ভূস্বামীদেব ওই এক অভিসম্পাত কবে গেছে। তাব পুত্রবধূ গবিব বাপেব সেই রূপসী মেযেও আধ-পাগল। কাবো সঙ্গে একটি কথাও বলে না, দিবাবাত্র কেবল হাতে কবে নিজেব কপাল মোছে। কিন্তু তাব ধাবণা কপাল থেকে বক্তেব দাগ আব কিছুতে উঠছে না।

তিনমাস না যেতে বড ভূস্বামীব সেই লম্পট ছেলেব বাসনা এই রূপসী বউকে কেন্দ্র কবে জ্বলে উঠতে শুরু কবেছে। দিবাবাত্র তাকে এই বাডিব কাছাকাছি ঘুব ঘুব কবতে দেখা যায। যে বউ সমস্তক্ষণ বোবা সে শুধু ওই লম্পটকে দেখলেই চেঁচিযে ওঠে, সময ঘনিযেছে, কাল ঘনিযেছে, বোসো।

অবাক কাণ্ড, সত্যিই তাব কাল ঘনালো। তিনদিন আগে মাত্র পুত্রশোকাতুবা সেই উন্মাদিনী মা হৃদবোগে আচমকা চোখ বুজেছেন। ঠিক তিনদিন বাদে খুব সকালে দেখা গেছে বড ভূস্বামীব সেই লম্পট ছেলেব মৃতদেহ দু'মাইল দূবেব একটা পুকুবে ভাসছে। তাব দু'হাত দু'পা শক্ত কবে বাঁধা, মুখে কাপড গোঁজা।

অনেকেবই মনে মনে ধাবণা ওই রূপসী বউযেব স্বামীব অন্তবঙ্গ সঙ্গীদেব কাজ এটা। এই নির্মম প্রতিশোধ তাবাই নিযেছে।

আব সেই বাতেব পব থেকেই ওই রূপসী বউকে গাঁযেব মানুষ আব দেখেনি। কোনদিনও দেখেনি।

মাযেব মুখে ওই অত্যাচাবেব গল্প শুনেই বাধু স্তব্ধ, কাবণ তাব অন্তবাত্মাসুদ্ধ বলে উঠেছে এই বামাসাধিকাই সেই রূপসী বউ। সঙ্গে সঙ্গে বুকেব ভিতবে কাঁপুনি তাব।...ওই নযা বাবা তাহলে কে? ছোট ভূস্বামীব সেই ছেলে—কানে মন্ত্র দিযে সাধু যাকে অকালে ধর্মপাগল কবে দিযেছিল? যত ভেবেছে বাধুব কাঁপুনি বেডেছে। বামাসাধিকা প্রথমদিন বেলা দ্বিপ্রহবে এই মহাশ্মশানে এসে যে-ভাবে দাঁডিযে আসনে সমাসীন বাবাকে দেখছিল—সেই দৃশ্য মনে পডতেই কাঁপুনি বেডেছিল। এমন অস্বাভাবিক মনে হযেছিল যে সেই প্রথম দেখা আগুন-পানা মেযেছেলেকে পাগলই

মনে হযেছিল।...আর এখনো মা যে-ভাবে এক-একসময বাবাকে দেখে চেযে চেযে —তাও কেমন স্বাভাবিক মনে হয না বাধুর।

ভযে ভযে এ-প্রসঙ্গ মায়ের কাছে আব কোনদিন তোলেনি বাধু। সে কেবলই ভাবতে চেষ্টা কবেছে, আগেব পবিচয নিযে মাথা ঘামানো মিথ্যে—তাদেব নযা বাবা মহাযোগী, আব বামাসাধিকা মহাযোগিনী।

বিপদেব সূত্রপাত বাধুকে নিযেই। সে নিজেই স্বীকাব কবেছে তাব স্বভাব চবিত্র ভালো ছিল না। ওব দুটো নেশা ছিল। মদ আব মুন্না। কিন্তু মুন্নাকে পেলে মদেব দবকাব হত না। শুধু ওই মেযেব জন্যেই নদীব ধাব ছেড়ে, সগোত্রদেব ছেড়ে এই দূবে এসে ডেবা বেঁধেছিল সে। মহাশ্মশানেব এই নির্জনে বাত-দুপুবে বিবক্ত কবতে আসবে এত বুকেব পাটা ওব স্বজাতীযদেবও নেই।

শুধু মুন্নাই আসত। একেবাবে নির্ভযে আসত। অমন বুকেব পাটাও বোধহয কোনো মেযেমানুষেব হযনা। মুন্নাব বাপ মানুষটা যেমন ক্রুব তেমনি লোভী। বাধুকে সে দু'চক্ষে দেখতে পাবতনা। পাববে কেন, বাধু যে কোনদিন তাব হুকুমেব পবোযা কবত না —সর্বদা বুক চিতিযে চলত। আবাব ঠিক সেই কাবণে মুন্না ওকে সকলেব থেকে বেশি পছন্দ কবত। ওব চোখে বাধুই একমাত্র মবদ। মুন্নাব গাযেব বং সামান্য তামাটে। আব ঘাগবা পবা চৌদ্দ বছরেব সেই মেযেব পাথবে কোঁদা নিটোল স্বাস্থ্য দেখলে পুরুষগুলোব চোখে ঘোব লাগত। তাব ওপব গাযেব ওই বঙেব বাডতি কদব। ...যোল বছব বযসে একবাশ টাকা গুনে নিযে বাপ ওকে চুলেব ঝুঁটি ধবে একটা বদমাসেব হাতে সঁপে দিল। বাধু তখন মুন্নাব বাপকে খুন কববে বলে শাসিযেছিল- —মাতব্ববকে এভাবে অপমান কবাব দরুন তাঁবেদাব স্বজাতীযবা ওকে প্রায বর্জনই কবেছিল।

দু'বছব. বাদে মুন্নাব শযতান স্বামীটাকে সাপে কাটতে মুন্নাব হাডে বাতাস লেগেছিল। ওদিকে বাপও আবাব মেযেব ওপব দখল পেযে খুশি। আবাব কাবো কাছে মেযে বেচে মোটা দাঁও মাববে।

কিন্তু মেযেও কম নয, বাপেব হাত থেকে বাঁচাব বাস্তা সেই বাব কবল মাথা খাটিযে। ওব ওপব প্রেত ভব কবল। ভব যে কববে বাধুকে ও সেটা আগেই জানিযে বেখেছিল। সাবাক্ষণ আলুথালু বিকট মূর্তি মুন্নাব কোনো পুরুষ মানুষ কাছে আসতে চাইলেই সে তাকে মাবতে ছোটে। নেচে কুঁদে একাকাব কাণ্ড কবে। চাব পাঁচটা জোযান মানুষও তখন ধবে বাখতে পাবে না ওকে।

মুন্নাব বাপও ঘাবডে গেল। দু'তিনটে ওঝা প্রেত ছাডাতে এসে উল্টে নাজেহাল হযে ফিবে গেল। অবশ্য মুন্নাবও হেনস্থা কম হলনা। ঝাঁটাব পিটুনি খেয়ে তাব সর্বাঙ্গ দাগডা হযে গেল। মাব খেয়ে ঝিম মেরে থাকে, আবাব ফাঁক পেলেই ওই গুণীনদের টুঁটি কামডে ধরতে আসে। এক গুণীনের তো প্রাণান্ত দশাই কবে ছেড়েছিল।

শেষে দূর থেকে এক বড গুণীন এলো। বলা বাহুল্য এটা রাধুব কারসাজি। আসলে সে গুণীন-টুনিন কিছুই নয়। বাধুর মোটা টাকা খেয়ে সে গুণীন হযে এসেছে।

বোগেব ফয়েসলা কবে দিলে মুন্নাব বাপেব কাছ থেকেও কিছু প্রাপ্তিব আশা। মনেব মত কাজ হলে বাধু তো প্রতিশ্রুতিব টাকা কডা-ক্রান্তিতে গুনে দেবেই।

সেই বড গুণীন প্রথমে খুব ঘটা কবেই চেষ্টা কবল প্রেত ছাডাতে। তাবপব তাব মুখ ভয়াল গম্ভীব। মুন্নাব বাপকে কাছে ডেকে জানালো, মুন্নাব স্বামীব প্রেত ভব কবেছে ওব ওপব—সে-ই তাব বহুকে আগলে বেখেছে। বহুব সামনে পুরুষ মানুষ দেখলেই সেই প্রেত ক্ষেপে যায়। এই মেয়েকে যে বিয়ে কববে এখন ওই প্রেত তাব ঘাড মটকাবেই। এখন একমাত্র পথ মেয়েব জন্য ডেবাব কাছাকাছি একটা আলাদা ঘব তুলে দেওয়া। সেদিকে কোনো পুরুষ মানুষ ঘেষবে না। আব বাতে পুরুষ বা মেয়ে কেউ না। ধবে নিতে হবে মেয়ে এখনো তাব স্বামীব ঘব কবছে।

মুন্নাব বাপ ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা কবেছে, কতদিন এভাবে চলবে?

বড গুণীন জবাব দিয়েছে, এক বছব কি দু'বছব কি তিন বছব কেউ বলতে পাববে না। মুন্না অর্থাৎ ওই প্রেতকে যত বিবক্ত কবা হবে ততো অমঙ্গল। এক সময় সে নিজে থেকেই মুন্নাকে ছেডে দিয়ে চলে যাবে। পুবোপুবি যেদিন ছাডবে, ওই প্রেত নিজেই তাব ডেবাব এক দিক ভেঙে দিয়ে চলে যাবে।

অবিশ্বাস কেউ কবেনি, কাবণ অবিশ্বাসেব কোনো পথ মুন্না বাখেনি। মাস দেড সে ঠাণ্ডাভাবে কাটালো, সন্ধ্যাব পব কোনো পুরুষকে ঘবেব কাছাকাছি দেখলে তখন সে তাব টুঁটি কামডে নিতে ছোটে। ওব বাপকেও ছেডে কথা কয় না।

তাবপব থেকে ওদেব নৈশ অভিসাব ভালই চলছিল। বিশেষ কবে কৃষ্ণপক্ষেব আধাব বাতে। অন্ধকাবে মিশে মুন্না চলে যেত বাধুব ডেবায়—অনেকটা পথ, কিন্তু মুন্নাব ভয় ডব কিছু ছিল না। ভোব হবাব ঢেব আগেই আবাব ফিবে আসত। আব তখন থেকেই টাকা জমাবাব চেষ্টায় মন দিয়েছে বাধু। হাতে কিছু জমলেই সকলেব চোখে ধুলো দিয়ে মুন্নাকে নিয়ে সে গ্রাম ছেডে পালাবে।

সুখেই দিন যাচ্ছিল।

.সব ওলট পালট হয়ে গেল ওই নয়া বাবা এসে এখানে সহস্রমুণ্ডীব আসন পেতে বসতে। ওই ছোকবা সাধু যেন বাতাবাতি বশ কবে ফেলল ওকে। নিজেব চোখে বাধু নয়া বাবাব এমন সব তাজ্জব কাণ্ড দেখল যে মুন্না গোপনে তাব ডেবায় এলে ওব কাঁপুনি ধবে। মুন্নাব আসাই একবকম বন্ধ কবে দিল বাধু। ফলে মুন্না আবাব নয়া বাবাব ওপব বিরূপ।

ওকে ঠাণ্ডা বাখাব জন্যেও বটে আবাব প্রবৃত্তিব তাডনায়ও বটে, এব থেকে ব্যবস্থাটা উল্টে গেল। সুযোগ পেলেই বাধুই বাতেব আধাবে মুন্নাব ডেবায় যায়। না, ভয় ডব তখন ওবও লেশমাত্র নেই। অতবড বাবাব চেলা হয়ে বসেছে, ও ভয় কববে কাকে? ভয় একমাত্র ওই নয়া বাবাকেই। গোডায় গোডায় মুন্নাব ডেবা থেকে বাতেব শেষ প্রহবে বা তাব আগেই কাঁপতে কাঁপতে ফিবত। কিন্তু ভয়টা ক্রমে ক্রমে কমে আসতে লাগল। মুন্নাকেও অন্যবকম আশ্বাস দেবাব সুযোগ মিলল, ভক্তদেব কাছ থেকে টাকা-পয়সা খাবাব-দাবাবেব ভেট যা আসে নয়া বাবা তো সেদিকে ফিবেও

তাকায না। অতএব টাকা আবো অনেক আগেই জমবে, আব ওদেবও পালানোব সুবিধে হবে। মুন্নাব জন্য ভালো ভালো খাবাবও সঙ্গে নিযে যায সে।

...কিন্তু মুন্নাব প্রতি আকর্ষণ সত্ত্বেও এখান থেকে বাবাকে ছেড়ে চলে যাওযাব ইচ্ছেটা যে ক্রমেই কমে আসছে, সে-কথা ওকে মুখ ফুটে বলতে পাবে না।

দ্বিতীয দফা গণ্ডগোলেব ব্যাপাব হযে গেল মহাশ্মশানে বামাসাধিকাব পদার্পণেব পব। সেই সঙ্গে বাধুব ভিতবটাবও আব এক প্রস্থ ওলট পালট। মুন্নাব কাছে যাওযাব সুযোগ ওব আগে থেকে কমে গেল। প্রবৃত্তিব অন্ধ তাড়না যখন অসহ্য মনে হয তখনি শুধু চোবেব মতো চুপিচুপি যায। কিন্তু এবই ফলে আবাব মুন্নাব সঙ্গে খটাখটি লাগে, ঝগড়া-ঝাঁটি হযে যায। বেশি বাগলে মুন্না শাসায ও-ই যাবে বাধুব ডেবায, নযা বাবা কেমন কবে ওকে ঠেকাতে পাবে দেখে নেবে।

ভযে ত্রাসে বাধু ওকে তখন কত ভাবে বোঝাতে চেষ্টা কবে ঠিক নেই। ত্রাসেব কাবণও আছে, ইদানীং ও বাইবে বাত কাটালেই ঠিক ঠিক যেন বুঝতে পাবে। এমন কবে তাকায তাব দিকে যে বাধুব বুকেব তলায কম্প শুরু হয। ও মনে মনে নাক কান মলে, আব কক্ষনো অমন কাজ কববে না—চুলোয যাক মুন্না।

আশ্চর্য, নযা বাবা আব সেই সঙ্গে বামাসাধিকা ওকে যেমন বশ কবেছে, তেমনি মুন্নাব প্রতি টানটাও কিছুতে যেন ছেঁড়বাব নয। সেই অন্ধ তাড়না যখন ওকে পেযে বসে, তখন সব ভুল হযে যায। নেশাগ্রস্তেব মতই ও তখন না গিযে পাবে না। ওদিকে মুন্নাও তেড়ে আসে, ওকে তাড়িযে দিতে চায। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাড়িযে দেয না—ববং লোকটাকে দ্বিগুণ বশ কবাব নেশায সে-ও ভিতবে ভিতবে ঝলসে ওঠে।

দু'দিক থেকেই বাধুব নিগ্রহ বাড়তে থাকে। বাবা ঠিক টেব পায। তাব ভ্রূকুটি আবো ভযাল হয। এক-একদিন এমন কবে তাকায যেন ভস্ম কবে ফেলবে ওকে। তখন আবাব মুন্নাকেই খুন কবতে ইচ্ছে যায বাধুব।

ব্যাপাবটা মা জেনে ফেলাব পব প্রথম দিনকতক খুব ভযে ভযে ছিল বাধু। কিন্তু বিপদ কিছু ঘটল না। তবু কিছুকাল নিজেকে সংযমেব শেকলে বেঁধে বাখল বাধু। বেশি যাতনা শুরু হলে ডবল মদ খেযে জ্বালা জুড়োয।..আশ্চর্য এই নেশা কবলে নযা বাবা কিন্তু ভ্রূক্ষেপও কবে না।

...কিন্তু বাধু অসহায, একবাব প্রবৃত্তিব দাস হলে তাব বুঝি আব অব্যাহতি নেই। আবাবও গেছে মুন্নাব কাছে। অনেক দিন পবে গেছে। মুন্না ক্ষিপ্ত হযে উঠেছে আবাব কেঁদেও ভাসিযেছে। আগে আব কখনো কাঁদেনি মুন্না।

পবদিন নযা বাবাব সামনে আসতেই বাবা আঙ্গুলেব ইশাবায ওকে সামনে থেকে চলে যেতে হুকুম কবেছে। বামাসাধিকা তখন বাবাব সামনে বসে। সে-ও গম্ভীব। চোখে অন্ধকাব দেখতে দেখতে বাধু সবে এসেছে।

বিকেলে বাবাব সামনে মা-ই ওকে ডেকে পাঠালো। কাছে যেতে ধমকে উঠল, বলি কোথায মবে পড়েছিলি সমস্ত দিন—কাঠ নেই, বলি এ-সব কি আমি বযে নিযে আসব।

বাধ্ পডিমবি কবে ছুটেছে সব সংগ্রহ কবতে। কিন্তু আশ্চর্য, নিযে এসে দেখে কাঠ ধুনো সবই আছে—আব মাযেবও খুশি-খুশি মুখ।

সেই থেকে বাধ্ বুঝে নিযেছে মাযেব অন্তত ওব ওপব বাগেব লেশমাত্র নেই। আব পবে ক্রমশ এও অনুভব কবেছে, ওকে নিযে মাযেব সঙ্গে নযা বাবাব ঝগডা-ঝাঁটিও হয মাঝে মাঝে। ঝগডাব হেতু যে মুন্না তাতে আব সন্দেহ কি।

.সেদিন বাতেব শেষ যামে মুন্নাব ডেবা থেকে ফিবে বাধ্ সকালে আব নযা বাবাব আসনেব দিকে যাযনি। ভযে ভযে নিজেব ডেবাতেই বসে আছে। এ-বকম আবো দুই একবাব হযেছে। পবে নযা বাবাব আব সে-বকম চাউনি দেখেনি। ওব ধাবণা মা-ই নযা বাবাব মাথা ঠাণ্ডা কবে ওব ফাডা কাটিযে দেয। কিন্তু এবাবে আব তা হল না। একটু বেলা হতে মা এলো। গনগনে মুখ। ঝাঁঝিযে বলল, তোব নযা বাবা যে এখান থেকে তাডাবেই তোকে ঠিক কবেছে সে খেযাল আছে? এবাবে যেখানে খুশি গিযে মব গে যা, আমি আব কিছুতে নেই।

সমস্ত পৃথিবীটা বুঝি বাধুব চোখেব সামনে বনবন কবে ঘুবে গেল। অন্ধকাব দেখছে। মা ঝলমল পা ফেলে চলে যাচ্ছে।

বাধ্ ছুটে গিযে তাব দুটো পা আঁকডে ধবে মাটিতে শুযে পডল।

—ছাড। ছাড বলছি, পাজি হতচ্ছাডা। চুলোয যা, চুলোয যা।

বাধ্ পা আঁকডে ধবে পডেই বইল। নিশ্চল মুহূর্ত গোটাকতক।

—পা ছাড। এই কণ্ঠস্বব সম্পূর্ণ আলাদা।

বাধ্ পা ছেডে উঠে বসল।

—যা, ঘবে যা। বিকেলে আসিস।

ছ'মাস কেটেছে তাবপব। বাধুব সংযমে চিড খাযনি আব। প্রবৃত্তিব সেই অন্ধ আবেগেব পাল্লায পডাব আগেই মদে ডুবেছে। বাবাব বিরূপভাজন আব সে হবে না —তাব আগে শবীবেব ক্ষুধা টুঁটি টিপে শেষ কববে ও। ভিতবটা এখনো ছটফট কবে এক একসময। তখন সক্কলেব ওপব বাগ হয—নিজেব ওপবে মুন্নাব ওপবে, মাযেব ওপব, ওই নযা বাবাব ওপব—দুনিযাব সক্কলেব ওপব। মদে চুব হযে হযে ফাঁডা কেটে যাবাব পব মুখে হাসি ফোটে, নিজেব ওপব আস্থা ফেবে।

.তাবপব সেই এক ভযাল বাত। প্রথম প্রহব হবে সেটা। মহাশ্মশান নিস্তব্ধ। নযা বাবা কালীমন্দিবেব সামনে বসে। অদূবে মা-ও বসে। তাব হাত তিনেক দূবে বাধুও বসে ঝিমুচ্ছে।

হঠাৎ আঁতকে উঠল সে। ঠিক দেখছে কি স্বপ্ন দেখছে ভেবে না পেযে দু'চোখ বগডে নিল। যা দেখছে সত্যি, না বাধুব মাথা খাবাপ হযে গেল? ফ্যালফ্যাল কবে বাবাব দিকে তাকালো, তাবপব মাযেব দিকে। তাবাও অবাক বিস্মযে একই দৃশ্য দেখছে।

কোমবে দু'হাত তুলে বাবাব ঠিক দশ গজ দূবে মুন্না দাঁডিযে আছে। দৃপ্ত উদ্ধত ফণা তুলে শত্রুকে দেখছে যেন সাপিনী। বাবাকেই দেখছে, বাবাব দিকেই চেযে আছে, দু'চোখ জ্বলছে।

বাধু নির্বাক, বিমূঢ়। গলা কাঠ, জ্ঞান বিলুপ্ত যেন।

তেমনি জ্বলন্ত চোখে একবার সকলকেই দেখে নিল মুন্না। তারপর বাবার দিকে ফিরল আবার। হিসহিস করে বলল, তুমি এখানে এসেছ কেন? পাহাড়ে যাও, জঙ্গলে যাও। এখানে এসে মেয়ে মানুষের মরদ কেড়েছ—তোমার পুণ্যি হবে? তোমার পাপ লাগবে না?

ওরা তিনজন তেমনি নির্বাক, তেমনি নিশ্চল।

যেমন আচমকা এসেছিল তেমনি আচমকা অন্ধকারে মিশে গেল মুন্না। একটা অদ্ভুত মোহ ভেঙে সজাগ হল যেন বাধু ভৃঙ্গী।

থমথমে মুখে নয়া বাবা উঠে নিজের কুটীরের দিকে চলে গেল।

মায়ের মুখভাব এখন শান্ত, নির্লিপ্ত।

বাধু উঠল। ক্লান্ত শরীরটা টেনে হিঁচড়ে ডেরার দিকে নিয়ে চলল। ঘরের কাছাকাছি এসে হুঁশ ফিরল আবার। ঘরে কুপী জ্বলছে।...আশ্চর্য, এ-রকম ভুল ওর বড় একটা হয় না। কুপী জ্বেলেই চলে গেছল।

ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত স্নায়ু লণ্ডভণ্ড করে দেবার মতই বিষম চমক আবার। সামনে মুন্না দাঁড়িয়ে। দু'হাত কোমরে তেমনি। কিন্তু হাসছে এখন। ওর চোখ হাসছে, মুখ হাসছে, সর্ব অঙ্গে হাসির বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে যেন। হাসির দমকে ওর ভরা বুক ফুলেফুলে উঠছে, সাদা দাঁত ঝকমক করছে।

..বাধু কি ওই অমোঘ ইচ্ছার সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে না হাতের কাছে কিছু একটা ধরে ভেসে ওঠার শেষ চেষ্টা করছে? হাতে ঠেকল কিছু। শেয়াল আর শুয়োর তাড়ানোর ডাণ্ডা।

তারপর কি হলো বাধু জানে না।

তীব্র তীক্ষ্ণ সত্তা থেঁতলানো আর্তনাদে শ্মশানের স্তব্ধতা খান খান করে দিয়ে বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কাঁপুনি ধরিয়ে দিল—ছুটন্ত আর্তনাদ—নাড়ি-ছেঁড়া আর্তনাদ করতে করতে মরণ-ছোটা ছুটছে।

স্থাণুর মতো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল বাধু জানে না। ঘরে এসে আবার কে দাড়াল। বামাসাধিকা। ঘোলাটে চোখে বাধু তাকালো তার দিকে।

সামনের লোহার ডাণ্ডাটা দেখল বামাসাধিকা। শিউরে উঠল একবার। এভাবে মারলি? এ-ভাবে মেরে শেষ করলি?

ঘোলাটে চোখে বাধু চেয়েই আছে।

কিন্তু কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে আবার একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেল যেন বাধু। ...মায়ের এ-কি চোখ, এ-কি মুখ? সমস্ত মুখ দিয়ে আগুন ছুটছে, দু'টো চোখ যেন জ্বলন্ত কয়লা। শুধু মুখ নয়—মায়ের সমস্ত দেহখানাই যেন ধকধক করে জ্বলছে।

...ভেবেছিলাম ক্ষমা করেছি, ক্ষমা করব...ক্ষমা করিনি...ক্ষমা করব না।

খুব অস্ফুট স্বরে যেন টুকরো টুকরো আগুন ছড়াতে ছড়াতে বামাসাধিকা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

খানিক্ষণ বাদে আচ্ছন্নেব মতো বাধুও বেরুলো। আধাবে পা ফেলে পর্ণ কুটিবেব দিকে এগলো।

...দূবে বামাসাধিকা চলেছে। কিন্তু নিজেব কুটিবে ঢুকল না। এগিযে গেল। অশ্বত্থ গাছটা ছাড়িযে নযা বাবাব কুটিবেব দিকে চলল। বাধু দেখছে, নযা বাবাব ঘবেব সামনে বামাসাধিকা দাঁড়িযে বইল কিছুক্ষণ। তাবপব খুব ধীব পাযে ঘবে ঢুকে গেল।

সময কেটে যাচ্ছে। অন্ধকাবে বাধুব দু'চোখ ঘোবালো ধাবালো কঠিন হযে উঠছে। শেষেব প্রহবেব শেযাল ডেকে উঠল। বাধু তেমনি ঠায দাঁড়িযে। দৃষ্টিশলাকা কুটিবেব গাযে বিঁধে আছে। পুবেব আকাশেব কালি-গোলা অন্ধকাব তবল হযে আসছে।

বাধু ভৃঙ্গী নিজেব ডেবাব দিকে ফিবল।

বেশ বেলাতেই বেরুলো আবাব। আসনেব থানে লোক আসতে শুরু কবেছে। কিন্তু সেখানে নযা বাবাও নেই, বামাসাধিকাও নেই। তাদেব দু'জনেবই কুটিবেব দবজা বন্ধ।

অনেক বেলা পর্যন্ত, প্রায বিকেল পর্যন্ত সেখানে দাঁড়িযে একেব পব এক ভক্ত বিদায কবল বাধু ভৃঙ্গী।. .বাবাব দেখা আজ আব মিলবে না, তাব দেহ অসুস্থ...ঘবেব মধ্যেই ধ্যানে বসে আছে হযতো।

শুধু নযা বাবা নয,বামাসাধিকাবও দেখা পাযনি কেউ।

সব বিদায হতে বাধু নিজেব ডেবাব দিকে তিবিশ চল্লিশ গজ এগিযে গেল। কিন্তু কি মনে হতে আব এগলো না। সেখানেই বসে পড়ল।

...আজ অমাবস্যা। আসন খালি থাকাব কথা নয।

সন্ধ্যা পেরুলো। বাত হল। বাত বাড়তে থাকল। পাথবেব মূর্তিব মতো বাধু ভৃঙ্গী বসে আছে।

হঠাৎ সচকিত। চোখে শাণিত দৃষ্টি। সহস্রমুণ্ডীব আসনেব দিকে নযা বাবা এগিযে আসছে। এগিযে গেল। চুপচাপ দাঁড়িযে বইল একটু। বাধু দেখতে পাচ্ছে, কাবণ অন্ধকাবে তাব চোখ সযে গেছে।

নযা বাবা ধুনী জ্বালল। কাঠ জ্বালল। ধুনী আব জ্বলন্তকাঠ হাতে আসন প্রদক্ষিণ কবল।

তাবপব আসনে বসল। সামনে ধুনী জ্বলছে। কাঠ জ্বলছে।

—জ্বলে গেলাম। পুড়ে গেলাম। মবে গেলাম।

বাধু ভৃঙ্গী ছিটকে উঠে দাঁড়াল। ওই আর্তনাদ কানে যেন গলিত শিসা ঢেলে দিযেছে। নযা বাবা আর্তনাদ কবে উঠে আসন থেকে লাফিযে নেমে এলো।

—জ্বলে গেলাম। পুড়ে গেলাম। মবে গেলাম।

মহাশ্মশানেব স্তব্ধতা খান খান কবে দিযে আজ আবাব মবণছোটা ছুটছে নযা বাবা। আর্তনাদ দূবে মিলিযে যেতে লাগল। দূব থেকে দূবে। আবো দূবে, আবো দূবে।

সম্বিত ফিরতে বাধু ভৃঙ্গী ঘুরে তাকালো। নয়া বাবার কুটিরের দিকে নয়, অশ্বত্থ গাছের এধারের কুটিরের দিকে। অন্ধকারে চোখ দেখা গেল না, মুখ দেখা গেল না, কিন্তু সাদা বসনে আবৃত নারী মূর্তি স্পষ্ট দেখা গেল।

দাওয়ায় স্থির নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে বামাসাধিকা।

উৎকট রকমের হাসি পেয়েছে বাধু ভৃঙ্গীর। কিন্তু সর্বাঙ্গ জ্বলছেও। হাসতে পারেনি।

পরদিন খুব ভোরে উঠে এসেছে আবার। নয়া বাবার কুটিরের দরজা খোলাই থাকবে জানে, কিন্তু বামাসাধিকার ঘরের দরজাও খোলা। ঘরের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যেতেই সোজা মাথার ওপরেই যেন মুগুরের ঘা পড়ল একটা।

...অশ্বত্থ গাছে একটা দেহ ঝুলছে, এক নারীদেহ ঝুলছে অশ্বত্থের ঝুরিতে।

বামাসাধিকার আগুনপানা দেহ ঝুলছে।

তারপর বাধু ভৃঙ্গীর অট্টহাসিতে ভোরের শ্মশান মুখরিত হয়ে উঠেছে। সেই হাসি বিকেলেও শোনা গেছে।

ফিরে চলেছি। সঙ্গে বাধু ভৃঙ্গীও আছে। আমাকে এগিয়ে দিচ্ছে। মুখে কিছু না বললেও ও বুঝেছে আর হয়তো আসব না।

অশ্বত্থ গাছটা ছাড়িয়ে মন্দিরের পাশ কাটিয়ে সহস্রমুণ্ডীর আসনের সামনে দাঁড়ালাম একটু। এখন আর সেই সকৌতুক চিন্তাটা মনে এলো না যে, ওই আসনটায় গিয়ে বসলে কি হয়। ফিরে একবার বাধুর দিকে তাকালাম। মনে হল ও চোখ দুটোও আসনটার মতই শূন্য।

পরদিনই ফেরার জন্য প্রস্তুত আমি। বার কয়েক বলার পর শ্রী মুখোপাধ্যায় আটকালেন না। তাঁকে প্রণাম করে রিকশয় উঠলাম।

মন এখন শুধু ঘরমুখো। চলেছি।

...এক বিচিত্র অনুভূতিতে ভিতরটা আচ্ছন্ন। এই যুগের অভিশাপ হঠাৎ যেন বড় কাছ থেকে দেখে উঠলাম...সর্বত্র আসন খালি পড়ে আছে, আর সকলে সেই আসনের মানুষ খুঁজছে, শূন্যতার প্রতিকার খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সর্বত্র শূন্য আসনের হাহাকার বাজছে।

— অষ্টম খণ্ড সমাপ্ত —